সমাজচিত্রে
ঊনবিংশ শতাব্দীর
বাংলা প্রহসন

সমাজচিত্রে
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন

ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য এম্.এ., পি. এইচ্.-ডি
মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা-সমৃদ্ধ।

প্রকাশ তারিখ : মহালয়া ১৩৮১

প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন,
কলিকাতা-৬

আমার পরলোকগত মা-বাবার আশিস্ কামনায়
আগামী দিনের গবেষকদের হাতে
আমার এই বইটি অর্পণ করলাম

॥ প্রাগ বক্তব্য ॥

বইটির রচনাকাল ১৯৬১-১৯৬২ খৃষ্টাব্দ। প্রায় একযুগ পরে এটা প্রকাশিত হলো বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সাঁতরার ঐকান্তিক আগ্রহে।

ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ। তাই আমার এই গবেষণার বইটি প্রকাশের বিষয়ে এতোদিন কারো সহায়তা পাইনি। তাছাড়া সংস্কৃতির সম্পর্ক-শূন্য এক পরিবেশ (যা থেকে বর্তমানে আমি আংশিক মুক্ত) আমার ব্যক্তিগত উৎসাহ-সৃষ্টির পরিপন্থী ছিলো। এই দীর্ঘসময়ে বইটির বক্তব্য ও ভাষা পরিমার্জনে আমার বৈরাগ্য এসে গেছিলো। কেন না, আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, এটা আর ছাপা হবে না। হয়তো এটা নিজেই নষ্ট করে ফেলতাম। কিন্তু একজনের চেষ্টায় সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। অবশ্য তাতে এখন আর দুঃখ নেই। ছাপবার সময়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করবার প্রলোভন ত্যাগ করেছি—এর আয়তন বেড়ে যাবে—এই ভয়ে। তাছাড়া বইটিতে সংস্কৃত, ইংরিজী, ফরাসী, আরবী ইত্যাদি ভাষায় দেওয়া উদ্ধৃতি প্রচুর আছে। কিন্তু তার সঙ্গে বাংলা অর্থ - যা মূল পাণ্ডুলিপিতে আছে, তা প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। কারণ, তাতেও বইটির বপু হতো ভয়াবহ। বইয়ে অনাবশ্যক বোঝা, এমন কি গৃহীত একখানিও ছবি পর্যন্ত দেওয়া হলো না। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, সেটা পাঠকের সহায়তায় সংশোধন করবার ইচ্ছা রইলো। সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে প্রাচীন বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরোনো বই থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি এবং প্রহসনের (কাহিনী বা আলোচনায় উপস্থাপিত) সংলাপ ভাষা ও বানান যথাযথ রাখা হয়েছে। বিশেষ করে প্রহসনের ক্ষেত্রে যথাযথ বানান রাখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে দিয়ে (লুপ্ত বা দুষ্প্রাপ্য প্রহসনের অভাবে) specimen-এর অনেকখানি বইটিতে ধরে রাখা যাবে; অন্ততঃ আকর-গ্রন্থ হিসেবে বইটি যাতে নির্ভরতার সঙ্গে গ্রহণ করা যায়, সে চেষ্টাও সংযুক্ত আছে। প্রহসনগুলির অঙ্ক ও দৃশ্যের হিসেব, পাত্র-পাত্রীর তালিকা ও হিসেব, কিংবা দৃশ্যানুযায়ী বক্তব্য-বিন্যাস করা হয়ে ওঠেনি—গ্রন্থের শিরোনামার কথা চিন্তা করেই। আগামী দিনের গবেষকদের এদিক থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে মার্জনা চাইছি। কারণ জঞ্জাল-সাহিত্যেরও বিভিন্ন

শাখায় বিচিত্র কলা-পদ্ধতির প্রয়োগ ও লেখক-মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র থাকা সম্ভব। তাছাড়া গ্রন্থের 'শেষ-কথা' অধ্যায়ে (১২৫৮ পৃষ্ঠায়) আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে।

এবারে ঋণ-স্বীকার। এই প্রসঙ্গে সব প্রথমে প্রণাম জানাই আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়কে। তাঁর চরণতল আশ্রয় করেই আমার এই দীন সৃষ্টি। বইটিতে সুবিস্তৃত ও মূল্যবান্ একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি আমায় উপলব্ধি করবার সুযোগ দিয়েছেন যে, আজও আমি তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আছি। আমার চির-আরাধ্য পিতৃদেব ৺সুধীরকুমার গোস্বামী মহাশয় আমার গবেষক-জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সন্ধান নিয়েছিলেন, এবং প্রতি পদক্ষেপে আমায় প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে আমার আত্মপ্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন পরে তাঁকে আর-একবার অশ্রুজলের সঙ্গে স্মরণ করি। একই সঙ্গে স্মরণ করি আমার মা ৺ প্রীতিবিন্দু দেবীকেও।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী মায়াঙ্গনা গোস্বামীর (এলিজাবেথ গোস্বামীর) অপরিমেয় এবং অপরিশোধ্য ঋণ এই বইটির প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। তার স্বতঃস্ফূর্ত সহৃদয়তা ও সহানুভূতি ছাড়া আমার পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব ছিলো না। আর-একজনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বইটির হাতে-লেখা ও টাইপ করা কপি এবং উপাদান-বহুল অন্যান্য ফাইলগুলি আমার বিধ্বংসী মেজাজের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সহৃদয় কর্তব্যবোধ ও সাহচর্যতার সঙ্গে আটবছর ধরে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করেছে আমার একান্ত সহায়িকা চিরকল্যাণীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণা মিশ্র। গ্রন্থটির সুবৃহৎ পরিশ্রমসাধ্য নির্ঘণ্ট অংশ তারই সম্পাদিত। তার কাছে আমার ঋণের বন্ধন চিরকালের।

তারপরে উল্লেখ করি অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত জ্ঞানসিন্ধু (বিশেষভাবে), শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসাকের নাম। তাঁরা সকলেই তখন ছিলেন একটি সুপরিচিত গ্রন্থাগারের কর্মী। লাইব্রেরী-ওয়ার্কে পেয়েছি তাঁদের সুমধুর আন্তরিক সহায়তা। আমার প্রিয় বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষ (লাইব্রেরিয়ান্, ইন্‌স্টিট্যুট্ অব্ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজ্‌নেস্ ম্যানেজ্‌মেণ্ট) এবং শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎকুমার সেন (হোম পুলিস্ ডিপার্টমেণ্ট, রাইটার্স) মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে নানাভাবে অমূল্য পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। সকলকেই আমি আমার কৃতজ্ঞতা

জানাই। দীর্ঘদিন অন্যত্র পড়ে থাকা ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে কপি করবার কাজে সহায়তা করেছে আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণীয় শ্রীপ্রণব মণ্ডল ('পল্টু'), কল্যাণীয় শ্রীঅশোক পোড়ে, এবং কল্যাণীয়া শ্রীছায়া সরকার। অন্যান্য বিভিন্ন ছোটখাটো সহযোগিতার জন্যে আত্মজ-ত্রয় সর্বকল্যাণীয় শ্রীজয়াঞ্জন গোস্বামী ('সেতু'), শ্রীরূপাঞ্জন গোস্বামী ('মিতু') এবং কুমারী দেবাঞ্জনা গোস্বামীর ('ঝিনুক'-এর) নাম উল্লেখ করছি। আমার ছোটোবোন কল্যাণীয়া শ্রীমতী সীমা কাঞ্জিলাল এবং নিকট-আত্মীয় কল্যাণীয় শ্রীমান ডেভিড ফ্রাঙ্কলিনের নামও তাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। এদের সকলের প্রতিই রইলো আমার স্নেহাশীর্বাদ।

সবশেষে একটি কথা, 'লোড্ শেডিং' এবং কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার বাধা কাটিয়ে আমার এই নিদারুণ প্রহসনটিকে নিয়ে মঞ্চে হাজির করেছেন 'সাহিত্যশ্রী'র শ্রীযুক্ত তপনকুমার ঘোষ ও শ্রীমান্ স্বপনকুমার ঘোষ। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই।

'পরিমার্জনিকা' অনুযায়ী সামান্য-কিছু সংশোধনের শ্রম তথ্যগত বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করবে।

বাগনান

১লা আশ্বিন, ১৩৮১ সাল

জয়ন্ত গোস্বামী

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ এবং সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও যে রচিত হয় নাই, এই কথা আশাকরি সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা রচিত না হইবার একটি প্রধান কারণ এই বিষয়ে যে ইহার বিচিত্র উপকরণ নানা-দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহা এত বিস্তৃত এবং বিপুল যে তাহা কোনও একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনের পরিশ্রমেও একত্র করা সম্ভব হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর চিন্তা এবং কর্মের ক্ষেত্রে যে এক সর্বতোমুখী বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, তাহা কোনও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের রূপ নিতে পারে নাই এ কথা সত্য, কিন্তু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া জাতির পক্ষে যে ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়, সে দিন বাংলার সমাজের বিনা রক্তপাতের বিপ্লব তাহা অপেক্ষা জাতির অনেক বেশি ফলপ্রসূ হইয়াছে। বিপ্লব-চিন্তা অন্তরের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে, কখনও বহির্বিক্ষোভের মধ্য দিয়া যেমন তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তেমনই তাহা অন্তরের মধ্যেও অভাবনীয় শক্তি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রক্তপাতহীন বিপ্লব জাতির অন্তরের মধ্যেও যে অভাবনীয় শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে তাহার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। যে সাহিত্য কেবলমাত্র রসোত্তীর্ণ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার সংবাদ আমরা রাখি, কিন্তু যে সাহিত্য উচ্চাঙ্গ শিল্পের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে অথচ তাহার ভিতর দিয়া যুগচিন্তার বহু খুঁটিনাটি বিবরণ বিধৃত হইয়াছে, তাহার সংবাদ রাখিবার আমরা কোনও আগ্রহ প্রকাশ করি না। তাহার মধ্যে সাহিত্যের অনুশীলন আমাদের যে মর্যাদায়ই উন্নত হউক না কেন, তাহা হইতে সমসাময়িক সমাজ-জীবনের তথ্য সংগ্রহে যে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহা আমরা তত গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখি না।

বিশেষতঃ ধ্রুপদী সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমসাময়িক সমাজের চিত্র অপেক্ষা শাশ্বত জীবনসত্যেরই উপলব্ধি অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলির মধ্য হইতে সমসাময়িক বাংলার সমাজের কতটুকু বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়? যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ মাত্র। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের রোমান্টিক নাটকগুলির মধ্যেই বা সে যুগের সমাজ-জীবনের কি-বাস্তব রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে?

এমন কি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় ইঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমগ্র শেষার্ধ জুড়িয়া যে অসংখ্য পৌরাণিক এবং রোমান্টিক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই বা তৎকালীন সমাজ-জীবনের কোন্ রূপটি ধরা দিয়াছে? বরং সেদিনকার সমস্যা জর্জরিত সমাজের নানা জটিল অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে রোমান্সের এত বাড়াবাড়ি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেখা যায়, তাহা সত্ত্বেও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের রচয়িতাগণ অনেকক্ষেত্রেই এই সকল একান্ত রোমান্টিক রচনাগুলিকেই তাহাদের ঐতিহাসিক আলোচনার ভিত্তিরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, ইহাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের কোনো অভাব নহে, বরং প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যেরই অভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় যাঁহারা খুঁটিনাটি করিয়া বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, সমাজ-জীবনের তথ্যের দিক হইতে সে যুগের কথাসাহিত্য, কাব্যসাহিত্য কিংবা নাট্য সাহিত্যের তুলনায় প্রহসনগুলি অধিক মূল্যবান। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, মাত্র কয়েকখানি প্রহসন ব্যতীত সে যুগে যে শত শত প্রহসন রচিত হইয়াছে, তাহাদের কাহারও কোনও সাহিত্য-মূল্য নাই। অনেকে কোনও বাংলা নাটকেরই কোনও সাহিত্য-মূল্য নাই বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা সত্য না হইলেও রামনারায়ণ, মাইকেল দীনবন্ধুকে বাদ দিলে আর কাহারও রচিত প্রহসনের যে কোনও শিল্প মূল্য নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শিল্পমূল্য না থাকিলেই ইহাদিগকে 'আবর্জনা' বলিয়া পরিত্যাগ করিবারও উপায় নাই। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে শিল্পমূল্যহীন এই সকল প্রহসনগুলির মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের তথ্যের অনেক সময় যে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইহাদিগকে 'আবর্জনা' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় না। নিজেদের ক্ষেত্রে ইহাদের অপরিসীম।

ইহাদের নিজেদের ক্ষেত্র কি, এখন তাহা বুঝিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাংলায় যে সকল প্রহসন রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংস্কার—শিল্প সৃষ্টি নহে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক' নাটক বলিয়া উল্লিখিত হইলেও

তাহা প্রহসন, কুলীনের বহু বিবাহের দোষকীর্তন করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল, নাট্যকার সে উদ্দেশ্য কোথাও গোপন করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিতভাবে নাটকের গুণও বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা ইহার অতিরিক্ত গুণ বা উপরি পাওনা মাত্র। লেখক নিজেও তাহা সচেতনভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, পাঠক কিংবা দর্শকগণও ইহার মধ্য হইতে তাহা লাভ করিবেন, তাহাও আশা করিতে পারেন নাই। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, একজন প্রগতিশীল ধনবান ব্যক্তি কুলীনের বহুবিবাহ প্রথার দোষ নির্দেশ করিয়া একটি নাটক রচনার জন্য পারিতোষিক ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই সেই উদ্দেশ্য লইয়াই রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক' রচনা করিয়াছেন, কোনও শিল্প-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কিংবা প্রেরণা লইয়া তিনি তাহা করেন নাই। এই প্রকার সকল প্রহসনই উদ্দেশ্যমূলকভাবে রচিত হইয়াছে। কারণ, সেদিন সামাজিক অব্যবস্থার দিক হইতেই প্রহসনের প্রেরণা আসিয়াছিল—সমাজের অবস্থা সেদিন এমনই ছিল যে, তাহা অতিক্রম করিয়া কলা কৈবল্যবাদের (Art for art's sake) কথা কেহ ভাবিতেও পারিতেন না। যে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্য হইতে সমাজ-জীবনে প্রহসনের উদ্ভব হইতে পারে, সেদিন সমাজের মধ্যে তাহার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সামাজিক কুপ্রথা, ইংরেজি সভ্যতার অনুকরণের মোহ, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ইত্যাদি সমাজের অগ্রগতির পথ সেদিন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই ইহাদের অবসানের জন্য সেদিন যেমন আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন, নিছক শিল্প-সৃষ্টির জন্য তেমন উৎসাহশীল হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাই ছিল সেদিনকার প্রহসনগুলির স্বক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহারা আর কোনও দাবী সেদিন পূর্ণ করিতে যায় নাই। তবে আগেই বলিয়াছি, ইহাদের মধ্য হইতেও ক্বচিৎ কোনও প্রতিভাশালী লেখকের হাত দিয়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে শিল্পের কোনও গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ কথাও সত্য, এই প্রয়াস কেহ সচেতনভাবে করেন নাই, লেখকের অজ্ঞাতভাবেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সচেতনভাবে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন কিংবা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সমাজের সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে তাঁহারা যে সফল হইয়াছেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাদের

রচনা শিল্পসৃষ্টিতে সার্থক হইল না বলিয়া পরিতাপ করিবার কোনও কারণ নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন বাঙ্গালীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সর্বস্তর স্পর্শ করিয়াছিল—ইহাই ইহার একটি বিশেষত্ব সেইজন্য তাহার প্রতিক্রিয়া যে কত ব্যাপক হইয়াছিল, তাহা আমরা অনেক সময় কল্পনাও করিতে পারি না। অনেকের ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, জনসাধারণের সঙ্গে তাহার কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভুল। কারণ, সামাজিক কুসংস্কার কেবলমাত্র নাগরিক সমাজের বুদ্ধিজীবী একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বরং ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নাগরিক সামাজিক স্বভাবতঃই শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, নাগরিক সমাজের বাহিরে যে সমাজ অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে, কূপমণ্ডুকতার মধ্যে জীবন যাপন করে তাহার মধ্যেই কুসংস্কারের ক্রিমিকীট পুষ্টলাভ করে। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ইত্যাদি নাগরিক জীবনের সমস্যা নহে বরং পল্লীসমাজেরই সমস্যা। সুতরাং ইহাদের মূল উৎপাটনের জন্য যেদিন সমাজ-সংস্কারকগণ কুঠার উদ্যত করিলেন সেদিন বাংলার সমাজের আপামর জনসাধারণ ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারিল; কেবলমাত্র নাগরিক সমাজের বুদ্ধিজীবী এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইল না। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন সেদিন সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়া না পৌছিলেও সমগ্র সমাজ-মানসে ইহা যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করিল, তাহা এই বিষয়ে ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। এখানে কেবলমাত্র একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, এই আন্দোলন দ্বারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ সেদিন কোনও ভাবেই প্রভাবিত হইল না। অর্ধশতাব্দী ব্যাপী রচিত বাংলা প্রহসনগুলির মধ্যে বাংলার মুসলমান সমাজের কোনও কথাই নাই। এমন কি, প্রহসন রচনার প্রেরণা শিক্ষিত মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে প্রসার লাভ করা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, তাঁহারাও হিন্দুর সমাজ এবং হিন্দুর পারিবারিক জীবনের দোষত্রুটিই তাঁহাদের আলোচনার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজ যে সেদিন সেই আন্দোলনের প্রভাব অনুভব করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; ইহা কেবলমাত্র নাগরিক সমাজের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধব্যাপী এই আন্দোলন যে এক ব্যাপক এবং সর্বতোমুখী প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, একমাত্র সে যুগের প্রহসনগুলির মধ্যেই আমরা তাহার পরিচয় পাই, ইহার এত ব্যাপক এবং খুঁটিনাটি পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে অনেকে সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলির উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্রগুলি প্রত্যেকটি এক একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিচালিত হইত ; ইহাদের প্রত্যেকেরই এই বিষয়ক এক একটি আদর্শ ছিল ; সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা নিজেদের পত্রিকায় সংবাদ পরিবেষণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে সেই আন্দোলনের সামগ্রিক রূপটি আশা করা যায় না। সেই সংবাদগুলি বিচ্ছিন্ন পরস্পর সম্পর্ক-হীন এবং নিজস্ব গোষ্ঠীর স্বার্থপ্রণোদিত ছিল ; সুতরাং একান্তভাবে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া সে যুগের ামগ্রিক কোনও সামাজিক ইতিহাস রচিত হইতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক দিক হইতে সে যুগের সাময়িক পত্রিকাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম এবং হিন্দু—ইহারা যথাক্রমে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের মুখপত্র, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মুখপত্র, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র। দুই একটি পত্রিকা মুখ্যভাবে কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব না করিলেও ইহাদের কোনও না কোনও গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বার্থ কিংবা আদর্শের দিক দিয়া জড়িত ছিল। সুতরাং সংবাদপত্রে সেকালের কথায় এই তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজের যে খণ্ডিত চিত্র পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা সামগ্রিক সমাজের কোনও পরিচয় উদ্ধার করা যায় না। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই যাবৎ এই সকল খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর অসংলগ্ন চিত্রগুলি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদান যোগাইয়া আসিতেছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও কোনও সময় কোনও অধ্যবসায়ী তরুণ গবেষকের আবির্ভাব ঘটিতেছে এবং তাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী নিরলস পরিশ্রমের ফলে বাংলা সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাস রচনার বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র অধুনা অধ্যাপক ডক্টর জয়ন্তকুমার গোস্বামী এই শ্রেণীর একজন নিরলস গবেষণা-কর্মী। তিনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই অনন্যচিত্ত হইয়া এই বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের কার্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। তারপর গভীর পরিশ্রম

করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে বিপুল তথ্যরাজি সংগ্রহ করিলেন। অচিরেই তাঁহার উপর আমার বিশ্বাস সৃষ্টি হইল এবং বর্তমান বিষয়টি অবলম্বন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ-ডি উপাধির জন্য তাঁহার নাম পঞ্জীভুক্ত করিয়া দিলাম। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি আমার পরামর্শ এবং উপদেশ অনুযায়ী তাঁহার সংগৃহীত বিপুল তথ্যরাজির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার বৃহদায়তন গবেষণা-পত্র রচনা করিলেন। যথা সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার গবেষণা-পত্র দাখিল করা হইল। বাংলা গবেষণার ক্ষেত্রে এত শ্রমসাধ্য কার্য ইতিপূর্বে আর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার গবেষণা-পত্রের পরীক্ষকগণ তাঁহার পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং তথ্যপরিবেষণের নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার প্রার্থিত উপাধি দিবার জন্য তাঁহার নাম সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশের সঙ্গে সকলেই এই গবেষণা-পত্রটি মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রায় পনর বছর যাবৎ ইহা অমুদ্রিত পড়িয়াছিল। কোনও প্রকাশকই এই বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। এতদিন পর বর্তমান প্রকাশক বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া বর্তমান কাগজ এবং মুদ্রণ-সঙ্কটের দিনে ইহাকে প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসসন্ধানকারী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সরকারী অর্থানুকূল্যেই মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক ছিল, সেই ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ যে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী প্রকাশক মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বর্তমান অবস্থাতেও অত্যন্ত আশার বিষয়।

বর্তমান লেখক একটি বিশাল পটভূমিকার উপর এই বিপুলায়তন গ্রন্থটির পরিকল্পনা করিয়াছেন। আজকাল সাহিত্যের কিংবা সমাজের ইতিহাস লিখিতে গিয়া অনেকেই কেবল মাত্র গ্রন্থের তালিকা মাত্র দিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার প্রত্যেক বিষয়ক প্রহসনেরই বিস্তৃত ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছেন, প্রহসনগুলির মধ্যে সাহিত্যের উপাদান নাই সত্য, তথাপি অন্য যে সকল উপাদান আছে, সাহিত্যের তুলনায় তাহাদের মূল্য কোনও অংশেই অল্প নহে, সেইজন্য সাহিত্যের সমমর্যাদা দিয়া তিনি অন্যান্য বিষয়গুলির গভীর এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বাংলা প্রহসনের আলোচনা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নূতন এবং লেখকের স্বয়ং উদ্ভাবিত এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার এই পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছি এই মাত্র।

কেন আমি এই পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছি, তাহা একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা প্রয়োজন; কারণ, অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থকারের এই সকল বিভিন্নমুখী আলোচনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সকল শ্রেণীর রচনাই যে সাহিত্যিক তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া বিচার করা প্রয়োজন এবং সেই বিচারে উত্তীর্ণ না হইলেই যে তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয় সে কথা আমি কখনও মনে করি না। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ব্যাপিয়া যে অগণিত প্রহসন শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যদি রস-শিল্পের বিচারে ব্যর্থও হইয়া থাকে, তবে তাহা কেন রচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ব্যর্থতাও কেন আসিল, তাহাও নানাদিক হইতে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান দিক মনস্তত্ত্বমূলক। সাহিত্যের শিল্পগত বিচারে মনস্তত্ত্বও যেমন সহায়ক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তেমনই এই প্রহসনগুলির রচনায়ও সমাজ-মানসের একটি বিশেষ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন, অনেক ক্ষেত্রেই ইহারা স্বস্থ মানসিকতার ফল নহে, বরং সমাজের এক বিকৃত (perverted) মানসিকতার ফল। সেইযুগে যখন সমাজ নানাদিক দিয়া উচ্চতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তখন তাহারই ছায়াতলে সমাজে কেন যে এক বিকৃত মানসিকতা জন্ম এবং পুষ্টিলাভ করিতেছিল, তাহা আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না। ব্রাহ্মধর্ম এবং সমাজের উচ্চনৈতিক আদর্শ যখন তখনকার কলিকাতার অভিজাত সমাজের একটি উচ্চ নীতি এবং রুচি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তখন তাহারই প্রতিবেশী সমাজ যে দুর্নীতি এবং কুরুচির পঙ্ককুণ্ডে নামিয়া গিয়াছিল, তাহা তখনকার যুগের একমাত্র প্রহসনগুলি ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। উচ্চ নীতি এবং রুচিবোধ সম্পর্কে সেদিনকার ব্রাহ্মসমাজ কেন যে এতখানি শুচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও সে যুগের প্রহসনগুলি অনুসরণ না করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। সমাজেই হউক কিংবা সাহিত্যেই হউক, প্রত্যেকটি বিষয়ই একে অন্যের পরিপূরক; কোনও বিষয়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ কিংবা স্বাধীন নহে। সমাজের মধ্যে যখন চরম দুর্নীতি এবং অশুচি প্রবেশ করে, তখনই সমাজের আর একটি অংশ নীতি এবং শুচিরক্ষার জন্য শুচিবায়ুগ্রস্ত

হয়, নতুবা তাহা হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সমাজ একদিন ভক্তিহীন হইয়াছিল বলিয়াই চৈতন্যদেবের মধ্যে ভক্তিধর্ম প্রবর্তনের প্রেরণা আসিয়াছিল, নতুবা তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া থাকিতেন। তেমনই উনবিংশ শতাব্দীতেও সমাজ অসত্য দুর্নীতি এবং অশুচির পঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছিল বলিয়াই সাহিত্যে সত্য সুন্দর এবং কল্যাণের সাধনার প্রেরণা দেখা দিয়াছিল। আমরা সার্থক শিল্প-সাহিত্যের মধ্য দিয়া সে যুগের সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের সাধনার রূপটিই দেখিয়াছি, কিন্তু যে অসত্য, অসুন্দর এবং অকল্যাণ পরোক্ষে সেদিন সত্য, সুন্দরের জন্ম দিয়াছিল, তাহাদের কোনও সন্ধান করি না। তরুণ গ্রন্থকার তাঁহার এই বহু শ্রমসাধ্য বিপুলায়তন গ্রন্থখানির মধ্য দিয়া আমাদিগকে হাত ধরিয়া সেই পথে নামাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। এতকাল আমরা কেবলমাত্র আলোই দেখিতেছিলাম, কিন্তু যে অন্ধকারের জন্য সেই আলোক শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোনও সন্ধান জানিতে পারি নাই। বর্তমান লেখক বাংলার সমাজ-জীবনের সেই অন্ধকার লোকের অতলান্তিক রহস্যের সন্ধান দিয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহাকে অনেক গভীরে নামিতে হইয়াছে, অনেক কাদা ঘাঁটিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত তথ্যসন্ধানীর মত তিনি নিজে সব কিছু হইতে দূরে রহিয়াছেন।

সাহিত্যিক রচনার ক্ষেত্রে কোনও কিছুই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না, কোনও বস্তুই বর্জনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না, বর্তমান লেখক এই নীতিতে বিশ্বাসী। তাহাতে সাহিত্যের রস যতটুকু পাই বা না পাই তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাতে অন্য বিষয়ের তথ্য লাভ করিতে পারি। কারণ, মানুষের সৃষ্টির কোনও বিষয়ই উপেক্ষণীয় নহে। মানুষের সৃষ্টির প্রতি এই বিশ্বাস ও মমতা গ্রন্থকারকে এই দুরূহ পথের পথিক করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিতে হইলে লেখক যে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর কোনও গতি ছিল না। তারপর সামগ্রিকভাবে দেখার যে অর্থ, খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার সেই অর্থ হইতে পারে না। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে শুধু বিধবা-বিবাহের আন্দোলন একটি খণ্ডিত কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনও স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন আন্দোলন নহে; ইহার সঙ্গে বাল্যবিবাহের যোগ আছে; কারণ, বাল-বিধবাদিগের জীবনই সেদিন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, সুতরাং বাল্যবিবাহের রূপ এবং তাহার দোষত্রুটি উপলব্ধি করিতে না পারিলে বিধবা-বিবাহ

আন্দোলনের স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না। শুধু তাহাই নহে, অসমবিবাহ, কুলীনের বহুবিবাহ এই সকল সামাজিক প্রথাও বিধবার সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সমাজের নানা কুপ্রথার সঙ্গে জড়িত ছিল, ইহা স্বাধীন কোনও আচার কিংবা প্রথা ছিল না, সুতরাং বিধবা-বিবাহেরও সামগ্রিক সমস্যাটি উপলব্ধি করিবার জন্য উহার সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনের রূপও উপলব্ধি করা আবশ্যক। গ্রন্থকার এই বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনের নানা খুঁটিনাটি সমস্যাগুলিকেও তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহার গ্রন্থের কলেবর স্ফীত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি পরিচিত পথে চলেন নাই বলিয়াই পরিচিত ধারার এখানে ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-জীবনে স্ত্রীজাতির প্রতি অবহেলা এবং অত্যাচারের প্রতিই সমাজের সর্বাধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কতদিক দিয়া যে স্ত্রীজাতি অবহেলিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ এবং সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা এতদিন উদ্ধার করিতে পারি নাই, লেখক গভীর শ্রম স্বীকার করিয়া বহু বিক্ষিপ্ত এবং বিচিত্র ক্ষেত্র হইতে তাহার বহুমুখী চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহা দেখিয়া এক শতাব্দীর মধ্যেই আমরা কি অবস্থা হইতে যে কি অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি, তাহা বুঝিয়াছি। এ পর্যন্ত আমরা কেবলমাত্র ইহার অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়াছি!

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-জীবনের স্ত্রী-পুরুষের যৌন সমস্যা লইয়া লেখক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ক রচিত প্রহসনগুলির মধ্য হইতেই এই আলোচনা অপরিহার্যরূপে ইহাতে আসিয়াছে, লেখক জোর করিয়া কোনও অনাবশ্যক আলোচনা ইহার উপর আরোপ করেন নাই।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগন্ধর কবি ভারতচন্দ্রের পরই ঊনবিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তখন পর্যন্তও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রভাব সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; তাহার সংস্কার সমাজের মধ্যে তখনও সক্রিয় রহিয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য কিংবা সমাজের ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের মার্জিত পাশ্চাত্ত্য রুচি এবং ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয় অবলম্বন করিয়া সে যুগে

সে অসংখ্য প্রহসন রচিত হইয়াছে, এই ঐতিহাসিক সত্য বিস্মৃত হইবার কোনও উপায় নাই। আত্মনির্লিপ্ত কিংবা আত্মনিরপেক্ষ হইয়া যাঁহারা সমাজ দর্শন করেন না, তাঁহারা কখনও সমাজের পূর্ণাঙ্গ রূপটি প্রকাশ করিতে পারেন না, তাঁহারা কেবলমাত্র তাঁহার একটি নিজেদের মনগড়া খণ্ডিত রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্তমান গ্রন্থকার সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনায় একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। সমাজের যাহা ভাল, কেবলমাত্র তাহাই নহে, মধ্যযুগ হইতে সমাজ-জীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারায় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আসিয়া সমাজ যে ভালোয় মন্দয় মিশানো পূর্ণাঙ্গ রূপটি লাভ করিয়াছিল, তাহা কোনও দিক দিয়া মার্জিত না করিয়াই তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সেইজন্য ইহার মধ্যে যে কাদা ও কালির দাগ আছে, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইহাদের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইলে সমাজের সামগ্রিক পরিচয়টি পাইব না, যাহা পাইব, তাহা আমাদের কোনও কাজে আসিবে না।

পতিতাবৃত্তি সামাজিক সমস্যা হইতে উদ্ভূত। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজে স্ত্রীজাতির যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার ফলে পতিতার ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সমাজে তাহার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এমন কি, ধ্রুপদী সাহিত্যের মধ্যেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রহসন জাতীয় রচনাগুলি ইহার নানা কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ; কারণ, কলিকাতার সে দিনকার নাগরিক জীবনের সাধারণ বিলাস-ব্যসনেরই ইহা অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে যাহারা কাটিয়া ছাঁটিয়া রোমান্টিক সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নরনারীর জীবনের কথা বলেন নাই, নিজেদের কল্পনার আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছেন মাত্র। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সংস্কার মুক্ত এবং সত্যসন্ধানী লেখক সমাজ-জীবনের এই অপরিহার্য অংশটিকে রুচি এবং নীতির জন্য 'বর্জনীয়' মনে না করিয়া অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সমান অধিকার দিয়াছেন। যাহার প্রতি আমরা এতদিন চোখ বুজিয়াছিলাম, তাহার প্রতি তিনি আমাদের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সমগ্র সমাজ একটি অখণ্ড দেহ ; ইহা অঙ্গে অঙ্গে খণ্ডিত নহে, পতিতাপল্লীটিও সমাজ-দেহের একটি অঙ্গ, ইহার প্রতি আমরা চোখ বুজিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ইহার ক্রিয়া অস্বীকার করিতে পারি না, তাহা হইলে সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। ইহা সমাজদেহের

একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়াই ইহা অবলম্বন করিয়াও যে অসংখ্য প্রহসন রচিত হইয়াছিল, তাহা সমাজ-জীবনের সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই স্থান পাইয়াছে। লেখক এই বিষয়ে যে দুঃসাহসী কাজ করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য ; কারণ, সংস্কারকে জয় করিতে না পারিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। ঐ কথা লেখক বুঝিয়াছেন, কিন্তু আমরা অনেকেই অনেক সময় বুঝিতে পারি না।

গ্রন্থকারের আলোচ্য প্রহসনগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সমাজ-জীবনের এমন কোনও পাপ নাই, যাহা এই প্রহসনগুলিতে বর্ণিত হয় নাই। একমাত্র প্রহসনগুলির মধ্যেই যেন সেদিন মানুষের মন সর্ববিষয়ে এক মহানন্দময় মুক্তির সন্ধান পাইয়াছিল। সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় যেমন কাব্য, কথাসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া মাজিয়া ঘষিয়া রচনা করিয়াছি, কিন্তু একমাত্র প্রহসনগুলির মধ্যে যেন মানুষের মন সহজেই একেবারে আলগা হইয়া গিয়াছিল। এমন কি, পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন পরম সংযমী লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তও যখন তাঁহার প্রহসন দুইখানি রচনা করিলেন, তখন সংযমের কোন বাঁধই তিনি আর স্বীকার করিলেন না। মনে হয়, প্রহসনের বিষয়-বস্তুর গুণেই ইহা সম্ভব হইয়াছে, লেখকের সংযমের বাঁধ যেন এখানে আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এমন কি, এ কথাও মনে হইতে পারে যে, ইহাদের মধ্য দিয়া কৃত্রিম সংযম-আচরণকারী সমাজের অবচেতন মনের নানা প্রচ্ছন্ন চিন্তা আপনা হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে কথা তথাকথিত শিল্পসাহিত্য বলিতে সাহস পায় নাই, অথচ যে কথা বলি বলি করিয়া তাহার মুখে আসিয়াও বার বার ফিরিয়া গিয়াছে, প্রহসনগুলি সমাজের সেই কথা দুঃসাহস করিয়া বলিয়াছে। ইহাদের কথা কিংবা চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু কখনও মিথ্যা নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অনেকে মনে করেন, অর্থনৈতিক সঙ্কট কিংবা অসাম্য সমাজ-জীবনের সকল বহির্মুখী সমস্যার মূল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলার সমাজে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রথাজাত। অর্থাৎ বিবাহে পণপ্রথা মধ্যবিত্ত পরিবারে সেদিন অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছিল এই কথা সত্য ; ধনী এবং দরিদ্রের অর্থনৈতিক জীবনে যে অসাম্য তাহা সমাজ-জীবনে চিরকালের একটি সমস্যা। তথাপি এই কথা সত্য, এই

যুগে সেই সমস্যাটি যেমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সে যুগে তাহা সমাজ-জীবনে তেমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই ; কারণ সে যুগের প্রহসনের মধ্যে ইহা একটি সমস্যা নহে। তবে বিলাসীর অর্থের অপচয় প্রহসনগুলির বিষয়ীভূত হইয়াছে।

একথা সকলেই জানেন, উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজী শাসনের ফলে নূতন এক ধনী সম্প্রদায় কলিকাতা মহানগরীর সমাজ-জীবন কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে তাহার মধ্যে পূর্ব-বর্তী কোনও সংস্কার কিংবা অভ্যাস না থাকিবার জন্য সেই অর্থ নানাভাবে অপচয় করা হইতে লাগিল। তাহার ফলেই ধনবানদের বিলাস-জীবনের একটি বিকৃত রূপ সেদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অসংখ্য প্রহসনে এই বিষয়টি অবলম্বন করা হইয়াছে এবং এই বিষয়ে সামাজিক মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক সঙ্কট যে এক নহে, ইহাদের মৌলিক চরিত্রের মধ্যেই যে পার্থক্য আছে, তাহা এই প্রহসনগুলি হইতে জানিতে পারা যাইবে। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া যদি কোনও দিন আমাদের সমীক্ষা (survey) কারবার প্রয়োজন হয়, তবে এই প্রহসনগুলি এই বিষয়ে যে তথ্য সরবরাহ করিতে পারে, কোনও দলিল কিংবা সমসাময়িক সংবাদপত্রের বিবরণ তাহা পারে না। বর্তমান গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ বিভাগ সে যুগের আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিয়াছেন। কারণ, বহু সংখ্যক প্রহসনে এই বিষয়টি নানাভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। একমাত্র বাবুয়ানার জন্যই যে কতভাবে অর্থের অপচয় করা হইয়াছে, তাহাও লেখক উক্ত বিভাগটির খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন, যেমন 'ফোতো বাবুয়ানা', 'হঠাৎ বাবুয়ানা', 'কাপ্তেন বাবুয়ানা', 'সাধারণ বাবুয়ানা',—এক বাবুয়ানাই যে কত রকমভাবে বিত্তশালী বিলাসী ব্যক্তিদের অর্থের অপচয় ঘটাইত, প্রহসনগুলিতে তাহার খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। অথচ এত খুঁটিনাটি করিয়া সমাজের এক একটি অংশের বিবরণ আর কোথাও সংগৃহীত হইতে পারে না। বিভিন্ন প্রকৃতির বাবুয়ানা'র ভিতর দিয়া যে মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও লেখক সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রচনা কেবলমাত্র ঘটনারই বিবরণ হয় নাই, সকল বিষয়েই বিশ্লেষণাত্মক হইয়াছে।

গ্রন্থকার কতকগুলি প্রহসনকে তাঁহার পরিকল্পিত 'সাংস্কৃতিক' বিভাগের

অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সংস্কৃতি শব্দটিকে এখানে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'জাতপাঁতে'র আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যসভ্যতা, স্ত্রীশিক্ষা, ব্রাহ্মসমাজ, পারিবারিক ক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক বিরোধ, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি বহু-বিষয়ক প্রহসন লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়কে সমাজ-চিত্রেরই অন্তর্গত করা যায়। কারণ, জাতপাঁতের আন্দোলন, অব্রাহ্মণের উপবীত গ্রহণের আন্দোলন, কিংবা নব্য সভ্যতার মধ্য দিয়া যে অনাচার ও ভণ্ডামি দেখা দিয়াছিল ইত্যাদি প্রসঙ্গ সামাজিক বিষয়েরই অন্তর্গত। সমাজ সেদিন কোনও সুস্থ অবস্থার মধ্যে স্থৈর্য লাভ করিতে পারে নাই, সুতরাং সে দিনকার প্রত্যেকটি সমস্যাই সামাজিক সমস্যাই ছিল, ইহাদের প্রত্যেকটির ভিতর দিয়া সমাজেরই চিত্র নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতির ধারা যেদিন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নূত . কোনও সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপও সমাজে সেদিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্য হইতেই ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির অঙ্কুরে উদগম হইতেছিল সত্য, কিন্তু নূতন কোনও সংস্কৃতি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই। সেই যুগ ছিল সংঘর্ষের যুগ। সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নূতন সংস্কৃতি তখন জন্মলাভ করিতেছিল। কিন্তু তাহার জন্মক্ষণ রক্ষণশীল সমাজের বিদ্রূপে ব্যঙ্গে নিন্দায় অপবাদে ধূম্রবাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্য দিয়া রক্ষণশীলতা এবং প্রগতিশীলতার যে শক্তিপরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনার মূল্যবান দলিল হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং বাংলার জীবনের পূর্ণাঙ্গ নূতন সাংস্কৃতিক রূপ সেদিন আত্মপ্রকাশ না করিলেও তাহার যে বিরাট কর্মযজ্ঞের সেদিন সূচনা হইয়াছিল, তাহার পরিচয়ে সেযুগের প্রহসনগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সেযুগের বাংলা প্রহসনগুলির মধ্য দিয়াই যে সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গীণ রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার একটি কারণ ছিল। তাহা এই যে, নাটক কিংবা কথাসাহিত্যের যেমন একটা সুনির্দিষ্ট বাঁধুনি এবং সুস্পষ্ট পরিণতি ছিল, প্রহসনগুলির তাহা ছিল না। সকলেই মনে করিত যেমন তেমন করিয়া রচনা করিলেই প্রহসন হইতে পারে, কিন্তু যেমন তেমন করিয়া রচনা করিলেই নাটক হইতে পারে না। তারপর রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল মনোভাবের মধ্যে সেদিন যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কাহারও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থঘটিত

কোনও বিবাদ হইতে সৃষ্ট হয় নাই। রক্ষণশীলতাই হউক, কিংবা প্রগতি-শীলতাই হউক ইহাদের প্রত্যেকের আচার-আচরণই লঘু কৌতুকের সৃষ্টি করিত। রক্ষণশীলদের নিকট প্রগতিশীলদের আচার-আচরণ যেমন কৌতুক সৃষ্টি করিত, প্রগতিশীলদিগের নিকট রক্ষণশীলদের আচার-আচরণ তেমনই কৃপার কারণ হইয়াছিল। এই মনোভাব হইতে যাহা রচিত হইয়াছে, তাহা কখনও গুরুত্বপূর্ণ কিংবা ভাবগম্ভীর রচনা হইতে পারে না, প্রহসনের মধ্য দিয়াই তাহার অভিব্যক্তি নিতান্ত স্বাভাবিক।

সামান্য কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখক ব্যতীত সেযুগের অধিকাংশ প্রহসনের লেখকই অল্প শিক্ষিত নিতান্ত সাধারণ স্তরের লোক ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে বাধাবন্ধহীন, বিধিনিয়মের বহির্ভূত যথেচ্ছ প্রহসন রচনা যত সহজ ছিল, অন্য কোনও বিষয় রচনা তত সহজ ছিল না। অনেক সময় প্রহসনের বিষয়বস্তু সমসাময়িক কোনও ঘটনা-নির্ভর ছিল, এই সকল ক্ষেত্রে ঘটনা উদ্ভাবনের যে একটি দায়িত্ব আছে, তাহাও প্রহসন লেখকদিগের পালন করিতে হইত না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিংবা সমসাময়িক লোকশ্রুতি অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা ঘটনার সূত্র লাভ করিতেন। প্রহসন রচনার জন্য কোনও কলাকৌশল, সাহিত্যিক প্রতিভা, বুদ্ধিচাতুর্য কিছুই আবশ্যক হইত বলিয়া মনে করা হইত না। সেইজন্য সেযুগে আমরা প্রহসনের নামে যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সমাজচিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, প্রহসন রচনার কলাকৌশল লেখকদিগের মধ্যে কিছুমাত্র জানা ছিল না, যাহা জানা ছিল, তাহা কতকগুলি চিত্র রচনা, কোনও সময় তাহা আতরঞ্জিত, কোন সময় তাহা প্রকৃত ঘটনা-নির্ভর।

গ্রন্থকার এই বিশাল গ্রন্থরচনার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অথচ সর্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য যে কাজ করিয়াছেন, তাহা এই যে, তিনি ইহাতে প্রত্যেকটি প্রহসনেরই কাহিনী বা প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সাম্প্রতিক-কালে যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া গবেষণা করেন, তাঁহাদের অনেকেই আলোচ্য গ্রন্থগুলির মূল পড়িবার সুযোগ পান না, অনেক সময় গ্রন্থতালিকা কিংবা অন্যের সমালোচনা পড়িয়া নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ; তাহার ফলে যাহা হইবার তাহাই হয় ; অনেক সময় দেখা যায় যে, মূল গ্রন্থের সঙ্গে তাঁহাদের সমালোচনার কোনও যোগ নাই। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার বহু দুর্গম স্থান হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য অথচ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর 'প্রহসনে'রও সন্ধান করিয়া

ইহার কেবলমাত্র একটি বহির্মুখী আকৃতির সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা নহে, অন্তর্মুখী বিষয়বস্তুটিও পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যে সকল সমালোচক নিজেদের বিশেষ 'বিজ্ঞ' বলিয়া এবং 'বিশেষজ্ঞ' বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, ইহার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন সমালোচক তাঁহারা সকলেই গ্রন্থকারের এই দুরূহ কর্মের জন্য তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিবেন। কারণ, দীর্ঘকাল যাবৎ নানাক্ষেত্র হইতে অনুসন্ধানের ফলে গ্রন্থকার যে অসংখ্য 'প্রহসন' সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বিষয়-বস্তুসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়েরই সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেক প্রহসনই আজ ইতিমধ্যেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহাদিগের কেহ কোনও সন্ধান পাইবে না। সুতরাং তিনি ভবিষ্যৎ গবেষকদিগের জন্যও যে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া গেলেন, তাহার জন্য সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন, কেহ ইহাকে অনাবশ্যক ত মনে করিবেই না, বরং পরম মূল্যবান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিবেন, তাঁহারা এই গ্রন্থখানির মধ্যেই একস্থানে তাঁহার সকল উপাদান লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে হইবে না। আমি ইহার মূল্য জানি বলিয়া আমি নিজেই তাঁহাকে এই কার্যে উৎসাহিত করিয়াছি এবং তিনি নিরলস চেষ্টায় তাঁহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

আজকাল গবেষণা-পত্র রচনায় কেহ পরিশ্রম স্বীকার করিতে চাহেন না, কোনও রকমে একটা কিছু খাড়া করিয়া দিয়া সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইতে চাহেন। আমি এই শ্রেণীর গবেষককে কোনদিনই প্রশ্রয় দিই নাই। যাহারা দুরূহ পথের পথিক, আমি তাহাদেরই গবেষণা-কর্মে সাহায্য করিয়া আসিয়াছি। বর্তমান লেখকের গবেষণা-পত্রটি তাহার একটি জলন্ত প্রমাণ। ইহার মধ্যে একজন তরুণ গবেষক যে কি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার গবেষণা-পত্র রচনা করিতে যে কত দুর্গম ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া কত দুষ্প্রাপ্য এবং অপাঠ্য 'প্রহসন' পাঠ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। এই পর্যন্ত বাংলায় যত প্রহসন প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিয়াছেন। কেবলমাত্র তালিকাটি দেখিলেই এই বিষয়ে বিস্তার সম্পর্কে একটি ধারণা হইতে পারে এবং

আমার বিশ্বাস এই তালিকাটি আরও বহু নূতন গবেষণা-পত্র রচনার প্রেরণা দিতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রসঙ্গত কিছু কিছু প্রহসনের আলোচনা স্থান পাইয়াছে, কিন্তু রচিত প্রহসনের সংখ্যার তুলনায় তাহা নিতান্ত সামান্য। ইহাতেই নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের দায়িত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রহসন যে নাটকের মধ্যে আলোচ্য নহে, ইহা যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন বিষয়, ইহার যে একটি নিজস্ব ধারা আছে, বর্তমান গ্রন্থখানি তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। সুতরাং নাটকের ইতিহাস হইতে প্রহসনের ইতিহাস স্বতন্ত্র করিয়া রচনা করা আবশ্যক। যদি ভবিষ্যতে সেই চেষ্টা কেহ করেন, তবে একমাত্র এই বইখানিই তাঁহার অবলম্বন হইতে পারে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পর নাটকের ইতিহাস রচয়িতাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, প্রহসন বিষয়ে অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত যে আলোচনা তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই বিষয় লইয়া স্বতন্ত্র কোনও গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন কি না। কারণ, বর্তমান গ্রন্থখানি সকলের জন্যই এই সুযোগটুকু আনিয়া দিয়াছে।

অনেকে এই কথা মনে করিতে পারেন যে, প্রহসনগুলি কেবলমাত্র যে সাহিত্যের দিক দিয়া অকিঞ্চিৎকর রচনা, তাহাই নহে, ইহারা রুচির দিক দিয়াও নিতান্ত নিন্দিত; সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের স্থান দেওয়া কর্তব্য নহে। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাহিত্য জাতির যে সকল বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করিয়া আসে তাহাদের সকলেরই যে নীতি ও রুচিবোধ এক এবং অভিন্ন তাহা নহে। অথচ যুগের প্রেরণাই সাহিত্যিক শক্তিশালী করে, তাহাকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র শাশ্বত সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক ভাবের পথ অনুসরণ করিলে সাহিত্য যথার্থ শক্তিশালী হইতে পারে না; সমসাময়িক জীবনই শাশ্বত জীবনের ভিত্তি; সুতরাং তাহা যাহাই থাকুক, তাহা কখনও উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। উনবিংশতি শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষের দিনে যখন তাহার সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনের নীতি এবং রুচিবোধের সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই, তখন অস্থিরতার মধ্যে সমাজের নীতি এবং রুচিবোধ উন্নত থাকিবার কথা নহে; জাতির সংস্কৃতি তখন নূতন একটি পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তাহার সুনির্দিষ্ট

রূপটি তখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। এই অবস্থায় সমাজের রূপ যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর মার্জিত রুচিবোধ লইয়া তাহার গুণ কিংবা মূল্য বিচার করিবার আমাদের কোনও অধিকার নাই। সে যুগের তাহাই নীতি এবং রুচি ছিল, সুতরাং তাহা যাহাই থাকুক না কেন, তাহাকে তাহার স্বরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিহাসের মধ্যে সকল যুগের কথাই স্থান পায়, অথচ সকল যুগেরই এক অভিন্ন রুচি এবং নীতি থাকে না। সেই দাবীতে ইহারাও সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। ইহাদের এই দাবী কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। সাহিত্যিক প্রয়োজনেই হউক কিংবা সামাজিক প্রয়োজনেই হউক, স্বতন্ত্রভাবে স্বমহিমায় ইহারা প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। অন্য কাহারও সঙ্গে এক কোণে কৃপার পাত্র হইয়া ইহারা থাকিতে পারে না।

গ্রন্থকার তাঁহার রচনাটিকে 'সমাজচিত্র' বলিয়াছেন, সাহিত্যের কোনও দাবী তাঁহার নাই। সমাজচিত্রের দাবী, সাহিত্যের দাবী নহে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহাদের যে সাহিত্যের একটি দিকও আছে, তাহা গ্রন্থকার তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নাই, সমাজচিত্রের পরিবেষণাই তাঁহার গ্রন্থখানির যে আয়তন দান করিয়াছে, তাহার উপর যদি তিনি সাহিত্যের আলোচনাও ইহাতে যোগ করিতেন, তাহা হইলে তিনি আর কূল পাইতেন না; তবে সাহিত্যিক কোনও মূল্য যে ইহাদের নাই তাহা তিনি কোথাও বলেন নাই। তিনি তাঁহার নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন, বিষয়-বহির্ভূত কোনও প্রসঙ্গ ইহাতে স্থান দেন নাই। সেইজন্যই মুখ্যত সাহিত্যের কথা ইহাতে আসে নাই।

অসীম শ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার যে কাজ করিয়াছেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, বিষয়-গুণে ইহা জনসাধারণের নিকটও সমাদর লাভ করিবে এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথঠাকুর অধ্যাপক ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ

কলিকাতা,
মহালয়া, ১৩৮১ সাল

॥ বক্তব্য সংকেত ॥

॥ প্রদর্শিত প্রহসন সংকেত ॥

'সমাজচিত্র প্রদর্শনা' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি তারকাচিহ্নসহ দেখানো হয়েছে।

যৌন

প্রারম্ভিকা

॥ সাহিত্য ও সমাজচিত্র ॥

সমর্থনলাভ-স্পৃহা সামাজিক জীবের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে গৃহীত হওয়ায়, এই সিদ্ধান্তে আসা সহজ যে লেখকমাত্রই সামাজিক এবং কিছু-না-কিছু সমাজ-সচেতন। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে, সেগুলোতে প্রকারান্তরে সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্কের কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি। যতো মতই থাকুক, সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং সাহিত্যে সামাজিক উপাদান অন্ততঃ কিছু পাওয়া যাবেই—যদিও চয়ন-পদ্ধতি সর্বত্র এক নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যের অন্তর্গত 'নিছক' কাল্পনিক উপাদানকে অনেকে সমাজ-নিরপেক্ষ বলে থাকেন। কিন্তু কল্পনার মূলেও সামাজিক প্রভাব আছে। বস্তুজগৎ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই সম্পূর্ণ ব্যক্তি-ইন্দ্রিয়গত হতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংস্কারমুক্ত নয়। তাছাড়া কল্পনা সম্পর্কে সর্বাধুনিক মত হচ্ছে এই যে, বস্তু-উপাদানের অবাস্তব সন্নিধানই কল্পনা, অবাস্তব উপাদান নয়। সুতরাং সমাজের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ চিত্র সাহিত্যে থাকবেই।

ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যেখানে একাধিক ব্যক্তি সমর্থিত, সেখানেই তা সামাজিক চিন্তা-ভাবনা বা সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ;—এক-কথায় 'সমাজচিত্র'। আমরা জানি, জাতি, ধর্ম অথবা রাষ্ট্র—কোনোটিকেই সমাজ বলা চলে না। কিন্তু আমাদের জাতি-চিন্তা, ধর্ম-চিন্তা ইত্যাদির সামর্থনিক পরিধি সমজাতিসম্পন্ন অথবা সমধর্মসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাধারণতঃ সাধর্ম্য বজায় রেখে বিস্তারলাভ করে বলে 'হিন্দু সমাজ', 'কায়স্থ-সমাজ', 'ব্রাহ্মণ-সমাজ', 'বাবু-সমাজ', 'শ্রমিক-সমাজ' ইত্যাদি শব্দের প্রচলন আছে। আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিলতার মূলে সমাজ-বিভাগের জটিলতা। তবে কোনো মানুষের মন যদিও এক নয়, কিন্তু সে তার

পরিপার্শ্ব এবং সংস্কারকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক একটি সমষ্টিগত রূপকেও আমরা লক্ষ্য করে থাকি। অতিরেক-পন্থীরা এই সমষ্টিগত রূপকে স্বীকার করতে চান না। কিন্তু এই সমষ্টিগত রূপ আছে বলেই সামাজিক বিধানে ব্যাবহারিক শক্তি আছে। বিধানের যা কিছু দ্বন্দ্ব—তা শুধু রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতায়। সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা গেলে সমাজ অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপ নিয়ে বর্তমান। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা থাকে না। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা ব্যক্তির মধ্যে কারণ কোন ব্যক্তি মনে গঠনে এক রকম নয়।

অতএব সমাজের পরিধিগঠন একটি আপেক্ষিক কাজ। প্রচলিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক পরিধি গঠনে তাই আমাদের জাতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য বা সাধর্ম্য গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য সাহিত্যের মধ্যেও সমাজধারণা এই পরিস্থিতি ছাড়াতে পারেনি। তাই, এখানে সমাজ মূলতঃ বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের আওতায় নির্দিষ্ট বাঙালী সমাজ। এবং সমাজচিত্র অর্থ—এই সমাজের পটভূমিতে আবদ্ধ চিন্তা-ভাবনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

সাহিত্যে সামাজিক উপাদান তথা সমাজচিত্র নির্বাচনে আমরা রচিত গ্রন্থে বিভিন্ন জাতীয় উপাদান লক্ষ্য করি। চিন্তা ও ভাবনাগুলোকে আমরা নিম্নোক্ত গোষ্ঠিতে ভাগ করতে পারি।

(ক) পূর্বানুকৃতি॥ প্রত্যেক লেখকই পূর্ববর্তী লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত। পূর্ববর্তী লেখকদের কল্পনা, সমাজ-সচেতনতা, উদাসীনতা, চিন্তাভাবনা এবং তৎপূর্ববর্তী লেখকদের অনুকৃতি এই উপাদানের বিষয়।

(খ) লেখকের ব্যক্তিগত কল্পনা॥ কল্পনা চর্চার মধ্যে মনোবৈজ্ঞানিক রীতি-নীতির অনুসরণ আছে এবং এই রীতি-নীতি সমাজনিরপেক্ষ নয়। কিন্তু এই পরোক্ষ উপাদান সমাজবিজ্ঞানের জটিলতর সমস্যায় প্রয়োজনীয় হলেও সাধারণ সমাজচিত্রে এর প্রয়োজন বেশী নয়।

(গ) লেখকের সমাজ-সচেতন বক্তব্য॥ এগুলো গোচরে বা অগোচরে লেখকের মনে অবস্থান করে।

অতিরেকপন্থীরা প্রথমগোষ্ঠীর উপাদানকেও মূল্য দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে,—পূর্ব নিদর্শনের অনুকৃতি তখনই ঘটে, যখন মানুষ তার প্রয়োজন অনুভব করে। এই প্রয়োজন পুরোপুরি ব্যক্তিগত হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে বাহিরাঙ্গিক আবেদনের আকর্ষণেই আনুষঙ্গিকভাবে আন্তরঙ্গিক আকর্ষণ ঘটে

থাকে বটে, তবে সর্বক্ষেত্রে নয়; এবং বাহিরঙ্গিক আকর্ষণের মূলেও যে কোনও সামাজিক কারণ থাকতে পারে না, এ-কথা কোনও সমাজবৈজ্ঞানিক জোর করে বলতে পারেন না। ভিন্নদেশের ভিন্নকালের এমন কি ভিন্নসমাজের সৃষ্ট সাহিত্যের অনুবাদ ও চয়নের মূলে কিছু সামাজিক সত্য আছে।

সমাজচিত্র-গ্রাহকের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক সমস্যা বিদ্যমান। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অনেকক্ষেত্রে সীমারেখা নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাদান চয়নে গ্রাহকের ক্ষমতার সীমাও নির্দিষ্ট। তবে গ্রাহক সাধারণতঃ এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হন। তার কারণ তিনি সমাজ-অন্তর্গতভাবে অবস্থান করেন। তাছাড়া সমাজের কতকগুলো আইনকানুন বা গতিবিধি স্থান অথবা কালকে অতিক্রম করে চলে। সুতরাং পদ্ধতি-গ্রহণে পারিপার্শ্বিককালের দান যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমানকাল এবং বর্তমান মনের প্রভাব সমাজচিত্র উপস্থাপনে সততা আনে না। তবে এ-কথা সত্য যে, সমাজচিত্রের কাজ ক্যামেরার কাজ হলেও, সমাজ স্থবির ও সরল নয় বলে, কার্যকারণ যোগসূত্র উপস্থাপনে গ্রাহকের ব্যক্তিগত আর্থনীতিক ও অন্যান্য ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নয়—যদিও এদিকটা মুখ্যও নয়। সমাজচিত্রের মধ্যে সমাজান্তর্গত মনের সমস্যা, সমাধান-ভাবনা ও প্রচেষ্টা—সবকিছুরই মূল্য আছে, কেবল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নয়। এই চিন্তা-ভাবনা যতই সংকীর্ণগোষ্ঠীর সমর্থন-পুষ্ট হোক না কেন, আধুনিক মতে সমাজচিন্তার অন্তর্গত। আধুনিক মত পদ্ধতিকে প্রভাবিত করলে ক্ষতি নেই লাভ আছে, যদি চিত্রকে কোন ভাবে অতিরঞ্জিত না করে, সমাজচিত্র গ্রাহকের এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

॥ যুগ ও সমাজচিত্র ॥

সমাজ সম্পর্কে আজকাল কতকগুলো মত এমন প্রভাবশালী যে অনেকে সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে সমাজ-চিত্রের যুগবিভাগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা সাধারণতঃ সমাজচিত্রের মূল কাঠামোর পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি বলেই মন্তব্য করেন যে সমাজচিত্র সবদেশে এবং সবসময়ে একই রকম। আমরা জানি, সমাজে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত সমস্যা ও সংঘাত চিরন্তন। এই তিনটি দিককে কেন্দ্র করে স্থিতিপন্থী ও প্রগতিপন্থীর দ্বন্দ্বের চিত্রের দেশকালগত ব্যবধান খুবই কম লক্ষ্য পড়ে। সম্ভবতঃ এই কারণেই

পূর্বোক্ত মতটিকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এর বিপরীত পক্ষেও কিছু চিন্তা করবার আছে।

দেশ এবং কালের প্রভাব সমাজচিত্রে মোটেই তুচ্ছ নয়। কালের নিজস্ব প্রভাবের কথা কুসংস্কারপন্থী কয়েকজন ছাড়া কেউই বিশ্বাস করেন না। যাঁরা করেন, তাঁরা সমাজবিজ্ঞানী নন। কিন্তু আমরা কালের অগ্রগতিতে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস লক্ষ্য করে অতি সহজেই যুগ-বিভাগের তাৎপর্য স্বীকার করবো।

(ক) **জাতি-সংশ্লেষ ॥** মানুষের আত্মিক বিকাশ জাতি-সংশ্লেষ ঘটায়। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পরিধিতে ভাব-বিনিময় দ্রুত সংঘটিত হয় বলে তাদের চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক একটি বিশেষ রূপ আছে। প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা থাকলেও সে এই বিশেষ রূপটির একজন বাহকও। এই জাতি-সংশ্লেষ ব্যক্তিগতভাবেই ঘটুক বা সামষ্টিক-ভাবেই ঘটুক, তার একটা সামাজিক ফল ফলবেই। স্বীকার অস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে আপোস একটা ঘটে বলেই সমাজচিত্রে যুগগত রূপ-পরিবর্তনে জাতি-সংশ্লেষের যথেষ্ট দান আছে।

(খ) **বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ॥** ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি গণ্ডীর মধ্যে থাকলেও এবং পারিপার্শ্বিক চিন্তাধারাকে স্বীকার করেও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই মৌলিক চিন্তার সম্ভাবনা আছে। এই চিন্তার অবকাশ মানবজাতির জন্ম থেকে ধ্বংস পর্যন্ত কালের গণ্ডীর মধ্যে সর্বত্রই ব্যাপক। জাতি-সংশ্লেষ এতে অনুকূলতা আনে। সমর্থনলাভের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিচিন্তা পরিধি বিস্তার করে। এর দ্বারা সমাজচিত্রের পরিবর্তন ঘটে, এটা সত্য।

(গ) **ব্যক্তিত্বের আপোষে মাত্রা-বিভিন্নতা ॥** সমাজের ব্যক্তিত্ব-গুলোকে সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—সক্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ব। সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়—দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই স্থিতিশীল ও প্রগতিশীল—দুটি দলের সাক্ষাৎ মেলে। সক্রিয় স্থিতিপন্থার মূলে থাকে স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন। যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক—তিন দিক থেকেই। সক্রিয় প্রগতিপন্থার মধ্যে থাকে স্বার্থ আদায়ের প্রশ্ন। নিষ্ক্রিয় গোষ্ঠীর দুটি দলই সাধারণতঃ ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন থাকে। সমর্থন লাভের জন্যে সক্রিয় দুটি দলই এই ভাবপ্রবণতা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। বস্তুগত ভিত্তির দৃঢ়তার জন্যে স্থিতিপন্থীরা আচার পালনের উপর জোর দেয়। কিন্তু সমাজ গতিশীল বলে, প্রচলিত আচারের পাশে প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনাচার এবং নবাচার সহাবস্থান করে। ব্যক্তিত্বের

আপোষের রূপ তাই এক রকম থাকে না, এটাও আমরা সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নিতে পারি।

সাহিত্য-সৃষ্টিতে বিশেষ ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হলেও পারিপার্শ্বিক চিন্তার বাহক হিসেবে লেখক গোচরে অথবা অগোচরে নিজের পরিচয় রেখে যেতে বাধ্য হন। অবশ্য তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুইই হতে পারে। তাই, বিশেষ যুগ-পরিধির অন্তর্গত সাহিত্যের সমাজচিত্রে আমরা যুগের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করে থাকি—সে-সাহিত্য 'সিরিয়াস' অথবা লঘু—যে কোনো শ্রেণীরই হোক না কেন।

॥ প্রহসন ॥

প্রহসন সম্পর্কে সাধারণের মনে ধারণা হচ্ছে এই যে, এটা লঘু আয়তনের লঘু মেজাজের কথোপকথনরীতির পুস্তিকা। অবশ্য যদিও 'প্রহসন' নামাঙ্কিত এমন অনেক পুস্তিকা পাওয়া গেছে, যেখানে কথোপকথনরীতি অনুপস্থিত, তবে তা ব্যাপকভাবে নয়। হাস্যরসাত্মক এবং বিদ্রূপাত্মক—দুরকম দিকই এতে থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ ধারণা থেকে একটু মননশীলতায় এসে, আমাদের প্রহসন ধারণার ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা নেহাৎ অযৌক্তিক হবে না।

বাংলা নাটকের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকগণ তিনটি ধারার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

(১) লৌকিক ধারা (যা, মূলতঃ ভাঁড়ামি এবং হাস্যরসাত্মক অনুকরণের বিক্ষিপ্ত প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো)।

(২) পাশ্চাত্ত্য প্রহসনের ধারা, (প্রধানতঃ ফরাসী ও ইংরেজী প্রহসনের সংস্কারে পুষ্ট)।

(৩) সংস্কৃত প্রহসনের ধারা।

বাংলাদেশে প্রথম বাংলা মঞ্চাভিনয় (১৭৯৫ খৃঃ) প্রহসন দিয়েই শুরু হয়।[১] মঞ্চব্যবসায়ী Geracim Stepanovitch Lebedeff বাঙালীর অতীত অভিনয় চর্চা ও প্রবণতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন এবং ব্যবসায়ে সাফল্যের আশ্বাসও পেয়েছিলেন। সুতরাং বাংলা প্রহসনের উৎস অনুসন্ধান নিছক

১। "I translated two English dramatic pieces namely, the Disguise, and Love is the best doctor, into Bengali Language".A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects, London 1801, p-vi (Int.)

পাশ্চাত্য প্রহসন এবং সংস্কৃত প্রহসনের মধ্যেই সীমিত রাখলে অন্যায় করা হবে।

প্রাগাধুনিক যুগে আসরে এক প্রকার লৌকিক নাটগীত অভিনীত হতো। এ সম্পর্কে একজন গবেষক লিখেছিলেন,—"যাত্রার মত এক শ্রেণীর লৌকিক নাটক (Folk drama) অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে।"[২] প্রহসনের লৌকিক ধারাটির অস্তিত্ব এই ধারাটির মধ্যেই যে বর্তমান ছিলো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই নাটগীতগুলো ছিলো মূলতঃ ধর্মনির্ভর। এগুলো ধর্ম-নির্ভর হওয়ার কারণ, নাটগীত-বিরোধী অন্য-ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের শাসনে সংগঠন-শূন্য হয়ে পড়বার আশঙ্কায় কিংবা ধর্মসংস্কার-নির্ভর সাম্প্রদায়িকতা। আসরে বর্ণনানির্ভর আকাঙ্ক্ষাকে সাধারণের মনে তুলে ধরা হয়েছিলো। অভিনয়ের কালও হয়েছিলো দীর্ঘ। এক্ষেত্রে একটি হাস্যরস প্রধান নাটগীত অভিনয়ের অবকাশ সৃষ্টি অনেকটা অসম্ভব ছিলো। নাটকের মূল চরিত্রের চিন্তা ও গতিবিধিতে গুরুত্ব আরোপিত না হলেই নাটক প্রহসন লক্ষণাক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু মূল চরিত্রগুলোকে অনেক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হতো। অন্যদিকে, মেলা বা উৎসবে অঙ্গভঙ্গিতে নিযুক্ত সঙ-এর ভাঁড়ামি সাধারণে রসিকতার সঙ্গে উপভোগ করতো। এই সঙ্গুলি অনেক ক্ষেত্রে গান করে কিংবা দু' একটি হাসির কথা বলে দর্শকের মনোরঞ্জন করতো। লৌকিক নাটগীতে এই সব সঙের আমদানী ছিলো—কিন্তু এগুলোর নাট্যগত প্রয়োজন বিন্দুমাত্র ছিলো না। তারাচরণ সিকদার তাঁর "ভদ্রার্জ্জুন অর্থাৎ অর্জ্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ" নামে নাটকটির (১৮৫২ খৃঃ)[৩] ভূমিকায় বলেছেন—"এ দেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলা অনুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।" (পৃঃ ৪)। এতে সাধারণ দর্শক কাহিনীর একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতো। যেখানে গ্রন্থের সংগে অভিনয়ের যোগাযোগ রক্ষাই এক রকম অসম্ভব ছিলো, সেক্ষেত্রে হালকা রসের একটা কেন্দ্রীকৃত প্রহসন রচনা কিংবা তার অভিনয় কতোটা অসম্ভব ছিলো, সেটা অনুমান করে নেওয়া কষ্টকর নয়।

২। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭১।

৩। কলিকাতা, চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত; শকাব্দ ১৭৭৪।

সংগীত ছাড়া অন্যান্য যা কিছু কথোপকথন, তা অভিনেতারা নিজেরাই তৈরী করে নিতেন। একটা প্রহসন অভিনয়ের মতো গ্রন্থানুবর্তিতা অভিনেতাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। তবে অনুমান করা যায়, "অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ড"দের ভণ্ডামি যখন সংগীতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতো, তখন গ্রন্থানুবর্তিতা মানতে তারা বাধ্য থাকতো। তবে প্রমাণভাবে কোনো কিছু সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। অতএব বাংলা প্রহসনের লৌকিক ধারার বীজ, কাহিনীর অবকাশের মধ্যে উপস্থাপিত গ্রন্থানুবর্তী হাস্যরসাত্মকগীত এবং গ্রন্থাতিরিক্ত স্বাধীন হাস্যরসাত্মক কথোপকথনের মধ্যেই অংকিত ছিলো।

ভাঁড় বা ভণ্ড শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত ভাবে ইংরাজী Hypocrite শব্দটির অর্থবাচক। প্রাচ্যদৃষ্টিতে ভণ্ড Serious নয় বলেই আমাদের কাছে সে ভাঁড় হয়ে হাসির উপকরণ যুগিয়েছে। লৌকিক ধারার এই ভাঁড়ামি পরবর্তী কালে উদ্দেশ্যমূলক তা-সর্বস্ব প্রহসনের মধ্যে পরিণতিলাভ করেছে। এটা সম্ভব হতো না, যদি না প্রাচ্য দৃষ্টি এর গোড়ায় কাজ করতো। কয়েক বৎসর আগে "যষ্টিমধু" পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৬৬) 'ভাঁড় দত্ত' নামে একটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রবন্ধকার লিখেছেন,—

"ভারতীয় প্রবণতা বিচার করলে দেখা যাবে যে, সাহিত্যের সঙ্গে একটা কল্যাণের আদর্শকে বেঁধে রাখা হয়ে থাকে। তাই আমাদের আদর্শে পার্থিব জীবনটা হচ্ছে খণ্ডিত জীবন। দুর্বৃত্তকে গুরুত্ব দিতে গেলে পার্থিব জীবনকেই চরম ভাবতে হবে। পার্থিব জীবনে নায়কের যেখানে পতন ঘটেছে, সেখানে তখন পতনকেই চরমভাবে ধরবো, তখনই দুর্বৃত্ত সম্পর্কে আমাদের চিন্তা হবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা জানি, পার্থিব জীবনের পরে আর-একটা জীবন আছে। সেখানে নায়ক-বিরোধীরা শাস্তি পাবে এবং নায়ক পাবে সুখ, শান্তি, কেননা ভারতীয় সাহিত্যে নায়ক সুবৃত্ত হতে বাধ্য। পার্থিব জীবনে ভগবান তো তার পেছন পেছন রইবেনই। তাই জানি দুর্বৃত্ত যেখানেই থাকনা কেন, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। সেজন্য আমরা তাকে শাস্তি দেবার জন্যে মাথা ঘামাই নে,—ভারটুকু ভগবানের হাতে ছেড়ে দিই। থানায় দেবার আগে যেমন পকেটমারকে টুকটাক চড় চাপড় লাগাই, অনেকটা সেরকম শাস্তির বেশী আর কিছু দিতে মন চায় না, কেননা সেই থানার ওপর বিশ্বাস অসীম।" (পৃ. ১৮)।

'ভণ্ড' শব্দটির ব্যাবহারিক দিকটি নিয়ে দীর্ঘ উদ্ধৃতি টানবার উদ্দেশ্য হলো,

পরবর্তীকালের বিদ্রূপাত্মক সমাজদৃষ্টিতে অত্যন্ত সহজে গ্রাস করে ফেলেছে কোন ভিত্তিতে সেটা দেখানো। কারণ অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক রচনাও আমাদের দেশে 'প্রহসন' নামে আখ্যাত হয়েছে।।

আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্রূপাত্মক সমাজদৃষ্টির সঙ্গে প্রাহসনিক দৃষ্টির মৌলিক বিভেদ অন্ততঃ এদেশের সামাজিক মনের মধ্যে জাগতে পারে না। বিদ্রূপাত্মক দিকটি সম্পর্কে 'সিরিয়াস' ভাব এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। কয়েকটি প্রহসন পাঠে 'সিরিয়াস' মনের যে প্রতিক্রিয়া তার কয়েকটি নমুনা দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। "বিজ্ঞানবাবু[৪] প্রহসনটির আলোচনায়" অনুসন্ধান পত্রিকায় (১৫ই ফাল্গুন ১২৯৬) বলা হয়েছে,—"ফলতঃ তাঁহার এরূপ উদ্যম প্রশংসার্হ ও সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কথা এই, চিত্রগুলি কিছু অতিরঞ্জিত।" "কর্মকর্তা"[৫] প্রহসনটির আলোচনায় "আর্যদর্শন" পত্রিকায় (কার্তিক, ১২৮৮ পৃঃ ৩২৯) বলা হয়েছে,—"আলেখ্যে দুই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা না থাকিলে ইহা উত্তম হইত।" এঁরা প্রাহসনিক দৃষ্টিকে হারিয়ে ফেলেছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের লৌকিক ধারার প্রাণবস্তুকেই হারিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। এমন কি "অনুসন্ধান" পত্রিকায় (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭) "আনন্দ লহরী" নামে একটি বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচক বলেছেন,—"স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', প্যারিচাঁদ মিত্রের 'হুতোমের নক্সা' (?), ইন্দ্রনাথবাবুর 'কল্পতরু', 'ভারত উদ্ধার',—এ সকল পড়িয়া কি আর হাসিতে পারা যায়? যাঁদের শরীরে কণামাত্র মনুষ্যত্ব আছে, যাঁহার ধমনীতে বিন্দুমাত্র মনুষ্যের রক্ত প্রবাহিত হয়, তিনি কখনই এসকল পড়িয়া বা দেখিয়া হাসিতে পারিবেন না—হাসিতে গিয়া অশ্রু যেন তাঁহার দুর্নিবার হইয়া পড়িবে। আনন্দলহরীর ন্যায় গ্রন্থ পড়িয়া লোকে যেন না হাসে, লোকের যেন প্রাণ বিদীর্ণ হয়।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমাজমন 'সিরিয়াস' হলেও এবং অনেক 'প্রত্যক্ষ' ধরনের প্রহসন[৬] জন্ম নিলেও খাঁটি প্রহসনেরও অপ্রাচুর্য নেই। এখন প্রহসন তার নিজস্ব ধারা খুঁজে পেয়েছে।

৪। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৮।

৫। [illegible]রেন্দ্রনাথ বসু, ১৮৮২।

৬। বাণী মন্দির—শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ৭৩।

প্রহসনের লৌকিক ধারার বৈশিষ্ট্য ভাঁড়ামি, অঙ্গভঙ্গী, বিকৃত সাজসজ্জা এবং হাস্যকর নৃত্য ও গীতের মধ্যেই অবস্থান করছিলো। রুচি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভাঁড়ামির মার্জনা ঘটলো। "সম্ভব রাজ্যের" কাহিনী অনুসৃত হতে লাগলো, তাই অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে কার্যকারণ নির্দেশ ও শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করে দেওয়া হলো। একই কারণে সাজসজ্জার বিকৃতি সদৃশসজ্জার মাত্রাতিরেকের দ্বারাই সাধন করে দেওয়া হলো। কাহিনীর মধ্যে অনেকটা বাধুনি ও স্বাভাবিকতা এসে যাওয়ায় নাচগানের অযথা ব্যবহার পরিত্যক্ত হলো। তবে প্রাচীন সংস্কারের বশে কতকগুলো মূল বক্তব্য নাচগানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করবার চেষ্টা চল্‌তে লাগলো।

বাংলা প্রহসনের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরিধি সহনশীল এবং বিস্তৃত। যেখানে যেখানে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে উপস্থাপিত আছে, সেখানেই লৌকিক ধারার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা যায়। অন্যান্য দেশেও লৌকিক ধারা অনুরূপ হলেও আমরা একথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত নই যে, পাশ্চাত্য বা অন্যান্য ধারার মধ্যে দিয়ে এ বৈশিষ্ট্য বাংলা প্রহসনে আসেনি।

সংস্কৃত ধারা লৌকিক ধারার খুব একটা বিরুদ্ধ কিছু ছিলো না। প্রাচ্য আলংকারিক সংস্কার এই লৌকিক সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় হতে পারে না। ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও Folk Drama-র পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যা বলেছেন,[৭] লৌকিক ধারা ও সংস্কৃত প্রাহসনিক সংস্কারের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও সেই একই কথা বলা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রহসনে জটিলতা পরিহৃত এবং পরিধি বিস্তারমুখীন বলে এখানে সম্পর্ক আরও নিকটতর। বরং লৌকিক ধারার অবয়ব হীনতায় পরবর্তী কালে সংস্কৃত বাহ্য সংস্কার এই ধারাটিকে সহজেই গ্রাস করতে পেরেছে। এদেশে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চার দ্বারাই এটা সূচিত হয়েছে।

প্রহসনের নিজস্ব আঙ্গিকের অভাব যে লৌকিক ধারার মধ্যে একটা অতৃপ্তি এনে দিয়েছিলো, সেটা নাটগীতের লক্ষ্য উপলক্ষ্যের প্রতি আগ্রহের পরিণাম বিচার করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষের দিকে যাত্রা দর্শনের মধ্যে এই প্রাহসনিক উপাদানগুলোই সাধারণের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। "বার-

৭। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—পৃ: ৭৩।

ইয়ারী পূজা প্রহসন" নামে একটি পুস্তিকায়[৮] তার একটু আভাস আছে। এর মধ্যে প্রাগাধুনিক যুগেরই পদচিহ্ন স্পষ্ট।—

"শশী॥ কাল ভূত সেজে এসে কি নাকালটাই করলে ভাই।

আমোদিনী॥ তবু যদি মহেশ চক্রবর্তী দলের ভূত পেত্নী দেখ্‌তিস্, তাহলে আর হেসে বাঁচতিস্ নে।

শশী॥ যাহোক ভাই বড় বেহায়াপনা করে। তাইতেই বাবা আমাদের যাত্রা শুনতে যেতে বারণ করেন।

আমোদিনী॥ তা ভাই, একটু নকল না করলে কি যাত্রা ভাল লাগে?"

—এই ভাল লাগার চেতনার তাগিদেই খাঁটি বাংলা প্রহসন সংস্কৃত আঙ্গিককে গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাশ্চাত্ত্য প্রহসনের ধারা তার মধ্যে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

সংস্কৃত চর্চা বাংলা দেশে অনেক দিন থেকেই চলে এসেছে, তাই শিক্ষিত (প্রাচ্য ধারায় শিক্ষিত) সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত প্রহসনের সংস্কার জাগ্রত ছিলো। তবে এ সংস্কারটি নিছক প্রহসন সংস্কার হিসেবে না থেকে প্রহসন ও প্রহসনাত্মক বা প্রহসন-সদৃশ নাট্য বিভাগগুলোর সংস্কারের সঙ্গে মিশ্রিত একটি সংস্কার রূপে বর্তমান ছিলো। সংস্কৃত নাটকের শ্রেণীবিভাগ করলে ১০টি রূপক এবং ১৮টি উপরূপকের প্রকার ভেদ পাই। প্রহসন ১০টি রূপকের অন্তর্গত। রূপক ১০টি যথা—(১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) ভাণ, (৪) ব্যায়োগ, (৫) সমবকার, (৬) ডিম, (৭) ঈহামৃগ, (৮) অঙ্ক, (৯) বীথী, এবং (১০) প্রহসন। উপরূপক ১৮টি যথা—(১) নাটিকা, (২) ত্রোটক, (৩) গোষ্ঠী, (৪) সট্টক, (৫) নাট্যরাসক, (৬) প্রস্থান, (৭) উল্লাপ্য, (৮) কাব্য, (৯) প্রেঙ্খণ (১০) রাসক, (১১) সংলাপক, (১২) শ্রীগদিত, (১৩) শিল্পক, (১৪) বিলাসিকা, (১৫) দুর্মল্লিকা, (১৬) প্রকরণী, (১৭) হল্লীশ, এবং (১৮) ভাণিকা।

উপরূপকগুলোর নাম বলবার সার্থকতা এই যে, সংস্কৃত প্রহসন সংস্কার প্রাচ্য ধারায় শিক্ষিত বাঙালীর মনে আলঙ্কারিক বিধিনিষেধ অনুযায়ী বিশুদ্ধ 'প্রহসন—সংস্কার' রূপে বিরাজ করে নি। এই প্রহসন সংস্কারে প্রকরণ, ভাণ ইত্যাদি রূপকের সংস্কার কিংবা নাট্যরাসক, প্রস্থান ইত্যাদি উপরূপকের সংস্কার এসে বিশুদ্ধতা রাখতে দেয়নি। অবশ্য এই সংস্কার মূলতঃ আলঙ্কারিক প্রহসন

৮। শ্যামাচরণ ঘোষাল, ১৭৭৮ খৃ।

সংস্কারকেই আবর্তন করেছে। তাই আলঙ্কারিকরা 'প্রহসন' রূপকটির যে বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, সেটা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

অলঙ্কার শাস্ত্রের সাধারণ-পাঠ্য গ্রন্থ 'সাহিত্যদর্পণে'র উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করে ব্যাখ্যা করাই নিরাপদ। কারণ এই অলংকার গ্রন্থটি সর্বজনগ্রাহ্য এবং বেশী প্রাচীনও নয়। বিশ্বনাথ তাঁর গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রহসনের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,—

"ভাণবৎ সন্ধি সন্ধ্যঙ্গ লাস্যাঙ্গাকৈ বিনির্ম্মিতে।
ভবেৎ প্রহসনে বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবি কল্পিতম্॥
তত্র নারভটীনাপি বিষ্কম্ভক প্রবেশকৌ।
অঙ্গী হাস্যরস স্তত্র বীথ্যাঙ্গানাং স্থিতির্নবা॥
তপস্বি ভগবদ্বিপ্র প্রভৃতিষত্র নায়কঃ।
একো যত্র ভবেদ্ দৃষ্টোহাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে॥
বৃত্তং বহূনাং ধৃষ্টানাং সংকীর্ণং কেচিদূচিরে।
তৎ পুনর্ভবতি দ্ব্যঙ্কম বৈকাঙ্ক নির্ম্মিতম্॥

যে রূপকে 'ভাণ'-এর মতো দুইটি সন্ধি, যথাসম্ভব সন্ধ্যঙ্গ, লাস্যাঙ্গ, এবং একটিমাত্র অঙ্ক থাকবে, যেখানে নিন্দনীয় ব্যক্তির কবি কল্পিত বৃত্তান্ত বর্ণিত হবে, তাকে প্রহসন বলা যায়।

'ভাণ'-এ দুইটি সন্ধি—আরম্ভাবস্থা 'মুখ' এবং ফলাগমাবস্থা 'নির্বহণ'। প্রহসনেও এই দুইটি সন্ধি থাকা উচিত। "মুখ্য একটি ফলের সহিত সম্বন্ধ কথাংশ সমূহের অবান্তর এক একটি প্রয়োজনের সহিত সম্বন্ধকে 'সন্ধি' বলে।" সন্ধি পাচ প্রকার। মুখ-সন্ধি হচ্ছে আরম্ভাবস্থা। এই সন্ধিতেই নাটকের বীজের উৎপত্তি। 'নির্বহণ' সন্ধি যেখানে করা হয়, যেখানে বীজযুক্ত 'মুখ ইত্যাদি সন্ধির বিষয় শুধুমাত্র মুখ্য প্রয়োজনের সাধন হিসেবে উপপাদিত হয়। প্রহসনে যত্নাবস্থা 'প্রতিমুখ', প্রাপ্ত্যাশাবস্থা 'গর্ভ', নিয়তাপ্তিবস্থা 'বিমর্শ' ইত্যাদি সন্ধি থাকে না।

তারপর আলংকারিকরা বলেছেন, সম্ভব হলে প্রহসনে সন্ধ্যঙ্গ এবং লাস্যাঙ্গ থাকবে। প্রত্যেক সন্ধির আবার বিভিন্ন অঙ্গ আছে। মুখ সন্ধির ১২টি অঙ্গ—যথা,—(১) উপক্ষেপ, (২) পরিকর, (৩) পরিন্যাস, (৪) বিলোভন, (৫) যুক্তি, (৬) প্রাপ্তি, (৭) সমাধান, (৮) বিধান, (৯) পরিভাবনা, (১০) উদ্ভেদ, (১১) করণ, (১২) ভেদ। এই 'সন্ধ্যঙ্গ'গুলো প্রকরণের ক্ষেত্রে,

যত সহজে উপস্থাপতি করা যায়, প্রহসনের ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। কেননা, প্রথমতঃ অবকাশ কম, দ্বিতীয়তঃ প্রহসনের নায়ক চরিত্রের ওপর কেন্দ্রীভূত ক্রিয়া এবং চরিত্রের পরিণতি সাধারণ নাটকের বিপরীত। "নির্ব্বহণ" সন্ধিরও অনুরূপ ১৪টি সন্ধ্যঙ্গ আছে। যথা—(১) সন্ধি, (২) বিবোধ, (৩) গ্রথন, (৪) নির্ণয়, (৫) পরিভাষণ, (৬) কৃতি, (৭) প্রসাদ, (৮) আনন্দ, (৯) সময়, (১০) উপগূহন, (১১) ভাষণ, (১২) পূর্ব্ববাক্য, (১৩) কাব্য সংহার, (১৪) প্রশস্তি। এই সন্ধ্যঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। ক্ষুদ্রায়তনের প্রহসনে দুটি সন্ধির এই সব সন্ধ্যঙ্গ উপস্থাপন করা কষ্টসাধ্য। তাই আলঙ্কারিকরা এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা আনেন নি। তাঁরা লাস্যাঙ্গের ব্যাপারেও সেই কথা বলেছেন, লাস্যাঙ্গ মোট দশ প্রকার। যথা,—(১) গেয়পদ, (২) স্থিতপাঠ্য, (৩) আসীন, (৪) পুষ্পগণ্ডিকা, (৫) প্রচ্ছেদক, (৬) ত্রিগূঢ়, (৬) সৈন্ধব, (৮) দ্বিগূঢ়, (৯) উত্তমোত্তক, এবং (১০) উক্ত প্রত্যুক্ত। লাস্যাঙ্গের আধিক্যে প্রহসন স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্ভবস্থলে কয়েকটি লাস্যাঙ্গ দিলে প্রহসনের উৎকর্ষই প্রকাশ পায় বলে অনেক আলঙ্কারিক অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রহসনে একটিমাত্র অঙ্ক থাকাই আলঙ্কারিকরা উচিত বিবেচনা করেছেন, যদিও দুইটি অঙ্কযুক্ত প্রহসনকে তাঁরা শাস্ত্র লঙ্ঘনের দোষে দুষ্ট করেননি। প্রকরণ ইত্যাদি রূপকের মতো প্রহসনের নায়ক আদর্শ চরিত্র অথবা স্বর্বৃত্ত হবে না। তবে কাহিনীটি 'কবি-কল্পিত' হওয়া উচিত। 'কবি-কল্পিত' বল্‌তে আলঙ্কারিকরা অবাস্তব কোনো কিছু বোঝাচ্ছেন না। তবে ঐতিহাসিক কোনো একটি চরিত্রকে নিয়ে প্রহসন রচনার বিধান দিতে তাঁরা পক্ষপাতী নন।

প্রহসন রচনায় আরভটীবৃত্তি, বিষ্কম্ভক এবং প্রবেশক উপস্থাপন করতে নিষেধ জানানো হয়েছে। যে উদ্ধতবৃত্তি মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যবহার ইত্যাদি এবং হত্যা কিংবা নিপীড়ন ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত, তাকে আরভটী-বৃত্তি বলা হয়। বলা বাহুল্য,—বস্তুত্থাপন, সম্ফেট, সংক্ষিপ্তি ও অবপাতন—এই চারপ্রকার আরভটীবৃত্তির কোনোটিই প্রহসনে উপযোগী নয়। প্রহসনে 'প্রবেশক'এরও কোনো প্রয়োজন ঘটে না। একটি বা দুইটি নীচ চরিত্র দ্বারা নীচ ভাষায় যা প্রযুক্ত হয়, তাকেই 'প্রবেশক' বলা হয়। প্রথম অঙ্ক ছাড়া, যে কোনো অঙ্কেই প্রবেশক দেওয়া চলে। কিন্তু একাঙ্কক প্রহসনে এই বিধিনিষেধ

মেনে চলা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া প্রহসন জাতীয় রচনায় প্রবেশকের পৃথক কোনো সার্থকতাও নেই। তাই আলঙ্কারিকরা প্রহসনে প্রবেশকের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। বিষ্কম্ভকও একই কারণে প্রহসনে বর্জনীয়। অঙ্কের আদিতে প্রদর্শিত অতীত ও ভবিষ্যৎ কথাংশের নির্দেশক এবং সংক্ষিপ্ত অর্থযুক্ত বস্তুকে বিষ্কম্ভক বলা হয়েছে।

হাস্যরস প্রহসনের প্রধান রস। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে প্রহসন—প্র-হস্ +অনট্ ভাবে ল্যুট্। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "হাস্যোদ্দীপন কাব্যন্তু প্রহসনমিতি স্মৃতম্।" অঙ্গীরসের উদ্দীপনে সহায়ক রসই প্রহসনে স্বীকৃত। কিন্তু বীথী-রূপকের সম্ভাব্য কোনো অঙ্গেরই স্থিতি প্রহসনে নেই। বীথ্যঙ্গ ১৩টি। যথা—(১) উদ্‌ঘাত্যক, (২) অবগলিত, (৩) প্রপঞ্চ, (৪) ত্রিগত, (৫) ছল, (৬) বাক্‌কেলি, (৭) অধিবল, (৮) গণ্ড, (৯) অবস্যন্দিত, (১০) নালিকা, (১১) অসৎপ্রলাপ, (১২) ব্যাহার এবং (১৩) মৃদব। এই সব বীথ্যাঙ্গের মধ্যে যদিও হাসির উপাদান রয়েছে, কিন্তু প্রহসনে এগুলোর কোনো পৃথক সার্থকতা না থাকাই সম্ভব বিবেচনা করেছেন আলঙ্কারিকরা।

"প্রভৃতিষু" শব্দটি প্রয়োগ করা হলেও 'প্রহসন'-রূপকে চরিত্র নিদিষ্ট পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তপস্বী, ব্রহ্মজ্ঞ বা বিপ্রই প্রহসনের নায়ক হবার অধিকারী। বলা বাহুল্য, চরিত্রটি অবদ্য বা নিন্দনীয় হবে। সামাজিক প্রয়োজনেই অবশ্য আলঙ্কারিকরা এই সংকীর্ণতাকে আশ্রয় করেছিলেন। 'প্রকরণ'-রূপকে অবশ্য এঁরা বিপ্র, অমাত্য এবং বণিককে নায়করূপে নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রকরণের এই সংকীর্ণতা হয়তো আলঙ্কারিকের সম্মুখে উপযুক্ত দৃষ্টান্তের অভাবে ঘটেছে। অমাত্য বা বণিককে নিয়ে সুবৃত্ত চরিত্র যতই অঙ্কন করা যাক না কেন, নিন্দনীয় চরিত্র অঙ্কন হয়তো নিরাপদ ছিলো না—তা সে যতোই কবিকল্পিত হোক না কেন। সে যুগে তাই বিপ্রই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিকার। সমাজের সাধারণ মানুষকে নায়ক করে, বিশেষতঃ প্রকরণ নির্ধারিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্যতিরিক্ত সমাজের মানুষকে নায়ক করে প্রহসন রচনার অবকাশ নিশ্চয়ই ছিলো। কিন্তু কোন্ কারণে রচনা হয় নি, তা বলা কঠিন। হয়তো লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ সংঘাত ছিলো না, কিংবা হয়তো লেখক গোষ্ঠীর আভিজাত্যে তা হানিকর ছিল।

প্রহসন তিন প্রকার। শুদ্ধ, সংকীর্ণ ও বিকৃত। যে প্রহসনে একটি ধৃষ্ট নায়ক থাকবে, সেই হাস্যরসাত্মক প্রহসনের নাম শুদ্ধ প্রহসন। দৃষ্টান্ত হিসাবে

"কন্দর্প-কেলি" প্রহসনের নাম উল্লেখ করা চলে। ধৃষ্ট ভিন্ন অন্য যে কোনো ধরনের নায়ককে অবলম্বন করে প্রহসন লেখা হলে, সেই প্রহসনের নাম সংকীর্ণ প্রহসন। সংকীর্ণ প্রহসনে দুটি অথবা একটি মাত্র অঙ্ক থাকবে। 'নটকমেলকাদি' প্রহসন এই জাতীয় প্রহসনের দৃষ্টান্ত। নাট্যসূত্রকার ভরতের মত,—যে প্রহসনে বেশ্যা, চেট, ক্লীব, বিট, ধূর্ত, বন্ধকী—এই সব চরিত্র বর্ণিত হবে, এবং অবিকৃত পরিচ্ছদ ও আচরণের বিধান থাকবে, তাকেই 'সংকীর্ণ প্রহসন' বলা উচিত। যে প্রহসনে ক্লীব, কঞ্চুকী, ও তাপস—বিট, চারণ বা ভট ইত্যাদির বেশ বা ভাষা অবলম্বন করে অভিনয় করেন, তাকে 'বিকৃত' প্রহসন বলা হয়। ভরত অবশ্য বিকৃত প্রহসনকে সংকীর্ণ প্রহসনের মধ্যে ফেলে অভেদ কল্পনা করেছেন। তিনি তাই 'বিকৃত প্রহসনের' পৃথক উল্লেখ করেন নি। কারণ ভরতোক্ত সংকীর্ণ প্রহসনের লক্ষণে যে বেশ্যা ইত্যাদির কথা আছে, তার মধ্যে বিটের কথাও আছে। তাই বিটের অভিনয় অবলম্বন করে উক্ত লক্ষণ সংগত হতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল দলের উপস্থাপিত পাশ্চাত্য প্রহসনরীতির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে রক্ষণশীলরা সংস্কৃত প্রহসনরীতিকে অনেকটা নমনীয় ও শিথিল-পরিধি-সম্পন্ন করে সাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সচেতন না হয়ে সাধারণ নাট্য-সংস্কার দ্বারা চালিত হয়েছেন। লৌকিক ধারার সহায়তা নিয়েছিলেন বলে তারা সংস্কৃত প্রহসনরীতির নিয়মকানুনের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সংস্কৃত প্রহসনের আঙ্গিকে এবং পাশ্চাত্য প্রহসনের আঙ্গিকে পার্থক্য যতোই থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষের তাগিদেই সব বৈশিষ্ট্য একাকার হয়ে গেছে। ধর্মের দিক থেকে প্রহসনকে অনেকে একটি বিশেষ রীতির "Elementary form" বলেছেন। এসব ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক নির্দেশ বেশী কার্যকর হতে পারে না। তাই নাট্যরীতির মধ্যে সমন্বয় আনতে যতখানি সংস্কার ভাঙবার প্রয়োজন হয়েছে প্রহসনে ততখানি হয়নি।

বাংলা প্রহসন সম্ভাবক ধারায় পাশ্চাত্যধারা যদিও গেরাসিম লেবেডেফ [Geracim Stepanovitch Lebedeff 1749—1817] তথা গোলকনাথ দাসের প্রচেষ্টাতেই প্রথম সংযুক্ত হয়েছিলো, কিন্তু অনূদিত প্রহসন দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে পাওয়া যায় নি। (সম্প্রতি এম্. জোভরেল রচিত 'দি ডিস্গাইস' গ্রন্থটির অনুবাদ উদ্ধারকৃত ও মুদ্রিত হয়েছে)। সুতরাং প্রচারও

হয়নি। মুদ্রন ছাড়াও অভিনয়ের কথা ধরলে দেখা যায়, সেখানে প্রবেশ পত্রের মূল্য এতো বেশী ছিলো যে, অভিনয় দর্শনে সাধারণের অসামর্থ্যের দরুণ সাধারণের মনে এর প্রভাব কিছুই থাকে নি। লেবেডেক লিখেছেন,—"...and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however, purely expressed —I therefore fixed on those plays, and which were most pleasantly filled up with a groupe of watchmen, *chokey-dars* ; savoyards, *canera* ; thieves, *ghoonia* ; lawyears, *gumosta*, and amongst the rest a crops of petty plunderers[৯] মঞ্চব্যবসায়ী লেবেডেকের এতোটা বৈষয়িকতায় তাঁর দানের মূল্য নিয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। আসলে তিনি লৌকিক ধারার কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মৌলিক প্রহসন বা পাশ্চাত্য অনুবাদ প্রহসন দূরের কথা, সংস্কৃত প্রহসনের অনুবাদও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রায় দেখাই যায় না। যেটুকু প্রহসনাত্মক রচনার অনুবাদ হয়েছে তার কারণ যে লেবেডেফের অভিনয় নয়, এটা নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত করা চলে। এ দেশীয় সাহেবরা যে সব হাস্যরসাত্মক অভিনয় নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে করেছেন, সেগুলোর সংগে সাধারণ মনের যোগ নেই। সাধারণের সঙ্গে পাশ্চাত্য-ভাবের সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলো যে ইয়ং-বেঙ্গল ছাত্রগোষ্ঠী, তাঁদের মধ্যেই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য প্রহসন সংস্কার গড়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের কাছে তখন নাটকের আদর্শ শেক্সপীয়র এবং প্রহসনের আদর্শ 'মলিয়ের'। 'মলিয়ের' ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী প্রহসনকার (Molière—1622—1693)। বহুদিন আগে লেবেডেফও এঁরই লেখা Le Medicin Malgre Lui প্রহসনটির (ইংরেজি থেকে) অনুবাদ করিয়েছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। মধুসূদনই সর্বপ্রথম সাধারণের মনে পাশ্চাত্য প্রহসন সংস্কার স্থাপন করলেন। ইতিমধ্যে সৌখীন নাট্য সমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো চারদিকে। তাছাড়া মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্যও অনেক কমে এসেছিলো মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ প্রহসনকারই মধুসূদনের প্রহসনের মাধ্যমেই—পাশ্চাত্য প্রহসন সংস্কারের ভিত্তি তৈরী করে নিতে পেরেছিলেন,

---

৯। A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects-Gerasim Lebedeff. London-J. Skirven, 1801, P.-VI. (Int.)

প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে। "ফার্স"-এর আদর্শ তাই সকলেই প্রায় মধুসূদনের প্রহসন দুইটি (১৮৬০ খৃঃ) থেকে আহরণ করেছেন। তবে মধুসূদন পাশ্চাত্য ফার্স-সংস্কারে একনিষ্ঠ থাকতে পারেনি। একজন প্রতিভাবান প্রহসনকারের এই একনিষ্ঠতা বা গোঁড়ামির অভাবই প্রকারান্তরে প্রহসনক্ষেত্রে প্রাচ্য পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয়কে ত্বরান্বিত করেছিলো।

এবার পাশ্চাত্য প্রহসন (Farce) সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সংস্কারটিকে বিশুদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ করাই যুক্তিসম্মত। অবশ্য তার আগে ঐতিহাসিক দিকটি একটু দেখে নিতে হবে।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে "Farce" (ইতালীয় Farse ল্যাটিন Farcita) বলতে বুঝি মধ্যযুগের খৃষ্টীয় চার্চের বাধ্যতামূলক সর্বজন-পালনীয় এক অনুষ্ঠান রীতি। সন্দেহমূলকভাবে ক্রমে একে ফ্রান্সের ধর্মীয় নাটকের (Mysteries) কৌতুক ও হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে নানান দৃশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক এইভাবে সেই দৃশ্যের উপস্থাপনা ইংরেজি আবর্তনমূলক নাটকেও cycle plays) দেখা যেতে লাগলো। ষোড়শ শতাব্দীতে "মিস্টিক" নাটক সমাপ্তির পর থেকে বিভিন্ন নাটকে এই ফার্সের প্রচলন আরম্ভ হলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে এটা 'ফার্স' নামে ব্যবহৃত হতো। যেখানে মূল নাটকের চরিত্রগুলোর ওপর কম গুরুত্ব থাকতো, সেই সব ক্ষুদ্র অংশে এর ব্যবহার দেখা যেতো। এই সময়কার Farce-এর ইতিহাস সুন্দর ভাবে বলেছেন—Joseph T Shiply তাঁর গ্রন্থে।

"And with the general confusion of dramatic terminology in the 19th century farce lost its identity and became indistinguishable Farce during the 19th and 20th century has thus, in effect, resumed its original status as elemental comedy of physical action buffoonery, costume, gestures etc" ১০

ফার্সের গঠন নিয়েও অনেকে অনেক কথা বলেছেন। পূর্বোক্ত আলোকেও এ ব্যাপারে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে, হর্ষান্তক নাটকের

১০। , Dictionary of World Literature—Philosophical Library, New York, 1953, p 157

প্রাথমিক গুণান্বিত রূপ থেকে ফার্সের গঠনগত পার্থক্য বেশি নেই। তিনি বলেছেন,—

"Generally means low comedy, intends solely to provoke laughter through gesture, buffoonery action or situation. May be considered the elemental quality of the comic drama. In its most elementary form it is found in its gestures and tricks of the circus clownes which provoke the ready-laughter among the greatest number of people. As the action becomes increasingly subtle, its audience grows correspondingly limited."১১

বলাবাহুল্য তিনি ফার্সের কৌলীন্য অস্বীকার করেননি। শুধু তিনি নন, অনেকেই করেননি।

প্রাচীন ফরাসী ভাষায় 'ফার্স' বলতে বোঝাতো—কাউকে হাস্যাস্পদ করে তোলা, কিংবা চপল ভাঁড়ামি দিয়ে বোকা বানানো। এগুলো আবার অভিনেতারা নাটকের মধ্যেও দেখাতেন। বিশেষ করে এই সংস্কার ফরাসী ফার্সের মধ্যে একটা বিশেষ ঢঙ্ এনে দিয়েছিল। পরবর্তীকালের ফরাসী সমালোচকদের সংজ্ঞানির্ধারণেও এই সংস্কারের প্রভাব থেকে গেছে। Joseph Le Roux তাঁর Dictionnaire Comique, satirique, critique etc. (1735) গ্রন্থে তাই 'ফার্স'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"Avanture plaisante, gaillarde et réjouissante scène bouffonne, action drole, arrivé entre des personnes qui se sont chanté des injures, où entrent quelques femmes qui se sont decoiffées et prises aux cheveux." যাহোক আজকাল নাটকে ফার্স-কে পুরোপুরি হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে কিংবা এর উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

Farce এবং Burlesque-এর মধ্যে কিন্তু পর্যায়-ভেদ আছে। Burlesque-তে ব্যঙ্গ ও হাসি-তামাসার মধ্যে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু Farce-এ প্রধানতঃ অমার্জিত বোকামি ও দৈহিক অঙ্গভঙ্গীই লক্ষ্য করে থাকি।

১১। Ibid ; P. 157.

ফার্সের ধর্ম নিয়ে A. Nicoll তাঁর Dramatic Theory গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি অবস্থাসৃষ্টি ও তার অসম্ভাব্যতার ওপরেই জোর দিয়েছেন।

"The main characteristics of Farce·· ·· are the dependence in it of character and dialogue upon mere situation. This situation, moreover, is of the most exaggerated and impossible kind, depending upon the coarsest and rudest of improbable in congruities." (P. 117)

এই অসম্ভাব্যতা ও মাত্রাতিরিক্ততার সঙ্গে পক্ষপাতদুষ্টির কথাও উল্লেখ করেছেন একজন সমালোচক। Greek Comedy গ্রন্থে Norwood বলেছেন,—

"Farce may be defined as exaggerated comedy; its problem is unlikely and absurd, its action ludicrous and one-sided, its manner entirely laughable." (P. 1)

ফার্সের অবশ্য প্রকারভেদও দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে ফার্স-গোত্রীয় বিভিন্ন ধরনের অভিনয় অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ পাই। Mimes-এর কথা এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজন লিখেছেন,—

"The Dorian towns of Magra Graecia were familiar with mimes who took off certain social type, such as quack doctors. The aim of the mime was to provoke laughter mimicus risus. Thus it did by more of less imprompter development of certain stock themes, such as the sudden elevation of a character to temporary wealth or the detection of a peccant wife and her gallant by her husband." [১২]

পাশ্চাত্য প্রহসন সংস্কার নিয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। বাংলা প্রহসনের ধারা এতাবৎ আলোচিত ত্রিবেণীসঙ্গমে পরিপুষ্ট বলেই, তিনটি সংস্কারের বৈশিষ্ট্য, নৈতিকতা এবং বিবর্তন সম্পর্কে মোটামুটি একটু ধারণা নিয়ে এগোনো উচিত।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা প্রহসনে তিনটি ধারা সমন্বয়ের প্রাথমিক যুগ।

১২ CASSELL'S Encyclopaedia of World Literature (FUNK WAG-NALIS); England, April, 1954; p. 217.

তাই এই সময়কার প্রহসনাত্মক রচনাগুলোতে অঙ্গগত বা ধর্মগত অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোথাও একটি বিশেষ ধারার সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠা পরিস্ফুট, আবার কোথাও বা একাধিক সংস্কারে লেখকের ব্যভিচার লক্ষণীয়। তাই প্রহসনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বাংলা প্রহসনের স্বরূপ ও ধর্ম খুঁজে বার করা দুরূহ। এক্ষেত্রে সমসাময়িকযুগের ব্যক্তিদের প্রহসন সম্পর্কিত ধারণাসমূহ উপস্থাপিত করলে হয়তো বৈজ্ঞানিক পথের সন্ধান পেতে পারি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সব প্রহসনকারই তাঁদের রচনাকে সাহিত্য শাখা-প্রশাখার বৈশিষ্ট্যনির্দেশক এক একটি নামে চিহ্নিত করেছেন। নামগুলো মোটামুটি এ রকম, যেমন,—'Farce', 'Satire', 'Pantomime', 'পঞ্চরং', 'ব্যঙ্গকাব্য', 'ব্যঙ্গনাট্য', 'সামাজিক ব্যঙ্গনাট্য', 'সাময়িক নাট্যরঙ্গ', 'সামাজিক নক্সা', 'সঙ্', 'বিদ্রূপহাসক', 'সমাজচিত্র', 'হাস্যকাব্য', 'গীতিরঙ্গ', 'রং-তামাসা', 'জ্ঞানোদ্দীপক প্রহসন', 'সামাজিক প্রহসন' এবং (শুধু) 'প্রহসন'। কয়েকটি বাহ্য বৈশিষ্ট্য ছেড়ে দিলে ধর্মের দিক থেকে এগুলো সমগোত্রীয়। Pantomime, পঞ্চরং, রং-তামাসা, সঙ্—ইত্যাদির মধ্যে বিক্ষিপ্ততার প্রতিশ্রুতি আছে কিন্তু 'প্রহসন' নামে চিহ্নিত প্রচুর পুস্তিকাতেও এরূপ বিক্ষিপ্ততা অত্যন্ত বেশি দেখা যায়। হাস্যকাব্য, গীতিরঙ্গ, নাট্যরঙ্গ—ইত্যাদির মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক উপাদান কমই আশা করা উচিত। কিন্তু এগুলো পড়লে অপ্রত্যাশিত জিনিসই চোখে পড়বে—যা সাধারণতঃ satire, ব্যঙ্গকাব্য ব্যঙ্গনাট্য, সামাজিক ব্যঙ্গনাট্য ইত্যাদি নামে চিহ্নিত পুস্তিকায় থাকলে আমরা চমকিত হতাম না।

সাধারণ সমাজে এইসব বিভিন্ন নামে চিহ্নিত পুস্তিকা 'প্রহসন' নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। তাই এই রচনাগুলোকে একটু বিস্তৃত পরিধির মধ্যবর্তী করে তার একটা সাধারণ ধর্ম উপলব্ধি করতে হবে বাংলা প্রহসন সংস্কারের ভিত্তিকে তার মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। অবশ্য আধুনিক প্রহসন সংস্কার দিয়ে এটা নিয়ন্ত্রিত না করলে সাহিত্যশাখায় প্রহসন সংস্কারের পৃথক কোনো সার্থকতা থাকে না। তাই আধুনিক প্রহসন সম্পর্কিত ধারণাটিকে একটু স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো।

আধুনিক বাংলা প্রহসন সংস্কার অনেকটা পাশ্চাত্য সংস্কারে নিয়ন্ত্রিত, যদিও এ নিয়ে সার্থক আলোচনার একান্ত অভাব। আধুনিক মতে প্রহসন—কমেডির

প্রাথমিক গুণ-সম্পন্ন। কমেডি নানারকম—Classicial, Satirical, Comedy of manners, Comedy of Romance ইত্যাদি। কিন্তু প্রহসনের বিচার কমেডির গুরুত্ব ও লঘুত্ব, কিংবা জটিলতা ও সরলতা বিচারে। এই দিক বিচার করে অনেকে Comedy-কে Serious এবং Humourous—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। Humourous শব্দটির পরিবর্তে light (লঘু) শব্দটি প্রয়োগ করে প্রহসনের স্বরূপকে লঘু কমেডির সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে দেখা যায়। পূর্বোক্ত জাতীয় অনুযায়ী লঘু কমেডিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা গেলেও লঘু কমেডিকে মোটামুটি Humour-প্রধান, Wit-প্রধান এবং Satire-প্রধান—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রহসনও তাই সাধারণতঃ তিন প্রকার—(১) Humour-প্রধান প্রহসন, (২) Wit-প্রধান প্রহসন এবং (৩) Satire-প্রধান প্রহসন। আদিরসাত্মক কিংবা অঙ্গভঙ্গীযুক্ত প্রহসন আধুনিক সংস্কারে অপাঙ্‌ক্তেয়। আধুনিক বাংলা প্রহসন নাটকের মতো সংবদ্ধ; কল্পনা বস্তুর সঙ্গে অনেকটা সম্পর্ক রেখে চলে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসনের সাহিত্য-বস্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই এক্ষেত্রে আধুনিক সংস্কারকে নমনীয় করে এবং পরিধি বিস্তার করে, তদানীন্তন প্রহসনকারদের সংস্কারের সঙ্গে অনেকটা তাল মিলিয়ে চলতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসনগুলো পড়ে মনে হয়, সে সময়ের সাধারণ লোকের সংস্কারে প্রহসনের অর্থ সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক বিদ্রূপাত্মক কথাশ্রিত লঘু রচনা। এগুলো মূলতঃ হর্ষান্তক। তবে প্রাচ্যদৃষ্টির আনুকূল্যে অনেক বিষাদান্তক নাটিকা প্রহসনাত্মক হয়ে গেছে। প্রহসন ও উদ্দেশ্য-মূলক নাটক অভেদ এই ধারণা অনেক লেখকের মনে হওয়ায় অনেক বিষাদান্তক নাটিকার সম্ভাবনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করে কোন কোন লেখক দুর্বৃত্ত চরিত্রের প্রতি ঘৃণা নাটক শেষে প্রধানভাবে উপস্থাপিত করে যথারীতি নাটিকাটিকে 'প্রহসন' নামে চিহ্নিত করে গেছেন।

সমসাময়িক উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বক্তব্য বিচার করা যেতে পারে। প্রহসনকে তাঁরা খুব একটা "কবি-কল্পিত" বলে কিছু মনে করেননি। "সম্ভবরাজ্যের" সীমানার মধ্যেই তার কাহিনীর অবস্থান। "সপ্তমীতে বিসর্জন" নামে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ রচিত একটি প্রহসনের (১৮৯৪ খৃঃ ?) ভূমিকায় পরবর্তীকালে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—"সামাজিক নাটক বাস্তব সংসারের ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত, এইরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের গল্প ও চরিত্র সম্ভবরাজ্যের প্রান্তসীমা

হইতে আহৃত হইয়া থাকে—ইহার সকলই উচ্ছৃঙ্খল।"[১৩] ইনি প্রহসনে মাত্রা-হীনতার কথা বলেননি, মাত্রাতিরেকের কথাই বলেছেন। মাত্রাতিরেক এবং অস্বাভাবিকতাই স্বাভাবিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রহসনকারদের অনেকেই অস্বাভাবিক বর্ণনাকেই স্বাভাবিক বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন —বিরোধী দৃষ্টিকোণকে সমর্থনশূন্য করবার জন্যে। এই উদ্দেশ্যের ব্যাবহারিক মূল্য রাখবার জন্যেই তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। তাই সমসাময়িককালে রচিত (১২৯৯ সাল) "পশ্চিম প্রহসন"-এর ভূমিকায় লেখক কৃষ্ণবিহারী রায় বলেছেন,—"ইহার কোন অংশ কল্পনা প্রসূত নহে।" বিখ্যাত প্রহসনকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রও তাঁর রচিত "গাধা ও তুমি" প্রহসনটির পরিচয়ে (১৮৮৯) খৃঃ লিখেছেন—"ভাক্ত সমাজসংস্কারকের নিখুঁত ফটোগ্রাফ।" প্রহসনগুলোর বাস্তবতা কয়েক ধরনের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "স্বাধীন জেনানা" প্রহসনের (১৮৮৬ খৃঃ) 'একটি কথা'-য় রাখালদাস ভট্টাচার্য বলেছেন,—"কেহ যেন মনে না করেন যে এই প্রহসন দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যদি কেহ গায়ে পড়িয়া লইয়া বিবাদ বাধাইতে চাহেন, তবে গ্রন্থকার বলেন, সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়।"

সে-যুগের অনেকেই সমাজ সংশোধনের জন্যই প্রহসন রচনার চেষ্টা করেছেন। "মাগ সর্বস্ব" প্রহসনের (১৮৭০ খৃঃ) ভূমিকায় হরিমোহন রায় (কর্মকার) লিখেছেন,—"প্রহসনাভিনয়ে যে সামাজিক দোষের কথঞ্চিৎ সংশোধন হয়, ইহা সর্বতোভাবে সম্ভব; কিন্তু বঙ্গদেশে প্রহসনের সংখ্যা অতি অল্প প্রযুক্তই যে সামাজিক দোষের বৃদ্ধি হইতেছে এমত নহে। তবে প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ দোষেরও সংশোধন হয়, তাহাই পরম লাভ।" "বারইয়ারী পূজা"-প্রহসনকার শ্যামাচরণ ঘোষালের লেখা ভূমিকায় (১৮৭৮ খৃঃ) এই উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট।—"আমি গ্রন্থকর্ত্তার পদাকাঙ্ক্ষী কিংবা অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধিতে ইহা প্রকাশ করিতেছি না; সমাজের কতকগুলি কুরীতি সংশোধন করাই আমার পুস্তকখানির একমাত্র উদ্দেশ্য।" সমাজ সংশোধনে প্রহসন রচনার সার্থকতা সম্পর্কে এঁদের মধ্যে মতবিরোধও দেখা গেছে। "পাঁচ পাগলের ঘর" (১২৮৭ সাল)" প্রহসনের রচয়িতা রাজেন্দ্রনাথ সেন 'বিজ্ঞাপনে'

১৩। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়' পৃঃ ৩৯৫

বলেছেন,—"সংসারে নানাপ্রকার কুক্রিয়ার অধিষ্ঠান, অতএব যাহাতে কতক পরিমাণে সামাজিক দোষের লাঘব হয়, এই উদ্দেশ্যে কাব্য-নাটক প্রভৃতি অপেক্ষা প্রহসনের আবশ্যকতা জন্মিয়াছে।" এ নিয়ে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন কয়েকজন। তাঁরা প্রহসনের লঘুতার কোন মূল্য দেননি। তাঁদের মতে উদ্দেশ্যমূলক Tragedy ইত্যাদির Serious-ভাব যেমন সমাজমনের প্রতিক্রিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী রাখতে সক্ষম, প্রহসন তেমন কিছু সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা শূন্য। সিদ্ধেশ্বর রায় "বঙ্গসাহিত্যে নাটক সৃষ্টি" নামে একটি প্রবন্ধে (নব্যভারত—পৌষ, ১২৯৬ সাল) লিখেছেন,—"প্রহসনের রস মিষ্ট হইলেও স্থায়ী নহে, সন্ধান তীব্র হইলেও মর্ম্মভেদী নহে। ইহা অস্ত্রঘায়ের অমোঘ ঔষধ হইতে পারে কিন্তু পুরাতন জ্বরের কেহ নহে। ভোজনাগারে ইহা অতি পরম পরিপাটী চাটনী, কিন্তু ইহাতে উদর পূর্ণ হয় না—মুখে ইহার রসাস্বাদ মুখেই ইহার লয়।" প্রহসনের কার্যক্ষমতা যা-ই হোক, উদ্দেশ্যমূলক ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্য পরিপূর্ণ ছিলো। সকলেই যে সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রহসন রচনা করেছেন, তা নয়। গ্রন্থকর্তা হওয়ার লালসায় কিংবা অর্থের লোভে এঁদের অনেকেই প্রহসন রচনায় হাত দিয়েছেন,—স্বীকারোক্তি যা-ই থাকুক। "সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ" প্রহসনের লেখক বেচুলাল বেনিয়া তার 'ভূমিকার ধাক্কা'-য় (১০৮৫ খৃঃ) লিখেছেন,—"বৈখানি আমার যে হুড়মুড় করে বিক্রী হবে তাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। নিশ্চয় জানি আমার ব্যবসা ফস্কাবে না।" এগুলোর চাহিদা সাধারণের মধ্যে তীব্র ছিলো বলে মঞ্চ-ব্যবসায়ীরাও এগুলো প্রচারে সহযোগী ছিলো। 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'-গ্রন্থে ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়[১৪] লিখেছেন,—"এই সকল বিসদৃশ চিত্রের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের রুচি ক্রমশঃ ব্যক্তিগত গালি ও কুৎসা শুনিবার দিকে চলিতে লাগিল। সে ক্ষুধা মিটাইল ক্ল্যাসিক থিয়েটার ও মধ্য যুগের মিনার্ভা থিয়েটার। এই নাট্যশালায় অভিনীত এইরূপ প্রহসনগুলির আর নাম করিয়া কাজ নাই। উহাদের স্মৃতি যত শীঘ্র লোপ হয়, ততই সাহিত্যের—সমাজের মঙ্গল।"

দেখা যাচ্ছে, বিদ্রূপাত্মক প্রহসন সমাজের মঙ্গলসাধনের পরিবর্তে অমঙ্গল সাধনই করেছে। শুধু সমাজে নয়, সাহিত্যেও। কেননা অনেকেই সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্যে প্রহসন পাঠ করেছেন। এই জন্যেই বোধ হয় "কিছু কিছু

১৪। অর্দ্ধেন্দু-পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী এই ছদ্মনামে গ্রন্থটি লিখেছেন।

বুঝি" প্রহসন রচয়িতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় পুস্তিকার 'মুখবন্ধে' (১৮৬৭ খৃঃ) বলেছেন,—"গুণগ্রাহী দেশহিতৈষী পাঠক মহাশয় মহোদয়েরা এই কয়েকটি প্রস্তাবের শব্দগ্রাহী ও রচনাপ্রিয় না হইয়া মর্ম্ম গ্রহণ করতঃ দেশাচার সংশোধনে দৃষ্টিপাত করিলেই চরিতার্থ হইব।" অবশ্য ভাষা চর্চার উদ্দেশ্য নিয়েও অনেকে প্রহসন রচনা করেছেন। "চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা" প্রহসনের রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুস্তিকার একটি দীর্ঘ ভূমিকায় (১৮৫৮ খৃঃ) এই উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত করেছেন।

প্রহসন সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে প্রহসনকারের উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুটা আলোচনা অযৌক্তিক নয়। কারণ উদ্দেশ্যই সংস্কারকে নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রাচ্য দৃষ্টিতে Satire-এর লঘুতাই Humour ইত্যাদির সঙ্গে Serious-কে অভেদ করে ফেলেছে,—তাই, পরবর্তীকালে Satirical দৃষ্টি যতো গুরুত্ব পেয়েছে, ততোই প্রাহসনিক দৃষ্টি তার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। সেইজন্যেই "এই কলিকাল" নামে প্রহসনটিকে (১৮৭৫ খৃঃ) Burlesque নামে চিহ্নিত করে রাধামাধব হালদার ভূমিকায় বলেছেন,—"যদি ইহা মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনাদের আমোদ বর্দ্ধন করিতে পারে, তাহা হইলেই আমি সমুদায় পরিশ্রম সফলজ্ঞান করিব।" কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্ভবতঃ ভারতীয় Satire-এর নিষ্ফলতা ও লঘুতা দর্শন করেই মন্তব্য করেছিলেন,—"ভাল নাটক যে হয় না, সে এখন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য হেতু, কেবল গ্রন্থকারগণের দোষে নহে। এই জন্য আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই, অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। এরূপ প্রহসন অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ।" (বান্ধব, ১২৮৩ সাল)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রহসন সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে "মিত্র প্রকাশ" পত্রিকায়।১৫ প্রহসনের—বিশেষতঃ তার উপাখ্যানের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক লিখেছেন,—"প্রহসন হাস্যরসাত্মক কাব্য। মনুষ্য এই কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যত প্রকার রসের আস্বাদন করে, তন্মধ্যে হাস্যরস সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও তরল। সেই প্রযুক্ত কর্ম্মভূমির প্রতিকৃতি স্বরূপ রঙ্গভূমিতেও হাস্যরস লঘু ও তরল এবং সেই প্রযুক্ত অন্যান্য রসের আশ্রিত

১৫। মিত্রপ্রকাশ—, ১২৭৮ সাল; ২য় পর্ব—১০ম সংখ্যা।

উপাখ্যানের অপেক্ষা প্রহসনের উপাখ্যান অল্পায়ত হওয়া প্রয়োজনীয়। কেবল রসকে আশ্রয় করিয়াই কাব্যের রচনা হয়, অতএব সেই রসের বহুবিধ প্রকৃতি-ভেদ হইবে। প্রহসনের রচনা সম্বন্ধে আমাদের দেশের গ্রন্থকারগণের একটি বিশেষ ভ্রম লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত প্রহসন মাত্রকেই দেখিয়া বোধ হয়, গ্রন্থকার মনে করেন, প্রহসনের নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মুখ হইতে হাস্য রসোদ্দীপক উক্তি-প্রত্যুক্তি বাহির করিতে পারিলেই প্রহসন হইল। কিন্তু বাস্তবিক প্রহসনে আরও গুরুতর উপকরণের আয়োজন থাকে। প্রহসনের উপাখ্যান এমনভাবে রচনা করিতে হয়, অঘটন ঘটাইয়া নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তি-গণকে এমন অবস্থায় ফেলিতে হয় যে, যেন তাহা হইতেই হাস্যরসের প্রচুর তরঙ্গ উঠিতে পারে।...হাস্যরসের মুখ্য আশ্রয় উপাখ্যানের মধ্যে কৌতুকাবহ ঘটনার সংঘটন ; হাস্যরসোদ্দীপক কথোপকথন হাস্যরসের গৌণ-আশ্রয় মাত্র।” উপরি-উক্ত বিস্তৃত আলোচনার মধ্যেও আলোচকের দৃষ্টি অনেকটাই সঙ্কীর্ণ। বস্তুতঃ প্রহসনের ধর্ম নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে কেউ ভালো আলোচনা রেখে যেতে পারেননি। অবশ্য অনেকে নিজেদের অগোচরে সূক্ষ্মতার পথে একটু এগিয়েছিলেন। “বড়দিনের বঙ্গ সাহিত্য” নামে একটি প্রবন্ধে (পূর্ণিমা পত্রিকা —২২।১১শ সংখ্যা ; ফাল্গুন—১৩০১ সাল) পাঁচকড়ি ঘোষ লিখেছেন,—“আমার মনটা মেকি। মনের ভাবগুলোই আসল নয়, নেহাৎ নকল। আমার এ যুগের জীবনটা সাড়ে পনের আনা রকম জাল। আমি একটা জীবন্ত পদার্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু কোনকালেই জীবন্ত নাটক নাহ। সকল সময়েই জীবন্ত প্রহসন।” পাঁচকড়ি ঘোষ “জীবন্ত” শব্দটি ব্যবহার করে যা ইঙ্গিত করেছিলেন, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় একই ইঙ্গিতে “সম্ভব-রাজ্য” শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। পাঁচকড়ি ঘোষ প্রযুক্ত “মেকি” শব্দটি এবং অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের “উচ্ছৃঙ্খল” শব্দটি সমার্থক নয়, বলা বাহুল্য। এর কারণ বাস্তব উপাদানের সন্নিধান বৈশিষ্ট্য —যা প্রহসনের মধ্যে দেখা যায়—তা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দিকটির আলোচনার অভাব এ ব্যাপারে এঁদের ধারণাকে অনেকদিন পর্যন্ত অস্পষ্ট রেখেছে। বাংলা প্রহসনের ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে গেছেন সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসনকার রসরাজ অমৃতলাল বসু। তিনি তার “বৌমা” (১৮৯৭ খৃঃ) প্রহসনের শেষে একটি গীতে তা ব্যক্ত করেছেন। ষ্টার নাট্যশালার সম্মুখে অভিনেত্রীদের মুখে গানটি দেওয়া হয়েছে। গানটি এই,—

(শুধু) একটুখানি তামাসা
সং সাজায়ে রং বাজারে
পাঁচজনের নিয়ে আসা ॥
সমাজে নানান সাজে
ঘুরি সব যে যার কাজে,
কারু ভুল চুকৃটি ধরে ফেলে,
রঙ রঙায়ে রঙে ভাসা ॥
ঠিক যেন পাগল খানায়,
পাগলকে ক্ষেপিয়ে পাগল
সব পাগলে মিলে হাসা ॥
যদি কিছু থাকে সাঁচ্চা
বেশ তো সে বহুত আচ্ছা,
কারদানি নাইকো দানে
পড়ে গেছে হাতের পাশা ॥
(নইলে) হাসির কথা উড়িও হেসে
বুঝব কেমন মেজাজ খাসা ॥"

প্রহসনের মধ্যে Satire থাকলেও তা Humour-এর সামিল এবং লঘু হওয়া উচিত বিবেচনা করেছেন অমৃতলাল। নিজের দৃষ্টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিলে প্রহসনের ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। এখানে অতিরঞ্জনের স্থান আছে, কিন্তু অতিরঞ্জনের সঙ্গে নিজের দৃষ্টিকেও সংযুক্ত করা উচিত। 'মেজাজ' 'খাসা' রাখা অর্থাৎ দৃষ্টি প্রসন্ন রাখা পাঠক এবং প্রহসনকার উভয়ের পক্ষেই দরকার। দৃষ্টি প্রসন্ন থাকলে Satirical উপাদানও প্রহসনাত্মক হয়ে দাঁড়ায় কারণ, শুধু বিষয়-বস্তুর গুণেই প্রহসন 'প্রহসন' হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ প্রহসন ধারণা থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা এদিক থেকে অনেকটা সংস্কার-মুক্ত। তিনি শুধু কটাক্ষিত ব্যক্তিদের নয়—দর্শকদের এমন কি নিজেকেও, উদ্দেশ্যবিহীন খাপছাড়ার রাজ্যে বিচরণ করতে বলেছেন। কোন বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণকে Serious হিসেবে মূল্য দিতে তিনি নারাজ। পরবর্তীকালে "কমলাকান্তের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে ভূমিকা" নামে একটি প্রবন্ধে (জয়তি, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৫ সাল) প্রবন্ধকার কমলাকান্তের এ-ধরনের Satire সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছেন, তা অনুধাবন করলে প্রহসনের বিদ্রূপাত্মক উপাদান ও তার সার্থকতা

সম্পর্কে অমৃতলালের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন,—"পরস্পরের দৃষ্টিকোণের পার্থক্যই হাস্যরসের উৎস। যিনি নিজের দৃষ্টিকোণকেই অপরের দৃষ্টিকোণের চেয়ে সত্য ভাবেন, তিনিই অপরের কার্য্যে কটাক্ষ করে হাসেন। পাগল তার নিজের দৃষ্টিকোণে কার্য্য করে যায়, সুস্থ ব্যক্তি তা পর্য্যবেক্ষণ করে হাসেন—তার দৃষ্টিকোণ ভুল জেনে। কমলাকান্তের দপ্তরে কমলাকান্ত ও পাঠক—উভয়েই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণকে সত্য ভাবছেন। অথচ এঁদের দৃষ্টিকোণে যথেষ্ট পার্থক্য। তাই কমলাকান্ত আমাদের কার্য্য দেখে হাস্‌ছেন, আর আমরাও কমলাকান্তের কার্য্য দেখে হাস্‌ছি। এই সুযোগে কমলাকান্ত আমাদের সমালোচনা করেছেন। এই প্রচার বাধ্যতামূলক নয়, কারণ কমলাকান্ত নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি অহিফেন-সেবী। বুদ্ধিজীবী মানুষ নিজের দৃষ্টিকোণকে ছাড়তে পারেন না অথচ নিজের কৃত কার্য্যগুলোর ভিত্তিহীনতা প্রত্যক্ষ করেন। সাহিত্যিকের কাজ প্রত্যক্ষ করানো—গ্রহণ করানো নয়।" প্রহসনের ধর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়ে এই দৃষ্টি নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসনকাররা কদাচিৎ নেমেছেন। এমন কি স্বয়ং অমৃতলাল বসুও তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।

আধুনিক প্রহসনের গঠন, প্রকারভেদ ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর আলোচনার অবকাশ থাকলেও প্রহসন সংস্কারের বিবর্তনের ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই সীমিত রাখা এই আলোচনার পক্ষে যুক্তিসম্মত। উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ প্রহসন সংস্কার সাহিত্যমূল্যকে যতোই নামিয়ে দিক, সমাজতত্ত্বের দিক থেকে যে অনেকটা সহায়তা করেছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

॥ প্রহসন ও সমাজচিত্র ॥

প্রকৃতি-বিচারে প্রহসন লঘু রচনা। লঘু রচনায় থাকে বহিশ্চিত্তের প্রক্ষেপ। চিত্তে বস্তুচ্ছায়ার প্রবেশ, ধারণ, বিকরণ এবং প্রক্ষেপের মধ্য দিয়েই রচনার জন্ম। এ অবস্থায় চিত্তের গঠন বৈশিষ্ট্য দ্বারা বস্তুচ্ছায়ার ধারণে ও বিকরণে বৈশিষ্ট্য এবং প্রক্ষেপ বিশেষরূপ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিচিত্তের গঠনবৈশিষ্ট্য এবং তদনুযায়ী বহিশ্চিত্তের ধারণশক্তি মূল নিয়ামক হলেও বহিশ্চিত্তের ধারণক্ষমতাও সীমিত। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বস্তুচ্ছায়ার পরিলেখ (outline) ধারণে বহিশ্চিত্ত সক্ষম বলে সাধারণতঃ বস্তুচ্ছায়ার পরিলেখই যে কেবল মনে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়, তা নয় ;—চেতন, অবচেতন বা অচেতন মনে বস্তুচ্ছায়া স্বাভাবিক-

ভাবেই প্রবেশ করে, কিন্তু বহিশ্চিত্তের মধ্যে শুধু পরিলেখই অবস্থান করে। অন্তর্নিহিত জটিলতা ক্রমে ক্রমে মনের গভীরতর প্রদেশের মধ্যে ধৃত থাকে। অবশ্য মনের গঠন অনুসারে, স্তরানুযায়ী এই জটিলতার ধারণশক্তি এক-একটি ভাবে নিহিত থাকে। তবে এই ধারণশক্তির একটা সাধারণ পরিমাপ আছে। প্রহসন জাতীয় লঘুরচনার সমাজচিত্র চয়নে আপেক্ষিক-কারণ-গত অনেক জটিলতা এলেও এই সাধারণ পরিমাপটুকুকে মূল্য না দিলে অচল-অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে যা-হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লঘু-চিত্ত বস্তুচ্ছায়ার পরিলেখ ধারণে সক্ষম বলে, প্রক্ষেপে রচিত লঘু রচনার মূল উপাদানও পরিলেখ মাত্র।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা জানা প্রয়োজন। অন্তশ্চিত্ত থেকেও লঘু রচনা সম্ভবপর। কারণ অন্তশ্চিত্তের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বেশি। এ-সব ক্ষেত্রে লেখক সচেতন থাকলে জটিলতাকে সাবধানের সঙ্গে এড়িয়ে যেতে পারেন। অনেক-ক্ষেত্রে লেখকের অবচেতনতায় বা অক্ষমতায় সেই জটিলতা এসে পড়ে। লঘু আঙ্গিকের আত্যন্তিক তাগিদেই সাধারণতঃ অন্তশ্চিত্ত থেকে লঘুরচনার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

লেখক-মনে বস্তুচ্ছায়া-প্রবেশের নির্ধারিত কাল নেই এবং লেখক কখনো Serious, আবার কখনো বা লঘু হয়ে থাকেন। রচনাকালে লেখক লঘু মন সম্পন্ন হলেও তৎপূর্বে তিনি এই বিষয়ে Serious মনে চিন্তা করতে পারেন। সুতরাং লঘু রচনার উপাদানস্বরূপ পরিলেখ সম্বল হলেও অভাব-পূরণের দিক থেকে উপ-লেখেরও অভাব হয় না। তাই লঘু লেখক রচনাকালে অসহায়বোধ করেন না। নতুবা ক্ষুদ্র সম্বলে লঘু রচনা সৃষ্টি একপ্রকার অসম্ভব হতো।

বাস্তব ঘটনার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বাসনার মিল থাকে না। তাই বাস্তব উপাদানের অবাস্তব সন্নিধানের প্রয়োজন মানুষ তার মনোরাজ্যে স্বীকার করে থাকে। যেখানে বাসনার সঙ্গে বাস্তব সন্নিধানের মিল থাকে, সেখানে মনের প্রবণতা থাকে মাত্রাবৃদ্ধির দিকে। তাই ব্যক্তিমানসে বস্তুচ্ছায়া বিকরণে বস্তুর যে স্বরূপ উপলব্ধি করি, তার মূল্যায়ণ অনেকটাই আপেক্ষিক হয়ে পড়ে। সমাজচিত্রের মূল্যও তাই বিবেচনার অধীন হয়।

এক্ষেত্রে বহিশ্চিত্তকৃত প্রক্ষেপে চিত্রিত বস্তুর মূল্যায়ণে আরও সংশয় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুর পরিলেখ অর্থ—আত্যন্তিক দিকগুলির দ্বারা ধৃত

বস্তুর রূপ। তাই মাত্রা নিরূপণ সামাজিক উপাদান চয়নে একটি প্রধান কাজ প্রহসনের সমাজচিত্র তাই মাত্রা ও সন্নিধানগত অবাস্তবতায় বিদ্যমান থাকায় উপাদান চয়ন অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। মাত্রা ও সন্নিধানগত অবাস্তব অংশটুকু ঘটনার দিক থেকে সমাজচিত্রে স্থান না পেলেও এর দ্বারা ব্যক্তিক তথা সামাজিক দৃষ্টিকোণের বিশেষ পরিচয় লাভ করি এবং এদিকটিও সমাজচিত্রের অঙ্গীভূত বলে স্বীকার করা যায়।

বস্তুচ্ছায়া বিকরণে মূল্যায়নের আপেক্ষিকতায় তুলনামূলক বিচারে মাত্রা-নির্ধারণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। সাংবাদিকতামূলক উপাদানের অপেক্ষাই হচ্ছে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল পথ। বর্তমানকালে যেগুলোকে আমরা সাংবাদিকতামূলক উপাদান বলে ধরে নিই, সে-ধরনের উপাদানকে সর্বদা ধরে নেওয়া (বিশেষ করে গত শতাব্দীর ব্যাপারে ধরে নেওয়া) মোটেই ঠিক নয়। সাংবাদিকতার আদর্শ সম্পর্কে সাংবাদিকের মনে ধারণা অস্পষ্টও থাকতে পারে; এবং যেখানে এমন অস্পষ্ট ধারণা, সে-ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা নয়। এ-সব ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিকরণের মাত্রাগত দিকটি অধিক লক্ষিত হয়। সেখানে যুগ-নিরপেক্ষ সাধারণ মাত্রাবোধের ওপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। তবে প্রকৃত সাংবাদিকতামূলক উপাদানের অভাবে এ ধরনের বিকৃত সাংবাদিকতামূলক উপাদান এবং অন্যান্য লৈখিক প্রকাশগুলোর মূল্য আছে ;—অন্ততঃ তুচ্ছ করলে অবিচার করা হয়।

॥ দৃষ্টিকোণ ও অনুশাসন—প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক ॥

সামাজিক প্রহসনের জন্ম এক একটি দৃষ্টিকোণে থেকে। তাই দৃষ্টিকোণ এবং তার সংঘাতমুখর পরিবেশ সম্পর্কে কিছু জানা আবশ্যক।

সার্বিক স্বার্থসাম্য রাখবার জন্যে মানুষের কর্মের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে কর্মকে আচরণীয় বা অনাচরণীয় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জীবন ধারণের সুবিধার্থে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণে এর জন্ম। সার্বিক স্বার্থের দিক লক্ষিত হলে তা অনেকের সমর্থন লাভ করে। যেখানে সার্বিক স্বার্থ আছে, সেখানে এগুলির জন্ম-সম্ভাবনা একই সঙ্গে অনেকের দৃষ্টিকোণে নিহিত থাকে। মানবিকতা দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থ-শিথিলতা ঘটলে তার পরিধি ক্রমে পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি ইত্যাদির মধ্যে বিস্তৃত হয়। জীবন ধারণের সুবিধার থেকে এর জন্ম হলেও জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে চর্যাচর্যের নতুন নতুন ক্ষেত্র

উপস্থিত হয়। এগুলোকে প্রাথমিক তথা মানবিক অনুশাসন বলা চলে। সামগ্রিক মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরও বিকাশ হয়। সামগ্রিকতার অভাবে স্বীকার-অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে এর পদক্ষেপ।

প্রাথমিক অনুশাসনের উপর দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের ভিত্তি। প্রত্যেক জাতির পালনীয় ধর্মীয় এবং সামাজিক পৃথক পৃথক অনুশাসন থাকে। বিভিন্ন সমাজে রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার আনুরূপ্যে বিভিন্ন সমাজের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক অনুশাসনে মিল লক্ষিত হলেও এগুলোর জন্ম সম্ভাবনা সম্পূর্ণ একক দৃষ্টিকোণে নয়। গোষ্ঠী নিয়োজিত সম্মিলিত দৃষ্টিকোণে এগুলোর সৃষ্টি হয়। এই অনুশাসনগুলো মোটামুটি তিনটি ভাগে পড়ে—(১)—ধর্মীয় অনুশাসন (২) সামাজিক অনুশাসন এবং (৩) রাষ্ট্রীয় অনুশাসন।

মানুষের স্বার্থ আদায়ের তাগিদের মূলে থাকে। দৈহিক তৃপ্তি এবং মানসিক শান্তির প্রতি জন্মগত আকাঙ্ক্ষা। মানুষের সমাজজীবনের মূলেও থাকে এই তাগিদ। কারণ সহযোগিতা-প্রাপ্তি ব্যতীত তা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সহযোগিতাসাধন মানুষের স্বভাবের বিপরীত। এ-ক্ষেত্রে পারস্পরিক চুক্তিমূলক সহযোগিতার আবশ্যক হয়। যৌনবোধের ওপর প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে কতকগুলো ভাবপ্রবণতার জন্ম হয়। সহযোগিতা আকর্ষণের জন্যে এই প্রবণতা বিকাশের সহায়তা করা হয়। এবং প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টা চলে সব মানুষই এই প্রচারে অংশ নেয় ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের জন্যে। এই ভাবপ্রবণতা আসলে স্বার্থ-আদায়ের চেষ্টা। এই abstract ভাবপ্রবণতাকে ধারণ করবার জন্যে কতকগুলো বাহ্য আচারের পত্তন করা হয়। ভাবপ্রবণতার সঙ্গে এই আচারের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। কিন্তু সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যমূলক কোনো যোগাযোগ আবিষ্কার করেই এই আচার সমূহের সৃষ্টি। মানুষের পীড়ন-ভীতি এবং সুখাকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে কতকগুলো কাল্পনিক পরিণামকে সৃষ্টি করা হয়। মানুষের নিজস্ব চিন্তার একক অগ্রগতির অবকাশ কম। মানুষের চিন্তা অনেকটা সামাজিক হয়ে পড়ে। তাই মানুষের মনে সামাজিক উদ্দেশ্যের পোষণমূলক চিন্তা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এই কারণেই ধর্মশাস্ত্রের প্রতারণাময় ফলশ্রুতির অসারতা মানুষ উপলব্ধি করতে চায় না। তা তাদের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মানসিক শান্তির পরিপন্থী। Sentiment-এর একটি চরমকেন্দ্র ব্যতীত দৃঢ়তা থাকে না। এই জন্যে মানুষ ভগবানকে সৃষ্টি করেছে। ভগবান মানুষের আদর্শ বন্ধু এবং আদর্শ দণ্ডদাতা। ব্যক্তিগত

প্রয়োজনে তিনি আদর্শ বন্ধু, কারণ সংসারে অতৃপ্ত বন্ধুত্বের বাসনা তার মধ্যে দিয়ে মেটানো হয়। সামাজিক প্রয়োজনে (যা অবশ্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন ব্যতিরিক্ত কিছু নয়) তিনি আদর্শ দণ্ডদাতা। কেননা সংসারে দণ্ডদাতার অক্ষমতা তার মধ্যে দিয়ে মেটানো হয়। দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের সমাজগত ও ধর্মগত দিক সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে গেলে সংস্কারবিহীন পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের বীজ এর মধ্যেই পাওয়া যাবে। সমাজ ও ধর্ম তাদের অনুশাসন পালনের জন্য মানুষের ভাবপ্রবণতাকে বশীভূত করে। তাই দৃষ্টিকোণকে গোষ্ঠীকৃত করে তোলবার জন্যে প্রাথমিক অনুশাসন-পোষক ভাবপ্রবণতাকে সামাজিক অনুশাসন মূল্য দিয়ে চলে। সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী ভাবপ্রবণতায় পরিধির অনুকূল দিকগুলি বিকাশের জন্যে যত্নবান্ হয়। এগুলো ধারণের জন্য বাহ্য প্রথারও সৃষ্টি হয় একে একে। এই প্রথা সৃষ্টির মূলে থাকে 'প্রাকৃতিক' এবং 'চারিত্রিক' আনুকূল্য। প্রথা সৃষ্টিতে সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ থাকতে পারে। প্রাথমিক অনুশাসন বিবেক-বলে দৃঢ়তাসম্পন্ন হয়েও ভাবপ্রবণতা সর্বস্ব। তাই সমাজে দ্বৈতীয়িক অনুশাসন প্রাথমিক অনুশাসনের আশ্রয়েই সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভের চেষ্টা করে থাকে, এবং প্রাথমিক অনুশাসনের আনুগত্য গ্রহণের জন্যে দ্বৈতীয়িক অনুশাসনও ভাবপ্রবণতার মাধ্যমেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। এই আনুগত্য গোষ্ঠীস্বার্থ নিয়োজিত হলে অনেকটা বাহ্য ও প্রতারণামূলক হয় এবং কালক্রমে প্রাথমিক অনুশাসনের সঙ্গে দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের সম্পর্ক তিরোহিত হয়। বিযুক্তি সর্বত্র হলে সমাজবিপ্লবের সূচনা হয়। সার্বিক স্বার্থসাম্যের স্থিতিশীলতা সমাজে কখনো থাকে না। পুষ্ট ব্যক্তিস্বার্থ কায়েমী থাকবার আকাঙ্ক্ষায় সমাজকে একটা স্থিতির মধ্যে রাখতে চেষ্টা করে। স্থিতিশীলরা প্রথানুগত্যের জন্যে সমাজমনের সংস্কারকে বড়ো করে তোলেন। কিন্তু প্রাথমিক অনুশাসন বিরহিত দ্বৈতীয়িক অনুশাসন বিরোধী আন্দোলনের জন্যে সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ঘটে।

রাষ্ট্রীয় অনুশাসনকেও ধর্মীয় অনুশাসনের মতো একদিক থেকে, সামাজিক অনুশাসনের অঙ্গ বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রসংগঠনের মূলেও একই কথা—দৈহিক তৃপ্তি ও মানসিক শান্তি। সমাজ শুধু ভাবপ্রবণতাকে আশ্রয় করে সংগঠন তৈরী করতে পারে না, কেননা

"নৈতিক-অসাড়" ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব সমাজে যথেষ্ট। তাই বিবেকশক্তির বৈকল্পিক সমাজস্বার্থ-নিয়োজিত বাহ্য-শক্তির আবশ্যকতা মানুষ অনুভব করে। দৈহিক তৃপ্তি ও মানসিক শক্তির জন্যে ভাবপ্রবণতা ব্যতিরিক্ত দিক থেকেও একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্যে রাষ্ট্রের পত্তন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় অনুশাসন সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। সমাজে ভাবপ্রবণতা ব্যতিরিক্ত আশ্রয় সঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ রাষ্ট্র-নিয়োজিত ব্যক্তিসমূহ দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তা সামাজিক ভাবপ্রবণতাময় উদ্দেশ্যের পরিধি থেকে অনেক সঙ্কীর্ণ ও স্থূল। ভাবপ্রবণতার প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, তার ফলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপক নিয়োগ সমাজ সমর্থিত নয়। অনেক-ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতার একক শক্তিকে মানুষ উপলব্ধি করে তৃপ্তি পায়। কিন্তু রাষ্ট্র যেখানে গোষ্ঠী স্বার্থে নিয়োজিত এবং সামাজিক অনুশাসন যেখানে বিরোধী, সেক্ষেত্রে সমাজকে ক্ষমতাশূন্য করবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ভাবপ্রবণতাময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকেও জাল বিস্তারের চেষ্টা করে। তাই রাষ্ট্রকেও এসব ব্যাপারে ভাবপ্রবণতার আশ্রয় নিতে দেখা যায়। সামাজিক আনুকূল্য রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য, তাই সামাজিক ভাবপ্রবণতার সমর্থনলাভের জন্যে রাষ্ট্রকে বাহ্যভাবে সমাজের আনুগত্য রাখতে হয়। যেখানে সমাজের ভাবপ্রবণতা রাষ্ট্রের, পরিপন্থী, সেখানে অনুকূল প্রতিশ্রুতিময় আচার ও ধর্মমতের প্রচার এবং সমাজের প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী কতকগুলো দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের বিরুদ্ধে ভাবপ্রবণ প্রচারের দ্বারা সমাজকে রাষ্ট্রের অনুকূল করবার চেষ্টা চলে থাকে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী যখন বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থে অবস্থান করে, তখন রাষ্ট্র ধর্মীয় ও সামাজিক প্রগতিশীলতার প্রতিকূল হয়। সমাজের সাধারণ গতিকে অব্যাহত করবার জন্যে sentiment-এর আশ্রয়ে স্থিতিশীলের বিরুদ্ধে প্রগতিশীলকে উত্তেজিত করে। প্রগতিশীলদেরও প্রধান অবলম্বন তখন হয় রাষ্ট্রীয় শক্তি, তা যতোই বিজাতীয় হোক না কেন।

সাধারণ ব্যক্তি গোষ্ঠীপ্রভাবে প্রভাবিত হয়। গোষ্ঠীর দৈহিক, আর্থনীতিক বা সাংস্কারিক বস্তবত্তায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাদের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়। দৃষ্টিকোণ গোষ্ঠীনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠা তখনই পায়, যখন স্বার্থ-অসাম্য প্রাথমিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে।

প্রাথমিক অনুশাসনে সাধারণতঃ দোষ বা গুণ বিচারের অবকাশ ঘটনার মধ্যে দিয়েই। মতামত মূলতঃ এর ওপর দিয়ে ওঠে। প্রাথমিক অনুশাসনের

দুটি দিক আছে। (১) সর্ব-নিরপেক্ষ এবং (২) সর্ব-অপেক্ষ। প্রথম প্রকার প্রাথমিক অনুশাসন স্বার্থ-সঙ্কোচনে স্পর্শকতার। দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের সঙ্গে এর বিযুক্তি সর্বত্র। কারণ সংযুক্তিতে স্বার্থ-অসাম্য ঘটে। স্বার্থ-শৈথিল্য সার্বিক স্বার্থসাম্যের অনুকূল।

সর্ব-অপেক্ষ প্রাথমিক অনুশাসনে স্বার্থশিথিলতা অপরিহার্য। সংসারে প্রতিটি মানুষের আচার-ব্যবহার-জাত বিভিন্ন ঘটনায় ব্যক্তি-স্বার্থের ক্ষতি বা বৃদ্ধি মিশ্রভাবে অবস্থান করে। ঘটনাগুলো এমনভাবে সূত্রবদ্ধ থাকে যে, আনুপাতিক গুরুতর বৃদ্ধি অনুষ্ঠান আনুপাতিক কোন লঘুতর ক্ষতি-অনুষ্ঠানকে সহজভাবে টেনে আনে। স্বার্থ শিথিলতা সার্বিক স্বার্থসাম্যের পক্ষে অপরিহার্য বলে আনুপাতিক লঘুতর ক্ষতিগুলো থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানকে 'বৃদ্ধি'-জনক হিসেবে মূল্য দেওয়া হয়।

কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ যখন দৈহিক, আর্থনীতিক বা সাংস্কারিক বলবত্তায় বড়ো হয়ে ওঠে, তখন আনুপাতিক লঘু ক্ষতিগুলো ব্যক্তিস্বার্থের আনুকূল্যে পুষ্ট হয়। এইসব প্রশ্রয় প্রাপ্ত 'ক্ষতি' সার্বিক স্বার্থস্বাম্যের প্রতি আঘাত হানে। একেই সর্ব-অপেক্ষ প্রাথমিক অনুশাসনে দুর্নীতি আখ্যা দেওয়া হয় এবং স্বাধীন দৃষ্টিকোণ এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হয়।

দৃষ্টিকোণের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ গোষ্ঠীগতভাবে সংঘটিত হয়। বস্তুতঃ গোষ্ঠীগত দৃষ্টিকোণ সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ মাত্র। সমর্থনলাভের জন্যে এইসব গোষ্ঠীগত দৃষ্টিকোণ স্বাধীন দৃষ্টিকোণকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবার জন্যে সাধারণতঃ বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর প্রাথমিক অনুশাসন-বিরোধী আচরণ এবং পরতঃ নিজস্ব আচার বিরুদ্ধ আচরণে আক্রমণ চালায়। প্রাথমিক অনুশাসন সমর্থিত আক্রমণ সার্বিক সমর্থন-সূচক। এইটিকে সম্মুখে রেখে গোষ্ঠীগুলো সাধারণতঃ দ্বিতীয় আক্রমণের সূচনা করে।

অনুশাসন এবং দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আলোচনার সার্থকতা এই যে প্রত্যেক সামাজিক প্রহসন এক একটি দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করে, এবং উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সর্বদা জড়িয়ে থাকে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক অনুশাসন।

॥ দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনে প্রহসন ॥

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বাসনা পরিতৃপ্তির মাত্রাবোধ, পরিবেশ বিশিষ্টতা এবং অন্যান্য সংস্কারের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেও, গঠনের দিক থেকে প্রত্যেক

মন একক বলে, প্রত্যেক মানুষের এক একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থাকা স্বাভাবিক। পূর্বোক্ত দিকগুলি অনেক সময় একই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষগুলির মধ্যে অনেকটা সমতা রক্ষা করে বলে প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক একটি সাধারণ দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে—যদিও সর্বদাই প্রভাবশালী বিশেষ দৃষ্টিকোণের দ্বারা সেটি গ্রস্ত। আসল কথা, একই রকম পরিবেশ বাসনা পরিতৃপ্তির সমপর্যায়গত মাত্রাবোধ এই দৃষ্টিকোণগুলোকে গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। এই দৃষ্টিকোণ অনুশাসনগত এবং অনুশাসন-বিরোধী—দুরকমই হতে পারে। মানুষের স্বার্থ-বোধ দুদিকেই প্রযুক্ত হতে পারে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের ক্ষেত্রে এবং অনুশাসন-বিরোধী ক্ষেত্রে—উভয়ক্ষেত্রেই স্বার্থবোধকে আবিষ্কার করা সহজ। দৃষ্টিকোণের স্বাভাবিক গতিই সমর্থনপুষ্টির দিকে।

আপোষ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ সমর্থনপুষ্ট করবার জন্যে অভিযান চালায়। প্রকাশের জন্য পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। সাহিত্যিক প্রকাশ অন্যতম পদ্ধতিমাত্র। দৃষ্টিকোণ প্রচারে মূলতঃ তিন প্রকার পদ্ধতি—চিন্তার মাধ্যম, অনুভূতির মাধ্যম এবং কর্মের মাধ্যম। অনুভূতির দ্বারা প্রচার সহজ হয়, কারণ অনুভূতি মানুষের কর্মবিধির প্রাথমিক প্রেরণা। কলাবিধিজ্ঞ লেখক তাই অনেকক্ষেত্রেই সাহিত্যের মাধ্যমে বক্তব্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে থাকেন।

সাহিত্যে অনেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং অনেকে পরোক্ষভাবে বক্তব্যকে প্রকাশ করে থাকেন। কখনো বা লেখক সমাজের সভ্য হিসেবে সমাজের ওপর দায়িত্ব মেনে নেন এবং কর্তব্যের প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে সহানুভূতি প্রক্ষেপের দ্বারা কর্তব্য নির্ধারণের ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দেন। কেউ বা আত্মপ্রচারের তাগিদে এসব করে থাকেন। লক্ষ্যহীন সাহিত্যসৃষ্টির কথা ছেড়ে দিলে, এইসব সৃষ্টির মধ্যে এক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ পরিস্ফুট।

প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ চায় সমর্থনপুষ্টি; তাই, দৃষ্টিকোণটি যে সমর্থনপুষ্ট, এটিও প্রচারের আবশ্যক হয়। সমর্থনপুষ্টি ঘটলেই নিজের দৃষ্টিকোণকে Superior বলে উপলব্ধি ঘটে। অনেকক্ষেত্রে Superior বলে প্রচার করেও সমর্থকদের Superiority উপলব্ধি করবার সুযোগ দেওয়া হয়—এই উপলব্ধি যতো ব্যাপক-ভাবে ঘটে, ততোই দৃষ্টিকোণের Superiority বৃদ্ধি পায়।

শেষোক্ত প্রক্রিয়ার জন্যে সাধারণতঃ সাহিত্যিক সৃষ্টিতে হাস্যরসকে টানা

হয়, এবং তার আধার করা হয় বিরুদ্ধ দৃষ্টিকোণকে। হাস্যরসের উপাদান ও উৎস সম্পর্কে মতবাদ বিভিন্নতার মধ্যে হব্‌স্‌ প্রমুখ মনীষীর অনুগতি গ্রহণ করলে পূর্ব বক্তব্যের সমর্থন পাই। আমরা জানি, দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে যখন কোনো ব্যক্তিসত্তা নিজের Superiority অনুভব করে, তখনই মানুষ হাসে এবং দৃষ্টিকোণের পুষ্টির জন্যে হাসায়। এক কথায়, দৃষ্টিকোণের Superiority-বোধের ওপরেই হাস্যরসের মূল ভিত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণের সমর্থনপুষ্টির অভিযানে হাস্যরসাত্মক সাহিত্য অনেকখানি কার্যকর।

রীতিগত পদ্ধতিটিরও ব্যাবহারিক মূল্য কম নয়। প্রহসনরীতি কথোপকথন মূলক। বিন্যাস এতে বস্তুগতভাবে থাকে বলে, পাঠক বক্তব্যকে বস্তুগতভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। একাধিক ঘটনার যোগ পাঠককে প্রবণতা সম্পর্কে সচেতনতা এনে দেয়। অনেকক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রবণতা প্রত্যক্ষভাবে গোচরীকৃত করাও হয়ে থাকে। কিন্তু চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় মাত্রাবৃদ্ধি করে কার্যকারণে স্থূলতা আনা হয় সহজ উপলব্ধি সৃষ্টির জন্যে। এতে সমর্থন-প্রত্যাশী লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এ ধরনের রচনাগুলির দৃষ্টিস্থূলতার জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই আকার ক্ষুদ্র হয়। প্রচারাত্মক বলে সচেতনভাবেই লেখক জটিলতাকে এতে এড়িয়ে চলেন। কারণ তাতে দৃষ্টিকোণ অস্পষ্ট হবার ভয় থাকে। কার্য কারণ যোগাযোগে ‘কাল’-কেও সংক্ষিপ্ত করা হয়, যদ্দ্বারা মানুষের সহজ মনের মধ্যে বক্তব্য ভিত্তি পায়। মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এই সহজ মনের ক্ষমতাই অধিক।

স্বাধীন দৃষ্টিকোণের কথা বাদ দিলে, গোষ্ঠীপুষ্ট দৃষ্টিকোণগুলোকে মূলতঃ স্থিতিশীল এবং প্রগতিশীল—এই দুটি দিকে ভাগ করা যায়। সুতরাং প্রহসনগুলোর মধ্যেও এই দুই ধরনের দৃষ্টিকোণ লক্ষ্য করা যায়। যদিও অনেকক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ অস্পষ্ট—এমনও দেখা গেছে। উক্ত দুই ধরনের প্রহসনের মধ্যেই প্রাথমিক অনুশাসনগত দৃষ্টিকোণকে আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ; কারণ ভিত্তির দৃঢ়তা।

॥ দৃষ্টিকোণ-সংগঠক সামাজিক সমস্যা ॥

কায়েমী স্বার্থের ক্রমপুষ্টিতেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব। এই সামাজিক সমস্যাগুলোকে মূলতঃ তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) যৌন

(২) আর্থিক এবং (৩) সাংস্কৃতিক। এই সমস্যাসমূহের বহিঃপ্রকাশ দৈহিক এবং মানসিক নিপীড়নের মধ্যে।

॥ যৌন ॥ স্ত্রীপুরুষের সুস্থ যৌনাচার পালনের জন্যে দাম্পত্য বিধিনিয়মের সৃষ্টি। সুস্থ মনই সামাজিক শান্তি আনে। দাম্পত্যবিধির লঙ্ঘনে সামাজিক মনে অসুস্থতা দেখা দেয়। তাই সমাজহিতৈষীরা দাম্পত্য বিধিনিয়ম পালনে নিষ্ঠার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। দাম্পত্য দুর্নীতির দিক থেকে কতকগুলো সমস্যাকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে—(ক) যৌগ্মিক (খ) পারিবারিক এবং (গ) সামাজিক।

প্রথমটির কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই নিহিত। এগুলো সাধারণতঃ দুই রকমে হয়ে থাকে—(১) স্বামী বা স্ত্রীর যৌন অত্যাচার এবং (২) স্বামী বা স্ত্রীর যৌন বঞ্চনা। বিবাহান্তে দৈহিক তৃপ্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং ব্যভিচার—এই দুই দিক থেকেই যৌন বঞ্চনা প্রকাশ পায়। এই সমস্যা থেকে উদ্ভূত প্রতিশোধমূলক বা আত্মঘাতমূলক প্রবণতা সমাজে সুস্থ দাম্পত্যজীবনের মধ্যেই সীমিত থাকে না। এর ক্রমবিস্তার ভয়াবহ।

দ্বিতীয়টির কারণ যৌথ পরিবারের স্বার্থ সংঘাতের মধ্যে নিহিত থাকে। যৌথ পরিবারের বিশেষ নিয়ন্ত্রণকারী সত্তা কর্তৃক পরিবার অন্তর্ভুক্ত দম্পতির যৌন বঞ্চনা বা যৌন অত্যাচারজাত সমস্যাগুলো এই গোত্রের। এই সমস্যা থেকেও প্রতিশোধমূলক বা আত্মঘাতমূলক প্রবণতার উদ্ভব ঘটতে পারে। যৌথ পরিবার আদর্শের বিরুদ্ধে প্রবণতা এই সমস্যা থেকে উদ্ভূত অন্যতম প্রবণতা। অবশ্য যৌথ পরিবার ছাড়াও সাধারণ পরিবারেও এই সমস্যা উদ্ভবের অবকাশ আছে।

তৃতীয়টির কারণ সমাজ। পরিবার এর অঙ্গীভূত হলেও বাইরের চাপ এখানে বেশি। এই চাপ সাধারণতঃ দুই আকারে প্রকাশ পায়,—লোকভয় আকারে এবং নির্দেশ পালনের আকারে।

দম্পতি ব্যতিরিক্ত সমাজের যৌন সমস্যাও সমাজের একটি ক্ষতিকর সমস্যা। বিধবা, বিপত্নীক, কুমার, কুমারী, অবিবাহিত লম্পট এবং বেশ্যাকে নিয়ে এই যৌন সমস্যার এই দিকটি প্রকাশ পায়। তবে এই সমস্যাও মূলতঃ দাম্পত্য সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

সমাজে বিধবা এবং বেশ্যার যৌন সমস্যা চারটি দিক থেকে প্রকাশ পায়। (ক) আর্থিক অপ্রতিষ্ঠায় যৌন-নিরাপত্তাহীনতা (খ) যৌন-অস্বাচ্ছন্দ্য—(বিধবার

ক্ষেত্রে) বুভুক্ষা অথবা—(বেশ্যার ক্ষেত্রে) অত্যাচার-জাত। (গ) অপর দম্পতির জীবনে ফাটল সৃষ্টির বীজ বহন (ঘ) সুখী দাম্পত্য জীবনের সম্ভাবনা সম্পন্ন অবিবাহিত পুরুষকে দুশ্চরিত্রীকরণের বীজ বহন।

সমাজে বিপত্নীক এবং অবিবাহিত লম্পটের যৌন সমস্যা তিনটি দিক থেকে প্রকাশ পায়। (ক) যৌন অস্বাচ্ছন্দ্য (খ) অপর দম্পতির জীবনে ফাটল সৃষ্টির বীজ বহন, এবং (গ) সুখী দাম্পত্য জীবনের সম্ভাবনা সম্পন্ন কুমারীকে দুশ্চরিত্রীকরণের বীজ বহন।

সমাজে কুমার কুমারীর যৌন সমস্যা থেকেও সমাজের দেহমনের সুস্থতা নষ্ট হয়। অসংযম ও অনাচারে দৈহিক ও মানসিক অশুচিতা ও অসুস্থতা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। ভবিষ্যতের সুস্থ দাম্পত্য জীবনে কুপ্রতিক্রিয়া সাধন পর্যন্ত এই সমস্যার অগ্রগতি।

সমাজে বেশ্যা (ক্ষেত্রবিশেষে বিবাহ সম্ভাবনা বিরহিত কুমারী) ও অবিবাহিত (বিবাহ সম্ভাবনা বিরহিত) লম্পটের পারস্পরিক যৌনাচার প্রত্যক্ষ-ভাবে সামাজিক সমস্যা না আনলেও সমাজে কুদৃষ্টান্ত উজ্জ্বল করে,—যার ফলে পরোক্ষভাবে সমাজে দাম্পত্য ফাটলের সৃষ্টি করে।

বিপত্নীক ও বিধবার পারস্পরিক যৌনাচারও প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক সমস্যা আনে না। তবে অবৈধ সন্তান সৃষ্টিতে সমাজে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। তাছাড়া পরোক্ষভাবে দাম্পত্য ফাটল সৃষ্টি এই যৌনাচারেও সম্ভবপর, কারণ সাধারণ দম্পতির মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা ও দাম্পত্য সংস্কার এই সব কুদৃষ্টান্তে লঘু অথবা নষ্ট হয়ে যায়।

শুধু সুস্থ যৌন তৃপ্তি নয়, সবল শিশুর জন্মও সমাজে কাম্য, কারণ সবল শিশু সমাজের সম্পদ। তাই নেশা ইত্যাদি দৈহিক ও মানসিক অনাচার সমাজে ধিক্কৃত, কারণ এতে দাম্পত্য অংশীদারের অস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি ঘটে দৈহিকভাবে। তাছাড়া স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি নাশের সম্ভাবনা যৌন বিধি-নিষেধকে মূল্যহীন করে তোলে।

॥ আর্থিক ॥ সমাজে যৌন সমস্যার মতো আর্থিক সমস্যাও অন্যতম প্রধান সমস্যা। আর্থিক সমস্যা মূলতঃ মানুষের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত সমস্যা। এই সমস্যার দিক বিভিন্ন। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক—ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যা আবির্ভূত হয়ে আর্থিক সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। অর্থ জীবন সংগ্রামে প্রধান রসদ হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায়, দেখা

যায়, প্রত্যেকটি মানুষেরই এক একটি ব্যক্তিগত ব্যয়ের দিক আছে। ব্যয়ের ক্ষমতা আয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ঔচিত্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি মানুষেরই পৃথক আয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমাজে নানা কারণে সেটা সম্ভবপর নয়। আয়-সম্পন্ন ব্যক্তিব্যতিরিক্ত সমাজে আছে অপ্রাপ্তযোগ্যতা ব্যক্তি (শিশু, বালক ইত্যাদি), দৈহিক বা মানসিক দিক থেকে অক্ষম ব্যক্তি (বৃদ্ধ, পঙ্গু, উন্মাদ ইত্যাদি), যোগ্যতা-প্রাপ্ত অথচ সামাজিক বাধায় অক্ষম ব্যক্তি (স্ত্রীলোক ইত্যাদি),—এমন কি পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় বাধায় অক্ষম যোগ্যতা-প্রাপ্ত ব্যক্তিও সমাজে থাকা সম্ভবপর। সাধারণতঃ এরাই আর্থিক সমস্যাকে সৃষ্টি করে।

ব্যক্তির ব্যয়ের পরিমাপ ও পরিধি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে আপেক্ষিক। আত্মসর্বস্ব-নীতি সামাজিক দিক থেকে ধিকৃত। তাই প্রত্যেকটি ব্যক্তির কিছু পারিবারিক এবং কিছু সামাজিক দান বাধ্যতামূলক। স্ত্রী কর্তৃক আয় অধিকাংশ অঞ্চলেই সমাজবিরুদ্ধ বিষয় বলেই প্রত্যেক স্বামীর স্ত্রী পরিপোষণ বাধ্যতামূলক বলে সমাজে গৃহীত হয়েছে। বিবাহ করে পোষণ না করা তাই, শুধু যৌন দিক থেকে নয়, আর্থিক দিক থেকেও দুর্নীতি। অক্ষম পিতামাতার পোষণ সামাজিক দিক থেকে বাধ্যতামূলক,—অন্ততঃ যেখানে অন্য সংস্থা তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। অঞ্চল বিশেষে যেখানে বিভিন্ন আর্থনীতিক কারণে একান্নবর্তী পরিবার গড়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে স্বজন পোষণেও সমাজ বাধ্যতার নির্দেশ দিয়েছে। আবার দেখা যায়, প্রতিবেশী অক্ষম-গলগ্রহদের সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকাও সমাজে নিন্দার্হ। কারণ, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন মানসে সমাজ মানুষের ওপর অনেক দায়িত্বের ভার চাপিয়েছে। সুতরাং পরিধি অনুযায়ী স্বার্থ-শিথিলতার সমস্যা সমাজে আর্থিক দিক থেকে একটি বড়ো সমস্যা।

আয় অনুযায়ী ব্যয়ের মানও নির্দিষ্ট হয়। ব্যয় সংক্রান্ত দিক থেকে সমাজে একটি সাধারণ মান থাকে বলে অনেকে মনে করেন। যাঁরা এ-মতের বিরোধী, তাঁরা অন্ততঃ ব্যক্তিগত ব্যয়ের মানের বিষয়ে স্বীকৃত হবেন। আয়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখে পরানুকরণে বা মোহসর্বস্বতায় ব্যয়বৃদ্ধি সমাজে প্রশংসনীয় নয়। কারণ এগুলো সমাজে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করে ব্যক্তিগত ব্যয়ের মানকে বিচলিত করে। এই হিসাব শূন্যতার দৃষ্টান্ত অন্য হিসাবীকেও হিসাবশূন্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। কারণ হিসাব শূন্যতার ভাঙন বাহ্যভাবে দৃষ্ট হয় না। তাছাড়া, আয়ের একটি সাধারণ মান সম্পর্কে মানুষ ধারণা না করে পারে না। এইজন্যে আয়ানুপাতিক ব্যয়বৃদ্ধির সমস্যা সমাজে প্রকট।

একই কারণে বড়ো লোকের সামাজিক দায়িত্ববিহীন ব্যয় অথবা অপব্যয় সমাজে আনুকূল্য পায় নি। তথাকথিত অপব্যয়ের মতো ব্যয়ের অধিকার মানুষের থাকলেও সমাজ এর পরিপন্থী,—তার কারণ দায়িত্ব লঙ্ঘন করে অপব্যয় ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষতি আনে। মানুষের সামাজিক দায়িত্বও থাকা উচিত বলে, এই অপব্যয় সমাজ জীবনেও ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়। কারণ সমাজে ব্যয়ের উপযুক্ত গলগ্রহ পাত্রের অভাব মোটেই নেই। দ্বিতীয় কারণ,—ধনীর অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত হীন আয় সম্পন্ন ব্যক্তির আর্থিক জীবনের মানকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এই অপব্যয় সাধারণতঃ দুই প্রকার—(ক) দুর্নীতিমূলক এবং (২) অনীতিমূলক। যদিও দুর্নীতি এবং অনীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ আপেক্ষিক কাজ, তবুও মোটামুটি প্রথমটিকে সমাজ ক্ষমার চোখে দেখতে অসমর্থ।

আয়ের দিক থেকেও আমরা সামাজিক প্রাতিকূল্য ও সমস্যার সন্ধান পাই। ব্যক্তিগতভাবে সাধিত দৌর্নীতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয় সমাজে স্বীকৃত নয়। সামাজিক, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় দিক থেকে সমষ্টিগত আয়েও দুর্নীতি থাকতে পারে। সমাজের পক্ষে কোনোটিই মঙ্গলময় বলে বিবেচিত হয় নি।

যোগ্যতা অনুযায়ী আয়ে অসঙ্গতি, যোগ্যের আয়হীনতা, যোগ্যতা অর্জনে চেষ্টাহীনতা ইত্যাদি সমাজে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বিভিন্ন দিক থেকেই এর কারণ থাকতে পারে। এরা সমাজে 'সক্রিয় অণু' তাই এরা সমস্যা সৃষ্টি এবং সমস্যা বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই করতে পারে না।

যুগ নিরপেক্ষ সমাজে আর্থিক সমস্যার গতিবিধি অনেকটা এরকম। তবে যুগ চিহ্নিত সমাজ তার বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পরিবেশে এই গতিবিধিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা রাখে।

॥ সাংস্কৃতিক ॥ সমাজে নিয়ন্ত্রণের বলবত্তা যখন সমাজসভ্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সংস্কার সৃষ্টি করে, তখন তা থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়। সমাজে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চারটি দিক থেকে ঘটতে পারে।—(১) ঔৎপাদনিক (২) প্রাতিভবিক (৩) প্রাতিষ্ঠিক এবং (৪) সাংস্কারিক।

সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশে প্রথমে ঔৎপাদনিক, পরে প্রাতিভবিক, তারপর প্রাতিষ্ঠিক এবং সর্বশেষে সাংস্কারিক বৃত্তির বিকাশ ঘটে। সাংস্কারিক বৃত্তির মধ্যেই সমাজের পূর্ণ বিকাশ। শুধুমাত্র উৎপাদন, সঞ্চয় এবং রক্ষণের মধ্যে

সমাজের সন্তুষ্টি নিবদ্ধ থাকে না। তাই সামাজিক ক্রমবিকাশে যথারীতি জ্ঞানচর্চার অবকাশও দেখা দিয়েছে। জ্ঞানচর্চা—রক্ষা, সঞ্চয় এবং উৎপাদন —তিন দিক থেকেই আবশ্যক হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবশ্যক হয়েছে "অবৈসযিক" জ্ঞান। ক্রমে এই জ্ঞানচর্চার জন্যে পৃথক বৃত্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। কারণ উক্ত তিনটি বৃত্তির মধ্যে অবৈষয়িক জ্ঞানচর্চার অনুপ্রবেশে বৃত্তিগত স্বার্থবিরোধের সম্ভাবনা ছিলো প্রচুর। সম্ভবতঃ সেই কারণেই সমাজ নিরপেক্ষ-বৃত্তির প্রয়োজন অনুভব করেছে। এই নিরপেক্ষ গোষ্ঠী সার্বিক হিত-সাধনে নিজ বৃত্তি নিয়োজিত করেছে—এই বোধ থেকে এই গোষ্ঠির প্রতি অন্য তিনটি গোষ্ঠীর শ্রদ্ধা ক্রমশঃ জন্ম নিয়েছে। কালক্রমে এই গোষ্ঠী সমাজে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সাংস্কারিক গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে এই গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের প্রচুর অবকাশ জন্ম নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী বাহ্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতালাভের জন্যে কালক্রমে এই সমস্ত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সমাজে গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূল বিভিন্ন আচার ও প্রথার জন্ম দিয়েছে। অন্য গোষ্ঠীর চিন্তা অত্যন্ত immediate হয়ে পড়ায় mediate চিন্তার ভার তারা স্বেচ্ছায় সাংস্কারিক বৃত্তি সম্পন্ন গোষ্ঠীর ওপর অর্পণ করলো। এবং, সাংস্কারিক গোষ্ঠীও নিজেদের ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজে উপস্থাপিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা পার্থিব সব কিছুর ওপর অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে রচনা করলো।

বৈষয়িক দিক থেকে প্রত্যক্ষ সংঘাত আসে ঔৎপাদনিক, আর্থিক (প্রাতিভবিক) এবং সামরিক (প্রাতিষ্ঠিক) গোষ্ঠীর মধ্যে। এক একটি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যখন তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কারিক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সংঘাত বাধে। কারণ, সংস্কার ও ভাবপ্রবণতার মাধ্যমেই সমাজস্থিতি সম্ভবপর। স্বার্থপুষ্ট গোষ্ঠীর লক্ষ্য সমাজস্থিতি, তাই সাংস্কারিক গোষ্ঠীকে বশীভূত করা তার অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে আপোষের মধ্যে দিয়ে বিশেষ মাত্রা রক্ষিত হয়। বৃত্তি-চতুষ্টয়ের আপোষের মাত্রা-বিভিন্নতার মধ্যে যে সংস্কার স্বীকৃতি পায়, তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা ও সংঘাত সূচিত হয়।"

সমাজ-সভ্যের বৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। তাই গোষ্ঠীগত আপোষও সমপর্যায়ে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিস্বার্থের সাংস্কারিক পুষ্টি গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠাকে ভিন্ন ভিন্ন করে তোলে। তাই একই গোষ্ঠীর

মধ্যে প্রতিষ্ঠাগত সংঘাতের অবকাশও থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে, সংশ্লেষ ব্যতিরিক্ত সমাজে সাংস্কৃতিক সমস্যা গোষ্ঠীতে সম্প্রদায়গতভাবে কিংবা উপসম্প্রদায়গতভাবে সংঘাতের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারে।

সংশ্লেষ ব্যতিরিক্ত সমাজেই সাংস্কৃতিক সমস্যার এমন জটিল গ্রন্থি, তার ওপর জাতি-সংশ্লেষ সমাজে এই সাংস্কৃতিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। বিশেষতঃ যখন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বিজাতি লাভ করে, তখন সামরিক, আর্থনীতিক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের চাপের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কারিক প্রতিষ্ঠার মানও ধ্বসে পড়ে এবং নতুন মানের জন্ম হয়। এই মান-বিপর্যয়ে, নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হয় এবং স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে এই ব্যক্তিত্বসমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক—তিন দিক থেকেই এই নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিত্ব প্রযুক্ত হয়, এবং নতুন মানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে এই ব্যক্তিত্ব নিজ দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করে।

শুধু গোষ্ঠীগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবেও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা সমস্যা সমাজকে সংঘাত মুখর করে রেখেছে। প্রতিষ্ঠা সমস্যা সাধারণতঃ যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে ঘটে। যৌগ্মিক, পারিবারিক বা যৌথ-পরিবারগত বিধিব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠার মানবিপর্যয় যখন ব্যক্তিচিত্তকে আক্রমণ করে, তখন এইসব বিধিব্যবস্থার মধ্যেও বিপর্যয় আসে। স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্য আনুগত্যমূলক বিধিব্যবস্থা ও প্রথায় বিপর্যয় দেখা যায় উভয়ের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতায়। অপর ব্যক্তিত্ব প্রভাবে কিংবা অন্যান্য কারণে কোনো ব্যক্তি যখন নিজ দৃষ্টিকোণের সমর্থনপুষ্টির জন্যে তার দাম্পত্য-অংশীদারের ওপর বলপ্রয়োগ করে, তখন এমন সমস্যার আবির্ভাব হতে দেখা যায়। অসম্ভাব্য-স্থলে দাম্পত্য সম্পর্ক অস্বীকারের মধ্য দিয়ে কোনো ব্যক্তি অন্যত্র নিজের সমর্থনলাভের চেষ্টা করে থাকে। পারিবারিক কিংবা যৌথ পরিবারগত ক্ষেত্রেও একই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, সমাজে যৌন, আর্থিক, এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে যে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করে তাকে উপস্থাপিত করা সম্ভবপর হয় না। তাই সামাজিক চিন্তাভাবনা এবং ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যে সমস্যা-গত দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পায়, তা ঐকিকভাবে বিচার করা সম্ভবপর হয় না। তবে এক একটি সমস্যা সামাজিক চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে মুখ্য হয়ে প্রকাশ পায়। অবৈজ্ঞানিকতা-চালিত অস্পষ্ট পথে দিশাহারা

হওয়ার চেয়ে মুখ্যাত্মকতার রীতি সমাজচিত্রের সূক্ষ্মতর দিকগুলির প্রকাশে সর্বাঙ্গীণ না হলেও মোটামুটি সহায়তা করবে।

॥ আমাদের সমাজে সমস্যা ও দৃষ্টিকোণ ॥

আমাদের সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য কি, তা 'সমাজ' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য করলেই অনেকটা জানা যাবে। 'আন্তর্জাতিক বঙ্গ' পরিষদের আলোচনায় (১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ) একটি প্রবন্ধে হরিদাস পালিত বলেছেন,— 'সমাজ' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ, সংস্কৃতে,—ইহা পুংলিঙ্গ শব্দ, 'সম্—অজ— অধিকরণে ঘঞ্'—সমূহ, গণ, সভা, একসঙ্গে (ভাবে)। বাংলা ভাষায়—সম্ +অজ—সমাজ। সম, ধা—বৈক্লব্য (বিক্লবভাব); বিক্লব—'বি—ক্লব, কর্তৃ— অন্'—অর্থ বিবশ, বিহ্বল, ভীত, অবধারণ অসমর্থ, পু—(ভাবে—'অন্',— ব্যাকুলতা, জড়তা)—বিহ্বলতা, বিবশতা ইত্যাদি। অজ, ধা—গতি; ক্ষেপণে (অ-জ, অ'টি—নঞ্ ন; না অর্থ প্রকাশ করে, অব্যয় শব্দ, এবং জ'টি জন্ ধাতুর জ, অর্থ উৎপত্তি, যথা—দ্বিজ, অন্ত্যজ ইত্যাদি), ক্ষেপন অর্থে—ক্লী, 'ক্ষিপ্—ভাবে—অনট্',—ক্ষেপ, প্রেরণ, যাপন। ক্ষপ্ ধাতু—প্রেরণ ক্ষেপন। মূল অর্থ হইতেছে—"বিহ্বলতা, বিবশতা পূর্ব্বক গতি বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা—অপ্রাকৃত ব্যাপার। জনগণের সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিতাহিত অবধারণে অসমর্থ হইয়াও গতিশীল হওয়া বুঝায়। মোটকথা হইতেছে দশে মিলে কেন একভাবে চলিতেছি ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ভীত বা বিবশভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অথবা জড়বৎ গতিশীলতা।"

পরবর্তীকালের বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম গবেষক হরিদাস পালিত সমাজের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও আমরা আমাদের সমাজ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু সচেতন হলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মেনে নিতে পারি নে। এই কারণেই আমাদের সমাজে সমস্যা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ সংগঠনের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়েছিলো। তাই আমাদের সমাজে সমস্যাগুলো এতো দৃঢ়মূল।

পূর্বোক্ত গবেষককৃত ব্যাখার কথা আমাদের সমাজের প্রসঙ্গে উঠছে এই কারণে যে, বাংলা ভাষায় আমরা একই শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এর মূলে ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাব কতকটা থাকলেও ভাবগত প্রভাব যে বর্তমান ছিলো তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বর্তমান সমাজ-সত্তার মধ্যে আর্য্যরক্তের

বিন্দুমাত্র নিদর্শন আবিষ্কার দুরূহ হলেও আমাদের সামাজিক কাঠামোর প্রতি নজর দিলেই আর্যসমাজের কাঠামো থেকে খুব একটা পৃথক কিছু বলে মনে হয় না। ব্রাত্যস্তোম ইত্যাদির দ্বারা আর্যসমাজ কাঠামো আমাদের সমাজে ভিত্তি গড়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের এই বিরাট অনার্যসমাজে ব্রাত্যস্তোমের প্রয়োজন ক্রমেই ফুরিয়ে এসেছিলো। কারণ ব্রাত্যস্তোম পরিচালনার অধিকার বিশুদ্ধ আর্যগোষ্ঠীর হাত থেকে অনেক আগেই অনার্য ব্রাত্যদের মধ্যে চলে এসেছিলো। তাছাড়া আর একটি কারণ ছিলো। আর্য আচার-বিচারের আভিজাত্য আমাদের অনার্যসমাজে মোহের সঞ্চার করেছিলো। এরা আর্যসমাজ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও এই আচার-বিচার কিছু কিছু মেনে নিয়েছে। পরে এইভাবে আর্যসমাজ কাঠামোর মধ্যে আনুলোম্য ঘটে যায়, এবং আর্যসমাজ কাঠামো আমাদের সমাজে স্বাভাবিকভাবেই দৃঢ়ভিত্তিলাভ করেছে। অনার্যসমাজে ব্যক্তির স্থান কতোটা ছিলো তা জানা যায় না, তবে আমাদের সমাজের মধ্যে ব্যক্তির অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো, তা আমরা পরবর্তীকালের সমাজের গতিবিধি থেকে প্রমাণ করে নিতে পারি। তবে আমাদের সমাজ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এদিক থেকে আর্যসমাজ বৈশিষ্ট্য এক হলেও আমাদের সমাজ এবং আর্যসমাজ একপদবাচ্য নয়। আমাদের প্রাগার্যযুগের সমাজবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। তাই চাতুর্বর্ণ্যের বিধি-ব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেও মাতৃতান্ত্রিকতার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য সমাজের যৌন, আর্থিক এবং প্রতিষ্ঠাগত—তিনদিক থেকেই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

মানুষের স্বার্থসংঘাতের চিত্র সমাজ-নির্বিশেষে সর্বত্রই এক। স্বার্থ-সংঘাত থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হলেও গোষ্ঠীস্বার্থে নিয়োজিত প্রথার চাপেই এই সমস্যার এক একটি বাহ্যরূপ প্রকাশ পায়। এই বাহ্যরূপগুলো সব সমাজে এক রকম না'ও হতে পারে।

১ ॥ যৌন সমস্যা ॥ দাম্পত্য বিধিনিষেধ সমাজকে সুস্থ করে গড়ে তোলে। কিন্তু এই বিধিনিষেধের মধ্যে যে সাংস্কারিক চাপ অনুভূত হয়, তার মধ্যে স্বার্থের বীজ কিছুটা গোষ্ঠীগত হতে পারে; তাই সমাজে দাম্পত্য-সমস্যা চিরাচরিত বিধিনিষেধের মধ্যেও বর্তমান থাকে। এই সমস্যার বৃদ্ধি করে নৈতিক অসাড় ব্যক্তি এবং সমস্যাযুক্ত প্রথায় ব্যক্তিত্বহীন স্বীকারক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর বহির্ভূত হয়েও বাহিরের চাপে অনেকে এই সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের যৌন

সমস্যার একটা বিশিষ্টরূপ আছে। আমাদের দেশে যৌন বিধি-নিষেধে স্ত্রী স্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এবং তাই স্ত্রীপক্ষেই এই সমস্যা প্রবল। পৃথিবীর সবদেশেই ঔৎপাদনিক, আর্থিক, সামরিক এবং সাংস্কারিক দিক থেকে পুংগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন থাকে। কিন্তু প্রথার বিভিন্নতায় এই ক্ষমতার অব্যবহার ব্যবহার এবং অপব্যবহার দেখা যায়। আমাদের দেশে পুংগোষ্ঠী স্ত্রী সমাজকে সাংস্কারিক চাপ, তদধীনে সামরিক চাপ, তদধীনে আর্থিক চাপ এবং তদধীনে ঔৎপাদনিক চাপের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে পুংগোষ্ঠীর যন্ত্রস্বরূপ মূল্যায়িত করেছে। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে বলা হয়েছে—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥"

স্ত্রী সম্পর্কে এই নীতি সাংস্কারিক সমর্থনে অত্যন্ত প্রতিপত্তিলাভ করেছে, তাই গোষ্ঠী নিয়োজিত যথেচ্ছ প্রথার প্রবর্তনে স্ত্রীসমাজের সমস্যাকে নির্মমভাবে বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাদেশে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা প্রাচীন নয়। কিন্তু আর্য স্মৃতিগ্রন্থসমূহের ব্যাবহারিক চর্চা বাংলাদেশে যথেষ্ট হয়েছে। এসব বিধিনিষেধ আর্য সমাজের আওতায় ঘটলেও আমাদের সমাজে এর যথেষ্ট চর্চার ফলে অনেক বিধিনিষেধ আমাদের সমাজে সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। সমস্যা সমাধানে এঁরা যা বিধান দিয়ে গেছেন, তা থেকেই সমস্যার স্বরূপ আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে রচিত স্মৃতগ্রন্থসমূহে অনেকক্ষেত্রেই প্রকারান্তরে এই সমস্যার বিভিন্ন অবস্থা ও জটিলতাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। আমাদের প্রাগার্যীকৃত সমাজের যৌন বিধিনিষেধ এবং সমস্যার স্বরূপ জানবার কোনো উপায় নেই। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌দের পদ্ধতি গ্রহণ করে তা নিয়ে চিন্তার অবশ্য কোনো দরকার পড়ে না; কেন না, প্রথমতঃ আমাদের সমাজের যৌন আদর্শে অনার্য প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমাজের যে সব গোষ্ঠীর মধ্যে এই ক্ষীণতা তবু যতোটুকু লক্ষ্য করা যায়, সে সব গোষ্ঠী থেকে প্রহসনের দৃষ্টিকোণের সূচনা ঘটে নি।

স্মৃতিগ্রন্থসমূহ তদানীন্তন সমাজগৃহীত নীতি কিংবা স্মৃতিকারের ব্যক্তিগত আদর্শ—যাই হোক না কেন, এগুলো বাংলাদেশের সমাজকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন করে এসেছে। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস,

শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, প্রমুখ স্মৃতিকারদের মধ্যে[১৬] অনেকেই পুংস্বার্থের অনুগতিতে যৌন বিধিনিষেধ দিতে ভোলেননি। এগুলো আমরা ব্যক্তিত্বহীন প্রথাস্বীকৃতির তাড়নায় কারণে অকারণে আমাদের সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছি। তাই একদিক থেকে বলা চলে যে, আমাদের দেশের যৌন সমস্যার মূলবীজ বহন করেছে এই সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ। দোষ সম্পূর্ণ স্মৃতিকারের নয়। আমরাই স্মৃতিগ্রন্থসমূহের যুগগত উদ্দেশ্যের দিকটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি এবং স্বার্থপ্রণোদিত অন্যায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এই স্মৃতিগ্রন্থসমূহের সমর্থন সন্ধান করে এসেছি।

প্রথাগত দিক থেকে সমাজের যৌনসমস্যা মোটামুটি দুইটিভাগে ফেলা যায়।—(ক) দাম্পত্য অংশীদারের ব্যক্তিগত যৌন সমস্যা এবং (খ) দাম্পত্য বন্ধন ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিসমূহের যৌন সমস্যা। আমাদের দেশে দুই রকম সমস্যাই কতকগুলো বিধিনিষেধের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট।

দাম্পত্য-সমস্যা সাধারণতঃ পাঁচটি রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। (ক) অসম বিবাহ—স্বামী বৃদ্ধ, স্ত্রী তরুণী; অথবা স্ত্রী বৃদ্ধা স্বামী তরুণ; এবং বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে দুটিই মাত্র দাম্পত্য অংশীদার থাকে। (খ) বহুস্ত্রীত্ব, (গ) বহুপতিত্ব, (ঘ) বার্ধক্য বিবাহ, যে ক্ষেত্রে উভয়েই বৃদ্ধ এবং দাম্পত্য অংশ দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। (ঙ) বাল্য বিবাহ—বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে দুজনেই বালক বা বালিকা; এবং দাম্পত্য অংশ দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

অসম বিবাহ।—অ বিবাহ আমাদের সমাজে একটি দৃঢ়মূলসম্পন্ন সমস্যা তথা একটি বিরাট অভিশাপ। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বিবাহ প্রসঙ্গে ধর্মীয় যোগ্যতা নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা যতোই থাকুক, বিবাহের পাত্রের বয়সের শেষসীমা নির্ধারণে এঁরা নীরব। কোথাও বা কন্যার লক্ষণ বিচারে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন,[১৭] কিন্তু বরের লক্ষণ বিচারের কথা তাঁদের মনে একবারও জাগেনি। বরের অযোগ্যতার কথা যে এঁরা টানেননি তা নয়। মনু একাদশ অধ্যায়ে আর্থিক অযোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮] এমন কি ক্লীবত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন পরাশর। চারের অধ্যায়ে তিনি বলেছেন—

১৬। পরাশর সংহিতা—১/১৩—১৫।

১৭। মনুসংহিতা—৩/৫—১১।

১৮। কৃতদারোঽপরান্ দারান্ ভিক্ষিত্বা যোঽধিগচ্ছতি।
রতি মাত্রং ফলং তস্য দ্রব্য দাতুস্তু সন্ততিঃ॥ ১১/৫

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধীয়তে॥ ৪/২৭

পরাশর সম্ভবতঃ জন্মগত নপুংসকত্বের কথাই বলেছেন। কিন্তু বার্ধক্যজনিত ক্লীবত্বের প্রসঙ্গে শুধু পরাশর কেন—কেউই সুস্পষ্ট মন্তব্য রেখে যেতে পারেন নি। বলাবাহুল্য বিবাহের বয়সের শেষসীমার প্রসঙ্গই এঁরা টানেননি। প্রচুর অনুলোম বিবাহের স্বাধীনতা, বিবাহের উদ্দেশ্য 'পুত্রার্থ'—এই মতের প্রচার,, গর্ভাধানের নিয়মাদির বিস্তৃত বিবরণ এবং বার্ধক্য বিবাহ সম্পর্কে নীরবতার কারণ সম্ভবতঃ এক,—জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যেই রতিশাস্ত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে,—

ঋতৌ নোপৈতি যো ভার্য্যামনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি।
তুল্যামাহুস্তয়োর্দোষান যোনৌ যশ্চ গচ্ছতি॥[১৯]

সুতরাং সর্বপ্রকারে সন্তান জন্মের অবকাশকে স্মৃতিকাররা কাজে লাগাতে বলে গেছেন। স্ত্রীপক্ষে অসম বিবাহের ক্ষতির দিক কতোখানি তা নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ বৃহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরেই বর্জন করা হয়েছে, বরং (লৌকিক শিবের মতো) বৃদ্ধ স্বামীর উপযোগিতার কথা বার বার প্রচার করা হয়েছে। শাস্ত্রকারদের বয়সোচিত স্বার্থপুষ্টির প্রশ্নও এক্ষেত্রে কিছুটা থাকা হয়তো স্বাভাবিক। এঁদের মতামত দেখে মনে হয়, দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর আনন্দের উৎস হচ্ছে বস্ত্রালঙ্কার, যৌনতৃপ্তি নয়। মনু বলেছেন,—

"যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংস ন প্রমোদয়েৎ
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে॥" ৩/৬১

শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'মন্বর্থ মুক্তাবলী'তে কুল্লুক ভট্ট বলছেন,—"দীপ্ত্যর্থেঽত্র রুচিঃ, যদি স্ত্রী বস্ত্রাভরণাদিনা শোভাজনকেন দীপ্তিমতী ন স্যাৎ তদা স্বামিনং পুনর্ন হর্ষয়েদেব হিশব্দোঽবধারণে অপ্রহর্ষাৎ পুনং স্বামিনঃ প্রজননং গর্ভধারণং ন সম্পদ্যতে।" (৩য় অধ্যায়)॥ অবশ্য বৃদ্ধের তরুণী দারপরিগ্রহ যে সমাজে প্রশংসনীয় বলেও মেনে নেওয়া হয় নি, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা" নামে বহু ব্যবহৃত প্রবচনটির কৌতুকতা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বার্ধক্যের প্রশ্ন সেক্ষেত্রেই বড়ো থাকে না, যেক্ষেত্রে কুল এবং পণের প্রশ্ন এসে দেখা দেয়। কৌলীন্য ও পণপ্রথা আমাদের সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ফলে এই

১৯। রতিশাস্ত্র—সি, সি; বসাক সং; পৃঃ ১০৯।

সমস্যা আমাদের সমাজে বীভৎসতার মধ্যে এসে পৌছেছিলো। এ থেকে আমাদের সমাজে আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা যতোটা সৃষ্টি হয়েছিলো, ততোটাই হয়েছিলো যৌন সমস্যার সৃষ্টি। স্ত্রীর অতৃপ্তিজনিত ব্যভিচার, বাল-বিধবার সৃষ্টি, যৌবনে বিধবার ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি পাপ আমাদের সমাজকে কলুষিত করে তুলেছিলো।

বৃদ্ধার তরুণ বিবাহ আমাদের সমাজে সাধারণতঃ অচলিত হলেও এই বিশেষ রীতি কৌলীন্য প্রথার পথ অনুসরণ করেই আমাদের সমাজে অসম বিবাহের একটি বিচিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কৌলীন্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীর বার্ধক্য অনেক-ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কিন্তু সেখানে বার্ধক্যজনিত দাম্পত্য সমস্যা যৌনক্ষেত্রে দেখা দেয় নি, কেন না স্বামীর যৌনসমস্যার যে দিক ছিলো, তা বহু বিবাহের সম্ভাবনায় সম বিবাহের বৈকল্পিক ক্ষেত্রের মধ্যে সমাহিত হয়েছে। স্ত্রীপক্ষে এই বিবাহে কৌলিক দিক ব্যতীত যৌনবোধের কোনো মূল্য থাকেনি। স্ত্রীর যৌনবোধ প্রাগ্‌বিবাহ জীবনের ব্যভিচার অথবা অবদমনের মধ্যে দিয়ে অবসিত হয়েছে। পিতৃগৃহের গণ্ডীতে মানসিক প্রকাশেরও কোনো অবকাশ থাকেনি। বৃদ্ধার যৌন বিকৃতি অবশ্য একটি সমস্যা সৃষ্টির বীজ বহন করে, কিন্তু কৌলীন্য প্রথানুযায়ী দাম্পত্য জীবনে তার নিস্ফলতা স্বীকার্য।

বহুস্ত্রীত্ব।—যৌনবিজ্ঞানীরা বহুস্ত্রীত্বে জীব-বিজ্ঞান-গত কোনো অস্বাভাবিকতা দেখতে পান না—একমাত্র মনোবিজ্ঞানগত কারণ ছাড়া। সমাজের সভ্য-বৃদ্ধির জন্যে অনেকক্ষেত্রে সমাজ বহুস্ত্রীত্বের পোষণ করেছে। আমাদের সমাজে স্মৃতিকারগণ যে কারণে বিবাহে পুরুষের বার্ধক্যের সীমা নির্দেশ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, একই কারণে তাঁরা বহুস্ত্রীত্বকে মেনে নিয়েছেন। ধর্মীয় স্বার্থ জন্মহার বৃদ্ধির পোষক ছিলো বলে ইসলাম ধর্মেও বহুস্ত্রীত্ব প্রথা আছে। কোরআন্ শরীফের 'ছুরা বাক্করাতে' স্ত্রীকে শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে,—কোর্‌আন্ শরীফের 'ছুরা বাক্করা' কিংবা 'ছুরা নেছা' ইত্যাদি এবং এই

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى

شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

সব ছুরার ভিন্ন ভাষ্য পাঠ করলেই তাঁদের বহুস্ত্রীত্বের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের সমাজে হিন্দুযুগ ও ইসলামী যুগ অতিক্রম করেও এই প্রথার ভিত্তিলাভের কারণ বহুস্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ প্রযুক্তির একান্ত অভাব। কৌলীন্য প্রথার আনুকূল্যে বহুস্ত্রীত্ব হিন্দু সমাজে আরও পুষ্টিলাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ লিখেছেন,—"অনুলোম প্রথা বা Hypergamy-র জন্য কুলীন সমাজে বহুবিবাহ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রথমে দু-চারজন স্ত্রীর মধ্যেই তা সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকত। পরে যত মেলবন্ধন হয়েছে, তত সঙ্কুচিত মেলের গণ্ডীর জন্য এক স্বামীর বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। তারপর ধীরে ধীরে বিবাহটা কুলীন ব্রাহ্মণের জাত ব্যবসায়ে পরিণত হতে দেরী হয়নি, আর্থিক কারণে। তখন শতাধিক পর্যন্ত বিবাহ হতেও বাধা রইল না।[২০]

বহুস্ত্রীত্বের ফলে সমাজে স্বামীপক্ষে যৌন অতি-আচার এবং স্ত্রীপক্ষে দাম্পত্য বন্ধনে শিথিল স্বীকৃতি, যৌন বিকৃতি, ব্যভিচার ইত্যাদি এসে সমাজকে অসুস্থ করে তোলে। কৌলীন্য ও পণপ্রথার মাধ্যমে আমাদের সমাজে এইসব সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই প্রহসনগত দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি করেছে।

বহুপতিত্ব।—প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থসমূহের বিধি এবং পুরাণাদির দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয় একদা সমাজে বহুপতিত্বের প্রচলন ছিলো এবং পত্যন্তর গ্রহণের ব্যাপক ক্ষেত্র ছিলো। কিন্তু সভ্যসমাজে এই রীতি বর্তমানে ঘৃণিত। তাছাড়া জীব বিজ্ঞান অনুযায়ী বহুপতিত্বে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। যৌন বিজ্ঞানীর মতে বহুপতিত্বে স্ত্রীর প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়। কোনো জাতি বা কোনো সমাজই স্ত্রী সমাজের ব্যাপক বন্ধ্যাত্ব কামনা করে না। জন্ম নিয়ন্ত্রণের যুগে বহুপতিত্ব মানসিক কতকগুলো বিকৃতির সূচনা করে যা সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে। অপরাধ-বিজ্ঞানী ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল এ বিষয়ে লিখেছেন,—নারীর একনিষ্ঠার মধ্যে সমাজ বিশেষের তথা জাতির মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এইজন্য পুরুষের এক নিষ্ঠার চেয়ে নারীর সতীত্ব বা পবিত্রতার মূল্য ও প্রয়োজন অনেক বেশী। জাতির মধ্যে অসতী নারীর প্রাদুর্ভাব ঘটলে জাতি বিশেষ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পুরুষ যদি বহু পত্নী গ্রহণ করে, তাহলে জাতির কোনো ক্ষতি হয় না, বরং জাতির এতে বৃদ্ধিই হয়ে থাকে,

২০। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ (১ম খণ্ড)—পৃঃ ২৮।

কিন্তু নারীর বহুপতিত্ব অর্থে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি ; ঈশ্বর নারীকে এমনিই দায়িত্বপূর্ণ করে পাঠিয়েছেন।[২১]

প্রকৃত অর্থে বহুপতিত্ব বলতে যা বোঝায় আমাদের সমাজে এখন তা চলিত নেই, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ অবকাশ আমাদের সমাজে বহুদিন পর্যন্ত ছিলো। কালক্রমে এটা লোপ পায়। কিন্তু বিধবার আর্থনীতিক গলগ্রহতাজনিত যৌন নিরাপত্তাহীনতা কিংবা অপ্রাকৃতিক প্রবৃত্তি দমনগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমাজে বিধবাদের যে সমস্যা এনেছিলো তা থেকেই পত্যন্তর গ্রহণ নিষেধের বিরুদ্ধে সমাজে একটি দৃষ্টিকোণ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই প্রগতিশীল আন্দোলনকে রক্ষণশীল সম্প্রদায় বহুপতিত্বের সমপর্যায় স্বরূপ গণ্য করেছেন। সমাজে বিধবা-বিবাহ সমস্যাকে তাই বহুপতিত্বজাত সমস্যার সমপর্যায়ভুক্ত না ধরলেও, বিশেষ দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বহুপতিত্ব জনিত যৌন সমস্যার আংশিক আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।

বার্ধক্য-বিবাহ।—বার্ধক্য বিবাহ থেকে সমাজে অন্যতম যৌনসমস্যা জন্ম নিলেও পাশ্চাত্য দেশের মতো তা আমাদের সমাজে ব্যাপক বা গভীর মূল নয়। আমাদের আধুনিক সমাজে বার্ধক্য বিবাহের প্রধান কারণ পাত্রের আর্থনীতিক অপ্রতিষ্ঠা, পাত্রীপক্ষের পণদানে অসামর্থ্য এবং পাত্র পাত্রীর মানসিক জটিলতাজনিত স্বাভাবিক বিবাহে বাধাসৃষ্টি। কিন্তু প্রাগাধুনিক সমাজে বার্ধক্য বিবাহের কয়েকটি অবকাশ থেকে গেছে অন্যত্র—কৌলীন্য প্রথার সূত্রে। কিন্তু সেখানে বার্ধক্য বিবাহের প্রাচীনতম সমস্যা—আর্থনীতিক সমস্যার গড়ন সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেক্ষেত্রে বৃদ্ধের বিবাহ দায়িত্বহীন এবং অংশীদারের বৈকল্পিকতা আছে। স্ত্রীপক্ষে যৌন চাহিদা প্রাগ্‌বিবাহযুগে অবৈধ পরিপূরণে কিংবা অস্বাভাবিক দমনে অবসিত। স্বামীর দায়িত্বহীন সাহচর্যে এবং বৈকল্পিক অংশীদার প্রাপ্তিতে স্ত্রীর যৌন বিকৃতি এক্ষেত্রেও দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টিতে নিষ্ফল। আধুনিক বার্ধক্যবিবাহজনিত সমস্যা সৃষ্টির অনুরূপ একটি অবকাশ অবশ্য শ্রোত্রিয় শ্রেণীর দ্বারা সূচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে অর্থনীতিক অপ্রতিষ্ঠায় কন্যাপক্ষকে পণ দিতে অসমর্থ হওয়ায় বার্ধক্যে বিবাহ করে বটে, কিন্তু কন্যার বয়োবৃদ্ধিতে পণের অঙ্ক বৃদ্ধি পায় বলে তারা বালিকা বিবাহই উচিত বিবেচনা করেছে। বস্তুতঃ শ্রোত্রিয় ঘরে কন্যা-ব্যবসায়ী পিতারা

২১। অপরাধ বিজ্ঞান—৩য় খণ্ড ; পৃষ্ঠা—৩।

কন্যাকে বেশি দিন ঘরে ফেলে রাখবার সংযম রাখতে পারেন নি। অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতো, কন্যার আয়ু সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিত হতে পারেন নি বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু-অবস্থায় এবং কখনো বা বালিকা অবস্থাতেই কন্যা পাত্রস্থা হয়। অবশ্য বার্ধক্য বিবাহের বিরুদ্ধে যৌন দিক থেকে সমাজে উল্লেখযোগ্য বিশেষ দৃষ্টিকোণ বলিষ্ঠতালাভ করে নি।

বাল্য বিবাহ।—ইসলামী শাস্ত্রের একটি সুপরিচিত প্রবচন সামাজিক যৌনবিজ্ঞানে স্বীকৃত। প্রবচনটি এই—"আন্নিকাহ নিসফল ইমান্।" অর্থাৎ বিবাহ করিলে নীতি রক্ষা সহজ হয়।[২২] সম্ভবতঃ এই কারণেই শাস্ত্র-প্রণেতাগণ প্রাচীনকালে আমাদের সমাজেও বাল্যবিবাহের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তাঁরা বালিকাপক্ষ থেকেই নীতিভ্রংশের আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু সমাজে যখন বিশিষ্ট পরিবেশে বালিকার নীতিভ্রংশীকরণে বাইরের চাপ অন্যতম একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন বাল্যবিবাহ সমাজে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে নিয়েছে। যৌথপরিবারগত আনুকূল্যে বাল্য বিবাহে যোগ্যতার নিয়মই সাধারণভাবে মেনে চলা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারে অথচ অন্যদিকে কৌলীন্য ও পণপ্রথার চাপে শেষে অযোগ্য বিবাহের মধ্যে তা পরণতি লাভ করেছে। মনুসংহিতায় গৌরীদানের প্রশস্তি আছে ; অনেকে নগ্নিকা দানেরও প্রশস্তি গেয়েছেন। এগুলোর মধ্যে খুব একটা অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু যখন শাস্ত্রকার বলেন,—"জাতমাত্রা তু দাতব্য কন্যকা সদৃশ বরে,"—তখন এই বিধান যে অত্যন্ত অমার্জনীয়, তা স্বীকার করতে কারো বাধা নেই। বৈদিক শ্রেণীর বিবাহে বাল্যবিবাহের অস্বাভাবিক বিধান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলো। একদিকে প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের শৈথিল্য, তারপর ইসলামী শাসনে নিরাপত্তাহীনতা এবং সর্বোপরি কৌলীন্য ও পণপ্রথার চাপে বাল্যবিবাহ সমাজে এমন ব্যাপক এবং ভয়াবহ হয়ে উঠেছিলো যে এর বিরুদ্ধে কালক্রমে পৃথক আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

বাল্যবিবাহকে পোষণ করবার মূলে সামাজিক কারণ ছিলো। সমাজের একছত্র প্রতিষ্ঠায় সাধারণ পরিবার প্রথার চেয়ে যৌথ পরিবার প্রথা বেশি সহায়তা করে। বাল্যবিবাহের মধ্যে দিয়ে বালক-বালিকার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের ধ্বংস ঘটিয়ে স্থিতিপন্থী সমাজপতিগোষ্ঠী তথা সমাজ তার কাজ সিদ্ধি করে।

২২। যৌন বিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ (২য় খণ্ড); পৃ: ১৬।

বাল্যবিবাহে যৌন দিক থেকে স্ব-মতামতের কিংবা স্ব-নির্বাচনের কোনো মূল্য থাকেনি। তাই দাম্পত্য অসন্তোষ সৃষ্টি এবং তজ্জনিত বিভিন্ন যৌন সমস্যার সৃষ্টি বাল্যবিবাহের অভিশাপ। দাম্পত্য অসন্তোষ থেকে সমাজে ব্যভিচার, মদ্যপান এবং অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্য-বিবাহকে সমাজে বিধবা সমস্যাসৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে শিশু ও কিশোর বয়সে পুরুষের মৃত্যুর হার অধিক। এক্ষেত্রে দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ করা সমাজের পক্ষে অনুচিত।[২৩] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত মানলে দেখা যায়, সমাজে বিধবাজনিত যৌন সমস্যা—তথা ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি পাপ সমাজের আবহাওয়া অপবিত্র করে তোলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যৌন দিক থেকে বাল্যবিবাহের সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক।

এতক্ষণ আমাদের সমাজে প্রথা এবং তজ্জনিত দাম্পত্যদিকের যৌন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হলো। অ-দাম্পত্য দিকের যৌন সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনায় আলোচক প্রতিশ্রুত।

সামাজিক পুরুষের পক্ষে বিবাহ আমাদের সমাজে একরকম বাধ্যতামূলক ছিলো।[২৪] বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিবাহে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে।[২৫] স্মৃতি পুরাণাদি সব কিছুর মধ্যেই অপুত্রকের নরকভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অবিবাহিত দ্বারা নিয়োগ প্রথাতে সন্তান নিয়োগকারীর হয় না। অতএব পিণ্ডলাভার্থে এবং পুন্নামক নরকভীতিতে পুরুষরা যথারীতি বিবাহ করেছে। অন্যদিকে স্ত্রীলোকের পক্ষেও কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতার দুর্লঙ্ঘ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হতো। মনু উল্লিখিত—"কালেঽদাতা পিতা বাচ্য"—শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভট্ট মেধাতিথি বলছেন,—"দানকালে প্রাপ্তে যদি পিতা ন দদাতি ...যঃ কঃ পুনঃ কন্যায়া দানকালঃ। অষ্টমাদ্বর্ষাৎ প্রভৃতি প্রাগৃতোরিতি স্মর্যতে ইহাপি লিঙ্গমস্তি...তি।"[২৬] সমাজে সন্ন্যাস গ্রহণের দৃষ্টান্ত থাকলেও অবিবাহিত গৃহস্থ স্ত্রীপুরুষের সংখ্যাও সমাজে বেশি ছিলো না এবং তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাও উন্নত ছিলো না। তাই একদিক থেকে কুমার-কুমারীর যৌনসমস্যা—যা আমাদের সামাজিক প্রথা থেকে জন্মলাভ করেছে—তা

২৩। বাল্যবিবাহের দোষ—বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ ; পৃঃ ৯।

২৪। মনুসংহিতা—৯/২৬ ; মৎস্যসূক্ত—৩১শ পটল, ইত্যাদি।

২৫। অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ—দক্ষসংহিতা—১ম অধ্যায়, ইত্যাদি।

২৬। মনু-ভাষ্য—৯/৪।

অনেকটা আধুনিক। কৌলীন্য ও পণপ্রথা থেকে আমাদের সমাজে সমর্থকালেও কুমার-কুমারী অবিবাহিত থেকেছে। এ থেকে তাদের মানসিক জটিলতা এসে গেছে। প্রাগাধুনিক যুগে জীবনের গতিহীনতায় স্বাভাবিক ভাবেই ব্যভিচারাদি প্রশ্রয় পেয়েছে। কুলীন কুমারী এবং শ্রোত্রিয় কুমারের দিক থেকে পরবর্তীকালে তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের সমাজে বিপত্নীকদের মধ্যে অনুরূপ সমস্যাসৃষ্টির অবকাশও কম। কারণ স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিপত্নীকের পুনর্বিবাহে কোনো সামাজিক বাধা ছিলো না। বস্তুতঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ অনুযায়ী এ বিবাহ অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাট ছিলো। এতে পুত্রের অধিকারগত জটিলতার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিলো। বিপত্নীকের পুনর্বিবাহে যেমন সামাজিক বাধা ছিলো না, তেমনি এতে সামাজিক অপ্রতিষ্ঠাও বিশেষ ছিলো না। বিপত্নীকের সমস্যা থেকে দৃষ্টিকোণ সংগঠনের অবকাশ থাকলেও বিধবাবিবাহ বিরোধীর প্রতিক্রিয়ায় সূচিত আন্দোলনের প্রাবল্যে যে দৃষ্টিকোণ জন্মলাভ করে, তার প্রতিষ্ঠাতেই বিপত্নীক সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ম্লান হয়ে পড়ে।

আমাদের সমাজে বেশ্যার যৌন দিক থেকে উৎপন্ন সমস্যা কোনো দৃষ্টিকোণ সূচনা করেনি। বৈশিক, কুট্টনীমতম্, কামসূত্রম্ ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যদিয়ে বেশ্যার যে সমস্যার কথা ব্যক্ত হয়েছে, তা মূলতঃ আর্থিক। প্রথার দিক থেকে বেশ্যাকন্যার যৌন নিরাপত্তার দিক সমাজ চিন্তা করেছে, কিন্তু সমাজের দূষিত ক্ষতস্বরূপ এই সব সমস্যা যথাসম্ভব তুচ্ছ করা হয়েছে নাগরিকদের সমষ্টিগত স্বার্থে। তবে 'চাণক্য-রাজনীতিসারে' বেশ্যাবৃত্তির কষ্টের কথা বলা হয়েছে।—"পরাধীনা নিদ্রা পরপুরুষচিত্তানুসরণং মুদাশূন্যং হাস্যং রুদিতমপি শোকেন রহিতম্। পণে ন্যস্তঃ কায়ঃ করজদশনৈর্ভিন্নবপুষামহো কষ্টা বৃত্তির্জগতি গণিকানাং বহুভয়া॥" মন্তব্যটির মধ্যে সমস্যার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আমাদের সমাজে বেশ্যাসক্তিবিরোধী যে দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে—তা বেশ্যার যৌননিরাপত্তা সমস্যা থেকে জন্ম নেয় নি, জন্ম নিয়েছে দাম্পত্য সমস্যার যৌন এবং আর্থিক দিক থেকে।

দম্পতি-ব্যতিরিক্ত সমাজে আকর্ষণীয় সমস্যা সৃষ্টি করেছে বিধবাবিবাহ নিষেধ প্রথা। বিষ্ণু সংহিতায় ২৫-এর অধ্যায়ে বিধবার কর্তব্য সম্পর্কে বলতে

গিয়ে শাস্ত্রকার বল্‌ছেন,—"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।"[২৭] মনু-সংহিতাতেও বলা হয়েছে,—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছতি অপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥[২৮]

বিধবাদের যৌন দিকটিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করবার জন্যে যে বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে, তা অমানুষিক। কাশীখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে,—

"বিধবা কবরীবন্ধোভর্ত্তৃবন্ধায় জায়তে।
শিরসোবপনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা ॥
একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পক্ষব্রতমথাপি বা ॥
মাসোপবাসং বা কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণমথাপি বা।
কৃচ্ছ্রং পরাকং বা কুর্য্যাত্তপ্ত কৃচ্ছ্রমথাপি বা ॥
যবান্নৈর্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পয়োব্রতৈঃ।
প্রাণযাত্রাং প্রকুর্বীত যাবৎ প্রাণঃ স্বয়ং ব্রজেৎ ॥
পর্য্যঙ্কশায়িণী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
তস্মাদ্ভূশয়নঃ কার্য্যং পতিসৌখ্য সমীহয়া ॥
নৈবাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
গন্ধদ্রব্যস্থ সম্ভোগো নৈব কার্য্যাস্তয়া পুনঃ ॥"[২৯]

বস্তুতঃ সধবাকালে স্বামীর প্রতি সেবা যাতে বৃদ্ধি পায়, খুব সম্ভব সেইজন্যেই বিধবাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা এতো বেশি ছিলো। সমাজে কুমারীর সংখ্যা অল্প না থাকায় এই নির্যাতন থেকে মুক্তির উপায় ছিলো না। বিধিনিষেধজাত নির্যাতন সহনীয় না থাকাতেই সমাজে সংস্কারভঙ্গের প্রতি বিধবাদের মধ্যে অনেকের ঝোঁক জেগেছিলো, যার ফলে ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, বেশ্যাবৃত্তিগ্রহণ, আত্মহত্যা ইত্যাদি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছিলো। বিধবার বিবাহ সম্পর্কে মনুর অমত ছিলো। তাঁর মতে, বিধবাবিবাহের অর্থ—নিয়োগ-ব্যক্তিরেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রসৃষ্টি। তিনি বলেছেন,—

২৭। বিষ্ণুসংহিতা—২৫/১৪।
২৮। মনুসংহিতা—৫/১৬০।
২৯। কাশীখণ্ড—৪/৭৪—৭৯।

"নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্য পরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্তোপদিশ্যতে ॥"[৩০]

নিয়োগের কথা তিনি যে বলেন নি, তা নয়[৩১] কিন্তু নিয়োগ সম্পর্কেই তিনি বলেছেন,—

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥[৩২]

বস্তুতঃ নিয়োগপ্রথা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট অস্বীকৃতিই প্রকাশ করেছেন।—

"ততঃ প্রভৃতি যোমোহাৎপ্রমীত পতিকাং স্ত্রিয়ং ;
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥[৩৩]

পুত্রোৎপাদনেই যৌন সমস্যার সমাধান হয় না ; এবং পুত্রোৎপাদন ও যৌনতৃপ্তি এক নয়। বিধবার সন্তান উৎপাদনার্থে একবার নিয়োগ আরও মর্মান্তিক। এ বিষয়ে সামাজিক নির্দেশ—

"বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥"[৩৪]

পরবর্তীকালে সমাজে বিধবার সমস্যাগত দৃষ্টিকোণ বলিষ্ঠতালাভের কারণ বৈবাহিক দুর্নীতিমূলক প্রথায় বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি।

আমাদের সমাজ আর্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও প্রাগাধুনিক পর্বে সব ক্ষমতা হারিয়ে সম্পূর্ণ স্মৃতিগ্রন্থ নির্ভর হয়ে বেঁচে ছিলো। তাছাড়া এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রয়োগের দিক থেকে নির্বাচনের ক্ষমতাও সমাজপতিরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ক্ষমতার ক্রমচ্যুতিতে দিশাহারা হয়ে তাঁরা সব কিছুই আঁকড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথার দিক থেকে সমস্যা ও দৃষ্টিকোণ আলোচনা করতে গিয়ে তাই স্মৃতিগ্রন্থগুলোর প্রসঙ্গ টান্‌তে হয়েছে।

সামাজিক প্রথার মধ্যে দিয়েই সমাজ সমস্যার রূপগুলো সাধারণতঃ প্রকাশ পায়। তাছাড়া ব্যক্তিক নীতি প্রবণতা কিংবা পারিবারিক বিধিনিষেধ থেকেও

৩০। মনুসংহিতা—৫/১৬২।
৩১। মনুসংহিতা—৯/৬০।
৩২। মনুসংহিতা—৯/৬৫।
৩৩। মনুসংহিতা—৯/৬৮।
৩৪। মনুসংহিতা—৯/৬০।

সমস্যা সৃষ্টি ঘটতে পারে। ব্যক্তিক নীতিগঠনে প্রভাব বিস্তার করে সংসর্গ ও পরিবেশ। অতএব সেদিকের আলোচনার অবকাশ মাত্রানির্ণয়ের ক্ষেত্রে। অবশ্য পারিবারিক বিধিনিষেধের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য যতোই থাকুক, সমাজের বিধিনিষেধের অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পরিবার বাধ্য হয়েছে। বিশেষতঃ আমাদের সমাজের যৌথপরিবারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা চলে। যৌথপরিবারের বিধিনিষেধের চাপে যৌগ্মিক এবং ব্যক্তিক যৌন সমস্যা কতকগুলো দৃষ্টিকোণ সূচনা করেছে।

রাষ্ট্রীয় চাপে সমাজে যৌন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের সমাজে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রত্যক্ষভাবে সমস্যা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু মদ্যপানে প্রশ্রয়, আর্থনীতিক শোষণ ইত্যাদির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সমাজের যৌন সমস্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। প্রাথমিক অনুশাসন-বিরোধী সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শক্তি নিয়োজিত হয়েছে এবং এভাবে অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের অবাধ-সাহচর্য এবং দাম্পত্য-কুসংস্কার-বিরোধী প্রচারে সমাজে অনাচার-ব্যভিচারের বৃদ্ধি ঘটেছে এবং দাম্পত্য ও অদাম্পত্য—দুই দিক থেকেই নূতন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যা থেকে কতকগুলো দৃষ্টিকোণের সন্ধান পাই। কিন্তু এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই সাংস্কৃতিক সংগ্রামে নিয়ন্ত্রিত। অনেকক্ষেত্রে অবকাশস্থানে কাল্পনিক-ভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে সমর্থন-লাভেচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য পূর্বে আলোচিত সামাজিক সমস্যার অভিব্যক্তিও এ ধরনের প্রতিষ্ঠাগত সংগ্রামে নিয়ন্ত্রিত।

২ ॥ **আর্থিক সমস্যা** ॥ সমাজে আয় সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) প্রত্যক্ষ আয় এবং (২) মাধ্যমিক আয়। মাধ্যমিক আয় আবার পাঁচ প্রকার—(ক) চুক্তিমূলক, (খ) প্রতিগ্রহ-মূলক, (গ) প্রতারণা-মূলক, (ঘ) বলাৎকার-মূলক এবং (ঙ) চৌর্যমূলক। মাধ্যমিক আয়নীতিতে প্রথম দুটি নীতিই সমাজে স্বীকৃত। তবে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় বা সামাজিক অবস্থার চাপে অন্যান্য আয়নীতি পরিমিত মাত্রায় সমাজে স্বীকৃতিলাভ করেছে। অবশ্য যেক্ষেত্রে মাত্রা অতিবর্তন করেছে সেখানে দৃষ্টিকোণের সূচনা ঘটেছে। তবে সাধারণভাবে শেষের তিন প্রকার আয় ধর্মোচিত নয়। এ ধরনের আয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্রকার উচ্চারিত করেছেন,—"পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।[৩৫]

৩৫। মনু-সংহিতা—৪/১৭৬।

দ্বৈতীয়িক আয়নীতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আমাদের সমাজে একদা অধিকার-অনধিকারগত আয়ের প্রশ্ন ছিলো—বৃত্তির দিক থেকে। মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময় থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দন পর্যন্ত স্মৃতিকাররা অনেকেই চাতুর্বর্ণ্য বৃত্তি বিভাগের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। মনু বিভিন্ন বর্ণের বৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৬] তবুও বৃত্তি বিপর্যয়ের ভয় এঁদের যথেষ্ট ছিলো। তাই অত্রি সংহিতায় দণ্ডের ভয় দেখাতে স্মৃতিকাররা ছাড়েন নি। সেখানে বলা হয়েছে,—

> "ম৯য়ৈষ ধর্মোঽভিহিতঃ সংস্থিতা যত্র বর্ণিনঃ।
> বহুমানমিহ প্রাপ্য প্রযান্তি পরমাং গতিম্॥
> যে ত্যক্তারঃ স্বধর্মস্থ পরধর্মে ব্যবস্থিতাঃ।
> তেষাং শাস্তি করো রাজা স্বর্গ লোকে মহীয়তে॥
> আত্মীয়ে সংস্থিতো ধর্মে শূদ্রোঽপি স্বর্গমশ্নুতে।
> পরধর্মো ভবেত্ত্যাজ্যঃ সুরূপ পরদারবৎ॥[৩৭]

বৃত্তি বিরোধী আয় আমাদের সমাজে নিন্দনীয় ছিলো। শ্রম বিভাগ যাতে ভারসাম্য না হারায় সেই চেষ্টায় সম্ভবতঃ এটা করা হয়েছিলো। এঁদের ধারণা ছিলো, প্রত্যেক গোষ্ঠীর ব্যক্তি সমপরিমাণ সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং সাংস্কারিক, প্রাতিষ্ঠিক, প্রাতিভবিক এবং ঔৎপাদনিক শ্রমও সমপরিমাণে উৎপাদনে সক্ষম। এঁরা অর্থ বণ্টন সাম্যের দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করেন নি। কারণ বিশেষ বৃত্তির অর্থ সঞ্চয়ের পরিমিতির নির্দেশও দিয়েছেন।[৩৮]

আয়ের অধিকার অনধিকারগত নির্দেশ অন্ততঃ বর্ণ বা বৃত্তির দিক থেকে সম্পূর্ণ অবাস্তব। "জীবন ধারণের হেতু" আয়ের প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন স্মৃতিকার।—

> বিদ্যা শিল্প ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
> ধৃতি ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন হেতব॥[৩৯]

৩৬। মনু-সংহিতা—১/৮৮—৯১।

৩৭। অত্রি-সংহিতা—১৬—১৮।

৩৮। মনু-সংহিতা—১০/১২৯।

৩৯। মনু-সংহিতা—১০/১১৬।

কুসীদ জীবিকা ইত্যাদি হেয় বৃত্তি উচ্চ বর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেও একই স্মৃতিকার আবার বলেছেন,—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রয়োজয়েৎ।
কামন্তু খলু ধর্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেহল্পিকাং ॥[৪০]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দ্বৈতীয়িক আয়নীতিতে এ ধরনের নির্দেশ ব্যাবহারিক দিক থেকে বিশুদ্ধভাবে মেনে চলা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তবুও বংশগত বর্ণাধিকারপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি-আকর্ষক বৃত্তি-বিপর্যয় সমাজে সাধারণভাবেও অননুমোদিত ছিলো। বিদেশী শাসনতন্ত্রের বৈকল্পিক আশ্রয়-স্থানের উদ্ভবে আমাদের পূর্বতন সমাজ কাঠামো ধ্বসে পড়ায় বিশেষ করে হিন্দু সমাজে পূর্বোক্ত দ্বৈতীয়িক আয়নীতি মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায় এবং যদিও এক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে, তা সাংস্কৃতিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু বৃত্তিভেদে নয়, লিঙ্গ ভেদে বা বয়স ভেদেও দ্বৈতীয়িক আয়নীতির প্রতিষ্ঠা—কিন্তু বিশেষ করে লিঙ্গভেদে আয়নীতি সম্পর্কিত যে দৃষ্টিকোণ তাও সাংস্কৃতিক দিকটির আনুকূল্যে পুষ্ট।

সাধারণভাবে সমাজের আয়নীতি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বৃত্তিগত এবং (খ) ব্যক্তিগত। আমাদের সমাজের বৃত্তিগত আয়নীতির বিবর্তন সম্পর্কেও কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক যদিও চাতুর্বর্ণিক বিভাগের দিক থেকে আলোচনা করা অবৈজ্ঞানিকোচিত। কারণ প্রথমতঃ আমাদের সমাজ এবং হিন্দু সমাজ একার্থবাচক নয়। দ্বিতীয়তঃ তথাকথিত হিন্দুরা সকলেই চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে পড়ে না। এবং তৃতীয়তঃ বা প্রধানতঃ বর্ণোচিত জীবিকা সর্বত্র অনুসরণ করা হয় নি। অতএব আয়নীতি বৃত্তিগত দিক থেকে আলোচনা করতে গেলে আধুনিক বৃত্তি বিভাগ অনুসরণে পদক্ষেপ করাই বিধেয়। আমাদের দেশের বর্ণ ও বৃত্তি আধুনিক বিভাগ অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে স্থান গ্রহণ করে।

(ক) সাংস্কারিক শ্রমজীবী।—সাধারণভাবে 'ব্রাহ্মণ' নামে আমাদের সমাজে আখ্যাত গোষ্ঠী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া অহিন্দু সমাজে সাংস্কারিক গোষ্ঠীও এর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) প্রাতিষ্ঠিক শ্রমজীবী।—এরা সাধারণতঃ দুই গোষ্ঠীতে পড়ে, কায়িক

৪০। মনু-সংহিতা—১০/১১৭।

এবং বৌদ্ধিক। প্রত্যেক গোষ্ঠীতে আবার ব্যাবহারিক—অতিব্যাবহারিক ভেদ আছে। যারা বেতনভোগী, তারা ব্যাবহারিক এবং যারা তাদের পারিশ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজে লাভ করে, তারা অতিব্যাবহারিক গোত্রে পড়ে। কায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র। তবে অতিব্যাবহারিক গোষ্ঠীতেই ক্ষত্রিয়ের সাধারণ অবস্থান সূচিত হতো। দাস শ্রেণীর কায়িক সেবক অন্য গোত্রীয় হলেও প্রাতিষ্ঠিক গোত্রের মধ্যেই ব্যাবহারিক শ্রেণীতে পড়ে। তেমনি আবার বৌদ্ধিক শ্রেণীর ব্যাবহারিক দিকে পড়ে করণিক ইত্যাদি এবং অতি ব্যাবহারিক দিকে পড়ে ব্যবহারজীবী, বৈদ্য (অম্বষ্ঠ)—ইত্যাদি সম্প্রদায়।

(গ) প্রাতিভবিক শ্রমজীবী।—চাতুর্বর্ণ্য কাঠামোর বৈশ্য শাখার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই বৃত্তিভুক্ত। তাছাড়া চতুর্বর্ণ বহির্ভূত সমাজের ব্যবসায়ীরাও এই শাখাতে পড়ে।

(ঘ) ঔৎপাদনিক শ্রমজীবী।—পূর্বোক্ত বৈশ্য শাখার দ্রব্যোৎপাদনিক গোষ্ঠী এই বৃত্তিভুক্ত। তাছাড়া চতুর্বর্ণ বহির্ভূত সমাজের দ্রব্যোৎপাদনিক শাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। ভূমিজ, প্রাণিজ, বৃক্ষজ ইত্যাদি দ্রব্য অঙ্গ বা যন্ত্রের মাধ্যমে যে গোষ্ঠী ব্যবহারোপযোগীভাবে উৎপাদন করে, তাদের এই গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায়।

চুক্তিমূলক আয়নীতিতেই বিভিন্ন বৃত্তি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা। আমাদের সমাজে ঔৎপাদনিক তথা বৈশ্য শাখার গ্রহণীয় বৃত্তি অন্যান্য বর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষণার মধ্যে দিয়েই একদিক থেকে সামাজিক চুক্তির মূল্য দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অবশ্য সন্ন্যাসী এবং অক্ষমদের প্রতিগ্রহমূলক আয়ের ব্যবস্থা সমাজ করেছে। প্রাচীন সমাজে সাংস্কারিক গোষ্ঠীর অর্থাগম আপাতদৃষ্টিতে প্রতিগ্রহ-মূলক বলে অনুভূত হয়, কিন্তু তা দক্ষিণা তথা বেতনেরই নামান্তর। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর বৃত্তি সম্পর্কে মনু-সংহিতায় বলা হয়েছে,—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়েৎ ॥[৪১]

অর্থাৎ সাংস্কারিকদের অর্থাগমের উপায় ছিলো দক্ষিণা ও দান প্রতিগ্রহ।

"ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎস্থ বিবিক্তেষু প্রেতস্বর্গ সমশ্নুতে ॥[৪২]

৪১। মনুসংহিতা—১/৮৮।
৪২। মনুসংহিতা—১১/৬।

অবশ্য প্রতিগ্রহের সীমা-নির্দেশও ছিলো।৪৩ আমাদের সমাজে অহিন্দু সম্প্রদায়ের সাংস্কারিক বৃত্তিগ্রাহী গোষ্ঠীর অর্থাগমও অনুরূপ পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর প্রতিগ্রহমূলক যে ব্যবস্থা ছিলো, তার কারণ প্রত্যক্ষ আয়ে সাংস্কারিক চর্চায় বিঘ্ন আসা স্বাভাবিক ছিলো।

কালক্রমে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মের প্রচারে বিশেষ বিশেষ সাংস্কারিক গোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্বশীল জনসাধারণের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। এই সঙ্কট অবস্থায় সাংস্কারিকদের পক্ষ থেকে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করে আচার পালনের দিকে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে তেমনি আচার সর্বস্ব ক্ষমতাহীন সমাজে প্রতিষ্ঠাগত দিক থেকে বলাৎকারের সাহায্যে অর্থাগমের প্রচেষ্টা চলেছে। এই অবস্থায় সাংস্কারিক গোষ্ঠী অর্থের বিনিময়ে অস্মার্ত বিধান দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। আবার তেমনি পাতিত্যের ভীতি প্রদর্শনে অর্থাগম প্রচেষ্টাতেও পশ্চাৎপদ হন নি। প্রাগাধুনিক সমাজে হৃতসর্বস্ব সমাজপতিরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা-সম্পৃক্ত ভাবপ্রবণতা জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তার অন্যতম ফল কৌলীন্যপ্রথা ও বিবাহ ব্যবসায়। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর এই আয়গুলো অসামাজিক এবং অননুমোদিত হলেও প্রথাসিদ্ধ হওয়ায় এবং হৃতসর্বস্ব গতিহীন সমাজ-সভ্যের আনুকূল্যে ক্রমেই ভয়াবহরূপ ধারণ করেছিলো। বিশেষ করে সমাজের প্রতি যাদের দুর্বলতা ছিলো, তারাই ছিলো সাংস্কারিক গোষ্ঠীর বড়ো শিকার। একদা যা ছিলো দক্ষিণা বা দান তথা চুক্তিমূলক বা প্রতিগ্রহমূলক আয় তা ক্রমে ক্রমে প্রতারণা মূলক ও বলাৎকারমূলক আয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ সাংস্কারিকদের এ ধরনের আয় সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদ প্রচলনের ফলে দৈবনির্ভর সংস্কার সমাজে নিষ্প্রভ হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আচার পালনের নিষ্ঠা একদিকে যেমন কমে এসেছে, তেমনি বলাৎকারমূলক আয়ও ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে পরিণতিলাভ করেছে। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর যে অধ্যাপন রীতির প্রচলন ছিলো তার বৈষয়িক মূল্য না থাকায় মূল্যহীনভাবে পরিত্যক্ত হলো। অধ্যাপন রীতিও অবশ্য শেষের দিকে অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। নতুন সাংস্কারিক গোষ্ঠীর

৪৩। মনুসংহিতা—৪/১৮৬।

অর্থকরী বিদ্যার অধ্যাপনে পুরোনো সাংস্কারিক দলের সর্বাত্মক পরাজয় সূচিত হলো। পুরোনো সাংস্কারিক গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকই পুরোনো বৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। উপায়ান্তরহীন সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা জীবিকার জন্যে প্রাচীন সমাজ বন্ধনে বিশ্বাসী রক্ষণশীল সমাজ-সভ্যের সন্ধান করতে লাগলো। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর পুরোনো বৃত্তি জড়িত আয়নীতি এভাবে পরিত্যক্ত হলো। নতুন সাংস্কারিক গোষ্ঠীর আয়নীতি সম্পর্কে অবশ্য দৃষ্টিকোণ সূচিত হয় নি তা নয়, তবে তার মূলে ছিলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত বিরোধ।

আমাদের সমাজে প্রাতিষ্ঠিকদের মধ্যে অতিব্যাবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর সম্মান যথেষ্ট ছিলো এবং সাংস্কারিক গোষ্ঠীর পরেই উক্ত গোষ্ঠী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের স্থান থাকায় আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, প্রাচীন সমাজে প্রাতিষ্ঠিক শাখার অতিব্যাবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর আয়নীতির মধ্যে চুক্তিমূলকতা থাকলেও প্রাতিষ্ঠিকদের স্বার্থ সেখানে বেশি রক্ষিত হতো। প্রাচীন রাজতন্ত্র অনুযায়ী রাজা ছিলেন প্রাতিষ্ঠিক শাখার অতিব্যাবহারিক কায়িক গোষ্ঠির অধিপতি। সমাজে এই গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি থাকায় এই অধিপতিই সমাজের অধিপতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। স্বয়ং রাজাকেও চুক্তি মেনে চলতে হতো। স্মৃতিকার বলেছেন যে, প্রজারঞ্জনই রাজার ধর্ম—উৎপীডন নয়। যে রাজা সামরিক শক্তি দ্বারা প্রজার স্বার্থের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেন অথচ কর আদায় করেন, তিনি নরকগামী হন।—

"যোঽরক্ষন্ বলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ॥"[৪৪]

আবার রাজার আপৎকালীন করগ্রহণ প্রাচীন সমাজে স্বীকৃত ছিলো।[৪৫] রাজার আয় ছিলো সমাহর্তার মাধ্যমে সাত দিক থেকে—(ক) দুর্গ (খ) রাষ্ট্র (গ) খনি (ঘ) সেতু (ঙ) বন (চ) ব্রজ (ছ) বণিক্ পথ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষপ্রচারে এই সমস্ত আয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো দেখানো হয়েছে।[৪৬] রাজার অনুচর যুদ্ধোপজীবী প্রাতিষ্ঠিকদের আয় রাজপ্রদত্ত বেতন থেকেই আসতো। তাছাড়া তাদের কিছু বলাৎকার রাজনীতিতে অনুমোদিত

৪৪। মনুসংহিতা—৮/৩০৭।

৪৫। "কোশমকোশঃ প্রত্যুৎপন্নার্থকৃচ্ছ্রঃ সংগৃহ্ণীয়াৎ"—অর্থশাস্ত্র ৫।২।

৪৬। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—অধ্যক্ষ প্রচার—২৪শ প্রকরণ।

ছিলো। তবে তার মাত্রা ছিলো। কারণ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রেই "যুক্ত" দ্বারা অপহৃত সমুদায় প্রত্যানয়ন প্রসঙ্গে "যুক্ত প্রতিষেধ" নামে একটি উপায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। "যুক্ত"-দের ধনাপহরণ অনেক সময় মাত্রা অতিক্রম করতো—এর থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৭] অতিব্যাবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক রাজ-নিযুক্ত অথবা অনিয়োজিত—দুইই হতে পারে। শেষোক্ত দলের (যেমন দস্যু ইত্যাদি দল) স্বীকৃতি সমাজে কোনোকালেই নেই। বলা বাহুল্য, বলাৎকার মূলক আয়ই এদের লক্ষ্য ছিলো। দেশীয় রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অতিব্যাবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক দলের সামাজিক মান নীচে নেমে যায়। এদের অনেকেরই পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় ব্যাবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক দল—তথা শূদ্র জাতীয় অর্থাৎ অনুচর ইত্যাদি জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গীভবনে। আমাদের সমাজে বিদেশী শাসনতন্ত্রের পত্তনে এই বেতনভোগী কায়িক প্রাতিষ্ঠিক দলের অনেকে যথারীতি পূর্ব বৃত্তি গ্রহণ করেছে এবং অনেকে বৃত্তি ত্যাগ করেছে। আমাদের প্রাগাধুনিক সমাজে এই ধরনের কায়িক প্রাতিষ্ঠিক দলের বেতনাতিরিক্ত বলাৎকারমূলক আয় এবং প্রতারণামূলক আয় বলবৎ থেকে প্রকারান্তরে প্রাচীন ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তবে প্রত্যক্ষ বলাৎকার অনেকক্ষেত্রে প্রতারণার মধ্যেও আত্মগোপন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর পুলিশের দুর্নীতির প্রতি যে দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে তার ভিত্তি অনাধুনিককালে গ্রথিত।

ব্যাবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিকদের আয় মূলতঃ চুক্তিমূলক কিন্তু এই চুক্তিতে তাদের কার্য উপেক্ষিত। এই গোত্রীয় ব্যক্তিদের প্রাচীনকালে সমাজে শূদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদের বৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,—

> "একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
> এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥[৪৮]

ব্যাবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিকরা আয়ের দিক থেকে অনেকটাই ছিলো কৃপার পাত্র। ভট্ট মেধাতিথি এ বিষয়ে লিখেছেন,—প্রভুঃ প্রজাপতিরেকং কর্ম শূদ্রস্যাদিষ্টবান্ এতেষাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যানাং শুশ্রূষা ত্বয়া কর্তব্যাচন-সূয়া অনিন্দয়া চিত্তেনাপি তদুপরি বিষাদো ন কর্তব্যঃ। শুশ্রূষা পরিচর্য্যা

৪৭। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—অধ্যক্ষ প্রচার—২৬ প্রকরণ।

৪৮। মনুসংহিতা—১/৯১।

তদুপযোগিকর্ম্মকরণং শরীর সংবাহনাদি চিন্তানুপালনম্। এতদ্দৃষ্টার্থং শূদ্রস্য অবিধায়কত্বাচ্চৈকমেবেতি ন দানাদয়ো নিষিধ্যন্তে। বিধিরেষাং কর্ম্মণামুক্তরত্র ভবিষ্যতি অতঃ স্বরূপ বিভাগেন যা গাদীনাং তত্রৈব দর্শায়িষ্যামঃ ॥[৪৯] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যাবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিকদের আয়ে বলাৎকারের অবকাশ ছিলো না। এর কারণ শ্রমিক সঙ্ঘের সামাজিক স্বীকৃতি তো ছিলো না, এমন কি তাদের অর্থ সঞ্চয় ও বিলাসিতাও নিষিদ্ধ ছিলো।—

"শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণেন বাধতে ॥[৫০]

অতএব শূদ্রের আয় ছিলো সঙ্কীর্ণস্বার্থ চুক্তিমূলক। প্রতিগ্রহমূলক আয়ের ক্ষেত্র অবশ্য এই বৃত্তিতে ছিলো। কিন্তু চৌর্য এবং প্রতারণামূলক আয়নীতির প্রয়োগ এই গোষ্ঠীর দ্বারা অনেকক্ষেত্রে স্ফীত হয়েছে। এই গোষ্ঠীর সম্যক নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নেই বলে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক দৃষ্টিকোণের জন্ম হয় নি। তবে সেবা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক দিকে দৃষ্টিকোণের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। ব্যাবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর সেবার মূলে যে চুক্তি, তাতে "অর্থদূষণ" সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ প্রাচীন। পরবর্তীকালে সেবক সঙ্ঘের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

অতিব্যাবহারিক বৌদ্ধিক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে বৈদ্য, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি বৃত্তিধারী ব্যক্তিসমূহ। অনেকের মতে বৈদ্য—অতিব্যাবহারিক কায়িক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক দলেরই সম্প্রদায় ভেদ। কিন্তু অম্বষ্ঠের জননগত রূপক পূর্বোক্ত মতেরই পোষক। চুক্তির ওপরেই এদের জীবিকা নির্বাহ হতো। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের রচনা অর্বাক্তন-কালের হলেও, অম্বষ্ঠের মান সাংস্কারিক সম্প্রদায়ের পরে থাকায়, দেখা যায়—সমাজ এদের আয়নীতি সম্পর্কে অনুকূল ছিলো না। অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য ছাড়াও অতিব্যাবহারিক বৌদ্ধিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার অস্তিত্ব ছিলো। আমাদের সমাজে আগে জীবিকা সম্পর্কিত জটিলতা ছিলো না—তা নয়; তবে কোথাও উপযুক্ত প্রমাণের অভাব কোথাও বা বিশেষ ক্ষেত্রেরই একমাত্র উপস্থিতি—ইত্যাদি নানা কারণে অতিব্যাবহারিক বৌদ্ধিক শাখার বিভিন্ন জীবিকা সম্পর্কে

৪৯। মনু ভাষ্য—১/৩৯।
৫০। মনুসংহিতা—১০/১২৯।

স্পষ্ট বিন্যাস সম্ভবপর নয়। পরবর্তীকালে ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে জীবনসংগ্রামের জটিলতা বৃদ্ধিতে। এদের জীবিকা ছিলো স্বাধীন, এবং আয় ছিলো চুক্তিমূলক। কিন্তু সাধারণের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার সুযোগে প্রতারণামূলক ও বলাৎকারমূলক আয়নীতি এদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাংস্কারিক এবং বৌদ্ধিক শাখার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণের তীব্রতাই সাধারণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঔৎপাদনিক, প্রাতিবিক এবং কায়িক (প্রাতিষ্ঠিক) দিক থেকে সাধারণের ব্যাপক অপসারণে বৃত্তিগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় সাংস্কৃতিক দিক থেকে দৃষ্টিকোণের সূচনাও অবশ্য হয়েছিলো। তবে আয়নীতির দিক থেকে চুক্তিমূলক আয়নীতির বিচ্যুতিই এই সমস্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠন করেছিলো।

ব্যাবহারিক বৌদ্ধিক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক শাখার মধ্যে আছে করণিক শ্রেণী বা করণ; এবং অতিব্যাবহারিক বৌদ্ধিক গোত্রীয় প্রাতিষ্ঠিক শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা বেতনভোগী—তাঁরাও এই গোষ্ঠীর মধ্যেই পড়েন। এঁরা রাষ্ট্র, সংস্থা, কিংবা ব্যক্তির প্রদত্ত বেতন ভোগ করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর লিপি-গুলোর মধ্যে "প্রথম কায়স্থ শাম্বপাল," "করণ কায়স্থ নরদত্ত", "কায়স্থ প্রভুচন্দ্র" ইত্যাদি ব্যক্তির সবিশেষ নাম পাই। এঁরা সকলেই ছিলেন রাজকর্মচারী।[৫১] রাজতন্ত্রের যুগে রাজনিযুক্ত পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাক্‌লেও এই শ্রেণীর নিয়োগ বা সংস্থা দ্বারাও সংঘটিত হতো সেটা অনুমান করা যায়। প্রাগাধুনিক সমাজে বিদেশী শাসনতন্ত্রের যুগেও একই ধরনের করণিক ইত্যাদি শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং গত শতাব্দীতে আর্থিক দিক থেকে করণিক বা বেতন-ভোগী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে, তার মূলে ঐতিহ্য অস্বীকার করা যায় না। ব্যাবহারিক সম্প্রদায়ের (কায়িক ও বৌদ্ধিক) আয়নীতির প্রতারণামূক, চৌর্যমূলক, সম্মান হানিকর প্রতিগ্রহমূলক আয়নীতির বিরুদ্ধে প্রাহসনিক লক্ষ্য সূচিত হয়েছে।

ইংরেজ আমলের সুরুতেই সামান্য কিছু ইংরেজী বিদ্যা সম্বল করে ইংরেজ শাসনের সেরেস্তায় ও ব্যবসাবাণিজ্যে একদল লোক চাকরী নিয়ে ঢুক্‌তে আরম্ভ করেছিলো। এরা ছিলো করণিক। ইংরেজরা এদের নতুন নাম দিলো

৫১। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—পৃঃ ২৭৬।

"বাবু"। এখনো তাদের অভিধানে বাবু অর্থ অল্পশিক্ষিত কেরাণী। এদের আয়নীতি চুক্তিমূলক হলেও এদের স্বার্থ ছিলো অনেকটাই উপেক্ষিত। রামমোহন রায়ের প্রতিবাদে অবশ্য এদেশে দায়িত্বপূর্ণ করণিক শাখারও পত্তন হলো। এতেও আয়নীতি অনুরূপই রইলো অর্থাৎ ইংরেজরা যে সব চাকরীতে বিলেত থেকে মোটা মাইনে দিয়ে লোক আনতে বাধ্য হতো, সেসব ক্ষেত্রে অল্প মাইনেতে উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলো। ইংরেজরা এভাবে স্বাধীন অর্থনীতি থেকে বাঙালীদের সরিয়ে এনেছিলো। এই বাবু বা কেরাণীদের মধ্যে সম্মান হানিকর চুক্তিমূলক আয়নীতি এবং দৌর্নীতিক আয়নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে। এই সময়ে সরকারী করণিক ছাড়া বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তি নিয়োজিত হয়েও এই বৃত্তি গৃহীত হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টিকোণ লক্ষিত হয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে প্রাতিভবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ছিলো। একটি সংস্কৃত প্রবচন আছে—"নাস্ত্যচৌরঃ···বণিগ্‌জনঃ।" এর থেকে বোঝা যায় চৌর্যমূলক আয় প্রাতিভবিক সমাজে ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলো। "অচৌর" প্রসঙ্গে "চৌর" অর্থে অবশ্য প্রতারণামূলক এবং চৌর্যমূলক —উভয় আয়নীতিরই অনুসরণকারী বোঝানো হয়েছে। বৈশ্যদের বৃত্তিসম্পর্কে বলা হয়েছে,—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥[৫২]

উক্ত উক্তি সম্পর্কে পুনরায় বলা হয়েছে,—

ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন॥
মণিমুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্॥
বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্র দোষগুণস্য চ।
মান যোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনং॥

৫২। মনুসংহিতা—১/৯০।

ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥
ধর্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদযত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ॥[৫৩]

আমাদের সমাজে প্রাতিভবিক এবং উৎপাদনিক সম্প্রদায়কে একত্রে বৈশ্য-সম্প্রদায় নামে চিহ্নিত করা হলেও আমাদের সমাজে ব্যবসায়ী বৈশ্যসম্প্রদায়ের প্রাচীনকালে অর্থোপার্জন-উপায় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। বৈশ্য-সম্প্রদায়ের বৃত্তিও সমাজে প্রকৃতপক্ষে চুক্তিমূলকতার মধ্যেই আবির্ভূত হয়। দ্রব্যবিস্তার বা দ্রব্যবণ্টন কিংবা অবিস্তার বা অর্থবণ্টনে চুক্তি অনুযায়ী যে প্রাপ্য তা দ্রব্য বা অর্থের ওপর 'লাভ' হিসেবে স্বীকৃত। এই আয়নীতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে প্রাতিভবিক সত্তার ওপর ন্যস্ত ছিলো বলে বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি সহজেই চুক্তিমূলক আয়নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটে। সাধারণ চুক্তিমূলকতায় স্বার্থসাম্য থাকে। লাভ থেকে আয়নীতির বিবর্তনের যুগে লাভের স্বাভাবিক গতি। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে অন্যক্ষেত্রে লাভের বিভিন্ন বিঘ্ন-উৎপাদকের উল্লেখ করেছেন।[৫৪] এগুলোর মধ্যে এমন কতকগুলো বিঘ্ন-উৎপাদক বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করি, যা প্রকৃতপক্ষে মানবিক গুণ বলা যেতে পারে। অতএব লাভেচ্ছা থেকে আমাদের সমাজে চৌর্যমূলক, প্রতারণামূলক, এবং বলাৎকারমূলক আয়নীতির সূত্রপাত ও পোষণ হয়েছে। সমাজ ব্যবসায়ী বৈশ্য সমাজের মুনাফার স্বীকৃতি দিলেও এর মাত্রাতিরেক সমাজে দৃষ্টিকোণের জন্ম দেয়।

প্রাচীন বৈশ্য সমাজের আয়নীতি সম্পর্কে বিধিনিষেধ আমাদের স্মৃতিগ্রন্থে খুব স্পষ্ট নয়। তবে সাধারণভাবে অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণ নিষিদ্ধই ঘোষণা করা হয়েছে। বিষ্ণু সংহিতায় বলা হয়েছে,—

আর্জবং লোভশূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজনং।
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম সামান্য উচ্যতে॥

সব বর্ণেরই পালনীয় হিসেবে এই উক্তি বৈশ্য সম্প্রদায় সম্পর্কেও প্রযোজ্য—বলা বাহুল্য।

৫৩। মনুসংহিতা—৯/৩২৮/৩৩।

৫৪। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—অভিযাস্যৎ কর্ম—চতুর্থ অধ্যায়—১৪২ তম প্রকরণ।

অর্থনীতি জগতের পরিবেশ বিশিষ্টতায় প্রাতিভবিক সম্প্রদায়ের আয়নীতির মাত্রা নির্ধারিত হয়। প্রাক্ শিল্প-বিপ্লব যুগে অর্থাৎ কৃষি ও কুটীরশিল্পের যুগে আমাদের আর্থনীতিক সংস্থা ছিলো গ্রাম-কেন্দ্রিক। প্রত্যেকটি পরিবার ছিলো এক একটি আর্থনীতিক unit। সে সময়ে আমাদের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন ছিলো কৃষি,—তাই কৃষির অর্থনীতিই ছিলো সে-যুগের অর্থনীতি। কৃষিকাজের অবসরে তারা কুটীর শিল্পে শ্রম নিযোগ করতো।[৫৫] ইসলামী যুগে আমাদের দেশে বিদেশী বণিকরা এসেছে. কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমাদের দেশের কুটিরশিল্প ক্রয় করে বিদেশে চড়া দামে বিক্রী করা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ছিলো আমাদেরই সমাজের বণিকদের মধ্যে। তাছাড়া সরকারী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ কড়া হারে শুল্কের প্রতিবন্ধকতায় বিদেশী বণিকরা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে আঘাত হানতে পারেনি। কিন্তু তারা বাণিজ্য চালিয়েছিলো কারণ আমাদের দেশে অর্থ সাধারণতঃ তহবিলে সঞ্চিত হতো এবং সাধারণতঃ লোক-আয়ত্তের বাইরে (out of circulation) থাকায় আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কম থাকতো। এই সময় তাদের দৃষ্টি পড়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের দিকে। এদিকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শক্তিকে তুচ্ছ করে দাঁড়িয়েছিলো আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে স্ফীতবিত্ত প্রাতিভবিক সম্প্রদায়। এই অবস্থায় সামন্তরা বুঝেছিলেন যে জমিদারীতে অর্থাগম বাণিজ্যে অর্থাগমের তুলনায় কিছুই নয়, তাই দেশীয় শেঠদের এতো প্রতিপত্তি।

পরবর্তীকালে বণিক ইংরেজদের রাজ্যাধিকারে দেশীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। যে কয়জন প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁদের খেতাব দিয়ে, সম্মান দিয়ে জমিদার হিসেবে বিলাসী ভাবাপন্ন করে তুললেন। বলা বাহুল্য প্রাতিভবিক সত্তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কের পার্থক্য বিশেষ হয় নি। দেশীয় প্রাতিভবিক সত্তার লাভনীতির মাত্রা শুধু বিদেশীয় তথা রাষ্ট্রীয় বণিকদের লাভনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অতএব মাত্রাতিরেক থেকেই প্রধানতঃ দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন বণিক-গোষ্ঠীর স্বার্থসংঘর্ষ সম্পর্কে যে দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব আমরা পাই, তা রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠাগত পথেই প্রযোজ্য হয়েছে।

৫৫ । History of the Military transaction of the British Nation in Indosthan —Robert Orme—Vol. II, P. 4.

প্রাতিভবিক সম্প্রদায়ের আয়নীতির বিবর্তন প্রসঙ্গে, বিশেষতঃ প্রাতিভবিক ক্ষেত্রেই পরিবেশ আলোচনার সার্থকতা এই যে বিদেশী শাসন নিয়ন্ত্রিত দেশীয় সমাজের আর্থনীতিক পরিবেশের চিত্রের সাহায্যে প্রাতিভবিক সম্প্রদায়ের লাভ-নীতির মাত্রাবোধের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে।

আমাদের সমাজে ঔৎপাদনিক সম্প্রদায়কেও বৈশ্য সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করা হয়েছে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সমাজে দ্রব্যোৎপাদনের সঙ্গে দ্রব্য বিস্তার ও বণ্টনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিলো বলেই সম্ভবতঃ এদেশীয় স্মৃতিকাররা ঔৎপাদনিক এবং প্রাতিভবিক উভয় সম্প্রদায়কেই বৈশ্য নামে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের দেশে ভূমিজ, প্রাণিজ, বৃক্ষজ ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদন বহু প্রাচীন-কাল থেকেই ব্যাপকভাবে সংঘটিত হতো। প্রত্যক্ষ প্রাতিভবিকের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় আয়নীতির ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে যে আয়নীতির অস্তিত্ব ছিলো, তা চুক্তিমূলক অবশ্যই ছিলো; তবে ঔৎপাদনিক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রশ্ন প্রাতিভবিক চাপে ঢাকা পড়ে গেছে। বস্তুতঃ ঔৎপাদনিক সম্প্রদায় যেক্ষেত্রে অতিব্যাবহারিক হয়েছে, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রাতিভবিক বৃত্তি গ্রহণ করেছে। আবার যখন ব্যাবহারিক হয়ে পড়েছে, তখন প্রাতিষ্ঠিক সম্প্রদায়ের ব্যাবহারিক কায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই। তাই আধুনিক সমাজে উপাদানগতভাবে ঔৎপাদনিক সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিলেও তার ব্যাবহারিক কোনো মূল্য নেই। তাই এই সত্তাকে প্রাচীন সমাজ প্রাতিভবিকদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। অবশ্য তাঁদের দৃষ্টি একদেশদর্শী, কারণ প্রাতিষ্ঠিক গোষ্ঠীর সঙ্গেও এদের সংযুক্তির অবকাশ যথেষ্ট আছে। এক কথায়, আমাদের সমাজে এদের আয়নীতি প্রকারান্তরে প্রাতিভবিক এবং প্রাতিষ্ঠিকদের আয়নীতি। অতএব ঔৎপাদনিক সম্প্রদায়ের আয়নীতি সম্পর্কে পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ বৃত্তিগত আয়নীতির ওপর ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। আমাদের সমাজে ধর্ম ও সমাজ অনেকটা একার্থক হয়ে পড়েছিলো। তাই ধর্মীয় প্রথার প্রভাব এবং সামাজিক প্রথার প্রভাবকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা যায় না। আয়নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথার সম্পর্কে কিছু পরিচয় প্রদান আবশ্যক।

এগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে—যৌথ পরিবার প্রথা, স্ত্রীলোকের আয় সম্পর্কিত প্রথা এবং প্রতিগ্রহমূলক আয়ের স্বীকৃতি।

আমাদের সমাজ ছিলো মূলতঃ কৃষিপ্রধান। ভূম্যাধিকার প্রথা ও কৃষিজাত আয়ের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার প্রথা ছিলো উপযোগী। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য আয়ের মধ্যে চাকুরী ইত্যাদি আয়ের পথ প্রধান হয়ে ওঠায়, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা সম্পূর্ণ অচল হয়ে ওঠে। যৌথ পরিবারে আয়কের দায়িত্ব আর্থনীতিক এবং সামাজিক—দুদিক থেকেই। প্রথার চাপে বিশেষতঃ এই ধরনের আর্থনীতিক দায়িত্ব স্বীকৃত হওয়ায় এই সমস্ত পরিবারের মধ্যে প্রাপ্তযোগ্যতা বেকার পরিবার সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই চাপ ব্যক্তিগত তথা বৃত্তিগত আয়নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

আমাদের সমাজে ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকের ব্যবহারিক (বৌদ্ধিক বা কায়িক) বৃত্তিগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিলো। যে-কারণে যৌথপরিবার প্রথা সমাজে অনুকূল ছিলো, সেই একই কারণে স্ত্রীলোকের জীবিকা গ্রহণের ওপর চাপ পড়ে নি। তাছাড়া এতে যৌন নিরাপত্তার অভাবই ছিলো একটা প্রধান কারণ। যে আর্থনীতিক চাপে সমাজে ভদ্রেতর স্ত্রীসমাজে জীবিকা গ্রহণের রীতি ছিলো, তা উচ্চ সমাজে ততোটা ছিলো না। তাছাড়া যৌন সংস্কার ভদ্রেতর স্ত্রীসমাজে ততো প্রখরও ছিলো না। যা হোক আমাদের সমাজে পারিবারিক শ্রমের চুক্তির মধ্যেই স্ত্রীলোকের আয় চলে এসেছে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্বামী, কিংবা স্বামীর বেকারত্বে স্ত্রীর ভরণ পোষণ সম্পর্কিত চুক্তির সঙ্গে শ্বশুর প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সাধারণ পারিবারিক দায় বিধিতে যেমন স্ত্রী বা পুত্রের প্রতি দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তেমনি পুত্রবধুর প্রতিও দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বিধবা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে আর্থনীতিক দায়িত্ব স্বীকার নিয়ে সমস্যা এসে দেখা দেয়। সন্তানহীনা বিধবা স্ত্রীলোকের শেষ গতি ছিল পিতৃগৃহ তথা ভ্রাতৃভবন, এবং সন্তানবতী স্ত্রীলোকের শেষ গতি ছিলো শ্বশুর গৃহই। অবশ্য, অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও যে দেখা যায় নি—তা নয়। পিতা বা শ্বশুর কন্যা, বা বধূকে প্রতিপালন করেন, কিন্তু পিতা বা শ্বশুরের মৃত্যুতে যৌন নিরাপত্তা-হীনতার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাও এসে উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে যৌথ পরিবার প্রথা কিছুটা অনুকূল হলেও, যৌথ পরিবার প্রথার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনিক শ্রমের বা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু

বিধবাদের সমস্যা ছাড়াও আরও সমস্যা ছিলো। স্বামীর আর্থিক দায়িত্ব থেকে বিচ্যুতা এবং পিতৃগৃহ-পালিতা বহুপত্নীক-স্ত্রীর আর্থিক সমস্যা অনুরূপই ছিলো। তাছাড়া স্ত্রী পরিত্যাগ সেকালে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা ছিলো। শেষোক্ত দুটি ক্ষেত্রে সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল এবং ভয়াবহ। বিধবাদের মতো এদের জীবনমানের নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। অতএব ব্যসন দোষ এদের সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে। যৌন নিরাপত্তাহীনতায় এদের অনেকেই কুল পরিত্যাগ ক'রে বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে আয়ের পথে পদক্ষেপ করেছে। এদের ক্ষেত্রে আর্থিক চাপও অন্যতম ছিলো। স্ত্রীসমাজে শিক্ষার প্রচলন সামাজিক-ভাবে নিষিদ্ধ ছিলো ব'লে তাদের বৃত্তি সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবর্তিত হয়েছে।

প্রতিগ্রহমূলক আয়ের স্বীকৃতি আমাদের সমাজে চিরদিনই ছিলো। সাংস্কারিক সম্প্রদায়ের প্রতিগ্রহমূলক আয় ছিলো সামাজিক চুক্তির নামান্তর। কিন্তু সংসারমুক্ত নৈষ্কর্ম্যবাদী সন্ন্যাসী—যাদের সাংসারিক চর্চা ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ, তাদের প্রতিগ্রহমূলক আয় সামাজিক চুক্তির দিক থেকে বিবেচ্য। অথচ আমাদের সমাজে সন্ন্যাসীদের প্রতিগ্রহমূলক আয় স্বীকৃত। মানসিক বা দৈহিক পঙ্গু ইত্যাদির প্রতিগ্রহমূলক আয় সম্পর্কে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধ মত থাকলেও তাদের এ ধরনের আয় সম্পর্কে সমাজে কোনো বিরুদ্ধ মত ছিলো না। একদিকে, ব্যক্তিগত সাংস্কারিক চর্চার মধ্যে সমাজ যেমন সামাজিক ফলের সম্ভাবনা দেখেছে, তেমনি ধর্মীয় যুক্তিতে পঙ্গুর প্রতিপালনেও সমাজ নির্দেশ দিয়েছে। পঙ্গুর শ্রম উৎপাদন সম্পর্কিত আধুনিক বিধিসমূহ সমাজের যে অজ্ঞাত ছিলো, তা নয়; কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে একে স্বীকার করে নিতে পারে নি। এ সব ছেড়ে দিলেও সাধারণভাবে প্রত্যেকের পক্ষেই আয় ছিলো কাম্য। এ সম্পর্কে মহাভারতের মধ্যেও আছে,—

অকর্মণাং বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্নাহি কাচন।
তদেবাভিপ্রপদ্যেত ন বিহন্যাৎ কদাচন।[৫৬]

রাষ্ট্রীয়নীতি সমাজের আয়নীতিকে প্রভাবিত করে এবং আমাদের সমাজেও তার প্রভাব আছে। আমাদের সমাজের মূল আয় ছিলো কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যগত আয়। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিলো ইংরেজদের। ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিলে সেখানে শিল্পের জন্যে প্রচুর

৫৬। মহাভারত—বনপর্ব—৩২।৮।

পরিমাণে কাঁচা মালের চাহিদা এলো। এই সময় বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল রপ্তানীর জন্যে সচেষ্ট হলো। অন্য দিকে দেশের অভ্যন্তরে কৃষিশক্তিকে খাদ্যোৎপাদনের বদলে শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত করবার চেষ্টা চলতে লাগলো বলপ্রয়োগের সাহায্যে। এবং, এই সঙ্গে, দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য নষ্ট করবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলতে লাগলো। তাদের বণিকতন্ত্রের সুবিধার জন্যে করণিক সম্প্রদায়ের ব্যাপক পত্তন ঘটলো। একদিকে শিল্প-বাণিজ্যের বিনষ্টি ও কৃষিশক্তির সীমিত প্রয়োগ, এবং অন্যদিকে করণিক সম্প্রদায়ের বৃত্তির ওপর অত্যধিক চাপ আয়-নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলো।

বৃত্তিগতভাবে আমাদের আয়নীতি নিয়ে আলোচনা মোটামুটি এখানেই শেষ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত আয়নীতির প্রকারভেদ পূর্বেই দেখানো হয়েছে। সাধারণভাবে চুক্তিমূলকতা বা প্রতিগ্রহমূলকতা যেখানে স্বাভাবিক ব্যক্তিমর্যাদা নষ্ট করে, সে-সব ক্ষেত্রে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ অপুষ্ট স্বার্থ সংযুক্ত চুক্তিকারের মূর্খতার প্রতিও প্রযুক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, পূর্বে আলোচিত সমাজবিরুদ্ধ আয়নীতির অনুষ্ঠাতার প্রতিও দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে।

আয়নীতির মতোই সমাজের আর্থিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যয়-নীতি। সাধারণতঃ চারটি দিক থেকে ব্যয়নীতির সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়।—

(১) মাপ : মাত্রা বিচারে ব্যয় তিন প্রকার—(ক) মিতব্যয়, (খ) অমিতব্যয়, এবং (গ) অতিমিতব্যয়! সাধারণতঃ শেষের দুটি ব্যয়-সম্পৃক্ত নীতিই দৃষ্টিকোণ সংগঠক।

(২) মান : যোগ্যতা বিচারে ব্যয় তিন প্রকার—(ক) যোগ্যকৃত ব্যয়, (খ) অযোগ্যকৃত ব্যয়, এবং (গ) অতিযোগ্যকৃত ব্যয়। সাধারণতঃ অযোগ্য-কৃত ব্যয়ই দৃষ্টিকোণ সংগঠিত করে।

(৩) পরিধি : পরিধি বিচারে ব্যয় তিন প্রকার—(ক) স্বার্থ সমন্বয়ী (নিজ ও অপরের স্বার্থ যেখানে সমন্বিত) ব্যয়, (খ) পরস্বার্থ লঙ্ঘনকৃত ব্যয়, এবং (গ) নিজ স্বার্থ লঙ্ঘনকৃত ব্যয়। এখানে শেষোক্ত দুটি ব্যয়-সম্পৃক্ত নীতিই দৃষ্টিকোণ সূচনা করে থাকে।

(৪) গুণ : গুণ বিচারে ব্যয়নীতি তিন প্রকার—(ক) নৈতিক ব্যয়,

(খ) দৌর্নীতিক ব্যয়, এবং (গ) অনৈতিক ব্যয়। দৌর্নীতিক এবং অনৈতিক ব্যয়-সম্পৃক্ত প্রবণতাই দৃষ্টিকোণ গঠন করে।

ব্যয় আমাদের সমাজে আয়ানুপাতিকভাবে করাই শাস্ত্রকাররা মঙ্গলময় বলে ঘোষণা করেছেন। অতি সঞ্চয় এবং অসঞ্চয় দুই-ই আয়ের তথা ব্যয়ের স্বাভাবিক মাত্রা নষ্ট করে বলে হিতোপদেশে বলা হয়েছে,—"কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ।" আয়ানুপাতিক ব্যয়ের সঙ্গতি রক্ষাপ্রচারক উপদেশ প্রকৃতপক্ষে হিতমূলক উপদেশ। অবশ্য অতিসঞ্চয়ে যে সামাজিক অর্থবণ্টনের সাম্য নষ্ট হয়, এটা তাঁরা জানতেন। তাই অকারণে সঞ্চিত ধন হরণের দ্বারা ব্যয়ের ব্যবস্থাকেও শাস্ত্রকাররা অযৌক্তিক ভাবেন নি।—

"আদান নিত্যাচ্চাদাতুরাহরেদ্ প্রযচ্ছতঃ।
তথা যশোঽস্য প্রথতে ধর্মশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে॥"৫৭

তাঁরা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়েরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। পারিবারিক পুরুষের কর্তব্য নির্দেশ দিতে গিয়ে শাস্ত্রকার বলেছেন,—"অর্থস্য সংগ্রহে চৈনা[illegible] চৈব নিয়োজযেৎ।"৫৮ অতিসঞ্চয় ও অসঞ্চয়—উভয় বৃত্তি পরিত্যাগে নির্দেশের মধ্যে দিয়ে অমিতব্যয় এবং অতিমিতব্যয় (যা চলতি শব্দে 'মিতব্যয়' নামেই পরিচিত) উভয় অনুষ্ঠানেরই অযৌক্তিকতা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করে গেছেন। সামাজিক দিক থেকে মাপ বিচার—মান, পরিধি বা গুণ বিচারের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ব্যক্তিগত দিক থেকে এর মূল্য আছে এবং সমাজে তার প্রভাব থাকতে পারে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে ১২৯ প্রকরণে পুরুষ ব্যসন বা সাধারণ লোকের ব্যসন দোষ নিরূপণ করতে গিয়ে কামের "চতুর্বর্গ" নামে চারটি দো[illegible] দেখিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যয়নীতি সম্পর্কে কিছু বক্তব্যের অবকাশ থাকলেও তিনি করেন নি—যদিও মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদির মধ্যে তার ইঙ্গিত রেখে গেছেন। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত ব্যয়নীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ নির্দেশ না থাকলেও সমাজে যে এ সম্পর্কে কিছুটা ঔচিত্য নির্দেশ ছিলো, তা অনুমান করা যায়।

ব্যয়ের যোগ্যতা বিচার আমাদের সমাজে শুধুমাত্র আর্থিক মানের দিক থেকেই অভিব্যক্ত হয় নি, অন্যান্য বিভিন্ন দিক থেকেও মানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু সংহিতায় বলা হয়েছে,—বয়স, বিদ্যা, বংশ, ধন এবং দেশের

৫৭। মনুসংহিতা—১১।১৫

৫৮। মনুসংহিতা—৯।১১।

অনুরূপ বেশভূষা করাই উচিত। (৭১ অধ্যায়)। এখানে ধনের ইঙ্গিতও করা, হয়েছে এবং, বেশভূষার সঙ্গে অন্যান্য ব্যয়ের প্রসঙ্গ অযুক্ত থাকলেও শাস্ত্রকার ব্যয়নীতির সম্পর্কে কিছু যে ইঙ্গিত করেন নি, তা নয়। মনুসংহিতায়[৫৯] ব্যাবহারিক সম্প্রদায়ের আয়ের সীমা নির্দেশের উদ্দেশ্য তাদের ব্যয়নীতিকেও সীমিত রাখা। আমাদের সমাজে সব বর্ণেরই বিলাসিতার বিরুদ্ধে শাস্ত্রকারদের উক্তি দেখে মনে হয়, আর্থিক মানের স্তরভেদ থাকলেও তার উচ্চতম সীমা নির্দেশের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন।

প্রাগাধুনিক যুগে আমাদের দেশে নাগরিক সভ্যতার পত্তনে বিলাসিতা ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং জীবন যাত্রার মান ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তর ভেদ করে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করেছে। আমাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্ত জমিদার সম্প্রদায় তাদের মুনাফালব্ধ অর্থ, নিয়োগের পরিবর্তে ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেছে এবং তাদের জীবন-যাত্রার মানকে ক্রমেই উন্নত তথা ব্যয়বহুল করে তুলেছে। এর মূলে অবশ্য বণিক শাসকের কূট প্রচেষ্টা নিহিত ছিলো। ব্যবসায় কেন্দ্ররূপে নগরগুলো প্রতিষ্ঠালাভ করায় নগরের মধ্যে উচ্চ জমিদারের পাশে দেখা দিয়েছে জমিহীন চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত ব্যাবহারিক বৌদ্ধিক গোষ্ঠী তথা কর্মচারী সম্প্রদায়। জমিদারের জীবনযাত্রার মান এই কর্মচারী সম্প্রদায়কে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে এবং কর্মচারী সম্প্রদায়কে জীবনমান সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেও কূট শাসক-গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিলো। শুধু অকারণ মান সঞ্চয়ে কিংবা বেশভূষায় অপব্যয় দৃষ্টিকোণ সূচিত করেছে—তা নয়; মদ্য পান, বেশ্যাসক্তি ইত্যাদি নাগরিক অভিশাপ—যা উচ্চবিত্তের জীবনযাত্রায় সহনীয় হলেও মধ্যবিত্তের জীবন-যাত্রায় ভয়াবহ ছিলো,—এই সমস্ত অপব্যয়ের বিরুদ্ধেও প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে।

ব্যয়ের পরিধি বিস্তার সম্পর্কে আমাদের সমাজ অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী। সাধারণ যুক্তিতে ব্যক্তিগত আয়ের সার্থকতা ব্যক্তিগত ব্যয়ের মধ্যে অবস্থান করলেও সামাজিক দিক থেকে সে নীতির ব্যাবহারিক মূল্য খুবই কম। তাই বলা হয়েছে,—

৫৯। মনুসংহিতা—১০।১২৯।

'যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ সতু জীবতু।
কাকোঽপি কিং ন কুরুতে চঞ্চ্বা স্বোদর পুরণং ॥"[৬০]

সাধারণভাবে ব্যয়ের দিক থেকে পারিবারিক দায়িত্বের চাপ কম নয়। পারিবারিক দায়িত্বের সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"পুত্রমুৎপাদ্য, সংস্কৃত্য, বেদমধ্যাপ্য, বৃত্তিংবিধায়; দারৈঃ সংযোজ্য গুণবতি পুত্রে কুটুম্বমাবিশ্য কৃতপ্রস্থান লিংগো বৃত্তিবিশেষানুক্রমেৎ ॥" (শঙ্খলিখিতৌ)॥ দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ব্যয়ের প্রসঙ্গে মন্বর্থমুক্তাবলীতে[৬১] কুল্লুক ভট্ট বলেছেন,—"প্রতিদিনঞ্চাতিথিমিত্রভোজনাদের্লোকব্যবহারস্য।" তাছাড়া উৎসবানুষ্ঠান ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে সামাজিক ব্যয় যথেষ্ট ছিলো। দানের পাত্র অবশ্য সাংস্কারিক গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো। দানের উপযুক্ত নয় প্রকার ব্রাহ্মণের কথা মনু উল্লেখ করেছেন।[৬২] ব্যাবহারিক প্রাতিষ্ঠিক গোষ্ঠী তথা অনুচরবর্গকে দয়াদাক্ষিণ্যের বশে সামান্য অর্থ দান শাস্ত্রকার স্বীকৃত। তাছাড়া ভিক্ষুক ইত্যাদিকে দান করবার পুণ্য সম্পর্কে শাস্ত্রকাররা সামাজিক ব্যক্তিকে সচেতন করেছেন। দক্ষ সংহিতায় বলা হয়েছে,—

"দীন নাথ বিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
অদত্ত দানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ ॥"[৬৩]

অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিক কারণে ব্যয়ের সঙ্গে পারিবারিক কারণে ব্যয় এবং সামাজিক কারণে ব্যয়ের আবশ্যকতা সমাজশাস্ত্রকাররা বার বার প্রচার করে গেছেন। অর্থ দিয়ে পোষণ করবার ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে,—

"মাতা পিতা গুরু ভার্য্যা প্রজা দীনঃ সমাশ্রিতঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃত ॥
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকঃ পীড়নে তস্য তস্মাদ্ যত্নেন তং ভবেৎ ॥"[৬৪]

৬০। হিতোপদেশ।

৬১। মন্বর্থ মুক্তাবলী—৯।২৭।

৬২। মনুসংহিতা—১১।১।

৬৩। দক্ষ সংহিতা—২।৪১।

৬৪। দক্ষসংহিতা—৩৪।৩৭।

কিন্তু সামাজিক বা ধর্মীয় ব্যয় নিজ বা পারিবারিক স্বার্থ লঙ্ঘন করলে, তার নিন্দাও করেছেন।—

"ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকং।
তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ ॥৬৫

অপর একটি শ্লোকে স্বার্থলঙ্ঘিত ব্যয়নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে,—

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম প্রতিরূপক ॥৬৬

এই ধরনের ব্যয় আপাত দৃষ্টিতে মধুর বলে প্রতীয়মান হলেও সামাজিক দিক থেকে এর ফল বিষময়। ব্যয়ের মান ও পরিধি সম্পর্কে এতো বিধিনিষেধ দেখে মনে হয় যে আমাদের সমাজে ব্যয়নীতি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত সমস্যাগুলোর অস্তিত্ব অন্ততঃ স্পষ্টগোচর ছিলো। তাই স্মৃতিকাররা এ ধরনের বিধিনিষেধ প্রচারের মাধ্যমে সমসাময়িক দৃষ্টিকোণগুলোকেই মূল্য দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে আর্থনীতিক চাপে বিস্তৃত পরিধির ব্যয়নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর ছিলো না। তাছাড়া আধুনিক দৃষ্টিতে এর অনেকগুলোই ছিলো অপব্যয়ের নামান্তর। দান-দক্ষিণা সম্পর্কে ধর্মীয় বা সামাজিক বিধান—নতুন দৃষ্টিতে দেখা দিলো—ব্যক্তিগত আয়ের ওপর বলাৎকারে সামাজিক বা ধর্মীয় প্রশ্রয়রূপে,—যা প্রকারান্তরে সমাজের সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছিল। এই পরিধি-সঙ্কীর্ণতার মূলে যুক্তি যা-ই থাকুক, স্থিতিপন্থীর মতে এই নীতি অসঙ্গত ছিলো। যৌথ পরিবার প্রথা ছিলো সমাজ শক্তি পরিচালনের একটা ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেত্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মুক্তির ফলে যৌন, আর্থিক বা প্রতিষ্ঠাগত অসন্তোষ থেকে যৌথ-পরিবারে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিপন্থীরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

গুণবিচারে ব্যয়ের যে প্রকারভেদ আছে, সেগুলোর মধ্যে দৌর্নীতিক ব্যয় অন্যতম। দৌর্নীতিক অনুষ্ঠানে সহায়ক বা মাধ্যমের স্থান আছে বলে, সেক্ষেত্রে ব্যয়ের অবকাশ থাকে। সেই সমস্ত ব্যয়ই দৌর্নীতিক ব্যয় নামে চিহ্নিত হয়েছে। দৌর্নীতিক অনুষ্ঠানের মূলে আমাদের শাস্ত্রকাররা ছয়টি রিপুর অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে সেগুলো তিনটি গোত্রে পড়ে; যথা,—কাম, লোভ; ক্রোধ, মাৎসর্য এবং মদ, মোহ। কিন্তু

৬৫। মনুসংহিতা—১১।১০।

৬৬। মনুসংহিতা—১১।৯।

এভাবে প্রকারভেদেও অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। প্রকৃত পক্ষে, পূর্বোক্ত গোত্র তিনটির অস্তিত্বের ওপরেই যথাক্রমে (১) আকর্ষণ মূলক, (২) বিপ্রকর্ষণ মূলক, (৩) স্থিতি মূলক—এই তিনটি বিভাগ সৃষ্টি করা যায়। আবার প্রত্যেকটির তিনটি সূক্ষ্ম উপবিভাগ আছে,—(ক) যৌন, (খ) আর্থিক এবং (গ) সাংস্কৃতিক।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে দৌর্নীতিক ব্যয়ের মূলে ব্যসনদোষের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, আন্বীক্ষিকী ইত্যাদি বিদ্যালাভ জনিত বিনয়ের অভাবই পুরুষের (অর্থাৎ সাধারণের) ব্যসনের হেতু হয়। কারণ বিদ্যালাভ না করে অবিনীত লোক ব্যসনোৎপন্ন দোস সমূহের জ্ঞানলাভ করতে পারে না।[৬৭]

আকর্ষণমূলক দৌর্নীতিক ব্যয়ের বিশেষতঃ কাম সম্পর্কিত ব্যয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন কামজ চতুর্বর্গের মধ্যে। মৃগয়া, দ্যূত, স্ত্রী এবং পান—এই চারটি ব্যসনদোষে পরিচালিত ব্যয়ের সম্পর্কে আলোচনা না করলেও এবং তাঁর ব্যসন দোষ বিবৃতিতে অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে দৌর্নীতিক ব্যয়ের আলোচনায় এর মূল্য আছে। সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে লোভজ ব্যসনদোষও অঙ্গীভূত। কামে যৌন এবং লোভে আর্থিক দিক প্রধান হলেও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিকটিও কাম-লোভ রিপু দুটির মধ্যেই মিলিয়ে আছে।

আকর্ষণমূলক যৌন দিকে আছে লাম্পট্য, বেশ্যাবৃত্তি, মদ্যপান ইত্যাদি। আর্থিক সমস্যার ক্ষেত্রে পুরুষপক্ষীয় লাম্পট্যই উল্লেখযোগ্য। বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে পরদারাধিকরণে পরস্ত্রীবশের অন্যতম অস্ত্রস্বরূপ অর্থের কথা বলেছেন। তাছাড়া কুট্টনী বা আড়কাঠি ছাড়া এসব ক্ষেত্রে কার্যানুষ্ঠান সম্ভবপর নয়। তারাও অর্থের বশীভূত। অতএব লাম্পট্যের প্রবণতায় বা পদক্ষেপে অর্থনাশ স্বাভাবিক। যে সব ক্ষেত্রে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কুট্টনী বা ব্যাভিচারিণী স্ত্রী ধরণ করে, সে ক্ষেত্রে অর্থনাশ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। লাম্পট্যের মতোই বেশ্যাসক্তির বিষয়েও অনুরূপ অর্থনাশের অবকাশ আছে। দাম্পত্যাদিকের ক্ষতির ভয় দেখিয়ে যৌন দিক নিয়ে অনেক কিছু বলা হলেও দুর্নীতিগত ব্যয়ের দিক থেকে কোন উল্লেখযোগ্য মন্তব্য নেই। তবে আকর্ষণমূলক যৌন দুর্নীতিগত ব্যয়ের বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে কোনোরকম দৃষ্টিকোণ যে ছিলো না, এটা

৬৭। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—১২৯ প্রকরণ।

চিন্তা করাও অসঙ্গত। বস্তুতঃ আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত অর্থনাশের সঙ্গে পারিবারিক স্বার্থ জড়িত ছিলো বলেই এই আকর্ষণমূলক যৌন দুর্নীতি সমাজে দৃষ্টিকোণ সূচনা করেছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত অর্থনাশে সামাজিক গলগ্রহতার বীজ বপন, কু-দৃষ্টান্তের সূচনা সমস্যা জড়িয়ে থাকে বলে সেদিক থেকেও দৃষ্টিকোণ সূচনার অবকাশ আছে।

আকর্ষণমূলক আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে পারিবারিক স্বার্থ। বলাবাহুল্য, পূর্বে বিবৃত অন্য কারণগুলোও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ঘোড়-দৌড়, ফাট্‌কাবাজী, জুয়া ইত্যাদি অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে এবং সমস্যাসৃষ্টি করে এসেছে। অর্থ আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় আকর্ষণমূলক দৌর্নীতিক ব্যয় আর্থিক-উপবিভাগের সার্থকতা স্পষ্ট করে তুলেছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে দৌর্নীতিক ব্যয়ের দৃষ্টান্তও আমাদের সমাজ অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে বহন করে এসেছে। প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে দৌর্নীতিকব্যয় তিনটি ক্ষেত্রে সম্পাদিত হতে পারে—ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে দৌর্নীতিক ব্যয় আমাদের সমাজের স্মৃতিকাররা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন স্পষ্টভাবে।৬৮ সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার জন্যে উৎকোচ প্রদান অত্যন্ত অসঙ্গত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংঘটিত হলে প্রতিগ্রাহক গোষ্ঠী বহির্ভূত সম্প্রদায় থেকে দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ইংরেজ প্রদত্ত সম্মানে কৌলীন্যের মান নির্ধারিত হলে তথাকথিত খেতাবলাভের স্পৃহায় দৌর্নীতিক ব্যয়ের অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় দিকে প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে দৌর্নীতিক ব্যয়ের দৃষ্টান্ত মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচন ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাহসনিক দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে।

বিপ্রকর্ষণের দিক থেকেও যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক—এই তিনটি অনুরূপ ক্ষেত্র আছে। বলা বাহুল্য, বিপ্রকর্ষণের দিক থেকে আমাদের সমাজে দৌর্নীতিক ব্যয় এবং দৃষ্টিকোণের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অবশ্য আকর্ষণ-মূলক ব্যয়ের সঙ্গে এর সংযোগে অধিকাংশক্ষেত্রেই জটিলতার মধ্যে পরিচয় লাভ করা যায়।

৬৮। মনুসংহিতা—১১।৯-১০

স্থিতমানের কালগত দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির জন্যে স্থিতিমূলক দৌর্নীতিক ব্যয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অর্জিত মানের পরবর্তী ক্ষয়িষ্ণুতায় দৌর্নীতিক ব্যয়ের সাহায্যে স্থিতিরক্ষার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে। যৌন-মানের স্থিতিরক্ষার বিরুদ্ধে বিশেষতঃ বৃদ্ধের যৌবন ধারণের ব্যর্থ চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক মানের স্থিতিরক্ষায় দৌর্নীতিক ব্যয় আকর্ষণমূলক ব্যয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জটিলতা সম্পাদন করেছে। সাংস্কৃতিক মানের স্থিতিরক্ষার জন্যে দৌর্নীতিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ প্রবলভাবে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে।

আমাদের সমাজে আর্থিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করা চলে। অবশ্য আয়নীতি ও ব্যয়নীতি সম্পৃক্ত সমস্যার সবগুলোই স্পষ্ট প্রাহসনিক দৃষ্টি সংগঠন করেনি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই আর্থিক সমস্যা যৌন ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সঙ্গে একত্র সংযুক্ত হয়ে দৃষ্টিকোণ সংগঠন করায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য দুটির প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় দৃষ্টিকোণে আর্থিক সমস্যার দিক অনেকটা গৌণ হয়ে পড়েছে। তবু সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণে আর্থিক সমস্যার প্রায় সবক্ষেত্রেরই কিছু কিছু আভাস ধরা পড়ে।

৩ ॥ **সাংস্কৃতিক সমস্যা** ॥ যৌন ও আর্থিক সমস্যার মতোই সাংস্কৃতিক সমস্যা আমাদের সমাজের অন্যতম সমস্যা। সমাজের বৈশিষ্ট্যগত ও মর্যাদাগত দ্বন্দ্বের সমস্যাকেই সাংস্কৃতিক সমস্যা নামে অভিহিত করা যায়। আমাদের সমাজের সাংস্কৃতিক সমস্যা সাধারণতঃ তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে—(ক) স্ত্রী পুরুষের ক্ষেত্র, (খ) পারিবারিক ক্ষেত্র, এবং (গ) সামাজিক ক্ষেত্র।

স্ত্রীপুরুষের ক্ষেত্র ॥ নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা আমাদের জাতি নির্ধারণ করতে গিয়ে যে মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, প্রাগাধুনিক সমাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন আমূলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। একথা ঠিক যে আর্যসমাজ কাঠামোর বাইরে যে বিরাট সমাজ ছিলো, তার ওপর আর্যবিধি নিষেধের প্রভাব ততো প্রবল ছিলো না। কিন্তু আর্য বিধিনিষেধের ওপর একটা মোহকে তারা অতিক্রম করতে পারেনি। তাছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিকোণ উপস্থাপক সম্প্রদায় সাধারণভাবে উক্ত গোত্র বহির্ভূত বলে আলোচ্যক্ষেত্রে তার মূল্যও

বিশেষ নেই। বস্তুতঃ প্রাগাধুনিক যুগে ক্ষয়িষ্ণু আচারসর্বস্ব সমাজের পক্ষ থেকে অঞ্চল বা কাল নির্বিচারে বিভিন্ন আর্য-স্মৃতি-পুরাণাদির বিধিনিষেধ নারীর ওপর প্রয়োগের জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং ক্রমাগত হীন প্রতিষ্ঠায় তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। পরবর্তীকালের স্থিতিশীল সম্প্রদায় যখন তাঁদের দৃষ্টিকোণ সমর্থনের জন্যে আর্য-স্মৃতি-শ্রুতিকে নির্বিচারে নির্বাচন করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তখন তা থেকেই আমরা স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের দিশা-হারা ভাব এবং স্মৃতি-শ্রুতি চয়নের সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত দুর্নীতি উপলব্ধি করতে পারি। তাই স্ত্রীপুরুষের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমস্যা আমরা আর্য-স্মৃতি গ্রন্থ সমূহের বিধি নিষেধের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত যদি করি, তাহলে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিকে অতিবর্তণ করা হয় না।

বিষ্ণুসংহিতার উক্তি থেকে আমরা নারীর আচরণীয় ধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে,—

"অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ (১) ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বম্ (২) শ্বশ্রূশ্বশুর গুরুদেবতা তিথি পূজনম্ (৩) সুসংস্কৃতোপস্করতা (৪) অমুক্তহস্ততা (৫) সুগুপ্ত ভাণ্ডতা (৬) মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ (৭) মঙ্গলাচারতৎপরতা (৮) ভর্ত্তরি প্রবসিতেঽপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া (৯) পরগৃহেষ্বাভিগমনম্ (১০) দ্বারদেশগবাক্ষকেঘনবস্থানম্ (১১) সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রা (১২) বাল্যযৌবনবার্দ্ধকেষ্বপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা (১৩) মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বা-রোহণং বা (১৪)৬৯ শুধু বিষ্ণুসংহিতা নয়, বিভিন্ন স্মৃতিকার স্ত্রীলোকের প্রতিষ্ঠা সঙ্কুচিত করবার জন্যে অনেককিছু বিধিনিষেধ প্রচার করে গেছেন। এই সমস্ত নির্দেশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক— তিন দিক থেকেই স্ত্রী সমাজকে পুরুষের অধীন করে রাখবার চেষ্টা হয়েছে। 'মিতাক্ষরা'র পরিবর্তে আমাদের সমাজে 'দায়ভাগ' অনুসৃত হলেও তাতে স্ত্রীসমাজের আর্থনীতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। এমন কি "নারী-নিগ্রহী" মনুর উপদেশ ভয়াবহ হলেও এবং কলিযুগে পরাশরাদি স্মৃতিকার-দের বিধান গ্রাহ্য হলেও আমাদের সমাজে প্রাগাধুনিককালে স্থিতিশীলের পক্ষ থেকে মনুসংহিতার বিধিনিষেধের নির্বিচার প্রচার ও প্রয়োগ বিনা দ্বিধায় সংঘটিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপদেশমূলক রচনায় মনুর বচন উদ্ধৃতির থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। নারী সম্পর্কে মনু উচ্চারণ করেছেন,—

৬৯। বিষ্ণুসংহিতা—২৫ অধ্যায়।

"স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণং।
অতোঽর্থান্ন প্রমদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥[৭০]

পুরুষকে প্রতিষ্ঠার দিক থেকে সর্বদা সচেতন হতে বলেছেন শাস্ত্রকার। প্রতিষ্ঠার জন্যে দৈহিক বা মানসিক নিগ্রহের মধ্যে অন্যায় আ বিষ্কার করতে তাই তাঁরা অসমর্থ হয়েছেন। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কামিনীর কাছে পুরুষের মিথ্যাভাষণে শাস্ত্রকারের মতে কোনো পাপ নেই। মনুসংহিতার[৭১] "কামিনীষু বিবাহেষু শপথে নাস্তি পাতকং"—শ্লোকটির ব্যাখ্যায় ভট্টমেধাতিথি লিখ্ছেন,—"কামঃ প্রীতিবিশেষো বিশিষ্টেন্দ্রিয়স্পর্শজন্যঃ স যাসু ভবতি পুরুষস্য তাং কামিনো ভার্য্যাবেশ্যাদযঃ তত্র যঃ শপথঃ কামসিদ্ধ্যর্থো যথা নাহমন্যাং কাময়ে প্রাণেশ্বরী মে ত্বমিত্যাত্ত্বোঽহযন্ত সংপ্রযুজ্যশপথ ইদং তয়া দেযং দাস্য ইতি তত্র ভবত্যেব দোষঃ।"—ইত্যাদি।[৭২] শাস্ত্রকারের মতে ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রীকে প্রহারেও দোষ নেই। সাধারণভাবে পৃষ্ঠদেশে হস্তদ্বারা তিনবার প্রহারের কথা বলা হয়েছে। এমন কি 'বেণু' বা 'রজ্জু' দ্বারা প্রহারের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।[৭৩] পরবর্তীকালে স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দৈহিক নিপীড়নের সমর্থনে যখন পুরুষপক্ষ থেকে শাস্ত্রের সমর্থন দেখানো হয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুশাসন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দাম্পত্য দিক থেকে শুধু নয়, সব দিক থেকেই স্ত্রীর আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার পুরুষের নিয়ন্ত্রণে রাখবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়াবাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ॥
বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥[৭৪]

স্ত্রীর প্রতি নির্দেশে বলা হয়েছে যে, পতি দুশ্চরিত্র হলেও তার সেবাই স্ত্রীর ধর্ম। তাছাড়া তার আর কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই।—

৭০। মনুসংহিতা—২।২১৩।

৭১। মনুসংহিতা—৮।১১২।

৭২। মনুভাষ্য—৮ম।

৭৩। মনুসংহিতা—৮।২৯৯।

৭৪। মনুসংহিতা—৫।১৪৭-৪৮।

বিশীল কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥[৭৫]

স্ত্রীসমাজ পুরুষের বশীভূত থাকবে—সর্বোপরি সে থাকবে পতি বশীভূত। যে কোনো দিক থেকেই পতিকে অতিক্রম করা তার পক্ষে অপরাধ বলে প্রচারিত করা হয়েছে। এবং যথারীতি সতীসাধ্বীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে,—

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥[৭৬]

পতিকে অতিক্রম করা ধর্মীয় বা সামাজিক দিক থেকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ হওয়ায় এবং স্ত্রীর আর্থনীতিক জীবন পুরুষ কর্তৃক প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সমাজে স্ত্রীপুরুষের সাংস্কৃতিক সমস্যা ক্রমেই কুপরিণামজনক হয়ে উঠেছে এবং স্থিতিশীল গোষ্ঠী প্রচারিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে লিঙ্গ নির্বিশেষে ক্রমেই প্রাথমিক অনুশাসন নির্ভর দৃষ্টিকোণের উদ্ভব ঘটেছে।

ইসলামী যুগে অবরোধ প্রথার চাপে স্ত্রীস্বার্থের দিক থেকে কোনো উন্নতিই হয় নি; বরং কামুক বৃত্তির প্রবণতায় পুরুষপক্ষ থেকে বিভিন্ন দুর্নীতি ক্রমাগত প্রকাশ পেয়েছে এবং স্ত্রীসমাজের স্বাভাবিক অধিকারের ওপর অমানুষিকভাবে আঘাত হানা হয়েছে। তাছাড়া মুসলমান সমাজও ছিলো পুরুষপক্ষীয় প্রভুত্বের পোষক। কোর্‌আন্‌ শরীফের 'ছুরা নেছায়'এর কারণ উল্লেখ করে বলা হোয়েছে,—

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ
اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ
اَمْوَالِهِمْ

৭৫। মনুসংহিতা—৫।১৫৪-৫৫।

৭৬। মনুসংহিতা—৫।১৬৪-৬৫।

পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রীতিনীতির অনুকরণে ইউরোপীয় রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এবং স্বাভাবিক যুক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয়ে প্রগতিশীলের পক্ষ থেকে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি আন্দোলন ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হলে, সাংস্কারিক নিয়ন্ত্রণাধিকার বজায় রাখবার জন্যে স্থিতিশীলের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন স্ত্রীসমাজে ভাবপ্রবণতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি স্ত্রীলোকের প্রতিষ্ঠায় সামাজিক কুপরিণাম ব্যাখ্যা করে স্ত্রীসমাজের ক্ষমতাবৃদ্ধির অযৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব পাই, তার মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সাংস্কৃতিক সমস্যা প্রধান একটি স্থান অধিকার করে রয়েছে। তবে প্রহসনকারদের মধ্যে সকলেই প্রায় পুরুষ। যে দু'একটি স্ত্রীলোকের নামাঙ্কিত পাই, অনেকের অনুমান সেগুলো পুরুষের রচনা। তাই স্ত্রীসমাজের সাংস্কৃতিক সমস্যার বাস্তব মূল্যকে অনেকে বিবেচনাধীন রাখবার পক্ষপাতী হতে পারেন। কিন্তু সামাজিক বিধান প্রাথমিক অনুশাসন নির্ভর যে দৃষ্টিকোণ সূচনা করে, তার মধ্যে গোষ্ঠী-ভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ থাকতে পারে না। তাই স্ত্রীপক্ষীয় প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের মূল্য সমাজচিত্রের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য।

পারিবারিক ক্ষেত্র ॥—আমাদের সমাজ ছিলো পরিবার কেন্দ্রিক। তাই পরিবারের গুরুত্ব সমাজে অত্যন্ত বেশী। পারিবারিক নিয়ম লঙ্ঘন সামাজিক অপরাধ বলেই আমাদের সমাজে গণ্য হতো। পরিবারের যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ পরিবারের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হতো। সমাজের সঙ্গে পরিবার সদস্যের সম্পর্করক্ষাও তাঁর নীতিতে স্থিরীকৃত হতো।

আমাদের সমাজের পারিবারিক সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার আগে আমাদের পরিবারের সাধারণ গঠন সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া দরকার। সমাজের চাপে এবং অর্জনরীতির ক্ষেত্রবিশেষের চাপে আমাদের দেশে যৌথ-পরিবার প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। যৌথ-পরিবার বিভিন্ন বৈচিত্র্য বহন করলেও, এই ধরনের প্রতিনিধিমূলক একটি পরিবারের লতিকার সাহায্যে সমস্যা-বিচার শ্রেয়ঃ। পর পৃষ্ঠায় একটা লতিকা দেওয়া হলো।—

তালিকাটিতে পুরুষগত দৈর্ঘ মেনে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সমস্যা আলোচনার সুবিধার্থেই এটা করা হয়েছে।

যৌথ-পরিবারে বৃদ্ধ ব্যক্তির অসামর্থে বা অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করে। পরিবারের স্বার্থের গতি সাধারণতঃ স্বক্ষেত্রে এবং নিম্নমুখে। তাই বৃদ্ধ ব্যক্তির বর্তমানে ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধা স্ত্রী এবং বিধবা কন্যার যে প্রতিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিচালনাক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠার সঙ্কোচ ঘটে। পরবর্তী পুরুষে ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বহির্ভূত হয়ে পড়ায় এবং ঊর্ধ্বমুখীন হয়ে পড়ায় পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার বিশেষ কিছুই মূল্য থাকে না। স্বক্ষেত্র বা নিম্নমুখীন স্বার্থের তুলনায় স্ব-রেখায় অবস্থিত। তালিকা দ্রষ্টব্য। ব্যক্তির স্বার্থ অপুষ্ট হলেও অবহেলিত হয় না। কিন্তু স্বক্ষেত্র, স্ব-রেখা কিংবা নিম্নমুখীন ক্ষেত্র থেকে বহির্ভূত অবস্থায় পতিত ব্যক্তির স্বার্থের অপুষ্টি মাত্রাতিবর্তন করলে দৃষ্টিকোণ সংগঠক সমস্যা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

প্রথম পুরুষে সমস্যা ॥—পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রথম পুরুষে বৃদ্ধ ব্যক্তির হাতে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের মূলে থাকে সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক দিক। পারিবারিক সংস্কার যেমন তাঁর মতেই গঠিত হয়, তেমনি তাঁর বিশেষ অর্জন-ব্যবস্থার আয়ে পরিবার পুষ্ট হয়। কিন্তু তার অক্ষমতায় বা অবর্তমানে দ্বিতীয় পুরুষের হাতে এই নিয়ন্ত্রণ গেলে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণই সমস্যা সৃষ্টি করে। অনেক সময় প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষের যুগপৎ আয় পারিবার শাসনে শিথিলতা আনে। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠায় প্রথম পুরুষের সমস্যা প্রকট হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা প্রথম পুরুষ ত্যাগ করতে পারে না। এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মিলিয়ে আছে ধর্ম ও সমাজ সম্পৃক্ত বিশেষ নীতি। এসব স্থানে সাংস্কৃতিক বিরোধই হয়ে ওঠে একটি প্রধান সমস্যা। বৈকল্পিক আয়শূন্য পরিবারে যদি দ্বিতীয় পুরুষ ব্যাবহারিক বৃত্তি (চাকুরী) গ্রহণ করে, তাহলে প্রথম পুরুষের আর্থিক স্বার্থ

আরও অপুষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে দেখা যায় প্রথম পুরুষের আর্থিক স্বার্থে অপুষ্টি-জনিত সমস্যা। এই অপুষ্টির মূলে থাকে দ্বিতীয় পুরুষের স্ব-ক্ষেত্র ও নিম্নমুখীন চাপ। সেজন্য সমাজে নিষ্কর্মা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মাতাপিতার সঙ্গে পুত্রের প্রতিষ্ঠাগত বিরোধে পুত্রবধূর স্থান প্রধান। তাই স্ত্রী-সর্বস্ব পুত্র অন্যান্যের নিন্দাস্পদ এই কথা বলতে গিয়ে পিতারও নিন্দাস্পদ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নিন্দন্তি পিতরো দেবা বান্ধবা স্ত্রীজিতং জনং।
স্ত্রীজিতং মনসা বাচা পিতাভ্রাতা চ নিন্দতি ॥[৭৭]

অনেক সময় স্ত্রীর প্ররোচনায় মাতাপিতার গৃহত্যাগ বা আত্মহত্যার ঘটনা আমাদের সমাজে পারিবারিক ক্ষেত্রে অবাস্তব নয়।

দ্বিতীয় পুরুষে সমস্যা ॥—প্রাচীন অজনরীতির অনুসরণে স্ব-রেখার মধ্যে স্বার্থ বিরোধ পারিবারিক ক্ষেত্রে ততো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ব্যাবহারিক বৃত্তিজনিত অর্জনে স্বার্থসঙ্কীর্ণতা প্রকট হলে স্ব-রেখাতে ভাঙন ধরে এবং যথারীতি পরবর্তী পুরুষেও ভাঙন ধরে। এই ভাঙন সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ হয় স্ব-রেখায় অবস্থিত বিধবা ভগ্নীর ক্ষেত্রে। বিধবা ভগ্নীর পক্ষে প্রথম পুরুষের নিম্নমুখীন ক্ষেত্রে স্থানলাভে যে সমস্যা কম থাকে, তা এতে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে প্রতিষ্ঠাগত বিরোধ দেখা যায় জায়ে জায়ে। জায়ের পক্ষ থেকে, এমন কি জায়ের প্রেরণায় উপযুক্ত স্বামী বা পুত্রের পক্ষ থেকে বিধবার ওপর গলগ্রহতার অনুযোগ বর্ষিত হয়। দ্বিতীয় পুরুষে আরও কয়েকটি সমস্যা আছে। আলোচনার সুবিধার্থে তৃতীয় পুরুষের সমস্যার প্রসঙ্গে তা ব্যক্ত করছি।

তৃতীয়-পুরুষে সমস্যা ॥—পূর্বতন পুরুষের নিয়ন্ত্রণে আর্থিক সাংস্কৃতিক বা যৌন দিক থেকে রীতিনীতি যে চাপের সৃষ্টি করে, তার থেকেই তৃতীয় পুরুষের প্রধান সমস্যা জাগে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে মানসগঠন সাধারণতঃ যুগ-পরিবেশে সম্পাদিত হয়। এই মানসপ্রবণতা আর্থিক, যৌন বা প্রতিষ্ঠা-গত নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ অনুভব করে এবং প্রথাতিরিক্ত বা প্রথাবিরোধী কতকগুলো রীতিনীতি প্রচলনে প্রবণতা প্রকাশ করে। এই স্বার্থ অপুষ্টি তার মধ্যে বিরোধের উপাদান সংগঠন করে। এখানে সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্ত্রীর

৭৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—২/১৬/৮৯।

সহায়তা তাকে আরও প্রবল করে তোলে। কিন্তু স্ত্রীর প্রথা স্বীকৃতিও পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা সৃষ্টি করে।

তৃতীয় পুরুষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিরোধ শাশুড়ী-পুত্রবধূর কিংবা ননদ-ভ্রাতৃবধূর বিরোধ। অবিবাহিত পুত্রের ক্ষেত্রে স্ব-ক্ষেত্র উৎপাদিত হয় না, কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-ক্ষেত্রের জন্ম হয়। স্ব-ক্ষেত্রহীনতাতে পূর্বতন পুরুষের প্রতিষ্ঠা পরবর্তী পুরুষে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্ব-ক্ষেত্রের উৎপত্তিতে তা থাকে না। পরন্তু স্ব-ক্ষেত্রের উৎপত্তিতে স্ব-রেখাস্থিত ব্যক্তি—অন্ততঃ যার বলবত্তা নির্ভর করে পূর্বতন পুরুষের প্রতিষ্ঠায়—সে ক্ষেত্রের উৎপত্তিতে প্রতিষ্ঠানাশের আশঙ্কায় পূর্বতন পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্ষেত্রনাশের চেষ্টা করে এবং স্বামী-স্ত্রীর ভাঙন সৃষ্টির অমানবোচিত পন্থা গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, শাশুড়ীও এর সমর্থন করেন। এক্ষেত্রে বিরোধ হয়ে ওঠে স্পষ্ট

বধূর সাংস্কৃতিক বিরোধ একটা প্রধান স্থান অধিকার করতে পারে। যৌন, আর্থিক বা সাংস্কৃতিক পারিবারিক-নিয়ন্ত্রণ যেক্ষেত্রে অনভ্যস্ত অথবা অপ্রত্যাশিত সে সব ক্ষেত্রে তারা যৌথ পরিবারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে।

আমাদের সমাজে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখবার জন্যে শাস্ত্রকাররা যত্নশীল হতে বলেছেন। মনু বলেছেন,—

"মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাতা পুত্রেণ ভার্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেন বিবাদং ন সমাচরেৎ॥"[৭৮]

তিনি আরও বলেছেন,—

"আকাশেশাস্তু বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধ কৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ॥"[৭৯]

কিন্তু পারিবারিক শাসনের সহায়তায় সমাজ কতোটা সক্রিয় ছিলো, তার প্রমাণ পাই স্মৃতিকারদেরই প্রদত্ত বিধিতে।—

"পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ ক্রুদ্ধো নৈব নিপাতয়েৎ।
অন্যত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাদ্বা শিষ্ট্যর্থং তাড়য়েত্তু তৌ॥"[৮০]

কিংবা অন্যত্র.—

৭৮। মনুসংহিতা—৪/১৮০।

৭৯। মনুসংহিতা—৪/১৮৪।

৮০। মনুসংহিতা—৪/১৬৪।

ভার্য্যাপুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তা পরাধাস্তাড্যাঃ স্যুঃ রজ্জ্বা বেণুদলেন বা ॥"[৮১]

পারিবারিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল দুই পক্ষ থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠামূলক দ্বন্দ্বে বিভিন্ন মাত্রায় দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে ব্যাবহারিক বৃত্তি গ্রহণের ফলে পারিবারিক বিরোধ এতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শতাব্দীর প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে সূচিত হয়েছে।

সামাজিক ক্ষেত্র ॥ সামাজিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমস্যা বর্ণ, বংশ, বৃত্তি এবং আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

যে কোনো বৃত্তি—সামাজিক দিক থেকে মঙ্গলের হোক বা অমঙ্গলের হোক—সমাজে এক একটি মানের জন্ম দেয়। কতকগুলো চিন্তাভাবনা বৃত্তির স্বরূপ ও গতিবিধিকে আবর্তন করে গড়ে ওঠে। এই চিন্তাভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভাবপ্রবণতা—যা মানুষের ইচ্ছিত বা অনিচ্ছিত বস্তুধারণার সঙ্গে সারূপ্য বা সাধর্ম্য আবিষ্কার করে কল্পিতভাবে মান নির্ণয়ের চেষ্টা করে। সমর্থনপুষ্টির মধ্যে দিয়ে এই মান সামাজিক মানরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এখানেই বৃত্তির দিক থেকে সাংস্কৃতিক সমস্যার জন্ম হয়।

বর্ণ-সম্পৃক্ত মর্যাদার মূলেও থাকে এই বৃত্তিগত সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ধীরে সংঘটিত হয়। তাই বৃত্তি পরিবর্তনে সংস্কৃতির সামাজিক মান সহসা পরিবর্তিত হয় না। বৃত্তিগ্রহণ জীবনযাত্রার জন্যে প্রাথমিক করণীয় বিষয়ের প্রধানতম অঙ্গ। আপৎকালীন আর্থনীতিক চাপে মানুষ তার বৃত্তি নির্দিষ্ট করে ফেলে। অপেক্ষাকৃত উচ্চমানে অবস্থিত বৃত্তিগ্রহণে তার আশঙ্কা থাকলেও পরিবেশ বা মনোগঠন তার অনুকূল হয় না। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন সমস্যা এড়াবার জন্যে পুত্র পিতার জীবিকা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। পরবর্তী জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা ও প্রত্যয়লাভের জন্যে পিতাও পুত্রকে নির্দিষ্ট বৃত্তিগ্রহণে চাপ দেন। এই ভাবে বিভিন্ন বৃত্তিগ্রাহী ব্যক্তি শৌণ্ডিক সম্প্রদায় গড়ে তোলে। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে শৌণ্ডিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য বিশিষ্ট হয়ে পড়ে।

আর সমাজ-কাঠামো আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার আগে সামাজিক

৮১। মনুসংহিতা—২/২৯৯।

প্রতিষ্ঠার মান যে ধরনের থাকুক না কেন, আর্য সমাজ-কাঠামোর প্রভাব সে মানকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর্য চাতুর্বর্ণ্য রীতির আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কাল অত্যন্ত প্রাচীন হলেও, আধুনিক কালেও আমাদের সমাজের বিভিন্ন 'জাত' বা সম্প্রদায় আর্য চাতুর্বর্ণ্য কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে ঐতিহ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেন এবং যুক্তি দেখান। এর থেকে বোঝা যায় আর্য-সমাজ কাঠামোর স্থিরীকৃত মানের প্রভাব আমাদের সমাজে এখনও অত্যন্ত প্রবল। অন্যান্য সমাজের মতো অনার্য সমাজেও সাংস্কারিক, প্রাতিষ্ঠিক প্রাতিভবিক, এবং ঔৎপাদনিক—এই চার ধরনের সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। আর্য বর্ণবিভাগে পূর্বোক্ত বৃত্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। তাঁদের চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে সাংস্কারিক (শুদ্ধ), কায়িক অতিব্যাবহারিক প্রাতিষ্ঠিক (আংশিক), প্রাতিভবিক-ঔৎপাদনিক (মিশ্র) এবং কায়িক ব্যাবহারিক প্রাতিষ্ঠিক (কক্ষচ্যুত আংশিক)—এইভাবে বৃত্তি বিভাগের মধ্যে অবস্থান করেছে। প্রাতিষ্ঠিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধিক শাখা সম্ভবতঃ সাংস্কারিকদের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিলো। আমাদের পুরাতন সমাজের ওপর আর্যসমাজ-কাঠামো প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীতে বৃত্তি অনুযায়ী বর্ণবিশেষে স্থানলাভ করবার অধিকার পূর্বতন সমাজ-সদস্যরা পেয়েছিলেন। প্রাক্তন সমাজের সাংস্কারিক সম্প্রদায় আর্য চাতুর্বর্ণ্য কাঠামোতে সাংস্কারিক মর্যাদার পরিবর্তে বৌদ্ধিক ব্যাবহারিক প্রাতিষ্ঠিক শাখার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন কিনা, তার অনুমান কল্পিত হতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বতন সমাজ সদস্যের যাঁরা স্থানলাভ করেছিলেন, তাঁরা করেছিলেন কর্মেরই ভিত্তিতে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আকৃতিগত বৈচিত্র্যই তার প্রমাণ দেয়। সুতরাং আমাদের বর্ণগত সাংস্কৃতিক সমস্যায় বৃত্তির মান নির্ধারণে আর্য কাঠামোর প্রতিষ্ঠিত মানেরও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা স্বাভাবিক।

আর্য চাতুর্বর্ণ্য রীতি প্রয়োগে শৌণিতিক সম্প্রদায় সৃষ্টি এবং তজ্জনিত প্রতিষ্ঠাগত সংঘর্ষের আশঙ্কা শাস্ত্রকাররা অনেকেই করেছিলেন। তাই জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"জাতিরিতি চ। ন চর্মনো ন রক্তস্য ন মাংসস্য ন চাস্থিনঃ না জাতিরাত্মনো জাতি ব্যবহার প্রকল্পিতা।"[৮২] ধর্মাচরণেই বর্ণের মর্যাদা রক্ষা পায়। তাই বলা হয়েছে,—

৮২। নিরালম্বোপনিষৎ—১০ম শ্লোক।

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌঃ।

অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বোবর্ণ জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌঃ ॥[৮৩]

তবে ধর্মাধর্মের আচরণ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিগঠনের মূলে থাকে আর্থনীতিক বা সাংস্কৃতিক চাপ—এটা অস্বীকার করা যায় না।

আর্য সমাজ কাঠামোতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌলীন্যের পার্থক্য স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে বলা হয়েছে,—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতা ॥"[৮৪]

পূর্বোক্ত মন্তব্যে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতারই ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরাশর কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম বলে নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৫] মনু ব্রাহ্মণকে দানের কথা আগেই বলে গেছেন। এই ধরনের প্রতিগ্রহমূলক আয়ে ব্রাহ্মণদের আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠাও একদা যথেষ্ট ছিলো। এদের মর্যাদা রাজ-মর্যাদাকেও স্পর্ধা করতো। স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যাবে, সর্ব বিষয়েই এঁদের প্রতিষ্ঠা সমাজ শাস্ত্রকারের অনুমোদিত।

কিন্তু এই অপ্রতিহত সামাজিক মর্যাদার মূলে ছিলো বৃত্তির মর্যাদারক্ষা। মনু ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করবার পরেও বলেছেন,—

"ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।

কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥"[৮৬]

কিন্তু জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের অধিকার তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এনে দেয়,—এই মতই উক্ত শাস্ত্রকারের পক্ষ থেকে প্রচারের চেষ্টা চলেছে।—

"ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতং।

শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোর্হতি ॥"[৮৭]

৮৩। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র—২/৫/১০/১১।

৮৪। মনুসংহিতা—১/৯৬।

৮৫। পরাশর সংহিতা—১/২২।

৮৬। মনুসংহিতা—১/৯৭।

৮৭। মনুসংহিতা—১/৯৯-১০০।

আর্য সমাজ কাঠামোতে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের সমাজে আর্য সমাজ থেকে প্রচুর ব্রাহ্মণের আগমন ঘটেছিলো। সমাজে আর্যপ্রভাব বাড়বার সঙ্গে তাদের প্রতিষ্ঠাও যে বেড়েছিলো, তা অনুমান করা যায়। ব্রাহ্মণদের আগমন সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,—"নানা গোত্র, প্রবর ও বিভিন্ন বৈদিক শাখানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণেরা…পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই উত্তর ভারত হইতে বাঙলা-দেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন…। 'মধ্যদেশ বিনির্গত' ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অষ্টম শতক হইতে ক্রমশ বাড়িয়াই যাইতে আরম্ভ করিল; ক্রোড়াঞ্চি-ক্রোড়ঞ্জ…তর্কারি,…মৎস্যাবাস, কুন্তীর, চন্দবার, হস্তিপদ, মুক্তাবাস্তু, এমন কি সুদূর লাটদেশ হইতে ব্রাহ্মণ পরিবারদের বাঙলাদেশে আসিয়া বসবাসের দৃষ্টান্ত এ যুগের লিপিগুলোতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা এদেশে আসিয়া পূর্বাগত ব্রাহ্মণদের এবং তাঁহাদের অগণিত বংশধরদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক।"[৮৮] আমাদের সমাজে আর্য-সমাজ কাঠামো দৃঢ়ভিত্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বমাজের সামাজিক প্রতিষ্ঠাগত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এঁরা যে লাভ করেছিলেন, তা ঐতিহাসিক। তাই আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা অবাস্তব ছিলো না।

পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষে স্থিতিপন্থী হিসেবে পুরোভাগে ছিলেন এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এঁদের সৃষ্ট ভাবপ্রবণতায় এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রাচীন সংস্কার সর্বস্ব বিপ্লব-ভীরু ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়। অবশ্য তাঁদের অনেকের স্বার্থও ছিলো স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠায়।

ব্রাহ্মণদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার ক্রমশিথিলতার যথেষ্ট কারণ ছিলো। বিভিন্ন ধর্মীয় সমাজের ক্রমমিশ্রণে ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের গণ্ডী হয়ে এসেছিলো সঙ্কীর্ণ। সাধারণের মধ্যে বস্তুগত মনোভাবের প্রাবল্যে একদিকে যেমন বৃত্তিগত আয়ের চুক্তিমূল্য কমে এসেছে, তেমনি প্রতিনিধি ব্যতিরিক্ত আচার-বিহীন ভজনরীতির ব্যাপক প্রভাবে এদের মর্যাদা কমে এসেছিলো। তাছাড়া এদের প্রযুক্ত বলাৎকার মূলক আয় এবং অন্যান্য দুর্নীতি এদের প্রতি সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিকে নষ্ট করেছিলো। অন্যদিকে পুরোনো সংস্কৃতির পাশে শাসকের আনুকূল্যে নতুন সংস্কৃতির ক্রমপ্রভাব সমাজকে আকৃষ্ট করেছিলো। একদিকে

৮৮। বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়; পৃঃ ২৯০।

যেমন নতুন আর্থনীতিক সমাজ কাঠামোর ভিত্তিরচনার কাজ চল্‌তে লাগলো, অন্যদিকে টোলের পাশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। সামাজিক কৌলীন্য নব্য-সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সংস্কৃতির এই ভঙ্গুর অবস্থায় প্রতিষ্ঠাগত বিরোধ হয়ে উঠেছে আরও সংঘাতমুখর।

আর্য সমাজ কাঠামো অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ছাড়া ছিলো আরও তিনটি ব .— ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্তিতে। কিন্তু দেখা যাবে, বাঙলাদেশে বিভিন্ন ধরনের যে জাত আছে, সেগুলোর মধ্যে নরগোষ্ঠী-গত, কোম-গত, জন-গত—যেদিক থেকেই ভাগ করতে যাই না কেন, আর্যকাঠামো অনুযায়ী বর্ণভাগ অসম্ভবপর হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে অতিব্যাবহারিক বৌদ্ধিক এবং কায়িক, প্রাতিষ্ঠিক বৃত্তিসম্পন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্তি দেখি উত্তম-সঙ্কর গোত্রবিভাগে। আবার সেই সঙ্গে উৎপাদনিক প্রাতিভবিক বর্ণেরও সাক্ষাৎকার মিলছে। এসব ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত সংগ্রামের জন্যে যে ভিত্তিগ্রহণ করা হয়, তা মূল্যহীন। বস্তুতঃ, দেখা যায়, বিভিন্ন জাতের পক্ষ থেকে স্বকপোলকল্পিত ঐতিহ্য রচনা করে তার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বলিষ্ঠতা আনা হয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধের অভাব ছিলো এই কারণে যে, বর্ণবিপর্যয়ের মূলে যে বৈবাহিক ব্যবস্থা দায়ী, তা পাত্রপাত্রীর স্বাধীন নির্বাচন ক্ষেত্রদানের অভাবে, স্বসমাজের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হয়েছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাঢ়দেশে রচিত। এই পুরাণে ব্রাহ্মণেতর জাতগুলোকে মর্যাদার দিক থেকে উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর এবং বর্ণাশ্রম বহির্ভূত অধম সঙ্কর জাতে ভাগ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও সৎ শূদ্র এবং অসৎ শূদ্র হিসেবে অব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজকে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণভাবে দেখা যায়, উত্তম সঙ্কর পর্যায়ের সম্প্রদায়কেই সৎ শূদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। কৈবর্ত ইত্যাদি দু-একটি জাতের সামাজিক মর্যাদা নিয়ে পুরাণ দুটিতে মতভেদ থাকলেও তাঁদের তালিকার মিল দেখে মনে হয়, ব্রাহ্মণেতর জাতগুলোর মধ্যে প্রধান দুটো ভাগ সমাজে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলো। প্রথমভাগের ছিলো জল-চলের অধিকার, আর দ্বিতীয়ভাগের ছিলো তার অনধিকার। জল-অচল সমাজকেও স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য—দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করা চলে। ব্রাহ্মণেতর জল-চল সমাজের মধ্যে রয়েছেন, কায়েত, বৈদ্য,

গন্ধবেনে, শাঁখারী, কাঁসারী, কুমোর, তাঁতী, কামার, চাষী, রাজপুত, নাপিত, ময়রা, বারুই, ছুতোর, মালাকর, তিলি এবং তামলী। জল-অচল সমাজে পড়েছেন,—সোনার বেনে, ধোপা, কলু, জেলে, শুঁড়ী ইত্যাদি। তাছাড়া তথাকথিত অন্ত্যজদের মধ্যে রয়েছেন, চাঁডাল, চামার, দুলে, মাল ইত্যাদি। জল-অচল সমাজের পাতিত্য বিপ্লবজনিত পাতিত্য এই যুক্তিতে উর্ধ্বগোত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির জন্যে আন্দোলন চালানো হয়েছে এবং সেখানে সাংস্কৃতিক সমস্যা প্রতিষ্ঠাগত বিরোধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বর্ণবণিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা হৃতমর্যাদা পুনর্লাভের যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে।[৮৯] কারণ তাঁদের পাতিত্য তাঁদের মতে বিপ্লবজনিত। মৎস্যসূক্তে বলা হয়েছে,—

"সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশ কালাদি বিপ্লবাৎ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ যস্ত ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ॥"

বস্তুতঃ, জাত সম্পর্কিত ঘৃণা ও বিদ্বেষই এই সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত বিরোধের সূত্রপাত করেছে। অবশ্য এই ঘৃণা বা বিদ্বেষের ইতিহাসও নতুন নয়। বাক্‌পারুষ্যে শাস্তিদানের বিধি বলতে গিয়ে বিষ্ণুসংহিতায় বলা হয়েছে, —"হীনবর্ণ আক্রোশনে ষড়দণ্ড্যঃ।"[৯০] উনবিংশ শতাব্দীর প্রাহসনিক দৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো এই বর্ণবিদ্বেষ।

বর্ণবিদ্বেষ যে শুধু ব্রাহ্মণেতর সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভাগের মধ্যেই ছিলো, তা নয়, ব্রাহ্মণ সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভাগেও এই বিদ্বেষ ও প্রতিষ্ঠাগত সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই চট্ট, বন্দ্য ইত্যাদি গ্রামের গাঞী বিভাগের পত্তন হয় বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের পাঁচটি গোত্রে প্রায় একশো ছাপান্নটি গাঞী-এর পরিচয় পাওয়া যায়। গাঞী-এর পরিচয়ে পরিচিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাগত বিরোধের মূল কুলজীগ্রন্থের স্বকপোলকল্পিত মাহাত্ম্যপ্রচার। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভৌগোলিক বিভাগে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ভাগ দেখা যায়। বৈদিক ব্রাহ্মণ নামকরণে বৈদিক বিশেষণে বিশিষ্ট হলেও ভৌগোলিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এঁরা দুভাগে বিভক্ত,—পাশ্চাত্য বৈদিক এবং দাক্ষিণাত্য বৈদিক। এছাড়া ছিলেন গ্রহবিপ্র

৮৯। সুবর্ণবণিকের উপনয়নের প্রয়োজন ও অশৌচ সম্বন্ধে বিচার—শিবচন্দ্র শীল : ১৩৩৬ সাল।
৯০। বিষ্ণু-সংহিতা—৫/৩৬।

সম্প্রদায়। এঁরা সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন না। শ্রোত্রিয়দের সঙ্গে এঁদের সামাজিক ব্যবহার সম্পন্ন হতো না। এঁদেরই এক শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। দেখা যাচ্ছে বৃত্তিগত মালিন্যেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সম্প্রদায়-গত পার্থক্য জন্মলাভ করেছে। ভবদেব ভট্টের প্রদত্ত ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ বৃত্তিগুলো লক্ষ্য করলে এঁদের পাতিত্যের কারণ বোঝা যাবে। তাছাড়া "কলুদোষ, কোচদোষ, হলান্তক দোষ, হেডাদোষ, রজকদোষ, বেড়ুয়াহাডিদোষ যবনদোষ, বিপর্যয়দোষ, বলাৎকার দোষ, ত্যাজ্যপুত্র দোষ, অন্যপূর্বাদোষ, কন্যাবহির্গম দোষ"[৯১] ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে সমস্যা এনেছিলো, তা কুলজী গ্রন্থগুলো পাঠ করলেই বোঝা যাবে।

এই সমস্ত সামাজিক মানকে নিয়ন্ত্রিত করেছে আর্থনীতিক অবস্থা। যথা অসৎ শূদ্রের কাছ থেকে দানগ্রহণ কিংবা লৌকিক পূজায় পৌরোহিত্য গ্রহণের মূলে ছিলো আর্থনীতিক চাপ। এই ভাঙনের মধ্যে নতুন করে কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার আবশ্যক অনুভব করেছে স্থিতিশীল সমাজ। বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করে কৌলীন্যের পার্থক্য দূর করে তুলেছে। এই কৌলীন্য প্রথা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই শুধু নয়, কায়স্থ ইত্যাদি ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়েছে। পরবর্তীকালে যৌন এবং আর্থিক দিক থেকে প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী উপাদানগুলো উপস্থাপিত করে এই কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠন করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠায় আমাদের সমাজে একদিকে চলেছে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ, অন্যদিকে চলেছে ব্রাহ্মণ, জল-চল, এবং জল-অচল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ। ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার প্রচলনের চেষ্টা, জল-অচল সম্প্রদায়ের জল-চল সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের প্রচেষ্টা আর্যসমাজ কাঠামোর স্বীকৃতি বটে, কিন্তু এর অর্থ স্থিতিশীলতার পোষণ নয়। গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে,—আর্য সামাজিক মর্যাদার অস্বীকৃতির মাধ্যমে নয়, স্বীকৃতির মাধ্যমেই নতুন সংস্কৃতিতে প্রবেশই ছিলো এই সব সম্প্রদায়ের প্রবণতা।

বর্ণের দিক থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত সমস্যা স্থিতিশীল এবং প্রগতিশীল

৯১। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ।

উভয় পক্ষেই দৃষ্টিকোণের সূচনা করেছে। প্রগতিশীলের পক্ষ থেকে নব্য সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠামানসে পুরোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠায় মর্যাদাপ্রাপ্ত উচ্চবর্ণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের দুর্নীতি নিয়ে মতবাদের সূচনা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে তাদের অবৈজ্ঞানিকোচিত রীতিনীতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে, তার পাশে স্বাভাবিক চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রাচীন সংস্কৃতিকে হাস্যকরভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও নব্য সংস্কৃতির অমানবোচিত দিকগুলো যেমন প্রদর্শন করা হয়েছে, তেমনি হীন সম্প্রদায়ের আধুনিক সমাজ কাঠামোতে উচ্চ আভিজাত্য অর্জনের চেষ্টা এবং অতীত সংস্কৃতিকে ভোলবার আপ্রাণ প্রয়াস কৌতুকের সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

বর্ণ, বংশ ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক বৃত্তির পাশে কতকগুলো দেশীয় আচার অনুষ্ঠান ছিলো। এগুলো সম্পর্কে যে চেতনা, তাও আমরা দেশীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে পারি। পূজা-পার্বন, আমোদ-প্রমোদ বেশ-ভূষা ইত্যাদি সম্পর্কে দেশীয় যে চেতনা ও বোধ, তার পাশে বিদেশী আচার ও রীতিনীতির পত্তনেও দৃষ্টিকোণ সংগঠক সাংস্কৃতিক সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমাদের সমাজের সমস্যা ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে মোটামুটি আলোচনা এখানেই শেষ করা উচিত। এটা সবারই জানা কথা যে, সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল সমস্যা আছে, এবং এগুলোর সংখ্যাও কম নয়। সঙ্কীর্ণ পরিসরে সেগুলোর আলোচনায় গ্রন্থকার শুধু অসমর্থ বলেই নয়, শতাব্দীর সাধারণ সমাজচিত্রের মাত্রানির্ণয়ে এসব আলোচনার অবকাশ থাকলেও সামষ্টিক প্রদর্শনীতে বেশি সূক্ষ্মতার প্রয়োজন নেই। তবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে মাত্রা-নির্ধারণে সেই সূক্ষ্মতা সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে—তবে সে-চিন্তার ক্ষেত্র 'প্রারম্ভিকা' নয়।

॥ বাংলা প্রহসনে সমাজচিত্রের অবকাশ ও ধারণ-সামর্থ্য ॥

পূর্বে আলোচিত 'প্রহসন ও সমাজচিত্র' প্রবন্ধটির অনুসরণে দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রহসনের মতো বাংলা প্রহসনেও সমাজচিত্রের অবকাশ সর্বত্রই, কিন্তু ধারণ সামর্থ্য এবং মাত্রাশুদ্ধির বিদ্যমানতা নিয়েই যা কিছু সমস্যা, তাই ক্ষেত্র-বিশেষের অধীন।

দৃষ্টিকোণ সংগঠন সমস্যাগুলোকে লেখক তাঁর বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট করে তুলে ধরবার চেষ্টা করে থাকেন। এই সমস্যাকে জড়িয়ে যে সামাজিক চিন্তাভাবনা

ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তাই সমাজচিত্র। এ ধরনের বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যাকে জড়িয়েই সমাজচিত্রের অভিব্যক্তি। কিন্তু চিত্র উপস্থাপনে সমর্থনপুষ্ট দৃষ্টিকোণ-সংগঠক-সমস্যাই উপযোগী। এই দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে লেখকের উদ্দেশ্য আবিষ্কার একটি প্রধান কাজ।

প্রহসনকার এবং পাঠকদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ ছিলো অতিরঞ্জনের বিরোধী। ফলে অনেক প্রহসনকারই পাঠকদের তুষ্টির জন্যে অসম্ভাব্যতার প্রতি বেশিদূর পদক্ষেপ করতে সাহসী হন নি। অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে সমাজের সমর্থন-পুষ্ট মত-অনুযায়ী এ সমস্ত প্রহসনে মাত্রাশুদ্ধি সম্পর্কিত নিরাপত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তারপর ধারণসামর্থ্য পর্যবেক্ষণ করবার একটি দিক আছে। প্রহসনকারদের মধ্যে সকলেই প্রহসনকে উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক নাটকের সঙ্গে অভেদ করে ধরেছিলেন। অথচ প্রহসন রীতিকেও তারা অস্বীকার করতে পারেন নি। কারণ উদ্দেশ্যমূলক নাটকের দেশীয় পরিচিত আঙ্গিক প্রহসন রীতি। প্রহসনের ধারণসামর্থ্যের অভাব প্রহসনকারকে উদ্দেশ্যমূলক ভূমিকা, প্রস্তাবনা, নান্দী, নামকরণ, মলাটলিখন এবং অকারণ গান ও কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত করেছিলে। এর মধ্যে দিয়ে প্রহসনে দৃষ্টিকোণের প্রকাশ বা ধারণসামর্থ্য বৃদ্ধি করবার ক্রমে প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে।

লেখকের উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়েই দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্য শুধু পরিণাম প্রদর্শনের মধ্যেই নয়, উপদেশের মধ্যে দিয়েও ব্যক্ত হয়েছে। "কর্মকর্তা" প্রহসনের আলোচনায় "আত্মদর্শন" পত্রিকা লিখছেন,—"শুষ্ক উপদেশ অনেক সময় দোষ সংশোধনে ব্যর্থ হয়। তাহার কারণ উপদেশের অযোগ্যতা নহে—লোকের প্রবৃত্তি। মানুষ সাধারণতঃ বিশুষ্ক উপদেশ চায় না। ভারতের সেদিন একসময়ে ছিল, যখন ভারতীয় মানব কেবল নীরস উপদেশের বশবর্তী হইতেন। সংস্কৃত প্রহসন ও 'হিতোপদেশের' সময়ে উপদেশ বড় শুষ্ক বলিয়া প্রতীত হয়। বিষ্ণু শর্ম্মা তজ্জন্য—

যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নতিস্তদিহ কথ্যতে॥

—বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন। যে ব্যক্তি নীরস উপদেশের অনুগত, তিনি কার্য এবং প্রকৃতিতঃ ইংরেজ। যিনি গল্পচ্ছলে উপদেশ মিশাইয়া দিলে শুনিতে

আপত্তি করেন না, তিনি ফ্রেঞ্চ। বলিতে কি এক্ষণে আমরা কার্যে ফ্রেঞ্চ। এই জন্যেই বক্তৃতা, নবন্যাস, নাটকাদির ন্যায় প্রহসনের সৃষ্টি।"[৯২]

দীর্ঘ উক্তিটি উপস্থাপনের সার্থকতা এই যে, বক্তব্যটির মধ্যে আমরা উদ্দেশ্য সাধনে প্রহসনের উপযোগিতা সম্পর্কে সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। "ডাক্তারবাবু" প্রহসনের ভূমিকাতে এ ধরনের উদ্দেশ্য প্রবণতার স্বীকৃতি আছে। প্রহসনকার "জনৈক ডাক্তার"[৯৩] লিখ্‌ছেন,—"এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে আমার নাটক বাস্তবিক নাটক হইল কিনা, আমি সে বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখি নাই, আমি কেবল ইহাই দেখিয়াছি যে, আমার নাটকে ঘটনা সকল প্রকৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি পাঠকদিগকে চমৎকার করিতে চেষ্টা করি নাই, কেবল সাবধান করিবার নিমিত্ত লিখিয়াছি। আমার রচনা পড়িয়া আমোদ হইতে না পাবে, কিন্তু উপকার হইতে পারিবে, ইহাতে রসোদয় হইতে না পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইতে পারে।"[৯৪]

ভূমিকা শুধু যে এভাবে মাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করেছে, তা নয়, লেখকের দৃষ্টিকোণের পরিধিও তুলে ধরেছে। "একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব" প্রহসনের ভূমিকায় বলা হয়েছে,—

> "বাঙ্গালার উন্নতিশীল নব সভ্যগণে,
> বাঁধিতে স্বজাতপ্রেম ডোরের বন্ধনে।
> উপহাস রূপ টুপি শিরের ভূষণ
> গড়িলেম্ "বাঙ্গালীসাহেব" নব্য প্রহসন ॥
> যদি কারো মস্তকেতে টুপি হয় ফিট্।
> হিণ্ট লয়ে শুধ্‌রে যাও হয়ে পড় টিট্ ॥"

ভূমিকা প্রহসনের অঙ্গীভূত নয়, কিন্তু ভূমিকার অবকাশ সৃষ্টিতে দৃষ্টিকোণের মাত্রা ও পরিধি দুইই নির্ধারণের চেষ্টা চলেছে।

দৃষ্টিকোণ আবিষ্কারে সমর্থ প্রহসনকারের উদ্দেশ্য সমূহ ভূমিকার অপ্রত্যাশিত অবকাশ ছেড়ে প্রস্তাবনারূপ প্রত্যাশিত অবকাশেও অভিব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য প্রস্তাবনা প্রথাস্বীকৃতিতেই প্রত্যাশিত। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে

৯২। আর্য্যদর্শন—কার্তিক, ১২৮৮ সাল পৃ: ৩২৯।

৯৩। ভুবনমোহন সরকার।

৯৪। কলিকাতা—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮২ সাল।

বাঙলাপ্রহসনের মধ্যে এই রীতি, তথা অবকাশের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। তারকচন্দ্র চূড়ামণি তাঁর "সপত্নী" নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের উক্তির মধ্যে দিয়ে বলেছেন,—"অতি প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই, তাহাতে নাট্যরস বিরস হয়।" কিন্তু এই বোধ প্রস্তাবনাক্ষেত্রে হারিয়ে ফেলে অনেকেই বক্তৃতার মাধ্যমে দৃষ্টিকোণের নগ্ন প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এমন কি নান্দী রচনাও হয়েছে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুপরিচিত প্রহসন "কুলীনকুলসর্বস্ব" প্রহসনের নান্দীটি স্মরণ করা চলে।

বাঙলা প্রহসনে উদ্দেশ্যধারণে সমর্থ হয়েছে প্রহসনের নামকরণ। প্রহসনের শিরোনামকে অনেকে প্রহসনের অঙ্গীভূত বলে স্বীকার করেন, আবার অনেকে করেন না। কিন্তু নামকরণের মধ্যে দিয়েই লেখক উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিকোণই প্রকারান্তরে সমাজচিত্রগ্রহণের সহায়তা করেছে। দেশ পত্রিকার ১৩৬৫ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সংখ্যায় নাটক-প্রহসনের নামকরণ সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে,—"নামকরণগুলোর মধ্যে দিয়ে মানস-ঐতিহ্য বা সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণই উদ্ধার করা যাবে। নামকরণ ব্যক্তিগত রুচি বা যুগ-রুচির পরিচয় বহন করে। বিশেষ করে নাটক-প্রহসনের মতো বস্তুগত সাহিত্যের নামকরণ সম্পর্কে সেটা বেশি বলা যায়। যাঁরা কিছু সচেতন, তাঁরা নামকরণের মধ্যেই কিছু বক্তব্য ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। উনিশ শতকে এই সচেতন ভাবটা বেশি ছিল বলেই বক্তব্যটা বেশি পাওয়া যায়।" (পৃঃ ৬৬৮)। প্রহসনের নামকরণ কখনো সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপকভাবে, আবার কখনো বা প্রশ্নাত্মকভাবে সম্পাদিত হয়েছে। উদ্দেশ্য-ধারণে একটি নাম অসমর্থ হলে বৈকল্পিক নামকরণও সম্পাদিত হয়েছে। সবিকল্পিক নামকরণসমূহ দৃষ্টিকোণ ও ধারণসামর্থ্য নিয়ে যথেষ্ট পরিচয় বহন করে

মলাটলিপি অর্থাৎ মলাটে কবিতারচনা বা উদ্ধৃতির অবকাশ সৃষ্ট অসন্তুষ্টির অপর একটি অভিব্যক্তি। কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী "চক্ষুঃস্থির" প্রহসনের মলাটে লিখেছেন,—

"গোলাম অধম যত আর্য্য জাতিগণ
না পারি সহিতে আর পর পদাঘাত।
ভণ্ডামি দেখিয়া কত সহিব যন্ত্রণা।
দেখে শুনে তাই আজি হলো চক্ষুঃস্থির॥"

আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের আগে আসরে গানের মাধ্যমে গ্রন্থপ্রচার

হতো। গদ্যে গ্রন্থপ্রচার সম্ভব ছিলো না বলেই পদ্যে বক্তব্য বিষয় লেখা হতো। এগুলো মুখে মুখে মুখস্থ আকারে বিস্তৃতিলাভ করতো। ছন্দাবেশের আকর্ষণ রচনাকে স্মৃতিতে ধারণে সহায়তা করে। পদ্যে মুখে ব্যাপক বিস্তৃতির আশা ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক প্রহসনকার পোষণ করেছেন। কারণ তাতে প্রহসনকার বিবৃত দৃষ্টিকোণের ব্যাপক সমর্থনলাভ সম্ভবপর হয়। এজন্যে অনেকে প্রথার ওপর নির্ভর করে, দৃষ্টিকোণের পরিধি উপস্থাপনে, গদ্যময় কথোপকথনের মধ্যেও উদ্দেশ্যমূলক আবৃত্তি বা গান অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলো সবই উপদেশাত্মক। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবার জন্যে কবিতা আবৃত্তিতে স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞানও প্রহসনে অনেক সময়ে হারিয়ে ফেলা হয়েছে। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "আচাভূয়ার বোম্বাচাক" প্রহসনে আহত মূর্ছিত রতিকান্তর সম্মুখে শ্রীহরির ছড়া অস্বাভাবিক।—

> "দূর শালা ! বাঙ্গাল পোলা ! তোরে দেখে লাগে তাক্।
> যাচ্ছিল প্রাণ যার জ্বালাতে তারেই আবার ডাক্॥
> নবাকালে সভ্য ছেলে করেন মুখে জাঁক।
> কালের গুণে মন আগুনে আমি পুড়ে হলেম খাক্॥
> মুলুক জুড়ে কলির চেলা. বেড়ায় লাকে লাক্।
> সাজে কুলাঙ্গনা—বারাঙ্গনা, তাই দেখে অবাক্॥"

স্বতন্ত্রভাবেও এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক কবিতা বা গান প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্য আরম্ভের আগে গানের অবতারণা—যেমন, "মাতালের জননী বিলাপ" প্রহসনে—

> "একি প্রাণে সয় কভু একি প্রাণে সয় !
> স্বর্ণ ভারতভূমি ছারখার হয়॥"—ইত্যাদি।

কোনো কোনো প্রহসনের শেষেও এমন গানের নমুনা পাই। "ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে" প্রহসনের শেষে—

> "বাইরে খায় নিত্য ঝাটা, গায়ে ফোস্কা হয় না।
> বাড়ীতে ফুলের টোকা, তাও প্রাণে সয় না॥"—ইত্যাদি।

অনেকক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক বেওয়ারিশ গানের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন "কাজের খতম্" প্রহসনের শেষে—

> দেশ হিতৈষী বাবুরা সব মাথায় থাক্।
> তাদের রীতিনীতি চুলোয় যাক্।"—ইত্যাদি।

সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে ভারত বাক্যের অবকাশ সৃষ্টিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে। সেই অবকাশটি প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ কথনেরই অবকাশ। বস্তুতঃ দৃষ্টিকোণ এবং মাত্রা দুদিক থেকেই প্রহসনে এই ক্ষেত্রগুলো অনুসন্ধানের সার্থকতা আছে।

সবশেষে "নাট্যোল্লিখিত" চরিত্রের নামকরণের প্রসঙ্গে আসতে পারি। চরিত্রের নামকরণেও অনেক সময়ে লেখকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। চরিত্রের নামকরণে বৃত্তির পরিচয় অনাধুনিককাল থেকে আমাদের সাহিত্যে চলে এসেছে।[১৫] বাঙলা প্রহসনেও এরকম উদ্দেশ্যমূলক নামকরণের সাক্ষাৎকার লাভ করি। "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" প্রহসনের অধর্মরুচি, বিবাহবণিক ইত্যাদি কুলীন ব্রাহ্মণের নামকরণ, অনৃতাচার্য প্রমুখ ঘটকের নামকরণ ইত্যাদিতে প্রহসনকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

বাঙলা প্রহসনে সমাজচিত্রের অবকাশ ও ধারণসামর্থ্য আলোচনায় প্রহসনকারের উদ্দেশ্যসম্পৃক্ত ক্ষেত্র বিষয়ে আলোচনাকেই প্রধানভাবে উপস্থাপনের কারণ এই যে, বাঙলা প্রহসনের ক্ষেত্রে কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং প্রথা স্বীকৃত জনিত যে বৈশিষ্ট্য সাধারণ প্রহসন থেকে বাঙলা প্রহসনকে পৃথক করেছে, সে বিষয়ে আলোচনাই এখানে যথেষ্ট। কারণ "প্রহসন" এবং প্রহসন ও সমাজচিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত বিষয়ের পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

১৫। "যষ্টি-মধু"—বৈশাখ, ১৩৬৬ সাল ; পৃঃ ২১।

সমাজচিত্র প্রদর্শনী

॥ মাত্রা-নির্ণয় পদ্ধতি ॥

প্রহসনে সমাজচিত্র অতিরঞ্জিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তাই প্রহসনের সমাজচিত্র প্রদর্শনী মাত্রারক্ষার মাধ্যমে এবং মাত্রা বিচারের মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়া উচিত। সমাজচিত্রে মাত্রার আপেক্ষিকতা নিয়ে মতভেদ থাকায় বাংলা প্রহসনের মাত্রারক্ষা ও মাত্রা বিচার নিয়েও মতভেদ থাকা অসম্ভব নয়। মাত্রার বাস্তবীকরণের ক্ষেত্র যা-ই হোক, অন্ততঃ অভিব্যক্ত বস্তুগত মাত্রাকেই স্বাভাবিক মাত্রা বলে মূল্য না দিলে মাত্রা বিচার অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতএব প্রহসনের মাত্রা বিচার করতে গেলে প্রহসনে প্রদত্ত মূল মাত্রা প্রদর্শনীতে বজায় রাখা উচিত ; এবং প্রহসনকারের উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি, সাংবাদিকতামূলক সমাজচিত্র এবং অন্যান্য সিরিয়াস রচনা দ্বারা প্রদত্ত প্রহসনের মাত্রাকে বস্তুগত দিকে যথাসম্ভব আকর্ষণ করা উচিত।

অধিকাংশ প্রহসনকারই প্রহসনের মধ্যে অথবা প্রহসন বহির্ভূত বক্তব্যে আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে থাকেন। উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থেকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবণতা এবং অতিরঞ্জনের ক্ষেত্রগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। সাংবাদিকতা মূলক রচনা দ্বারা স্বাভাবিক মাত্রা উপস্থাপিত করলে অতিরঞ্জিত ক্ষেত্রগুলোর মাত্রা বিচার সহজ হয়।

প্রহসনকারের উদ্দেশ্যসমূহকে কতকগুলো গোত্রে ভাগ করা যায়। যে সব ক্ষেত্রে প্রহসনকারের উদ্দেশ্যের অনভিব্যক্তি কিংবা উপযুক্ত সাংবাদিকতা-মূলক রচনার অভাব থাকে, তখন সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রহসনের মাত্রানির্ণয়ের ফলাফলের মধ্যে দিয়েই বিচার্য প্রহসনের মাত্রা নির্ণয় করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সূক্ষ্ম দিক থেকে এই ধরনের মাত্রা নির্ণয় নিরাপদ না হলেও অবৈজ্ঞানিক নয়। তাই মাত্রা নির্ণয়ের সুবিধার জন্যে প্রহসনকারের উদ্দেশ্যের দিকটি প্রধান মূল্য দিয়ে সমস্যাভিমুখীন দৃষ্টিকোণ সমূহকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে প্রদর্শনীকে সমস্যার দিক থেকেই ভাগ করতে হয়েছে। যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে ভাগ করার এ-ছাড়া আর কারণ নেই।

সাংবাদিকতামূলক রচনা নির্বাচন একটি দুরূহ কাজ। বিশেষ করে আলোচ্য ক্ষেত্রে আরও দুরূহ। কারণ গত শতাব্দীতে সাংবাদিকতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার যথেষ্ট অভাবে আমাদের দেশের তদানীন্তন তথাকথিত সাংবাদিকগণের

মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তিক প্রবণতা এসে সংবাদকে আচ্ছন্ন করেছে। আধুনিককালে সাংবাদিকতার স্বরূপ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিক প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকা সাংবাদিকের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু এই সম্পর্কে অন্ততঃ যতোটুকু প্রচেষ্টাও সাংবাদিকের থাকা উচিত, উনবিংশ শতাব্দীর সাংবাদিকতার সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো অনুসন্ধান করলে তার খুব কমই পেয়ে থাকি। কিন্তু অভাবের ক্ষেত্রে এগুলো গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

পরিশেষে, serious রচনার মাত্রাস্থিতির কথায় আসা যাক্। বলা বাহুল্য, এর মাত্রাস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের কিছুটা অবকাশ আছে। সিরিয়াস হলেই যে মাত্রা বস্তুগত থাকে, এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তীব্র satire মূলক রচনাও serious, কিন্তু মাত্রাতিরেক লক্ষণীয়। এসব ক্ষেত্রে অস্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক বস্তুগত রচনাকে গ্রহণ করা নিরাপদ। অবশ্য serious রচনা ও প্রবন্ধের মূল্য যে শুধু বস্তুগত মাত্রাস্থিতিক্ষেত্র নির্ণয়েই প্রয়োজন—তা নয়, এই সমস্ত রচনাসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাত্রা তুলনামূলক আলোচনা করে প্রহসনেতর রচনা সৃষ্টিতে লেখকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারি। প্রত্যেক লেখকের উদ্দেশ্যের মূলে ঐতিহাসিক কারণ থাকে। তাই এসব থেকে ঐতিহাসিক কারণসমূহের সমর্থন পাই উদ্দেশ্যের ব্যাপক প্রকাশের ক্ষেত্রে। সমাজচিত্রের মধ্যে এগুলোর মূল্য কম নয়।

আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এই যে, বাংলাদেশে প্রহসনকাররা প্রহসন বলতে প্রায় সবক্ষেত্রেই সামাজিক প্রহসন বুঝেছেন! তাই মাত্রা নির্ণয় করে, শুধু প্রাপ্ত প্রহসনসমূহের বিষয়বস্তু উদ্ধারের মধ্যে দিয়েই সমাজচিত্র প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি পালন করা চলে। ব্যতিক্রম যে নেই—তা নয়। সে-সব ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণে আলোচনার অবকাশ বেশি। যথাস্থানে সে-অবকাশে গ্রন্থকার এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

॥ যৌন ॥

১। মদ্য পানাদি নেশা।

মদ্যপান পৃথিবীর সব জাতীয় সমাজেই বিদ্যমান থাকলেও আমাদের দেশে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলদের প্রশ্রয়ে এটা ব্যাপক এবং ভয়াবহ এতোটা হয়ে উঠেছিলো যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসন ইত্যাদির মধ্যে মদ্যপান এবং তার পরিণতির বর্ণনা একটা স্বাভাবিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। প্রহসনে হাস্যরস সঞ্চয়ে বুদ্ধিভ্রংশ দেখাবার একটা স্বাভাবিক পন্থা হিসেবে মদ্যপানের প্রসঙ্গ আনবার একটা সাধারণ অবকাশ থাকলেও মদ্যপানের আত্যন্তিকতা যে একটা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রহসনের মধ্যে দৃষ্টিকোণের সূচনা করেছিলো, তা অস্বীকার করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে মদ্যপান বেড়ে যাবার প্রচুর কারণ ছিলো। তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো এই,—(ক) ইউরোপীয়দের মদ্যপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ, (খ) প্রগতিশীলতার উত্তেজনা সঞ্জীবিত রাখবার উপায়, (গ) প্রত্যক্ষ কর্ম থেকে মুক্তির অবকাশ জনিত বিলাস, (ঘ) মদ্যের সুলভতা। অবশ্য সংসর্গ-দোষ, পীড়ামুক্তির উপায় গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ থেকেও যে মদ্যপানের বিস্তার ঘটে নি তা নয়। তবে মদ্যপানের কারণ সম্পর্কে এ যাবৎ যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাদের অনেকেই পূর্বোক্ত কারণগুলো দেখিয়েছেন। "সুলভ সমাচার" পত্রিকায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে বৈশাখ তারিখে একটি ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদিত হিসেব উল্লেখ করা হয়। তার মধ্যে দিয়ে মদ্যপানের ক্রমবর্ধমান হার লক্ষ্য করা যাবে।

মদের দোকানের সংখ্যা

	স্থান	১৮৬৮ খৃঃ	১৮৭০
১।	ঢাকা	১১৫	১৬১
২।	ময়মনসিংহ	৯৪	৩৮৪
৩।	ফরিদপুর	২৬	৫৫
৪।	শ্রীরামপুর	২	১৪
৫।	রামকৃষ্ণপুর	১	৮
৬।	চট্টগ্রাম	৫৯	৮২
৭।	বর্ধমান	১০৭	১২৫

আবার ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্পিরিট ও ড্রাগে যে ১৩৬৯৪২৮০ টাকা এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৫০৭৬৮৩০ টাকা শুল্ক আদায় হয়েছে,—এ সংবাদও পাওয়া যায়।[১]

১। The Gazette of India—29th January, 1881.

বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত তালিকাতে কলকাতার কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কলকাতায় মদ্যপানের মাত্রা স্বাভাবিক ছিলো। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন,—"কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায়, সেখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।"[২] প্যারীমোহন সেন রচিত "রাঁড ভাঁড মিথ্যা কথা তিনলয়ে কলিকাতা" নামে পুস্তিকায় একটি ছড়াতে আছে,—

"যেদিকে ফিরায় আঁখি সেইদিকে রাঁড।
মারামারি হুড়াহুড়ি টানাটানি ভাঁড॥
কেহ কার মেরে চূর্ণ করিতেছে হাড।
তবু সে না ছাড়ে রোক্ যেন হট্ট ষাঁড॥"

ভাঁড় অর্থে এখানে মদ্যপাত্রের কথার ইঙ্গিত করেছেন।

মদ্যপানের ব্যাপকতার মূলে প্রবৃত্তির তাড়না ছাড়া বিপরীত পক্ষের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের কথাও অনেকে স্বীকার করেছেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "আচার" গ্রন্থে বলা হয়েছে,—"রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করাই রাজপুরুষগণের লক্ষ্য। বর্ষে বর্ষে মদের দোকানের বন্দোবস্ত হয়, অর্থাৎ মদ্য বিক্রয়ের নূতন অনুজ্ঞাপত্র দেওয়া হয়। যে সমস্ত রাজকর্মচারী এই অবসরে আইন বাঁচাইয়া দোকানের সংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা প্রশংসাভাজন হন।" টেম্পল সাহেবও এ সম্পর্কে কিছুটা সমর্থন রেখে গেছেন। তিনি আরও বলেছেন,—"On the other hand it sustains a class of influential publicans, who have every incentive to encourage drinking among all those who are inclined to this indulgence."[৩] বিশেষতঃ কলকাতা ইত্যাদি শহরাঞ্চলে মদ্যপান বিস্তৃতির এটা প্রধান কারণ। একদিকে যেমন শহর, অন্যদিকে তেমনি পল্লীগ্রাম— দুইদিকেই মদ্যপানের ক্রমবিস্তারে সমাজ-হিতৈষীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

মদ্যপান আমাদের সমাজে কোনোদিনই মঙ্গলময় বলে বিবেচিত হয় নি। কারণ সন্তানার্থী সমাজ অসুস্থ সন্তান যেমন কামনা করে নি, তেমনি কামনা করে নি সামাজিক দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা। মদ্যপানে বুদ্ধিনাশ হয়,—এতে দাম্পত্য বা সামাজিক সব রকম চুক্তিই ধ্বসে পড়ে। তাই সংস্কৃত শাস্ত্রবাক্যে

২। মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় ১২৬৬ সাল—পৃ: ১।
৩। India in 188C—Richard Temple Bart, G. C. S. I. & C. P-232.

মদ্য সম্পর্কিত নিষেধ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে,—"মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যঞ্চ।" বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে,—

"অদেয়ঞ্চাপ্য পেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেবচ।
দ্বিজাতীনাং অনালোচ্য নিত্যং মদ্যং ইতি স্থিতিঃ॥"

সুরা সম্পর্কে অধিকাংশ সংহিতাতেই বিস্তৃত নিষেধ আছে। উশনা লিখছেন,—

"সুরাপস্তু সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেৎ তদা।
নির্দ্দগ্ধকায়ঃ স তদামুচ্যতে চ দ্বিজোত্তম॥১২
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশ কৃদ দ্রবমেব বা
পয়ো ঘৃতং জলং চাথ মুচ্যতে পাতকাৎ ততঃ॥১৩
জলার্দ্রবাসাঃ প্রয়তো ধ্যাত্বা নারায়ণং হরিম্।
ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চার্থ চরেৎ তৎপাপশান্তয়ে॥"১৪[৪]

যম-সংহিতাতেও বলা হয়েছে,—

"সুরান্যমদ্যপানেন গোমাংস ভক্ষণে কৃতে।
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বিপ্রস্তৎপাপস্তু প্রণশ্যতি॥[৫]

আবার সংবর্ত-সংহিতাতেও আছে,—

"ব্রহ্মশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ॥[৬]

আমাদের সমাজ যদিও আর্যসমাজ নয়, তবু প্রাগ্‌বিপ্লব সমাজটি সম্পূর্ণ আর্য-আচার নির্ভর হয়ে বেঁচে ছিলো। এক্ষেত্রে তাই এই সমস্ত সংহিতাগ্রন্থ-সমূহের নির্দেশিত সামাজিক বিধিনিষেধের ব্যাবহারিক প্রযোগ একেবারে হীন ছিলো না। অবশ্য প্রাগ্‌বিপ্লব সমাজ বল্‌তে হিন্দুসমাজই বোঝায় না। তবে দেশীয় মুসলমান সমাজ কোর্‌আন্ শরীফ্‌-এর উপদেশে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ করেছে। বলা বাহুল্য মদ্যপান সম্পর্কে কোর্‌আন্ শরীফে স্পষ্ট নিষেধ আছে।[৭] মুস্‌লিম ফাওয়ায়েদে হজরত নেশার পানীয়কে হারাম বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি দশজনের ওপর লানত করেছেন; প্রস্তুতকারী,

৪। উশনঃ সংহিতা—৮ম।

৫। যম-সংহিতা—১১।

৬। সংবর্ত-সংহিতা—১০৮।

৭। কোর্‌আন্ শরীফ্‌—ছুরা মায়েদা।

প্রস্তুতকারক, পায়ী, পরিবেষক, পরিবেষণের লক্ষ্য ব্যক্তি, পানসংঘটক, বিক্রেতা, লভ্যভোগী, ক্রেতা, এবং ক্রয়ের আদেষ্টা ব্যক্তি সম্পর্কেই এই লানত আছে। (তঃ মঃ)। তাছাড়া আমাদের দেশের লৌকিক বাধানিষেধগুলোর সঙ্গেও মিলিয়ে আছে স্মৃতিগ্রন্থসমূহ। তাই এদেশীয় মুসলমানী সমাজেও এই স্মৃতি-গ্রন্থের পরোক্ষ ফল লক্ষিত হয়েছে।

এতো নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সুরাপানকে সম্পূর্ণ দমন করা স্মৃতিকারদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা অনেকক্ষেত্রে একে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে প্রচার করে গেছেন। মনু লিখেছেন,—

"ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"৮

যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মদ্যপানের বিধান দিয়েছেন উপায়ান্তরবিহীনভাবে। তিনি বলেছেন,—

"কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যশ্চাপি কথঞ্চন।
মদ্যমেবাসুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে॥"৯

অতএব দেখা যাচ্ছে যে পানাসক্তিকে সম্পূর্ণ রোধ করা কখনোই সম্ভব হয় নি, কিন্তু সমাজের মঙ্গলের জন্যেই সুরাপানের প্রশস্তি অবশ্য তাঁরা করেন নি। সুরাপান নিরোধ প্রবৃত্তিবিরোধী এবং অবাস্তব—এই মত ভাগবতের মধ্যেও কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে।--

"লোকে ব্যবয়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু
জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তি রিষ্টা॥"১০

প্রশ্রয় এবং নিষেধের মধ্যে সমাজে মদ্যপান স্বাভাবিকভাবেই চলেছে—অন্ততঃ যাতে আমাদের সমাজে তীব্র ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ ও মতবাদ জন্মলাভের তেমন সুযোগ পায় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজে সুরাপানের অনিষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞান যে জাগে নি—তা নয়। W. E. Channing সুরাপানের থেকে জ্ঞানহীনতা আসবার

৮। মনুসংহিতা—৫/৫৬।

৯। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

১০। ভাগবত—১১/৫/১১।

দিকে মনোবৈজ্ঞানিক ও জীববৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়েছেন। Dawson Burns সুরাপানে মৃত্যুর খতিয়ানও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু স্বদেশে ও বিদেশে সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলন ঘটলেও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীসমাজে সুরাপানের ক্রম-বিস্তৃতি ঐতিহাসিক সত্য। উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রচারিত একটি গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে,—"There can be no doubt that healthy persons, capable of the fullest amount of mental and physical exertion without the stimulous of alcohol, not only do not require it, but are far better without it."[১১] অন্যত্র একটি বিশেষজ্ঞের আলোচনায় বলা হয়েছে,—"The authors (Parkes and Wollowicz) consider that the use of alcohol by healthy persons is unnecessary and may be injurious.[১২] কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যেই মদ্যপানের বাহুল্য লক্ষ্য করা গেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে তো বটেই। ডাক্তারদের মধ্যে মদ্যপান উনবিংশ শতাব্দীর একটা স্বাভাবিক রীতি ছিলো। তাই 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় একটি মন্তব্যে বলা হয়েছে,—"আমাদের দেশের লোকেরা মনে করেন যে ডাক্তার হইলেই মদ খাইতে হয়, কিন্তু বিলাতে কমবেশ ১৬৮ জন ডাক্তার একেবারে মদ খান না।"[১৩]

এদেশীয় ডাক্তাররা ব্যাপকভাবে মদ্যপান অভ্যাস করেছিলেন, অথচ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ব্রিষ্টলে ব্রিটিশ মেডিক্যাল্ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে সেক্রেটারী Dr. Ridge সুস্থ শরীরে ও পীড়িতশরীরে মাদকদ্রব্যের প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,—(a) Alcohol was not necessary to health. (b) It was of no importance as a food. (c) It did not sustain the bodily heat. (d) It was prejudicial to hard work. (e) To children it was especially injurious. (f) It lessened the duration of life and increased the liability to disease.[১৪]

১১। Hand Book of Therapeutics—7th Ed. P-329.

১২। A Biennial Retrospect of Medicine and Surgery, for 1872-73, p-464.

১৩। সুলভ সমাচার—৩রা ফাল্গুন, ১২৭৭।

১৪। The Lancet, 30th October, 1880.

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তক-পুস্তিকায় সুরাপানের বিরুদ্ধে বিদেশী আন্দোলন-সমূহ প্রচার করবার চেষ্টাও অধিকাংশক্ষেত্রে হয়েছে। বিদেশে সুরাপানের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে 'সুলভ সমাচার' একটি প্রস্তাবে লেখেন,—"সুরাদেবী আমেরিকাতে প্রতি বৎসর ষাটহাজার লোকের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। মদ্যপান রোগটী বঙ্গদেশে ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি হইতেছে। দিন দিন ইহা কত পরিবারকে অসহায় করিতেছে। কবে আমাদের বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে সাবধান হইবেন!"[১৫] উক্ত পত্রিকাতেই অন্যত্র "মদ্যপান" সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে,—"কোন দেশে দুর্ভিক্ষ মড়ক কিম্বা লড়াই হইলে হাজার লোক একেবারে মরিয়া যায় এবং কষ্টের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। কিন্তু এই সকল কারণ অপেক্ষাও সুরাপান অতিশয় প্রবল, উহাদের সমুদায়কে একত্র করিলে যত অনিষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা মদ খাওয়ার অনিষ্ট দশগুণ অধিক।"[১৬]

মদ্যপান সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে যে দৃষ্টিকোণের সূচনা হয়েছে, তাতে ইংরেজ শাসকদের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশানে হেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভায় 'বেঙ্গল ক্রীশ্চান্ হেরাল্ডের' সম্পাদক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন,—"মেং উড সাহেব ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যাহা যাহা ব্যক্ত করিলেন এবং তাহার যে প্রকার সৎফল-সমূহ দেখাইয়া দিলেন, তাহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে একটি বিষফল উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার নাম করিলে ফলগণনার সম্পূর্ণতা হইতে পারিত। সে ফলটি আর কিছুই না—পান দোষ।"

প্রহসনেও এ ব্যাপার নিয়ে কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের লেখা "ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে" প্রহসনে তারক ও মাধবের কথোপকথন উপস্থাপনীয়,—

"মাধব॥ পূর্ব্বকালের রাজারা মদ্যপদিগের দণ্ডবিধান করেন, ইংরেজ বাহাদুর এ বিষয়ে আরো প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেছেন, এদিকে যে প্রজারা অসার অকর্ম্মণ্য হয়ে এককালে যে উচ্ছন্ন হচ্চে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও কচ্চেন না।

১৫। সুলভসমাচার—৮ই অগ্রহায়ণ ১২৭৭ সাল।

১৬। সুলভ সমাচার—৬ই পৌষ, ১২৭৭ সাল।

তারক ॥ রাজপুরুষদের দোষ দিচ্চেন ব্রেথা। তাঁরা ত আর এমন কোন নিয়ম করে স্থান নাই যে, যে মদ না খাবে তাকে দণ্ডনীয় হতে হবে?"

ওপরের কথোপকথনে অবশ্য দোষারোপটুকু যতোটা প্রকাশ পেয়েছে, তাও রাজভীতিতে বলিষ্ঠতাশূন্য। কিন্তু কানাইলাল সেনের লেখা "কলির দশদশা" প্রহসনের একটি মন্তব্যে যথেষ্ট বলিষ্ঠতা আছে। প্রহসনটির অন্যতম চরিত্র দিগম্বরের উক্তি—"ওরে যে রাজ্যের রাজা স্বহস্তে প্রজাকে কালকূট বিষ এনে মুখে তুলে দেয়, হ্যাঁরে সে কি রাজা?"

উনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিত সমাজে মদ একটা স্বাভাবিক পানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের লেখা "সুধা না গরল" প্রহসনে রাজেন শম্ভু সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে,—"দেখ, শম্ভু আগে একজন নিরীহ বালক ছেল।... হাই সার্কেলে ইয়াকি দিয়ে বড়লোক হতে গিয়ে ঘোর মাতাল হয়েছে।" সাহেবদের মদ্যপানের দৃষ্টান্তে এ দেশীয় এক ধরনের প্রগতিবাদীর ধারণা ছিলো মদ্যপান জ্ঞানচর্চা ইত্যাদির পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ। রিচার্ডসন মদ্যপানের তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। (a) Stage of excitement (b) Stage of intoxication (c) Stage of Comar of True Apoplexy. ডাঃ এনেষ্টি প্রমুখ চিকিৎসকরা প্রথম Stage-এর মদ্যপানের আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন, তার ফলেই একধরনের প্রগতিবাদী মদ্যপানকে জ্ঞানচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। বাংলা প্রহসনে এই মতগুলোকে কটাক্ষ করা হয়েছে। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "বৌবাবু" প্রহসনে রামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছে,—"যাদের Lecture দিতে হয়, তাদের মদ না খেলে Stimulant হয় না, Brain-এ thoughts জমে না, Points সব arrange কত্তে পারা যায় না।" কিন্তু বুদ্ধিবর্ধনের জন্যে বুদ্ধিনাশের পথে পদক্ষেপ অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কী হতে পারে! মানুষ হওয়ার চেষ্টায় নতুন করে পশু হওয়ার দৃষ্টান্ত তাই সমাজে প্রাহসনিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। "সুধা না গরল" প্রহসনে তাই একটি ইংরিজী লাইনের আবৃত্তিতে বলা হয়েছে,—

"There shallow draughts intoxicate the brain.
And drinking largely sobers us again."

শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" প্রহসনে বৃষধ্বজও আবৃত্তি করেছে,—

"সুরার হও কিঙ্কর, বুদ্ধির হইবে জোর,
সুরাপদ না সেবিলে রহিবে পশুমতন।"

তথাকথিত 'হাইসার্কেল' থেকেই সুরাপানের ব্যাপক প্রচার হয়েছে, আর 'হাইসার্কেল' থেকেই প্রচুর সুরাপানবিরোধী সভার পত্তন হয়েছে। প্রতিষ্ঠাগত-ভাবে, আক্রোশে কিংবা কিছুটা বাস্তব কারণে "সুরাপান নিবারিণী সভার" ব্যাবহারিক মূল্য সম্পর্কেও অনেকের যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো। সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার দ্বারা যে কিছু ফল হয় না, তা নয়। ভারত সংস্কারক সভার "সুরাপান ও মাদক নিবারণ" বিভাগের মুখপত্র "মদ না গরল" নামে মাসিক পত্রিকাটির (১৭৬১ খৃঃ)"প্রত্যেক সংখ্যা হাজার খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতারিত হইত।" এ সবের ব্যাবহারিক মূল্য হয়তো কিছুটা ছিলো। কারণ, ১২৭৭ সালের ৬ই পৌষের 'সুলভসমাচার'-এর "মদ্যপান" সম্পর্কিত আলোচনা পাঠ করে কালনা থেকে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী সম্বলিত একটি খেদমূলক পত্র এক মাতাল "সুলভ সমাচার" সম্পাদকের কাছে পাঠান এবং সেটা ঐ বছরেই ৫ই মাঘ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশ পায়। ব্যবসায়গত উদ্দেশ্যে সম্পাদকের কারসাজি সম্পর্কে যদিও এক্ষেত্রে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক, কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে এতোটা অবিশ্বাস হয়তো অসঙ্গত। অবশ্য এ ধরনের সভাসমিতি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ভণ্ডামি প্রকাশেরও যে কিছুটা অবকাশ ছিলো, সেটা দীনবন্ধু মিত্রের লেখা "সধবার একাদশী" প্রহসনে ব্যক্ত হয়েছে।—

নকুল ॥ সুরাপান নিবারিণী সভা কচ্চে কি ?

নিম ॥ Creating a concourse of hypocrites.

নকুল ॥ না হে, এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েচে—মদ খাওয়া অনেক কমেচে।

নিম ॥ প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কমচে, গোপনে খাওয়া বাড়চে।

নেশাখোরের কৈফিয়ৎ সর্বদাই একটা উপস্থিত থাকে—তার পক্ষ থেকেই। তাই মদের উপকারের দিকটি সম্পর্কে দুর্বলতা প্রকাশ করাই তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। এই উপকার স্বীকার করেই সে যুগে দুর্বলতার ছিদ্র পথটুকু তৈরী করে রেখেছেন অনেকে। আবার অনেকে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উপকারের

দিকটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গেছেন। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা[১৭] "আক্কেলবাগ বা সুরা—সুধা না বিষ" নামে একটি পুস্তিকার আলোচনা করতে গিয়ে "অনুসন্ধান" পত্রিকায় আলোচক গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন,—"গ্রন্থকারের মত, ব্যবহারের দোষেই দ্রব্যবিশেষে উপকার ও অপকার সাধিত হয়; অর্থাৎ তাঁহার মতে ব্যবহারের দোষগুণেই মদের দোষগুণ।—নহিলে মদ কিন্তু দোষের নহে।"[১৮] অবশ্য পুস্তিকাকারের বক্তব্য নতুন নয়। "চিকিৎসিত স্থান" নামে সুপরিচিত গ্রন্থের ১২শ অধ্যায়ে অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। বক্তব্যে বলিষ্ঠতার সন্ধান পাওয়া যায় "সুরাপান কি ভয়ঙ্কর" নামক অজ্ঞাত লেখকের অজ্ঞাত খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তিকার[১৯] মন্তব্যে। ৮ম পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন,—"আর কোন কোন ব্যক্তি এরূপ কহেন যে শরীর সুস্থ জন্য ঔষধস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মদিরা পানে দোষ নাই, আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহার সময় আছে, নিয়মও আছে। হলাহল যে কখন কখন ঔষধ হয়, তাহা বলিয়া কি নিয়ত হলাহল পান করিয়া আত্মহত্যা হইতে হইবেক।" বাস্তবিকই ঔষধার্থে পানের অভ্যাস থেকেই মদ মানুষকে সম্পূর্ণ মাতাল করে তোলে। "সুলভ সমাচারে" লিখিত হয়েছে,—"কেহ কেহ বলেন যে—'এমন করে মদের বদনাম করা উচিত নহে। মদ খেলেই কি থানায় পড়িতে হয়? সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি অন্যায়; কিন্তু সমস্ত দিনে এক গেলাস খাইলে কি মানুষ একেবারে বোয়ে গেল, না তার টাকাকড়ি মান ধর্ম্ম ডুবে গেল? কতকগুলি গোঁড়া বৈষ্ণবের মত লোকেই মদকে সাপের ন্যায় ভয় করে, যেন এক ফোঁটা মুখে দিলেই অমনি ফোঁস করিয়া কামড়ায়। তাদের গোঁড়ামি ভাল লাগে না। তাঁহারা আরও বলেন বিলাতে কত বড় বড় সভ্য জ্ঞানী লোকেরা রোজ নিয়মিতরূপে মদ খান, তাঁহারা কি সব বদমায়েশ, না তাঁরা নরকের রাস্তায় যাচ্চেন? একটু একটু খেলে বাস্তবিক কিছুই দোষ নাই।' এরূপ কথা এ দেশের যুবা দলের অনেকের মুখে শুনা যায়। তাঁহারা এইরূপ স্পর্দ্ধা করে মদ খাইতে আরম্ভ করেন, ক্রমে তাঁহাদের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা সকলেই জানেন।"[২০]

১৭। প্রকাশকও অজ্ঞাত; মুদ্রক—উমাচরণ চক্রবর্ত্তী।

১৮। 'অনুসন্ধান' পত্রিকা—৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল।

১৯। পুস্তিকাটি ১৯শ শতাব্দীর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কপি আছে।

২০। সুলভ সমাচার—৬ই পৌষ, ১২৭৭ সাল।

শুধু মদ্যপানে নয়, অন্যান্য নেশাতেও সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলো। আফিম, চরস, গুলি, গাঁজা ইত্যাদি সমাজের স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে দিয়েছিলো। এই সমস্ত নেশার মূলে অবশ্য ব্যক্তিগত পীড়া উপশমের ইচ্ছাও কিছুটা হয়তো থাকে। কিন্তু তার চেয়েও প্রবল হয়ে দেখা দেয় সংসর্গ-দোষ। তথাকথিত বাহাদুরী বা কেরামতীর লোভ থেকেই তারা নেশার দাস হয়ে পড়ে। এভাবে তারা তাদের বুদ্ধিনাশ করে। "পশ্চিম প্রহসন" নামে প্রহসনের ভূমিকায় ১২৯৯ সালের বৈশাখে কুঞ্জবিহারী রায় লিখ্ছেন,—"নায়কের কিঞ্চিন্মাত্রায় আফিম ও চরস সেবন নিবন্ধন যদ্যপি পাঠক কহেন 'যে নেশাখোর লোকের এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? তবে পুস্তক লেখা কেন?' তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে নায়ক সে নেশাখোর নহেন। যাঁহারা যৌবনের প্রাক্কাল হইতে অভ্যাসের বশীভূত হইয়া অথবা কোন কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিঞ্চিৎ মাদক-দ্রব্য সেবন পূর্ব্বক দৈহিক বা মানসিক অসুস্থতা দূর করেন, আমাদের নায়ক তাঁহাদের দশজনের মধ্যে একজন।"—এসব ক্ষেত্রেও বুদ্ধির যে নাশ হয়, তা প্রহসনটির পরিণতির মধ্যে দিয়েই যথাস্থানে বোঝান যাবে। অর্থাৎ এঁদের মধ্যে অনেকের মতেই মাদকদ্রব্যের সামান্য অভ্যাসেও বুদ্ধিলোপ ঘটে।

পল্লীগ্রামে মদ্যপানের নেশা কলকাতা ইত্যাদি শহরের মতো ব্যাপক না হলেও, কতকগুলো সাধারণ হুজুগে উত্তেজনা সঞ্চারের জন্যে মাদকদ্রব্য সেবনের যে প্রাচীন লৌকিক প্রথা ছিলো, পরবর্তীকালে পল্লীগ্রামে মদ্যপানের ক্রমবিস্তৃতিতে সেই প্রথাই অনেকটা ভয়াবহভাবে দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে নাগরিক দৃষ্টান্ত অনুকরণ। বারোয়ারী পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে মদ্য, ভাঙ, বা সিদ্ধি, গাঁজা—ইত্যাদির নেশা পুজোর স্বাভাবিক শুচিতা যতোখানি নষ্ট করে তুলেছিলো, তার চেয়েও বেশি নষ্ট করে তুলেছিলো পাড়া-গাঁয়ের নির্মল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। শ্যামাচরণ ঘোষালের লেখা "বারইয়ারী পূজা" প্রহসনে শশী বলেছে,—"দেখ বৌ, আর বৎসরের বারইয়ারী পূজাই আমাদের এ সর্ব্বনাশের মূল। দাদা আগে মদ খেতে জান্তেন না, মদের উপর তাঁর দারুণ ঘৃণা ছিল। কেবল আর বৎসর বলিদানের সময় যখন মহাকালীর পাণ্ডারা মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে দাদাকেও দলভুক্ত করে নেয়।"

মদ্যপান একদিকে যেমন শহর এবং পাড়াগাঁ—দুইই দূষিত করেছে, তেমনি

মদ্যপানের ভয়াবহ ক্রমবিস্তৃতিতে সমাজের বালক এবং স্ত্রীলোকেরাও রক্ষা পায় নি। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এ ধরনের অনাচারে সমাজহিতৈষীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, কারণ স্ত্রীলোকদের মধ্যে আদর্শ রক্ষার মধ্যে দিয়েই জাতির মঙ্গল রক্ষা করা সম্ভবপর হয়। মদ্যপান থেকে স্বাভাবিকভাবেই অনাচার ব্যভিচারে রূপলাভের কথা কল্পনা করে প্রহসনকাররা তাঁদের দৃষ্টিকোণকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। জয়কুমার রায়ের লেখা "এঁরা আবার সভ্য কিসে" প্রহসনের অন্যতম চরিত্র রসরাজ পাড়াগাঁয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বল্‌ছেন,—"গাঁজাগুলি মদের ভয়ানক দৌরাত্মি হয়ে উঠ্‌লো। ছোট ছোট বালকগুলি পর্য্যন্ত মদ গাঁজার দাস হতে চল্লো। ইহাদের বিশ্বাস মদ গাঁজা না হলে কোনপ্রকার আমোদ-প্রমোদই জমকায় না।...বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে ও বিষাদে অন্তর অবসন্ন হয়ে পড়ে; কোন কোন কুলস্ত্রীও মদ-গাঁজার পূজা আরম্ভ করেছে।"

বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্যে যেমন বাবুয়ানার পত্তন, মদ্যপানের ব্যাপকতার মূলেও একই কারণ থাকা সম্ভবপর। শহরে শিক্ষা ও সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে মদ্যপান অত্যন্ত সাধারণ রীতি হয়ে উঠেছিলো। মুক্তির আনন্দে অনেক শিক্ষিতা স্ত্রীলোক শিক্ষিত বাবুদের অনুকরণে মদ্যপান অভ্যাস করেছেন, এমন একটা প্রাহসনিক কটাক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মদ্যপ স্বামীর প্রহারভীতিতে বা মন-রক্ষার্থে মদ্যপানের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। "মদিরা" নামে কলকাতা থেকে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার লেখক ভুবনেশ্বর মিত্র বলেছেন,—"কলিকাতায় কোন কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত লোক আপন স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক মদ্যপান করাইতেন এবং স্ত্রী তাহা অস্বীকার করিলে প্রহার করিতেন, লেখক ইহা পঠদ্দশায় জ্ঞাত হইয়াছিলেন।" সমাজে মদ্যপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা বিস্তারে অনেক লেখক খেদোক্তি করেছেন। ক্ষেত্রমোহন ঘটকের লেখা "কামিনী" নাটকের নায়িকা একজন পানাসক্তা বিবাহিতা স্ত্রী। পরপুরুষের গৃহে মদ্যপানে উন্মত্তা কামিনী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বল্‌ছেন,—

> "এই কি সেই লজ্জাবতী? থাকিতে দীপের
> দীপ্তি যেতে নিজ পতিপাশে আগে পাছে
> চায় নাহি চায় (পাছে থাকি অন্তরালে
> দেখে ঘোষে অপযশ লোক মাঝে) হেন
> যেই? কিম্বা সেই জাতি নারী, যারা থাকি

এক গৃহে একাকিনী ঢাকে হৃদি বাসে ?
সেই নারী বটে, কিন্তু মোহিত সুরায়
বারুণী অনলে বঙ্গ পুড়িল যে হায়।"

ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষালের লেখা "সমাজ সংস্করণ" নামে প্রহসনটির মধ্যেও অনুরূপ একজন পানাসক্তা স্ত্রীর বর্ণনা করেছে তারই স্বামী বনমালী।—

"গোপাল ॥ তোমার পরিবার কি এন্‌লাইটেণ্ড্ ?

বনমালী ॥ সে আমার বড দাদা। আমার কোনদিন এক ডোস্ হলেও হয় না হলেও হয়, কিন্তু তাঁর না হলে নয়। গত রাত্রের পূর্ব্বরাত্রে একটা মজা হইয়া গিয়াছে, গৃহিণী একটা পাথর বাটীতে আমাকে গোপন করে খানিকটা মদ ঢেলে রেখেছিল, এখন একটা ছেলে তাহা চিনির পানা বলিয়া পান করে, তাই দেখে ওয়াইফ্ গর্‌গর্ করিয়া মরে কেবল বলিতে লাগিল রাত্রে ঘুমোবো কেমন করে ?"

বনমালী "কি হয়েছে" বলে এগিয়ে গেলে স্ত্রী তা গোপন করতে যায়। একটা ছেলে অবশ্য ফাঁস করে দেয়—"ফলনা তোমায় লুকুয়ে পাথর বাটীতে করে মদ ঢেলে রেখেছিল, খোকা তাই খেয়েছে।" কাহিনীটি বর্ণনা করে বনমালী মন্তব্য করে,—"আমি সেই কথা শুনে হাসতে লাগলাম।"

মদ্যপানের পরিণতির ভয়াবহতার কথা শুধু ধর্মশাস্ত্রে নয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও বর্ণিত হয়েছে এবং যথারীতি সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশও আমাদের সমাজের হিতৈষীরা যথাযথভাবে দিয়েগেছেন। নিদানের টীকায় এ ব্যাপারে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাবে। উত্তরতন্ত্রের ৪৭ অধ্যায়ে তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—

"অবস্থশ্চ মদো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বো মধ্যোহথ পশ্চিমঃ ॥
পূর্ব্বে বীর্য রতিপ্রীতি হর্ষ ভাষ্যাদি বর্দ্ধনং।
প্রলাপে মধ্যমে হর্ষো যুক্তাযুক্ত ক্রিয়াস্তবা ॥
বিসংজ্ঞঃ পশ্চিমে শেতে নষ্ট কর্ম্ম ক্রিয়াগুণঃ।"

মদ্যপানের পশ্চিমাবস্থা রিচার্ডসনের Stage of comer of True Apoplexy-র মতোই ক্ষতিকর। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায় মদ্যপানের পরিণতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কালনা চরিত্র সংশোধিনী সভায় (অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রেভারেণ্ড গোষ্ঠবিহারী মাকর প্রতিষ্ঠিত) তারাধন

তর্কভূষণ ১২৯৭ সালে ধারাবাহিকভাবে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু ছিলো "সুরাপানের শারীরিক, নৈতিক ও সামাজিক ফলাফল।" এ বিষয়ে পরে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।[২১]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসনকাররাও এই পরিণতি প্রদর্শন করতে বিস্মৃত হন নি। এই সমস্ত বিবৃতির মূলে যে ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান ছিলো, তা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার বিক্ষিপ্ত সংবাদগুলোর মধ্যে থেকেই জানা যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা সংবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১২৯৭ সালের ৩১শে শ্রাবণের "অনুসন্ধান" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে আছে,—"ব্রজনাথ গাঙ্গুলী বাগবাজারে শ্বশুরবাড়ী গমন:পথে ট্রেনে প্রমত্ত অবস্থায় বালক একজনকে চুম্বন করিয়া গালের মাংস তুলিয়া লয়।"

মদে সাধারণ জ্ঞানকাণ্ড লোপের যে দৃষ্টান্ত প্রহসনে ব্যক্ত হয়েছে, তার সঙ্গে সংবাদটির মাত্রাগত পার্থক্য না থাকাই সম্ভব। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনের অন্যতম চরিত্র চন্নবিলেস তার বর্ণনায় বলেছে,—"আমরা উইলসনের হোটেল থেকে আস্‌ছি, একটা ভদ্র সন্তান দি কি কাপড়-চোপড় পরা, মদ খেয়ে নর্দ্দামায় পড়েচে, চদ্দিকে লোকে লোকারণ্য। বাবুটি ঠিক যেন পাত্‌কো ঝোলা সেজেছেন, তার ভেতরে আবার তখন কত রঙ্গ ভঙ্গ হোচ্চে, নর্দ্দামায় পড়েও বাবু যেন স্বর্গসুখ ভোগে আছেন, শেষে পোলিস্ সারজন এসে ঝোলায় তুলে দেবার হুজ্জুগ কোবেচে, পাহারাওয়ালা ঝোলা বাগাচ্চেন, বাবুটি নর্দ্দামা থেকে সারজনকে এমনি মিষ্টি করে বল্লেন,—You have no power. As now I am not under the control of the Jurisdiction but of the Justices of the peace. সারজন শুনে ভারি খুসি হোলো, বাবুটির বাড়ী জিজ্ঞেস কোরে, আপনি একখানি পালকির ভাড়া দিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।" সার্জেন্টের ব্যবহার সম্পর্কে মাত্রা বজায় রাখা না হলেও পূর্বোক্ত মাতাল চরিত্রটি অতিরঞ্জিত নয়।

মদের দোষেই মানুষের সব মহত্ত্ব নষ্ট হয়ে যায়—এই মতটিও "বারইয়ারী পূজা" প্রহসনে বিনয়ের স্ত্রী সুকুমারীর মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে।—"পাত্রের রূপগুণ, বিষয় দেখে বিবাহ দেওয়া, তা সকলই হয়েছিল। কুবের সদৃশ শ্বশুর,

২১। "সুরাপানের শারীরিক মানসিক নৈতিক ও সামাজিক ফল কি"—জ্ঞানধন তর্কভূষণ,—কলিকাতা, ১২৯৯ সাল।

ধনের ভাণ্ডার, গুণের সাগর। সকলে বলে—"আমার মেয়ের ডাকিনী সাকিনী ননদ"—বলে বড়ই ভয় পেয়ে থাকে, কিন্তু এমন সোনার ননদ পেয়েছি যে একদণ্ডের নিমিত্তও কখন কথান্তর হয় নি। সকলই ভাল হয়েছিল, কেবল আমার ভাগ্যদোষে সকলই মন্দ হল।"

অন্যগুণের অভাব-অবস্থার পরিবর্তন সম্ভবপর, কিন্তু মদ্যপানদোষ ক্রমেই সর্বগুণ নাশ করে। এবং শুধু তাই নয়, মদ্যপ যখন তার অবনতির পথে ছোটে, তখন তাকে রক্ষা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত প্রহসনেই সুকুমারী আরও বলেছে,—"মাতালদের প্রতি সদুপদেশ, আর বানরের গলায় মতির মালা—এ দুইই সমান। মাতালেরা যদি গুরুজনকে ভক্তি করবে, তাহলে এ সংসারে আমার মত অভাগিনীরা কেন কেঁদে কেঁদে বেড়াবে? মদই রাজা ছারখার করলে। মদের জন্যেই কত সরলা কুলস্ত্রীরা অকালে জলে অনলে উদ্বন্ধনে অথবা বিষপানে প্রাণত্যাগ করে দারুণ মর্মযন্ত্রনা হতে উদ্ধার হচ্ছে।"

সুকুমারীর মতে, মদ বেশ্যাসক্তিরও কারণ। সে বলে, তার দুই সতীন—মদ ও বেশ্যা। সতীনে সতীনে ভাব হয় না, কিন্তু মদ ও বেশ্যায় খুবই সম্ভাব। তার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় একটি মাতালের উক্তির মধ্যে। রাজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "কষ্টিপাথর" প্রহসনে উমেশ মাতাল তার গানে বলেছে,—

"সাফা বংশ স্থগে রোক্, লাগাও দুচার ঢোক
তর প্রাণ, তর মন, বিছাও মজলিস্।
নয় নিরামিষ, নিদেন একটা Miss
A couple for a kiss.
টারা-রা-রা বুম্-ডি-এ, Oh night, Oh bliss
রাত কি মজার চিজ্, এক ভয় পুলিস্॥

মদ্যপানে শুধু যৌন স্বাস্থ্যের দিকেই নয়, সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকেও ক্ষতির সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। এতে মানুষ যে তার শরীরের স্বাভাবিক পরিপুষ্ট পদ্ধতি নষ্ট করে ফেলে, সেটা প্রকাশ পেয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা "সধবার একাদশী"তে। জীবন গোকুলবাবুকে বলেছে,—"গোকুলবাবু, ক্রমে ক্রমে কি সর্বনাশ হয়ে উঠ্‌লো, আবাগের ব্যাটা মদ না খেলে আর আহার কত্তে পারে না—এখন ওরে মদ ছাড়তেই বা বলি কেমন করে? শেষকালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বসবে।"

বস্তুতঃ মদ যে অত্যন্ত ঘৃণ্য পদার্থ—এটা প্রকাশ করবার জন্যে প্রহসনকারেরা হীনবর্ণের ভৃত্য, মেথর, হরিজন, স্ত্রীলোক ইত্যাদির মাধ্যমে ঘৃণা ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা "দ্বাদশ গোপাল" নামে প্রহসনটির মধ্যে এরূপ মন্তব্য দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে।—

"৩য় স্ত্রী ॥ ঐ কালো মিন্‌সেটা মদ খেয়ে মাঝির ভাতের হাঁড়ী ছুঁয়ে দেচে, তাই—

৪র্থ স্ত্রী ॥ (বাধা দিয়া) তা' মুছলমানের হাঁডী ছুঁলে দোষ কি ? ওরা ত সগ্‌ড়ির বিচের করে না।

৩য় স্ত্রী ॥ নেই বা কোল্লে ;—তা বোলে কি মদ খেয়ে হাঁড়ী ছুঁয়ে দেবে ? মদ যে শূওরের বিষ্ঠে।

১ম স্ত্রী ॥ খুব হয়েছে—যেমন কম্ম তেম্নি ফল ! যেমন শূওরের গৃ, তেম্নি সায়েবের মু—।"

মাতালদের গানের মধ্যে পরিহাসমূলকভাবে অনেক প্রহসনকারই মদ্যপানের দোষ ব্যক্ত করেছেন। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা "চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা" প্রহসনের মধ্যে গোপাল আবৃত্তি করেছে,—

"গঙ্গা যদি একবার মদ হয় ভাই
টুপ্ টুপ্ ডুব দিযে ঢুক্ ঢুক্ খাই ॥
বাবু ভেয়ে এর তরে লাথি ঝাঁটা খায়।
এর তরে কত লোক হরিং বাড়ী যায় ॥"

পূর্বে উল্লিখিত "দ্বাদশ গোপাল" প্রহসনেও মদ্য প্রশস্তি করতে গিয়ে নন্দ আবৃত্তি করেছে,—

"একবার গলে উরে কফো বুক ফেল চিরে,
কফগুলো পুড়ে হ'ক খাক্ ,
তুমি দয়া কর যদি, এখনি নর্দ্দামা-নদী
পার হই মুখে মেখে পাঁক ॥
তোমার করুণা মিঠে, ছুঁচো যেন পুলি পিঠে,
মলমূত্র অগুরু চন্দন ;
পাহারাওলার রুল, পিঠে যেন পড়ে ফুল,
ফুলমালা দড়ির বন্ধন ॥"

নাটকের তথা প্রহসনের আরম্ভে অনেক প্রহসনকারই তাঁদের মূল বক্তব্য

বলে প্রহসনের মাত্রাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। যেমন রামচন্দ্র দত্তের লেখা "মাতালের জননীবিলাপ" প্রহসনের আরম্ভে নেপথ্যগীতিতে লেখক বলেছেন,—

"একি প্রাণে সয় কভু, একি প্রাণে সয়।
স্বর্ণ ভারত ভূমি ছারখার হয়॥
বিরূপাক্ষী সুরেশ্বরী, মায়াবিনী মায়া ধরি,
প্রবেশি ভারতপুরী, ঘটাইল দায়॥"

আবার নাটকের শেষেও এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর লেখা "চক্ষুঃস্থির" প্রহসনের শেষে যতীনের উক্তি—

"পুরুষের দশদশা মনে পড়ে মুখ ঘসা,
সাবাস্ রে সুরা তোর শক্তি চমৎকার।
কুহকে ভারতবাসী ভুলাইলি সর্ব্বনাশী
একেবারে চক্ষুঃস্থির বাপ্‌রে আমার।"

মদ্যপান ও অন্যান্য নেশাকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রহসন রচিত হয়েছে। বিশেষ করে মদ্যপানকে প্রহসনকাররা বেশি মূল্য দিয়েছেন। মদ্যপানের সঙ্গে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক—তিনপ্রকার সমস্যাই অত্যন্ত ভয়াবহভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু যৌন সমস্যাই সমাজে মুখ্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের সমাজের যৌন আদর্শ অর্থাৎ সুস্থ সন্তানের জন্ম, দাম্পত্য শান্তি ইত্যাদি মদ্যপানে ধ্বসে পড়ে। তাছাড়া আধুনিক যৌনবিজ্ঞানগত যৌনানুভূতি বিশ্লেষণের বিশিষ্ট মত গ্রহণ করেও মদ্যপানাদি নেশাকে যৌনসমাজচিত্র প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত করা হয়েছে। বস্তুতঃ 'যৌন' শব্দটিকে সাধারণ অর্থের চেয়ে অনেকটা ব্যাপক করে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। 'যৌন' শব্দটির পরিবর্তে 'দৈহিক' শব্দটি আরোপ করলে এই ব্যাপকতা কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

প্রথা স্বীকৃতিতেই হোক, অথবা বাস্তব কোনো কারণেই হোক, প্রায় প্রতিটি প্রহসনেই মদ্যপানের বিষয় আছে। তাই এদিক থেকে প্রহসন নির্বাচনে যথেষ্ট অসুবিধা থাকতে পারে। বিশেষ করে মদ্যপানের দিকটির মূল্য দিতে গেলে সমাজের অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে প্রাপ্য মূল্য দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই, শুধুমাত্র মদ্যপানাদি নেশার সমস্যাই যে সব প্রহসনে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর থেকে কিছু প্রতিনিধিমূলক প্রহসনের বিষয়বস্তু যথাযথ মাত্রায় বজায় রেখে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করা হলো। প্রহসনে কাহিনী মুখ্য নয়। কিন্তু

বিশেষ ক্ষেত্রে আবর্তিত প্রহসনগুলোর মধ্যে একটা পরিণতি থাকে। তাই কাহিনীরস অযথা নষ্ট করবার চেষ্টা করা হয় নি।

সুধা না গরল (১৮৭০ খৃঃ)—জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার॥ লেখক তাঁর গ্রন্থের মলাট পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য অনেকটা পরিষ্কার করেছেন। প্রথমটি Charles Johnson-এর উক্তি—

"O, when we swallow down
Intoxicating Wine, we drink Damnation ;
Naked we stand the sport of mocky friends
Who grin to see our noble nature Vanquished,
Subdued to *beast* !"

দ্বিতীয়টি Othello থেকে,—

"O than men should put an enemy in
their mouths to steal away their brains !
that we should with joy, revel pleasure
and applause transform ourselves
into *beasts*."

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার উদ্ধৃতি দুটির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মদ্যপ মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি নামকরণের মধ্যে দিয়েও দেখিয়েছেন যে, মদ্য প্রকারান্তরে গরল ছাড়া কিছুই নয়। নাটকের শেষে সরোজিনীর আবৃত্তির মধ্যে দিয়েও লেখকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।—

"হায় কেন পোড়া মদ ধ্বংসের কারণ
প্রবেশিলি দেশ মাঝে ; কেন রে এমন
করিলি হৃদয়নাথে পাষাণ হৃদয় ?
অবলার প্রাণে হেন দুঃখ নাহি সয়।
সবার লতায় ফলে বিষময় ফল।
জানিবে সুরারে নাথ, সুধা না গরল।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি পত্রিকার নামকরণে এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের নামকরণে[২২] গ্রন্থকার সূচিত বক্তব্যের সামাজিক সমর্থন আছে।

২২। 'সুরা—সুধা না বিষ'—মুদ্রক, উমাচরণ চক্রবর্তী।

বরানগর সুরাপান নিবারিণী সভায় চন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক পঠিত একটি কবিতা ১২৭৯ সালে "কি ভয়ানক !!!" নামে এক পুস্তিকারূপে প্রকাশ পায়। তার শেষ স্তবকে (পৃঃ ৬৩) লেখক বলেছেন,—

"সুরা আর বিষধরে তুলে কোন্ জন রে
যারে সর্প দংশায়, প্রাণে মারা যেই যায়,
হের কত জন গেল সুরা দংশনে রে।"

বস্তুতঃ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার প্রহসনটি রচনা করেন।—

"নট॥ এখন সকলে কেবল আমাদের নিমিত্ত অভিনয় দর্শন করেন, নাটকের ভাব গ্রহণ করেন না, এমত স্থলে বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি।

সূত্রধার॥ এমন কথা বোলো না, যাঁদের সামাজিকতা আছে, তারা অবশ্যই নাটকের উদ্দেশ্য বোঝেন।"

কাহিনী।—উকিল বিধুবাবু গর্ব করেন, তাঁর মতো Civilized আর Prejudice-শূন্য লোক এ অঞ্চলে নেই। তিনি বলেন,—"দেখ আমি ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েছি, হিন্দুদের দেবতা মানি না, চাচাদের দোকানে রুটি খাই। Prejudice-গুলো root out না কল্লে দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গল হবে না। These are the noxious weeds of Society." বিধুবাবুর ইয়ার রামেশ্বর কিন্তু বলে,—"ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া, কেশব সেনের সমাজে নাম লেখান, মুসলমান ও উইলসনের দোকানের বিস্কুট খাওয়া, আল্‌বার্ট ফেসনের টেরিকাটা, হাফ্ ইষ্টাকিং পায়ে দেওয়া, এক নেকটি টাউনে এলেই তোমাদের দেশের ছেলেদের হয়ে থাকে। হাজার লেখাপড়া শেখ, তোমরা সেই 'বাইবাভরী' কেশাপবীর পায়ের চুচা।" বিধু প্রতিবাদ করে বলেন যে তিনি তাঁর ৪ বছরের বিধবা বোনের বিয়ে দিয়েছেন। তার সন্তানও আছে।

ইতিমধ্যে গণেশ ডাক্তার আসে। রামবাবুর মদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া তার স্বভাব হলেও বিনা দ্বিধায় সে মদ্যপান করে। "নিজে খাই তার জন্যে তত হানি হচ্চে না, দেশশুদ্ধ লোক যাতে না উচ্ছন্ন যায় তাই আমার ইচ্ছা,—আর দেখ ডুবে জল খেলে শিবে টের পায় না।" গণেশ ডাক্তারও নিষ্কলঙ্ক নয়। স্ত্রীর সঙ্গে তার "দা কুমড়োর সম্পর্ক", কিন্তু বোসেদের বউয়ের সঙ্গে সে মজেছে। বোসেদের বউ—"Full 16, রসের লঙ্কা পায়রা।" সে সধবা হলেও স্বামী না থাকারই মধ্যে, বেশ্যালয়ে পড়ে থাকে। বিধুবাবু নিজের

স্ত্রীকে মদ খাওয়া অভ্যাস করিয়েছেন। কিন্তু নিজে সংস্কারমুক্ত বলে যতোই জাহির করুন না কেন, স্ত্রীকে ইয়ারদের সামনে আন্‌তে চান না। "ঘরের মাগ্‌ কি খেম্‌টাওয়ালী? যদিও আমি তাকে সার্কস, ম্যাজিক ও থিয়েটর দেখ্‌তে নিয়ে যাই, কিন্তু তা বলে তারে দশ ইয়ারের কাছে বসে ইয়ার্কি দিতে allow কর্ত্তে পারি নে।"

অবিনাশবাবু ও রাজেনবাবু এ দেশে শরীর চর্চার অভাব নিয়ে নানান আলোচনা করেন। বলেন, এজন্যেই দেশের দুর্দশা। শম্ভু আসে। তার মতে, সাহেবদের মতো মাংস না খেয়ে শাক-ভাত খেয়ে ব্যায়াম করা চলে না। জাতির উন্নতির জন্যে শম্ভুদের নাকি চেষ্টার অন্ত নেই। তাদের club আছে। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধেই অবশ্য তাদের মত। তাদের Secretary-র মত, "লেখাপড়া শিখ্‌লে ব্যভিচার দোষটা বাড়বে, কারণ—little learning is a dangerous thing". একথা শুনে রাজেনবাবু বলেন,—"যে বেশী মুখস্থ কর্ত্তে পারে সেই University-তে shine কর্ত্তে পারে। ওতে solid knowledge-এর তত দরকার নেই।" শম্ভু কাজের অজুহাতে চলে যায়। অবিনাশবাবু ও রাজেনবাবু ভদ্র যুবক। তাঁরা শম্ভু সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। এমন সময় অবিনাশবাবুর জ্যাঠ্‌তুতো ভাইকে পড়াবার জন্যে কমল-মাষ্টার আসে। আজ সে মদ্যপান করে মত্ত অবস্থায় এসেছে। সেটা নিজে বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়ে পালায়। ইতিমধ্যে কমলের এক ইয়ার কমলকে খুঁজতে আসে। শালীনতা-বোধহীন ব্যবহার সুরু করে দেয় সে। অবিনাশবাবু তাকে গলাধাক্কা দেওয়াবার ব্যবস্থা করেন। তারপর দেশের অবস্থা নিয়ে দুঃখ করেন। মদ দেশের সর্বনাশ ডেকে আন্‌ছে। শেষে আবার তাঁরা ব্যায়ামের প্রসঙ্গে আসেন। বলেন, এ ব্যাপারে কারও চাড়ও নেই, চাঁদাও কেউ দেবে না। "তুমি যদি থিয়েটার কর্ত্তে পার এখনি তুমি ২০০ সবস্ক্রাইবার পাবে। সব্‌স্ক্রিপ্‌সনের জন্যে যার বাংলা স্কুলের একখানা খোলার ঘর হতে পাচ্ছে না।"

এদিকে গণেশ ডাক্তার বায়নাকুলার নিয়ে বোসেদের বাড়ীর ছাদে তার প্রেমিকাকে দেখ্‌তে চেষ্টা করে। বিধু আর শম্ভু এমন সময় ডাক্তারখানায় আসেন। তাঁদের দেখে গণেশ অপ্রস্তুত হলেও উপস্থিত বুদ্ধিতে সেটা কাটিয়ে ওঠে। সে বলে,—"ডাক্তারিতে কত সুখ তাত জান্তে পাল্লে না? সকলেরই অন্তঃপুরে অব্যাহত গতি; স্ত্রীরত্ন দেখে দেখে চক্ষুর উদ্ধার হয়ে গেছে, পুনর্জন্ম

আর হবে না।” তারপর যথারীতি ডাক্তারখানাতেই মদ্যপান চলে। বিধু বলেন,—“যাঁদের মদটা চলে, গণেশদাদা তাঁদের একপ্রকার ফ্যামিলি ডাক্তার বল্লিই হয়।” গণেশ বোসেদের বাড়ীর পাশের দত্তদের বাগানে বোসেদের বউকে নিয়ে কার্য-নিষ্পত্তি করবে। লোক দিয়ে সে এই ব্যবস্থা করিয়েছে। তবে তার বড়ো ভয়, এক সোনার বেনের মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করতে গিয়ে একবার সে খুব জব্দ হয়েছিলো। ইতিমধ্যে ডাক্তারখানায় খবর আসে ননীবাবুকে ননীবাবুর স্ত্রী স্বয়ং মদ অবস্থায় কী খাওয়াতে কী খাইয়েছেন—তাঁর অবস্থা খুব serious। সবাই তাই শুনে উঠে যায়।

বিধুবাবুর বৈঠকখানায় খুব মদ্যপান চলে। নলিনবিহারীকে নিয়ে শম্ভু এসেছে। নলিন এককালে থিয়েটারে অ্যাক্ট করতো—হিরোইনের পার্ট নিয়ে। তাকে গোলাপী বেশ্যার substitute করে মাতলামি চলে। নলিন খুব অল্প-বয়সী ছেলে। বিধু বলেন,—“বাবা নলিনী থাকতে মেয়েমানুষ না হলেও চলে।” এমন সময় গোলাপী আসে। ছোকরা ছেলেটিকে দেখে তাকে বলে,—“বাবু, তোমাকে দেখলে বড়লোকের ছেলে মনে হয়। বিধুবাবু, এমন দুগ্ধপুষ্যি ছেলেটির কেন মাথা খাচ্ছ?” তারপর গোলাপীর গান সুরু হয়। বিধুবাবুর ইয়ার রামবাবু কথাপ্রসঙ্গে শম্ভুকে বলে, সে স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে হয়েও বসে গেছে। রামবাবু তার কারণ জিজ্ঞেস করলে শম্ভু বলে,—“বাবা চিরকালটাই যদি লেখাপড়া করে মর্ব্বো, তবে ইয়ার্কি বা কবে করবো? আর বড় লোকের সঙ্গে মিশে reputation-ই বা gain কর্ব্বো কবে?” এদের মদ্যপান এবং বেশ্যার নাচগান চলছে, এমন সময় দেভেল কোর্থটাচার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় আসেন। তিনি দেখলেন—এ ফচকে ছোকরাটা তাকে চেনে, এখানে মদ খেলে ঢাক বাজিয়ে দেবে। আবার হেড মাস্টারের কানে গেলে চাকরী নিয়ে টানাটানি। “আজকাল সময় পড়েছে কদর্য্য, হিপক্রিট না হলে কাজ চলে না।” মধুবাবু জনান্তিকে বিধুবাবুকে বলেন, তিনি এখানে মদ খাবেন না, একটু আড়ালে গিয়ে খাবেন। তারপর সকলের সামনে মদের প্রতি তার বিরাগের কথা তোলেন। তবে জানা গেলো যে, মধুবাবুও গোলাপীর পূর্বপরিচিত। গোলাপীই সেকথা প্রকাশ করে। বিধুবাবু মধুবাবুকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে যান।

একদিকে এ ধরনের দুষ্কর্ম চলে, অন্যদিকে রাজেনবাবু অবিনাশবাবু দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। যে ব্যায়ামের ব্যাপারে তারা উৎসাহ

প্রকাশ করেন, সে-ব্যায়ামেরই কয়েকটি বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তাঁরা মন্তব্য করেন। ব্যাযাম বিদ্যালযের দলরা প্রায় যাত্রার দল হয়ে উঠেছে। "কোন ভদ্রলোকের বাড়ী রাস হলো, কি দোল হলো, কিম্বা কোন পুজো হলো, বাবুরা খুটিটুটি পুতে রাত্রে সাজ পরে ব্যাণ্ডের সঙ্গে এক্ট কর্ত্তে আরম্ভ কল্লেন।" আমাদের physical exercise সর্বদাই morality-র সঙ্গে থাকা উচিত। মদ্যপানের কথা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, হিন্দুসভার সভ্যদের মধ্যে অনেকে "বিড়াল তপস্বী" হযে মদ্যপান করে। ব্রাহ্মসমাজেও এরকম প্রচুর আছে। বিবাহের দুর্নীতি নিয়েও আলোচনা হয়। অবিনাশ বলেন, "আমাদের দেশে ত বে করা নয, বে দেওযা।" রাজেন বলেন,—"নিজে দেখে শুনে যে বিয়ে করা উচিত, তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যার সঙ্গে চিরকাল একত্র বাস কর্ত্তে হবে, যার উপর আমাদের সমুদায় সুখ নির্ভর করে তাকে স্বচক্ষে দেখে বিবাহ করা উচিত। পিতার ইচ্ছাতে বিবাহ বহু বিবাহের কারণ। বহু বিবাহ যে কীদৃশ অনিষ্টকর তা বলা যায না। পিতার ইচ্ছাতে বিবাহ পাতিব্রত্যের কণ্টকস্বরূপ, ভ্রূণ হত্যার আকর, বেশ্যাসক্তির হেতু, নানাবিধ কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক।" তারপর বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রাজেন বলেন, "অপক্ক বীজে কখন সতেজ বৃক্ষ জন্মাতে পারে না।" ঐক্যের অভাব, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি এসে দেশকে নষ্ট করে ফেলেছে। যেমন শম্ভু একজন ইউনিভার্সিটির শাইনিং স্কলার। কিন্তু তার মধ্যে বিনয নেই, সকলের কাছে superiority ফলাতে যায। হাই-সার্কেলে ইযার্কি দিয়ে বড়লোক হতে গিয়ে এখন ঘোর মাতাল। মদ মানুষের স্বভাবও নষ্ট করে। কমলমাষ্টার ঘড়ি চুরির দাযে ধরা পড়েছে। বিধুবাবুও কিছুদিন আগে মারা গেলেন—একরকম অকাল মৃত্যু। গণেশডাক্তার অবশ্য জব্দ হয়েছে। সেদিন বোসেদের বাড়ী বদমাযেসি করতে গিয়ে প্রহার খেযে দেশ ত্যাগ করেছে।

এদিকে শম্ভুর স্ত্রী শম্ভুকে মদ-বেশ্যা ছাড়তে বলে। কিন্তু শম্ভু তাতে কান না দিযে স্ত্রীর রতনচূড় চায। "বসন্ত" নাকি কলকাতায় নাচতে যাবে, তারজন্যে দরকার। স্ত্রী সরোজিনী কান্নাকাটি করে। শম্ভু তখন অধৈর্য হয়ে স্ত্রীর পিঠে লাথি মেরে রতনচূড় নিযে প্রস্থান করে। স্ত্রীটি এতে ছটফট করতে করতে মারা যায়।

মাতালের জননী বিলাপ (কলিকাতা-১৮৭৪ খৃঃ)—রামচন্দ্র দত্ত॥[২৩]

২৩। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত।

প্রহসনকার ভূমিকা বা মলাটলিপির মধ্যে দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ করে যান নি। নাটক শেষে নেপথ্যে একটি গান আছে। তার শেষের দিকে বলা হয়েছে,—

"বলের পরিচয় দিয়ে, করে মায়ের অপমান।
হয়ে সভ্য চূড়ামণি, অসভ্যের শিরোমণি
সভ্যতার শিরে বজ্র করিলে পতন ॥"

মদ্যপান সভ্যতার নামে অসভ্যতা ; মদ্যপানে বুদ্ধিনাশ হয়। এতে অন্যান্য দিক থেকে সর্বনাশ তো হয়ই, এমন কি মায়ের প্রতি সাধারণ দায়িত্ব কর্তব্য মমতা শ্রদ্ধা—সবই নষ্ট হয়ে পড়ে। জননীর দৃষ্টিকোণটি তুলে ধরে মাতালের চালচলন চিন্তাভাবনার গতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে মাত্রানির্ণয় এই প্রহসনের ক্ষেত্রেও চলে।

কাহিনী।—হরিশবাবু কলকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক। এককালে অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে তাঁর জানা-শোনা ছিলো। এখন তিনি ঘোর মদ্যপ। তবে মাঝে মাঝে সমাজে গিয়ে বসেন অবশ্য। তাঁর একজন ইয়ার আছেন। তিনি এটর্ণি। তিনিও একই পথের পথিক।

হরিশবাবু হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি মদ খাবেন না। ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি দশ পনরো বার একই প্রতিজ্ঞা করেছেন, কিন্তু তিনি রাখ্‌তে পারেন নি। তবে গতদিন মদ খেয়ে উলঙ্গ হয়ে তিনি রাস্তায় নেচেছেন, এজন্যে তাঁর মনে অনুশোচনা এসেছে। এটর্ণি এসে এ সব শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন, কিন্তু হরিশবাবু প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন। বলেন, নিজেও খাবেন না, কাউকে খেতেও দেবেন না। কিন্তু বেশ্যাবাড়ী যাওয়া সম্পর্কে এখন তিনি কিছু বল্‌তে পারছেন না। তবে আজকালের মতো তিনি যাবেন না। আজ শনিবার অর্থাৎ মধুবার—একথা এটর্ণি তাঁকে জানিয়েও প্রতিজ্ঞা ভাঙাতে পারেন না। এমন কি ব্রাহ্মসমাজেও নাকি তিনি যাবেন না। "এটর্ণিবাবু, আমি ও বাটাদের মত মুখ্যু নৈ, লোকের কাছে বলে বেড়াবো এ কর তা কর কিন্তু আপনি সে দিক দিয়ে যাবো না—আমাকে তেমন পাও নি।"

এটর্ণিবাবুর খুব একটা রোজগার নেই। নিজের সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে বলেন, —"আমরা ফাঁকি দিয়ে উকীল হয়েচি—লেখাপড়া যত জানি তা ত জানই—দশ পনেরো বছর উকীলের বাড়ী ঘুরে ঘুরে একরকম সকলের সঙ্গে আলাপ

করে নিয়েছিলুম—যোগাড় করে পাস্‌টা হয়েছি—তোমার কাছে বল্‌তে কি ভাই মোকদ্দমার কিছুই বুঝি নি—তবে একটা দোকান ফেঁদে বসে আছি——ছখানা একখানা চিঠিফিটির খদ্দের আসে।”

তৈরী উড়িয়া চাকর মদের বোতল গ্লাস নিয়ে এসে ঘরে ঢোকে। হরিশ তাকে সে সব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল্‌লে এটর্ণিবাবু বারণ করেন। হরিশ এটর্ণিকে মদ ছুঁতে বারণ করলে এটর্ণি বলেন,—“আর ছুঁতে দোষ কি, আমি ত আর খাচ্চি নি।” অবশেষে বলেন, আজ খাই, কাল থেকে প্রতিজ্ঞা করবো। বাধ্য হয়ে সম্মতি দিলেন। হরিশের চোখের সামনে এটর্ণি মদ্যপান স্থরু করে। হরিশের অন্তরের মধ্যে ছট্‌ফটানি স্থরু হয়। তিনি ভাবেন, “··কিন্তু কেমন করেই বা খাই—এখনি এত দিব্বি ফিব্বি কল্লুম. দিব্বি ফিব্বি কিসের! —তবে কিনা লজ্জা লজ্জা কচ্চে—লজ্জাই বা কিসের? আর কারোর কাচে ত বলি নি··” ইত্যাদি দ্বন্দ্ব কিছুক্ষণ ধরে চলে। তারপর লজ্জাসরম বিসর্জন দিয়ে তিনি মদে চুমুক দিলেন। এটর্ণিকে আশীর্বাদ করে তিনি কালীকীর্তন গাইতে স্থরু করে দিলেন।—

“ওমা কালি কাত্যায়ণী
যিনি ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥
সাগর পারে জন্ম তোমার. তুমি মা মাতালেশ্বরী।”—

তারপর দুজনে গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে কামিনী-বেশ্যার বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

হরিশবাবুর অধঃপতন এইভাবে দিন দিন চরমে উঠেছে। একদিন হরিশ কামিনীর বাড়ী যাবার আগে তাঁর মা সাবিত্রীর কাছে কিছু টাকা চাইলেন। সাবিত্রী বলেন, টাকা তিনি দেবেন.—কিন্তু হরিশের কোথাও যাওয়া চল্‌বে না। আগে সকলে হরিশের প্রশংসা করতো, কিন্তু এখন সবাই ছি-ছি করে। হরিশ চটে গিয়ে বলে ওঠেন,—“বেশ করবো। আপনার পয়সা দিয়ে মদ খাবো, রাস্তায় ল্যাংটা হোয়ে নাচবো, রাঁড়ের বাড়ি পাঁচজন ইয়ার নিয়ে মজা করবো।” সাবিত্রী টাকা দিতে অস্বীকার করলে হরিশ মাকে বলেন যে, এবার থেকে মাইনের টাকা থেকে খরচের টাকা কেটে নিয়ে কামিনী-বেশ্যার কাছে রাখ্‌বেন। তারপর মার কাছে তিনি বলেন,—“মদ খাওয়া একটা সভ্যতার চিহ্ন, আর ডাক্তারেরা বলেন যে মদে অনেক উপকার করে।” মা জবাব দেন,—সভ্যতার নয়—অসভ্যতার চিহ্ন। “বাপ্‌কে শালা, মা-কে খান্‌কি, মাগকে মা মাসী

তুলে গালাগালি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেউর গাওয়া, দশজনের সাক্ষাতে ন্যাংটো হয়ে নাচা, খান্‌কির বাড়ী গান বাজনা করা, নর্দ্দমার পাঁকে ডুব দেওয়া; বাছা! এগুলো কি সভ্যতার কাজ?...ডাক্তারেরা পিপে করে মদ খেতে বলে না।”

ইতিমধ্যে নেপথ্যে হরিশের ইয়ার-বন্ধুর ডাক পড়ে। হরিশ আর থাকতে পারেন না। মাকে তিনি আরও তাগাদা দেন। অবশেষে মুখ-খারাপ করেন এবং মারের ভয় দেখান। সাবিত্রী তখন সিন্দুকের ওপর উঠে বসেন। আজ তিনি বেপরোয়া। হরিশবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন,—“চোপরাও, তোর বাবার কি!” এই বলে পদাঘাত করে মাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে হরিশ উধাও হন।

হরিশের চরিত্র কেমন করে এমন হলো, তা তিনি ভাবতে গিয়ে আক্ষেপ করেন। আগেকার দিনের হরিশের ছবি তার মনে পড়ে। চোখ তার সজল হয়ে ওঠে। তিনি বিলাপ করেন। “মদ কি আমার সর্বনাশ করবার জন্যে ইংরেজেরা এনেছিল, ইংরেজেরা না দেশের রাজা!—এ যে রাজার সাক্ষাতে দেশ খেয়ে ফেল্লে, রাজার কি বল নেই, কামানের কি জোর নেই যে দমন কর্ত্তে পারেন—হায় এমন দিন কবে হবে—যেদিন সকলে মদ গরল বলে আর ছোঁবে না!”

এই এক প্রহসন (কলিকাতা ১৮৮১ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত॥ মদ্যপান জীবনের স্বাভাবিক ধারাকে নষ্ট করে জীবন দুঃখাবহ করে তোলে, প্রহসনকার সমাজচিন্তায় দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন প্রসঙ্গে এই মত প্রচারে প্রবণতা প্রকাশ করেছেন। পরিণতিতে মাতালবাবু এই জ্ঞান লাভ করেছে,—“সভ্যভাবে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে সত্যভাবে বিশুদ্ধ আমোদে দিনাতিপাত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যিনি এই প্রকারে কালাতিপাত করেন, তিনিই পৃথিবীতে যথার্থ সুখী।” ঊনবিংশ শতাব্দীতে মদ্যপান ইত্যাদির দ্বারা যে অস্বাভাবিকতা আমাদের জীবনে এসে পড়েছে, তার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে সামাজিক সমর্থন পেয়েছি। লেখক সমর্থন বৃদ্ধির দ্বারা সমাজচিত্রের মাত্রা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কাহিনী।—আফিসের কেরাণী বামাপদ দে মাথা ধরার নাম করে সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে গিয়ে বইয়ের দোকান দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁর বই কেনবার ইচ্ছা হয়। দোকানীর কাছে একটা নাটক চাইলে দোকানী “সধবার

একাদশী" বইটা দেখায়। বইটার দাম এক টাকা। আরো একটু সস্তা দামের চাইলেন তিনি। দোকানী এবার দেয়—"বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো।" নাম দেখে বামাপদ দোকানীকে জিজ্ঞেস করেন যে, লেখকরা বুড়োদের ওপর এতো চটা কেন? বুড়োরা বিয়ে পাগ্‌লা, না যুবকরা বিয়ে পাগ্‌লা? দোকানীর কাছে কি "বিয়ে পাগ্‌লা যুবো" বলে কোনো বই আছে? দোকানী তখন জবাব দেয় যে, ঐ নামে কোনো বই বাজারে নেই। দোকানী আরও কম দামের বই—"চোরের উপর চাতুরী" দেখালো,—দাম চার আনা। এমন সময় হলধর মল্লিক নামে আর এক কেরাণী "গোবিন্দ সামন্ত" নামে এক বইয়ের খোঁজে দোকানে এসে জানলো যে, সে-বই সব ফুরিয়ে গেছে। বামাপদবাবুর হাতে "চোরের উপর চাতুরী" বইটা দেখে সে মন্তব্য করে—Worthless—বইটা কেনা মানে বাজে পয়সা নষ্ট। হলধর বইটা কিনে নাকি আগুনে পুড়িয়েছে। বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে,—'স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ।' বামাপদবাবু বইটা কিনলেন না। দোকানী নিরাশ হলো। যাবার সময় হলধর তার ঠিকানা দিয়ে বামাপদবাবুকে সেখানে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে

হলধর বামাপদবাবুকে নির্দিষ্ট স্থানে আসবার জন্যে লিখে ছলো। হলধর 'পান্না' নামে এক বেশ্যার কাছে গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে সে বেশ্যার তোষামোদ করছিলো। মদের ঝোঁকে তার পা পর্যন্ত ধরেছে। এমন সময় বামাপদ ও তার ইয়ার রামসেবক সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর সকলে মিলে মদ্যপান করেন। একটা সভা কল্পনা করে নিয়ে বামাপদবাবু সভাপতি হয়ে পড়েন আর সবাই হয় শ্রোতা। বক্তৃতা দিতে দিতে মদের ঝোঁকে বামাপদবাবু কাহিল হয়ে পড়েন। একটা কাগজের টুকরোয় কি যেন লিখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পান্না ও হলধর তাড়াতাড়ি টুকরোটা সংগ্রহ করে নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখলো।

বামাপদবাবু পান্নার বাড়ীতে অচেতন, এদিকে হলধর দুজন অনুচরকে নিয়ে বামাপদবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হলধর একটা পত্র তার হাতে দিয়ে গৃহিণীকে দিতে বলে। গৃহিণী কৃষ্ণপ্রিয়া চিঠিটা পড়ে দেখলেন যে, বামাপদবাবু লিখেছেন,—তিনি দুর্বুদ্ধিতা বশতঃ কোনো দুষ্ট লোকের সঙ্গে এক ভয়ানক জায়গায় এসেছেন। বিপদ উপস্থিত। নেশাতে তিনি আচ্ছন্ন। কৃষ্ণপ্রিয়া যেন সাবধানে থাকে। আর শেষ কথা, তাকে এক হাজার টাকার যে একটা তোড়া দিয়ে এসেছিলেন, তা

যেন সাবধানে রাখে। 'পুনশ্চ' দিয়ে তিনি আরও লিখেছেন যে, টাকাটা তাঁর নিজের নয়। এক মহাজনের। পত্রবাহকের হাতে ওটা যেন দিয়ে দেওয়া হয়।

বামাপদবাবুর স্ত্রী কৃষ্ণপ্রিয়া খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর সখী চিঠিটা পড়ে বুঝতে পারলো যে, ওপরের লেখাটা বামাপদবাবুর হাতের, কিন্তু 'পুনশ্চ' দিয়ে লেখাটা অন্য হাতের। অতএব চিঠিটা যে জাল—তাতে সন্দেহ নেই। সখী সরলা ঝি-কে নির্দেশ দিলো,—আগন্তুকরা যাতে পালাতে না পারে, সেজন্যে বৈঠকখানার দরজা যেন বাইরের থেকে বন্ধ করে দেয়। হলধররা আঁচ পেয়ে তখন পালিয়ে যায়। কৃষ্ণপ্রিয়া জানতে পারলেন যে, হলধর পালিয়েছে, তখন ঝি-কে বল্লো, তাকে ভেতরে রেখে ঝি বাইরের দরজায় তালা দিয়ে রাখুক। বামাপদবাবু এলে ঝি যেন বলে দেয়, দুর্বৃত্তরা এসে তাঁর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেছে।

বামাপদবাবু বাড়ীতে এলেন রাত্রে। এসে শুনলেন স্ত্রীকে নাকি কারা ধরে নিয়ে গেছে। তিনি অনুশোচনায় নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগ্‌লেন। পুলিশে খবর দেবেন বলে তিনি স্থির করলেন। ঝি তাঁকে আশ্বস্ত করে অন্ততঃ রাতটুকু ঘরে কাটাবার জন্যে বলে। বামাপদবাবু ঘরে স্ত্রীকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণপ্রিয়া তাকে বলেন,—"তুমি অপরাধ করেছ, মদ খেয়েছ, আর কোথায় গিয়েছিলে?" তারপর হলধরের দেওয়া চিঠিটা বামাপদবাবুর সামনে ধরলেন। বামাপদ চিঠি দেখে বল্‌লেন,—এ চিঠি জাল, জোচ্চোরের লেখা। তিনি তাদের দেখে নেবেন। আতঙ্কিত হয়ে বলে ওঠেন,—"লোটখানা ফাঁকি দিয়া লইয়া যায় নাই ত?" কৃষ্ণপ্রিয়া মাথা নাড়েন। কৃষ্ণপ্রিয়া স্থির করলেন, বামাপদবাবুকে এমন কিছু একটা করাতে হবে যাতে বামাপদবাবু ভুলেও আর সে-পথ না মাড়ান। বামাপদবাবু স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে শপথ করলেন—কখনোই তিনি ঐ পথে আর যাবেন না, মদ্যপান করবেন না। স্ত্রীর কথা শুনে চল্‌বেন। বামাপদবাবুকে দিয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া 'তিন সত্যি' করিয়ে ঐ রাতেই পুকুরে স্নান করে আস্‌তে বল্‌লেন। বামাপদবাবু শীতের রাত্রে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নান করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী এলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, ও পথে তিনি তো আর যাবেনই না, এমন কি কাউকে যেতেও দেবেন না।

মাতালবাবুর বৈঠকখানায় মাতালবাবু মদ্যপান করছিলো, আর তার

মোসাহেব মদের যোগান দিচ্ছিলো। বামাপদবাবু এলেন। মাতালবাবু বামাপদবাবুকে অভ্যর্থনা করে মদ্যপান করতে বল্‌লে বামাপদবাবু তা স্পর্শ করলেন না এবং বীতশ্রদ্ধ ভাব দেখালেন। মাতালবাবু এতে বিস্মিত হলো। বামাপদবাবু তখন নিজের সব ঘটনা খুলে বলেন। মাতাল জানে, নারী ছাড়া এ জীবনে অন্য সুখ নেই। নারী ছাড়া নর যে সুখী হয়—যে একথা বলে, সে প্রণয়ের মধুর ভাব জানে না। একথা শুনে বামাপদবাবু সেখান থেকে চলে যেতে চাইলে মাতালবাবু তার পথ আটকায়। বামাপদবাবু জিজ্ঞেস করে জান্‌তে পারলেন যে, মাতালবাবু সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়ে নি। তিনি বল্‌লেন, যাহোক মাতালবাবুকে তিনি যে কথাগুলো বলবেন, সেগুলো সত্য কিনা, মাতালবাবু যেন তার জবাব দেয়। এই বলে বামাপদবাবু আরম্ভ করেন,—

"সত্য সত্য সত্য ভাই! কিছু মিথ্যা নয়।
সত্যই বলিব আমি জানিহ নিশ্চয়॥

সত্য বলি তোকে, কত ছোঁড়া বই বিক্রি করে বেশ্যালয়ে যায়। বাগী নেই বলে বাপাজী কাঁদে। পরমধার্মিক রাঁড়ের উচ্ছিষ্ট মদ্য মধু মনে করে খায়। স্ত্রী-ধন রাঁড়কে দেয়,—ফাউল, মটন, ব্রাণ্ডি খায় আর রিফর্মারের ভান করে রেণ্ডী পোষে, ধর্মাধর্ম ভান করার স্বভাব হইতেছে। লক্ষ টাকা খরচ করে মুখে চূণ মাখে। রাঁড়ের সেবা করে এবং তাকে যদি টাকা দিতে দেরী করে তবে সে খ্যাংরা ঝাড়ে। সংসারে সত্যের তুল্য আর কিছু নেই অতএব সত্যপথে চল।"

বামাপদবাবুর উপদেশে মাতালবাবু নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে সঙ্কল্প করে, জীবনে সে আর কখনো এমন কুকর্ম করবে না।

প্রেমের নক্সা বা রগড়ের চাঁচি (কলিকাতা ১৮৯৯ খৃঃ)—বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়॥ গ্রন্থকার নামকরণের মধ্যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নি। একটা মলাটলিপি থাকলেও সেটির মধ্যে রস পরিবেশনের ইচ্ছাই জ্ঞাপন করা হয়েছে।[২৪] ভূমিকায় তিনি রচনাকে প্রহসন নামে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন,—"আমি বহু পরিশ্রমে ও অনেক যত্ন সহকারে এই সুরসিকপ্রিয় 'প্রেমের নক্সা বা রগড়ের চাঁচি' নামক প্রহসনখানি জনসমাজে বাহির করিলাম।" প্রহসনকারের 'যত্ন' ও 'পরিশ্রম' কতকগুলি সস্তা হাসির গল্পের একত্র সঙ্কলনে নিয়োজিত। একটি কাহিনীর মধ্যেই সস্তা সুপ্রচলিত কাহিনীগুলো

২৪। "ইতর তাপ শতানি"......ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোক।

ঘটনাকারে কিংবা ইয়ারের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং লেখক সর্বত্রই মাত্রাতিরেকের প্রবণতা দেখাবেন—বলা বাহুল্য। কিন্তু মূল কাহিনীটি অনুকৃত কোনো কাহিনীর উপস্থাপনা হলেও মদ্যপ পিতার উপযুক্ত মদ্যপ পুত্রের আচরণ এবং পিতার অবস্থা বিবৃতির মধ্যে কিছুটা সামাজিক সমর্থন পাওয়া যাবে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "অবাক কাণ্ড বা জ্যান্ত বাপের পিণ্ডদান" নামে অনুরূপ কাহিনীর একটি প্রহসনের ভূমিকায় বলা হয়েছে,—"সত্য ঘটনামূলক প্রহসন।" একদিকে গতিহীন জীবন, অন্যদিকে মুনাফাজনিত এবং অলগ্নীকৃত প্রচুর কাঁচা টাকা জমিদারশ্রেণীর নৈতিক মেরুদণ্ডকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছিলো, এবং যথারীতি সেই পাপের বীজ পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়েছে। বীজ সংক্রমণের দিকটি এই প্রহসনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

কাহিনী।—রমেশবাবু নেশাখোর জমিদার। চব্বিশ ঘণ্টা তার ইয়ারদের ভাঁড়ামির মধ্যে দিয়ে তিনি দিন কাটান। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে রাস্তার লোক ধরে এনে তাকে নিয়ে মজা করেন। ফট্টাই, ভাদুড়ি, হবির-খুড়—এরা সবাই মজার মজার কথা শুনিয়ে তাঁর সর্বক্ষণের অবসর বিনোদনে সহায়তা করে। নেশা সব রকমই চলে। পাওনাদারও তাই কম নয়। তাদের কৌশলে বিদায় দিতে তিনি অভ্যস্ত।

পদ্মলোচন একজন আশ্রয়চ্যুত ইয়ার মাতাল। তার ভাষায়—"রমেশবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকলে নেশা হয়। গাঁজা, গুলি, চরস, চণ্ডু, সেট্‌, মরফিয়া, বস্থ— এ সবার মদের বোতল শুদ্ধ কম্‌প্লিট্‌। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, রম্‌, জিন্‌, সেরি, সাম্পেন সব তাক তাক তাক্‌ তাক।" রমেশবাবুর খরচের প্রসঙ্গে সে বলে,— "রমেশবাবুর রোজ-পিছু নেশার বিষয়ে যা খরচ আজকালের বাজারে একটা কেরাণীর মাইনে তাও না। চব্বিশ ঘণ্টাই চোল্‌বে, নেশা কামাই নেই বাওয়া!"

বাপের উপযুক্ত পুত্র অঙ্গদ। তার সহচর হয় পদ্মলোচন। সহরতলীর রাস্তায় একদিন মত্ত অবস্থায় গান গেয়ে ফিরতে ফিরতে অঙ্গদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। রতনে রতন চিনে নিলো। পদ্মলোচনের শিকার—এধরনের পয়সালো লোকের বয়ে-যাওয়া ছেলে। অল্পবয়স্ক অঙ্গদের চোখে পদ্মলোচন মদ খেয়ে মানুষের নেশা জাগিয়ে দেয়। বন্ধু ব্রজলালের কাছে পদ্মলোচন একদিন নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছিলো—"আমি হোলুম আগোরপাড়ার মুকুটি বাচ্ছা।

দেখচো ত? চিরকালটা কাপ্তেন ধরে ধরে কাটালুম। কত বেটা আমিরের ছেলেকে ফকির কোরে বাগ্‌নাপাড়ায় পাঠালুম—তুমি কি জাননা ব্রজলাল!"

মেয়ে মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে পদ্মলোচন অঙ্গদকে নিয়মিত তথাকথিত প্রেমের জ্ঞান দেয়। অঙ্গদ প্রতিভাবান্। সে গুরুমারা-বিদ্যে আওড়ে পদ্মলোচনকেই অবাক্ করে দেয়।

এসব ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং বাবার কাছে হাত পাততে হয়। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। তাই সে বলে, পশ্চিমে বেড়াতে যাবার জন্যে তার টাকার দরকার। রমেশবাবু গোবর শুকিয়েই ঘুঁটে। তাই অঙ্গদকে ফিরিয়ে দেন। ইয়ারকে তিনি বলেন,—"দেখ্‌, ফট্টাই!—আমি অনেকদিন ঠাউরিচি যে, আমার অঙ্গদের রস বিদেচে!" ব্যর্থ মনোরথ অঙ্গদ বাধ্য হয়ে বাবার বালিশের তলা থেকে কিছু টাকা সরায়।

সামান্য টাকা কয়টি নিয়ে পদ্মলোচনের কাছে গেলে পদ্মলোচন দুঃখ করে—হাত বাক্সটা সরাতে পারলে ভালো করতে। হঠাৎ অঙ্গদের মাথায় ফন্দি আসে। সে বলে,—ভাগলপুরে তার বাবার একটা বিরাট তালুক আছে। সেখানকার প্রজারা খুব বশীভূত। সেখানে গিয়ে সে যদি রটাতে পারে যে তার বাবা কলেরায় মারা গেছে, এবং একটা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান যদি করতে পারে, তাহলে প্রজাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পাবে। পদ্মলোচন উপদেশ দেয়, শ্রাদ্ধশান্তির জন্যে কিছু কিছু খরচও করা চাই—নইলে তারা সন্দেহ করবে।

যাহোক বালিশের তলা থেকে পাওয়া সামান্য টাকা দিয়ে হুইস্কি কিনে নিয়ে তারা প্রমদা নামে এক বেশ্যার বাড়ীতে গিয়ে রঙ্গরস করে। আর এদিকে রমেশবাবু খেদ করেন—"আমার বেটা হাড় হাবাতে—কাঁচা বাঁশটায় ঘুণ ধরালি!"

অঙ্গদের বয়েস রমেশবাবু অনেকদিন আগেই পেরিয়ে এসেছেন। তিনি কোন্ সূত্রে যেন ছেলের ফন্দি ধরতে পারলেন। ইয়ারদের সঙ্গে নিয়ে তিনিও ভাগলপুর রওনা দিলেন।

বিরাট শ্রাদ্ধবাড়ী। পদ্মলোচন খাতাপত্র নিয়ে হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত। ওদিকে নিমন্ত্রিত লোকেরা আস্‌ছে যাচ্ছে। ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে টাকা পড়ছে। এক পাশে ভট্টাচার্যরা তামাক পোড়াচ্ছেন, বেয়ারারা তামাক সাজতে সাজতে হয়রান্ হচ্ছে। একদিকে একজন মেয়ে কীর্তনীয়া কীর্তন গাইছে; অন্যত্র

একজন দরবেশ সহকারীর সঙ্গে দরবেশী গান গাইছে। হাতে চামর, পায়ে নূপুর। অঙ্গদ লোকজনকে খাতির করছে।

হঠাৎ সদলবলে রমেশবাবুর আবির্ভাব ঘটে। বিপদ বুঝে অঙ্গদ তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে রটিয়ে দেয়,—দান পেয়ে তার বাবা প্রেতাত্মা রূপ ধরে আসছেন। খিড়কির দরজা দিয়ে সকলে ভঙ্গ দেয়। রমেশবাবু শ্রাদ্ধ স্থানে এসে দেখেন, সেখানে একটি বৃষকাঠ, গুচ্ছের আলোচাল, আর কলা দিয়ে পিণ্ডি চটকে তাঁর জন্যে রাখা হয়েছে।

দ্বাদশ-গোপাল (১৮৭৮ খৃঃ)—'জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামানী' (রাজকৃষ্ণ রায়)॥ মাহেশের দ্বাদশ-গোপাল দর্শনকে কেন্দ্র করে সেকালে বাবু সমাজের মদ্যপান ইত্যাদি অনাচার প্রকাশ পেতো। প্রহসনটি এই অনাচারকে ব্যঙ্গ করে রচিত। লেখক মলাটে পদ্যের মধ্যে মদ্যপানের দিকটি ইঙ্গিত করেছেন। মলাটে দুটি উদ্ধৃতি আছে। প্রথমটি,—

"Rosy Bacchus, give me wine,
Happiness is only thine" —Chatterton.

দ্বিতীয়টি,—

"ভোলারে ভুল না মাতা এই ভিক্ষা চাই।"—দীনবন্ধু মিত্র।

প্রহসনের শেষে বাউলের গানে উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।—

"তোদের মতন অনেক বদ্ ইয়ার
দ্বাদশ-গোপাল দেক্তে এসে, দেখে কারাগার,
তবু কি হয় না সরম? (ও শালারা!)
যা শালারা রসাতল।"

সমাজচিত্রের যথার্থতা অথবা লেখকের সমর্থিত দৃষ্টিকোণের প্রমাণ পাই মাহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রদত্ত চিত্রে। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"য় এক জায়গায় বলা হয়েছে,—"স্নানযাত্রা পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে।" এই আমোদের ইতিহাসও লেখক দিয়েছেন,—'পূর্বে স্নানযাত্রার বড় ধূমধাম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচখেলা হত, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতোর, কাঁসারি, কামার ও গন্ধবেনে মশাইরাই যা রেখেছেন, মধ্যে মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের দু-চার

জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোক্‌রাগোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।" আমোদের চিত্রটি লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন। "গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার, বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্‌ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো, রং, হাসি ও ইয়ার্কির গর্‌রা উঠচে, কোনটিতে খ্যাম্‌টা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন, মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুজোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাতুলি ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচ্চা গলায়— মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা পাতানো কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি কচ্চেন, বয়স ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'বাম'-কে 'আম' ও 'দাদা' ও 'কাকা'-কে 'দাঁদা' 'কাঁকাঁ' বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রংপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কররান, কিন্তু চক্র ধরে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও বেলা চারটে অবধি পুজো করেন। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্যোদয় দেখেচেন কিনা সন্দেহ।"

কাহিনী।—মাহেশ, বল্লভপুরের গঙ্গায় রবিবারের এক সকালে একটা নৌকো চলেছে। নৌকোয় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল ঘোষাল, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য আর জহরলাল পণ্ডিত—এই চারজন ইয়ার তিলোত্তমা নামে এক বেশ্যাকে নিয়ে চলেছে। নৌকোয় রয়েছে কতকগুলো মদের বোতল, টিকে, তামাক, হুঁকো, বাঁয়া, তবলা, মদের বাক্স, খাবারের চুপড়ী, কাঁচের গেলাস, ফুলের মালা, পানের দোনা ইত্যাদি নানা জিনিস। তাছাড়া দুই দাঁড়ী ও এক মাঝি তো আছেই। নন্দলালরা তিলোত্তমাকে নিয়ে দ্বাদশ গোপাল দেখতে এসেছে। নন্দলাল নিজে বাড়ীর শালগ্রাম শিলার সোনার পৈতে চুরি করে তিরিশ টাকায় বেচে কিছু মদ কিনেছে। হরলাল নিজের স্ত্রীকে মেরে একটা হার ছিনিয়ে এনেছে। মদ ফুরোলে এই হার বেচে সে মদ আনাবে। বিধুভূষণ Peley & Co-এ দেড়শো টাকা মাইনেতে কাজ করে, কিন্তু মাইনের সব টাকাই সে তিলোত্তমাকে দেয়। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা অনাহারে থাকে। তিলোত্তমা বাইরে ভালবাসার ভান দেখায় আর মনে মনে ভাবে, তার একমাত্র ভালবাসা টাকার ওপর। সে মনে মনে এদের সবাইকে বোকা বাঁদর ভাবে। যাহোক নন্দলাল বাক্স থেকে বোতল বের করে এবং সকলে মিলে মদ খায় আর মাতলামি করে। বিকৃত সুরে গান গায়। কথনো

কখনো তিলোত্তমাকে জড়িয়ে ধরে ভালবাসা জানায়। বিধু হঠাৎ রবার্ট বার্ণসের Bonny Peggy Alison থেকে Quote করে চেঁচিয়ে ওঠে,—

"I'll kiss thee yet, yet
And I'll kiss thee o'er again ,
And I'll kiss thee yet, yet,
My bonnie Peggy Alison !"

'our' হবে কি 'my' হবে তাই নিয়ে বিধুর সঙ্গে হরলালের ঝগড়া বাধে। শেষে সেটা দাঙ্গায় পরিণত হয়। নন্দলাল আর জহরলাল ঠেকাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। নন্দলাল বলে,—"থাঃ শালারা ঝগড়া করে মর, আমি আমার কাজ গুছিয়ে নিই।" নন্দলাল বোতল ওড়াতে আরম্ভ করে। মাঝিরাও দাঙ্গা থামাতে পারে না।

গঙ্গার ধারে এক পুলিশ ইন্‌সপেক্‌টার দুইজন পাহারাওয়ালাকে নিয়ে দাড়ায়। ইন্‌সপেকটার হেঁকে বলে,—"এই মাঝি ! ইধর নাও হাটাকে লাও।' একেবারে ধারে নৌকো আনা অসুবিধে, তলায় ভাঙা। যা হোক, বাবুরা একে একে নেমে পড়ে। বিধু আর হরলালকে ইন্‌স্‌পেকটার আগে পাহারা-ওয়ালার হাতে দেয়। সঙ্গী জহরলাল পণ্ডিত "হিন্দুস্থানী কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ" বলেও রেহাই পায় না। তার মুখেও মদের গন্ধ ছিলো। জহরলাল বলে,—"সঙ্গ্ দোষমে মেরে এই দো হুয়া।" তাকেও বাঁধা হয়। তিলোত্তমা কাঁদতে কাঁদতে বলে,—"আমি কিছু করিনি, সাহেব ! আমি মাহেশে ডোয়াডশ গোপাল ঠাকুর দেক্তে এসেছিলুম, সাহেব।" ইন্‌স্‌পেকটার মন্তব্য করে,—"এই চারজন বুঝি টোমার ডোয়াডশ গোপাল বাবাঠাকুর !" তিলোত্তমাকেও পাহারাওয়ালার হাতে দেওয়া হয়। নৌকোর ভেতর মদের বোতল, তামাক, হুঁকো, বাঁয়া তবলা ইত্যাদি যা যা ছিলো এসবগুলো থানায় নিয়ে যেতে হয়। মাঝিদের দিয়েই এগুলো বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সাহেব তাদের অভয় দেয়, কিছু তাদের করবে না। সাহেব মন্তব্য করে,—"টোম্ রাসকেল লোক বরষ বরষ ইহা আয়কে ইসিটরে কি বড়্‌মাসী করটা হ্যায়। টোম লোকরা মাফক আওর আওর ডোয়াডশ গোপাল ডেক্‌নেকে লিয়ে মাহেশমে আটা হ্যায়, লেকেন শালা লোককো ঠাকুর ডেক্‌না খালি মুঃ কি বাট হ্যায়। শালা লোক হিণ্ডু হোসকে, ঠাকুরা পাশ রেণ্ডী নাচওয়াতা আওর দারু পিটা হ্যায়। এই ক্যা টোমলোককো হিণ্ডুয়ানী !!"

চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা (কলিকাতা—১৮৫৮ খৃঃ)—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সিমুলিয়া) ॥ মদ্যপান ইত্যাদি নেশাকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি রচিত হলেও ভূমিকা বা প্রস্তাবনায় সে ধরনের কোনো উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয় নি। ভূমিকায় তিনি বলেছেন,—"ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে কলিকাতা সহরের অধিকাংশ লোক* স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত বিরত। যাহা হউক অধুনা নানাপ্রকার নাটক ও পুস্তকাদি বঙ্গভাষায় রচিত হওয়ায় এবং সেই সকল নাটকের অভিনয় হওয়াতে বোধ হয় বঙ্গবিদ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর প্রচলিত হইবে তাব সন্দেহ নাই।"[২৫] প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলেছে,—"এক্ষণে কতকগুলীন নব্যসভ্য বাবুগণ বঙ্গবিদ্যার প্রচালনা না করিয়া ইহাকে নির্ম্মূল করণার্থ যত্নবান হইয়াছেন। কারণ তাঁহারা স্বজাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করত বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন।" লেখক ভূমিকা বা প্রস্তাবনায় উদ্দেশ্য ব্যক্ত না করলেও প্রহসনের অন্যতম চরিত্র রামকৃষ্ণের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে তুলেছেন। লেখকের প্রকাশরীতি বা উপস্থাপনরীতি থেকে এটা বোঝা যায়। রামকৃষ্ণ আবৃত্তি করেছে,—

> "বর্ত্তমানে ছেলেদের অতি মন্দ প্রথা।
> মুখেতে লাগিয়া থাকে অতি মন্দ কথা ॥
> মদ ভাং খেয়ে বাবু চক্ষু করে ঘোর।
> শুঁড়ির বাড়িতে সারারাত করে ভোর ॥"

বিশেষতঃ পদ্যে বক্তব্য উপস্থাপনে বোঝা যায় যে, লেখক পদ্যাকারে গ্রথিত অন্যান্য বক্তব্যের মতো এটার ওপরেও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। প্রহসনটির নামকরণে 'ইয়ার' শব্দটির প্রয়োগে লেখকের কটাক্ষ অভিব্যক্ত। বস্তুতঃ, কোনো উদ্দেশ্য না জানিয়ে এ ধরনের বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই সমাজচিত্রের বাস্তবতা উপলব্ধি করি। অবশ্য পরিণতি লেখক-কল্পনাতে নিয়ন্ত্রিত।

কাহিনী।—গোপাল চন্দ্র মিত্র মদখোর, হরিহর মিত্র আফিম খোর, নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় গুলিখোর, এবং শ্যামলাল গুপ্ত গাঁজাখোর। চারজনেই ঘোর ইয়ার। এরা সকলেই এককালে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলো। নেশা ও স্ফূর্তিতে পৈতৃক সম্পত্তি নাশ করে এরা সকলেই এমন নিঃস্ব যে আহার

---

* বাঙ্গালি ভায়ারা। (উদ্ধৃতির ফুটনোট)।

২৫। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা—তারিখ ১৫ই আষাঢ়, ১২৬৫ সাল।

জোটে না। গোপালের বাবা মৃত্যুকালে ষাট্ হাজার টাকা রেখে গেছিলেন। "রাজ বাড়ীর মতো বাড়ীও একটা ছিলো। এখন ভাঙা খোড়ো ঘরে তার আস্তানা। ছমাস টাকার মুখ দেখে নি। কেবল একবার জগন্নাথ উড়ের বাড়ী থেকে ঘটি চুরি করে তাই বিক্রী করে পাঁচ সিকে পেয়েছিলো। হরিহরের অবস্থাও একসময় ভাল ছিলো।—

"গোঁপে চাড়া দিয়ে ভাড়া করিতাম গাড়ী।
চাদরে আতর মেখে মারিতাম পাড়ি॥
গাড়ী চড়ে বাড়ী বাড়ী ফিরিতাম রেতে।
দারোয়ান বলিত বাড়ীতে ফিরে যেতে॥
ইষ্টপিড্ নেকাল যাও বলিতাম তারে।
শুনে বেটা কথা আর কহিতে না পারে।

কিন্তু এখন তার সব গেছে। শ্যামলাল আর নিতাইয়ের অবস্থাও তাই।

গোপালের পারিবারিক অশান্তি যথেষ্ট। গোপাল বলে,—"আমার দুটি মেয়ে ছিল, তার একটি না খেতে পেয়ে অক্কা পেয়েছে, আর একটি ক্ষুধারোগে আজকাল প্রায় মরে, আর আমি আমার স্ত্রী না মরি না বাঁচি, আড়া আগলে বসে আছি।" হরির অশান্তি আসলে তার কুৎসিত ছেলেটির জন্যে। সে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। তা ছাড়া—

"পায়ে গোদ তায় কানা অতি অপরূপ।
হাত নুলো কানে খাট ভোদড় স্বরূপ॥"

হরির টাকাকড়ি কিছুই নেই। কি করে যে ছেলের বিয়ে দেবে, সেই চিন্তাতেই আচ্ছন্ন।

নিতাই অনেক ভেবে চিন্তে চার ইয়ারের আহার জোটাবার উপায় স্থির করে। "দেখ ভাই এই কলিকাতা শহরে কত শত ধনী লোক বাস করিতেছেন। একজনের নিকট গিয়া তাঁহার খোসামোদ করত কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করা যাক্। তাহলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু ভাই খোসামোদ করিলে যে সে টাকা দেয়, এমন তো বোধ হয় না, কারণ খোসামোদ করিলে গোলামের ন্যায় থাকিতে হয়।...প্রথমে তাঁহার নিকট আমি বাবু হইয়া গমন করিব, পরে অল্প দিবসের মধ্যেই তাহাকে আমি মদক। পান করিতে শিখাইব, এবং তাহা হইলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।" বড়ো লোকের কাছে যেতে হলে অবশ্য কাপড় ভাড়া করা দরকার।

প্রতিবেশী রামকৃষ্ণের সঙ্গে এদের পরিচয় ছিলো। রামকৃষ্ণের সঙ্গে গোপালের কথাবার্তা হচ্ছিলো, এমন সময় রামকৃষ্ণের গুরুদেব সদানন্দ গোস্বামী মদ্যপান করে এসে মত্ত অবস্থায় উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণ বলেন,—"প্রণাম মহাশয়, আজ এরূপ দেখিতেছি কেন? আপনি একজন প্রধান গোস্বামী। এ কর্ম কোথা শিক্‌লেন।" সদানন্দ বলেন,—"শুঁড়ির বাড়ী, আর কোথা।" —এই বলে টল্‌তে টল্‌তে পড়ে যান। দুজন পাহারাওয়ালা এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।

গৌরদাস বাবাজীরও গুরুগিরি ব্যাবসা আজকাল নেই—দিন আর চলে না। "পল্লে পাড়াতে যদি এক আদ্‌টা বিবাহ হইত তাহা হইলে গ্রামভেটির টাকার কিছু বখ্‌রা পেতেন, এখন কন্যাকর্ত্তারা না দিয়ে গাপ করেন, দৈবাৎ দুএকজন দেয়। গৌরদাসের সঙ্গেও ইয়ারদের পরিচয় আছে। গৌরদাসকে দেখে হরিহর বলে, তার ছেলের যদি একটা বিয়ে গৌরদাস ঘট্‌কালি করে দিয়ে দিতে পারে, তাহলে সে তাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেবে। অবশ্য এতোটা পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আদৌ নেই—বলা বাহুল্য। সবে প্রসন্নবাবুর বাড়ীতে ৬ টাকা মাইনেতে এদের কাজ জুটেছে। কাজ হচ্ছে তোষামোদ করা।

রামনাথ ঘোষ অন্য এক প্রতিবেশী। গৌরদাসের ইচ্ছে,—তাঁর মেয়ের সঙ্গেই হরিহরের কুৎসিত ছেলেটির বিয়ে দেয়। রামনাথের বাড়ীতে ঘটক গৌরদাস গিয়ে প্রস্তাব করলে রামনাথ ঘটকজাতের মিথ্যাভাষণের দোষের কথা বলেন।—"দেখ বাবাজী এখনকার ঘটক বেটারা বড় যুয়াচোর, বেটাদের কথার ঠিক নাই, বলে বর ভাল, কিন্তু সকলই মিথ্যা। বলে বরের ধন আছে, কিন্তু সে-সব ফাঁকি।" গৌর বলে, সে মিথ্যাভাষণে অভিজ্ঞ নয়। তারপর সে বরের অর্থাৎ হরির ছেলেটির বর্ণনা দেয়—অনেকটা দ্ব্যর্থকভাবে। "বরের দোষ কোনই নাই, ছেলের একনজর পাশাভারি, বরের বাপের ঘরে আলো বাইরে আলো।" কন্দুইহীনতার দোষ, একচক্ষুর কথা, পায়ে গোদের কথা, ঘরের ভাঙা ছাদের কথা এ ভাবে ব্যক্ত করলেও রমানাথ এটা বুঝতে পারেন না। যথারীতি বিবাহ হয়ে যায়। পরে অবশ্য রামনাথ আক্ষেপ করেন। গৌরদাসকে হরি ঘট্‌কালির জন্যে ১০০ টাকার বদলে মাত্র ১০ টাকা দেয়।

প্রসন্নবাবুর বাড়ীতে এদিকে চারজন ইয়ার মহা উৎসাহে ইয়ারকি দেয়। বাবুর নাম করেই খাবার মদ ইত্যাদি আনিয়ে খায়। চাকরের একটু দোষ হলেই বাবুর হয়ে চাকরকে গালাগালি করে। এদের সঙ্গে আর এক ইয়ার

আছেন। তিনি হচ্ছেন নন্দরাম ভট্টাচার্য। তিনি বলেন,—"মদ্‌কা সহিতং নূনঃ চাটনি আদি আয়োজন। বড মিষ্টং ছাগমাংসঃ অতি হরে মনঃ॥"

নিতাই একদিন শ্যামকে বলে, প্রসন্ন যখন তাদের মতো "বাবু" হবে, তখন তাকে নিয়ে পাঁচজনে মিলে ভেক নেবে, পরে ভিক্ষা করতে করতে বৃন্দাবনে যাবে, তারপর সেখানে সুখে বাস করবে। মিউটিনির ভয় থাকলেও অনাহারের ভয় নেই। "আর আমরা লেখাপড়া জানি, তাতে সেখানে সুখে থাকতে পারবো, কেননা এই সহরে সকলেই কেরাণী হোতে চায়। কি মুটে, কি মজুর সকলেই মাথায় বিঁড়ে বাঁধিতে চায়।"

চার ইয়ারের তীর্থযাত্রার কথা তাদের স্ত্রীর কানেও যথাসময়ে যায়। তারা বলে, তারাও শ্রীক্ষেত্রে যাবে। এ ভাবে ঘরে থাকা না থাকা তুইই সমান। তাছাড়া বেরিয়ে গেলেও দুর্নামের ভয় নেই, কারণ আর কেউ তারা ফিরছে না।

ইতিমধ্যে প্রসন্ন নিঃস্ব হয়েছে। শুধু বসতবাড়ীটিকই অবশিষ্ট থাকে। এইটা বিক্রী করে এরা বৃন্দাবনে যাবার পাথেয় করে নেয়। তারা স্থির করে, জীবনে আর কোনোদিন তারা মদ খাবে না। হাটখোলা থেকে ২০০ টাকা ভাড়ায় তাদের নৌকো ছাড়ে। কয়েকটা তীর্থ দেখবার পর শেষে তারা বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়।

(প্রহসনের কাহিনীর মধ্যে যৌন দিকের সঙ্গে আর্থিক দিকটিও আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দৌর্নীতিক এবং অনধিকার আয় ব্যয় সম্পর্কেই লেখকের দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট। এ সম্পর্কে প্রদর্শনীর আর্থিক বিভাগে আলোচিত হয়েছে।)

বিধবার দাঁতে মিশি (কলিকাতা—১৮৭৪ খৃঃ)—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়॥ 'সধবার একাদশী' অথবা 'একাদশীর পারণ' প্রহসনের নামকরণ যে উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়েছে, এই প্রহসনটির নামকরণ সে-ভাবে হয় নি, যদিও মদ্যপ গোরাচাঁদ এবং বরদাকান্তের স্ত্রীর যৌনবুভুক্ষা বিধবাজনোচিত। মদ্যপানে স্বামীর বুদ্ধিনাশ হয় এবং ফলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যৌনদায়িত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে নষ্ট হয়। বস্তুতঃ নামকরণের উদ্দেশ্য যা-ই হোক, উল্লিখিত যৌন দিকটি —যার সঙ্গে 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি প্রহসনের সাধর্ম্য— তাই সমাজ চিত্রের বাস্তবতা রক্ষা করে এসেছে ;—দৃষ্টিকোণের সমর্থনপুষ্ট লক্ষ্য করে এটা বলা চলে। অনাচারের পাশে যৌন বুভুক্ষার স্বরূপ উপলব্ধি করি হেমাঙ্গিনী (বরদার স্ত্রী) এবং যামিনীর (গোরাচাঁদের স্ত্রী) খেদোক্তিতে। হেমাঙ্গিনী

বলে,—"বিয়ের পর তিন বছর ঘরে শুলেন না। বল্লেন—মাগটা মূর্খ, ওর সঙ্গে আমার বন্‌বে না, তাই শুনে যতদূর সাধ্য লেখাপড়া শিখ্‌লেম, তবে এখন ঘরে আসেন না কেন? বলেন—মদ খাও। আমি কুলের বৌ—আমি মদ খাবো কি করে?" যামিনী সখেদে মন্তব্য করে,—"বিধি আমাদের সকলি দিয়েছে, রূপ-যৌবন-পতি—সকলি আমরা পেয়েছি। কিন্তু পেয়েও এক মুহূর্ত্তের জন্যেও স্থখিনী হতে পাচ্চি না, কেবল দুঃখানলে দগ্ধ হচ্ছি।" এ-ছাড়া মদ্যপানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির যৌনদূষণপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও দৃষ্টিকোণের দৃঢ়তা লক্ষ্য করি।

কাহিনী।—শিবপুরের জমিদার কমলাকান্ত রায়ের মৃত বড়ো ভাইয়ের দুই ছেলে—শারদা ও বরদা। শারদা বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট। কিছুদিন থেকে বরদাকান্ত কতকগুলো মাতালবন্ধুর সঙ্গে মিশ্‌তে আরম্ভ করেছে। এ নিয়ে কমলাকান্তের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। বরদাকান্তের বন্ধু এবং কমলাকান্তের জামাই গোরাচাঁদ বরদাকে অভয় দেয়,—"ওরা যা বলে বলুক না, দেশের লোকে ত তোমাকে একজন রিফরমার বোলে জান্‌ছে, তাহলেই হল।" বরদার আর এক বন্ধু উডুম্বর চট্টোপাধ্যায়। "মদ খেয়ে কোর্টের বেঞ্চ থেকে উড়তে গিছলেন বলে, নাম হয়েছে উডুম্বর।" ইনি বাংলার ওয়াল্টার স্কট্ নামেই পরিচিত। কারণ অনেক বই লিখেছেন তিনি। ৫০০ টাকা মাইনের এক পয়সাও তিনি খরচ করতে চান না, কিন্তু "মামার বাড়ী" তাঁর অনেক টাকাই চলে যায়। গোরাচাঁদ এককালে প্রচুর বিষয় পেলেও মদ খেয়ে সব খুইয়েছে। এখন পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙাই তার কাজ। মদ্যপান করতে করতে গোরা প্রস্তাব করে, কমলাকান্তকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলে অনেকটা নিষ্কণ্টক হওয়া যায়। বন্ধুদের মধ্যে গোরাচাঁদ, বিধুভূষণ এবং উডুম্বর এটা সমর্থন করলেও বরদা কোনো কার্যকর ভার নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং আলস্যের ভান দেখায়। বাধ্য হয়ে ওকে রেখে বাকী তিনজন কাজ হাসিল করবার জন্য চলে যায়। এই গোরাচাঁদকেই একসময় কমলাকান্ত দারোগার চাকরী করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন্ গৃহস্থ কন্যার প্রতি দুষ্কর্ম করায় তার চাকরী যায়। পৈতৃক সম্পত্তিও মদে নষ্ট হয়, তাই শ্বশুরবাড়ীই এখন তার আশ্রয় হয়েছে।

কমলাকান্ত শোবার ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। মত্ত ব্যক্তি বলে এরা নিস্তব্ধতা রাখ্‌তে পারলো না। কমলাকান্ত জান্‌তে পেরে উঠে পড়ে বিধুকে পদাঘাত

করে ধরাশায়ী করেন, অন্য দুজন পালায়। বিধু কমলাকান্তের গায়ে বমি করে দেয়। ওদিকে গোরাচাঁদ পালাবার সময় পথে সূর্যকুমার কবিরত্নের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলে, কমলাকান্তের নাভিশ্বাস উঠেছে। সূযকান্ত কমলাকান্তের কাছে হন্তদন্ত হয়ে এসে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

ওদিকে বরদার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী আর গোরাচাদের স্ত্রী যামিনীব খুব দুঃখ। তাদের স্বামী রাত্রে বাড়ী থাকে না। রাত্রে যেদিন বাড়ী আসে, সেদিন সে এতোই মত্ত থাকে যে থাকাওযা নাথাকাণ তা। এদেরই মতো দুঃখিনী শারদার স্ত্রী সৌদামিনী। সৌদামিনী বরদারই নিরুদ্দিষ্ট দাদাব স্ত্রী। এদিক থেকে হেমাঙ্গিনী বা যামিনার চেয়ে সৌদামিনীর সান্ত্বনাব কিছুটা কারণ থাকাব কথা, কিন্তু তাও ছিলো না। গোরাচাঁদ তাকে প্রেমপত্র লিখে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করেছে। এতে সে ক্ষুব্ধ। এসব দেখেশুনে শীতশ্রদ্ধ হয়ে কমলাকান্ত কাশী চলে যান।

গোরাচাঁদের পরিকল্পনা বিরাট। সে বলে, সে বরদাকে মদ খেতে শিখিয়েছে—লিভার পচিয়ে বরদাকে মেরে ফেলে তার সম্পত্তি হাত করবে বলে। শারদা নেই, কমলাকান্ত কাশীতে। সৌদামিনীকে নিষ্কণ্টকভাবে সে ভোগ করতে পারবে, কারণ তখন সে সব কিছুর রক্ষক হবে।

কমলাকান্ত চলে গেলে বরদা ও গোরাচাঁদের উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে পৌছোয়। সমজাতীয ইয়ারদের নিয়ে তাবা বাগানবাড়ীতে স্ফূর্তি করে। বাড়ীতে অর্থলোভী ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে ডাকিয়ে এনে অর্থের লোভ দেখিয়ে মদ খাইয়ে তারা মজা পায়। তাছাড়া ব্যভিচারের চেষ্টা লেগেই থাকে। সৌদামিনীকে একদিন গোরাচাঁদ কুপ্রস্তাব জানিয়ে চিঠি লেখে. এতে লজ্জায় অপমানে আত্মধিকারে সৌদামিনী অনাহারে থাকে, তারপর উন্মত্ত অবস্থায় নিরুদ্দিষ্টা হয়। এদিকে মাতাল গোরাচাঁদ নিজ ঘরে স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তরোয়াল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে এবং পালিয়ে যায়। অনেকে গোরাচাঁদ ও সৌদামিনীর অনুপস্থিতিতে ভাবলো, দুজনের মন্ত্রণাতেই বুঝি যামিনার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সৌদামিনীর একটি চিঠি আবিষ্কৃত হওয়ায় ভুল ভেঙে যায়। সৌদামিনী হেমাঙ্গিনী আর যামিনীকে তার সম্পত্তি দান করে গেছে কিছু দেশের জন্যেও দিয়ে যেতে বলে গেছে।

গোরাচাঁদের কামনার একটি পূর্ণ হয়, বরদাকান্ত অত্যধিক মদ্যপান করে ক্রমে ক্রমে নিজের আয়ু শেষ করে আনে। লিভার পচিয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। স্ত্রী হেমাঙ্গিনী এতে পাগল হয়ে গিয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে।

এদিকে নিরুদ্দিষ্ট শারদাকান্ত দৈবগতিকে কাশীতেই উন্মাদ হয়ে অবস্থান করছিলো। অবশ্য তার প্রলাপগুলো অর্থহীন হলেও, সে যে অত্যন্ত শিক্ষিত ছিলো, এটা তার প্রলাপ থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো। দয়াপরবশ হয়ে সদানন্দ নামে সন্ন্যাসী ওষুধ প্রয়োগে তাকে সারিয়ে তোলেন। শারদা তার আত্ম-পরিচয় দেয়। সদানন্দ তাকে নিজের ঘরে এনে রাখেন।

সৌদামিনী গোরাচাঁদের দৌরাত্ম্যে কাশীতে পালিয়ে এসেছে। গোরাচাদও তার পিছু নিয়েছে। পথে বাগে পেয়ে গোরাচাঁদ তার ওপর অত্যাচার করবার চেষ্টা কয়েকবার করেছে—কিন্তু দৈবক্রমে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কাশীতে হঠাৎ একবার ক্রুদ্ধ গোরাচাঁদের কবলে পড়ে সৌদামিনী প্রহার খায় এবং আর্তনাদ করে ওঠে। তাকে উদ্ধার করে দৈবক্রমে যে গৃহে শারদা ছিলো, সেখানেই আনা হয়। সৌদামিনী প্রহারে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং তার বুকের মধ্যে থেকে শারদাকান্তের একটি ছবি আবিষ্কৃত হয়। জ্ঞান হলে শারদা ও সৌদামিনীর মিলন হয়—চোখের জলের মধ্যে দিয়ে। এদিকে কমলাকান্ত কাশীতেই বাঙ্গালীটোলায় ছিলেন। দেশ থেকে তিনি অনেকগুলো দুঃসংবাদ একসঙ্গে শুনে মরবার উদ্দেশ্যে নিজের খাবারে বিষ মিশিয়ে রাখেন। তারপর শেষবারের মতো পুণ্যসঞ্চয় করবার জন্যে গঙ্গাস্নানে যান। স্নান করে এসে বিষাক্ত খাবার তিনি খাবেন।

গোরাচাঁদ কাশীতে কমলাকান্তের বাসা চিনতো। সৌদামিনীর কাছে ব্যর্থ হয়ে রুক্ষ মেজাজে সে কমলাকান্তের বাসায় এসে ওঠে। তখন কমলাকান্ত গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। অভদ্র ও রুক্ষ গোরাচাঁদ চাকরের আপত্তি সত্ত্বেও শ্বশুরের খাবার সামনে দেখে খেতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়।

এদিকে সৌদামিনীর আজ আনন্দের দিন। এতোদিন তার ছিলো বিধবার সাজ। আজ সে সধবার সাজ পরেছে। আয়নায় মুখ দেখে সে হেসে মন্তব্য করে—"বিধবার দাঁতে মিশি।"

যেমন দেবা তেমনি দেবী (সোমড়া—১৮৭৭ খৃঃ)—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ সোমড়া থেকে ১২৮৪ সালের আষাঢ় মাসের তারিখের এক বিজ্ঞাপনে লেখক বলছেন,—"আধুনিক পল্লিগ্রামবাসী জনগণের অবস্থা ও রীতিনীতি সবিশেষ বর্ণন এই নাটকের উদ্দেশ্য।" নটনটীর অবতারণার মধ্যে দিয়ে লেখক তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। ঘটকের দ্বারা অর্থলোভে অযোগ্য বরের সঙ্গে অযোগ্যা কনের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার বর্ণনা থাকলেও এবং নামকরণটি

সেই কাহিনীকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত হলেও প্রহসনটিতে আর্থিক দিকের চেয়ে যৌন দিক বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য ঘটকের অর্থলোভ, পাত্রপাত্রী পক্ষের অর্থপ্রয়োগে দুর্নীতিমূলক বিবাহপ্রদানচেষ্টা এবং কৃপণতার আতিশয্যে অসুস্থ পুত্রকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করা ইত্যাদি আর্থিক দিকগুলো তুচ্ছও নয়। গ্রন্থকার মদ্যপানের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে তাঁর মতবাদ প্রচার না করলেও পদ্মমণির বক্তব্যের মধ্যে গৌণভাবে তা বলেছেন এবং এও বলেছেন যে মদ্যপান ইত্যাদি দাম্পত্য অংশীদারের মানসিক সুখশান্তি নষ্ট করে। পদ্মমণি আবৃত্তি করেছে,—

"নারীর ভরসা আছে একমাত্র পতি।
যদ্যপি না করে কভু কুপথেতে মতি॥
কুসঙ্গ ত্যজিয়ে যদি আত্মবাসে রয়।
রমণীর বল তবে কত সুখোদয়॥"

কাহিনী।—রামকালীবাবু একজন সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি তার পুত্র এবং কন্যা—দুজনেরই বিয়ে দিয়েছেন। কন্যা কামিনী দাম্পত্য জীবনে সুখী। সে বাপেরবাড়ীতে এসে তার সইয়ের কাছে গল্প করে—বোধহয় শ্বশুরবাড়ীতেই সে ভালো থাকে। সরঙ্গিণীর কাছে সে প্রায়ই স্বামী সোহাগের কথা বলে। এর মধ্যে একদিন শ্বশুরবাড়ীতে স্বামী নাকি তাকে আদর করতে এসেছিলো। স্ত্রীর ওপর দুঃখ করে স্বামী নাকি বলেছিলো,—

"সাধিলে না কথা কয়, এ বড় যাতনা,
কি আছে অধিক ধিক ইহাতে লাঞ্ছনা।"

এতে কামিনী চুপ করে থাকতে পারেনি। সেও জবাব দিয়েছে,—

"রমণী কঠিন বল শ্বশুর তনয়।
পুরুষের মত কিন্তু রমণী তো নয়॥"

এইভাবে সারারাত ধরে অনেক উত্তর প্রত্যুত্তরের পর—অনেক গল্প করে শেষরাত্রে তারা নাকি ঘুমিয়েছে। সুরঙ্গিনী কামিনীর গা টিপে হাসাহাসি করে। কামিনীও হাসিতে যোগ দেয়।

কিন্তু রামকালীর পুত্র প্রিয়নাথ মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র। তাই তার স্ত্রী সরমার দুঃখের অন্ত নেই। প্রিয়নাথ আগে ভালো ছিলো, কিন্তু এখন কতকগুলো বাজে লোকের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে গেছে। প্রতিবেশিনী জ্ঞানদা সুখদাকে নসীরাম মুখুজ্যের মেয়ে গোলাপী বলে, তার মামার বাড়ীর কাছেই সরমার বাড়ী। তাকে দিদি বলে। সরমার স্বামী "সরমাকে সর্ব্বদাই গালাগালি

দেয়, মারে, বেশ্যালয়ে যায়, আবার সম্প্রতি নাকি মদমাংসও আরম্ভ করেছে শুনে বড ঘৃণা হইল। এমন ভ্রাতার যেন কাহারও না হয়।”

পুত্রের ব্যাপারে রামকালী দুঃখিত। তিনি কাশীবাস করবেন সঙ্কল্প করেছেন, কিন্তু সংসারে জড়িয়ে পড়ে কিছুতেই যেতে পারছেন না। বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলে সময় কাটান। তাঁর বৈঠকখানায় আসে গৌরবল্লভ রায়, রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য, নসীরাম মুখুজ্যে, হরিহর ঘটক ইত্যাদি। ভট্টাচার্য নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে রাজবাড়ীতে গিয়ে একটা কবিতা পড়াতে সকলে নাকি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়েছিলো। নসী তার কথাটা লঘু করে দেবার জন্যে বলে, কবিতার মানেই এই,—

“গাধার পেটে ভ্যাড়া'র ছাঁ, ঘোড়ার পেটে হাতী।
বাবার পেটে ছেলে হলো, মায়ের পেটে নাতি।”

নসী বলে, সে কলেজে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়েছে। টোলে যে পড়া দশবছর পড়ে শিখতে হয়, সে পড়া কলেজে দু'ছর পড়ে শেখা যায়। —এইভাবে নসীরাম ভট্টাচার্যকে প্রতি কথায় অপদস্থ করবার চেষ্টা করে। ভট্টাচার্য ঘটককে বলে, নসী ছেলেমানুষ—এর কথায় যেন কান না দেয়। এই সময় ঘটককে রামকালী কথাপ্রসঙ্গে বলেন গৌরবল্লভের একটা কানা মেয়ে আছে। তার জন্যে ঘটক যেন একটা পাত্র দেখে দেয়। রামকালী আরও বলেন কুলীনদের ঘরে যারা গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে তাদের সঙ্গে অথবা এমন অনেক কুলীন পাত্রও আছে—যারা উপযুক্ত টাকার লোভে যে কোনো প্রকার মেয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়—এদের সঙ্গেও চলতে পারে। রামকালী ঘটককে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের লোভ দেখায়।

ঘটক অবশেষে বিয়ে ঠিক করে দুর্গাপুরের শশিভূষণ চাটুজ্যের ছেলের সঙ্গে। এই ছেলের বিয়ে নিয়ে শশিভূষণ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। তার মা চন্দ্রভূষণের বিয়ে যাতে শিগ্‌গির হয়, এজন্যে শশীর ওপর চাপ দিচ্ছেন, কিন্তু ছেলের যা বিদ্যেবুদ্ধি এবং কানেও যেমন খাটো, তাতে, কেউ মেয়ে দেবে বলে ভরসা হয় না। শশী যখন নিরাশ, তখন ঘটক এসে এক পাত্রীর খবর দেয়। শশীও ঘটককে ৫০ টাকার লোভ দেখিয়েছিলেন। ঘটক গৌরবল্লভের কানা মেয়েটার খবর দিতে গিয়ে বলে, মেয়েটার বয়স ১৩/১৪ বছর, সুন্দরী—তবে বাম চোখের কিছু দোষ আছে। ৫/৭ ভরি সোনা দেবে। শশী তাতেই সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়। তখন পুরোতের কাছে দিন দেখিয়ে

২রা বৈশাখ বিয়ের দিন ঠিক করে। শশী বলে বরযাত্রী সবশুদ্ধ পঁচিশ জন যাবে।

এমন যে সম্বন্ধ হবে এটা কামিনীও আন্দাজ করেছিলো। সুখদার কথার জবাবে সে বলেছিলো,—"উপযুক্ত কি আর বর নেই? যেমন দেবী তেমনি দেবা হবে। যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা।' এদিকে ঘটক বিয়ের সব ঠিকঠাক করে ভাবে, 'পরে আমাকে বরের মা বলবে কানা বউ দিয়েছি, আবার কনের মা ও বলবে কালা বর যোগাড় করে দিয়েছি। তা নিতান্তই গাল দেয় তার আর কি করবো, পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন কাজটা হলেই হয়, আমিও দুপয়সা কামিয়ে নিই।"

ওদিকে বিয়ের যোগাড় চলে, আর এদিকে প্রিয়নাথের দিন দিন অবনতি হয়। একদিন প্রিয়নাথ শোবার ঘর থেকে পান দেবার জন্যে সরমাকে কর্কশভাবে ডাকে। সরমা বলে, ভালোভাবে কথা বললে সে কি পান দিতো না? প্রিয়নাথ তখন তার অপরাধ স্বীকার করে বলে—বাড়ীতে সে থাকে না বলে বাবা তাকে বকুনি দিয়েছেন। আবার সরমাও তার কথা অবাধ্য হয়েছে, এজন্যেই তার মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিলো। সরমা ভাবে যে, পিতামাতার অবাধ্য স্বামী কোনোদিনই সুখী হতে পারবে না। এমন স্বামী নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। তার মতো আরো কতো মেয়ে আছে যারা এ ভাবে জীবন কাটাচ্ছে কিংবা শেষে বারবণিতার বৃত্তি গ্রহণ করেছে।—সরমা একথা ভাবছে এমন সময় চাকর এসে প্রিয়নাথকে ডেকে নিয়ে যায়। যাবার আগে প্রিয়নাথ সরমাকে বলে, আজকের ঘটনাটা যেন সে মা-কে না জানায়। সরমা বলে, সে কি কোনো কথার অবাধ্য হয়েছে কোনোদিন? তারপর প্রিয়নাথ রজনী ও গোপালের কাছে গিয়ে তাদের প্রশ্নের জবাবে বলে—তার দিবা বিহার সেরে আসতে দেরী হলো। মনোমোহন প্রিয়নাথেরই অন্য একজন ইয়ার বন্ধু। তার বৈঠকখানায় সকলে মিলে মদ্যপান করতে লাগলো এবং প্রলাপ বকতে লাগলো। রজনী বলে,—"এই সময় একজন মেয়েমানুষ থাকলে ভাল হতো।" মনোমোহন বলে—গরীববাড়িতে মেয়েমানুষ কোথায় পাবে। টাকা খরচ করে মেয়েমানুষ সংগ্রহ করার জন্যে রজনী তাকে পরামর্শ দেয়। প্রিয়নাথ তখন বলে,—তাদের বাড়ীতে "ওল্ড ফুল" গুলো মরলে তার স্ত্রীকেও সে এখানে নিয়ে আসতে পারবে। সকলে তার কথা সমর্থন করে বলে, আজকাল সমস্ত স্ত্রীদেরই সব রকম মজার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈঠকখানায় বসে এদিকে রামকালী ভাবছেন তাঁর জামাইয়ের (অর্থাৎ কামিনীর স্বামীর) অসুখের সংবাদ তিনি পেয়েছেন। কর্ত্তা কৃপণ বেয়াই টাকা খরচ করতে চান না। রামকালী ভাবছেন, জামাইকে ডাক্তার দেখাবার জন্যে তিনি কিছু টাকা পাঠাবেন। এই সময় গৌরবল্লভ এসে বলে, তার মেয়েটার সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। তবে পাত্রের বয়স ৩৬।৩৭ হবে। রামকালী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,—লোকে পঞ্চাশ বছর বয়সেও তো বিয়ে করে, এবং তিন চারিটি সন্তানও হয়। ঘর ভালো হলেই অমতের আর কি কারণ থাকতে পারে? গৌর চলে গেলে রামকালী চাকরের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, প্রিয়নাথ এখনো বাড়ী ফেরে নি। এই অন্ধকার রাতে সে কোথায় রয়েছে দেখে ডেকে আনবার জন্যে চাকরকে আদেশ দিলেন। তিনি ভাবলেন, জামাইয়ের অসুখের কথা বাড়ীতে কাউকে জানাবেন না। ওদিকে প্রিয়নাথকে ফিরতে না দেখে কামিনী সরমাকেই দোষ দেয়। সে কেন দাদার ওপর মান করেছিলো? সে নাকি আড়াল থেকে সবই শুনেছে। সরমা হেসে বলে, সে কামিনীর ঘরে ছিলো বলেই সে মান করেছিলো। হেসে কথা বল্‌লেও সরমার মনের মধ্যে উদ্বেগ থাকে। হয়তো তার স্বামী কোনো ইয়ার বন্ধুর পাল্লায় পড়েছে। "আমার তো ভাল বোধ হচ্ছে না।"

রামকালী তাঁর স্ত্রী বিমলা এর বিধবা ভগ্নী নীরদাকে জিজ্ঞেস করে জানলেন এখনো প্রিয়নাথ ফেরে নি। প্রিয়নাথ এখন আর রামকালীর কথা শোনে না। একটা কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে দেয়। ৫ টাকা জোড়া ধুতি না হলে হয় না ৭ টাকার জুতো না হলে পরবে না। এখন থেকে এসব খরচ বন্ধ করে দেবেন বলে রামকালী সঙ্কল্প করেন। রামকালীর স্ত্রী বিমলা স্বামীকে মিনতি করে বলে,—তিনি যেন প্রিয়নাথকে বকুনি না দেন, সে এখনো ছেলেমানুষ। এতে রামকালী আরও রেগে যান। এমন সময় চাকর ফিরে আসে, বলে, প্রিয়নাথকে পাড়ায় পাওয়া গেলো না। এতে ক্রুদ্ধ রামকালী স্থির করেন, রাত্রে তাকে আর বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবেন না। এ-কথা শুনে বাড়ীর মেয়েরা সবাই কাঁদতে লেগে যায়।

ওদিকে প্রিয়নাথ মদ খেয়ে সদর রাস্তা দিয়ে বাড়ীমুখো চলেছে। অন্ধকারে পথ ঠিক করে উঠ্‌তে পারছে না। এমন সময় একজন চৌকিদারকে দেখ্‌তে পেয়ে প্রিয়নাথ রামকালী ঘোষের বাড়ীর হদিশ জিজ্ঞেস করে।

চৌকিদার "কোন্ রামকালী"—জিজ্ঞেস করায় প্রিয়নাথ বলে,—"যে রামকালী-বাবু হউক না কেন? সে-কথায় কাজ কি?" চৌকিদার তখন তাকে দাদাবাবু বলে চিন্‌তে পারলো এবং রাস্তা দেখিয়ে দিলো। প্রিয়নাথ বাবার ভয়ে সদর রাস্তা দিয়ে না গিয়ে খিড়কীর পথে গিয়ে চাকরকে ডাকতে লাগ্‌লো। সেখানে ভীষণ গন্ধ পেয়ে বুঝতে পারলো যে, ওটা পায়খানা। তারপর অনেক ডাকাডাকিতে কামিনী ও সরমা ভয়ে দরজা খুলে দিলো। কামিনী বুঝতে পারলো, প্রিয় আজ নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে এসেছে। ওপরে ভাত ঢাকা রয়েছে—প্রিয়কে তা নিজে নিয়ে খেতে বল্‌লো। তখন প্রিয়নাথ জবাব দেয়, "আচ্ছা ক্ষমা দিদি, একটু ক্ষান্ত হও, খাই না খাই, তা আমি বুঝবো।" সরমা ভাবে, "কলকাতায় সুরা নিবারিণী সভা হয়েছে, তারা কি কোনো কাজ করে না? সুরায় যে দেশ নষ্ট হতে চললো।"

প্রিয়নাথ শোবার ঘরে যায়। সরমা এসে দেখে প্রিয়নাথ শুয়ে শুয়ে প্রলাপ বকছে। সরমা তখন শাশুড়ীকে গিয়ে খবর দেয়। বিমলা আর নীরদা আসে। কর্তাকেও ডেকে আনা হয়। রামকালী মন্তব্য করেন, বিকেলে যে দুজন ইয়ার বন্ধু এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেলো, তখনই তিনি এর কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন। যাহোক ছেলের তিনি মুখদর্শন করবেন না বলে চলে গেলেন। নীরদা কামিনীকে বলে, সরমা কেবল কাঁদছে। সে যেন তার সঙ্গে শুতে যায়।

সরমা বাড়ীর একদিকে এককোণে বসে বসে ভাবে—

"হায়! আমি অভাগিনী জন্মিয়ে ধরায়,
সুখের সোপান কভু না হেরি নয়নে॥
জীবনে নাহিক সুখ, মরণ মঙ্গল।
কেন হে বিলম্ব কর লইতে পাপিনী।"

সরমা ভাবে "স্বামী-সুখ-বঞ্চিতা বনিতার জীবনে ফল কি?" তারপর বিষপান করে সরমা সকল জ্বালা জুড়োয়।

কামিনী সরমাকে কেমন করতে দেখে নীরদাকে ডাকে। তারপর চাকরকে বলে কর্তাকে ডেকে আন্‌তে এবং বল্‌তে যে বউ বিষ খেয়েছে। রামকালী বৈঠকখানায় বসে বসে প্রিয়নাথ সম্বন্ধে ভাবছিলেন। তিনি ছুটে এলেন। অন্তঃপুরে এসে দেখ্‌লেন, সরমা মারা গেছে। তিনি বল্‌লেন, তিনি আগেই ভেবে রেখেছিলেন যে কুলাঙ্গার পুত্র থেকে এমন একটা সর্বনাশ

হবে। বউ ঘরের লক্ষ্মী ছিলো আজ ঘরের লক্ষ্মী বিদায় নিলো। রামকালী নিজের মৃত্যু কামনা করেন।

সরমার মৃত্যুর পর প্রিয়নাথের মনে অনুশোচনা জাগে।—তার পাষাণ হৃদয়! বিনাদোষে সে তার পতিপরায়ণা স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েছে। নরকেও তার স্থান হবে না। ওদিকে রামকালীও খুব আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু এ আঘাতেও মুক্তি নেই। আবার একটা আঘাত এলো। পত্রবাহক একটা পত্র দিলো। পত্র পড়ে তিনি জানলেন—তাঁর জামাই অর্থাৎ কামিনীর স্বামী মারা গেছে। রামকালী ভাবেন, এতো অল্প বয়সে তার প্রিয় কন্যা কি করে বৈধব্য ব্রত পালন করবে? একে একে সবাই খবর জানতে পারে। কামিনীও জানতে পারে। স্বামীর মৃত্যুশোকে কামিনী হাহাকার করে। তার মতো স্বামীসুখে সুখী কয়জন ছিলো! কিন্তু আজ তার মতো হতভাগিনী কে আছে!

ওদিকে গৌরবল্লভ রায়ের বাড়ী মহা ধূমধাম। বাসর ঘরে জ্ঞানদা, সুখদা, গোলাপ ইত্যাদি মেয়েরা জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের সামনে কালা বর আর কানা মেয়ে বসে আছে। সবাই ছড়া কাটে, গান গায়। তারপর বরকেও একটা গান গাইতে বলে। বর যে কালা এটা তারা জান্‌তো না।—এবার বুঝতে পারে। শুধু কালা নয়, হাবা-ও। শেষে বর একটা টপ্পা গায়,—

"পিরিতে ও সই মজ না
পরে পাবে যাতনা॥
দুকুল হারাবে অকুলে পড়িবে
কুল ফিরে আর পাবে না।
যতক্ষণ মধু নিকটে বিরাজে,
ফুরাইলে গুন যায় না॥"

তারপর পুঁটিও গান গায়। এইভাবে গান গাইতে গাইতে রাত প্রায় শেষ হয়ে যায়। তখন বরবধূকে রেখে তারা চলে যায়।

বিশেষতঃ মদ্যপান ইত্যাদি নেশাকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীতে আরও প্রচুর প্রহসন লেখা হয়েছে। যেগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে খোঁজ পাওয়া যায়, এমন আরও কয়েকটি প্রহসনের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

দলভঞ্জন (১৮৬১ খৃঃ)—হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়॥ মদ আফিম ইত্যাদি নেশার কুফল নিয়ে প্রহসনটি লিখিত হয়েছে।

ফাল্‌তো ঝকড়া (১৮৭০ খৃঃ)—জীবনকৃষ্ণ সেন ॥ বেশ্যাবাড়ীতে দুটি মাতালের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি লেখা হয়েছে। সমাজের কদমাক্ত চিত্র এতে উন্মোচিত।

কলিকালের গুড়ুক ফোঁকা নাটক (১৮৭০ খৃঃ) অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ও হীরালাল দত্ত॥ বাঙ্গালী যুবকদের তামাকের নেশা এবং অন্যান্য কু-অভ্যাসের অনিষ্টকারিতা দেখিয়ে প্রহসনটি রচিত।

জ্ঞান দায়িনী (১৯৭১ খৃঃ)—কেদারনাথ ঘোষ। মদ্য পানের কুফল নিয়ে প্রহসনটি রচিত।

আর কেহ যেন না করে (১৮৭৩ খৃঃ)—নিত্যানন্দ শীল॥ "ফাল্‌তো ঝকড়া" প্রহসনটির মতো এটিও বেশ্যালয়ে দুই মাতালের কাণ্ড কারখানা নিয়ে রচিত। চিত্র অত্যন্ত কদমাক্ত।

মাতালের সভা (১৮৭৪ খৃঃ)—"পণ্ডিত মানবজম্বু নারায়ণ বিদ্যাশূন্য॥" সমাজের নানাস্তরের এবং নানা সম্প্রদায়ের মাতাল এসে শুঁড়ীখানায় জুটে যেভাবে বিবাদ করে, প্রহসনটিতে তার বর্ণনা পাওয়া যাবে। মদ্যপানের কুফল নিয়েই এটি লেখা। সমাজের ভণ্ডদের মুখোস এতে খুলে ধরা হয়েছে।

কি লাঞ্ছনা (১৮৭৫ খৃঃ)—শ্রীপতি ভট্টাচার্য॥ মদ্য পানের অভ্যাস কেমন করে নিজেকে এবং অপরকে লাঞ্ছনা ভোগ করায়, তার বর্ণনা এতে পাওয়া যাবে।

কার মরণে কেবা মরে মলো মাগী কলু (১৮৮৩ খৃঃ)—বনোয়ারীলাল গোস্বামী॥ কতকগুলো মাতাল বাঙ্গালীবাবু একবার মড়া পোড়াতে শ্মশানের দিকে যায়। পথ চল্‌তে চল্‌তে তাদের মদ খাওয়াও অবিরাম চল্‌তে থাকে। শেষে নদীর ধারে এসে তারা ভাবে, মদের উপযুক্ত চাট্‌ এই মৃতদেহ দিয়ে বেশ ভালো করে বানানো যায়। তখন তারা সেটা আগুনে ঝল্‌সিয়ে মাংসগুলো কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে খেয়ে শেষ করে। ঠিক্‌ সেই সময় এক কলু বৌ এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে দেখামাত্র মাতালরা সবাই মিলে তাকে মেরে ফেলে এবং তাকেও এরা ঝল্‌সিয়ে নিয়ে চাট্‌ বানায়। Calcutta Gazette এর (1883) মন্তব্য বলা হয়েছে,—"A revolting story, related with the view of condemning and showing the evils of drunkenness among educated Bengalis."

অসৎকর্ম্মের বিপরীত ফল (ঢাকা—১৮৮৫ খৃঃ)—হরিহর নন্দী॥

মাত্রারিক্ত মদ্যপানের অভ্যাসে একটি লোক কিভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলো, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

মদ ইত্যাদি নেশা নিয়ে লেখা আরও অনেক প্রহসন আছে ; যেমন,—**গুলি ছাড়কালি নাটক** (১৮৬২ খৃঃ)—ভুবনেশ্বর লাহিড়ী, **বারুণীবিলাস** (১৮৬৭ খৃঃ)—নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, **ঘরের কড়ি দিয়ে মদ খায়, লোকে বলে মাতাল** (?)—অজ্ঞাত—ইত্যাদি। খুঁজলে এরকম আরও প্রচুর প্রহসন মিলবে।

সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক ॥

প্রতিষ্ঠার সংঘর্ষকে ভিত্তি করে প্রচুর প্রহসন রচিত হলেও সাময়িক ঘটনা নিয়েই অনেক বেশি প্রহসন লেখা হয়েছে। কোথাও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবার কোথাও বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এগুলোর সৃষ্টি। উৎস অনেককিছুই অনাবিষ্কৃত। আনুমানিকভাবে উল্লেখ করলে, হয়তো সেগুলোর মধ্যে কিছুটা সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে, কিন্তু তা নিরাপদও নয়। সমসাময়িক কালের পত্র-পত্রিকা, পুলিশ রিপোর্ট, কোর্টের নথিপত্র—ইত্যাদি নিয়ে তুলনামূলকভাবে অনুসন্ধান চালালে সমগোত্রীয় প্রচুর অনুষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যাবে। অনুষ্ঠাতা সম্পর্কে সন্ধানকার্যও নিষ্ফল হবে না।

মদ্যপানকে কেন্দ্র করে সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক কয়েকটি প্রহসনের উল্লেখ করা হলো।—

রক্তারক্তি (কলিকাতা—১৮৯৬ খৃঃ)—অক্ষয়কুমার দে॥ এ সম্পর্কে Calcutta Gazette-এ (1896) বলা হয়েছে,—"A Kumartuli murder case dramatised" প্রহসনকার কুহকিনী মদিরা ইত্যাদি কয়েকটি রূপক চরিত্র অঙ্কন করে তার মধ্যে দিয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। কুহকিনীর উক্তি—"সংসারে আর সধবা রাখবো না, স্বামী থাকতেও স্ত্রীজাতিকে বিধবা অবস্থায় রাখবো। স্ত্রীর আর পুরুষে যা প্রণয় তার চিহ্নমাত্রও রাখবো না, সর্বদাই আপনার পত্নীর প্রতি বিষদৃষ্ট হবে, ভাত দিতে দেব না, কাপড় দিতে দেব না, সধবাদিগে বিধবার মত চক্ষের জলে ভাসাব, (নিজ বক্ষে চপেটাঘাত) আর এই বারবিলাসিনী কুহুকিনীরই কি ক্ষমতা, তাই জগজনাকে দেখাব। পুরুষগুলোর বিষয়আশয় সমস্ত নিয়ে মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, সরম জ্ঞান, গৌরব এই সকলগুলিন হাতগত করে নাকাল নাজেহাল করে তবে ছেড়ে দেব, এইত

ভাই এই কাজগুলিন হাসিল করে দিতে পারলে তবে কলি মহারাজা আমাকে ভালবাসবে।" বেশ্যাসক্তি ও মদ্যপান—উভয় সম্পর্কেই লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত। মদিরার উক্তিও অনুরূপ। সে বলেছে,—"আমাতে যে যখন বেস প্রবত্য হবে, তখন তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকবে না, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যা থাকবে না, ··হিতাহিত শূন্য হয়ে ব্রাহ্মণে শূদ্রাণীতে গমন করবে শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করবে। জাতের বিচারই বল, আর ভাতের বিচারই বল, আমি আর কোন বিচারই রাখবো না। আমাতে রত হলে, পর অন্নটাই তাকে পরমান্নের মত ভাল লাগবে, বিশেষ বেশ্যা অন্নটাই বেশীর ভাগ সুধাতুল্য জ্ঞান করবে।· ·আত্মীয়জনের সনে সমান সম্বন্ধও রাখতে হবে না। কখন দাদাকে বাবা বলবে, আর বাবাকে দাদা বলবে। আমার অনুগত হলে জ্ঞানশূন্য হয়ে আপ্তবিচ্ছেদ, মারামারি, কাটাকাটিতেই প্রবত্য হবে। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি যবন, কারুই জাতির বিচার থাকবে না। আমাতে আসক্ত হলে, কি ব্রাহ্মণ, কি ইষ্টদেব, কি দেবদেবী কাহারই প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকবে না। মাতা, পিতা, বনিতা, পুত্র, কন্যা, কাহাকেও অন্নবস্ত্র দিয়ে প্রতিপালন করবে না।"

কাহিনী।—ভুবনবাবু জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি তার ছোট মেয়ে মুক্তকেশীকে শরৎচন্দ্র নামে এক ধনীপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের চরিত্র খারাপ হয়। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তিতে সে তার সমস্ত অর্থ নিঃশিষ্ট করে ফেলে। শরৎচন্দ্র আক্ষেপ করে,—"আমি কল্লোম কি, পাঁচ বেটা ভগুর তোষামুদি এয়ারকিতে পড়ে সর্ব্বশ্রান্ত হলেম। সুরাসুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করে, বাবার উপার্জিত অতুল ঐশ্বর্য্য বেশ্যানগরে আর সুরাসাগরে বিসর্জন দিলাম।" সে তার প্রচুর নগদ টাকা, পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, তিনটে ভাড়াটে বাড়ী হারিয়ে শেষে বসত বাড়ীও হারিয়েছে। গাড়ীও বিক্রী করে দিয়েছে। "বাড়ী গেল, গাড়ী গেল এখন কেবল বাবর টের্‌রিটী মাত্র ঠেকেছে।" এককালে যারা খুব বন্ধু ছিলো—তারা চিনেও চিনতে চায় না। এখন সে ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করে। পাওনাদারকে ঠেকানো যায়, কিন্তু বাড়ীওয়ালা থাকতে দিতে চায় না—শুধু তাগাদা দেয়। তবুও শরৎচন্দ্রের রোগ কমে না। সে বলে,—'মরুগ্যে তাও না হয় যা হয় তাই হবে, তার জন্যে আর বেশী ভাবচি নে, কিন্তু কামিনীকে যে আমার হীরের বালা হীরের চুড়ি দিতে হবে তার উপায় কি করি, সেটিকে ত আর ভাঁড়ালে চলে না।" শরৎচন্দ্র ভাবছে, এমন সময় শুঁড়ি এসে পাওনা চায়।—শরৎচন্দ্রের জবাব শুনে

সে বলে,—"এখন আব ধারবে কেন, যখন চিঠি চালিযে হুকুম চালিযে ডজন ডজন নিযে বং চালান হযেছিল, তখন আর এরকম বোলচাল ছিল না। এখন টাকা দিয়ে কথা কও, আমরা শুঁড়ি বাচ্ছা ভুঁড়ি বার করে টাকা নিযে থাকি, আদালতে নালিশ কর্ত্তে যাই নে। এখনও বলছি ভাল চাও তো টাকা দিযে কথা কও।" অবশেষে সে চলে যায। তারপর কানাইবাবু আসেন টাকার তাগাদা দিতে। 'অগ্রিমেণ্ট নোটে' শরৎ নাকি হাজার টাকা নিযেছে। কানাইবাবু চলে গেলে আসে মাড়োয়ারি চুন্নলাল। মেজাজ হারিযে শরৎ তাকে ছোটোজাত বলে গাল দিলে সে বলে,—"আবে বাবু মাড়োয়ারি ছোট জাত আছে, তোম্ বাঙালি ভদ্দর জাত আছে, রুপেযা চুক্তি কবো, আজ বেগর রুপেযা নেই ছোড়েঙ্গে।" সে শাসিয়ে চলে যায। শরৎচন্দ্র ভাবে, এমনি করে পাওনাদারদের অপমান সহ্য হয না। স্ত্রীকে সে টাকার জন্যে বার বার তাগাদা দিলেও তার কাছ থেকে আজকাল আর টাকা মেলে না। এ হারামজাদীকে ওর বাপ মার কাছে ... আজ কদিন থেকে টাকা আনতে বলছি তা কই গ্রাহ্যই তো করে না, আজ হয টাকা নয যা হয তাই করবো।"

দরদালানে মুক্তকেশী তার ছেলেদের ভাত খাওয়াতে খাওয়াতে গল্প করে। ছেলেদের মধ্যে নবীন, বিজয ... আর চারু ছিলো। এমন সময শরৎ এসে বলে,—'বলি কি হচ্ছে, আমোদের যে ছড়াছড়ি দেখছি, মজলিশ পাকিযে ছেলেদের নিযে ভাত গেলাতে বসা হযেছে দেখ একবার। বলি আমি শালা যে টাকার জন্যে নাকাল হযে বেড়াচ্ছি কাটা ছাগলের মত ছটফট্ করে মরছি তা কি দেখতে পাচ্ছ না (উচ্চস্বরে) টাকা এখনি চাই, ভাত খাবার আমোদ এখনি ঘুরিযে দেব।" মুক্ত এ-হাঁড়ি ও-হাঁড়ি করে কুড়িযে বাড়িযে চারটে চাল নিযে অল্প ভাত্তে করে দিয়েছে—কেননা—শুধু মুখে ইস্কুলে গেলে ওরা খিদেয খুন হবে।—একথা কৈফিয়ৎ হিসেবে মুক্তকেশী যখন বলে, তখন শরৎ বলে,— "তেল মাখান কথাটি বেশ গুছিযে গাছিযে বল্লি তা বোঝা গেল, কিন্তু আমি-শালাকে যে টাকার জন্য পাঁচজনে জুতোর বাড়ি মাচ্ছে, তার যোগাড় কি করেছিস্ বল দেখি।" উত্তরে মুক্ত দুঃখ করে বলে যে তার হাতে একটা টাকাও নেই, গাযেও গযনা নেই,—নইলে কি চোখে এতো দুঃখ সে দেখে। তার বাবাও সব জানেন। তাঁর কাছে টাকার কথা বললে তিনি বকবেন, মুক্তর কাছেও তার নিন্দে করবেন। "তাই মনে করি দিনান্তে একমুঠো জোটে তাও ভাল, না জোটে তাও ভাল, তাই বলে যে এই দুঃখের সময বাপের বাড়ী

গিযে পাঁচজনার কাছে তোমার পাঁচটা নিন্দেবান্দা শুনে সহ্য কর্ত্তে পারব তা কখনই পারব না।" একথায় শরৎ কান দেয় না। সে বলে,—"হয টাকা দে, নয এখান থেকে দূর হযে যা, নিমতলায নিযে গিযে ভাত খাওয়া গে যা।" এই বলে ছেলেদের ভাতের থালায লাথি মারে। ছেলেরা কেঁদে ওঠে। মুক্ত কাঁদে। শরৎ বলে,—"ওসব কবির সুরের গাওনা রেখে দিযে এখন টাকা নিযে আয, নয আমার সামনে থেকে দূর হ।" এই বলে সে মুক্তর চুল ধরে মুষ্টাঘাত দেয। "সংসার ছারখার করে তবে ক্ষান্ত হব, দেখি কে আজকে রক্ষা করে।" ইতিমধ্যে শরৎ-এর বড়ো ছেলে কমলকৃষ্ণ আসে। মুক্ত তার কাছে সব চেপে যায।

এদিকে শরৎচন্দ্রের মনোমোহিনী কামিনী বেশ্যা শরৎচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করে। সে শরৎকে তাড়াবার মতলব করে। সেইজন্যেই সে নাকি দামী গযনার বাযনা করেছে। "আমরা হলেম ব্যবসাদার মানুষ, যার ট্যাঁক ভারী দেখব তাকেই যত্ন করে বসাব, যার ট্যাঁক গড়ের মাঠ দেখব তার দিকে ফিরেও চাইব না, শতমুখী দিযে বিদায করব।" কামিনী [illegible] দিযে হুঁকো আনিযে ধূমপান করে। শরৎবাবু আসে। —"দেখ কামিনী, কাছে বল্লে খোসামোদ করা হয, আমার কিন্তু এই পরজন্মের পুণ্যের জোর না থাকলে তোমাকে কিছুতেই পেতাম না [illegible] বলে নাই আমার মতন সৌভাগ্য পুরুষ প্রায দেখা যায না।" এই কামিনী পযসার খোঁটা দেয। শরৎ-এর sentiment-এ একে আঘাত লাগে।—"টাকাটা কি এতই বড় হলো কামিনী, এলুম আগে আমোদ আহ্লাদ মজলিস করতে এসে, টাকা [illegible] হাতের ময়লা কামিনী।" এই কথা [illegible] —"টাকা হাতের ময়লা বটে, কিন্তু টাকার জন্যেই আবার মনের ময়লা হয [illegible] ও চটক কটক তোমার বোল চালাতে আমি ভুলিনি, দিতে পার [illegible] দাও, নইলে আর আমায জ্বালিও না। এখন ঢেঁকির তলো আওয়াজ আর ভাল লাগে না।" তাকে বিদায দেয সে। বিদায করে দিযে স্বস্তিলাভ করে। প্রতিবেশিনী বেশ্যা সৌদামিনীর চোখে এটা দৃষ্টিকটূ লাগে। সে বলে, যাই হোক শরৎ বড়োলোকের ছেলে। কামিনী সৌদামিনীর ভুল ভেঙে দেয। সৌদামিনী কামিনীকে বলে,—এই সেই দিন বাপমা মরবার পর শরৎ কামিনীর ঘরে ঢুকেছে। সবটাকা কি তুইযে নেওয়া শেষ হযে গেছে? কামিনী জবাব দেয—শুঁড়ি আর ইযারেতেই অর্দ্ধেক নিযেছে। সৌদামিনী তখন কামিনীর

কাছে ভালবাসার দোহাই দিতে গিয়ে অপদস্থ হয়। কামিনী বলে,—"দেখ, গোদো, তুই নাকি যে মেয়েমানুষকে সেই মেয়েমানুষ, তোর কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্রই নাই, তবে তোকে আর বোঝাব কি। বল্লি কিনা ধর্ম্মের দিকে চেয়ে দেখিনি ত কি অধর্ম্মের দিকে দেখ্ছি। যার যা ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মেই চল্বে না অন্য ধর্ম্মেই চল্তে বলিস্, তাই বল্ দেখি।"

এদিকে মুক্তকেশীর দিন আর চলে না। তাই ছেলেদের নিয়ে বাপের বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। অবশ্য মুক্তর বাবা ভুবনবাবু মুক্তকে আনবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে চাকরকে খোঁজ নিতে বল্লে চাকর বলে,—"তা মু কিমুতে কইমু কর্ত্তাবাবু, তিনভাড় গঙ্গাজড আনুচি, বাজারে যাইকিবি বজাড আনুচি—বজাড আনুচি—আউ (একটু ভেবে) কঁড করিলা কঁড করিলা কর্ত্তাবাবু।" ইতিমধ্যে নেপথ্যে মুক্ত এবং তার ছেলেদের গলা পাওয়া যায়।—"ওমা কিছু খাবার দে মা—ওমা খিদেয় আর দাঁড়াতে পারিনে।"—"এই ত বাড়ীতে এসেছি বাবা, তোমার দাদীমা এখন খাবার দেবে চলো না।" তারা ঘরে ঢোকে। ভুবন এদের চেহারা দেখে অবাক হন, কষ্ট হয় তার। চারু সব কথা খুলে বলে। দুদিন তারা কিছু খায় নি। ভুবন তাড়াতাড়ি রামরূপকে হুকুম করেন—এদের ঘরে নিয়ে গিয়ে আগে পেট ভরে খাওয়াতে।

ভুবনবাবুর বাড়ীতে মুক্তকেশী ছেলেদের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলে, এমন সময় শরৎ আসে। মুক্ত ভয়ে ভয়ে বলে, তার টাকার কথা মনে আছে। শরৎ জবাব দেয়,—"তোমার মনে থাক্লেই আমার স্বকায় স্বর্গবাস হলো আর কি, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল নাকি। আমার কাছেও আবার কান ঝাড়তে আরম্ভ হচ্ছে বটে, মনে করেছ বাপের বাড়ী এসে ধিঙ্গী হয়ে বসেছি, তা এ-শর্ম্মার কাছে খাটবে না, বদমাইসি রোগের রীতীমত ঔষুদ জানি।" টাকার ধান্দায় স্বামীর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে বলে মুক্ত সহানুভূতি দেখাবার চেষ্টা করে। শরৎ বলে ওঠে,—"আর বেশী তেল মাখান ভালবাসা জানাতে হবে না, এখন টাকা চাই, তুই বীবীর বেটী বীবীর মত আমোদে আটখানা হয়ে আছিস্, আর আমি শালা যে টাকার জন্যে অপমানের শেষ হয়ে বেড়াচ্ছি, তা দেখতে পাস্নি।" শরৎ মুক্তর কেশাকর্ষণ করে যথেচ্ছ মুষ্টাঘাত দেয়। শেষে পিঠে পদাঘাত করে। এই সময় উপেন এবং নগেন এসে শরৎকে তিরস্কার করে। তাতে শরৎ বলে,—"ভাল করি বা মন্দ করি,

আমিই করেছি, তোমায় আমি দালালি কর্ত্তে ডাকি নি।" এমন সময় ভুবনবাবুও আসেন। তিনি বলেন,—"বাপুতি, বিষয় আশয় যা ছিল, তা সব ঘুচিয়ে ত পায়খানা বানিয়েছ, দেনার জ্বালাতেও শুনছি, রাবণের বেটা মেঘনাদের মত লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্চ, বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েও আবার কুলোপানা চক্র দেখাও কেন?" শরৎ বলে,—"যদি ভাল চান, তবে এই দণ্ডেই আমার পরিবারকে পাঠিয়ে দিন, নইলে আমি এইখানে বসে মদ খাব, ইয়ারকি করব, মুখ খারাপ করবো, মারবো, ধরবো, যা ইচ্ছে তাই করবো. তাতে কোন রাস্কেল, কোন স্কুয়ারেল আমার প্রতিবন্ধকতা হতে পারবে না।" ভুবনবাবু মন্তব্য করেন—তাঁর টাকায় পেট চালিয়ে তারই উপর চোটপাট। এবার তিনি টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেবেন। আজ থেকে তিনি মনে করবেন মুক্তকেশী বিধবা। শরৎ এর অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়ে চলে যায়। ভুবন মুক্তকে সান্ত্বনা দেয়।

দুই-একদিন পরে ভুবনকে হরকরা চিঠি দিয়ে যায়। শরৎ ভুবনকে চিঠি লিখেছে যে সব কাটিয়ে মারবে—ওকে ছাড়বে। নীচে স্বাক্ষর আছে—'মাতাল শরৎ'। নগেন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাতে বলে, ভুবন এতে গুরুত্ব দেন না।

অন্ধকার রাত। শরৎ সাহেবী পোষাকে সেজে ভুবনবাবুর বাড়ীর পাশের পথে দাঁড়ায়। দড়ির সিঁড়ি দিয়ে তেতলার ছাদে ওঠে। তারপর ঘরে ঢোকে। ঘর অন্ধকার। শরৎ দেশলাই জ্বেলে কেবল ছেলেদের দেখে আর কাউকে পায় না। নবীন হঠাৎ চিনতে পারে বাবাকে। শরৎ বলে,—"এ শালার ছেলের জন্যই আমার সর্ব্বনাশ হলো দেখতে পাচ্ছি যত চেষ্টা যত আশা, সকলই বৃথা হলো দেখছি।" সে নবীনের বুকে বার বার ছুরি আঘাত করে। বিজয় জেগে উঠে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে—"মেজদাদাকে কেটে ফেল্লে কেন বাবা। তখন শরৎ বিজয়কেও ছুরি মারে। বসন্ত উঠে পালায়। খবর পেয়ে নগেন এসে শরৎকে ধরতে এলে শরৎ নগেনকে পদাঘাতে ফেলে দিয়ে তার বুকে ছুরি চালায়. উপেন এসে "খুন—খুন—পুলিস—পুলিস" বলে চেঁচায়। শরৎ উপেনকে মারতে গেলে উপেন পালায়। এমন সময় কনষ্টেবল আসে। সে মন্তব্য করে,—"আরে বাপ্‌রে বাপ, এ কেমন হইয়ে সেরে বাপ্‌, এ কেতনা আদ্‌মিকো কাটিয়ে সেরে বাপ্‌, লহুমে একদম্ তালাও বানায় দিয়াবে।" শরৎ কনষ্টেবলকে মারতে গেলে কনষ্টেবল পালাতে যায়, এমন

সময় উপেন এসে পেছন থেকে শরৎকে জাপ্‌টে ধরে ফেলে। পরে কনষ্টেবলের সহায়তায় তাকে বেঁধে ফেলে। শরৎ নিষ্ফল আক্রোশে ফোঁস্ ফোঁস্ করে। শরৎ মন্তব্য করে,—"তা হোক য়্যারেষ্ট হয়েছি তায় ভয় করিনে, মরি —তাতেও ভয় করিনে, কিন্তু মনের দুঃক্ষু রইল, যা মনে করেছিলাম, তা কর্ত্তে পেলাম না, সব বেঁচে রইল, সব মার্ত্তে পেলাম না, সব পোড়াতে পেলাম না।"

শরৎ-এর ছেলে কমলকৃষ্ণ এসে শরৎকে গালাগালি করে,—"তুমি কি আমাদের জন্মদাতা বাপ, না রাক্ষস।" মুক্তকেশীর বড় বোন স্বর্ণলতা ছুটে আসে। স্বামী নগেনকে রক্তাক্ত দেখে কাতরায়। সবাই হাসপাতালে দেওয়ার প্রস্তাব করলে স্বর্ণ আপত্তি ক'রে বলে যে বাড়ীতেই চিকিৎসা চল্‌বে। ডাক্তার ইতিমধ্যে এসে বলে,—চিকিৎসার প্রয়োজন চিরতরে ফুরিয়েছে। স্বর্ণ কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে যায়। এমন সময় মুক্তকেশী এসে এসব দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। উপেন শরৎকে অনেকক্ষণ তিরস্কার করে। পরে বলে,—"হে জগৎবাসী, হে সুহৃদগণ, হে ভাইসকল, তোমরা যদি এই আর্য্য সনাতন ধর্ম্ম বজায় রাখতে ইচ্ছা কর বারবিলাসিনী রাক্ষসীগণের মায়াপথে যেন প্রাণান্তেও পদার্পণ করো না, আর এই শরৎবাবু যেমন সুরা পান করে, ঐহিক পারত্রিক এই উভয় পথে কণ্টক রোপণ কল্লেন, দেখে শুনে এ পথের পথিক যেন কেহই হয়ো না।"

রক্তগঙ্গা (১৮৯৬ খৃঃ)—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়॥ এই প্রহসনটিও কুমারটুলির সুপ্রসিদ্ধ হত্যাকাণ্ড নিয়েই লেখা। শ্বশুরের প্রতি আক্রোশে শ্বশুরবাড়ীর পাঁচজনকে আসামী হত্যা করে এবং শেষে উপলব্ধি করে যে তিনটিই তার পুত্র। প্রহসনটির সন্ধান এখনো পাওয়া যায় নি।

সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রহসনই লেখা হয়েছে ; তবে সেগুলোর মধ্যে কতকগুলোর পরিচিতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। আনুমানিক-ভাবে এ ধরনের কতকগুলো ঘটনার উদ্ধার হয়তো সম্ভবপর, কিন্তু তাতে করে মাত্রা নির্ধারণের প্রশ্ন ব্যতীত উপাদান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জাগে না।

মদ্যপানের যৌন-সমস্যা-প্রধান প্রহসনগুলো প্রদর্শন করা হলো। যৌন ব্যতিরিক্ত সমস্যা যেখানে প্রধান, তা অন্যান্য বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে। অবশ্য মদ্যপান প্রাথমিক-অনুশাসন-বিরোধী একটি অনুষ্ঠান, তাই যে কোনো ধরনের প্রহসনেই মদ্যপানের অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অনেকসময় মদ্যপের বোধহীন দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সাধারণে সহযোগ-বিমুখ হয় বলেও এই

পদ্ধতি অনেক প্রহসনকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সমাজচিত্রগত মূল্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

২। **পুরুষপক্ষীয় ব্যভিচার প্রবৃত্তি**—

বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্যদোষ।—

পুরুষপক্ষে বহু-যোনী-সম্ভোগ-সমস্যার অন্যতম দিক হচ্ছে বেশ্যাসক্তি সমস্যা। যৌন-তাড়না মানুষের স্বাভাবিক এবং প্রবল প্রবৃত্তি। দৈহিক ও মানসিক শান্তির দায়িত্ব বহন করেছে সমাজ। তাই যৌনাচার পালনে সমাজ অংশীদারকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। স্ত্রীপক্ষে সমাজবিশেষে বহু-পুরুষাঙ্গধারণে কতকগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ক্ষেত্রদূষণের সমস্যা ছেড়ে দিলেও, সমাজ বিশেষে যেখানে পিতৃতান্ত্রিক বংশরক্ষা প্রণালী প্রচলিত, সেখানে ঔরস নির্দেশের অভাবে বংশগত সমস্যা এসে দেখা দেয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর তথা সন্তানের আর্থনীতিক দায়িত্ব স্বীকারের দিক থেকেও পুরুষপক্ষে সমস্যা বিদ্যমান্। তাছাড়া বহু পুরুষাঙ্গ ধারণের জীববিজ্ঞান স্বীকৃত কুফল—বন্ধ্যাত্ব—স্ত্রীপক্ষে বড়ো অভিশাপ। কিন্তু বহু যোনী-সম্ভোগে পুরুষপক্ষে বিশেষ কোনো সমস্যার সৃষ্টি ঘটে না—যদি পুরুষসম্ভুক্ত স্ত্রীলোক একটিই মাত্র অংশীদারের সঙ্গে নিযুক্ত থাকে। তাই সমাজে বহু বিবাহপ্রথাতে যেমন কোনো অসুবিধা ঘটে নি, তেমনি বেশ্যাবৃত্তির প্রচলনে সমাজের বিশেষ কাঠামোই সহযোগিতা করেছে। অবশ্য সেই সঙ্গে প্রতিকূল হয়ে দেখা দিয়েছে স্ত্রীলোকের দৈহিক কতকগুলো অসুবিধা।

বেশ্যাসক্তিতেও তেমন পুরুষের ক্ষেত্রদূষণগত কোনো সমস্যা উদ্ভবের কারণ থাকতে পারে না। 'ফিরিঙ্গী' রোগাদি অর্জনের সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দিক।) বহুযোনী সম্ভোগের ক্ষেত্রে বহুবিবাহের চেয়ে বেশ্যাগমনের পক্ষে কতকগুলো আকর্ষণীয় দিক আছে। এতে পুরুষের কতকগুলো সুপ্ত প্রবৃত্তি পূর্ণ বিকাশ পায়—যা দাম্পত্য জীবনে বা সামাজিক জীবনে সম্ভবপর নয়। বহুবিবাহে বিবাহিত ব্যক্তির বেশ্যাসক্তির সামাজিক দৃষ্টান্ত এর প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করা চলে।

দাম্পত্য অসন্তোষও বেশ্যাসক্তির অন্যতম কারণ। যেখানে স্ত্রী যৌনতৃপ্তি দিতে অক্ষম, অথবা সাংস্কৃতিক সমর্থনে অসমর্থ, সেক্ষেত্রে স্বামীর বেশ্যাগমন

লক্ষ্য করা যায়। দাম্পত্য-সন্তোষে যে মানসিক শান্তি আসে, বেশ্যাগমনে তা ঘটে না, কিন্তু বেশ্যার সঙ্গে মদ্য একত্র বিজড়িত থাকায় বৈকল্পিক আকর্ষণ থাকে। অবিবাহিতের বেশ্যাসক্তির মূল কারণ যৌনবুভুক্ষা।

বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যক্তির বেশ্যাসক্তির মূলে আরও কতকগুলো কারণ আছে। যেমন, আকর্ষণমূলক বা স্থিতিমূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনে বেশ্যাগমন। অবশ্য এ ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা বিশেষ পরিধিতে আবদ্ধ।

বেশ্যাবৃত্তি আমাদের সমাজে অত্যন্ত প্রাচীন। অনেকদিন পূর্বেই 'দত্তক' বেশ্যাদের নির্দেশে বেশ্যাবৃত্তি সম্পর্কিত একখানি পুস্তক লেখেন। বাৎসায়নের কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণের ছয়টি অধ্যায়ে বেশ্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বেশ্যাবৃত্তির অস্তিত্বের দ্বারাই আমরা বেশ্যাসক্তির ঐতিহাসিকতা মেনে নিতে পারি। বেশ্যাসক্তির ঐতিহাসিকতা মেনে নিলেও বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে যৌন দৃষ্টিকোণের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য—যদিও আর্থিক দিক থেকে দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ আধুনিক বলা যেতে পারে না। পুরুষপক্ষে পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে যে কারণে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয় নি, বেশ্যাসক্তির বিষয়ে একই কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে স্ত্রী-পক্ষীয় মানসিক সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দেয় নি। বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে স্ত্রী-পক্ষীয় দৃষ্টিকোণ আমাদের সমাজে আধুনিক কালেই সমর্থনপুষ্ট। এই সমর্থনের মূলে দাম্পত্যনীতিরক্ষাই বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেশ্যাসক্তির সঙ্গে বেশ্যাসমস্যাও জড়িত থাকে। এই সমস্যা মুখ্যতঃ আর্থিক এবং গৌণতঃ যৌন। দাম্পত্য স্থিতিতে সামাজিক মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সমাজের সামষ্টিক স্বার্থে-ই বেশ্যার সমস্যার প্রতি দৃক্‌পাত করা হয় না। বস্তুতঃ এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল। আধুনিককালেও Logan, Action, James Marchant, Dr Bloch প্রমুখ পণ্ডিতরা বেশ্যার সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করেও সমাধানের স্বচ্ছ পথ দিতে সমর্থ হন নি।[১] অনেকের মতে, বেশ্যার দাম্পত্য-জীবনে স্বীকৃতিদান অসঙ্গত। এর কারণ বহুচারিতার প্রবৃত্তিকে একচারিত্বের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ—বিশেষ করে যৌনক্ষেত্রে—মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে অবাস্তব। গার্হস্থ্যজীবনে "দূষিত ক্ষত"-রূপ বেশ্যার অন্তর্ভুক্তির অর্থ গার্হস্থ্য পরিবেশের

1. The Great Socisl Evil—Logan. On Prostitution—Action; The Master Problem—James Marchant, Sexual Life of our time; Glass of Fashion—Dr. Bloch etc.

সুস্থ সামাজিক অণুগুলো দূষিত করা। তাই অনেকেই বেশ্যাসমাজকে পৃথক পরিধিভুক্ত রাখবার মত পোষণ করেন। বেশ্যাসমাজ সাধারণ সমাজের ওপর সম্ভাব্য অসামাজিক ব্যক্তিপ্রযুক্ত চাপ নিজে গ্রহণ করে সমাজকে বিপন্মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। এই সমস্ত অসামাজিক ব্যক্তি যৌন, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক নীতির দিক থেকে অসাড। সমাজের দুষ্ট ক্ষতের কেন্দ্রীকৃতির জন্যে লম্পট ও বেশ্যার বিহারকেন্দ্রকে অস্বীকার করতে সমাজ সাহসী হয নি, তবে দাম্পত্য নীতিরক্ষার জন্যেই বেশ্যাসমাজকে কঠোরভাবে গণ্ডীবদ্ধ করবার চেষ্টা চলছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে যে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে—তা দাম্পত্যনীতি বিরোধী অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত। প্রসঙ্গতঃ গৌণভাবে বেশ্যার স্বপক্ষে দৃষ্টিকোণ সূচিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তাদের সামাজিক যৌনসমস্যার ইঙ্গিত বিরল। এর কিছুটা আর্থিক সমস্যার দিক উপস্থাপিত করা হয়েছে—এর মূলেও আছে দাম্পত্যজীবনে আর্থিক সম্পর্ক রীতিনীতি বিষয়ক দৃষ্টিকোণ। তবে দাম্পত্যজীবনের প্রতি মোহ অধিকাংশ বেশ্যার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিকোণ স্বরূপ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অনুযোগ বিবৃত হয়েছে। বেশ্যাবৃত্তিগ্রহণের কারণ হিসেবে এদের অনেকেই যৌন অসন্তোষ ও যৌন নিরাপত্তাহীনতা ইঙ্গিত করেছে। এগুলোর মূলে যে ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিনীতি বা অনুষ্ঠানই সক্রিয়—একথা প্রচারেরই চেষ্টা করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ্যাসক্তি এতো ব্যাপক হয়ে উঠেছিলো যে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনের মূলে অন্যান্য যে কারণ থাকতে পারে, সেগুলো স্বীকার করেও এটা অস্বীকার করা যায় না। এটা হয়তো সত্যি যে, সমাজের মধ্যাকার এই বেশ্যাসক্তি প্রদর্শনের মূলে ছিলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত বিরোধ, কিংবা প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রদর্শন ছিলো উদ্দেশ্যমূলক, এবং এটাও হয়তো মিথ্যা নয় যে প্রাচ্য প্রহসন রীতির অনুসরণ করতে গিয়ে বেশ্যার প্রসঙ্গ টানতে বাধ্য হওয়ায় লেখক প্রসঙ্গক্রমে বেশ্যাসক্তির বিষয় ব্যাপকভাবে এনে ফেলেছেন। কিন্তু সমসাময়িককালের ঐতিহাসিক নজির এই প্রমাণই দেবে যে, এই সমস্ত উদ্দেশ্যমূলকতা অতিবর্তন করে বেশ্যাসক্তি বিষয়টি বাস্তবতার স্মৃতিই বহন করেছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর "সেকাল আর একাল"[২]

২। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ পৃঃ ৭৮

গ্রন্থে বলেছেন,—"(একালে) যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্বে গ্রামের প্রান্তে দুই একঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত, এক্ষণে পল্লিগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমন বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা কিন্তু সভ্যতার চিহ্ন। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।"

রাজনারায়ণ বসুর উক্তি সম্পূর্ণ সাংবাদিক সুলভ না হলেও এবং যুক্তি সমাজবিজ্ঞান মতে সম্পূর্ণ অখণ্ডনীয় না হলেও উনবিংশ শতাব্দীর বেশ্যাসক্তির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সমর্থন এতে পাওয়া যায়। সভ্যতার সঙ্গে বেশ্যাসক্তিকে লেখক জড়িয়ে দেখেছেন, এ থেকেই বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ্যাসক্তি আগেকার মাত্রা অতিক্রম করেছে। শহরাঞ্চলের মতো পল্লীঅঞ্চলেও বেশ্যাবৃত্তির এবং বেশ্যাসক্তির ব্যাপকতাও ঐতিহাসিক। "নিশাচর" তার "সমাজকুচিত্র" গ্রন্থের (?) মলাটে লিখেছেন—"আঁকিনু এ চিত্রপট স্বভাব তুলিতে।" তিনিই তার পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "পল্লীগ্রামতীর্থ" প্রবন্ধে লিখেছেন,—

পল্লীগ্রামের ছেঁমোচাপা মেয়েগুলো পিতৃ ও শ্বশুরকুলে কলঙ্ক-পঙ্ক ও লজ্জা সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে দু পা বেরিয়ে দাঁড়ালেই চিত্রগুপ্তের রেজিষ্টারী খাতায় তাহাদের নাম উঠে যায়। বাম, শাম, বাবাঠাকুরেরা সেই সকল শুভ পুণ্যাহের (ফী) প্রসাদ পান। নামদাগা অফিসরেরা গ্রামের প্রকাশ্য সাযেব ও গঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এসে আফিস খোলেন। ক্রমে উহাতে কৃত্রিম "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের" কাজও হোতে থাকে। পূর্ব্বে অনেক পল্লীগ্রামের লোকেরা বারাঙ্গনা নাম শুনেছিল মাত্র, উহা কাহাকে বলে জান্‌তো না। প্রবাদ আছে, "১২৪২ সালে শ্রাবণ মাসে এক পল্লীগ্রামে বেশ্যার আবশ্যক হওয়াতে ঐ গ্রামের এক মিশ্র ব্রাহ্মণ তাহাদের বাসগ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে এক বাজারে বেশ্যা আস্তে যায়। সেখানেও প্রকাশ্য 'উহা' ছিল না। কেবল কযেকজন ধীবর-কন্যা দিবসে মৎস্য বিক্রয় কর্ত্তো, আর রজনীতে চিরাভ্যস্ত নূতন ব্রতের অভ্যাস রাখতো। মিশ্র ঐ দলের ২/৩টিকে নিজ গ্রামে এনে প্রতিষ্ঠা কোল্লেন।

তদবধি ঐ সকল কুলবধূর কুলবৃদ্ধি হয়ে আদিসুর রাজার ব্রাহ্মণ পরিবারের মত পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঁই ছড়িয়ে পোড়েছে।”

নিশাচরের উক্তিতে যে ইতিহাস প্রদত্ত হয়েছে, তার মূল্য নগণ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তার উক্তি থেকেই বোঝা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ্যাবৃত্তি ও বেশ্যাসক্তি পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, এটা তিনি স্বীকার করেছেন।

এ যুগে বেশ্যাসক্তির ব্যাপকতার মূলে প্রচুর কারণ ছিলো। এগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে—সংস্কৃতিগত দাম্পত্যবিরোধ, প্রতিষ্ঠা অর্জন-মানস এবং বেশ্যার সুলভতা। যৌন বুভুক্ষা বা কৌতূহলকে অন্যান্য কারণ হিসেবে গ্রহণ করা গেলেও যুগগত দিক থেকে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। পণদানে অকুলীনের অক্ষমতায় অবিবাহ জনিত যৌনবুভুক্ষা এবং বাল্য বিবাহ বা অসমর্থ বালিকা বিবাহ জনিত অসন্তোষ উনবিংশ শতাব্দীর বেশ্যাসক্তির যুগগত কারণ নয়। তবে এগুলো অন্যতম কারণ হিসেবে অস্বীকার করাও অযৌক্তিক। বস্তুতঃ যে দাম্পত্য অসন্তোষ থেকে বেশ্যাসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, তা ছিলো সাংস্কৃতিক বিরোধ জনিত। উনবিংশ শতাব্দীতে স্বামীর সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে স্ত্রীর পদক্ষেপ সমতালে সাধিত হয়নি বলেই, পাশ্চাত্য স্ত্রীসুলভ ব্যবহারের আকর্ষণে অনেকে স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করেছে। ইউরোপীয় ভাবপ্রভাবে স্বাধীনা স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ উনবিংশ শতাব্দীর অনেক যুবক অনুভব করেছে। বেশ্যাদের চালচলনের মধ্যে এইসব যুবকদের আকর্ষণীয় উপাদান ছিলো। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তার ‘স্ত্রী শিক্ষা’ প্রবন্ধে[3] বলেছেন,—“স্বামীর সহিত আলাপে স্ত্রীর, স্পষ্টাক্ষরে বলিলে দোষ হয়, বেশ্যার ন্যায় আচরণ করে। ইহা হিন্দুশাস্ত্র যে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, বাঙ্গালী শিক্ষিতা স্ত্রীকে ঘৃণা করে। এই শাস্ত্র অবহেলাই বঙ্গ যুবকের ব্যাভিচারের কারণ।” বেশ্যাদের [illegible] সাধারণতঃ মানুষের দুর্বলতার উপর বলাৎকার প্রয়োগে অনুসৃত হয়। [illegible] জীবনে অচরিতার্থ সুপ্ত বোধগুলো এক্ষেত্রে জাগ্রত করবার চেষ্টা চলে [illegible] দাম্পত্য-শিথিলতার ভয়ে যে যে সুখকর স্ত্রী-আচার সামাজিক দিক [illegible] নিষিদ্ধ, সেগুলোর চর্চা বেশ্যাদের ‘প্রাতিষ্ঠিক’ বৃত্তির অন্যতম সহায়। [illegible] বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তার “আপনার মুখ আপনি

[3] নাট্যমন্দির—২য় বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৮।

দেখ” নামে পুস্তিকায় (১৮৬৩ খৃঃ) যে আটটি বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার মধ্যেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর যুবকদের আকৃষ্ট করবার জন্যে কোন্ কোন্ উপাদান তাদের মধ্যে ছিলো তাও জানা যাবে। “খান্‌কী”-র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন.—

“ঠাট ১ ঠমক ২ চটক ৩ চাল ৪
মিথ্যা ৫ মান ৬ কান্না ৭ গাল ৮।”

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের লেখা “ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে” প্রহসনের (১৮৭২ খৃঃ) মধ্যে বেশ্যাসক্তির এই কারণটি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রহসনের অন্যতম চরিত্র রসিক বলে—“ভাই ঘরে যে ঠাকরুণ আছেন. তাব না আছে কথার ছেনালী, না আছে পোষাকের বিউটী. না আছে গাওনা বাজনার টেস্ট।... প্যাইফের সঙ্গে তাদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করা দূরে থাক, একবার দেখানোর যো নাই।” যুবকদের এই সুপ্ত বাসনা অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীর মধ্যে দিয়ে চরিতার্থ করবার ইচ্ছার ভেতর দিয়েও বেশ্যাসক্তি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত কারণটির সমর্থন পাওয়া যায়। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা “ভ্যালারে মোর বাপ” প্রহসনে (১৮৭৬ খৃঃ) সিতুর মা-কে কলির কাপ বলেছে,—“আমি বেশ্যালয়ে যাইনে। যারা বাউরে তারাই খানকির বাড়ী গিয়ে টাকা নষ্ট করে। ঠানদিদি! তোমাকে বোল্‌তে কি? তুমি কিছু কারো সাক্ষাতে বোল্‌তে যাবে না। আমি আফিস থেকে আসবার সময় রাস্তার ধারে বারেণ্ডায় খান্‌কি বেটীরে যেমন কোরে সেজে বোসে থাকে দেখি, ঘরে এসে তোমার নাতবৌকে ঠিক তেমনি করে সাজাই।” যদিও লেখক অন্য উদ্দেশ্যে সংলাপটি উপস্থিত করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে একটি সমাজ সত্য নিহিত আছে।

বেশ্যাদের সাংস্কৃতিক বৈতাসকতার চিত্র অঙ্কন করেও বেশ্যাসক্তির পূর্বোক্ত কারণ—সংস্কৃতিগত দাম্পত্য বিরোধের সত্যতা মেনে নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধেশ্বর ঘোষের লেখা “লণ্ডভণ্ড” প্রহসনে বারবিলাসিনীর গানটি এ সম্পর্কে উল্লেখ করা চলে—

“সভ্যতাতে চ’খের জল হ’ল মোদের সার।
গিয়েছে গুমোর পসার সহরে আর টাকা ভার।
নাগরে বাঁধতে নারি বেণী আউনয়ন বাণে,
মন মজে না প্রাণ ভোলে না বাংলা বেশে বাংলা গানে॥”

বেশ্যাসক্তির মূলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত কারণও লক্ষ্য করা যায়। দেশের

ধনী সম্প্রদায়কে অর্থ নিয়োগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে এবং নিজস্ব শিল্পের বাজার সৃষ্টির জন্যে শাসকগোষ্ঠী তাঁদের মর্যাদাবোধকে উন্নত করে তুলে ধরেছিলো। এঁদের মধ্যে অনেকেই জমিদার ছিলেন, যাঁরা ছিলেন না, তাঁরাও জমিদার হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পেলেন। জাগ্রত মর্যাদাবোধে এবং খেতাব ইত্যাদি লাভের প্রতিযোগিতায় তাঁদের বিলাসিতা ও অপব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এইভাবেই মদ ও বেশ্যা এই সমস্ত ধনীর জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়েছিলো। পরবর্তীকালে রক্ষিতা পোষণ যেন ধনী এবং অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তির মর্যাদাকে রাখবার একটি আবশ্যিক উপায় রূপে গণ্য হয়েছে। এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,—"সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে, আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে —"ইনি ইঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী করিয়া দিয়াছেন, এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই? দেশের সর্ব্বত্র এই সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল।"[৪] নাগরিক জীবনে ধনীর অনুষ্ঠিত এই সব কুদৃষ্টান্ত সমাজের প্রাতিষ্ঠিক সম্প্রদায়কেও প্রলুব্ধ করেছে। গত শতাব্দীতে সস্ত্রীক সহরাবাসের অনেক অসুবিধা ছিলো। ধনীরা শহরে আসতেন চাকরী নিয়ে, অথবা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে। স্ত্রী বিচ্ছেদে এঁদের অনেকেরই ছিলো যৌন অস্বাচ্ছন্দ্য। প্রাতিষ্ঠিক গোষ্ঠীর মর্যাদাবোধও শাসকপক্ষ বাড়িয়ে তুলেছিলো। এর ফলে এঁদের আয় যা-ই হোক, মর্যাদা রক্ষার জন্যে ধনী সম্প্রদায়ের সাধিত আচার অনুষ্ঠানের যথাসাধ্য অনুকরণে, এঁরা অনেকেই "ফাতা বাবুয়ানার" দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই ভাবে তাঁদের মধ্যেও মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ্যাসক্তিতে অর্থের অপচয় হয়। অর্থের অপচয়েই যেন মানুষের মর্যাদা উন্নীত হয়—এই ধারণাই এখানে বলবৎ ছিলো।

এই বেশ্যাসক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যেও বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের সম্মুখে বয়স্কদের কুদৃষ্টান্ত উজ্জ্বল ছিলো। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,—"তখন অল্পবয়স্ক বালকদিগের আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করিত। তরলমতি বালকেরাও এমন সকল বিষয় জানিত যাহা তাহাদিগের

৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ: ২য় সং: পৃ: ৪৩

জানা উচিত নয়।"[৫] রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রশ্নে Oriental seminaryর দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র "কালীপ্রসন্ন দাস ঘোষস্য" নামাঙ্কনে মন্তব্য করেছিলেন,— "সন্তানেরা কেবল স্ব স্ব গর্ত্তধারিণীর কুসংস্কাররূপ তিমিরাচ্ছন্ন হয় এমত নহে। তাহারা নিজ ২ পিতা পিতৃব্য, পিতামহাদি গুরুতর ব্যক্তিদিগের সুরাপান, বেশ্যাবিলাস, ও অগম্য গমনাদি বিবিধ প্রকার উৎকট পাপাচরণেও অনুবর্ত্তী হয়েন।"[৬] অবশ্য অল্পবয়স্কদের বেশ্যাসক্তির মূলে ছিলো বাহাদুরী নেবার অথবা কেরামতী দেখাবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক পরিস্থিতি বিচারে যৌন কৌতূহলের প্রসঙ্গ মনে আসা স্বাভাবিক, যদিও তা থাকে, তাহলেও তা মুখ্য নয়। বিশেষতঃ আমরা জানি, সেকালে বাল্যবিবাহ আমাদের দেশের অল্পবয়স্কদের মধ্যে যৌন চেতনা এনে দিয়েছিলো, অথচ আধুনিককালে অল্পবয়স্কদের সম্পর্কে যতোই অভিযোগ আসুক না কেন, তাদের মধ্যে যে যৌন অপরাধ সচেতনতা তথা মানসিক জটিলতা আছে, গত শতাব্দীতে তা ছিলো না।

ক্লাসিক পরিবেশ সৃষ্টির একটা আকাঙ্ক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর নব্য গোষ্ঠীর অনেকের মধ্যে দেখা গেছে। প্রাচীনকালে গ্রীক বুদ্ধিজীবীদের সংস্কৃতি-চক্র ছিলো বেশ্যা গৃহ। বেশ্যাগৃহে সাংস্কৃতিক চক্র গড়বার অনুকরণমূলক বাসনা থেকেও স্বাভাবিকভাবে বেশ্যাসক্তি জন্ম নিয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,— "পূর্ব্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ—এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল! যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমাদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড়প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে সেথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।" অবশ্য আনাতোল ফ্রাঁস-এর Thais নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং বলাবাহুল্য এর কোনো প্রভাব ছিলো না। শেষে যে কারণ উল্লেখ করা হলো, অনেকের মতেই এবং গ্রন্থকারের মতেও মুখ্য কারণ নয়।

৫। **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ; নিউ এজ; ২য় সং; পৃ: ৪৩।**

৬। **সংবাদ ভাস্কর ৬ই চৈত্র, ১২৬০।**

ব্যাপক বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রহসন রচিত হয়েছে। কোনোটিতে তা মুখ্যস্থানীয়, আবার কোনোটিতে গৌণ স্থান অধিকার করেছে। অনেক প্রহসনের ভূমিকাতেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট। 'বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক" এর ভূমিকায়৭ প্রহসনকার লিখেছেন—'বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক মুদ্রিত হইল, ইহা কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা অন্য কোন ইংরাজী নাটকের অনুরূপ নহে, এতৎ পাঠে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বেশ্যাসক্তি নিবৃত্তি হয়, ইহাই আমার অভিপ্রায়।"

প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণে বেশ্যাদের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে বিগত দাম্পত্যজীবনগত অনুশোচনা লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে দেখা যায় একটি গোষ্ঠীর প্রতি অনুযোগ—যারা দাম্পত্যজীবনে জটিল সৃষ্টির জন্যে দায়ী। তাই এসব দৃষ্টিকোণের অন্তরালেও প্রহসনকারের উদ্দেশ্য ছিলো দাম্পত্য নীতি রক্ষা। রামলাল বন্দোপাধ্যায়ের লেখা 'কষ্টিপাথর' প্রহসনে পিয়ারী বেশ্যা বলছে—"আমরা যাদের সর্বনাশ করি তাদের সুমুখে যাই না, ভয়ে তফাতে থাকি যথার্থ গেরস্তর মেয়েদের আমরা দেবতা ঠাওরাই, তাদের ছায়ায় প্রণাম করি প্রার্থনা করি যেন জন্মজন্ম। যেন সেরকম হতে পারি।" দাম্পত্য নীতি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হলেও এই দৃষ্টিকোণ অবাস্তব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বেশ্যা বিনোদিনী দাসী তাঁর স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে বলেছেন,—'এই ভাগ্যহীনা হতভাগিনীর হৃদয় যে কত দীর্ঘশ্বাসে গঠিত কত মর্মভেদী বেদনার রেখায় সিমেন্ট চাপা কত নিরাশা হা হুতাশ দিবানিশি অতৃপ্ত অন্তরে ঘুরিয়া বড় হইয়াছে কত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত বাসনা, যাতনার জ্বলন্ত জ্বালা লইয়া ছটফটি করিতেছে তাহা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে আশ্রয়াভাবে বারাঙ্গনা হয় বটে কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণীহৃদয় লইয়া সংসারে আসে।"৮

অনেক প্রহসনকার কিছুটা উদার দৃষ্টি নিয়েও বেশ্যাসক্তি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এঁদের মতে, অবিবাহিতদের বেশ্যাগমন যৌবনের অপরাধই হোক, বিবাহিতের বেশ্যাগমন ক্ষমা করা যায় না। এর দাম্পত্য দিকটিই

৭। প্রসন্ন কুমার পাল রচিত, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ।

৮। আমার কথা—বিনোদিনী দাসী, পৃ ১০৪—৫

কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর "সধবার একাদশী" প্রহসনে (১৮৬৬ খৃঃ) এ ধরনের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন। সেখানে গোকুল পটলকে বলেছে,—"বেশ্যা রাখা লোকতঃ ধর্মতঃ বিরুদ্ধ—বিশেষ যাদের স্ত্রী আছে, তারা যদি বেশ্যা রাখে, তারা নিতান্ত নরাধম, পাষাণহৃদয়, স্ত্রীহত্যা পাতকী।"

বাস্তবিকই বিবাহিতের বেশ্যাসক্তি মর্মান্তিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক ও ধর্মীয় চাপে স্ত্রীলোকেরা ছিলো সম্পূর্ণভাবে পতি-সর্বস্ব। এমন অবস্থায় তাদের বেশ্যাসক্তি দাম্পত্য-অংশীদারকে কোথাও করেছে আত্মঘাত-কামিনী আবার কোথাও বা করেছে প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষিণী। স্ত্রীলোকের এই পতিসর্বস্বতার মনোভাবের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে রামনারায়ণ তর্করত্নের "নব নাটক"-এ (১৮৬৬ খৃঃ)। এই প্রহসনের অন্যতম চরিত্র কমলা বলেছে,— "প্রথম ঘর কত্তে যাওয়া বড় কঠিন, দেখ যাদের সঙ্গে জন্মাবধি ঘর করা হয় নি, যাদের চক্ষেও একবার দেখ নি, সেই সকল আ-কামানে কেয়ুটে বোড়ার সঙ্গে সংসার করা বিষম সমিস্যে। যাদের কি ভাব কি চরিত্র, কিছুই টের পাও নি, একবারে গিয়ে তাদের মন যোগান ভাই সামান্যি কঠিন কম্ম? সকলে কি তা পেরে ওঠে? তাতে ভাই একোজন একোরকম, নতুন বৌ এলে সে তো বনের পাখি ধরো নিয়ে আসা হলো, তা তার প্রতি স্নেহমমত্ব করা চুলোয় থাক, ঐ কি খেলে, ঐ কি কলো, কোথায় দাঁড়ালো, কার সঙ্গে কথা কৈলে, এই সকল কথা নিয়েই সংসারের ভতর ধূম পড়ে যায়। এ সকল বিষের মধ্যে পতিই আপন।

পতি ধনে যেই ধনী সে ধনীই ধনী
নির্ধন সে ধন বিনে বরঞ্চ রাণী॥"

ঊষর জীবনে মরূদ্যান-স্বরূপ পতির যৌনবঞ্চনা বা অবিশ্বস্ততা কতোখানি মনকে বিষাক্ত করে তোলে, তা পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই উপলব্ধি করা যাবে। বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর অভিমান এখানেই যে, তারা তাদের প্রেমের প্রতিদান পায় না,—আর প্রেমহীনা নারী তাদের অলভ্য প্রেম লাভ করে। "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক"-এ (১৮৬০ খৃঃ) শশিমুখীর ছড়াটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা চলে।

"মোর পোড়া পতি, বেহায়া সে অতি
থাকে দিবারাতি, পোড়ে বেশ্যালয়।

বিরহের রোগে যারা নাহি ভোগে
তাহাদের আগে, সতত সে রয় ॥
লাথি ঝাঁটা খায়, লজ্জা নাহি পায়
তবু তথা যায় ত্যাজিয়া আমায়।"—ইত্যাদি।

স্ত্রী বা মায়ের প্রতি বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির নির্যাতনের যে ঘটনা প্রহসনের কাহিনীর মধ্যে আবিষ্কার করে থাকি, তা অবাস্তব নয়। সবকিছুর মূলে থাকে মোহজনিত বুদ্ধিভ্রংশ। "বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক"-এর মধ্যেই দেখি, শশিমুখী কাদম্বিনীকে তার স্বামীর বেশ্যাসক্তির প্রসঙ্গে বলেছে,—"কাল যকোন্ রাত্তিরে ভাত খেয়ে ঘরের ভেতরে পান খেতে গ্যালো. তবোন্ আমি মোনে কোল্লুম কি, আজকে আর যেতে দেবো না, তাই মোনে কোরে ভাই. আমি তার কোঁচাটা ধোল্লুম, তাতে সে পোড়া কোল্লে কি বোন্, ন্যাংটো না হোয়ে দৌড়ে গিয়ে আল্লা থেকে আর একখানা কাপড় পোরে গ্যালো, আমি দেখে শুনে ওম্নি অবাক্ হোয়ে গেলুম।" বুদ্ধিভ্রংশের জন্যেই বেশ্যার কাছে তাদের চালচলন হাস্যকরভাবে প্রতীয়মান্ হয়। প্রহসনকার এ ধরনের অবস্থা চিত্রিত করতেও ভোলেননি। "মা এয়েচেন" প্রহসনের[৯] মধ্যে দেখ্তে পাই,—গিরিশ নামে এক ব্যক্তি মোহিনী নামে অন্য একজনের রক্ষিতাতে আসক্ত। একবার অবস্থাগতিকে মোহিনীর জন্যেই গিরিশকে মশার কামড় খেতে হয়। "মজা হয়েছিলো বলে গিরিশ মোহিনীকে মশার কামড়ের দাগ দেখিয়ে সহানুভূতি ভিক্ষার চেষ্টা করে। মোহিনী মৃদু হেসে বলে,—"এই মজা? তা তোমার কেবল একার নয়, অনেকেরই এই দশা।" একজনকে লুকিয়ে অন্য জনের সঙ্গে 'কারবার' করবার মধ্যে যে সাহস আছে—এটা মোহনার উপর আরোপ করে গিরিশ তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। উত্তরে মোহিনী বলে যে, ছাগল বা বাঁদর নাচাবার মতোই সে পুরুষকে নাচিয়ে বেড়ায়। গিরিশ বলে,—"ঐ গুণেই ত ঝুরে মরি, ঐ গুণেই তো মরে আছি।" প্রহসনের পাতায় পাতায় এ ধরনের বেশ্যাসক্তির হাস্যকর উপাদান দেখিয়ে বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে দাম্পত্য অংশীদার স্ত্রী-চরিত্রকে serious করে তুলে সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এর উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র নয়।

৯। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৩ খৃ।

বেশ্যাসক্তের শিক্ষালাভের মধ্যে দিয়েই প্রহসনকার বেশ্যাসক্তির পরিণতি দেখিয়েছেন। কোথাও ধর্মীয়, কোথাও সামাজিক, আবার কোথাও রাষ্ট্রীয় পীড়নে বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিলাভ ঘটেছে। কোথাও বা সে তার জীবন-সর্বস্বের কাছ থেকে চরম প্রতারণা পেয়েছে। কখনো বা স্ত্রীর আত্মবিনাশ বা অন্যান্য পারিবারিক বিচ্ছেদ বেশ্যাসক্তকে জ্ঞানদান করেছে। স্ত্রীর ব্যভিচার থেকে শিক্ষালাভের কাহিনীও বাংলা প্রহসনে বিরল নয়। স্বামীর যৌন ঈর্ষা সৃষ্টি করে স্ত্রী নিজের যৌন-ঈর্ষার স্বরূপ জানিয়েও স্বামীকে বেশ্যাসক্তি থেকে মুক্ত করেছে, এমন অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়েছে। স্ত্রীর ব্যভিচার বা যৌন ঈর্ষা সৃষ্টির দ্বারা স্বামীকে বেশ্যাসক্তি থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর কি না, তা বিবেচনাধীন। তবে স্বামীর বেশ্যাসক্তি, লাম্পট্য ও অন্যান্য পাশব দুর্ব্যবহার যে স্ত্রীলোকের বেশ্যাবৃত্তিগ্রহণের অন্যতম কারণ এটা প্রাহসনিক পরিণতি প্রমাণেই শুধু নয়,—সমসাময়িককালের বৈজ্ঞানিক আলোচনাতেও সমর্থিত। Calcutta Journal of Medicine পত্রিকায়[১০] "Prostitution and the Modern Remedy of Some of its Evils" প্রবন্ধে বলা হয়েছে,—"Ill treatment by the husband and relatives is a not infrequent cause of prostitution. Sometimes the treatment is so brutal, and the redress from law or other sources so uncertain and unsatisfactory, that the unfortunate being are tempted out the paths of chastity simply to escape the brutality." বস্তুতঃ বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে শিক্ষাপ্রচারে যে পরিণতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর কোনোটিই অবাস্তব নয়। অবাস্তব ছিলো না বলেই প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ ক্রমপুষ্টির দিকে পদক্ষেপ করেছে।

বেশ্যাসক্তির মতো লাম্পট্যও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিলো। 'লাম্পট্য' বলতে এখানে বেশ্যা ব্যতিরিক্ত সমাজে পুরুষপক্ষীয় যৌন অনাচারই ইঙ্গিত করা হয়েছে; যদিও বেশ্যাগমনকেও লাম্পট্য বলা চলে। 'বেশ্যাসক্তি' সম্পর্কে আলোচনায় বেশ্যাসক্তির যে কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, লাম্পট্যদোষের কয়েকটি কারণ সেগুলো থেকে যদিও অবশ্য ভিন্ন নয়, তবু লাম্পট্যের অন্যান্য কারণও আছে। বস্তুতঃ লাম্পট্য দোষের

১০। **Calcutta Journal of Medicine, Sept.—Oct., 1869.**

মূলে থাকে প্রাকৃতিক যৌনবুভুক্ষা, অপ্রাকৃতিক স্বভাবদোষ এবং পরিবেশের আনুকূল্য।

গৌরীদান প্রতিগ্রহের খাতিরে কিংবা পণের চাপে শ্রোত্রিয় ইত্যাদির অসমর্থা কন্যা বিবাহের ফলে—পুরুষপক্ষে যৌন চাহিদার বৃদ্ধি অথচ অংশীদারের অক্ষমতায় যে যৌনবুভুক্ষা পুরুষমনকে আচ্ছন্ন করে, তা থেকেই তার লাম্পট্য প্রবৃত্তির জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। অবিবাহিতের ক্ষেত্রেও যৌনতৃপ্তির অংশীদার অভাবেও লাম্পট্যদোষ জন্মানো সম্ভব না।

যৌনবিজ্ঞানীদের অনেকেরই মত এই যে বিশেষ দেহগঠন মানুষের চরিত্রবিকৃতি সাধনে সক্ষম। অবয়বের বিশেষ গঠনাবস্থায় ইন্দ্রিয়লিপ্সার অস্বাভাবিকতা প্রকট হয়। মানুষের মনের ওপর এটা যখন বলপ্রয়োগ করে, তখন মন থেকে সাধারণ সংস্কার মুছে ফেলে। অনেকসময় দেহগঠন স্বাভাবিক হয়েও মনোগঠনের অস্বাভাবিকতা থেকেও লাম্পট্যদোষের সৃষ্টি হতে পারে। মানসিক অস্বাভাবিকতার মূলে পারিবারিক বা প্রাতিবেশিক সংস্পর্শপ্রভাব সক্রিয়। মদ্যপানাদি থেকে স্বেচ্ছাকৃত মানসিক অস্বাভাবিকতাও এর কারণ হতে পারে।

স্ত্রীপক্ষে দাম্পত্য অসন্তোষজনিত ব্যভিচার প্রবণতা নির্দোষ পুরুষকে লাম্পট্যে প্রবৃত্ত করতে পারে। ক্ষেত্রদূষণভীতিহীন পুরুষ অতি সহজেই স্ত্রীলোকের শিকারে পরিণত হয়। স্ত্রীলোকের যেখানে তীব্র দাম্পত্য অসন্তোষ থাকে, সেখানে পৃথিবীর কোনোরকম ধর্মীয়, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় আইন কার্যকর নয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে তার "বাংলা প্রবাদ" গ্রন্থে একটি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন—'মেয়ে মরদ রাজী কি করবে কাজী' প্রবাদটির মধ্যে এরই ইঙ্গিত বহন করা হয়েছে। শুধু বিবাহিতার দাম্পত্য অসন্তোষই নয়, অবিবাহিতার বা বিধবার যৌনবুভুক্ষাও পুরুষের লাম্পট্য প্রবৃত্তি বর্ধনে সহায়তা করে। আমাদের দেশে কৌলীন্য পণপ্রথা, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষেধ ইত্যাদি প্রথার চাপে মেয়েদের যৌনবুভুক্ষা যথেষ্ট ছিলো। লাম্পট্যের ব্যাপক অনুষ্ঠানের মূলে এগুলো যথেষ্ট সক্রিয় ছিলো। বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক যৌনবুভুক্ষা, অপ্রাকৃতিক স্বভাবদোষ এবং পরিবেশানুকূল্য পুরুষের লাম্পট্যের অনুকূল হয়। অবশ্য এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে, এখানে তা আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বহু স্ত্রীর দায়িত্বহীন সম্ভোগে স্বামীর সফলতার দৃষ্টান্ত পুরুষমনকে প্রভাবান্বিত

করে। যৌনাচারে যে-সমাজে স্ত্রীলোক সুলভ, সেই সমাজে গতিবিধিতে অভ্যস্ত পুরুষ, দাম্পত্য বন্ধনযুক্ত ও সতীত্বসংস্কারযুক্ত সমাজের মধ্যে সেই সুলভতার ধারণায় নীতি প্রয়োগ করে। সেক্ষেত্রে অবস্থা বিপাকে অনেক স্ত্রীলোক লম্পট পুরুষের শিকার হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষতঃ বেশ্যাসমাজে গতিবিধিতে অভ্যস্ত লম্পট যখন উন্নততর যৌনতৃপ্তিমানসে "ঘুসকী"-র বা "হাফ্ গেরস্ত"-র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে শেষে ঘরের বৌ-ঝির দিকে নজর দেয়, তখন তাদের লাম্পট্য দৃঢ়ভিত্ত দাম্পত্য সৌধের ওপর বার বার আঘাত হানে। গৃহস্থ বধূর ওপর 'নজর' দেওয়া থেকে যে যে সমস্যার উদয় হয়, তার মূলে থাকে লম্পটেরই মানসিক জটিলতা বা বিশেষ ধরনের মানসিক ধারণা।

প্রসাধনিক দ্রব্য, গহনা অথবা এগুলো ব্যবস্থাপনের জন্যে অর্থের প্রতি স্ত্রীলোকের স্বভাবজ আকর্ষণ সুবিদিত। এই দুবলতার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে লম্পটরা দম্পতির মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করে। অনেকক্ষেত্রে স্বামী আর্থিক দায়িত্ব স্বীকার করলেও, স্ত্রীলোকের পূর্ণ আর্থিক সন্তুষ্টি —বিশেষ করে প্রাসাধনিক ব্যাপারে—সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া যেক্ষেত্রে স্বামী আর্থিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন, সেক্ষেত্রে বলা বাহুল্য এই অসন্তোষ তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। ধনীর সঞ্চিত অনিয়োজিত অর্থ যখন লাম্পট্যে নিয়োজিত হয়, তখন ধনী প্রদর্শিত প্রলোভনের অনায়াসলব্ধ শিকার হয়ে পড়ে আর্থিক অসন্তোষে অসন্তুষ্ট দাম্পত্য-বিরোধে পতিত স্ত্রীসমাজ। শুধু আর্থিক অসন্তুষ্টি নয়, আর্থিক অনটনের মধ্যেও অনেক স্ত্রীলোককে লম্পটের শিকার হতে দেখা যায়। লম্পটের শিকার হওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে লাম্পট্যবৃদ্ধির অনুকূল হওয়া। পরপুরুষের কাছে সুলভ যৌন-অংশীদারত্ব স্বীকৃতিই লাম্পট্যকে ব্যাপক করে তোলে। স্ত্রীলোকের এই স্বীকৃতিদানে সর্বদাই যে ব্যক্তিগত অর্থ চাহিদা বলবৎ থাকে তা নয়, অনেক সময় দেহবিক্রয়ের মধ্যে পারিবারিক কল্যাণবোধও জড়িত থাকতে দেখা গেছে।

যৌন ও আর্থিক প্রলোভন ছাড়াও সাংস্কারিক প্ররোচনাতেও লাম্পট্যে স্ত্রীলোককে সহায়তা করতে দেখা গেছে। ধর্মীয় সমর্থন দেখিয়ে কিংবা তথাকথিত প্রেম অথবা পরকীয়াতত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে অনেক লম্পট তাদের কার্যসিদ্ধি করেছে। সামাজিক কুদৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে কৃত্রিমভাবে একটি দৌর্নীতিক দৃষ্টিকোণের ব্যাপক সমর্থনের কথা প্রচার করে অনেক লম্পট স্ত্রীলোকের সতীত্ববুদ্ধি নষ্ট করেছে। বস্তুতঃ যৌন ও আর্থিক অসন্তোষ,

মদ্যপান অভ্যাসে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিলোপ, উক্ত অভ্যাসে অস্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি, দৃষ্টান্তের ব্যাপকতায় দৌর্নীতিক দৃষ্টিকোণের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি স্ত্রীসমাজের সতীত্ববুদ্ধি লঘু করে লাম্পট্যের ব্যাপক অনুষ্ঠানে সহায়তা করেছে।

লাম্পট্যক্ষেত্রে বলপ্রয়োগেরও দৃষ্টান্ত থাকে। দৈহিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অবরোধ থেকেও নারীধর্ষণ ঘটেছে। বিশেষ করে আর্থিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক বলে বলীয়ান ধনিক সম্প্রদায় তাদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে লাম্পট্যের অনুষ্ঠান বৃদ্ধি করেছে। স্ত্রীলোকের নিরাপত্তারক্ষক ব্যক্তির প্রতি নির্যাতন চালিয়ে বা ভয় দেখিয়ে, আবার কখনও বা কুটনী মারফৎ স্ত্রীলোককে ভয় দেখিয়ে বলাৎকারমূলক যৌনসম্ভোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রচুর প্রহসনে লাম্পট্য অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। লাম্পট্যদোষ সম্পর্কে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব থেকেই যে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজে লাম্পট্যদোষের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে, তা নয়। আমরা জানি, দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণের সমর্থনপুষ্টির জন্যে দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের সঙ্গে প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী উপাদান জড়িয়ে উপস্থাপিত করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল—উভয় ধরনের কাযের সঙ্গেই লাম্পট্যকে জড়িয়ে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি সাধারণের বিতৃষ্ণা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু প্রহসনকারের কাহিনী পরিকল্পনার মূলে যে সামাজিক দৃষ্টান্ত ছিলো না, একথা বললে অনৈতিহাসিকতার পোষণ করা হবে। সমাজে যৌন বিধি-নিষেধ যতোই থাক, প্রলোভনের চাপে লাম্পট্য-দোষ চিরদিনই চলে এসেছে। তবে উভয়পক্ষীয় আনুকূল্যে সেটা মাঝে মাঝে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অমানুষিক বিধিনিষেধে প্রাগাধুনিক যুগে সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই যৌন অতৃপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু প্রাচীন সংস্কারের প্রবল শাসনে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু নব্য সংস্কৃতির সংঘর্ষে পুরোনো সংস্কারের ক্ষীয়মাণতায় সতীত্বধারণা ও ব্যভিচার-পাপবোধ ক্রমে লঘু হয়ে গেছে। এ ধরনের অনুকূল অবকাশে সমাজে লাম্পট্য যে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হবে, এটা অনুমান করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি যে বৃদ্ধি পেয়েছিলো, এর ঐতিহাসিক সমর্থন আছে। একদিকে বেশ্যাসমাজের দৃষ্টান্ত থেকে যেমন গৃহস্থ-সমাজের স্ত্রীলোকের সতীত্বমূল্য সম্পর্কে লম্পটের চেতনা নষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ক্ষেত্রেই মদ্যপানের ব্যাপক অভ্যাসে ব্যভিচার-পাপবোধ ও সতীত্ব-সংস্কার নষ্ট হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে একপক্ষীয় বলাৎকারিক প্রচেষ্টাও নিযোজিত হয়েছে। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি লম্পটের রুচিবোধকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছে। হরিমোহন কর্মকারের (রাসের) লেখা "মাগ সর্ব্বস্ব" প্রহসনের (১৮৮৪ খৃঃ) মধ্যে রামেশ্বর বলেছে,—"আজকাল এমন বাবু ঢের আছে, মোছলমানী, ফিরিঙ্গি ইহুদি বই কথাটি কন না, বাড়ীর মেথরাণী দেখ্‌তে ভাল হলে তিনিও পার পান না।" এর জবাবে রমাকান্ত বলে,—"হিঁদুর ছেলে হয়ে কেমন করে সেই প্যাজ রসুন ভেড়া গরু খেকো মুখে মুখ দেয়? ওসব মদের গুণ আর কি।" মদ্যপান প্রাচীন সংস্কৃতিবোধ নষ্ট করে স্থিতিশীল গোষ্ঠীর স্বার্থ নষ্ট করবে, এই ভয়েই যে শুধু মদ্যপানকে লাম্পট্যের অন্যতম কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা নয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে লাম্পট্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ ব্যাপক অর্থ নিয়োগ। আর্থিক ক্ষেত্রে অর্থনিয়োগের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী বণিক সম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দীর ধনিক সম্প্রদায়কে অর্থনিয়োগের ক্ষেত্রে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছিলো। অন্যদিকে তেমনি তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছিলো বিশেষ স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে। এ অবস্থায় ধনিক সম্প্রদায় বিলাসিতায় অর্থনিয়োগ ছাড়া আর কিছুই করেন নি। খ্যাতির জন্যে অপব্যয় বা পরোপকার এঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেও যৌনসম্ভোগেও এঁরা কম অর্থনিয়োগ করেন নি। এই প্রবণতার সুযোগে কোথাও বা আসক্তি সৃষ্টি করে অর্থদোহনেচ্ছু দালাল কুট্‌নী আড়কাঠি ইত্যাদি সম্প্রদায় মুনাফা লুঠেছে। যেক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের আর্থিক অসন্তুষ্টিগত দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, সেক্ষেত্রে অর্থনিয়োগ করে ক্রমে ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নতুন সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় জমিদারশ্রেণীর অত্যধিক মুনাফা গ্রহণে উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক বলবত্তা সূচিত হয়েছে। প্রজাদের আর্থিক জগৎ নিয়ন্ত্রণের ভার এই সম্প্রদায়ের ওপর ন্যস্ত থাকায় আর্থিক অবরোধের দ্বারা এঁদের অনেকে লাম্পট্যপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছেন। সামরিক বলও এঁদের যথেষ্ট ছিলো। পাইক বরকন্দাজ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় সামরিক কর্মচারীরাও আর্থিক প্রলোভনে পড়ে এঁদের বশীভূত থাকতেন। তাই বলাৎকারে সামরিক শক্তি নিয়োজনের দৃষ্টান্তও এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আবার, প্রাচীন সংস্কৃতির বাহক যে সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁরাও অর্থের জন্যে এই জমিদার শ্রেণীর গলগ্রহ

হয়ে পড়েছিলেন। তার ফলে এই সমস্ত সাংস্কারিক সম্প্রদায়কে প্রয়োগ করে এই জমিদারশ্রেণী সাংস্কারিক অবরোধ সৃষ্টি করেও লাম্পট্যবৃত্তি চরিতার্থ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থিতিশীল এবং প্রগতিশীল—উভয় গোত্রের মধ্যেই যে লাম্পট্য অনুষ্ঠানের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতিষ্ঠাগত মূল্য যতোই থাক, সত্যও যে কিছু আছে, তা সমসাময়িক সাংবাদিক রচনা সমর্থন করবে। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরির লাম্পট্য অভিযোগ সুপরিচিত। এ ধরনের ধর্মধ্বজ স্থিতিশীল গোষ্ঠীর লাম্পট্য সমাজে যে দু-একটি নিদর্শনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো না, তা মাধবগিরির ঘটনাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন সাংবাদিক ও ব্যক্তির পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য থেকেই জানা যায়। কিন্তু নব্যদের মধ্যেও এ অনুষ্ঠান যথেষ্ট হতো। 'নিশাচর' তাঁর "সমাজ-কুচিত্র" পুস্তিকায় লিখেছেন,—"কল্‌কেতার সহরে অনেক প্রকার আমোদখোর দ্বিতীয় কিউপিড্ আছেন, তাঁরা যদি অধ্যবসায় সহকারে লম্পট প্রদর্শন করেন, দেখ্‌তে পান কত সমারোহ হয়। নীল বানরের নাচ, বুল্‌বুলের ফাইট্, হাওয়া খাওয়া আর সঙ্ দেখা আমাদের পুরোণো হয়ে পড়েছে।"[১১] শুধু কল্‌কাতায় নয়, সর্বত্রই লাম্পট্যদোষ ব্যাপক হয়ে উঠেছিলো। এ সম্পর্কে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় লাম্পট্যের বলি বারাঙ্গনা সম্প্রদায়ের প্রেরিত পত্রে স্বীকৃতিতে। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় ১২৬১ সালের ৩রা আশ্বিন তাঁরা একটি মিলিত পত্রে[১২] লেখেন,—"সম্পাদক মহাশয়' কোন প্রবল যুবকদল হীনবলা অবলাগণকে নিতান্ত অবলাবোধে অবাধে যথার্থ করাল করবাল ধারণ ও প্রহার করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীপাত, স্ত্রী প্রতি সদা সদনবদ্ধঃ অস্মদাদির জীবন নষ্ট না হইয়া কেবল স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, দেখ সেও আক্ষেপের বিষয় বটে, লোকে অপরাধী হইয়াই দণ্ডনীয় হয়, অবলারা অবলাদোষেই বাসভ্রষ্ট ও নানা কষ্ট পাইতেছে, হে সুবিবেচক সম্পাদক মহাশয় একবার অভাগিণীগণ পক্ষে কৃপাকটাক্ষে স্বল্পক্ষণ ঈক্ষণ করিলে বিলক্ষণরূপে অলক্ষণ দূর হয় ।"—ইত্যাদি। পত্রপ্রেরণের উদ্দেশ্য অবশ্য অন্যরকম হলেও এর মধ্যে সমসাময়িক লাম্পট্যদোষের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

১১। 'আলীপুরের কৃষি প্রদর্শন' প্রবন্ধ (সমাজ-কুচিত্র)।

১২। ভাষা সন্দেহজনক।

মদ্যপানের মতো বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্যের দৃষ্টান্ত অধিকাংশ প্রহসনেই কিছু না কিছু আছে। কিন্তু বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্যকে কেন্দ্র করেই শুধু যেসব প্রহসন লেখা হয়েছিলো, সেগুলোর মধ্যে থেকে প্রতিনিধিমূলক কয়েকটির উপস্থাপনের মধ্যে দিয়েই সমাজচিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে। অবশ্য প্রত্যেকটিরই মাত্রা নির্ণয়ের অবকাশ আছে।

বেশ্যাসক্তি ॥

সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ (কলিকাতা ১৮৮৫ খৃঃ)—বেচুলাল বেণিয়া (ঢাকাপটী)॥ বুদ্ধিহীন সক্রিয়তাই হনুমানের বৈশিষ্ট্য—এ ধারণায় লেখক বেশ্যাসক্ত পুরুষদের হনুমানের সঙ্গে অভেদ করে দেখেছেন। তাই নামকরণেও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "ভূমিকার ধাক্কা"-য় লেখক বলেছেন,—"এতে রকমারী হনুমানের রকমারী বস্ত্রহরণ। এই অদ্ভুত হনুমানগুলির জ্বালায় সহরে ট্যাকা ভার। দৌরাত্ম্যে বাত্রে।" চূণীবেশ্যা একটি ছড়াতে এদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছে,

"কত শত দেখলেম বাবু
　　ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খায়।
পিরীত করে সারা হলেম,
　　এখন দেখে হাসি পায়॥
বেঁচে যদি থাকি প্রাণ সুখে
　　দেখ্‌বো কত আর।
যত নব্যবাবু হয়েছে নচ্চা
　　কলির কল্কে অবতার॥"

পর্বর্ণিত চতুর্থ হনুমানের বক্তব্যে লেখকের উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। "সভ্যগণের প্রতি" হনুমান সবশেষে বলছে,—"সভ্যগণ এমনধারা আর তোমরা না কর। কুলটার নিকট এই হনুমানের বস্ত্রহরণ দেখ।" বেশ্যাসক্তি শুধু যৌন দিক থেকে নয়, অন্য দিক থেকেও যে কাণ্ডজ্ঞান লোপ করে, প্রহসনটির কাহিনী তার দৃষ্টান্ত বহন করছে।

কাহিনী।—হনুমান একজন নব্যবাবু এবং পিতার উপযুক্ত পুত্র। মদ্য, নারী, গঞ্জিকা প্রভৃতি সকল দোষেই সে নষ্ট। সে বলে,—"বাবা ব্যাটা যত

রোজগার করলে, সবই ত সোনাগাছির বিনোদিনীর বাকসয বাডলো এখন আমার আয়েসের কি উপায় ।”

হনুমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভোলা। ভোলার কাছে সে দুঃখ করে যে তার স্ত্রীর কাছে কাল সে প্রহৃত হয়েছে। ভোলা সান্ত্বনা দেয়—ওটা তাঁর আদর। ভোলার প্রতি হনুমানের আকর্ষণ প্রবল। ভোলাকে সে বলে,—“কি কি খাবে বল না এবার, তোমার জন্য ঘরের গিন্নি প্রস্তুত আছে। তোমাতে আমাতে কি দুই ?”

হনুমানের মনে লাম্পট্যপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে। ভোলার সঙ্গে সে এক বৃদ্ধা বেশ্যা ভামিনীর গৃহে হানা দেয়। “ওগো ঝি, ঝি গো” বলে তাকে ডেকে চুপি চুপি বলে—“বলি ভাল একটা ঘুস্‌কি-টুসকি আন্‌তে পারবি ?” তখন রাত্রি। ভামিনী অবাক হয়—কার বউ ঝিকে এত রাত্রে বার করবে? হনুমান এবং ভোলাকে তার ঘরে বসিয়ে রেখে সে ‘ঘুস্‌কি’ অর্থাৎ অসতী গেরস্ত বৌয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। হনুমান ভাবে, মেয়েমানুষটা এলে তাকে নেশা করিয়ে ‘রগড’ করবে। তাই ইতিমধ্যে কিছু ‘রোজ্‌লিকার’ আন্‌বার ব্যবস্থা করে।

বেশ্যাপল্লীতে ফুলকুমারী বেওয়ার বাড়ীতে মণি, চুণি, হরি ইত্যাদি গণিকারা গল্পগুজব করে। তারা দুঃখ করে বলে, আজকাল তাদের তেমন খদ্দের মেলে না। হরি দুঃখ করে, তার দৈন্যদশা চরমে। অনাহারে দিন যায়। ইতিমধ্যে “বুড়ী-ময়না” ভামিনীর আবির্ভাব হয়। বুড়ী-ময়নার শালিকের প্রসঙ্গ তুলে গণিকারা ভামিনীকে ঠাট্টা করে। তারা চলে গেলে হরিকে ডেকে ভামিনী বলে যে,—পাডার হনুমানবাবু একটা ঘুস্‌কি মেয়েমানুষ চায়। হনুমান তার পায়ে ধরে নাকি অনেক সেধেছে। কিন্তু সমস্যা—এতো রাত্রে তা সে কোথায় পাবে ? সে ঠিক করেছে—একজন বেশ্যাকে ‘খবৃশি’[১৩] ঘুসকি সাজিয়ে তার কাছে নিয়ে যাবে। হরিকেই সে নিয়ে যেতে চায়। হরি রাজী হলে সে হরিকে কুলবধূর আচরণ অভ্যাস করতে বলে এবং গণিকাসুলভ অর্থলোলুপতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ করতে নিষেধ করে। হরিও যথারীতি প্রস্তুত হয়।

অনভ্যস্তা হরি ঘোমটা দিয়ে চল্‌তে গিয়ে পড়ে যায়। শেষে তাকে এক

১৩। খব্‌শি < ষোড়শী=‘ডবকা’ বিশেষণযুক্ত নারী অর্থে।

পাল্কী ভাড়া করে ভামিনী নিজের বাড়ী নিয়ে আসে। সেখানে হনুমান ও তৎসঙ্গী ভোলা উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো।

ভামিনী ওদের সামনে হরিকে ছেড়ে দেয়। হরি কুলবধূর ভান করে এবং সলজ্জভাবে কথাবার্তা কয়। মদ এবং নেশার ব্যাপারেও যেন অবাক হয়েছে এই ভাব দেখায়। ইতিমধ্যে মদ্যপান নিয়ে ভোলার সঙ্গে হনুমানের ঝগড়া হয় এবং ভোলা চলে যায়। ভামিনীর নির্দেশে হরি হনুমানকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়। হনুমান বিস্ময়প্রকাশ করলে সে বলে, কোনো ভয় নেই, তার স্বামী গণিকালয়েই সর্বদা সময় কাটায়। হরি তাকে নিজের ঘরে বসিয়ে মদও খাওয়ায়। কৈফিয়ৎ হিসেবে বলে,—তার স্বামী মদ্যপ, তাই বাড়ীতেও সে কিছু মদ এনে রেখেছিলো,—মাঝে মাঝে এসে খেয়ে যায়।

অবশেষে হরিকে নিয়ে হনুমান ঘরে কপাট দেয়। অন্ধকার ঘরে শয্যায় শুয়ে হনুমানের মনে কুপ্রবৃত্তি জাগে। হুঁকো, ডাবর ইত্যাদি হরির যা কিছু নিয়ে যাবার মতো অস্থাবর সম্পত্তি ছিলো, সব নিয়ে সে চুপি চুপি পা বাড়ায়। ধূর্ত ভোলা কাছেই কোথায় যেন ছিলো। সে বেশ্যাদের জাগিয়ে দিয়ে বলে, তাদের ঘরে চুরি হয়েছে। হরি তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দেখে যে তার জিনিসপত্র অদৃশ্য হয়েছে। বাইরে এসে সে দেখে, হনুমান ডাবর হুঁকো ইত্যাদি নিয়ে পালাচ্ছে। এক পথিকের সহায়তায় সে হনুমানকে ধরে আনে। হনুমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলে,—সে একজন ভদ্রলোক, গণিকা-গৃহে কেন সে যাবে। কিন্তু পথিক তাকে হরির হাতে সমর্পণ করে। হরি এবং তার সঙ্গিনী বেশ্যারা তাকে পাকড়িয়ে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। মণি তার কোঁচড় খুলে দিয়ে বলে,—"ন্যাংট করে দে হতভাগাকে। ভদ্রলোক হয়ে রাঁড়ের জিনিষ চুরি করতে লজ্জা করে না।" তারপর তার বস্ত্রহরণ করে ঐ অবস্থায় তার ওপর অশ্লীল নির্যাতন চলে। নগ্ন হনুমান সভ্যদের উদ্দেশ করে এ ধরনের দুষ্কর্ম করতে বারণ করে।

ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে (ঢাকা ১৮৬৩ খৃঃ)—হরিশ্চন্দ্র মিত্র॥ মলাটে লেখক বলেছেন,—

"অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং নহি কৃত ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবী নর্ত্তযামি গৃহে গৃহে॥"

—অর্থাৎ লেখক রচনার উৎকর্ষ বিচারের চাইতে উদ্দেশ্যপ্রবণতার দিকে পাঠকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যদিও তাতে গুরুত্ব দেন নি। নাটক শেষে নেপথ্যের একটি গানে লেখক নামকরণের ব্যাখ্যা করেছেন,—

"বাইরে খায় নিত্য ঝাটা, গায়ে ফোস্কা হয় না।
বাড়ীতে ফুলের টোকা, তাও গায়ে সয় না॥
বাইরের লাথি জুতো, সে যে পরের গয়না।
না পরে যেদিন, পেটে ভাত হজম হয় না॥
এতেও বাইরের মন সদা বশে রয় না।
বেবেল্লা বেহায়াদের তবু জ্ঞান হয় না॥
ঘরে আছে সতীলক্ষ্মী তারে মন লয় না।
ঘর থাকতে বাবুই ভেজে ইয়েরেই কয় না॥"

দাম্পত্যশান্তির প্রতিশ্রুতিতে কর্ণপাত না করে সমাজের যে সব ব্যক্তি বেশ্যাসক্তির দ্বারা ইচ্ছাকৃত অশান্তির দাহ ভোগ করে তাদের কর্মবিধির বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে।

কাহিনী।—মোহন একজন হঠাৎ-বাবু। ইয়ারদের সঙ্গে মদ্যপান ও লাম্পট্যই তার কাজ ছিলো। রসিক হচ্ছে তারই ইয়ার। বৈঠকখানায় বসে একদিন মোহন মাখনের সঙ্গে গল্প করছিলো। রসিক অনুপস্থিত থাকায় মোহন সন্দেহ করে—সে কোথাও বোধ হয় স্ফূর্তিতে গেছে। পরে ভাবে, "আয়েস তো বেগড় এয়ারে চলে না।" একটা প্রবাদ আছে—"এয়ার বনে দেল ফাঁক।" মাখন সেই প্রবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা গল্প শোনায়।—

এক "বাব-ফাট্‌কা" ছেলে ছিলো। সে প্রতিদিনই তার পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়েও গণিকাগৃহে যেতো। তার বাবা ভাবেন, গণিকার চলনবলনের সাজসজ্জার আকর্ষণেই পুত্র সেখানে যায়। তিনি তখন গোপনে গণিকাটির চালচলন হাবভাব এমন কি তার কবর্ণায় সব কিছ দেখে এসে পুত্রবধূকে এক এক করে সব কিছু শেখালেন। তাও পুত্রবধূর কাছে ছেলে ভেড়ে না। সব কিছু থাকতেও সে চলে যায় কেন,—বাবা ক্রুদ্ধস্বরে ছেলেকে একদিন জিজ্ঞেস করেন। তখন ছেলে ঐ প্রবচনটি ঝেড়েছিলো। লোকে বল্‌লো—"মানুষটা যথার্থ এয়ার ছিল ভাই।"

ইয়ারেই প্রকৃত আমোদ,—এই তত্ত্বটি অনুধাবন করবার সময় রসিক এসে জোটে। সে বলে,—"আমার এয়ার যেখানে, বাড়ী সেখানে—ঘর সেখানে

—শুধু ঘর কেন?—বৈকুণ্ঠ সেখানে।" কথা প্রসঙ্গে রসিক নিজের বিপদের কথা বলে। তার আমোদ-প্রমোদের রীতি বাড়ীর লোকরা বরদাস্ত করতে পারেন না। কুঠি থেকে এসে "বড় জাম্বুবান" "শুকুনীর মড়া" বাবা নাকি নাকি-স্বরে তাকে সদুপদেশ দিয়েছে। সঙ্গে জুটেছিলো কতকগুলো "Old fool"—"বিড়াল-তপস্বী"।—"যেমন একটা শেয়াল হোয়া করে উঠ্‌লে পালের সবগুলই হোয়া হোয়া করে উঠে, তেম্নি তর য বেটা এসে জুটেছিল, সব বেটাই যেন কলকাতার কেশবসেন আর ডফ্ সাহেব হয়ে বক্তৃতার বার ঝাড়তে লাগ্‌লো।"

"স্ত্রীকে রসিকেরও ভালো লাগে না। "ভাই ঘরে যে ঠাক্‌রুণ আছেন, তার না আছে কথার ছেনালী, না আছে পোসাকের বিউটী, না আছে গাওনা বাজনার টেস্ট্। ওসাইফের সঙ্গে তাদের (ইয়ারদের) নিয়ে আমোদ করা দূরে থাক, একবার দেখানোর যো নাই।" সুতরাং ইয়ার হিসেবে রসিকের স্থান যে মোহন আর মাখনের ওপরে—এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

রসিকের পিতার অবশ্য সদুপদেশ দেবার কারণ ছিলো। রসিকের স্ত্রী প্রমীলা খেদ করে যামিনীকে বলে যে, পতিহীনতার দুঃখ সহ্য করা যায়, কিন্তু "থাকতে গরু বয় না হাল, তার দুঃখ চিরকাল।"—"আমার সোমত্ত বয়েস, যৌবনকাল, এ সময় স্বোয়ামীর সোহাগে গলে পড়বো না তাঁর হেনস্তায় সংসারের মধ্যে যেমন বেহায়া বেড়াল হয়ে রয়েছি।" যামিনী তাকে সান্ত্বনা দেয়,—"আজকাল অনেক পরিবারেই এই রকম এক একজন মহাপুরুষ অবতার হয়ে পড়েছেন যে তাদের কথাবার্ত্তা শুনে অবাক্ হতে হয়।" প্রমীলা ভাবে, পিতা অর্থলোভে এমন নীচ ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন! বলে,—"যেমন গরুর ব্যবসায়ীরা আপনার মনের মত দাম পেলে, পালাপোষা গরুটাকে কশাইয়ের হাতে বেচতেও পেছোয় না, তেম্নি পণ পেলে এখানকার অনেক মা বাপ, কানাই হোক, আর কুজ-ই হোক, একটা যেমন তেমন বরের হাতে সোঁপে দেয়।" কথা প্রসঙ্গে সে তার স্বামীর নির্যাতনের কাহিনী বিবৃত করে।—

একদিন তার স্বামী ঘরে এসেছিলো এবং সোহাগ করে অনেক মিষ্টি কথা বলেছিলো। অনেকদিনের জমাট অভিমান প্রমীলা অশ্রুতে ধুইয়ে দিলো। রসিক কিন্তু এসেছিলো অলঙ্কার হস্তগত করবার জন্যে। প্রমীলা উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তীব্র আপত্তি জানালে ডাকাতের মতো রসিক তার হার ও নথ টান

মেরে ছিনিয়ে নেয়। পালাবার সময় প্রমীলার আর্তস্বরে শাশুড়ী ননদী জেগে ওঠে। রসিক তাদের সম্মুখে ক্ষোভের ভান করে চীৎকার করে বলে ওঠে,—"তোমরা না বল সোমত্ত বৌ, তা ও গুখোর বেটী এখনো কচী খুঁকী রয়েছে, আমি কেমন করে থাকি!" মায়ের সম্মুখে দুষ্কর্ম ঢাকবার জন্যে স্বামীসহবাসে স্ত্রীর অপটুতা ও বালিকাজনোচিত ভীতির অপবাদ দিতে নির্লজ্জ রসিকের বাধে না। প্রমীলার দুঃখের অন্ত নেই। অলঙ্কার সব তার স্বামীই গ্রাস করেছে, অথচ শাশুড়ীর ধারণা সেগুলো সে লুকিয়ে লুকিয়ে বাপের বাড়ী চালান করেছে। শাশুড়ী ও ননদ তার ওপর সবদাই দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়।

কয়দিন রসিক বাড়ী আসে না। পিতা দুঃখ করেন—"কোথা মরে পিটে একবেলা খেয়ে ইত্তি বেচে বিক্রি বেচে, ছেলেটাকে ইংরেজী পড়ালাম, আশা ছিল ছেলে মানুস হয়ে দশটাকা রোজগার করে শেষকালে আমার দুঃখ দূর করবে!" কিন্তু হলো তার বিপরীত। হঠাৎ রসিককে পাওয়া যায় মত্ত অবস্থায়,—গায়ে নদামার দুর্গন্ধ। মেথর দিয়ে তার গা সাফ্ করিয়ে অন্দরে আনা হয়। অন্দরে এসে সে সবাইকে গালাগালি করতে সুরু করে। পিতা খেদ করেন।

বুঁচির প্রেমেই রসিকের এই অধোগতি। একদিন সে বুঁচির বাড়ী পা বাড়ায়। সেদিন ঝড় বৃষ্টির বিরাম নেই। রসিক বলে, "যদি আজ আকাশ ভেঙ্গেও পড়ে, তবু বাবা রসিক বুঁচির বাড়ী না যেয়ে ছাড়ে না, বুঁচির সঙ্গে প্রেম হওয়াতে আমার জন্মটা সার্থক হয়েছে।" মনের আনন্দে সে গান গাইতে সুরু করে। পথে এক পাহারাওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পাহারাওয়ালা তার গানে আপত্তি জানালে তার সঙ্গে রসিক কথা কাটাকাটি করে। ইতিমধ্যে নসীর সঙ্গে রসিকের দেখা হয়। স্বভাবচরিত্রের দিক থেকে নসী রসিকের সমগোত্রীয়। নসীকে সঙ্গে নিয়ে রসিক বুঁচির বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়।

আড়াল থেকে রসিক লক্ষ্য করলো তার প্রাণাধিকা বুঁচি তারই এক ইয়ারের সঙ্গে গান বিনিময় করছে। গানগুলোর মধ্যে দিয়ে সহজে প্রকাশ পায়— দুজনে দুজনকে ভালবাসে। এ-সব দেখে রসিকের মেজাজ আগুন হয়ে ওঠে। সে ধৈর্যশূন্য হয়ে দরজা ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে। বুঁচি দরজা খুলতে নারাজ হয়। তখন রসিক গোলমাল সুরু করে দেয়। বুঁচি তখন

পাহারাওয়ালাকে ডেকে বলে,—এদের সে চেনে না এরা অযথা এসে তাকে বিরক্ত করছে। রসিক কর্কশ স্বরে বলে যে, সে কালই তাকে সাতনরী হার আর নথ দিয়েছে। কিন্তু রসিকের বক্তব্য পাহারাওয়ালার কানে যায় না। পাহারাওয়ালাকে দিয়ে বুঁচি দুজনকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

কমলা কাননে কলমের চারার আঁটী (কলিকাতা—১৮৮০ খৃঃ)—দীননাথ চন্দ্র॥ প্রহসনটি বেশ্যাসক্তিকে কেন্দ্র করে রচিত, অথচ মলাট লিপিতে বক্তব্য অনুরূপ নয়। টাইটেল পেজে লেখক বলেছেন,—

"পাথরে খাব না ভাত
গোটে হেল কাল।
হোটেল টোটাল লস।
সেও বরং ভাল॥
সাড়ী পরা কাল চুল,
বাঙ্গালীর মেম।
ড্যাম বেঙ্গলীর লেডী
সেম সেম সেম॥"

এ-থেকে মনে হয়, লেখকের মত, বেশ্যাসক্তিতে নব্যসংস্কৃতিই আনুকূল্য এনেছে। বাছবিচারহীন স্ত্রীগমনের বিরুদ্ধেই যে লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত, এটার প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রহসন শেষের গীতটির মধ্যে।—

"হায় হায় শুন সভ্যগণ, এবে শুন সভ্যগণ।
বাসবচন্দ্রের মিলন হলো অপূর্ব্ব কথন॥
তাই ভেবে পায় ধল্লে বাসব
চুলোয় দিয়ে কুলের গৌরব।
পিরিতের কি আছে জাতি
হাড়ী চণ্ডালী যবন॥"

নামকরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে পৌরাণিক চরিত্রসম্বলিত একটি কাহিনীর বর্ণনায়।

গঙ্গাস্নান করে নারদমুনি গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে "ঘানী পাড়ার রাজপ্রাসাদের" কমলাকাননের ভেতর ঢুকলেন ফুল তোলবার জন্যে। দেখলেন, যেখানে যজ্ঞের জন্যে অট্টালিকা ছিলো সেখানে আজ মেষ, মহিষ ইত্যাদির দুর্গন্ধময় অস্থি স্তূপাকার হয়ে আছে। হয়তো কমলা এখানে থাকেন

না—নইলে এমন হয় কি করে। হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে চম্‌কে ওঠেন নারদ। শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে স্বয়ং কমলা কাঁদছেন। তিনি খেদ করে বল্‌ছেন, হায়! তিনি কি কুক্ষণেই এই কমলা-কাননে কলমের চারার আঁটি রোপণ করেছিলেন। শীর্ণ কমলা এবং তাঁর জীর্ণ বস্ত্র দেখে প্রথমে নারদ তাঁকে চিন্‌তে পারেন নি। পরে তাঁকে চিন্‌তে পেরে নারদের খুব কষ্ট হয়। নারদ বলেন, মহাদেবকে তিনি সব কথা গিয়ে বল্‌বেন। কমলা নারদকে অনুরোধ করেন—তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে। তিনি আর কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না। এমন সময় ভারবী মালী এসে একটা দড়ি দিয়ে কমলাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। কমলা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। নারদ কমলাকে আশ্বাস দেন, যে করেই হোক, মহাদেবকে সঙ্গে করে এনে তিনি কমলার মুক্তি ঘটাবেন।

বলা বাহুল্য কাহিনী উপস্থাপনায় ব্যক্তিগত আক্রমণ আছে এবং আর্থিক অপচয়ের দিকটিও বলা হয়েছে। কিন্তু প্রহসনের মূল কাহিনী বেশ্যাসক্তি বিষয়ক বলে যৌন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। অবশ্য এই বেশ্যাসক্তিতে লেখকের দৃষ্টিকোণ আর্থিক দিক থেকেই প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

কাহিনী।—জমিদার বাসবচন্দ্র চাটুকার প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য ও মোসাহেব যোগীন্দ্র চাটুজ্যেকে নিয়ে সর্বদা দিন কাটায়। সেই সঙ্গে আছে মদ এবং রক্ষিতা 'লবেজান' নামে এক মুসলমানী বেশ্যা। লবেজানের পেছনে সবকিছু খরচ করে বাসব আজ প্রায় নিঃস্ব। এর মধ্যে লবেজানের জন্যে একটা বাড়ী তৈরী আরম্ভ করেছে। ধার করেই বাড়ী তৈরীর টাকা সংগ্রহ করেছে। লবেজানের পোষাক গয়না ইত্যাদির জন্যে বাজারে এমনিতেই শহরের অনেক পাওনাদার ছিলো। ৫/১০ টাকা সুদ স্বীকার করলেও আজকাল বাসবকে কেউ তাই টাকা দিতে চাইছে না। দালালরা রোজ দরজায় ভিড় করছে। বাসবের আজকাল একটু অসুবিধে হয়েছে।

বাসবের সুবিধাবাদী পুরোহিত ত্রিলোচন তর্কবাগীশ কিছু অর্থ দোহনের জন্যে বাসবকে তার জন্মদিন উৎসব পালন করবার প্রস্তাব দেন। এই অর্থাভাবের দিনে এই প্রস্তাবে বাসব প্রথমে বিরক্ত হয়। কিন্তু মোসাহেব বাসবকে বুঝিয়ে বলে, জন্মদিনের উৎসবটা ঘটা করে বিবিজানের বাড়ীতেই করা হোক। দশজন জানবে শুনবে। শেষে তা-ই স্থির হয়। বাসব নিমন্ত্রণপত্র বিলি করতে আদেশ দেয়।

বাসব এ-ভাবে অকারণ অর্থ অপব্যয় করে। অথচ একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাসবের কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলে, বিরক্ত হয়ে বাসব হুকুম দেয়,—"জুয়াচোর, বেটার গলায় হাত দিয়ে বার করে দে।" সেই ব্রাহ্মণটি এক ভদ্রলোকের কাছে তাঁর দুঃখের কথা বলছিলেন। ভদ্রলোকটি বাসবকে বিলক্ষণ চিনতেন। তিনি বুদ্ধি দিলেন,—"এইবার কালাপেড়ে ধুতী পরিয়া, বুটজুতা পায় দিয়া, পাকাচুলে টেরী কাটিয়া ওখানে গিয়া বল্‌বে যে আমার নিকট তিনটি রক্ষিতা আছে। নিজে বৃদ্ধ। এখন যাহাতে মৌতাত করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করুন। তাহলে অবশ্যই কিছু হবে।" ভদ্রলোক ব্রাহ্মণকে বস্ত্রাদি দিলেন।

ভদ্রলোকের নির্দেশ-মতো ব্রাহ্মণ তেমনি পোষাক পরে বাসবের কাছে এসে বল্‌লেন, তিনি হাড়কাটা থেকে আস্‌ছেন। তাঁর হেফাজতে তিনজন রক্ষিতা আছে। তিনি বুড়ো হয়ে পড়ায় তারা হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে। বাসববা যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য করে, তাহলে তিনি রক্ষা পান। বাসব তক্ষুনি খাজাঞ্চিকে ডেকে পাঁচশো টাকা দিতে আদেশ দেয়। ব্রাহ্মণ চলে গেলে অবাক হয়ে খাজাঞ্চি বলে, এই ব্রাহ্মণই কাল পিতৃহীন হয়ে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। বাসব ও-ব্যাপারে মাথা না গলিয়ে আবার উৎসবের কথায় আসে। যোগীন্দ্র, প্রলাপ—এরা জানায় যে, নিমন্ত্রণ পত্র লেখা শেষ হয়েছে, লবেজানের ওখানেই উৎসব হবে। বাসব বলে,—কলুটোলা, মুরগীহাটা, মেছোবাজার, হাড়কাটার গলি—সব জায়গাতেই যেন পত্র পাঠানো হয়।

যথাদিনে জানবাজারে লবেজান বিবির বাড়ীতে বাসবের জন্মদিনের উৎসব লেগে যায়। বাড়ীতে লোকের বেশ ভীড় হয়। বাসব লবেজানকে ডেকে মদ্যপান করায়। সে নিজেও পান করে। তারপর লবেজানকে বাসব 'হ্যাম্' খেতে অনুরোধ করে। বাসব বলে, এই খাবার "সেন-সাহেবের" কাছ থেকে আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসা ক'রে লবেজান যখন জানতে পারে যে এটা শূয়োরের মাংসের তৈরী, তখন সে একটা খ্যাংরা ঝাঁটা নিয়ে বাসবকে বার বার পেটাতে লাগলো। পরিত্রাহি চীৎকার করে বাসব তার মোসাহেব চাটুকারদের ডাকতে থাকে সাহায্যের জন্যে। প্রলাপ এসে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারে যে, বাসব তার নিজের কাপড়-নষ্ট করে ফেলেছে। মনে মনে প্রলাপ মন্তব্য করে,—"পাষণ্ডের পায়খানাতেও মদের গন্ধ বেরোচ্ছে।" তারপর প্রকাশ্যে বলে,—"তাহাতে আর কি হইয়াছে। চল পুকুরে যাই। ঐ খান্‌কী বেশ্যারা যা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। ওর হৃদয় বড় কঠিন। না হলে

আপনাকে মারে। ওকে পুলিসে দিব।"—এই বলে তারা রাতের অন্ধকারে পথে নামে। ঝিঁ-ঝি পোকাগুলো যেন ছিঃ ছিঃ করতে লাগ্‌লো। শিয়াল ও অন্যান্য জন্তুরা উঁকি মেরে পালিয়ে যেতে যেতে যেন বল্‌তে লাগ্‌লো—"অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল।" "কি দুঃখ—এদেশের অবস্থাপন্ন কুলাঙ্গার ভারত-সন্তানেরা এইরূপ পশুবৎ কুৎসিত জঘন্য কাজে রত হইয়াই একেবারে উৎসন্নে গেল গা।"—এই বলে মেঘগুলো যেন এক পশ্‌লা চোখের জল ফেলে।

লবেজান বাসবচন্দ্রকে ছেড়ে দিয়েছে। চাটুকার মোসাহেবদের দিন আর চলে না। "তালগাছিযার" উদ্যানে একদিন বাসব লবেজানের ওপর দুর্বলতা প্রকাশ করে বলে, বাসবের ওপর লবেজানের হয়তো টান আছে। প্রলাপ ও যোগীন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। প্রলাপ বলে--"সেইজন্যই তো সেদিন আপনার পিছনে অনেকটা দূর এসেছিল।" অবশেষে বাসব সকলকে নিয়ে আবার লবেজানের বাড়ীর দিকে চলে।

লবেজানের বাড়ীর ভেতর ঢুকে বাসব অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে লবেজান বিবির পাশে এসে বসে। লবেজান কপট রাগ দেখিয়ে বলে, এতোদিন যার কাছে বাসব ছিলো, তার কাছেই থাকুক না কেন। বাসব তখন তার পা জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যিই সে আর কারো কাছে যায় নি। লবেজান তখন বাসবের গঙ্গাবধারের বাড়ীটা নিজের জন্যে চায়। বাসব সানন্দে তখনই প্রলাপকে ডেকে লেখাপড়া করে নিতে চায়। প্রলাপও বলে, সে প্রস্তুত আছে। এদিকে বাসব আড়াই হাত নাকে খৎ দিয়ে লবেজান বিবিকে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে,—"আমার ঘাট হয়েছে, আর তোমাকে ছেড়ে যাব না।" মহানন্দে বাসব ও লবেজান কৌতুক করতে করতে অন্য ঘরে চলে যায়।

রাঁড় ভাঁড় মিথ্যাকথা তিন লয়ে কলিকাতা (কলিকাতা—১২৭০ সাল)—প্যারীমোহন সেন॥ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর হুতোম প্যাচার নক্সায় হুতোম দাসের একটা বাউল সঙ্গীতে বলেছেন,—

"আজব শহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি, জুড়িগাড়ি মিছাকথার কী কেতা।"[১৪]

মদ, মেয়েমানুষ আর মিথ্যাকথা—এই তিনটি ম-কারের অস্তিত্ব প্রহসনকার কলকাতার জীবনযাপনে অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। হুতোমদাস

১৪। হুতোম প্যাচার নক্সা—'কলিকাতার বারইয়ারী পূজা' প্রবন্ধ।

তার গানে "ভাঁড়ের" উল্লেখ না করলেও অন্যত্র তা বলে গেছেন। অতএব প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ সামাজিক সমর্থন শূন্য বলা চলে না। "রাঁড় ভাঁড় মিথ্যাকথা" যে, যে-কোনো নাগরিক সভ্যতার অভিশাপ, এটা যে-কোনো সমাজবিজ্ঞানীই স্বীকার করবেন। নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্র কলকাতা'কে কেন্দ্র করে তাই অনুরূপ দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে। মধ্যযুগের গ্রামীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী সৎ ও সরল সাধারণ মানুষ নাগরিক সভ্যতার কলুষিত জীবনকে ঘৃণার চোখে প্রত্যক্ষ করেছে। গণিকাপোষণ, মদ্যপান ও ছল-চাতুরীর প্রতি লক্ষ্য রেখে ছড়াকার যে ছড়াটি রচনা করেছেন, প্রহসনটি তারই ব্যাখ্যা মাত্র।

কাহিনী।—এক সাধু শহর দেখবার জন্যে কলকাতায় আসে। শহরে প্রবেশ করেই একটি অদ্ভুত গান তার কানে গেলো। গানটি এই,—

"যদি কেহ সুখী হতে চাও।
হিতকথা বলি শুন উপদেশ লও॥
পরস্ত্রী পরধন, সদা করিবে হরণ,
মিথ্যাকথা প্রতারণ, এই কার্য্যে রও॥
মিছে কাল কর গত, মদ্যপানে হও রত,
সুখ পাবে বিধিমত, বেশ্যাসক্ত হও॥
হাসে খেল অনিবার তাজ পুত্র পরিবার,
কহিলাম এই সার, ইথে মন দাও॥"

এতোদিন সাধু যা শিখে এসেছে, তার বিপরীত কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। তাই একটি পথিককে ডেকে সে গানটির ভাবার্থ জানতে চাইলো। পথিকটি স্থানীয় ব্যক্তি এবং যথারীতি লম্পট। তবে সে সহৃদয়। সে বলে,—"তুমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান কর, তাহলেই জানিবে যে, সকল ব্যক্তিই উহাতে লিপ্ত হইয়া দিনরাত্রি আমোদে কালযাপন করিতেছে। সাধুকে লম্পট স্বেচ্ছায় শহর দেখাতে নিয়ে যায়।—

"যে দিকে ফিরায় আঁখি সেই দিকে রাঁড়।
মারামারি হুড়াহুড়ি টানাটানি ভাড়॥
কেহ কার মেরে চূর্ণ করিতেছে হাড়।
তবু সে না ছাড়ে রোক্ যেন হট্ট ষাঁড়॥"

সাধু এসব দেখে হতভম্ব ও ভীত হয়। লম্পট বলে, এতো সামান্য, সোনাগাছি নামে একটা প্রসিদ্ধ স্থান আছে—সেখানে যদি সাধু যেতে চায় তো সে নিয়ে যাবে। সাধু বলে,—সেখানে ক দেবালয় আছে? লম্পট মৃদু হেসে তাকে নিয়ে সোনাগাছির দিকে পা বাড়ায়। পথ চল্‌তে এক জায়গায় গানবাজনার শব্দ ভেসে আসে। তখন লম্পট স্বরূপ ব্যাখ্যা করে।—

"গীতবাদ্য যত লোক করিতেছে তথা।
কহে না ভুলেও সত্য ছাড়া মিথ্যাকথা॥
বাড়ি ভাড়া লয়ে সবে হয়ে আনন্দিত।
সর্ব্বক্ষণ রাখে চক্ষু করি প্রফুল্লিত॥
গালাগালি চলাচলি মুখে কত বোল।
এইরূপ সারাদিন করে ওরা গোল॥
দিনমানে যারে দেখে নমস্কার করি।
রজনীতে তারে দেখে লজ্জা পেয়ে মরি॥"

ইতিমধ্যে সাধু দেখলো—একটি বাবু মত্ত অবস্থায় বোতল হাতে নিয়ে একটি গণিকার দেহে ভর রেখে টলতে টলতে যাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন। গায়ের জামাকাপড়ে ধুলোকাদা মেখে গেলো। গণিকাটি তাকে টেনে তোলে, কিন্তু বোতলের মদটুকু নষ্ট হয়ে যায়। বাবু ক্ষেপে ওঠেন। বলেন, যতোক্ষণ না মদ পাবেন, ততোক্ষণ এখানে পড়ে রইবেন। বেগতিক দেখে বেশ্যা মদের লোভ দেখিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যায়। বলে, এদের এতো দুর্গতি, তবু তার লজ্জা নেই।

সাধু ভাবে, বাবুদের কপালে আরো কী কী লেখা কপালে আছে—কে জানে। ক্রমে সে আরো দেখে—

"ছোট বড় কত লোক দলে দলে দলে।
আনন্দেতে যাইতেছে টলে টলে টলে॥
ইংরাজী বা না হিন্দী মুখে কত বোল।
কেহ বা করিছে পথে মিছে গণ্ডগোল॥"

সেদিন শুক্রবার ছিলো। কিন্তু লম্পটটি শনিবারের মতো 'মধু বাবু" এর আমোদ না দেখিয়ে সাধুকে ছেড়ে দিলো না। তাই পরের দিনও তাকে নিয়ে গেলো। এবার তাকে নিয়ে গেলো মেছুয়াবাজার। পথে বারান্দায়, ছাদে প্রচুর গণিকা পুরুষের প্রতীক্ষা করছে। তাদের অধিকাংশই প্রৌঢ়া। কিন্তু হাস্যকরভাবে তারা সাজসজ্জায় চলনবলনে যুবতী বলে নিজেদের জাহির

করবার চেষ্টা করছে। মদ্যপ এবং মিথ্যাবাদী যতো বাবু ইয়ারের সঙ্গে গণিকালয়ে প্রবেশ করছেন। ইয়ারদের সৌভাগ্য অসীম। বাবুর প্রসাদে তাদের ভাগ্যে সুখ ছাড়া দুঃখ নেই। লম্পট সাধুকে বলে,—"সেখানে গেলে পদবৃদ্ধি ও সকলের নিকট মহামান্য হইতে পারিবেন।" লম্পট সাধুটিকে সুন্দরভাবে ইয়ার জীবনের প্রলোভনে দেখায়। মদ, মাংস আর মেয়েমানুষ —বিনা খরচে সব সুখই এতে পাওয়া যায়!

কথায় কথায় রাত অনেক হয়। হঠাৎ মলের শব্দে সাধু চমকে ওঠে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এতো রাত্রে পথে স্ত্রীলোক! লম্পট বলে,—এদের দিনরাত্রি বোধ নেই। সবদাই সর্বত্র এদের গমন। সাধু লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি খুব তাড়াতাড়ি হাটছে। আশে পাশে দুয়েকজন লম্পট ছিলো। তারা স্ত্রীলোকটিকে তাদের তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে দেখে, তার পথরোধ করে তাকে জাপ্‌টিয়ে ধরে। স্ত্রীলোকটি তাদের "বাপান্ত" করে দ্রুতপদক্ষেপে কাছের একটা বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে।

সাধু ভাবে,—"কালের কি গতি! কিছুই বোঝা যায় না, ধর্ম্মকর্ম্ম সব গিয়েছে, জুয়াচুরি, প্রতারণা, মাতলামি, এই সকল যে ঘট্‌বে এত আমাদের শাস্ত্রের লিখন।" লম্পটকে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে,—"হে মহাপুরুষ লম্পট-প্রবর! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! তুমি বিলক্ষণ সুখে আছ, আমি চিরকালটা ধর্ম্মকর্ম্ম করে অসুখে কাটাইলাম, আর আমি সাধুত্বও চাহিনা, চল একবার প্রমোদদায়িনী বারবিলাসিনিগণের সুখদ সহবাস দ্বারা অপবিত্র জীবন সফল করি।" এইভাবে বারবণিতার প্রেমে মত্ত হয়ে সাধু দিন কাটাতে লাগ্‌লো।

(পুস্তিকাটির শেষে বলা হয়েছে,—"এইরূপ সাধুবর বেশ্যাসক্ত হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন, পরে তাহার যেরূপ অবস্থা হইল তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।" দ্বিতীয় খণ্ডটি পাওয়া যায় নি।)

শিখ্‌ছ কোথা? ঠেকেছি যথা। (ঢাকা—১৮৮৮ খৃঃ)—হরিহর নন্দী॥ দেখে শেখা এবং ঠেকে শেখা—এই দু-রকম শিক্ষার কথা চলিত বাংলা প্রবচনে স্থানলাভ করেছে। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষার ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ় বলে পরিচিত। প্রহসনকার এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ দেখিয়ে প্রথম প্রকার শিক্ষাদানেই কার্যকরী পন্থা অনুসরণ করেছেন। অন্যান্য অনেক প্রহসনের মতোই ভুক্তভোগীর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে লেখক তাঁর দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন।

কাহিনী।—অভয় স্কুলের ছাত্র। কিছু সংখ্যক ইয়ারের দল জুটিয়ে সে মদ্যপান করে এবং গণিকাগৃহে যাতায়াত করে। ইয়ারের দল সকলেই স্কুলের ছাত্র। অবশ্য পিতার অসাক্ষাতে এবং অগোচরেই অভয় এ-সব করে। পিতা অবশ্য কিছু কিছু বুঝতে পারেন। তাঁর ধারণা অভয়ের বন্ধুবান্ধবরাই অভয়কে নষ্ট করছে।

ক্ষীরদা, হরিদাসী, ফুৎনী, স্বর্ণ, কিরণ, পান্না, মোক্ষদা ইত্যাদির সংখ্যা হিসেব করতে গিয়ে এরা নিজেদের ষোলশো গোপিনীর কৃষ্ণ বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। বুদ্ধিতেও এরা কম যায় না। অশ্বিনী বলে, আজকাল বাড়ীর বার হওয়া মুস্কিল, কারণ বাড়ীর লোকেরা টের পেয়েছে। তখন নব বুদ্ধি দেয়,—"তুমি একটু স্টুপিড্, বল্লেই হবে যে, আমি অমুক বাসায় পড়া বুঝতে গিয়েছিলাম।

অধঃপতনের সূত্রপাত বন্ধুদের নিয়েই হয়। পরে বন্ধুদের আর দরকার পড়ে না। গোপী অভয়ের বন্ধু। কিন্তু এখন সে অভয়ের সঙ্গ ছাড়াও কুকর্মে পটু। সে, আর দুই বন্ধু—গৌর ও ব্রজরাজকে নিয়ে গণিকাগৃহ থেকে মাঝরাতে ফিরছিলো। গণিকা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। গোপী তার ওপর আক্রোশ প্রকাশ করতে করতে ফেরে। বন্ধুরা সুবুদ্ধি দেয়—ওখানে গোলমাল করতে গেলে লোক জানাজানি হবার সম্ভাবনা, সুতরাং চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঢাকার ইসলামপুরের পথে রাত দুটোর সময় দুই দলের দেখা হয়। গোপী অভয়ের পুরোণো বন্ধু। অভয়কে সে বলে,—"শুনতে পাই, তুমি স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাসা হতে বের হও, সমস্ত দিন হরিদাসীর বাড়ীই পড়ে থাক।" অভয় যে গোপীর চেয়েও কম যায় না—এটা বোঝাবার জন্যে ওকে হরিদাসীর বাড়ী নিয়ে চলে। শুধু হাতে গণিকাগৃহে যেতে নেই. কিন্তু এখন রাতে মদ কোথায় পাব? চারদিকে পাহারাওয়ালা আছে। অভয় বলে,—"সেজন্যে ভেবো না, টাকা দাও দিচ্ছি।"

গোপী রাস্তার মাঝেই গান আরম্ভ করে। পাহারাওয়ালা এসে তাল ভেঙে দেয়। বলে,—"বাবু দারু পিও মজা করো, চুপ করকে চলা যাও আপনা।" পাহারাওয়ালার সঙ্গে অভয়রা রসিকতা সুরু করে দেয়। অভয় বলে,—"আরে বাবা, চলে যাব না কি বসে থাকব. আমরাও ত টেক্স দেই। মদ খেয়ে যদি একটু আমোদই না করতে পারব, তবে অনর্থক পয়সা খরচ করে খাওয়ার লাভ কি? তুমিই বিবেচনা কর।" বেরসিক পাহারাওয়ালার অতো বিবেচনাশক্তি ছিলো না। সে বলে. রেণ্ডি বাড়িমে যাও, দারু পিও,

মজা করো, সডকে ক্যা ?" এমন সময় সার্জন (সার্জেন্ট) আসে। ওদের সবাইকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে চলে। অশ্বিনী আক্ষেপ করে,—"খেলেম না, ছুঁলেম না, মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গে পুলিশে যেতে হল। অভয় বলে—"কেন বাবা, বার বাড়ী যেতে পার, আর ব্রাণ্ডি গিল্‌তে পার, পুলিশে যাবার বেলায় মার্গ ফাটে।" অশ্বিনী নগেন্দ্র আর গৌর প্রতিজ্ঞা করে, এদের দলে আর মিশবে না। অভয় তখন বলে,—"মাতালের প্রতিজ্ঞা ডাল ভাত, কালই বুঝা যাবে।"

যাহোক, পাহারাওয়ালাকে অনেক বলে-কয়ে দু'টাকা দিয়ে তারা ছাড়া পায়। পাহারাওয়ালা বলে—"দেও রূপায়া দেও, বাবু এই রূপায়া ৮ ভাগ হোগা।" অভয়ও অবশেষে চৈতন্য লাভ করে। বলে,—"আর না, অদ্য যথেষ্ট শিক্ষা পেলেম। শিখ্‌ছ কোথা ' ঠেকেছি যথা।"

দিল্লীকা লাড্ডু । কলিকাতা—১৮৮৮ খৃঃ)—সুধামাধব দাস॥ চিনির আঁশে তৈরী সুপরিচিত এই লাড্ডু সম্পর্কে এ...ট হিন্দী প্রবচন আছে—"যো খাতা ও ভি পস্তাতা, যো নেই খাতা ও ভি পস্তাতা।" বেশ্যাগমন এবং বেশ্যাসক্তি-হীনতা—দুটোতেই মানুষ যে পস্তায়—এই মনোভাব পোষণ করবার মূলে বেশ্যাসক্তি সম্পর্কে প্রহসনকারের যে উদার দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পেয়েছে, এর অর্থ বেশ্যাসক্তির ক্রমবিস্তারে সাধারণের মনোভাবকে তুলে ধরা। বেশ্যাসক্তির ভয়াবহ ক্রমবিস্তৃতির প্রমাণ এর থেকে বোঝা যায়। অবশ্য লেখকের পলায়নী মনোবৃত্তির কারণও যুগগত।

কাহিনী ।—বিনোদ একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তার স্ত্রীও বর্তমান। তা সত্ত্বেও সে তরঙ্গিনী বেশ্যার কাছে যাতায়াত করে। তরঙ্গিনী বিনোদকে অনেকটা সর্বস্বান্ত করে এনেছে, তবুও বিনোদের শিক্ষা হয় না।

একদিন তরঙ্গিনীর কাছে বিনোদ গেলে তরঙ্গিনী অর্থ আদায়ের জন্যে কপট মান করে। বিনোদ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তরঙ্গিনী তার "ভালবাসা"-র পুতুলের বিয়েতে যৌতুক দেবার জন্যে বিনোদের কাছে একশো টাকা চায়। বিনোদ বলে, "সেজন্যে চিন্তা কি, তোমাকে আর অদেয় কিছুই নাই।" সে ছুটে বেরিয়ে যায়। তরঙ্গিনী বলে, "তাড়াতাড়ি এস, নইলে মাথা খাও।" তরঙ্গিনীর মা গঙ্গামণি আসে বিনোদ চলে গেলে। তরঙ্গিনীকে সে বলে,—"বেশ মা বেশ, ঐ রকম চাই, ও রকম না কল্লে কি বাবুদের কাছে পয়সা আদায় হয়, এই যৌবন বয়স, এই সময়ে যা করে নিতে পার মা।"

তরঙ্গিনী বলে,—"বিনোদ আমাকে অনেক দিয়েছে, তাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা নাই।" গঙ্গামণি মন্তব্য করে, "কি এমন দিয়েছে—কুল্লে দু খানা বাড়ী, একটা বাগান, আর নগদ হাজার পাঁচ ছয় টাকা, এই দিয়েছে বই ত না, একি খুব বেশি হল? আগে কপ্‌নি পরা, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে দে, তবে বলিস্ অনেক দিয়েছে।" সে আরও বলে,—"তোকে সে ছাই দিয়েছে। এখন তার পরিবারের কাছে নগদ টাকা আর বিস্তর গহনা আছে, তোর এখন যৌবন বয়স রোজকারের সময় এই সময় যদি একটু বুঝে সুঝে চলিস, তাহলে পর সুখে থাকবি, বড়ির কথা অগ্রাহ্য করিস না মা।"

বিনোদ এদিকে বিপদে পড়েছে। এত টাকা সে কোথায় পাবে? অথচ যত রজনী বাড়চে, তত‌ই তার মুখ মনে পড়চে, তত‌ই প্রাণ কাতর হচ্চে।" কালীবাবু তাঁর কাছে এলে বিনোদ তার কাছে একশ টাকা চায়। কালীবাবু বিনোদকে তার অধঃপতনের জন্যে তিরস্কার করেন। তার পত্নীর প্রতি দায়িত্বের কথা তিনি মনে করিয়ে দেন। তাছাড়া বলেন,—"তোমার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করবে বলে একশ টাকা ধার লইয়াছিলে, কিন্তু তোমার পিতার শ্রাদ্ধ না করে অর্থগুলি তরঙ্গিনীর পাদপদ্মে অর্পণ করে চরিতার্থ হলে। আগে যদি জানতেম তোমার চরিত্র এত নীচ তাহলে কখনই তোমাকে টাকা ধার দিতাম না।"

কালীবাবুর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে ফন্দি আটে, স্ত্রীর গয়না চুরি করবে। রাজলক্ষ্মীর ঘরে বিনোদ প্রায় আসেই না। রাজলক্ষ্মী স্বামীসুখে বঞ্চিতা। অনেকদিন পর বিনোদকে ঘরে আসতে দেখে সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। না ঘুমোলে গয়না সরানো যায় না, তাই বিনোদ রাজলক্ষ্মীকে বলে,—"আমি কিছুক্ষণ পর আস্‌ছি, তুমি শোও গে। রাজলক্ষ্মী বিলাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। বিনোদ চুপি চুপি এসে কাজ হাসিল করে তরঙ্গিণীর বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিনোদ পুলিস ইনস্পেকটর আর হাবিলদারের সামনে পড়ে যায়। পুলিসের জেরায় বাধ্য হয়ে গয়নার বাক্সটা বেরিয়ে পড়ে। ইনস্পেকটর তখন তাকে চোর বলে সন্দেহ করে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। বিনোদ কাকুতি মিনতি করে। "ও সাহেব একবার ছেড়ে দাও, তরঙ্গিণীকে দেখে আসি, তারপর তোমার যেখানে ইচ্ছা সেইখানে নিয়ে যেয়ো।" ইনস্পেকটর ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে বিনোদ বলে—"আর পাকড়ে কাজ নাই, ও চিক্‌টি নিয়ে আমায় ছেড়ে দাও, তরঙ্গিণীকে

দেখে প্রাণ জুড়াই।" চিক্‌টি নিয়ে ইন্‌স্পেক্‌টর বিনোদকে ছেড়ে দেয় এবং পাহারাওয়ালাকে নাকে হাত দিয়ে বলে, "দেখো এ বাৎ—"...। পাহারাওয়ালা ইঙ্গিত বুঝে বলে ওঠে—"নেই সাব্ নেই—" ঘন ঘন সেলাম দেয় সে।

ছাড়া পেয়ে খালি হাতেই বিনোদ তরঙ্গিণীর বাড়ীতে যায়। বিনোদ এসেছে বুঝতে পেরে নেপথ্য থেকেই তরঙ্গিণী তাকে গালাগালি দেয়। তরঙ্গিণীর ঝিও বিনোদকে গালাগালি দিয়ে বলে, বিনোদের অনুরোধে সে শুঁড়ির দোকান থেকে ধারে মদ এনেছে, এখন শুঁড়িরা তাকে রাস্তায় বার হতে দেয় না। বিনোদকে দেখামাত্রই তরঙ্গিণী তার কাছে একশত টাকা চায়। বিনোদ তখন তার দুর্ভাগ্য এবং চিক্ চুরির কথা জানিয়ে সহানুভূতি ও ক্ষমা চাইতে যায়। তরঙ্গিণী তখন বিনোদকে গালাগালি দিয়ে বলে—"দেখ বিনোদ আমরা বেশ্যা কখন কারও বশীভূত নই, আর যদ বশীভূত থাকবো, তাহলে সংসার পরিত্যাগ করে বেশ্যাবৃত্তি করবো কেন? তুমি যতক্ষণ পয়সা দেবে ততক্ষণ তোমায় যত্ন করবো, আর যেদিন পয়সা দিবে না, সেদিন তোমায় যত্ন করবো না এমন কি বসবার স্থানও দিব না, তোমায় বারণ করছি, তুমি আর এখানে এসো না।" বিনোদ মর্মাহত হয়ে আক্ষেপ করে বলে,— "তোমার জন্য যে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করেছি, তার পরিবর্তে যদি সেই পদ্মপলাশলোচন হরির চরণ ধ্যান করতেম, তাহলে অন্তিমে পরিত্রাণ পেতাম; কিন্তু তোমার প্রেমে মত্ত হয়ে ইহকাল ও পরকাল হারালেম।" তরঙ্গিণী চটে গিয়ে বলে ওঠে "বস্ তো পণ্ডিতগিরি বের করি।" ঝাঁটা মেরে তরঙ্গিণী বিনোদকে বার করে দেয়।

এদিকে ঘুম থেকে উঠে রাজলক্ষ্মী দেখে যে তার চিক নেই। এইজন্যেই তার স্বামী এসেছিলো। স্বামীর নীচতায় সে মর্মাহত হয়। এমন সময় বিনোদ ফিরে আসে। রাজলক্ষ্মীর কাছে এসে তার পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। বলে,—এখন আমার দিব্যজ্ঞান হয়েছে, বেশ্যা কিছুই নয়, যেমন দিল্লীকা লাড্ডু। যে বেশ্যা প্রেমে মত্ত হয়েছে সে অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্চে, আর যে বেশ্যার প্রেম জানে না সেও অনুতাপ কচ্চে। প্রিয়ে! এখন চল উভয়ে হরিপদে প্রাণ সঁপে হরির পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে, হরি হরি বলে দেহ পবিত্র করি গে।"

বেশ্যাশক্তি নিবর্ত্তক নাটক (কলিকাতা—১৮৬০ খৃঃ)—প্রসন্ন কুমার

পাল ॥[১৫] নামকরণের মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি একটি ভূমিকার মধ্যেও তা ব্যক্ত করেছেন।—

"বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক মুদ্রিত হইল। উহা কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা অন্য কোন ইংরাজী নাটকের অনুরূপ নহে, কুলাঙ্গনাগণ বিরহ বেদনায় ব্যথিত হইলে তাহারদিগের চিত্ত যে প্রকার উত্তেজিত হয় এবং তাহারা কুলমার্গ পরিহার পূর্ব্বক বারাঙ্গনা শ্রেণীভুক্ত হইলে যে প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে, পরবধূ মধুপান প্রত্যাশি লম্পটগণ যে সমস্ত দুর্ঘটনার ঘটক হয়, যেরূপ উত্তেজনা এবং ক্লেশ ও অপমান সহ্য করে, এই পুস্তকে নাটকচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, এতৎপাঠে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বেশ্যাসক্তি নিবৃত্তি হয়, ইহাই আমার অভিপ্রায়। যদিও এই দুরাশা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাচ তদর্থে যত্নবান হওয়া স্বদেশ হিতেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ সাধনার দ্বারা তাহার কিয়দংশের ফললাভ হইলেও শ্রম সার্থক হয়।"

কাহিনী।—ছিদামচাঁদ ঘোষের ছেলে শ্যামাচরণ মদ্যপ এবং বেশ্যাসক্ত। ছিদাম অনেক করেও তাকে শোধরাতে পারেন নি। শ্যামাচরণ এমন হওয়ায় তার স্ত্রী শশিমুখীর কষ্টের শেষ নেই। "বিবেচনা করে দ্যাক দিকিন বোন, বৌঝিরে সারাদিন খেটে খুটে রাত্তিরে ভাতারের কাছে শুলে মোনটা ক্যামোন খুসি হয়। তা বোন্ সেই সুকই যার ঘরে নেই, তার বাঁচনই বেরথা।" পড়শী কাদম্বিনীর কাছে জলের ঘাটে শশিমুখী তার মনের দুঃখ ব্যক্ত করে। কাদম্বিনী বা বামা—এদের অবশ্য স্বামী পেয়ে খুব একটা সুখ হয় নি। কাদম্বিনীর স্বামী বুড়ো, কেশোরুগী, বামার স্বামী কালা। মনের কথা বলবারও সময় হয় না। ঘাট থেকে ফিরতে দেরী হলে শাশুড়ী বলেন শ্যামার কাছে গিয়ে লাগাবেন। শ্যামা অর্থাৎ শশিমুখীর স্বামী শ্যামাচরণের কাছে তার শাশুড়ী যদি লাগান, স্বামী যাহোক তার সঙ্গে তাহলে কথা কইবেন—তা সে মিষ্টিই হোক্ বা গালিই হোক্। কিন্তু সে ভাগ্যও তো হয় না তার। শশিমুখী একটু প্রতিবাদ করতে গেলে শাশুড়ী বলেন, "তুই খাবি দাবি কাজকম্ম কর্‌বি, তোর আবার কিসের কথা লা।" শশিমুখী উত্তর দেয়, "কি আর চোপা কল্লুম, আমাদের কি রক্ত মাংসের শরীর নয়, আমরা কি আর মানুষ নই।"

ছিদাম ঘোষের মেয়ে বিনোদিনী। তারও দুঃখ কম নয়। তার স্বামী

১৫। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

তার খোঁজ খবর নেয় না। বিনোদ বাপের বাড়ীতেই থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন পঞ্জিকা দেখে জামাই মদনকৃষ্ণকে আনানো হয়। মদনকৃষ্ণ এলে বিনোদিনীর মনে হয়, তার কি এমন ভাগ্য হবে! মদনকৃষ্ণকে দেখে তার মনের মধ্যে আনন্দে ভরে ওঠে।

জামাইয়ের বাটা সাজানো হচ্চে ফল-মিষ্টি দিয়ে। শশিমুখী ঠাকুরজামাইকে একলা পেয়ে তার সঙ্গে গল্প করে। গল্প করতে করতে হেঁয়ালির ছলে বলে, তার অসুখ—এজন্যে সে বদ্দি খুঁজে হয়রাণ, হাতুড়ে বদ্দিকে দেখাতে ভয় হয়, যদি বিপদ ঘটে। ঠাকুর জামাইয়ের খোঁজে কোনো বদ্দি আছে কিনা। মদনকৃষ্ণ শ্যামাচরণেরই গোত্রের। সে মনে মনে ভাবে, "এঁযার গতিকটে বড়ো মোন্দ নয়, স্যাকবার চেয়ে ছেয়ে গ্যাখা যাক।" শশিমুখী ঘরের বদ্দি সম্পর্কে বলে—"সে বোদ্দির মুখে আগুন, যে কেবোল নিরুগিদ্দের চিকিচ্ছে কত্তে পারে, রুগীর কেউ নয়।" মদন শশিমুখীকে বলে, সে নিজেই পাকা বদ্দি। তারপর খলে বলে,—"আমি এখান থেকে গি.। মেচোবাজারে স্যাকটা বাড়ী ভাড়া কোরে পরস্থ রাত্তিরে দশটা আন্দাজ তোমাদের ঘবের পেচোনে দাডাবো তুমি সুযোগ ক্রমে সেইখানে গিয়ে জুটবে।" মদনকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে শশিমুখী খুব চাপল্য প্রকাশ করে, স্বামীর মৃত্যুকামনাও বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে। কাদম্বিনী এই পরিবর্তন দেখে জেরা করলে, চাপে পড়ে শশিমুখী তাকে সব কথা খলে বলে।

জামাই মদনকৃষ্ণ সেইদিনই সেখান থেকে চলে গেছিলো। কিন্তু তবু শ্বশুরবাড়ীর কাছে তাকে চলতে ফিরতে দেখে হরগোয়ালিনীর মনে সন্দেহ জাগে। হরগোয়ালিনীর মতো মেয়েমানুষদের স্বরূপ জানতে মদনকৃষ্ণের মতো লম্পটের বেগ পেতে হয় না। কুলবধূকে ঘরেব বার করাই যার অন্যতম কাজ। মদনকৃষ্ণ তাকে শশিমুখীর কথা বলে। মদনকৃষ্ণ নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা না করে হরগোয়ালিনীর বাড়ীতে অপেক্ষা করবে—একথা যেন হরগোয়ালিনী শশিমুখীকে জানায়। কিছু প্রাপ্তির আশায় হরগোয়ালিনী উৎফুল্ল হয়।

হরগোয়ালিনী শ্রীদাম ঘোষের বাড়ীতে দুধ দিতে গিয়ে শশিমুখীকে নির্জনে পেয়ে তাকে এই বলে ভয় দেখায় যে তার গোপন কথা সে জেনেছে। শশিমুখী ভয় পেয়ে যায়। কাউকে বলবে না—এই প্রতিশ্রুতি দেবার জন্যে সে দশ টাকা আদায় করে। শশিমুখী আশ্বাস দেয়, ভালো কিছু খবর হলে

আরও পাঁচ টাকা সে দেবে। স্থির হয় হরগোয়ালিনীই তাকে তার বাড়াতে নিয়ে যাবে।

যথা সময়ে শশিমুখীকে পাওয়া যায় না। রাত্রে শোবার আগে সে নাকি বিনোদিনীকে বলেছিলো, "ঠাকুরঝি তুই শো আমি ঘাট থেকে আসছি।" ঘাটে খোঁজ করে শশিমুখীকে পাওয়া গেলো না। কাদম্বিনীর কাছে যখন সবাই খোঁজ করতে যায়, তখন সে বলে, এতো রাত্রে সে আস্বে না। অবশেষে কাদম্বিনী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এদের কাছে আভাস দেয়। ছিদাম সব শোনে, ভাবে,—"আমি বোয়ের দোষ বড় দিতে পারি নে কেবল সেই ছোঁড়ার দোষ, কারণ ও যদি অমনতরো না হোত, তাহলে সে কোনক্রমে ভ্রষ্টা হোতে পারত না।" যখন এদিকে এসব চল্ছিলো, তখন, শ্যামাচরণ গোলাপী বেশ্যার বাড়ীতে তাব মুখনাড়া খাচ্ছিলো। মতি তাকে শশিমুখীর নিরুদ্দেশ হবার কথা জানালে শ্যামা বলে, "যেতে দাও গে, ন্যাকটা রাড় বেড়েছে, আমি ন্যাকোম এ গয়না ছেড়ে যেতে পাল্লেম না।"

হরগোয়ালিনীর বাড়িতে মদনকৃষ্ণ আসে। শশিমুখীও আসে তারপর। দুজনকে দেখে দুজনেই খুব খুশি হয়। মদনকৃষ্ণ আবেগে গয়ালাদিকে হ্যাণ্ডসেক করে এক কুড়ি টাকা বকশিস্ দেয়। তারপর ঘোড়ার গাড়ীতে করে মদনকৃষ্ণ শশিমুখীকে নিয়ে মেছোবাজার মুখো রওনা হয়।

এতোরাত্রে গাড়ী দেখে নৈমদ্দী চৌকিদারের মনে সন্দেহ হয়। সে গাড়ী থামাতে বলে। শশিমুখী এতে ভয় পেয়ে আওয়াজ করে ফেলে। মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ শুনে চৌকিদার বলে,—"আরে ও গারিব মোদ্দি মাইয়া মানষির লাহান্ হন হোনাম ক্যাডা গারোয়ান বড়ো মোরে দেকাতে এবে!" ইতিমধ্যে জমাদাব সঙ্গে নিয়ে সারজন (সার্জেণ্ট) আসে। তাকে দেখে মদন বলে ওঠে,—'গুড্ নাইট্ স্যার উই গো আওয়ার ফ্রেণ্ড হাউস ফর ইনভাইট্, নাউ গোইং হাউস।" সারজন বলে, "হাম টুম সব বাট নেই জান্টা, টুম গাড়িমে রেণ্ডী কোন্ হ্যায়?" মদন শশিমুখীকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু শশিমুখী ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেলে মদনকৃষ্ণ তার ভাই। পরে একটু ধাতস্থ হয়ে বলে, "উনি আমার সোয়ামি হন, উনি আমাকে বার করে নিয়ে যাচ্ছেন না।" সারজনের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হলো। সে মদনকৃষ্ণকে চেপে ধরে। সারজনকে সে একশত টাকা দিতে চাইলে সারজন তা প্রত্যাখ্যান করলো। সারজনের নির্দেশে জমাদার

গারদে নিয়ে চল্‌বার পথে তাকে ঘুষ দিতে চাইলে, সেও বলে, "চোপ্ রও বাঙ্গালি, তোমারা রোপেয়া কোন্ মাংতা, হারামজাদ্।" নৈমদ্দী চৌকিদার বলে,—"আরে হালা, এহোনে আর কি ঐবে, হারজন ছ্যাকচে, য়্যাহোন এই গারদে আহো।" মদন মানভয়ে বিচলিত হয়, শশিমুখী কাঁদে। এ খবর গোপন রইবে না, সবাই ছি ছি করবে।

মতিলাল খবর পেয়েছিলো যে মদন ও শশিমুখীকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। সে ছিদামকে নিয়ে বেনীগারদে খবর নিতে যায়। বেনীগারদের জমাদার করিমবক্সকে দুটো টাকা দিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পায়। ছিদাম ওদের দুজনকে যথেচ্ছভাবে তিরস্কার করে। ওরা অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে তিরস্কার হজম করে।

নির্দিষ্ট দিনে ছিদামের দরখাস্ত অনুযায়ী এদের বিচার হয়। ম্যাজিস্ট্রেট মদনকৃষ্ণ ও হরগোয়ালিনীকে জেলে পাঠালেন। শশিমুখীকে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন—সে ঘরে ফিরতে চায়, না নাম লেখাতে চায়? শশিমুখী ঘরে ফিরতে রাজী না হলে, তাকে নাম লিখিয়ে পল্লীতে পৌছিয়ে দেবার জন্যে জমাদারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। পেয়াদা মদনকৃষ্ণকে যখন নিয়ে চল্‌ছে, তখন শশিমুখী আর্তনাদ করে বলে, "ঠাকুরজামাইকে কোতা নিয়ে যায় গো?" ম্যাজিস্ট্রেট হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দেন, "ঠাকুর জামাইকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে চল্লো গো, তুমি এখন চোলে যাও।"

ইহারই নাম চক্ষুদান (কলিকাতা—১৮৭৫ খৃঃ)—শ্যামলাল বসাক॥ (প্রকাশক: যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য)। মলাট পৃষ্ঠায় দুইটি উদ্ধৃতি আছে। (১) "ছেঁড়াগুণে দাসা চাল" এবং "ফলেন পরিচীয়তে।" প্রত্যক্ষ ফলপ্রাপ্তিতেই ঘটে চক্ষুদান। বেশ্যাসক্তির ফলে স্ত্রীপক্ষে যে যৌন অশান্তির সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ঈর্ষাবোধ। এই ঈর্ষাবোধ পুরুষপক্ষে জাগ্রত করে বেশ্যাসক্তির ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করাবার কাহিনী উপস্থাপনে বেশ্যাসক্তির একটি প্রধান দিক অবলম্বন করে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে।

কাহিনী।—নীলকান্ত হেমচন্দ্রের সংসর্গে পড়ে মদ্যপান করে এবং মাতঙ্গিনী বেশ্যার বাড়ীতে রাত কাটায়। অবলার দুঃখের অন্ত নেই। স্বামীর দুর্ব্যবহার সে আপ্রাণ সহ্য করে, স্বামী বিপদগ্রস্ত হলেও সে সহায়তা করে। মদ্যপানে যে টাকা জরিমানা হয়, তা অবলাই সংগ্রহ করে দিয়ে নীলকান্তকে ছাড়িয়ে আনে। একবার সরলা খবর দেয়, "তিনি মদ্যপানে বিহ্বল হোয়ে

পথিমধ্যে এক যুবকের বিপণিতে নানাপ্রকার উৎপাত করায় তাহারা তাঁহাকে নিদারুণ প্রহার করিয়া নরদমায় ফেলিয়া দিয়াছিল। পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া তিনি নীলকান্ত কিনা তাই তদন্ত করিতে আসিয়াছে।” অবলা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছাড়িয়ে আন্‌তে বলে,—“তুমি যাইয়া তাকে নিয়ে এস যত টাকা লাগে আমি দিব।” অবলার বাপের বাড়ীর ঝি চপলা বলে, নীলকান্তকে সে ভালো করে নিয়ে কাশী যাবে। অবলা বলে, তাই বলে চপলা যেন তাকে গুণ না করে। পাশের বাড়ীর ময়রা বৌ তার স্বামীকে গুণ করতে গিয়ে কি খাইয়ে স্বামীকে মেরে ফেলেছে। তার চেয়ে যেমন আছে তেমন থাকাই ভালো।

হেমচন্দ্র নীলকান্তের বাড়ী যাওয়া আসা করে। তার উদ্দেশ্য নীলকান্তের ভিটেতে ঘুঘু চরাবে এবং “ধরিবা লইব কেড়ে অবলার কর।” নীলকান্তের সঙ্গে মদ্যপান করতে করতে রহস্য করে বলে, স্ত্রীশিক্ষা এসে স্ত্রীলোকদের কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলে তার মতো সুপুরুষ ও সুরসিকদের মজা বাড়িয়ে দিয়েছে। “আজকাল Female Education হয়ে বড় মজা হয়েছে।” হেমচন্দ্র নীলকান্তের বন্ধু হলেও এ ধরনের নীচ কথাবার্তায় নীলকান্ত খুব অস্বস্তি প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসে। সে বলে, বছরখানেক আগে শুনে ছলো—নীলকান্ত একজন মহৎ লোক, সেই শুনে সে তার কাছে এসেছে। নীলকান্ত বুঝতে পারে, এক বছর আগে সে যা ছিলো, এখন তার কিছুই নেই। ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা তাকে বিব্রত করে তোলে, সে নিজেকে অপরাধী বলে মনে ভাবে।

তবু নীলকান্তের চরিত্র শোধরায় না। একবার নীলকান্ত মাতঙ্গিনীর বাড়ী থেকে রাত চারটের সময় এসে শুতে যায়। বেশ্যাবাড়ীর অপবিত্র জামাকাপড় দেখে অবলা তাকে অন্য কাপড় পরতে বলে, তারপর কুলুঙ্গী থেকে গঙ্গাজল ছুঁয়ে তারপর বিছানায় তার কাছে শুতে বলে। এতে নীলকান্ত অপমানবোধ করে। সে বলপ্রয়োগ করে বিছানায় শুতে গেলে অবলা পালিয়ে যায়। এক অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে।

যে ব্রাহ্মণটি এসেছিলো, নীলকান্ত তাকে নিজের কাছে রেখে মাঝে মাঝে উপদেশ নেয় বটে, কিন্তু হেমচন্দ্র এলেই সব ভুলে যায়। ব্রাহ্মণটি যে নীলকান্তকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে মনে মনে হেমচন্দ্র ব্রাহ্মণটির ওপর অসন্তুষ্ট হয়। একদিন হেম এসে বলে নীলকান্ত মাতঙ্গিনীর বাড়ী যায় নি বলে মাতঙ্গিনী নাকি তার অর্থহীনতা নিয়ে কটাক্ষ করেছে।

নীলকান্ত বলে, এসব নীচ সংসর্গ ত্যাগ করাই ভালো। হেমচন্দ্র তখন ভাবে,—"ব্রাহ্মণটাকে আজ মেরেই ফেল্‌ব, বেটা আমার দুরভিসন্ধি ভঙ্গ 'কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে।" সুযোগ পেয়ে সে ব্রাহ্মণটাকে ধরে যথেচ্ছ প্রহার করে।

মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে নীলকান্ত যথেষ্ট সচেতন হলেও মদ না খেয়ে থাকতে পারে না এবং আনুষঙ্গিক হিসেবে তাকে বাইরে রাত কাটাতে হয়। অবলারও দুঃখের অন্ত থাকে না। অবলার দুঃখ দেখে চপলা ভাবে, জ্ঞানপাপীকে নীতি-উপদেশে ভালো করা যায় না। অন্য কোনো পথ নিতে হবে। অবলা আর চপলা মিলে একটা ষড়যন্ত্র করে।

নীলকান্ত একদিন যখন অবলার শয়নঘরে ঢুকবে সে-সময় চপলা পুরুষবেশে ঘরের কাছে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকে। নীলকান্ত এলে অবলা তাকে মিষ্টি কথায় বলে, সে যেন রাত্রে বাড়ী থাকে। উগ্রভাবে নীলকান্ত জবাব দেয়, মাতঙ্গিনী আর হেমচন্দ্রকে সে কখনোই ছাড়তে পারবে না। অবলা তখন বলে ওঠে,—"তবে আমার ঘরে কেন? মাতঙ্গিনীর ঘরে যাও, আমার ঘরে যে আসে আসুক। নীলকান্ত এতে অত্যন্ত রেগে অবলাকে মারতে উদ্যত হয়। ইতিমধ্যে চপলা পুরুষবেশে এলো। চপলাকে দেখে অবলা প্রেমিক পুরুষের মতো তাকে আপ্যায়ন করে এবং সে রকম ব্যবহারও করে। নীলকান্ত থাকতে না পেরে চপলার হাত চেপে ধরে। স্ত্রীলোক চপলা বাধ্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এতে নীলকান্ত মরমে মরে যায়—স্ত্রীলোকের হাত চেপে ধরেছে সে! তাছাড়া মিথ্যা সন্দেহও সে করেছিলো তার সতী স্ত্রীর ওপর। এতোদিন পর নীলকান্ত জানতে পারলো, স্বামী অন্য নারীর সংস্পর্শে এলে স্ত্রীর মনে এমনই ঈর্ষা আর যন্ত্রণা হয়। তখন নীলকান্ত দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলে,—'সভাস্থলীর মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা সন্দেহ, মহাশয়েরা! জীবিতেশ্বরী আমাকে আপনাদের সমক্ষে যেরূপ চক্ষুদান দিলেন, ইহাতে আপনাদের যেন চক্ষুদান হয়, মহাশয়েরাও নিশ্চয়ই জানিবেন যে ইহারই নাম চক্ষুদান।"

একাদশীর পারণ (১৮৭১ খৃঃ)—বিপিনবিহারী দে॥ কুপথগামী স্বামীর স্ত্রীর ভাগ্যে ঘটে "সধবার একাদশী" অর্থাৎ দাম্পত্য অধিকার সত্ত্বেও যৌন-বুভুক্ষা। স্বামী যখন কুপথ পরিত্যাগ করে স্ত্রী-অনুবর্তী হয়, তখন এই বুভুক্ষার পর আসে ক্ষুধা-শান্তি। "একাদশীর পারণ" নামকরণে ব্যাখ্যা এ ভাবে দিলে

ভুল হবে না, কারণ প্রহসন শেষে 'প্রেমলাঙ্গিনী'র কাছে আশুতোষের যে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, তা এই ব্যাখ্যারই সমর্থক। লেখকের দৃষ্টিকোণ বেশ্যাসক্তিকে, বিশেষ করে স্ত্রীর যৌনবুভুক্ষাকে অবলম্বন করে উপস্থাপিত হয়েছে।

কাহিনী।—জমিদার আত্মারামবাবুর পুত্র আশুতোষ ইয়ারদের সংসর্গে পড়ে মদ্যপ এবং বারনারীগামী। চাপে পড়ে মদ্যপান নিবারিণী-সভার প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সে নির্বিকার। ইয়ারদের সঙ্গে সে দুষ্কর্ম করে দিন কাটায়। পিতা আত্মারামের বিশ্বাস, আশুতোষ বর্তমানে সৎপথে ফিরেছে। তবে তার সাময়িক স্খলনের জন্যে তিনি তার বন্ধুদের দায়ী করেন। অবশ্য এখন আশুতোষ পিতার অগোচরে অত্যন্ত নিপুণভাবে দুষ্কর্ম করে বলেই পিতা আজকাল এমন ধারণা করেছেন।

কিন্তু বন্ধুরাই যে পুরোপুরি দায়ী—একথা ঠিক নয়। কারণ মদ্যপানে অসম্মত ইয়ার সুধাচাদ দত্তকে আশুতোষ জোর করে মদ খাইয়ে বলে, "This is called civilization." এমন কি সুধাচাদের আপত্তি সত্ত্বেও বারনারী হেমাঙ্গিনী ওরফে হিমি-বিবিকে নিয়ে বাগানবাড়ীতে আমোদের সিদ্ধান্তে আশুতোষ অটল থাকে। এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করে কেবল বন্ধু অভয়।

সুধাচাদের সুমতি এসেছে অবশ্য স্ত্রী কামিনীর চাপে পড়ে। একদিন তার স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে গেলে সুধাচাঁদ বলেছিলো, "প্রিয়ে আমার হাতে দড়ি দিও না, আর আমি বাইরে ইয়ারকি দেব না, আর মদ খাব না, এই সুরানিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে আসি গে।"

বাগানবাড়ীতে যথারীতি আমোদ-প্রমোদের জন্যে আশুতোষ অভয় এবং হিমিকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সুধাচাদ এসেছে শুধু আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে নি বলেই। হিমি আশুতোষকে ইতর ভাষায় গালাগালি করে। আশুতোষের কাব্যময় প্রেমোচ্ছ্বাসের উত্তরে সে বলে, "তুই আর জ্বালাস নি বাবু, তোর ট্যাসট্যাসানি কথা শুনে আর এখানে আসতে ইচ্ছে করে না।" এ ধরনের গালাগালিতে সুধা অস্বস্তিবোধ করে।

তারপর মদ আসে। যথারীতি সকলে তা পান করে। সুধাচাঁদকে আশুতোষ জোর করে মদ খাওয়ায়। মদ খেতে খেতে সুধাচাঁদ বলে,— "Oh God! the contagious evil of a vicious company affects me." ওদিকে আশুতোষ তখন হিমি-বিবিকে হাওয়া করতে ব্যস্ত। সুধাচাঁদ

হিমির সম্মুখেই প্রমাণ করিয়ে দেয় যে, হিমি গোপনে আর একজন বাবু রেখেছে। সুধা বলে, "আমার শুনা কথা নয় বাবা, দেখা কথা।" ক্রুদ্ধা অপ্রস্তুতা হেমাঙ্গিনী বেগে প্রস্থান করে। মর্মাহত আশুতোষ আক্ষেপ করে, "আমার প্রেমলাঙ্গিনীর (স্ত্রী) ঘরে যদি কেউ আসৃত তাহলেও আমার দুঃখ হতো না। তুমি যে অপর লোককে ঘরে আসৃতে দাও, আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।"

প্রেমলাঙ্গিনীর প্রতি আকর্ষণের নমুনা এতেই পাওয়া যায়। শাশুড়ী সুরমা তার সম্বন্ধে বলে, "বৌ আমার সতীলক্ষ্মী, আশু হাজার মুখ করুক, ঝুক্ করুক, তবু তার মুখ চেয়ে আছে। বাছাব ভাতারের যে কেমন সুখ তা জানে না। চিরকালটা কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছে, তার মতন গুণের বৌ কি আর হবে? অন্য মেয়ে হলে, কুলে কালি দিত।"

একদিন প্রেমলাঙ্গিনী তার ননদ বিদ্যুল্লতার কাছে দুঃখ করে বলেছে,— "ঠাকুর ঝি! আমার পাঁচজন সেওর কাচে বস্তে লজ্জা করে। আমি যে সেওর হয়েও হলুম না। কাচে বসে গায়ে হাত বুলুতে গ্যালে লাথি মেরে তাড়িয়ে দ্যায়। যদি বলি 'কেমন আছ' তাহলে উত্তর দ্যায়—তোমার তার মতন নয়।" সুধাচাঁদের স্ত্রী কামিনীর কথা তুলে সে বলেছে,—"কামিনী একাদশীর পারণ কচ্চে, আমার যে একাদশী সেই একাদশী, কোন জন্মে দ্বাদশী হল না।"

কিন্তু পারণের দিন এলো। মদের অভিশাপ এতোদিনে ফলেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় আশুতোষ শয্যাশায়ী। ডাক্তারের ওষুধে এবং স্ত্রীর অক্লান্ত সেবায় ক্রমে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। হিমি-বিবির প্রতি মোহ আগেই কেটে গেছে। স্ত্রীর সেবামুগ্ধ আশুতোষের মনে অনুশোচনা জাগে। স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে সে তার প্রেম প্রার্থনা করে। স্ত্রীর মনের পুঞ্জীভূত অভিমান দুবার হয়ে ওঠে—কিন্তু প্রেমিকা স্ত্রীর অভিমান ভাঙতে দেরী হয় না। চোখের জলে তাদের মিলন হয়। আশুতোষ স্ত্রীর হাত ধরে বলে,—

"রোদন কোরো না আর ওলো রসবতী।
একাদশীর পারণ, কর লয়ে পতি॥"

কলির সঙ (১৮৮০ খৃঃ)—শৈলেন্দ্রনাথ হালদার॥ 'কলি'র নাম সংযুক্ত অবস্থায় বাংলায় প্রচুর প্রহসন রচিত হয়েছে। গত শতাব্দীর সমাজবিপ্লব

কলিকালের প্রতাপ সম্পর্কে একটা ধারণা সাধারণের মনে দৃঢ়মূল করে তুলেছিলো। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, কল্কি পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে কলিযুগের যে বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর কিছু কিছু সব যুগেই দৃষ্টান্তের মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। সমাজের গতিশীলতার প্রভাবে স্থিতিশীলতার শাসন শৈথিল্যের ক্ষেত্রেই কলির অবস্থিতি বলে ধরা হয়। তবে দৌনীতিক অনুষ্ঠানের বাহুল্যই কলিকালের বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক দৌর্নীতিক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সূচিত সাধারণ দৃষ্টিকোণ এই নামকে ইন্ধন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রহসনটির এক স্থানে মনিবদের অনুপস্থিতিতে ভৃত্যরা গান গেয়েছে,—

"দেখ ভাই করে বিচার—এ দুনিয়ার কি তামাসা।
সব বামুনগুলো মূর্খ হলো বেদ বেদান্ত পড়ে চাষা।
যত ঠগ ঠগরন্দ, রাজভোগে আছে স্বচ্ছন্দ,
পণ্ডিতের না যোড়ে অন্ন, সদা ক্ষুণ্ণ দৈন্য দশা।
যারা সৎ সত্যবাদী, তাদের প্রতি সবাই বাদী,
বঞ্চকেরা জগৎপুজ্য, হর্ত্তাকর্ত্তা ভরসা আশা॥
দুঃখের কথা বল্‌বো কারে, বিকার সুরা বসে ঘরে,
দুগ্ধ করে দ্বারে দ্বারে, কে তারে করে জিজ্ঞাসা॥
যারা সব সাধ্বী সতী, তাদের নাহি মিলে ধুতি,
কশ্‌বি যারা পরে তারা, ঢাকাই কোরা নিমু খাসা॥"

কলির সঙ কে বা কারা, তা সম্পর্কেও ভৃত্যদের একজনের মুখেও বক্তব্য আছে।—"এ গানের সঙ্গে একাল তো মিল্‌ছেই কিন্তু আমার বাবুর বাড়ীর সঙ্গেও অনেকটা মিল—তবে বেশির ভাগটা কর্ত্তাবাবু ও সোনার চাঁদ ছেলের ওপরেই বিলক্ষণ আছে।" তুলসীদাস কলিযুগের বৈশিষ্ট্যের ওপর যে দোহা লিখেছেন, তার বক্তব্যের সঙ্গে ভৃত্যদের গানটির মিল আছে। তুলসীদাস বলেছেন,—

"বামন সবনে মূরুক্ক হোঞে
শূদ্র পড়েহেঁ গীতা,
ঠক্ ঠকর বঁদ আচ্ছা রেঁাহে
দুখ, পাণ্ডে পণ্ডিতা,

খান্‌কি সবনে আচ্ছা রে̐াহে,
সতী রে̐াহে উপবাসী,
ধন্য কলিকাল তেরে তামাসা
দুখ্‌ লাগে আর হাসি।"

প্রহসনটি বেশ্যাসক্তি সম্পর্কিত হলেও বেশ্যাসক্তির কুফল সম্পর্কেই লেখকমন সচেতন হয়ে উঠেছে। বেশ্যাসক্তিতে শুধু দাম্পত্য কুফল নয়, সামাজিক কুফলও যে তার অন্যতম পরিণতি, তা অস্বীকার করা যায় না।

কাহিনী।—বেহারীবাবুর ছেলে গোপাল বেশ্যাসক্ত এক নব্য বাবু। যথারীতি তার কতকগুলো ইয়ার আছে। তাদের সঙ্গে সে মদ্যপান এবং বেশ্যাগমন করে বেড়ায়। "মহাপুরুষটি একদিন একটি বেশ্যার ঘরে ঢুকে নানারূপ অত্যাচার করে ঘর দোর ভেঙে পলায়ন করে; কিন্তু কপাল জোরে বেঁচে গেছেন।" বাবু চাকরী করেন না। বলেন, "dam nasty চাকরী, নেই দাস হোগা।" তিনি "গণ্ডারের মত এক গেঁ-য়ে চলেন, ওপোরে চক্‌চকে হয়ে লোকের কাছে এই সাউখুড়ি করে বেড়ান, আর বাড়ীতে খরচের দুই পয়সা বরাত, আবার কোন্‌ কোন্‌ দিন ও দুপয়সা জমায় আসে।" তাছাড়া মোকদ্দমা করা তার একটা স্বভাব। এক ভদ্রলোক, যাঁর কাছে গোপাল এককালে যথেষ্ট উপকার পেয়েছে, তাঁকে অযথা অনিষ্টের বাসনায় মোকদ্দমায় জড়িয়েছে। অবশ্য কেস্‌ ডিস্‌মিস্‌ হয়, তাই রক্ষা!

স্ত্রীকে আনবার জন্যে একবার গোপাল শ্বশুর বাড়ী যায়। ছোটো শালী তাকে কৌতুক করে বলে, তার জায়গা হবে না, সে পথ দেখুক। এ কথায় গুরুত্ব দিয়ে গোপাল তার শ্বশুরকে গালাগাল করে ফিরে আসে। শ্বশুর তাকে মেয়ে দিতে নারাজ হয়। মেয়েও পিতার অমতে শ্বশুর বাড়ী যেতে রাজী না হলে গোপাল তাকে লাথি মেরে বলে,—"তবে তোমার বাবাকে ভালবাস, বাবাকে অন্তরে রাখ, বাবার কথা শুনে কাজ কর, আমি চল্লুম।" গোপাল ফিরে এসে রাগ প্রকাশ করে,—"আমার মাগ্‌, আমি যদি নিয়ে এসে বিলিয়ে দিই, তোরা করবি কি?"

গোপালের বাবা স্ত্রৈণ। গিন্নির প্রশ্রয়েই ছেলে এমন হয়েছে—যদিও গিন্নি সৎমা। ছেলেকে প্রশ্রয় দেবার ব্যাপারে বেহারী মৃদু অনুযোগ করলে গিন্নি বলেন,—"হাঁ রা বুড়ো ড্যাগ্‌রা, সৎমা হই আর নাই হই, ছেলে যাকে মা বলে ডাকে, সে কি তখন সে ছেলেকে ছেলে বলে আদর করে না?" তখন

বেফাঁস বলে ফেলেন, "তুমিই ছেলের মাথা খেলে।" তাতেই গিন্নির তাণ্ডব-নাচের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের তুবড়িও ছোটে। নিরুপায় হয়ে বেহারী কাঁদেন,—"ও গিন্নি, আমার আর কেউ নেই, এক মেয়ে ছেলো, তাকে বড় ভালবাসতুম, কিন্তু সে মরে যেতে তোমাকে বে করে এনে তোমার মুখ দেখে মেয়ের শোক ভুলে আছি, দোহাই আমায় পাথারে ভাসিয়ে যেও না গো— !"

বেহারীলালের কাছে বেয়াই কমলাকান্ত আসেন—এমন একটা অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটে যাবার পর। জামাইয়ের দ্বাবনয়ের কথা তিনি বেয়াইকে বল্‌লে বেহারী দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে ক্ষমা চান। কমলাকান্ত বলেন,—"মশায়, সেদিন ইংরেজিব গুঁতো দেখে কে। তপ্ত ধানের খোলায় যেন খৈ ফুট্‌তে লাগ্‌ল, তা আবার সব ইংরেজি হলে বজায় থাকতো, মশায় তা না তো, ইংরেজ, বাঙ্গালা, হিন্দী পাঁচরকম মিশিয়ে,—তা অধিকাংশই হিন্দী আর বাঙ্গালা। আব মশায় এক ইংরেজি বুল শিখেছে যে, আমার conscience যা বল্‌বে আমি তাই কবব।" চাকবকে দিয়ে বেহারী গোপালকে ডেকে পাঠালেন। গোপাল আসে। ইতিমধ্যে টিকি কেটে দিয়েছে বলে গোপালের বিরুদ্ধে নালিশ করবার জন্যে পুরোত হরিহর উপস্থিত হয়েছিলো। গোপালকে দেখে মার খাবার ভয়ে পালায়। শ্বশুরকে বাবার কাছে উপস্থিত থাকতে দেখে গোপাল তার আসবার কারণ বুঝতে পারে। "এই যে মশায়, বাবার কাছে বসে খুব লাগান হচ্ছে যে।" শ্বশুরের ওপর অভদ্র ব্যবহারে বাবা তাকে তিরস্কার করেন। গোপাল বলে,—"আমরা পড়েচি—উচিত বল্‌তে কুণ্ঠিত হওয়া কাপুরুষের কর্ম।" বেহারী বলে,—"তোর পড়ার মুখে ছাই, তোর মুখে ছাই আর তোর চোদ্দ পুরুষের মুখে ছাই, একেবারে গোল্লায় গেলি।" প্রত্যুত্তরে গোপাল বলে ওঠে,—"যত গালাগালি দিতে পারেন দিন, মার কাছে গিয়ে যখন বল্‌বো তখন টেরটি পাবেন, বুড়ো বয়েসে বে করা কেমন সুখ!" বাবাকেই এমন কথা বল্‌তে দেখে কমলাকান্ত স্তম্ভিত হয়ে যান। বেহারী হতবাক্ হয়ে বলেন,—"হায়রে! কলি কি আর মেঠাই মোণ্ডা, না হাত পা ওলা মানুষ, এই সব গর্হিত কাজ দেখেই লোকে কলিকাল বলে।"

গোপাল তার শ্বশুরের ওপর প্রতিশোধ নেবার উপায় খোঁজে। ইয়ারকে বলে, "ও বেটার (শ্বশুরের) মাগ্‌টা নষ্ট, বিশেষ দ্বিতীয় পক্ষে, যদি ভাই তারে বাগিয়ে একেবারে গঙ্গাপার কত্তে পার, তাহলে তোমার যা খরচপত্র

হবে, তা দিতে আমি রাজী আছি।” ইয়ার বলে, তার আগে গোপালের স্ত্রীকে এখানে আনাতে হবে। তাছাড়া শাশুড়ীকে কুলত্যাগ করাবার চক্রান্তে কিছু টাকাও দরকার। যা হোক গোপাল নিজের মায়ের নাম করে ইয়ারকে দিয়ে চিঠি লেখায়। “অদ্য অতি উত্তম দিন আছে জানিয়া বধূমাতাকে আনিবার জন্য আমাদের বাড়ীর বিশ্বাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পাঠাইতেছি, যদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন পাঠাইবেন, নচেৎ স্পষ্ট জবাব দানে বাধিত করিবেন।” নইলে আবার ছেলের বিয়ে দেওয়া হবে—এই ভয়ও দেখানো হয়। হরিহর ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে একবার গোপালের হাতে বিপর্যস্ত হয়েছিলো, তাই ভয়ে ভয়ে চিঠি নিয়ে যায়। অবশ্য গোপালের মাকে এ খবর জানানো হয়। তিনি খুসীই হলেন। বেহারীর কানে কথাটা গেলে তিনি ভীত হলেন বটে, তবে হরিহর আছে ভেবে একটু আশ্বস্ত হলেন।

ওদিকে কমলাকান্ত শিবমন্দিরে এসে দেখে একটা সন্ন্যাসী তারই তোলা ফুলগুলো নিয়ে পূজোয় বসেছে। কমলাকান্ত চটে যান, কিন্তু সন্ন্যাসীর ঔদ্ধত্য, হিন্দী কথা এবং “শঙ্কর হর হর হর, ব্যোম কেদারেশ্বর” বুলি শুনে ঘাবড়ে যান। তখন কাঁচুমাচু হয়ে তার কাছে বিনয় প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসী তাঁর হাত দেখে অতীত বলে দেয়। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীটি গোপালের ছদ্মবেশী ইয়ার। কমলাকান্তের অতীত তার অজানা নেই। কমলাকান্তকে সে বলে, তার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। তার আয়ুও বেশিদিন নেই—ছ’সাত মাস আছে। “তোমারা একঠো বড়া শোক লাগে গা, ওই শোকমে তোমারা যান যাগা সমুজা?” কৌতূহলবশে কমলাকান্তের স্ত্রী কাদম্বিনী এগিয়ে এলে তিনি তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসীর ওপর তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। “চল গো লক্ষ্মী আমরা যাই, ও জন্তুটা যা করবার করুগ্‌ গে, এস!” কিন্তু স্ত্রী-জনোচিত কৌতূহলে আবার কাদম্বিনী আসে। এবার আসে স্বামীকে লুকিয়ে একা একা। সন্ন্যাসীর কাছে এসে তাকে হাত দেখা শেখাতে বলে। সন্ন্যাসী বলে, “হাম তোম্‌কো অতি যতনমে শেখায় গা, কিন্তু একঠো কঠিন কাম করনে হোগা।···রাত দো প্রহরকো বাদ হিঁয়া আনেসে হামারা সাথ শ্মশানমে যাকে একঠো হাড় উঠায় লিয়ানেসে শেখলায় গা।” কাদম্বিনী ভাবনায় পড়ে। কারণ সে ‘গেরস্থ মেয়ে।’ যা হোক সে চেষ্টা করবে—কথা দেয়। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীর কাছে আরও কয়েকজন প্রতিবেশিনী আসে তারা হাত দেখায়। সন্ন্যাসী হাত দেখার ছলে হাত

টেঁপে। একজন বলেই ওঠে,—"হাতে বড় লাগে যে অত টেঁপেন কেন?" হাত দেখিয়ে এরা চলে গেলে সন্ন্যাসী ভাবে, যাক্—মাঝে থেকে কিছু extra পাওয়া গেল।

রাত্রে হঠাৎ কাদম্বিনীকে পাওয়া যায় না। কাদম্বিনীর খোঁজে সন্ন্যাসীর কাছে কমলাকান্ত আসে। সন্ন্যাসী গণনা করে বলে, কাদম্বিনী কূপে ডুবে মরেছে। কমলাকান্ত বিলাপ করতে করতে চলে যায়। সন্ন্যাসী আশ্বস্ত হয়,—যাক কাদম্বিনীর আর খোঁজ পড়বে না। সন্ন্যাসী ভাবে, কাজ শেষ হলে "গোপাল বেটার শাশুড়ে বদনাম চিরকাল থাকবে।" এদিকে ভট্টাচার্য গোপালের স্ত্রীকে নিতে এসে এসব খবর শুনে ভয়ে পালিয়ে যায়। ওদিকে গোপালের ইয়ার সন্ন্যাসী সাজবার গোঁফ দাড়ির পুট্‌লি হাতে করে এসে গোপালের সামনে সেটা ফেলে দেয়। সে হাসতে হাসতে বলে, গোপালের শাশুড়ীকে সে কেওড়াতলার ঘাটের পাশে 'মুনি আশ্রম'গুলোর একটিতে রেখে এসেছে। এবার গিয়ে হাত দেখা শেখাতে হবে। ওদের জম্মায় রেখে সে কিছু টাকাও পেয়েছে।

(নিজের মায়ের চরিত্রদোষে গোপালের স্ত্রী কুসুমের মনে ধিক্কার আসে। নিজে থেকেই শ্বশুরবাড়ী আসে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গোপালের মা নিজের গিন্নিপনা ঘুচে যায় দেখে গোপালের কাছে বেটার বৌয়ের নামে লাগায়। গোপাল স্ত্রীকে ধমক দেয়।... —এখানে ৬০ পৃষ্ঠায় প্রহসনটি খণ্ডিত।)

মা এয়েচেন !!!—(১৮৭৩ খৃঃ)—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়॥ টাইটেল পেজে দুটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, একটি সংস্কৃত, অপরটি বাংলায়। (১) "ধিক ত্বাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ।" এবং

(২) ধিক্ তোকে, ধিক্ তাকে ধিক্ মদনায়।

এই আমি! ধিক্ ধিক ধিক্ রে আমায়॥"

অকৃতজ্ঞতা রক্ষিতার স্বাভাবিক ধর্ম—এই সত্য প্রচার করে দাম্পত্য ভিত্তি সুদৃঢ় করবার চেষ্টা এতে করা হয়েছে।

কাহিনী।—কামিনী ও মোহিনী দুই বেশ্যা। মোহিনী কানাইবাবুর রক্ষিতা। কামিনী কুলীনের মেয়ে ছিলো, প্রলোভনে পড়ে মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে এখন বেশ্যাবৃত্তি ধরেছে। সে তার ইতিহাস বলে,—"আগে তো ঘর বর পাওয়া গেল না কোরে অনেক বয়সে এক বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তারপর পাঁচ গণ্ডা টাকা না পেলে কুশণ্ডিকা কোরবে

না, এই রকম ধনুক ভাঙ্গা পণ করে ; বাবা দুঃখী মানুষ, অত টাকা কোথায় পাবেন, দিতে পাল্লেন না, কুশণ্ডিকাও হলো না। তারপর আসবে আসবে কোরে মুখ চেয়ে থাকলেম, আশা মিথ্যে হলো। শুনলেম, তার ন গণ্ডা বিয়ে, তার চেয়ে আরও বেশী। কাজেই আমার পিছনে দুষ্ট লোক লাগলো, আমারো কেমন কুমতি হলো, কুলের দিকে চাইলেম না, বাপ-মায়ের মুখের দিকে চাইলেম না, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম।" সে "খান্‌কি-বংশের" নয় বলে মোহিনীর "নিমক হারামি" বড়ো খারাপ লাগে। কানাইবাবুর অনুপস্থিতিতে মোহিনী অন্য বাবুকে ঘরে আনে কিংবা অন্য বাবুর বাগানবাড়ীতে যায়।

একদিন মোহিনী কামিনীর সঙ্গে বিস্তি খেলছিলো ; এমন সময় স্বরুন নামে তার হিন্দুস্থানী বেহারা এসে খবর দেয় যে গত শনিবার যে লোকটির সঙ্গে এক বাবুর বাগানবাড়ীতে সে গিয়েছিলো, সেই লোকটি এসেছে। মোহিনী তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে ব'লে কানাইবাবু শহরে আছেন কিনা বেহারাকে খোঁজ নিতে পাঠায়। বেহারা ফিরে এসে বলে, তিনি শ্রীরামপুর গিয়েছেন। তখন মোহিনী বাইরের সেই লোকটিকে বলে, সন্ধ্যার সময় বাবু যেন আসেন। লোকটি চলে গেলে কামিনীকে বলে,—"ইহকাল পরকাল তো আমাদের গেছেই, তবু নিমকহারামি করাটা কি ভাল?" কামিনী বলে, এখন যে তাকে রেখেছে, তার কাছে সে বিশ্বস্তই থাকবে। "এখন ঐ মানুষটি আমাকে রেখেছে, কিছু কিছু দেয়, দিনান্তে অন্ন যুড়ুক আর নাই যুড়ুক, তাকেই ধরে রেখেছি। মোহিনীর মত সে নিজে ঠিকই করেছে। সগর্বে সে বলে, রক্ষককে না জানিয়ে অন্যের সঙ্গে কারবার চালানোর কায়দা থাকা চাই। "একজনের ভাতে কি আমাদের পেট ভরে? আমাদের জেতের ধর্ম্মই এই।"

এদিকে কানাইবাবুর স্ত্রী শশিকলা সতীসাধ্বী। কানাইবাবু প্রায়ই বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকেন। স্ত্রী ভাবে, কাজের চাপে উনি আসতে পারছেন না। কখনো চিন্তিত হয়ে ভাবে, তাঁর কি কোনো অসুখ করলো? শশিকলাকে কানাইবাবু অনেক সময় প্রহার করেন সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে। কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছে শশিকলা অবশ্য একটা মিথ্যা কিছু বলে স্বামীর দোষ চেপে রাখে। সবাই শশিকলার খুব প্রশংসা করে। কিন্তু তবু কানাইবাবু এমন স্ত্রী ছেড়েও বেশ্যাসক্ত!

সন্ধ্যায় যথাসময়ে মোহিনীর বাড়ীতে গিরিশ বোস নামে সেই বাবুটি আসেন। দুজনেতে মিলে মদ্যপান ও রহস্যালাপ চলে। গিরিশ বলেন,

গতবার তিনি মোহিনীকে বাড়ী পেঁাছে দিয়ে রাত চারটের সময় দারোয়ানকে দিয়ে দরজা খুলিয়ে ভেতরে ঢোকেন; কিন্তু তাঁর গিন্নী তাঁকে শোবার ঘরে ঠাঁই দিলেন না। দরজা বন্ধ করেছিলেন, বাধ্য হয়ে গায়ের উড়ুনীটা পেতে বাইরে তাঁকে শুতে হয়। সেই মশার কামড়ের দাগ আজও তাঁর গায়ে আছে। মোহিনীর সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু এসব শুনে মোহিনী হাসে। মদ্যপানের পর মোহিনীর অনুরোধে গিরিশ অঙ্গভঙ্গী করে গান করে। এমন সময় বাইরের থেকে কানাইবাবু হাঁক দেন। বিপদ বুঝে মোহিনী খুব তাড়াতাড়ি মদের বোতল আর গ্লাস খাটের তলায় রাখলো। তারপর গিরিশকে থান কাপড় পরিয়ে বিধবা সাজায়। জামা-কাপড়গুলো একটা পুঁটুলি করে রাখা হলো। গিরিশকে বল্লো, "ঘোমটা দিয়ে পুঁটুলিটি সাম্‌নে রেখে চুপটি করে খাটের খুরোর কাছে বসো।" এদিকে সব ঠিক্‌ঠাক্ করে কানাইবাবুকে মোহিনী ঘরে আনে। কানাই এলে মোহিনী বলে, তিনি তাকে পাঁচ রকম দেন বলে পাড়ার ড্যাক্‌রা'রা আপশোষে ফেটে মরে। নিত্য নিত্য কত লোক এসে তাকে লোভ দেখায়, তার ঘরে আস্‌তে চায়। কিন্তু মোহিনী হচ্ছে 'কানাই-অন্ত প্রাণ'। তাই তাতে সে বিচলিত হয়নি। অবশেষে তারা রেগে গিয়ে তার মায়ের কাছে গিয়ে খবর দিয়েছিলো যে মোহিনীর কলেরা হয়েছে। মা তাই শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। থান পরা ঐ বিধবাটি তার মা।

কানাই ভাবে তার পরম শত্রু হচ্ছেন গিরিশ বোস। কলেরার সংবাদ হয়তো সে-ই দিয়েছে। কানাই মোহিনীকে বলে, সে শ্রীরামপুর গিয়েছিলো মোকদ্দমার জন্যে নয়, মোহিনীর চন্দ্রহার আন্‌বার জন্যে। মোহিনী বলে, সে জাত হারিয়েছে বলে তার মা তার হাতে খাবেন না। এখনো অনাহারে আছেন। কানাই যদি তার মার জন্যে কিছু সন্দেশ কিনে আনে তো ভালো হয়। কানাই গিয়ে সন্দেশ নিয়ে আসে। মোহিনী বলে, হঠাৎ তার মনে এলো, আজ একাদশী—মা কিছু খাবেন না। সন্দেশ মোহিনী পুঁটুলির মধ্যে রেখে দেয়—মা পারণ করবে বলে। তারপর মোহিনী কানাইকে বলে, মা চলে যাচ্ছেন। এম্‌নি অম্‌নি যাওয়া ভালো দেখায় না। একটা কাপড় কিনে দেওয়া উচিত। কানাই তাড়াতাড়ি একটা কোরা কাপড় এনে দেয়। তারপর একশত টাকা মোহিনীর মার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে। বলে. "দেখ, মা এয়েচেন, আগে আমি জানি নি, কিছু প্রণামী না দেওয়াটা ভাল হয় না।"

গিরিশকে মোহিনী থান পরা অবস্থাতেই জামাকাপড়ের পুঁটুসি, সন্দেশ আর কোরা কাপড়খানা নিয়ে বেরিয়ে যেতে বলে। অবশ্য একশত টাকা নিজের কাছে রেখে দেয়। গিরিশ চলে যাবার সময় তাঁর পুরুষাকৃতি চলনে কানাইয়ের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিলো। তবে কিছু বল্‌লো না। পরে মোহিনীর কাছে সে সন্দেহের কথা জানাতেই মোহিনী গালাগালি দিয়ে ওঠে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে শেষে মোহিনীর কাছে প্রহার জোটে। মোহিনী কানাইকে বেরিয়ে যেতে বলে। কানাই বলেন, এটা তাঁর নিজের বাড়ী। তখন মোহিনীই বেরিয়ে যায়—মুটে ডেকে জিনিসপত্র নিয়ে।

কানাই খালি ঘরে ঢুকে খাটের তলায় মদের বোতল গেলাস আবিষ্কার করে। একটি ছড়িও পাওয়া গেলো। বিধবা মানুষ তো ছড়ি হাতে নিতে পারে না! পুঁটুলিতেও ছড়ি ঢোকে না। তাই এটা থেকে গেছে। ছড়ির গায়ে লেখা—G. C. B., অর্থাৎ গিরিশ চন্দ্র বোস!—চম্‌কে ওঠে কানাই। তারপর কপাল চাপ্‌ড়িয়ে খেদ করে। তখন সে নিজের স্ত্রীর কথা ভেবে দুঃখ পায়। ভাবে, তাকে কতো কষ্ট সে দিয়েছে। সে বলে ওঠে,—"আমার মতন হতভাগা যদি কেউ থাকেন আর যাঁরা যাঁরা আছেন, আমার এই দশা দেখে এখন অবধি সাবধান হবেন। যাঁরা এ পথে আসেন নি। তাঁরা যেন লোভে পড়ে রাক্ষসীদের টোপে না যান্‌। আর যাঁরা যাঁরা মজেছেন, আমার এই দশা মনে করে আজ অবধি তাঁরা যেন নাকে কানে খত দেন।…অ্যাঁ! বেটী স্বচ্ছন্দে বোল্লে কিনা, মা এয়েচেন!!!"

চক্ষুদান (কলিকাতা ১৮৬৯ খৃঃ)—রামনারায়ণ তর্করত্ন॥ কাহিনীটিতে স্বামীর মনে যৌন ঈর্ষা জাগিয়ে স্ত্রী তার যৌন অশান্তির স্বরূপ দর্শনে চক্ষুদান করেছে বলেই এমন নামকরণ। স্ত্রী বসুমতী তার স্বামীকে প্রহসনে সবশেষে বলেছে,—"নাথ বিবেচনা করে দেখ, আমাদের তো এমনি হয়, তুমি বুদ্ধিমান বিদ্বান বট, বিবেচনা শক্তি শরীরে আছে, তুমি যে এই অধীনীকে এই বয়েসে শূন্য গৃহে একাকিনী চিরদিন ফেলে রেখে আত্মসুখে রত থাক, আমি মনে কত দুঃখ পাই, শরীরে কত যাতনা হয়, অন্তরাত্মা কতদূর ব্যাকুল হয়ে ওঠে তুমি বিবেচনা করো না। এই নিমিত্ত কি করি ভেবে চিন্তে তোমাকে এই চক্ষুদান দিলাম।" দাম্পত্য অংশীদারের যৌন-বঞ্চনার দিকটির প্রাধান্য দিয়েই বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে।

কাহিনী।—নিকুঞ্জবিহারী মাতাল এবং লম্পট। স্ত্রী বসুমতীর মনে সুখ নেই। বাপের বাড়ী মাধবপুর থেকে নাপ্তে বৌ বসুমতীর খোঁজ খবর নিতে আসে। মাধবপুরে যে যায়, সেই নাকি বলে, বসুমতীর শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে। নাপ্তে বৌকে বসুমতী মনের কথা বল্‌তে পারবে এই ভেবে বসুমতীর মা তাকে পাঠিয়েছেন। বসুমতী নাপ্তে বৌকে তার দুর্দশার কথা জানায়। মাকে বল্‌তে বলে, তার বসু মরে গেছে। "মা আমার নাম রেখেছেন বসুমতী, বসুমতী সব সহ্য করেন, অকারণ পদাঘাত সহ্য করতে পারেন না, কিন্তু আমি এমনি বসুমতী যে পদাঘাত তো পদাঘাত আমার অদৃষ্টে কত মর্ম্মাঘাত সহ্য কত্তে হচ্চে। এই আটপর রাৎ একা পড়ে থাকি, এই দিন কাল, অম্‌নি ফেলে চলে যায়। তুই তো মেয়ে মানুষ, সকলি জানিস, ইচ্ছা হয় গলায় দড়ী দি কি বিষ খেয়ে মরি, আর ভাই যাতনা সইতে পারিনে।" হয়তো কোনোদিন স্বামী রাত দুটো আড়াইটের সময় আসে। "তা সে আসায় কায কি ভাই, এসে চক্ষু বুজতে না বুজতে ভোর হয়ে পড়ে।" বসুমতীও আর আলাপ করবার চেষ্টা করে না। এক সময় বসুমতী এজন্যে স্বামীকে অনুরোধ খোসামোদ করেছে, মন যুগিয়েছে, কিন্তু 'চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী।' "সে সব এখন ছেড়ে দি'চ্ছি, এখন অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়েছেন, স্বামী পরম গুরু মনে মনে জানি, ভক্তিও আছে, কিন্তু যাতনাতে এখন মুখে যা এসে তাই বলি, গালিমন্দ দি।"

স্বামীকে ওষুধ দিয়ে বশ করবার কথায় বসুমতী বলে, কী হতে গিয়ে শেষে কী হয়ে যাবে। তাছাড়া মজুমদার-বাড়ীর অভিজ্ঞতা আছে। মজুমদার বৌয়ের ভাগ্যও বসুমতীর মতো ছিলো। একদিন সে কোথা থেকে বশীকরণ ওষুধ এনে স্বামীর ভাত খাবার আগে নির্দেশ মতো দুধের মধ্যে মিশিয়ে রেখেছিলো। স্বামী দুধ খেতে গেলে স্ত্রী অমনি ছুটে এসে হাত চেপে ধরে বলে, 'দুধ খাওয়া হবে না', তারপর কাঁদতে কাঁদতে সব কথা খুলে বলে। স্বামী দুধটুকু ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে বলে। দুধের বাটি ঢাকা দিয়ে এক জায়গায় আলাদা করে রাখা হলো। পরদিন ঢাকা খুলে দেখা গেলো, বাটির মধ্যে একটা বড়ো কচ্ছপ। পেটের মধ্যে ঐ কচ্ছপ গজালে মজুমদার মারা পড়তো। স্বামী তখন নিজেকে ধিক্কার দেয়। প্রতিজ্ঞা করে, সন্ধ্যের পর সে আর বাড়ীর বাইরে যাবে না।

নাপ্তে বৌয়ের সঙ্গে বসুমতী কথা বল্‌তে বল্‌তে দেখে, দূরে তার স্বামী

নিকুঞ্জ আস্‌ছে। নাপ্তে বৌকে বসুমতী আড়াল থেকে জামাইবাবুর ব্যবহার দেখতে বলে। বসুমতী ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকে। ঘরে এসে বসুমতীকে ঘুমোতে দেখে নিকুঞ্জ ভাবে, যাক্ আজ বকুনি থেকে রেহাই পাওয়া গেল। জুতো কাপড় ছাড়তে গিয়ে শব্দ হয়। শব্দ শুনে যেন ঘুম ভাঙলো—এই ভান দেখিয়ে বসুমতী উঠে বলে, 'কখন এলে?' স্বামী উত্তর দেয়—'অনেকক্ষণ।' তখন বসুমতী বলে, সে ঘুমোয় নি, ভান করেছিলো মাত্র। নিকুঞ্জ বলে, রাত তো বেশি হয় নি। স্ত্রী ঘড়ি দেখায়—দুটো। নিকুঞ্জ বলে—'ঘড়ি রং।' পরপর বলে, 'গরমী' ছিলো, তাই বাইরে ঘুরে বেড়া চ্ছলো। স্ত্রী ব্যঙ্গের স্বরে বলে, এই পৌষের রাত্রে! তখন স্বামী বলে, "ও পাড়ায় রক্ষাকালী পূজো হচ্চে, সেখানে যাত্রা শুনতে রাত বেশি হয়ে গেলো।" স্ত্রী মন্তব্য করে, রক্ষাকালী বুধবারে পুজো হয় না, অথচ আজ বুধবার। যাহোক যুক্তিতে হেরে শেষে বিছানায় উঠে আসতে যায়। বসুমতী স্বামীকে বিছানা ছুঁতে বারণ করে। স্বামী অশুদ্ধ অবস্থায় আছে। এমন সব অবস্থা ঘটছে, আর আড়াল থেকে নাপ্তে বৌ সবই দেখে। এবার সে ভালোভাবেই বুঝতে পারে বসুমতীর দুঃখটা কোথায়।

পরদিন নিকুঞ্জের অনুপস্থিতিতে দুজনে যুক্তি করে—কী করে নিকুঞ্জকে জব্দ করা যায়, সেই সঙ্গে শিক্ষাও দেওয়া যায়। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে শেষে বসুমতী নাপ্তে বৌকে পুরুষবেশ পরালো। মাথার চুল ঢাকবার জন্যে একটা পাগড়ী বেঁধে দেওয়া হলো। নকল গোঁফও নাপ্তে বৌয়ের নাকের তলায় শোভাবর্ধন করলো। ঘোষেদের বাড়ী সখের যাত্রা হয়েছিলো। তারা গোঁফটা ফেলে রেখেছিলো। ঘোষেদের বাড়ীর একটা বাচ্চা মেয়ে খেলা করতে করতে একবার এটা এনেছিলো। বসুমতীর সেটা মনে ছিলো। মেয়েটিকে বলে বসুমতী গোঁফটা জোগাড় করেছে। নাপ্তে বৌ যখন পুরুষবেশ পরে গোবর্ধন চট্টোপাধ্যায় সাজে তখন কে বল্‌বে এ মেয়ে! বসুমতী নাপ্তে বৌকে শিখিয়ে দেয়, পরস্ত্রীকে বশ করতে গেলে যে ভাবে 'কাব্যি' দিয়ে পুরুষ মানুষে আলাপ করে থাকে, সেভাবে আলাপ করতে হবে। 'কাব্যি দেওয়া কথা' রিহার্সাল দেওয়াতে গিয়ে নাপ্তে বৌ সেটা হাস্যকর ভাবে বিকৃত করে উচ্চারণ করে। তখন বসুমতী বাধ্য হয়ে সে চিন্তা ত্যাগ করে বলে, নাপ্তে বৌ মান করে থাকবার ভান দেখাবে এবং বসুমতী সাধাসাধি করবে।

যথা সময়ে নিকুঞ্জ এলো। যথারীতি রাতও সে অনেক করেছে।

জানালা দিয়ে সে লক্ষ্য করে—ঘরে আলো জ্বলছে। আতরের গন্ধ আসছে। বিছানায় গোলাপ ফুলের একটা মালা পড়ে আছে। যত্ন করে কতকগুলো পানও সাজা আছে। হঠাৎ চম্‌কে ওঠে—বসুমতীর সঙ্গে ও কে! পর পুরুষ!! ততক্ষণে বসুমতী অভিনয় সুরু করে দিয়েছে। নিকুঞ্জ দেখে, পুরুষটি মান করে আছে, আর বসুমতী তাকে সাধাসাধি করছে, বিছানায় বসতে বল্‌ছে। "ছিঃ ভাই. তুমি ম্লান বদনে থাক্‌লে, তোমার ম্লান বদন দেখ্‌লে আমার প্রাণটা কেমন করে।" পুরুষবেশী বলে,—"যাও আর তোমার কথায় কায নাই। যা বড ভালবাস তা জানি আমি।" বসুমতী তখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে দীর্ঘ আলাপে ভালবাসা জানায়। তারপর তাকে শয্যায় বসিয়ে নিজের হাতে পান খাওয়ায, এমন কি মালাটিও গলায পরায়। নিকুঞ্জ মনে মনে ফোঁসে, "কি, এত বড যোগ্যতা! পাপীয়সী কচ্যে কি? কি কু-প্রবৃত্তি অ্যা একটা পর পুরুষ ঘরে এনেছে। ওকে এখুনিই সংহার করবো। এদিকে পুরুষবেশী বলে, এ সব বসুমতী করচে, যদি তার স্বামী দেখে ফেলে। তখন বসুমতী উত্তর দেয়, স্বামী এটা জানেন। "আমার এই দিন এই কাল একাকিনী ঘরে ফেলে চিরদিন যখন আপনি বেরোন, তখন জান্তে আর কি বাকি আছে, অবশ্যই জানেন। তা ওকথা রেখে দেও, এস এটু আমোদ প্রমোদ কর, আমি ভাই তোমার কোলে এটু শুই।"

এবার নিকুঞ্জ আর থাকতে পারে না। লাফিয়ে ঘরে ঢুকে পডে। নাপ্তে বৌ তাডাতাডি লুকোয়। স্বামীর উত্তপ্ত জিজ্ঞাসায় বসুমতী বলে, কেউ এখানে আসে নি। শেষে কেঁদে বলে ওঠে,—"কেন! আমি কি মানুষ নই। আমার রক্তমাংসের শরীর না! আমার মন নাই। ইন্দ্রিয় নাই, সুখ দুঃখ নাই?"

হঠাৎ ঘরের কোণে পুরুষবেশী নাপ্তে বৌকে দেখে নিকুঞ্জ সঙ্গে সঙ্গে তাকে সজোরে চেপে ধরে। নাপ্তে বৌ তখন নিজের বেশ ধরে। নিকুঞ্জ হাত ছেড়ে দেয। নিকুঞ্জকে বসুমতী জানায় এ নাপ্তে বৌ—বাপের বাড়ী থেকে খবর নিতে এখানে এসেছে। নিকুঞ্জের চরম শিক্ষা হয়। নিকুঞ্জ ভাবে, পরপুরুষ দেখে তার মনে যেমন জ্বলুনি এসেছিলো, পরনারীর সঙ্গে তাকে ব্যভিচার করতে দেখে বসুমতীর মনে দিনের পর দিন এমন কত জ্বলুনি এসেছে। বসুমতীর জন্যে তার কষ্ট হয়। বসুমতী বলে, "এই নিমিত্ত কি করি ভেবে চিন্তে তোমাকে আজ এই চক্ষুদান দিলাম।"

আমি তো উন্মাদিনী (কলিকাতা ১৮৭৪ খৃঃ)—শ্রীনাথ চৌধুরী (হরিপুর, পাবনা) ॥ স্বামীর লাম্পট্য—দাম্পত্য অংশীদারের মনে) যে অশান্তি সৃষ্টি করে তার পরিণতি উন্মত্ততার মধ্যেও যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, প্রহসনকার তা দেখিয়েছেন। যৌন-বঞ্চনা মানসিক বিকৃতি আনে—এ সত্য মনোবিজ্ঞান সম্মত। অতএব এই উন্মত্ততার বাস্তব সমর্থন আছে।

কাহিনী।—বিধুভূষণ লম্পট এবং মাতাল। মালতী নামে তার এক রক্ষিতা আছে। দিনরাত তার কাছেই বিধু পড়ে থাকে। স্ত্রী বিদেশিনীর দুঃখের শেষ নেই। "যথার্থ বল্‌ছি। এ জ্বালার চেযে সাতজন্ম বিধবা হযে থাকা ভাল। আর সইতে পারিনে বোন্ আর সইতে পারিনে। সারাদিন উপোস করে থাকলেও কেউ বলে না যে, মুখে একটু জল দেও। কেবল একটু কোন কর্ম্মে ত্রুটি হলেই অম্‌নি তিরস্কারের সীমা থাকে না।"

গাঁযের দলাদলিতে বিধুভূষণ একজন মস্ত বড়ো পাণ্ডা। সে ব্রাহ্মণ হযেও শূদ্রের দলাদলির মধ্যেও মাথা গলায। প্রবাসী কিশোরীলাল এসব শুনে অবাক হযে জিজ্ঞাসা করে, "শূদ্রদের দলাদলিতে ব্রাহ্মণের ক্ষেপাক্ষেপি কেন ?... আপনারা তো আর শূদ্রের ঘরে খেতে যাবেন না।" বিধু উত্তর দেয়, "দলাদলি আর পদ্মার পাক, এ দুই সমান,—যে নিকটে আসে, সে-ই তার মধ্যে পড়ে। আমরা ওর এক পক্ষের নিকট শ তিনেক টাকা নিযে ওদের নিমন্ত্রণ করেছি, তাই ছোঁড়ারা ক্ষেপে উঠে বলে, যেমন ও পক্ষের নিকট শ তিনেক টাকা নিযে ওদের নিমন্ত্রণ কোরলেন, তেম্নি এ পক্ষের নিকটও টাকা নিযে এদের নিমন্ত্রণ করুন, তা আমরা করবো কেন ? এতেই ষণ্ডামার্কাগুলো ক্ষেপে উঠেছে। কালের স্বধর্ম্ম।।" এমন সময বিধুর চাকর রঘু এসে খবর দেয, বিধুর স্ত্রীর খুব জ্বর। বিধু মন্তব্য করে,—"বেটা জ্বরের খবর এনেছে, মরার খবর আনতে পারিস্ নি ?" কিশোরী যাওযার ঔচিত্য নিয়ে কিছু বল্‌তে গেলে বিধু চটে যায। বলে,—"বালক আসে বুড়োকে শিখাতে। কালের স্বধর্ম্ম !!"

দলাদলি শেষ করে অনেক রাত্রে বিধু খেতে আসে। বলে,—"ভাত কোথায় ঢাকা আছে। শিগ্‌গির খেয়ে যাব।" মালতীর কাছে তার না গেলে নয়। অন্ততঃ একদিনের জন্যে বিধুকে ঘরে থাকবার জন্যে বিদেশিনী অনুনয় করে। বিধু বলে,—"আমি তোমায় বিয়ে করেছি। যেমন বিয়ে করেছি, তেমনি খেতে পরতে দি, আর কি চাও ? বিদেশিনী তখন বলে,—

"তুমি যদি আমায় খেতে পরতে না দিয়ে বল তুই ভিক্ষা করে খা আর স্ত্রীর মত আমায় দেখ্, সেও আমার ভাল, কিন্তু অন্নবস্ত্র দিয়ে এমন করে জীয়ন্তে মারা কে সহ্য করতে পারে বল? লোকে নানা কটূক্তি করে। তাছাড়া তুমি বুড়ো হয়েছ, এখন এ ধরনের কাজ করা শোভা পায় না। যুবা বয়স হলেও হতো। বিধু মন্তব্য করে, "একটা মেয়ে মানুষ—সে এল আমাকে বুঝুতে—এমনি কালের স্বধর্ম !!"

বিদেশিনী বিধুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আগের পক্ষের দুটি মেয়ে আছে। তারা দুজনেই বিবাহিতা। তার বড়োটির জীবন বিড়ম্বিত। তার স্বামী হেমাঙ্গসুন্দর, মাতাল, লম্পট এবং গাঁজাখোর। সৌদামিনীর অবস্থাও বিদেশিনীর মতো।

হেমাঙ্গসুন্দর শ্বশুরের উপযুক্ত জামাই। শ্বশুর বাড়ী এসে শ্বশুরকে না দেখে হেমাঙ্গ বলে ওঠে,—"বেটা শ্বশুর গোয়াল খালি করে বুঝি মাঠে চরতে গেছে। বাবা ভাল মালতী পেয়েছ।" এমন সময় বিধু আসে। তাকে দেখে জামাই বলে,—"এস বাবা শ্বশুর! তোমার আছে মালতী, আমার আছে গাঁজা। বল দেখি কে বড লোক!" আড়াল থেকে চাকর শ্বশুরকে প্রণাম করবার জন্যে ইঙ্গিত দিলে হেমাঙ্গ বলে—"দুঃ শালা, তুই প্রণাম কর। ও 'তোর' শ্বশুর—আমার সেকেলে ইয়ার।" ছোটো জামাই রজনীকান্ত এখানে আসে। সে অত্যন্ত ভদ্র। তাকে দেখে হেমাঙ্গ বলে—"শ্বশুরের জামাই! তুমি সম্বন্ধী বিশেষ। তাইতেই তোমার প্রতি দেখিবামাত্রই বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়েছে।" বিধুর ভাই চন্দ্রভূষণ ভাবে,—দাদা না বুঝে মেয়েটার মাথা খেয়েছেন। (এর পর ২৫—৩২ পৃষ্ঠা ছিন্ন।)

এ সব দেখে (?) বিধুর মনে পরিবর্তন এসেছে সে বিদেশিনীর কাছে গিয়ে প্রেমোচ্ছ্বাস জানায়। বিদেশিনী চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তার অভিমান মেশানো প্রেম নিবেদন করে। বিধু সঙ্কল্প করে—সে মালতীর কাছে আর যাবে না। "কুহকিনী আমার মনুষ্যত্ব হরণ করেছিল, আর মুখ দেখ্‌ব না।"

হেমাঙ্গের স্ত্রী সৌদামিনী বাপের বাড়ীতেই ছিলেন। হেমাঙ্গ ভাবে সৌদামিনীর সঙ্গে সে আজ একটু আমোদ করবে। সে "দেহিপদপল্লবমুদারং" বলে সৌদামিনীর মান ভাঙাতে যায়। সৌদামিনীও মান করে বলে—সে এখন চন্দ্রাবলী গুণী গয়লানীর কাছেই থাকুক। স্থূলবুদ্ধি হেমাঙ্গ এ সব সূক্ষ্ম ব্যাপার বুঝতে না পেরে তাকে প্রহার করে। সৌদামিনী কাঁদতে কাঁদতে

চলে যায়। শুনে পাড়ার লোকে বলে,—ছিঃ ছিঃ! এখনকালে কি কেউ স্ত্রীকে মেরে থাকে? ও মা যাব কোথা?"

এদিকে হেমাঙ্গ পাড়ার সর্বত্র নিজের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বিধুভূষণের নাম ডোবায়। পাড়ার কেশববাবুর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন হবে। বাইরের বৈঠকখানায় অনেক ভদ্রলোক এসেছেন। হেমাঙ্গও ব্রাহ্মণ হিসেবে এসেছে। তাকে কেশববাবু আগে দেখেন নি। বলেন—"এটি কে" হেমাঙ্গ জবাব দেয় "এটি তোমার বাবা। এখন চিন্লে?" কেশব চম্‌কে ওঠেন,—"আঁ—এই পাত্রে ঐ লক্ষ্মী স্বরূপিণী কন্যা দান।" হেমাঙ্গ তখন বলে,—

'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন
গাই কি বলদ ল্যাজ তুলে দেখ নি।

এখন কেঁদে করবে কি? আগে বুঝতে পার নি? কন্যাদান করলে কেন? আমি কি সেধে নিইচি?" হেম' নাকি ন্যায়ভূষণ। তার পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে,—"গোরু চুরি হইতে বৈষ্ণব বন্দনা পর্যন্ত এঁরা তখন সকলে হেমাঙ্গের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন,—"ওর আর কিছু হবে না, ওর এখন হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ী দেওয়া বাকি।"

কেশববাবুর স্ত্রী কামিনী হাসতে হাসতে সৌদামিনীকে বলে, হেমাঙ্গের সর্বনাশ হয়েছে। কামিনীর কৌতুক ধরতে না পেরে সৌদামিনী ভাবে, হেমাঙ্গের বুঝি খারাপ কিছু হয়েছে। সে মূর্ছিত হয়। অনেক কষ্টে তার মূর্ছা যদিও বা ভাঙে, সে প্রলাপ বকতে সুরু করে। হেমাঙ্গের 'মেয়েমানুষ' গুলো গয়লানীকে সামনে কল্পনা করে সৌদামিনী সতীনের মত ঝগড়া করে। হেমাঙ্গের মনে অনুতাপ হয়। ভদ্রসমাজ ও পত্নীকে ত্যাগ করে সে এতোকাল ইতর সমাজে সহবাস ও বেশ্যার সহগমন করেছে। "আমি কুলীনের ছেলে, সুখভোগ কাহাকে বলে কখন তা জান্‌তেম না, মায়ের সহিত কুটীরে বাস করেছি, ক-অক্ষর মহামাংস তুল্য ছিল, "দৈবে সৌদামিনীর সহিত বে হওয়ায় অতুল সুখে সুখী হয়ে ছিলাম।" হঠাৎ সামনে দিয়ে সৌদামিনী উন্মাদিনী অবস্থায় "দেহিপদপল্লবমুদারং" গান গাইতে গাইতে যায়। হেমাঙ্গের অনুশোচনা হয়। মান ভাঙাবার নাম করে সে স্ত্রীকে একদা প্রহার করেছে এবং কতোখানি মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে। সে স্ত্রীর পেছন পেছন ছুটে গিয়ে বলে,—"প্রিয়ে, —দাঁড়াও দাঁড়াও—আমিও তোমার সঙ্গে এলেম।"

ছেড়ে দেনা কেঁদে বাঁচি (১৮৮১ খৃঃ)—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বেশ্যাসক্তি ও দুষ্ক্রিয়া মানুষকে যে বিপদ্ জালে জড়িয়ে ফেলে তার স্বরূপ উপলব্ধি করে মানুষ পরিত্রাণ কামনা করে। পরিণতিতে ভুবন আক্ষেপ করেছে—"হায়! হায়! আমার ইন্দ্রিয় দোষে অপমানের পরিসীমা রইলো না। আমি কত স্থানে কত রকমে এই ইন্দ্রিয় দোষে অপমানিত হয়েছি, তাহাতেও আমার চেতনা হয় নি।" অবশ্য লেখক বেশ্যাসক্তির ক্ষেত্রে সংস্কারকে অতিক্রম করেছেন।

কাহিনী।—আধুনিক বাবু সুরেন ধর্মের পণ্ডিত ভগবান ডোমের বিধবা কন্যা 'হরিমতির' সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। হরিমতি অবশ্য সুরেনকে ভালবাসে। ভুবনমোহন অন্য একজন আধুনিক বাবু। হরিমতির ওপর তারও চোখ পড়েছে। হরিমতির মা দয়া হরিমতির স্খলনের কথা জানে। কিন্তু অর্থলোভে এতে প্রশ্রয়ই দেয়। বরং হরিমতিকে বলে, সুরেনকে ছেড়ে বরং ভুবনকে হাত করতে। যখন এই পথে আসা তখন যাতে দশখানা সোনাদানা হয় তার চেষ্টা করা উচিত। হরি বলে, সুরেনের সঙ্গে তার মনের মিল আছে। অন্য কিছু তার প্রয়োজন নেই। দয়া চলে গেলে সুরেন আসে। সুরেন সব বুঝে হরির কাছে আক্ষেপ করে, তার টাকা পয়সা নেই, শুধু মন দিয়ে কি হবে। ভুবনবাবু বড়লোক,—হরি তারই হবে। সুরেন ভুবনের কাছে পাঁচ বছর চাকরী করছে, তাকে সে চেনে। হরি বলে,—ভুবনবাবুর দৃষ্টি যখন তার ওপর পড়েছে, এই সুযোগে টাকা পয়সা সোনাদানা সে আদায় করে নেবে এবং ভুবনকে জব্দও সে করবে। কি করে সাজা দেওয়া যায়—পরামর্শ চায় হরিমতি। সুরেন বলে, বাহিরে এসে বলবে।

ভগবান ডোমের বাড়ীর রাস্তা। ভুবনমোহন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবে, বাড়ীতে ঢুকবে কিনা। এমন সময় দয়া আসে। ভুবন তার হাতে দুই টাকা দিয়ে হরির সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে বললো। দয়া ডাকতে থাকে। হরি এসে ভুবনকে দেখে ঝগড়ার ভান করে। ভুবন তখন তাকে নানা কথায় শান্ত করে।

ভুবন চলে গেছে। হরি একা তার ঘরে সুরেনের জন্যে অপেক্ষা করছে। এমন সময় তার মা দয়া এসে তাকে বলে যে—ভুবনের কাছ থেকে সে যেন আগাম কিছু নিয়ে রাখে। আর সুরেনকে যেন আসতে না দেয়। এতে হরিমতি রেগে গিয়ে বলে, সুরেনের সঙ্গে তার মনের মিল হয়েছে। দয়া যদি

সুরেনকে কিছু বলে, তাহলে হরি গলায় দড়ি দেবে। দয়া যাবার আগে বার বার বলে যায়—সে যেন ভুবনকে যত্ন করে। দয়া চলে যাবার পর সুরেন আসে। সুরেন জানতে পারে ভুবন আজ আস্‌বে। সুরেন বলে, ভুবন আগে দশ টাকা মাইনের চাকর ছিলো। বড়লোকের অনুগ্রহে আর খোসামুদেগিরি করে তার টাকা হয়েছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঋণে তার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। আর যা কিছু আছে তা বেশ্যালয়ে খরচা করছে। যা হোক্ তারপর সুরেন আর হরিমতি পরামর্শ করে ঠিক করে যে, ভুবন যখন হরিকে দরজা খুলে দেবার জন্যে দড়ি ধরে টান্‌বে, তখন দড়ির সঙ্গে একটা বালিশ বাঁধা থাক্‌বে। বালিশ টেনে নিলে চোর বলে চেঁচিয়ে উঠবে। তারপর যথারীতি ভুবন আসে। সে বালিশের দড়ি ধরে টান দেয়। তখন সবাই চোর চোর বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

ভগবান ডোম স্বয়ং ভুবনকে মারতে আরম্ভ করে দেয়। ভুবন যখন বলে,—"আমি চোর নই," তখন ভগবান ডোমের ছেলে দুখীরাম বাবাকে পরীক্ষা করতে বলে এ মাতাল কিনা। ভুবন এদের পাঁচ টাকা দিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, এ ঘটনা যেন বাইরে প্রকাশ না করে এরা। সবাই চলে গেলে ভুবন বলে,—"আমার বয়সে এমন বপদে কখনো পড়ি নি।" এমন কর্ম আর সে করবে না—এই বলে ভুবন যখন চলে যাবার উপক্রম করছিলো, তখন হরি এসে বলে যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। হরি ভুবনকে শনিবারে আসতে বলে। ভুবন প্রথমে আসবেই না বলে। শেষে হরির আদর যত্নে শান্ত হয়ে কথা দেয়, শনিবারে সে আসবে। ভুবন চলে গেলে সুরেন এসে হরিকে বলে,—"শালা যেমন পাজি, তেমনি হোয়েছে, এখনও চ্যাংড়ি আরো জব্দ কোত্তে হবে।"

এদিকে ভুবনের কুসুম নামে এক রক্ষিতাও আছে। একদিন ভুবনমোহনকে কুসুম জানায় তার অম্বল হয়েছে। ওষুধের জন্যে কুড়ি টাকা লাগবে। ভুবনমোহন যদি টাকা দেয় ঠিক নচেৎ গহনা বিক্রি করে ওষুধ কিন্‌বে। কুসুম বলে, সে নিজে ভালোমানুষ বলেই ভুবন বেঁচে গেলো, নচেৎ অন্য কারো পাল্লায় পড়লে টেরটি সে পেতো। সে তলে তলে কতো কাণ্ড করতো, আর মুখে সতীত্ব ফলাতো। কুসুম যদি ঐ সকল করতে পারতো তবে টাকা রাখতে নাকি জায়গাই থাকতো না। এ সব শুনে ভুবন কুসুমকে কুড়ি টাকা দেয়। তারপর কুসুম ভুবনকে মনে করিয়ে দেয় যে, ভুবন কুসুমের জন্যে একটা বাড়ী কিনে দেবে বলেছিলো। ভুবন বলে,—"যখন দেবো বলেছি, তখন দেবোই।"

তারপর নেমন্তন্ন আছে বলে ভুবন চলে যায়। কুসুম মনে মনে ভাবে, এমনি করে খাবার আর পরবার মতো সংস্থান আর একখানা বাড়ী নিতে পারলে "ব্যাটাকে দূর কোরে দিয়ে পেসাকে (প্রসন্নকে) নিয়ে মাগভাতারের মত ঘরকন্না করবো"। ভুবনের রক্ষিতা হলেও কুসুম প্রসন্নর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় চালায়। ভুবন চলে গেলে প্রসন্ন গান গাইতে গাইতে আসে। কুসুম তাকে টাকা কয়টি দিয়ে বলে—ভুবন কোথায় নেমন্তন্নে গেলো—খোঁজ করতে। সেখানে তাকে নিয়ে যেতে হবে। প্রসন্ন বলে, ভুবন ভগবান ওস্তাদের মেয়ের কাছে গিয়েছে। কুসুম তখন বলে,—"আজ যদি ধোরতে পারি, কিছু টাকা আদায় হবে।" প্রসন্নকে কুসুম আন্তরিক ভাবেই ভালোবাসতো। যদিও প্রসন্ন কিছু দিতে পারতো না, তবুও। কুসুম তাকে বলতো,—

"যার সঙ্গে যার ভালবাসা, তার সঙ্গে তার কিসের আশা,
আর এক ব্যাটা দিবে টাকা গোলাম হবো তোর॥

ওদিকে স্বরেনের সঙ্গে হরিমতির ভালবাসাও কম নয়। স্বরেন মতলব ক'রে হরিকে বলে,—"আজ ভুবনকে নাকাল কোরতে হবে।" এমন সময় ভুবন সাড়া দিয়ে ঘরে ঢোকে। ঢোকবার আগেই স্বরেন পাশের ঘরে গিয়ে লুকোয়। ভুবন হরির ঘরে ঢুকে বলে, এই স্থানটা বিশেষ নিরাপদ নয়। তার ইচ্ছে অন্য একটা বাড়ীতে হরিমতিকে নিয়ে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবে। "আমরা রসিক লোক, কত নাচ্‌বো কত গাব। হরির কি দশা হবে।" হরি তখন তাকে মিষ্টি কথায় বশ করে তোলে। ভুবন তখন আনন্দে গান গায়।

"তোরে বুকের মাঝারে সদা রাখিব।
কোন শালাকে দেখিতে না দিব॥
নিকটে বসায়ে মাথা নোয়ায়ে,
চরণ তলে ভকতি দিব॥"

হরিমতি ভুবনকে ঘুঙুর পড়ে নাচতে বলে। তারপর ভুবন ঘোড়ার নাচ নাচতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করলে ভুবন বলে, সে গাধার নাচ ভালো নাচতে পারে। হরি তখন গাধার নাচই দেখ্‌তে চায়। ভুবন আনন্দে বলে,— "তুমি যদি শ্রীচরণে স্থান দাও তাহলে আমোদের চূড়ান্ত কোরবো, আমি যে কেমন রসিক তা জান্‌তে পারবে।" ভুবন হরিমতিকে তার পিঠে সওয়ার হতে বলে। এময় সময় স্বরেন ও কুসুম এসে ঘরে ঢোকে। স্বরেন হরিমতিকে

সরিয়ে নিজেই ভুবন-গাধার পিঠে বসে। কুসুম পায়ের চটী খুলে ভুবনের পেছনে মারতে সুরু করে দেয়। ভুবন ঘুঙুর খুলতে খুলতে বলে,—"তোর পায়ে পড়ি আর আমাকে মারিস্ নে, আমার ঘাট হয়েছে।" বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্যের ওপর তার ধিক্কার আসে। অনুশোচনাও হয় তার। সে আক্ষেপ করে বলে, —"আমি একটি আস্ত গাধা। আমার গাধা সাজা বাহুল্য মাত্র।" এইসব বলে নাক কাণ মলে নাকে খত দিয়ে ভুবন প্রতিজ্ঞা করলো,—"বাঁচিতে আর ইচ্ছা নাই, যদি বেঁচে থাকি, প্রাণ থাক্‌তে আর একাজ কোরবো না।" কুসুম বলে,—"একাজ আর কোত্তে হবে না, আমি তোকে বাড়ীতে নে গে কেটে আজই ফাঁসি যাব।" হরিমতি তাঁদের যাবার পথে বাধা দেয়। তখন ভুবন বলে—"আমার ঘাট হয়েছে—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

বিচিত্র অন্নপ্রাশন (কলিকাতা ১৮৮৯ খৃঃ)—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য॥ ললাট লিখনে গ্রন্থকার বলেছেন,—

"প্রেমদায় পিতৃশ্রাদ্ধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
বেশ্যাপুত্র অন্নপ্রাশন দিলেন জাঁকিয়ে।"

আর্থিক ক্ষেত্রে দৌর্নীতিক ব্যয় অথচ উচিত ব্যয়ে কুণ্ঠা ইত্যাদি সমাজগর্হিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হলেও বেশ্যাসক্তি এখানে প্রধান হওয়ায় এরই অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচীন হবে না—যদিও আর্থিক ক্ষেত্রেও এর উপস্থাপনের অবকাশ আছে॥

কাহিনী।—শিক্ষিত ব্রাহ্মণপুত্র হয়েও চারুবাবু বেশ্যাসক্ত। তিনি গোলাপী বেশ্যার বাড়ী যাতায়াত করেন এবং তার জন্যে যথেষ্ট খরচ করে আজ দীন অবস্থায় পৌছিয়েছেন। কিছুদিন আগে তাঁর বাপ মারা গেছেন। চারুবাবু চিন্তামণি চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় বসে বিমর্ষ হয়ে ভাবেন, কয়েকদিন পরই বাবার শ্রাদ্ধ—অথচ হাতে টাকা পয়সা নেই। সবই তিনি গোলাপীর পায়ে দিয়েছেন। হ্যাণ্ডনোটে টাকা নিতে কোথাও বাকী রাখেন নি। এমন কি অফিস থেকেও চার-পাঁচ হাজার টাকা ভেঙে খরচ করেছেন। এসব কথা ভাবছেন, এমন সময় খানসামা এসে গোলাপীর একটা চিঠি দেয়। চারুবাবু সেটা পড়ে আরো চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাতে গোলাপী লিখেছে, তার ছেলের অন্নপ্রাশন ২৫শে হবে এবং যথারীতি চারুকে কিছু দিতে হবে। কিন্তু

এদিকে যে ঠিক ঐ তারিখেই তার বাবার শ্রাদ্ধ। বিষম সঙ্কটে পড়েও শেষে তিনি খানসামাকে বল্‌লেন বলে দিতে যে তিনি সেখানে যাবেন।

এমন সময় অল্প মত্ত অবস্থায় নবীনবাবু এসে চারুবাবুর সংবাদ জান্‌তে চাইলেন। চারুবাবু বল্‌লেন—তিনি মহা সঙ্কটে পড়েছেন। তাঁর এক্ষুনি দশ হাজার খানেক টাকার দরকার। গোলাপী চিঠি দিয়েছে তার ছেলের অন্নপ্রাশন। তারিখটা পেছবার সাধ্য তাঁর নেই। স্বয়ং তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ পরে করলেও চল্‌তে পারে। নবীন বলেন, তিনি তাঁর টাকার যোগাড় করে দেবেন। তারপর যথারীতি ঝিকে মদ আনবার জন্যে আদেশ দেওয়া হলো। তর্কবাগীশ মহাশয়ও এসে পড়েন। তিনি এলে তাঁকে নিয়ে এঁরা নির্জন ঘরে বসে পরামর্শ করতে যান।

নির্জন ঘর। চারুবাবু, নবীনবাবু আর তর্কবাগীশ আলাপ-আলোচনা করছেন। তর্কবাগীশ চারুবাবুকে তাঁর পিতার শ্রাদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করলে, চারুবাবু বলেন, তিনি যা ব্যবস্থা করবেন তাই-ই হবে। টাকা যা লাগে তিনি দেবেন। এর মধ্যে ঝি মদ নিয়ে আসে। তিনজনে মিলে মদ খাওয়া আরম্ভ করে দেন। নবীনবাবু তর্কবাগীশকে বলেন, তিনি এমন একটা পরামর্শ দিয়ে ব্যবস্থা করুন যাতে গোলাপীর ছেলের অন্নপ্রাশনটা আগে হয়। টাকার লোভে তর্কবাগীশ তখন পাণ্ডিত্য জাহির করে বলেন যে পিতার শ্রাদ্ধ প্রকারান্তরে ভূতের শ্রাদ্ধ। বরং যশ বা খ্যাতিলাভের জন্যে অন্নপ্রাশনই আগে করা উচিত। চারু এতে তৃপ্ত হলেন। তারপর তর্কবাগীশকে বলেন যে, ২৫ তারিখে অন্নপ্রাশন, তর্কবাগীশ যেন সোনাগাছিতে আসেন। তর্কবাগীশ বল্‌লেন, শ্রাদ্ধের জন্যে নিমন্ত্রিত অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তিনিও যেতে পারেন। তর্কবাগীশ চলে গেলে নবীনবাবু এবং চারুবাবু সোনাগাছির দিকে চলেন অন্নপ্রাশনের জন্যে ব্যবস্থাদি করতে।

এদিকে তখন সোনাগাছিতে রাইমণি বাড়ীউলীর বাড়ীতে গোলাপীর ঘরে গোলাপী, রাইমণি, মোহিণী, কামিনী, দামিনী ইত্যাদি সবাই বসে আলাপ আলোচনা করছে। রাইমণি সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, চারুবাবুর তো পিতার শ্রাদ্ধ, তিনি কি আর আসবেন! গোলাপী তখন বলে যে, সে এমন করে চিঠি দিয়েছে যে চারুবাবু আসতে বাধ্য। সবাই অবাক্ হয়ে বলে,—সত্যিই গোলাপীর মোহিনী শক্তি আছে। সব বড়লোকই তাঁর কাছে ভেড়া হয়ে যায়। মোহিনী জিজ্ঞাসা করে, ছেলের অন্নপ্রাশনে বাবকে দিয়ে গোলাপী,

কতো টাকা খরচ করাবে। গোলাপী বলে, ১০ হাজারের তো কম নয়। লুঠ করতে হলে ভাণ্ডারই লুঠ করতে হয়। এমন সময় নবীন ও চারুবাবু আসেন। গোলাপী তাঁকে আদর করে বসায়, এবং চারুবাবুর পোষাকের অবস্থা দেখে দুঃখ করে। তারপর চারু গান গায়,—

"ভুলিতে কি পারি প্রাণ ও চাঁদ বদন। (তোমার)

দিবানিশি মমান্তরে তোমা করি দরশন ॥"—ইত্যাদি।

তারপর গোলাপীও গান গায়। নবীন করতালি দিয়ে ওঠেন। তারপর অন্নপ্রাশনে কি কি আনতে হবে জিজ্ঞাসা করেন। চারুবাবু ফর্দ করতে বলেন। চারু সকলের অনুরোধ রক্ষা করে ব্র্যাণ্ডি, লেমনেড, হাজার ডিস ফাউল, ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণী ঢুলি নাচ, গোলাপী ও ছেলের গয়নার জন্যে সোনা, খানসামার পোষাক পরিচ্ছদ, বাড়ীউলীর গয়না কাপড় ইত্যাদি মিলিয়ে মোট পাঁচ হাজার আট শত পনের টাকা খরচ করবেন। দশ হাজার টাকা থেকে এগুলো ছাড়া বাকীটুকু নগদ ক্যাশ হিসেবে তিনি গোলাপীকে দেবেন স্থির করেন।

অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান হবে। কামিনী, মোহিনী একে একে প্রবেশ করেন। নবীন সকলের সঙ্গে বাড়ীউলীর পরিচয় করিয়ে দেন। রাইমণি বলে, তাদের পদধূলিতে তার বাড়ী পবিত্র হলো। তারপর চারু সকলের অনুমতি নিয়ে অন্নপ্রাশনের মন্ত্র পড়তে সুরু করেন। পণ্ডিতরা পুত্রের নাম রাখেন শরচ্চন্দ্র এবং মাতৃকুলের উল্লেখ করেই মন্ত্র পড়েন। তারপর পিতৃকুলের পরিচয় জানতে চাইলে রাইমণি বিষম বিপদে পড়লেন। তিনি বল্লেন, ছেলের কোনো গোত্র হতে তো বাকী নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মেথর, ডোম, ধোপা নাপিত—সব গোত্রই লাভ হয়েছে। আর কোন্ কুলেরই বা পরিচয় দেবে। শেষে গোত্রের নাম "পাঁচ মেশালী" বলে উল্লেখ করা হয়। পণ্ডিতরা সখেদে অন্নপ্রাশন পর্ব শেষ করে দক্ষিণা চাইলেন। রাইমণি তখন জিজ্ঞাসা করে, চারুর কাছে কি আছে? চারু বলেন, তাঁর কাছে ঘড়ি আর আঙটি আছে। রাইমণি ঘড়ি চেয়ে নিয়ে মোহিনীকে আদেশ দেয় যে, রাইমণির সিন্দুকে এটা রেখে মোহিনী যেন সেখান থেকে দশ টাকা নিয়ে আসে। এমন সময় একজন বাউল আসে। বাউলের খরচার জন্যে রাইমণি চারুর কাছ থেকে আঙটিটা চায়। একই নিয়মে সে কিছু টাকা এনে বাউলকে দেয়। তারপর বিদ্যারত্ন, তর্কবাগীশ ইত্যাদি দক্ষিণা চাইলে রাইমণি চারুর স্তব করতে বলে, কেননা

ওঁরা আশার অতিরিক্ত দক্ষিণা পেতে পারেন। পণ্ডিতরা রাইমণির পরামর্শে চারুবাবুকে গিয়ে ধরেন। তাঁরা বলেন,—তাঁর পুত্র সামান্য পুত্র নয়। এই পুত্রই তাঁর বংশ উজ্জ্বল করবে। পিতৃ-মাতৃকুল পিণ্ড পাবে। চারুবাবুও বিদ্যা, বুদ্ধি, দানে মহৎ লোক। চারু তাদের চাটু বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে সবাইকে নগদ একশত টাকা এবং রূপোর কলসী এবং রাহা খরচ পঁচিশ টাকা করে দিয়ে বিদায় দিতে বলেন। অধ্যাপক ও পণ্ডিতরা আশীর্বাদ করে উচ্ছ্বসিতভাবে। এমন সময় ব্যস্তভাবে কামিনী এসে খবর দেয়—চারুবাবুর নামে ওয়ারেণ্ট এসেছে। এইদিকে কয়েকজন কনষ্টবল ও জমাদার আসছে। চারুবাবু তখন গোলাপীর কাছে ভয়ে ভয়ে পরামর্শ চায়—কোথায় যাবে। গোলাপী নীরসভাবে জানায়—সে এসবের কিছু জানে না।

চারজন কনষ্টেবল ও জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে মদনবাবু এসে চারুকে বলেন, তিনি কেন অফিস কামাই করছেন? অফিসের পাঁচ হাজার টাকাই বা কোথায় গেলো। চারুবাবু তখন মিনতি করে জানান, তিনি এর বিন্দুবিসর্গ জানেন না। মদনবাবু আসামীকে গ্রেফ্তার করবার জন্যে জমাদারকে আদেশ দেন। চারুবাবু তখন বলেন, তিনি কেমন করে যাবেন—আর মুখ দেখাবেনই বা কেমন করে। মদনবাবু বলেন—"যারে হীরের গহনা দিয়ে সাজিয়েছ, তাকে এখন রক্ষা কর্ত্তে বল।" চারুবাবু গোলাপীকে সাধাসাধি করেন রক্ষার উপায় করে দেবার জন্যে। গোলাপী বলে,—সে কোথাকার কে যে রক্ষা করবে। সে বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাক্। জমাদার এদিকে চারুবাবুকে প্রহার করতে করতে নিয়ে যায়। চারু বলে, আর তিনি এমন কাজ করবেন না! "আমি গোলাপের প্রেমে আবদ্ধ হয়ে যথা সর্ব্বস্ব হারিয়েছি, অফিসের ক্যাস ভেঙ্গে গোলাপের পাদপদ্ম পূজা করেছি। সময়ে অনেক বন্ধু পেয়েছিলাম। ...যার হাতে সর্ব্বস্ব দিলাম, যার জন্য পিতৃশ্রাদ্ধ জলাঞ্জলি দিলাম; সে আজ আমাকে চিন্তে পারলে না। বেশ্যাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে শেষে আমার এই হলো!" চারুবাবু সভ্যদের অনুরোধ করেন—তাঁর এসব দুর্দশা দেখে তাঁরা যেন সাবধান হন।

প্রধানতঃ বেশ্যা ও বেশ্যাসক্তিকে কেন্দ্র করে রচিত প্রহসনের সংখ্যা কম নয়। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই দুষ্প্রাপ্য। তবু এ ধরনের অন্যান্য যে কয়টি প্রহসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারা যায়, সেগুলোর পরিচয় নীচে দেওয়া হলো।—

বেশ্যা বিবরণ (১৮৬৯ খৃঃ)—তারিণীচরণ দাস ॥ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৪এর আইন সম্পর্কে অর্থাৎ Indian Contagious Disease Act No. XIV of 1868 সম্পর্কে জনমতকে প্রহসনে তুলে ধরা হয়েছে।

বাহবা চৌদ্দ আইন (১৮৬৯ খৃঃ)—The Contagious Disease Act বা সংক্রামক রোগ আইনের (পূর্বোক্ত প্রহসনের সম্পর্কে বর্ণিত) সুফল নিয়ে লেখা হয়েছে।

উদ্ভট নাটক (১৮৭০ খৃঃ)—মতিলাল মজুমদার ॥ বর্তমান হিন্দুসমাজের অনাচার নিয়ে লেখা। মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি ইত্যাদির কুফল দেখানো হয়েছে।

গিরিবালা (১৮৭১ খৃঃ)—কলকাতার বেশ্যাপল্লী, বেশ্যাসমাজ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে প্রহসনটি রচিত।

অমৃতে গরল (১৮৮৩ খৃঃ)—দিবাকান্ত রায় ॥ একজন লম্পট তার রক্ষিতার মুখে সর্বদা ভালবাসার কথা শুনে যত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো ততোই সে রক্ষিতার ওপর বেশি আকর্ষণ অনুভব করতো। একদিন সে বুঝতে পারলো রক্ষিতার সব কিছু প্রেমই ভাণ। রক্ষিতাটি নিজেই প্রকাশ করলো যে অর্থের জন্যেই সে তাকে ভালবাসবার ভাণ দেখায়। মনের দুঃখে লোকটি তখন আত্মহত্যা করে।

বড় বৌ বা ডাক্তার (১৮৮৪ খৃঃ)—প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় ॥ এক ব্যক্তি নিজের বিবাহিতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রক্ষিতার সহবাসে থাকতো। এক সময় রক্ষিতাটি লোকটির অনিষ্ট করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করে। লোকটির সাধ্বী স্ত্রী একথা জানতে পেরে নিজে ডাক্তার সেজে ঘটনাস্থলে এসে ষড়যন্ত্র বার্থ করে দেয়। এতে লোকটির চেতনা ফিরে আসে এবং সে বিপন্মুক্তও হয়।

এমন কর্ম আর করবো না (ঢাকা ১৮৮৬ খৃঃ)—হরিহর নন্দী ॥ তিনজন নব্যবাবু বেশ্যালয়ের কাছাকাছি এক শুঁড়িখানায় গিয়ে গণ্ডগোল জুড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর পুলিস এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। তারা প্রতিজ্ঞা করে, এমন কর্ম তারা আর কোনোদিনই করবে না।

কলির ছেলে প্রহসন (১৮৮৭ খৃঃ)—তিতুরাম দাস ॥ বিবাহিতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একটি যুবক রক্ষিতা-সর্বস্ব ছিলো। একদিন সে রক্ষিতার দাবী মেটাবার জন্যে নিজের স্ত্রী এবং মাকে মারধোর ক'রে তাঁদের কাছ থেকে দামী জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

সকলি শুখায় (১৮৯০ খৃঃ)—রমেশচন্দ্র নিয়োগী ॥ এক ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত, মদ্যপ এবং অত্যাচারী। লোকটি অবশেষে একজন উৎসাহী সাধুর প্রভাবে পড়ে। সাধু তাকে ভক্তিরহস্য শিক্ষা দেয়। শেষে দেখা যায়, লোকটি একজন হরিভক্ত এবং সৎলোক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর উপায় কি? (১৮৯২ খৃঃ)—মীর মশাররফ হোসেন ॥ একজন বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে ওদিকে মদ ও বেশ্যা নিয়ে রাত কাটাতো। একদিন সে হঠাৎ তার স্ত্রীর ঘরে একটি পরপুরুষ আবিষ্কার করে চটে ওঠে। তাকে মারতে গিয়ে শেষে বুঝতে পারে লোকটি আসলে পুরুষ বেশে তার শালী। শালী তাকে এই শিক্ষা দিতে এসেছে যে, তার স্ত্রীকে অপর পুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে দেখলে তার যেমন মনের অবস্থা হয়, তেমনি মনের অবস্থা হয় স্ত্রীরও—সে যদি দেখে তার স্বামী অপর স্ত্রীর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে।

ডুমুরের ফুল (১৮৯৮ খৃঃ)—কুসুমেষু কুমার মিত্র ॥ প্রহসনটি কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্সার সমষ্টি। প্রতারণা, মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি লিখিত হয়েছে। বাঙ্গালী জীবনের কতকগুলো বিশেষ দোষকে এতে তুলে ধরা হয়েছে। ঐ বৎসরের Calcutta Gazette এই প্রহসনটি সম্পর্কে লিখছেন,—"Cheats, drunkard, harlots. & C. figure largely among the characters. The fig tree, it is popularly believed, never flowers, so the expression the "flower of the fig" means the Bengali something which has no existence, or which is an impossibility. And the book is so named becaused, as is said in the prelude that those who will see the piece represented on board will realise an impossibility."

বেশ্যাসক্তিকে কেন্দ্র করে **বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি** (১৮৬৩ খৃঃ)—রাধামাধব হালদার, **দিল্লীকা লাড্ডু** (১৮৯৬ খৃঃ)—শরৎচন্দ্র দাস ইত্যাদি আরও অনেক প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থশেষে প্রদত্ত তালিকায় খুঁজলে আরও অনেক নাম মিলতে পারে ; তবে সেগুলোর পরিচয়হীনতায়, আনুমানিক ভাবে উপস্থাপনের কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণে বেশ্যাসক্তি বিভিন্ন অনাচারের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে। অনেকক্ষেত্রে যৌনেতর সমস্যাকে প্রহসনকার

তার দৃষ্টিকোণে চরম মূল্য দিয়েছেন। অতএব বেশ্যাসক্তি সম্পর্কিত প্রহসন যে শুধুমাত্র এগুলোর মধ্যেই সীমিত তা নয়। বস্তুতঃ বেশ্যাসক্তি বাংলা প্রহসনের একটি মুখ্য দৃষ্টিকোণ।

লাম্পট্য ॥—

আমি তোমারই (কলিকাতা ১৮৭৯ খৃঃ)—যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বেশ্যাসমাজ ছেড়ে স্ত্রীপক্ষীয় ক্ষেত্রদূষণ এবং ক্ষেত্রদূষণ প্রচেষ্টা যে গৃহস্থ সমাজে বিস্তারলাভ করেছে, তার সামাজিক ফলের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। পরিণতির মধ্যে লাম্পট্যবিরোধী দণ্ডদান ক্ষমতার অস্তিত্ব ও মহিমা প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে।

কাহিনী।—নটবর বাবু লম্পট। নিজের ঘর সংসার থাকতেও পাড়ার গৃহস্থ বৌ-ঝিদের ওপর তার নজর। সম্প্রতি সুশীলার ওপর তার নজর পড়েছে। সুশীলার স্বামী বিদেশে কোম্পানীতে কাজ পেয়েছে। ওখানকার আবহাওয়া দেখে এসে সুশীলাকে সে নিয়ে যাবে। বাড়ীতে সুশীলা একা। ইতিমধ্যে ঝি সুশীলাকে একটা চিঠি দেয়। পাড়ার ঘোষেদের নটবরবাবু তাকে প্রেমপত্র দিয়েছে। পত্রের মর্ম এই,—"তোমার মতন সুন্দরী যুবতী আর কাকেও দেখ্‌তে না পেয়ে তোমাকে এই চিঠিখানি লিখিলাম, অতএব তুমি যদি দয়া করে আমাকে আজ্‌গের মত অতিথ্‌সেবা (কর) তাহলে তোমার উপর যে কতই সন্তুষ্ট হই, তা বল্‌তে পারি না ; দেখ, হিন্দু-মহিলাগণের অতিথিসেবাই হচ্ছে প্রধান ধর্ম্ম।" নাপ্তে বৌ একথা শুনে বলে,—এর লজ্জা এখনো হয় নি। নিজের ভাদ্রবৌয়ের সঙ্গে অবৈধ সহবাস করে নটবর তার গর্ভ সঞ্চার করেছে ; এখন তাকে এক ভাড়াটে বাড়ীতে রেখেছে। পাড়ায় ওর নামে সর্বত্রই নিন্দে। এখন কি করে জব্দ করা যায় ? নাপ্তে বৌ একটা ফন্দি বার করে। নাপ্তে বৌ বলে, ঝি সুশীলা সাজুক, সুশীলা ঝি সাজুক, তারপর যথারীতি নটবর এলে ঝিই সুশীলা সেজে তার সঙ্গে অভিনয় করবে। ইতিমধ্যে নাপ্তে বৌ নিজেই নটবরের স্ত্রী সেজে সেখানে এসে দেখা দেবে।

যথাসময় সুশীলার বাড়ীতে নটবর এসে দেখা দেয়। ঝি সেজে সুশীলাই তাকে অভ্যর্থনা করে। তারপর সুশীলার সাজে সরলার কাছে নটবরকে বসিয়ে রেখে চলে যায়। বিধবা ঝি সরলা অনেকদিন পর ভালো গয়না সাড়ী পরে আনন্দ পায় এবং একটা বাবু পুরুষমানুষকে প্রেমিক পেয়ে মনের সাধ মিটিয়ে

প্রেমালাপ করে। যখন ঠিক চরম মুহূর্ত, তখন নাপ্তে বৌ নটবরের স্ত্রীর মতো গলা করে বাইরের থেকে হাঁক দেয় এবং দরজায় ধাক্কা দেয়। নটবর তার বিপদ বুঝতে পারে। অবশেষে কৌশল করছে—এই ভাণ দেখিয়ে সরলা নটবরকে থলে চাপা দিয়ে রাখে। নাপ্তে বৌ ঘরে ঢুকে নটবরের উদ্দেশে এক প্রস্থ গালাগালি দিয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চলে যায়। নটবর তখন আত্ম-প্রকাশ করে সরলার বুদ্ধির প্রশংসা করে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সরলার তুলনা করে সরলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। "ইচ্ছে করে এখনি তোমাকে একটা কাঁচের আলমারির ভেতরে রেখে তোমার চাঁদ বদনখানি দেখি।" আর স্ত্রী? "বেটি যেন ওর বাবাকালি ভাতার পেয়েছে; তাই অমনতরা করে বল্লে, ইচ্ছে করে এখনি ও মাগীর মুখে দুই নাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় নিয়ে ঘরকন্না করি……।" যাহোক, আর প্রেমালাপ হয় না—রসভঙ্গের পর। স্ত্রীর ভয়েই উদ্বেগ নিয়ে নটবর বাড়ী ফেরার উদ্যোগ করে। সরলা তাকে পরদিন আরও সকাল সকাল আসতে বলে।

পুকুর পাড়ের রাস্তা দিয়ে পরদিন ঝি সরলা তার নিজের বেশেই যাচ্ছিলো। নটবর তাকে ডেকে বলে, তার গিন্নির সঙ্গে সেখানে বসে আমোদ আহ্লাদ করাতে অনেক অসুবিধা আছে। তাছাড়া তার স্ত্রী এটা টের পেয়েছে। নটবর তাই সুশীলাকে বাগানে নিয়ে যেতে চায়। আজ যেন সুশীলা তার বাগানে আসে। বাগানের বৈঠকখানার চাবি আর কিছু টাকা হাতে দিয়ে দেয়। যদি সুশীলা আগে এসে পড়ে, এইজন্যে বৈঠকখানার চাবিটা দেয়।

দূর থেকে নটবরের স্ত্রী বিমলা লক্ষ্য করে, নটবর অন্য বাড়ীর এক ঝির সঙ্গে কথা বল্‌ছে। নটবরকে বিমলা হাড়ে হাড়েই চেনে। নটবরের উদ্দেশ্য সৎ নয় বুঝতে পেরে সে অপেক্ষা করে। নটবর চলে গেলে ঝির সঙ্গে আলাপ করে সবকিছু শুনে নেয়। অবজ্ঞা মিশিয়ে ঝি বিমলাকে বলে,—"উনি এইসব নিয়েই ত আছেন, অমুক লোকের ঝি-বৌটি দেখ্‌তে ভাল, তাদের বের কর্ব্বো, অমুক মেয়েমানুষ আমার গিন্নির মতন করে, তার কাছে দুবেলা যাব, শেষে সে যা বল্‌বে, তা না যোগাতে পাল্লে তার লাতি খাব, আবার কি সে ঐ যে কি একটা চাষা আছে তার সর্ব্বনাশ কর্ব্বো এই সবই ত তার স্বভাব, ও রকম লোকের মুখে ছাই; এমন তরো লোকদের জন্মাবার সময়ে মা বাপে কি নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পারি নি; কেনই বা এমন তরা জন্ম দিয়েছিলো।" বিমলা ঝির কাছ থেকে বৈঠকখানার

চাবিটা চেয়ে নেয়, আর মনে মনে একটা ফন্দি আঁটে। এদিকে ঝির মুখে এসব ব্যাপার শুনে সুশীলা আর নাপ্তে বৌ খুব খুসী হয়। যাক্ এবার নটবর আচ্ছা জব্দ হবে। সুশীলা মা কালির কাছে প্রার্থনা করে,—"মিন্‌সেটা যাতে জব্দ হয়। তার উপায় মা করুন ; এমন তরা লোক জব্দ না হলে পাড়ার ঝি বউয়ের টেক্‌বার যো নেই। মা কালী, এমন দিন তুমি কবে কর্ব্বে মা! মা! তোমার কালীঘাটে গিয়ে ষোল আনার পূজো দেবো, মা! তুমি এমনতরা লোকদের শীগ্‌গীর নাও মা, শীগ্‌গীর নাও।"

বাগানবাড়ীর বৈঠকখানা খুলে বিমলা আগে থেকেই বসে থাকে নটবরের জন্যে।—"আজ তার জচ্চুরী, বাটপাড়ি, গেরস্ত ঝি বোয়ের ওপর নজর দেওয়া সব ঘোচাব তবে ছাড়বো!" যথাসময়ে নটবর আসে। আবছা' অন্ধকারে একটি মেয়েমানুষ দেখে ভাবে, সুশীলা তাহলে এসে গেছে। কিন্তু ঝিকে তো কই আনে নি—একা কেন? তার পরেই তার মনে হয়—সুশীলা খুব চালাক। বেশি মজা লুটবার জন্যেই একা এসেছে। "আমরা দুজনে থাকলে যেমন মজাটা হবে, তা ঝি থাকলে কি তেমনি হবে!"

সুশীলা মনে ক'রে বিমলার গায়ে নটবর যেমনি হাত দিতে গিয়েছে, অমনি বিমলা নিজের স্বরূপ জানিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে চলে তার ক্ষুরধার জিভের অবিরাম চালনা। নটবর প্রথমে ঘাবড়ে যায়, কিছুটা ভয়ও পেয়ে যায়। তারপর স্ত্রীর ওপর রাগ বেড়ে উঠে। শেষে স্ত্রীকে বার বার পদাঘাত করে। পদাঘাত সহ্য করতে না পেরে বিমলার মৃত্যু হয়। বিমলাকে নিহত দেখে নটবরের মনে অনুশোচনা জাগে। "নিজ স্ত্রী অপেক্ষা এ ভুবনে আর আপনার কেহই নয়। দেখুন আমি যাদের বিশ্বাস কল্লেম শেষে তারা আমারই সর্বনাশ কল্লে।" মৃতদেহের মুখে চুমো খেয়ে নটবর বলে ওঠে—"আমি শপথ করে বলচি আমি তোমারই।"

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল (কলিকাতা ১৮৬৫ খৃঃ)—রামনারায়ণ তর্করত্ন ॥ লাম্পট্য প্রবৃত্তি মানুষকে তার সম্মান ও পদমর্যাদার প্রশ্ন ভুলিয়ে দেয়। লেখক যৌন এবং সাংস্কৃতিক—উভয় দিক থেকেই দৃষ্টিকোণ তুলে ধরতে চেয়েছেন। পূর্বোক্ত প্রহসনের মতো এই প্রহসনেও কাহিনীর পরিণতিতে লাম্পট্যবিরোধীর দণ্ডদান ক্ষমতার অস্তিত্ব ও মহিমা প্রচারের চেষ্টা আছে।

কাহিনী।—সুধীর কলকাতায় একটা চাকরী পাওয়ায় স্ত্রীকে প্রতিবেশী ভোলানাথের রক্ষণাবেক্ষণে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় রওনা হয়। ভোলানাথ সুধীরের বড়ো ভাইয়ের মতো এবং ধার্মিক বলেই সবাই জানে। তাই সুধীর অনেকটা আশ্বস্ত হয়। বাড়ীতে স্ত্রী সুমতি এবং দাসী 'মতের মা' থাকবে। মাঝে মাঝে ভোলানাথ খোঁজখবর নেবে—এই ব্যবস্থাই সুধীর করে গেলো।

অনেকদিন পর সুধীর দেশে ফেরে। তাকে ছেড়ে ভুলে থাকার জন্যে সুমতি মান করে। সুধীর বলে সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানেই থাকবে। তখন সুমতি বলে, "আমি তোমার চরিত্র ভাল জানি। তাই তোমাকে বিদেশে যেতে দিয়েছিলেম, নৈলে কি যেতে পারতে ?" প্রত্যুত্তরে সুধীর বলে যে সুমতির চরিত্র সেও ভালভাবে জানে বলেই, এভাবে তাকে ফেলে বিদেশে যেতে পেরেছে। সুমতি বলে, যেখানে স্ত্রীলোক অরক্ষিতা, সেখানে সে সুচরিত্রা হলেও দুষ্ট পুরুষে তাকে নষ্ট করতে পারে। সুধীর তখন বলে, যে নারী দুশ্চরিত্রা তাকে লৌহ শৃঙ্খলেও বেঁধে রাখা যায় না, আবার যে সুচরিত্রা, সে নিজের শৃঙ্খলেই নিজে সুরক্ষিতা। সুমতি হঠাৎ মুখ নীচু করে কেঁদে ফেলে। তার স্বামীর বার বার জিজ্ঞাসায় একে একে ঘটনা বলে যায়।

সুমতি বলে, ভোলানাথের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের মানে "ডাইনের কোলে পো সমর্পণ !" সুধীর যখন বিদেশে চলে যায়, ভোলানাথ "তখন যেন কতো আত্মীয়, আজ মিঠাই পাঠান, আসেন, যান, জিজ্ঞাসাবাদ করেন।" মাস খানেক পর একদিন মতের মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, "হে দেখ মতের মা, আমি যে এতটা কচ্চি, তা বৌ আমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন তো ?" মতের মা সরলভাবে বলে, "তা বাবু বাড়ী থেকে গেছেন, আপনি না করলে কে করবে ! বাবু সকল ভারই আপনাকে দিয়ে গেছেন। মতের মার শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করে ভোলানাথ বলে, বৌ যেন এটা বুঝে চলে। একদিন সুমতির বড় টাকার টানাটানি চলছিলো। তখন সে মতের মাকে ভোলানাথের কাছে টাকা ধার চাইতে পাঠায়। ভোলা বলে, "বৌ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, ধার কেন যত টাকা চান, অম্নি দিতে পারি।" ঘৃণায় লজ্জায় মতের মা পালিয়ে সুমতির কাছে এসে কাঁদতে থাকে। সুমতি ভাসুরের স্বরূপ চিনতে পারে। এইজন্যেই বুঝি এতদিন তার আসা যাওয়া, মাছ, মিঠাই দেওয়ার ধুম। তার পরের আর একটি ঘটনা। বাজারে মতের

মা, বাড়াতে একা সুমতি ; এমন সময় হঠাৎ ভোলানাথ এসে বলে, সুধীরের লক্ষ্ণৌতে একটা বড় চাকরী হয়েছে। বছর তিনেক সে এখানে আসতে পারবে না। সুধীর নাকি ভোলানাথকে চিঠি দিয়েছে। সুমতি যদি ভোলানাথকে গ্রহণ করে, তাহলে এ তিনবছর সুখে কাটাতে পারবে। কথা বলতে বলতে ভোলানাথ কাছে এগোয়। হাত ধরলে জাত যাবে, এই ভয়ে সুমতি বলে ওঠে,—সে এ প্রস্তাবে রাজী আছে, তবে এখন সে অসুস্থ। সুস্থ হলে তাকে ডাকবে।

সুমতি সব ঘটনা স্বামীকে জানিয়ে বলে, এমন অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তবে এ সব কথা যেন না রটে। সুধীর কথা দেয়, ভোলানাথকে সে শাস্তি দেবেই।

ভোলানাথ মুন্সেফের সেরেস্তাদার। কিন্তু মুন্সেফ নিজেও সুমতির ওপর কিছুদিন থেকে কুনজর দিচ্ছে, সে কথাও তখন সুমতি তার স্বামীকে জানায়। মুন্সেফ বয়সে বুড়ো। "এই তোমার দেশের মুন্সোব—ভূঁদো মিন্সের এই বয়েসে আবার আমার উপর চোখ পড়েচে।" প্রতিদিন কাছারি থেকে বাড়ী যাবার সময় নাকি ঐ খিড়কীর পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুমতি যখন ঘাটে যায়, তখন তাকে দেখে মুন্সেফ রঙ্গভঙ্গ তামাসা ইঙ্গিত করে। বুড়োর বাঁদরামি দেখে সুমতির হাসি পায়। এক দিন সে তার স্পর্ধা অতিক্রম করলো। মতের মাকে একদিন সে বলে—"ওরে তোর মা ঠাকরুণের সঙ্গে আমায় দেখা করিয়ে দিতে পারিস্, তোকে দশটাকা দেবো!" মতের মা তাকে কথা শুনিয়ে দিয়েছে। সে মুন্সেফ আছে নিজে আছে,—তাই বলে কি তাকে সে ভয় করে চল্‌বে?"

সুধীর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে ওদের বাড়ীতে এনে অপদস্থ করবে। তবে একটু কৌশলে। মতের মা মহা উৎসাহে তেলকালি তৈরি করে। সুমতিকে বলে, সে মতের মাকে দিয়ে দুজনকেই আজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করুক। মুন্সেফ আর ভোলা এদিকে নেমন্তন্নের চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। যাবার আগেই তারা সুমতির কাছে ভালো ভালো তত্ত্ব পাঠায়—সন্দেশ, শাড়ী, টাকা ইত্যাদি সাজিয়ে। অভিনয় সার্থক করে তোলবার জন্যে সুমতি এগুলো আর ফেরৎ পাঠায় না। তবে হালিশহুরে ঝাঁটা ঠিক করে রাখে।

প্রথমে আসে ভোলানাথ। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ভোলানাথকে

দেখে সুমতি আহ্লাদের ভাণ দেখিয়ে বলে ওঠে,—"ওলো মতের মা, দেখ্‌ছিস্‌ কি? একটু আদর অপেক্ষা কর্‌লো বস্‌তে বল্‌। আমার আজ অদেষ্ট সুপ্রসন্ন। ভোলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রেম নিবেদন করে। সে বলে, সেদিন সুমতি টাকা চাইলে, সে দিতে পারে নি, কেন না দুষ্ট মুন্সেফ তাকে টাকা দেয় নি। সে মুন্সেফের অধীনে কাজ করে, কি করবে! মতের মাকে ভোলা বাইরে পাহারা দিতে বলে। কেমন ভয় ভয় করছে। আসবার সময় আবার মুন্সেফের চাকর পেছু ডেকেছিলো।

নেপথ্যে পদশব্দ শুনে ভোলা জানতে পারলো মুন্সেফ আসছে। সুমতির পরামর্শে ভোলা বিছানার ধারে উপুড় হয়। তার ওপরে গদি চাপা দেওয়া হয়। ভোলার আবার হাঁপানি কাশি আছে। শরীর কাহিল। সুমতি বলে, এ ছাড়া আর উপায় নেই। মুন্সেফ ঘরে ঢুকে হাঁক দেয়, "কৈ হে ঘরের গিন্নি কোথা? এই একজন সকের চাকর এলো, একবার চেয়ে দেখ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" মতের মা তাকে অভ্যর্থনা করে বসায়। মতের মা মুন্সেফের সঙ্গে কথার প্যাচে উত্তর দিতে গিয়ে পারে না। তখন মুন্সেফ বলে,—"এ কি সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজী—তাই বলি, আমি এই বয়েসে কত কাপ্‌তান্‌ ভাসালেম। এই দুশ টাকা করে মাইনে পাই, কেবল এই কম্মেতেই আমার সব জায়।" সুমতি মুন্সেফকে দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে,—"মতের মা, এ কি ভাগ্যি যে আমার বাড়ী আজ মুন্সেব মোশার পাদধূলো পড়লো।" মুন্সেফকে উচু জায়গায় বসতে দেওয়া উচিত। ঘরে চেআর নেই। ঘডাঞ্চের ওপর যে গদিটা আছে, তাতে মুন্সেফকে বসতে বলে সুমতি। গদির তলায় ভোলানাথ ছিলো। মুন্সেফ বস্‌তেই ওঁক্‌ করে একটা শব্দ হলো। মুন্সেফ কারণ জিজ্ঞেস করলে সুমতি বলে, ঘড়াঞ্চে পুরোনো সেই জন্যে শব্দটা হয়েছে। মতের মা টিপ্পনি কাটে,—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গতরে ভুঁড়িতে মুন্সেফের ওজন তো কম নয়। মুন্সেফ সুমতিকে নিয়ে গদির ওপর একত্র বসতে চাইলে, সুমতি বলে,—সে একত্র বস্‌বার যুগ্যি নয়। মুন্সেফের পায়ের কাছে সে বসে। মুন্সেফ মনে মনে ভাবে, "আহা মেয়ে মানুষটে কি শায়েস্তা!" মুন্সেফ বেসুরো গলায় হাস্যকরভাবে দুয়েকটা প্রেমের গান শোনায়। তার পর নিজের গানের নিজেই প্রশংসা করে। এতে নাকি অনেক "অনুপ্রয়াস" আছে। "অনুপ্রয়াস" বা অনুপ্রাস অলঙ্কার বোঝাতে গিয়ে সে বলে, "এই একজাতি কতগুলি শব্দ একত্রে থাকলে তাকেই বলে অনুপ্রয়াস। 'কোথা কাঁথা মাতা ব্যথা'—বুঝলে

তো? আর এতেই কবিদের গুণপনা।" সুমতি মতের মাকে বাইরে পাঠায় পাহারা দেবার জন্যে। মুন্সেফ ভাবে, গিন্নি একে রসিকা, তার ওপর বুদ্ধিমতী।

হঠাৎ মতের মা ছুটতে ছুটতে এসে বলে, "সর্বনাশ! বাবু আসছেন!" মুন্সেফ খবর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সুমতির পরামর্শে মুন্সেফ একটা খালি বস্তার মধ্যে বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে ঢোকে। মাথাটা শুধু বের করে রেখে মতের মা বস্তাটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়। মাথার ওপর মাছের একটা চুপ্‌ড়ি চাপা দিয়ে রাখে। অন্ধকারে বোঝা যাবে না।

সুধীর এসে ঘরে ঢুকে সাধারণ আলাপ করতে করতে হঠাৎ গদির মধ্যে থেকে ভোলানাথের কাশির আওয়াজ পেলো। সুমতি বলে, বোধ হয় চোর এসেছে। চোর খুঁজতে খুঁজতে সুধীর খাটের তলায় সন্দেশ কাপড় ইত্যাদি দেখে স্ত্রীকে প্রশ্ন করলে সুমতি বলে, বোধ হয় চোর এনে থাকবে। সুধীর লাঠি হাতে ঘরে ঘরে খোজবার ভাণ দেখায়। তার পর মতের মাকে গদি তুলতে বলে। মতের মা গদি তোলে। তখন ভোলা পালাতে চেষ্টা করে। সুধীর তাকে চোর বলে চেপে ধরে। অন্ধকার, চোরের মুখ দেখা যায় না। প্রদীপ আনিয়ে দেখে—চোর নয় ভোলানাথ! কিন্তু এখানে কি করে এলো। ভোলানাথ বলে, "আমি—তাই তো—কেন যে এলেম, আমি ভুলে গেছি!" সুধীর ভোলানাথকে যতই ভদ্রতা করে সম্মান দেখায়, ভোলানাথ ততই লজ্জা পায়। এদিকে মতের মা একটু একটু করে বলে যায়—ভোলানাথ একটু আগে কি বলেছে। ভোলানাথ আরো লজ্জা পায়। এদিকে পালাতে গিয়ে চালের বস্তা অর্থাৎ মুন্সেফের বস্তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভোলানাথ ব্যর্থ হয়। এদিকে বস্তাটা গড়াগড়ি যায়। ঘরের মাঝখানে এমন একটা বস্তা দেখে সুধীর জিজ্ঞেস করে, এতে কী আছে? তারপর প্রদীপ হাতে নিয়ে কাছে এসে দেখে মুন্সেফ স্বয়ং। তখনো মুন্সেফের মাথার ওপর মাছের চুপ্‌ড়ি! সুধীর বিদ্রূপ করে বলে, আজকাল বুঝি কুঠিতে এমন পাগড়ি পরতে হয়! মুন্সেফ খুব লজ্জা পায়। সুধীর তাকে ধিক্কার দিয়ে বলে,—"ছিঃ মুন্সোব মোশাই, আপনি হাকিম, আপনার কি এ কর্ম্ম উচিত? আপনি দেশহিতৈষী, মান্য, এমন বিদ্বান্‌, এমন গুণবান্‌—।" সুমতি টিপ্পনি দেয়,—"ঠিক বলেছো, তা মুন্সোব মোশাই যেমন গুণবান্‌ আমিও তেমনি গুণে ওঁকে বদ্ধ করে রেখেছি।" সুধীর ভয় দেখায়—মুন্সেফকে থানায় নিয়ে যাবে। মুন্সেফ তখন পায়ে ধরে বলে,

তাকে বরং মেরে ফেলুক। পাঁচজনের সামনে মান ইজ্জৎ হারানোর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। সুধীর তখন মতের মাকে দিয়ে মুন্সেফের মুখে গালে চুণকালি মাখায়। সুধীর বলে, মুন্সেফ হাকিম, সেকালের শাস্তির ব্যাপার ভালোই জানে সে। অবশ্য শাস্তি যা কিছু তা ঘরের মধ্যেই হবে। মুন্সেফের মাথায় চুপ্‌ড়ি চাপা দিয়ে বলা হয় এটা তার টুপী। তারপর গাধার পিঠে চড়াতে হবে। সুধীর বলে, ভোলানাথের মতো গাধা ভূ-ভারতে নেই। সে হামাগুড়ি দিক। মুন্সেফ তার ওপর বস্‌বে। হাঁপানি রোগী ভোলা বিরাটবপু মুন্সেফকে পিঠে নেয়। সুধীরের আদেশে দু-একবার গাধার ডাকও ডাকে। মুন্সেফকে পিঠে নিয়ে ভোলা ঘরময় হামাগুড়ি দেয়। মতের মা পেছন পেছনে কুলো বাজায়। উৎসাহের আতিশয্যে মতের মা হঠাৎ পা দিয়ে ভোলানাথের পেছনের পায়ে লাথি মারে। সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথ চিৎ হয়ে পড়ে আর ভুঁড়েল মুন্সেফ ভূঁই কুম্‌ড়োর মতো মেঝেতে গড়াগড়ি যায়।

এঁরাই আবার বড়লোক! (কলিকাতা—১৮৬৭ খৃঃ)—নিমাইচাঁদ শীল॥ কলকাতার ধনীদের মতো পাড়াগাঁয়ের ধনী—বিশেষ করে যাঁরা জমিদার—তাঁদের মানসম্মান, বিলাসব্যসন ও দুর্নীতিতে অর্থনিয়োগের যে ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যায়, প্রহসনকার তার বিরুদ্ধে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করেছেন। এগুলো মূলতঃ যৌন সমস্যাকেই তীব্র করে তুলেছিলো। সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক দিক থেকে দৃষ্টিকোণের প্রতিষ্ঠা থাকলেও যৌন দিকে উপস্থাপনই যুক্তিসঙ্গত। 'বড়লোক' এর প্রতি সাধারণভাবে যে শ্রদ্ধা জন্ম নেন, তাকে বিবেচনার অধীন বলে লেখক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কুকর্ম মানুষকে অশ্রদ্ধেয় করে তোলে—এই বিচার সাধারণ সংস্কারকেও অতিক্রম করতে সক্ষম। লাম্পট্যবৃত্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সাধারণ সংস্কার অতিক্রমনের সামর্থ্য বহন করে, নামকরণের মধ্যে লেখক তা প্রচার করতে চেয়েছেন।

কাহিনী।—রাজাবাবু পল্লীগ্রামের একজন বিশিষ্ট ধনী। তাঁর অনেক দান আছে। গ্রামে এডেড্ স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি ছাড়াও বাইরের বড়ো বড়ো চাঁদার খাতায় তাঁর নাম আছে। কলকাতায় বড়োলোকদের সঙ্গে তিনি প্রতিযোগিতা করে চলেন। কিন্তু সবকিছু দানের পেছনে আছে নাম কেনবার সখ। তাছাড়া তাঁর মদ ও নারী-দোষও আছে। তাঁর উপযুক্ত

সঙ্গী ডাক্তার জয়কুমার আর মাস্টার কৃষ্ণকিশোর। ডাক্তার বলে, "আমার ডাক্তারি সাজ আর খুল্‌বো না, বড়মানুষদের অন্দরে আমাকে সতর্ক হতে হবে। কুলীনকন্যা অসতী বামার সম্পর্কে সে বলে,—"ধন্যরে কুলীনের মেয়ের সতীত্ব! ওর যে আবার মূল্য আছে তা স্বপ্নেও জানতেম না।" বামার সঙ্গে অবৈধ সংযোগ স্থাপিত হবার পর বামা একদিন তাকে "উষাহরণ" করতে বলেছে! আবার মাস্টার কৃষ্ণকিশোরও তেমনি। সে বলে,—"ডেপুটিবাবুর বেতন দু'শ, আর আমার এক শ, কিন্তু বুদ্ধির জোরে আমি তিনটি ডেপুটি। জমিদারের এডেড স্কুল না হলে সুখ নাই। আমি বাবুর নামে চাঁদা সই করেও দস্তুরি নিই।" ইন্‌স্পেকটার ষ্ট্রিক্‌ট হলেও তাঁকে জয়কুমার ভয় খায় না। "আমার কলমের জোরে আর গোঁজলেশ্বরীর জয় জয়কারে, যে হিসাব প্রস্তুত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে মুচ্ছুদ্দী ভায়াদেরই চক্ষুঃস্থির হয়, তা আবার স্কুল ইন্স্পেক্‌টর।"

এরা পাড়াগাঁয়ে ব্রাহ্মসমাজও করেছে। সমাজে এরা নিয়মিত যাতায়াত করে থাকে, অথচ মদ্যপান লাম্পট্য এদের অবাধভাবে চলে। একদিন কৃষ্ণকিশোর মদ্যপান করছিলো, সেই সময়ে সমাজের একজন নতুন সভ্য একটু প্রসাদ চায়। কৃষ্ণকিশোর বলে, মতিরাম বৈষ্ণবের সন্তান। —এতোদিন তো খেতো না। তাছাড়া সে ব্রাহ্মসমাজে যখন যায়, এটা কি দোষ নয়? মতিরাম বলে, পিতা বারণ করেছিলেন বলে সে এতোদিন খায় নি, কিন্তু সমাজের লোক হয়ে কৃষ্ণকিশোর যখন খাচ্ছে, তখন খেলে দোষ কি? কৃষ্ণকিশোর জবাব দেয়,—"আমাকে তো শ্রোতাদের সঙ্গে বসতে হবে না যে গন্ধ পাবেন। একাকী বেদীতে বসে সে বেদ পাঠ করবো। সে সভায় আমার উপর কথা বল্‌বে না কেউ।"

স্বয়ং রাজাবাবু মদ্যপান ও নারীদোষে সবার উপরে চলেন। নিজের সুন্দরী স্ত্রী নির্মলা ঘরে থাক্‌তেও তিনি তাঁর জ্ঞাতির বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে নষ্ট। ঘরে বসে তিনি সর্বদাই মদ্যপান করেন। একদিন কৃষ্ণকিশোর শশিমালা নামে এক বিধবা সুন্দরী কুলীন কন্যাকে এনে রাজাবাবুর সামনে হাজির করে। বিধবার একটি শিশুপুত্রও আছে। সে এসেছিলো—খাজনা মাফের জন্যে। কৃষ্ণকিশোর তাই তাকে রাজাবাবুর কাছে এনেছে। শশিমালা, বলে, রাজাবাবু তো অনেক জায়গায় মোটা চাঁদা দিচ্ছেন, তার সামান্য বাকী খাজনা নয় টাকা তিনি যদি মাফ করে দেন, তাহলে সে খুব উপকৃত

হয়! সে একান্ত নিঃসহায়া। রাজা তার দিকে বারবার চেয়ে দেখেন। ভিক্ষার স্বর না অনুরাগের স্বর—সেটা তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর বল্‌লেন,—"খাজনার টাকা ছাড়া যাবে না, পেটে খেতে না পাও, আমার অন্নসত্রে খাও না, ঘর বেচে খাজনা দাও, বেশ টুক্‌টুকে ছবির মত চেহারা, বেশ্যাবৃত্তি করয়ে কেন রাজার খাজনা দাও না? কি ছার ন টাকা, ন'শ টাকা দিয়ে কত লোক তোমার চরণ ধরতে পারে।" তারপর বলেন, "তুমি চাঁদার কথা বুঝবে না। সে চাঁদা সাহেবদের দিতে হয়, জমিদারীর প্রজাদের নয়।" শশিমালা মনে মনে খেদ করে বলে,—"আমি লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে এই চণ্ডালের কাছে এলাম। এই সব কাপুরুষদের হাতে পড়ে প্রজাগণ যাতনা ভোগ করিতেছে। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট।"

নবকুমার ও হরিহর ভদ্রলোক এবং সত্যিকারের দেশহিতৈষী। এরা বিধবাবিবাহের সমর্থক। কুলীনরা যেমন অনেক বিয়ে করে, তেমনি বিধবা-বিবাহ না হলে অনেক মেয়ের ভাগ্যে এমন দুর্দশা আসে। এমন সময় শশিমালার একটা চিঠি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। ন টাকা খাজনা মাফের জন্যে যে রাজাবাবুর কাছে গিয়েছিলো, সেই শশিমালার। চিঠিতে সে জানিয়েছে—"আপনি অবলাকুলের প্রতি দয়াবান্। আমি বিপদগ্রস্ত। আমি অবলা, কুলকামিনী, বিধবা, দুঃখীনী, নিরাশ্রয়া, আবার রূপবতী এবং কুলীনের মেয়ে। আমি এ পর্যন্ত সতীত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। একটি দুগ্ধপোষ্য পুত্র আছে। আমি নিরাশ্রয়া, আমাকে রক্ষা করুন। আমার সতীত্বনাশের চেষ্টা হইতেছে। অনেক যত্নে লেখাপড়া করিয়াছি। এই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইলে লেখাপড়া শেখার সার্থকতা জানিতে পারিব।" নব এবং হরিহর কি করবে, চিন্তা করে এমন সময় একটা অঘটন হয়ে যায়। এরা একদিন রাজাবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে কুলীনের মেয়ের দুর্দশার প্রমাণ জানতে চেয়েছিলেন। তাই রাজাবাবু গাড়ীতে করে একটি মূর্ছিতা কুলীনের কন্যাকে নববাবুর বাগানে ফেলে গেলেন। সঙ্গে বামা এসেছিলো, সে তাদের এই কথা বলে পালায়। সহিসও পালায়। নব ও হরিহর মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখে মেয়েটি মৃতা। রাজাবাবু এবং জয় ডাক্তারের লোলুপতা শেষে মেয়েটির এই পরিণতি এনেছে। জয়কুমারকে পরীক্ষা করবার জন্যে এরা কল্ দেয়। জয়কুমার এসে মৃতার নাড়ী পরীক্ষা করে বলে,—এমন কেস সে অনেকদিন আগে একবার পেয়েছিলো। অন্য ডাক্তার এই রোগের সুরাহা করতে পারে নি।

একমাত্র জয় ডাক্তারই সারাতে পেরেছে। নববাবু তখন জয় ডাক্তারকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তাড়িয়ে দিয়ে মৃতার সৎকারের ব্যবস্থা করে। কথাপ্রসঙ্গে এরা কৃষ্ণকিশোরের একটা মজার ব্যাপার বলাবলি করে। কৃষ্ণকিশোর স্কুলের টাকা চুরি করেছিলো। ইন্‌স্পেক্‌টর সুখনাশবাবু তাকে ধরতে এলে কৃষ্ণকিশোর তাকে নিজের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যায়। মাস্টারের স্ত্রী সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। তাছাড়া মাস্টারের উপযুক্ত সহধর্মিণী। সে বলে স্কুলের টাকায় তার এই সব অলঙ্কার হয়েছে। তিনি যদি বিবেচনা করেন, তাহ'লে এসব খুলে নিন। সুন্দরীর কাছে ইন্‌স্পেক্‌টরের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সে চলে যায়। কিন্তু এহেন স্ত্রীও একদিন কৃষ্ণকুমারকে ছেড়ে পালিয়ে যায় অন্যের সঙ্গে। নবকুমার আর হরিহর দুজনে মিলে অনেক কথা আলোচনা করে। ব্রাহ্মসমাজের নতুন সভ্য মতিরাম নবকুমারের কাছে ধরে—তাদের প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয়ে যদি একটা চাকরী পায়। মতিরাম নববাবুদের কাছে বলে যে সে তিন বছর নর্মাল স্কুলে পড়েছে। বলা বাহুল্য, মতিরামের মতলব ভালো ছিলো না। এরা মতিরামকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। তখন প্রতিশোধ নেবে বলে মতিরাম চলে যায়।

রাজাবাবু অন্দরমহলে বিধবা বড় বৌকে নিজের বৌ সম্পর্কে বলেন,—"সে বিয়ে করা স্ত্রী বই তো নয়! টাকা দিয়ে কেনা, পিতার দেওয়া গলায় ফাঁসি। আর তুমি আমার মাথার মণি।" কথা প্রসঙ্গে মেয়েদের নাইটস্কুলের কথা ওঠে। বড়বৌ বলে,—"শুনতে পাচ্চি রাত্তে নাকি স্কুল হবে। মেয়েরা পড়তে যাবে। এইরূপ কিছু যুবতী যদি জোটে তবে কুলের দফা শেষ হয়। তারা কি কুলীন ব্রাহ্মণ, মাগ নিয়ে ঘর করে নি কখন? এমন বোকা কে আছে যে ১৬ বছরের মাগকে রাতের স্কুলে পাঠায়। তারপর রাজাবাবু আর বড়বৌ মদ্য পান করে। রাজাবাবু হাসতে হাসতে বলে, "তোমাকে সেদিন জল বলে একটু মদ খাইয়েছি বলেই, আজ এতো সুখ সাগরে ভাসছি!" প্রেমালাপ চল্‌ছে—এই সময় অন্তরাল থেকে রাজাবাবুর স্ত্রী নির্মলা এসব দেখে কাঁদতে আরম্ভ করে। "আমার চোখে এখন ঘুম নাই। এতদিনে আমি জীবনের সর্বস্ব ধনে বঞ্চিত হইলাম। কোন্ নিষ্ঠুর পাপীয়সী আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিল।" রাজাবাবু ও বড়বৌ কান্না শুনতে পান। রাজাবাবু মন্তব্য করেন, "ও কাঁদুক গে।" তারপর বড়বৌকে মদ খাওয়াতে খাওয়াতে বলে, "বদন সুধাকরটি শুকিয়ে রয়েছে একটু অমৃত ঢেলে দিই।" রাজাবাবুর বড় বোন্ শ্যামা নির্মলাকে

ভালবাসে। সে রাজাবাবুর এসব কুকীর্তি দেখে মন্তব্য করে,—"দিনের বেলা যে দেশের ভাল করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়, অবলাদের কিসে ভাল হবে, চিন্তাতে ঘুম হয় না, সে আপনার ঘরের বিধবার এই দশা ঘটায়!"

সতীত্বনাশের ভয়ে ভীতা শশিমালা হরিহরদের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলো। এদিকে রাত্রে তার ঘুম হয় না। সর্বদা তার ভয়। কত দুঃখী রূপসী নারী হওয়ার অপরাধে সতীত্ব হারিয়েছে। শেষে কাঁদতে কাঁদতে শশিমালা নিজের চুল সব কেটে ফেলে। যাতে তাকে মেয়ে বলে চিনতে না পারে। চুল হারালে মেয়েদের অনেকখানি রূপ নষ্ট হয়ে যায়! অতএব ভয়ের কোনো কারণ নেই। শশিমালাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে ক্ষমা নামে একটি মেয়ে। সে তাকে সান্ত্বনা দেয়। নিদ্রিত পুত্রের মুখ চুম্বন করতে করতে শশিমালা ঘুমোবার উদ্যোগ করে। এমন সময়ে চুপি চুপি জয় ডাক্তার আসে। শশিমালাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে সে তাকে আরো অচেতন করবার জন্যে ওষুধ শোঁকাতে যায়। কিন্তু ফল হয় উল্টো। সে ওষুধ তার নিজের নাকে গিয়ে নিজেই অজ্ঞান হয়ে যায়। ইতিমধ্যে শশিমালা জেগে উঠে জয় ডাক্তারকে দেখে চীৎকার করে ওঠে। ক্ষমা ছুটে আসে। সে বুঝতে পারে জয় ডাক্তার আরকের শিশি নিয়ে শশিমালার ধর্ম নষ্ট করতে এসেছিলো। জয় ডাক্তারের ওপর ক্ষমার রাগ ছিলো। একদিন ক্ষমা তার কাছে পুরোনো জ্বর দেখাতে গিয়েছিলো। তখন ডাক্তার ছিলো ঘোর মাতাল। সে ক্ষমাকে ধরে তার দাঁত তুলে দিয়েছিলো। রক্তাক্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা নবকুমারদের কাছে তার সব কিছু জানিয়েছিলো। এবার ক্ষমা ডাক্তারকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে ডাক্তারের দাঁত কয়েকটা ভেঙে নিয়ে দাঁত তোলার প্রতিশোধ নিলো। এতোদিনে ডাক্তার উপযুক্ত শিক্ষা পেলো।

ক্ষমার ঝাঁটা খেয়ে ডাক্তার দেশ ছাড়া হয়েছে। মাষ্টারও পালিয়েছে, সেইসঙ্গে স্কুলটাও উঠে গেছে। রাজাবাবুর বৈঠকখানা এখন নরককুণ্ড। বিশ্রী গন্ধে ঘর ভরে আছে। নিমলা কাঁদে আর বলে,, সে পতিভক্তির এই ফল পেলো! ছেলেকে নির্মলা রাজপুত্র বলে আদর করতো. কিন্তু সে ছেলে এখন ভিখারীর ছেলের মত হয়েছে। নিজেকে আর রাজরাণী বলে গর্ব অনুভব করে না সে। এমন সময় বোতল হাতে রাজাবাবু এসে শয়নাগারে ঢোকেন। তিনি বলেন,—"তোর বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে। ঘরের কথা পরকে বলিস্। তুই আমার কেনা গোলাম।"—এই বলে তিনি নির্মলার মাথায়

বোতলের বাড়ি মারলেন। রাজাবাবুর বোন শ্যামা আক্ষেপ করে বলে,—"হায়রে মদ! তুমিই ধন্য! তুমি কি শুভক্ষণেই এদেশে পা বাড়িয়েছিলে।" রাজা তখন, তাকে নরবলি দেবেন বলে প্রস্থান করেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে নির্মলা বলে—"আমার কপালে এই ছিল। যাহার কাছে জীবন সমর্পণ করেছিলাম, তাহার হাতে আমার মৃত্যু লিখেছিলেন। আমার দুঃখিনী মা আমাকে বড় মানুষের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন কি এই কারণে!" এইভাবে আক্ষেপ করতে করতে নির্মলা মারা যায়।

এমন সময় খবর পেয়ে নবকুমার ছুটে আসে। সে রাজাবাবুকে ধিক্কার দেয়। "যে মদ খেয়ে মাতলামী করে, যার ভিতরে এই চণ্ডালের ব্যবহার, সে আবার কোন্ মুখে এসব কাজে হাত দিতে যায়। বেহায়া, আগে আপনার মুখের কালি ঘুচো, মদ ছাড়্, আপনি ভাল হ', তবে মেয়েদের জন্য করিস্।.. এই ভণ্ড তপস্বীদের কাজ দেখেই তো বিদেশীরা হাসে। এঁরাই আবার সমাজের ভূষণ! এঁরাই আবার দেশের লোকের প্রতিনিধি! এঁরাই আবার বড়লোক!"

গোলক ধাঁদা (কলিকাতা ১০৮২ খৃঃ)—কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী॥ অসৎ-প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে আনে জটিলতা এবং মানুষ এতে নিজেই নিজেকে প্রতারণা করে—এই মত প্রচারের মধ্যে দৌর্নীতিক মনোভাবের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে পুষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রহসনের অন্যতম চরিত্র শিবে পাগ্‌লার যে সাবধানবাণীর মূল্য পরিণামের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়েছে, তা এই।—

"না বুঝতে পেরে ধোঁকায় পড়ে
শেষ কালে সার হবে কাঁদা।
এক এক পাকে আঠারো বাঁকে
দেখিয়ে দেবে গোলক ধাঁদা॥"

প্রহসনটি রচনার দু বছর পরে একই দৃষ্টিকোণের অনুরূপ সমর্থন পাই হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "সাদাই ভাল" প্রহসনের মধ্যে। যৌন ব্যভিচার অনুষ্ঠান এবং তাকে কেন্দ্র করে যে চিন্তা ভাবনা, তার একটি প্রধান দিক থেকে লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে।

কাহিনী।—নিশ্চিন্তপুরের জমিদার কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী লম্পট। লাম্পট্যের

পেছনে সে টাকা ঢেলে বেড়ায়। একদিন কৃষ্ণকান্ত মোসাহেবের কাছে বলে, —টাকা দিয়ে কি না বশ করা যায়। মোসাহেব তাতে সায় দেয়। বলে, জাত সাপও মন্ত্রে বশ হয়। এদের বৈঠকখানায় শিবে পাগলা এসে ঢুকে পড়েছিলো। সে বলে, কেউটে, গোখরো—এরা বশ হয় না। দাবানল ফুঁয়ে নেভে না। কৃষ্ণকান্ত বলে, "তাহলে কি হবে না! কত কত স্ত্রীলোককে দেখেছি, প্রথমে সতীত্ব জানায় পরে টাকার লোভ ছাড়তে পারে না।" মোসাহেবরা এক কথায় সায় দেয়। তখন শিবে বলে,—"টাকার লোভে যাহারা ব্যভিচারী হয়, তাহারাই নিজেদের সতী বলে। যে স্ত্রীলোক পতিকেই একমাত্র জানে, অন্য পুরুষের দিকে তাকায় না, বিপাকে পড়লে ছুরি মেরে মরে, তারাই সতী।" বিশে মন্তব্য করে—"যেমন রাজা, তেমন মন্ত্রী, এরাই জমিদার হলে জাত বাঁচান ভার।"—এই বলে শিবে পাগল পালিয়ে যায়। কৃষ্ণকান্ত পাগলটাকে কিছুক্ষণ গালাগালি দেয়। তারপর মোসাহেবকে কিছু টাকা দিয়ে বলে,—যে করেই হোক একটি মেয়ের ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। দেওয়ান বলে, "আপনি কালই রাত্রে যেতে পারবেন। মেয়েটি বাড়ীতে একলা থাকে। একজন দাসী আছে। তাকে দু' টাকা দিলেই বশ হবে।"

শিবে পাগলা আসলে সেই গ্রামেরই বৌ বিনোদবালার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। লোক চেনবার জন্যে সে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলো। আজ ছদ্মবেশে গ্রামে পাগলামি করে বেড়ায়। কেউ তাকে চিনতে পারে নি। গ্রামে সে বাউলের মতো গান গেয়ে বেড়ায়। গানের সুরে সে বলে—সাধ করে সে পাগল হয় নি। লোকের কায়দা দেখবার জন্যে 'জবুস্থবু' হয়ে আছে। "ধর্ম্মের নামে যারা মালা জপ্‌চে, ভিতরে তাদের গোলক ধাঁদা, বাইরে শাদা। ধাঁদায় পড়ে আঁধার দেখছি, ভারতময় ঘুরে বেড়িয়ে, ধর্ম্মে, বিদ্যায়, একতায়, স্বাধীনতায়, বাণিজ্যে, শিল্পে, অভিমান, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামিতে আমাকে ঘুরপাক খাওয়ায়। পবিত্র তীর্থ কাশীতে গিয়েও সাধুদের ভণ্ডামি দেখেছি। তারপর যেখানেই গিয়েছি, দেখেছি দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, মহান্ত, যা দেখি সকলই ধাঁদা।" গ্রামেও সে অনেকের ভণ্ডামি প্রত্যক্ষ করবার জন্যেই এসেছে।

গাঁয়ের কাপড়ওয়ালা হরিহর তাঁতী পথ দিয়ে যেতে যেতে নিজের মনেই মন্তব্য করে—"ছুঁড়ীটের কি চেহারা। চেষ্টা করতে হবে, দেখি হাত লাগে কিনা।" শিবু একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হরিহরের চালাকী বুঝতে পারলো। সে হরিহরের পেছু নিয়ে চলে। হরিহর গিয়ে নগেন্দ্রবাবুর অর্থাৎ

শিবে পাগলারই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। বিনোদবালাকে জিজ্ঞেস করে সে—কাপড় নেবে কিনা! একটা কাপড় দেখে বিনোদবালা পছন্দ করে দাম জিজ্ঞেস করলে হরিহর বলে,—"আপনি আমাকে পায়ে রাখলেই যথেষ্ট।" সঙ্গে সঙ্গে বিনোদবালা হরিহরের চাল বুঝতে পারে। মনে মনে ভাবে,—"আমি এখানে একলা থাকি বলে সকলেই আমার সতীত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। জমিদার, দেওয়ান, মোসাহেব, রামকুমার পর্যন্ত বিরক্ত করছে। আমি প্রাণ থাকতে সতীত্ব নষ্ট হতে দিব না।" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিনোদ ভাবে, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে তার কি দশা হয়েছে! তার কতোদিন আর অপেক্ষা করতে হবে সে জানে না। শিবু পাগলকে সে ধন্যবাদ দেয়। সে বিনোদকে পরামর্শ দিয়েছে, তাতেই কাল সকলে গোলক ধাঁধা দেখবে। রামকুমারকে বিনোদ আসতে বলেছে দু'দণ্ড রাতে। দেওয়ানকে বলেছে প্রথম রাত্রে, জমিদারকে দুই প্রহরের মধ্যে আসতে বলেছে। সব কিছু শিবুরই পরামর্শে হয়েছে। যথারীতি হরিহরকেও বিনোদ আসতে বলে—তবে সন্ধ্যাবেলাতেই হরিহরকে আসতে বলে। সে হরিহরকে বলে,—"তুমি অস্পৃশ্য জাত। তোমার দেহ পবিত্র না হলে তোমাকে স্পর্শ করতে পারি না। যদি আমার এখানে আসতে চাও—আজ মাথা মুড়িয়ে, হবিষ্যি করে থেকো, কাল উপবাস করে সন্ধ্যার সময়ে এসো। হরিহর বলে,—"যাহা আজ্ঞা করলেন তাহা করিব—দেবতার সহবাস!" শিবে পাগলা আড়াল থেকে সব শোনে। তারপর ভাবে,—সে ছায়ার মতো ঘুরছে শুধু তার স্ত্রীর সতীত্ব দেখবার জন্যে। খাঁটী হবে—তবেই সে পতিকে ফিরে পাবে।

এদিকে বিনোদ ঘরে বসে ভাবছে, কি করে চারজনকে একসঙ্গে সামলাবে। এই সময় যদি শিবু থাকতো তো বুদ্ধি পরামর্শ দিতো। শিবের কথা ভাবতে ভাবতে বিনোদ মনে মনে বলে—"আমার পাগলের দিকে মন টানছে কেন? দশ বছরে বিয়ে হয়েছে, চার বছর পতির সঙ্গে ছিলাম। আমি তো তাহার কোন দোষ করি নি। তবে দু'বছর হয় পতি কেন নিরুদ্দেশ হলো। পাগলকে দেখে মনে হচ্ছে সেই।" এমন সময় শিবু আসে। শিবু বলে, ঐ সময় সে থাকতে পারবে না; যা করবার, বিনোদকেই করতে হবে। এই বলে সে চলে যায়। বিনোদ চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে ভাবে,—"যদি সতীত্ব না রাখতে পারি, তবে এই ছুরি দিয়ে জীবন দিব।" লক্ষ্মী ঝি এই সময় কথা প্রসঙ্গে বিনোদকে বলে,—"আমি তো মানুষ করেছি, ঠিকই চিনেছি সে এই শিবু।

বিনোদ বলে তবে আর সন্দেহ নেই। সব আসবে সন্ধ্যে হলেই, সব পরিষ্কার হবে।”

সন্ধ্যে হয়েছে। বিনোদের বাড়ীতে যথাসময়ে হরিহর আসে। বিনোদের ঝি লক্ষ্মী তাকে খাটে বসিয়ে বলে, “তিনি খাবার তৈরী করছেন, এখানে বসুন।” এমন সময় বাইরের দরজায় আঘাত পড়ে। লক্ষ্মী এসে বলে, জমিদারের মোসাহেব রামকুমার এসেছে। হরিহর ভয়ে চোর কুঠ্‌রিতে লুকিয়ে পড়ে। রামকুমারকেও বসিয়ে লক্ষ্মী বলে, তিনি এখন খাবার তৈরি করছেন, এক্ষুনি আস্‌বেন। আবার দরজায় আঘাত পড়ে। লক্ষ্মী দৌড়ে এসে বলে, দেওয়ান মশায় এসেছেন। রামকুমার ভয়ে কোথায় লুকোবে স্থির করে উঠ্‌তে পারে না। লক্ষ্মী তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে এক তাল কাদা রেখে একটা পিদিম রাখবার জায়গা করে দেয়। বলে,—দেওয়ান মনে করবেন, এটার ওপর পিদিম আছে। যথারীতি দেওয়ান এলে তাকে লক্ষ্মী বসায়। বিনোদকে দেওয়ানজী একটা জড়োয়া গয়না দিতে যায়। বিনোদ ওটা আপাততঃ দেওয়ানের নিজের কাছেই রাখতে বলে। মনে মনে ভাবে, এর সমুচিত ফল পাবে। এমন সময় জমিদার কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী স্বয়ং এসে দরজায় করাঘাত করে। দেওয়ান জমিদারের কথা শুনে ঘাব্‌ড়ে যায়। লক্ষ্মী তাকে একটা গুড়ের গামলার মধ্যে বসিয়ে পরে তুলোর মধ্যে বসায়। ফলে দেওয়ানের সারা গা গুড়ে পশমে ভর্তি হয়। পরে সেখান থেকে তুলে গলায় দড়ি বেঁধে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখে। বিনোদ বলে, জমিদার মনে করবেন একটা ভেঁড়া বাঁধা আছে। তারপর জমিদার আসে। সে এসেই বিনোদকে আদর করতে এগিয়ে যায়। তখন বিনোদ তাকে বাধা দিয়ে তার একটা অপূর্ণ সখ মেটাবার কথা বলে। তার ঘোড়ায় চড়বার নাকি ভারি ইচ্ছে। অবশ্য জমিদারকেই ঘোড়া হতে হবে। কামান্ধ জমিদার এতে সানন্দে রাজী হয়। লক্ষ্মী লাগাম চাবুক ইত্যাদি নিয়ে এসে কৃষ্ণকান্তবাবুকে বাঁধে। এমন সময় শিবু খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণকান্তবাবুর পিঠে উঠে চাবুকের বাড়ি মারে। আর বলে,—“আমি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করতে এসেছ।” এই বলে বেদম প্রহার করে। এমন কি নাকে খত দেওয়ায়। কৃষ্ণকান্ত সমুচিত শিক্ষা পেয়ে আর্তস্বরে বলে,—“যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে গোলকধাঁধা দেখিয়েছো। তারপর নগেন্দ্র দেওয়ানজীকে টেনে বার করে চাবুক মারে। পরে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। রামকুমার

এবং তারপর হরিহরকেও একইভাবে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেয়। অবশেষে নগেন্দ্র বিনোদবালাকে বুকে চেপে ধরে আদর করে বলে,—

"কেঁদো না আমার ও গো আদরিণী
জীবন থাকিতে দিব না জ্বালা।"

বিনোদ অভিমান করে। নগেন্দ্র তখন বলে, সতীত্ব পরীক্ষা করবার জন্যই তাকে এভাবে জ্বালা দিয়েছে।

ওদিকে কৃষ্ণকান্তের বৈঠকখানায় সবাই বসে আছে। হরিহর সেখানে কাপড় বিক্রী করতে এলে সবাই তার মাথা নেড়া করবার কারণ জিজ্ঞেস করে। হরিহর জবাব দেয়—ছড়া কেটে।—

"হুজুর ঘোড়া দেওয়ান ভেড়া
মোসাহেবের মাথায় বাতি।
সেই তীর্থে মাথা মুড়িয়েছে
এ অভাগা হরে তাঁতী॥'

কৃষ্ণকান্ত মন্তব্য করে,—"তাই ত হে, সকলকেই জব্দ করেছে। শিবু যা বলেছিলো, তাই করেছে। 'এক এক বাঁকে আঠারো ঝাঁকে দেখিয়ে দেবে গোলক ধাঁদা।' সত্যিই শিবু দেখিয়ে দিলে গোলকধাঁদা।"

কলির কাপ্‌ (কলিকাতা ১৮৯৫ খৃঃ)—যশোদানন্দন চট্টোপাধ্যায়॥ বিজ্ঞাপনে লেখক লিখেছেন,—"লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রহসনের সৃষ্টি। অনেক প্রহসন জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজীভাবাপন্ন। কারণ—মধ্যে মধ্যে ইংরেজী গৎ অন্তর্নিহিত থাকায় ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্বোধ্য হইয়াছে,—সর্ব্বসাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গমোপযোগী করিয়া, একখানি প্রহসনের অবতারণা।" লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে সহজ রীতি গ্রহণের মূলে লেখকের নিজ দৃষ্টিকোণের বিষয়ে সমর্থনস্পৃহা যে ছিলো, তা অস্বীকার করা যায় না।

কাহিনী।—কাশীপুরের জমিদারের মৃত্যুর পর তার পোষ্যপুত্র হরিহর বসু এখন জমিদার। তার প্রধান পরামর্শদাতা এবং কর্মচারী—সেইসঙ্গে মোসাহেব হচ্ছে রমাকান্ত। রমাকান্ত মনে মনে ভাবে, মেয়েমানুষের টোপ দিয়ে বড় মানুষকে কেঁচো করে তার কাছ থেকে সব কিছু শুষে নেওয়া যায়। "আমি লেখাপড়া জানি না। কিন্তু চাটুকারিতা করিয়া বশ করিবার গুণ আমার

আছে। বড়লোক ছেলের ঠিক রোগ ধরিয়াছি।" রমাকান্তের পরিকল্পনা অত্যন্ত সুদৃঢ় অথচ ধীরগতিতে এগোয়। হরিহর এখন রমাকান্তের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

কিছুদিন আগে হরিহরের পালক পিতার মৃত্যু হয়েছে। এজন্যে হরিহরের অবশ্য দুঃখ নেই। বরং সে একদিন রমাকান্তকে জানায়, সে তার পিতার জন্যে গোঁফ কামিয়েছিলো, এখন কি সেটা সমান হয়েছে! রমাকান্ত জবাব দেয়—"আপনি শুধু শুধু চার মাস কষ্ট পেলেন। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের ৫ গণ্ডা পয়সা দিলে সুবিধে মত ব্যবস্থা লিখে দিত। আপনার সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই কোন শত্রুতা আছে।" হরিহর তাহাতে সম্মতি দিয়ে বলে, —তা ঠিকই। কর্তা থাকতেই ঐ ব্রাহ্মণ তাকে "পুষ্যি এঁড়ে" বলতেও কুণ্ঠিত হয়নি। হরিহরের পিতা ছিলেন বোকা! তাই তার কাছ থেকে এই ব্রাহ্মণ দফায় দফায় টাকা নিতো। ওর কাছে এখনো নাকি হরিহরের তিনশো টাকা পাওনা আছে। রমাকান্তকে হরিহর বলে,—"তুমি বিদেশী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, একটু পরামর্শ দাও।" এমন সময় হরিহরের চাকর খুদিরাম এসে তামাক দিয়ে যায়। খুদিরাম সম্পর্কে হরিহর রমাকান্তকে সাবধান করে দেয়। লোকটা নাকি খুব ধূর্ত। ওর কাছে যেন কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ না হয়। নষ্টবুদ্ধিও বিলক্ষণ রাখে। খুদিরাম চলে গেলে রমাকান্ত হরিহরকে পরামর্শ দেয় যে, তর্কালঙ্কারের যে সম্পত্তি আছে, তা আটকালে পাওনা তিনশো টাকাও আদায় হয়। তর্কালঙ্কারের সুন্দরী স্ত্রীর সম্পর্কেও সে ইঙ্গিত করে। হরিহরকে সে বলে বেশ্যা "বামা বোষ্টমীই" সবকিছু করবে। তার সাহস আছে। হরিহর রমার বুদ্ধিকে বাহবা দিতে থাকে। কাজ হাসিল করতে পারলে রমাকান্তের আরো সে উন্নতি করিয়ে দেবে কথা দেয়। হরিহর বলে, ব্রাহ্মণ বাড়ী থাকলে তো হবে না। তাছাড়া তাকে দেখলেই হরিহরের ছেলেবেলার ভয় আসে। তারপর স্নান করবার জন্যে দুইজনে চলে যায়।

এদিকে খুদিরাম আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব পরামর্শই শোনে। সে মনে মনে বলে,—কে এক হাভাতে এসে পুরোণো চাকর সবাইকে তাড়িয়েছে। একমাত্র খুদিরামই আছে। রমাকান্তকে মনে মনে সে ধিক্কার দেয়। পুরোহিত পত্নী! তার ওপরে কু-নজর দিয়েছে! ঠিক আছে—সেও রমাকান্তকে দেখে নেবে। "তুমি ঘুঘু আমি বাজ—ভাস্কর তোমার ডানার মাঝ।"

নবীন তর্কালঙ্কারের বাড়ী। নবীনের স্ত্রী মনোরমার কাছে বামা বোষ্টমী

এসে উপস্থিত হয়। মনোরমা তাকে আদর করে এনে বসিয়ে অনুযোগ করে বলে—এতোদিন কেন সে আসেনি। বামা মনোরমার রূপগুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তার পর বলে,—

"সমানে সমানে প্রেম বড় মধুময়,
দেবতা-দুর্লভ তাহা মানবী না পায়।
অসমানে প্রেম করা কাঁচা বাঁশে ঘুণে ধরা,
(ও সৈ) হাতীর গলায় ঘণ্টা প'রা দেখলে হাসী পায়॥"

এই ধরনের নানা কথা বলে মনোরমার মনে দ্বিচারিতার ভাব জাগাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মনোরমা এতে রেগে যায়। বামা তখন বলে,—"আমার প্রথম সোয়ামী তেজ বেরে ছিল। আমাকে কেউ সেকথা বললে কখনও রাগ করতাম না।" এসব কথা বলে শেষে মনোরমার একটি খোকা হওয়ার কামনা জানায়। তার ঐ নরম গায়ে একটিও অলঙ্কার নেই বলে বামা দুঃখের ভান দেখায়। মনোরমা বলে, তার স্বামী অতো টাকা কোথায় পাবেন। কর্তা মশায় মরে গিয়ে অবধি আর তেমন উপায় নেই। তাদের কাছে তিনশো টাকা ঋণ আছে; হরিহর তা ছেড়ে দেবে না বলেই মনে হয়। বামা বলে, তর্কালঙ্কার দিগ্‌গজ পণ্ডিত। বাইরে গেলেই টাকা রোজগার করতে পারেন। এর উত্তরে মনোরমা বলে,—তিনি চলে গেলে একলা সে কেমন করে থাকবে? বিশ্বাসী লোক সে কোথায় পাবে? বামা বলে, সে-ই জুটিয়ে দেবে। মনোরমা ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অসম্মত হয়। তখন বামা বলে,—"টাকায় কাজ নাই, ভাল কাপড়ে কাজ নাই—গহনায় কাজ নাই—কাজ কেবল ভাতারের কাছার খুঁটে নিজ খুঁট বেঁধে বসে থাক।" যাবার আগে বামা সাবধান করে দিয়ে বলে, বয়স হলে তিনি আর তাকে ভালোবাসবেন না। এখনই তার পথ পরিষ্কার করে রাখা উচিত। বামা চলে গেলে মনোরমা মনে মনে ভাবে, বামা যা বলেছে, তা যথার্থ। মনোরমার সন্তান না হলেই তো স্বামী অন্য একটি বিয়ে করবেন। "সৎ বেটা যদি দেখতে না পারে, তবেই তো আমি ডাল ছাড়া বাঁদর। আগেই কায়দা করি, নহিলে ঠক্‌বো।"

এদিকে নবীন তর্কালঙ্কারকে রমাকান্ত হরিহরের হ'য়ে অপমান করে—তিন শো টাকার জন্যে। নবীন ফিরে এসে ভাবেন, রমা কোথাকার এক ছোট চাকর ছিলো, এখন সে হরির প্রধান মন্ত্রী হয়ে হরিহরের পিতৃপুরুষের পুরোহিতকে কিনা অপমান করলো! যাহোক অপমান যখন করেছেই, যে

করেই হোক টাকা শোধ দিতে হবে। নবীন ঘরে ফেরেন। তারপর অপমানে সান্ত্বনা পাবার জন্যে স্ত্রীকে আদর করতে যায়। স্ত্রী অভিমান করে থাকে। সে বলে,—"আমি রাজপুরুতের মাগ হয়ে গায়ে রাঙরত্তিও জোটে না?" তর্কালঙ্কার ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েন জীবিকার খোঁজে। নদের চাঁদ নাপিতকে সঙ্গে নেন। এই নদের চাঁদ আবার বামা বোষ্টমীতে আসক্ত। নবীন খেদ করেন,—"নাপিতের ছেলে পয়সা উপায় করে বিয়ে করবে, তা নয়, কোথাকার এক ঠাকরুণ দিদির বয়সী রাঁড়ের চরণে পড়ে আছে।" বামার পয়সাকড়ি তেমন নেই, নদেকে সে ভালবাসে। অথচ পাঁচ টাকার লোভে বামা নদেকে যে কেন ছেড়ে দিলো, নবীন তার কারণ খুঁজে পান না। আসলে বামার সঙ্গে রমাকান্তের চুক্তির কথা নবীন ঘুণাক্ষরেও জানতো না। নদে দেরী করে এসেছে। সে বলে, "যখন বামীর সেই কাঁদো কাঁদো হুমদো বদন মনে হয়, তখন বোধ হয় পা দুটোই মন দুই জগন্নাথী গোদ হয়েছে। কাজেই থপাঙ্ থপাঙ্ করে আস্তে আস্তে আসছি।" নদেকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলেন। নবীনের সঙ্গে হাঁড়িতে মিষ্টি ছিলো। জানতে পারলে নদের চাঁদ খেয়ে নেবে, এই ভয়ে তিনি তাকে বলেন, হাঁড়ির মধ্যে মন্ত্রপুতঃ করে কেউটে সাপ রেখেছেন। নদে প্রথমে ভয় পেয়ে সাপের মন্ত্র আওড়ালেও এক সময় বুঝতে পারে যে ওর মধ্যে মিষ্টি আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে একে একে সে মিষ্টিগুলো শেষ করে। পরে হাঁড়ি খালি দেখে নবীন আক্ষেপ করেন। ধরা পড়বার ভয়ে বলেন সাপ পালিয়েছে। তারপর উদ্বেগের ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কামড়ায়নি তো? নদে জবাব দেয়,—"কামড় কোমর কোথা পাবেন, উবু উবুই শেষ।" নবীন সবই বুঝতে পারেন, কিন্তু কিছু বলবার ক্ষমতা নেই।

যা হোক, নবীন নদের চাঁদকে নিয়ে মণিপুর এসে অনেক টাকা রোজগার করেছেন। পাঁচ শত টাকা জমিয়েছেনও। ঋণ পরিশোধের টাকাও তিনি ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে। এজন্যে নদের চাঁদকে ডেকে তিনি পরামর্শ করেন। মনোরমার জন্যে তিনি গয়না নেবেন স্থির করে নদের চাঁদকে স্যাকরার দোকানে পাঠালেন। নদের চাঁদ নবীনের নাম করে গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। স্যাকরা তখন নবীনের কাছে টাকা দাবী করে। নবীন গয়নার দাম দিতে পারেন না। স্যাকরা তখন কোটালের সাহায্যে মণিপুরের রাজবাড়ীতে ধরে নিয়ে যায়।

এদিকে হরিহরের অধঃপতন দিন দিন চরমে পৌঁছোয়। হরিহরের হাতে পড়ে তাঁর স্ত্রী স্নীতির ভাগ্যে কষ্টের অন্ত নেই। অথচ তার কোনোই অভাব ছিলো না। রমাকান্তই সবকিছু অনিষ্টের মূল। সে-ই তার স্বামীকে বিপথগামী করেছে। এখন তারই পরামর্শে স্বামী পুরোহিত পত্নীর ধর্মনাশ করতে চেষ্টা করছেন। একদিন একাকী পেয়ে স্নীতি স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করে ; মদ ও কুসঙ্গ ত্যাগ করে সৎ পথে চল্‌তে বলে। কিন্তু হরিহর তাকে পদাঘাত করে চলে যায়। পর পর তিনবার এইভাবে বিফল হয়ে আত্মহত্যা করবার জন্যে স্নীতি ছুরি বার করেছিলো। কিন্তু ঠিক এই সময়ে খুদিরাম এসে তাঁকে বাঁচায়। খুদিরামের সঙ্গে মনোরমাও এসেছিলো। মনোরমার অনুরোধেই স্নীতি আত্মহত্যা থেকে বিরত হয়। খুদিরাম মনোরমাকে আশ্রয় দেবার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছে। খুদিরাম দুজনকেই আশ্বাস দিয়ে বলে, এদের কোনো ভয় নেই। এরা ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকুক। সে ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে যেন এরা দরজা না খোলে।

খুদিরাম ধর্মের উপর নির্ভর করে স্নেহ বশে এদের নানা বিপদ থেকে রক্ষা করছে। খুদিরাম দুবছর যাবৎ পাপিষ্ঠদের পাপকার্যে বাধা দিচ্ছে। কোনোদিন মড়ার মাথা, কোনোদিন হাড়, কোনোদিন বা ইট ফেল্‌ছে। ফলে তারা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। রাত জেগে এই কাজ করবার ফলে তার অসুখও আজ পর্যন্ত হয় নি, এ শুধু ভগবানের কৃপা। এই সবই বামীর চক্রান্ত। বামীর ওপর তার সব রাগ গিয়ে পড়ে। নবীন তর্কালঙ্কার কবে আসবেন তার দিন গুন্‌তে থাকে খুদিরাম।

ওদিকে মণিপুর রাজবাড়ীতে স্যাকরা নবীনকে দেড় হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। সেখানে নবীন ঠাকুর সেবা, পরিচারকের কাজ ও পাচকের কাজ করে। পথে একদিন এক পাগল হঠাৎ তাকে বলে, সকাল দুপুর নবীন যদি ঠাকুরবাড়ীর মাঝে নামাজ পড়ে, তবে সে এই কাজ থেকে মুক্তি পাবে। পাগলের কথা মতো একদিন নবীন ছদ্মবেশে মনিপুর রাজের ঠাকুর বাড়ীতে নামাজ পড়তে আরম্ভ করে। রাজার ভৃত্য মধু সেটা দেখে রাজাকে খবর দিয়ে এনে দেখায়। রাজা নবীনকে ডেকে পাঠালে নবীন রাজার কাছে গিয়ে মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে সব খুলে বলেন। রাজা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না। শেষে তিনি বলেন, তাঁর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তিনি প্রফুল্ল মনে প্রার্থনা পূর্ণ করবেন এবং বন্ধুভাবে গ্রহণ করে বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন।

নবীনকে প্রতারণা করে নদের চাঁদের অবস্থাও বিশেষ করে সুবিধার হয়নি। একদিন নদের চাঁদ এক গাছতলায় বসে মদ্যপান করছিলো। সামনে গয়নাগুলো রেখে বামীর কথা ভাবছিলো। বামীকে এই গয়না দিলে সে তার ওপর কতো সন্তুষ্ট হবে—সেটা সে ভাবে আর আনন্দ পায়। মনে মনে কল্পনা করে গানই গেয়ে চলে।—

"রূপটি যেন কোকিল পাকি, খাঁদা নাকি প্যাঁচামুকী,
গলা ফুলো গুগ্‌লি চকি, চাউনিতে প্রলয় রে।
টাক ভরা মস্তকেতে, চুলগুলি কুড়কুড়ে তাতে ;
গেছো পেত্নী নেমে এসে সৈ পাতিয়ে যায় রে॥"

নদের চাঁদ মশ্‌গুল্‌ হঠাৎ ডাকাত এসে তাকে যথেষ্ট প্রহার করে গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে চলে যায়। নেশা ছেড়ে গেলে নদের চাঁদ শোকে হায় হায় করে।

এদিকে কাশীপুরে বামা বোষ্টমীর ওপর খুদিরামের রাগ ক্রমেই ভীষণ হয়ে উঠেছিলো। বামাকে শাস্তি দেবার জন্যে খুদিরাম একদিন একটা আফিংগোলা বোতল আর অনেকদিন ধরে পোষা দশজন গুণ্ডা নিয়ে বামা বোষ্টমীর বাড়ীতে আসে। বামার ওপর যেন আসক্ত এই ভাব দেখিয়ে খুদিরাম বামাকে ডেকে একটু মস্করা করতে যায়। কিন্তু বামা খুদিরামকে দেখে চাকর বলে ঘৃণা প্রকাশ করে। পরে খুদিরামের বোতল কেড়ে নিয়ে মদ মনে করে তা পান করে। কিন্তু পান করতে করতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। খুদিরাম বামীকে গালাগালি করে—তার সতীনাশের সর্বনাশ করার চেষ্টার জন্যে। শেষে স্ত্রী হত্যার ভয়ে পোষা গুণ্ডাদের খুদিরাম আদেশ দেয় বামীর দেহটা দূরে কোথাও ফেলে দিতে। বামীকে শাস্তি দিয়ে খুদিরাম অনেকটা আশ্বস্ত হলো।

কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে হরিহর রমাকান্তকে বলে, আজ দুই তিন বছর হলো অথচ তার উদ্দেশ্য সফল হলো না। হরিহর ভূত মানে না কিন্তু দৈনিক ভূতুড়ে কাণ্ড চলে আসছে। কোনোদিন হাড়, মাথার খুলি পড়ছে। সেদিন একরাশ বিষ্ঠা তার মাথার ওপর পড়েছে। রমাকান্ত হরিহরকে বলে, সবই ঐ খানসামা খুদের কাণ্ড। সে-ই বামীকে কূপে ফেলে দিয়েছে। খুদিরামের ওপর হরিহর চটে যায় এবং একটা উপায় জিজ্ঞেস করে। রমাকান্ত পরামর্শ দেয়, খুদিরামকে একটা চিঠি দিয়ে সন্তোষপুর ডিহিতে এমন একজন লোকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক যে, সে যাওয়ামাত্র লোকটি তাকে মেরে ফেল্‌বে। হরিহর এতে সম্মত হয়।

কিন্তু ঠিক এই সময় খুদিরাম অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে বলে,—আমাকে মারবার কথা চিন্তা করছিলো এরা,—অথচ ক্ষুদিরাম এদের চাইতেও বেশি বুদ্ধি ধরে। এতোদিন এদের প্রাণে মারবে না বলেই খুদিরাম স্থির করেছিলো। যা হোক খুদিরাম রমাকান্তের চুল টেনে ধরে। হরিহর রেগে খুদিকে মারতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই দশজন গুণ্ডা প্রবেশ করে। খুদিরামের আদেশে গুণ্ডারা দুজনকে বেঁধে ফেলে। তারপর খুদিরাম রমাকান্তের কান কেটে, বিষ্ঠা মুখের মধ্যে দিতে বলে এবং আরো বলে, "চখে তোমরা সবাই মেলে দাঁড়িয়ে ২ মোত।" রমাকান্ত চীৎকার করে দয়া ভিক্ষা করে। খুদিরাম শেষে রমাকান্তকে দরিয়ার অন্যপারে ফেলে দিতে আদেশ দেয়। তারপর হরিহরকে একটু একটু করে কেটে গায়ে লেবুর রস মাখিয়ে তিলে তিলে যন্ত্রণা দেবার জন্যে তরোয়াল বের করে। এই সময় হঠাৎ নবীন তর্কালঙ্কার এসে পড়েন। বসুবংশের একমাত্র সন্তানকে বধ করতে তিনি নিষেধ করেন। হরিহর কুলোকের পরামর্শে এমন হয়েছেন। তাই বলে তো নবীন তাঁকে ত্যাগ করতে পারেন না। হরিহর অনুতপ্ত হয়ে বলেন. তাঁর এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তিনি নরাধম, পিশাচের প্রলোভনে, চাটুকারিতায় পিশাচের ন্যায় ব্যবহার করেছেন। "সাদৃশ্য চাটুবাদ প্রিয় হিতাহিতশূন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, যাহারা ধনমদে মত্ত হয়ে ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নয়, তাহারা আমার শোচনীয় পরিণাম দেখে শিক্ষা করুক, চাটুকারগণ কতদূর সূক্ষ্ম।" হরিহর চাকর খুদিরামের পায়ে ধরতে চায়। খুদিরাম বলে,—

> "কেমন মজা, কেমন শিক্ষে হল চাঁদ।
> মনে মনে দিব্বি গাল' পেত না পাপের ফাঁদ।
> ধাম্মিক লোকে ধর্ম্ম রাখে, ধর্ম্মে বাজায় জয়ের ঢাক
> চিনো ভালরূপ চাটুকারগণে, ঐ বেটারাই—কলির কাপ"।

প্রধানভাবে লাম্পট্যকে কেন্দ্র করে আরও অনেক প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর পরিচয় উদ্ধার সম্ভবপর হয়েছে, এমন কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য প্রহসনের পরিচয় দেওয়া হলো।

বিধবা বঙ্গবালা (১৮৭৫ খৃঃ)—অজ্ঞাত॥ একজন ব্রাহ্মণ এক বিধবাকে প্রলুব্ধ করে ধর্ম নষ্ট করে। পরে তার বিচার ও শাস্তি হয়। এই কাহিনী নিয়ে প্রহসনটি লেখা।

বাঙ্গালীবাবু প্রহসন (১৮৭৬ খৃঃ)—কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীবাবু তার বিবাহিতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত। বাবুর একটি বিধবা ভগ্নী ছিলো। তার সঙ্গে আবার উক্ত স্ত্রীলোকটির ভাইয়ের প্রণয় সম্পর্ক ছিলো। বাবুর ভগ্নী সেই লোকটিকে অর্থ সরবরাহ করতো। এতে দুইদিক থেকেই বাবুর পকেট থেকে প্রচুর টাকা চলে যেতো। একদিন বাবুর ভগ্নী নিরুদ্দিষ্টা হলো। ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটিও বাবুর নামে ১০,০০০ টাকার নালিশ আনে। বাবুর মা অবশেষে সেই টাকা দিয়ে হাঙ্গামা থেকে বাবুকে মুক্তি দিলেন। উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে বাবুর মতি পরিবর্তন হয়।

Calcutta Gazette-এর মন্তব্যে অবশ্য বেশ্যাসক্তির কথাই বলা হয়েছে। কারণ ঐ খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় লেখা হয়েছে,—"The writer of the drama expresses a desire to root out many social evils, but in making a prostitute one of the principle actions on the stage. Corrupt ideas are necessarily left on the mind."

দুকুল ফর্সা (১৮৭৮ খৃঃ)—নিবারণ চন্দ্র দে ॥ শিক্ষিত বাঙালীদের লাম্পট্য ইত্যাদি দোষগুলো প্রহসনটিতে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা যায়।

পাজীর বেটা ছুঁচো (১৮৮০ খৃঃ)—উপেন্দ্র কৃষ্ণ মণ্ডল ॥ যেমন পিতা তেমনি পুত্র। পেজোমি'তে পিতা বা পুত্র কেউই কম চলেন না। পুত্রের অকর্ম-কুকর্মে পিতা প্রশ্রয় দিয়ে চলে। পুত্রটি আবার লম্পট। এই লাম্পট্যবৃত্তির সহায়তা করে যারা—অর্থাৎ যারা মেয়েমানুষ জোগাড় করে দেয়—তাদেরও সে প্রতারণা করতে অভ্যস্ত। পরিচিত প্রতিবেশীকে আক্রমণ করা হয়েছে বলে Calcutta Gazette অনুমান করেন।

প্রণয় বিচ্ছেদ (১৮৮৩ খৃঃ)—মনোরঞ্জন বসু ॥ স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি অত্যন্ত লম্পট ছিলো। একসময় যখন তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন লোকটি আত্মহত্যা করলো।

সই (১৮৯৭ খৃঃ)—কালীচরণ মিত্র ॥ এক ব্যক্তির প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। প্রতিবেশীর স্ত্রীটি ছিলো তার নিজের স্ত্রীর 'সই'। 'সই' হিসেবে তার বাড়ীতে সেই স্ত্রীলোকটি আসতো এবং এইভাবে ঘনিষ্ঠতা হয়ে পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে তাদের গুপ্ত প্রেম প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিটিকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়।

বাল্যকালে দুষ্প্রবৃত্তি ॥—

মদ্যপান বেশ্যাসক্তি ইত্যাদি যে উনবিংশ শতাব্দীতে কিশোরমনকে এমন কি শিশুমনকেও কলুষিত করেছে, এই সত্যের প্রমাণ নিয়ে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের জন্ম হয়েছে। সুলভ সমাচার পত্রিকায় (৩রা মাঘ, ১২৮৩) একটি সংবাদে আছে,—"কলিকাতার কোন একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর ১০/১২ বৎসরের পুত্র সুরাপান করিয়া রাস্তায় পতিত ছিল। পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ঐ বালক মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৫ টাকা জরিমানা করত সাবধান করিয়া দিয়াছেন।" বাল্যকালের দুষ্প্রবৃত্তির কেন্দ্র অনেক প্রহসন লেখা হয়েছে।

তুমি যে সর্বনেশে গোবর্দ্ধন (কলিকাতা—১৮৭৯ খৃঃ)—শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ॥ মলাটে প্রহসনকার কবিতায় মন্তব্য করেছেন,—

হরিবাবুর কুলাঙ্গার পুত্র,
আমি অনেক খুঁজে পেয়েছি সূত্র ॥

লেখকের উদ্দেশ্য অবশ্য অন্যদিকেও কিছুটা ছিলো, তা অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞাপনে তিনি বলছেন,—" নানাবিধ নাটক দেখিয়া এবং আমার বিদেশস্থ বন্ধুদিগের সাহায্য পাইয়া এই কার্যে প্রবর্ত্ত হইলাম। ...দেশস্থ পণ্ডিতের দ্বারা সংশোধিত না হওয়াতে কিয়তপরিমাণ বর্ণাশুদ্ধি রহিল তজ্জন্য পাঠকবর্গ সকল দোষাদোষ মার্জ্জনা করিবেন।"

কাহিনী।—হরিবাবুর দশ বছরের ছেলে গোবর্ধন কতকগুলো ইতর বালকের সঙ্গে মিশে অনেকগুলো নেশা করতে শিখেছে। হরিবাবু তাকে যথেষ্ট মারধোর করেও তার স্বভাব বদলাতে পারেন নি। গোপালবাবু হরিবাবুর বন্ধু। তাঁর কাছে নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আক্ষেপ করেন। গোপালবাবু বলেন,—"হাঁ ভাই সত্য বটে, এখনকার ছেলেপিলেরা এই রকম হইয়াছে বটে, আবার লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খেয়ে ইয়ারকি করে থাকে।" তাছাড়া পরিবেশই এদের খারাপ করে দিচ্ছে।—"এখন সকের যাত্রা, জীবনেষ্টিক, অপেরা, বেঙ্গল থিয়েটার, জুয়াখেলা কত রকমি হয়েছে।" হরিবাবুকে তিনি পরামর্শ দেন, এখন থেকেই যেন ছেলেকে বাঁধেন, নইলে পরে নাগালের বাইরে চলে যাবে। বলা বাহুল্য, গোপালবাবুর ওপর গোবর্ধন ও তার সঙ্গীরা খুব রেগে যায়। "বেটাকে যেদিন ধরব,- সেদিন আছাড়ে মারবো, তার

মেগের হাতের নুওয়া খসাব।" ইতিমধ্যে নেশার প্রসঙ্গ এসে পড়ায় শাস্তি দেবার সঙ্কল্প আপাততঃ স্থগিত রাখে। প্রতিদিন আফিম বা গাঁজা আরাম দেয় না। তাই মদ খাবার জন্যে গোবর্ধন লালায়িত হয়। মদ যদি খেতেই হয়, তাহলে গরাণহাটা, হাড়কাটা বা সিমলাবাজারে গিয়ে খাওয়াতেই আসল আনন্দ। জীবন এসে গোবর্ধনকে বলে,—"আমি গরাণহাটার বাড়ীতে একটি মেয়ে মানুষ দেখিয়াছি, অতি চমৎকার শারীর কি বাহার, শালীকে দেখ্‌লে মুনির মন ভুলে যায়।" সকলকে সে সাজ গোজ করতে বলে।

বন্ধুদের সঙ্গে যথাসময়ে তারা গরাণহাটার খুকুমণি বেশ্যার ঘরে এসে উঠলো। আগে সংবাদ পেয়ে হরিবাবু তার চাকর রাখালকে সঙ্গে নিয়ে ঠিক সময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। একটা লাঠি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি গোবর্ধনের চুলের মুঠি ধরলেন। এই সুযোগে শ্যাম ও জীবন পালায়। গোবর্ধনকে হরিবাবু বার বার লাঠি দিয়ে মারেন। মার খেতে খেতে গোবর্ধন বলে,—"মাগো গেলুম গো য়ো, য়ো, য়ো, য়ো, বাবা তোমার পায়ে পড়ি, আর এমন কাজ করব না।"

কিন্তু এতে কিছু ফল হলো না। আবার নিয়মিত বন্ধুদের নিয়ে গাঁজার আড্ডা জমে ওঠে। বন্ধুরা ঠাট্টার ছলে গোবর্ধনের মায়ের কথা তুললে গোবর্ধন বললো, মার খাবার পর এসে ত্'ছিলিম গাঁজা খাওয়া মাত্র ব্যথা কোথায় চলে গেছে! গাঁজার এমন গুণ! এই কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আবার স্থির হয় বেশ্যাবাড়ী যাবে তারা। টাকার জোগাড় না হলে জামাকাপড় বেচেই পয়সা জোগাড় করবে।

তাদের অধঃপতন চরমে পৌছলো। একদিন বেশ্যাবাড়ী মারামারির সুযোগে গোবর্ধন সেখান থেকে একটা দামী শাল চুরি করে আনে এবং বন্ধুদের কাছে নিজের কেরামতী জাহির করে।

এসব দেখে হরিবাবু নিরাশ হয়ে যান। নিরুপায় হয়ে শুধু খেদ করেন তিনি। এইভাবে দুশ্চিন্তায় ক্রমে ক্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়লো। আকস্মিক-ভাবে একদিন তিনি মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে গোবর্ধনের মনে একটা বড়ো আঘাত এলো। সে কাঁদে। তারই জন্যে এই সর্বনাশ ঘটলো।

ষ্টুডেণ্টস্‌ রহস্য (কলিকাতা—১৮৮৮ খৃঃ)—মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়॥ নামকরণ ইংরেজীতে আছে,—"Students Rahasya a Prahasana"

নামে। বৈকল্পিক কোনো নাম নেই। ভূমিকায় লেখক লিখছেন,—"আজকাল সভ্য নব্য কুলপ্রদীপ স্কুলস্থ বালকদিগের চরিত্র ও আচার ব্যবহার যারপরনাই দূষিত হইতেছে। ইহা তাহারই একখানি চিত্র মাত্র।" অন্যান্য প্রহসনের মতো এটিও বালকদের লাম্পট্য অনাচার এবং অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। বালক-জীবনের ও অন্যান্য বিকৃতিও এতে পরিস্ফুট।

কাহিনী।—রাখালকৃষ্ণ, রমানাথ, মন্মথনাথ, বিধুভূষণ, হরেন্দ্রমোহন—এরা সবাই একই স্কুলে পড়ে এবং এদের মধ্যে বন্ধুত্ব খুব বেশি। কিন্তু ইদানীং হরেন্দ্রমোহন খারাপ হয়ে গেছে এবং রাখালও তার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ পথে এসেছে। হরেন, রাখালকে আফিম অভ্যাস করাতে গিয়ে রাখালকে শয্যাশায়ী করে দেয়। এ অবস্থায় মন্মথ ও বিধু রাখালের দেখাশোনা করে এবং প্রতিবেশী যুবক কালীকুমারকে ডেকে পাঠায়। কালীকুমার রাখালের শুয়ে থাকবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে এরা সব খুলে বলে। তখন সঙ্গে সঙ্গে একজনকে বাজারে পাঠানো হলো মাছ কেনবার জন্যে। মাছ এলে মাছধোয়া জল খাইয়ে রাখালকে বমি করানো হলো। রাখালকে বমি করতে দেখে তার মা করুণাময়ী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তখন রাখালের বন্ধুরা তাঁকে আশ্বস্ত করেন। রাখাল হরেনের খোঁজ করলে মন্মথ বলে,—"যে তোমার জীবন হরণ কর্ত্তে বসেছিল, তাহার নাম আবার উচ্চারণ, বড় লজ্জার বিষয়।" রাখাল বলে,—"হরেনের কোন দোষ দিও না, তা হলে চাদের কলঙ্ক হবে।" তারপর রাখাল বলে,—

> "যে জ্বালা হৃদয়ে, হরেন বিহনে,
> জ্বলিছে সদাই, হা হুতাশ প্রাণে।" ইত্যাদি।

রমানাথের বাড়ী হরেন গিয়েছে শুনে রাখাল বিছানা থেকে উঠে বলে,—"যে যাকে চায় সে তাকে পায় কি না দেখবো, চেষ্টার অসাধ্য কাজ আছে কি না।" সবাই চলে যায়।

বাগানবাড়ীতে মন্মথ আর হরেন। মন্মথ হরেনকে বলে, তার ওপর একজন ব্রাহ্মণপুত্রের জীবন নির্ভর করছে। হরেন তখন বলে,—রাখালকে একজন অসচ্চরিত্র বালক বলেই সে জানে। তার সঙ্গে মেশা উচিত নয়। মন্মথ বলে,—সে যদি নিজে খাটি থাকে, তাহলে রাখাল তাকে ঝুটা করতে পারবে না। এই বলে মন্মথ রাখালকে ডেকে আন্‌তে যায়। এমন সময়

রমানাথ এসে হরেনকে বলে,—হরেন প্রতিজ্ঞা করেছিলো রমানাথ ছাড়া আর কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করবে না। এরই নাম কি ভালবাসা? রমানাথ বলে, এর সে শোধ নেবে। রাখালকে আসতে দেখে রমানাথ চলে যায়। রাখাল এসে হরেনের সঙ্গে ভাব করে। হরেন না বুঝে রাখালকে যে সব ব্যথা দিয়েছে তার জন্যে হরেন বারবার ক্ষমা চায়। আর আজ থেকে হরেন রাখালকে "অর্ধাঙ্গভাগী" করে।

ক্লাসে সব বন্ধুরা বসেছে। রাখাল বসেছে হরেনের পাশে। পূর্ণ মাষ্টার এসে এদের গোষ্ঠীকে পড়া ধরেন, কিন্তু এরা সবাই নিরুত্তর থাকে। কিছুই বলতে পারে না। মারবার জন্যে পূর্ণ মাষ্টার বেত আন্‌তে গেলেন। রাখাল সব বন্ধুদের নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায়। ওদের মধ্যে শুধু রমানাথই বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে। সে ভাবে, কেমন করে রাখালকে শাস্তি দিয়ে হরেনকে নিজের কাছে টানা যায়! বেত হাতে পূর্ণবাবু ঘরে ঢুকে এদের দেখতে না পেয়ে চটে যান। বিনা অনুমতিতে ছাত্ররা চলে গেছে এইজন্যে তিনি Rusticate করবেন বলে সঙ্কল্প করেন। রাখাল দূর থেকে পূর্ণবাবুকে জানিয়ে দেয়,—"শিমূলতলায় দেখা যাবে, কে কাকে Rusticate করে।"

রাখাল বন্ধুদের নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় রমানাথ এসে বলে, —"একজনের প্রণয়ী দুইজনে কখনই হতে পারে না। যদি ভীত হইয়া থাক, হরেনকে প্রত্যর্পণ করো, নচেৎ এসো।" এই বলে রাখালকে মারতে যায়। রাখাল বলে, সে তার সঙ্গে লড়বে না। রমানাথ যেন বামন হয়ে চাঁদে হাত না দেয়! রমানাথ বলে,—সে তার 'প্রণয়াকাঙ্ক্ষী'কে চুরি করেছে, অতএব সে চোর। রাখাল কথাটা সহ্য করতে না পেরে রমানাথকে ঘুষি মারে এবং তাড়া করে। রমানাথ শাসিয়ে যায়, লোকজন নিয়ে সেও আসছে! রাখাল দলবল নিয়ে প্রস্তুত হয়।

রাখালের বাবা যদুনাথ করুণাময়ীকে এসে বলেন যে রাখাল নাকি মারামারি করেছে খবর পেয়েছেন। রাখালের খোঁজ করেন তিনি। তাকে তিনি জুতো মারবেন। করুণাময়ী রাখালের কথা ভেবে ভয় পান। এমন সময় রাখাল এসে বলে, রমানাথই আগে তাকে মেরেছে। বাজারের লোক নিশ্চয়ই রমানাথের কাছে ঘুষ খেয়ে রাখালের নামে বদনাম রটাচ্ছে। যদুনাথ কোনো কৈফিয়ৎ না শুনে রাখালকে ধমক দেন এবং জুতো মারতে যান। করুণাময়ী তাকে রক্ষা করলেন। যদুনাথ চলে গেলে রাখাল মাকে বলে, সে এখন বড়ো

হয়েছে, তবুও বাবা তাকে জুতো মারতে আসেন! করুণাময়ী রাখালকে আদর করেন।

হরেন তার বাড়ীতে মাকে বলে, আজ সে রাখালকে নেমন্তন্ন করেছে। বিন্দুবাসিনী বলেন,—রাখাল তো সেদিন রমানাথের সঙ্গে মারামারি করেছে। সে তো খারাপ ছেলে। হরেন তখন বলে,—রাখাল ভালো ছেলে। সেদিনকার মারামারিতে রাখালের দোষ ছিলো না। হরেনের বাবা রামেশ্বর এই সময় আসেন। তিনি হরেনকে বকুনি দিয়ে বলেন, রাখালের মতো খারাপ ছেলের সঙ্গে সে যেন আর না মেশে। বিন্দুবাসিনী স্বামীর কাছে অভিযোগ করেন, হরেন আজকাল বাড়ী থাকে না, আবার জিজ্ঞাসা করতে গেলে মারতে আসে। দিন দিন ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ছে। এমন সময় রাখাল বাইরে থেকে শিস্ দিয়ে হরেনকে ডাকে। রামেশ্বরবাবু সেটা বুঝতে পেরে রাখালকে শাস্তি দেবার জন্যে এগোলে বিন্দুবাসিনী পরামর্শ দেন, পরের ছেলেকে না মেরে বরং তার বাবাকে বলে দেওয়া ভালো। রামেশ্বর বলেন, —"ওর বাপকে বলে বলে মুখ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। যদুনাথের কি পুণ্যিই জন্মেছে, বেচারার মুখ তুলে, কারো সঙ্গে দুটো কথা কবার যো নাই।" রামেশ্বরবাবু চলে গেলে হরেন মার কাছে অনুযোগ করে, তার বাবা তাকে শুধু শুধু বকেন। "আমি দেখবো উনি আমার কি কত্তে পারেন।" হরেনের মা এ কথায় হরেনকে বকুনি দিলে হরেনের পিসি এসে হরেনকে আদর করে এবং বকুনির জন্যে হরেনের মাকে দোষ দেয়। হরেন পিসিমার কাছে বলে, —"বাবা আজ আমাকে বড় অপমান করেছেন।......এর প্রতিবিধান ক'ত্তে পারি কি না। যদি না পারি তবে আমি বেজন্মা।"

পূর্ণবাবু রাস্তা দিয়ে চলছিলেন, হঠাৎ তাঁর গা ঘেষে একটা ডাংগুলি বেরিয়ে যায়। পূর্ণবাবু ভাবেন, মরতে মরতে তিনি বেঁচে গেলেন। আর একটু হলেই গায়ে লাগতো। কোথা দিয়ে পালাবেন ভাবছেন, এমন সময় দলবল নিয়ে রাখাল এসে পূর্ণবাবুকে ঘিরে ধরে। রাখাল বলে,—"যদি দুটি হাত ভেঙ্গে দি, তাহলে আপনাকে কে রাখতে পারে?" পূর্ণবাবু খুবই কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। ছেলেরা তাঁকে মারতে যাবে এমন সময় পাড়ার যুবক কালীকুমার এসে রাখালকে চপেটাঘাত করে পূর্ণবাবুকে উদ্ধার করেন। কালীকুমার তারপর এদের অভিভাবককে বলে দেবে বলে ভয় দেখায়। রাখাল ও তার সঙ্গীরা কেঁচোর মতো পালিয়ে যায়। যাবার আগে

কালীকুমারের কাছে ধরাধরি করে—যাতে না বলে দেয়। কালীকুমার নিজে মাষ্টারমশায়কে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়।

মন্মথ ও বিধুভূষণ নিজেরা বলাবলি করে যে, তারা রাখাল আর হরেনের মতলব লুকিয়ে শুনেছে। হরেন তার নিজের বাবাকে শাস্তি দেবার জন্যে রাখালের সাহায্য চেয়েছে। বিধু বলে, সে কথায় কথায় বিরাজমোহিনীর ব্যাপারও জানতে পেরেছে। বিরাজ হরেনের বিধবা বোন। রাখালকে হাতে রাখবার জন্যে সে রাখালকে বিরাজের দেহ ভোগ করবার সুযোগ দেবে। হরেন বিরাজকে রাজী করিয়েছে! বন্ধুরা বলাবলি করে—এবার সত্যিই হরেনের সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে! অবশ্য রাখালের প্রস্তাবেই হরেন এসব ব্যবস্থা করেছে। মন্মথ বলে,—"এইবার ঘরের বৌ ঝি ধত্তে আরম্ভ করেছেন। আমরা আর ওদলে মিশবো না।"

বিরাজের ঘর। হরেন একটা চিঠি নিয়ে বিরাজের কাছে আসে! বিরাজকে চিঠি দিয়ে বলে, এই চিঠির কথা যেন প্রকাশ না পায়। বিরাজ বলে, তোমরা যে এ পথে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, যদি কেউ জানতে পারে, তবে মুখ দেখানো যাবে না। হরেন বলে, সে ভার রাখালের। বিরাজ মনে মনে ভাবে,—একদিকে ধর্ম আর একদিকে আনন্দ। অধার্মিকই এখন সুখী। "মরে গেলেই ফুরিয়ে গেল, সুখ হল কই?" বিরাজ শেষে রাজী হয়। হরেন মনে মনে ভাবে, এইভাবে বাবার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। "যাহার পিতা শত্রু, তাহাকে এমনি করেই প্রতিশোধ নিতে হয়।" তারপর বিরাজকে নিয়ে যায় রাখালের সঙ্গে মিলন করাতে।

বৈঠকখানায় একটি চেয়ারে হরেন বসে আছে স্ত্রীর ছদ্মবেশে, অন্য চেয়ারে বিরাজমোহিনী। রাখাল এলে 'বিমলা' ও বিরাজ তাকে মধ্যের চেয়ারে বসতে বলে। রাখাল সব আশা পূর্ণ হতে দেখে আনন্দে বলে ওঠে,—"Now I am a fortunate man, student life কি pleasant। ····হে নব্য কুলপ্রদীপ, সভ্যগণ! সকলে এই পথে অগ্রসর হও, ইহার পারণাম অতি মধুর। সময় গুণে ইহার বিষময় ফলও সুধারূপে পরিণত হয়ে, মানবের অপার সুখ সাধন করে। সকলে মদ্যপান করে। রাখালের সঙ্গীরাও ভাগ পায়। এতোক্ষণ ধরে রাখাল বিরাজের দিকে তাকিয়েই কথা বলছে দেখে হরেন মনে মনে রাগ করে ভাবে, এখন রাখালের সকল আশা পূর্ণ হয়েছে বলে আর তার ওপর ভালবাসা দেখাচ্ছে না! তবুও শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখবার জন্যে হরেন

চুপ করে থাকে। বিরাজ দুটি মধুর গান শোনায়। রাখাল আনন্দে বলে ওঠে,—"আজ আমাদের কি সুখের দিন। কেবল আমাদের কষ্ট দিবার জন্য লেখাপড়া শিখান।......রাত নেই, দিন নেই 'Explanation' মুখস্থ কত্তে কত্তেই প্রাণটা যায়।" বিরাজ বলে, আর সে দেরী করতে পারবে না। বাড়ীতে খোঁজ করলেই সর্বনাশ হবে। রাখাল তাকে সাহস দিয়ে বলে,—"Don't fear for that।" বিধু ও মন্মথ এদের পাশেই ছিলো। তারা মন্তব্য করে,—হরেন এখনো নিজের ভুল বুঝতে পারছে না।

নদীর ধারে রাখাল, হরেন আর বিরাজ। হরেন বলে, সুখ চিরকাল থাকে না। এবার সে কি করবে! বিরাজও হরেনকে দোষ দিয়ে বলে, শুধু দাদার কথাতেই সে এ পথে পা বাড়িয়েছে। রাখাল আশ্বাস দিয়ে বলে, সুখ চিরদিনই থাকবে। হরেন রাখালকে জিজ্ঞাসা করে, সে যে বাগান বাড়ীতে রাত কাটায় বাবা কিছু বলেন না? রাখাল বলে, এর জন্যে তাকে একটু বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় খাটের ওপর সে বালিশকে এমনভাবে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে যে বাড়ীর লোক কিছুই টের পায় না। হরেন বলে, সেও একটা কৌশল করেছে। থিয়েটার যাবার নাম করে এখানে এসেছে। ভাগ্যিস্ সত্যিই এদিন থিয়েটার আছে, নইলে বিপদে পড়তে হতো। বাগানবাড়ীর সামনে একটা গোলাপফুল ফুটতে দেখে হরেন সেটা রাখালকে আনতে বলে। বিরাজও সেই গোলাপটা চায়। রাখাল গোলাপটা এনে বিরাজের হাতেই দেয়। হরেন তখন রাখালের স্বার্থপরতা বুঝতে পারে। হরেন ভাবে,—"আমি নিতান্ত মূর্খ তাই এখনও এ সঙ্গে লিপ্ত আছি। রাখালের মিষ্ট কথায় আর ভুল্‌বো না।" হরেন ঠিক করে, রাখালের সঙ্গে এতোদিন মিশে লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়েছে। তারপর সে রাখালকে জানায়, আজই তার সঙ্গে শেষ দেখা। তার মনে এতো কু-অভিসন্ধি ছিলো, তা সে জানতো না, এই বলে সে চলে যায়। অন্ন মারা যাবার ভয়ে রাখাল হরেনকে শান্ত করতে যেতে চাইলে বিরাজ তাতে বাধা দেয়।

রমানাথ পড়ার ঘরে বই পড়ছিলো। হরেন তার কাছে গিয়ে দুর্ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চায়। হরেন বলে, সে অনেক পাপ করেছে। রাখালই যদি এসব দোষের কারণ, তবু সেও দোষী। রাখাল আজ রাত্রে বিরাজকে নিয়ে পালাবার পরামর্শ করেছে। এইসব ব্যাপার ঘটে গেলে হরেন আর কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না। হরেন রাখালের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে

একটা ছুরি সঙ্গে নিয়েছে। আর প্রতিজ্ঞা পালন না করে সে সারাদিন কিছুই খাবে না—সে ঠিক করেছে। তার এই প্রতিজ্ঞা যাতে সফল হয় এবং রাখালকে যাতে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায় তার জন্যে হরেন রমানাথের সাহায্য চায়। রাখালের ঘৃণিত কাজ যাতে না হয় এবং উপরন্তু রাখালের যাতে শাস্তি হয় তার ব্যবস্থা করবে বলে রমানাথ কথা দেয়।

রাখাল যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথে হরেন আর রমানাথ অপেক্ষা করে। হরেন রমানাথকে বলে, বিরাজ যে রাখালের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে এটা বাড়ীর কেউ জানে না। কাজটা এমনভাবে সারতে হবে যেন কেউই জানতে না পারে। জানতে পারলে পাড়ায় বদনাম। রাতারাতি কাজ শেষ করে বিরাজকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। এরা আলোচনা করছে, এমন সময় দূরে রাখাল ও বিরাজমোহিনীকে দেখা যায়। বিরাজ ও রাখাল—দুজনেই বাড়ী থেকে টাকা পয়সা নিয়ে বের হয়েছে। রাখাল মদ খেয়ে এসেছে। এজন্যে বিরাজ তাকে তিরস্কার করে। ভবিষ্যতে তাকে এসব খেতে বারণ করে। কেননা, মাতাল অবস্থায় কোনো খানায় পড়ে গেলে "কত শ্যাল কুকুরে গায়ে মুতে দেবে।" বিরাজকে রাখাল ভবিষ্যতে কি খাওয়াবে—বিরাজ তা জিজ্ঞাসা করলে রাখাল বলে, সে থাকতে আর কোনো ভাবনা নেই। তাছাড়া বাড়ী থেকে সে যা নিয়েছে তাইতে তাদের সারাজীবন কেটে যাবে। বিশ্রামের জন্যে তারা একটি গাছের নীচে বসে। এমন সময় হরেন আর রমানাথ গাছের পেছন থেকে এসে পড়ে। হরেন লাঠি দিয়ে রাখালকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে। বিরাজ চেঁচাতে আরম্ভ করলে হরেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, —রাখাল তাদের বংশকে কলঙ্কিত করতে যাচ্ছিলো। এই ঘটনা সকলে জানতে পেরেছে—এই ভয় বিরাজ যখন করে, তখন হরেন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, এ ব্যাপার কেউ জানে না। গোলমাল না করে সে বাড়ী চলুক। রমানাথ রাখালের বুকের ওপর চড়ে ছুরি বার করে। রাখাল প্রাণে বাঁচবার জন্যে কাকুতি মিনতি করে। রমানাথ বলে, যে হাতে সে বিরাজকে কুপ্রস্তাব করে চিঠি লিখেছে, সেই হাত তার ভেঙ্গে দেবে। নাক কেটে দেবে। আর, গালে কলঙ্কের ছাপ মেরে উপযুক্ত শাস্তি দেবে। রাখালের আর্তনাদ সত্ত্বেও রমানাথ রাখালকে এইভাবেই শাস্তি দেয়। তবে প্রাণে মারে না। বিরাজ ও রমানাথ চলে যায়। পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন, গুরুকে প্রহার ইত্যাদির জন্যে রাখাল যে শাস্তি পেয়েছে, তার জন্যে রাখাল অনুশোচনা করে। এসব কাজের

জন্যে সে উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা অথচ প্রাণও বেরোয় না। রাখাল যন্ত্রণায় কাতরায়। এই সময়ে তুজন পাহারাওয়ালা আসে। তারা রাখালকে মাতাল মনে করে এবং রুলের গুঁতো মারতে মারতে থানায় নিয়ে চলে।

রাখালের বাবা যতুনাথ এবং মা করুণাময়ী সকালে দেখেন রাখাল এখনও বিছানায় শুয়ে। কারণ আগের দিন রাতে বালিশের ওপর চাদর চাপা দিয়ে রাখাল বেরিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু হঠাৎ পাহারাওয়ালা বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় এবং রাখালের খবর দেয়। তখন রাখালের বাবা বুঝলেন রাখাল নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল বাধিয়েছে। করুণাময়ী যতুনাথকে অনুরোধ করে—থানায় ঘুষ দিয়ে রাখালকে উদ্ধার করবার জন্যে। যতুনাথেরও সদর আদালতে যাবার আগেই কাজ সারবার ইচ্ছে ছিলো। সদর আদালতকে তাঁর ভয়। তারপর ঘুষ দিয়ে রাখালকে যতুনাথ উদ্ধার করেন। বাবাকে দেখে রাখাল বলে ওঠে, —"আমাকে ছুঁয়ো না, আমি ঘোর নারকী।" যতুনাথবাবু রাখালের অবস্থা দেখে খুবই ভয় পেয়ে যান। তিনি তাকে বলেন,—সে যেন আর না জ্বালায়, এবার থেকে ভালোভাবে যেন কাটায়। রাখাল বলে,—এ অবস্থায় তার মৃত্যুই ভালো; "সুন্দর পদার্থে মোহিত হয়ে মানব পাপ পথে যেতেও সঙ্কুচিত হয় না। ধন্য মোহিনী শক্তি !! বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় পরিণামান্ধ বালকদিগের পক্ষে অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় ব্যাপার !!!"

এই গোত্রীয় আরও কয়েকটি প্রহসনের উল্লেখ করা চলে। এগুলি সবই বাল্যকালের তুষ্প্রবণতাকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে।—

মুষলম্ কুলনাশনং (১৮৬৪ খৃঃ)—দ্বারকানাথ মিত্র॥ পরিবারের তুরন্ত বালকদের কুকর্মের ফলে কিভাবে পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তার বর্ণনা এতে পাওয়া যাবে।

তোমার ভালবাসার মুখে আগুন (১৮৮৫ খৃঃ)—নলিনীলাল দাশগুপ্ত॥ কতকগুলো স্কুলের ছাত্র স্কুলে যাবার নাম করে লাম্পট্য ও অন্যান্য কুকর্ম করে বেড়াতো। তারা তাদের সরল সাদাসিধে বাবা মাকে বোঝাতো যে তারা পড়াশোনায় খুব মনোযোগী এবং ভালো ছেলে। বেশ্যাবাড়ীতে গিয়ে তারা মদ্যপান ও লাম্পট্য করে সবকিছুই তারা বাড়ীতে চেপে রাখতো। একদিন বেশ্যাবাড়ীতে একটা গোলমাল সৃষ্টির ব্যাপারে পুলিস তাদের ধরে নিয়ে যায়।

যৌবনের ঢেউ (১৮৮৫ খৃঃ)—অজ্ঞাত॥ তুটি বাঙালী স্কুলের ছাত্র;

বাইরে ভালো বলে পরিচিত এবং সকলে জানে তারা পড়াশোনায় খুব মনোযোগী। কিন্তু তারা গোপনে একজন বিধবা তরুণীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করে।

ভালবাসার মুখে ছাই (১৮৮৬ খৃঃ)—লালবিহারী সেন॥ চারটি স্কুলের ছাত্র কি করে বেশ্যালয়ের কাছে এক শুঁড়িখানায় গিয়ে গোলমাল করে এবং অবশেষে পুলিস তাদের ধরে নিয়ে যায়, তাই এতে বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মধ্বজের লাম্পট্য ও অনাচার॥—

ধর্মধ্বজের মদ্যপান, অনাচার,—বিশেষ করে লাম্পট্য নিয়ে প্রচুর প্রহসন রচনার সন্ধান পাই। এগুলোর মূলে ছিলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত সমস্যা। কিন্তু এই সমস্ত লাম্পট্য অনুষ্ঠানের আক্রমণাত্মক উপস্থাপন ছাড়াও ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। বস্তুতঃ প্রত্যেক দৃষ্টিকোণই সংস্কৃতি-নির্ভর। তবে কোথাও তা অস্পষ্ট আবার কোথাও স্পষ্ট।

লাম্পট্য সাধারণতঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। কেননা লম্পটের প্রতি ঘৃণাভাব সমাজ ব্যতিরিক্ত সাধারণ ব্যক্তির মনে স্বাধীনভাবে প্রসূত হওয়া সম্ভবপর। সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষের ভাবপ্রবণতার ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। লাম্পট্য এই ভাবপ্রবণতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। প্রাচীনপন্থীরা শাসকগোষ্ঠির অনুকূলে সম্পূর্ণ সমাজ ও ধর্মসর্বস্ব হয়ে পড়েছিলেন। এই সমস্ত সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা ভাবপ্রবণতানির্ভর ছিলো বলেই এসব ক্ষেত্রে ভণ্ডামি ছাড়া উপায় ছিলো না।

প্রদর্শনের সুবিধার জন্যে সাংস্কৃতিক সমাজচিত্র প্রদর্শনাতে প্রহসনগুলো উপস্থাপন করা যাবে। তবে সাংস্কৃতিক দিকটি গৌণ এমন দু একটি প্রহসন উপস্থাপন না করলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়।

গুণের শ্বশুর (কলিকাতা ১৮৮১খৃঃ)—কালীপদ ভাদুড়ী (সাঁত্রাগাছি)॥[১৬] উপসংহারের কবিতায় আছে,—

> "তোরে বাইরে দেখে. সকল লোকে,
> ভাবতো তোকে সদাচার।
> এখন কর্ম দেখে জানলে লোকে
> বর্ণচোরা দুরাচার॥"

১৬। সংশোধিত ও প্রকাশিত।

কাহিনীর পরিণতিতে অন্যতম চরিত্র সতীর বক্তব্যের মধ্যেও লেখকের উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। Calcutta Gazette (১৮৮১ খৃঃ) প্রহসনটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—"Probably a personal attack."   ৯

কাহিনী।—গুণের শ্বশুর বিশ্বনাথ। তাঁর বাবা রুইদাস জীবিত। তাঁর দুই পুত্রের বিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা এখনও তীব্র। তাই পুত্রবধূদের মহলে থাক্‌তে তাঁর সর্বদা ভালো লাগে। রুইদাসেরও নাকি চরিত্রদোষ আছে। কিন্তু বাপ-কা-বেটা বিশ্বনাথের দৃষ্টি অন্তঃপুরেই আবদ্ধ।

স্ত্রীমহলে যখন তাসখেলা চলে তখন তিনি খেতে এসে খেলার সঙ্গী হন। বিশেষ করে বড় বৌমার দিকে খেল্‌তে তাঁর ভালো লাগে। বৌমারা লজ্জা পেলে শ্বশুর বলেন, কেন লজ্জা কি, এই যে বড় বৌমা খেল্‌ছেন, সাহেবদের বৌরা 'বিলেতে' তাদের শ্বশুরের সুমুকে নাচে, এ সব নির্দোষ আমোদ এতে দোষ কি।" বাড়ীর ঝিও অপ্রকাশ্যে কর্তার এই বেহায়াপনার নিন্দা করে। বলে, যাদের টাকা আছে, তাদের কিছুতেই দোষ নেই! বিশ্বনাথের বাইরের ভণ্ডামি আছে পুরোপুরি। তাই ছোটছেলে হরিদাস—যার বয়স বাল্যের সীমা অতিক্রম করেনি, তাকেও এদের সঙ্গে তাস খেল্‌তে দেখ্‌লে বকেন। অবশ্য হৈমবতীকে বিশ্বনাথ ভয় করেন যমের মতো। কারণ সে তাঁর বড় বৌমার প্রতি দুর্বলতার কথা জানে। শুধু সে নয়, বাড়ীর সকলেই কিছু কিছু আন্দাজ করেছে। বিশ্বনাথের মেয়ে যখন বলে, বাবার জলখাবার সময় বড় বৌ কাছে না থাকলে জল খাওয়া হয় না,—তখন বিধু বলে, আর কদিন পরে হয়তো বড় বৌর বাতাস না পেলে বাবুর ঘুম হবে না।

হৈমবতী একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলো, বৌমা ছাদে বেড়াতে গেলে পেছন পেছন তার শ্বশুর অর্থাৎ হৈমবতীর স্বামী বিশ্বনাথও উঠলেন। তীব্র জ্বালা নিয়ে হৈমও ছাদে উঠে যায়। ছাদে বিশ্বনাথ পুত্রবধূর হাত ধরে যে কথা বলে, তা শুনে সে শিউরে ওঠে। মনের দুঃখে ঝিকে হৈম বলে,—"ভাতার যদি বার ফাটকা হয়, তাহলেও মনে আশা থাকে যে, কিছুদিন পরে শোধরাবে।" মেয়েটা যেন তার সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে না তাড়ালে স্বামীর চরিত্র ভালো হবার আশা নেই। ঝিকে বলে, বড় বৌকে একদিন সে ভুলিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসুক। নগদ ২০০ টাকা এবং আরও কিছু পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ঝি রাজী হয়। ভাবে,—বড় বৌ রূপসী এবং যৌবনসম্পন্না। তাকে দেহবিক্রী করিয়ে টাকা রোজগার করানো যাবে

—এতে ঝিরও লাভ। ঝি একদিন হৈমের কথামতো বড় বৌমাকে অন্যত্র রেখে আসে।

বিশ্বনাথের চরিত্র অপরিবর্তিতই থেকে যায়। যথারীতি কিশোরীরও বিয়ে হয়। বিশ্বনাথ এবার নতুনটির প্রতি দৃষ্টি দিলেন। মদ্যপান শেষ করে একদিন ইয়ার বন্ধু চুনীকে বিশ্বনাথ বলেন,—"তের বছরের মেয়ে বে দিয়েছিলাম, তুই তিন মাস পরে দ্বিতীয় বিবাহ হয়, আর সেও এক বছর হল। খুব বাড়ন্ত গড়ন, আমার কাঁধের সমান উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে।" তার কথা স্মরণ করে প্রমত্ত বিশ্বনাথ আদিরসাত্মক গান গেয়ে ওঠে। এইভাবে বিশ্বনাথের লালসা তার স্বাভাবিক মনুষ্যত্বটুকুও ধ্বংস করে দেয়।

বিশ্বনাথ একদিন প্রমদার কাছেও কুপ্রস্তাব করেন। স্তম্ভিত প্রমদা শ্বশুরকে ধিক্কার দেয় এবং কেঁদে কেটে তিনদিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে। কিশোরীর স্ত্রী সতীর কাছেও নাকি তিনি একটি প্রণয়পত্র পাঠিয়েছেন।

বিশ্বনাথের ব্যভিচার দোষ সন্তানের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। রুইদাসের পুত্র বিশ্বনাথ বাপ-কা-বেটা বলে অহঙ্কার করেছেন, কিন্তু বিশ্বনাথের ছেলে কিশোরী অহঙ্কার না করলেও তার মনেও কুপ্রবৃত্তি জাগে। তাই সে তার বৌদি প্রমদাকে ডাক্তারখানা থেকে একটা Kiss-me-quick এনে দিয়ে বলে. "আমি Swear করে বল্‌তে পারি আমার Life যতদিন থাকবে, তোমার উপর এমনিই Love থাক্‌বে।" অশিক্ষিত প্রমদা ইংরাজী কথা বুঝতে না পারলেও কিশোরীর স্ত্রী সতী এসে এটা দেখে ফেলে এবং তাকে ধিক্কার দেয়। বলে, "বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে কোথায় গুরুজনের মতো মান্য করতে হয়, তা এ বাড়ীর কি সবই উল্টো!" অনাহারে দুবল প্রমদা ঘটনাটি উপলব্ধি করে মরমে মরে যায়। সতী কিশোরীকে উপদেশ দিতে গিয়ে পদাঘাত খায়।

সতী আর কিশোরী চলে গেছে। হাতে Kiss-me-quick নিয়ে প্রমদা ভাবছে, এমন সময় নির্লজ্জ শ্বশুর বিশ্বনাথ আবার দেখা দিলেন। শিশিটা হাত থেকে নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে প্রমদাকে তার মানে বুঝিয়ে দেন। তারপর বলেন,—"তা তোমার হাতে যখন এইটি রয়েছে, তখন আমার কাজে করা উচিত।" তার হাত ধরে বিশ্বনাথ চুম্বন করতে গেলে নাটকীয়ভাবে হৈমবতী এসে বিশ্বনাথকে সম্মার্জনীর চুম্বন দেয়। অন্তরের অসহ্য গ্লানিতে সে বলে, ছেলেবেলায় শাশুড়ী কেন তাকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলেনি!

শ্বশুরের কাছ থেকে প্রেমপত্র পেয়ে সতী এম্‌নিতেই ক্ষুব্ধ ছিলো। তার

ও'র স্বামীর কুপ্রবৃত্তি দর্শন করে এবং পদাঘাত লাভ করে সে অন্তরের জ্বালায় বিষপান করলো। গুরুজন কোথায় ভাল উপদেশ দেবেন, না তিনিই পাপ পথে নিয়ে যান। এখানেই ছিলো তার ক্ষোভ। মরবার আগে সে বলে যায়, —"সকলেই বলে, এরা বড় হিঁদু, সন্ধে আহ্নিক, পূজোআচ্ছায় ছেলেবুড়ো সকলেরই সমান ভক্তি। কি আশ্চর্য!...এদের যে আচরণ, হিঁদু দূরে থাক, মোছনমান, মেলচ্ছ, অসভ্য বুনো জাতিদেরও বোধ হয়, এমন স্বভাব নয়।"

লাম্পট্য সম্পর্কিত প্রহসনগুলোর অন্ততঃ নামোল্লেখ করবার মতোও অনেক নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থ শেষে প্রদত্ত বিরাট তালিকাটি অনুসন্ধান করলে এ ধরনের প্রচুর প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যাবে। গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে এগুলোর উল্লেখ থেকে বিরত হতে হলো।

বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্য সম্পর্কিত সাময়িক ঘটনা কেন্দ্রিক ॥—

অধিকাংশ প্রহসন রচনার উৎসই অনাবিষ্কৃত। তাই এগুলো সাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা হলেও আনুমানিকভাবে ঘটনার ইঙ্গিত করা প্রকৃত ঐতিহাসিকের পক্ষে নিরাপদ নয়। সমসাময়িককালের লুপ্ত ও প্রাপ্য পত্রপত্রিকা, পুলিশ রিপোর্ট, কোর্টের নথিপত্র ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানে পরবর্তী গবেষকরা পদক্ষেপ করবেন, আশা রাখি।

লাম্পট্যকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত একটি ঘটনা হচ্ছে তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরির লাম্পট্য। এ নিয়ে রচিত প্রহসন পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই পৃথক চিত্র দেবার আগে দু'একটি সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক প্রহসন উপস্থাপন করা যেতে পারে।

মক্কেল মামা (১৮৭৮ খৃঃ)—নটবর দাস ॥ সমসাময়িককালে কোলকাতা হাইকোর্টে একটি হিন্দু-ব্যভিচার সম্পর্কিত মোকদ্দমা চলে। প্রহসনটির বিষয়-বস্তু তাকে নিয়ে। একজন ব্যক্তি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে তার নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে ব্যভিচারে রত হয়। অবশ্য মামার প্রলোভনেই ভাগ্নী তার ধর্ম নষ্ট করে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর তালিকার মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, এটা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মোকদ্দমা। ব্যক্তিটির নাম উপেন্দ্রনাথ বসু। সে তার ভাগ্নী ক্ষেত্রমণিকে ধর্ষণ করায় তার জেল হয়।

মামা ভাগ্নীর নাটক (১৮৭৮ খৃঃ)—মহেশচন্দ্র দাস দে ॥ 'মক্কেল মামা' প্রহসনটির যে বিষয়বস্তু, তা নিয়েই এটিও রচিত।

ব্যাপক গবেষণা বিভিন্ন ঘটনা আবিষ্কারে সহায়তা করবে। তবে তাতে মাত্রা নির্ধারণের প্রশ্ন ব্যতীত উপাদান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন আসে না। মাত্রা নির্ধারণের দায়িত্ব বর্তমান সমাজচিত্র গ্রাহকের যত তাই থাক, প্রাথমিক পদক্ষেপে পরিধি বিস্তার ঘটানো সম্ভবপর নয়।

মোহন্ত ও যৌন দুর্নীতি ॥

মোহন্ত শব্দটি 'মহান্ত' শব্দটির ব্যঙ্গাত্মক প্রয়োগে কিংবা অজ্ঞাতসারে "মোহের অন্ত হয়েছে যার"—এই ধারণায় প্রযুক্ত। শব্দটি মহান্ত, মহন্ত, মোহন্ত, মোহান্ত—এই চার'রকম বানানেই দেখা যায়। ভাগবতে 'মহান্ত' কাকে বলা হয়, তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,—

> "মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।
> যে বা ময়ীশে কৃত সৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভর বার্ত্তিকেষু।
> গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥[১৭]

এক্ষেত্রে মহান্ত বা মোহন্ত নামধেয় ব্যক্তি যখন বিষয়াসক্ত এবং পরদারগামী হন, তখন সমাজে তা নিয়ে আন্দোলন হওয়া স্বাভাবিক।

তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরির লাম্পট্য সম্পর্কিত একটি ঘটনা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনে বিচলিত গণমানস থেকে প্রচুর নাটক প্রহসনের জন্ম হয়। বিশেষতঃ প্রাহসনিক দৃষ্টির ব্যাপক প্রচারে "বঙ্গবাসী" পত্রিকা ছিলো পুরোভাগে। মোহন্তের কারামুক্তির (১২৮৬ সাল) পরও "বঙ্গবাসী" এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছে। দুঃখের বিষয়, বঙ্গবাসীর সমসাময়িককালের সংখ্যাগুলো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। "নিরপেক্ষ-অনুসন্ধান" নামে একটি পরিচয়হীন পুস্তিকায়[১৮] রক্ষণশীলের পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়েছে,—"গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ হইতে বঙ্গবাসীতে ৺তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ মাধবগিরির বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ নানা কেলেঙ্কারীর কথা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইতেছে; তৎপাঠে দেশবিদেশে লোকসমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে।…যেমন একটি শৃগাল ডাকিবামাত্র সমস্বরে সকল শৃগাল ডাকিয়া উঠে, তদ্রূপ ঐরূপ পত্রিকা সম্পাদকগণও একখানি

১৭। শ্রীমদ্ভাগবত—৫।৫।২—৩।

১৮। সনৎকুমার গুপ্ত—ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

কাগজে যাহা রচিত হয়, তাহাই পাঠ করিয়া হুজুগে মত্ত ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হন, এবং যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়াই স্ব স্ব পত্রিকায় তাহাই প্রকাশ করেন (পৃঃ ৩)।" প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের সমর্থনপুষ্টিতে বেঙ্গল থিয়েটারও সক্রিয় ছিলো। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখ্ছেন,—"বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় চল্‌ছে, কিন্তু জম্‌ছে না, শেষে বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন; মোহন্ত মহারাজ এক ষোড়শী এলোকেশী যাত্রীর রূপে মোহিত হলেন, এলোকেশীর স্বামী পত্নী বধ করলেন; কে একজন বাঙ্গালী (কৃশ্চান বোধ হয়) "মোহান্তের এই কি কাজ" বলে নাটক লিখ্‌লেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল, আমি আর নগেন উপরি উপরি দু'রাত্রি টিকিট কিনতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। মাইকেলের পরামর্শে নারী একট্রেস নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহান্তের অভিনয়ে টিকিট না পেয়ে শত শত লোক ফিরে যেতে লাগল।"[১৯] এই সমস্ত উক্তির মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং তীব্রতা সহজেই অনুমেয়।

তারকেশ্বরের মোহন্ত-ঘটনা সম্পর্কে ১২৮০ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "ভারত সংস্কারক" পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদটি পরিবেশন করা হয়। সংবাদটি দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিটির উপস্থাপন প্রয়োজনীয়,—বিশেষ করে সর্বজনপূজ্য ব্যক্তির কলঙ্কঘটিত বিষয়কে সংবাদের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করাই নিরাপদ।—

"নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কলিকাতার মিলেটরি অর্ফ্যান প্রেসের জনৈক কর্ম্মচারী তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ঘোলা গ্রামে বিবাহ করে। অন্য কোন অভিভাবক না থাকাতে তাহার যুবতী স্ত্রী তাহার পিত্রালয়ে থাকিত। নবীন মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিত। একদা নবীন তাহার স্ত্রীর চরিত্র বিষয়ে কুসমাচার শ্রবণে সন্দেহান্বিত হইয়া কতিপয় দিবসের ছুটি লইয়া হঠাৎ এক রজনীতে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়। তৎকালে তাহার শ্বাশুড়ী ও পত্নী গৃহে ছিল না। কারণ জিজ্ঞাসিলে তাহাকে বলা হইল যে, তাহার স্ত্রী পীড়িতা হইয়াছে, তজ্জন্য মোহন্তের নিকট ঔষধ আনিতে তারকেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছে। নবীন তৎক্ষণাৎ মন্দিরে গমন করিল, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। প্রত্যাগমনকালে একজন ইতর লোকের প্রমুখাৎ শুনিল যে তারকেশ্বরের

১৯। মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪ সাল।

মোহন্ত তার স্ত্রীকে নষ্ট করিয়াছে এবং সে প্রতি রজনীতেই মোহন্তের বাড়ীতে যাতায়াত করে। মোহন্ত তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে ইহার জন্য কিছু কিছু অর্থ দিয়া থাকে। নবীন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাহার শ্বশুরকে নীচ প্রবৃত্তির জন্য যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহার স্ত্রী ও শ্বাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীনের উত্তেজনায় তাহার স্ত্রী স্বীকার করল যে তাহার পিতামাতা অর্থলোভে তাহাকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিয়াছে। নবীন স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে কলিকাতায় আনিতে চাইলে সে তাহাতে সম্মত হইল। কিন্তু তাহার শ্বশুর শাশুড়ী লাভের পথ অবরোধ হইতেছে জানিয়া মোহন্তকে সমাচার দিল। মোহন্ত বলিয়া পাঠাইল যে যখন নবীন পাল্কী করিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বারা পাল্কীশুদ্ধ তাহাকে আপন আবাসে লইয়া যাইবে এবং তথায় তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিতে পারিবে। নবীন জানিতে পারিয়া একেবারে হতাশ হইল এবং কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মনের অসহ্য কষ্টে একখানি অস্ত্র লইয়া দুই তিন আঘাতেই পত্নীকে হত্যা করিল। হত্যা করিয়াই হুগলী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গিয়া সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল, শীঘ্র আমাকে ফাঁসী দিন, এই পৃথিবী আমার পক্ষে অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, শীঘ্র পরলোকে গিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইব। কি ভয়ানক, কি ভয়ানক, কি ভয়ানক !!! এই সংবাদটি লিখিতে আমাদের হস্ত কাঁপিতেছে, শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইচ্ছা হইতেছে, এ সময় মোহন্ত এবং ঐ পাপাত্মা পিতামাতাকে সম্মুখে পাইলে ইহার প্রতিফল দি! হুগলীতে এ বিষয়ে বিচার হইতেছে।"

উক্ত সংবাদ শেষে সাংবাদিকের নিজস্ব মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক সমাজপরিবেশের ইঙ্গিত আছে। তিনি বলেছেন,—"তারকেশ্বরের মোহন্তটির চরিত্রের বিরুদ্ধে আমরা আরও অনেক কথা শুনিয়াছি। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথের মোহন্তের এই প্রকার অত্যাচার জন্য আদালতে বিচার হইতেছে। তীর্থ সকলের পাণ্ডাদিগের সমুচিত দণ্ড হওয়া সত্বর আবশ্যক। ইহারা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া যারপরনাই অলস ও ভোগবিলাসী হয়, অথচ ইহাদের বিবাহের প্রথা নাই। এ অবস্থায় ইহারা যে ঘোরতর জঘন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব ইন্দ্রিয়শক্তি চরিতার্থ করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের প্রস্তাব, গভর্ন্মেণ্ট কোর্ট অব ওয়ার্ড স্থাপন করিয়া

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ধনিসন্তানদিগের সম্পত্তিভার যেমন সহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ এতদ্দেশে দেবসেবাদি জন্য যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট বিপুলবিত্ত মোহন্তদিগের ভোগজাত হইতেছে, তাহার ভার স্বহস্তে লইয়া নিয়মিতরূপ কার্য্যনির্ব্বাহের বিশেষ ব্যবস্থা করুন।”

শ্রদ্ধাস্পদ মোহন্ত সমাজের মধ্যে এই ঘটনা অবাস্তব বলা যেতে পারে না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখের সমাচার দর্পণে “তারকেশ্বর মহন্তের পুণ্য প্রকাশ” নামে একটি সংবাদে তারকেশ্বরের অন্য একজন মোহন্ত “মন্তগিরির” (!) বেশ্যাসক্তি ও ব্রহ্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া পূর্বোল্লিখিত মোহন্ত ঘটনার পরেও ধনদৌলত ও তারকেশ্বরের গদী নিয়ে শ্যামগিরি এবং মাধবগিরির দীর্ঘকালের মোকদ্দমা মালিন্যেরই পরিচয় বহন করে। অন্যান্য বিভিন্ন প্রহসনেও একটি কুকাজের দৃষ্টান্ত হিসেবে মোহন্ত-ঘটনাটি স্মরণ করা হয়েছে। কুঞ্জবিহারী বসুর “তুই না অবলা” প্রহসনে (১৮৭৪ খৃঃ) একটি কবিতা আছে,—

“মন্দ কাজ ঢাকা দেখ, কখন না রয়।
অবিশ্যি প্রকাশ হবে জেন গো নিশ্চয়॥”

কবিতাটির প্রসঙ্গে থাকমণি মন্তব্য করে,—“তা না তো কি দিদি—তার সাক্ষি দেখ না কেন—ঐ মোহন্তের বিষয়টা সে তো বড় বেশী দিনের কথা নয়—দেখ দেখি তারা তো কত চুপি চুপি বল্‌তে গেলে প্রায় প্রথমে কেউই টের পায় নি—এমন করে কর্ম্ম করেছে লো—তবু কি দিদি সিটি অপ্রেরকাশ রইলো, না সেটি কেউ জান্‌তে বাকি রইলো!” মলিয়ারের স্কুল অব্ ওয়াইভ্‌স্-এর বিষয়বস্তু অবলম্বন করতে গিয়েও অমৃতলাল বসু তাঁর “চোরের উপর বাটপাড়ি” প্রহসনে (১৮৭৬ খৃঃ) মোহন্তের প্রসঙ্গ না দিয়ে পারেন নি। ১ম দৃশ্যে হাতুড়ী ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে কাঙ্গালী গান গায়,—

“এসেছে লবীন আবার বাংলা মুলুকে।
সে যে স্বাধীন হয়ে—কোরে বিয়ে,
কাল কাটাবে মনের সুখে॥
ঘানির বিত্তন্ত, জেনেছে মোহন্ত,
থাকতে জীবন্ত, পরনারীর নামটি আন্‌বে না মুখে।”

কথা প্রসঙ্গে নারায়ণ কাঙ্গালীকে বলে,—নবীনকে টেম্পল সাহেব দয়া করে খালাস দিয়েছেন। এখন সিমূলে কোন্ বাবুদের বাড়ীতে আছে। কাঙ্গালী

জিজ্ঞাসা করে,—"হাঁ গা, লবীন লবীন লবীন। লবীনটি কেমন?" নারায়ণ জবাব দেয়,—"কেমন আর, তুমি আমি যেমন। যাহোক, একটা হুজুগ কোরে অনেকে অনেক পয়সা রোজগার কল্লে, বিশেষ বটতলার বইওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালারা।" কাঙ্গালী মন্তব্য করে,—"হাঁ ঠিক ঠিক, আমি একবার চার আনার এক টিকিস্ কোরে ব্যাংগোলে মোহন্ত লাটক দেখে এসেছি। আঃ ভ্যালা য্যা হোক্, এলোকেশীকে কেটে লবীন যা কল্লে, রক্তে রক্তপাত! চরকি ঘুরে পাগল হ'ল—সেইখানটি বাবু আমার বড় ভাল লেগেছিল।" নারায়ণ বলে,—"আমি ওসব দেখেছি, আমার ফ্রি টিকিট ছিল। মোহন্তের রামায়ণ পর্যন্ত দেখেছি—মোহন্তের 'সাতকাণ্ড'। সেদিন যে 'মোহন্তের ঘানি' করেছিল, বহুৎ আচ্ছা! কোথা লাগে গ্রেট ন্যাশন্যালের 'সতী কি কলঙ্কিনী'!"

প্রহসনে শুধু মোহন্ত ঘটনা নয়, আন্দোলনের কথাও স্মরণ করা হয়েছে। "মোহন্ত তেল" নাম দিয়ে এ সময়ে তৈলব্যবসায়ীদের অনেকে লাভবান হয়েছে এমন একটি সংবাদ পূর্বোক্ত প্রহসনে পাওয়া যায়। "মিস্ত্রীমশাই, একটাকা দিয়ে এক বোতল মোহন্তের তেল কিনে নে গেছলেন, তেলটার যে ঝাঁজ, দু-দিনে বুন্নুয়ের দাদ আরাম হোয়ে গেল।" 'মোহন্তের এই কি দশা' প্রহসনে মোহন্তের ঘানি টানার একটি চিত্র আছে। বিভিন্ন প্রহসনে প্রচারিত হয়েছে মোহন্ত জেলে ঘানি টেনেছেন। মোহন্ত তেল সেই ঘানি থেকে নিঃসৃত তেল! অবশ্য এই সংবাদের উপযুক্ত ভিত্তি পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন কবিতায় ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ কম থাকা উচিত হলেও, এগুলো যে প্রহসন তথা প্রাহসনিক দৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত নয়—এটা বলা কঠিন। মহেশচন্দ্র দাস দে-র লেখা "মাধবগিরি মহন্ত এলোকেশী পাঁচালী" পুস্তিকায় আরম্ভে একটি সংবাদের উল্লেখ আছে।—

"কমরুল গ্রাম মধ্যেতে পরস্পর কয় সকলেতে
জলের ঘাটে আসিয়া তখন।
হেনকালে মন্দাকিনী নীলকমলের গৃহিণী
এই বাক্য করিল শ্রবণ॥
কহিছে কোন রসবতী, ওগো ব্রাহ্মণ যুবতী
শুন মাগো বলি গো তোমারে।

তব কন্যা এলোকেশীরে লয়ে যাহো তারকেশ্বরে,
ঔষধ খাওয়ায়ে আন তারে ॥
তার বয়েস যায় নি ছেলে হবার, কত ছেলে হবে আবার,
ঔষধ যদি খায় একবার।
তারকনাথের হয়েছে স্বপ্ন; ঔষধ খাবে করে যত্ন
হইবে উত্তম পুত্র তার ॥"

মূল ঘটনা এক হলেও খুঁটিনাটি ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তিকায় যথেষ্ট অমিল দেখা যায়। মাত্রা নিরূপণের জন্য সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তারকেশ্বর নাটক" অনেকটা সাহায্য করতে সক্ষম—বাহ্যতঃ আশা করা যায়। নাটক শেষে লেখক একটি পত্রে বলছেন,—

"This Drama is entirely based upon the Newspapers and by the oral conversations of the Hero of this Drama (Nobine Chandra Banerjee). Mohunto Raja is a Great land Lord of Tarokeshor. And one of the priests of the Hindoos. We cannot express our opinion untill the Judgement of the session is finished , but only depending our this Drama according to defendent Nobine Chandra Banerjee declared at the court of Magistrate of Hooghly. I hope that in the second part we express our opinion, who is guilty or innocent.[২০] ভূমিকায়ও তিনি লিখেছেন,—"এই ঘটনা সবিশেষ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার জনৈক বন্ধুকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলাম; তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করি।[২১] কিন্তু লেখক যে সংবাদ সরবরাহ করেছেন, তা লোকশ্রুতিগত এবং অস্পষ্ট। বরং বিচারকালীন অবস্থায় সাধারণের পক্ষে আরও সংবাদ জানা সম্ভবপর হয়েছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

পরবর্তীকালে মোহন্তের দোষস্খালন করবার জন্যে অনেকেই অনেক যুক্তির

২০। Calcutta—4th September, 1873.

২১। ২১শে শ্রাবণ, ১২৮০ সাল।

অবতারণা করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত "নিরপেক্ষ অনুসন্ধান" পুস্তিকায় লেখক বলেছেন,—"এলোকেশীর মোকদ্দমায় মোহান্ত মহারাজের বিরুদ্ধে এমন কোন বিশেষ প্রমাণ ছিল না যে, তিনি দণ্ডিত হন, এবং তিনি চেষ্টা করিলে ভদ্র ভদ্র লোক দ্বারা নিজ নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিতে পারিতেন। বাস্তবিক এক্ষণে অনেক লোকের মুখে উহার গুপ্ত রহস্য ও প্রকৃত বিষয় যাহা শুনা যায়, তাহাতে বোধহয় অনেক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে মোহান্ত দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মোহান্তের কৌন্সীলি মিঃ জ্যাক্সন বিচারস্থলে বলিয়াছিলেন, তাঁহার মক্কেলের বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, সাফায়ের সাক্ষ্য দেওয়ান নাই। কেবল মোহান্ত মহারাজ আপন পক্ষের কুলোকের কু-অভিসন্ধি বুঝিতে অক্ষম হইয়া পলায়ন করেন, জজ্ বাহাদুর সেই অপরাধ ধরিয়াই দণ্ড প্রদান করেন। বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ গড়গড়ি ঐ মোকদ্দমায় এসেসর জুরী ছিলেন, তিনি মোকদ্দমার আদ্যন্ত সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া শুনিয়া মোহান্তকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাহাতে তাঁহাকে কত লোক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা করে ও উৎকোচগ্রাহী বলে অপবাদ দেয়।" (পৃঃ ৬)। পুস্তিকাকারের মন্তব্যটি যুক্তিশূন্য বলা চলে না। মোহন্তের শত্রু সংখ্যা কম ছিলো না। শ্যামগিরিকে কেন্দ্র করে চাঁতুর, বৈদ্যপুর, সন্তোষপুর, আলাটী, রৈয়ে, অমরপুর, গড় কৃষ্ণনগর, বাহিগড, ভঞ্জীপুর, জ্যোৎশম্ভু ইত্যাদি তারকেশ্বরের কাছাকাছি বহুস্থানের প্রচুর প্রভাবশালী ব্যক্তি অনেকদিন ধরে তাঁর প্রতি শত্রুতা করে এসেছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। (ঐ পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অযুক্তিমূলক প্রচুর কারণ দেখিয়ে অনেকে ব্যভিচারেই মোহন্তের সমর্থ দেখিয়েছেন। পরে উপস্থাপিত "মহন্ত পক্ষে ভূতো নন্দী" প্রহসনটির (১৮৭৪ খৃঃ) মধ্যে এ ধরনের সমর্থন আছে। অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুই তাঁদের সংস্কারের ওপর আঘাত নিতে চান নি। "নিরপেক্ষ অনুসন্ধান" পুস্তিকাতেও বলা হয়েছে,—"যার কৃষ্ণচরিত জানা আছে, মহাদেবের কুচনী পাড়ার কথা কি মনে হয় না? তাঁহারা কি, দেবতা বলিয়া পুজিত হইতেছেন না? 'বঙ্গবাসী' তোমার মিথ্যা নিন্দা করা হেতু শীঘ্রই তাহার ফল বাবা তারকনাথই দিবেন।" (পৃঃ ২২)। "মহন্ত পক্ষে ভূতো নন্দী" প্রহসনে শ্রীকৃষ্ণরাধা সম্পর্কিত তত্ত্বের অনুরূপ একটি তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে। যথাস্থানে তা সন্নিবিষ্ট আছে।

মোহন্ত ঘটনার ব্যাপক প্রচারের কারণ ধর্মধ্বজের বিরুদ্ধে ব্যাপক সাংস্কৃতিক

অভিযানের পথ বলা যেতে পারে। কারণ প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী উপকরণই দ্বৈতীয়িক ক্ষেত্রে আক্রমণের প্রারম্ভিক অস্ত্র। কিন্তু লাম্পট্যের ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত করে যেগুলো ঘটায় সেগুলোকে যৌন বিভাগের অন্তর্গত করা যেতে পারে।

তারকেশ্বর নাটক অর্থাৎ মহন্ত-লীলা (কলিকাতা ১৮৭৩ খৃঃ ১ম খণ্ড) —সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ১ম খণ্ডটি প্রহসনাত্মক বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত নয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি লুপ্ত। তারই সংযোগে তারকেশ্বর নাটক বিদ্রূপাত্মক প্রহসন। কিন্তু আংশিক উদ্ধারের তাগিদে এবং মাত্রাবিচারের জন্যে এটি উপস্থাপনের প্রয়োজন। নামকরণ স্বতন্ত্র। চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের "মোহন্তের এই কি কাজ" প্রহসনের দ্বিতীয় সংস্করণের নামকরণগুলো অনেকটা যথাযথ। যথাস্থানে সেই নামকরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপনে সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখ্ছেন,—"সম্প্রতি তারকেশ্বরে অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র নাটকখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহারা এই ঘটনার কিছুমাত্র অবগত নহেন, তাঁহারা যদি এই নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইবেক।" মলাটে পুস্তিকাকার লিখেছেন,—

"পাপকর্ম কভু দেখ ছাপা নাহি রয়।
অবশ্য প্রকাশ হবে জানিহ নিশ্চয়।"

কাহিনী।—হরিহর তারকেশ্বরের মোহন্ত। সে "সদা সর্বদা কুলোবালার ফুলমধু অন্বেষণ করে।" হরিহরের প্রচুর অর্থ। অর্থ দিয়ে সে বশীভূত করে থাকে। বিনোদিনীর পিতা ঘোলাগ্রামের হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী অত্যন্ত গরীব। স্ত্রী ক্ষেত্রমণি বলে,—এভাবে দিন আর চলে না। "তাই বলি যে তারকেশ্বরের মহন্তকে মেয়েটি দাও, তাহলে মেয়েটিও সুখে থাকিবে, আর আমরাও প্রতিপালিত হবো।" হারাণ এতে আপত্তি করলে ক্ষেত্রমণি বলে, "তুমি নাই পারো নাই নাই, আমি আমার মেয়েকে তারকেশ্বরের মহন্তর কাছে রোজ রাত্রে পাঠাইয়া দেব। সমাজ এবং লোকলজ্জার কথা যখন হারাণ তোলে, তখন ক্ষেত্রমণি জবাব দেয়,—"তাহলে তখনি মহন্তকে জানাবো, মহন্ত তো তোমা আমার মতন সামান্য লোক নয়, তাকে কেহ ভয় করিবে না, মহন্ত এ দেশের রাজা বল্লেই হয়। যদি সে কোন মন্দ কর্ম্ম করে, তাহা হইলে

কার এত বুকের পাটা যে ইহা প্রকাশ করে।" হারাণ রেগে গিয়ে, বলে,—"যা ইচ্ছে কর গে।" ক্ষেত্রমণি ভাবে, যাক্, এবার মেয়েকে রাজী করাতে পারলে হয়।

এদিকে মোহন্ত ভাবে, "একে তো ইয়ং বেঙ্গলের দল হয়ে ক্রমেই আমার প্রভাব কমে আস্‌চে, এবং রোজগারের পথও ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্চে, এখন তারকেশ্বরে কেই বা আসে, সকলেই আমার ভণ্ডামি বুঝতে পেরেছে।" ক্ষেত্রমণির সঙ্গে মোহন্তের আগেই কথাবার্তা হয়ে গেছিলো। যথাসময়ে ক্ষেত্রমণি এসে বলে, তার মত, এবং কর্তারও একরকম মত, মাসে এখন কত দেবে? ক্ষেত্রমণি পঞ্চাশ টাকার কমে রাজী হয় না। তাছাড়া মাসে মাসে একটা করে গয়না দিতে হবে। মোহন্ত বলে, সে ত্রিশ টাকা দেবে। ক্ষেত্রমণি বলে, "ত্রিশ টাকায় মেয়ে পাবে না বাঁশবনের পেত্নী পাবে। আমি এখনি যদি ও পাড়ার বুড়ো মুকুজোকে মেয়ে দিই, তাহলে মাসে আশী টাকায় পডতে পায় না।······কলিকাতা সহরে বাবুরা এক একটা মেয়েমানুষকে মায় খোরাক পোষাকে মাসে একশো দেড়শো টাকা মাহিনা দিয়েও মন পায় না, এ সওয়ায় কত গহনা দেয়। এ পাড়া গাঁ ও আপনাকে বলিয়া দর কম বলেচি, সহরে বাবুদের কাছে হলে এর আর কথাটী কহিতে হতো না।" মোহন্ত পঞ্চাশ টাকাতে রাজী হয়। অবশ্য বলে,—"মেয়ে দেখে তখন দরের চুক্তি হবে।" স্থির হয়, পরদিন মেয়েকে নিয়ে আস্‌বে। ক্ষেত্রমণি চলে গেলে মোহন্ত ভাবে,—"অর্থের লোভে সকল কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা না হইলে স্বীয় জননী আপন দুহিতাকে ব্যভিচারিণী বৃত্তি অবলম্বন করাইতেছে।"

ক্ষেত্রমণি কন্যা বিনোদিনীকে চুল বাঁধতে বলে। মোহন্তর লোক আসবে, তার সঙ্গে তারকেশ্বর যেতে হবে। বিনোদিনী তার সই সুলোচনার মুখে মা-র ষড়যন্ত্রের কথা শুনেছিলো। মাকে সে বলে ওঠে,—"না মা আমি প্রাণ থাকতে কখনই এমন গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবো না।" স্বামীকে স্মরণ করতে করতে বিনোদিনী মূর্চ্ছা যায়। ক্ষেত্রমণি ভাবে, মেয়ে যে এমন করবে, আগেই ভেবেছিলো। মূর্চ্ছা ভাঙলে ক্ষেত্রমণি তাকে আবার বোঝায়,—"ও ছুঁড়ি, তুই যে বুঝতে পারচিস্ নে এই হলে আমাদের ভাৎভিৎ চলে, আর তোর ভাতার যেকালে পাঁচ ছয় মাস আসে নি সেকালে বেঁচে আছে কি মরেচে তারি বা ঠিক কি, এটা মন্দ কর্ম্ম হলে আমি কি মা হয়ে তোকে করতে পরামর্শ দিই।" বিনোদিনী তখন 'মাতৃস্নেহ'কে ধিক্কার দেয়, সমস্ত পৃথিবীকে ধিক্কার

দেয়। বলে,—"আমাকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে করো।" ক্ষেত্রমণি বিনোদিনীকে সঙ্গে করে তারকেশ্বরে রওনা হয়।

ক্ষেত্রমণির কন্যা বিনোদিনী বিবাহিতা। তার স্বামী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবাজার হিরে কাটার গলিতে থাকে। পুরোপুরি ইয়ং বেঙ্গল দলের সভ্য। স্ত্রীর ব্যভিচারের সংবাদ পেয়ে সে চিন্তিত হয়। পাঁচ ছয় মাস তার স্ত্রী বাপের বাড়ী আছে। এর মধ্যে নবীন আর সেখানে যায় না। বন্ধু চন্দ্রশেখর তাকে পরামর্শ দেয়,—নবীন প্রথমে শ্বশুর বাড়ী যাক—সেখান থেকে তারকেশ্বর। যদি এসব সত্যি বলে কিছু প্রমাণ পায়, "তাহলে এমন স্ত্রীর মুখাবলোকন না করিয়া তখনি প্রাণহত্যা করিও, আমার বিবেচনা তো এই হয়।" দু একজন বন্ধু নবীনের সঙ্গে যেতেও চায়।

হারাণ একা একা দুশ্চিন্তা করে—কাজটা কি ভালো হলো? অন্যদিকে অর্থের লোভ। একা একা যখন এসব কথা হারাণ ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ নবীন এসে তার কাছে উপস্থিত হয়। নবীনকে দেখে সে চমকে ওঠে। ইয়ং বেঙ্গল নবীন যদি এসব শোনে, তাহলে হয়তো কিছু কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। নবীন হারাধনের কাছে শাশুড়ী ও স্ত্রীর খোঁজ করলে হারাধন বলে, তারা তারকেশ্বরে ওষুধ আনতে গেছে। নবীনের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। নবীন বলে, কালই তাকে কলকাতায় যেতে হবে। সুতরাং আজ তারকেশ্বর গিয়েই সে তাদের সঙ্গে দেখা করবে। হারাণ বলে, যেতে হলে কাল সকালে যাওয়া ভালো, কেননা, পথ সুবিধের নয়—ডাকাতের ভয়! নবীন বলে, ওতে কিছু হবে না। হারাণ ভাবে, জামাই যদি অন্ততঃ রাতটা কাটবার পর যেতো, তাহলে হয়তো কুদৃশ্য দেখতে পারবে না। তারকেশ্বরে গিয়ে এদিকে নবীন মোহন্তের ঘরে উঁকি দিয়ে সব কিছুই দেখে। তক্ষুণি সে গম্ভীরভাবে ফিরে আসে। হারাণ তাকে দেখে আশ্বস্ত হয়। যাক্ ডাকাতের ভয়ে যায় নি। নবীনও তাকে বলে,—সে ভেবে দেখেছে, রাতে তারকেশ্বরে না যাওয়াই উচিত।

পরদিন শাশুড়ী মেয়েকে নিয়ে ফিরলো। নবীন শাশুড়ীকে বললো, তার স্ত্রীকে নিয়ে এভাবে রাত্রে অন্যত্র থাকা তার কাছে দৃষ্টিকটু লাগছে। সমাজের কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দেবে? সুতরাং আজই সে স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। শাশুড়ী জামাইকে বলে,—তার যখন স্ত্রী, সে নিয়ে যাবে বৈকি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মোহন্তকে খবর পাঠায়—বিনোদিনীকে কলকাতায় নিয়ে যাবার

চেষ্টা করা হচ্ছে, মোহস্ত যেন লোকজন দিয়ে পাল্কী আটকায়। বিনোদিনী চলে গেলে তার রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে।

বিনোদিনীর অন্তরে একটা গ্লানি এসেছে। স্ত্রীকে নবীন এভাবে বিশ্বাস করে নিয়ে যাচ্ছে, এতে নিজের ওপর ধিক্কার এলো। সে নবীনকে সব খুলে বললো। আরও বললো, মা বাবা মোহস্তর কাছে গিয়েছে লোকজন দিয়ে তাকে আটকাতে। নবীন একাই কলকাতায় ফিরে যাক, একটা বিয়ে করুক, সে দাসীর মতো বাড়ীতে থাকবে। স্ত্রীর এই স্বীকারোক্তিতে নবীন তার ওপর সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু ভাবে তার স্ত্রীকে অপরের ভোগ্য করে বেঁচে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। কলকাতায় যাবার পথে পান খাবার জন্যে নবীন স্ত্রীকে পান সাজতে বলে। বিনোদিনী যখন মাথা নীচু করে পান সাজছে, তখন নবীন তাকে তরোয়ালের কোপ মেরে খুন করলো। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে কৃষ্ণগঞ্জ থানার দারোগার কাছে আত্মসমর্পণ করলো।

ঘরে ফিরে এসে হারাণ আর ক্ষেত্রমণি আক্ষেপ করে। শুধু রোজগারই বন্ধ হলো—তা নয়, পুলিস নিয়ে টানাটানি।

মোহন্তের এই কি দশা !! (কলিকাতা ১৮৭২ খৃঃ)—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ॥ ভূমিকায়[২২] লেখক বলেছেন,—"দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার নৃশংস নর-পিশাচ তারকেশ্বরের মোহস্ত মাধবগিরি যে হিন্দুধর্ম্ম সিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্ম্মের পবিত্র নাম কলুষিত করিয়া এত কালাবধি কত শত অবৈধ কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, —কত শত সতীর পবিত্র সতীত্বরত্ব হরণ করিতেছিল—এলোকেশীর সহিত ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ায় এক্ষণে তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। লোকবল, অর্থবল, তদুপরি ধর্ম্মের ভাণ করিয়া দুষ্ট লোকে পৃথিবীতে অনায়াসে প্রায় সকল প্রকার পাপাভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। মাধবগিরি মোহস্তও সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক 'ধর্ম্মের জয়—সত্যের জয় অবশ্যই হইবেক।' যে দুর্ব্বৃত্ত ব্যাপারে ভণ্ড মাধবগিরি এতদিনের পর ধরা পড়িয়াছেন ও যাহার জন্য এতদিন বিচারালয়ে আন্দোলন হইতেছিল, মোহস্তের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর কারাবাস স্থিরীকৃত হইয়া সে দিবস তাহার চূড়ান্ত বিচার হইয়া গিয়াছে।

·····এক্ষণে এই ঘটনা কিছু কালের নিমিত্ত বঙ্গবাসীদিগের মনে জাগরূক

২২। ৪ঠা পৌষ—১২৮০ সাল, কলিকাতা।

রাখিবার জন্য আমি 'মোহন্তের এই কি দশা!' নাটকখানি প্রণয়ন করিলাম। যদি আমার উদ্দেশ্য কিয়দংশেও সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"

কাহিনী।—কুকার্য জানাজানি হওয়ায় মোহন্ত ভয়ে তারকেশ্বর ছেড়ে ফরেসডাঙায় তার বাসা-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় ভদ্রলোক বিনীত-ভাবে বলে, এভাবে পালিয়ে আসা অন্যায় হয়েছে। এতে সন্দেহ আরও বাড়বে। মোহন্ত ধরা পড়েও হার মান্‌তে চায় না। পারিষদদের কাছে মোহন্ত বলে, তার নামে মিছামিছি একটা অপবাদ রটে গেছে। ওয়ারেণ্টও বেরিয়েছে। মিথ্যা অভিযোগ হলেও এভাবে একটা নালিশ হলে তাঁর সম্মান নষ্ট হয়। মোহন্ত বলে, তার প্রচুর টাকা আছে, যত টাকা লাগে, সে খরচ করবে,—কিন্তু এ বিশ্রী পরিস্থিতি থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে। মোহন্ত বলে, —"আমি যদি বাবু ঐ কর্ম্মের কর্ম্মী হব, তবে কেন দণ্ডধারী হয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়াব, সংসারি হয়ে থাকলে অ নায় কে কি বলতে পারে?" রমেশ সব কিছু জেনেও উত্তর দেয়, অকাজ করলে জাগ্রত দেবতা তারকেশ্বর তাকে হাতে হাতে ফল দিতেন। মোহন্ত মনে মনে ভাবে, "কি ঝকমারি করেই এলোকেশীকে ঘরে আসতে দিতেম, আমার বাড়ীতে রেখে দিলেই কোন গোল হত না।" পরিষদ হরি বলে,—"আপনার যদি মনে ময়লা না থাকে, তবে ভাবনা কিসের? কথায় বলে, মনের অগোচর পাপ আর মায়ের অগোচর বাপ।" কালিদাস বলে, এক—শুধু কোর্টে যাওয়া, "তা মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরকেও আজকাল কোর্টে হাজির হতে হচ্চে, ইংরাজ বিচার কর্ত্তাদের কাছে ছোট বড় নাই, সকলেই সমান।" রামকিশোর বলে, "নিশ্চয় বলচি আপনার কিছুই হবে না। আপনাকে কোন মতে আসামীর স্থলে আনতেই পারবে না, আমরা সকলেই সাক্ষী দেব।" কালিদাস মোহন্তকে বিনীতভাবে পরামর্শ দেয়,—"আমি বলছিলাম এই যে কাছারিতে হাজীর হবার দিন আপনাকে এ পোষাক ত্যাগ করতে হবে, আপনাকে গেরুয়া বসন পরে যেতে হবে, তা না হলে জজসাহেবের মনে সন্দেহ হবে।" মোহন্ত এটা মেনে নেয়। বিপিন সরকারের দরোয়ান সব বাড়ী বাড়ী বলে যায়, "খপরদার কেউ মোহন্তের বিপক্ষে বল না; কেউ যদি কিছু দেখেও থাক যেন না যত টাকা চাই মোহন্ত দেবে।"

ঘটনাটি এই। নীলকমল মুখুয্যে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছে। আগের

পক্ষের দুই মেয়ে এলোকেশী ও মুক্তকেশী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্ররোচনায় তেলী বৌ থাকমণির সহায়তায় অর্থের লোভে এলোকেশীকে মোহন্তর কাছে প্রতি রাত্রে পাঠানো হতো। এলোকেশীর স্বামী নবীন এলোকেশীকে বাপের বাড়ী রাখতে চায় না। মোহন্ত এসব শুনে লোকজন ঠিক করে রাখে যাতে এলোকেশী না যেতে পারে। ক্রুদ্ধ নবীন এলোকেশীকে মেরে ফেলে থানায় আত্মসমর্পণ করে। এলোকেশী অবশ্য মরবার আগে স্বীকার করে যায়, তার এতে কোনো হাত ছিলো না। বাবা এবং সৎমার প্ররোচনায় ও বলপ্রয়োগে সে বাধ্য হয়ে ব্যভিচারিণী হয়েছিলো। নবীন বর্তমানে উন্মাদ অবস্থায় হুগলী গারদে আছে। মোহন্ত জামীনে খালাস আছে।

কুটনী তেলী বৌ থাকমণি বিধবা অথচ অন্তঃসত্ত্বা। মোহন্তের হয়ে সে কোর্টে কি করে সাক্ষী দেবে, স্নানের ঘাটে মেয়েদের ভাবতে অবাক লাগে। প্রসন্ন বলে,—"ওর আবার লজ্জা কিসের বল, ও লজ্জার মাথা খেয়ে বসেচে, যারা ও কাযে কাযী, তাদের কি আর লজ্জা ভয় থাকে, বেহায়া নাক-কাটা না হলে অমন কম্মে রত হয় না, এই সেদিন ওর ভাতার মরলো, এখন তার স নেবে নি এরি মধ্যে দেখ না ও কি না করলে!" মেয়ে মহলের আলোচনায় জানা যায় মোহন্তের সংসর্গেই তেলী বৌ গর্ভবতী। গরবিনী বলে, "যে বেটী এমন, সে বেটী যে ভাতার থাকতেও এ কায করে নি, সেটা বিশ্বাস হয় না।" কামিনার মত, "মোহন্তের যদি একমাস মেদ হয় ও বেটীর ছ মাস হবে।" এলোকেশীর বাবা নীলকমল সম্বন্ধে গরবিনী বলে, "বুড় ড্যাগবার কিছু হয় তাহলে আমি হরির লুট দেবো, মুখ পোড়া বুড় বয়েসে বে করে এক ধ্বজা তুললেন, কালা-মুখোর একটু লজ্জা হলো না, আবার মোহন্তের হয়ে সাক্ষী দেবে।" ঘটনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলে,—'গ্রামের মধ্যে কে আর জানতে বাকি আছে বল, মোহন্তের চাকর বাকর ত এলোকেশীকে গিন্নি বলে ডাকত।"

মোহন্ত পাল্কী করে কোর্টে আসে। স্কুলের কয়েকটা ছেলে তাকে দেখে বলে ওঠে, "দূর শালা মোহন্ত তোর এই কি কাজ, ছদ্মবেশী বেটা বকা ধার্ম্মিক শালা আবার মুখে কাপড় দিয়েচেন মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্চে!" তারা মোহন্তের গায়ে ধুলো দেয়। মোহন্তের দরোয়ানের বকুনি তারা অগ্রাহ্য করে।

হুগলী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে সাক্ষী নেওয়া হয়। নীলকমল বলে, সে ব্যভিচারের ব্যাপার কিছুই জানে না; তারকেশ্বরে এলোকেশী কোনোদিনই যায় নি। নবীনকে সে চেনে না। সে তার বাড়ীতে কয়েকদিন এসেছিলো।

তেলী বৌ জবানবন্দীতে বলে, সে ধানটান ভেনে খায়, অকাজ-কুকাজ সে কোনোদিনই করে নি। অবশ্য তেলী বৌয়ের হাত আর পেটের দিকে চেয়ে সবাই হেসে ওঠে "হাতে গহনা নেই বিধবা, কিন্তু পেট উঁচু সধবা।" নীলকমলের সঙ্গে যখন তেলী বৌয়ের কথাবার্তা হচ্ছিলো, তখন কপাট ভেঙে নবীন তাকে মারতে গিয়েছিলো, এটাও সে অস্বীকার করে। এলোকেশীর ছোটো বোন মুক্তকেশী অবশ্য নবীনকে ভগ্নীপতি বলে স্বীকার করে। এলোকেশী যে মোহন্তর কাছে পাল্কী করে যেতো, এটাও সে স্বীকার করে। মোহন্তের কর্মচ্যুত দারোয়ান সাক্ষী দেয়, এলোকেশী তেলী বৌয়ের সঙ্গে কখনো বা সৎমায়ের সঙ্গে মোহন্তের কাছে যেতো। প্রায় সমস্ত রাত্রি থাকতো, ভোর হলেই চলে আসতো, কোনোদিন বেলায় গিয়ে সারা দিনরাত থাকতো। কি জন্যে যেতো জিজ্ঞেস করলে সে বলে,—"যুব মেয়ে তার কাছে যে জন্যে যেতে হয়, তাই যেতো. আমি প্রকাশ করে বলতে পাচ্ছি নে।" খাস্ কামরায় ঢুকতে তার মানা, কিন্তু খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সে এলোকেশীকে মোহন্তের বিছানায় বসে থাকতে এবং আবীর মাখামাখি করতে দেখেছে। মোকর্দমা জটিল দেখে ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারের জন্যে সেসন জজের কাছে সোপর্দ করেন। নবীনকে হাজতে রাখা হয়। মোহন্ত জামীনে থাকে।

গাঁয়ের লোকদের একজন—নিমাই বলে,—"মোহন্তের কিছু না হলে বড় দোষের কথা। কেন না ওর যে রকম চাল চুল, বোধ করি এবার খালাস পেলে কিছু বাকি রাখবে না। আর মশাই ওর যদি কিছু হয়, তাহলে দেখবেন অনেকেই সোজা হয়ে যাবে।......বেটা যে দৌরাত্তি আরম্ভ করেচে, তা যদি আপনি শোনেন তা কানে হাত দেবেন। আপনাকে বলতে কি, এই যে ঘটনাটি হয়েচে এর একবিন্দু মিথ্যা নয়।"

সেসন জজের কাছারীতে বিচার চলে। আরও কিছু তথ্য প্রমাণ হয়। রামেশ্বর পাত্র যখন মোহন্তের কাছে টাকা ধার করতে যায়, তখন সে মোহন্তকে এলোকেশীর পিঠে হাত বোলাতে দেখেছে। তাছাড়া এলোকেশীর ব্যভিচারের কথা চারদিকে রটে গিয়েছিলো, কেন না, "নবীন তার দিদি-শ্বাশুড়ীর বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক খাইতে পায় না, তাহাকে খাবার থালা আপনি মাজিতে বলে।"

কৌঁসুলি মিঃ জ্যাক্‌সন বলেন, মোহন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। প্রথমতঃ দারোয়ানের সাক্ষ্য ধরা যেতে পারে না, কারণ মোহন্ত

তাকে কর্মচ্যুত করায় মোহন্তের ওপর তার রাগও থাকতে পারে। দারোয়ান বলেছে, এলোকেশীকে গাঁয়ে আটকিয়ে রাখবার জন্যে যাদের রাখা হয়েছিলো, দারোয়ান তাদের মধ্যে ছিলো। এটা যেমন প্রমাণ সাপেক্ষ, তেমনি, মোহন্তকে এলোকেশীর সঙ্গে এক বিছানায় যে দেখেছে, এটাও প্রমাণ সাপেক্ষ, কারণ সে দুবছর হলো কর্মচ্যুত। তাছাড়া সঙ্গমকার্য প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় নি। মৃত্যুকালে এলোকেশীর কথা গ্রাহ্য নয়, কারণ জীবিত অবস্থায় আদালতে সে বলে যায় নি। কেনারাম ভট্টাচার্য এলোকেশীর ওপর আসক্ত ছিলো বলেই মোহন্তের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে, এটাও অবিশ্বাস করবার মূলে কোনো যুক্তি নেই।

জজ সাহেব মিঃ ফিল্ড্ বলেন, দারোয়ানের উক্তি যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ, সকলে নীরবে তা শুনেছে, প্রতিবাদ করে নি। অপরাধী ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী। সুতরাং টাকা ও উপহার দিয়ে বশীভূত করবার ক্ষমতা তার আছে। দোকানদারের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায়, এলোকেশী ভালো কাপড় গয়না পরে যাতায়াত করতো, অথচ তারা নাকি গরীব। তবে সঙ্গমানুষ্ঠানের সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া সর্বত্রই দুর্ঘট। "বিলাতী আইন সম্বন্ধে বাস্তবিক প্রমাণ বিষয়ে অতি কষ্ট। কিন্তু আমি কোন ইংরাজের বিচার করিতেছি না। ইহা এদেশের ঘটনা, এদেশের লোকেরা যেভাবে এই সমস্ত ঘটনা দৃষ্টি করে, আমিও সেইভাবে দেখিব। এখানকার লোক সকলেই জানে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যদি কাহাকেও অন্য পুরুষের সঙ্গে একত্রে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়, ও হাস্য পরিহাস করিতে দেখা যায়, আর সেই পুরুষ যদি তাহার আত্মীয়জন না হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোককে দুশ্চরিত্র বিষয়ের তাহা যথেষ্ট প্রমাণ। ইংরাজদের পক্ষে এ প্রমাণ কিছুই নয় বটে, অতএব মোহন্তকে আমি পরদারাভিগমনের অপরাধে সম্পূর্ণ অপরাধী বলিয়া তাহার প্রতি তিন বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস এবং ২০০০ টাকা জরিমানা হুকুম দিলাম।"

মোহন্তের এই পরিণতিতে সবাই আনন্দ করে। বলে, "যেমন কর্ম তেমনি ফল।" মেয়েরা সকলে জড়ো হয়ে তুলসীতলায় হরির লুট দেয়। বলে নবীন যদি খালাস পায় তাহলে আরও পাঁচ সিকের হরির লুট দেবে। মোহন্ত হাইকোর্টে আপীল করতে পারে শুনে একজন মেয়ে বলে ওঠে, তাহলে হয়তো মোহন্তের মেয়াদ আরও বেড়ে যাবে!

এদিকে হুগলী জেলে আটক অবস্থায় মোহন্ত খেদ করে। বারবার নিজের

মঠের মেজাজ আনতে গিয়ে অপদস্থ হয়—প্রহরীদের কাছে গালাগালি খায়। প্রহরী বলে এখানে মোহন্তগিরি চল্‌বে না। তার নিজের ঘরের সঙ্গে জেলখানার ঘরের অনেক পার্থক্য। বেশি বাড়াবাড়ি করলে গায়ে জল ঢেলে দেবে কিংবা বাইরে হিমের মধ্যে ফেলে রাখ্‌বে। জীবনে মোহন্ত কোনোদিন গালাগালি খায় নি, তোষামোদই পেয়েছে। এতোটা ভাগ্য পরিবর্তনে সে বিচলিত হয়ে পড়ে। রাত হয়ে গেছে। সেই সুন্দর শয্যা নেই। যাহোক মোহন্ত শেষে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

শেষরাত্রে প্রহরী মোহন্তকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গায়। বলে, এখন তাকে ঘানি টানতে যেতে হবে। এতো আরাম এখানে চল্‌বে না। ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধোবার জন্তে মোহন্ত একঘটি জল চায়। প্রহরী জবাব দেয়, এটা জেলখানা—এখানে চাকর নেই। ওখানে মাটির ভাঁড় আর বদনা আছে। দূরে ওখানে পাত্‌কো আছে। নিজে তুলে নিতে হবে। আর, এ তো সবে সুরু। এভাবে তিন বছর চল্‌তে হবে।

যথাসময়ে ঘানির কাছে এনে মোহন্তকে ঘানিতে যুতে দেওয়া হয়। আয়েসের শরীর—অল্পতেই মোহন্ত হাঁপাতে আরম্ভ করে। ঘন ঘন তারকনাথের নাম করে। একটু থেমে হাঁপ ছাড়তে গেলে পেছন থেকে প্রহরী ধাক্কা দেয়। মোহন্ত মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে যায়। বমি করে ফেলে সে। ও পাশের গরাদ থেকে নবীন এসব দেখে আমোদ পায়। মোহন্তের অবস্থা কাহিল দেখে প্রহরী জেলের দারোগাকে খবর দেয়। দারোগা এসে বলে, ওসব কিছু না, চাবুক মারলেই মোহন্ত সোজা হবে। মোহন্তের পিঠে চাবুকের পর চাবুক পড়ে। শেষে মোহন্ত পড়ে যায়। জেলের ডাক্তার আসে। সে বলে, মোহন্তর গায়ে শক্তি আছে। কাজ করতে পারবে ঠিকই, তবে অভ্যাস নেই বলেই এমন হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার চলে যাবার পর মোহন্ত প্রহরীর কাছে জল চায়। প্রহরী বলে, ঘণ্টা না বাজলে জল দেবার হুকুম নেই। ওর হয়ে এখন কে মেয়াদ খাটতে যাবে!

এদিকে জেলে নবীন গলায় দড়ি দেয়। গলায় দড়ি দেবার আগে বলে যায়,—"হায় হায় আমার এ মনের যন্ত্রণা ভারতবাসীদের নিকট প্রকাশ করতে পেলে, বোধ হয় ভারতবাসীদের অনেক উপকার হতো, ভাবীকালে এরূপ কার্য্য যেন আর কেহই না করে।"

মোহন্তের এই কি কাজ !! (হাওড়া ১৮৭৩ খৃঃ)—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ॥ (১ম খণ্ড) ॥ মোহন্ত-কৃত কর্মের প্রতি বিস্ময়বোধক জিজ্ঞাসা অপ্রত্যাশাকেই অভিব্যক্ত করে। পদ মর্যাদা ও প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘনই সামাজিক দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করেছে।

কাহিনী।—কলকাতার আধুনিক যুবকদের সঙ্গে মিশলেও নবীন মদ্য পানের বিরোধী। এজন্যে নবীনের বন্ধুরা নবীনকে "পাড়াগাঁয়ের ভূত" বলে। কানাই বলে, "মদ এই সহরের প্রাণ। আমোদ আহ্লাদ, সুখ সম্পত্তি মদ না হলে সহরে একদণ্ড চলে না। এই যে বাবা পরিশ্রম করা যায়, রাত জেগে বুক ফুলিয়ে বেড়ান যায়, কেবল মদের জোরে। মদ না খেলে কল্‌কাতায় পচা গন্ধে ট্যাঁকা যেত, মশা ছারপোকার কামড় সহ্য হত না কারো সঙ্গে আলাপ থাক্‌ত, এই পিপেশ্বরীর আশীর্বাদে একজন মানুষের মত হয়ে কাল কাটাচ্ছি।" নবীন মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে মদের দোষ দেখাবার চেষ্টা করে। আলোচনা অফিসেই বন্ধুদের সঙ্গে চল্‌ছিলো। হঠাৎ নবীন শ্বশুরবাড়ী থেকে একটা চিঠি পেয়ে ছুটী নিয়ে রওনা হয়। আফিসের বন্ধুরা মন্তব্য করে, তাদের তো শ্বশুরবাড়ী নেই, কিন্তু মামার বাড়ী আছে। সেখানেই যাবে। মামার বাড়ী মানে শুঁড়ীর দোকান। নবীন যে চিঠি পেয়েছিলো, সেটা ভয়ঙ্কর। সে বিবাহিতা স্ত্রী কমলাকে বাপের বাড়ীতেই রেখে এসেছে। কিন্তু কমলার বাবা এবং সৎমা নাকি মোহন্তের সঙ্গে তাকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করিয়ে পয়সা রোজগার করছে। উদ্‌বিগ্ন মনে সে শ্বশুরবাড়ীর দিকে চলে। সেদিন শনিবার।

নবীনের শ্বশুর রামহরি শর্মার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাবার পর সে বুড়ো বয়সে রাধামণিকে বিয়ে করেছে। রাধামণি বাইরে বাইরে ঘোর। রামহরির সময়মতো খাবারও জোটে না, আয়েস তো দূরের কথা! রাধামণি সতীনের মেয়েকে দিয়ে ব্যভিচার করিয়ে অনেক টাকা পেয়ে গয়না গড়াচ্ছে একের পর এক। রাধামণি বলে,—"ছার কপাল আমার! এমন হতভাগার ভাগ্যে পড়েছি, মনের মতন কিছুই হলো না, না পেলেম দুখানা পরতে, না পেলেম আমোদ আহ্লাদ করতে—তবে আমি খুব শক্ত, তাই যাহোগ করে কাটাচ্ছি। আর এসব গহনা—তা এতো আমারই বুদ্ধিতে, ওকে আর এ বুদ্ধি খাটাতে হয় না!" রামহরি সর্বদা রাধামণির মন যুগিয়ে যুগিয়ে হয়রাণ। রামহরি বলে,—"আমি মনে করেছিলাম যে, শাল্‌গেরামের পৈতে ভেঙ্গে, ৮টা মাকড়ী,

আর ছাতা, সিংহাসন ভেঙে তোমায় চারগাছি মল, আর চাবি-শীকলী গড়িয়ে দি—তা—আমায় করতে হলো না আপনা হতেই যুটে গেল ;" রাধামণি রামহরিকে বলে,—"তোমার কমলার জোর কপাল, পূর্ব্ব জন্মে শিবপূজার ফল বলতে হবে। কেন না মোহন্ততে আর বাপাতে কোন তফাত নাই,—এক অঙ্গ বললেই হয়। তোমার কমলাকে যত ভালবেসেচেন, কৈ আর কাকেও তো তত ভালবাসেন না, এর পরে দেখতে পাবে, যদি মোহন্ত এই রকমই ভালবাসেন, তবে কত লোক অন্নপূর্ণ মনে করে মন্দির তয়ারি করে দেবে।" রামহরি ভাবে—"আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেচি, সহ্য করতে হবে, ফুটতেও পারিনে, সাপে ছুঁচো ধরা, ওগরাতেও পারিনে, আর গিলতেও পারিনে।" রামহরি স্থির করে, নবীন এলে কমলাকে আর পাঠাবে না। রাধামণিকে সে সাধে, অন্ততঃ এইদিনকার মতো কমলাকে নিয়ে রাধামণি যেন তারকেশ্বরে না যায়। কারণ শনিবার, নবীনের আসবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। বিশেষ করে পরে কয়েকদিন বন্ধ আছে। রাধামণি তাকে আমল না দিয়ে যথাসময়ে কমলাকে নিয়ে চলে যায়। রামহরি ভাবে, দ্বিতীয় পক্ষে যেন কেউ না বিয়ে করে,—বিশেষতঃ যাদের ছেলেমেয়ে আছে এবং বয়সে যে বুড়ো।

নবীন গাঁয়ে ঢুকে পুকুরের বাঁধাঘাটের ওপর বসে ব্যাগ থেকে আয়না চিরুণী বার করে ফিট্‌ফাট্ হয়ে নেয়। সে মনে মনে বলে,—"এই নাকে কানে খৎ আর কখন না, ফোতোবাবুগিরি দেখাতে গেলে নানান্ বিপদ, কেন বাবু টাইট জুত, টাইট বোতামওয়ালা জামা গায়ে দিয়ে সুখ তো ভারি!" চিঠির কথা ভেবে মনে মনে সান্ত্বনা পায় এই বলে যে,—"ও পত্র টত্র" মিছে, কোন ছোঁড়া টোঁড়া পাড়াগেঁয়ে ইয়ারকি ফলিয়েছে চাষা বইত নয়।" গ্রাম দেখে নবীনের খুব আনন্দ হয়। সে মনে মনে বলে,—এখান থেকে যেতে ইচ্ছা হয় না। এদেশে কিছু বিষয় থাকে, তাহলে এর অপেক্ষা আর স্থান নাই, মাতালের দৌরাত্ম্য নাই, চোর ছ্যাঁচড় খুব কম, আর সর্ব্বনেশে মিউনিসিপ্যালিটির কোন অত্যাচার নাই—আমাদের মতন লোকের খাওয়া দাওয়া খুব সস্তা।" কতকগুলো গ্রাম্যবধূ জল নিতে এসে কমলার ব্যভিচার সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতে করতে চলে যায়। নবীনের মন বিষিয়ে ওঠে। শ্বশুর বাড়ীতে পোঁছিয়ে সে দেখে রামহরি একা। স্ত্রী কোথায়—জিজ্ঞাসা করলে শ্বশুর বলে, সে তার মার সঙ্গে তারকেশ্বরে ওষুধ খেতে গিয়েছে। কথা শুনেই নবীন তখন রাতের অন্ধকারেই তারকেশ্বরের পথে পা বাড়ায়। তারকেশ্বর

থেকে ফিরে এসে সে শ্বশুরকে ধিক্কার দেয়। নবীন তাকে বলে,—"তুমি আর ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিও না, পৈতার অমান্য কর না, তোমার এ ভণ্ডপনা রেখে দাও, তুমি সহ্য করিতে পার, তোমার পরিবারকে পাঠাবে, আমার পরিবারকে তুমি ক্যান পাঠাবে!" শ্বশুর ভেতরে চলে যায়। ওদিকে রাধামণি ফিরে এসে নবীন এসেছে জান্‌তে পেরে, সাপের কামড়ে মৃতপ্রায় বলে হলা নাপ্‌তের বাড়ী থেকে রামহরির কাছে খবর পাঠায়।

নবীনের কাছে কমলা এসে দাঁড়ায়। নবীন তাকে তিরস্কার করে—ব্যভিচারিণী বলে ধিক্কার দেয়। কমলা কাঁদতে কাঁদতে পা জড়িয়ে ধরে। তারপর সে নিজের দুঃখের কথা বলে। "আমি কিছুই জানিনে যে, আমার যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।" কমলা নিঃসন্তান। রাধামণি নাকি বলেছিলো, "বাপার মোহন্তের ওস্বুদ খেয়ে চক্রবর্তীদের বৌয়ের ১৪ বছর বয়েসে ছেলে হয়েছে, ঘোষালদের নবৌয়ের ছেলে হবে না হবে না করে ৬ গণ্ডা বছর বয়েসে ছেলে হয়েছে।" রামহরি নাকি মোহন্তর ওষুধ খাবার জন্যে অনুরোধ করে। সে নাকি নাতির মুখ দেখে স্বর্গে যাবে। কমলা ভেবেছিলো, "যদি বাবার এ্যামন মনে সাধ হয়েছে, যাঁ হতে পীরথিবী দেখ্‌লুম, তবে ওষুধ খেতে দোষ কি।" তারপর মোহন্তর কাছে সে ওষুধ খেতে গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে দেখে যে, মোহন্ত বসে আছে, আর চারদিকে দু একজন বৌ-ঝির মতনও রয়েছে। তাই দেখে কমলার প্রাণ শুকিয়ে আসে, কিন্তু মা সঙ্গে আছে, এই ভেবে সে সাহস সঞ্চয় করেছিলো। কমলাকে আলাদা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিনি মেশানো দুধের মতো সরবত আর জল খাবার খেতে দেওয়া হয়। প্রসাদ আর ওষুধ বলে। সঙ্গে সঙ্গে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। সে ঘরের একটা খাটেই শুয়ে পড়ে। তারপর রাত্রে কি হয়েছে না হয়েছে সে কিছুই জানে না, তারপর ভোরে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। "চোকে চেয়ে দেখি না, মা-টা কেউ নাই, আমি যেখানে শুয়েছিলুম সেখানে নেই, আর একখানা খাটে শুয়ে আছি, আর বোধ হলো যেন মোহন্ত সেই খাট থেকে উঠে গেল।"

কমলা নবীনকে নিজের দুঃখের কথা বলে আর কাঁদে। সে বলে, "আমি এক্‌লা কাকেও যে বলি এমন লোক এ গ্রামে কেউই নাই, যে আছে সে মোহন্তর ভয়ে কিছু করতে পারে না।" বাপ মার কথায় প্রতিবাদ করে ঘরে বসে রইলেও "মোহন্তের নগ্‌দী দরোয়ানের দৌরাত্তি জোর করে নিয়ে যেতে কেউ কিছু বল্‌তে পারবে না, মানা করে কি রক্ষা করে এমন কেউ নেই।" কমলা

স্বামীর কাছে মিনতি করে বলে, সে তার স্ত্রী হতে চায় না। নবীন আর একটা বিয়ে করুক, আর কমলাকে চাকরানী করে বাড়ীতে নিয়ে রাখুক। এখানে সে থাক্‌বে না। নবীন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তাকে সে গ্রহণ করবে। সে পাল্কী আনতে চলে যায়। কমলা স্বামীর মহত্ত্বের কথা ভেবে স্বামীর মূল্য আরও ভালো করে বুঝতে পারে।

কমলা টিনের বাক্সে তার যাবতীয় জিনিসপত্র ভরে প্রস্তুত হয়ে আছে। বামুনপিসী বেড়াতে এসে কমলার কলকাতায় যাওয়ার কথা শুনে উচ্ছ্বসিত-ভাবে নবীনের প্রশংসা করে, আর রামহরি ও রাধামণির নিন্দে করে। রাধামণি সম্বন্ধে সে বলে,—"ও কালামুখি কোন অন্ত্যজের মেয়ে, ঘর ভাঙ্গানীর ঝি, বাপের কালে ও রূপ সোনা চক্ষে দেখে নি, এখন বুড়র ভাগ্যে পড়ে ধিঙ্গী হয়েছে।" রামহরির কথায় সে বলে,—"বুড় হলে পাগল হয়, বে বে করে বুড় বয়সে যেমন হেদিয়ে ছিলেন এখন তার ফলভোগ করুক, কপালে গেরো আছে কে খণ্ডাবে!" স্বামীভক্তি নিয়ে বামুনপিসী কমলাকে অনেক নীতি উপদেশ দেয়।

এদিকে নবীন হতাশ হয়ে ফিরে আসে। ঘাঁটীতে ঘাঁটীতে মোহন্ত লোক পাহারা রেখেছে। স্ত্রীকে নিয়ে যেতে দেবে না। "নিয়ে যেতে দেবে না, কেড়ে নেবে, ভয়ানক অরাজক দেখ্‌তে পাই। ব্যাটা যে শিবের মোহন্ত। তার এই কি কাজ? সকল তীর্থস্থান যদি এইরূপ হলো, তবে ভদ্রলোক মেয়েছেলে নিয়ে কি করে আসে. মোহন্ত, পাণ্ডা অধিকারী হাল্‌দারদের মধ্যে যদি এই সব হতে লাগ্‌ল তবে ত আর রক্ষা নেই।" হঠাৎ নবীন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আঁশ বঁটী একটা কাছে ছিলো। সেটা তুলে নিয়ে কমলাকে তিনবার আঘাত করে। চীৎকার করে বলে,—মোহন্ত কি করে তার প্রাণের কমলাকে কেড়ে নেয় দেখ্‌বে। কমলা সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। নবীন পাগলের মত বেরিয়ে যায়। ইতিমধ্যে সবাই এসে কমলার মৃতদেহ দেখে ঘাবড়ে যায়।

পুলিস থানা। ফতেবক্স জমাদার ডায়রি নিয়ে ব্যস্ত। লালগোবিন কনষ্টেবল একজন আসামীর বুকে পা দিয়ে, একখান বাখারির চিম্‌টা দিয়ে চুল টেনে কথা বার করবার চেষ্টা করে। কথায় কথায় বুকে লাথি মারে। আসামী দোষ অস্বীকার করে। লালগোবিন তখন একখানা টিকের আগুন নিয়ে ঢোকে। আসামীকে আগুন দেখিয়ে কনষ্টেবল বলে,—"দেখা হ্যায় শালা, এই আগ্‌সে তেরা চামড়া লাল করেগা।" আসামী তখন ভয়ে ভয়ে চোরাই

মালের সন্ধান বলে দেয়। আসামীকে নিয়ে কনষ্টেবল চলে যায়। জমাদার মন্তব্য করে,—"আজকাল লোক চেনা দায়, আর চোর ডাকাত কি মিষ্টি কথায় এক্‌রার দেয়, ওদের মধ্যে ত আর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কেউ নেই, যে মিথ্যে বলবে না। ও সব লোককে কষে মার চাই, মারতং সর্বতং জয়, আর তার সাক্ষি ত দেখলেন।" জমাদার পুলিসের কথা নিয়ে আলোচনা করে। "পুলিস স্থাপন, কেবল চোর-ডাকাত ধরবার জন্যই, ভদ্রলোকের ধন, মান রক্ষার জন্য তা পুলিস কি কখন বিনা কারণে কাকেও পীডন করতে পারে, তা হোলে কোম্পানি বাহাদুর এতদিনে পুলিস উঠিয়ে দিতেন।...তবে যে চারদিগে পুলিস অত্যাচার পুলিস অত্যাচার শুনতে পাওয়া যায়, তার কতকটা সত্তি; কেন না, এমন কতকগুলি কনষ্টেবল আছে, যারা প্রজার কাছে পার্বনি চেয়ে বেড়ায়, তা না পেলেই, রাস্তায় প্রস্রাব করেছিস, মাতাল হয়েছিস, দাঙ্গা করেছিস বলে হাঙ্গাম হুজুক করে,...আর তাদেরি জন্যে পুলিসের বদনাম।" পুলিসের কথা নিয়ে জমাদার এবং দারোগা আলোচনা করছিলো, এমন সময় নবীন এসে থানায় আত্মসমর্পণ করে। সে তার সব দোষ স্বীকার করে এবং সব কথা খুলে বলে যায়।

মোহন্তের এই কি কাজ !! (১৮৭৪ খৃঃ)—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। ২য় খণ্ড॥ ২য় খণ্ডে নামকরণের গুরুত্ব নেই। বরং এটাকে 'দশা'-র মধ্যে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে, লাম্পট্যের শাস্তি প্রদর্শন প্রাহসনিক দিক থেকেই বিদ্যমান্। তাই লাম্পট্য অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত প্রহসনের অঙ্গীভূত করা অসঙ্গত হতে পারে না। সুতরাং লেখকের দৃষ্টিকোণ সামগ্রিক দিক থেকেই বিচার শ্রেয়ঃ।

কাহিনী।— তারকেশ্বরের মাধবগিরি মোহন্তের কুকীর্তি প্রকাশ পাওয়ায়, সে ফরাসডাঙায় গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলো। মোহন্তের কৌন্সিলি জ্যাক্‌সন সাহেব জামীন বার করে এনেছেন। তাই মোহন্ত ফরাসডাঙা থেকে তারকেশ্বর ফিরে আসে। পারিষদ উমেশ বলে,—"এখন পাথরে পাঁচ কিল, খোরায় এক নাথি। এক ধার থেকে সব বৌ-ঝির জাত খাব।" বিপিন একটু চিন্তিত। নীলকমল মুখুয্যে আর তেলীবৌয়ের হাতেই মোকদ্দমা। তাদের জোবানবন্দীর ওপরেই সব। বকাউল্লা তদারকে আসবে, তার পয়সার লোভ নেই; সেখানেই মুস্কিল। তেলীবৌ আর নীলকমলকে মোহন্তের সামনে ডেকে আনা হয়। নীলকমল অভয় দিয়ে বলে, মোহন্তের কুকর্মের

'অপবাদে' সাক্ষী কে? তাছাড়া খুনী ব্যক্তিটির সঙ্গে এলোকেশীর বিয়ে হয়েছিলো, এমন কোনো সার্টিফিকেট লোকটির কাছে নেই। বিপিন অবশ্য এতে আপত্তি তুলে বলে, প্রতিবাসীরা তো জানে। নীলকমল তখন জবাব দেয়—"কে বলবে বলুগ দেখি, তার ঘরে আগুন দে পুড়িয়ে মারব না, ছেলে বুড় এক খাদ কোর্ব্বো না। আমি এলোকেশীর বাপ, আমি যাকে জামাই বোলবো, সেই আমার জামাই, আমি যার কাছে ইচ্ছা, তার কাছে মেয়ে পাঠাব।" তেলীবৌও এসব কথা সমর্থন করে এবং সুপটুভাবে অভিনয়ের মহড়া দেয়। নীলকমল বলে, কোনো ভয় নেই, যা কিছু যাবে টাকার ওপর দিয়ে যাবে। এলোকেশীর জন্যে মোহন্তর মনটা কেমন করে। আশ্বাস দিয়ে তেলীবৌ বলে, এলোকেশীর ছোটো বোন মুক্তকেশী তো আছে! "তা একজন গেছে, আর একজন ত আছে, সেও ত যুগ্‌গি হয়ে এলো, আর তাকেও ত উনি ভালবাসেন।" মোহন্ত ভাবে এই মোকদ্দমায় জেতবার জন্যে যতো টাকা লাগে, সে ছড়াবে। "আমার ত আর তালুকের টাকা নয়, ফাঁকি দে টাকা পাওয়া, আর জে টাকা আছে, তার ত খরচ চাই, তা না হয় এতেই জাবে। দশজন লোকের পেট ভরবে—সেও ত একটা পুন্নির কাজ!"

এদিকে হুগলী সেসন কোর্টের বিচারে নবীনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কলকাতার যদুগোপালবাবু নবীনকে খালাস করবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ফল হলো না। এই বিচারে সাধারণ লোকেরা বড়ো অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। মতি ঠাকরুণদিদি বলে,—"মরুগ্‌গে মোহন্তের আর কি হবে ভাই! তার টাকা আছে! আর টাকায় কি না হয় বল? টাকার মাতায় বুড়র বে, সে দেদার টাকা খাওয়াচ্চে; সাক্ষি ত আর পাবার যো নেই, কত বড় বড় লোকও মোহন্তর টাকার বশ হয়েছে।" হুগলী জেলখানায় নবীন আটক থাকে। নবীনের মোক্তার উমেশ তাকে বলে,—"নবীন আমি তোমার কি উপকার করিতেছি, তোমার জন্যে আবালবৃদ্ধ যুবা প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত। এই দেখ কলিকাতা হইতে যদুগোপালবাবু পত্র লিখেছেন যে ছোটলাটসাহেবের কাছে তোমার প্রতি দয়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন।" উমেশবাবু চলে গেলে নবীন ভাবে,—"মনুষ্য স্বভাবতঃই সমাজপ্রিয়, সমাজচ্যুত হওয়া কেমন কষ্টকর!"

কিন্তু মোহন্ত রেহাই পায় না। সাক্ষীরা গোলমাল বাধায়। মোহন্তর দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। ঘরে বসে মোহন্ত ভাবে,—"বেটারা যেরূপ সাক্ষী দিচ্ছে, তাতে ত প্রমাণ হবার খুব সম্ভাবনা। উঃ! ভাবনা কাকে বলে তা জানতেম

না, চিরকাল নিশ্চিন্তে পরম সুখভোগ কচ্ছিলেম।.... নবনে শালা হতেই ত আমার এ কষ্ট হয়েছে। শালা এলোকেশীকে কেন খুন কল্লে; আমার কাছে টাকা নিয়ে আর একটা বিয়ে কল্লে না ক্যান, যত টাকার দরকার হোতো আমি দিতাম।" মোহন্তর এই দুশ্চিন্তার সুযোগে মোহন্তর বন্ধু কিশোরী তার কাছ থেকে যতোটা পারে টাকা দুইয়ে নেবে ভাবে। সাক্ষীদের বশ করবার নামে সে কিছু টাকা চেয়ে নেয়। এভাবে মোহন্তর কাছ থেকে আরও অনেক টাকা নিয়েছে। মোহন্তর কাছে থাকলে শুধু টাকা নয়, মেয়েমানুষও যোটে। মোহন্তর এতো ভাবনা সত্ত্বেও সোনাগাছি থেকে গোলাপী আর প্রমদা নামে দুটো বেশ্যা আনা হয়েছে। একটা ষোড়শী গৃহস্থবধূকেও ভুলিয়ে আনা হয়েছে। প্রমদা গোলাপীকে বলে, "ভাই, তারকেশ্বরে এলে মোহন্ত বড় খাতির করে কিন্তু আপনার বৈঠকখানায় এনে বাসা দেয়। চাকর চাকরানীরা অমনি হুকুমের গোলাম, কিছু অভাব নেই, আর মোহন্ত নিজে খুব আমুদে, রসিক, একত্রে বসা দাঁড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, আর নিত্য কত আমোদ, এমন জায়গায় আসতে ইচ্ছা যায়।" প্রমদা আরও বলে,—"মোহন্ত সদয় হলে শিব দর্শনে বাধা থাকে না, তুমি যেমন করে ইচ্ছা পূজা কর না কেন, বাপার গহ্বরে হাত দিয়ে চরণামৃত তুলে নাও, কেউ এক কথা বলবে না, এমন কি টাকাকড়ি কিছুই খরচ হবে না। বরং বাড়ী ফিরে যাবার সময়, বেশ দশ টাকা পাওয়া যায়। গৃহস্থ বধূটি সম্পর্কে মোহন্তের দাদা বলে,—"দেখ না, বয়স ১৬/১৮ বছর হলো ছেলেপিলে হবার নামটি নেই, তারই তরে বাপার কাছে হত্যা দেবে! তা বাপার হুকুম আছে যে, যুবতী স্ত্রীলোক মাড়োতে এলে, মোহন্তরাজার বাড়ীতে বাসা নিতে হয়, পাছে দুষ্ট লোকে কোন অন্যায় করে, তাহলে ত বাপারই অখ্যাতি।" গেরুয়া রুদ্রাক্ষ ছেড়ে মোহন্ত কিশোরীর সঙ্গে বাবুর বেশে আসে। গৃহস্থবধূ ঘোমটা দিয়ে ছিলো। কিশোরী তাকে বলে,—"ঘোমটা টোমটা দিয়ে থাকলে ওষুধ টোষুধ পাবে না, চোখ মুখ জীব না দেখে কি রোগ ঠাওরানো যায়, তোমার চোকে রক্ত আছে কিনা, মুখের রং ফেঁকাশে কিনা, সব দেখতে হবে, তবে ত জানা যাবে তোমার ছেলে হবে কিনা।" ষোড়শী পেয়ে মোহন্তর আর বেশ্যা ভালো লাগে না। সে কিশোরীকে বেশ্যা দুটি দিয়ে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেন। কিশোরীকে বলে,—"মনে দুঃখু কোরো না ভাই।"

মোহন্ত তারপর বৌয়ের হাত ধরে কাছে বসিয়ে জলখাবার খাওয়াতে যায়।

উদ্দেশ্য, জলখাবার খাইয়ে অজ্ঞান করিয়ে একেও এলোকেশীর মতো সম্ভোগ করবে। ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক্, এমন সময় দারোয়ান নেপথ্য থেকে খবর দেয়, বিপিন সরকার মোকদ্দমা সংক্রান্ত জরুরী কাজে একবার দেখা করতে চায়। মোহন্ত তাড়াতাড়ি কৈলাসীকে দিয়ে বৌকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, তাড়াতাড়ি গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা আনতে বলে। বিপিন আসবার আগেই মোহন্ত পুরোপুরি প্রস্তুত। বিপিন এসে খবর দেয়, মোহন্তর বিচার শুক্রবারে হবে। বিপিন চলে গেলে, মোহন্ত তাড়াতাড়ি রুদ্রাক্ষ আর গেরুয়া কাপড় খুলে ফেলে আগেকার সাজ পরে নেয়। মন্তব্য করে,—"মিছিমিছি আমোদটা গুলিয়ে গেল, অনেক সময় আছে, আগে ত খোলোসা হয়ে আসা যাগ।"

শুক্রবার। হুগলী সেসন জজসাহেবের কাছারী ঘরে জজ ফিলড্ সাহেব বসে আছেন। কাছে দুজন এ্যাসেসর। ডানদিকে গভর্ণমেণ্টের উকীল ঈশানচন্দ্র মিত্র, বাঁদিকে মাষ্টার জ্যাকসন, মোহন্তর উকীল বসে আছেন। আসামী মোহন্ত দাঁড়িয়ে আছে। সাক্ষীদের মধ্যে নবীনও দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া আমলা, আরদালি, পুলিস, দর্শক, এমন কি স্কুল-পালানো অনেক ছেলেও এসে জুটেছে।

গভর্ণমেণ্টের উকীল ঈশানবাবু পরস্ত্রী গমনের অপরাধ প্রমাণের ব্যাপারে তিনটি বিষয় তোলেন—(ক) স্ত্রীলোকের বাস্তবিক বিয়ে হয়েছে কিনা (খ) আসামী তাকে বিবাহিতা জানা সত্ত্বেও দুষ্কর্ম করেছে কিনা এবং (গ) দুষ্কর্মের বিশেষ প্রমাণ আছে কিনা। ঈশানবাবু বলেন, প্রথমটি স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে। হিন্দুঘরের বৌয়ের সধবা লক্ষণ শাঁখা সিঁদুরের মধ্যে স্পষ্ট। অতএব এর থেকে বোঝা যায়, মোহন্ত যেহেতু চক্ষুষ্মান, অতএব সে এ ব্যাপারে অজ্ঞও নয়। তৃতীয় দিকটি প্রমাণ করবার অবশ্য একটু অসুবিধা, তবে এলোকেশীর ওপর মোহন্ত যে আসক্ত ছিলো, এটার প্রমাণ আছে। গোপী দারোয়ান, রামেশ্বর পাত্র, নবকুমার তাঁতী—এরা এলোকেশীকে মোহন্তর সঙ্গে একত্রে বসতে আমোদ আহ্লাদ করতে স্বচক্ষে দেখেছে। এলোকেশীর আত্মীয়রা যে নীলকমলকে একঘরে করে রেখেছিলো, তারও প্রমাণ আছে। জ্যাকসন বলে,—"There can be no reliance on the evidence of Gopee Durwan." কেননা সে তিন জায়গায় তিন রকম জোবানবন্দী দিয়েছে। এলোকেশী জীবিত নেই। তার "Confession" যখন পাওয়া

যাচ্ছে না, তখন প্রমাণ নেই। তাছাড়া "The presumption is that Kenaram Bhattacharjee had illicit intercourse with Alokasi and that in order to screan himself from infamy he fabricated the story laying the charge on the Mohunt." জজ সাহেব শেষে বলেন,—"It is proved by direct evidence that Alokasi was seen sitting with the Mohunt and speaking with him freely and in a jovial manner. This fact in an English society would raise no questionable point against the character of the female, but in the light of the society, to which she belongs, it is tentamount to positive proof of her having had illicit connection with the Mohunto. To me, the evidences appear to be sufficient to prove the charge." বিচারের রায়ে মোহন্তকে তিনি তিন বছর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা এবং দু হাজার টাকা অর্থদণ্ড করলেন। রায় শুনে মোহন্ত মূর্ছা যায়। পরে চেতনা পেয়ে ওঠে। পুলিশ তার হাতে হাতকড়ি পরায়। সোনার তাগার বদলে এবার সে লোহার বালা পরে। পেছন পেছন স্কুলের ছেলেরা তার গায়ে ধুলো দিতে দিতে চলে। অনেকে এই মোকদ্দমায় মোহন্তের শাস্তি নিয়ে বাজী ফেলেছিলো। তারা এবার মনের আনন্দে খাওয়া দাওয়া করে।

চারদিকে মোহন্তের ব্যাপারে হিড়িক পড়ে যায়। বোষ্টম-বাউলরা মোহন্তর কুকীর্তি নিয়ে গান বেঁধে ভিক্ষে করে। ঘরে ঘরে মোহন্তের তেল বিক্রী হয়। জেলখানায় মোহন্ত ঘানি টেনে তেল বার করে, সেই তেলই এই তেল। এই তেলে চুল ভালো হয়, বোবার কথা ফোটে, বাঁজার ছেলে হয়, এমন কি বশীকরণের কাজও নাকি চলে—এমন গুজবে তেল সকলেই কিনে ঘরে রাখে। এই তেলের ব্যবহারে "মোহন্ত রোগে" যারা ভুগছে, তাদেরও নাকি চৈতন্য হয়!

মোহন্তর এই কি কাজ!! (২য় সংস্করণ—হাওড়া, ১২৮০ সাল)—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১ম খণ্ড)॥ প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে ছিলো,—"মোহন্তরাজের জঘন্য ব্যবহার দেখিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র নাটকখানি জনসমাজে প্রকাশ করিতেছি।" দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন,—"স্থানে

স্থানে সংশোধন পূর্বক নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রকৃত নাম দিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা গেল।"[২৩] লেখক প্রদত্ত নামসমূহ নিম্নরূপ—

মাষ্টার মাইণ্ড—ছাপাখানার প্রধান কর্মচারী॥ ডিক্রুজ সাহেব—কম্পোজিটার॥ নবীন বন্দ্যোপাধ্যায—ঐ॥ কানাই দে—ঐ॥ মাধব পাল—ডিষ্ট্রিবিউটার বালক॥ পিরু—ছাপাখানার হরকরা॥ নীলকমল মুখুজ্যে—নবীনের শ্বশুর॥ গোপাল—ইন্‌স্পেক্টর॥ ফতেবক্স—জমাদার॥ মন্দাকিনী—নীলকমলের স্ত্রী॥ এলোকেশী—নবীনের স্ত্রী॥ তারা—প্রতিবাসিনী॥ প্যারী—ঐ॥ কেলোর মা—ঐ॥

এই পরিবর্তন, দৃষ্টিকোণ, তথ্য ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে মূল্য বহন করে বলে এই সংস্করণটি উপস্থাপনেব উপযোগিতা অস্বীকার করা প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনকর।

কাহিনী।—নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায ছাপাখানার কম্পোজিটার। নবীন, কানাই, ডিক্রুজ—সবাই মিলে কম্পোজ কবছে। এর মধ্যে কানাই মন্তব্য করে—"আর কাজে মন লাগছে না।" নবীন বলে,—"তুমি রাত জেগে, মদ খেযে কাটাবে, ভাল লাগবে কেন।" কানাই তখন মদের মাহাত্ম্যের কথা বলে। ডিক্রুজও তাতে সায দেয। এমন সময বড়োসাহেব মাষ্টার মাইণ্ড এসে নবীনকে বলেন, সে যেন কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ী যায। সাহেব চলে গেলে কানাই মন্তব্য করে,—"বাঁচলে তুমি! বাড়ীতে কি করে যুবতী বউকে ফেলে আস! আমাদেব তাতো নেই, কিন্তু মামাবাড়ী আছে।" নবীন জবাব দেয—"বউ পরিবারের ভিতরে থাকে। আবার সে গাঁযে মাতাল নেই।" অতএব চিন্তার কোনো কারণ নেই।

নবীনের বৌ এলোকেশী আছে বাপের বাড়ীতে। শ্বশুরের নাম নীলকমল মুখুয্যে। সে বুড়ো বযসে দ্বিতীযপক্ষে বিযে করে স্ত্রীসর্বস্ব হযে পড়েছে। নীলকমল স্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছে। মন্দাকিনী তারকেশ্বরে পুজো দিতে গেছে। শেষে মন্দাকিনী ফিরে এলে স্বামী তাকে আদর করে। স্বামীকে স্নান করতে পাঠিযে মন্দাকিনী একটা ফন্দি আঁটে। তারপর স্বামী এলে বলে যে, এলোকেশীকে মোহন্তর কাছে পাঠানো উচিত। এলোকেশী তার সতীনের মেয়ে। মন্দাকিনী বলে,—"মোহন্ত এলোকেশীকে যেমন ভালবাসে

২৩। ১লা ফাল্গুন ১২৮০ সাল, হাওড়া।

এমন তো অন্য কাউকে আর ভালবাসে না।" মোহন্তের পায়ের ধুলো পাওয়ায় এলোকেশী ধন্য।—এসব কথা বলে সে নীলকমলকে ভোলায়। নীলকমল দোটানায় পড়ে। সে বলে,—নবীনের আসবার কথা আছে। সে এসে পড়লে ভয়ানক বিপদ হবে। যাহোক এলোকেশীকে নবীনের কাছে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে, এমনই তার ইচ্ছে। মন্দাকিনী তখন নীলকমলকে বলে,—মোহন্তর কাছে এলোকেশীকে পাঠালে মন্দাকিনী পাচশো টাকা পাবে। নীলকমলও আড়াইশো টাকা পাবে। অর্থলোভে শেষে নীলকমল স্ত্রীর কথায় সম্মত হয়, তাছাড়া স্ত্রীর কথার বিরুদ্ধে কাজ করবার মতো কোনো ক্ষমতাই তার ছিল না।

এদিকে নবীন এলোকেশী সংক্রান্ত একটা বেনামী চিঠি পেয়ে শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয়। কুমরুল গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে পুষ্করণীর বাঁধা ঘাটের কাছে সে একটু দাড়ায়। বাবুগিরির জন্যে সে একটা নতুন জুতো কিনেছে, কিন্তু ফোস্কার জন্যে পায়ের ব্যথায় সে চলতে পারছে না। চিঠির ব্যাপারে নবীন ভাবে,—এলোকেশী তো তাকে খুব ভালোবাসে। এমন ঘটনা হতেই পারে না। পাড়ার কোনো বদমাস ছোঁড়া এমন চালাকী করেছে। পথে তো হরিদাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিছু হলে সে নিশ্চয়ই বলতো! কিন্তু বলে নি। কয়েকজন মেয়ে এই সময় স্নান করতে ঘাটে আসছিলো। তারা নবীনকে দেখে নিজেরাই বলাবলি করে, এলোকেশী নাকি মোহন্তর কাছে যাতায়াত করে। আর, এই মোহন্তও ভালো নয়। তার ওখানে বাঈজী নাচ ইত্যাদি হয়। পাড়ায় সকলেই সব জানে, কিন্তু মোহন্তর ভয়ে বলতে পারে না।

এসব শুনে নবীন উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে। শ্বশুরবাড়ীর দরজায় এসে নবীন পৌঁছোয়। নবীন দেখে, বাড়ীর দরজা বন্ধ। আস্তে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। ভেতর বাড়ী। বাড়ীতে কেউ নেই। দূর থেকে গান ভেসে আসছে,—

> "সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেছে, শেষ পড়েছে কলি।
> বুড়োর ঘরে ছুঁড়ি গিন্নী, মনের দুঃখে বলি॥"

কাউকে দেখতে না পেয়ে নবীন নীলকমলকে ডাকে। কিছুক্ষণ পর নীলকমল এসে বলে, সে পায়খানায় গিয়েছিলো। কেলোর মা-কে নীলকমল জলতামাক আনতে নির্দেশ দেয়। কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে সে বলে,—পরিবারের সবাই মোহন্তর কাছে আরতি দেখতে গিয়েছে। নবীন বিন্দুমাত্র অপেক্ষা

করে ওখান থেকে বিদায় নিয়ে সেই রাতেই রওনা হয়। আর এদিকে নীলকমলও ভয়ে ভগে পৈতে জপ করে। ভগবানের কাছে রক্ষা পাবার জন্যে প্রার্থনা করে সে। নবীন ফিরে আসে। এসে নীলকমলকে কর্কশ স্বরে বলে, "রোজগার করতে পাঠিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর চৌকী দিচ্ছ, দিব্বি চাকরী পেয়েছ! তুমি সহ্য করতে পার তোমার পরিবারকে পাঠাবে আমার পরিবারকে কেন পাঠাবে, এ কেবল আজকে বলে নয়।" নীলকমল তাকে মাতলামি করতে বারণ করে। এমন সময় নেপথ্য থেকে কে যেন বলে ওঠে, "মামাঠাকুর শীঘ্র আসুন মামীঠাকরুণকে কিসে কামড়েছে।" নবীন তা দেখবার জন্যে যায়। কিন্তু জানতে পারে সবই ভাওতা। মনে মনে সে ভাবে,—"দুষ্টবুদ্ধির আর সীমা নেই—সাপে কামড়েছে বলেন!"

এলোকেশীকে একা পেয়ে নবীন ডেকে বলে,—"রোজ কোথায় যাস্ বল। এই তোর পতিভক্তি! আমি বিদেশে খেটে [illegible] খাবার ব্যবস্থা করি। বল কি হয়েছে!" এলোকেশী বলে,—আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমার এমন স্বামীহারা হলেম। জন্মদাতা বাপ হয়ে এমন দুর্দশা ঘটালে। আমি মহাপাতকী, কলঙ্কিনী, ব্যভিচারিণী [illegible]। কী তা নবীন জিজ্ঞেস করলে এলোকেশী বলে, সন্তান মানসে একদিন তার মা আর [illegible]বৌ দুজনে মিলে তাকে মোহন্তর কাছে নিয়ে যায়। মোহন্ত একটা পানা খাওয়ায়। তারপর সে জ্ঞান হারায়। পরদিন ভোর হলে সে দেখে, মোহন্ত তার বিছানা ছেড়ে উঠে যাচ্ছে। মোহন্তর বিছানাতেই সে রাত কাটিয়েছে। এরপর মায়ের চাপে এলোকেশীকে অনেকবার সেখানে যেতে হয়েছে। এই বলে সে কাঁদতে সুরু করে। এলোকেশী আক্ষেপ করে—"আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল। আমার এ আভরণ গয়না পরে কি হবে।"—বলে সব গায়ের গয়না এলোকেশী ফেলে দেয়। নবীন মন্তব্য করে—"মোহন্তের এই কি কাজ!!"

নীলকমলের ভেতর বাড়ী। এলোকেশী ভাবে, বেলা হলো—এখনো এরা এলো না। বামনপিসী এসে এলোকেশীকে সান্ত্বনা দেয়। এলোকেশী বলে,—তার আর বাঁচতে সাধ নেই। বাবা মাকে খুঁজতে গেছে। নবীন পাল্কী আনতে গেছে—এলোকেশীকে নিয়ে যাবে। এলোকেশীকে যদি চরণে স্থান দেয়, তাহলেই এলোকেশী সুখী। এদিকে নবীন হতাশ হয়ে ফিরে আসে। বলে, —"বেটার দৌরাত্ম্য তো আছে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক রেখে দিয়েছে,—এলোকেশীকে নিয়ে যেতে দেবে না।" পাল্কীওয়ালাকে বায়না দিয়ে রেখেছিলো।

সেও মোহন্তর বিরুদ্ধে কাজ করবে না। নবীন মন্তব্য করে,—"এ সকল স্থানে আসবে কি করে। এ গ্রামের সকলেই তাহার বশীভূত। আমারই যখন ভয় হচ্ছে, তখন এলোকেশীরও ভয় হওয়া স্বাভাবিক। মা বাপের কথায় রাজী হতে হয়েছে।" নবীন একবার ভাবে থানায় যাবে। কিন্তু পরেই ভাবে, তাহলে এদিকে দেরী হয়ে যাবে। এমন সময় জলখাবার হাতে এলোকেশী আসে। নবীনের শুক্‌নো মুখ দেখে এলোকেশী ভয় পেয়ে যায়। সে মন্তব্য করে,—এ সংসারে তার আর একদণ্ড থাকবার ইচ্ছে নেই। নবীন এলোকেশীকে একটি পান সাজতে বলে। এই সময়ে নবীন একটা আঁশ বঁটি দিয়ে বার বার আঘাত করতে করতে উন্মত্তের মতো বলে,—"কেন এমন রূপসী হয়েছিলে, এইবার মোহন্ত কেমন তোমায় নেয় দেখি!"

এলোকেশীকে খুন করে নবীন থানার দারোগার কাছে গিয়ে নিজেই স্ত্রী-হত্যার স্বীকারোক্তি করে। সব কথাই সে খুলে বলে। এমন কি পাল্কীওয়ালাকে বায়নার টাকা দিয়েও সে এলোকেশীকে নিয়ে যেতে পারে নি—তাও বলে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মোহন্তের চর। বাধ্য হয়ে সে নিজের স্ত্রীকে খুন করেছে। তারপর সে দারোগার কাছে অনুনয় বিনয় করে—ফাঁসীতে যাবার জন্যে। এ পৃথিবীতে তার একদণ্ড থাকবার ইচ্ছে নেই। দারোগার প্রশ্নের জবাবে সে বলে,—"স্বচক্ষে দেখি নি, স্বকর্ণে শুনিনি বটে, কিন্তু পতিপ্রাণা এলোকেশীর স্বীকারোক্তি মিথ্যা নয়। হায়! হায়!! মোহন্তের এই কি কাজ!!"

উঃ! মোহন্তের এই কাজ! (কলিকাতা ১৮৭৩ খৃঃ)—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ॥ লেখক কবিতাকারে একটি বক্তব্য প্রকাশ করে তাকেই ভূমিকা নামে অভিহিত করেছেন।[২৪]

এই যে দর্পণখানি রাখিনু সম্মুখে।
কার প্রতিবিম্ব ইথে হইবে বিম্বিত?
মুকুর সমান যার বিমল মূরতি;
সেত কভু ইথে মুখ দেখিতে না পাবে,
যথা মুকুরে মুকুর;—কিন্তু তা না হলে
বিম্বিত হইবে মূর্তি-রূপ দেখা দিবে।"

২৪। ১৯শে আশ্বিন—১২৮০ সাল।

সর্বশেষে নান্দী—

"ঘোর পাপাচারী ভণ্ড পাষণ্ড দুর্জ্জন।
রে মোহন্ত রে পামর কি করিলি বল ?
কলুষিত করি ধর্ম্ম—রাজসিংহাসন।
কামানলে পোড়াইলি সতীত্ব কমল ॥
মেঘপাশে প্রেমপাশে বাঁধা সৌদামিনী
পতিকোলে নৃত্য করে দহিবে সুন্দর ॥
কে চাহেরে ধরিবারে সেই বিনোদিনী।
যে চাহে সে অগ্নি চাহে মস্তক উপর ॥"

কাহিনী —নবীন কলকাতার আধুনিক যুবক। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সে স্ফূর্তি করলেও তার চরিত্রদোষ নেই। বরং তার বন্ধুরা সমাজের হিত নিয়েও আলোচনা করে। উমেশ বলে,—কেশববাবু বাংলাদেশের কিছুই মঙ্গল করেন নি। "কেবল কতকগুল ছোঁড়ার মাথা খাওয়া হচ্চে।" ভুবন বলে,—"ছোড়াগুল আগে বাপমার ভয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে পারত না, এখন 'সমাজে যাচ্ছি' বল্লে আর বাপমা বারণ করতে পারে না, কিন্তু সমাজ যে কোথা হচ্চে তাত আর মা বাপ জানতে পারে না।" বিপিন অবশ্য মন্তব্য করে—"বাস্তবিক, জন কত এই বখাটে ছেলের জন্য সমস্ত ব্রাহ্মদের নিন্দে হচ্ছে।" এরা সাহিত্যে ও সমাজে অশ্লীলতা নিয়েও আলোচনা করে। এদেরই বন্ধু নবীন।

নবীন বিবাহিত। শ্বশুরবাড়ীতে তার বিবাহিতা স্ত্রী সরলা আছে। হঠাৎ নবীনের কাছে চিঠি আসে যে, তারকেশ্বরের মোহন্তর সঙ্গে ব্যভিচার করবার জন্যে সরলাকে তার বাবা মা বাধ্য করেছে। নবীনের মনে হয়, কেউ বুঝি শত্রুতা করেছে, যাহোক সে তক্ষুণি শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে তৈরি হয়। ট্রেন চলে গেছে। নৌকোতেই পাড়ি দেয়। অবশেষে অনেক রাতে গিয়ে সে উপস্থিত হয়।

নবীনের শ্বশুরের নাম হরিশঙ্কর শর্মা। নবীনের স্ত্রী সরলা তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী সাবিত্রীর কন্যা। সাবিত্রী মারা গেছে। হরিশঙ্কর বৃদ্ধ বয়সে তরঙ্গিনীকে বিয়ে করেছে। গয়না এবং টাকার ওপর তরঙ্গিনীর খুব লোভ। তেলীবৌয়ের পরামর্শে টাকার লোভে সে মোহন্তের সঙ্গে সতীনের মেয়েকে ব্যভিচার করতে প্ররোচিত করেছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে বৃদ্ধ হরিশঙ্কর কেঁচো। সে বাধ্য হয়ে অনুমোদন করেছে। হরিশঙ্কর আক্ষেপ করে,—

"বৃদ্ধ বয়সে যুবতীর পাণিগ্রহণ করা গুখুরি কাজ।…উঃ! বাপ হয়ে কি কাজই করচি, টাকার লোভে এই সর্ব্বনাশী আমাকে কি না করাচ্চে।" সরলা প্রথম দিনে চক্রান্তে পড়ে মোহন্তর কাছে গিয়েছিলো, এবং অজ্ঞান অবস্থায় তার ধর্ম নষ্ট করা হয়েছিলো। তারপর থেকে তাকে বার বার যেতে বাধ্য করা হয়েছে এবং একবার ধর্ম নষ্ট হওয়ায় সেও আর আপত্তি করে নি। তবে সে-ই চিঠি দিয়ে স্বামীকে এসব জানিয়েছিলো।

তরঙ্গিনীকে হরিশঙ্কর বলে,—"আমরা যে কাজে হাত দিয়েছি, তা কিন্তু বড় ভাল নয়। অ্যাকে ত লোকের কাছে অপমান। আর দেখ সরলা ছেলেমানুষ, সে স্বামী বই আর কিছুই জানে না, তার মন্দ করে আমরা এ টাকা নাই বা রোজগার কল্লেম।"—বিদেশে স্বামী আছে—জানতে পারলে কি ভাববে, তাছাড়া ভগবানও তো আছেন! তখন তরঙ্গিনী যুক্তি দিয়ে বলে,—"মোহন্ত সরলাকে নিয়ে আর ত কিছু করে না, কেবল ভালবাসে বই ত নয়। তবে আর পাঠাতে হানিটা কি? আমায় যদি ভালবাসে তাহলে তুমি কি রাগ কর?" একথার পর তরঙ্গিনীকে সে কিছু বলতে পারে না। আজও তরঙ্গিনী তেলীবৌ আর সরলাকে নিয়ে পাল্কী করে মোহন্তর কাছে যাবে। হরিশঙ্করের বারণ না শুনে সে চলে যায়। হরিশঙ্কর ভাবে,—"সরলাকে একবার শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পারিলে হয়, আর এ মুকো কোরব না, এখানে আনবার নামও করিব না। একবার পাঠাতে পারলে বাঁচি।"—

নবীন শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে গাঁয়ের পথেই মেয়েদের বলাবলি করতে শোনে যে, সরলার সঙ্গে মোহন্তর অবৈধ সংযোগ চলছে। এরা ঘাটে জল আনতে যাচ্ছিলো। নবীন আরো দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। শ্বশুরবাড়ীতে এসে সে দেখে হরিশঙ্কর একা। কোথায় আর সবাই—জিজ্ঞেস করলে হরিশঙ্কর জবাব দেয়, সরলা এবং তাঁর স্ত্রী মোহন্তর কাছে ওষুধ আনতে গেছে। এতো রাত্রে এভাবে যাওয়াটা সন্দেহজনক। নবীন ছুটে বেরিয়ে যায় তারকেশ্বরের উদ্দেশে। গিয়ে সব দেখে ফিরে এসে হরিশঙ্করকে গালাগালি করে। হরিশঙ্কর তাকে মাতলামি করবার জন্যে তিরস্কার করে। সে বলে,—কেন হে বাপু কুকাজটা কি হয়েচে বলত? দেবতা স্থানে যাবে না, গুরু-পুরুতের বাড়ী যাবে না, গুরু-পুরুতের বাড়ী রাত্রি প্রবাস করবে না, হিন্দুয়ানী রাখতে গেলে এসব চাই। আমরা ত আর তোমাদের মত নাস্তিক নই"

"নবীন জবাব দেয়—"আমরা নাস্তিক আর তুমি ব্রাহ্মণ? তুমি আর ওকথা

মুখে এন না,—ব্রাহ্মণের অমান্য কোরো না, তোমার ভণ্ডামি আমি সব শুনেছি।" হরি উঠে ঘরের মধ্যে চলে যায়। নবীন আড়াল থেকে শোনে, তরঙ্গিনীর সঙ্গে হরিশঙ্করের ঝগড়া। এবার সে তাদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই সব ধরে ফেলে।

শয়নঘরে সরলা মৌনভাবে যখন এসে দাঁড়ায়, নবীন তাকে তিরস্কার করে। বলে, যার জন্যে তার এতো প্রেম, সে কিনা ব্যভিচারিণী! সরলা নিজের দোষ প্রকাশ করে। সে নিজের পাপ স্বামীর কাছে জানাবার জন্যেই নিজের থেকে চিঠি পাঠিয়ে সব জানিয়েছিলো। সরলা কাঁদে। স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে, তাকে মেরে ফেলবার জন্যে অনুরোধ জানায়। তারপর ধীরে ধীরে তার দুঃখের কথা বলে। তেলীবৌয়ের পরামর্শে তার সৎমা ছেলে হবার জন্যে মোহন্তের ওষুধ খাওয়ার জন্যে সরলাকে অনুরোধ করে। সরলার বাবাও বলে,—"মোহন্তের ওষুধ খেয়ে যদি সরলার আমার একটি ছেলে হয়, তবু যা হোক, আমি কবে আছি কবে নেই, নাতীর মুখটি দেখে গেলেও স্বর্গ হবে।" সরলা রাজী না হলে তরঙ্গিনী সরলার নামে তার স্বামীর কাছে পাড়ার ছেলেদের সম্পর্ক তুলে মিথ্যে অপবাদ দেয়। তখন বাধ্য হয়ে সরলা রাজী হয়। শনিবারের দিন সন্ধ্যার পর গিয়ে ওষুধ খেতে হবে। শনিবারের দিন বেলা থাকতেই তরঙ্গিনী তাকে তারকেশ্বরে নিয়ে গিয়ে বাবার পূজো দেওয়ায়। মোহন্তর ওষুধ সবাই বাইরের আটচালা থেকেই নিচ্ছিলো, কিন্তু সরলাদের নিয়ে ওখানকার একটি মেয়েমানুষ ভেতরের এক ঘরে বসায়। সরলার মনে ভয় হলেও ভাবে, তার মা তো এখানে সঙ্গে আছে। কিছুক্ষণ পর মোহন্ত এসে তার মার সঙ্গে এবং সেই মেয়েমানুষটির সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে এবং বলে, "এই কি তোমার মেয়ে, একেই ওষুধ খাওয়াতে হবে!" তরঙ্গিনী মোহন্তকে বলে "ও আসতে চায় না, বলে, আমায় ছেলের কাজ নাই; কত বলা কওয়ায় তবে এয়েছে।" তাতে মোহন্ত কত বোঝায়—"সন্তান না হলে মেয়েমানুষের জন্মই মিথ্যা, সন্তান না হলে মেয়েমানুষ হাজার পুণ্য করিলেও স্বর্গে যায় না।" এমন কি, "শাস্ত্রে লেখা আছে, স্বামী কাছে না থাকলে অন্য কারো দ্বারা..." ইত্যাদি অসঙ্গত কথাও মোহন্ত বলে চলে। কিছুক্ষণ পরেই মোহন্ত গেলাসে করে "ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি" ওষুধ এনে দেয়। তারপর বলে,—"আবার ওষুধ খেতে হবে, একবার খেলেই যদি ছেলে হতো, তাহলে আর ভাবনা কি ছেল! এখন মধ্যে মধ্যে ওষুধ খেতে

হবে।" কিছুক্ষণ পর সেই মেয়েমানুষটা প্রসাদ বলে একটা থালায় করে জলখাবার দিয়ে যায়। তখন সরলার জিভটা পেটের মধ্যে যেন টানে, মাথাটা ঘুরতে থাকে। সে বাড়ী যেতে চায়। তরঙ্গিনী মেয়েমানুষটার সঙ্গে গা টেপাটেপি করে হেসে তারপর বললো, "ওষুধ খেলেই একটু গাটা কেমন করে তা একটু শুয়ে থাক তাহলে সব সেরে যাবে এখন।" খাটের ওপর সরলাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। পরপুরুষের খাটে সে শুয়েছিলো—ওঠবার ক্ষমতা ছিলো না বলেই। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সরলা বর্ণনা দিতে দিতে বলে,—"তারপর সমস্ত রাত্রি কি হলো তা আমি কিছু জানিনে,—ভোরের সময় উঠে দেখি যেন সেই বিছানা থেকে কে উঠে গেল। আমি এই দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেম, কিন্তু কারও কিছু সাড়া শব্দ পেলুম না।"—সরলা নবীনকে এসব কথা বলে আর কাঁদে! নবীন তাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে,—"কাঁদলে আর কি হবে, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর উপায় নাই।" যাহোক নবীন তাকে বলে, সে কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিক, কলকাতায় তাকে নিয়ে রাখবে। স্বামীর উদারতায় সরলা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। স্বামী পাল্কী ডাকতে চলে গেলে কাঁদতে কাঁদতে সরলা বলে,—"আহা! এমন স্বামী কি কেউ আর পাবে! আমার পূর্ব্ব জন্মের ফল তাই আমি এমন স্বামী পেয়েছি।"

থাকমাসী এসে সরলাকে স্বামীভক্তি নিয়ে উপদেশ দেয়। বলে,—"দেখ মা সোয়ামী অপেক্ষা আর পিরথীবিতে কিছুই নেই। শুন নি দময়ন্তি সোয়ামীর জন্য কি না করেছিল, সীতা দেবী বনে গিয়েও সোয়ামীর নিন্দে করে নি, তা সোয়ামীর চেয়ে কি আর কিছু আছে। যদি ফুল-চন্দন দিয়ে সোয়ামীর পা পূজা করা যায়, তাহলে নারায়ণের পূজা আর তাঁর কথার বাধ্য হয়ে থাকতে পারলে কোন বিঘ্ন বিপদ হয় না, তা যখন তোমার সোয়ামী তোমার সব দোষ ক্ষমা করেচেন আর তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রাহ্যি করেচেন তখন আর তোমার ভাবনা কিসের?" থাকমাসীর কথা শুনে সরলার মনের দংশন অনেকটা কমে আসে। সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

এদিকে নবীন হতাশ হয়ে ফিরে আসে। মোহন্ত ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক রেখেছে। স্ত্রীকে নিয়ে যেতে গেলে তারা পথ আটকাবে। "উঃ! একি অরাজক! দেশে কি রাজা নাই? ও ব্যাটার যা মনে যাচ্চে তাই কচ্চে, দেশে কি শাসনকর্ত্তা নেই! হায় হায়! বেটা আমার সব দিকে প্রতিবন্ধক হল—ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক রেখেচে—কোন মতেই আমার স্ত্রীকে নিয়ে

যেতে দেবে না।” কার কাছে নবীন সাহায্য চাইবে, সকলেই তো এর মুঠোর মধ্যে। “সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভার সভ্যগণ, তোমরা কি এই সব অত্যাচার দেখে শুনে কিছুই করবে না। আর যদি তোমরা এসব বিষয়ে অমনোযোগী হও, তাহলে যে, দেশের কত সতীর সতীত্ব যাবে, কত সতী দুশ্চরিত্রা হয়ে স্বামীর মনে কষ্ট দিবে, তা কি তোমরা দেখবে না।...উঃ! আমি পুরুষ বাচ্ছা, পাঁচজনের কাছে গিয়ে আমার দুঃখ জানাতে পারি—তাই যখন আমি পাচ্চি নি, তখন আমার সরল সরলা মেয়ে মানুষ হয়ে কি করে জানাবে।” নবীন খেদ করে। কিন্তু উপায় কি? সরলাকে এখানে রাখলে মোহন্ত আবার সরলাকে অপমান করবে। হঠাৎ নবীন পাগলের মতো হয়ে পড়ে। একটা আঁশবঁটি হাতে তুলে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে বলে—“তার এমন কি সাধ্য, এমন কি ক্ষমতা যে আমার হাত থেকে আমার একমাত্র ধন—জীবন-ধন প্রাণের সরলাকে কেড়ে নেয়।” বঁটি দিয়ে সে সরলাকে পরপর তিনবার আঘাত করে মেরে ফেলে। বলে ওঠে,—“মোহন্ত—তোর এত বড় কি আস্পর্দ্ধা যে তুই কেড়ে নিবি, কেড়ে নিয়ে যা, আমার সরলাকে নিয়ে সুখভোগ কর।” নবীন পাগলের মতো বেরিয়ে যায়। সকলে ছুটে এসে সরলার অবস্থা দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে।

ওদিকে নবীনের দিদি-শাশুড়ীরা সবাই একঘরে হয়েছে। চন্দ্রমণি আক্ষেপ করে বলে, কি কুক্ষণেই সে তরঙ্গিনীকে পেটে ধরেছিলো। ব্রতের নিমন্ত্রণে বড়ো বড়ো কোনো ব্রাহ্মণই ওখানে যান নি। চন্দ্রমণি বলে,—“সকলেই কি আসবে না? তবে কিনা যারা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারাই আসে নি। আর তারা না আসলেই আমার সব কর্ম্ম বৃথা। কেন না তারা বিধান দাতা শাস্ত্র তাস্ত্র তদেরি করে, পুঁথি পড়ে, তারাই সমাজের প্রধান।” প্রতিবাসিনী গয়া বলে,—“তা দেখচি এতে আবার কিছু টাকা বাহির কত্তে হবে। এই সকল প্রধান বামুন পণ্ডিতকে কিছু করে দিলেই এঁরা তোমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন। তা আবার কি করবে, জাত মান রাখতে গেলে, এও কর্ত্তে হয়।” ইতিমধ্যে সরলার মৃত্যুর খবর আসে। এরা খবর শুনে আঁৎকে ওঠে। তবে এমন একটা যে হবে, এটা নাকি তারা আগেই অনুমান করে ছিলো।

থানায় আজ জমাদার আর কনষ্টেবল উল্লসিত। একটা আওরৎ তারা সংগ্রহ করে এনেছে। দীননাথ পালের স্ত্রী ফুলমণিকে তারা ধরে এনে

অভিযোগ আনে যে, 'রিজিষ্টারি' না হয়ে রাত করে কুমতলবে মেয়েটি পথে বেরিয়েছিলো। জমাদার মহাবের বলে,—"আমরা এক রকম রাজা, কলকেট্টা পুলিশ আমাদের, আমরা যা করবো, তাই হবে, আমরা চোরকে ছাড়িয়ে দিতে পারি আর ধরতেও পারি।" আড়ালে ডেকে কনষ্টেবল আসানউল্লা মেয়ে-মানুষটিকে বলে,—"তুই হামারা সাৎ কুছ বন্দোবস্ত কর, না করিস্ তো ইস্ যায়গা মে তোম্‌কো হাম আচ্ছি তরেসে হামারা মোট কো ভিতর লে যায়েগা।" ওদিকে মহাবেরও কন্‌ষ্টেবলকে আদেশ দেয়,—"ফুলমণিকো একলা এক কামরামে রাখিও, হাম বি উস ঘরমে রহেগা।" দুজনেই ফুলমণির ধর্ম নষ্ট করবার জন্যে উত্তেজিত। মহাবের ফুলমণির প্রতিবাদ সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ করে পেটের কাপড় ধরে টানাটানি করে। স্বামী দীননাথ আসে, কিন্তু সব দেখেও নিরুপায়। পুলিশের বিরুদ্ধে কি বল্‌বে! সে আক্ষেপ করে বলে,—"তোরা দেশরক্ষক হয়ে পতিপ্রাণা স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করতে প্রস্তুত হয়েছিস্? হা গবর্ণমেণ্ট! হা লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর! হা নর্থব্রুক সাহেব! তোমরা কি এসব কিছুই দেখবে না?......পুলিস কর্মচারীদের শাসন করিবার জন্য ভারতবর্ষে কি কেহই নাই? দেশে কি রাজা নাই?"

ইতিমধ্যে নবীন ছুটতে ছুটতে পাগলের মতো আসে। তার চালচলন সন্দেহজনক মনে হয়। ফুলমণির ধর্মনাশের কাজ স্থগিত রেখে তারা ইন্‌স্‌পেক্টরকে খবর দিতে চলে।

মোহন্তের চক্রভ্রমণ (কলিকাতা ১৮৭৪ খৃঃ)—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়॥ প্রহসনকারের উদ্দেশ্যমূলকতা গ্রন্থশেষে প্রদত্ত দীর্ঘ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"কি কব নবীন মনে দিলি কি বেদন।
ভ্রষ্টা নারী জেনে কেন করিলে নিধন॥
পরিহরি রমণীরে যদি রে আসিতে ফিরে
ভাসিত না আঁখিনীরে, কেহ তাহলে এখন॥
পুরুষত্ব দুঃখ রোষ স্ত্রীবাধ্য এ চারি দোষ,
প্রকাশ্যে তব আক্রোশ, দেখি এ কাজে।
লোকে পুরুষত্ব জন্য, বলিছে তাহাতে ধন্য,
নহে এ কার্য জঘন্য, হয়েছে বলি ঘটন॥"

পরিশেষে,—

"বলি রে ডেকে ডেকে শিখে নে রে তোরা।
পরদার পাপাচারে মোহন্তের এ ঘানি ঘোরা ॥
ছিল সে রাজভোগে, মোলো কি ছাই রোগে,
যেমন রোগ তেমনি তাহার ঘানি গাছে ওষুধ পোরা ॥
দোষিছে দেখ দশে, গদীতে কেবা বসে,
ছাই দিয়েছে ঢেলে যশে সার হয়েছে আঁখি ঝোঁরা ॥

কাহিনী।—মোহন্ত তার ঘরে বসে ভাবে। সে কতো কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট করেছে। আর আজ এক সামান্য বিষয়ের জন্যে সে ভাবছে। বাবা তারকেশ্বর নিশ্চয়ই তার কামনা পূর্ণ করবেন! বামুনটা চাকরীর উমেদার, তেলী বৌ ভরসা দিয়েছে; বিমাতারও অমত নেই। আর, টাকা খরচ করতেও সে রাজী। তবুও এখনো মেয়েটিকে আনছে না কেন! এমন সময় গিন্নি ও তেলী বৌ এলোকেশীকে নিয়ে আসে ওষুধ খাওয়াবার জন্যে। মোহন্ত এগিয়ে এসে তাদের বসতে বলে। গিন্নি ও তেলী বৌ এলোকেশীকে বিছানায় বসতে বলে। মোহন্তর ওষুধ খেলেই তার সন্তান হবে। তাদের পীড়াপীড়িতেও এলোকেশী রাজী হয় না। পরে তার জলতেষ্টা পেলে মোহন্ত বাবার প্রসাদী জল খাওয়ায়। এলোকেশী অস্বস্তিবোধ করে। সে তার মা এবং তেলীবৌকে বলে তাকে বাড়ী রেখে আসতে। কিন্তু শত অনুনয় বিনয়েও কোনো কাজ হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলোকেশী মূর্ছিত হয়ে পড়ে। গিন্নি এলোকেশীর ভার মোহন্তের ওপর দিয়ে চলে যায়। মোহন্তও এলোকেশীকে নিয়ে দুষ্কর্ম করতে যায়।

নীলকমল মুখুজ্যের বাড়ী। এলোকেশী ভাবে, সে যে দুষ্কর্ম করেছে, তাতে তার প্রাণনাথ কি তাকে গ্রহণ করবে! এই দুষ্কর্ম বেশিদিন চাপাও থাকবে না। তার মৃত্যু হলেই ভালো হতো। এলোকেশী এসব কথা ভাবছে, এমন সময় তেলীবৌ এসে বলে, এতো ভাববার কি আছে! ছাপাখানার চাকর আর মোহন্ত মহারাজ—অনেক তফাৎ। মোহন্ত মহারাজের ওপর তার কোনো ক্ষমতা নেই। আজও এলোকেশীকে আবার যেতে হবে মোহন্তের ওখানে। এলোকেশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে,—মোহন্তর ওপর ক্ষমতা প্রকাশ করতে না পারলেও তাকে তো নবীন মাপ করতে পারবে না। গায়ের গয়নায় তার কোনো প্রয়োজন নেই। ঐসব মন্দ কথা সে যেন আর না বলে।

এ বিষয়ে তার আর ইচ্ছে নেই। "ওষুধ খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে, তোদের অত্যাচারে তেষ্টা পেল আর তোরা কিনা সিদ্ধিগোলা জল দিলি। আমার দুর্দশা তোরা কেও দেখলি না।" এই বলে এলোকেশী কাঁদতে থাকে। তেলীবৌ তাকে সান্ত্বনা দেয়। এমন সময় গিন্নি এসে এলোকেশীর রূপের বর্ণনা করে। তারপর, জামাইটি মনের মতন হয়নি বলে দুঃখও করে। এখন এই বাছার জন্যই সংসার চলছে।"—ইত্যাদি নানা কথা বলে এলোকেশীকে ডেকে নিয়ে যায়।

এলোকেশীর স্বামী নবীন কলকাতায় ছাপাখানায় কাজ করে। ছাপাখানার উঠোনে তেলীবৌ নবীনকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে। সঙ্গে তার এক হাঁড়ি 'ওলা' ও একখানি কাপড়। নবীন এসে তার কাছে এলোকেশীর খবর নেয়। বলে যে, সে সামনের গুড ফ্রাইডে ছুটিতে এলোকেশীকে আনতে যাবে। তেলীবৌ বলে, এখন ভীষণ রোদ। যাওয়ার এখন প্রয়োজন নেই, পরে গেলেই চলবে। হাঁড়ি ও কাপড় দিয়ে তেলীবৌ চলে যায়। নবীন কাপড় খুলে দেখে, কাপডটা নতুন, কিন্তু ব্যবহার করা বলে মনে হয়। কাপড়টা কার—কেই বা তা ব্যবহার করেছে—নবীন এসব চিন্তা করে।

নবীনের শ্বশুর নীলকমল মুখুয্যে। নীলকমল তামাক খাবার জন্যে নেপথ্যে হাঁক দিয়ে আগুন আনতে বলে, কিন্তু কেউই সাড়া দেয় না। আগে নীলকমলকে পাড়ায় সকলে মান্য করতো। এখন বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে যেন ভেড়া হয়ে গেছে। ওদিক থেকে মোহন্তর কাছ থেকে সোনাদানা পেয়ে গিন্নির আহ্লাদ হচ্ছে। নীলকমল বাপ হয়ে নিজের চোখের সামনে মেয়ের সর্বনাশ দেখছে। আসলে তেলীবৌই সব কিছু নষ্টের গোড়া। মেয়ে তাকে এখন কতো গালমন্দ দিচ্ছে। মেয়ের সর্বনাশের সেই প্রধান পাপী। নীলকমল এসব নানান কথা চিন্তা করে। এমন সময় গিন্নি আগুন নিয়ে আসে। গিন্নি এসেই দেরী করতে চায় না। কারণ পাল্কী এসে গেছে, এখনই তাকে মোহন্তর কাছে যেতে হবে। নীলকমল তাকে বাধা দিয়ে বলে, তেলীবৌ নেই, কি হবে! গিন্নি কর্তাকে তখন অনুযোগ করে বলে, গিন্নির একটু সুখ হয়েছে, তাই কর্তার বুঝি সহ্য হচ্ছে না। সে একাই যেতে পারবে। কোথায় কোন্ ঘরে যেতে হবে, তা সে সবই জানে। এমন সময় তেলীবৌ ফিরে আসে। সে বলে, নবীন আসবার জন্যে উদ্যত হয়েছিলো। সে তাকে মানা করে এসেছে। কর্তা মনে মনে বলে, তার নিজের ঘৃণা বা লোকলজ্জা

—কিছুই নেই। স্ত্রীবাধ্য বশতঃ কিছুই বলতে পারে না। সেই কারণে তাকে এই জঘন্য কার্যে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে।—এই বলে নীলকমল গিন্নিকে পাল্কীতে তুলে দিতে গেলো।

রাস্তার ধারে পুকুরের পথ। দুজন গ্রামবাসী স্ত্রীলোক বলাবলি করে,—'মাগীর কি বুকের পাটা!' ওরা চেষ্টা করছে জামাই যেন না আসে। মোহন্তর দয়ায় তার গায়ে গয়না হয়েছে! বুড়োটাই সব নষ্টের মূল। শুনি, মেয়ের নাকি দোষ নেই। কপাল বলতে হবে। এদের কথাবার্তাতেই জানা যায় যে বুড়োর শাশুড়ী সাবিত্রী চতুর্দশী করবে। তাতে গ্রামের সবাই স্থির করেছে নিমন্ত্রণে যাবে না। রাজপথ দিয়েই এক বাউল গান গেয়ে যায়।—

"(কত) কুলবধূ হত্যা দিত, এবার কেউ যাবে না আর,
ছুঁড়ীর বাপের মুখে ছাই চক্ষু থাক্‌তে যেন নাই,
কেমন কোরে উদরে ভাৎ দিচ্চে বল ভাই।
আহার ব্যবহার গেল যে তার কুলের হলো কুলাঙ্গার ॥"

গান শুনে স্ত্রীলোকেরা মন্তব্য করে—"লোকে গান পর্য্যন্ত গেয়ে বেড়াচ্চে, মিন্‌সে লোকের কাছে কি কোরেই বা মুখ দেখায়!"

বাড়ীতেও অবশ্য বুড়োকে বিদ্রূপ হজম করতে হয়। কর্তা তামাক খাচ্ছিলো আর বাড়ী পাহারা দিচ্ছিলো। এমন সময় একপাল ছেলে এসে তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

"ভাল ধ্বজা দিলে বুড়ো, তোমার মুখে দি নুড়ো।
কি কোরে পরিলে শিরে কলঙ্কের চূড়ো ॥
অর্থলোভে একি কর্ম্ম, নাশিলে দুহিতার ধর্ম্ম,
সহিবে না এ অধর্ম্ম, খাইবে হুড়ো ॥"

এমন সময় নবীন এসে প্রবেশ করে। নবীনকে দেখে কর্তা গায়ে কাপড় জড়িয়ে জ্বরে পড়ার ভান করে। বাড়ীর সবাই কোথায় গেছে—নবীন জিজ্ঞেস করেও জবাব পায় না। তেলীবৌ এসে তাকে আদর করে বসায়। পথে কষ্ট হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে। নবীন দিদিমার বাড়ীতে যেতে চাইলে কর্তা নবীনের ছোটো শালী মুক্তকেশীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলে। মুক্তকেশী নবীনকে তার মামার বাড়ী নিয়ে চলে।

মুক্তকেশীর দিদিমা আনন্দময়ীর বাড়ী। নবীন আনন্দময়ীকে প্রণাম করে জানতে পারে যে দিদিমা সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপন করছেন। তাদের

নিমন্ত্রণ করেন নি বলে নবীন অনুযোগ করে। পরে এসে খাবে বলে নবীন চলে যায়। আনন্দময়ী খুব অসুবিধেয় পড়েন। এমন সময় প্রতিবেশিনী একজন পরামর্শ দেয়, নবীনকে বামুন ভোজনের পরে এনে একপাশে আলাদা করে খাইয়ে দিলেই চলবে।

এদিকে এলোকেশীর মন যেন কেমন কেমন হয়েছে। আপনা আপনিই চমকে ওঠে। দিনরাত ভাবে। অন্যবার নবীন এলে কতো আনন্দ পায়, অথচ এবার মন কেমন যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। এখন তার মৃত্যু হলেই ভালো। এসব কথা সে চিন্তা করে। "আমার এই পাপের জন্মজন্মান্তর ফল ভোগ করতে হবে।"

নবীন বুঝতে পারে, মুক্তকেশী তাকে নজরবন্দী করেছে। দিদিমার বাড়ী যাবার সময় সে সঙ্গে ছিলো। আবার দামোদরে স্নান করতে যাবার সময়েও সে সঙ্গে ছিলো। দিদিমার নিমন্ত্রণের কথা নবীন মুক্তকেশীকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, কেন যে নিমন্ত্রণ করে নি, তা সে বলতে পারে না। নবীন খেয়ে শুতে গেলে মুক্তকেশী বলে, নবীনকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেওয়া বারণ আছে। এলোকেশী বলে, "আমি অসুখ সারাতে এখানে এসেছিলাম, কিন্তু শরীরে এমনি রোগ প্রবেশ করেছে যে তাতে আর কোন মতেই নিস্তার নেই।"

আনন্দময়ীর বাড়ীতে খাবার সময় নবীন এসে দেখে যে ব্রাহ্মণ ভোজন হয়ে গিয়েছে। তাকে সময় মতো কেউ ডাকে নি। হরিনারায়ণ মন্তব্য করেন, তারা সেখানে খেয়েছে বলেই নবীনকে ডাকে নি। এমন সময় আনন্দময়ী এসে তাকে খাওয়াবার জন্যে ডেকে নিয়ে যান। একজন চক্রবর্তী এসে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে যে, নবীন এখানে এসেছে। নবীন খাওয়া শেষ করে তামাক খাবার জন্যে ব্রাহ্মণের হুঁকোতে হাত দিতে গেলে চক্রবর্তী তাকে সরিয়ে বলে যে ঐ হুঁকোতে হাত দেবার অধিকার তার নেই। "ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় তোমাকে ডাকা হয় নি, বাড়ীর এক পাশে আলাদাভাবে খাওয়ান হলো তাহাতেও তোমার বুদ্ধি বিবেচনা হলো না!" নবীন ভাবে, সত্যিই তো এমন করেছে। কিন্তু কেন করেছে, তা বুঝতে পারলো না। হরিনারায়ণকে নবীন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেও কোনো সদুত্তর পায় না।

গ্রামের পথ। নবকুমার তাঁতী নবীনকে প্রণাম করে বলে যে, দলাদলির বিষয় সে কিছু জানে কিনা। নবীনকে সে অনুরোধ করে যাতে সে স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে যায়। এমন সময় চিন্তামণি এসে বলে যে, এলোকেশী

মোহন্তর কাছে যাচ্ছে আসছে, সকলেই দেখেছে। তাকে নিয়ে যাওয়াই নবীনের পক্ষে ভালো হবে। এরা চলে গেলে নবীন ভাবে, এলোকেশী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। সে মোহন্তর কাছে যাবে, এটা হতেই পারে না। এরা নিশ্চয়ই শত্রু। কিন্তু সন্দেহও তো হয়। এই কি মোহন্তর ধর্ম! এলোকেশীর মনে এতো ছিলো। মনটা বড়ো খারাপ হওয়ায় নবীন শ্বশুরবাড়ী না গিয়ে আনন্দময়ীর বাড়ী যায়।

আনন্দময়ীর বাড়ী। চক্রবর্তী হরিকে বলে যে, নবীন তার কাছে হুঁকো চাইতে এসেছিলো, তাকে সে দেয় নি। আরও জানিয়ে দিয়েছে যে, তাকে এক পাশে আলাদা করে খাওয়ানো সত্ত্বেও সে কি কিছু বুঝতে পারে নি! এমন সময় নবীন এসে হরিকে বলে, সে সব জেনেছে। এলোকেশীকে সে ভালোবাসতো। আগে জানলে সে তার স্ত্রীকে কিছুতেই এমন বাপের বাড়ীতে রাখতো না। আর মোহন্তও ব্রহ্মহত্যা পাপ করলো! মোহন্তের এই কি ধর্ম! এই বলে নবীন চলে গেলো।

আনন্দময়ীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে নবীন কর্তাকে তিরস্কার করে বলে, সে এই বুড়ো বয়সে মুখে চূণকালি মাখলো। সে কেন নবীনের সর্বনাশ করলো। তার পাপমুখ দেখবার আর ইচ্ছে তার নেই। কর্তা নবীনকে এসব কথা বলতে দেখে বলে, নবীন মদ খেয়ে এসে কি সব মাতালের প্রলাপ বকছে! পরে তাকে এর শাস্তি দেবে,—এই বলে নবীন চলে যায়। কর্তা ঠিক করে, মোহন্ত আর তেলীবৌকে জানাতে হবে যে নবীন সবই জানতে পেরেছে।

এলোকেশীর কাছে গিয়ে নবীন তার অপকার্যের জন্যে দোষারোপ করে। যে এলোকেশী তাকে এতো ভালবাসার কথা বলতো, সেই কি তার মুখ শেষে এমন করে পুড়িয়েছে! এলোকেশী তখন নবীনের কাছে সব কথা খুলে বলে এবং মৃত্যু কামনা করে। খেদ করে এলোকেশী বলে, নবীন তাকে মারুক, তাহলেও তার প্রাণটা জুড়োবে। নবীন মনে মনে ভাবে, বুড়ো আর মোহন্তকে কাটতে পারলে তার মনের ঝাল মেটে। এমন সময় হরিনারায়ণ এবং আনন্দময়ী আসেন। নবীন মন্তব্য করে,—"আমার স্ত্রী মোহন্তর সহিত ভ্রষ্টা হয়েছে, একথা মনে করিলে ঘৃণা হয়।" এলোকেশীকে নিয়ে যাবার কথা নবীন হরিনারায়ণের কাছে প্রকাশ করলে হরিনারায়ণ বলেন, আজ দিন ভালো নয়, বরং কাল নিয়ে যেতে পারে। নবীন আজকের মতো নিজের স্ত্রীকে দিদিমার ওখানে রাখবার জন্যে তাঁদের অনুরোধ জানায়।

আনন্দময়ীর বাড়ী। নবীন লোকের কথা সহ্য করতে না পেরে এলোকেশীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। এলোকেশীর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। হরি পাঁজি দেখে বলেন, দিনটা ভালো নয়, কাল ভালো দিন আছে। এই একদিনের জন্যে মেয়েকে এখানে আনা ভালো দেখায় না। হরিকে নবীন তখন বলে, "এলোকে আগে পাঠিয়ে দিন আর আমি এদিকে পাল্কী বেয়ারা ঠিক করে রাখি কাল সকালে রওনা দিব।"

ওদিকে কর্তা নীলকমল গিন্নিকে বলে, নবীন এলোকেশীকে নিয়ে যাবে বলেছে। নিয়ে গেলেই ভালো। গিন্নি এতে জবাব দেয়,—"সকলে আমাদের একঘরে করে রেখেছে। আমাদের আর ভয় কি। আমি এলোকে যেতে দোব না। নবীন জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না।" গিন্নি কর্তাকে বলে, সে স্ত্রীলোক হয়েও ভয় পাচ্ছে না, আর কর্তা পুরুষ হয়েও এতো ভীরু! গিন্নি চলে গেলে তেলীবৌ কর্তাকে অভয় দিয়ে বলে, নবীন আর এলোকেশীকে নিতে যেতে পারবে না। মোহন্ত রাস্তায় রাস্তায় পাহারা রাখবে। পথ থেকে ছিনিয়ে আনবে। নবীন ঘরের পাশ থেকে সব শুনে মনে মনে মতলব এঁটে চলে যায়। কর্তা ভেবে পায় না—এ অবস্থায় কি করবে।

নবীন সামনে এলোকেশীকে দেখে পাগলের মতো বলে,—"আমার বুকের হাড় যে ভেঙ্গে দিয়েছে। সব কেটে মেরে ফেল্‌বো। কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে দেব না।" সামনে একটা আঁশ বঁটি দেখে নবীন সেটা তুলে নিয়ে হঠাৎ এলোকেশীর গায়ে কোপ মারে। এলোকেশী মারা যায়। নবীন সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যায়। কর্তা গিন্নি এবং পাড়া-পড়শীরা আসে। এলোকেশীর অবস্থা দেখে গিন্নি কাঁদতে কাঁদতে বলে,—সে তাকে কতোই ভালোবাসতো! এলোকেশীর জন্যে সে প্রাণ যে আর ধরে রাখতে পারছে না। এমন বরের হাতে পড়ে তার প্রাণটা গেলো। বলা বাহুল্য কান্না তার কপট। প্রতিবেশীরা পুলিশের ভয়ে চলে যায়। সাক্ষী দেওয়া ঝামেলার কাজ। কর্তা অনুতাপ করে বলে,—"এলোকেশী তো জন্মের মত গেল, এখন আমার দশা যে কি হবে তা বলতে পারিনে, এবার ধনে প্রাণে গেলাম।" কর্তার কথা না শুনেই নাকি অভাগীর সর্বনাশ হলো। যা হোক কাঁদবার সময় এখন নয়। অন্যদিক সামলাতে হবে। সবাই চলে গেলে চৌকিদার গোলমালে ঘরে ঢুকে দেখে খুন হয়েছে। পাশে একটা বঁটি পড়ে রয়েছে।

ওদিকে নবীনও থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। সে বলে, সে খুন

করেছে। তার গায়ে রক্তের দাগ দেখে রাজকুমার সর্দার তাকে হাজতে রাখবার আদেশ দেয়।

হুগলীর কাছারীতে মোহন্তর বিচার হবে। প্রচুর লোক হয়েছে কোর্টে। মোহন্তের দোষ প্রমাণিত হয়েছে। মোহন্ত অবশ্য অনেক টাকা খরচ করেছে। এই সুযোগে অনেকেই কিছু টাকাকড়ি লাভ করে নিলো। তারই পাপের ফলে একটা স্ত্রীহত্যা হলো। এখন নবীনের যে কি হবে কিছু বলা যায় না। আদালতে মোহন্ত নিজের নাম বলে মাধবগিরি মোহন্ত। তার গুরুর নাম রঘুনাথগিরি মোহন্ত, নিবাস জ্যোৎশম্ভু। এইদিন আগের দুদিনের মতোই মোকদ্দমা স্থগিত হয়। আজ আর কোনো সাক্ষীর জোবানবন্দী হয় না। জজ মোহন্তকে ব্যভিচারের অপরাধে এবং এলোকেশীর বাবা নীলকমল এবং তেলীবৌ থাকমণিকে ব্যভিচারে সাহায্য করবার অপরাধে সেসনে সমর্পণ করলেন।

হুগলীর সেসন আদালতের কাছে বিদ্যাবাগীশ মশায় দত্তজার কাছ থেকে জানতে পারেন যে, এই ঘটনা শ্রীরামপুরে ঘটেছে, তাই সেখানেই বিচার হবে, হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা নেই। শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের হাতেই বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাবাগীশ আরও জানলেন যে, মোহন্তর বিচারের পর নবীনের বিচার হবে। সকলেই নবীনের জন্যে দুঃখ করে।

বিচারের ফলাফল জানা যায় বেশ্যালয়ের এক বাবুর মুখে। মোকদ্দমায় মোহন্তর তিন বছর কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে মেয়াদ এবং দুহাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। নবীনের হয়েছে দ্বীপান্তর। ব্যারিস্টার জ্যাক্‌সন সাহেব মোহন্তকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেও পারেন নি। তখনই মোহন্তকে হাতকড়ি দিয়ে জেলে নিয়ে গেলো!

কয়েদীদের কার্যালয়। মোহন্তকে এখানে এনে তেলের এক ঘানির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। একজন জেল কর্মচারী তাকে জুড়ে দিয়ে বললো, "এখন ঘানী চক্রে ঘোরো। দাঁড়ালেই প্রহার পড়বে। মোহন্ত এতে আপত্তি জানালে নেপথ্য থেকে একজন মন্তব্য করে—"সতীত্ব নষ্ট, স্ত্রীহত্যা, জাতিভ্রষ্ট ও দ্বীপান্তর বাস, মোহন্ত! তোমার একটি পাপের জন্য এই চারিটি ঘটনা ঘটেছে।" মোহন্ত এমন কঠিন কাজ কোন দিনও করে নি। চিরদিনই বাবার দৌলতে ভালো জামাকাপড় পরেছে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছে। ভাগ্যবিধাতা তার কপালে এমনও লিখেছিলেন। এতো টাকা খরচ করে

কিছুতেই কিছু হলো না। যদি ছদ্মবেশে বেরিয়ে যেতো—কিন্তু তারও আর উপায় নেই। এখন একমাত্র শান্তি মরণে !!

মহান্ত পক্ষে ভুতো নন্দী (১৮৭৪ খৃঃ)—হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়॥ মলাট পৃষ্ঠায় একটি কবিতা মুদ্রিত আছে।—

"ঘরে ঘরে অভিনয়, দেখে মনে ইচ্ছা হয়,
আমি করি বেচে নিজ ভিটে।
হইলাম জ্বালাতন, শেষে কোরে আস্বাদন,
এ নাটক না টক না মিটে॥"

প্রহসনকারের উদ্দেশ্য অত্যন্ত অস্পষ্ট, তবে তার দৃষ্টিকোণ যে রক্ষণশীল এটা বোঝা যায়। ব্যভিচারানুষ্ঠান স্বীকার করে নিয়েও পুরোনো লুপ্তপ্রায় সংস্কার দিয়েই তার সমর্থন করেছেন। অনুকরণশীলতার দ্বন্দ্বে বিদ্রূপাস্পদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেছে।

কাহিনী।—নন্দীভৃঙ্গীর কথায় জানা গেলো যে, মহাদেব নাকি মাধাই মোহন্তের ওপর রেগে গেছেন। ভৃঙ্গী মোহন্তের বৃত্তান্ত বলে।—"পৃথিবীতে তারকেশ্বর বলে একটি স্থান আছে। আমাদের মহাপ্রভু কাশী পরিত্যাগ করে প্রায় সর্ব্বদাই সেইখানে থাকেন। বাবার কৃপায় কত শত মহাপাপী সেই স্থানে হত্যা দিয়া উৎকট রোগে নিস্তার পায়। বরাবর একজন করে মহান্ত সেবাত নিযুক্ত থাকে। সে মরে গেলে তার প্রধান চেলাই মহান্ত-পদ প্রাপ্ত হয়। যে বেটা হতে তারকেশ্বরের পাটে কলঙ্ক হলো, তার আগে যে মহান্ত ছিল, সে বড় মন্দ লোক ছিল না। তাহাকে পাপী বল্‌তে হয়, কিন্তু পুণ্যের ভাগও অনেক থাকাতে বাবার কোপে পড়তো না। বুড়ো মহান্ত মরবার কিছু পূর্ব্বে দুটো চেলা করেছিল। বড়োটা বাঙ্গালী বামুনের ছেলে। সে যদিও সন্ন্যাসী হয়েছিল, কিন্তু নিজ আত্মীয় পরিবারের সহিত সংশ্রব রাখত। দেবমন্দিরের টাকা চুরি করে বাড়ী পাঠাতো। এইজন্য বুড়ো মহান্ত তাকে দেখ্‌তে পারত না। কিছুকাল পরে এই মেদো ছোঁড়া এসে জুট্‌লো।...এর বাড়ী পশ্চিম দেশ। খোট্টার ছেলে বটে, কিন্তু বালককাল থেকে বাঙ্গালায় ছিল।...ছোটবেলায় ছোঁড়ার বাপ মা মরে যায়। তারপর দিনকতক পথে পথে বেড়িয়ে, বুড়ো মহন্তের কাছে এসে জোটে। বুড়ো মরবার পুর্ব্বে ঐ মেদোর নামেই উইল করে ফেলে। তাতে সাবেক চেলা রাগ করে আদালতে

নালিশ উপস্থিত করেছিল। মোকদ্দমা ফেঁসে গেলো। তারপর বুড়ো যেই মরা, অম্‌নি মেদো তারকেশ্বরের মঠের কর্ত্তা হয়ে বস্‌লো।...তারপর কতকগুলা ইয়ার জুটিয়ে ভারি বাড়াবাড়ি কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে। তারজন্য একটা স্ত্রীহত্যা হয়। এখন ইংরাজ আদালতে ব্যাভিচার দোষে দোষী হয়ে জেলখানায় ঘানি ঘুরাচ্চে।"

এলোকেশী পেত্নীপাড়ার হাজতে ছিলো। ভৃঙ্গীর আদেশে মাম্‌দো তাকে তার সাম্‌নে টেনে আন্‌লো। ভৃঙ্গীর জেরার উত্তরে এলোকেশী বলে, মাধবগিরকে সে আগে চিন্‌তো না। তার মা বাবাই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে। বিমাতা তার সহকারী "তেলীবৌ রাড়ীর" সহায়তায় অনেক লোভ দেখিয়ে তাকে মন্দিরে আরতি দেখাতে নিয়ে যায়। সেখানে এলোকেশীকে সিদ্ধি খাওয়ানো হয়। পরদিন প্রভাতে যখন তার জ্ঞান হয়, সে দেখে, মাধবের শয্যায় তার পাশে সে শুয়ে আছে। মোহন্ত 'এক কোঁচ টাকা' তাকে দেয়। অর্থলোভে বিবাহিতা এলোকেশী নিজের সতীত্বধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে তেলীবৌয়ের সঙ্গে মোহান্তের কাছে যেতো। কিন্তু এ পাপ কাজ ঢাকা রইলো না। এলোকেশী পিতৃগৃহে ছিলো। স্বামী সব জান্‌তে পেরে বঁটির আঘাতে তাকে মেরে ফেলে দ্বীপান্তর যায়।

নন্দীভৃঙ্গী দুজনেই বিশ্বাস করে যে, এলোকেশীর বাবা মা নীলকমল ও বগলাই এজন্য দায়ী। ভৃঙ্গীর মতে,—"মাগী অপেক্ষা মিন্সে অধিক পাপী। সে প্রথমতঃ মহামাংস বিক্রয় করে, তাহার পর পরের ধন অপরকে প্রদান করে। মিন্সের কিঞ্চিৎ শাস্ত্রবোধ ছিল, সুতরাং সে জ্ঞানপাপী—জ্ঞানপাপীর কোনক্রমেই নিস্তার হইতে পারে না।"

নীলকমল ও বগলা নরকে পচ্‌ছিলো। ক্রিমিকুণ্ডে ও বিষ্ঠাকুণ্ডে দুজনকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিলো। যেই না তারা মাথা তুল্‌ছিলো, অমনি তাদের মাথায় মুগুর দিয়ে ঘা মারা হচ্ছিলো। আঘাতের ভয়ে তারা মাথা ডুবিয়ে যন্ত্রণা সহ্য করছিলো। ভৃঙ্গীর আদেশে 'খামারে' ও 'দাতা' এলোকেশীর পিতামাতাকে ভৃঙ্গীর সামনে এনে উপস্থিত করলো। ভৃঙ্গীর জেরার উত্তরে বগলা ফাঁস করে যে, নীলকমলই মোহন্তর কাছে প্রকাশ করেছিলো যে তার ঘরে মেয়ে আছে। এলোকেশী তখন বলে, এরা দুজনেই দায়ী। দুজনেই অর্থলোভের বশীভূত হয়ে মোহন্তর হাতে তাকে অর্পণ করেছে। সতীত্ব রাখবার সে চেষ্টাই করেছে, কিন্তু সিদ্ধিতে অজ্ঞান অবস্থায় তার ধর্ম নষ্ট করা হয়েছে।

নন্দীর মত, এদের পাপে "মহামান্য মহান্ত" ঘানি টান্‌ছেন। দুর্গাও মোহন্তের পক্ষে। তিনি কলির লোকদের নিন্দে করেন। বলেন,—"আমার প্রিয় শিষ্য মাধব মহান্তকে নষ্ট করবার জন্য দুরাত্মারা না করেছে কি? প্রথমতঃ কতকগুলো দুষ্টলোক জুটে মহান্তকে ভ্রষ্ট করে তুল্লে। সে একে বালক, তাহাতে জ্ঞানালোক বিহীন।...সে লোকাচারে এবং রাজদ্বারে দোষী হইয়াছে সত্য; কিন্তু আমার কাছে এবং দেবদেব মহাদেবের নিকট মাধবগিরি কোনক্রমেই অপরাধী হইতে পারে না।"

দুর্গা নন্দীকে মাধব-এলোকেশীর পূর্বজন্ম স্মরণ করতে বলেন। নন্দী বলে, মাধব ছিল কুবেরের পৌত্র, চমৎকার চন্দ্রের পুত্র—নাম নন্দন। এলোকেশী ছিলো নন্দনের প্রিয়তমা ভার্যা—তার নামও এক। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যভিচারের দোষ তাকে মোটেই দেওয়া যেতে পারে না।

মাধব জেলখানায় ঘানি টান্‌ছিলো। দুর্গার আদেশে জেলখানা থেকে মাধবের জীবাত্মাকে নিয়ে আসা হয়। দেহটা পরমেশ্বরের জিম্মায় রেখে দেওয়া হয়। দুর্গা খেদ করেন, "মাধবের আর এলোকেশীর বিবরণ লয়ে পৃথিবীতে তুমুল আন্দোলন চল্‌ছে। মাধব কি সামান্য লোক; না এলোকেশীই সামান্য মেয়ে। তাদের ব্যভিচার ঘটিত প্রবন্ধ লিখে পৃথিবীর কত লোক কত টাকা উপার্জন করে।" ইতিমধ্যে মাধব এসে পড়ে। এসে দুর্গাকে অনুযোগ করে যে দুর্গাই তাকে শাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন; এখন যেন তিনি দুর্গতি ঘোচান। দুর্গা মাধবকে কাঁদতে বারণ করেন। বলেন, অবিলম্বে তোমায় মুক্ত করে আন্‌চি। মাধব তার সহধর্মিণী এলোকেশীর তত্ত্ব জিজ্ঞেস করলে দুর্গা বলেন যে সে শিবলোকেই আছে, কিন্তু পৃথিবীর নিয়মানুসারে তাকে এক বৎসরের জন্যে প্রেতত্ব ভোগ করতে হবে। কারণ হিসেবে দুর্গা বলেন যে, সে ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে অপমৃত্যু বরণ করেছে; এবং যে সময় মাধবের অংশ অবতার অর্থাৎ এলোকেশীর পার্থিব স্বামী নবীন তাকে হত্যা করেছে, সে লগ্নটাও ছিলো মন্দ।

মাধবকে তার স্থূল দেহ রেখে আসবার আগে দুর্গার আদেশে এলোকেশীকে আনা হলো। স্বামীকে দেখে এলোকেশী আনন্দিত হয়। 'নাথ'-এর গুরুদণ্ডে সে মর্মাহত হয়। দুর্গা তাকে আশ্বাস দেন যে তার স্বামী শীঘ্রই যক্ষদেহ ধারণ করবেন এবং এলোকেশীরও প্রেতত্ব মোচন হবে। দুর্গা বলেন, "তোমাদের বৃত্তান্ত পৃথিবীতে একটি উপকথার ন্যায় হয়ে রইলো।"

১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দ মোহন্ত-আন্দোলনের কাল। এ সময়ে মোহন্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রবন্ধাকারে মন্তব্য, গান, ছড়া এবং নাটক প্রহসনের জন্ম হয়েছে। এগুলোয় অধিকাংশই লোপ পেয়ে গেছে। মোহন্তর কুকীর্তিকে বিদ্রূপ করেই প্রহসনগুলো প্রায় লেখা হয়েছে। বিষয়বস্তু জানা যায় না, এমন কতকগুলো প্রহসনের তালিকা দেওয়া হলো। এগুলো একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা।—

মোহন্তের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল (১৮৭৩ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত ; **মোহন্তের এই কি কাজ** (১৮৭৩ খৃঃ)—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ; **আজকের বাজার ভাও** (১৮৭৩ খৃঃ)—দুর্গাদাস ধর ; **যমালয়ে এলোকেশীর বিচার** (১৮৭৩ খৃঃ)—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; **মোহন্তের কি দুর্দ্দশা** (১৮৭৩ খৃঃ) —তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ; **নবীন মহন্ত** (১৮৭৪ খৃঃ)—রাজেন্দ্রলাল ঘোষ ; **মোহন্তের দফা রফা** (১৮৭৪ খৃঃ)—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, **মোহন্তের কি সাজা** (১৮৭৪ খৃঃ)—চন্দ্রকুমার দাস ; **মোহন্তের শেষ কান্না** (১৮৭৪ খৃঃ) —লেখক অজ্ঞাত ; **ভণ্ড তপস্বী** (১৮৭৪ খৃঃ)—দক্ষিণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; **মোহন্তের কারাবাস** (১৮৭৪ খৃঃ)—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; **মোহন্তের য্যাসা কি ত্যাসা** (১৮৭৪ খৃঃ)—নারায়ণ চন্দ্র ; **এলোকেশী, নবীন, মোহন্ত** (১৮৭৪ খৃঃ)—রাজেন্দ্রলাল দাস। এছাড়া উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা আরও কয়েকটি নাটক আছে যা প্রহসন বলা চলে না। সমসাময়িক যুগে রচিত অন্য একটি প্রহসনের নাম করা যায়।— **তীর্থ মহিমা** (১৮৭৩ খৃঃ) —নিমাইচাঁদ শীল। প্রকাশকালের সমসাময়িক Calcutta Gazette এর উক্তি—"A drama on the general deeds of Mohants showing forth their adulteries, drunkeness, and other acts." তারকেশ্বর ঘটনার বিশেষ কোনো ইঙ্গিত উক্ত পরিচয়ে নেই। অথচ প্রকাশ কাল সন্দেহজনক। কিন্তু মূল পুস্তিকাটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ সম্পর্কে কোনো কিছু মন্তব্য করা কঠিন।

ঘটনার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ও চিন্তাভাবনা—সব কিছুই সমাজচিত্রেয় মধ্যে পড়ে। মোহন্ত ঘটনার কাহিনী বিভিন্ন প্রহসনে অনুরূপ হলেও কাহিনীর বিন্যাসে চরিত্র পরিকল্পনায় এবং সংলাপের বিভিন্ন মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রত্যেক প্রহসনের স্বতন্ত্র মূল্য অস্বীকার করা যাবে না। তাছাড়া কাহিনীর মধ্যে মূল গ্রন্থ থেকে সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

বিচারে অনুরূপ কাহিনী বলে সমাজচিত্র গ্রাহকের পক্ষে একই জাতীয় একাধিক প্রহসন বাদ দিয়ে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন চলে না। অন্যদিকে, প্রত্যেকটি প্রহসনের স্বতন্ত্র মূল্য রাখা প্রয়োজন—পরবর্তী গবেষকদের সুবিধার্থে।

পুলিশের যৌন দুর্নীতি ॥—

নাপিতেশ্বর নাটক (১৮৭৩ খৃঃ)—নগেন্দ্রনাথ সেন ॥ ভূমিকায় লেখক ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন।—"সম্প্রতি যে ভয়ানক ঘৃণিত রহস্যজনক মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি এই ক্ষুদ্র নাটকখানি প্রণয়ন করিয়াছি।" সমসাময়িককালের ঘটনাটির ইঙ্গিত পাই ১২৭৯ সালের ১৬ই চৈত্র শুক্রবার তারিখের "ভারতভৃত্য" নামক পত্রিকায়। ১২২ পৃষ্ঠায় "একি ভয়ানক" নামে একটি সংবাদ আছে। সংবাদটি অত্যন্ত দীর্ঘ হলেও সংবাদের সঙ্গে একটি দরখাস্তের উদ্ধৃতি থাকায় সমাজচিত্রের প্রয়োজনে তা সম্পূর্ণ উপস্থাপিত করা হলো।—

"সম্প্রতি হাবড়া জিলায় একটী ভয়ানক কথা শোনা যাইতেছে। হাবড়া জিলার খুরত কাসুন্দা গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র নাপিত নামে এক ব্যক্তি বাস করে। গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে ঐ ঈশ্বরচন্দ্র নাপিত আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে পুলিষের একটী ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে। পাঠক-বর্গের গোচরার্থ আমরা দরখাস্তখানি অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম।

'মোহিনী দাসী' নামে, আবেদনকারির একটী কন্যা আছে। কন্যাটী পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আপনকার আবেদনকারী. কন্যার পূর্ব্বের অসদ্ব্যবহার অবগত ছিল বলিয়া লজ্জাহেতু তাহার কোন অনুসন্ধান করে নাই এবং আবেদনকারির ইচ্ছাও ছিল না যে, সেই কুলকলঙ্কিনী কন্যা আবার পরিবারের মধ্যে আসিয়া বসবাস করে।

আপনকার আবেদনকারী বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, হাবড়া পুলিসের প্রধান কনষ্টেবল কৈলাশচন্দ্র মণ্ডল তাহার কন্যাটীকে নষ্ট করিয়াছে। এই হেতু আপনকার আবেদনকারী অনেক সময় কৈলাশচন্দ্রকে বাড়ীতে আসিতে বারণ করিয়াছিল এবং কন্যাকেও অনেকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। কন্যার প্রতি পিতার কর্ত্তব্যকর্ম্ম মনে করিয়াই আবেদনকারী এইরূপ করিয়াছিল। কন্যা এইরূপ শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

উক্ত কৈলাশচন্দ্র মণ্ডল তাহার অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাধা পাইয়া

আপনকার আবেদনকারির শত্রু হইয়া উঠিল এবং অনেক চেষ্টা করিয়া পরিশেষে তাহাকে বিপদে ফেলিল।

গত বুধবারে উক্ত কৈলাশচন্দ্র মণ্ডল, তারাচাঁদ নামে তাহার একজন বাধ্য লোকের দ্বারা পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট স্থপরইনটেণ্ডেণ্টকে এই বলিয়া খবর দিল যে, আপনকার আবেদনকারী এবং তাহার দুই পুত্র বিধু নাপিত দুই জনে আপনকার আবেদনকারির কন্যা মোহিনী দাসীকে খুন করিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট স্থপরইনটেণ্ডেণ্ট, এই খবর পাইয়া রিজর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর বাবু নিমাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়কে এবং প্রধান কনষ্টেবল কৈলাশচন্দ্র মণ্ডলকে ইহার তদারকের ভার দিলেন।

পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট স্থপরইন্‌টেণ্ডেণ্টের আদেশ অনুসারে উক্ত রিজর্ব্ব ইনস্পেক্টর এবং প্রধান কনেষ্টবল আবেদনকারির বাডীতে আসিয়া, তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে এবং তাহার শিশুসন্তানদিগকে বলপূর্ব্বক এই দোষ স্বীকার করাইবার জন্য নানাবিধ শারীরিক যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। আবেদনকারির কনিষ্ঠ পুত্র তাহার বয়স ১২ বৎসর এবং তাহার পুত্রবধু, যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া রিজর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর তাহাদের দুইজনকে যাহা বলাইলেন তাহারা তাই বলিল স্থতরাং আপনকার আবেদনকারী এবং তাহার পুত্র বিধু নাপিত অপরাধি বলিয়া সাবাস্ত হইল এবং তাহাদিগকে হাজতে রাখা হইল। পরিশেষে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট রিকেট সাহেবের নিকটে মকর্দ্দামা আরম্ভ হইল। আপনকার আবেদনকারির কনিষ্ঠ পুত্র এবং কনিষ্ঠা পুত্রবধূ যন্ত্রণা হেতু পুলিষের অনুরোধে ডিষ্ট্রিক্ট স্থপরইনটেণ্ডেণ্টের সম্মুখে যাহা বলিয়াছিল, ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের সম্মুখ খুন সম্বন্ধে সমস্ত কথাই তাহারা অস্বীকার করিল। ডিষ্ট্রিক্ট স্থপরইনটেণ্ডেণ্ট ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া রিজর্ব্ব ইনস্পেক্টরকে নূতন সাক্ষী আনিতে বলিলেন। এই আদেশ অনুসারে রিজর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর এবং প্রধান কনষ্টেবল, একখানি তরবাল একটী মাটির জালা এবং রক্ত মাখান একখণ্ড বাঁশ আর দুইটী মরা মানুষের মাতা আনিয়া আদালতে হাজির করিয়া দিল। উহারা বলিল ইহার একটী মাতা মোহিনী দাসীর। মকর্দ্দামা যখন এতদূর আসিয়াছে, এমন সময়ে আবেদন-কারির ব্যভিচারিণী কন্যা মোহিনী দাসী স্বইচ্ছায় ডিষ্ট্রিক্ট স্থপরইনটেণ্ডেণ্টের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। যদিও তাহার শরীর অপবিত্র হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহার অন্তরে পিতা মাতা এবং ভ্রাতার প্রতি সেইরূপ স্নেহ আছে। নতুবা এই খবর শুনিবামাত্র সে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে কেন?

এইরূপ স্থলে আদালতে আর কিরূপ মকর্দ্দামা হইতে পারে সুতরাং গত রবিবারে আপনকার আবেদনকারী খালাস পাইয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি এবং ব্যভিচারিণী কন্যাকে ক্ষমা করিতেছি।

এটী বড় সহজ ব্যাপার নহে। দরখাস্তখানির সমস্ত কথা যদি সত্য হয় তবে তো আর পুলিষের দৌরাত্ম্যে এদেশে আর কাহারও বাস করা হয় না। আমরা শুনিলাম এবিষয়ের তদারক হইতেছে। দেখা যাউক কি হয়।"

নাপিতেশ্বর নাটকটির শেষে নট লর্ড নর্থব্রুককে উদ্দেশ করে পুলিশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ অভিযোগ কবিতাকারে প্রকাশ করেছে, তার দিকে দৃক্‌পাত করলে গ্রন্থকারের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৫] বলা বাহুল্য সংবাদশেষেও একই দৃষ্টিকোণের সমর্থনপুষ্টি লক্ষ্য করা যায়।

কাহিনী :—ভগবান নাপিতের মেয়ে শামী বালবিধবা। "আমার দশ বছরের সময় ভাতার মরে গেছে, ভাতার যে কেমন জিনিস তাতো জান্তে পারি নি।" শামী সাজসজ্জা সাধ আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিতে রাজী নয়। "কেবল ঠোঁটে আল্‌তা, পেটে পাড়া আর পঁইচে মাজা নিয়েই আছেন।" সে কারো বাড়ী কামাতে চায় না। কামাতে বল্‌লেই সে বলে, সে বেরিয়ে যাবে। একা একা স্নান করতে যায় সেজেগুজে, মা পরাণী কিছু বলতে গেলে সে বলে,—"ক্যান্‌লা আটকুড়ি সর্ব্বনাশি বাহার দোব না কেন তোর বাবার খেয়ে বাহার দিয়ে বেড়াই না আমার বাপের খেয়ে বাহার দিই আমর আঁটকুড়ি উনি যেন আমার সতীন তাই সারাদিনই আমার সঙ্গে লেগেছেন।

হেড কনষ্টেবল বিলাস মোড়ল শামীর ঘরে যাতায়াত করে। পরাণী বিলাসকে অবিশ্বাস করে না, কিন্তু লোকের চোখে এটা খারাপ দেখায়। শামী যখন বেশি বাড়াবাড়ি করতে আরম্ভ করে, তখন পরাণী তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে বলে। শামী তখন বলে,—"যার গরজ হবে সে-ই গলায় দড়ি দিয়ে মরবে, আমার কি দায় পডেচে যে গলায় দড়ি দেব।" ভগবান নাপিত মেয়ের ব্যাপার শুনে তিরস্কার করে উপদেশ দেয়। বাবার কথায় মেয়ে চুপ করে মাথা হেঁট করে চলে যায়। ভগবান বলে, বিলাসের সঙ্গে মিশলে লোকে তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করবে।

শামীকে বিলাস ভালোবাসার কথা শোনায় বটে, কিন্তু শামীকে ভোগ

২৫। অধ্যায়টির প্রারম্ভিক বক্তব্যে কবিতাটি উদ্ধৃত।

করবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া তার মনে অন্য কিছু ইচ্ছা ছিলো না। শামীর মনেও প্রবৃত্তিই বড়ো ছিলো, তাই সেও বিলাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবে। সমাজের ওপর তার শ্রদ্ধা নেই; বরং সে ভাবে, বিলাসের সর্বত্রই প্রতিপত্তি আছে—এমন কি চৌকিদারদের ওপরেও।

শামীর শোবার ঘর বাগানের পাশে। মাঝরাতে যথাসময়ে বিলাস মোড়ল এসে জানলার কাছে দাঁড়ায়। আজ সে সঙ্গে করে এনেছে ইন্‌স্‌পেক্টার নিতাই মুখুয্যে এবং সহকর্মী কালাচাঁদকে। তার ইচ্ছে, শামীকে এদের দিয়ে ভোগ করিয়ে এদের নিজের অনুগৃহীত করে রাখবে। শেষে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ কেলি সাহেবকেও হাত করবে শামীর টোপ গেঁথে। সঙ্গী নিয়ে বিলাস এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় দুজন কনষ্টেবল এসে খবর দেয়,—ওদিকে একজনকে মেরে ফেল্‌ছে— তাকে বাঁচাবার জন্যে এদের সহায়তা দরকার। বিলাসরা তখন অন্যকাজে ব্যস্ত। ইন্‌স্‌পেক্টর নিতাই হুকুম করেন, "তোমলোক শালা আবি জাও কাল ফজির মে হামলোক তদারক করেগা।" তারপর বলে,—"যা মরেগা উস্কো লাশ চালান দো। আজ হামলোক নেই যাগা, আইন বড় কঠিন হ্যায়।" কনষ্টেবল পানাউল্লা ভাবে, "সুমন্দিরে কেমন হিয়ান্ গুতার বেলা পাঠাবা আর দশ সিকি পাবার বেলা আপনারা যাবা।" তবু মনুষ্যত্বের তাগিদে আর একজন কনষ্টেবল আক্রান্ত লোকটির প্রাণরক্ষার জন্যে আবার নিতাইকে অনুনয় করে। বলে, "এ কেয়া আইন হ্যায় ধর্ম্মাবতার। আদমি ঠো মর যাতা হ্যায় তব আপলোক নেই যাগা।" নিতাই তখন তাকে "বানচোৎ" "মাদরচোৎ" ইত্যাদি গালি দিয়ে লাথি মারে। কনষ্টেবলরা চলে যায়। শামী ইসারা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এতো লোক দেখে অসন্তুষ্ট হয়। বিলাস এদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর শামী ঘরে ফিরে যায়। তারাও সরে পড়ে।

ভগবানের অনুপস্থিতিতেই বিলাস সাধারণতঃ তাদের বাড়িতে সবার সঙ্গে বিশেষ করে শামীর সঙ্গে গল্প করতে আসতো। ভগবান একদিন না বেরিয়ে বাইরের বাড়িতে বসে রইলো। যথারীতি বিলাস এলো। ভগবান ভাবে,—"হুঁ হুঁ বাবা আমি নাপিতের ছেলে—বলে নরনাং নাপ্তে ধূর্ত্ত, তা সেই জাৎ আমরা আমাদের ওপোর ধূর্ত্তুমি সালা আবার মনে করে থানার কার্য্য করি আর কি হাকিম হয়েছি সালা।" পরাণীর বারণ সত্ত্বেও বিলাসকে

ভগবান ধমক দেয়। বিলাস বলে, এর শোধ সে তুলবে। ভগবানও জবাব দেয়, তার মতো প্রচুর চৌকিদার সে দেখেছে।

হরেকেষ্টপুরের থানা। বিলাস, নিতাই, কালাচাঁদ—এরা সব বসে পরামর্শ করে কি করে নাপিতটাকে জব্দ করা যায়! বিলাস বলে, সেদিন যা চোরাই-মাল পাওয়া গেছে, সেটা ওর ঘরে ফেলে রেখে ওকে চোর বলে হাজতে দেওয়া যায়। পরে আর একটি নতুন ষড়যন্ত্র হয়। শামীকে সুন্দর সংসারের লোভ দেখিয়ে টেনে বার করে বিলাস প্রথমে কোথাও তাকে আটকিয়ে রাখবে। ইতিমধ্যে মড়ার মাথা আর তরোয়াল একটা জোগাড করে ভগবানের বাড়ীর মধ্যে পুঁতে রাখতে হবে। তারপর শামীকে খুন করেছে বলে ভগবানকে ধরা হবে। এতে ভগবানেরও ফাঁসী হবে, শামীকে নিয়ে নিজেও মজা লুট্‌বে।

শামীর কাছে একদিন বিলাস এসে বলে, তাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে সে সংসার ফাঁদতে চায়, সে যেন তার গয়নাপত্র নিয়ে যথাস্থানে থাকে। যথাসময়ে শামীহরণ হয়ে যায়। এই সময়ে ভগবান কলকাতায় গিয়েছিলো। কলকাতার এক বড় সাহেবের বাড়ী তাকে মাঝে মাঝে কাজ করতে যেতে হয়। ইতিমধ্যে নিতাই তার দলবল নিয়ে এসে ভগবানের বাড়ী ঘেরাও করে। তারা বলে, শামীকে ভগবান খুন করেছে। খবর পেয়েছে লাশটা নাকি বাড়ীতেই পোঁতা আছে ; কোথায় আছে, পরাণীর কাছে তা জিজ্ঞেস করলো। পরাণী ঘাবড়ে যায়,—কেঁদে বলে, সে জানে না। তখন তারা তাকে লাথি মারে এবং বেঁধে ফেলে। নাপিতের পুত্রবধূ তখন শিশু কোলে নিয়ে একপাশে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো। কালাচাঁদ গিয়ে তাকে গ্রেফ্‌তার করে ও অত্যাচার করে। এরমধ্যে ভগবানের ছেলে সিধু এবং ভগবান এসে পড়ে। তাদেরও মারধোর করে বেঁধে ফেলা হয়। মেরে ধরে মুখ দিয়ে বার করাতে চায় যে ভগবান খুনী। এক ব্রাহ্মণ মধ্যস্থতা করতে গিয়ে অপদস্থ হয়। এরা তাঁকেও বেঁধে ফেলে—তাঁর এজাহার নেবে বলে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বিচার হয়। ভগবান এবং তার পরিবারের সকলে বলে এ ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। সব ঘটনা তারা অকপটভাবে বলে যায়। এমন সময় শামী ছুটতে ছুটতে আসে। বিলাস তাকে শামী বলে স্বীকার করে না। কিন্তু সকলেই শামীকে চিন্‌লো। মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়ে যায়।

ভগবান নাপিত কলকাতায় গিয়ে তার সাহেব মনিবকে সবকথা খুলে বলে। সাহেব ওপরওয়ালাদের কাছে চিঠি লিখে দেয়। বিলাস এবং তার দলবল ভয় পেয়ে যায়। আবার তদন্ত হয় এবং সেসনকোর্টে আবার বিচার হয়। ক্রমে ক্রমে জেরাতে তাদের সব দুষ্কর্মই প্রকাশ হয়ে পড়ে। মার-ধোর, অনধিকার প্রবেশ, অসদুদ্দেশ্যে নারীহরণ, পদের অমর্যাদা ইত্যাদি নানা কারণে বিচারে বিলাসের ৯ বছর, নিতাইয়ের ৬ বছর এবং কালাচাঁদের তিনবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্য বিষয়ক প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে এমন প্রচুর প্রহসন আছে, যেগুলোর মূলীভূত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় লুপ্ত, অথচ অস্পষ্টভাবে কোনো কোনো ঘটনার স্মৃতি বহন করে। এ ধরনের প্রহসনকে আনুমানিক-ভাবে উপস্থিত করা বিপদজনক। সুতরাং এ ধরনের অবাস্তব প্রচেষ্টা থেকে বিরত হওয়া ব্যতীত গ্রন্থকারের গত্যন্তর নেই।

৩। স্ত্রীলোকের ব্যভিচার প্রবণতা।

এক অর্থে পুরুষপক্ষীয় যৌন ব্যভিচার অনুষ্ঠানই স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচার অনুষ্ঠান। কারণ ব্যভিচার পুরুষ এবং স্ত্রী—উভয়কে নিয়েই সংঘটিত হয়। কিন্তু এক একটি ক্ষেত্রে ব্যভিচারে প্রবৃত্তির প্রাধান্য এক একটি বিশেষ পক্ষে থাকা সম্ভব। সেই পক্ষের প্রলোভনে বা প্ররোচনায় অনিচ্ছুক পক্ষের প্রবৃত্তিও জাগ্রত হয়। এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতা যখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, তখন প্ররোচনা বা প্রলোভনের দরকার হয় না। ব্যভিচার প্রবৃত্তি অনিচ্ছুক পক্ষকে ক্রমে দূষিত করে বলে এটি একটি ভয়াবহ সামাজিক দোষ। তুলনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচার প্রবৃত্তি আরও ভয়াবহ। পুরুষপক্ষীয় ব্যভিচার প্রবৃত্তি স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচার প্রবৃত্তিকে জাগাতে পারে না, তার কারণ স্ত্রীর নৈতিক জ্ঞান যতোটা, তার চেয়েও বেশি হয় দেহযন্ত্রের থেকে উদ্ভূত কতকগুলো বিপদ। ব্যক্তিগত আর্থিক বলবত্তাহীন এই সমস্ত স্ত্রীলোকের পীড়নভীতি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচার প্রবৃত্তি পুরুষপক্ষীয় দুষ্প্রবৃত্তিকে সহজেই জাগাতে সক্ষম, কারণ একমাত্র পুরুষের নৈতিক জ্ঞান ছাড়া দেহযন্ত্রগত বা অন্যান্য কোনো বিপদ নেই। তাই ব্যভিচারদোষের ব্যাপারে স্ত্রীসমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। এই দায়িত্ব যেখানে লঙ্ঘিত

হয়, সেখানে স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচার প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ সূচিত হওয়া স্বাভাবিক।

স্ত্রীপক্ষীয় কামপ্রবৃত্তি পুরুষপক্ষীয় থেকে অত্যন্ত গভীর। তাই ব্যভিচার প্রবৃত্তির মেয়াদ ক্ষণস্থায়ী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই একটি পরিকল্পনা প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই জন্যেও স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচার প্রবৃত্তির সামাজিক কুফল অত্যন্ত জটিল এবং গভীর। স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচার যখন সমাজে বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজ ধ্বসে পড়ে। স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচার প্রবৃত্তির মূলেও অনুরূপ তিনটি কারণ থাকে—(১) প্রাকৃতিক যৌন বুভুক্ষা (২) অপ্রাকৃতিক স্বভাব-দোষ। (৩) পরিবেশ-আনুকূল্য।

প্রাকৃতিক যৌন বুভুক্ষা কুমারী, বিধবা এবং সধবা তিনটি ক্ষেত্রে অনেকটা এক বলা চলে না।

কুমারীর যৌনবুভুক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং পুরুষ-আসঙ্গলিপ্সাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই লিপ্সাকে সংযত রাখে ভাবী সুখভোগের স্বপ্ন। অন্ততঃ যেখানে কুমারী সমর্থ, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক যৌন বুভুক্ষা ব্যভিচার প্রবৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে না। স্বাভাবিক যৌন বুভুক্ষার সঙ্গে মনের অস্বাভাবিক উদ্বেলতা যুক্ত হলেই ব্যভিচার প্রবৃত্তি জন্মলাভ করে। আমাদের সমাজে কৌলীন্যপ্রথামুক্ত সমাজ পরিধির মধ্যে সমর্থ অবস্থা পর্যন্ত কন্যাকে কুমারী থাকতে দেওয়া হয় নি। তাই এই ধরনের ব্যভিচারের অবকাশ থেকে গেছে কুলীন কন্যাদের মধ্যে। আবার নব্য সমাজেও দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদির পোষণে এবং আধুনিক রীতিনীতির অনুগমনে কুমারীকে সমর্থ অবস্থাতেও অবিবাহিত রাখা হয়েছে। এখানেও ব্যভিচারের অবকাশ থেকে গেছে। এই সব অবকাশগুলোতে অনুষ্ঠান কল্পনা বা প্রয়োগ করে প্রহসনকাররা রীতিনীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে পুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। যৌবনে কুমারীর নিষ্ফল সামর্থ্য ক্রমে ক্রমে সংযমকে নষ্ট করে দেয়। আসন্ন যৌবন-বিগতির পথে তারা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। অনেকক্ষেত্রে তা যৌনবিকৃতি এবং মানসিক রোগে পর্যবসিত হয়।

সধবার যৌনবুভুক্ষা আরও মর্মান্তিক। এসব ক্ষেত্রে কারণ প্রাকৃতিক হলে তাদের ব্যভিচারের জন্যে দোষ দেওয়া বিবেচনার অধীন। বহুবিবাহ, অসমবিবাহ ইত্যাদি প্রথা এভাবে অনেক স্ত্রীলোককে কুপ্রবৃত্তিতে নিয়োজিত করেছে। এছাড়া স্বামীর দৈহিক বা মানসিক দিক থেকে দাম্পত্যজীবনে

অপটুত্ব বা অবহেলা—অর্থাৎ স্বামীর নপুংসকত্ব, বেশ্যাসক্তি, উন্মত্ততা ইত্যাদি দাম্পত্য অংশীদারের যৌনবুভুক্ষা প্রশমিত করে না। কুমারীর সংযমরক্ষা হয় যে স্বপ্নকে কেন্দ্র করে, তা ধ্বসে পড়ে। তাই মানসিক দিক থেকে সধবার মধ্যে অস্বাভাবিক উদ্বেলতা প্রকাশ পায়। সধবার পক্ষে তাই কুমারীর চেয়ে অতি সহজেই দুষ্প্রবৃত্তিতে পদক্ষেপ সম্ভবপর। অবিবাহিতার গর্ভধারণে সামাজিক অমর্যাদা, পীড়ন ও নিরাপত্তাহীনতার ভয় থাকে; কিন্তু বিবাহিতার পক্ষে সে রকম কিছু বাধা থাকে না। সন্তান নিরূপণের প্রশ্নও সাধারণতঃ বড়ো হয়ে দেখা দেয় না। তাই সাধারণ গর্ভধারণের মধ্যে ঔরসগত ব্যভিচার সমাজে লক্ষ্য পড়ে না, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বর্তমান। কিন্তু মানসিক উদ্বেলতা যেখানে প্রবল হয়ে ওঠে সেখানে এইসব বাধা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই যে ক্ষেত্রে স্ত্রী দীর্ঘদিন স্বামীর সহবাস থেকে বঞ্চিত থাকে এবং তা সমাজে গোচরীকৃত, সেক্ষেত্রে স্ত্রীর গর্ভধারণ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও স্ত্রীপক্ষীয় প্রবৃত্তিকে এই সমস্যা উপস্থিত হয়ে নিবৃত্ত করতে পারে না। সতীত্ব সংস্কার সধবার ক্ষেত্ররক্ষার অন্যতম বর্ম। কিন্তু সংস্কারের বিরুদ্ধে যখন মানবিক দৃষ্টিকোণ প্রবল হয়ে ওঠে, তখন এইসব সংস্কার মূল্যহীন হয়ে ওঠে।

আপাতদৃষ্টিতে বিধবার যৌনবুভুক্ষা কুমারীর যৌনবুভুক্ষার সমগোত্রীয়। বিধবার যৌনবুভুক্ষার মধ্যে যেখানে স্মৃতিচারিতা বা সংস্কার নিরাপত্তা রক্ষা করে না, সেখানে যৌনবুভুক্ষার গতিপ্রকৃতি ভয়াবহ। কুমারীর জীবনে যৌন অভিজ্ঞতা থাকে না, কিন্তু তা বিধবার মধ্যে বর্তমান থাকে। তাই বিধবার ক্ষেত্রে এই যৌন অভিজ্ঞতা স্মৃতিরূপে অবস্থান করে একদিকে যেমন মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি সংস্কারভঙ্গের তথা ব্যভিচার প্রবণতার দিকে নিয়োজিত করে। কুমারী জীবনে যে সুখলাভের প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকে, বিধবার জীবনে সেই প্রতিশ্রুতি থাকে না।

অবয়ব-গঠনগত অস্বাভাবিকতা অস্বাভাবিক পুরুষআসঙ্গ লিপ্সার কারণ। প্রাকৃতিক যৌনতৃপ্তির সাধারণ ব্যবস্থায় এই লিপ্সা প্রশমিত হয় না। বলা বাহুল্য অবয়ব গঠনের বৈশিষ্ট্যে মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। মানসিক গঠনের মূলে অবশ্য পরিবেশ প্রভাবও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এসব থেকে অতি সহজেই স্ত্রীলোক ব্যভিচারের পথে পদক্ষেপ করে।

পরিবেশ আনুকূল্য -স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের পক্ষে একটি প্রধান দিক। বিভিন্নভাবে এই পরিবেশ আনুকূল্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। (১) যৌন

নিরাপত্তা-হীনতা (২) প্রলোভন (৩) দৌনীতিক দৃষ্টিকোণে পুষ্ট হয়ে কুতত্ত্ব প্রকাশের ইচ্ছা (৪) যৌন কৌতূহল (৫) সমাজ, সংস্কার, পরিবার ও স্বামী ইত্যাদির প্রতি প্রতিশোধ বাসনা (৬) বলাৎকারান্তে অভ্যাস—ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ ব্যভিচার প্রবৃত্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সতীত্ব সংস্কারকে ধ্বংস করে। মদ্যপান ইত্যাদি মানসিক চিন্তাশক্তিকে নষ্ট করে এবং অবচেতনিক প্রবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠা করে। তাই মদ্যপান ইত্যাদিতেও সতীত্ব সংস্কার নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। মদ্যপ নারীকে তাই অতি সহজেই ব্যভিচারে রত হতে দেখা যায়।

দাম্পত্যবিধি নিয়মের প্রতিষ্ঠার যুগ থেকেই সমাজে যৌন ব্যভিচারের অনুষ্ঠান চলে এসেছে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে এটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে, এটা বলাও নিরাপদ নয়। এই সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তির অবকাশ অনেককাল থেকেই সমাজে অবস্থান করেছে। বস্তুতঃ দুশ্চরিত্রতার অবকাশগুলোই আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠানরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু অবকাশে প্রযোজ্য অনুষ্ঠানগুলোর ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করা সমাজচিত্র-গ্রাহকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতপক্ষে, দৃষ্টিকোণের ঐতিহাসিকতার সঙ্গে ঘটনার ঐতিহাসিকতার সম্পর্ক নির্ণয়েই সমাজচিত্র প্রদর্শনের সার্থকতা।

স্ত্রীলোকের ব্যভিচার উনবিংশ শতাব্দীতে যে কতোখানি ভয়ঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা একটি দৃষ্টান্তমূলক সংবাদেই স্পষ্ট বোঝা যায়। "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকার ১২৬০ সালের ২০শে ফাল্গুনে একটি সংবাদ আছে। মেদিনীপুরের ২৬শে মাঘ তারিখের রাত্রের ঘটনা। "মেদিনীপুরের বড়বাজার নিবাসী মৃত সুন্দরনারায়ণ পাইনের বিধবা পত্নী অহল্যা তাহার সৎপুত্রের সহিত প্রণয় করে এবং পুত্রবধূকে অহল্যা হত্যা করে এবং উভয়ে মিলিয়া কংসাবতীতে প্রক্ষেপকালে রাত্রে ধরা পড়ে।"

স্ত্রীসমাজে মদ্যপান যে ব্যাপকতালাভ করেছিলো, তার ঐতিহাসিক নজির আছে। এই মদ্যপান থেকে ব্যভিচার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, মদ্যপান দৈহিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারবোধ ধ্বংস করে। "কামিনী" নাটকে (১৮৬৯ খৃঃ) ক্ষেত্রমোহন ঘটক লিখেছেন,—

"হায় এ ভারতভূমে ভীম হুতাশন
আসি কোথা হতে জ্বালায় সোনার রাজ্য

পশি এ অসুর ছদ্মবেশধারী মদ রূপে…
…নাশিয়া পুরুষকুলে তুষ্টি লভ মনে
হে বীর কিশোরী ! আর চাহিও না কোপ
দৃষ্টে অন্তঃপুর পানে, অবলা সরলা
তথা সাগরিকা সমা সুদৃঢ় নিগড়ে
বাঁধা আছে কুলনারী কত শত। রাখ
এ মোর মিনতি হে মদ।"

স্ত্রীসমাজে 'সভ্যতা'র পদক্ষেপ ঘটেছে ব্যক্তিগত আগ্রহবোধে, আবার কোথাও বা স্বামীর সংস্কৃতির মধ্যে বৈতসিকতায় স্ত্রীসমাজের মধ্যে সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক-দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।[১] সুতরাং স্ত্রীসমাজে 'সভ্যতার' প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান বৃদ্ধিও ঘটেছে। এযুগে স্ত্রীস্বাধীনতার ধ্বজাবাহিকাদের মধ্যে সুরাপান যেমন অস্বাভাবিক ছিলো না, তেমনি অস্বাভাবিক ছিলো না তা থেকে প্রসূত ব্যভিচারের অবকাশ। অনভ্যস্ত স্ত্রীসমাজ নব্য রীতিনীতির খাতিরে পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করেছে। এতে স্ত্রীপক্ষে প্রবৃত্তি দুর্বার হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। 'স্ত্রীশিক্ষা' সম্পর্কীয় সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর প্রারম্ভিক বক্তব্যে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে "আজব কারখানা" নামে প্রহসনে (১৮৯৪ খৃঃ) অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র সমাজসত্যকে এক জায়গায় যথার্থভাবে উপস্থাপন করেছেন। শিক্ষিতার প্রকাশ্যে অবৈধ প্রেম সম্পর্কে প্রহসনের অন্যতম চরিত্র চকোরিণী মন্তব্য করেছে,—"বাঙ্গলাদেশ যখন অসভ্য ছিল—কোলকাতায় যখন মেয়ে মদ্দ একখানায় নাম লেখায় নি—তখনও শুনেছি গুপ্ত প্রেমের আদর ছিল—এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি—ঘরে বাইরে সমান জোরে চল্‌ছি—এখন কোর্টশিপ্‌ সিভিল ম্যারেজ হনিমুন ও ডাইভোর্সের প্রথার ধূম চোলেছে—এখন কি আর লুকুনো চুরোণো চলে ?"

গুপ্তপ্রেমের আদর প্রাগ্‌-উনবিংশ শতাব্দীতে যে ছিলো, তার রেশও যে প্রহসনে সেকালের পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় নি তা নয়।

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (২য় সং) পৃঃ ৮৬

"বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক" নাটকে (১৮৬০ খৃঃ) ব্যভিচারেচ্ছায় পরপুরুষ ঠাকুর-জামাইয়ের কাছে কুলবধূ শশী হেঁয়ালীতে বলেছে,—

"কু কার্যে আবার হয় বড় ভয় মনে।
কলঙ্কে কি হয় পাছে হারাই জীবনে॥
এ রোগের বৈদ্য নাহি পাই কোনোজন।
হাত যশ কামরসে অতি বিচক্ষণ॥
মূর্খ বৈদ্য দেখাইতে বড ভয় হয়।
কি জানি বিকারে প্রাণ করে বা সংশয়॥
দেখো কি দুস্কর জ্বরে ভুগিতেছি আমি।
পার যদি বিধি মত বৈদ্য আনো তুমি॥"

একই প্রহসনে অন্যত্র স্ত্রীলোকের উক্তি এই প্রকাশ :—

"আমরাও মেয়ে বটে, থাকি মোরা কুলে।
ভিতরে যেমন হোক্ লোকে ভাল বলে॥
গোপনে গোপনে থাকি, কেবা টের পায়।
একান্তই গেলে যদি, ধরি তার পায়॥"

পল্লীগ্রাম এবং শহর অঞ্চল—উভয়ত্রই ব্যভিচারের কথা প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণে স্থান পেয়েছে। "এঁরা আবার সভ্য কিসে" প্রহসনে (১৮৭৯ খৃঃ) প্রথমেই পল্লীগ্রামের স্ত্রীসমাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে,[২] —"এদিক মেয়েগুলা ভয়ানক ব্যভিচারিণী হয়ে উঠ্তেছে। ইহাদিগকে কিছুতেই দমন করা যায় না। ইঁহারা বারবিলাসিনীদের ন্যায় ভাল ভাল কাপড পরে মাথায় কেশ বেশ করে বিন্যাস করে, দাতে মিশি দিয়ে ঘাটে পথে পুরুষের গানগুলি অনুকরণ করে বেড়ায়। যে গ্রামে পুরুষেরা পরদারাসক্ত, পরস্ত্রী-সতীত্ব যাদের রক্ষণীয় নহে, তথায় যে ব্যভিচার দোষ প্রবল হবে—বিচিত্র কি? এ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামে যে কত ভ্রূণ হত্যা হয়ে গেল, তাহা মনে করলেও পাপী হইতে হয়।" স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে— "দরবারে ক্রিয়াকাণ্ডে দলাদলিতে তাদেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। স্থানে স্থানে মেয়েদের কয়টী—আজকে কজন উপপতি কল্লে, কে কেমন নাগর ভুলানো ফাঁদ জানে, কার উপপতি কাকে কেমন ভালবাসে—মেয়ে মহলে এই বই

২। লেখক—জয়কুমার রায়।

আর অন্ত কথা নাই।...মানবজাতির দৃষ্টান্তের দাস। দৃষ্টান্ত মানবমন সত্বর যেরূপ পরিবর্ত্তন করে আর কিছুতেই তেমন করে না।...যৌবন কুসুম না ফুটতে ফুটতে অনেক অবলা পতিধনে বঞ্চিত হয়ে, পঞ্চশরের তীব্র শর সহ্য করে আসতেছে, তাতে আবার কুলোকের প্ররোচনবাক্য ও প্রলোভন হতে আত্মরক্ষা করা অনেক বাল্যবিধবার সাধ্যায়ত্ত নহে।" একই প্রহসনের মধ্যে এক জায়গায় ঘটনায় আছে যে, কতকগুলো যুবতীর মুখে অশ্লীল গান শুনে এসে একজন সেকথা রসরাজকে জানালে রসরাজ মন্তব্য করেন,—"এদের কথা আর তুলবেন না। এদের চেয়ে বরং বারস্ত্রীরা অনেকাংশে ভাল!...এদের মা ভগ্নিই উপপতি জুটায়ে দেয়, এরা ঘরে বাইরে উপপতি নিয়ে রঙ্গ রস করে দিন কাটায়।"

বলা বাহুল্য এই প্রাহসনিক দৃষ্টিতে মাত্রাকে যথেষ্ট অতিক্রম করা হয়েছে, কিন্তু মাত্রা যতোই অতিক্রান্ত হোক না কেন—এগুলোর মধ্যে কিছু বাস্তবতা না থাকলে দৃষ্টিকোণের উপস্থাপন অথবা পরিপুষ্টি ঘটতো না। "গাঁয়ের মোড়ল" প্রহসনেও[৩] স্ত্রীসমাজের ব্যভিচার সম্পর্কে দু'একটি মন্তব্য আছে। হরনাথের সঙ্গে কুমুদিনীর গুপ্ত প্রণয় আছে। হরনাথের কাছে কুমুদিনী এসে ক্ষোভ প্রকাশ করে—দুর্গামণি তাকে 'খানকী' বলেছে। তার মত, সে দুর্গামণির মতো ৫/১০টা নিযে থাকে না, একটাই আছে। এতে হরনাথ মন্তব্য করে—"ঠিক যথার্থই ত যারা দুটো পাচটা করে, তারাই হল যথার্থ খানকী, একটা কল্লে কি আর খানকী হয়?" হাস্যকরভাবে এটা উপস্থাপিত হলেও এর মধ্যে পল্লীসমাজের ব্যভিচার প্রবণতার ইঙ্গিত থেকে গেছে।

পল্লীগ্রামে যেখানে এরকম অবস্থা, সেখানে শহর অঞ্চলের অবস্থা আরও ভয়াবহ হওয়া স্বাভাবিক। স্বাভাবিক কারণেই এখানে ব্যভিচার অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত পরিমাণে বেশি থাকে। "কাপ্তেনবাবু" প্রহসনের মধ্যে[৪] একটি ঝি কলকাতার স্ত্রীসমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে,—"কলকেতার লোকেরা বাজারে খানকিকে আবার খানকি বলে নিজেদের ঘরে বার করলে যে জোড়া জোড়া খানকি বেরোয়, তা দেখেও দেখতে পায় না।" বস্তুতঃ গতিহীন স্ত্রীসমাজ

৩। অমৃতলাল বিশ্বাস, ১৮৮৫ খৃঃ।

৪। কালীচরণ মিত্র, ১৮৯৭ খৃঃ।

ব্যভিচারের অনুকূল ছিলো। "বক্কেশ্বরের বোকামি" প্রহসনে[৫] এই গতিহীনতার আভাস আছে। বক্কেশ্বরের একটি মন্তব্য—"মাগীদের আর বসে বসে কায নাই। দু'তিনজন জুটে, কিনা গ্রিনজুরির বিচার আরম্ভ করলেন। এ এ করলে, সে তা করলে, ওর বৌর কথা ভাল নয়, তার বৌর চলন বাঁকা, যতুর মায়ের ডেলে নুন কম!" এই অবস্থায় জীবনে যৌন দিকটা যে প্রাধান্য বিস্তার করবে, এটা স্বাভাবিক।

স্ত্রীলোকের রুচিও অত্যন্ত নেমে গিয়েছিলো। পুত্রবধূ-ননদের রসিকতা, বেয়াই-বেয়ানের রসিকতা, বাসরঘরে বরের প্রতি স্ত্রীলোকদের রসিকতা, নাতির প্রতি ঠাকুরমার রসিকতা ইত্যাদি সব কিছুই ছিলো যৌন বিকৃতিরই নিদর্শন। সখীদের পারস্পরিক আলাপেও বীভৎস রুচির পরিচয় মেলে। "তুমি যে সর্বনেশে গোবর্দ্ধন" প্রহসনে[৬] বালিকা হরদাসী তার সখী অর্থাৎ গোবর্ধনের ভগ্নীকে বলে,—"ভাতার বিদেশে চলে গেছে, আর আসে কিনা, তুই এই বেলা তোর ভাইকে বিয়ে কর লো।" "ভাই-ভাতারী" শব্দটা স্ত্রীসমাজে গালাগালিই শুধু নয়, রসিকতার কথা ছিলো।

অনেকক্ষেত্রে শাশুড়ীর বিকৃত যৌনচেতনা পুত্রসম জামাইকে আক্রমণ করেছে। "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক" নাটকে[৭] শাশুড়ীর স্বীকৃতিতেই প্রকাশ :—

"মনোসাধে দিব তাঁরে বাটা সাজাইয়ে।
আদ্ ঘোমটা দিয়ে দেখিবো আড়ে চেয়ে॥
উত্তম শয্যায় দিব করিতে শয়ন।
আড়ি পেতে দেখে আমি জুড়াব নয়ন॥

এই যৌনচেতনার দ্বন্দ্বও যে প্রকাশ পায় নি, তা নয়। একই প্রহসনে আছে,—শাশুড়ী জটিলে তার প্রতিবেশিনী বামাকে প্রকাশ করে যে জামাই না দেখে সে আঁধার দেখছে। বামা সঙ্গে সঙ্গে কু-দিকটি ইঙ্গিত করে বলে—"হাঁ জামাই না দেকে আঁধার দেকচে বৈ কি?" এতে জটিলে জবাব দেয়,—"দূর ও কতা কি বল্তে আচে? জামাই আর ছেলে সমান, ছেলেকে না দেখতে পেলে যেমন হয়, জামাইকে না দেকলে তেম্নি।"

৫। কামিনীগোপাল চক্রবর্তী, ১৮৮১ খৃ.

৬। শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, ১৮৮০ খৃ:।

৭। প্রসন্নকুমার পাল, ১৮৬০ খৃ:।

যৌন বিকৃতি স্ত্রীসমাজের আলাপ আলোচনাকেই যে কলুষিত করেছে, তা নয়; ধর্মাচরণের মধ্যেও আত্মগোপন করেছে। কীর্তন গান ইত্যাদির মধ্যে অভিব্যক্ত রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া তত্ত্ব এবং লীলা কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ বিকৃত যৌনবোধেরই চরিতার্থতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যা হোক, যৌন বিকৃতি সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এটি নয়। তবে যৌনবিকৃতি ব্যক্তিক ব্যভিচার-প্রবণতাকে চালিত করে—এই সত্যের খাতিরে যৌনবিকৃতির প্রসঙ্গ অবান্তর নয়।

গতিহীন জীবন, দাম্পত্য অসন্তোষ, বিকৃত সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্ত ইত্যাদি ঊনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীলোকের ব্যভিচার-প্রবণতাকে অত্যন্ত লক্ষণীয় করে তুলেছে, এটা অস্বীকার করা যায় না। এই ব্যভিচার-প্রবণতা পুরুষ-পক্ষকে অতি সহজেই অংশীদার গ্রহণে বাধ্য করেছে। এইভাবে প্রবর্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যভিচার অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়েছে!

বিভিন্ন প্রহসনে ব্যভিচারের সমর্থনে বা অসমর্থনে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে ব্যভিচারের প্রতি অসমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে, যেখানে ব্যভিচারের শাস্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। শুধু ইহলৌকিক শাস্তিই নয় (যা সাধারণতঃ পরিণতির মধ্যে দেখানো হয়ে থাকে), পারলৌকিক শাস্তির কথাও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন "যমের ভুল" প্রহসনে[৮] চিত্রগুপ্ত পাপীদের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করতে করতে একটি পাপী রমণী সম্বন্ধে বলেছে,—"এই দুঃশীলা রমণী উপপতির প্রীতি সাধন জন্য স্বহস্তে আপন পতিকে সুষুপ্ত অবস্থায় নিদ্দয়রূপে বধ করেছেন।"

স্ত্রীলোকের ব্যভিচার সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অধিকাংশ প্রহসনে গৃহীত হবার প্রধান কারণ এই যে যৌন দিকটি সাধারণকে অতি সহজেই আকর্ষণ করে। প্রহসনকাররা এ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।[৯] সুতরাং যৌন বিষয়ক প্রহসনের অস্তিত্বের আধিক্য থেকে যৌন সম্পৃক্ত দৃষ্টিকোণের সমাজচিত্রগত মূল্য দেবার আগে নিশ্চয়ই আমাদের বিবেচনা করা উচিত। যৌন দিকটি আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দিকেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। যৌন দিকের পুরুষপক্ষীয় লাম্পট্য ইত্যাদির মধ্যে স্ত্রীলোকের ব্যভিচার অনুষ্ঠানও অনেকক্ষেত্রে

৮। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯৪ খৃঃ।

৯। হনুমানের বস্ত্রহরণ—বেচুলাল বেনিয়া, ১৮৮৫ খৃঃ। "ভুঁমকার ধাক্কা" দ্রষ্টব্য।

সংযুক্ত আছে—কারণ লাম্পট্য প্রবৃত্তি এক পক্ষীয় হলেও অনুষ্ঠান উভয় পক্ষীয় প্রচেষ্টায় সংঘটিত হয়। আবার যেখানে আথিক বা সাংস্কৃতিক দিকেও স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতা জড়িয়ে আছে, সেখানে আথিক বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ মুখ্য বলেই তাকে গণ্ডী বহির্ভূত করা হয়েছে—যদিও যৌন সমাজ চিত্র প্রদর্শনী সেগুলো ছাড়া অপূর্ণাঙ্গ।

সাদাই ভাল (১৮৮৪ খৃঃ)- –হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ লাল এবং সাদা এই দুটি রংয়ের তুলনায় লেখকের মতে সাদাই ভাল। প্রহসনের নায়ক অবতারের মত, লাল অর্থাৎ সম্ভবতঃ ব্রাণ্ডিই ভাল। বস্তুতঃ সুনীতি নির্ভর জীবনযাত্রাই শুচিশুভ্র জীবনযাত্রা এবং এতে মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত হতে হয় না। পুরুষ এবং স্ত্রী—উভয়পক্ষীয় ব্যভিচারের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হলেও প্রাপ্ত খণ্ডিত কাহিনীটি মূলতঃ স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচারকেই উপস্থিত করেছে।

কাহিনী —বনগ্রামের যুবক অবতারবাবু লম্পট। তার কু-কাজের সঙ্গী আছে রমেশ আর গিরিশ। একই গ্রামের সচ্চরিত্র এক যুবক আছে সুশীল। সে এদের বৃথা নীতি উপদেশ দেয়। সুশীলের উপদেশ গিরিশের সহ্য হয় না। অবতারকে ডেকে সে বলে, সুশীল নাকি ধামিক সেজে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়। তার মত,—"আধুনিক নব্য সম্প্রদায়েরা অকিঞ্চিৎকর ভোগ সুখের অনুরোধে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আবগারির দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক পরদারে রত হয়ে থাকেন।" কিন্তু গিরিশের মত,—"বর্ত্তমান পৃথিবীতে আবগারিই পৃথিবীর মধ্যে রত্নভাণ্ডার হয়েছে। ধনিই হন, আর দরিদ্রই হন, কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক রত্ন পরিত্যাগ করতে চান না। অপর পুরাকালে চন্দ্রমণ্ডল অমৃতের আধার ছিল, সম্প্রতি কলি উপস্থিত। এ সময় স্ত্রীগণের অধর(ই) অমৃতের আধার। আর অমৃতপানই অমর হবার একমাত্র উপায়। আমাদিগেরও অন্ততঃ আপনাদিগকে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করবার কারণ পরদারে রত হওয়া আবশ্যক।" সুশীল বলে—"নিজ নিজ পত্নী বর্তমানে পরদারের আবশ্যক কি? অপর যখন বাজারে অসংখ্য বেশ্যা রয়েছে তখন পত্নীর অবিদ্যমানেও পরদারের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।" অবতার জবাব দেয়,—"পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে যে দশজনের মধ্যে গণ্য হতে না পারে তার জীবন(ই) বৃথা; অপর আজকাল ইয়ার না হলে কেহই গ্রাহ্য করে না।" ইয়ারের নেশা সম্পর্কে বলে,—"গোল

আলু যেমন ঝালে, ঝোলে, অম্বলে, সকলেই চলে—কিছুতেই বিস্বাদ হয় না ; আধুনিক ইয়ারগণও সেইরূপ সমস্ত আবগারি মহলেই চলে থাকেন।"

ইতিমধ্যে রমেশ অবতারের পকেট থেকে গাঁজার বুঁটি নিয়ে ধরে। অবতার বলে,—"বেঁচে থাক। লালে লাল করে দাও।" সুশীলের মত হচ্ছে—সাদাই ভালো,—এটা অবতার বিশ্বাস করে না। সুশীল অবতারের কাছ থেকে যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, তখন এরা সুশীল সম্পর্কে অশ্লীল কৌতুককর দৃষ্টান্ত টানে, —সুশীল নাকি স্ত্রীলোক সম্পর্কে কিছুই জানে না—ইত্যাদি নিয়ে সেই দৃষ্টান্ত।

বনগ্রামেই ঈশান আর সুরেশের বাস। এই দুই ভদ্রলোক স্ত্রী নিয়ে বাস করেন। তবে অনুজ ঈশান প্রবাসী। ঈশানের স্ত্রী বিরাজমোহিনী অবশ্য বনগ্রামেই থাকে কিন্তু সে ব্যভিচারিণী। ময়রাণীর মুখে সে অবতারের কথা শুনে মনে মনে ভাবে—অবতার নয় মদন-অবতার! সে তার কামোন্মত্ততা প্রকাশ করে। ময়রাণী এসে আশ্বাস দেয়। বিরাজমোহিনী মন্তব্য করে— "কি কুক্ষণেই যে তাকে দেখেছিলাম, দেখে অবধিই অন্তর্দ্দাহ হচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্যও স্থির হতে পারি নে।" বিরাজমোহিনী তখন ছিলো বাগান-বাড়ীতে। ইতিমধ্যে অবতার আসে। ময়রাণীর মাধ্যমে দুজনের মধ্যে রহস্যালাপ চলে। তারপর ময়রাণী চলে যায় দুজনকে রেখে। তখন এদের প্রেমালাপ চলে। তারপর অবতার বলে,—চুপে চুপে প্রেম পোষায় না। এতে অনিষ্টাশঙ্কা। কোনোক্রমে বিরাজকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে পারলে ভয় নেই, বরং আনন্দ আছে। বিরাজ একথায় বিমর্ষ হলে অবতার চলে যাবার ভান দেখায়। বিরাজের দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো। কিন্তু অবতার চলে যাবার উপক্রম দেখে ঘরে নিয়ে যায়। বিরাজ পাপাশঙ্কা করলে অবতার বলে, যুদ্ধের জয় পরাজয়ে সৈন্যের বদলে রাজা যেমন ফললাভ করে, তেমনি সাধারণের পাপকর্মে সাধারণ নয়, বিধাতা ফললাভ করে। তাছাড়া বিধাতার অদৃষ্টলিপি তথা অজ্ঞাতেই যখন মানুষ এসব করে, তখন তাঁরই কর্মফল প্রাপ্য।

এদিকে ঈশানবাবু এক ঘণ্টা হলো বাড়ী ফিরে এসেছেন, কিন্তু বিরাজকে দেখতে পান না। বড়বৌ বলেন, তাকে নাকি সন্ধ্যার সময় ঘরে দেখেছেন। এখন রাত ন-টা! "রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের বাটী হতে বার হওয়াই অন্যায়। আর রাত্রই কি আর দিনই কি স্ত্রীলোক অন্দরমহলের চৌকাট পার হবে?… আমি কোথায় ছয় মাসের পর বাটীতে এলাম ;—আসবার সময় কত কি মনে করতে করতে আসছিলাম।" যাহোক ঈশানবাবুর সন্দেহ জাগে।—"আমার

বোধ হচ্ছে যে, পাপিয়সী কুলটা হয়েছে।" আবার তার নিজেকেই খারাপ লাগে—স্ত্রীকে অযথা দোষারোপ করবার জন্যে। হয়তো ১৫/১৬ দিন স্বামীর চিঠি পায় নি। চিঠি লেখাবার জন্যে কারো বাড়ী গেছে।

ঈশান দরজা বন্ধ করে দেন। এমন সময় বিরাজ এসে দরজা ধাক্কায়। ঈশান তখন ঘরের ভেতর থেকে তাকে বকুনি দেয়, দরজা খোলে না। বিরাজ খেদের ভান দেখিয়ে পুকুরের দিকে যায়—মরবে—এই ভয় দেখাবার জন্যে। তখন ঈশানের অনুশোচনা হয়। ঈশান দ্বার খুলে একটু বাইরে চায়। ইতিমধ্যে বিরাজ পুকুরে ভারী একটা পাথর ফেলে "ঝুপ" করে শব্দ করে। "বিরাজ—বিরাজ" বলে ঈশান ছুটে গিয়ে অন্ধকারে পুকুরে ঝাঁপ দেয়। এদিকে বিরাজ ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে। ওদিকে ঈশান ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে "পিশাচি, নারকি ? আমার সঙ্গে চাতুরি ?" বলে দরজায় পদাঘাত করেন। ও পাশে বিরাজ ভেতর থেকে চেঁচায়—"ও দিদি ! ও দিদি ! দেখ না গো। পোড়ারমুখো কোথা থেকে কতকগুলো ছাইভস্ম খেয়ে জলে পড়েছিল, জল থেকে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে আমাকে তম্বি কচ্চে।"

ঈশানের বৌদি নলিনী এসে ঈশানকে মদ খাওয়ার জন্যে তিরস্কার করে। ওদিকে বিরাজ বলে, "দিদি ! আমি আজ ওর কাছে শুতে পারব না। ও দুর্গন্ধে আমার গা বমি বমি করবে।" সে মেজদিদির কাছে শোবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। মেজদিদি তাদের প্রতিবেশিনী। ঈশানের দাদা সুরেশ এতে সম্মতি দেয়! ঈশান বিরাজকে আটকাতে গেলে নলিনীর চাপে পড়ে ঈশান ব্যর্থ হন। বিরাজ মেজদিদির বাড়ীর পথে বেরোতে গিয়ে মনে মনে ভাবে,—"এই যে বাড়ী হতে বেরুলাম, এই বেরনতেই বেরনা। এখনি মেজদিদির ওখান হতে অবতারের কাছে যাব। তারও মত আছে,—তার সঙ্গে ভেসে পড়লে ও পোড়ারমুখো আমার কি করবে!" ঈশান তখন মনে মনে এর প্রতিবিধান করবে বলে ঘর বন্ধ করে।

রামকমল মিত্রের বাড়ীতে অবতার ও বিরাজমোহিনী। দুজনের প্রেম-রহস্যালাপ চলে। অবতারের মদ্যপানের ইচ্ছায় বিরাজ সম্মতি জানায়। কিন্তু অবতার বিরাজকে প্রসাদ করে দিতে বলে। তারপর অবতার কিছুক্ষণের জন্যে বিরাজকে একা রেখে বাইরে যায়। বিরাজ হঠাৎ বিভীষিকা দেখে। ডান চোখ স্পন্দিত হয়। যেন যমদূত মারতে আসছে। এমন সময় ছুরি নিয়ে ঈশানবাবু এসে তাকে গালাগালি করেন। বিরাজ আত্মরক্ষার জন্যে

কান্নাকাটি করে বলে—"ওগো মের না গো, মের না গো!—তুমিই আমার ধর্ম্মবাপ।" কিন্তু ঈশান তাকে পদাঘাত করেন। তারপর বিরাজের কান দুটো আর চুল কেটে দিয়ে চলে যান। এমন সময় অবতার আসে। বিরাজ তার কাছে কান্নাকাটি করে বলে,—"পোড়ারমুখো আমাকে কুরূপের আদর্শ করে গেছে বলে, তুমি যেন আমায় পায়ে ঠেল না।" অবতার আস্ফালন দেখিয়ে বলে, এখুনি সে ঈশানকে সমুচিত শিক্ষা দেবে—এই বলে অবতার প্রস্থানের উদ্যোগ করে। আসলে কুরূপা বিরাজের প্রয়োজন তার নেই আর। এবার বিরাজের কাছ থেকে সে পালাবে। তাছাড়া ভয়ও করছিলো অবতারের,—যদি ঈশান কোথাও লুকিয়ে থাকে তাকে মারবার জন্যে! যাহোক, সে বিরাজকে বলে, তার সন্দেহ হচ্ছে, বিরাজের অলঙ্কারগুলো নেবার জন্যে ঈশান এখনো ঘুরছে। এ সময় যদি বিরাজের অলঙ্কারও ঈশান নিয়ে যায়, তাহলে বেকার অবস্থায় অবতার আর বিরাজ দুজনেরই খুব কষ্ট হবে। ওগুলো স্থানান্তরে রাখবার ইচ্ছা অবতার প্রকাশ করে। বিরাজ তার অলঙ্কার সবকিছু খুলে দিলে অবতার সেগুলো নিয়ে একেবারে চম্পট দেয়,—এক মিনিটের জন্যে আসছি বলে। কিন্তু কি মনে করে খালি হাতে অবতার আবার ফিরে আসে। মনে মনে বলে,—"ওঁর মাথায় চুল নেই, একটাও কান নেই, ওঁকে নিয়ে আবার সহবাস করতে হবে।...অমন মেয়েমানুষের দরকার কি? প্রাণে বেঁচে থাকলে অমন ঢের বিরাজমোহিনী মিলবে।" অবতার মুখে বিষণ্ণতা দেখিয়ে বিরাজকে বলে,—সে ভেবেছিলো, বরদা মজুমদারের বাড়ী খালি আছে। কিন্তু কোথাও বাড়ীর সুবিধা হল না। এদিকে বিরাজের স্বামী নাকি এখনো অবতারকে খুন করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অতএব বিরাজ তার নিজের পথ দেখুক। বিরাজের পা থেকে যেন মাটি সরে যায়। সে সবাইকে উদ্দেশ করে বলে,—"হে ভগ্নিগণ! তোমরা যে যেখানে আছ, সকলকেই আমি যোড় হস্তে নিবেদন কচ্চি, কেউ কখন আমার মত অসৎ পথাবলম্বী হও না। হলেই আমার ন্যায় বিপদে পতিতা হবে। —আমি আমার স্বামির সাদা প্রাণে কালি দিয়েছি বলেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা হল।"

ঈশান ইতিমধ্যে এসে ছুরি নিয়ে অবতারকে তাড়া করেন; অবতার পালাতে গেলে বিরাজ তাকে থাকবার জন্যে অনুনয় বিনয় করে। অবতার বলে ওঠে,—"হারামজাদি! রাখ তোর ছিনালি;—আপনি বাঁচলে বাপের

নাম।"—বলে অবতার চলে যেতে উদ্যত হয়। তখন ঈশান ছুরি নিয়ে অবতারকে মারতে চায়। (এইখানে পুস্তিকাটি খণ্ডিত।)

তুই না অবলা !!! (কলিকাতা ১৮৭৪ খৃঃ)—কুঞ্জবিহারী বসু॥ বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন,—"তুই না অবলা !!! প্রকাশিত হইল। ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা বিষয় বিশেষ লক্ষিত করিয়া লিখিত হয় নাই; কেবল কুলবালাগণকে সতীত্বের প্রাধান্য শিক্ষা দেওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে সকলে অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করতঃ দর্শন করিলে বাধিত হইব।" এখানে প্রহসনকার সতীত্বহীনতার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণের সমর্থন চাইলেও ব্যভিচার-প্রবণতার মূলে যে কয়েকটি কারণ থাকে, তার একটিকে সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। এর মধ্যে প্রহসনকারের উদ্দেশ্য দ্বিমুখী করবার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাকৃতিক যৌনবুভুক্ষা থেকে বিশেষ করে সধবাকে জোর করে সরিয়ে রাখা হলে কুলবধূও ব্যভিচারিণী হয়ে দুদম সাহসিকতার পরিচয় দেয়।

কাহিনী।—হরিশচন্দ্র একজন বিশিষ্ট ভদ্র গৃহস্থ। তিনি তাঁর পুত্র অন্নদার বিয়ে দিয়েছেন রামধন মিত্রের কন্যা গোলাপের সঙ্গে। গোলাপের বয়স যোল সতেরো—দেখতে অপরূপ সুন্দরী। তাছাড়া সদ্বংশের মেয়েও বটে। গোলাপের মতো একজন পুত্রবধূ পেয়ে হরিশচন্দ্র সুখী। হরিশচন্দ্রের পুত্রটি রুগ্ণ। লেখাপড়া এই কারণেই তার বেশি দূর হয় নি। তবে বিয়ে দিয়ে তাঁর সাধ মিটিয়েছেন। কিন্তু আর এক ভয় তাঁর দেখা দিলো। দৈহিক সংযম না থাকলে পাছে ছেলের শারীরিক অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তিনি আদেশ জারি করলেন যে, মাসে একবার ছাড়া তাদের সহবাস ঘটবে না। প্রতিবাসী হরি তাঁর এসব আইন জারির ব্যাপারে গোড়া থেকেই সতর্ক করে দেন। তিনি বললেন, এ অবস্থায় বিয়ে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে। তবে বিয়ে যখন দিয়েছেন তখন এমন নিয়ম করা খুবই খারাপ। হরিশচন্দ্র প্রতিবাসীর সতর্কবাণী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না।

অতি স্বাভাবিকভাবেই গোলাপের মনে অন্যচারিতার ভাব জেগে ওঠে। দাসী ক্ষেমীর সহায়তায় গোলাপ পত্রালাপ করে লম্পট ফিরিঙ্গী গোমিসের সঙ্গে প্রণয় করে। গোমিসকে সে বলে,—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তাকে যেন এ বাড়ি থেকে গোমিস উদ্ধার করে নিয়ে যায়। গোমিস পত্রোত্তরে জানায় ছয় সাত হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গোলাপ যেন রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে

নির্দিষ্ট যায়গায় অপেক্ষা করে। যথারীতি রাত্রে গোমিস গোলাপকে একটি গাড়ীতে করে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে এনে তোলে। তারপর সেখানে তার ধর্ম নষ্ট করে এবং অর্থ আত্মসাৎ করে পালিয়ে যায়। নিরুপায় গোলাপকে অবশেষে যখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন সকলে মিলে তাকে তিরস্কার করে। সাহেবের সঙ্গে পালিয়েছিলো—একথা ভেবে বামা বলে,—"ধন্নি মেয়ে বাবু!" তাই শুনে থাক গোয়ালিনী বলে—"ধন্নি না তো কি—হাজার বার ধন্নি—এই দেখ বামাদিদি আমরা তো বাজারে বাজারে পথে পথেই ঘুচ্চি,—তবু একটা সাহেবকে কাছ দিয়ে চলে যেতে দেখলে গা-টা উল্‌সে ওঠে—তাদের কেমন সেই—বিকট মূর্তি দেখ্‌লেই—চম্‌কে উঠ্‌তে হয়—।" বামা বলে,—"·· হাজার হক্ বাঙ্গালির মেয়ে—যতই কেন বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াও না, বাঙ্গালি মেয়ের সে ভয় টুকুন কোথায় যাবে?" পাড়ার সবাই-ই অবাক হয়ে কুলবধূকে সাহেবের সঙ্গে পালানো দেখে। তারা ভাবে, ধন্নি মেয়ে! বাজারের মেয়েরাও সাহেব দেখ্‌লে কেঁপে ওঠে, আর গোলাপ কিনা সদ্‌বংশের মেয়ে হয়ে কুলবধূ হয়ে সাহেবের সঙ্গে পালায়।

কলির মেয়ে ছোট বৌ ওরফে ঘোর মূর্খ (কলিকাতা ১৮৮১ খৃঃ) —অম্বিকাচরণ গুপ্ত॥ বৈকল্পিক নামকরণের মধ্যে লেখকের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রহসন শেষে সারদার গানের মধ্যেও তা অভিব্যক্ত। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের নীতি বলিষ্ঠ না হলেও তাঁর বক্তব্য এই যে, স্বামীর মূর্খতার দোষেই স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হয়। অবশ্য এজন্য তিনি প্রাহসনিক মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করেছেন। সম্ভবতঃ দৌর্নীতিক অনুষ্ঠানের মহিমার চেয়ে স্ত্রীর প্রতিষ্ঠার মহিমাই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ গানের এক জায়গায় উপপতিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে,—

"ভাল করে নাচরে আমার বদ্দিনাথের এঁড়ে।
আক্কেল সেলাম করে দেখি ঘাড়টি তোমার নেড়ে।"

কাহিনী।—মদনপুরের রাম ভট্টাচার্য আর শ্যাম ভট্টাচার্য দুই ভাই। তাদের বাবা বেঁচে নেই। বিধবা বোন দিগম্বরী আছে, আর আছে তাদের খুড়ো বিশ্বম্ভর। রাম আর শ্যাম—দুজনেই বিবাহিত। রামের বৌ বিরাজ এবং শ্যামের বৌ সারদা।

শ্যাম অত্যন্ত নির্বোধ। দিগম্বরী শ্যামকে একদিন বলে শ্বশুরবাড়ী থেকে রামের বৌকে নিয়ে আসতে। শ্যাম পরদিন যাবে সঙ্কল্প করে। পরদিন

দিগম্বরী শ্যামের হাতে তিনটে টাকা দিয়ে আগে হাটে যেতে বলে। হাট থেকে কাপড় আর 'এ-ও-তা' নিয়ে, রামের শ্বশুর রাজীবলোচনের বাড়ী গিয়ে, রামের বৌ বিরাজকে নিয়ে যেন শ্যাম ফেরে.—এই কথা দিগম্বরী শ্যামকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেয়।

কথামতো শিবনগরের হাটে যায় শ্যাম। কাপড়ওয়ালার কাছ থেকে একটাকা চোদ্দ আনার কাপড় ২ টাকা দিয়ে কেনে এবং দিগম্বরীর কথামতো 'এ-ও-তা' আছে কিনা জিজ্ঞেস করে। একজন পুরুৎ তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে 'এ-ও-তা'র নাম করে তার কাঁচকলা আর ফুলবেলপাতা বাঁধা গামছাখানা একটাকারও বেশী দামে বিক্রি করতে চায়। শ্যামের কাছে ছিলো ১ টাকা মাত্র। পয়সার অভাবে শ্যাম নিজের উত্তরীয়খানা একটাকার সঙ্গে দিয়ে পুরুতের কাছ থেকে 'এ-ও-তা' কিনে নেয়। তারপর গিয়ে উপস্থিত হয় কাশীগঞ্জে রাজীবলোচনের বাড়ী। শ্যাম সেখানে গিয়ে বিরাজকে দেখতে পায়। বিরাজ আর প্রসন্নময়ী তখন আলাপ করছিলো। প্রসন্ন শ্যামকে দেখে নানারকম প্রশ্ন করে। শ্যাম প্রত্যেকটি প্রশ্ন দিগম্বরীর উপদেশ মতো পাঁচবার শুনে 'হুঁ' বলে উত্তর দেয়। এতে কথাগুলোর অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় রাম মারা গিয়েছে। তারপর বিরাজকে শ্যাম নিয়ে যেতে চাইলে সকলে কাঁদতে কাঁদতে বলে— আরও কতকদিন পরে তারা নিজেরাই গিয়ে রেখে আসবে।

এদিকে মদনপুরে ফিরে এসে শ্যাম খবর দেয় বিরাজ বিধবা হয়েছে। এতে বিশ্বম্ভর আর দিগম্বরী কাঁদতে আরম্ভ করে। তারাও বুঝতে পারে না যে রাম বেঁচে আছে। এরা সকলেই নির্বোধ। রামও এসে শুনে কাঁদতে লাগলো। সেও এদেরই মতো বোকা। একজন প্রতিবেশী কান্না শুনে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—"রাম জীবিত থাকতে বিরাজ কি করে বিধবা হয়। নির্বোধ বিশ্বম্ভর জবাব দেয়, সে থাকতে তাহলে দিগম্বরী কেন বিধবা হলো!" দিগম্বরী বিশ্বম্ভরেরই ভাইঝি! প্রতিবেশী হাসতে হাসতে চলে যায়।

এদের বাড়ীর সকলেই বোকা, তবে শ্যামের বোকামি যেন মাত্রা ছাড়ায়। দিগম্বরী একদিন শ্যামকে উপদেশ দেয়, সে এখন আর ছোটো নয়। বাড়ীর চাকরকে দিয়ে বাজার না আনিয়ে তাকে নিজে বাজার করা উচিত। শ্যাম এতে রাগ করে এবং এ বিষয়ে ভাবতে বারণ করে।

এরকম বোকা যে শ্যাম, তার স্ত্রী সারদা যে দুশ্চরিত্রা হবে, এটা স্বাভাবিক। সোনা সারদার ঝি। তাকে দিয়ে সারদা ছাদ থেকে এক একটি লোক

দেখিয়ে তাকে ঘরে আনিয়ে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে। সোনা একদিন বলে,—"তোমার এতো সব ভাল না। তুমি গেরস্ত ঘরের বৌ।" তবুও সারদা বলে যে, সে মনের মতো লোক দেখলে চুপ করে থাকতে পারে না। মন খুলে কথা কইতে ইচ্ছে করে তার। সোনা বলে,—"তোমার তো নিত্য নূতন পছন্দ। আজ যাকে ভাল বলো—আবার সে কাল খারাপ হয়ে যায়।" সন্ধ্যার সময়ে গোপালকে এবার আনতে বলেছে। নিরুপায় সোনা কথা দেয় তাকেই আনবে।

সারদা অনেকের সঙ্গেই ব্যভিচার করে। এমন কি বাড়ীর চাকর পরাণও বাদ যায় না। একদিন সারদা পরাণকে নিয়ে হাসি তামাসা করতে যায়। এমন সময় বাইরে থেকে শ্যাম এসে ডাকাডাকি করে। সারদা দরজা খুলে দিয়ে বলে, হঠাৎ তার গা-বমি করছিলো, তাই এইভাবে ছিলো। পরাণকেও তাই সে ঘরে নিয়েছে সেবার জন্যে। শ্যাম তাই-ই বিশ্বাস করে। পরাণের কাছে শ্যাম জানতে পারে—সারদা নাকি তাকে বলেছে যে, পরাণ যদি সারদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তবে সারদা আর কিছু চায় না। দুঃখের বিষয়, এ বাড়ীর মনিবদের মতো চাকরও বোকা। কিন্তু শ্যাম এসব কথা কিছু বোঝে না। সারদা শ্যামকে বলে—সন্ধ্যের সময় বসে সে কি করে? বরং ভাড়াটেদের খাজনা নিয়ে আসুক, নইলে পঞ্চমী ব্রত আছে— চলবে কি করে?

প্রতিবেশী অবিনাশবাবুকে একদিন সারদা সোনাকে দিয়ে ডেকে পাঠায়। সোনা গিয়ে অবিনাশবাবুর চাকরকে বলে বাবুকে খবর দিতে। অবিনাশবাবু তখন স্ত্রী সরলার কাছে ছিলেন। স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও তিনি ভাবলেন, আধা বয়সী স্ত্রীলোক—বোধহয় মোকদ্দমার জন্যেই এসেছে—এই ভেবে তার সঙ্গে দেখা করে এবং যথারীতি সারদার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করতে রাজীও হয়।

অবিনাশবাবুকে নিয়ে সোনা সারদার ঘরে যথাসময়ে আসে। সারদা অবিনাশবাবুকে মন ভোলানো কথা বলে। এমন সময় গোপালবাবুও সারদাকে ডাকাডাকি করে। সারদা অবিনাশবাবুকে গুড়ের গামলা থেকে গুড় লাগিয়ে পাট দিয়ে মুড়িয়ে গরু করে লুকিয়ে রাখে। গোপালবাবু এলে তার সঙ্গেও হাসি তামাসা করে। এমন সময়ে আবার প্রিয়বাবু এসে সারদাকে ডাকাডাকি করে। সারদা গোপালবাবুকে বাউলের জামা পরিয়ে হাতে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারপর প্রিয়বাবুকে ডেকে এনে বসায় এবং প্রেমালাপ করে।

এই সময় "ছোট বউ" বলে শ্যামা এসে হাঁক দেয়। সারদা তখন প্রিয়বাবুকে হরিণের চামড়া জড়িয়ে রেখে দেয়। শ্যামা এলে তাকে বলে, একজন নাচতে এসে গরুটা রেখে গেছে। আমার ইচ্ছে গরুটাকে নাচাই, তুমিও ওর সঙ্গে নাচবে। শ্যামা ভেড়ার ছালটা পরতে চায়। সারদা তাতে স্বীকৃত হয়। সারদা পরাণকে বলে, সে ঢোলক বাজিয়ে জানোয়ারগুলোকে নাচাক। সারদা 'জানোয়ার'গুলো নাচাতে নাচাতে ছড়া কাটে.

"সোয়ামীর চোখে ধূলো দিয়ে
বার ফাট্‌কা মেয়ে,
কেমন করে মজায় দেখ
বোকা পুরুষ পেয়ে।
পরাণ—তুই একবার নাচ,
ডাঙ্গায় বসে ধরি আমি
জলের ভিতর মাচ॥"

মানুষরূপী জানোয়ারদের সঙ্গে সঙ্গে পরাণও শেষে নাচতে আরম্ভ করে।

সমাজ কলঙ্ক (কলিকাতা ১৮৮৫ খৃঃ)—আশুতোষ বসু॥ ব্যভিচার দোষ সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। প্রাকৃতিক যৌনবুভুক্ষা যখন প্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হয়, তখন ব্যভিচারবৃত্তি সম্পর্কবোধও ধ্বংস করে দেয়। এই যৌনবুভুক্ষা অবশ্য কৌলীন্য প্রথাজাত। তবে বৈবাহিক দুর্নীতি এখানে গৌণ, যদিও কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত।

কাহিনী।—সোনাপটীর নীলকমলবাবু কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার লোভে তার মেয়ে সুরবালাকে বিনোদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিনোদ অপদার্থ, তাই সুরো বাপের বাড়ীতেই থাকে। প্রতিবেশী যখন সুরবালার মাকে সুরোর বাপের বাড়ী থাকা নিয়ে এবং জামাই আসে না কেন—এই নিয়ে জিজ্ঞেস করে, তখন ভুবনমোহিনী জবাব দেন—"সে ছোঁড়ার চাল চুলো নেই। সুরোকে কি করে খাওয়াবে? কেবল গাঁজা আর গুলিখোর, চরসখোর, চণ্ডুখোর, তাকে উন পাঁজুরে ঘুণ ধরা ছাড়া আর কি বলা যায়! ছোঁড়াকে আগে এতটা জানতাম না, তাই বিয়ে দিয়েছি। যেদিন সুরোর হাত থেকে বালা খুলে নিয়ে গিয়েছে, সেদিন থেকে কর্ত্তা আর তাহাকে বাড়ী ঢুকতে দেন না। সে মাঝে মাঝে গ্যাঁজা খাবার পয়সা নিতে এখানে আসে।"

আবার একদিন বিনোদ আসে। সে সুরোকে বলে, তার কি মনস্কামনা পূর্ণ হবে না? সুরো বলে, সে একদিনই বলেছে যে, সে তার নয়। সুরো বিনোদের চোদ্দপুরুষ তুললে বিনোদ রেগে চলে যায়। বাড়ীর ঝি সুরোকে বলে,—"সোয়ামীকে এমন অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া ভাল হয় নি।" ঝি আরও মন্তব্য করে,—"একটা জোড়া গাঁথা পেয়েছ কিনা তাই মনের সুখে মজা করছো।" সুরো রেগে গিয়ে তাকে মারতে গেলে ঝি পালাতে পালাতে বলে,—"কি অমন ভাতার ফেলে কিনা আপনার ভেয়ের সঙ্গে" ইত্যাদি।

কথাটা সত্যি। সুরো তার নিজের খুড়তুতো ভাই অবিনাশের সঙ্গে নষ্টা। অবিনাশের সঙ্গে অবৈধ সহবাসে সে গর্ভবতী। প্রথম প্রথম অবিনাশ তাকে কতো বারণ করেছে, কিন্তু তার কামনার উগ্রতার সামনে অবিনাশের নীতি-বোধের কিছুমাত্র মূল্য রইলো না।

অবিনাশ চিন্তিত। সে ভাবে, সাত বছর ধ'রে সে একাজ করে আসছে, কোনোদিন ডরায় নি। কিন্তু এখন জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা—এমন কি চাকরাণী পর্যন্তও জানে। সে ভাবে, "ফেলানা" করেই সুরোকে খালাস করবে। গর্ভপাতের বা ভ্রূণ হত্যার জন্যে ডিস্পেন্সারীতে ওষুধ আনতে যায়।

শুধু অবিনাশ নয়, সুরোর বাপ মাও চিন্তিত। নীলকমল আর ভুবনমোহিনী এ নিয়ে আলোচনা করেন। নীলকমল বলেন—এখন জাতকুল মান বাঁচাতে গেলে কিছু টাকা খরচ করতে হবে। ভুবনমোহিনী বলে, কুটুম্বিতা করে ওটুকু ঢেকে রাখ্‌তে হবে। শেষে শনিবারের দিন লৌকিকতার জন্যে ধার্য করা হলো। নীলকমল চলে গেলে ভুবনমোহিনী ভাবে, নীলকমল কিছু না বলাতেই তার এতটা সাহস বেড়ে উঠেছে। যাহোক, দেশে লোক পাঠিয়ে (গর্ভপাতের) "সেকোর মাকোর" আন্‌বে বলে ঠিক করে।

নীলকমল মনে মনে ভাবেন, তার মতো হতভাগা যেন কেউ না হয়। শেষ বয়সে রোগ, হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন, তার ওপর আবার এ জ্বালা সহ্য হয় না। ভুবন এসে বলে, সংসারে থাকতে গেলে এই সব ঝামেলা আছেই। তাই বলে তো সুরোকে ফেল্‌তে পারবে না।

হঠাৎ বাইরে আর্তনাদ শুনে ভুবনমোহিনী বাইরে চলে গেলে নীলকমল মন্তব্য করেন,—"কালোবেড়াল আর মেয়েমানুষ এদের চেনা ভার। যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে ততদিন এই দুষ্কর্মের গঞ্জনা সইতে হবে। এরূপ অবস্থায়

কাহারও যেন মেয়ে না হয়।" তারপর কে মারামারি করছে—দেখ্তে বাইরে যান।

বর্তমানে অবিনাশ তার বৈঠকখানায় বসে বসে ভাবে, "স্থরোর ধর্ম তো নষ্ট করেছি, সেইটি ঢাকবার জন্য আবার পেটের ছেলে নষ্ট করেছি, আবার দেখি এও মরতে বসেছে। আমার মতো মহাপাপী কি আর এ জগতে আছে? হে ভগবান আমাকে পাপ থেকে রক্ষা করো।" অনুশোচনায় অবিনাশ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। এমন সময় বিনোদ ছুটে এসে তাকে বলে,—"শ্বশুরবাড়ীর ঝি যা বল্লে তাহা কি সব সত্যি?" অবিনাশকে এ অবস্থায় দেখে বিনোদ ভাবে, "বোনের জন্য কি এ পাগল হইয়াছে, তাহলে তো স্থরো মরলে এ বেটাও মোরবে।" প্রতিশোধ নেবার জন্যে বিনোদ অবিনাশের গলা টিপতে যায়, কিন্তু তা না করে পরে কয়েকটা মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাবে বলে ছেড়ে দেয়। অবিনাশ ভাবে,—যারা পাপ করে, তাদের কি কষ্ট—এর চেয়ে মরা ভালো।

অবিনাশবাবুর শোবার ঘর। বিছানার ওপর স্থরোবালা শুয়ে আছে। কাছে বিনোদ এসে দাঁড়ায়। স্থরো বিনোদকে দেখে বলে, সে অনেক পাপ করেছে, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। অবিনাশদাদা তাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু বিপদ থেকে তো তাকে উদ্ধার করতে পারলো না। বিনোদও স্থরোকে অনেক উপদেশ দিয়েছে, কিন্তু সেকথায় স্থরো কান দেয় নি।—এই সব বল্তে বল্তে স্থরো মারা যায়। বিনোদ নিজে নিজেই বলে—"ওঃ আগুন আর পাপ কখনই চাপা থাকে না। এতোদিনে তোমার পিপাসা মিটলো। কত হতভাগী কুলের অনুরোধে কত পাপ করেছে. কিন্তু কোনই প্রতিকার কুল করতে পারে নি। ভগবান্ তুমি পাপের উচিত সাজাই দিয়েছ। সমাজে যতদিন না কৌলিন্য উঠে যাবে, ততদিন তোমার উন্নতির আশা নেই।"

রহস্য-মুকুর (কলিকাতা ১৮৮৬ খৃঃ)—কবিরত্ন বিরচিত (কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়?)॥ উপসংহারে প্রকাশক কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন,—"সত্যের ছায়া অবলম্বনে সংসার-অনভিজ্ঞদিগকে জ্ঞানদান করাই কবির উদ্দেশ্য।" লেখক অবশ্য "সেক্সপীয়রের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। কাহিনী ও চরিত্রের ওপর সেক্সপীয়রের প্রভাব যতই থাকুক, প্রহসনটি আমাদের সমাজেরই চিত্র বহন করে। বিশেষ করে এই ধরনের কাহিনীর সামাজিক চাহিদা কিংবা লেখকের ব্যক্তিগত চাহিদার মূলেও যে সামাজিক

কারণ ছিলো; এটা অস্বীকার করা যায় না। প্রহসনটিকে অনুবাদ বলা প্রকৃত অর্থে ভুল হবে বলেই এটা এখানে উপস্থাপন করা চলে।

কাহিনী।—গবেশবাবু সুবর্ণপুরের অশিক্ষিত গণ্ডমূর্খ ধনী জমিদার। কিন্তু সে নিজেকে খুব বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ মনে করতো। তার স্ত্রী সুচতুরা ছিলো কুলটা। অবশ্য গবেশ স্ত্রীর এই পরিচয় বিন্দুমাত্র জানে না। গবেশের এক কুলীন সুন্দরী জ্ঞাতিকন্যা ছিলো। তার নাম সুকুমারী। তাকে হস্তগত করবার ইচ্ছা জাগে গবেশের। কিন্তু সুকুমারী স্বগ্রামেই এক দরিদ্র অথচ শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ যুবককে ভালবাসে। একদিন সেই যুবক প্রমোদের প্রতীক্ষা করতে করতে সুকুমারী আবৃত্তি করে—

"যেদিকে নিরখি হেরি প্রেমের পিপাসা,
কেবলই শুনিতে পাই প্রণয়ের ভাষা।"

তারপর প্রমোদ আসে। সেও তার প্রেম জানিয়ে বলে,—

"প্রমোদের প্রাণাধিকা তুমি সুকুমারী,
প্রমোদ কেবল তব প্রেমের ভিখারী।"

কিন্তু ঐ দিকে সুকুমারীকে বিবাহ করবার জন্যে গবেশবাবু উদ্‌গ্রীব। রান্নাঘরের বারান্দায় বসে বামা আর শ্যামা গল্প করছিলো। এরা গবেশবাবুর বাড়ীর ঝি। এরা বল্‌ছিলো যে, বাড়ীর বাবু সুকুমারীকে বিয়ে করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুকুমারী ভালো মেয়ে, একটু লেখাপড়া শিখেছে। আবার সে প্রমোদকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছে। সুকুমারী প্রমোদকে ছেড়ে এমন বরে রাজী হবে না। সুকুমারী তো সুচতুরার মতো নয় যে মিথ্যে কথা বলবে আর, "গবেশচন্দ্রের বুকের উপর ভাত রেঁধে খাবে?" তার ওপর আবার গবেশচন্দ্রের গায়ে লম্বা লম্বা লোম,—ভালুক বলেই মনে হয়।

"এই মুখেই সুকুমারীর প্রেম পেতে চায়,
সুকুমারী লাথি মারবে টাক্ পড়া মাথায়।"

তখন রাত আটটা। অন্তঃপুরে প্রবেশ পথে একটা ঘরে দাঁড়িয়ে সুচতুরা ভাবছে, "বারো বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে সে সুখের মুখ দেখলো না।" পোড়ার মুখে এবার আগুন দিয়ে না হয় ভিক্ষে করে খাবো। সামনে গবেশের একটা ফোটো ছিলো। সেটা দেখে সুচতুরা তার রূপের ব্যাখ্যা করে। তার পাকা চুলে টাক পড়েছে।—

"উপর হয়ে দুহাত নেরে হেলে দুলে হাঁটেন,
আষাঢ় মেসে শূয়র যেন মাঠে কাঁদা ঘাটেন।"

সে একটা আস্তাবলের পশু। প্রেম জানে না, তায় আবার একটা বিয়ে করতে যাচ্ছে। এমন সময় মদন আসে। মদন গবেশের বিশ্বাসঘাতক মোসাহেব। সে আর স্থচতুরা—দুজনে মিলে সলা পরামর্শ করে। মদন বলে, সে ডাক্তারখানা থেকে সেই জিনিস নিয়ে এসেছে। স্থচতুরা মদনকে ১০০ টাকা দিয়ে তারপর রাত ১১টার সময় বালাখানার দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বলে। এমন সময় গবেশকে আসতে দেখে মদন পাছ পুকুর দিয়ে বাড়ীর বার হয়ে যায়।

গবেশচন্দ্রের বালাখানা। গবেশ তার স্ত্রীকে নীরব দেখে বলে, সে কেন মান করেছে? গবেশ এখনই তার পা দুটো দেবে—পুকুর থেকে জল টেনে এনে। নিজে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে ভক্তপোষে শোয়াবে। স্থচতুরা গবেশের চাটুবাক্য শুনে মনে মনে বলে,—"এবার তোমায় রসাতল পাওয়াবো।" গবেশ মান ভাঙাবার জন্যে বলে,—সে কি বরের যোগ্য নয়? চাকর বাকর তাকে হুজুর বলে, হাকিমেরা আদর করে "রায়বাহাদুর" বলে ডাকে! গবেশের কথা শুনে স্থচতুরা বলে,—

স্থকমারীর বাপকে নাকি হাজার টাকা দিয়ে
তুমি তার রূপে ভুলে করতে যাচ্ছ বিয়ে?"

গবেশ বলে, যে এসব কথা রটিয়েছে, তাকে সে আস্ত রাখবে না। তারপর গবেশ স্থকুমারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক তুলে একবার বলে, সে তার বোন হয়, আর একবার বলে, সে তার মাসী পিসী হয় ইত্যাদি। স্থকুমারীর রূপের নিন্দা করে এবং তাকে কুৎসিত প্রতিপন্ন করে গবেশ বলে, তাকে সে ভালোবাসতেই পারে না। তারপর একসময় স্থচতুরা যখন গবেশকে পান দেয়, তখন পানের সঙ্গে মরফিয়া খাইয়ে দেয়। তারপর ১১টার সময় মদন আসে। স্থচতুরা অলঙ্কারগুলো মদনের হাতে তুলে দেয়। পালিয়ে যাবার সময় গবেশকে সম্বোধন করে বলে যায়,—

হতভাগ্য গবেশচন্দ্র নিদ্রা যাচ্ছ সুখে,
রাত পোহালে চুনকালী পড়বে তোমার মুখে,
স্থচতুরার খোঁজ খবর পাবে নাকো আর,
বড় লোক মূর্খ হলে এমনি দশা তার।"

স্ত্রীলোকের ব্যভিচার-প্রবণতামূলক প্রহসন অন্য অনেক উদ্দেশ্যমূলক প্রহসনের গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেগুলো যথাস্থানে প্রদর্শিত হওয়ার অবকাশ থাকায় সেগুলোর উপস্থাপন সমীচীন নয়। তবে ব্যভিচার-প্রবণতাকেই মুখ্য করে রচিত আরও কয়েকটি প্রহসনের নাম লেখা যায়, এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামান্য কিছুই জানা সম্ভবপর হয়েছে।

হেমন্তকুমারী (১৮৬৮ খৃঃ)—অজ্ঞাত॥ একটি স্ত্রীলোক কিভাবে তার দেবরের সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়ে বদ্ধ ছিলো, তার কথা এতে জানা যাবে।

কলির কুলটা প্রহসন (১৮৭৭ খৃঃ)—বটবিহারী চক্রবর্তী॥ কয়েকটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের ক্রিয়াকলাপ এবং পরিণতিতে তাদের শাস্তি প্রহসনটির মুখ্য বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে।

তিন জুতো (১৮৮৪ খৃঃ)—নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়॥ এক বাবুকে কটাক্ষ করে প্রহসনটি লেখা হয়েছে। এই বাবুটি তার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মতো সেবা করতো। সে তার মাকে অযত্ন করতো। স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত বেশি আকর্ষণেই সে স্ত্রীর কথারও বেশী মূল্য দেয়। Calcutta Gazette-এ এটিকে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফচ্‌কে ছুঁড়ীর ভালবাসা (১৮৮৬ খৃঃ)—অজ্ঞাত॥ একটি তরুণী অসতী স্ত্রী কি করে ব্যভিচার করতো এতে তাই বর্ণিত হয়েছে।

নারী চাতুরী (১৮৮৫ খৃঃ)—চন্দ্রশেখর শর্মা॥ দুইটি অত্যন্ত কামুক স্বভাবা স্ত্রীলোক ছিলো। শুধুমাত্র স্বামীকে নিয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিলো না। এছাড়া অর্থলোভও তাদের যথেষ্ট ছিলো। তারা একদিন যুক্তি করে স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে শেষে বেশ্যাবৃত্তি করতে লাগলো।

এ মেয়ে পুরুষের বাবা (১৮৯৬ খৃঃ)—শরৎচন্দ্র দাস॥ একটি বৃদ্ধ কেমন করে তার অসতী স্ত্রী দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলো—তার কাহিনী নিয়ে প্রহসনটি রচিত।

স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতা নিয়ে আরও অনেক প্রহসন লেখা হয়েছে—যেমন,—**সরসীলতার গুপ্তকথা** (১৮৮৩ খৃঃ)—বিনোদবিহারী বসু; **গোপালমণির স্বপ্নকথা** (১৮৮৭ খৃঃ)—এস্, এন্, লাহা, **শান্তমণির চূড়ান্ত কথা** (১৮৮৭ খৃঃ)—মণিলাল মিশ্র; **কলিকালের রসিক মেয়ে** (১৮৮৮ খৃঃ)—হারাণশশী দে; **রসিক কামিনীর হদ্দমজা, রথ দেখা আর কলা বেচা** (১৮৮৯ খৃঃ)—মোহনলাল মিত্র, **ছোটবউর বোম্বাচাক** (?)—বেচুলাল

বেণিয়া ; **কমলিনীর মধুচাক** (?)—বেচুলাল বেণিয়া ; **রাতে উপুড় দিনে চিৎ ছোট বউর একি রীত** (?)—কালু মিঞা ; **রং সোহাগীর আজব ঢং** (?)—ছিদ্দিক আলি ; **সোমত্ত মাগীর সখ** (?)—সিদ্দিক আলি ইত্যাদি।

গ্রন্থশেষে তালিকায় প্রদত্ত এমন অনেক প্রহসন আছে যেগুলো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র পরিচয় উদ্ধার সম্ভবপর হয় নি। অনুমানের ভিত্তিতে সেগুলোকে এখানে উপস্থাপিত করে প্রয়োজন নেই।

৪। বৈবাহিক প্রথা ঘটিত যৌনদোষ।

বিবাহ অর্থ সামাজিক স্বীকৃতিতে দার পরিগ্রহ। দার পরিগ্রহ ব্যতীত সংসার যাত্রা অচল হয়। এ সম্পর্কে একটি শ্লোকে আছে,—

দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ॥

পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর প্রয়োজন আছে এবং স্ত্রীর পক্ষেও পুরুষের প্রয়োজন আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে[১] বলা হয়েছে স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গ ; আবার বৃহদারণ্যকেও[২] বলা হয়েছে যে স্ত্রী এবং পুরুষ—উভয়ের মিলনেই মানবিক পূর্ণতা। আধুনিক কালেও এমত স্বীকৃত। H. Ellis তাঁর Man and Woman গ্রন্থে বলেছেন,—"That woman is undeveloped man is only true in the same sense as it is to state man is undeveloped woman ; in each sense as it is to state man is undeveloped woman ; in each sex there are undeveloped organs and functions which in the other sex are developed.[৩]

বিবাহের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সমাজে ধারণা ছিলো অত্যন্ত গভীর। শুধু যৌন নয়,—যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক চুক্তি তো বটেই, তাছাড়া চুক্তি-অতিবর্তী সাধনার দিকও ছিলো। আমাদের সমাজে বিবাহে বর কন্যাকে বলেন,—

সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সন্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদ্রেষ্টি দধাতু নৌ॥

১। শতপথ ব্রাহ্মণ—৫,২—৩,১০।

২। বৃহদারণ্যক—১৪,১০।

৩। Man and Woman—H. Ellis—P. 445.

কখনও বা বলেন,—

"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিতং
তেহস্তু মম বাচমেক মনা জুষস্ব প্রজাপতির্নিযুনক্তু মহ্যম্।"

অন্নগ্রহণকালে বর বধূকে বলেন,—

অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে ॥

বিবাহে বর ও বধূর হৃদয় যেন এক হয়ে যায়।—

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥

শুধু হৃদয় নয়—অস্থি মাংস ত্বক প্রাণ—সবকিছুর মধ্যেই এই অচ্ছেদ্যতাবোধ বিবাহের উদ্দেশ্য।—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচাত্বচম্ ॥

এক দিকে থাকে একত্ব অন্যদিকে থাকে ধ্রুবত্ব।-

ধ্রুবা দৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবানঃ পর্বতা ইমে, ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ম্ ॥

সামাজিক উদ্দেশ্য বিচার করলে দেখা যায়, বিবাহের মূলে থাকে সামাজিক অমঙ্গল রহিতের উদ্দেশ্য। তাই ইসলামী সমাজেও বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—"আন্নিকাহ নিসফল ইমান। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুগত, তাই তাদের বিবাহে সামাজিক দিকটা মুখ্য হযে উঠেছে। "It was ordained for the procreation of children,···It was ordained for a remedy against sin and avoid fornication &c. &c."[8] দৈহিক স্বীকৃতিকে অতিক্রম করেও যা কিছু অভিব্যক্ত হয়েছে, তাও পার্থিব। পাশ্চাত্য বিবাহে শপথে বলা হয়েছে,—"With this Ring I thee wed, with my body I thee worship, and with all my worldly goods I thee endow."[৫]

বস্তুতঃ আমাদের সমাজে বিবাহের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে উচ্চস্তরের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, তা তুলনাতীত—কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানান্তে এই আদর্শ

৪। The Book of Common Prayer (The Church of England)—P. 199.

৫। Ibid—P. 200.

ও উদ্দেশ্যের ব্যাবহারিক মূল্য ক্রমেই কমে এসেছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও আমাদের প্রাচীন বিবাহ সংস্কার গত আদর্শকে বারবার প্রচারের চেষ্টাও যে হয়নি তা নয়। "বিবাহ সংস্কার" নামে একটি গ্রন্থে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লিখেছেন[৬] "আমাদের বিবেচনায়, বিবাহ বন্ধন একটি সংসারের বন্ধন নয়। ইহা একটি ধর্মবন্ধন। কেবল বিজ্ঞান সম্মত হইলেই ইহাতে মঙ্গল হয় না, কিন্তু ধর্ম ও নীতি সম্মত হওয়া একান্ত উচিত।" বিবাহের মধ্যে তাই দুর্নীতি জড়িত হলেও তা "Religious Institution" রূপে উপস্থিত হয়ে আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে "more" রূপে দেখা দিয়েছে। অনেকদিন আগে বহুবিবাহ সম্পর্কিত একটি আবেদনের উত্তরে ভারত সরকার জানিয়েছিলেন,—"It must be remembered that polygamy as it exists in India, is a Social and Religious Institution and Governor-General in Council doubts whether the great defficulty of dealing with the subject in India, or even in Bengal, has been fully considered.[৭] এই প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে শক্তি পরিচালনায় রাষ্ট্রও অক্ষমতাজ্ঞাপন করেছিলো। সুতরাং বৈবাহিক প্রথার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিও যে কতোখানি দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন ছিলো, তা অনুমান করা যেতে পারে।

বৈবাহিক প্রথাসমূহের মধ্যে দুর্নীতি অনুপ্রবেশের মূলে থাকে স্ফুরিত ব্যক্তিত্ব দ্বারা নিয়োজিত স্বার্থ। এই স্বার্থের প্রতিষ্ঠা ঘটে যৌন, আর্থিক বা সাংস্কৃতিক বলবত্তায়। পরে সাধারণ অস্ফুরিত ব্যক্তিত্বের প্রথানুগত্যভাব এই স্বার্থকে ন্যায়-রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে। আমাদের সমাজে অসমবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষেধ, (কৌলীন্য প্রথাগত) বার্ধক্যবিবাহ ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক বিবাহের মূলে গোষ্ঠীগত স্বার্থের পরিপুষ্টি ঘটেছে। কিন্তু স্বার্থবোধ ছাড়া নিছক ব্যক্তিত্ব অনুভবের জন্যেও অনেকক্ষেত্রে দুর্নীতির পত্তন ঘটেছে। দুর্নীতির মূলে যা-ই থাকুক না কেন, কালক্রমে এগুলোর সামাজিক ফল অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে উঠেছিলো। উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে স্বাধীন দৃষ্টিকোণের জন্ম সম্ভাবনা ঘটে। এই অবস্থায়

৬। বিবাহ সংস্কার—দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ১২৯৫ সাল, পৃঃ ৭।

৭। Legislative Department Proceedings—16-8-1866/14.

প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের আবির্ভাব হয়েছে এবং সমাজে সমর্থনলাভস্পৃহা প্রকাশ করেছে। যা সম্পূর্ণ "More" এবং Religious Institution, তার বিরুদ্ধেও দৃষ্টিকোণের প্রকাশ অত্যন্ত নির্ভীক হয়ে উঠেছে।

কৌলীন্য প্রথা ॥—

স্ত্রীসমাজের প্রতি পুরুষসমাজের একচ্ছত্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা সর্বক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকের জীবনে দুঃখ এনেছে। আহিরীটোলা উন্নতিবিধায়নী সভার দ্বাত্রিংশ সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত নরেন্দ্রনাথ বসুর "রমণী" প্রবন্ধে বলা হয়েছে—"আহা! বঙ্গবামার জীবন ধারাবাহিক দাসত্বের সংঘটনা।... আহা অশিক্ষিতা শৃঙ্খলাবদ্ধা বঙ্গবামা গভীর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাইবার পথ পাইতেছে না। আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে বিধবা ললনার, কুলীন কন্যার হৃদয় বিদারক সকরুণ বিলাপধ্বনি উঠিতেছে, কাহারও চৈতন্য নাই।"[৮]

বাস্তবিকই বিধবাবিবাহ নিষেধ এবং কৌলীন্যপ্রথা সমগোত্রীয়। "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় বলা হয়েছে,—"বৈধব্য বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া নব্য সম্প্রদায়েরা যে সকল পাপ পরিহার করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, এ দেশে কেবল বৈধব্য হেতুই যে সেই সকল পাপ জন্মিতেছে এমত নহে, কৌলীন্যও তাহার অনেক আনুকূল্য করিতেছে। এক পুরুষের পঞ্চাশৎ পত্নী হইলে তাহার স্ত্রীদিগকে পতি সত্বেও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; এরূপ প্রবাদ আছে যে কোন এক কুলীন মহাশয় একেবারে তাঁহার সন্তানের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া মহা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, এমত সময় তাঁহার পিতা তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে—'আরে বাপু! কেন এত খিদ্যমান হইয়াছ? আমি তোমার উপনয়নকালে জানিতে পারিয়াছিলাম।' যাহা হউক, কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকাতে যে এদেশে সতীত্বের অনেক হানি হইতেছে, তাহা একপ্রকার সকলেই জানেন।"[৯]

কৌলীন্য প্রথাগত গতিবিধির সুন্দর চিত্র দিয়েছেন চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় "সংবাদ ভাস্করে" তাঁর প্রবন্ধে।[১০] তিনি বলেছেন,—"এক্ষণকার কুলচূড়ামণি

৮। আর্যদর্শন—আষাঢ়, ১২৯২ সাল।

৯। সংবাদ প্রভাকর—১৬ই বৈশাখ, ১২৬০ (৭ই এপ্রিল—১৮৫৩ খৃঃ)।

১০। সংবাদ ভাস্কর—২০শে পৌষ, ১২৬০। "হিন্দু মোসলেম ইংরাজ এই তিন জাতি কর্তৃক শাসিত ভারতবর্ষের অবস্থা" (ধারাবাহিক)।

যাঁহারা কৃষ্ণবিষ্ণু প্রভৃতির সন্তান, তাঁহারা কেবল বিবাহ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা নাই, কেহ পঞ্চাশৎ, কেহ অশীতি, কেহ শত, কোন ব্যক্তি সার্দ্ধশত, কিন্তু তিন শত ষষ্ঠী বিবাহের অধিক শ্রুত হয় নাই। উক্ত কুলগর্ব্বি মহাশয়দিগের বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট এই যে সপ্তম বর্ষ হইতে শমনসদনগমন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই মুখ্যকাল। কন্যা বিবাহের কাল প্রসূতীর উদর হইতে নির্গতাবধি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত··· দম্পতীর মধ্যে ন্যূনাধিক্য বয়সে বিবাহের বাধা নাই, সপ্তমবর্ষীয় বালকের সহিত অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার এবং ত্রয়োদশ দিবসের কন্যার সহিত নবতিবর্ষীয় প্রাচীনের অনায়াসে বিবাহ হইতেছে···।

···অনেকানেক বিবাহোপজীবি মহাশয়েরা কুলে দোষ হইবার আশঙ্কায় এ জন্মে কন্যাদিগের বিবাহ দেন না, তাহাকে যম্বরা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ যম তাহার বর।···আরো অনেক কুলাভিমানি মহাশয়দিগের ধারণাবতী মতির ন্যূনতাপ্রযুক্ত পরিচারকের হস্তে অশ্বজিন স্বরূপ বিবাহের এক নির্দ্দিষ্ট পত্র আছে। ভৃত্য সেই লিপি দৃষ্টে কোন্ স্থানে কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাহা বলিলে তদনুসারে শ্বশুরালয়ে গমন করেন।”

“কৌলীন্য সংশোধনী” নামে পরিচয়হীন একটি পুস্তিকায়[১১] ১ম পৃষ্ঠায় কুলীনসমাজের চিত্র দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—“যেমন গুরুতা ব্যবসায়ী মহাশয়েরা শিষ্যালয় ভ্রমণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তদ্রূপ কুলীন মহাশয়েরাও যে ২ স্থানে কিঞ্চিত ২ বার্ষিক পান, সেই ২ স্থানে সংবৎসরে এক ২ বার উপস্থিত হন। কিন্তু তাহাতেও অধিককাল বিলম্ব করেন না, কোথা বা একরাত্রি প্রবাস, কোথা বা মধ্যাহ্ন ক্রিয়া করিয়া, কোথা বা বহির্দ্বার হইতেই বার্ষিক নিয়া বিদায় হন। গুরুমহাশয়েরাও যেমন বরণ বস্ত্র আর কিঞ্চিত দক্ষিণা পাইলেই একেবারে পাঁচ সাতজনের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন, তদ্রূপ কুলীন মহাশয়েরাও একজোড় বরণবস্ত্র আর কিঞ্চিৎ কুলোচিত পণ পাইলেই এককালে পাঁচ সাতটি পরিণয় করিয়া থাকেন।”

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষেও এ ধরনের বিবাহিত কুলীনের বিবাহ সংখ্যা কম ছিলো না। “অনুসন্ধান” পত্রিকায়[১২] একটি উদ্ধৃতিতে বলা হয়,—“হিন্দু

১১। বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

১২। অনুসন্ধান—২৯শে মাঘ, ১২৯৫ সাল।

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, পূর্ব্ববঙ্গে ১২ জন কুলীন আছেন, তাঁহাদের সর্ব্বসমেত ৬৫২টি বিবাহ। তন্মধ্যে একজনের ৮০টি ও বাকী ১১ জনের ৫৭২টি। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য তাঁহার কেবলমাত্র ৪০টি পত্নী। সর্বজ্যেষ্ঠ কুলীন চূড়ামণির বয়স ৭০ বৎসর ও সর্ব্বকনিষ্ঠের বয়স ৪০ বৎসর।"

বিবাহ করলেই আয়—অতএব অর্থোপার্জনের লোভে যথেচ্ছ বিবাহ স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন,—"সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণদের কোন প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল (Productive) কর্মের দায়িত্ব না থাকার জন্য এবং কেবল কুলবৃত্তি শাস্ত্র ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠার জন্য, তাদের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌছয়। শেষ পর্যন্ত বহু বিবাহ করে তাঁরা আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করেন। দারিদ্র্য ও অভাব অনটন থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পাবার খুব সহজ পন্থা হয়ে ওঠে বহুবিবাহ।"[১৩] কুলীন ব্রাহ্মণদের এই বিবাহ ব্যবসায়ের ওপর সমসাময়িককালে যথেষ্ট কটাক্ষপাত করা হয়েছে। "কুলকালিমা" নামে একটি পুস্তকে[১৪] জানকীনাথ মজুমদার বলেছেন,—"অনেকেই মনে করেন…যে আমাদের দেশীয় মহিলাগণ কেবল পারিবারিক গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন। পুরুষগণ অর্থোপার্জন প্রভৃতি ক্লেশসাধ্য ব্যাপার সমাধান করেন। কিন্তু সেটী কেবল ভ্রমমাত্র। স্ত্রীগণ অর্থপ্রদান করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার পৈতৃক বা স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা পতি গৃহস্থের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে পারেন, ততদিন একখণ্ড কুটীরে পতি সমীপে থাকিতে সমর্থা। নতুবা ভ্রাতৃপদ সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।" স্বয়ং বিদ্যাসাগরও একথা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে[১৫] কুলীনদের "ভিজিট" গ্রহণ পদ্ধতির কথা বলে তারপর বলছেন—"বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোন ভঙ্গ কুলীন দয়া করিয়া তাঁহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন; কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

১৩। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—(৩য় খণ্ড) পৃঃ ২৫৬।

১৪। ৯ই বৈশাখ, ১২৮০।

১৫। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ সুঃ চঃ সং পৃঃ ২২৬।

শুধু প্রবন্ধে নয়, কবিতা আকারেও কুলীনদের গতিবিধি সম্পর্কিত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য লেখকের কটাক্ষের সঙ্গে তা উপস্থাপিত। "কলি কুতূহল" নামে একটি পুস্তিকায়[১৬] শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি লেখেন,—

"কলি অনুকূল হয়ে করিল কুলীন।
সংসারে তেমন কোথা আছয়ে কুলীন ॥
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি।
শস্যহীন আম্রাতক যেন সার আঁটি ॥
কুল অভিমানে পদ না ধরে ধরাতে।
সজ্জন সঙ্খ্যায় কিন্তু না পড়ে ধরাতে ॥
বুদ্ধিতে বলদ বিদ্যাভ্যাসে সিদ্ধিফলা।
অলগ্ন লতাতে কে দেখেছে সিদ্ধি ফলা ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিতে কষ্ট তুষ্ট ভোজ ভাতে।
করেন বার্ত্তাকু দগ্ধ নিত্য পরভাতে ॥
খাইতে উৎসুক বড় ভার্য্যা উপাজন।
নির্লজ্জ নির্দ্ধন নারী তেজয়ে দুর্জ্জন ॥
রাজকর হেতু যদি ধরে জমিদারে।
দার লাগি তখনি ভ্রমেন দ্বারে ২ ॥
বিবাহ সম্বন্ধে হয় আনন্দ বিশেষ।
দুহিতা জন্মিলে পরে দুঃখ বহু শেষ ॥
অধিক সৌভাগ্য এই উল্লাস-জনক।
বিনাশ্রমে হোতে হয় পুত্রের জনক ॥
...শ্রীনারায়ণ কহে শুন বন্ধুগণ।
ভাবিলে কুলীনকৃত্য নিরখি গগণ ॥"

"সঙ্কতভঙ্গ" সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর "বহুবিবাহ" পুস্তকে বলেছিলেন,— "এদেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বঞ্চিত।"[১৭] শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ তাদের সম্বন্ধেও লিখেছেন,—

১৬। ১২৬০ সালে প্রকাশিত।

১৭। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ ৩ঃ চঃ সং পৃঃ ২১৯।

"যে জন স্বকৃত ভঙ্গ. ভূমিতে না পড়ে অঙ্গ,
শতেক দুশত যার নারী।
যেখানে যেখানে যায়, জামাই আদর খায়,
মুদ্রা লইবারে বাড়ে জারি॥
দুচারি বৎসর পরে, যদি পতি পায় ঘরে,
তাহে হয় এরূপ ঘটন।
টাকা দেহ এই বলি, প্রায় হয় চুলাচুলি,
দ্বন্দ্বে হয় রজনী বঞ্চন॥
ইথে কি সতীত্ব থাকে, জাতি কুল কেবা রাখে
বিবাহ সে সংস্কার মাত্র॥"

কুলীনদের অনাচার এবং কুলীন কন্যাদের খেদ সম্পর্কে কবিতা সংখ্যাতীত। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও "কুলীন মহিলা বিলাপ" নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এই বিলাপ যে ঐতিহাসিক সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায়। "নব প্রবন্ধ" সম্পাদককে একজন কুলীন কন্যা কুলীনের মেয়ের দুঃখ নিয়ে একটি চিঠি লেখেন সেটা উক্ত পত্রিকার ১২৭৪ সালের ভাদ্র মাসের সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। চিঠির শেষে পত্রলেখিকা নিজের পরিচয় হিসেবে লেখেন,—"চির দুঃখিনী শ্রীকুমুদিনী দেবী ; সপ্তগ্রাম—জেলা হুগলী ১২৭৪ সাল।" প্রেরিত পত্রের নামকরণ ছিলো "আমার অদৃষ্ট।"

কৌলীন্যের প্রতি আকর্ষণ আমাদের সমাজ জীবনে অনাধুনিক। কারণ সমাজে কুলীনের যথেষ্ট সম্মান ছিলো। মনুসংহিতাতেও আছে,—

"শ্রোত্রিয়ং ব্যাধিতার্ত্তৌ চ বালবৃদ্ধাবকিঞ্চনং।
মহাকুলীনমার্য্যঞ্চ রাজা সংপূজয়েৎ সদা।"[১৮]

কুলীনের নয়টি লক্ষণ ছিলো। একটি শ্লোকে নবধা লক্ষণের উল্লেখ আছে—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাশান্তিস্তপো দানম্ নবধা কুললক্ষণম্॥"

চাণক্য শ্লোকের একটি সুপরিচিত উক্তিতে কুলীনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার কথা বলা হয়েছে।—

১৮। মনুসংহিতা—৮/৩৯৫।

"কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বাণো ন বিনশ্যতি॥"

বলা বাহুল্য এ সম্পর্ক অর্থ "পরিবর্ত"-রক্ষা নয়। কিন্তু প্রাচীন নবধা লক্ষণের দুইটিকে শ্লোকচ্যুত করে 'গুণ'এর সঙ্গে 'আবৃত্তি' প্রক্ষিপ্তভাবে শুধু প্রকাশ পায় নি, প্রধান লক্ষণ বলেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

কৌলীন্য অর্জনের দুর্বার আকর্ষণ এমন ছিলো যে প্রথমে ব্রাহ্মণ, পরে কায়স্থ এবং অবশেষে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই কৌলীন্য সাম্প্রদায়িক পরিধির মধ্যে স্থানলাভ করেছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের তিনভাগে ভাগ করা যায়।—(১) রাঢ়ী, (২) বারেন্দ্র এবং (৩) বৈদিক। বৈদিকদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়।—(ক) পাশ্চাত্য এবং (খ) দাক্ষিণাত্য। কায়স্থদেরও তিনভাগে ভাগ করা যায়।—(১) রাঢ়ী, (২) বারেন্দ্র এবং (৩) বঙ্গজ। রাঢ়ী কায়স্থকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়।—(ক) উত্তর রাঢ়ী এবং (খ) দক্ষিণ রাঢ়ী। কৌলীন্য প্রথা ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের বিভিন্ন উপসম্প্রদায়কে আক্রান্ত করেছে। অবশ্য এগুলোর সর্বত্রই বল্লাল, দুলোপঞ্চানন বা দেবীবরের নির্দেশ জড়িত ছিলো কিনা সন্দেহ।

কৌলীন্য প্রথার অভিশাপের জন্যে সাধারণতঃ বল্লালকে দায়ী করা হয়। "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নাটকে ২৫ বার বল্লালের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে "কস্মিন্ হিন্দু মহিলা" ছদ্মনামে একব্যক্তি "বল্লালীখাত" নামে একটি নাটকও লেখেন। সমসাময়িক কালে প্রচুর কবিতায় বল্লালকে গালাগালি করা হয়েছে; অনেকক্ষেত্রে গালাগালির ভাষাও রুচিকে অতিক্রম করেছে। কখনো বা বল্লালকে স্মরণ করে খেদ করা হয়েছে। "বিশ্বসঙ্গীত" নামে একটি গ্রন্থে সংগৃহীত এরূপ একটি গানে[১৯] লেখা আছে,—

বল্লালী তুই যারে বাঙলা ছেড়ে।
ডুবল ভারত কদাচারে,
সোনার বাঙলা যায় রেছারে খারে।
ভ্রূণহত্যা সঙ্গে করে, ব্যভিচার তুই যারে মরে
পাপস্রোতে ভাসালিরে, বঙ্গমায়েরে অপার পাথারে।
শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেলরে নিপাত,
কুমারী কুলীন কুমারী করে অশ্রুপাত।

১৯। সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত—বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত (১২৯৯ সাল। পৃঃ ৪৭০।

(এবে) বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি, তারা বলে সমাজপতি।
ঘটক সনে করে যুক্তি, দম্ভে কাঁপায় বঙ্গ পদভরে ॥"

বাংলা প্রবচনে আছে—"রঘু, চৈতা, বলা, এ তিন কলির চেলা ॥

(শিরোমণিশ্চ চৈতন্যো বল্লালো রঘুনন্দনঃ
লোকানাং ধর্মনাশায় কলেঃ পুত্রচতুষ্টয়ম্ ॥"[২০])

এই বিদ্বেষের মূলে অবশ্য সামাজিক জটিলতা আছে, তবে অন্যতম কারণ যে প্রথা, তা বোধ করি অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বল্লালকে দায়ী করা চলে না। বহুবিবাহ এবং তজ্জনিত অন্যান্য সামাজিক দোষের মূলে বরং দেবীবর ঘটককে দায়ী করা যেতে পারে। তিনি বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের মেলবন্ধন করেই এই সমাজদোষ-সমূহের সূচনা করেন। ব্রাহ্মণ কৌলীন্যের দিক থেকে পাঁচ প্রকার—(১) কুলীন, (২) শ্রোত্রিয়, (৩) বংশজ, (৪) গৌণ কুলীন এবং (৫) সপ্তসতী। বল্লাল গুণ অনুযায়ী ভাগ করেন, কিন্তু দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেন এক একটি দোষ বিচার করে। "দোষান্ মেলযতীতি মেলঃ।" মেল শব্দের অর্থ দোষ মেলন, অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায় বন্ধন।—দোষো যত্র কুল' তত্র। এইভাবে ৩৬টা মেল বন্ধন করা হয়। এগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ খড়দহ এবং ফুলিয়া মেল।[২১] মেল বন্ধনের আগে কুলীনদের আটঘরে পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। একে বলা হতো "সর্বদ্বারী বিবাহ।" এতে কন্যার আদান-প্রদানের অসুবিধা হতো না এবং একব্যক্তির একাধিক বিবাহেরও আবশ্যক হতো না। কিন্তু পরে অপেক্ষাকৃত অল্প ঘরের মধ্যে মেলের পরিধি সঙ্কুচিত হওয়ায় কুলরক্ষার খাতিরে একপাত্রে অনেক কন্যা সম্প্রদান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ দেবীবরের মেল বন্ধনের ব্যবস্থা থেকেই বিবাহে দুর্নীতি প্রবিষ্ট হয়েছে এবং তজ্জনিত সামাজিক দোষের সৃষ্টি হয়েছে।

কুলীনদের কুলরক্ষায় 'আবৃত্তি' বা 'পরিবর্ত'-এর একটি বিশেষ স্থান ছিলো। এগুলো চারপ্রকার (১) আদান—(কন্যাকে সমান বা উচ্চ ঘর থেকে আদান), (২) প্রদান—(কন্যাকে সমান বা উচ্চ ঘরে প্রদান), (৩) কুশত্যাগ—(কন্যা-ভাবে কুশকন্যা প্রদান), (৪) ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা—(ঘটকের কাছে বাক্য দ্বারা—

২০। বাংলা প্রবাদ—ডঃ সুশীলকুমার [illegible]

২১। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ([illegible]) [illegible]

কন্যাহীনের কন্যাদান)। বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণের কুলরক্ষার মূলে ছিলো কন্যার আদান-প্রদান ; তাই কন্যাহীনের কুশকন্যা দানের রীতি সম্ভবপর ছিলো।

মেলের প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাবোধ পরবর্তীকালে কুলীন সমাজেও জেগে উঠেছে। "কৌলীন্য ও কুসংস্কার" প্রবন্ধে[২২] মহেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন,—"কুলীনেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে এই কুসংস্কার নীতির মূলোচ্ছেদ করিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর।" কিন্তু তা আর থাকে নি। উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকের প্রারম্ভেই অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছেন—[২৩] "মেল বন্ধন জন্য কুলীনদিগের যে কত অসুবিধা, কত মনোকষ্ট ও কত গ্লানি সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা এক্ষণে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।" যাকে কেন্দ্র করে এই বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে, সেই রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নিজে কুলীন ছিলেন। মেলের প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ এ সময়ে কুলীন-অকুলীন নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই জেগে উঠেছিলো। সমসাময়িককালে একজন কবি লিখেছেন,—

"মেল ভাঙ্গ মেল ভাঙ্গ কুলীন সবে
তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে।
মেলে মেলে নাহি মিল এতে কিরে ফল বল,
মিল মেলে মিল, জাতি কুল সকল রহিবে।[২৪]

উনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে কেবল আর্থিক বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ নয়, যৌন দৃষ্টিকোণও আত্মপ্রকাশ করেছিলো এবং তুলনায় মুখ্যভাবেই তা আত্মপ্রকাশ করেছে। "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকায় ১৭৬৪ শকের ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত একটি পত্রে বলা হয়েছে,—"যে অবধি এই ঘৃণিত কার্য্যের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুষ্কর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন।"

কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে যে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে, তাতে সমাধান সম্পর্কিত মনোভাব অবশ্য তিনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকায়

২২। মধ্য ভারত—আশ্বিন, ১২৯৭ সাল।

২৩। অমৃতবাজার পত্রিকা—১৮৮৩ খৃঃ ; ২০ সংখ্যা।

২৪। সচিত্র বিষসঙ্গীত (১২৯৯ সাল)—পৃঃ ৪৫১।

"অধিবেদনিক" প্রস্তাবে বলা হয়েছে—"কোন দেশীয় কুপ্রথার নিষেধক এক বিদ্যার অনুশীলন অপর রাজার শাসন দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে।"[২৫] শিক্ষা কৌলীন্যপ্রথা ক্রমে রহিত করতে সক্ষম এই ধারণা প্রকাশ করেছেন অনেকে। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায়[২৬] বলেছেন,—"ইংরাজী শিক্ষার বলে আমাদিগের দেশের লোকেরা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংই সমাজ সংস্কারে সমর্থ হইবেন। বহুবিবাহ সম্পর্কিত তদন্ত কমিটিও অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেছিলেন।[২৭] রাজবিধির সমর্থনকারী সম্প্রদায়কে পোষণ করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন,[২৮]—"রাজবিধি দ্বারা বহু বিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের উদ্দেশ্য এই, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর, যদৃচ্ছা প্রবৃত্তিকর বহু-বিবাহ কাণ্ড রহিত হইয়া যায় এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা রাজবিধি দ্বারা তৎসাধনার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত নমনীয় হয়ে অনেকেই "সর্ব্বদ্বারী বিবাহের" পুনঃপ্রচলনের জন্যে মত প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরও উপায়ান্তর বিহীন হয়ে এটাও সমর্থন করে গেছেন। "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" পুস্তকে তিনি বলেছেন,—"এ অবস্থায়, বোধহয়, পুনরায় সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের পথ নাই।"[২৯]

বাস্তবিক, কৌলীন্যপ্রথা আমাদের সমাজে অস্বাভাবিক বিবাহ পদ্ধতি এবং অস্বাভাবিক যৌন রীতিনীতির প্রবর্তন করেছিলো। অসম-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বার্ধক্য-বিবাহ, কুমার-কুমারী সমস্যা, বিধবা-সমস্যা ইত্যাদি এনে

২৫। বিদ্যাদর্শন—ভাদ্র, ১৭৬৪ শক।

২৬। সোমপ্রকাশ—......১২৭৮ সাল।

২৭। It is satisfactory, however, to receive their testimony that the opinion of Hindoos on this subject has undergone a remarkable change within the last few years, and that custom of taking a plurality of wives as a means of subsistence is now marked with strong disapprobation; and it may be hoped that with the further progress of these enlightened ideas the necessity for legislation as the only effectual means of giving them full effect will at no distance be realized."—Legislative Department Proceedings—March 1866/35.

২৮। সোমপ্রকাশ পত্রিকা—ভাদ্র ১২৭৮ সাল।

২৯। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ স্থঃ চঃ সং পৃঃ ২১৯।

আমাদের সমাজে যৌনপাপস্রোতের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলো। তাই একদা আতঙ্কিত বাংলা সরকার ভারত সরকারকে লিখেছিলেন— "...it seems far better that the practice of unlimited Polygamy should at once be restricted in Bengal. where it prevails to an extent unknown elsewhere..."[৩০]

বাংলা প্রহসনে অসম-বিবাহ বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে তো বটেই কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধেও প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। নামকরণে এবং বিষয়বস্তুতে সাধারণতঃ দুটি দিক প্রকাশ পেয়েছে। (ক) কুলীনকন্যার দুঃখ বর্ণনা (খ) কুলীনের হাস্যকর আচার বিচারকে মাত্রাবৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে উপস্থাপনা। গ্রন্থশেষে প্রদত্ত প্রহসনের তালিকা এবং গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রহসনের বিষয়বস্তুগুলো লক্ষ্য করলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। এ ছাড়া স্থানে স্থানে কৌলীন্যপ্রথার প্রসঙ্গ টেনে অনেক প্রহসনকার কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করে গেছেন।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "চপলা চিত্ত চাপলা" নাটকে (১৮৫৭ খৃঃ) বিনোদা নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করেছে। "ছেলেবেলা ত, মেয়ে বলে মা-বাপ দূরছাই করেচেন। আমি কুলীনের মেয়ে, মা কি বাপ, কখন একটি কথা বলে নি।...বাপ তো জুটিয়ে বের বর আন্‌লেন, অম্নি 'ওট্ ছুঁড়ি তোর বে' বে ত হলো তারপর মাস খানেক পরেই এম্নি হয়েচে। ভাতারের সঙ্গে আলাপও হয়নি, পরচেও হয়নি। সেই শুভদিষ্টির যা দেখা, আর সুতো খুলতে যা ছোঁয়া, সকল হলো পরে পরে, গুটীকতক মন্তরপোড়ে এই একাদশী লাভ হলো।" বিনোদা তার বৈধব্যদশার কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে কৌলীন্যপ্রথাকে ব্যঙ্গ করেছে। কোথাও কোথাও প্রসঙ্গ টেনে কবিতা আকারে কুলীনকন্যার খেদ ব্যক্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "মেয়ে মনষ্টার মিটিং (১৮৭৫ খৃঃ) প্রহসনে একটি কবিতায় আছে—

যৌবন ভরে চল্‌তে নারি
মদন বেটা নিজে বাদী
অরসিক বল্লাল বেটা
বিধি করে কেমন করে

আমরা কুলীনের নারী
সে দুঃখ আর বল্‌বো কারে ?
থাক্‌তো যদি মারতেম ঝেঁটা,
শিক্ষা দিতেম কানে ধরে।

[৩০] Legislative Department Proceedings—Aug. 1866/10-14. [illegible]

কুলীনদের বহুবিবাহ প্রসঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটকে' (১৮৬৬ খৃঃ) সুধীর বলেছে—"একজন ৫০।৬০টা বিবাহ করলে স্ত্রী ধর্ম রক্ষা করতে পারে না। তাদের পাপে স্বামীও পাপী—শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।" সুধীর আরও বলেছে—"ঐ স্ত্রীদিগের অনেককেই স্বামীবিরহ সহ্য করতে হয়। স্বামীবিরহ-ই পতিব্রত্যনাশক মনু বলেছেন। সুতরাং তাদের অধিকাংশেরই নানা দোষ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, স্ত্রীরা দূষিতা হয়ে ভ্রূণ ইত্যাদি নানা পাপ সঞ্চয়ও করতে লাগলো, জগতে অযশ বিস্তারেরও ত্রুটি হলো না।"

সুধীর সিরিয়াসভাবে যে ব্যভিচারের দিকটি ইঙ্গিত করছে, অন্যান্য প্রহসনে বিদ্রূপাত্মকভাবে তা ব্যক্ত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষালের "সমাজ সংস্করণ" প্রহসনে (১৮৮৩ খৃঃ) কেনারামের বন্ধু বেণী মন্তব্য করেছে,—"কুলমর্য্যাদা আছে, তাহাতেই তাহাদিগের সন্তান উৎপাদন করিতেছে; কুলীনের স্ত্রী, সন্তান প্রসব করিলেই পুত্র কুলীন হইল।...বল্লাল সেন রাজা হইয়া কুলীনদিগের যে সমস্ত নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সব গিয়া এক বিবাহ পদ্ধতি বজায় আছে মাত্র।" উক্ত প্রহসনে অন্যত্র একটি বর্ণনায়,—"একজন কুলীন ব্রাহ্মণের ৮০টি বিবাহ, তাহার মধ্যে কোন এক স্থানে তিনি বিবাহের পর অবধি তথায় যান নাই, কিন্তু সেই স্থানের পরিবারের একটি পুত্র ডিপুটী মাজিস্ট্রেট হইয়া তাহার জেলায় আসিয়াছেন, ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য অনুরোধে তাঁহার নিকট যাইয়া কথোপকথন করায় ডিপুটীবাবু দেখিলেন যে, এ ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা। উক্ত ডিপুটি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন—মহাশয়ের পিতার কয়টি বিবাহ। ব্রাহ্মণ।—আমার পিতার ১৮০টা বিবাহ। হাকিম।—তিনি সকল স্থানে গমনাগমন করেন? ব্রাহ্মণ।—সকল স্থানের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মাতামহী ঠাকুরাণী আমাকে বলিতেন, তোর বাপ তোরে একবার এসে দেখে গেল না, সেই যে তোর মার বিবাহের সময় ঝগড়া করে সেই রাত্রে গেল, তারপর এমুখ হল না।" মাতাপুত্রের কথোপকথনও আকর্ষণীয়। "পুত্র।—আমার জন্ম কোথা থেকে হল! মা।—ঈশ্বরের ইচ্ছায়। পুত্র।—ঈশ্বরে ইচ্ছায় বটে, কিন্তু উপলক্ষ? মা।—উপলক্ষ আর কি তাঁর মনে যা ছিল, তাই হয়েছে।"

"চপলা চিত্ত চাপল্য" প্রহসনে (১৮৫৭ খৃঃ) চারু মালিনীকে (কুট্নী) বলে,—বিধবা-বিবাহে মালিনীর লোকসান কিসে? কুলীনের মেয়েরা তো আছে। মালিনী বলে, কুলীনরা একাজ করে না। তাদের পদ্ধতি

অন্য রকম। "এখন হয়েচে কি (পেট) বেঁধে গেলে পরিবারেরা একদিন রাত-দুপুরের সময় ধূমধাম করে, বলে তেল নিয়ায়, নুন নিয়ায়, সন্দেশ নিয়ায়, কেন গো, না জামাই এসেছে গো জামাই এসেচে, পরদিন দেখি, কেউ কোথায়ও নেই। কইলো তোদের জামাই কৈ? না গেচে, জামাএর ভারি দরকার, ভোরবেলা গেচে। এই ত গোড়া বাঁধনি হলো, তারপর, দিনকতক বই একটি মুখুজ্জে কুলীন জন্মালেন, তা তারা ওষুধ খাবেই বা কেন, কড়ি দেবেই বা কেন?" কুলীনকন্যার যৌনবুভুক্ষার পরিণতি সম্পর্কে "নাপিতেশ্বর" নাটকে দুজনের কথোপকথনের মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। মুখুজ্যেদের 'কুমদা'র দুঃখের কথা প্রসঙ্গে বৌকে শামী বলে,—"ওদের কথা ছেড়ে দে লো ওদের কথা ছেড়ে দে—ও ভদ্দোর লোকদের সব উল্টো. ওরা হচ্চে কুলীন বামুন ওর একশ সাড়ে ছিয়াত্তরটা সতীন তা ওর ভাতার কাকে ভালবাসবে বল!" বৌ অবাক হয়ে বলে,—"ওমা বলিস কিলো একশ সাড়ে ছিয়াত্তরটা যে মিনসে বিয়ে করেছে ধন্যি তার ক্ষমতা—সকলের ধর্ম্ম থাকে তো। শামী হাসতে হাসতে জবাব দেয়—"হাঁ ধর্ম্ম থাকে বই কি কারুর আঁব বাগানে, কারুর গোলঘরে, কারুর হাটে, কারুর মাঠে, এই সকল জায়গায় অনেকের ধর্ম্ম থাকে দু একটার ধর্ম্ম হয় বিষে. না গলাস দড়িতে।"

দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দিকটিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘটক ॥ আপনি জঙ্গলবেড়ের 'কুঁচিল' বাবুকে জানেন?

পদ্মলোচন ॥ তিনি কুলীন চূড়ামণি।

৩য় পারিষদ ॥ তাঁর ব্যবসা কি?

পদ্ম ॥ ছেলেমেয়ে বিক্রী করা। তাঁর সন্তানগুলি দরে বিক্রী হয়; তাঁর পিলেরোগা গন্নাকাটা কালপ্যাচা মেয়েটা দেড় হাজার টাকায় হাইষ্ট বিডারে বিক্রয় হয়েছে।

৪র্থ পারিষদ ॥ তাঁর ছেলেটি কেমন?

পদ্ম ॥ ভগ্নীর ভাই।

৪র্থ পারিষদ ॥ লেখাপড়ায় কেমন?

পদ্ম ॥ আমি তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেম,—"তোমরা কয় ভাই?" সে বল্লে, "তিন ভাই" আমি বল্লেম. "কে কে"? সে বল্লে. "আমি, কালাকাকা আর ভগীপিসী। লেখাপড়ায় কেটে জোড়া দেন।"

কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদারের লেখা "রামের বিয়ে" প্রহসনে (১৮৭৬ খৃঃ) কুলীন রামতারণকে ভূপেন জিজ্ঞাসা করে—"তোমরা কি কুলীন ?" রামতারণের সঙ্গী নিশাকান্ত স্বগত মন্তব্য করে—"ন ছেড়ে দিলেও হয়।" তারপর প্রকাশ্যে বলে, "বল না কেন ?" তখন রামতারণ জবাব দেয়—"আমি কুলীন, বরোজ গোত্র, কাশীমুণির নাতি।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনের নামকরণ, বিষয়বস্তু, প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে যে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে, তা আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু যৌন দিকটিও গৌণ ছিলো না। বৈবাহিক দুর্নীতি ছাড়াও কুমারী ও বিধবা সমস্যা সমাজকে দূষিত করে তুলেছিলো।

প্রদর্শনীর ভিন্ন বিভাগে অর্থাৎ আর্থিক বিভাগে 'কৌলীন্য ও পণপ্রথা' ইত্যাদি উপ-বিভাগে আলোচনা এবং প্রদর্শনীর অবকাশ আছে। কিন্তু বৈবাহিক দুর্নীতির মূলে যে প্রথার অপ্রতিহত প্রভাব—তা নিয়ে আলোচনা প্রারম্ভিক-ক্ষেত্রে করাই যুক্তিসম্মত। কৌলীন্যপ্রথা অন্যান্য সমাজের বৈবাহিকপ্রথাকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে—যথা শ্রোত্রিয় বিবাহপ্রথা ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে যথাস্থানে বক্তব্য প্রকাশ করা যাবে।

(ক) অসম-বিবাহ ॥ —

আধুনিক যৌনবিজ্ঞান বিবাহের যোগ্যাযোগ্য বিচারকে প্রধান একটি স্থান দিয়েছেন। সাধারণভাবে দেহের দিক থেকে সমর্থ এবং সম্পূর্ণ পুষ্টাঙ্গ ব্যক্তিই স্ত্রীই হোক বা পুরুষই হোক—বিবাহযোগ্য! অবশ্য এই যোগ্যতা আর্থিক, মানসিক ইত্যাদি যোগ্যতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মানুষের যৌনভাব সম্পূর্ণ পশুত্বের মধ্যে অবসিত থাকে না। তাই অনুভূতিকে কেন্দ্র করে একটা মানসিক দিক গড়ে ওঠে। একে সাধারণতঃ 'প্রেম' বলা হয়। একে যৌন অনুভূতির সংস্থান অর্থাৎ যৌন সংস্কার বলা যেতে পারে। যৌনবোধ আঙ্গিক দিকে সম্পূর্ণ নয়, মানসিক দিককে নিয়ে এর সম্পূর্ণতা। এই মানসিক দিকটির বিকাশ ঘটে যৌন অংশীদারের দৈহিক এবং মানসিক সমপর্যায়ত্বে। বিবাহের সঙ্গে সাময়িক যৌনানুভূতির প্রশ্ন জড়িত থাকে না। তাই দৈহিক এবং মানসিক সমপর্যায়ত্ব বিবাহের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য চাহিদা। কিন্তু এই চাহিদাকে আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দিকের সঙ্গে আপোষ রেখে চলতে

হয়। পুরুষকে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দায়িত্ব বহন করতে হয় বলে, সমপর্যায়ত্বের মধ্যেও পুরুষের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পরিপক্কতার আবশ্যক হয়। প্রকৃতিগুণে স্ত্রীলোক বৈতসিকবৃত্তি-সম্পন্না বলে এই অসমতা কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। দ্বিতীয়তঃ, পুরুষ সাংস্কৃতিক মনের দ্বারা প্রধানতঃ চালিত হয় বলে অংশীদারের এই পর্যায়ন্যূনতা তারও কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না। বলাবাহুল্য সমবয়স এবং সমপর্যায় এক অর্থ নয়। কারণ যৌনবিজ্ঞানের এটি একটি সাধারণ কথা যে বয়সের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের যৌনসামর্থ্য এবং যৌনানুভূতিকেন্দ্রিক মনোগঠনের সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত আগে আসে।

আমাদের সমাজে যৌনবিজ্ঞান সম্মতভাবেই পুরুষের বয়স স্ত্রীলোকের বয়সের চেয়ে একটু বেশি পার্থক্যযুক্ত রেখে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অরক্ষণীয়ার ধর্ম বা সমাজ-গত কিংবা নিছক প্রকৃতি-গত সমস্যা এড়াবার জন্যে এবং নীতিরক্ষার জন্যে স্ত্রীলোককে আমাদের দেশে সমর্থকালের প্রারম্ভেই কিংবা অনেকক্ষেত্রেই সমর্থকালের পূর্বেই বিবাহদানের রীতি আছে। অবশ্য পুরুষের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক প্রস্তুতির জন্যে বয়স একটু বেশি পার্থক্যের রেখা টেনেছে। এ সম্পর্কে মনু নির্দেশ দিয়েছেন—

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ।[৩১]

এতো পার্থক্য সৃষ্টির মূলে একটা সূক্ষ্মতর যৌনবিজ্ঞানগত দৃষ্টি আবিষ্কার করা যায়—যা আধুনিককালের যৌনবিজ্ঞানীরা স্বীকার করে থাকেন। জার্মানীর হাফ্‌কার, গ্রেট ব্রিটেনের সেড্‌লার, আমেরিকার নেপিয়ার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকবৃন্দ পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছেন যে স্বামী স্ত্রীর চেয়ে বয়সে বড়ো হলে পুত্র জন্মাবার সম্ভাবনা বেশি।[৩২] পার্থক্য বেশি থাকলে হয়তো সম্ভাবনা আরও নিশ্চিতের পথে পদক্ষেপ করে। আমাদের দেশে যেখানে পুত্রসৃষ্টিই বিবাহের উদ্দেশ্য, সেখানে এই নীতি অনুসরণ স্বাভাবিক। অবশ্য এটা অনুমানমাত্র। পুত্রের সুস্থতার জন্যেও হয়তো সমর্থ স্ত্রীর চেয়ে পুরুষের বয়সের পার্থক্য বেশি

৩১। মনুসংহিতা—৯/৯৪।

৩২। Sexual Physiology and Hygiene— Dr. R. T. Trall, M.D., Pp. 178—79.

রাখা হয়েছে। Cowan সাহেব লিখেছেন—"In man, the period of perfect growth does not arrive until the twenty eight or thirtieth year."[৩৩]

আমাদের সমাজে আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক পরিবর্তনের ফলে পুরোণো পাত্রপাত্রীগত বয়সমান একরকম থাকে নি। এই পরিবর্তন শুধু বাইরের দিক থেকেই আসে না। পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিগত দিক থেকে যৌন আথিক এবং সাংস্কৃতিক কতকগুলো সমস্যার ফলেও অনেক সময় দেখা দিয়ে থাকে। বাইরের দিক থেকে—পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় চাপ বয়সের মানে বিপর্যয় আনে।

এই সমস্ত সমস্যা থেকেই আমাদের সমাজে অসম-বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। আমাদের সমাজশাস্ত্রে বিবাহের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতম সীমার নির্দেশ নেই, কিন্তু রজস্বিনী বালিকা মাত্রেই অরক্ষণীয়া বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মনু-সংহিতায় বলা হয়েছে যে বিবাহের বয়সে কন্যার বিবাহ না দিলে পিতা নিন্দনীয় হন।[৩৪] পরাশর এ সম্পর্কে আরও কঠোরভাবে বলেন—

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥[৩৫]

পুরুষের ক্ষেত্রে বিপত্নীক বিবাহের নিষেধ নেই, অথচ কন্যা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী সমাজে কঠোর। তাই বৃদ্ধের দার পরিগ্রহ সম্ভাবিত হলে পাত্রী হয় বালিকা। কারণ বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় না হলেও আচারবিরুদ্ধ ছিলো এবং চাহিদা অনুযায়ী কুমারী এদেশে সুলভ। মনু বহুদিন পূর্বেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥[৩৬]

কিন্তু তিনি বয়সের অযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই বলে যান নি।

বস্তুতঃ প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে অসম-বিবাহের বিরুদ্ধে তেমন

৩৩। The Science of A New Life—Dr. J. Cowan, M. D., P.—31.

৩৪। মনুসংহিতা—৯/৪।

৩৫। পরাশর সংহিতা—৭/৭

৩৬। মনুসংহিতা—৯/৮৯।

কোনো কঠোর নীতির প্রতিষ্ঠা ঘটে নি। কৌলীন্যপ্রথা এসে তার ওপর দুর্নীতিরই প্রতিষ্ঠা করে গেছে। নতুনভাবে অসম-বিবাহের ব্যাপক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছে কৌলীন্যপ্রথা। ক্ষয়িষ্ণু সমাজে সাংস্কৃতিক দিকটিই বড়ো হয়ে উঠেছিলো, তাই সমাজের একটি অপরিহার্য দিক—যৌন সমাধান—তা সম্পূর্ণ তুচ্ছ হয়ে গেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাকামী পিতা ক্ষমতায় একচ্ছত্র ছিলো, এবং কন্যার স্বনির্বাচনের মূল্য বিন্দুমাত্র ছিলো না। পরিবারের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার জন্যে কন্যার যৌনবোধের সম্পূর্ণ বলিদান ঘটেছিলো। কৌলীন্যপ্রথার আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ-প্রথার দিক থেকে অসম-বিবাহের মূল উৎস নির্দেশ করা হয়েছে। কৌলীন্য প্রথাজাত অসম-বিবাহের দৃষ্টান্তের কথা চিন্তা করলে পূর্বে উদ্ধৃত চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিটি স্মরণ করা চলে। "দম্পতির মধ্যে ন্যূনাধিক্য বয়সে বিবাহের বাধা নাই, সপ্তম বর্ষীয় বালকের সহিত অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার এবং ত্রয়োদশ দিবসের কন্যার সহিত নবতিবর্ষীয় প্রাচীনের অনায়াসে বিবাহ হইতেছে· ·।" এর পরিণতি কেমন ছিলো, দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি সংবাদ ও সাংবাদিক মন্তব্য উদ্ধার করা যায়। "বামা বোধিনী" পত্রিকায় একটি সংবাদে[৩৭] বলা হয়েছে,—"বরিশালে এক প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর সহিত এক শিশুর বিবাহ হওয়াতে স্ত্রীলোকটি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহেও এরূপ দুর্ঘটনা মধ্যে মধ্যে হয়। কৌলীন্য কুপ্রথা আজিও কি নির্ম্মূল হইবে না?"

অসম-বিবাহ ইত্যাদির ফলে আমাদের সমাজে দাম্পত্য অসন্তোষ অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বাংলাদেশের স্ত্রীসমাজের মধ্যে যে কলহ-প্রবণতার অভিযোগ করা হয়, তার মূলে স্ত্রীসমাজের মুখ্যতঃ যৌন এবং গৌণতঃ আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অসন্তোষ নিহিত ছিলো। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, অনুরূপ কারণ অভাবেও কলহ বিস্তার লাভ করেছে। পতিব্রতোপাখ্যানে (১৮৫৩ খৃঃ) [৩৮] গ্রন্থকার রামনারায়ণ লিখেছেন,—"আমি অসঙ্কোচে সর্ব্বজন সমক্ষে কহিতে পারি এতদ্দেশে এমন্ গৃহস্থের গৃহ নাই যেখানে স্ত্রীজাতির নিরর্থক কুক্কুর কন্দোলের আন্দোলন না হয়।" উক্ত শতাব্দীর শেষের দিকে

৩৭। বামা বোধিনী, বৈশাখ, ১২৯২; পৃঃ ৩৪।

৩৮। কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা নাটমন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত।

প্রকাশিত "ললনা সুহৃদ" নামে একটি পুস্তকেও[৩৯] বলা হয়েছে,—"বঙ্গীয় রমণীগণের যতগুলি নীচ প্রবৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে কলহ প্রধান। বঙ্গললনাগণ যেরূপ কলহপ্রিয়া বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশের স্ত্রীলোকই সেরূপ নহেন।" বস্তুতঃ দাম্পত্য অসন্তোষ জনিত ব্যভিচার প্রবণতার তুলনায় কলহ-প্রবণতা সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি বিশেষ। সাংস্কৃতিক এবং যৌন স্বার্থচ্যুতি স্ত্রী-সমাজকে আর্থিক দিক থেকে বেশি সচেতন করেছে। যৌন এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থচ্যুতির বিরুদ্ধে স্ত্রীসমাজের মন যেখানে স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করেছে, সেখানে তারা ব্যভিচার প্রবণতা প্রকাশ করেছে। দাম্পত্য অসন্তোষ সমসাময়িককালে অনেকেই অনুভব করেছেন বটে, কিন্তু সমাধানের পথ দিতে গিয়ে তাঁরা স্বার্থ ও সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি। রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর "পতিব্রতোপাখ্যান" গ্রন্থে বলেছেন,—"এক্ষণকার দম্পতিদিগের বিভিন্ন মতি উপস্থিত হওয়াতে কি দুঃখের বিষয় না ঘটিতেছে, ইহাদিগের মনের অনৈক্যই সংসার সাগরের দুঃখ প্রবাহকে প্রবল করিতেছে।"

কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পণ গ্রহণ প্রথা—যা অসম-বিবাহের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। বরপক্ষীয় পণগ্রহণপ্রথার ক্ষেত্রে কন্যাদায় মুক্তির জন্যে পাত্রের যোগ্যতা বিচার গৌণ হয়ে পড়ে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর "বলিদান" নাটকের শেষে বলেছেন,—"......আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম। ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতিগৃহে নিত্য বিরাজমান! তথাপি আমরা পুত্রের শুভবিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন করতে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্তি—জগতের এক নূতন রহস্য! বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয় বলিদান!!" কন্যাপক্ষীয় পণগ্রহণক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রোত্রিয় সমাজেও অসম-বিবাহের সম্ভাবনা থেকে গেছে। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা "কোনের মা কাঁদে" প্রহসনে (১৮৬৩ খৃঃ) ঘোষাল ঘটককে রায় মশায় বলেছেন,—

"ও সকল কথা মুখে এনো নাক আর।
আমরা ধারিনে কোন কৌলীন্যের ধার॥
লেখাপড়া বুঝে কিবা আছে প্রয়োজন।
বেশী পণ যেবা দিবে সুপাত্র সেজন॥

৩৯। ললনা সুহৃদ—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—১২৯৪ সাল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাংস্কৃতিক দিক থেকে কৌলীন্যপ্রথা এবং আর্থিক দিক থেকে পণপ্রথা সমাজে অসম-বিবাহের জন্ম দিয়েছে।

সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক কারণের মতো যৌন কারণেও অসম-বিবাহ সংঘটিত হয়। পাত্র বা পাত্রীর এক পক্ষীয় কামপরবশতায় এটির সম্ভাবনা ঘটে। আমাদের সমাজে সাধারণতঃ পাত্রপক্ষীয় কামপরবশতা এ ধরনের অসম-বিবাহের দৃষ্টান্ত এনেছে। তবে এ সব ক্ষেত্রে পাত্রের ব্যক্তিগত আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ প্রধানভাবে প্রচারের চেষ্টা চলে থাকে।

অসম-বিবাহে যেখানে দাম্পত্য অংশীদারত্ব দুজনের মধ্যেই নিবদ্ধ এবং স্বামী বৃদ্ধ এবং স্ত্রী তরুণী—সেক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যৌন-অপরাধী মনোভাব এসে চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা এনে দেয়। তখন এই দুর্বলতার সুযোগে স্ত্রী স্বামীর কাছে অন্যান্য দিকে প্রতিষ্ঠার জন্যে চাপ দেয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্বামী তার যৌন অক্ষমতার জন্যে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আর্থিক দিক থেকে আনন্দদান এবং যৌনেতর অন্যান্য কায়িক বা বাচনিক আনন্দদানের চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামী জানে এই সব চেষ্টায় যৌন অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ সম্ভবপর নয়। তাই অসন্তুষ্ট স্ত্রী স্বামীর এই দুর্বলতার সুযোগে স্বামীর ক্ষতিপূরণরূপ চেষ্টাগুলোর ওপর বলাৎকার করে থাকে এবং বিভিন্ন দিক থেকেই স্বেচ্ছাচারকে প্রকাশ্যভাবে আশ্রয় করে। এমন কি যৌন স্বেচ্ছাচারকে প্রকাশ্য-ভাবে আশ্রয় করতে দেখা যায়। বৃদ্ধের বিবাহ সংক্রান্ত যে বাংলা প্রবচনগুলো প্রচলিত—এগুলোর মধ্যে এই সমাজসত্য অত্যন্ত প্রকট। যথা—

(১) দোজবরে ভাতারের মাগ
চতুর্দশীর চোদ্দ শাক ॥

(২) দোজবরের মাগ গজরা হাতী
ভাতারকে মারে তিন লাথি ॥

(৩) একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা।
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়।
চার বরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায় ॥

(৪) বুড়ো বয়সে বিয়ে
পুরাণো কাপড় সিয়ে ॥

অযোগ্য বিবাহ বা অসম-বিবাহ পদ্ধতিকে আমাদের সমাজ কপাল বা অদৃষ্ট বলে চালিয়েছে। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার উপায় থাকে না এবং প্রতিক্রিয়া শক্তি সংগঠনের ইচ্ছাও নষ্ট হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ অদৃষ্টকে শিখণ্ডীর মতো সম্মুখে রেখে সমাজ তার দৌর্নীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।—

"তালসাশ কাটম বাসের বাটম
আমাদের ঝিঃ।
তোমার কপালে বুড়া বর,
আমরা করিব কিঃ॥

অন্যদিকে শিবকে আদর্শ স্বামী বলে প্রচারের চেষ্টাও চলেছে—লৌকিক ব্রতকথায় যার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিল্‌বে।

অসম-বিবাহের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ অনাধুনিক। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে নাটক-প্রহসনে, কবিতায়, প্রবন্ধে সর্বত্রই অসম-বিবাহ বিষয়ক বিষয়বস্তুর একতায় বোঝা যায় যে এই শতাব্দীতে উক্ত দৃষ্টিকোণের যথেষ্ট পুষ্টিলাভ ঘটেছে। কারণ শুধুমাত্র অসম-বিবাহকে বিষয়বস্তু করেই প্রচুর রচনা লেখা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হেমন্ত রায়চৌধুরী "ত্রয়স্পর্শ বিবাহ" নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। তাতে বলা হয়েছে,—

"দন্তহীন হাসি হেসে, নেড়ে শুভ্র শিরে!
আদরে তোষেন প্রিয়, প্রাণ প্রেয়সীরে॥
বেঁচে থাক প্রাণ-প্রিয়ে! ফলাও সন্তান!
নরক হইতে মোরে, কর পরিত্রাণ!!
ধিক্ ধিক্ বুড়ো বর, ধিক্ ধিক্ ধিক্!
পুরুষে মাগীর দাস, ধিক শত ধিক!!
নারী দাস দেখি নরে, ঘোর কলিকালে!
আরো কত দেখিব রে, এ পোড়া কপালে!!
......দশের পুণ্যের ফলে, যশের প্রমাণ।
হইতেছে বুড়োদের সুশীল সন্তান!!"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রচুর প্রহসনে পরিণয়ে অসমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "কোনের মা কাঁদে" প্রহসনে (১৮৬৩ খৃঃ) রায়গৃহিণী বলেছে,—"প্রাণনাথ—এদেশের এই একটি অত্যন্ত মন্দ দেশাচার বলিতে হয়, যাহার সঙ্গে যাবজ্জীবনের জন্য একত্রে

ঘরকন্না করিতে হইবেক, তাহাদিগের উভয়ের মনস্থ হইয়া পরিণয় কার্য্য সম্পাদন হওয়া উচিত, এ বিষয়টি এ দেশের ব্যবহার নাই বোলেই যা বলুন, কিন্তু মা বাপের এ বিষয়ে খুব বিবেচনা চাই।" "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" প্রহসনের (১৮৭৪ খৃঃ) শেষে কবিতায় তাছে,—

"সমানে সমানে বিনা প্রকৃত প্রণয় !
ধরাধামে কদাচন দৃষ্ট নাহি হয় ॥
ধনী সনে ধনী জনে সদালাপে রয় !
নির্ধনের সনে কভু প্রেম নাহি হয় ॥
সাধু চায় সাধু সঙ্গ গুণী গুণী জনে।
তস্করে তস্করে সখা বিবিধ বিধানে ॥
তরুণী তরুণ মনে মনোল্লাসে রয়।
বৃদ্ধ সনে রসরঙ্গে মত্ত নাহি হয় ॥
সমতার বিপরীত যথা দৃষ্টি হয়।
প্রকৃত প্রণয় নাহি জানিবে নিশ্চয় ॥"

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "আক্কেল গুড়ুম" প্রহসনের (১৮৮২ খৃঃ) শেষে পদ্মনাথ বলেছে—"ভালবাসা যার তার সঙ্গে হয় না, উভয়ের মনের মিল না হলে ভালবাসা হয় না. এবার অবধি ছেলেপুলে হলে বিবাহের সময় আগে উভয়ের মনের মিল দেখে বিবাহ দেবো আর এই প্রথা যেন আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়, নচেৎ আমার মতন অনেককে চিরকাল অন্তর্দ্দাহে পুড়তে হবে।" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের লেখা "উঃ মোহন্তের এই কাজ" প্রহসনে (১৮৭৩ খৃঃ) হরির মন্তব্যেও অসম-বিবাহরূপ দেশাচারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ পেয়েছে। —"এই নাকে কানে খত, আর কখন না। কিন্তু এবারকার টাকা হাত করে, এ বুড়ো বয়েসের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, আর দেশের বড় লোকদের আমার এই অবস্থা দেখিয়ে—পায়ে ধরে মিনতি কর্ব্বো, যেন তাঁরা ছেলেমেয়ে থাকতে আমার মতন বুড় বয়েসে বিবাহ না করেন, আর যাতে এটা দেশ থেকে একেবারে উবে যায় তার চেষ্টা করেন। আমার অবস্থা দেখেও কি তাঁদের চোখ ফুটবে না ?"

অসম-বিবাহে স্বার্থপর বৃদ্ধদের যুক্তির অভাব ছিলো না। শেখ আজিমদ্দির লেখা "কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে" (১৮৮৬ খৃঃ) প্রহসনে বুড়োর যুক্তি অত্যন্ত হাস্যকর। বুড়ো বলেছে,—

"একা শয্যা থাকি আমি নির্জ্জন পুরীতে।
সময় হয়েছে, নাহি বিলম্ব মরিতে॥
কোন সময় মৃত্যু হয় বলিতে না পারি।
সে সময় কে দিবে বদনে তুলি বারি॥"

বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীপক্ষীয় স্বার্থপরতার বিন্দুমাত্র প্রশ্ন এখানে নেই! অনেকে মনুসংহিতা ইত্যাদির দোহাই দিয়ে বিবাহের ইচ্ছা জানিয়েছে। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" প্রহসনে রাজীব মনুসংহিতার "সর্ব্বাগ্রে দ্বিজাতিনাং" শ্লোকটি আবৃত্তি করে বলে, ব্রাহ্মণের রতিইচ্ছা জাগ্‌লে সে যে কোনো বর্ণের নারীকে বিবাহ করতে পারে, ব্রাহ্মণীর তো কথাই নেই। "আর দেখ বিবাহ হচ্চে তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তক আর কাম্য। আমার হচ্চে নৈমিত্তক বিবাহ, কারণ আমি পুত্রের নিমিত্ত বিবাহ কর্‌ছি। দ্বিতীয়তঃ আমি হচ্চি কুলীনের ছেলে, কাম্য বিবাহ আমারই তরে, আমি যটা ইচ্ছে ততা বিয়ে কোত্তে পারি, এখনও মনে কোল্লে দশটা বিয়ে কোত্তে পারি তাতে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নেই।" যুক্তি এঁদের যা-ই হোক কাম-পরবশতা থেকেই এই বিবাহেচ্ছা। অমরেন্দ্র দত্তের লেখা "কাজের খতম্‌" প্রহসনে একথা নগ্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রহসনটিতে এক স্থানে মতি রমাকান্তকে বলেছে,—"দ্বিতীয় পক্ষের বে করা আর ভদ্র রকমের বেশ্যা রাখা এ দুইই সমান।"

তরুণী ভার্যার বৃদ্ধ স্বামী বিবাহান্তে এমন অনেক অস্বাভাবিক কাজ করে থাকেন—যা কর্মভোগের নামান্তর। "মোহন্তের এই কি কাজ" প্রহসনে (১৮৭৩ খৃঃ)[৪০] বামুনপিসী মন্তব্য করেছে,—"বলতে হাসিও পায় দুঃখও হয়, কেউ নূতন গিন্নিদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে কেঁচে যুবা হন, যে চিরকাল সাদা থান ফাড়া পরে কাটিয়েচে, কিন্তু এখন কালা পেড়ে ধুতি না হলে আর পরা হয় না, পাকা চুলে কলপ দ্যান, দাঁত বাঁদিয়ে আসেন, বুড়দের সঙ্গে না মিশে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গেই বসা দাঁড়ান।" "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" প্রহসনে রামের মন্তব্যে তা স্পষ্টই কর্মভোগ বলা হয়েছে।—"এ বয়সে পাকা চুলে কলপ দেওয়া, কালাপেড়ে ধুতি পরা, চুল পেন্‌চুট্‌ করা, গোঁপে তা দেওয়া, নিধুর টপ্পা অভ্যাস করা, এ কি কম কর্ম্মভোগ?" "ঝক্‌মারির মাশুল" (১৮৭৭ খৃঃ) প্রহসনে বাদ্‌লীর অলঙ্কার লোলুপতায় বিরক্ত হয়ে ভূতো মন্তব্য করেছে,—"বুড়ো বয়সে

৪০। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস—১ম খণ্ড।

ছোট মেয়ে বিয়ে করা এক জ্বালা। মন যোগাতে যোগাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।” তরুণী ভার্যার মন যোগাতে গিয়ে বৃদ্ধের যে অস্বাভাবিক তৎপরতা প্রকাশ পায়, তা উন্মত্ততারই নামান্তর। রাধাবিনোদ হালদারের লেখা “ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি” প্রহসনে (১৮৮৫ খৃঃ) সুশীলার উক্তি—“ঘাটে সবাই বলে—এমন বামুন দেখিনে—৮০ বছর বয়সে একটা ছুঁড়ী বে কোরে উন্মাদ হোয়েছে। দুদিন বাদে মোরে যাবে আর একটা কুলধ্বজ রেখে যাবে।”

বৃদ্ধের এই স্ত্রী-সর্বস্বতাকে কটাক্ষ করে একটি বর্ণনাত্মক কাহিনী উপস্থাপনার সাক্ষাৎকার পাই শিশিরকুমার ঘোষের “নয়শো রূপেয়া” প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ)। প্রহসনটির একস্থানে ঘাটের পথে চপলা বিমলাকে বলে—“কানাই ঘোষালের নূতন বৌ সেদিন নাকি তাদের চাকর রসিকের সঙ্গে কথা বলে হাস্‌ছিল, তাই ঘোষাল মহাশয় দেখে, রাগে গর্‌গর্‌ হোয়ে নূতন বৌর কাছে চোক্ গরম কোরে গিয়েছিলেন। নূতন বৌ অম্‌নি বোলেছে,—“কেন্‌রে বুড় ড্যাক্‌রা, তোকে আমায় বে কোরতে বোলেছিল কে? তুই যেন না বুড়ো হোয়েছিস্‌, আমাদের অল্প বয়স, আমরা একটু হাস্‌ব না, আমোদ করবো না? তোর পান ছেঁচলে স্বর্গে যাব নাকি? ওঁর একটাতে পোষালো না। ছেলে মোরেছিল, পুষ্যিপুত্র রাখ্‌লিনে কেন? পুরুষের ক্রমেই নবীন বয়স হোচ্ছে, এদিকে যে সত্তর গড়াল, তা জেনেও জান না? আবার পাড়ওয়ালা ধুতি পরা হয়, কত সাধই যায়! পুরুষ আবার বলেন এস, একটু আমোদ করি। মর্‌! তোকে নিয়ে আমি কি আমোদ কোরবো রে? তুই যে আমার বাবার দশ বছরের বড়? অমন কোরে যদি জ্বালাতন কোরিস্‌, তবে তোর ঘরে দোরে আগুন দিয়ে মুখে চুণকালি দিয়ে, একদিকে চোলে যাব। ঘোষালের আর কথাটি না, অমনি আস্তে আস্তে সর্‌সর্‌ কোরে প্রস্থান।” (৫০পৃঃ)

অসম-বিবাহে স্বামীর বয়স কন্যার পিতার স্থানীয় এমন কি তার বেশি দেখা গেছে অনেকক্ষেত্রে। পিতার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় কন্যা যে সংস্কার বহন করে চলে, তার মধ্যে যৌনঅনুভূতিকে দমনের চেষ্টা থাকে। পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণে এই বাহিত সংস্কারের মধ্যে যে বিপর্যয় আসে, তা অনেকক্ষেত্রে যৌনবিকৃতি আনে। বলাবাহুল্য পুরুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের “জামাইবারিক” প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) দাম্পত্যসম্বন্ধক্ষেত্রে বিন্দুর অযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন করিয়ে মানসিক

অশান্তির সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঈর্ষাপরায়ণা সপত্নী বগলাও পিতা-কন্যাসম্পর্ক উপস্থাপন করে পরিহাস করেছে।—

"আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি
মড়ি পোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে
বাবা বলিছি!"

বিবাহে স্বামীর অযোগ্যতা নিয়ে যতোই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশ পাক না কেন, তার পাশাপাশি "ফুলের কুঁড়ি" কন্যাদের দুঃখ প্রহসনকারের সহানুভূতির পরিচয় রেখে যায়। "বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা" প্রহসনে হেমাঙ্গিনী বলেছে,—"পুরুষ চোর, আর স্ত্রী ভ্রষ্টা বড় বদ্‌নাম। তা কি কোরবো, স্ত্রী-জাতির স্বামীই সর্ব্বস্ব ধন; স্বামী যদি মানুষ হোতেন তাহলে কি এ কাযে প্রবৃত্ত হতে পারি?···আমার মা-বাপ যে কি বোলে, এ হাবাতের হাতে সমর্পণ কোরেছিলেন, বোল্‌তে পারি না এ পাপের ভোগ্‌ তাঁদেরই। আমার দোষ কি?···স্বামী পরম গুরু সত্য। কিন্তু সে কেমন স্বামী, যাকে স্বামী সম্বোধন কর্ত্তে ঘৃণা হয়, তাকে কি ভক্তি করা যায়?···আমি বেশ জান্‌চি মন্দ কচ্চিনে, লোকে যা বলুক, কেন পুরুষ যদি পরদার করে তাতে অধর্ম্ম নেই, স্ত্রীলোকের বেলাই যত দোষ, স্ত্রীলোকের কি মন নাই ইন্দ্রিয় নাই!" বাস্তবিকই বিবাহিতার যৌনবুভুক্ষার দাবী ন্যায্য দাবী। জৈবিক ক্ষুধাকে সংস্কার দিয়ে রোধ করা হৃদয়হীনতার নামান্তর। তাই অসম-বিবাহের ফলে ব্যাপক ব্যভিচার অনুষ্ঠানে স্ত্রীসমাজকে দোষ দেওয়া চলে না। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের সহানুভূতিই বেশিমাত্রায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। পূর্বোক্ত প্রহসনেরই একস্থানে ফুলমণি বলেছে,—"দিদি ঠাকুরুণের সমস্ত বয়েস্‌, ভরা যৌবন, এখন তো ও সক্‌ হবেই, আর ঐ তো জরাজীর্ণ স্বামী, অমন স্বামী থাকায় আর না থাকায় সমান।"

অসম-বিবাহে সমর্থ স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামীর দৃষ্টান্তই যে একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিলো, তা নয়; অনেকক্ষেত্রে সমর্থ পুরুষের শিশু বা অসমর্থা স্ত্রীর দৃষ্টান্ত ছিলো—যেখানে স্ত্রীপক্ষে যৌবনের অকালবোধনের দেহযন্ত্রণা ছিলো। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মোকর্দ্দমা হয়—Queen Empress *Versus* Harry Mohan Mythee I. L. R. 18 Cal 49, J. Wilson, July 1890. বিবরণে প্রকাশ যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হরিমোহন মাইতি নামে একজন

৩৫ বৎসর বয়স্ক বাঙালী তার এগারো বৎসর সাড়ে তিন মাস বয়স্কা স্ত্রীতে উপগত হয়। ফলে স্ত্রীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়ে সাড়ে তেরো ঘণ্টা পর তার মৃত্যু হয়। শুধু দেহ-যন্ত্রণা নয়, এ ধরনের সহবাসে পরিণতিও যে, কিছু ঘটতো—এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত। এছাড়া সমর্থার শিশু স্বামী বা বালক স্বামী বরণের দৃষ্টান্ত অথবা বৃদ্ধার তরুণ বা বালক স্বামী গ্রহণের দৃষ্টান্তও কৌলীন্যের পথ দিয়ে আমাদের সমাজে উপস্থিত হয়েছে। ক্ষেত্রমোহন ঘটকের লেখা "কামিনী" নাটকে (১৮৬৯ খৃঃ) উদয় যখন বলেন, ইংরেজ মহিলা অনেকেই বিয়ে করেন না, সেটা তাঁদের রুচি, চাপের দরকার হয় না।—তখন কেবলরাম বলে—"না পেলেই করব্যাক্ নাই, যেমন আমাদের শিবি বামনী। শিবীদের সমান ঘর মেল্যাক না বলে, লোকে মনে কল্লে, বুঝি ই যাত্রায় বিবাহ হলই না, মাতার চুল পেকে গ্যালো, অবশ্যাষকালে ভাগ্যিবলে শিবীর আইবুড়ো নাম ঘুচাতে পুব্ব্ দেশ হতে একটী বছর ইগারর ছেলে এলো. তাই তার বিয়ে হলো। আহা! সে বুড়ো বয়েসে ভাতার পেয়ে বত্তে গ্যালো, ছেলেটাকে মার মত যত্ন করতো পা ধুইয়ে দিত, বাতাস করতো সে যেন শিবীর গুরুপুত্তুর। বিটল্যা ছোঁড়ারা বল্‌ত, শিবী পুষ্যিপুত্তুর লিচ্যা তাই রাখ্, শিবী বাম্নী কবে ট্যার পাবে, লোকের গালাঘুসো স্বরু হইচে।"

উনবিংশ শতাব্দীতে অসম-বিবাহের বিরুদ্ধে অভিব্যক্ত দৃষ্টিকোণের সমর্থন-পুষ্টির মূলে সাংস্কৃতিক বলবত্তাও যথেষ্ট ছিলো। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাঁরা তাঁদের লেখনী ও কর্মকে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁরা বিধবাদের যৌবনের বুভুক্ষা বা প্রবৃত্তির বিন্দুমাত্র মূল্য দেন নি। অসম-বিবাহের বিরুদ্ধে অভিব্যক্ত দৃষ্টিকোণের মধ্যে বৃদ্ধের যে কামপরবশতা প্রকাশ করা হয়েছে—সেখানে প্রবৃত্তির মূল্যবোধ নিয়েই রক্ষণশীল গোষ্ঠীকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক আনুকূল্য যতোই থাকুক সমাজচিত্রের যৌন দিক থেকে অসম-বিবাহের যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে, এগুলোর অবকাশ অবাস্তব নয়।

অসম-বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত প্রহসনসমূহ থেকে কতকগুলো এখানে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। এগুলো অবশ্য মাত্রার আপেক্ষিকতা স্বীকার করে সমাজচিত্র বলে গ্রহণ করা যায়।

কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে (গরাণহাট—১৮৬৮ খৃঃ)[৪১]—সেখ আজিমদ্দী (কড়েয়া নিবাসী আজিমদ্দী প্রণীত?)॥ কেবলমাত্র কন্যাদায়-

৪১। দ্বিতীয় সংস্করণ।

মুক্তি নয়—অর্থলোভেও কন্যার মাতা-পিতা এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা আযোগ্যবিবাহে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। আর্থিক সমাজচিত্র প্রদর্শনীতে প্রহসনটির যথেষ্ট মূল্য থাকলেও যৌন দিকটিই পরিণামের দিক থেকে প্রধান হয়ে উঠেছে। হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ব্যক্তির দৃষ্টিকোণের দিক থেকে প্রহসনটির সমাজচিত্রগত মূল্য অস্বীকার করা যায় না। যদিও প্রথাস্বীকৃতি একে নিয়ন্ত্রিত করেছে, কিন্তু বিষয়বস্তুতে প্রথাস্বীকৃতির একটি অর্থ ব্যাপক সমর্থনপুষ্টি।

কাহিনী।—মৃত্যুপথগামী এক বুড়োর হঠাৎ বিবাহ বাসনা জাগে। তার প্রচুর বিষয়-আশয়। কিন্তু সে ভাবে, স্ত্রীই যদি না থাকে তাহলে শুধু বিষয়ের আনন্দে কি সুখ হবে! বুড়োর স্ত্রী অনেকদিন আগেই মারা গেছে।

অনেকদিন পর তার বেয়াইয়ের সঙ্গে দেখা। বেয়াইকে সে দুঃখ করে বলে যে, বাড়ীতে সে একা। মরবার আর বেশি দেরী নেই। মৃত্যুকালে কে তার মুখে জল তুলে দেবে! সুতরাং এ অবস্থায় তার বিয়ে করা উচিত। বেয়াই তাই শুনে বাড়ীতে এসে বুড়ীকে বলে যে, বেয়াই বিয়ে করতে চায়। বুড়ী বলে—"যমদূতে যে বুড়োর ঘাড় ধৃত করিয়াছে কেবল ভাঙ্গিতেই বাকী রাখিয়াছে তাহার বিবাহ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, যেমত ব্যঙ্গের গায় জ্বর ও কুম্ভীরের সন্নিপাত।"

সব কিছু শোনবার জন্যে বেয়ান বিয়ে-পাগলা বুড়োর কাছে যায়। বুড়ো বলে, "এ বয়েসে অপরালয়ে গমনাগমনের অযোগ্য হইয়াছি। লোকে দেখিলে সহজেই মন্দ বলিবেক।" বুড়ীর মনে সন্দেহ জাগে। সে বলে—"তুমি এ বয়েসে বিবাহ করে বর্ণতাকে কি আমার স্বামিকে দিয়ে যাবে, তাই বুঝি দুই বেহাই যুক্তি স্থির করিয়াছ।" ঝাঁটা নিয়ে বুড়ী বুড়ো বেয়াইকে মারবার ভয় দেখায়। বুড়ীকে প্রসন্ন করবার জন্যে তখন বিয়ে-পাগলা বুড়ো বলে, "এ বিয়েতে বুড়ো নতুন বৌকে যে গয়না পরাবে, বেয়ানকেও তাই একপ্রস্থ দেবে।" গয়নার লোভে বুড়ী বেয়ান ভাবে—তা মন্দ কী! অলঙ্কার যদি দেয় দিক্ না।

বুড়ী তখন উদ্‌যোগ করে অর্থলোভী এক গৃহস্থের রূপসী ষোড়শী কন্যা সৌদামিনীর সঙ্গে বুড়ো বেয়াইয়ের বিয়ে দেয়। সৌদামিনী ভাবে বিয়ে করা মানে বিধবা হওয়া—এর চেয়ে কুমারী থাকা বরং ভালো। সে কান্নাকাটি করে। কিন্তু এক হাজার সোনার মোহর পণ দিয়ে কনেকে বুড়ো বিয়ে করে নিয়ে যায়।

শয্যায় বুড়ো কনেকে স্পর্শ করতে গেলে সে সর্বাঙ্গে কাপড় ঢেকে পড়ে

থাকে মড়ার মতো। বুড়ো অনেক সাধ্যসাধনা করেও শেষে ব্যর্থ হয়। এইভাবে দিন যায়।

কিন্তু বুড়ো কিছুদিন পরই মারা গেলো ! এক ব্যবসায়ী পুত্রের সঙ্গে বুড়োর বৌ সৌদামিনী ভ্রষ্টা হলো।

"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" (কলিকাতা—১৮৭৪ খৃঃ)—অজ্ঞাত ॥৪২ নামকরণটী একটি বিখ্যাত প্রবচনের অংশ। প্রবচনে বলা হয়েছে,—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥ ন দদাতি ন বা ভুঙ্‌ক্তে কৃপণোহি ধনং সদা। কিন্তু স্পৃশতি হস্তাভ্যাং দিব্য স্ত্রীমান্ যথা জরন্॥" মলাটে প্রহসনকার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।—

"সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্ত ষট্‌পদা,
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ॥

শ্লোকটির সাহায্যে লেখক উদ্দেশ্যের দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। পরিণতিতে রাজীবের বক্তব্যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। রাজীব বলেছে,—"আমি এতদিনে জান্‌লেম যে—

…"তরুণী তরুণ সনে মনোল্লাসে বয়।
বৃদ্ধ সনে রসরঙ্গে মত্ত নাহি হয়॥
সমতার বিপরীত যথা দৃষ্টি হয়।
প্রকৃত প্রণয় নাহি জানিবে নিশ্চয়॥"

কাহিনী।—মণিরামপুরের জমিদার রাজীব গাঙ্গুলী বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে তরুণী হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করেছে। কথায় বলে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। রাজীব স্ত্রীর কথায় উচ্ছ্বসিত, স্ত্রী বলতে অজ্ঞান। সে বলে,—"স্ত্রীরত্নং মহাধনং, স্ত্রী মাথার শিরোমণি, পরমপূজ্য দেবতা, অত বড় সামগ্রী কি আর জগতে আছে? ধন সোনা ওর কাছে কোন্‌ছার।" প্রতিবেশী রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাকে বুঝিয়ে বলে, কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়—"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।" এ বয়সে বিয়ে করে রাজীব ভাল করে নি। এ কথায় রাজীব চটে গিয়ে যুক্তি দেখায়। বলে, "যার পুত্র নাই, তাকে অন্তে নিরয়গামী হতে হয়, কথায় বলে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন—জান্‌লে কী না!" রামকান্ত তার যুক্তির অসারতা দেখিয়ে বলে, পুত্র নেই বটে, তবে দৌহিত্র সকলেই তো

৪২। যোড়াসাঁকো নববঙ্গ নাট্যশালা থেকে প্রকাশিত।

বর্তমান। শেষে রাজীব বলে,—"ভায়া যখন আমার অসময় হবে তখন আমার সেবা করে কে?" মনুসংহিতার শ্লোক দেখিয়ে প্রমাণ করে দেয় যে তার বিয়ে যুক্তিযুক্তই হয়েছে। এমন কি বিদ্যাসাগর-বিরোধী পণ্ডিত তর্কবাচস্পতিও নাকি তাকে সমর্থন করেন।

রাজীবের প্রচুর অর্থ। স্ত্রীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সে অকাতরে অর্থব্যয় করে, কিন্তু পরোপকার বা সৎকার্যের কথায় সে বিমুখ। মণিরামপুরে একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সে বলে—"কি জান এখানকার ছেলেপিলে বড় ব্যাদ্‌ড়া, দুপাত্‌ ইংরেজী শিখে হিন্দুধর্মটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে বসে। সেইজন্য আমি ইস্কুল ফিস্কুল বড় ভালবাসিনে।" কন্যাদায়গ্রস্ত এক ভদ্রলোকও প্রত্যাশিত অর্থে বঞ্চিত হয়। এক কথায় রাজীবের অর্থব্যয় তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই।

রামকান্তের কিন্তু এ ধরনের আদেখোতা ভালো লাগে না। বিশেষ করে সে জানে রাজীবের স্ত্রী ভ্রষ্টা। রামকান্ত এ ব্যাপার নিয়ে রাজীবকে ইঙ্গিত দিলে রাজীব বলে সে তার স্বামীভক্তির অভাব দেখে না। রামকান্ত মন্তব্য করে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। তারপর সবকথা প্রকাশ করে। বলে, গ্রামের দুইটি যুবকের সঙ্গে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক আছে। তাদের অন্তঃপুরে ডেকে নিয়ে সে গুপ্তভাবে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করে। রাজীব চোখে অন্ধকার দেখে, তারপর জমিদারী রাগ দেখায়, বলে, "কোন শালা এ অপকলঙ্ক রটালে? আমি তাকে দেখ্‌বো, সে রাজীব গাঙ্গুলীকে চেনে না; জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ।" রামকান্ত তাকে থামিয়ে বোঝায় যে, সত্যিই হোক বা মিথ্যেই হোক এ কথা রাষ্ট্র হলে নিজেরই ক্ষতি। রাজীব আপাততঃ নিরস্ত হয়, কিন্তু ভাবে দাসী ফুলমণিরই এই কাজ। "বেটীর রীতচরিত্র ভাল নয়, বেটীর রকমটাও ছেনাল ছেনাল, প্রেয়সীর যদি ভালমন্দ হোয়ে থাকে, সে ও বেটী হোতেই হয়েছে।"

ফুলমণি হেমাঙ্গিনীর বাপের বাড়ীর ঝি। তাকে দেখে রাজীব রাগের মাথায় গালাগালি করে ফেলে হঠাৎ ভীত হয়ে বলে, "দেখ বাছা, তোমার দিদিবাবুকে একথা বোলো না, আমি তোমায় মেঠাই খেতে কিঞ্চিৎ দোবো।"

এদিকে গ্রাম্যযুবক প্রিয়নাথের সঙ্গে অন্তঃপুরে হেমাঙ্গিনী প্রেমালাপ চালায়। স্বামীকে হেমাঙ্গিনী অদ্ভুতভাবে বশ করেছে এ কৃতিত্বের কথা প্রিয়নাথ যখন ব্যক্ত করে, হেমাঙ্গিনী তখন বলে, "তিনি যদি মানুষ হোতেন, তাহলে কি

আর আমি পর ধোরে বেড়াই। যে মানুষ নয়, তাকে বশ করায় আর বাহাদুরি কি ?" অন্ত এক গ্রাম্য যুবক শ্যামাপদর সঙ্গেও হেমাঙ্গিনী ভ্রষ্টা। সে প্রিয়নাথেরই বন্ধু এবং গায়ক। হেমাঙ্গিনী যখন শ্যামাপদর অভাবের কথা প্রকাশ করে, তখন প্রিয়নাথ শ্যামাপদর ওপর হেমাঙ্গিনীর দরদ নিয়ে খোঁচা দেয়। হেমাঙ্গিনী চটে গিয়ে বলে, "আমি তো আর তোর ঘরের মাগ নই যে দাব্‌বি!" অবশেষে আপোষ হয়। প্রিয়নাথের অনুরোধে হেমাঙ্গিনী ধূমপান করে, ব্রাণ্ডি সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে আগ্রহ পোষণ করে। প্রিয়নাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব্রাণ্ডির প্রশংসা করে।

হঠাৎ রাজীবের পায়ের শব্দ ভেসে আসে। হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি প্রিয়নাথকে শাড়ী পরিয়ে ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোক সাজায়। রাজীব এলে বলে যে, এ তার ছোটবেলাকার সই। রাজীব দেখে, সইয়ের চেহারা বেশ বাড়ন্ত। অতি আগ্রহে রহস্যচ্ছলে রাজীব তার ঘোমটা খুল্‌তে গিয়ে অপদস্থ হয়। প্রিয়নাথ মেয়েলী গলায় বুঝিয়ে দেয় যে সমর্থ স্ত্রীলোকের প্রতি এমন আগ্রহ প্রকাশ পুরুষের পক্ষে অনুচিত। অবশেষে সইকে বিদায় দেবার নাম করে হেমাঙ্গিনী প্রিয়নাথকে বাইরে নিয়ে গিয়ে নিরাপদে ছেড়ে দেয়।

রাত্রে শয্যায় শুয়ে রাজীব অনেক ভণিতার পর হেমাঙ্গিনীকে বলে, "কি জান প্রিয়ে, এই লোকে বলে তুমি নাকি আমায় ভালবাস না।" সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনী কান্নাকাটি আরম্ভ করে। বলে, "আমি কালই বাপের বাড়ী চলে যাবো, যে তোমায় ভালবাসে তাকে নিয়ে থেকো।" অপ্রতিভ রাজীব আম্‌তা আম্‌তা করে বলে, "আমি কি লোকের কথায় বিশ্বাস করি, তবে রহস্যচ্ছলে বল্যেম।" কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কান্নাকাটি বন্ধ হয় না। রাজীব বলে, "আমি তোমার পায়ে হাদ্দে শপথ কচ্চি, আর তোমায় কিছু বল্‌বো না।" অবশেষে রতনচূড় দেবার প্রতিশ্রুতিতে কান্না বন্ধ হয়। কালই সে প্রজাদের তদারকে গিয়ে অর্থআদায় করে রতনচূড় গড়িয়ে দেবে।

আজ কর্তা বাড়ী থাকবে না। আজ হেমাঙ্গিনী প্রিয়নাথবাবুকে নিয়ে সারারাত আমোদ আহ্লাদ করবে। কথাটা রামকান্তের কানে দিয়ে ফেলে ফুলমণি। রামকান্তের ওপর ফুলমণির কিছুটা দুর্বলতা আছে। সে চায় রামকান্তও ফুলমণির ঘরে আজ আসুক। কারণ আজ নিশ্চিন্তমনে রাত্রিযাপন করা যাবে। রাজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী রামকান্তের কাছে হেমাঙ্গিনীর স্বৈরাচার খারাপ লাগে। সে কথা ফুলমণির কাছে প্রকাশ করলে ফুলমণি বলে—

"দিদি ঠাক্‌রুণের সমস্ত বয়েস, ভরা যৌবন, এখন তো ও সক হবেই, আর ঐ তো জরাজীর্ণ স্বামী, অমন স্বামী থাকায় আর না থাকায় সমান।" রামকান্ত হেমাঙ্গিনী সম্পর্কে আরও একটা কথা শোনে। সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকটি—রাজীববাবুর কাছে যিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি অর্থের আশায় রাজীববাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন। রাজীব তখন বাড়ীতে ছিলো না। হেমাঙ্গিনী তাকে চুপি চুপি ডেকে বলে, রাত্রে তিনি যদি খিড়কীর দ্বার দিয়ে ভেতরে এসে হেমাঙ্গিনীর কাম পরিতৃপ্ত ঘটান তাহলে হেমাঙ্গিনী তাঁকে ১০০ টাকা দেবে। বিদেশী ভদ্রলোক ভয়ে সেখানে আর যান নি।

রাজীব যাতে স্বচক্ষে স্ত্রীর কাণ্ড সব দেখে, রামকান্ত তার ব্যবস্থা করে! রাজীবকে সে সব কথা খুলে বলে। রাজীব প্রজাদের তদারকে যাওয়া স্থগিত রাখে। পরিচিত দারোগা কনষ্টেবলকেও খবর দেওয়া হয়।

এদিকে হেমাঙ্গিনী ভাবে,—"পুরুষ চোর, আর স্ত্রী ভ্রষ্টা বড় বদ্‌নাম। তা কি করবো, স্বামীই সর্ব্বস্ব ধন ; স্বামী যদি মানুষ হোতেন তাহলে কি একাজে প্রবৃত্ত হোতে পারি?...স্ত্রীলোকের কি মন নাই ইন্দ্রিয় নাই!"

নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি প্রিয়নাথ ও শ্যামাপদ আসে। ঠাট্টা ইয়ারকি চলে। প্রিয়নাথ কোঁচড়ের ভেতর থেকে ব্রাণ্ডির বোতল বার করে। গতদিন হেমাঙ্গিনী ব্রাণ্ডির প্রশংসা শুনেছে। আজ সে চাখতে চায়। কিন্তু চাখতে গিয়ে বমি করে ফেলে সে। অবসন্ন হেমাঙ্গিনী প্রিয়নাথের কোলে মাথা রেখে শোয়। ক্রমে মাদকতা সুরু হয়। হেমাঙ্গিনী প্রিয়নাথকে বলে,—"প্রিয়নাথ রে তুই যদি আমার ভাতার হতিস্।" প্রিয়নাথ সান্ত্বনা দেয়—"পতি আর উপপতি, কেবল দুটো অক্ষরের তফাৎ বৈ তো নয়!" সে কথা দেয় হেমাঙ্গিনীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করবে। আকর্ষণ চুম্বনাদির সময়ে হেমাঙ্গিনী কলকাতায় যাবার জন্যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করলে প্রিয়নাথ বলে, বুড়ো মরলে রাজত্ব রাজকন্যা দুইই মিলবে, নিষ্কণ্টকভাবে ভোগসুখ হবে।

ইতিমধ্যে দারোগারা নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করে। শ্যামাপদ পালাতে গেলে হেমাঙ্গিনী বারণ করে, বলে, এতে আরো প্রহার জুটবে। হেমাঙ্গিনী বীরদর্পে কনষ্টেবলদের সামনে দাঁড়িয়ে অন্তঃপুরে ঢোকবার কৈফিয়ৎ চায়। কনষ্টেবল বলে যে, চোর গ্রেফ্‌তার করবার জন্যে তারা এসেছে। হেমাঙ্গিনী চোটপাট্‌করে। এদিকে মত্ত প্রিয়নাথ কনষ্টেবলকে কামড়িয়ে দেয়। দারোগা বলে, কর্ত্তার হুকুমেই তারা অন্তঃপুরে ঢুকেছে। এমন সময় রাজীব প্রবেশ করে।

রাজীবকে দেখে হেমাঙ্গিনী তাকে নগ্ন ভাষায় গালাগালি করে। রাজীব আমৃতা আমৃতা করে। তারপর দারোগাকে সাধাসাধি করে—"উনি বড়ো অভিমানিনী—ওঁকে কিছু বোলো না।" দারোগাদের হেমাঙ্গিনী বলে, ঘরে যে দুজন আছে, তারা স্বামীর পরিচিত। তারপর হেমাঙ্গিনী এই মিথ্যা কথাটি স্বামীকে দিয়ে সমর্থন করাবার জন্যে স্বামীর দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকায়। রাজীব হঠাৎ বলে ফেলে—"এদের সে চেনে না।" হতাশ হেমাঙ্গিনী স্বামীকে "কালামুখো সপুরীখেগো" বলে গালিগালাজ করে। শেষে দারোগার কাছে হেমাঙ্গিনী পরিচয় দেয় শ্যামাপদ তার গুরুপুত্র এবং প্রিয়নাথ তার ভিক্ষাপুত্র। তাই শুনে রাজীব কাঁদতে কাঁদতে হেমাঙ্গিনীর পদতলে পড়ে বলে,—"প্রেয়সী —তোর মনে কি এই ছিল! আমি কি দোষ করেছি—রে—আমি কি তো-মা-র—তেজ্য—পু—*।" পদতলেই রাজীব মূর্চ্ছা যায়।

ওদিকে দারোগা শ্যামাপদ ও প্রিয়নাথকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যায়।

সাধের বিয়ে (ঢাকা—১৮৭৩ খৃঃ)—ফেলুনারায়ণ শীল। অসম-বিবাহের হাস্যকর দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করলেও লেখকের উদ্দেশ্য এবং প্রচার-প্রবণতা অনেকটা গৌণ। তবে এই প্রচ্ছন্নতা ভেদ করে আমরা লেখকের যে দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করি, তা অসম-বিবাহের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত।

কাহিনী।—বৃদ্ধ নীলকণ্ঠবাবু বৈঠকখানায় বসে চাকরকে তামাক আনবার জন্যে ডাকেন। চাকরের নাম মঙ্গলা। মঙ্গলা এলে নীলকান্ত তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন বাবুটাবু এসেছিলো কি না। চাকর অত্যন্ত নির্বোধ। সে বুঝতে না পেরে বলে, 'টাবুবাবু' নামে কেউ আসে নি। নীলকান্ত তখন তাকে জ্ঞান দেয়,—"আরে শালা পাটনাইয়ে মেড়া, এগুল একটা কথার কথা।...... যেমন মা-টা, বাপ-টাপ, হাতী-টাতি, বাগুন-টাগুন—" এভাবে বুঝিয়ে না বললে চাকর কিছু বোঝে না। একবার এক বাবু নীলকান্তর খোঁজ করেছিলো। নীলকান্ত তখন ছিলেন পায়খানায়। সেই বাবুটিকে মঙ্গলা বলেছিলো, "বাবু পাকানে গেছেন।" নীলকান্তকে সংবাদ দেবার জন্যে মঙ্গলা পায়খানার মধ্যে গিয়ে ডেকেছিলো। চাকরের এতো বোকামি সত্ত্বেও নীলকান্ত যে ছাড়েন না, তার কারণ আছে। চাকরটা মাসে পাঁচ টাকা মাইনে পেলেও তা নীলকান্তর কাছেই জমা থাকে। শুধু দুই বেলা খাওয়ার খরচ তাঁকে দিতে হয়। যা হোক, মঙ্গলা চাকরকে তিনি তাঁর বিয়ে করবার ইচ্ছে জানালেন। মঙ্গলা জবাব দেয় শাদী করবে কাকে—লেড়কা না লেড়কীকে? এমন সময় নীলকান্তর বন্ধু

প্যারী আর হারাণ আসে। হারাণ জিজ্ঞাসা করে জান্তে পারে যে, নীলকান্তর সঙ্গে সোনাতলের মেয়ের বিয়ে হবে। মেয়েটা নাকি "ট্যাব্‌রা"। নীলকান্ত বলেন,—"এমন ট্যাব্‌রা কি, মেয়ে মানুষ শীঘ্র কুলে যাবে।" নীলকান্তর কাছে এই সময় প্রতিবেশী নবীন আর শিরীষ পড়া বুঝতে এসেছিলো। নীলকান্ত শিরীষকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর সঙ্গে পশুর তফাৎ কতোখানি? হনুমান দেখ্‌তে কেমন? শিরীষ জবাব দেয়, নীলকান্তর সঙ্গে পশুর তফাৎ শুধু একটু লেজের এবং দেখতে ঠিক হনুমানেরই মতো। "এমনি কাল, হাত দুটি এমনি লম্বা লম্বা, কিন্তু তোমার লেজ নাই, উহার লেজ আছে।" এমন সময় নবীনদের চাকর রাত হয়েছে বলে এদের ডেকে নিয়ে যায়।

নীলকান্তর বিধবা বোন চম্পক। সে তার ভাই নীলকান্তর বিবাহ দিয়ে তার সংসার স্থিত করবে বলে ঠিক করেছে। নীলকান্তকেও বিয়ের কথা বলেছে। নীলকান্ত তাকে বলেছে,—"বিয়ে থায়ের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না, কেন না ৬০/৬৫ বৎসর বয়েস হোয়েছে, এত দিনই গেল, আর এখন বিয়ে দিয়ে কি হবে? তা দিতে চাও দাও আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না।" চম্পকের সঙ্গে প্রতিবেশিনী সৌদামিনী আর কামিনীও ছিলো। সবাইকেই নীলকান্ত এই কথা বললেন।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে নীলকান্ত বিয়ে করে। পুরুতরা দক্ষিণা নিয়ে চলে যায়। তারপর বাসরঘর। বাসরঘরে বর কন্যা, নীলকান্তর শালী রমাসুন্দরী, সৌদামিনী, কামিনী, যামিনী ইত্যাদি নীলকান্তকে ঘিরে ধরে আছে। রমা উমাকে একবারটি কোলে নেবার জন্যে নীলকান্তকে অনুরোধ করে। দেখে সে চোখ সার্থক করবে। কনেকে আদর করে বর নীলকান্ত, "ধন আমার, লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, কোলে এস" বলে ডাকে। কনে উমা বয়েসে ছোটো। প্রথমে বসতে চায় না। তারপর সকলের আদেশে বসে। নীলকান্ত নিজেকে ধন্য মনে করে। কামিনী নীলকান্তকে জানায়, শাশুড়ী না এলেও ওপাশ থেকে নাকি জানিয়েছেন, "বাবা আমার বেঁচে থাকুন, ছেলে-পিলে হউক।" একথা শুনে নীলকান্ত শাশুড়ীর ওপরে চটে যায়। শাশুড়ী গালাগাল দিচ্ছে ভেবে নীলকান্ত বলে,—"আমার ছোটবেলায় একবার পিলে হইয়েছিল, তাতে যে ভোগোন ভুগেছি, সে কেবল আমিই জানি।" কামিনী, যামিনী—এরা সবাই বরকে খুব রসিক মনে করে।

কনের মা বরকনে দেখতে এসে তাদের কোলে নিতে চাইলেন। তারা কোলে বসলে তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করতে সুরু করেন। নীলকান্ত সবাইকে গান শোনাতে চাইলে সবাই সম্মতি দেয়। নীলকান্ত তখন গান গায়,—"পার কর গৌরাঙ্গ, তরঙ্গ মাঝারে" ইত্যাদি। গানের পর সবাই বরের সঙ্গে কনের মিলের সুখ্যাতি করে। বরের একটু বয়েস হয়েছে যে, তাও মানতে চায় না এরা। রমা, যামিনী, কামিনী -সবাই ভাগ্যের কথাই বলে। এদের ভাগ্যও তেমনি। যামিনী দুঃখ করে বলে, বুড়ো তবু ভাল, কিন্তু তার ভাগ্যে পড়েছে শিশুস্বামী। সে "অধিক রাত্রে উঠে বলে মুত্তে নিয়ে যা।" কামিনী বলে,

"সেও বরং ভাল,
গোদার কপালে পড়ে মোর প্রাণটা গেল।
রাত হোলে গোদা পা চাপিয়ে দেয় ঘাড়ে।
ঘুমাতে না পারি বুন গোদা পায়ের ভরে।"

আবার সৌদামিনীরও স্বামী শিশু। সৌদামিনী বলে,—

"সেও বরং ভাল,
ছেলে-ভাতারের কপালে পড়ে মোর প্রাণটা গেল।
অধিক রাত্রে উঠে বলে দুধ খাব মা!"

যামিনী মন্তব্য করে,—সবাইকার ভাতারেরই এক না এক গুণ আছে। যা হোক বর কনেকে শুতে দিয়ে এরা চলে যায়।

এবার নীলকান্ত কনেকে একা পেয়ে বলেন,—"আমার শালি না শালি, যেন রূপের ডালি আর কি. তা আমারটাও মন্দ নয়, বড় হোলে আরও ভাল হবে।" কনেকে কোনো কথা বলতে না দেখে নীলকান্ত তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। তিনি বলেন,—"প্রাণেশ্বরি তুমি আমার জমিদারি, তুমি আমার নয়নতারা, তুমি আমার ভগবতী, তুমি আমার স্বর্গের দেবতা, তুমি যদি মান কোরে থাক, তবে আমি এস্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করব। তুমি আমার কোলে বস, আমার শরীর শীতল হউক।" এই বলে নীলকান্ত তাকে কোলে নেন। নীলকান্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, "যে অবধি তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েছে, সে অবধি আমি তোমার চিন্তানলে দগ্ধ হচ্চি, আজ তুমি আমার সে চিন্তা নির্ব্বাণ কল্লে।" এইভাবে অনেক কথা বলার পর কনে বলে যে, তার বড়ো ঘুম আসছে, আর থাকতে পারছে না। নীলকান্ত তখন বলেন,—

প্রাণেশ্বরি, তোমার ঘুম আসচে, তবে আমারও ঘুম আসচে, চল শুই গে। বর কনে দুজন শুতে যায়।

আক্কেল গুড়ুম বা কুলের প্রদীপ প্রহসন (কলিকাতা—১৮৮২ খৃঃ)—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়॥ অসম-বিবাহে স্ত্রী-পক্ষের যৌনবঞ্চনাপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি রচিত। যে বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করে পুরুষপক্ষ অসম-বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, অসম-বিবাহের কুপরিণাম দর্শনে সেই বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে বিপর্যয় আসে। নামকরণ অসম-বিবাহে প্রবৃত্ত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিকে কটাক্ষ করেছে। কটাক্ষিত ব্যক্তি পরিশেষে আক্কেল লাভের পর মন্তব্য করেছে,—"এবার অবধি ছেলেপুলে হলে বিবাহের সময় আগে উভয়ের মনের মিল দেখে বিবাহ দেবো আর এই প্রথা যেন আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়…।"

কাহিনী।—পদ্মনাথ গুণালঙ্কার একজন কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বসন্ত বর্তমান। তাছাড়া তাঁর মাতঙ্গিনী নামে একটা সেবাদাসীও আছে। স্ত্রীর সঙ্গে পদ্মনাথের দাম্পত্য-সদ্ভাব নেই। কারণ তাঁর যৌবন গত হয়েছে আর তাঁর স্ত্রীও বয়সে তরুণী। পদ্মনাথ নরেন নামে একটি ছেলেকে ঘরে রেখে পালন করতেন! কিন্তু বসন্তের সঙ্গে নরেনের মেলামেশা তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেন। অথচ নরেনের সঙ্গে প্রথমে যে সম্পর্ক ছিলো, তা নির্মল। সেবাদাসী মাতঙ্গিনী নিজের কার্যসিদ্ধি করবার জন্যে এই সন্দেহ বাড়িয়ে তোলে। কয়েকদিন নরেনের সঙ্গে বসন্তের রসিকতা আড়াল থেকে মাতঙ্গিনী পদ্মনাথকে দেখায়। কয়েকটি উক্তিকে প্রেমালাপ বলে ভুল করেন পদ্মনাথ। বসন্ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,—"বসন্ত আমার বারাঙ্গনা সতী।"

পদ্মনাথের স্ত্রী এবং সেবাদাসী থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তিনি পতিতালয়ে যান। কমলা নামে একজন বেশ্যা ছিলো। এর বাড়ীতেই পদ্মনাথের যাতায়াত আছে। পালিত পুত্র নরেনও অবশ্য মাঝে মাঝে সেখানে যেতো। কমলার কাছে একদিন পদ্মনাথ খুব জব্দ হন। ঘটনাটি ঘটে নরেনের সম্মুখে। "আমি নিকশকুলীন কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, আমার নাম শ্রীপদ্ম"—এই বলে বাইরের থেকে পদ্মনাথ এসে কমলাকে দরজা খুলতে বলে। তখন কমলা নরেনের সঙ্গে আলাপ করছিলো। কমলা নরেনকে তাড়াতাড়ি করে স্ত্রী সাজিয়ে ফেলে। পদ্মনাথ ঢুকলে তার কাছে ঘোমটা পরা নরেনকে ছোটবৌ বলে পরিচয় দেয়। ছোটবৌকে দেখে পদ্মনাথ পুলকিত হন। আগে

পদ্মনাথের গোঁফ ছিলো। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বসন্তের অপছন্দ বলে সেটা কেটে ফেলেছেন। কিন্তু এখন কমলা বলে, ছোটবৌ গোঁফওয়ালা পুরুষ পছন্দ করে। এই বলে সে পদ্মনাথের মুখে গোঁফ এঁকে দেয়। ছোটবৌ টিকি পছন্দ করে না বলে কমলা তাঁর টিকিও কেটে দেয়। নরেনও গোপনে গোপনে এতে সহায়তা করে আনন্দ পাচ্ছিলো। পদ্মনাথের মাথায় সিঁদুর হলুদ দেবারও ব্যবস্থা হয়। পদ্মনাথ ফলার খেতে চাইলে ফলার দেওয়া হয়। তিনি কিছুটা পুঁটলিতে বেঁধে নেন। ফলারের পর প্রাপ্য দক্ষিণা পিঠের ওপর দেওয়া হয়। প্রহারের চোটে ব্রাহ্মণ কাঁদতে আরম্ভ করেন। কমলা বলে,—"কি করবো ভাই, আমাদের এখানকার এই দক্ষিণা, এই যিনি সয়ে থাকতে পারলেন, তিনিই থেকে গেলেন।" নরেন পদ্মনাথকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়, বলে,—"বল কমলা তোমার মা।" পদ্মনাথ বলে ওঠেন,—"কমলাকে মা বলা দূরে থাক, আমি তোমার নিকট শপথ করে বলছি, সোনাগাছি, মেছোবাজার প্রভৃতি যে যে স্থানে এই মহামায়াদের মন্দির আছে, সে সকলই আমার মা।" রেহাই পেয়ে পালাতে পালাতে পদ্মনাথ মন্তব্য করেন,—"বেশ্যার বাটী যারা যান, ধন্য তাঁদের শরীর।"

বেশ্যাবাড়ী যাওয়া তাঁর বন্ধ হয় বটে, কিন্তু এদিকে নরেনকে বিদায় নিতে হয়। নরেন অভিমানের সঙ্গে বিদায় নেয়। বসন্ত এতে মর্মাহত হয়। কারণ নরেনের সাহচর্যে এসে তার প্রতি বসন্তের একটা মায়া পড়ে গেছিলো। বসন্ত ভাবে,—"এমন বরাৎ করে এসেছিলাম, যে একদিনের জন্য সুখী হতে পারলেম না, বাবা কুল বজায় রাখবার জন্য এই গুণ-পুরুষের হাতে দিয়েছেন।" এমন সময় মাতঙ্গিনী আসে। তার কাছে দুঃখ করে বসন্ত বলে, "নরেন চলে যাওয়ায় তার মনটা হু হু করছে।" পদ্মনাথ কথাটা আড়াল থেকে শুনে ভেতরে ঢুকে পড়েন। বসন্তকে তিরস্কার করেন এবং মাতঙ্গিনীকে কুটনী বলে গালাগাল করেন। বসন্ত কাঁদতে থাকে। এমন সময় শিরোমণি পদ্মনাথকে ডাকতে এলে পদ্মনাথ তাঁকে অনুযোগ করেন,—তিনি নাকি ভদ্রলোকের মেয়ে বলে বসন্তের সঙ্গে পদ্মনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন। বসন্তকে সর্বস্ব দিয়েও সন্তুষ্ট করতে পারা গেলো না। লজ্জা-সরম ভুলে বসন্ত তখন কেঁদে কেঁদে বলে ওঠে,—"না বলেও থাকতে পারি না—না রুইলে কি চাষ হয়? দেখতে পাবে, যখন ফল ফলবে, তখন তোমার পোড়ার মুখ কোন চুলোয় লুকোবে।" মিথ্যা অপবাদে কাঁদতে কাঁদতে বসন্ত চলে যায়।

পদ্মনাথের আক্কেল গুড়ুম। যে সন্তানের মতো—তার সঙ্গে প্রেম—একি সম্ভবপর! অবশেষে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন। "ভালবাসা যার তার সঙ্গে হয় না, উভয়ের মনের মিল না হলে ভালবাসা হয় না, এবার অবধি ছেলেপুলে হলে বিবাহের সময় আগে উভয়ের মনের মিল দেখে বিবাহ দেবো।" আক্কেল পাবার পর পদ্মনাথ বসন্তের কাছে গিয়ে মান ভাঙান এবং সোহাগ দেখান। বসন্তের ওপর তিনি কতোটা ভুল করেছিলেন, সেটা এবার তিনি বুঝতে পেরেছেন। আদর করে তিনি বসন্তকে "কুলের প্রদীপ" বলে ডাকেন।

বুড়ো বাঁদর (কলিকাতা—১৮৯৩ খৃঃ)—অতুলকৃষ্ণ মিত্র॥ বৈকল্পিক ইংরাজী নাম The old cuckold. মলাটে কবিতায় দীনবন্ধু মিত্রের একটি ছড়ার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।—

"বুড়ো বয়সে বিয়ে করা
আপনা হতে জ্যান্ত মরা।"

বাংলায় 'বাঁদরামি' শব্দটির প্রচলন আছে। এর মধ্যে বুদ্ধিহীনতা এবং ভুষ্প্রবণতার একত্র সমাবেশ থাকে। লেখকের দৃষ্টিকোণ নামকরণের মধ্যে যথেষ্ট পরিচয় রেখে গেছে।

কাহিনী :—ষাঁড়েশ্বর কলকাতায় থাকেন। তাঁর দুই স্ত্রী—বড গিন্নি ও পুঁটে গিন্নি। পুঁটে গিন্নিকে তিনি বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছেন। বুড়োর নিজের দুর্বলতা আছে, তাই তিনি পুঁটে গিন্নিকে যুবকদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চান। বুড়োর এই নিষেধেই পুঁটে গিন্নির মনে স্বৈরাচার বাসনা জাগে। সে যুবকদের দেখে ইসারা ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করে।

এদিকে ষাঁড়েশ্বর শুধু পাড়া বদলান—পাড়ার যুবকদের ভয়ে। ষাঁড়েশ্বরের রাগ, বুড়োর বৌ দেখে সবাই ভাব জমাতে আসে। নতুন পাড়ার প্রতিবেশী যুবক হরিদাস ষাঁড়েশ্বরের সঙ্গে আলাপ করতে এলে ষাঁড়েশ্বর বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাঁর ধারণা তাঁর স্ত্রীর আকর্ষণেই হরিদাস সামাজিকতা করছে। ষাঁড়েশ্বরের বয়স ষাট। তাঁর অন্দরে ষোল-সতেরো বছরের একটি মেয়েকে ঘুরতে দেখে হরিদাস জিজ্ঞাসা করে, এটা কি তার মেয়ে। ষাঁড়েশ্বর চটে বলে ওঠে,—মেয়ে হোক, দ্বিতীয় পক্ষের বৌ হোক, তার অত মাথা ব্যথা কেন! হরিদাস উপদেশ দেয় বুড়ো বয়সে দ্বিতীয় বিয়ে করা উচিত হয় নি। ষাঁড়েশ্বর বলে,—"যা খুসী তা করেছি, তোমার কি!" হরিদাস তখন উপদেশ দেয়,—পাড়ায় কেলেঙ্কারী হবার ভয়, ষাঁড়েশ্বর যেন তাঁর অন্দর এঁটে রাখেন।

কেননা বাইরের পথের যত পুরুষ, বালক, যুবক—যে যায় তার হাতের কাছে পানের খিলি ফুলের তোড়া ইত্যাদি পড়ে। কিছু ইঙ্গিতও নাকি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যায়। ষাঁড়েশ্বর "ছোটলোকের পাড়া" বলে গালাগালি দেন। যাহোক, হরিদাস তাঁকে সাবধান করে দেয়।

বড় গিন্নি পুঁটে গিন্নির সতীন। কাজেই পুঁটে গিন্নির নিন্দায় সন্তুষ্ট। কেননা পুঁটে গিন্নি বলতে স্বামী তার অজ্ঞান। তবে ছোট গিন্নিকে হাতে নাতে ধরে একদিন ঝাঁটাপেটা করবার সুযোগ সে খোঁজে। পুঁটে গিন্নি এলে বড় গিন্নি তাকে ওসব কথা তুলে গালাগালি দেয়। পুঁটে গিন্নি বলে,—সে যা চাইছে, তাই পাচ্ছে, বরং বড় গিন্নিই স্বামীর কাছে লাথি ঝাঁটা খায়। তারই বার হয়ে যাওয়া উচিত। ঝগড়া বেধে যায়। শেষে বড় গিন্নি প্রস্থান করে। পুঁটে গিন্নির সঙ্গে ষাঁড়েশ্বরের দেখা হলে ষাঁড়েশ্বর তার নামে মৃদুভাবে অভিযোগ আনলে পুঁটে গিন্নি বাপের বাড়ী যাবার ভয় দেখায়। ষাঁড়েশ্বর চুপ করে যান।

ষাঁড়েশ্বরের চোখে অবশ্য অনেক কিছুই অসহ্য লেগেছে। বড় গিন্নির কাছেও। পুঁটে গিন্নি বিকেল বেলায় গা খুলে ঘুরে বেড়ায়। কিছু বললে সে বলে—গরম পড়েছে। ভগ্নীপতির সঙ্গে যেমন হাসিঠাট্টা করে, সেটা কম দৃষ্টিকটু নয়। স্কুলের ছেলে—তার খুড়তুতো ভাই খোকাকে পানের খিলি দেওয়ার অর্থও একেবারে ইঙ্গিত বহন করে না, তা বলা চলে না।

যে হরিদাস ষাঁড়েশ্বরকে একদিন সাবধান হতে বলেছিলো, তার সঙ্গেই অবশেষে পুঁটে গিন্নি অবৈধ ঘনিষ্ঠতা গোপনে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। অবশ্য পুঁটের পক্ষ থেকেই আগ্রহটা বেশি। হরিদাস বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী নলিনী একদিন হরিদাসকে লেখা পুঁটের একটা প্রেমপত্র আবিষ্কার করে। একদিন নলিনী নাকি পুঁটে গিন্নিকে ইসারা করতেও দেখেছে হরিদাসের দিকে। হরিদাসের বোন অর্থাৎ নলিনীর ননদ হরিদাসী একথা শুনে বলে,— "ভাতারের কাছে মেনিমুখো হয়ে থাকলে হয় না, শক্ত ও জেদী হতে হয়। হরিদাস এলে স্ত্রী নলিনী কিছুক্ষণ অভিমানের ভান দেখিয়ে শেষে চিঠির সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চায়। হরিদাস বলে, সে ইচ্ছে করেই চিঠিটা ফেলে গেছে। ইসারাও সে জানে। স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে যখন কিছু করছে না, তখন তাকে লম্পট বলা যেতে পারে না।

হরিদাসী আর নলিনী তুজনে মিলে পুঁটে গিন্নিকে জব্দ করবার উপায় চিন্তা

করে। শেষে পুঁটে গিন্নিকে হরিদাসের বাগানবাড়ীতে আসবার জন্যে বলা হয়। হরিদাসীই হরিদাসের ছদ্মবেশ ধারণ করে। যমজ ভাইবোনের চেহারার সাদৃশ্যে ছদ্মবেশ ধরা কঠিন হয়। পুঁটে গিন্নি এসে হরিদাসীকে হরিদাস মনে করেই তার সঙ্গে আলাপ করে। স্মৃতি রোমন্থনের ভাব দেখিয়ে পুঁটেকে জেরা করে হরিদাসের লাম্পট্যের সম্পর্কে কিছু সংবাদ পেতে চেষ্টা করে। তারপর পুঁটে গিন্নীকে প্রত্যাখ্যান করে। হরিদাসী বলে,—পুঁটে বেশ্যা, তাছাড়া—তাকে নিয়ে তার সখ মিটেছে। লম্পট মানুষের সখ মিটলেই আর বিশেষ বেশ্যাটির প্রয়োজন হয় না। হরিদাস প্রত্যাখ্যান করেছে ভেবে পুঁটে মনে আঘাত পায়। প্ল্যান অনুযায়ী ইতিমধ্যে নলিনীও এসে পড়ে। হরিদাসের স্ত্রী পরিচয়ে সে পুঁটেকে মারতে যায়,—কেন তার স্বামীকে নষ্ট করছে! পুঁটে হরিদাসীকে অনুনয় করে—খিড়কী দিয়ে তাকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে। হরিদাসী বলে, "মেগের কথাই শোনা উচিত খানকীর কথার চেয়ে।"

বড় গিন্নি ও ষাঁড়েশ্বরও এসে পড়েন। এঁদেরও খবর পাঠানো হয়েছিলো। নলিনী আর হরিদাসী চলে যায়। বড় গিন্নি পুঁটেকে গালাগালি দেয়। কিন্তু ষাঁড়েশ্বর পুঁটেকে আদর করেন। বলেন,—"তুই যে আমার কোলজোড়া পুঁটে বউ! আমার সঙ্গে চ! তোর বেরিয়ে আসা, পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটান, সব ভুলে যাব।"

সব শেষে আসল হরিদাস এসে পড়ে। হরিদাস ষাঁড়েশ্বরকে বলে, পুঁটে পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটায় নি। পুরুষটি তারই বোন হরিদাসী। সব কথা খুলে বললো ষাঁড়েশ্বরকে। তারপর বললো, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই এ কাজ করেছেন। ষাঁড়েশ্বরের যেমন বিয়ে করাই অন্যায় হয়েছে, তেমনি তাঁর স্ত্রীর এরকম চাপল্যও ক্ষমা করা যায় না।

যখন প্রমাণিত হলো পুঁটে অসতী হয় নি, তখন ষাঁড়েশ্বরের ধড়ে প্রাণ এলো। নিজের ভুলও তিনি বুঝতে পারলেন।

ষষ্ঠি বাঁটা প্রহসন—(কলিকাতা—১৮৮৭ খৃঃ)—প্রফুল্লনলিনী দাসী। দৃষ্টিকোণ অস্পষ্ট হলেও অসম-বিবাহের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রত্যক্ষতা অনুভূত হয়। প্রহসনের একস্থানে রাধামোহনের উক্তিতে আছে,—"মেয়ে—তার আবার মনোমত আর অমনোমত; যাতে তাতে ঘর থেকে বার কোত্তে পাল্লেই হোলো।" কিন্তু মৃত্যুপথগামিনী চারুশীলার উক্তি—"আমার এই

বর্তমান অবস্থা দেখে সতর্ক হোতে যত্নবান্ হবেন, যেন কেহ কন্যাকে অর্থের লোভে অপাত্রে প্রদান না করেন।" দাম্পত্য অংশীদারদের মধ্যে কেবল বয়সের পার্থক্য নয়, সংস্কৃতিগত পার্থক্যও বিবাহের অযোগ্যতা নির্দেশ করে। লেখিকার (?) দৃষ্টিকোণ সাংস্কৃতিক পার্থক্যের দিকটি অবলম্বন করে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

কাহিনী।—হরনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুই মেয়ে—কুমুদিনী ও চারুশীলা—দুজনকেই তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কুমুদিনীর বিবাহ দিয়েছেন চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে প্রেসিডেন্সী কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে। চন্দ্রকুমার ধীরবুদ্ধি সম্পন্ন। একবার ওয়েব সাহেব ক্লাসে ছাত্রদের অপমান করলে, সব ছাত্র বেরিয়ে যায় কিন্তু চন্দ্রকুমার বেরোয় নি। সেকথা উঠলে চন্দ্রকুমার বলে,—যা ইংরেজ ছাত্রদের মানায়, বাঙালীর তা মানায় না।

কুমুদিনী বাপের বাড়ীতেই থাকে এখন। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে, বান্ধবীদের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করে। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তারা নাকি খৃষ্টানদের চেয়েও বেশি চলাচ্ছে! বান্ধবী নলিনী বলে, "আচার্য মশাই অমন লোক হয়েও এরূপ কেলেঙ্কার কোচ্চেন কেন! কৈ ভাই, দেওয়ানজি মশাই তো এমন কখন করেন নি।" কুমুদিনী মন্তব্য করে,—ওরা জীবিত থাকতে দেশের উপকার নেই।

কুমুদিনী এবং কুমুদিনীর স্বামী দুইই শিক্ষিত। সুতরাং হরনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ যোগ্যে যোগ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। হরনাথও এ বিবাহ দিয়ে তৃপ্ত।

এবার তিনি কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ের সম্পর্ক স্থির করেন। পাত্র একজন ব্যাকরণের তীর্থ। হরনাথের বন্ধু শরৎবাবু মন্তব্য করেন—লেখাপড়া জানা মেয়েকে ইংরাজী পড়া বর না দিয়ে ব্যাকরণ পড়া এনে সর্ব্বনাশ করলে কেন!" অপর এক বন্ধু রাধামোহন সেকথা শুনে চটে যান। বলেন,—"মেয়ে—তার আবার মনোমত আর অমনোমত! যাতে তাতে ঘর থেকে বার কোত্তে পাল্লেই হোলো। ওগুলো জন্মো কেবল চিরকালটা বাপমাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে বৈ ত নয়। ওদের সঙ্গে কেবল খাওয়ার আর নেওয়ার সম্পর্ক। বেটীর শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় বাপের বাড়ীর ঝাঁটাগাছটা নিয়ে যেতে পাল্লেও ছাড়ে না।···মেয়ের বিয়ে দেওয়া কুটম্ব ঘরটী ভালো হলেই হোলো, যাতে লোকের কাছে মুখ উজ্জল হয়।" যাহোক, পাত্রপক্ষ চারুশীলাকে দেখে যান। রাধামোহনই বিয়ের দিন ঠিক করে দিলেন—তেরোই আষাঢ়।

চারুশীলা অকূলে পড়ে। সে অপর এক পুরুষের আসক্তা। "আমি যখন মনে মনে একজনকে পতিত্বে বরণ কোরেছি ;—যখন আমি দেহ, মন, জীবন যৌবন সমস্তই সেই চরণে সমর্পণ কোরেছি তখন আবার অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ কোর্ব্বো ?" বান্ধবী নীরদবালা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অবশেষে চারুশীলা বিষপান করে জ্বালা জুড়োয়। মৃত্যুকালে বলে যায়,— "আমার এই বর্ত্তমান অবস্থা দেখে সতর্ক হোতে যত্নবান্ হবেন, যেন কেহ কন্যাকে অর্থের লোভে অসৎপাত্রে প্রদান না করেন।" সকলের অলক্ষ্যে চারুশীলা তার শয়ন ঘরে পড়ে রইলো।

সেদিন জামাই ষষ্ঠীর রাত্রি। সকলে জামাইকে নিয়ে ব্যস্ত। হরনাথের স্ত্রী কলকাতার লোক হয়েও, কেনা মিষ্টি না দিয়ে নিজে হাতে মিষ্টি করেছেন। কুমুদিনীর বান্ধবীরাও আসে। জামাইয়ের ঘরে তারা চন্দ্রকুমারের সঙ্গে রসিকতা করে। বুদ্ধিমান চন্দ্রকুমারও তদনুযায়ী প্রত্যুত্তর দেয়। প্রচুর আদিরসাত্মক গান হয়। যোগ্য বিবাহের জন্যে সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। অবশেষে রাত শেষ হলে চন্দ্রকুমার কলকাতায় রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন।

অযোগ্য পরিণয় (কলিকাতা ১৮৮০ খৃঃ)—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য॥ অসম-বিবাহের দুইটি দিককে কেন্দ্র করে এটি রচনা—একটি, বৃদ্ধের তরুণী বিবাহ, অন্যটি, যুবতীর শিশু বিবাহ। প্রহসনের শেষে দর্শকদের উদ্দেশ করে বিপিন বলেছে,—"সভ্য মহাশয়গণ! আপনারা অযোগ্য পরিণয়ের দুটি উদাহরণ দেখলেন,—একটি বাল্য-বিবাহ আর একটি বার্ধক্য-বিবাহ। এদের বিষময় পরিণাম দেখে আপনারা কি সাবধান হবেন না? এই দুটি কারণে আমাদের সমাজে কত অনিষ্ট হচ্ছে তা বোধ হয় আপনাদের অবিদিত নাই। অতএব আপনারা কায়মনোযত্নে সমাজক্ষেত্র হতে এই বিষবৃক্ষ দুটি উন্মূলিত করে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করুন। আজ আপনাদের কাছে এই শেষ অনুরোধ।" গভর্ণমেণ্টের সমর্থনলাভের ইচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে কোথাও কোথাও। যেমন নলিনীর উক্তিতে—"সমাজের এ সকল কু-নিয়ম কি উপায়ে দেশ থেকে দূর হয়। আমি দেখ্‌ছি, গবর্ণমেণ্টের হাত না পড়লে কিছুতেই কিছু হবে না!"

কাহিনী।—নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ। তার প্রথমা স্ত্রী গত হতে না হতেই—তিন মাসও হয় নি—নন্দদুলাল বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। "যেন বুড়ো বয়েসে ওঁকে ভূতে পেয়েছে!—দিবে রাত্তির কেবল

বিয়ে বিয়ে করে পাগল! এক অর্থপিশাচ ব্রাহ্মণ শিরোমণি একটি কন্যার ব্যবস্থা করে কিছু লাভের চেষ্টায় থাকে। শিরোমণি যে কন্যাটির কথা চিন্তা করেছে, মেয়েটির নাম শুক্লতা। মেয়েটির সঙ্গে নলিন নামে পাড়ার একটি যুবকের অনেকদিনের ভালবাসা। বুড়োর সঙ্গে বিয়েতে মায়ের মত নেই, কিন্তু মেয়ের বাপ অর্থপিশাচ। নন্দদুলালও টাকার লোভ দেখিয়েছে। এই-ভাবে বিয়ের ব্যবস্থা হয়। নলিন বিপিনের কাছে খেদ করে বলে,—"দেখ দেখি, দেশের কি কুপ্রথা—সমাজের কি কু-নিয়ম—অর্থের কি অনর্থকরী শক্তি। যার সঙ্গে পরস্পর বয়সের মিল হলো, মনের মিল হলো, তাকে বঞ্চিত করে কিনা পিতামহের তুল্য বৃদ্ধ বরের হস্তে সেই কুসুমকুমারী বালিকাকে সমর্পণ কর্ত্তে উদ্যত!" বিপিনের কাছে নলিন আর একটি সংবাদ পায়—শিরোমণি তাঁর শিশুপুত্রকে এক যুবতীর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন। নন্দদুলাল ও শিরোমণির সঙ্গে নলিন-বিপিনের দেখা হয়। শিরোমণির শিশুপুত্র কেনারামের বিয়ের ব্যাপারে কটাক্ষ করে নলিন বলে—"আপনি আপনার নাবালক ছেলের একটি ধেড়ে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন, তা সেই বৌটির কি আপনার দুধের গোপালকে মানুষ করে নিতে হবে না? ছি! আপনি এটা বড অন্যায় কাজ কচ্ছেন!" কিন্তু শিরোমণির কৈফিয়ৎ "আমার এই শেষ দশা, কবে চোক উল্টোবো, এর পর আর ছেলের বিয়েটা হবে না!" বিপিন মন্তব্য করে—"ছেলের বিয়ে দিয়ে দিতে পালেই পিতামাতার একটা মহৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হয়! উঃ—কি কুপ্রথা!" নন্দদুলালকে তার বিয়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে নন্দদুলাল বলে—"না কর্ল্যে আমার চলে কেমন করে ভাই? আমার এই পীড়িত শরীর, কে সেবা শুশ্রূষা করে বল?" তখন যুবকদুজন এদের বিদ্রূপ করে। তখন এরাও রেগে যান। শিরোমণির শিশুপুত্র কেনারামের বিয়েতে আদৌ ইচ্ছে নেই। তার বন্ধুবান্ধবরা নাকি বলেছে—"তুই অতবড় বৌ নিয়ে কি করবি? তোর বাবাকে দিস্!" কিন্তু শিরোমণির আদেশ। বিপিন নন্দকে বলে, বুড়ো নন্দ যাকে বিয়ে করতে চলেছে, সে অন্য একজনকে ভালবাসে। নন্দ বলে, "বাঙ্গালীর ঘরে কে কবে কনের মন জেনে বিয়ে করে থাকে ভাই।" শিরোমণিও সেই সঙ্গে বলে, নন্দ আপনিই তাকে বশ করে নেবে। বিপিন মন্তব্য করে—"ওই জন্যেই তো আমাদের মধ্যে দাম্পত্য-সুখের এত অভাব, আর অধিকাংশ বিবাহের শেষ ফল বিষময় হয়।" শিরোমণি ও নন্দদুলাল এদের কথা কাণে তোলে না। তখন এরা শেষবারের মতো

সতর্ক করে দিয়ে চলে যায়। এদিকে নন্দ ভাবে—"আর যা হোক, এবার বাসর ঘরে সাধ পুরিয়ে আমোদটা কর্ত্তে হবে। রসিকতায় আমায় কেউ ঠকাতে পারবে না,—বিদ্যাসুন্দর, নিধুর টপ্পা, দাশুরায়ের পাঁচালী; এসব মুখস্ত করে ফেলিছি।"

বুড়ো নন্দদুলালের সঙ্গে তরুলতার এবং শিশু কেনারামের সঙ্গে কাঞ্চনমালার বিয়ে হয়ে যায়। তরুলতা আর কাঞ্চনমালা সমান দুঃখের দুঃখী,—তাই তারা দুজন বন্ধু হয়ে পড়ে। কাঞ্চন যখন তরুর স্বামীর প্রসঙ্গে বলে,—"দোষের মধ্যে এই একটু বুড়ো—তা এত গুণের মধ্যে অমন একটু দোষ সওয়া যায়!"

তখন তরু জবাব দেয়—"এক কলসী দুদে এক ফোটা গোচোনা পড়লে কলসী সুদ্ধ দুদ্ নষ্ট হয়! তা ভাই ওই যে একটী দোষ, ওতেই আমার সকল সুখ নষ্ট করেছে! এর চেয়ে যদি মনের মতন স্বামী পেয়ে সারাদিন খেটে দিনান্তে আদপেটা খেয়ে গাছতলায় বাস কর্ত্তে হতো, সেও পরম সুখ বলে মানতুম।" কাঞ্চন বলে তার শাশুড়ী ননদ এমন কি স্বামীও তাকে চব্বিশ ঘণ্টা গালাগালি করে। "এরা মায়ে ঝিয়ে ঠিক্ সেই জটিলে আর কুটিলে! দিনরাত কেবল আমার ছল খুঁজে বেড়ায়:—এই কোথায় দাঁড়ালুম, কি খেলুম, কার সঙ্গে কথা কইলুম, কেবল এই সন্ধান! দুঃখের কথা বল্‌বো কি ভাই? বল্‌তেও লজ্জা করে,—দুবেলা পেট ভরে খেতে দেয় না! শুতে গেলে বিছানায় জল ঢেলে দেয়! আর কেবল কলুর বলদের মত নাকে দড়ি দে সারাদিনটে খাটায়।" কাঞ্চন এসব কথা বল্‌ছে, এমন সময় কাঞ্চনের ননদ মেনকা অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে কাঞ্চনকে নিয়ে যায়। কাঞ্চন নাকি বসে বসে "পর্চ্চে পাড়ছে।" কাঞ্চন চলে যাবার পর বুড়োর নির্দেশে নাপ্তেবৌ তরুকে কামিয়ে যায়। নাপ্তেবৌর কাছে তরু দুঃখ করে—"বাহাত্তুরে কেশোরুগী ঘরে এলে কেশে কেশেই খুন। রাত্তিরে একটু ঘুমোবারও যো নেই! তার চেয়ে আমি একলা পড়ে থাকি সে ভাল।" নাপ্তেবৌ মন্তব্য করে—"মিছে নয়, তোমরা দুটিতে যখন পাশাপাশি দাঁড়াও, তখন দুজনকে ঠিক্ যেন ঠাকুরদাদা আর নাত্‌নী বলে বোদ্ হয়!" লজ্জিত হয়ে তরুলতা নলিনের জন্যে খেদ করে। নলিন তার জন্যে দেশান্তরী! এমন সময় বুড়ো নন্দদুলাল এসে রসে ডগমগ হয়ে তরুলতার চিবুক ধরে আদর করে বলে —"তরু! আমার তরু! আমার শুক্‌নো গাছের কচিপাতা! আমার অন্তকালের গঙ্গাজল!" বুড়ো তরুর চুল বেঁধে দিতে যায়। এমন সময় হঠাৎ

কাশির বেগ আসে। বুড়ো কেন ডাক্তার দেখায় না তার জবাবে বলে—“খক্-খক্-ও জোলো-খক্-খক্-খক্-কাশি, খক্-খক্-খক্-খক্-আপনি সার্-খক্-খক্-বে।” শেষে বসে পড়ে হাঁপাতে আরম্ভ করে। “খক্-খক্-খক্-এট্-বা-বাতাস! খক্-খক্-খক্ বড় হাঁপ-খক্-লেগেছে।” বুড়ো গায়ে এক বস্তা কাপড় জড়িয়ে ছিলো—যুবা সাজবার সখ! তরু মন্তব্য করে—“এমন অদেষ্টও করে এসেছিলুম।”

শিরোমণির বাড়ীতে কেনারাম পড়ছিলো আর পাখীর ছানা পাড়বার প্ল্যান আঁটছিলো। সেসময় শাশুড়ী আর ননদ বাইরে ছিলো। কাঞ্চন চুপি চুপি ঘরে ঢোকে এবং তাকে একটা পান খেতে দিতে চায়। পানটা সে নিজে সেজে এনেছে। কেনা বলে, “দিদি যে তোর পান খেতে মানা করে দেছে!—তোর পানে ওষুধ দেওয়া!” দিদিকে কেনা ডাকতে যায়। কাঞ্চন বলে, “না না তোমার পান খেয়ে কাজ নেই, তুমি চুপ কর।” তারপর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। কাঞ্চন বলে—“দেখ ভাই, লোকে বৌকে কত ভালবাসে; কিন্তু তুমি আমাকে দেখ্‌তে পার না! কৈ আর কেউ তো তোমার মত বৌকে মারে না, কি গাল দেয় না? তারা বৌয়ের কথা শোনে!—দেখেছো তো তোমার মা যা বলেন ঠাকুর তাই শোনেন। তুমি যদি আমাকে কিছু না বলো, তাহলে আমি তোমাকে কত জিনিস এনে দিই।” শিশু তার কথায় ভুলে যায়। শিশুকে অবাক্ করে কাঞ্চন বলে যে সে লেখাপড়াও জানে। অনেক বই এনে দেবে বাপের বাড়ীর থেকে। এই সব কথা চলছে এমন সময় ননদ মেনকা ঘরে ঢুকে এসব দেখে কাঞ্চনকে গালাগালি দেয়। কাঞ্চন নাকি কেনারামের কানে মন্তর দিচ্ছে। গিন্নি এসে মন্তব্য করে—“ওমা! এমন বেহায়া মেয়ে তো আমি বেক্ষাণ্ডে দেখিনি! ও কিনা স্বচ্ছন্দে বসে ভাতারের সঙ্গে গপ্প কচ্ছে। ওমা কি ঘেন্না! আমার এই তিন কাল গেছে এক কালে ঠেকেছে, তাঁর সঙ্গে চোকাচোকী কথা কইতে আজো আমার লজ্জা করে! অ্যাঁ এ কালে কালে হলো কি! কলি কিনা? কোথা থেকে এক বেবিস্তের মেয়ে ঘরে এনেছেন!” শিরোমণি আসেন! গিন্নির কাঞ্চনকে অকারণ গালাগালি করবার ব্যাপারে তিনি প্রতিবাদ করেন। এমন সময় নন্দদুলাল এক পরামর্শের জন্যে শিরোমণিকে নিয়ে যায়। নন্দদুলাল বাগান থেকে ফিরে এসে নাকি দেখেছে তার বৌ বিপিনের সঙ্গে গল্প করছে। এতোদিনেও স্ত্রীকে বশ করা গেলো না! শিরোমণি চলে গেলে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে

কাঞ্চনের ওপর মায়ে-ঝিয়ে মিলে নির্যাতন চালায়। কাঞ্চন বিষপান করে জ্বালা জুড়োয়।

গ্রামে এক সন্ন্যাসী এসেছেন। তরু অনুমান করে—এ সেই নলিন। নলিনের জন্যে তার কষ্ট হয়। মনে মনে বলে,—"কিন্তু নলিন, আমার মনের সুখ একদণ্ড তরেও নেই! আমি দিনরাত, তোমার জন্যই কাঁদি এবার তোমায় একবার দেখা পেলে, যাতে তোমার সঙ্গে আর বিচ্ছেদ না হয় তাই কর্ব্বো!" তরু সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নন্দদুলালের অনুমতি চায়। নন্দ আপত্তি করে। তখন তরুও অভিমান করে। নন্দ তখন তরুর হাত ধরে বলে,—"এই আবার অভিমান হলো! আ পাগ্‌লি! আমি কি যেতে নিষেধ কচ্ছি তবে কিনা তুমি গৃহস্থের বৌ, দুপুরবেলা—।" তরু বলে দুপুরবেলা পুরুষরা পথে বেরোয় না বলেই ঐ সময় সে বেরোতে চাইছে। নন্দও ইচ্ছে করলে যেতে পারে। শুনে নন্দ আঁৎকে ওঠে। খাবার পর দুপুরে ওঠবার শক্তি থাকে না তার। তরু তখন তাকে বোঝায়, আসলে সে বুড়োর কাশির ওষুধ আনবার জন্যেই যেতে চাইছে। আর তাছাড়া ছেলেপুলে হবার ওষুধও যদি পায়! নন্দ তখন খুশি হয়ে বলে ওঠে—"আর তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বলো, আমার গাত্তে একটু শক্তি হয়, এমন একটা ওষুদও যেন অবিশ্যি করে দেন।"

ইতিমধ্যে শিরোমণির বাড়ীতে হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে যায়। সেখানে কেনারাম আর শিরোমণির বৌকে পুলিশ বেঁধে ফেলেছে। অভিযোগ এই যে শিরোমণির বৌ তার মেয়ে আর ছেলের সঙ্গে যুক্তি করে বৌকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। শিরোমণি এই সময়ে নন্দদুলালের বাড়ী ছিলো। মেনকা পালিয়ে এসে শিরোমণিকে খবর দেয়। সারজন (সার্জেন্ট) আর জমাদার এসে শিরোমণি আর মেনকাকে ধরে। সারজন যখন মেনকাকে মারতে মারতে নিয়ে যায়, তখন মেনকার যন্ত্রণা দেখে তরু বিদ্রূপ করে বলে—"কেন—এখন অমন কর কেন?—দেখ দিকি মার কেমন লাগে।"

তরুলতা সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হয়। সন্ন্যাসী নলিনই। তরুলতা তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বলে। নলিন বলে, সে পরস্ত্রী। তরু তখন পুরোণো স্মৃতি জাগিয়ে তুলে বলে—"কে বলে আমি পরস্ত্রী? আমি যে তোমারি স্ত্রী!" নলিন যদি সন্ন্যাসীই হতে চায়, তাহলে তরুকেও সন্ন্যাসিনী করে তার সহযাত্রিণী করুক। নলিন তাকে পাপকার্য করতে বারণ করে।

সে বলে, তরুকে সে ভালবাসে—কিন্তু পাপ করতে পারবে না। নলিন ভাবে, কায়দা কৌশল করে তরুকে সে পতির কাছে রেখে আসবে। একজন মুটে এসব লক্ষ্য করছিলো। তার সন্দেহ হয়। ফকিরের সঙ্গে মেয়ে কেন! নলিনরা যখন চলে গেছে তখন নন্দদুলাল এসে কাব্য করে বিরহী বিরহী ভাষায় মুটের কাছে তরুর সন্ধান জিজ্ঞেস করে। অনেক পরে মুটে বুঝতে পারে, ততক্ষণে ব্রাহ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে! পয়সার লোভে মুটে তরুকে ধরতে ছুটে যায়। "তা বামন ঠাউর তো ওডারে ধত্তি কয়েলো? ধত্তি হলো, তা হলি বাওন ঠাউরির কাচে কিচু বাগাতি পারবো হনে!" মুটে হঠাৎ নলিনের কাছে তরুকে দেখতে পেয়ে টানাটানি করে। নলিন জোর করে তার হাত ছাড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে নন্দদুলালও এসে পড়ে। নন্দকে দেখে নলিন আশ্বস্ত হয়, কিন্তু তরু মন্তব্য করে—"হা কপাল! আবার সেই বুড়ো সব্বনেশের হাতে পড়লুম।" তরুকে 'ভগ্নী' সম্বোধন করে নলিন পালিয়ে যায়।—"তরু—ভগ্নী! তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে গৃহে যাও! আমার সঙ্গে এই জন্মের শোধ দেখা!" তরুর মনে স্বামীর প্রতি বিরক্তি আসে। তরু বলে—"আমি আর তোমার বাড়ী যাবো না, আমায় ছেড়ে দাও।" তখন বৈষ্ণবী মুটে ইত্যাদি তরুকে লুফে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিপিন তখন লাঠি হাতে এসে তরুকে আর নন্দদুলালকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিপিন তরুকে সতীত্ব শিক্ষা দেয়। তরুর মনও বদলে আসে। নন্দ বলে,—"ভাই বিপিন, আমারো আজি চোক্ ফুটেছে! আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, কেউ যেন আর বৃদ্ধ বয়েসে বিয়ে না করে!" শিরোমণির চোখ আগেই ফুটেছে। সে বলেছে,—"আমার এই দশা দেখে এখন থেকে লোকে যেন সাবধান হয়,—অল্প বয়সে যেন কেউ ছেলের বিয়ে না দেয়!"

অসম-বিবাহের কুফলকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি প্রহসন রচনার সন্ধান পাই। এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামান্যই জানা সম্ভবপর হয়েছে।—

কচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা (১৮৮৩ খৃঃ)—শম্ভুনাথ বিশ্বাস॥ একজন বৃদ্ধের একটি তরুণী স্ত্রী ছিলো। সে ব্যভিচারিণী হয়ে একটি উপপতি জুটিয়েছিলো। তার সঙ্গে তরুণীটি প্রায়ই মিলিত হতো। বৃদ্ধ তার প্রমাণ পেয়ে হাতেনাতে লোকটিকে ধরে ফেলবার জন্যে এবং শাস্তি দেবার জন্যে বার বার বুদ্ধি খাটায়। কিন্তু বৃদ্ধের স্ত্রী বার বার তার ফন্দী ভেস্তে দেয়।

মাগ সর্বস্ব (১৮৮৪ খৃঃ)—রামকানাই দাস (?)॥ একজন বাঙালীবাবু

বৃদ্ধবয়সে এক যুবতীকে বিয়ে করে অবশেষে তার দেহমন তারই সেবায় উৎসর্গ করে। যুবতী স্ত্রীর মন রাখবার জন্যে সে তার মা এবং বিধবা বোনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর একদিন সে সওদাগরী আপিসের তহবিল তছরূপ করে প্রচুর অর্থ এনে তা দিয়ে গয়না গড়িয়ে স্ত্রীকে উপহার দেয়। কিন্তু অবশেষে পুলিস এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

প্রহসনটিতে আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Calcutta Gazette (১৮৮৪ খৃঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন—"The work which is directed against the daily increasingly number of those Babus who give their wives undue authority and indulgence within the domestic circle, is written specially for the Calcutta stage."

বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায় না, অথচ নামকরণ নিশ্চিতভাবে বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয়, এ ধরনের কয়েকটি প্রহসনও আছে। যেমন,—**রাঙ্গা বৌয়ের গোদা ভাতার** (১৮৮৭ খৃঃ)—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ; **বানরের গলায় হীরার হার** (১৮৯১ খৃঃ)—হাজারিলাল দত্ত ;—ইত্যাদি। আরও হয়তো এ ধরনের প্রহসন আছে, কিন্তু সেগুলো উপস্থাপন করবার যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

বৃদ্ধের বিবাহ সাধে বাদ ॥ —

বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬ খৃঃ)—দীনবন্ধু মিত্র ॥ শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে প্রহসনটি উৎসর্গ করতে গিয়ে বলেছেন, এটা নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ। বৃদ্ধের বিবাহের অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যয়বোধেই তিনি প্রহসনটিকে নির্দোষ বলে অভিহিত করেছেন।

কাহিনী।—বৃদ্ধ রাজীব মুখুজ্যে বিশ্বনিন্দুক। কথায় কথায় লোকের জাত মারেন। দলাদলি করতেও তিনি ওস্তাদ—যদিও যমের দুয়োরে এসে পৌছিয়েছেন। "আর বৎসর বাগান বেচে দলাদলি করেছিল ; স্কুলে একটি পয়সা দিতে হলে বলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোথা হতে টাকা দেবো !" রাজীবের বয়স যখন ষাট, তখন তাঁর স্ত্রী মারা গেছে। কিন্তু আবার তাঁর বিয়ে করবার সখ। অথচ তাঁর যুবতী মেয়েটি অল্পবয়সে বিধবা হয়ে ঘরে দাসীর মতো খাটছে, তার বিয়ের কথা তুললে তিনি মারতে আসেন। স্কুল

ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে একবার বিধবাবিবাহ নিয়ে আলোচনা হলে তিনি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান। তখন ইন্‌স্পেক্টার বল্‌লেন, রাজীবের বুড়ো বয়সেও যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়, তাহলে রাজীবের মেয়ের মতো যুবতী বিধবাদের কি কোনও ইচ্ছা জাগতে পারে না। তাতে রাজীব ইন্‌স্পেক্টারকে অকথ্যভাবে গালাগালি করেন।

রাজীব বিয়ের চেষ্টা করেন নিজের। মেয়ে রামমণি এতে রেগে যায়। অবশ্য তার বিশ্বাস, তাঁর মতো বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে, এমন হৃদয়হীন মেয়ের বাপ ভূ-ভারতে নেই। যাহোক, রাজীব নিজের বয়স কমিয়ে প্রচার করবার চেষ্টা করে। কিন্তু বাদ সাধে পেঁচোর মা নামে এক বুড়ী ডোম্‌নী। তার তিনকুলে কেউ নেই। আছে কয়েকটা শুয়োর আর শুয়োর ছানা। সে এসে বলে—তার যখন এ গাঁয়ে অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিলো, তখন রাজীব কাছারিতে গোমস্তাগিরি করছেন। পেঁচোর মা রাজীবের আসল বয়স রটিয়ে দিচ্ছে বলে তিনি পেঁচোর মার নাম শুনলেই চটে ওঠেন।

ছেলেছোক্‌রারা রাজীবকে কম জ্বালাতন করে নি। একবার রাজীব যখন স্নান করে ফিরছেন, তখন অনেকগুলো কাগের ডিমের শাঁস একসঙ্গে রাজীবের গায়ে প্রাচীরের ওপাশ থেকে কে যেন ঢেলে দেয়। নামাবলী ঘাটে রেখে তিনি স্নান করছেন। কে যেন নামাবলীর মধ্যে পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি বেঁধে রেখে চলে যায়। এসব কাজের মূলে আছে ভুবন, নসি, রতা নাপ্‌তে ইত্যাদি কয়েকজন যুবক। এরা সকলেই একটা ব্যক্তিগত কারণে রাজীবের ওপর চটা। রাজীব বিশেষ করে রতাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারেন না। রতা নাপিত হয়েও—'ছোটলোক' হয়েও স্কুলে লেখাপড়া করে, এটা তাঁর সহ্য হয় না। পাড়ার ছোটো ছোটো ছেলেরা রাজীবকে দেখলেই বলে ওঠে—

বুড়ো বামনা বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

পেঁচোর মাকে সকলে রাজীবের কনে বলে ক্ষেপায়। পেঁচোর মার এতে মনে মনে খুব আনন্দ হয়। একদিন নাকি সে স্বপন দেখেছে, বুড়ো বামুনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে এবং পেঁচোর মা বামুনের কোলে নিজের বাচ্চা দিচ্ছে। স্বপন যদি সত্যি হয়, তাহলে ঠাকুরকে সে ন'কড়ার সিন্নি দেবে। রাজীব, বামুন, ডোম্‌নীর সঙ্গে কি করে বিয়ে হবে—একথা উঠলে ও বলে, "ডুম্‌নি বাম্‌নিতি তপাতটা কি? তোমরাও প্যাট্ জ্বলে উট্‌লি খাতি চাও, মোরাও

প্যাট্ জ্বলে উট্‌লি খাতি চাই ; তোমরাও গালাগালি দিলি আগ্ কর, মোরাও গালাগালি দিলি আগ্ করি।" রাজীবের মেয়ে রামমণি বলে—"আ বিটী পাগ্‌লি, বামুনের মর্য্যাদা জান না—বাবার গলায় একগাছ দড়ি আছে দেখ নি ?" পেঁচোর মা উত্তর দেয়,—"তিতে ডোমের এঁড়ে শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি আছে, মোর ধাড়ী শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি নেই, মোর ধাড়ীডের তো ছানা হতি লেগেচে।" পেঁচোর মার অকাট্য যুক্তিতে সবাই হার স্বীকার করে।

বিয়েপাগলাবুড়ো রাজীবকে জব্দ করবার জন্যে সকলে মিলে একটা বিরাট ফন্দি আঁটে। সেই অনুযায়ী এক ঘটক গিয়ে রাজীবের সঙ্গে দেখা করে। রাজীব তো আহ্লাদে আটখানা। ঘটককে জামাই-আদরে অভ্যর্থনা করে শুনলেন, একটি মেয়ে আছে—বিধবার একমাত্র মেয়ে, তেরো উৎরে চোদ্দোতে পা দিয়েছে। মেয়ের বাবা টাকা গয়না সবই রেখে গেছে। তবে মেয়ের 'স্ত্রী-সংস্কার' হয়েছে। ঘটক দোষ খণ্ডাবার জন্যে বলে, বয়স গুণে ওটা হয় নি ; আদুরে মেয়ে, পাঁচরকম ভালো খায়দায়, তাই ওটা হয়ে গেছে। রাজীব আরো উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তাইই-তো তিনি চান, তিনি তো আর বালক নন। ঘটকের সামনে হঠাৎ তাঁর মেয়ে এসে পড়লে রাজীব মেয়েকে ধমকিয়ে সরিয়ে দেন, পাছে মেয়ের বয়স দেখে ঘটক বরের বয়স জেনে ফেলে। অবশ্য ঘটক কি না জানে ! তবে ঘটক অভয় দেয়। কনে পক্ষকে ওসব কিছু বলা হবে না। তবে সে বলে, বিয়ের ব্যাপার গোপন রাখাই ভালো কারণ শত্রু অনেক। রাজীবকে সে ১০০ টাকা মজুত রাখতেও বলে। "আপনার বাড়ীতে কোন উদ্যোগ কত্তে হবে না, আপনি শনিবারে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাবেন, রবিবারের প্রাতে গৃহিণী লয়ে গৃহে প্রবেশ করবেন। কন্যাকর্ত্তারা মেয়ে নিয়ে দক্ষিণপাড়ায় রতন মজুমদারের বাগানে থাক্‌বেন।" ঘটক নিজের উপর রাজীবের সন্দেহ রাখতে দেয় না। "বৃদ্ধ লোককে লয়ে লোকে এমন কৌতুক বিয়ে দিয়ে থাকে এবং পাঁচটা দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে—আমার ভাবনা হচ্চে পাছে আপনি আপনার তনয়ার বাক্‌পটুতায় আমাকে সেইরূপ বিবাহের ঘটক বিবেচনা করেন—কেবল কনক-বাবুর অনুরোধে আমার এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া।" কনকবাবুকে রাজীব নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলেন। রাজীব ঘটককে অভয় দিলেন—"আমি কচি খোকা নই যে কারো পরামর্শে ভুল্‌বো, বিশেষ স্ত্রীলোকের কথায় আমি কখন কান দিই না।"

ইতিমধ্যে রাজীবের ওপর আর একটা শাস্তি হয়ে যায়। ভুবন নসী রতা —এরা সবাই একটা সোলার সাপের মুখে বাব্‌লার কাঁটা এঁটে তাই দিয়ে রাজীবকে ছোবল খাওয়ায়। রাজীব তখন শুয়ে শুয়ে কাল্পনিকভাবে কনের যৌবন আস্বাদন করছিলো। ভুবনরা জানলা দিয়েই এ ব্যবস্থাটা করে ফেলে। রামমণির চীৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। কুয়োর দড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান বেঁধে ফেলা হয়। যে রতা নাপ্‌তের ওপর রাজীবের এতো রাগ, এখন তারই ডাক পড়লো। গাঁয়েতে সে-ই একমাত্র ওঝা। তার বাবা তাকে মরবার আগে নাকি সব শিখিয়ে গেছে। রাজীব বলে—“বাবা রতন, তুমি শাপভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।” বিষ ঝাড়বার নাম করে নিজের হাতের তেলোয় মন্ত্র পড়ে মনের সাধ মিটিয়ে সে বুড়োকে চপেটাঘাত করে। শরীরে বিষ থাক্‌লে নাকি এতে ব্যথা লাগে না। রতা বলে,—“ঠিক করে বলো—যেন বিষ থাকতে লাগে বলে সর্ব্বনাশ কর না।” রাজীবের বাঁচবার ইচ্ছে খুব। তাই সামান্য বিষ থাকলেও যদি তিনি না বাঁচেন, তাই মার খেয়েও তিনি বল্‌তে বাধ্য হন—তাঁর লাগ্‌ছে না। মারতে মারতে রতার নিজেরই হাত জ্বলে যায়। শেষে সহকারী সকলের হাতের তেলোয় মন্ত্র পড়ে দেয়, তারা সকলে মিলে চড়চাপড় লাগায়। শেষে সহ্য করতে না পেরে রাজীব স্বীকার করেন, তাঁর লাগ্‌ছে। তখন রতার আদেশে তাঁকে “অপেয় জিনিস” ওষুধ বলে খাওয়ানো হলো। মাথায় দশ কলসী জল ঢালা হলো এবং অনাহারে রাখ্‌তে বলা হলো। বাঁচবার জন্যে রাজীব সব অত্যাচার সহ্য করলো।

শনিবারের দিন বাগানের আটচালায় ভুবন, নসীরাম, কেশব ইত্যাদি জড়ো হয়। অপরিচিত একটা লোককে তারা ঘটক সাজিয়েছিলো। এবার কেশব বড় ঠাকুরঝি, ভুবন কনেপক্ষের বেয়ান, নসীরাম শালাজ সাজে। রতা নাপ্‌তে নিজেই সাজে রাজীবের কনে। তাছাড়া আর চারজন লোককে, কনের কাকা, কনের মেসো, কনের দাদা আর পুরোহিত সাজানো হয়। স্থির হয়, বুড়ো যে টাকা দিয়েছে, সে টাকা তার মেয়ে দুটোকে ভাগ করে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে ঘটককে সঙ্গে নিয়ে বরবেশে বুড়ো রাজীব আসেন। কনের কাকা রাজীবকে দেখে বেঁকে বসেন—“সোনার চম্পক এই মড়ার হাড়ে অর্পণ

করবো, আমি তা পারবো না।" কনের দাদা বলে, কথা যখন দেওয়া হয়েছে, তখন বিয়ে দিতেই হবে। পুরোহিতও বলে,—"ছোটবাবুর সকলি অন্যায়।" রাজীব নিজের গুণকীর্তন করেন, বিশেষ করে অল্পবয়সী বলে প্রচার করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। বৈকুণ্ঠ নাপিত বুড়ো বরকে কোলে তুলে নিয়ে যেতে পারে না, শেষে ঘটকের সহায়তায় সে রাজীবকে চ্যাং দোলা করে ছাতনাতলায় নিয়ে যায়।

বিয়ে হয়ে গেছে। আটচালাতেই একটা কামরায় বাসরঘর করা হয়েছে। রাজীব ঘরে ঢুকে কনের পাশে বসে। বাসরে স্ত্রীর ছদ্মবেশী বালকরা সবাই রাজীবকে আমোদের নাম করে কান মলে দেয়। রাজীব গান গাইলেন—"মন মজরে হরিপদে।" সকলে চলে যায়। দরজা বন্ধ হয়। রাজীব কনের হাত ধরতে যান। কনেকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে নিজের চাবি কোমর থেকে খুলে দেন। বুড়ো বলে ঘৃণা করতে বারণ করেন। কনের মুখে রসের কথা শুনে রাজীব ভাবেন,—"আহা আহা এমন মেয়ে ত কখন দেখি নি, আমার কপালে এত সুখ ছিল, এতদ্দিন পরে জান্‌লেম, বুড়ো বিটী আমার মঙ্গলের জন্যে মরেচে, "বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে।" কনের হাত নিয়ে নিজের গালে ঠেকান। শেষে কনের কাছে রাজীব আব্দার জানান,—"সুন্দরি আমি একবার তোমার গা দেখ্‌বো।" কনে এতে আপত্তি করে বলে—তার দেহ স্বামীরই ধন, তবে তিনি আজ ক্ষান্ত দিন। রাজীব তার হাত ধরে টানাটানি করে। রাত পুইয়েছে বলে অজুহাত দেখিয়ে কনে বাইরে চলে যায়।

রাজীব বিয়ে করে বৌ নিয়ে নিজের বাড়ী ওঠেন। বৌ ঘোমটা দেওয়া। রাজীবের দুই মেয়ে—গৌরমণি এবং রামমণি। এতোদিন নিশ্চিন্ত ছিলো যে, বুড়োকে কেউ বিয়ে দেবে না। কিন্তু এবারে সামনে কনেকে দেখে তারা খেদ করে, আর ধিক্কার দেয়। ইতিমধ্যে পাড়ার কতকগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এসে রাজীবকে ক্ষেপাতে আরম্ভ করে—"বুড়ো বাম্‌না বোকা বর,—পেঁচোর মারে বিয়ে কর।" রাজীব বলেন—"দূর ব্যাটারা গর্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই ছ্যাখ্,"—বলে রাজীব কনের ঘোমটা খুলে দেন। গৌর বলে ওঠে—"ওমা এযে সত্যিই পেঁচোর মা, ওমা কি ঘৃণা কোথায় যাব—মাগীর গায় গহনা দেখ, যেন সোনার বেনেদের বউ!" শেষে পেঁচোর মা সবকথা প্রকাশ করে। ছুটো পরি নাকি এসে তাকে বলে, তার স্বপন ফলেছে, এখন

বিয়ে করতে চলুক, তাই বলে পেঁচোর মাকে নিয়ে আসে, গয়না পরায়, তারপর পাল্কীতে তুলে দিয়ে কথা বল্‌তে বারণ করে।

এদিকে পেঁচোর মাকে দেখে রাজীব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। পেঁচোর মা সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"কান্‌তি নেগ্‌লে ক্যান্‌, তোমার ছ্যালে কোলে কর।"—এই বলে কাপড়ের ভেতর থেকে একটা গয়না পরা শুয়োরের ছানা রাজীবের কোলে ফেলে দেয়। নেহাৎ মায়ায় পড়ে এটাকে না এনে সে থাকতে পারে নি। রাজীব রাগ করে ছানাটা রামমণির গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পেঁচোর মা তখন ছানাটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলে—"বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার কোলে গিইলে বাবা— কোলে নেলে না, আগ্‌ করে ফেলে দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে।" রাজীব রেগে চলে যায়। ইতিমধ্যে রতা নাপ্‌তে এসে সব কিছু খুলে বলে চাবি আর টাকার তোড়া রাজীবের দুই মেয়ের হাতে দেয়। রামমণি আর গৌরমণি মনে মনে খুব খুশি হয়—বাবার এইভাবে জব্দ হওয়াতে। রতা পেঁচোর মাকে কোনোরকমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যায়—হারাধন খুঁজে দেবে।

পশ্চিম প্রহসন (কলিকাতা ১৮৯২ খৃঃ)—কৃষ্ণবিহারী রায়॥[৪৩] প্রহসনটিতে প্রদত্ত ভূমিকাটি সমাজ চিত্রের মাত্রা নির্ধারণে যথেষ্ট মূল্যবান্। বৈশাখ, ১২৯৯ সাল—তারিখযুক্ত ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"...ইহার কোন অংশ কল্পনা প্রসূত নহে। পশ্চিম দেশীয় বাঙ্গালী সমাজে সময়ে সময়ে নানারূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই আখ্যায়িকা সেই ঘটনাপুঞ্জের অন্যতম শাখা অবলম্বন করিয়া লিখিত। বলা বাহুল্য যে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ পুস্তক লেখা হয় নাই।

এ পুস্তকের কেবল দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই "এ বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো, এ আবার পড়িব কি" বলিয়া যদি কেহ তাচ্ছল্যপূর্ব্বক পুস্তক পাঠ করিতে বিরত হয়েন, তাহা হইলে তিনি প্রতারিত হইবেন, কারণ ইতিহাস ও মাতামহীর রূপকথাতে যে প্রভেদ, আমাদের নায়ক ও 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'তে সেই প্রভেদ। লোভের সম্পূর্ণ বশীভূত হইলে মানুষ জ্ঞানান্ধ হইয়া অপদার্থ হইয়া যায়, আমাদের নায়ক তাহার জীবন্ত ও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।"

"এ পুস্তক পাঠ করিয়া লোভান্ধ ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।"

৪৩। হিউম প্রেস—নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রিত।

কাহিনী।—লক্ষ্মণ গ্রাম নিবাসী গবেন্দ্র ষাট বছরের বুড়ো। তার পিঠ কুঁজিয়ে গেছে। ছেলে নাতি সবাই আছে। কিন্তু তার হঠাৎ বিয়ের সখ জেগেছে। ছেলে সর্বেন্দ্র বিদেশে ওভারসিয়ারী করে, তার বয়েস তেত্রিশ। বুড়ী মরে যাওয়াতেই গবেন্দ্রের আবার বিয়ে করবার সাধ হয়েছে। মেয়েরা বলে,—"মাগ মরে গিয়ে অবধি মিনষে কেমন ছেমো-ছেমো হয়েছে।"

বুড়ো একা থাকে; সুতরাং পাড়ার লোকেরা নির্ভয়ে তাকে নাচায়। পাড়ার লোকে মিলে একটা ভুয়ো সম্বন্ধ স্থির করে। মানপুরের ঠিকেদার পদ্মনাথবাবুর তেরোবছরের মেয়ে কমলিনীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। "তারা ওরে পাঁচ হাজার টাকা, ঘড়ি, চেন, আংটি আর দান সামগ্রী দেবে। তারপর শ্বশুর মরে গেলে দশ লক্ষি টাকার বিষয়ও পাবে।" অর্থলোভী বিয়ে পাগ্‌লা গবেন্দ্র বুঝতে পারে না, সে যোগ্য পাত্র কিনা! কিন্তু পাড়ার সবার কাছে আহ্লাদের সঙ্গে একথা প্রচার করে বেড়ায়। বিয়ের দিন স্থির হয়েছে ১১ই শ্রাবণ।

সনাতন মুখোপাধ্যায় নামে গড়দহ গ্রামের কর্মচ্যুত তার-বাবু তাঁর প্রাপ্য টাকা উদ্ধারের আশায় লক্ষ্মণ গ্রামে আসেন। প্রায় সাড়ে তিনশো মতো টাকা তিনি পাবেন। লক্ষ্মণ গ্রামের প্রতিবেশীদের মনে দুষ্টবুদ্ধি খেলে। সনাতনবাবুকে শিখিয়ে পড়িয়ে গবেন্দ্রের বাসায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। সঙ্গে সাড়ে তিনশো টাকার পুঁটলিও।

এদিকে গবেন্দ্র তখন ভাবী জমিদারীর হিসেবের জন্যে খাতাপত্র কিনতে বল্‌ছে রমেশকে। রমেশ ঐ বাড়ীতেই থাকে। রমেশকে বলে তাকে সে শ্বশুরের কাছ থেকে পাওয়া জমিদারীর নায়েব করবে। মাইনে হবে ৭৫ টাকা—তাছাড়া উপরি তো আছেই।

এমন সময় প্রতিবেশী চূড়ামণির সঙ্গে সনাতনবাবু গবেন্দ্রের বাসায় প্রবেশ করেন। গবেন্দ্রকে চূড়ামণি বলেন, মানপুরে যদি সুবিধা না হয়, আর একটা সম্বন্ধ আছে। সনাতন বানিয়ে বানিয়ে বলেন, তিনি গবেন্দ্রের স্বজাতি——পদবী সরকার। তাঁর দুটি মেয়ে আছে, একটির বয়েস চোদ্দ, অপরটির বারো। যেটি পছন্দ হয় বিয়ে করতে পারেন। গবেন্দ্র তখন বলে,—"কথাটা স্পষ্ট করে বল্‌তে গেলে রূঢ় শোনায়, মনে মনে একটু বিবেচনা কল্লেই বুঝতে পারবেন আমার মনোগত ভাবটা কি?" পাত্র কর্তার মনোগতভাব যে কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি অতি সহজেই বুঝতে পারেন। সনাতনবাবুও বুঝলেন।

তিনি বল্‌লেন, তিনি গরিব মানুষ। সামান্য এই তিনশো টাকা জমিয়েছেন। টাকার পুঁট্‌লিটা তিনি দেখালেন। গবেন্দ্র দোটানায় পড়েন। একদিকে হাতের মুঠোয় টাকা, অন্যদিকে দশলক্ষ টাকার বিষয়ের আশা। শেষে গবেন্দ্র আশাকেই দাম দেয়। গবেন্দ্র এ বিয়েতে অসম্মতি জানায়। চূড়ামণি ও সনাতন চলে যায়। তবে প্রতিবেশীরা গবেন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পারে।

তারপর প্রতিবেশী চিত্তহরণ আসে আরেকটি সম্বন্ধ নিয়ে। কুঁক্‌ড়োগাছার গোলোক সরকারের মেয়ে। মেয়ের বয়েস সাড়ে বারো। রং অবশ্য খুব ফর্সা নয়, কিন্তু দেবে-থোবে ভালো। "গহনাতে আর টাকাতে হাজার পাচেক টাকা দেবে, এ ছাড়া তোমাকে হীরের আঙটী, সোনার হার, সোনার ঘড়ি ও সোনার চেন বরাভরণও দেবে।" চিত্তহরণ বলে, এ সম্বন্ধটাই রাখা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তহরণ গোলোক সরকারের নামে বিবাহের প্রস্তাব জানিয়ে চিঠি লেখে। বলা বাহুল্য গোলোক সরকার একটা কল্পিত নাম। এদিকে গবেন্দ্র নিজের ইচ্ছায় মণ কয়েক খরমুজো ঝুড়ি ভরতি করে কুঁক্‌ড়োগাছার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। তারা পেয়ে আহ্লাদ করবে। অবশ্য হাওড়া ষ্টেশনে সেগুলো অনেকদিন বেওয়ারিশ থেকে পচে যায়।

সুরনাথ নামে একজন ভদ্রলোক ভাগ্যান্বেষণে নিঃসম্বল অবস্থায় মানপুর থেকে লক্ষ্মণ গ্রামে আসেন। এখানে কিছুদিন থেকে তিনি চাকরীর চেষ্টা করবেন। কিন্তু অর্থ নেই, কার বাড়ীতে কে রাখবে কতোদিন? হঠাৎ প্রতিবেশীদের মাথায় আবার দুষ্টবুদ্ধি গজিয়ে ওঠে। সুরনাথকে ঘটক সাজিয়ে কয়েকজন প্রতিবেশী তাঁকে গবেন্দ্রের বাড়ীতে নিয়ে যায়। বলে, ইনি মানপুর থেকে এসেছেন গবেন্দ্রের গায়ে-হলুদ দিতে।

গবেন্দ্র সুরনাথকে পেয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তাকে জামাই-আদরে রাখে। গবেন্দ্র নিজের ঘরের মেঝেয় কম্বলে শুয়ে সুরনাথকে খাটে শোওয়ায়। সুরনাথ বিব্রত বোধ করলে, গবেন্দ্র বলে,—"আমাকে মাপ্‌ করুন, আপনি আমার গুরুর গুরু।" গবেন্দ্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর কাছে হবু শ্বশুরবাড়ীর খবর জান্‌তে চায়। তিনিও যথাসাধ্য বানিয়ে বানিয়ে বলেন। নির্দিষ্ট দিনে সবাই মিলে গবেন্দ্রের গায়ে-হলুদ দেয়। একটা ভাঙা কুলোর ওপর বরণের উপকরণের সঙ্গে একপাটি জুতোও রাখা হয়। হাতে সুতো বেঁধে দিয়ে ঘটক বলেন, যেন এটা না খোলা হয়। একটা যাঁতি হাতে দিয়ে বলা হয়, এটা

যেন হাতছাড়া না হয়। গবেন্দ্র ঘটককে আহ্লাদে প্রাপ্যাতিরিক্ত দক্ষিণা দেয়। যাঁতি হাতে করেই গবেন্দ্র অফিসে যায়, পাছে বিয়ে ফস্কে যায়। অথচ সাহেবের অফিসের ৪৫ টাকা মাইনের চাকরিটাও রাখতে হয়।

গবেন্দ্রের ইচ্ছে মানপুর বা কুঁক্ড়োগাছা যে কোনো একটা বিয়ে হলেই হলো। চিত্তহরণের কাছে কুঁক্ড়োগাছার বিয়ের সম্বন্ধে সম্মতি দিয়েও মানপুরের জন্যে গায়ে হলুদ কেন দিলো—চিত্তহরণ তার কৈফিয়ৎ চাইলে গবেন্দ্র বলে,—"আসল কথাটা কি জান, দুটোই হাতে রাখ্‌ছি, শেষটা যেটা লেগে যায়।" গবেন্দ্র কুঁক্ড়োগাছার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলে চিত্তহরণ বলে, কনের মাতামহ মারা গেছে। শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হলে বিশ্বেশ্বরপুরীতে নিয়ে গিয়ে তারা মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। গবেন্দ্রকে বলে, এ মাসের মাইনে আর কিছু ঘরোয়া জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় করে নিয়ে তাকে বিশ্বেশ্বরপুরীতে যেতে হবে।

গবেন্দ্রের টাকায় চিত্তহরণ বিশ্বেশ্বরপুরীতে বেড়ায়। শুধু খাবার সময় আসে, অন্য সময় থাকে না। "হরদাদা কেবল আহারের সময় বাসায় আসেন, তারপর যে কোথায় যান কিছুই বলেন না।" চিত্তহরণ টাকা খেয়ে অন্যত্র সম্বন্ধ স্থির করছে না তো? গবেন্দ্রের মনে নানা সন্দেহ হয়। চিত্তহরণের কাছে অবশেষে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে চিন্তিত মুখে চিত্তহরণ বলে,—আসেনি তো—দেখা যাক্। শেষে অধৈর্য গবেন্দ্রকে কুঁক্ড়োগাছার ঠিকানা দিয়ে দেয় —কোন্‌দিক দিয়ে কোথায় যেতে হবে না হবে—সবকিছু। গবেন্দ্র একাই কুঁক্ড়োগাছায় পা বাড়ায়।

এক গৃহস্থের বাড়ীতে থেকে সেখানে এক হপ্তা ধরে অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু গোলোক সরকার নামে কাউকে খুঁজে পায় না। আশায় আশায় ফেরার ভাড়াটুকুও অনুসন্ধানের পেছনে খরচ করে ফেলে পুত্র সর্বেন্দ্রকে চিঠি লেখে অবস্থা জানিয়ে। পুত্র সর্বেন্দ্র এসে ২০ টাকা দিয়ে যায়। তবে ধিক্কার দেয় পিতাকে। তবু গবেন্দ্র আরো দুয়েকদিন অনুসন্ধান চালায় সেই টাকা সম্বল করে। শেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

অবশেষে একদিন মানপুরের বিয়ের দিন আসে। মানপুরের এক ভদ্রলোক শৈলেশ্বর বাবুর সঙ্গে প্রতিবেশীদের আগেই চুক্তি করা ছিলো। গবেন্দ্র সেজেগুজে সেখানে বিয়ে করতে যায়। বরযাত্রী আসে নি। সকলেই এক-একটা ওজর নিয়ে সরে পড়েছে। গবেন্দ্রকে দিয়ে শৈলেশ্বরবাবু বিয়ের

অনুষ্ঠান বলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করান। সেই অনুযায়ী মন্ত্রও পড়ান। গবেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হয়। সে ভাবে, বাসর ঘরে "মাগো এসেছি তোমার দ্বারে" গানটি গাইবে।

এমন সময় গোলযোগ ওঠে। বরযাত্রী কেউ আসেনি। বরপক্ষের সাক্ষী কেউ না থাকলে বিয়ে মঞ্জুর হয় না। সুতরাং গবেন্দ্রকে ভঙ্গ দিয়ে চলে আসতে হয়। যাবার সময় গবেন্দ্র ষ্ট্যাম্প দেওয়া কাগজে লিখিয়ে নেয়,—"That I, Padmonath, agree to marry my daughter Srimati Arobindo Nivanani alias Kamal Kamini by first wife deceased, with the said Gobendranath in the month of Augrahaon and I shall pay her, Rupees Five thousand as drowry."

গবেন্দ্র অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করে। কিন্তু হঠাৎ পদ্মনাথের পত্র আসে যে, লোকে বলে গবেন্দ্রের চরিত্র ভালো নয়। সুতরাং চরিত্র গোপন রেখে লেখাপড়া করাতে পদ্মনাথ প্রতারিত হয়েছেন, তাই উকীলের এই কাগজের জন্যে পদ্মনাথ দায়ী নন। আর একটি চিঠি আসে কমলকামিনীর নামাঙ্কিত। "প্রাণেশ্বর" সম্বোধনে একটা আবেগ ভরা চিঠি। দিশাহারা গবেন্দ্র স্থানীয় লোকদের দীর্ঘস্বাক্ষরযুক্ত একটা চিঠি পাঠায়। তাঁরা লিখে দেন, গবেন্দ্রকে তাঁরা ষোল বছর ধরে দেখেছেন। তাঁর চরিত্রে কোনো দোষ নেই। পদ্মনাথের চিঠি এবার আসে। ২৯শে অগ্রহায়ণ বিয়ের দিন স্থির করেন তিনি।

ধারে ১০০ টাকা সংগ্রহ করে বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে গবেন্দ্র সেজেগুজে যেই না চৌকাঠে পা দিয়েছে, এমন সময় ডাকপিয়ন একটা টেলিগ্রাম দেয়। তাতে লেখা, কনের হঠাৎ কলেরা হয়েছে। অবস্থা সাংঘাতিক, বিয়ে বন্ধ। পরে খবর আসে কনে মারা গেছে। গবেন্দ্র দুকূল হারিয়ে পাগলের মতো হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে এক প্রতিবেশী একজনকে গণৎকার সাজিয়ে নিয়ে আসেন। গনৎকার বলে, বিবাহ স্থানে শনির দৃষ্টি। তবে এটা কাটাতে হলে টাকায় হবে না—চতুষ্পদ জন্তু দরকার।—গাধা হলেই ভালো হয়। "শ্রীকৃষ্ণের দোলের দিন দ্বিপ্রহরে রীতিমত বরণাদির পর, সেই গাধাটির উপর চড়ে বাবুকে আড়াই দণ্ডকাল পথে পথে ভ্রমণ করতে হবে, তাহলে নিশ্চয়ই শনির দৃষ্টি কাটবে।" গণৎকারের নির্দেশমতো নির্দিষ্ট দিনে গবেন্দ্রকে বরণ করা হয়। ভাঙাকুলোর

ওপর জুতো, চুলের নুড়ি ও ঝাঁটা রাখা হয়। বুঝিয়ে বলা হয়, শনির প্রকোপ রোধ করতে হলে বরণডালায় এসব রাখা দরকার। তারপর গবেন্দ্রকে গাধায় চড়িয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়।

রামের বিয়ে প্রহসন (কলিকাতা—১৮৭৬ খৃঃ)—কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার॥ মলাটের কবিতায় আছে,—

"আশার তপন তাপে তাপিত হইয়ে,
বারীশ সম্বরে হায় পতিত এ দীন !
সহায় সম্পদ মম দয়ার তরণী
এই বিপজ্জালে—হৃদ অনিবার কাঁপে।"

দৃষ্টিকোণ যৌনসমস্যাগত হলেও এতে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত সমস্যাও গৌণ নয়। 'পিরিলী' নামে 'অতি নীচ ব্রাহ্মণ বংশের' সন্তান যে কুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের যোগ্য নয়, এটিও প্রকাশ করবার চেষ্টা আছে। তবে যৌনপ্রদর্শনীর উপস্থাপনায় প্রহসনটির অন্তর্ভুক্তি অযৌক্তিক নয়।

কাহিনী।—বৃদ্ধ রামতারণ মুখোপাধ্যায় বিয়ে-পাগ্‌লা। সে রক্ষাকালীর কাছে ধর্ণা দেয়—যাতে ঘটকীরূপে মা অবতীর্ণ হয়ে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এমন সময় গোপাল ঘটক এসে বলে, হোগলকুড়ের কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের পরমাসুন্দরী এক মেয়ের সঙ্গে গোপাল তার বিয়ে ঠিক করে এসেছে। কাল রামতারণের মামাশ্বশুর তাকে দেখতে আসবেন। রামের অনুরোধে গোপাল কনের রূপ বর্ণনা করে। সে বলে, সে নেহাৎ কায়স্থ, নইলে সে-ই তাকে বিয়ে করে আনতো ; অন্যকে দিতো না। মেয়ের নাম মধুমতী। এ সব শুনে রামের খুব আহ্লাদ হয়। সে বলে,—"ভাই ! তুমি যদি আমাকে বল, মধুমতীর গু খাও, আমি মোণ্ডার মতো মহাপ্রসাদ বলে তাও খেতে পারি।"

এদিকে বিধুবাবুর বৈঠকখানায় হাসির রোল পড়ে যায়। গোপাল গিয়ে সব কথা বলে। একজনকে মামাশ্বশুর সাজতে হবে। ভূপেন নামে এক কাপড়ওয়ালাকে রাস্তা থেকে ধরে আনা হয় এজন্যে। সে রাজী হয়—বলে, মিষ্টিটা যেন পায়।

রামতারণ কিন্তু একা একাই নাচে আর ছড়া কাটে। নিশিকান্ত এসে রামকে বলে, দাড়ির ওপর তার মামাশ্বশুর বড় চটা। রাম দাড়ি রেখেছিলো তারকেশ্বরে—যাতে বিয়ে হয়। (অবশ্য লোকে জানে শূলবেদনার জন্যেই দাড়ি রেখেছে)। যাহোক, বিয়ে যখন হচ্ছেই, তখন দাড়ি ফেল্‌লে কোনো

দোষ নেই। শ্রীনাথ নাপিত এসে তার সাধের দাড়ি কামিয়ে দেয়। একদিকে কামিয়ে দিয়ে বলে, এটাই ফ্যাশন। রামতারণ তাকে বেশী করে বকশিস্ দিয়ে দেয়। রামবাবুর এখন পাথরে পাঁচকিল। "চাদের দিন বুধের দশা, আলোচাল আর তিল ঘষা।" রামতারণ মুখে সাবান মাখে। ইতিমধ্যে রামতারণের "বেশ্যাপ্রিয়া" এসব সংবাদ পেয়ে আসে। পাওনা টাকা চায় এবং রেগে আগুন হয়ে যায়। রামতারণ গা ঢাকা দেয় সাময়িকভাবে।

মামাশ্বশুর আসবার আগে গোপাল রামতারণকে সবকিছু শিখিয়ে দেয়—তার সঙ্গে কি ক'রে বাক্যালাপ করতে হবে। যথারীতি ভূপেন যখন মামাশ্বশুর সেজে রামতারণকে দেখতে এলো, তখন রামতারণের আনন্দ দেখে কে! রামতারণ তাকে বলে, "আমি কুলীন, বরোজ গোত্র (ভরদ্বাজ) কাশীমুনির নাতি!" (কেন না তাঁর পিতা নাকি বলেছিলেন, তিনি কাশীমুনির সন্তান)! হবু মামাশ্বশুরকে সে বলে যে, সে ১৫ টাকা মাইনে পায়। সে ইংরেজীও জানে—"বি—এ—বে পর্য্যন্ত আই রিডিং।" বাংলায় সে বক্তৃতা করতেও পারে—সেটাও দেখায় একটা বক্তৃতা করে। বক্তৃতার মধ্যে অনেক আবোল-তাবোল উদ্ধৃতি দেয়। শেষে বলে, "এইস্থানে তুই একখানা পুস্তকের নাম করা কর্ত্তব্য যথা,—শিশুবোধ প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ আর মনে নেই।" দশদিন ধরে এই বক্তৃতাটা গোপাল রামতারণকে দিয়ে মুখস্থ করিয়েছিলো—কিন্তু সবই সে ভুলে গেছে। বক্তৃতা শুনে ভূপেন বলে,—"এ যে কেশববাবুর ঘাড়ে হাগে, বাবা তুমি চিরজীবী হও।"

২৪ তারিখে বিয়ের দিন স্থির হয়। রামতারণ দিনরাত নৃত্য করে। রামতারণের মা কুৎসিতা। রামতারণ স্থির করে, বিয়েতে মাকে নিয়ে আসবে না। তবে যদি কোনোদিন তাকে মধুমতী দেখে ফেলে কিংবা পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তখন মাকে চাকরাণী বললেই হবে।

দাসী মোহিনীর কাছে র‍্যাপার বাঁধা রেখে রামতারণ ২ টাকা যোগাড় করে। গোপালদের প্রতারণায় পড়ে সে অকাতরে পয়সা খরচ করে। এই পয়সা যোগাড় করতে গিয়ে তার অস্থাবর জিনিসপত্রগুলো বাঁধা দিতে বা বিক্রী করতে হয়। গোপালদের দলের কেউ এলেই রামতারণ তার কাছে বার বার মধুমতীর রূপের কথা শুনতে চায়। তারাও নিরাশ করে না। মুরুব্বী এসে বিয়ের ফর্দ ব'লে শ্রাদ্ধের ফর্দ দিয়ে যায়—বিশেষ করে—পাকা কলা, কড়ি, দড়ি, সুঁদরী কাঠ, চন্দন কাঠ, ঘি, খাট, ষাঁড় ইত্যাদি। বিয়েতে এগুলো কেন

দরকার সেটাও ভুলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। রামতারণও তাই বিশ্বাস করে। আনন্দে সবাইকে নিয়ে রামতারণ মদ খায়। গান ধরে—

"বলি আয়রে পেঁচা উড়ে খাঁচায়
এনেছি ফড়িং ধরে তিড়িং তিড়িং পাছা নাচায়।"

বিধুর বাড়ীতে ভূপেন গোপালদের সঙ্গে নিয়ে হাসাহাসি করে। গৌরী-ভূষণকে মধুমতী সাজাবার ব্যবস্থা হয়। মোহিনী চাকরাণী বলে,—"বুড়োরাই বিয়ে-পাগ্‌লা হয়, কিন্তু এমন কখন দেখি নি। রাস্তার লোক যদি বলে, 'রামের বিয়ে কবে?' অমনি রাম তার পা ধরে; যেন মা মরা দায়।"

রামতারণ অনেকক্ষণ থেকে সেজেগুজে তাড়াহুড়ো করছিল। অবশেষে তাকে একটা ভাড়াটে বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো। সেখানে রামতারণ মনের আহ্লাদে মধুমতীর কল্পনা করে। বাসর ঘরে কি করবে, তাই নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে। যথাসময়ে গৌরীভূষণকে সকলে কনে সাজিয়ে নিয়ে আসে। রাম তখন আত্মহারা হয়ে ওঠে। এমন সময় ভূপেন অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে গোপালকে গালাগালি দেয়। বলাবাহুল্য এটাও ভান মাত্র। সে অভিযোগ করে, গোপাল নাকি প্রতারণা করে এক পিরিলি পাত্রের সঙ্গে তার কুলীন কন্যার বিয়ে দেওয়াচ্ছে। তাদের সে পুলিশে দেবে। ভূপেন বলে, ভাগ্যি কন্যা সম্প্রদান হয়ে যায় নি।

রামতারণ তখন ভূপেনের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। ইতিমধ্যে পুলিস এসে রামতারণকে ধরে নিয়ে যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে বিচার হয়। প্রতারণা ও মিথ্যা পরিচয় দেবার অপরাধে রামের তিনমাস জেল হয়। "পিরিলি হয়ে কুলীন দুহিতাকে বনিতা কর্ত্তে সাধ গিয়াছিল কেন"—এই অপরাধে। সবাই রামতারণের এই পরিণামে বেশ আনন্দ উপভোগ করে।

কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে (কলিকাতা—১৮৮৪ খৃঃ)—অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য॥ সমাজে পরিবারবিশেষের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার কামনা অনেক অসম-বিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভাবিত করেছিলো। কৌলীন্যের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক-সমস্যাজনিত দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব থাকলেও যৌন সমস্যাজনিত সাধারণ দৃষ্টিকোণই এখানে প্রধানভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কাহিনী।—বৈঠকখানায় বসে কর্তামশায় নাতি সুরেশকে বলেন, গিন্নির অসুখ, এযাত্রা সেরে উঠবেন কিনা বলা যায় না। সুরেশ বলে, গিন্নির বয়েস

হয়েছে। ছয়জন বেটা, চারজন নাতি রয়েছে। গঙ্গাও কাছে, সাত আট টাকার বেশী খরচা হবে না। কর্তা আপত্তি তুলে বলেন,—গিন্নির সবে ৬০ বছর বয়স, এই বয়সে বুড়ী হলো কি করে? "তাহলে আমিও তো বুড়ো। যদিও আমার ৭০/৭৫ বছর বয়সে, ছয় বেটা, চার নাতি, বউ, ঝি আছে বলে পুকুরে যেতে পারিনে নে। ডান পা-টা ভেঙেছে বলে লাঠি নিয়ে চলতে হয়, সারলে, আর লাঠি লাগবে না।" সুরেশ জিজ্ঞেস করে জানলো, তার জন্মের আগেই পা ভেঙেছে। এখন সুরেশের কুড়ি বছর বয়েস। কর্তা বললেন.—গিন্নির যদি দৈবাৎ কিছু একটা হয়, তবে তাকে তো আবার বিয়ে করতে হবে। সুরেশ বলে—এই বয়সে তাঁকে আবার কে মেয়ে দেবে! দাঁত একটিও নেই, মাথায় চুল শনের মতো সাদা। আর জলদোষের ব্যামো আছে। এ দেখে যে মেয়ে দেবে সে কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বৈতরণী পার করুক। কর্তা কৈফিয়ৎ দেয়,—উমেদারী করতে গিয়ে তার দাঁত সব পড়ে গেলো। এক হাতুড়ে তেল দিয়েছিলো, তাই ব্যবহার করে চুলগুলো পেকে গেলো। তাঁর কুল দেখেই কতোলোক আসবে। শেষে সুরেশের ওপর চটে গিয়ে বলে.—সুরেশের সঙ্গে কথা বলে কর্তার সুখ নেই—বুড়োর মতো পাকা কথা। উচ্ছন্নে যাবার পথ তৈরী করছে নিজের। এইজন্যেই সুরেশ একজামিন দিয়ে পাশ করতে পারে নি!

অবশেষে গিন্নি মারা গেলেন। শোবার ঘরে শুয়ে কর্তা ভাবেন—বেশ ভালোই হলো গিন্নির মৃত্যুতে। আর একটা বিয়ে করা যাবে। না হলে তাঁকে কে আর আদর করবে? "ভাগ্যিস আমি গিন্নিকে কাশী পাঠাইনি, পাঠালে লোকে বল্‌তো গিন্নিকে মারবার জন্যেই কাশী পাঠিয়াছি।" এমন সময় সুরেশ ও রমা আসে। সুরেশ বলে—ঠাকুরদার কথা সব সে শুনেছে। রমা কর্তার মেয়ে। সে বলে "বাবা এখন অচেতন—দাঁত কপাটি লেগেছে।" সুরেশ বলে, "দাঁতই নাই যে দাঁত কপাটি লাগবে।" কর্তাবাবু তখনো আবোল তাবোল বকছিলেন। উপস্থিত কাউকেই চিন্‌তে পারলেন না। শেষে বল্‌লেন যে, স্ত্রীলোক না থাকলে ঘর আঁধার—"নারী নাই গৃহে যার, দ্বার কপাট বন্ধ তার।"

বৈঠকখানায় বসে কর্তা বিদ্যাভূষণ, রামনাথ ও বিপ্রদাস চক্রবর্তীর কাছে তাঁর স্ত্রীবিয়োগের জন্যে খেদ করেন এবং কথাপ্রসঙ্গে এঁদের কাছে জানালেন, এখন তাঁর আর একটি গিন্নি প্রয়োজন। তিনি নিজে পুত্রদের কাছে নিজের বিয়ের প্রস্তাব তুলতে লজ্জা করেন। অতএব বিদ্যাভূষণ, রামনাথ, বিপ্রদাস—

এঁরাই যেন এর ব্যবস্থা করেন ; বিপ্রদাস দেখে যে এই সুযোগে এই মাসটা অন্যের মাথায় হাত বুলিয়ে চলতে পারবে। শ্রাদ্ধের বাকী আর তিন চারদিন। আবার বিয়ের পাওনাও হবে। পুত্র শরৎ ও রামনাথকে ডেকে আনা হয়। বিপ্রদাস তাদের সব কথা খুলে বল্লে শরৎ বলে যে, তাদের মা মারা গেছেন, এখন ঠাট্টার সময় নয়। কর্তা তখন বলে ওঠেন, না ঠাট্টা নয়। তাঁর চেয়েও বেশী বয়সী লোক বিয়ে করছে। কর্তা কুলীন, ইচ্ছে করলে দশটা বিশটা বিয়ে করতে পারেন। শরৎ বলে, তাঁর এখন বিয়ে করা সাজে না। আর এমনভাবে পঁচিশটা বিয়ে করবার ফলে মেয়ের বাজার আগুন! অন্যান্য চব্বিশ জন লোককে বিয়ে না করে থাকতে হচ্ছে। বল্লাল সেনই বাংলাদেশে এই সবনাশের বীজ বুনে গেছে। কর্তা তার ওপর রেগে গেলেন। শরৎ তখন জানায় যে, কেশববাবু বলে গেছেন—"যেখানে দেশের অহিতকর কথা শুনবে সেইখানেই তাহা নিবারণ কর্ত্তে চেষ্টা করবে, তাতে যতদূর হয়।" ছয় পুত্র, চার নাতি থাকতে এই বয়সে বিয়ে করা কর্তার পক্ষে নিন্দনীয়। ছেলেরা চলে গেলে কর্তা বিদ্যাভূষণকে বলেন, শ্রদ্ধের খরচ যেন কম করে ধরেন। কেননা আবার পরে বিয়ের খরচ আছে তো!

প্রায় আটদিন হলো, গিন্নির শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও কোনো ঘটকের পাত্তা নেই। কর্তা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এমন সময় ঘটক সোনারপুর থেকে পদ্মপলাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে কর্তার কাছে উপস্থিত হলো। পদ্মপলাশ তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। পদ্মপলাশবাবু কর্তার নাম জিজ্ঞাসা করায় কর্তা আবেগে পাঁচপুরুষের নাম বলে গেলেন।

বিয়ের তোড়জোড় চলে। অন্দরমহলে সুশীলা, শশিমুখী ও শরৎকামিনী গল্পগুজব করছিলো, এমন সময় কর্তার মেয়ে হরকামিনী এসে জানায় যে বাবা আবার বিয়ে করছেন! শুনে সবাই অবাক্ হয়। হরকামিনী ভাবে, বাবাকে সে এবার কিছু গরম গরম কথা শুনিয়ে দেবে। সকলে মিলে কর্তার দুর্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দেয়। রামনাথ এসে বলে তারা যেন কর্তাকে কিছু না বলে। কেননা বিয়ে করতে বারণ করায় তিনি গলায় ফাঁসি দিতে গিয়েছিলেন।

ওদিকে সোনারপুরেও তোড়জোড় চলে। পদ্মপলাশ বাড়ী ফিরলে সবাই এসে জিজ্ঞাসা করে পাত্র কেমন। পদ্মপলাশ জবাব দেন, বড় ঘর, কুলীনেরা যেমন বৌকে শ্বশুরবাড়ী রাখে, এ তেমন রাখবে না। তবে বয়েসটা

একটু বেশি, দেখতে বেশ। পদ্মপলাশের কথায় সবাই উল্লসিত হয়ে ওঠে। বিয়ের আগে খুব ধুমধাম হয়। এমন কি বাজীও পোড়ানো হয়।

যথাদিনে বিবাহবাসর বসে। বুড়ো কর্তাকে নাপিত কোলে করে সভায় আনে। মেয়ের ভাই প্রাণেশ্বর কর্তাকে দেখে রেগে যায়। পদ্মপলাশবাবু বলেন, কি করবেন তিনি, কুল দেখে তো দিতে হবে। প্রাণেশ্বর বলে— "ওর বউ-এ পেয়েছে। ওর চক্ষুলজ্জা নাই! কুলে কি স্বর্গ দেবে?" বিয়ের সভায় সকলে বুড়ো বরকে দেখে যা ইচ্ছে তাই বলে ঠাট্টা করে। শেষে বরকে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুটি মেয়ে কিল চড় মেরে আদর জানালো। কিল চড়ের ধাক্কায় বর মেঝেতে গড়াগড়ি যান। কিন্তু সব যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করেন তিনি। শেষে রামনাথ এসে দেখে যে তার পিতা মৃত। সে কেঁদে উঠ্‌লো। সবাই বল্‌লো—ভয় নেই, নেশার ঘোরে এমন হয়েছে, পরে ভাল হয়ে যাবে।

সমপর্যায়ের আরও দুটি প্রহসনের নাম করা যেতে পারে। প্রথমটি— "**হিতে বিপরীত**" (১৮৯৬ খৃঃ —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; এবং দ্বিতীয়টি "**বুঝলে**"? (১৮৯০ খৃঃ)—বিপিনবিহারী বসু॥ কিন্তু এগুলোর মধ্যে আর্থিক সমস্যার দিকটি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই আর্থিক প্রদর্শনীতে এগুলোর উপস্থাপনা যুক্তিসম্মত।

বৃদ্ধের বিবাহবাসনাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে লেখা অনেকগুলো প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়। শুধু বিবাহ নয়, প্রেম ইত্যাদি অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির কথাও এগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে। প্রথার আনুকূল্যে সংঘটিত এই সব অস্বাভাবিক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকতার পদক্ষেপে প্রচুর পরিমাণে প্রহসন রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু জানা যায়, এ ধরনের কয়েকটি প্রহসনের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে —

বুড়ো পাগ্‌লার বে (১৮৮৬ খৃঃ)—এস্. এন্. লাহা॥ বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে গিয়ে একটি লোক কেমন করে জব্দ হয়েছিলো, প্রহসনটির মধ্যে তা বর্ণিত হয়েছে।

OLD FOOL (১৮৯৬ খৃঃ)—রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত॥ এক কৃপণ বৃদ্ধের বিয়ে করবার বাসনা হয়। তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়ার কতকগুলো লোক তার বিয়ে স্থির করে। বলা-বাহুল্য এটা ছিলো সম্পূর্ণ প্রতারণা। একটি

সুন্দরী তরুণী এনে দেবার নামে এরা কৃপণ বৃদ্ধের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে। অর্থ হারিয়ে কৃপণ বৃদ্ধ অনুশোচনা করে।

নক্সা (১৮৯৮ খৃঃ)—গোবিন্দচন্দ্র দে॥ একজন বৃদ্ধ অবশেষে কীভাবে এক চাকরাণীর প্রেমে পড়ে অপদস্থ এবং দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলো, প্রহসনটিতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

বস্তুতঃ অসম-বিবাহকে কেন্দ্র করে যে দৃষ্টিকোণের সংগঠন ছিলো, তার সমর্থনপুষ্টিও লক্ষণীয়। কারণ বিভিন্ন দিক থেকে একাধিক প্রহসনের জন্ম আমরা লক্ষ্য করে এসেছি। তালিকার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ হয়তো এগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমর্থ।

(খ) বহুবিবাহ।—

বহুবিবাহ সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) বহুপতিত্ব এবং (২) বহুস্ত্রীত্ব। এগুলোও আবার দুই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) এককালে একাধিক দাম্পত্য-অংশীদার গ্রহণ (খ) একজনের মৃত্যুর পর অন্য অংশীদার গ্রহণ। সাধারণতঃ আমাদের সমাজে বহুবিবাহ বলতে বোঝায় দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম ক্ষেত্র। অর্থাৎ বহুস্ত্রীগ্রহণ যে ক্ষেত্রে একইকালে সম্পন্ন হয়, সেখানেই তা 'বহুবিবাহ' এই অস্পষ্ট নামেই সমাজে প্রকাশ পেয়েছে। এর কারণ আছে। বিবাহের কর্তৃত্ব এদেশে পুরুষের ; এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর পত্যন্তর গ্রহণ অত্যন্ত স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ায় বহুবিবাহের পর্যায়ে তাকে ধরবার মতো সংস্কারমুক্ত চিন্তা আমাদের দেশে সাধারণতঃ আসে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত বিখ্যাত সামাজিক সমস্যা,—যা বহুবিবাহের মধ্যে পড়লেও তার আলোচনার অবকাশ স্বতন্ত্রস্থানে। বিপত্নীকের বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যার মধ্যে বিধবাবিবাহ সদৃশ কোনো সমস্যা তেমন উগ্র ছিলো না। অন্য যে সমস্যা ছিলো তা "অসম-বিবাহ" সম্পর্কিত বক্তব্যে প্রকাশ করা হয়েছে। বহুবিবাহ সম্পর্কিত দুটি উপবিভাগের মধ্যে মিলিয়ে আছে অন্য একটি বিভাগ—যাকে তৃতীয় একটি উপবিভাগ হিসাবে স্থান দেওয়া যায়। সেটি হলো স্বামী পরিত্যাগ বা স্ত্রী পরিত্যাগ। পরিত্যক্ত স্ত্রীর পুনর্বিবাহের প্রথা আমাদের সমাজে "ব্যবহার বিরুদ্ধ" বলে এর সমস্যা সাধারণতঃ বহুস্ত্রীত্ব প্রথার অনুরূপ। স্ত্রী পরিত্যাগের ঘটনা আমাদের সমাজে একটা অত্যন্ত সহজসাধ্য ঘটনা ছিলো।

এককালে একাধিক স্ত্রী গ্রহণই সাধারণতঃ সমাজে বহুবিবাহ নামে

আখ্যাত হয়েছে। বহুবিবাহ শুধু আমাদের সমাজে নয়, পৃথিবীর অনেক সমাজেই প্রচলিত আছে কিংবা ছিলো। বিশেষতঃ যে সব ক্ষেত্রে প্রজা-জননের দিকে সমাজের লক্ষ্য, সেখানে বহুবিবাহ অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ দুষ্পরিবর্ত্য প্রথারূপে গণ্য হয়েছে। আমাদের দেশেও প্রাচীন বিধি এবং উপাখ্যানাদি পাঠ করলে দেখা যায়, এই প্রথা অস্বাভাবিক বলে গৃহীত হয় নি। তবে এক-পত্নীত্বের ঘটনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই মূল্য দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনকালের উপাখ্যান ইত্যাদির নায়ক সাধারণ ব্যক্তি নন। সুতরাং সাধারণ ব্যক্তির বিবাহরীতির ওপর পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভবপর নয়। তবে সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে বহুবিবাহ যে ঘৃণিত ছিলো না, এটা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

স্মৃতির বিধান আর ইতিহাস এক নয়। তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের মূলে এই বিধান পালনের চেষ্টা থাকে। এককালে আমাদের দেশে সমাজের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিলো, তাই সে সময়ের স্মৃতির বিধানকে ইতিহাসের সঙ্গে বেশি পৃথক করে দেখাও অবিচারের কাজ হবে। আমাদের সমাজে প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থসমূহে যথেচ্ছবিবাহের কথা না থাকলেও পুরুষের ক্ষেত্রে একবিবাহের মধ্যেই দাম্পত্যজীবনকে অবসিত হতে দেওয়া হয় নি,—অবশ্য বিশেষ বিশেষ-ক্ষেত্রে। মনু সাধারণতঃ স্ত্রীবিয়োগ, স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা এবং সন্তানজন্মঘটিত দোষের ক্ষেত্রেই অন্য স্ত্রীগ্রহণের বিধি দিয়েছেন।—

> "ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মনি।
> পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥"[৪৪]
> "মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
> ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥
> বন্ধ্যাষ্টমেহধিবেত্তাব্দে দশমে তু মৃত প্রজা।
> একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥"[৪৫]

যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহের ক্ষেত্রে অনুলোম বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।—

> "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
> কাম প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥[৪৬]

৪৪। মনুসংহিতা—৫/১৬৮।

৪৫। মনুসংহিতা—৯/৮০—৮১।

৪৬। মনুসংহিতা—৩/১২।

কিন্তু সাধারণের মধ্যে বহুবিবাহ যে বেড়ে গিয়েছিলো—তার মূলে যে স্মৃতির সমর্থন সক্রিয় ছিলো তা নয়; কিংবা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি পালনের নিষ্ঠা ছিলো, তা নয়। এটি নেহাৎ সামাজিক চাপ—যা সমাজের যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা ও চাহিদা থেকে বিশেষ মাত্রা গ্রহণ করেছে। কৌলীন্য প্রথাকেই দৃষ্টান্ত ধরে এটা প্রমাণ করা যায়। বিদ্যাসাগর লিখেছেন,—"দেবীবর যে যে ঘর লইয়া মেল বন্ধ করেন, সেই সেই ঘরে আদানপ্রদান ব্যবস্থিত হয়! মেলবন্ধনের পূর্ব্বে, কুলীনদিগের আটঘরে পরস্পর আদান-প্রদান চলিত। তৎকালে আদানপ্রদানের কিছুমাত্র অসুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্যাকেই যাবজ্জীবন অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত না। এক্ষণে, অল্পঘরে মেল বন্ধ হওয়াতে কাল্পনিক কুলরক্ষার জন্য, এক পাত্রে অনেক কন্যার দান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এইরূপে দেবীবরের জন্য কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহের সূত্রপাত হইল।"[৪৭]

আমাদের সমাজে প্রজা-প্রজননের আবশ্যকতা এতো বেশি ছিলো যে বিবাহবিধি লঙ্ঘনে ভীতিপ্রদর্শিত হয়েছে। মৎস্য-সূক্তে বলা হয়েছে,—

অদারস্য গতিনাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥
একচক্রোরথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বস্বেনাপি দেবেশি কর্ত্তব্যো দার সংগ্রহঃ॥[৪৮]

যেক্ষেত্রে বিবাহের ব্যাপারেই শাস্ত্রীয় আগ্রহ এতোটা বেশি, সেখানে পুরুষের বহুবিবাহের মাত্রা সম্পর্কে কঠোর দৃষ্টি রক্ষা করা সমাজশাস্ত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়,—বলাবাহুল্য।

আমাদের সমাজে স্মৃতিশাস্ত্র অর্থ-ই সংস্কৃত বচন, তা সে প্রাচীন হোক, অর্বাচীন হোক কিংবা প্রক্ষিপ্ত হোক। সমাজের বিভিন্ন আচার এমন কি

৪৭। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার—চতুর্থ সং, পৃঃ ৩২—৩৩।
৪৮। মৎস্য সূক্ত—৩১শ পটল।

অনাচার সব কিছুরই সমর্থন তথাকথিত স্মৃতিবচনের মধ্যে পাওয়া যাবে। গত শতাব্দীতে বহুবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে যে তর্ক-বিতর্ক চলেছে, সেগুলো দেখে এই ধারণাই জাগে। যথেচ্ছবিবাহের ক্ষমতা অর্জন করে আমাদের সমাজে পুরুষ তাই প্রতিপক্ষের সম্মুখে শাস্ত্রীয় যুক্তি খুঁজেছে। বলাবাহুল্য শাস্ত্রীয় যুক্তির অভাবও হয় নি। যেমন মদনপারিজাতধৃত স্মার্তবচনে—

একামূঢ়্বা তু কামার্থন্যাং বোঢুম য ইচ্ছতি।

কিংবা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (গার্হস্থ্য ধর্ম প্রস্তাব)—

একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনা।
প্রার্থনা চাতিরাগে চ গ্রাহ্যানেকা অপি দ্বিজ॥

স্মৃতিচন্দ্রিকাধৃত দেবলবচনেও আছে,—

একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লুব্ধং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ॥

অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী বিপক্ষের সম্মুখে বহুবিবাহ সমর্থকরা এ ধরনের শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধারের কষ্ট স্বীকার করেছেন।

বহুবিবাহ পুরুষের স্বভাবগত না স্বভাববিরুদ্ধ এ নিয়ে মতভেদ আছে। যৌনবিজ্ঞানে দেহপন্থী এবং মনঃপন্থীর চিরন্তন দ্বন্দ্ব টানবার আবশ্যক নেই। তবে সমাজের চাপেই সমাজ-সভ্য প্রজা-প্রজননের তাগিদ প্রকাশ করেছে। চাণক্য শ্লোকে আছে—"অবিদ্যঃ পুরুষঃ শোচ্যঃ শোচ্যং মৈথুনমপ্রজম্।" সামাজিক তাগিদ যে কতো প্রভাববিস্তার করে, তা আমেরিকার একটি পুরোনো ঘটনা উল্লেখ করে বোঝানো যেতে পারে। প্রজা-প্রজননের তাগিদে সমাজ আমেরিকার 'ইউটা' প্রদেশকে এমন প্রভাবিত করেছে যে সেখানকার ২৩৩৬০৩ জন নারী পুরুষের বহুবিবাহের পক্ষে মত দিয়েছে—পুরুষের যে বহুবিবাহ নারীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ![৪৯] নিজ স্ত্রীর বহুপতিত্ব অনুমোদনও তেমনি পুরুষের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হলেও পুরুষের বহুস্ত্রীত্বকে সমাজনিয়ন্ত্রণকারী পুরুষের কাছে তেমন ইচ্ছাবিরুদ্ধ মনে হয় নি। বহুপতিত্ব এবং বহুস্ত্রীত্ব নিয়ে তৈত্তিরীয় সংহিতার একটা সুন্দর কথা আছে।—"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপযোঃ পরিব্যয়তি

৪৯। ভারত সংস্কারক—১০ই আশ্বিন, ১২৮১।

তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে।"৫০ বহুস্ত্রীত্বের চেয়ে বহুপতিত্বের ক্ষেত্রে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, তাই আমাদের পুরুষ-শাসিত সমাজে বহুস্ত্রীত্বের ব্যাপারে সমাজ শিথিলতা এবং নীরবতা পোষণ করেছে। বহুস্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে স্ত্রীপক্ষীয় দৃষ্টিকোণের ব্যাপকতা আগেকার দিনে কতোটা ছিলো তা পরিষ্কার জানা না গেলেও পরে এই দৃষ্টিকোণের ব্যাপকতা অস্বীকার করতে পারি না। "ভারত সংস্কারক" পত্রিকার একটি মন্তব্যে আছে,—"বহুবিবাহ যে কোন দেশের প্রথা হউক, স্ত্রীগণ যে পারতপক্ষে তাহার অনুমোদন করেন না, ইহা আমাদিগের দৃঢ় সংস্কার। আমাদিগের দেশের সপত্নীব্রত প্রভৃতি ইহার প্রমাণস্থল।" কিন্তু স্ত্রীপক্ষীয় মূল্য আমাদের সমাজে বিশেষ ছিলো না। পরবর্তীকালে কৌলীন্য প্রথা বহুবিবাহের স্ত্রীর সংখ্যা অস্বভাবিকভাবে বাড়িয়ে তুলেছিলো। এসব ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টাও প্রকাশ পেতো। কারণ বহুস্ত্রীত্ব ছিলো যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি সে সম্পর্কিত দায়িত্বও অস্বাভাবিক ভারযুক্তই ছিলো। এই দায়িত্বমুক্তি থেকেই আমাদের সমাজে দাম্পত্যপাপ প্রবেশ করেছিলো এবং তার বিরুদ্ধে যথারীতি দৃষ্টিকোণও অভিব্যক্ত হয়েছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বেভলি সাহেব মানুষ গণনার যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাতে পুরুষ এবং স্ত্রীর সংখ্যা ধর্ম-বিশেষে এক এক রকম অনুপাতে অবস্থান করলেও আকর্ষণীয় পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তিনি নিম্নোক্ত অনুপাত দেখিয়েছেন।

	স্ত্রী	পুরুষ
হিন্দু	৫০.০০	৫০.০০
মুসলমান	৪৯.৬	৫০.৪
বৌদ্ধ	৪৮.৫	৫১.৫
খ্রীস্টান	৪৪.৫	৫৫.৫
অন্যান্য	৪৮.৯	৫১.১

"ভারত সংস্কারক" পত্রিকায়৫১ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের একস্থানে বলা হয়েছে,—"জন্ম সম্বন্ধে তদন্ত করিলে দেখা যায় যে যতটি পুরুষ জন্মে, প্রায় ততটী স্ত্রীও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যদি কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা

৫০। তৈত্তিরীয় সংহিতা—৬ষ্ঠ কাণ্ড / ৬ষ্ঠ প্রপাঠক / ৫ম অনুবাক / ৩য় কণ্ডিকা।

৫১। ৯ই শ্রাবণ, ১২৮১।

যায়, তাহার অন্য কারণ থাকিবে। ইহাতেই বোধহয় যে একটী স্ত্রী এক পুরুষে বিবাহ হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যদি বহুবিবাহ তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই স্ত্রী কিংবা পুরুষের সংখ্যা অধিক করিয়া সৃষ্টি করিতেন।" ভগবানের কি অভিপ্রেত তা চিন্তা না করেও দেখা যায় যে, উৎপাদন অনুযায়ী চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা সামাজিক প্রয়োজনে উচিত—এই দিক সম্পর্কে চিন্তাও আমাদের সমাজে অচর্চিত ছিলো না। কিন্তু যেখানে ব্যষ্টিস্বার্থ সমষ্টিস্বার্থকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে চলে, সেখানে এসব চিন্তায় ভগবানের দোহাই দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

১২৮২ সালে প্রকাশিত ভুবনেশ্বর মিত্রের লেখা "হিন্দুবিবাহ সমালোচন" নামে একটি পুস্তকে বহুবিবাহের দশটি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—

"১। অক্রত্রিম দাম্পত্য প্রেমের অভাব।

২। পুরুষের প্রত্যক্ষ, স্ত্রীর পরোক্ষ ব্যভিচার প্রথাবলম্বন এবং তদ্দ্বারা সমাজে ব্যভিচার কার্য্যের আদর্শ সংস্থাপন।

৩। জারজেরা ঔরস সন্তানরূপে পরিগণিত, অথচ আবার অন্যায়রূপে আদৃত।

৪। অনেকস্থলে বংশবৃদ্ধির ব্যাঘাত।

৫। অনেকস্থলে শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল সন্তানের উদ্ভব।

৬। স্বাভাবিক অপত্য ও ভ্রাতৃস্নেহের অভাব।

৭। অসম-বিবাহের অন্যতর প্রধান প্রয়োজন উদ্ভব।

৮। দারিদ্র্য দুঃখের বিস্তৃতি।

৯। গৃহবিবাদ।

১০। স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা, পতিহত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি অনিষ্ট সমুদ্ভূত হইতেছে।"[৫২]

ভুবনেশ্বর মিত্র যদিও বিক্ষিপ্তভাবে এবং অনেকটা অবৈজ্ঞানিকভাবে দোষের তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তবুও বহুবিবাহ জনিত কিছু কিছু দোষ অস্বীকার করলে অন্যায় করা হবে। আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ আছে,—"জন্ম মৃত্যু বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে।" অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু যেমন অমোঘ আইনের প্রথাস্বীকৃতি, তেমনি বিবাহেও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বা যুক্তিপ্রকাশের অবকাশ

৫২। হিন্দুবিবাহ সমালোচন—পৃঃ ৩৬-৩৭।

নেই। এইভাবে বিবাহ তার দৌর্নীতিক প্রথাসমূহের সঙ্গেই ধর্মীয় একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই এটা হয়ে উঠেছিলো অপরিবর্তনীয়। পূর্বে উল্লিখিত সরকারী মন্তব্যটি নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে স্পষ্টভাবে একথা সমর্থন করে।—

"It must be remembered that polygamy as it exists in India, is a Social and Religious Institution and Governor General in Council doubts whether the great difficulty of dealing with the subject in India, or even in Bengal, has been fully considered." বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহরহিতের প্রস্তাবে প্রথম পুস্তকে সে "সাতটি আপত্তি"-কে খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন, এই আপত্তিগুলো সমসাময়িককালের প্রচলিত "আপত্তি"। আপত্তিগুলোর মধ্যে প্রথমটি শাস্ত্র ও ধর্মঘটিত আপত্তি। তিনি লিখেছেন,—"এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, বহুবিবাহ প্রথার দোষ কীর্তন বা নিবারণ কথার উত্থাপন হইলে, তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের এরূপ সংস্কার আছে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্মানুগত ব্যবহার। যাহারা এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তিসকল, তাঁহাদের মতে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্মদ্বেষী নাস্তিক ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত।"[৫৩] বিদ্যাসাগর অন্যান্য যে 'আপত্তি' খণ্ডনের জন্যে উপস্থাপিত করেছেন, সেগুলো সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। যেমন দ্বিতীয়, তৃতীয় আপত্তি এবং পঞ্চম আপত্তি কুলীনের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সমস্যা। চতুর্থ এবং ষষ্ঠ আপত্তি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সমস্যা। সপ্তম আপত্তিতে বৃহত্তর স্বার্থ প্রদর্শনের চেষ্টা আছে—যা প্রকারান্তরে ধর্মীয় বা সামাজিক রক্ষণশীলতার অনুকূল। অতএব দেখা যাচ্ছে, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল মনোভাব বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু তাদের ভিত্তি তারা তথাকথিত ধর্মের ওপর স্থাপন করে বেশি শক্তিশালী হবার চেষ্টা করেছে। সমাজ ও ধর্ম আমাদের কাছে একাকার হয়ে গেছে। "অনুসন্ধান" পত্রিকায় একটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে,—"সমাজ দেবতা। আমি হিন্দু, হিন্দু সমাজের বিষয় অবগত আছি। হিন্দুসমাজ হিন্দুর নিকট দেবতা।"[৫৪] তাই সমাজের বাইরে কোনো সংগঠন পরিদৃশ্যমান না হলেও তার প্রথা অত্যন্ত

৫৩। বহুবিবাহ—৪র্থ সং—পৃঃ ৩।

৫৪। অনুসন্ধান, ১৫ই আষাঢ়, ১২৯৭।

দৃঢ়মূলবদ্ধ। অপেক্ষাকৃত পরের যুগে "রূপ ও রঙ্গ" নামে একটি পত্রিকায় সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—"বাঙলায় এখন সমাজ নাই, সমাজপতিও নাই বটে, পরন্তু সমাজের এমন একটা Power of passive resistance আছে, যাহা দুরতিক্রম্য।...যুক্তির সাহায্যে বাঙলার কোনো প্রকারের সমাজ সংস্কার হইতে পারে না, হইবেও না।"[৫৫] সমাজক্ষমতার চাপের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে, এখনো বহুবিবাহ তুলে দেবার যুক্তিতে পত্রিকায় প্রেরিত পত্র দেখা যায়। ১৩৭০ সালের ২রা পৌষ তারিখের 'যুগান্তরে' নবদ্বীপের সমাজশিক্ষা-সংগঠকের পক্ষ থেকে হরিশঙ্কর দাশগুপ্তের প্রেরিত একটি পত্র প্রকাশিত হয় একই যুক্তিসহযোগে।

এক্ষেত্রে কতখানি বৈবাহিক দুর্নীতিতে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সমাজে ব্যাপক দৃষ্টিকোণের উদ্ভব হতে পারে—তা সহজেই অনুমান করা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব নাটকে' (১৮৬৬ খৃঃ) গ্রাম্য ও নগরের কথোপকথনে বহুবিবাহ ও সামাজিক প্রথা সম্পর্কে আলোকপাত আছে। বহুবিবাহের বন্ধের ব্যাপারে গ্রাম্য বলেছে,—"যা চিরকাল চল্যে আসচে, সেটা উল্টে দেওয়া কি ভাল?" নাগর জবাব দেয়,—"চিরকাল কিছুই চল্যে আসেনি, এক ঈশ্বরের নিয়ম তাই চিরকাল সমান চল্যে আসচে, তাছাড়া দেশকালপাত্র ভেদে ১০ জন একত্র হয়ে যা চালায়, তাই চলে।...(সংস্কারে) বুড়োকেও পারা যায়, কতকগুলি যে খুড়ো আছে, তারা আবার বুড়োর বাবা, তাদের পারা কঠিন।" একই নাটকের অন্যতম চরিত্র সুধীরের মন্তব্যে আছে,—"বহুবিবাহ নিবারিণী সভাতে দেশের অনেক মঙ্গলোদয় হবে নিশ্চয় জেনে কায়মনোবাক্যে তার যত্ন কচ্যি, কিন্তু অভিমান পরতন্ত্র প্রাচীনদল তার উন্মূলনে কৃতসম্পন্ন হয়েছে, যত্ন করা নিরর্থক হচ্যে!"

বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে স্ত্রীপক্ষীয় সমর্থনকে সরকারী সমর্থনের সঙ্গে যুক্ত করে বহুবিবাহ সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" (১৮৭২ খৃঃ) প্রহসনে জগৎমোহিনী এবং জ্ঞানদার আলোচনায় এ ধরনের স্ত্রীপক্ষীয় সমর্থন প্রচার করা হয়েছে। জগৎমোহিনীকে জ্ঞানদা বলেছে,—"আজকাল আর সেকাল নাই। একটার বেশী আর দুটো বিয়ে হবে না, কেমন নিয়ম করেছে,

৫৫। রূপ ও রঙ্গ—৩রা শ্রাবণ—১৩০৮।

যদি কেউ দুটো বিয়ে করে, তাহলে তাকে চিরকাল খাওয়াতে হবে, আর তা দিতে না পাল্লে জেলে গিয়ে পাথর ভেঙে শোধ দিতে হবে।" জ্ঞানদা কাগজের একটা সংবাদের কথা টানে। "একদিন ডাক্তারবাবু একখানি কি খবরের কাগজ পড়ছিলেন, আমি তাই শুনলেম, যে শিবপুর না হাবড়ার কোন্ ব্রাহ্মণের নামে তার স্ত্রী আদালতে খোরাক পোষাকের জন্যে নালিস্ করেছিল। তাতে নরম্যান্ সাহেব ব্রাহ্মণকে মেয়াদ দিলে, কাজে কাজে শেষে চাপ পড়লেই বাপ্ বলতে হলো।" স্বামীর প্রতি এটা স্ত্রীর নিষ্ঠুরতা—জগৎমোহিনী এই মন্তব্য করলে জ্ঞানদা জবাব দেয়—"এর আর নিষ্ঠুর কি? করেছে বেশ ভালোই হয়েছে। কুলনের ছেলেরা আর কুলিনত্ব নাড়া দিতে পারবে না।"

বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে যে প্রহসনগুলো লেখা হয়েছে, অধিকাংশতেই পরিণতিতে দাম্পত্য অশান্তি, ব্যভিচার, আত্মহত্যা ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণতিতে বিবাহকর্তার আক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাধাবিনোদ হালদারের "ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি" (১৮৮৫ খৃঃ) প্রহসনের পরিণতিতে আছে,—ভজহরি বলে,—"এমন জান্‌লে কোন্ শালা দুটো বিয়ে কর্ত্তো! সাতজন্ম যদি ছেলে না হয়, তবুও যেন এমন কুকর্ম্ম কেউ কখন করে না।"

কৌলীন্য প্রথাঘটিত দায়িত্বহীন বহুবিবাহের সম্পর্কে বক্তব্যের অবকাশ অন্যত্র। কারণ তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার সমস্যা মুখ্যভাবে জড়িয়ে আছে। দায়িত্ব স্বীকৃত বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত কতকগুলো প্রহসনকে এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে।

নব নাটক (কলিকাতা—১৮৬৬ খৃঃ)—রামনারায়ণ তর্করত্ন। নাটকটির সম্পূর্ণ নাম—"বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাটক।" সুতরাং নামকরণেই লেখকের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। উপহার দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন,—"ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।" নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা এবং উপদেশপ্রচার প্রবণতার প্রশস্তি রামনারায়ণ প্রস্তাবনায় একবার গেয়েছেন।—

"নটী। এ নব-নাটুকে দেশে নব নাটকের অপ্রতুল কি? কত চটক-ওয়ালা নব নাটক এখন দিন দিন হয়ে উট্‌চে দেখ্‌চো না।

নট। সে সকল নাটক এ সভাতে অভিনয় করা হবে না; এ অতি সুবিজ্ঞ

সমাজ, এ সমাজে সদুপদেশ-পূর্ণ কোন বিশুদ্ধ নাটক প্রকাশ করতে হবে। উপদেশ দেওয়াই নাটক প্রকাশের উদ্দেশ্য।" নাটক শেষেও নটী ও সূত্রধারের প্রবেশ ঘটানো হয়েছে। সূত্রধার কৃতাঞ্জলিপুটে বক্তৃতা দিয়েছে,—"সভ্য মহোদয়বর্গ! আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর দুরবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথার অনুমোদন করবেন?...যাতে ঐ প্রথা নানা দোষাকার ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ হতে দূরীকৃত হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা কি কিছু যত্ন করবেন না?"

কাহিনী।—গ্রাম্য জমিদার গবেশবাবু বিবাহিত। স্ত্রী সাবিত্রী এবং দুইটি ছেলে বর্তমান। কুলীন হলেও সে বহুবিবাহের কথা ভাবে নি। সাবিত্রীও বহুবিবাহকে ঘৃণা করে। একজন বুড়ো বয়েসে আর একটি বিয়ে করেছে। তার দাসীকে সাবিত্রী বলে,—তার "মনিবের বে বে নয় বেহাল।" —বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ। গবেশ নিজে বহুবিবাহ সম্পর্কে চিন্তা না করলেও, চাটুকার চিত্ততোষ, বিধর্মবাগীশের মতো মূর্খ পণ্ডিত এবং দন্তাচার্যের মতো দলপতির সাহচর্যে গবেশের মন বিগড়ে গেলো। সে হঠাৎ ভাবে, আর একটি বিয়ে করবে। ভয় হলো, বহুবিবাহ সভা যদি বিরোধী হয়! বিধর্মবাগীশ বলে,—"রেখে দিন সভা; যত বেটা ভণ্ড একত্র হয়েছে। কৈ কোন শাস্ত্রে তো তার নিষেধ নাই।" মনুর আটপ্রকার বিবাহ বিষয়ক শ্লোকটি উদ্ধৃত করে সে বলে আট দশটি—যতো ইচ্ছে বিয়ে করা যেতে পারে। সুধীর গবেশের বাড়ীতে ঠাকুর পূজা এবং শিক্ষকতা করতো। সে উপস্থিত ছিলো। সে দেখে, এক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ বৃথা। তবু বলে,—"দেখুন স্ত্রীজাতির বৈষয়িক কার্য্যাতিপাত অধিক নাই, সাংসারিক যে কিছু কর্ম্ম তা সমাপন করে অনেক অবসর সময় ওদের নিরর্থক যাপন করতে হয়। তাতেই রিপুবিশেষের প্রাবল্যই প্রায় ঘটে উঠে, সুতরাং বহু স্ত্রীর নায়ক একটি পুরুষ হল্যে তাদের আন্তরিক অসন্তোষের আর সীমা থাকে না, এতাবতা বিবাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য যে পবিত্র প্রণয় তা বহুবিবাহে কোনরূপেই থাকে না।" সুধীর আরও বলে যে এক্ষেত্রে স্ত্রীর ভ্রষ্টা হবার সম্ভাবনা বেশী। বিধর্ম অট্টহাসি হেসে বলে ওঠে— "হাঃ হাঃ হাঃ, অহে ভায়াহে, কুলীনের ছেলেদের ওতে অযশ হয় না হে ভাই। ঐ যে শাস্ত্রে লিখেছে,—"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভূজো যথা।" সুধীরের কথায় এরা কর্ণপাত করে না, বরং ফলে উল্টো হয়,—অর্থাৎ সুধীরের চাকরী চলে যায়। চাকরীটা চিত্ততোষের ভাগ্যে জোটে।

পঞ্চাশ বছর বয়সের গবেশবাবু কুসুমপুর থেকে নতুন স্ত্রী চন্দ্রলেখাকে বিয়ে করে আসে। সাবিত্রী অতি সহজে নিজের দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করে নেয়। তার মন ভালো, সতীনের ওপর সে বিদ্বেষ রাখে না। সে বলে—"আমি তো এক্‌কাল ভোগ করেছি, এখন যে আসচে, সেই করুক, আমি ঘরদোর ধর্ম্ম কম্ম সব এখন তারি হাতে দেবো।" বধূকে মাছ দিয়ে বরণ করতে হয়। প্রতিবেশিনী অমলা পরামর্শ দেয—বেলে মাছ দিয়ে অভ্যর্থনা করতে। বেলে মাছ বোকা। নূতন বৌও তাহলে বোকা হবে, সাবিত্রীর বাধ্য হবে। সাবিত্রী উত্তর দেয, স্বামীর হাতে বোকা মেয়ে পড়বে, এটা সে পছন্দ করে না।

গবেশের দুইটি বিয়ের ব্যাপার নিয়ে এক সহুরে ভদ্রলোক গ্রাম্য পরিবেশকে নিন্দা করেন। "বুড়োকেও পারা যায়, কতকগুলি যে খুড়ো আছে, তারা আবার বুড়োর বাবা।" এই ধরনের একজন "খুড়ো" দন্তাচার্যকে একদিন সুধীর ধরে। বলে বহুবিবাহ নিবারিণী সভার সভ্যদের ভালো বিদায় দেওয়া হবে। উচ্ছ্বসিতভাবে দন্তাচার্য তখন বলে—"দেবে বৈ কি; তুমি বেঁচে থাক, এই দেখ বহুবিবাহ নিবারিণী সভা যাতে খুব জেঁকে ওঠে, তাই কর, ওতে বিস্তর উপকার আছে। আমার তিনটী কন্যা একটী কুলীনকে দিতে হয়েছে, তার আবার একশ দেড়শ বিবাহ, একবার উঁকি মেরে দেখে না, দুঃখের কথা বল্‌বো কি? মেয়েদের যাতনা দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়।" সুধীর বলে,—"এত আপনি ভাল বুঝেছেন?" দন্তাচার্য উত্তর দেয়,—"ভাই বুঝি সব কেবল অভিমান বৈ ত নয়, তা আমি এখন চল্‌লাম—তোমার প্রতিই সব ভার।" দন্তাচার্য চলে যায়।

গবেশবাবুর সংসারে বহুবিবাহের কুফল ফল্‌তে সুরু করেছে। চন্দ্রলেখার পরামর্শে গবেশবাবু তার নিজের সম্পত্তি বিক্রী করে বেনামীতে নিজের ছোট-বৌয়ের নামে সব বিষয় ডেকে রেখেছেন। সাবিত্রীর দুটো ছেলেকে ফাঁক দেওয়া—এই লাভ। তাছাড়া এমনিতেও সাবিত্রী এবং তার ছেলেদুটির ওপর কষ্ট দেওয়া লেগেই আছে। ছোট বৌ কাউকে মানে না। কর্তাকেও নয়। সুধীরকে সাবিত্রীর বড়ো ছেলে সুবোধ বলে,—"আহার করতে গেলে আহার করতে পাইনে, বিছানাতে জল ঢেলে রাখেন।" নিজের কষ্ট যদিও বা সহ্য হয়, মায়ের কষ্ট সে চোখের ওপর সহ্য করতে পারে না। একদিন সুবোধ ভাবে, বাড়ী ছেড়েই চলে যাবে। ব্যাপারটি কিছুই নয়—আজ বন্ধুরা আসবে

খবর পেয়ে সুবোধ গবেশের আনা একটা ছবি সৎমার ঘরের দেওয়াল থেকে সাময়িকভাবে খুলে এনে বৈঠকখানায় টাঙাতে যাচ্ছিলো, তাতে সৎমা তাকে গালাগালি দেয়।

ছোট বৌ চন্দ্রলেখা এদিকে তার বন্ধুদের কাছে বলে, প্রথম পক্ষের ওপরই গবেশের দুর্বলতা আছে। একটা ঘটনার কথা বলে সে প্রমাণ দিতে চায়। একদিন সাবিত্রী নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলো। কয়েকদিন হলো সুবোধ নিরুদ্দেশ হয়েছে। স্বামী তা শুনে সান্ত্বনা দিতে যেই না ওঘরে গিয়েছে, অমনি চন্দ্রলেখা খড়খড়ি খুলে বলে ওঠে কে ও, অমনি গবেশ অপ্রস্তুতের একশেষ। গবেশ বলে, "আমি তো ওর ঘরের কাছে যায় নি।" চন্দ্রলেখা মন্তব্য করে—"ঠাকুর ঘরে কেরে, আমি তো কলা খাইনি।"

ইতিমধ্যে ছোট বৌ সাবিত্রীকে একদিন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেয়। বলে, সে খবর জেনেছে সুবোধ মরেছে। সুবোধ মরেছে জেনে সাবিত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। নেহাৎ শত্রুতা বশে ছোট বৌ এটা জানায়। আসলে সুবোধ মরে নি।

এদিকে গবেশবাবুর ভাগ্যবিপর্যয় সুরু হয়েছে। গবেশবাবু শারীরিক অপটু হয়েছে, কর্মেও নানা বিভ্রাট এসে দেখা দিচ্ছে। নিজের বিষয় বিক্রী করে করে বেনামী করতে গিয়ে রমেশ রায়ের সঙ্গে মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত। আজকাল টাকা নেই—কেউ তোয়াক্কাও করে না—বৈঠকখানায় কেউ বেড়াতেও আসে না। গবেশ আক্ষেপ করে—"তা এমন শোচনীয় অবস্থা আমার ঘটেছে, তার কারণই তো আমি। ... যার প্রণয় পিপাসায় এই প্রবাণ বয়সেও আমি নবীনজন-সেব্য পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকি, যার জন্যে বিসদৃশ সামান্য আলাপ, সামান্য কথা লয়ে বালকের মত এখন রহস্য করতে হচ্ছে, এমন কি, এ অবস্থায় নিধুর টপ্পার বই পর্যন্ত কিনিছি, আর আপনার পূজা আহ্নিকের সময়কেও সঙ্কোচ করে সেই অসার ঘৃণিত পুস্তক কণ্ঠস্থ করেছি, যার জন্যে এতদূর পর্যন্ত হলো, সেই বা আমার প্রতি প্রসন্ন কৈ?" এখন গবেশবাবুর চাকর মদোও মনিবের কথা শোনেনা, কথায় কথায় বিরক্তি প্রকাশ করে। চিত্ততোষকেও গবেশ হারাতে বসেছে। যেদিন গবেশ সাবিত্রীকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলো, সেদিন ছোট বৌ গবেশকে লক্ষ্য করে হাল্লিশহুরে খ্যাংড়া ছুঁড়ে মারে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা চিত্ততোষের গায়ে লাগে। পাঁচ-ছয় মাসের বাকী মাইনে দশ টাকা আদায় করে সে চলে যায়। গবেশ নিজেকে একাকী ভাবে। সেটা আরও অনুভব

করে—যেদিন সাবিত্রী গলায় দড়ি দেয়। একদিন আকস্মিক পীড়ায় গবেশের মৃত্যু হয়। লোকে মন্তব্য করে, কেউ কোনো ওষুধ খাওয়ানোর জন্যে এটা হয়েছে। চন্দ্রলেখার কলঙ্কের ভয় নেই। "আমরা চাঁদের জাত, কলঙ্কে আমাদের ভয় কি? চন্দ্রে কলঙ্ক না থাকলে কি তার শোভা হয়ে থাকে।"

নিরুদ্দিষ্ট পুত্র সুবোধ দুঃস্বপ্ন দেখে দেশে ফিরে এসে সব কিছু শুনে আক্ষেপ করে। সুধীর সান্ত্বনা দিয়ে বলে,—"বৎস, কি করবে বল? দেখ বহুবিবাহ দুষ্প্রথার অনুমোদনই মূল, সুহৃদ্বাক্য না শোনাই বৃক্ষ, সতী স্ত্রীর অবমাননাই পুষ্প, সময়ে তারই এই সকল ফল ফল্‌লো।"

উভয় সঙ্কট (১৮৭২ খৃঃ) রামনারায়ণ তর্করত্ন॥ বহুবিবাহ জনিত মানসিক অশান্তি পরিণতিতে প্রদর্শন করে লেখক বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। প্রহসনের পরিণতিতে উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে কর্তা "সভ্য মহাশয়"-দের উদ্দেশ করে নিজের দুর্গতি প্রচার করেছেন। "আমার দুর্গতি আপনারা দেখ্‌চেন, আপনাদের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যশালী পুরুষ কেহ থাকেন, তিনি এমন সময় উপস্থিত হলে না জানি কি করেন, বোধ করি তাঁরও এইরূপ উভয় সঙ্কট!"

কাহিনী —দুইটি স্ত্রীর সেবার আগ্রহাতিশয্যে কর্তার উভয় সঙ্কট। পারস্পরিক অসূয়াবশে এবং স্বামীপ্রিয় হবার আশায় স্বামী সেবায় দুজনের প্রতিযোগিতা চলে। তাদের কাজের ধারা এমন বিপরীত এবং দুজনের ক্ষমতাও এমন ভয়ঙ্কর যে সঙ্কটে পড়ে স্বামীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

গয়লানী দুধ দিতে এসেছে। তার কাছে দাঁড়িয়ে বড় বৌ অনুপস্থিত ছোট বৌয়ের নামে কিছু নিন্দে ছড়ালো। ছোট বৌ তখন পাড়ার কোন বাড়ী থেকে তেঁতুল সংগ্রহ করতে বাইরে বেরিয়েছিলো। স্বামীর আহার্যে বৈচিত্র্য আনবার জন্যে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। বলাবাহুল্য বড় বৌ ছোট বৌয়ের নামে স্বৈরিনীর অপবাদ দেবার এই রকম সুযোগটি ছাড়লো না।

বড় বৌ তরকারী কুটছিলো নিজের পছন্দ মতো রান্না করবার জন্যে। তার উদ্দেশ্য এই যে—রান্নার কৃতিত্বে সে স্বামীর অনুগ্রহ পাবে। কুট্‌নো শেষ করে সে গেলো জল আন্‌তে। ইতিমধ্যে তেঁতুল হাতে ছোট বৌয়ের আবির্ভাব হয়। বলা বাহুল্য, বড় বৌয়ের কুট্‌নো তার পছন্দ হলো না। লাথি দিয়ে তা উঠোনে ফেলে দিলো। তারপর নিজের

মতো কুট্‌নো কুটে রান্না চাপিয়ে চলে যায়। বড় বৌ ফিরে এসে ছোট বৌয়ের কাজ দেখে জ্বলে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে উনুন থেকে রান্না নামিয়ে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখে। এই সময় হঠাৎ দুজনের দেখা হয়ে যায় এবং বেশ একটা জমাট ঝগড়া বেধে ওঠে।

দিনটি ছিলো দ্বাদশী। আগের রাত্রে কর্তা উপোস করেছেন। কর্মের তাড়নায় তাঁকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। ঘর্মাক্ত দেহে পরিশ্রান্ত কর্তা বাড়ীতে ঢোকেন। উঠোনে কোটা তরকারী ছড়ানো। রান্নাঘরে উনোন নেভা অবস্থায় পড়ে, নীচে আধসেদ্ধ রান্না নামানো। অবাক হয়ে কর্তা কারণ জিজ্ঞেস করলে দুই সতীনে আবার ঝগড়া আরম্ভ হয়।

অবশেষে কর্তা অন্নগ্রহণের আশা ত্যাগ করে চিঁড়েমুড়ি ধরনের কিছু খাবার ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন। ছোট বৌ ছাতু খেতে চাপ দিলো, আর বড় বৌ চাপ দিলো চিঁড়ে খাবার জন্যে। একে অন্যের খাবারের নিন্দে করতে লাগলো। ছোট বৌ ইতিমধ্যে নিজের উদ্দেশ্য অব্যক্ত রেখে পাড়ায় পিসীর বাড়ী থেকে দই সংগ্রহ করবার জন্যে বাইরে গেলো। বড় বৌ এই সুযোগে ছোট বৌয়ের পাড়া বেড়ানোর ব্যাপারে অপবাদ দিলো। বল্‌লো, গয়লানী সাক্ষী আছে। ছোট বৌ দই আনলে বড় বৌ তা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো।

খাবার আশায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে কর্তা বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে পা টেপাটেপি নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়ে যায়। শেষে দুই বৌ কর্তাকে নিজের নিজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করতে লাগ্‌লো। কর্তা এভাবে উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে বিড়ম্বনা ভোগ করেন।

দাম্পত্য অংশীদারদের মধ্যে কোনো কু-প্রবৃত্তি না থাকলেও এমন কি সদিচ্ছা থাকলেও শুধুমাত্র অংশীদারের সংখ্যাবৃদ্ধি কিভাবে দাম্পত্য অশান্তি সৃষ্টি করে তার একটি অবকাশ সৃষ্টি করে বহুবিবাহের মৌলিক দিকটির প্রতি লেখকের কটাক্ষপাত প্রহসনটির মধ্যে লক্ষণীয়।

কলির দশদশা (কলিকাতা ১৮৭৫ খৃঃ) কানাইলাল সেন॥ মলাটে একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে,—

"বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষাংশ্চ নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ॥"

উপহার দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন,—"এই সৎসামান্য প্রহসনখানি আপনাদের মহোত্তম প্রণয় পীযূষ পরিপূরিত নেত্রের সম্মুখে মুকুর স্বরূপ অর্পণ করিলাম। যেমত দেখাইবেন, তেমতি দৃশ্য হইবে—এবং ইহার দ্বারা রচয়িতার আন্তরিক উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছে কিনা,—তাহাও সুধীর সুঠিক ও সদ্বিচার প্রবর পাঠকবর্গের পাদপদ্মে ন্যস্ত…।[৫৬] গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কি ছিলো, তা জানা যাবে নাটক শেষে হরিদাসের উক্তির মধ্যে।—

উপস্থিত ঘোর কলি দোষ দিব কারে।
ডুবিল ভারতভূমি পাপের সাগরে॥
অতএব বন্ধুগণ মম নিবেদন।
দুরন্ত কলির করে সঁপো না জীবন॥
অনাদি অনন্ত যিনি সর্ব্ব সারাৎসার।
দিনান্তে একান্তে ডাক সেই নিরাকার॥
দশদশা কি দুর্দ্দশা কলির প্রহসনে।
যেমন মন তার তেমনি ধন সেনের পুত্রে ভণে॥

সাধারণভাবে বিভিন্ন অনাচারের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হলে ইন্দ্রিয়-সুখাকাঙ্ক্ষা জনিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ এখানে প্রধান হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রহসনের অন্যতম চরিত্র দিগম্বর সুখের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছে,—"যে হতভাগ্য অপেক্ষা কত্তে না পেরে ইহলোকে সুখে থাকে চায়, ইহলোক সুখের স্থান ভেবে ইন্দ্রিয় সুখকেই সুখের পরাকাষ্ঠা কোরে আমোদে মত্ত হয়, সে ভ্রান্ত জীব আত্ম অনন্তসুখের পথে আপনিই কণ্টক বিস্তার করে।"

কাহিনী—হরিহর দত্ত বৌবাজারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তাঁর তিনটি পক্ষ। প্রথম পক্ষে সাবিত্রী, দ্বিতীয় পক্ষে তরঙ্গিনী। প্রথম পক্ষের এক কন্যা উমাকালী এবং দ্বিতীয় পক্ষের একপুত্র নবকুমার বর্তমান। সকলে জানে, হরিহর তরঙ্গিনীকে বিয়ে করতে যাবার সময় সাবিত্রীকে দশমাস অন্তঃসত্ত্বা রেখে গেছিলেন। ফিরে এসে শোনেন এক কন্যা প্রসব করে সাবিত্রী মারা গেছে। তখন খোঁজ করে একজন দুগ্ধবতী ধাইকে যোগাড় করে তার ওপর মেয়েকে মানুষ করবার ভার দেওয়া হয়েছে। আসল

৫৬। কলিকাতা—১লা বৈশাখ, ১২৮২ সাল।

ঘটনা সাবিত্রী মরে নি। সে স্বামীসুখে বঞ্চিত ছিলো। ভেবেছিলো দাসী সেজে সে স্বামীর সেবা করবে। তাই সে নিজেই দুগ্ধবতী ধাই সেজে ছদ্মবেশে স্বামীগৃহে দাসীর কাজ করছিলো। সে-ই দুগ্ধবতী ধাই এখন সবার কাছে 'সাবি' বলেই পরিচিত। স্বামী এবং দ্বিতীয় পক্ষের কালিন্দী—কেউই সাবিকে সাবিত্রী বলে চিনতে পারলো না। উমাকালী তখন ১৫/১৬ বছরের হয়ে উঠেছে। বাগদের ছেলের সঙ্গে সে গোপনে প্রণয় করেছে। ঘটক খেলারাম চূড়ামণির সহায়তায় ঐ ছেলেটির সঙ্গেই হরিহর মেয়েটির বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

হরিহরের পুত্র নবকুমার ব্রাহ্ম হয়েছে। সমাজে নিয়মিত যাতায়াত করে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নবীনকিশোর। সেও একজন সমাজভ্রাতা। হরিহরের যুবতী স্ত্রী তরঙ্গিনীর সঙ্গে সে আন্দির মা-র সহায়তায় পত্রে যোগাযোগ করে। দাম্পত্য জীবনে অসন্তুষ্ট তরঙ্গিনী নবীনকিশোরের পায়ে যৌবন সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। সতীন কালিন্দীর ওপর তার রাগ। "আর উননমুখো ভাতারও তেমনি, যেন কালীন্দীর কেনা গোলাম! ওঁরে ওঠ বোল্লেই ওঠেন, আর বোস বোল্লেই বসেন। চুলয় যাগ, এখন এ পোড়া সংসারের মুখে ছাই দিয়ে ড্যাং ডেঙিয়ে চলে যাবো।"

হরিহরের ভাই দিগম্বর। তিনি অবিবাহিত এবং সৎ লোক। দাদার কাছেই তিনি থাকেন। একদিন নবীনকিশোর তাঁকে ধরে নিয়ে যায় ঝামাপুকুরের সমাজ মন্দিরে। গান মোটামুটি ভালো লাগলেও বক্তৃতা এবং ঢঙ্‌ঢাঙ্‌ তাঁর কাছে ভালো লাগলো না। ভণ্ডামি বলেই মনে হলো। বিশেস করে বিধবাদের বিয়ে দেওয়াটাকেই এঁরা যেন আসল ধর্ম ভাবে। দিগম্বর ব্রাহ্ম সমাজকে গালাগালি করেন। "তো—তোমাদের পালের গোদাও তে-তেম্‌নি একজন ধ-ধর্ম্মপুত্র যু-যুধিষ্ঠির! হুঁ, বে-বেটার বাপ মরেন মালা ঠক্‌ ঠকিয়ে, আর বা-বাবু আমাদের ইজ্জের প্যা-প্যান্টুলুন ব্যবহার করেন, পোঁটাচুন্নির বে-বেটার নাম চ-চন্দনবিলাস।" নবীনকিশোরকে তিনি "ব্রহ্মবকধার্মিক" বলেন। নবীনকিশোর ভাবে, —"দয়াময় কত দিনে এঁদের পাপান্ধকার থেকে দীপ্ত জ্ঞানালোকে লয়ে যান।"

এই নবীনকিশোরই একদিন ধরা পড়ে হরিহরের যুবতী স্ত্রী তরঙ্গিনীর ঘরে। তরঙ্গিনীর নির্দেশ মতো সে নারীবেশে তরঙ্গিনীর ঘরে এসেছে।

সেদিন হরিহরের হরিবাসরের দিন। তরঙ্গিনী নিশ্চিন্ত। নবীনকিশোর ঘরে ঢুকলে তরঙ্গিনী তাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় শুয়ে দেয় কু অভিপ্রায়ে। এদিকে নবীনকিশোরের ভয়ে গলা শুকিয়ে যায়। সে কাঁপতে থাকে। অবশেষে জল খায়, কিন্তু গলার মধ্যে শড়্‌শড়ানি আরম্ভ হয়। সে কেশে ফেলে। কাছাকাছি কোথাও হরিহরের ভাই দিগম্বর ছিলেন। তিনি তরঙ্গিনীর ঘরে পুরুষের কাশি শুনে তরঙ্গিনীকে দরজা খুলতে বলেন। বাধ্য হয়ে তরঙ্গিনী দরজা খোলে,—অবশ্য নবীনকিশোরকে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে। ঘরে ঢুকে দিগম্বর খাটের তলায় নবীনকিশোরকে আবিষ্কার করেন। ইতিমধ্যে নবকুমারও এসে পৌঁছোয়। নবকুমারকে দিগম্বর নির্দেশ দেয়— নবীন যেন না পালায়। তাকে শিক্ষা দেবার উপযোগী হাতিয়ার আন্‌তে তিনি বাইরে যান। নবকুমার নবীনকে পালাতে সাহায্য করে। কিন্তু পালাতে গিয়ে নবীন আরও বিপদে পড়ে। কালিন্দী ভাবে—স্বামী বুঝি তরঙ্গিনীর ঘরে এতোক্ষণ ছিলো। স্বামী মনে করে নবীনকে ধরে গালাগালি ও প্রহার করে। ইতিমধ্যে আসল স্বামী এসে পড়ায় লজ্জায় নবীনকে ছেড়ে দেয় সে। নবীন এতোক্ষণে মুক্তি পায়।

হরিহর মনমরা হয়ে যান। তরঙ্গিনী ভ্রষ্টা। কালিন্দীর পরিচয়ও পাওয়া গেলো প্রত্যক্ষ। সে একজন পরপুরুষকে নিয়ে কি যেন করছিলো—যতোই চেপে থাকুক সাবিত্রীর কথা তাঁর তখন বার বার মনে পড়ে।

কালিন্দীও ইতিমধ্যে এক সর্বনাশ করে বসেছে। সতীনকে দুর্নামের ভাগী করবার উদ্দেশ্যে সতীনের মেয়ে অবিবাহিতা উমাকালীকে যুবকের সঙ্গে সহবাসের সুযোগ দিয়ে গর্ভবতী করিয়েছে। প্রলোভন জয় করা যুবতী মেয়েটির পক্ষে সহজ ছিলো না, বলা বাহুল্য। কালিন্দীর "মতলব সতীনের ঝাড়ে বংশে নির্মূল করবেন।" রসময়ী নামে এক স্ত্রীলোককে দিয়ে স্বামী-বশের জন্যে টোট্‌কা প্রস্তুত করিয়ে রাখে। সুযোগ মতো স্বামীকে খাওয়াবে। এদিকে নবকুমারও হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

কালিন্দীর টোট্‌কা ওষুধ খেয়ে হরিহর মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে বিলেত থেকে নবকুমারের একটা চিঠি আসে। একজন মেমের সঙ্গ এবং সুরাপান তাকে নাকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এটাই বোধহয় তার শেষ চিঠি—সে তাই লিখেছে। অবশ্য ওটা সত্যিই শেষ চিঠি ছিলো। নবকুমার সেখানেই মারা যায়। দুঃসংবাদের ওপর দুঃসংবাদ। তরঙ্গিনী নবীনকে নিয়ে

নিরুদ্দিষ্ট হয়। রোগ যন্ত্রণার ওপর এসব যন্ত্রণা হরিহরের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কালিন্দী বুঝতে পারে যে, সে পরের সর্বনাশ করতে গিয়ে নিজেরই সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সে মানসিক যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যায় এবং এই অবস্থাতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই দুঃসংবাদ শুনে অসুস্থ অবস্থায় ছুটে যেতে গিয়ে হরিহর পড়ে গিয়ে মারা যান। সাবিত্রী নিজের আত্মপরিচয় আর গোপন রাখতে পারে না। কিন্তু সে পাগল হয়ে যায়। পাগল অবস্থায় সে বলে, এতোদিনে সে স্বামীর পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। ঝুলন্ত কালিন্দীকে সে টানাটানি করে বলে, এবার দোলা থেকে নামুক, সাবিত্রী চড়বে। টানাটানি করতে গিয়ে কালিন্দীর মৃতদেহ সাবিত্রীর ঘাড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীরও মৃত্যু হয়। ডোমরা কালিন্দীর ভারী লাশ আলাদা করে নিয়ে চলে, সাবিত্রী ও হরিহরের লাশ একসঙ্গে বাঁশে বেঁধে নিয়ে চলে। এইভাবে কলির দশদশা সবাই প্রত্যক্ষ করে।

বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে লেখা আরও কিছু কিছু প্রহসন ভিন্ন অবকাশে প্রদর্শনীর ভিন্ন স্থানে উপস্থিত করা হয়েছে! বিভিন্ন সমস্যাজনিত দৃষ্টিকোণের পার্থক্যই এই বিক্ষিপ্ততা এনেছে। তবে প্রধানভাবে বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু প্রহসনের নাম পাওয়া যায়—যেগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। যেমন—**দুই সতীনের ঝগড়া (?)**—হরিহর নন্দী; **দুই সতীনের ঝগড়া**—(১৮৬৯ খৃঃ)—মুন্সী নামদার (ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়), **সপত্নী কলহ** (১৮৭২ খৃঃ)—হরিশচন্দ্র মিত্র; **বৌবাবু**—(১৮৮৩ খৃঃ)—গোঁসাইদাস গুপ্ত; **এক ঘরে দুই রাঁধুনি পুড়ে মলো ফ্যান গালুনি** (১৮৮৭ খৃঃ)—রাধাবিনোদ হালদার, **দোজবরে ভাতারের তেজবরে মাগ** (১৮৮৭ খৃঃ)—রাধাবিনোদ হালদার;—ইত্যাদি। অনুসন্ধান করলে এ ধরনের আরও প্রহসন পাওয়া অসম্ভব নয়।

(গ) বাল্যবিবাহ ॥

মানুষের যৌন চাহিদা যৌবনেই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাভাবিক নীতিরক্ষার খাতিরেই যৌবনকালে বিবাহকে সমাজ অস্বীকার করতে পারেনি। যে ক্ষেত্রে আর্থনীতিক বা সাংস্কৃতিক অস্বাভাবিকতায় যৌবন বিবাহ সঙ্ঘটিত হয় না, সেখানে সমাজ অনাচার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়। বস্তুতঃ যৌন, আর্থিক

এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিশিষ্টতায় যৌবন বিবাহকালের পূর্ব পরিধির অবস্থান নিয়ে টানাটানি চলেছে। বলাবাহুল্য এ ধরনের একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ থেকে জন্ম নিয়েছে।

পণপ্রথা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের স্পৃহা বাল্যবিবাহের জন্ম দিয়েছে। বৈদিকদের মধ্যে "পেটে পেটে সম্বন্ধ" নামে একটি সাধারণ প্রবচন আমাদের সমাজে পরিজ্ঞাত। কুলীনপুত্র এবং শ্রোত্রিয় কন্যার 'বাজার দর' বয়স অনুপাতে বাড়তে থাকে। যে সব ক্ষেত্রে অযোগ্যবিবাহের মতো অমানবোচিত অনুষ্ঠানে বরকর্তা বা কন্যাকর্তার আপত্তি থাকে, সে সব ক্ষেত্রে সমবয়সের পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দেবার চেষ্টা থাকে। অতএব একজন ব্যক্তির শিশুত্ব অন্য ব্যক্তির শিশুত্বেরও কারণ হয়ে দেখা দেয়। এইভাবে আর্থিক চাপ বাল্যবিবাহকে পোষণ করেছে। আর্থিক চাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক চাপ। যে ব্যক্তি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে কুশকন্যা দান করে, অযোগ্যবিবাহ অনুমোদন করে, তার দ্বারা যে বাল্যবিবাহের পোষণ ঘটবে, এটা স্বাভাবিক। উল্লিখিত আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ ছাড়া অন্য কারণও অনেকে আবিষ্কার করেছেন। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর "আচার" নামে একটি গ্রন্থে (১৮৯৬ খৃঃ) একটি মত উদ্ধার করেছেন। "বোধ হয় মুসলমানদিগের উপদ্রবের সময়ে যখন তাহারা অনূঢ়া কন্যা পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং অন্যান্য অত্যাচার করিত, হিন্দুরা কন্যাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অতি অল্প বয়সে তাহাদিগের বিবাহ দিবার নিমিত্ত এই অভিনব বিধান করিয়াছেন।"[৫৭] মতটি যতোই দুর্বল হোক না কেন, বাল্যবিবাহ প্রথাকে এই পরিবেশ যথেষ্ট পোষণ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটিকে বাল্যবিবাহের একমাত্র কারণ বলা অত্যন্ত ভুল হবে।

আমাদের সমাজে অনেক আগেই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানেই বাল্যবিবাহের পোষণ ঘটেছে। অন্ততঃ কন্যার ঋতুকালকে নিষ্ফল রাখবার ঘোর বিরোধী ছিলেন শাস্ত্রকাররা। তাঁরা এ সম্পর্কে অবিবাহিতা কন্যার অবধারককে যেভাবে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, সেখানে অনেকটা ভীতির বশেই বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে কন্যাদায় উদ্ধারের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে "সর্বশুভকরী" পত্রিকা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "বাল্যবিবাহের দোষ" সম্পর্কে একটি আলোচনায়

৫৭। আচার, ৫ম অধ্যায়—১৫৫ পৃঃ।

আছে—[৫৮] "অষ্টম বর্ষীয় কন্যাদান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়, নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়; দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পাত্র পবিত্র লোক প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্যমাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।"

ঋতুকাল নিষ্ফল থাকতে দেবার বিরুদ্ধাচরণে শাস্ত্রকারদের কোন্ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো, তা ইতিমধ্যে বিভিন্ন বক্তব্যে বলা হয়েছে। প্রথম রজঃ সন্তান-ধারণ ক্ষমতার বার্তা বহন করে। এ সম্পর্কে একটি গ্রন্থে আছে,—"The first menstruation is the usual sign that girl has become capable of conception and childbearing."[৫৯] এ ধরনের অন্যান্য গ্রন্থেও একই কথা আছে।[৬০] আমাদের দেশের শাস্ত্রকার 'বৃষলী' কন্যা বিবাহের নিন্দা করেছেন। কশ্যপ বলেছেন,—

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্য সংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥
যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্‌বৃষলীপতিম্।[৬১]

যম সংহিতায় বলা হয়েছে,—

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যা রজস্বলাম্॥[৬২]

এইভাবে বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে রজস্বলা হওয়ার আগেই কন্যার বিবাহ দেওয়ার ওপর সাংস্কৃতিক বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহের নির্দেশ অনেক সময় পরিষ্কারভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে। পৈঠীনসি বলেছেন,—"যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ ঋতুমতী ভাতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে। তস্মাৎ নগ্নিকা দাতব্যা।[৬৩]

৫৮। বিদ্যাসাগরের রচনা বলে গৃহীত।
৫৯। Gallabin's Midwifery—p. 45.
৬০। দৃষ্টান্তস্বরূপ—The Science and Practice of Midwifery—W. S. Playfair, M. D., LL. D., F. R. C. P., p.—72.
৬১। উদ্বাহতত্ত্বধৃত কশ্যপ বচন।
৬২। যম সংহিতা—২৩।
৬৩। জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগ ধৃত।

নানারকম বিধির চাপে সমাজসভ্য কন্যা সমর্থ হওয়া মাত্রই তাকে "পুত্রার্থে" নিয়োজিত করেছে ; এবং স্বাভাবিক কারণেই ক্রমে ক্রমে মাত্রা এসে এমন স্থানে ছেদ টেনেছে যেখানে শাস্ত্রকারের বিধি—"জাতমাত্রা তু দাতব্যা কন্যাকা সদৃশ বরে।" অবশ্য এই সমস্ত বিধির পাশাপাশি আরও বিধি ছিলো যা যুক্তি সম্মত হয়েও স্মৃতি বিধানসমূহের একতাবদ্ধ চাপে মূল্যহীন হয়ে পড়েছিলো। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে,—

অজ্ঞাতপতি মর্য্যাদামজ্ঞাত পতি সেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্ম শাসনাম্ ॥৬৪

যৌন নীতির দিক থেকে বাল্যবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি সমূহের মূলে বিবেচনা শক্তি সম্পূর্ণ অভাব ছিলো বললে ভুল বলা হয়। আধুনিক-কালে বার্ধক্য বিবাহরীতি এবং যৌবনকালীন বুভুক্ষা সমাজে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তাতে আধুনিক যৌনবিজ্ঞানীরাও সমর্থকালীন অবস্থার প্রথমেই বিবাহদানের পক্ষপাতী। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে আবুল হাসানাৎ লিখেছেন,— "যাঁহারা অল্প আয়ের জন্য এখনও বিবাহ করিতেছে না তাঁহারাও জন্ম-নিয়ন্ত্রণে পরিপক্ক হইলে যথাসময়ে বিবাহ করিতে ভয় পাইবেন না। সুতরাং সমাজে বর্তমান সময় অপেক্ষা ব্যভিচার, গণিকাবৃত্তি, রতিজরোগ, গর্ভপাত ও ভ্রূণহত্যা অনেক কম হইবে এবং বিবাহিত জীবনে, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রেম বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম যৌবনে বিবাহ হওয়াতে অবাঞ্ছিত গর্ভের আশঙ্কা দূর হওয়ায় ও আর্থিক সচ্ছলতা থাকায় দম্পতির প্রণয় মধুর ও গভীর হইবে। পরোক্ষতঃ মদ্যপান, অপরাধ, মোকর্দ্দমায় অর্থনাশ ইত্যাদি হ্রাস পাইবে।"৬৫

হাসানাৎ সাহেব প্রথম যৌবনে বিবাহদানের পক্ষে মত দিয়েছেন—অবশ্য সন্তান উৎপাদনের জন্যে নয়, সুস্থ যৌনতৃপ্তির জন্যে। বার্ধক্যবিবাহ-জনিত অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছাড়া বাল্যবিবাহকে পোষণ করবার যুক্তিসম্মত কোনো কারণ থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বাল্য-বিবাহকে পোষণ করা হয়েছে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করবার জন্যে। বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে অগোচরে

৬৪। মহানির্বান তন্ত্র-অষ্টমোল্লাস—১০৭।

৬৫। যৌনবিজ্ঞান (২য় খণ্ড) আবুল হাসানাৎ—পৃঃ ২৮।

বা গোচরে এই মনোভাব অনেকেই প্রকাশ করেছেন। "আর্য্যদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত "বঙ্গীয় বিবাহ প্রথা" নামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে,—"আমাদিগের দেশে পিতামাতা যে নিঃস্বার্থ বাল্যবিবাহ অনুমোদন করেন, তাহা মনে করিবেন না। একদিকে আমোদ, পুত্রকে দৃঢ়রূপে সংসারে বদ্ধ করা এবং সেই সঙ্গে কিছু লাভ। অন্যদিকে যত শীঘ্র কন্যাদায় হইতে মুক্তি হয়, ততই লাভ।"৬৬ হিন্দুসমাজ ও বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে "অনুসন্ধান" পত্রিকার একটি আলোচনায় আছে,—

"অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতি সভ্যতার রসাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া বাল্যবিবাহের প্রতিকূলে অন্ততঃ দুই একটা কথা না কহিয়া থাকিতে পারেন না। বাল্যে বিবাহ উচিত কিনা, আমরা এ প্রবন্ধে সে কথার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব না। তবে উচিত হউক বা অনুচিত হউক, ইহা যে হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং ইহা উঠিয়া যাইলে যে হিন্দুসমাজকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা হিন্দুসমাজের উচ্ছেদাভিলাষী পরম শত্রুকেও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দুর বিবাহ অন্যান্য জাতির ন্যায় শুদ্ধ বর কন্যায় বিবাহ নহে। একটী অপরিচিত পরিবারের সহিত অপর একটী পরিবারের মিলনই হিন্দুর বিবাহ।

যদি বিলাতি স্বয়ম্বর (Courtship) হিন্দুসমাজে চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে জগতে সতীত্বের আদর্শ পবিত্র হিন্দুসমাজের কি অবস্থা হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন। কুমারী অবস্থায় সেই চঞ্চল অপরিণত বুদ্ধিতে শত শত পুরুষ পরীক্ষা করিয়া পতি মনোনীত করিতে গিয়া তাহার সতীত্বের দশা কি হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন।

একটি অজ্ঞান বিহঙ্গকে বহুযত্নে ধাড়ী বেলায় পোষ মানান যায় না। ইংরাজাদির সমাজ স্বতন্ত্র প্রকার। সতীত্বনাশে পরিবারের মধ্যে থাকিতে হয় না। তাহারা নববিবাহিত স্ত্রীর কাছে দাসবৎ (Groom) এবং আমরা বর।"—ইত্যাদি।৬৭

বস্তুতঃ বাল্যবিবাহ প্রথা উদ্ভবের মূলে যে কারণটি ছিলো তা অত্যন্ত জটিল। এই প্রথা আমাদের সমাজে তার সমস্ত শ্রীফল সঙ্গে নিয়ে ক্রমে দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কুলপঞ্জীর মধ্যে বাল্যবিবাহের ভয়াবহ নিদর্শনও কতকগুলো থেকে

৬৬। আর্য্যদর্শন আশ্বিন—১২৮৮ সাল।

৬৭। অনুসন্ধান—৩০ পৌষ, ১২৯৪।

গেছে। ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন বিষ্ণুঠাকুরের পৌত্র সীতারামের বিবরণে আছে,—"সীতারামস্থ উচিত···বং রামানন্দগ্রহণাৎ। অত্র প্রবন্ধেন ত্রয়োদশ দিবসীয়া কন্যা পণস্থ মুদ্রা সহিত দদে, সীতারাম বলাৎকার ভয়েন স্বকৃতং।" ইত্যাদি।[৬৮]

বাল্যবিবাহ থেকে এবং বহুবিবাহ থেকেও স্ত্রীসমাজে যে অপ্রতিরোধ্য দাম্পত্য অসন্তোষ জেগেছে, তাকে ঠেকাবার জন্যে কৃত্রিম প্রচেষ্টা চাপানো হয়েছে,—কিন্তু এতে বাল্য বিবাহজনিত দাম্পত্য অসন্তোষ রোধ করা সম্ভবপর হয় নি।

বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের কতকগুলো দোষ একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন।[৬৯] সেগুলোর মধ্যে পাঁচটি দোষই উল্লেখযোগ্য। (ক) বাল্যবিবাহে আমাদের দৈহিক দুর্বলতার কারণ: অপক্ব বীর্য নিষেকাদি বিভিন্ন কারণে দুর্বলতা। (খ) বাল্যবিবাহ প্রথা লুপ্ত না হলে স্ত্রী-শিক্ষা হবে না, ফলে জনশিক্ষাও হবে না। পুরুষপক্ষে উপার্জন ক্ষমতার আগেই বিবাহ ঘটায় অর্থসঙ্কট এবং পরমুখাপেক্ষা। (গ) দুষ্প্রবণতা—যা বিদ্যারত হলে জাগা সম্ভবপর নয়। (ঘ) মানুষের মৃত্যু সম্ভাবনা ১ থেকে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে এর মধ্যে পুরুষের বিবাহ ঘটলে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। (ঙ) যৌবনে বিধবা হওয়াতে পাপের আশঙ্কা বেশি থাকে।—যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর যেগুলো বলেছেন—সেগুলোর কোনোটিই বিশেষ দুর্বল যুক্তিসম্পন্ন নয়। অবশ্য আরও কতকগুলো কারণও বিক্ষিপ্তভাবে সমসাময়িককালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বা পুস্তিকায় পাওয়া যাবে। "মিত্র প্রকাশ" পত্রিকায় বাল্যবিবাহের দোষের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।[৭০] "বাল্যবিবাহ দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ ও তাহাদিগের সন্তানাদির স্বাস্থ্যের হানি হয়, তদ্দারা মানসিক প্রকৃতি সকলের হ্রাস হইয়া পড়ে এবং অল্পবয়সে ভোগ ইচ্ছা হইলে দূর স্থানে গিয়া বিদ্যা ও অর্থোপার্জনের ব্যাঘাত হয় এবং স্ত্রী পুরুষের বাল্যাবস্থা প্রযুক্ত পরস্পরের মনোনীত করিবার ভার তাহাদিগের পিতামাতার উপরেই ন্যস্ত থাকে। বংশ মর্যাদা, ধন, রূপ, বিদ্যা ও চরিত্রের বিষয়ে তদন্ত

৬৮। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—(১ম খণ্ড) বিনয় ঘোষ।

৬৯। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ দ্রষ্টব্য।

৭০। মিত্র প্রকাশ—২৩শে শ্রাবণ—১২৮১।

করিয়াই কন্যা-পুত্রের বিবাহ পিতামাতা দিয়া থাকেন। কিন্তু বাল্যকালে তাহাদের প্রকৃতি পরিণত নয়, এজন্য এতদূর দেখিয়া বিবাহ দিলেও পশ্চাৎ তাহাদিগের মন্দ প্রকৃতি লইয়া পরস্পরের কষ্ট জন্মাইতে পারে।"

বাল্যবিবাহের প্রত্যক্ষ কুফল যাই হোক, পরোক্ষ কুফল খুঁজলে দেখা যাবে তা সংখ্যাতীত; এবং সেগুলোও অত্যন্ত জটিল অবস্থায় অবস্থান করে থাকে।

বাল্যবিবাহ সমাজের একটি দুষ্প্রথা। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ছাড়া সমাজের দুষ্প্রথার লোপসাধন সহজ নয়। এবং, নব্য সংস্কারকদের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে "কন্‌সেন্ট্‌ বিল্‌" পাশের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিলো। কনসেন্ট বিলের প্রস্তাবে অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তিরই গাত্রদাহ হয়েছিলো। চট্টগ্রাম থেকে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "হায় কি সর্বনাশ" নামে একটি পুস্তিকা "গর্ভাধান বিলের প্রতিবাদকারী মহাত্মাদের পবিত্র করকমলে" উপহৃত হয়। তার মধ্যেকার কয়েকটি বক্তব্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ টানতে পারি।—

(৩৬) "ও হে লর্ড ল্যান্সডাউন! কেন কেন তুমি আজ
ভ্রমেতে ডুবিয়া।
করিলে ধর্ম্মের লোপ নীরবে বসিয়া॥
কান্দিল ভারতবাসী বিশ কোটী প্রজা।
কি দোষে তাদের বল দিলে এই সাজা॥...

(৪৫) তুলিয়াছ সতীদাহ চড়ক ঘূর্ণন।
তাতে ত আপত্তি কেহ করে নি কখন॥
শিশু সুত বিসর্জ্জন দিলে বিসর্জন।
বিরুদ্ধে একটী স্বর ছুটে নি কখন॥
গর্ভধানে ধর্ম্মনাশ হইবে দেখিয়া।
মন দুঃখে কাপে সবে কাতরে ডাকিয়া॥"

ধর্মের দোহাই দিয়ে এই কুপ্রথাকে সঞ্জীবিত রাখা সম্ভবপর হয় নি। দৃষ্টিকোণ ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠেছিলো এবং হিন্দুসমাজের গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্যান্য সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। বাল্যবিবাহ মুসলমানসমাজেও বিষময় ফল উৎপন্ন করেছিলো। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ব্যাপক দৃষ্টিকোণ উক্ত সমাজে কিছু পরে লক্ষিত হয়েছে। ১৩১৬ সালের জৈষ্ঠমাসে হোসেনপুর (পোঃ সিরাজগঞ্জ) নিবাসী মোহম্মদ মেহেরউল্লা 'সমাজ চিত্র' নামে চিহ্নিত করে "বাল্যবিবাহের

বিষময় ফল” নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। তার ভূমিকায় বলেছেন,—"আমাদের মুসলমানসমাজের মধ্যেই এই কুসংস্কাররূপ সংক্রামক পীড়া বহু পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে আক্রমণ পূর্ব্বক অবনতির গভীরতম কূপে নিপতিত করিতেছে।…সমুদয় কুসংস্কারের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, সর্ব্বপ্রধান মারাত্মক ও অবনতির দ্বার স্বরূপ বাল্যবিবাহ। যতদিন বাল্যবিবাহ সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারা না যাইবে, ততদিন এই মুসলমান জাতির উন্নতির আশা কখনই করা যাইতে পারে না।” গ্রন্থকার যথেষ্ট যুক্তিরও অবতারণা করেছেন। যথা,—"শিশু বালক বালিকার ইজাব কবুলের দ্বারা বিবাহ কখনই ছহি হইবে না।…উল্লিখিত বিবাহ উকীল দ্বারা সমাধা হয় না খোদে খোদে হয়? যদি উকিল দ্বারা সমাধা হয়, তাহা হইলে ওকালতীর সর্ত না পাওয়ায় ঐ বিবাহ ছহি হইবে না।”

পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিকোণের ব্যাপকতার মূলে কোনো প্রস্তুতি যে ছিলো না তা নয়। অতএব মুসলমানসমাজেও এর আগের থেকেই যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক দৃষ্টিকোণের পত্তন ঘটেছিলো, এটা অনুমান করা যায়।

কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সমসাময়িককালেই একই সঙ্গে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ ব্যাপক হতে আরম্ভ করে! এই ব্যাপক সমর্থনপুষ্টি অবশ্য একদিনে হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর ফলেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে হরিনাভিতে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহরোধ আন্দোলনের উল্লেখ করা যায়।[৭১] হরিনাভিতে আন্দোলন প্রচেষ্টা চলবার সময় দেখা গেলো সবই বৈদিক। যারা অবিবাহিত তারা ছিলো শিশু—প্রতিজ্ঞা পত্রের মর্ম বোঝবার উপায় তাদের ছিলো না। যারা অবশ্য বুঝতে শিখেছিলো, তারা সবাই বিবাহিত,—যদিও তারা স্কুলের ছাত্র! কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ ধরনের একটি জনপ্রিয় গান—[৭২]

"ডুবিল সোনার দেশ পাপের সাগরে
পরিপূর্ণ দশদিক্ ঘোর হাহাকারে।

৭১। বঙ্গবিবাহ (১৮৮৮খৃঃ)—চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বি, এ।

৭২। বৈকুণ্ঠচরণ বসাক সম্পাদিত "সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত"-এ উদ্ধৃত—পৃঃ ৪৫৩।

মহাপাপ শিশু বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে,
ছারখার করিল রে স্বর্ণ ভারতেরে।
ধন মান বুদ্ধি বল, সব গেল রসাতল,
জাগরে ভারতবাসী, উদ্ধার মায়েরে॥"

দৃষ্টিকোণ পুষ্টির আর একটি নিদর্শন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিশেষ নামকরণে স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশ। ১২৮০ সালে বৈশাখ মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। এতে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কবিতা প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। বলাবাহুল্য অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরনের প্রচুর কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিকোণের বাপকতা অনুভব করি।

নব্য সাংস্কৃতিক শক্তির সহায়তায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ পুষ্ট ধরেছে। যৌনসমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রহসনে প্রসঙ্গক্রমে বাল্যবিবাহ সমস্যার অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল—দুপ্রকার মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। বাল্যবিবাহের সমর্থকরা স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বেশ্যাবিবাহ, বৃদ্ধবিবাহ স্ত্রীলোকের ব্যায়াম চর্চা ইত্যাদি কতকগুলো অবান্তর অবকাশ সৃষ্টি করে বাল্যবিবাহের পক্ষে সমর্থনলাভের চেষ্টা করেছেন। সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর সূক্ষ্মভাবে মাত্রাবিচার কালে অতি সহজেই রক্ষণশীল প্রহসনকারদের দৃষ্টিকোণ এবং আক্রমণ পদ্ধতি উপলব্ধি করা যাবে। অনেকগুলো প্রহসনের মধ্যেই নব্য সংস্কারকের বেশ্যাবিবাহের কথা আছে। প্রহসনকারদের মতে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা মাত্রেই দূষিতা না হয়ে পারে না। সুতরাং যুবতীবিবাহ বেশ্যাবিবাহেরই নামান্তর। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "বৌবাবু" প্রহসনে (১৮৯৫ খৃঃ) রামকড়ি একজন বেশ্যাকে বরণ করতে গিয়ে বলেছে,—"আমি এমন সাধ্বী গুণশীলা যুবতী, সুমতি মানিনী কামিনীর শ্রীকমকণ্ঠে—না পাণিগ্রহণ করে বঙ্গে, ভারতে, জগতে প্রজলন্ত উদাহরণ পাষাণ ভাষায় পাষাণ অক্ষরে স্থাপন কত্তে সমর্থ হলুম।" অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ব্যায়াম শিক্ষার চিত্র উপস্থাপন করে বাল্যবিবাহ বিরোধীদের উল্লিখিত একটি মন্তব্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। (বিদ্যাসাগর উল্লিখিত প্রথম দোষটি জ্ঞাতব্য)। কেদারনাথ মণ্ডলের লেখা "বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাসা" (১৮৯৪ খৃঃ) প্রহসনে একটা পদ্যে এ ধরনের একটি ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। নব্য স্ত্রী সমাজের একটি মিটিংয়ে "গেঙ্গুলী" নামে একজন মহিলা পয়ারে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

"বঙ্গেতে দুর্বল কেন সন্তান নিচয় ।
কি করিলে তারা সব দীর্ঘজীবী হয়।
কিসে নিবারিত হবে অকাল মরণ ।
জেনেছি বিজ্ঞান বলে নব বিবরণ ॥
বালিকা বিবাহ এক দোষের আকর ।
বলহীন স্বামী সেই দোষের দোসর ॥
আমাদের এত দুঃখ সামর্থ্য অভাবে ।
সামর্থ্য হইলে দেখো সব দুঃখ যাবে ॥
কিসে সে সামর্থ হবে, কি আছে উপায় ।
ব্যায়াম শিখিলে বামা এড়াবে এ দায় ॥
আর এক কথা আছে শুনহ সন্ধান ।
বাছিয়া লউক স্বামী দেখিয়া জুয়ান ॥
জাতিভেদ দ্বিধা মনে কাহার না রবে ।
বলিষ্ঠ যে জাতি হোক, সেই স্বামী হবে ॥"

বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রহসনকারর৷ তাঁদের প্রহসনগুলোর পরিণতিতে কুফলগুলো যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাকেও তাঁরা টেনেছেন। বাল্যবিবাহের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ প্রকাশ পেলেও অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীপক্ষে সহানুভূতির আতিশয্যে অবাস্তবতা স্বাভাবিকমাত্রাকে স্পর্শ করেছে। বিশেষ করে বিধবা সমস্যার প্রসঙ্গে বিধবার মন্তব্যে তা স্পষ্ট। অবশ্য কোথাও কোথাও আবার শিশুদের অস্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের গতিবিধি কৌতুকের সঙ্গে পর্যবেক্ষণও করা হয়েছে।

বাল্যবিবাহের সমস্যা নিয়ে প্রচুর প্রহসন রচিত হলেও শুধুমাত্র বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করে খুব বেশি প্রহসন নেই—অন্ততঃ সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে একটি সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ "কন্‌সেণ্ট বিল্‌ পাশ" কে কেন্দ্র করে কতকগুলো প্রহসন রচনার সন্ধান পাই। সাধারণ দু একটি বাল্যবিবাহ-কেন্দ্রিক প্রহসনের পরিচয় দেওয়া হলো—যদিও এগুলো পাওয়া সম্ভবপর হয় নি।

"বাল্যদ্বাহ নাটক" (১৮৬০ খৃঃ) শ্যামাচরণ শ্রীমানি॥ "বিজ্ঞাপনে" (১৫ই আষাঢ়, ১৭৮২ শকাব্দ) লেখক বলেছেন,—"এক্ষণে বাল্যোদ্বাহ

নিবন্ধন অস্মদ্দেশে যে সমস্ত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎও যদিস্যাৎ এই নাটকে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধ বিবেচনায় পরম সন্তোষানুভব করিব।" নটীর মুখে একটি গীতে—

"গেল হে গেল হে বঙ্গ   কি আর দেখিছ রঙ্গ
দেহ হলো ভঙ্গ সবাকার ॥ ১ ॥
না হোতে যৌবন কাল,   সত্বরেতে গ্রাসে কাল,
হায় হায় কাল চমৎকার ॥ ২ ॥
তেজ হীন বুদ্ধিবৃত্তি   ধর্ম্মেতে নাহি প্রবৃত্তি,
কীর্ত্তি বৃত্তি, সব ভ্রষ্ট করে ॥ ৩ ॥
ভূমিষ্ঠ হোলে কুমার,   বিবাহ সম্বন্ধ তার।
সর্ব্বাগ্রেতে সার বুঝি করে ॥ ৪ ॥

প্রহসন শেষে ধনহীনের প্রতি বুদ্ধিহীনের দীর্ঘ বক্তৃতার (পৃঃ ৭১-৭২) গ্রন্থকার তার সব বক্তব্যই প্রায় বলেছেন। দীর্ঘ হলেও সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি না দিলে চলে না।—

"মহাশয়! বাল্য-বিবাহ যেন আর এই পৃথিবীতে কেহই না করে, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন :—এক্ষণে আমার 'বলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে এই বিষময়ী প্রথা নৃঘাতকীরূপে এই ভারত ভূমে অবতীর্ণা হইয়া ইহাকে একেবারে ছারখার করিতেছে,—কত কত প্রাণীর কত প্রকারে কতবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, কত কত অবলা কুলবালারা দারুণ দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, কত কত কামিনীরা কুলে জলাঞ্জলি দিতেছে, কত কত যুবা পুরুষ সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া আত্মঘাতী হইতেছে, কত কত ভদ্র সন্তানেরাও অতি ঘৃণাস্কর ও লজ্জাকর চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে এবং কত কত মহাপুরুষেরা জরা ও রোগগ্রস্ত হইয়া হীনবল পীণ্ডের ন্যায় সন্তানসকল উৎপাদন করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতেছে ;—এই সকল পাপ প্রবাহের বাল্য বিবাহই প্রধান প্রস্রবণ ; ইহাকে না সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত করিলে দেশের মঙ্গল নাই, প্রতিবাসির মঙ্গল নাই, আপনার পরিবারের মঙ্গল নাই এবং আপনারও মঙ্গল নাই। অতএব হে বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ তোমরা আর কত কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে? একেবারে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়া এই পরম শত্রুকে আক্রমণ করত ইহার শিরশ্ছেদ করে তাহলেই তোমাদের মাতৃভূমির অনেক উপকার হইবে ও কালে তোমরা

বীর্য্যবান্ হইয়া পরাধীন শৃঙ্খল ভগ্ন করত মহাসুখে সঞ্চরণ করিবে এবং পরমেশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়া কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দই উপভোগ করিবে—"

কাহিনী :—বলহীন ধনাঢ্য একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। তার স্ত্রী মায়াবতী এবং একমাত্র পুত্র গোপাল বর্ত্তমান। গোপালের বয়স নয় বছর। মায়াবতী তার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হন। "আহা! বাছা আমার ন বচরের হোলো গো, তবু তিনি কি একবারও সে সব কথা মুখে আনেন, আপনার কাযেই ব্যস্ত থাকেন" : মালিনীর কাছে মায়া দুঃখ করে বলে,—"এই গোপাল আমার গেল বসেকে নয় পা দেছে তা কত্তাকে এর কত দিন আগে থেকে বোল্‌চি, ওগো আমার বড় সাদ আমি বো-র মুখ দেক্‌বো, কবে মরে যাব তা হোলে মনের স্বাদ মনেই থাকবে।" মায়ার ভাবনা উস্কিয়ে দেন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী। মায়াকে বলেন, "তোর বেটা তো শত্রু মুখে ছাই দে ডাগর ডোগর হোচ্যে, তা তার বের্ সময় কি হবে? বৌ পাবি কোথা? তখন তোর ছেলেকে এই গোদা পায়ের সেবা কত্তে হবে।" মায়া ভাবে,—

"অমুকের শাশুড়ী বলে লোকেতে ডাকিত।
লোমাঞ্চ হইয়া দেহ পুলকে পূরিত।"

বৃদ্ধা মায়াকে আশ্বাস দেয়,—"না গো ছোট বৌ তুই দুঃখ করিস্‌নে, আমি, সত্ত্যি বোল্‌চি গোপালের বাপ্ এ কম্ম না করে আর থাক্‌তে পারবে না, পাঁচ-জনে নিন্দে কর্ব্বে যে, আর এই ঘরের মধ্যে গণ্ডগোল এতেও কি কেউ চুপ করে থাকতে পারে?" বাস্তবিকই বিবাহ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মায়ার মন কষাকষি চল্‌ছে। মালিনী মায়াকে আশ্বাস দেয়, "ফুল ফুট্‌লেই ও আর কেউ ধরে রাখ্‌তে পারবে না।"

রামমণি রঙ্গিণীর সঙ্গে পুকুরে জল নিতে আসে। রামমণির চাইতে রঙ্গিণী বয়সে অনেক ছোটো। তবু রামমণির সঙ্গে সমান তালে পথ চল্‌তে পারে না। রামমণি আজকালকার মেয়েদের দুর্বলতার কথা নিয়ে মন্তব্য করে। সে বলে,—"আমরা তো তোদের মত ছেলে বেলা ভাতার নিয়ে শুতে শিখি নি, পোনের ষোল বচরের না হলে সে কেমন তা জানতেম্‌ই না, তোদের এই বয়েসে ছেলে হোলো মাগো! কলিকালই বটে!" গোপালের বিয়ের ব্যাপারে মন্তব্য করে,—"কে জানে বাবু, এখনকার মেয়ে ছেলেকে যে চেনে সে পাত্তর

চেনে, অমনি ফুল না ঝর্‌তে বে ২ করে পাগল হোয়ে বেড়ায়; ঐ গোপালের বাপ্‌ তো এই সেদিনকার ছোঁড়া হদ্দ গণ্ডা ছয়েক বয়েস্‌ হয় কি না, আর ছুঁড়িরো ঐ এগার বচরে ছেলে হয়, কিসেরি বা বয়েস্‌, বাঁচি যদি আরো কত দেখ্‌বো।" মালিনী মন্তব্য করে,—"এখন সব্‌ ঘরে ঐ রকম হোচ্যে, আর ছোট বোর বা কিসের অভাব তা তার কি সাধ্‌ হয় না?"

কাজহাসিলের জন্যে মায়া একদিন অনশনে থাকে। মায়ার স্বামী বলহীন ধনাঢ্য অবশেষে ভাবে,—"কর্ম্মটাও উচিত বটে। অবলা জাতি যদিও বিদ্যাহীনা, তথাচ অনেক স্থলে প্রখর বুদ্ধি প্রভাবে সুপরামর্শ প্রদানে সমর্থা। সন্তানটীর তো ত্বরায় বিবাহ না দেওয়া অযৌক্তিক বোধ হোচ্যে, যে হেতুক মমাপেক্ষা বহুগুণে ধনহীন ব্যক্তিরাও স্ব ২ সন্তানসন্ততিগণের অতিশয় অল্প বয়সেই পরিণয় সংস্কার সম্পন্ন করিতে যত্নবান হয়। অপর এই দেশের এই প্রথা, দেশাচারানুযাইক কার্য্য করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে।" বলহীন উড়ে চাকর রামাকে বলে ঘটককে নিযে আস্‌তে। রামা বলে,— "কি সে কৈল? ঘোটক আঁড়িতে আস্তবড়্‌ কো যাই মি?" পরে অনেক বুঝিয়ে রামাকে পাঠায়। ইতিমধ্যে বলহীনের প্রতিবেশী ধনহীন মহদাশয় বলহীনের কাছে এসব শুনে বলে,—"তবে আপনকার পুত্রটীর অধিক তো বয়োক্রম হয় নাই, কিছুকাল বিলম্ব করে কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করালে কি ভাল হোত না?" বলহীন বলে,—"লেখাপড়ার বিষয় যা বল্‌চ তা কপালে না থাক্‌লে কখনই হয় না, যথা, 'পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা বিদ্যাঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং', অতএব বিবাহ কিছু বিদ্যাকে ও ধনকে লোপ করে তার এরূপ শক্তি নাই, তবে অল্প বয়সে বিবাহ দেবার ক্ষতি কি?" স্বার্থপর ঘটক আছে। কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায় বলহীনের পুত্রটি চির রুগ্ন। বলহীনের বংশগত যক্ষ্মারোগ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ধনহীন এসব শুনে আক্ষেপ করে। "অপক্ক বীর্য্যে সন্তান উৎপাদনই যে এসবের কারণ, ধনহীন তা উপলব্ধি করে।

স্বার্থপর ঘটক বলহীনের বাড়ীতে কন্যার পিতা—বুদ্ধিহীন মতিচ্ছন্নকে ধরে আনে। বলহীনকে ঘটক বলে, "আপনার বাটী হোতে সেদিন প্রায় বহির্গত হয়েই, অম্‌নি এক প্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করত অজস্র পরিশ্রম কোরে একেবারে ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বগুণে গুণাকর এবং প্রভাকর তুল্য নিষ্কলঙ্ক ও তেজবান এই যে কুলীন সন্তান ইহাকেই আনয়ন কোরেছি—অপর ইহার কন্যাটিও পরমাসুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণা, অধিক বলা বাহুল্য একেবারে

লক্ষ্মী সরস্বতী বলোই হয়।” মেয়েটি গত ফাল্গুনে সবে আটে পড়েছে। গোপালকে বুদ্ধিহীন ডেকে আনিয়ে পরীক্ষা করেন। সে ‘বাঙ্গালা ইস্কুলে’ বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পড়ে। ঘটক গোপালের অদ্ভুত স্মরণশক্তির প্রশংসা করে পঞ্চমুখে। বলহীনও বলে, “গোপাল পাড়ার কোন বালকের সহিত আলাপ করে না, অনর্থক খেলাতে সময় নষ্ট করে না, কেবল আপনার পুস্তক লয়েই পাঠ কোরে থাকে।” বুদ্ধিহীন সন্তুষ্ট হন। বাল্যেই দুপক্ষের সম্মতিতে বিয়ে স্থির হয়। স্থির ক’রে ঘটক মনে মনে ভাবে—“বলহীনের ছেলেটা তো মৃত বোল্যেই হয়, ওঁর আবার বিবাহ! তা আমাদের কি? ‘প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল বিচারণা’, আহার পেলে ছাড়্‌বো কেন?”

বিদ্যাহীন দাম্ভিক অবস্থাপন্ন। তাই অল্প বয়সে বিয়ে করে সে নিজেকে সুখী বলে প্রচার করে। বাল্যবিবাহের সমর্থন করে সে কবিতা আবৃত্তি করে।—

“ছেলে বেলা বিয়ে হোলে হয় বড় মজা।
শ্বাশুড়ী তুলিয়া দেয় খায় খাজা গজা॥
আদর করিয়া বড় শালী লয় কোলে।
বড় বড় মাছ খায় ঝালে আর ঝোলে॥
কত মত কথা শেখে নানা রঙ্গ রস।
যাহাতে করিবে পরে রমণীরে বশ॥
ঠারে ঠোরে কনেটির মুখ পানে চায়।
আধো আধো হাসি দেখে নয়ন যুড়ায়॥
সহিতে না হয় কভু পাঠশালের ক্লেশ॥
খায় দায় বেড়ায় বালিশে মেরে ঠেস্॥
ঘুম পাড়াইতে আসে কত কুল নারী।
রতি শাস্ত্র শিখাইতে বসে সারি সারি॥
কোমল কামিনী কর গাত্রেতে বুলায়।
কি কহিব স্মরণেতে দুঃখ দূরে যায়॥
তাই বলি এ অপেক্ষা সুখ কিবা আছে।
করো না ইহার নিন্দা লোকে নিন্দে পাছে॥”

ধনহীন বিদ্যাহীনকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করলেও বিদ্যাহীনের দাম্ভিক উক্তিকে স্বীকার করে যায় শুধু মাত্র তার কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। বিদ্যাহীন ধনহীনকে অযাচিত উপদেশ দিচ্ছিলো।

বিলাসিনী নিজের নাম সার্থক করেছে। সে লজ্জাহীন স্ত্রৈণ নামে এক চোরের স্ত্রী। লজ্জাহীন বিলাসিনীর কথায় ওঠে বসে। বিলাসিনী লজ্জাহীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কথায় কথায় গয়নার জন্যে চাপ দেয়, আর কপট মান-অভিমান দেখায়। স্বামীর ওপর তার বিন্দুমাত্র টান নেই। অতি শিশুবয়সে এই স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো—যদিও তখন সে চোর ছিলো না। এবার আবার বিলাসিনী গয়নার জন্যে মান করে। লজ্জাহীন ভাবে, "কি করি? যে রকম দেক্‌চি এতো না দিলেই নয়।... ..সার্জনের যে হুড় পথে বেরুলেই যেন ঘাড়ে পড়ে—যা হোক চেষ্টা পেতে হবে—কোথায় যাই—পাড়া ঘরে ও কর্ম্ম কল্যে সে তো বার করা যাবে না—কেন বড বাজারে বিক্রী করে তখন চাঁপাতলা থেকে কিনে আন্‌বো, এ পরামর্শ তো ভাল?"

কিন্তু এবার আর অলঙ্কার দেওয়া হয় না। পাড়ার বিদ্যাহীন দাম্ভিকের যথাসর্বস্ব চুরি করে। চুরি প্রমাণিত হয়—লজ্জাহীন জেলে যায়; কিন্তু চোরাই মাল সে দীঘিতে ফেলে দিয়েছিলো। বিদ্যাহীন সেগুলো আর ফেরৎ পায় না। লজ্জাহীন জেলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিনীর সবুর সয় না। সে বেরিয়ে গিয়ে খাতায় নাম লেখায়। ওদিকে বিদ্যাহীন স্থাবর সম্পত্তির অংশ বিক্রী করে চালাতে চালাতে শেষে কপর্দকহীন হয়ে দাঁড়ায়। বাল্য-বিবাহের অভিশাপ কি—নিঃস্ব অবস্থায় অনেকগুলো সন্তান নিয়ে বুঝতে পারে। শেষে সে বিষপান করে জ্বালা জুড়োয়।

এদিকে বলহীনের বাড়ীতে বিয়ে। পুরোহিত অর্জনস্পৃহ ভট্টাচার্যের যজমান বলহীন। অর্জনস্পৃহ পয়সার গন্ধে গন্ধে এসে হাজির হয় বলহীনের বাড়ী। বাড়ীর সামনে সুধীরের সঙ্গে দেখা হয়। যথারীতি বাল্যবিবাহ নিয়ে বিতর্ক ওঠে। অর্জনস্পৃহ অবিবাহিতা কন্যার রজোদর্শনের পাপের কথা পরাশর থেকে উদ্ধার করে। সুধীর সঙ্গে সঙ্গে কুলীনদের কুমারী বৃদ্ধার কথা টেনে রক্ষণশীলদলের কথার অসঙ্গতির দিকে কটাক্ষ করে। নিরুপায় অর্জনস্পৃহ সুধীরের যুক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এমন সময় বলহীন আসে। বাল্যবিবাহ না হলে অর্জনস্পৃহের প্রাপ্তিযোগ বন্ধ হবে। সুতরাং বলহীনের সামনে সে সুধীরকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। সুধীর আপন মনে মন্তব্য করে—"হায়। হায়। সামান্য লাভের প্রত্যাশায় মানবগণ কি কুকর্ম্মই না কোর্ত্তে প্রবর্ত্ত হয়!"

বিবাহের পর অসংযমে চিররুগ্ন গোপালের শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ে।

বলহীন নিজেও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। বৈদ্যও মন্তব্য করে মনেমনে,—"যে স্বয়ং চিররোগী, তার পুত্র কি কখন বলিষ্ঠ হতে পারে, জীর্ণ বীজেতে কোনক্রমেই উত্তম শস্য উৎপাদন করে না।" ধনহীন মন্তব্য করে—"স্বয়ং চিররোগী হয়ে বিবাহ করা কি অল্প অধর্ম্ম—এবং জানিয়া শুনিয়া আপনার পীড়িত পুত্রের পাণি সংযোজন করান কি সাধারণ অপকর্ম্ম ?" বলহীনকে মনেমনে সম্বোধন করে বলে,—"হা বলহীন ? দেশাচার তোমাকে একেবারে অন্ধ করিয়াছে—শূকরের ন্যায় সুরম্য পুষ্পোদ্যান ত্যাগ করিয়া কদর্য্য কর্দ্দম বিশিষ্ট স্থলে বাস করিতেছ ?"

গোপাল মৃত্যুশয্যায়। মায়া ভগবানকে ডাকে—"হে মা দুর্গা ! হে মা কালী ! মাগো। আমি যোড়া পাঁঠা দেব—হে ! হে মা সব দেবতা ! মা গো আমি তোমাদের সকলের কাছে বুক চিরে রক্ত দেব, ষোড়শোপচারে পূজ দেব, মা গো তোমরা আমার গোপালকে আমায় ভিক্ষা দাও।" কিন্তু মায়ার ওপর মায়েদের দরদ এলো না। গোপাল মারা যায়।

কান্নার রোল শুনে দুজনের কাঁধে ভর করে দুর্বল বলহীন আসে। রাক্ষসী কন্যা ঘরে এনেছিলো বলে আক্ষেপ করে সে। হঠাৎ কাশির ধাক্কায় দম আটকিয়ে পড়ে মরে যায়। ধনহীন তাকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করে। বুদ্ধিহীনও আক্ষেপ করে—"আমিও গেলেম—আমার ঐ একমাত্র কন্যা উহার মুখ নিরন্তর দর্শন করিয়া কেবল প্রজ্জলিত মশালেই দগ্ধ হবো ; আবার ঐ নির্দ্দোষী বালিকাকে বলহীন যে দুর্বাক্য প্রয়োগ করেছে তাহা কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না।" বাল্যবিবাহের দোষ সম্পর্কে সে দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়। ধনহীন বলে,—"হা ঈশ্বর……কুসংস্কারের কেশাকর্ষণ করিয়া পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত কর এবং দেশীয় বন্ধুগণের চক্ষুরুন্মিলন করিয়া বাল্যোদ্বাহ নিবন্ধন দুঃসহ দুর্গতিকে দূর করত এই দয়া-শূন্য দেশের শ্রীসাধন কর।"

বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত আরও কয়েকটি প্রহসনের পরিচয় দেওয়া হলো।—

বাল্যবিবাহের অমৃত ফল (১৮৮৪ খৃঃ)—সারদাচরণ ঘোষ এম, এ॥ প্রহসনটির মাধ্যমে লেখক বলতে চেয়েছেন যে বাল্যবিবাহ বাঙালী বালকের বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অননুকূল। বাল্যবিবাহ বালকদের জীবনের স্বাভাবিক ধারাকেও পাল্টিয়ে দেয়।

ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে গামছা পড় গে (১৮৬৪ খৃঃ)—**হরিমোহন কর্মকার ॥ আনুমানিকভাবে প্রহসনটিকে বাল্যবিবাহ-কেন্দ্রিক প্রহসনগুলোর মধ্যে উপস্থাপিত করা হলো।**

সাময়িক ঘটনা কেন্দ্রিক ॥—

কনসেণ্ট বিলের বিরুদ্ধে যে দৃষ্টিকোণ তা মূলতঃ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত। এর মধ্যে দিয়ে বাল্যবিবাহের পোষকতা অর্থ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের পূর্ব প্রতিষ্ঠা রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা বিশেষ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কন্যা অতি অল্প বয়সে রজস্বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে বিবাহকাল নির্ধারণ বা সহবাস সম্মতির জন্যে আইনের সৃষ্টি হলে নাকি জাতিপাতের আশঙ্কা আছে। কোন্‌দিক থেকে এই আশঙ্কা তা সহজেই অনুমেয়, কারণ এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে প্রচুর স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত করা হয়েছে। অন্যতম একটি বচন প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধার করা যেতে পারে।—

> "প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
> মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥
> মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
> ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥[৭৩]

অমৃতলাল বসুর লেখা "সম্মতি সঙ্কট" প্রহসনে (১৮৯৪ খৃঃ) এই আশঙ্কা একস্থানে একটি চরিত্রের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। এই আশঙ্কা নিরসনে অভিব্যক্ত উক্তিগুলোও বিদ্রূপের সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে।—

মানিক ॥ "আর যদি তার আগে (বারো বছরের আগে) কন্যাকাল উত্তীর্ণ হয়, তখন যে দ্বিতীয় সংস্কার না করলে সূর্যিপূজা না হলে ধর্ম্মে পতিত হতে হবে, চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে।

তিলক ॥ ঘোড়ার ডিম হবে, গবেন্দ্র ভট্‌চায্যি বলেছে, ও সব গল্পের কথা, বেদে ত্রিশ বছরের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা আছে। গবেন্দ্রবাবু বড় যে-সে লোক নন ; একে এম-এ, তায় বিদ্যাভূষণ, আবার তার উপর আইন পাশ, গভর্ণমেণ্ট তাঁর কথা সব শোনেন।"

কনসেণ্ট বিল একদা আমাদের সমাজে সর্বস্তরেই আন্দোলন এনেছিলো।

৭৩। পরাশর সংহিতা—৭/৭—৮।

১২৯৭ সালের চিত্রদর্শন পত্রিকায়[৭৪] বলা হয়েছে,—"সার এণ্ড্রু স্কোবলের কল্যাণে আমরা যে নূতন বিধি পাইয়াছি তাহা আবাল বৃদ্ধ বণিতার জানিতে বাকি নাই। বিল যে কি বস্তু, এতদিন তাহা কেবল আধুনিক শিক্ষিতদলের মস্তিষ্কেই আলোড়িত করিতেছিল, এখন কিন্তু উহা অন্দরমহলেও প্রবেশ করিল।" আন্দোলনের বর্ণনা দিতে গিয়ে উক্ত পত্রিকা লিখছেন,—

"সহবাস সম্মতি আইন লইয়া দেশময় ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। কলিকাতায় এরূপ আন্দোলন হইয়াছিল যে, ধর্ম্মের জন্য, আইনের জন্য কখনও যে এত লোক একত্রিত হয় নাই, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কলিকাতায়—এমন কি সমগ্র ভারতের ইতিহাসেও ইহা এক অতি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। ভারতের অনেক স্থানে আন্দোলন হইলেও, আমরা কলিকাতার ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলাম। পুরাতন কথা হইলেও, আমরা বলিতেছি, আমরা ১৪ই ফাল্গুন বুধবার কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে মহালোকারণ্য—যে অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিব না। এ সভাধিবেশনের কথা যদি দিন কয়েক পূর্ব্বে লোকে জানিতে পারিত, না জানি আরও কি অদ্ভুত দৃশ্যই দেখিতাম! হিন্দু মুসলমান, উত্তর পশ্চিমবাসী, মাড়োবারী, মারহাট্টী, পঞ্জাবী, মৈথিলী, উৎকলবাসী এত জাতির লোক ধর্ম্মলোপ ভয়ে ভীত হইয়া মহাক্ষেত্রে মহাচিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন।"

শুধু গড়ের মাঠের বক্তৃতা নয়, কালীঘাটের কালীমন্দিরে বিভিন্ন প্রদেশের ধর্মভীরু হিন্দু এসে যাগযজ্ঞ কীর্তন সুরু করেন। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে "চিত্রদর্শন" বলছেন,—"ঠিক হইয়াই গেল, আগামী বৃহস্পতিবার আইন পাশ হইবে। এই সময়ে হিন্দুগণ কাতর হইয়া জগজ্জননী মঙ্গলময়ী কালীর আরাধনার জন্য কালীঘাটে উপনীত হইয়াছিলেন। সেদিন কালীঘাটে যেন সত্যযুগের আবির্ভাব।......এই উপলক্ষে গড়ের মাঠে ও কালীঘাটে কিরূপ লোকারণ্য হইয়াছিল, তাহা বলিতে ইংলিশম্যান্, স্টেট্স্ম্যান্, ডেলিনিউস প্রভৃতি পত্র সম্পাদকগণ সকলেই একান্ত বিস্ময়প্রকাশ করিয়াছেন।"

কন্সেণ্ট বিলের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়েরও সক্রিয় আন্দোলন ছিলো। পূর্বোক্ত অনুষ্ঠিত সভায় মৌলবী কোরাদ আহম্মদ, মোহাম্মদ আবুল হোসেন প্রমুখ অনেকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কারণ ইসলাম ধর্মেও বাল্যবিবাহ রীতি

৭৪। চিত্রদর্শন পত্রিকা—১২৯৭ সাল—পৃঃ ৬৩।

ধর্মীয় সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। একথা আগেই বলা হয়েছে। হিন্দুত্ব রক্ষার সংস্কারে সাংবাদিক হিন্দুদের প্রচেষ্টার ওপর জোর দিয়েছেন। সংবাদে বলা হয়েছে,—"যাঁহারা বিলের বিপক্ষে মত প্রদান করিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষায় চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিল এক্ষণে পাশ হইয়া গেলেও, তাঁহাদের নাম হিন্দুগণ কখনই ভুলিতে পারিবেন না। রাজা শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর ও মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ হিন্দুদিগের ধর্মরক্ষা করিতে অন্তরের সহিত চেষ্টা করিয়া ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই. মহাশয় যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহা পূজারই যোগ্য।"[৭৫] সাংবাদিক উত্তর-পশ্চিমীয় পণ্ডিত গোপালনারায়ণ মিশ্র, মাড়োয়ারী পণ্ডিত দেবী সহায়, পাঞ্জাবী শিখ পণ্ডিত হরগোপাল সিং কিংবা দিল্লী আর্যসমাজের সুন্দরলাল বর্মা প্রমুখ ব্যক্তিকে হয়তো অবাঙ্গালী বলেই ততোটা মূল্য দেন নি, যদিও আন্দোলনে এঁদের সক্রিয়তা কম ছিলো না।

কন্‌সেণ্ট বিল সমর্থকদের প্রতি রক্ষণশীল দলের ক্ষোভের অন্ত ছিলো না।—"গল্প শোনা আছে, এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঘরে একসময় একটি ক্ষুধার্ত কুকুর মুখ বাড়াইতেছিল দেখিয়া গৃহস্থ আহ্নিক করিতে করিতে "দূর দূর" করিলেন, ছেলে কিন্তু ইঙ্গিতে ভাতের হাঁড়ি দেখাইয়া শিশ ও চুম্‌কুড়ি দিতে লাগিল। কুকুর পলাইতে পারিল না, গৃহস্থ একটু অন্যমনস্ক হইলেই সরিয়া গিয়া তাঁহার হাঁড়ি মারিয়া দিল। গৃহস্থ ঠাকুর প্রণাম করিয়াই দেখেন, সম্মুখেই কুকুর, থালায় একটিও ভাত নাই, তাঁহার গর্ত্তস্রাব দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছে। 'হিন্দুশাস্ত্র বলেন, রাজা দেবতাস্বরূপ। রাজা যখন আইন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইহা পালন করিতে হইবে। আইন কর্তাদেরও দোষ নাই। তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বাস মতই কার্য্য করিয়াছেন। কুকুরেরও দোষ কিছু নাই, কুকুর বুভুক্ষিত, সুতরাং সে হাঁড়ি খুঁজিবে বৈকি! তবে দোস দিই শুধু ঐ কুলাঙ্গার গর্ত্তস্রাবকে, যে কুকুরকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া হাঁড়ি দেখাইয়া দেয়। ছেলের বাবাকেও আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেন অতঃপর সাবধান থাকেন এবং উইলেও যেন ত্যাজ্যপুত্রের কথাটা খোলসা করিয়া যান।"[৭৬]

৭৫। চিত্রদর্শন পত্রিকা—১২৯৭ সাল, পৃঃ ৬৬।

৭৬। চিত্রদর্শন—১২৯৭ সাল—পৃঃ ৬৩।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি আইন শিক্ষার পুস্তিকায়[৭৭] ৩৭৩ ধারা প্রসঙ্গে লেখক সমসাময়িক ভ্রমাত্মক দৃষ্টির উল্লেখও করেছেন।—"অনেক সাদাসিদে লোক বুঝিয়াছিলেন যে, ১২ বৎসরের কম বয়স্ক বলিয়া বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ। উহা সম্পূর্ণ ভ্রম। বিবাহের বয়স সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভা আইনে কখন নিষেধ রাখেন—নিতান্ত বালিকা থাকিতে বিবাহ দিয়া, কত পিতামাতা অন্তর্জ্বালায় জ্বলিতেছেন, তাহার সংখ্যা করা যায়-না।" (পৃঃ ১০৭)।

এই অন্তর্জ্বালার ভীষণতা সম্পর্কে নব্যভারত পত্রিকায় শ্রীনাথ দত্ত লিখেছেন,—"অনৃতুমতী সহবাসে অস্মদ্দেশে স্ত্রীলোকের নিতান্ত কষ্টদায়ক দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মিতেছে, প্রাণবধ পর্য্যন্ত হইতেছে। স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সুখে গৃহকার্য্যে শিক্ষা করিবে, না কোথায় অকালে স্বামী সহবাস করিতে শ্বশুরগৃহে আনীত হইয়া কতপ্রকার যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছে। বস্তুতঃ সরল ব্যক্তিরা শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক জঘন্য কামরিপুর বশবর্ত্তী হইয়া শূলে মৎস্য ভাজিবার ন্যায় দুর্বলা অসহায়া অনৃতুমতী বালিকা স্ত্রীদিগকে ভাজাপোড়া করিতেছেন। দস্যু ব্যক্তির দন্ত না হইলে কীদৃশ অনিষ্টরাশি উৎপন্ন হইতে পারে, বিংশতি বর্ষের ন্যূন বয়স্কা বাঙালী স্ত্রীলোক দিগের দুর্দশা তাহার উদাহরণস্থল হইয়াছে।"[৭৮] সরকার থেকে সম্মতি-আইন শুধুমাত্র এই যন্ত্রণা থেকে স্ত্রী-সমাজকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টা। কিন্তু রক্ষণশীল দৃষ্টি পূর্বোক্ত ভ্রমাত্মক ধারণাতেই কয়েকটি প্রহসনের জন্ম দিয়েছে।

সম্মতি সঙ্কট (কলিকাতা ১৮৯১ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু॥ প্রহসনে রঙ্গিণীর গানে বাল্যবিবাহ বিরোধী সংস্কারকদের তির্যকভাবে নিন্দা করা হয়েছে কারণ এই গোষ্ঠীর সমর্থনেই কন্‌সেণ্ট বিল বা সম্মতি আইন পাশ হয়। রঙ্গিণীর গানে আছে,—

"...সংস্কারক 'তারকদা' বলেছে আমায়
সম্পাদক 'মদক মেদো' দেছো তায় সায়॥
বারো না হইলে পার, যদি করে অধিকার,
হবে দেশ ছারখার, পতি গতি ব্যভিচার ;

৭৭। পকেট আইন শিক্ষা (১৮৯২ খৃঃ)—প্রঃ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য।
৭৮। নব্যভারত—অগ্রহায়ণ, ১২৯৭ ; পৃঃ ৪৬৫-৬৬ ; অরজস্কা স্ত্রী-সহবাস দণ্ডনীয় কিনা ?

উকীল 'অখিল' এতে দিয়েছেন রায়।
ফুটিয়ে উঠিলে কলি তবে দিব কায়॥"

শেষে,—

"গা'লো সই গা'লো সই, গা'লো জয় জয় ;
জয় সংস্কারের জয়, জয় দেশ উদ্ধারের জয়,
গা'লো লেক্‌চারের জয়, গা'লো এডিটারের জয় ;
কি ভয় কি ভয় হলো হিন্দুয়ানী ক্ষয় ;
গা'লো গা মকর গঙ্গাজল।
মালাবারীর পীরিতে সব হরি হরি বল॥···
ওলো দেব না সম্মতি, আমি দেব না সম্মতি।
দেখ্‌বো কেমন আসে পাশে এগারোর পতি॥"

প্রহসনের শেষে কালীঘাটে অনুষ্ঠিত কীর্তনের ভাষা,—

"রাজবিধি করে রাজা,
সুখে যাতে রহে প্রজা,
এ আইন যে দীনের সাজা,
রাজায় সবাব বুঝাই না ;—
যেন এ আইন থাকে না
থাকে না থাকে না তারা।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি !
বুঝাও রাজায় জননী ?
পাষণ্ডের পণ্ড কাণ্ড লণ্ড-ভণ্ড
কর মা দানব দলনি॥

কাহিনী—কৈলাসে দুর্গা জয়া বিজয়ার সঙ্গে বিবাহ-প্রথার মহিমা প্রকাশ করেন। হঠাৎ মর্ত্ত্যের ক্রন্দনে তাঁর মন বিচলিত হয়ে ওঠে। নারদ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বল্‌লেন "মনুষ্যের—সংসার ধর্ম্মের—সমাজ ধর্ম্মের—সকল ধর্ম্মের মূল বিচার ধর্ম্ম।···কিন্তু জনকয়েক কুলাঙ্গারের পরামর্শে বিদেশী রাজা রাজবিধি করে সেই পবিত্র বন্ধনের অতি প্রয়োজনীয়—অতি প্রধান একটি গ্রান্থি খুলে দিয়েছেন।" এমন সময় মহাদেব এসে সতীত্বের অবমাননার কথা শুনে

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দক্ষযজ্ঞের কথা কি তারা ভুলে গেছে! তিনি ত্রিশূল নিয়ে ধ্বংস করতে ওঠেন। দুর্গা তাঁকে শান্ত করেন।

মর্ত্যে কন্‌সেণ্ট বিল্ পাশ হয়েছে। মাণিকের ছেলে তিলক ইংরাজী ইস্কুলে পড়ে বাবু হয়েছে। সে 'মিরর' কাগজ পড়ে। মাণিককে সে যখন 'মিরর'-এর সংবাদ থেকে আইনের ব্যাপার বুঝিয়ে দেয়, তখন মাণিক মাথায় হাত দিয়ে বসেন। মাণিক এগারো বছর বয়সে তাঁর মেয়ে হিমির বিয়ে দিয়েছেন বৌবাজারের বাড়ী বেচে। বারো বছর না হলে কনের ঘরে বর যেতে পারবে না। বেয়াই বাড়ী থেকে তাগাদা আস্‌ছে, পুনর্বিবাহ দিয়ে জামাইকে ঘরে আনবার জন্যে। কিন্তু এই সময়েই আইন! তিলক বলে,—"পণ্ডিতবর নিতাইচাঁদ সাধু খাঁ বলেছেন যে, সব মিথ্যা আর ভুল, Dr. Andrew Smith এ মতের পোষকতা করেন। Professor মহাশয় তা সব বলেছেন।" মাণিক খেদ করেন। "এ সব হলো কি! টেক্স নিচ্ছিস্, নে বাবা, আমাদের ঘরের ভেতর কি হচ্ছে— মেয়ের বে, ছেলের বে, এ সবে বাবু কোম্পানীর হাত কেন? ঘরের ছেলেই ঢেঁকি, তা কারে আর কি বল্‌বো? মেজ জ্যাঠা স্বর্গে গেছেন, তাঁর কথা না শুনেই এমন হলো, তিনি আমায় তখনি মানা করেছিলেন যে, তিলককে স্কুলে দিও না, ওটা বে-জেতে স্কুল।" মাণিকের স্ত্রী রামমণিও এসব শুনে অবাক হয়। "পুনর্ব্বে হলে জামাই ঘরে শোবে না ত কি তিন ছেলের মা হলে শোবে? আবার আইন করছেন বারো বছর? তিলক জানে না, ঐ যে আমার তেরো বছরে হয়েছিল।"

রামলাল এসে তার দুঃখের কথা জানায়। তার মেয়ে কনকের এগারো বছর পার হয়েছে—অনেক কষ্টে সিকদার বাগানের দে-বাড়ীর একটা ছেলে পেয়েছিলো। বাড়ী বাঁধা দিয়ে হাজার চারেক টাকাও সংগ্রহ করেছিলো। কিন্তু আইনের কথা শুনে আজ নাকি ছেলের বাপ বলে পাঠিয়েছে যে বিয়ে দেবে না। রামলাল খেদ করে বলে,—"কোম্পানী আর যা তা করুন, এতদিন আমাদের ধর্ম্মে হাত দেন নাই, কিন্তু এখন কতকগুলো ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে লাটসাহেবকে সলিয়ে কলিয়ে সেই কাজ করাচ্ছে।" রামলাল স্থির করে, সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যকে দিয়ে কনকের একটা জাল কুষ্ঠী করিয়ে নেবে। তাতে কনকের বয়স দেবে বারো বছর দু'মাস। দস্তুরের ওপর তাকে কিছু বেশী ধরে দেবে, তাহলেই হবে। মেয়ে বলে কনকের সে এতোদিন কুষ্ঠী করায় নি।

কন্‌সেণ্ট বিলের ঢেউ পণ্ডিত সমাজকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। স্মৃতিরত্নের চতুষ্পাঠীতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে পণ্ডিতরা নিজেরাই ঝগড়া করে। তর্কালঙ্কার বলে,—"কিং কিং কিং ত্বং না জানাতি মাম্? অহং তর্করত্নং বিশ্ববিদিতং। উল্টোডিঙ্গিস্থ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতং। পুনঃ বাক্য বদন্তি ত এক চপেটাঘাতেন মস্তকং চূর্ণ করোতি।" যাহোক গোলমাল থামানো হয়। স্মৃতিরত্ন বলেন, "সৎকুলীনং সমাসাদ্য অপূর্ণে দশমে বুধঃ। গ্রাহয়েদ্ বিধিনা গৃহস্থো ধর্ম্মমাচরণ॥" কুলীন মানে এখানে সদ্‌বংশীয় পাত্র। বাচস্পতি স্মৃতি-রত্নকে সমর্থন করেন। তর্করত্নদের মতো কয়েকজন পণ্ডিত-মূর্খকে বোঝবার জন্যে বাচস্পতিকে ব্যাখ্যা করে দিতে হয়। তর্করত্ন নিজের থেকেও ভুল অর্থ করে কিছু বল্‌লে স্মৃতিরত্ন তাঁর সম্মান রক্ষার জন্যে তাকে থামিয়ে বলেন,—"কি পরিহাস কোচ্ছো, লোকে মনে করবে, তুমি একটি অর্ব্বাচীন অনড্বান্।" অনূঢ়া রজস্বলা কন্যার পিতার অধোগতি নিয়ে মনুসংহিতা থেকে স্মৃতিরত্ন বা বাচস্পতি শ্লোক উদ্ধার করেন। তর্করত্ন বলে,—"ব্যাখ্যা কর। কোথাকার সব নূতন শ্লোক আবৃত্তি কোচ্ছো, মুগ্ধবোধেও তো ও সমস্ত নাই, সরস্বতী মহাশয়, ভাষায় বুঝিয়ে দাও। স্মৃতিরত্ন গৃহ্যসূত্র থেকে গর্ভাধানের পবিত্রতা এবং মাহাত্ম্য বোঝান। তর্করত্ন, বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি পণ্ডিতরা প্রতিবাদের জন্য কুমার সম্ভব আর মুগ্ধবোধ হাতড়িয়ে বেড়ান।

চারজন ভট্টাচার্যকে নিয়ে তিলক এসে পণ্ডিতদের বলে, যে কন্‌সেণ্ট বিলের পক্ষে, তাদের সবাইকে পাঁচ টাকা করে দেওয়া হবে। স্মৃতিরত্ন বাদে সকলেই তিলকের পেছন পেছন চলে যায়। স্মৃতিরত্ন আক্ষেপ করে বলেন,—"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করিয়া থাকেন, সনাতন ধর্ম্মরক্ষার ভার যাঁহাদের সঙ্গে, তাঁহারাই যখন তুচ্ছ রজতখণ্ড লোভে জাতিধর্ম নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন আর হিন্দুত্বের লোপ হবার বিলম্ব কি।"

মাণিক শেষ পর্যন্ত হিমির 'পুনর্বে' দেবেন স্থির করলেন। পাড়াপড়শী মেয়েরা সব নিমন্ত্রিত হয়ে আসে। হিজড়ের গান হয়। হিজড়ের গান শুনতে জ্ঞানদার খুব ভালো লাগে। কিন্তু শরৎ-এর স্বামী আধুনিক—হিজড়ের গান শুনতে মানা করে দিয়েছেন। একজন মেয়ে বলে ওঠে,—"আমাদের বাবু যা বলেন, তা ঠিক শরতের বাবুর কথার সঙ্গে মেলে। বারো বছর আগে কি ঘরে যাওয়া উচিত?" মেয়েটির স্বামী ব্রাহ্ম। অথচ জানা গেলো, মেয়েটির প্রথম সন্তান হয় চোদ্দ বছর বয়সে। এই মেয়েটি সব কথার "বোধহয়" বলে।

"তিনি বলে দিয়েছেন যে, সকল কথাতেই বোধহয় বলা উচিত, তাহলে সত্যি মিথ্যা কেটে গেল, সব কথা বল্‌তে পারবে।" রঙ্গিণী নামে একটি মেয়ে এসে কন্‌সেণ্ট বিলের পক্ষে উচ্ছ্বসিতভাবে কবিতা আবৃত্তি করে। শেষে সকলে লুচি খেতে বসে। লুচি খেতে তো আইনে বাধা নেই!

মাণিকের জামাই রাধাকিশোর শ্বশুরবাড়ী আসবার পথে সাক্ষী খুঁজে বেড়ায়। এমন একজনকে সে চায়, যে রাত্রে তার ঘরে শোবে এবং বল্‌বে কনে রাধাকিশোরের ঘরে শোয় নি। এক পাহারাওয়ালাকে শেষে কয়েক আনা পয়সার লোভ দেখিয়ে রাজী করায়। পাহারাওয়ালাকে সে বিছানায় শুতে দেবে, নিজে মেঝেয় শোবে। পাহারাওয়ালা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভয় করে। রাধাকিশোর বলে, দোকানের পানওয়ালাকে বলে গেলেই সে তার হয়ে মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়বে। তখন পাহারাওয়ালা বলে,—"চল। হেই—কোন্ খাড়া হ্যায়। আস্তে আস্তে চল বাবা চল, হাম ঠিক গাওয়া দেগা যে, তোমরা জরু তোমরা পাশ নেই শুয়া।"

একদিকে রাজবিধির প্রতিবাদে সার্বভৌম অনশন আরম্ভ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণীর অনুরোধ উপেক্ষা করে বলেন,—"শাস্ত্রের নিয়মপালন, হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য্য। সেই ধর্ম্মে যখন আঘাত পড়েছে, তুমি আমায় গৃহকার্য্য করতে বল?" সার্বভৌম ব্রাহ্মণীকে বলেন, বিবাহ এবং গর্ভাধান সম্পর্কে হিন্দুদের দূরদৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি অনেক বেশি। ব্রাহ্মণী নিজেও বাধ্য হয়ে অনশনে থাকেন, তবে ছাত্রদের খাইয়ে দেন যথানিয়মে। হিন্দু ধর্মরক্ষার জন্যে সার্বভৌম ভগবানকে অবতীর্ণ হতে বলেন।

সার্বভৌমর কাছে তিলক আসে। ছয় টাকার লোভ দেখায়। বলে অন্য পণ্ডিতদের পাঁচ টাকা করেই দেওয়া হয়েছে। সার্বভৌম দেশের একজন বড়পণ্ডিত বলেই এক টাকা বেশি দেওয়া হলো। সার্বভৌম বিলের বিরোধিতা করেন। ক্রমে ক্রমে তিলক তাঁকে দশ টাকার পর্যন্ত লোভ দেখিয়ে বলে, "এই শেষ, হাজার কেঁড়েলি করুন, এর চেয়ে বেশী পাচ্ছেন না।" সার্বভৌম তাকে চলে যেতে বলেন। তিলকও ছাড়তে চায় না। সার্বভৌম বলেন,— "এই সর্ব্বনাশের সময়—তুমি সার্ব্বভৌমকে টাকা দেখাও, তোমায় শাপ দিলে আমার ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুমতি হোক।" তারপর সার্বভৌম তার কাছে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু স্ত্রীর সতীত্বের মহিমা বর্ণনা করে

চলেন। তিনি বলেন, আম যেমন ১৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে পাকে না, তেমনি মেয়ের যৌবন আসবারও কোনো বয়সের নিয়ম নেই। তিলক তখন জিজ্ঞেস করে, অল্পবয়সে স্ত্রীর সন্তান হলে সন্তান কি বলবান বুদ্ধিমান হয়? সার্বভৌম তখন বাল্যবিবাহ সমর্থক রাজপুত জাতির বীরত্বের কথা তোলেন, তারপর আমাদের দেশের অনেক বড় বড় মহাপুরুষের কথা তোলেন—তাঁরা কেউই যুবতী মাতার গর্ভে হন নি, বালিকা মাতার গর্ভেই হয়েছেন। শেষে সার্বভৌম বলেন,—"আমি একটি কথা বলি, হিন্দু সন্তান সাবধান হও! বাঁধ ভেঙ্গে ঘরের দ্বারে বাণ এলো। এই যে গর্ভাধানের বিধি হচ্ছে, বড় সর্ব্বনাশ হবে, বালিকার বিবাহ বন্ধ হবে, হিন্দুকুলকামিনীর যে পবিত্র বন্ধন রয়েছে, তা ছিন্ন হবে, সাবধান!" তিলক্ মনে মনে ভাবে,,—"ব্যাটা বামুন কথাগুলো যা বল্লে, ঠিক, কিন্তু এ গোড়ে গোড় দিলে ত আমাদের নাম বেরুবে না, ও মেলাই দল জুটেছে, ওঁর সঙ্গে গেলে আমি পালে মিশিয়ে যাব. আমি ছোট দলেই থাক্‌ব। Professor বলেছেন, তাহ'লে রোজ রোজ মিটিঙের কাগজে আমার নাম বেরুবে, আচ্ছা, থাক্ শালারা!" তিলক সার্বভৌমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাতীবাগানের পণ্ডিতদের কাছে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। Professor তার হাতে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন। ওদের বশ করা কিছু কঠিন হবে না।

হিন্দুধর্ম ডুবে যায় দেখে সনাতন ধর্ম প্রেমিক লোকরা কালীঘাটের মন্দিরে দেবীর সামনে প্রার্থনা করে—যাতে হিন্দুধর্ম রক্ষা পায়, কন্‌সেণ্ট বিল্ এসে হিন্দু নারীর সতীত্ব যেন ম্লান না করে।

সম্মতি আইন ঘটিত আরও একটি প্রহসনের সংবাদ পাওয়া যায়।—

আইন বিভ্রাট (১৮৯০ খৃঃ)—হরেন্দ্রলাল মিত্র॥ নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ধনী জমিদার। সে তার একজন সম্ভ্রান্ত প্রজা ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বনাশ করবার চেষ্টায় থাকে। অন্য কোনো উপায় না দেখে সে সম্মতি আইনের সাহায্য গ্রহণ করে। এক ভণ্ড ব্রাহ্ম আচার্যের সহায়তায় সে ভূপতি এবং তার পুত্র দুজনকেই জেলে পাঠায়।

সম্মতি আইন বিরোধী আন্দোলন এককালে প্রচুর বিক্ষিপ্ত কবিতা-প্রবন্ধের জন্ম দিয়েছে। প্রহসনের যতোটা জন্ম-অবকাশ ছিলো, সে অনুযায়ী নমুনার অত্যন্ত অভাব। ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য হয়তো কিছু অভাব দূর করতে সক্ষম।

(ঘ) বিধবা বিবাহ ॥—

সামাজিক সুস্থতা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে প্রাকৃতিক যৌনবুভুক্ষাকে প্রবৃত্তির মধ্যে দমন করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে বলেই বিবাহপদ্ধতি জন্ম হয়েছে। কাম প্রবৃত্তি মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম। এই দিকটি বিধি বা আইন দিয়ে দমন করা সম্ভবপর হয় না—যদি না সংস্কার দ্বারা মানসিক অস্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্তি ক্ষেত্রবিশেষে না ঘটে। মানসিক অস্বাভাবিক সমাজ-মনের মধ্যে বিকৃতি আনে। অতএব সমাজের একাংশের ব্যাপক প্রবৃত্তি দমনে যে চিত্তবিকৃতির সূচনা হয়, তা সমাজের মঙ্গল আনতে পারে না। শুদ্ধ দাম্পত্য নিষ্ঠা সত্যই মধুময় এবং আকর্ষণীয়, কিন্তু সামাজিক ব্যভিচার-রোধের জন্যে একটি সাধারণ বিবাহপদ্ধতি থাকা উচিত যা চুক্তিমূলক অংশীদার স্বীকৃতিমাত্র। নইলে শুদ্ধ দাম্পত্য পরিধির বাইরের ক্ষেত্রে সর্বত্রই হয়ে ওঠে ব্যভিচারের বিভীষিকা ও বীভৎসতা। পাশ্চাত্য-সমাজে আদর্শের ব্যাবহারিক দিকটিকে মূল্য দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনকে সহনশীল করে তোলা হয়েছে;—যদিও এটিও একটি অপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং এর থেকে ব্যাভিচারানুষ্ঠান পাশ্চাত্য-সমাজে অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু আমাদের সমাজহিতৈষীরা একটি উন্নত অচ্ছেদ্য দাম্পত্য আদর্শের রূপ দিয়েছেন—যা জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে পদক্ষিপ্ত ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদির দ্বারা ভারবহুল করে তোলা হয়েছে। এই আদর্শকে লক্ষ্য করে ধাবিত হবার জন্যে সক্ষম অক্ষম সকলকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দাম্পত্য আদর্শ স্থান-কাল-পাত্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত বলে আধুনিককালের সমাজহিতৈষীরাও উপলব্ধি করে থাকেন, আমাদের সমাজে পরবর্তীকালে সেটার একান্ত অভাব হয়ে পড়েছিলো। বিধবার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশে পরাশর এটা অনুভব যে করেন নি তা নয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে তিনি (ক) সহমরণ (খ) ব্রহ্মচর্য্য ও স্বামীর স্মৃতিধ্যান এবং (গ) অন্যবিবাহ—তিনটিরই নির্দেশ দিয়েছেন। এই সমস্ত বৈকল্পিক নির্দেশের মধ্যে যে কোনো একটি মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু "ব্যবহার" বা "শিষ্টাচার" তথাকথিত দাম্পত্য আদর্শের খাতিরে এই সূক্ষ্মদৃষ্টিকে মূল্য দেয় নি। তাই আমাদের সামনে বিধবা সমস্যা এতো তীব্র।

বহু পতিত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদান্তর পত্যন্তর গ্রহণ এবং বিধবাবিবাহ—যৌন জীবনে তিনিটিরই কতকগুলো কুফল আছে—যা একই পর্যায়ে পড়ে। এমন কি

বার্ধক্য বিবাহের কুফলও অনুরূপ। বিশেষ করে বিধবাবিবাহে পুত্রের অধিকার সমস্যা অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতা নিয়ে বিচার করতে গিয়ে আমাদের দেশের স্মৃতিকাররা অবশেষে চার রকম পুত্র স্বীকার করে সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছেন।[৭৯] কিন্তু এ ছাড়াও অন্য সমস্যাও আছে যা সূক্ষ্মবিচারে দেখলে দাম্পত্য-শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। Dr. Carpenter's Human Physiologyতে একটি মন্তব্য আছে—"That a strong mental impression made upon the female by a particular male will give the offspring a resemblance to him, even though she has had no sexual intercourse with him."[৮০] নিকল সাহেব স্পষ্টই বলেছেন যে—"The children of a woman by a second husband resemble her first husband."[৮১] Trall সাহেবও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৮২]

কিন্তু স্বামীর মানসিক নির্যাতনও এতে কম থাকে না। একথা ঠিক যে দেহ এবং মনের সমস্যার মধ্যে যেখানে দেহের সমস্যা বড়ো সেখানে এসব বিচার নিয়ে চিন্তা করা নিরর্থক। কিন্তু মনের সমস্যা সম্পূর্ণ তুচ্ছ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

এক একটি প্রথার সঙ্গে যৌন আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ জড়িয়ে থাকে। বিধবাবিবাহনিষেধ আমাদের সমাজের একটি দৃঢ়মূল প্রথা। বিধবাবিবাহ আমাদের সমাজে ব্যবহার বিরুদ্ধ। এই ব্যবহার বিরোধিতার শক্তি শাস্ত্রানুকূল্যকেও অনেক ক্ষেত্রে তুচ্ছ করেছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েছে।[৮৩] তার একশো বছর পরেও ব্যবহার বিরোধিতার শক্তি কমেনি। কয়েক বছর আগে Statesman পত্রিকার চিঠিপত্রের কলমে[৮৪] একজন লিখছেন,—"...I do not think that these

৭৯। "ঔরস ঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্ত ঃ কৃত্রিমক ঃ সুতঃ"—পরাশর সংহিতা—৪/২০।

৮০। Dr. Carpenter's Physiology, p. 999.

৮১। Human Physiology—Dr. Nichol—p. 289.

৮২। Sexual Physiology and Hygiene—R. T. Trall. M. D.—195.

৮৩। "Act XV of 1856, being an Act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu Widows."

৮৪। Statesman—February 17, 1960.

hard regulations which a Hindu widow has to observe can be regarded as the right way for commemoration of anyone's memory. This question should attract the attention of our society, especially of social reformers. It should be observed that a Hindu widower is not called upon by social customs and conventions to lead the austere life that a widow is asked to follow irrespective of whether it tells on her health and mind.

These age-old Social evils should be removed from our society. It does not do any harm to our society, if widows, unwilling to remarry, are permitted to lead their normal way to life." (—letter Dated Cal.—13.2.60)

আমাদের সমাজে ব্যবহারের আনুকূল্য যে সমস্ত দুষ্প্রথার জন্ম দিয়েছে সেগুলো বাস্তবিক অনড়। আমাদের দেশের সামাজিক রীতিনীতি ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের চেয়েও ধর্মের সঙ্গেই সমাজের ঘণিষ্ঠতা বেশি। অথচ এই ধর্মটা শাস্ত্রসিদ্ধতার চেয়েও ব্যবহার সিদ্ধতার ওপরেই নির্ভর করে। বশিষ্ঠ সংহিতায় বলা হয়েছে,—"লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।" কিন্তু 'শিষ্টাচারের' কাছে কলিযুগের স্মৃতিশাস্ত্র—পরাশর সংহিতাও তুচ্ছ—মনুসংহিতা ইত্যাদি শাস্ত্র তো অস্বীকৃত হওয়া আরও স্বাভাবিক। পরাশর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ।"[৮৫] মানুষের মঙ্গলের জন্যেই স্মৃতির বিধান দিয়েছেন তিনি।—"মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।"[৮৬] কিন্তু এই মঙ্গলময় বিধানও 'শিষ্টাচারের' চাপে ম্লান,—শিষ্টাচার তার বিপরীত দিকে পদক্ষেপ করলেও সমাজসভ্য তারই আনুগত্য গ্রহণ করবে।

বিধবার বিবাহেচ্ছা আমাদের সমাজে এমনই অসঙ্গত আচরণ বলে গৃহীত হয়েছে যে, একটি প্রবাদের জন্ম হয়েছে,—"রাঁড়ী বেটীর বিয়ের সখ, উনায় রসের কত ঠমক।" বিবাহ স্ত্রীলোকের যৌন আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা

৮৫। পরাশর সংহিতা—১/২৩।

৮৬। পরাশর সংহিতা—১/২।

—তিনটিই দূর করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে আমাদের সমাজের পক্ষে এটা অত্যন্ত প্রযোজ্য। বিধবার যৌনবুভুক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমাদের দেশের বিধবা সমাজে যৌনবুভুক্ষা থাকলেও অন্য সমাজে স্বাভাবিক অবস্থায় যতোটা ব্যভিচারাদির অনুষ্ঠান হয়, আমাদের সমাজে ততোটা হয় না —শুধুমাত্র সংস্কার-সর্বস্বতার জন্যে। "শ্রীমতি—দাসী" রচিত "বিধবা রমণী" নামে একটি পুস্তিকায়[৮৭] বলা হয়েছে,—"দেখুন ইংরাজদের বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু সে কারণ ইংলণ্ডে কি কুলটা নাই? ইংলণ্ডে যত প্রকার জঘন্য পাপাচরণ হয়, আমাদের দেশে তাহার সহস্র অংশের এক অংশও হয় না।" কথাটা পাশ্চাত্য দেশগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত সত্য। Cowan সাহেব লিখেছেন,—"Dr. Nathan Allen, of Lowell has declared in a paper read before a late meeting of the American Social Science Association, that no where in the history of the world was the practice of abortion so common as in the country , and he gave expression to the opinion that, in New England alone, many thousand abortions are procured annually.[৮৮]

অন্যান্য সমাজের তুলনায় আমাদের সমাজের বিধবারা যৌনবুভুক্ষাকে বেশি সংযত রাখতে হয়তো সক্ষম হতো যদি না অন্যান্য চাপ এসে দেখা দিতো। কিন্তু আর্থিক চাপও বিধবা সমাজে কম আসে নি। "আর্যাদর্শন পত্রিকায়" "হিন্দুবিবাহ" প্রবন্ধের একটি মন্তব্যে আছে—[৮৯] "আমরা যখন অধীনা ও নিরুপায় বিধবাগণকে আইন মতে তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া কেবল সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করি, তখন সেই বিধবাগণকে কি নিপীড়ন করি না?" বিধবাদের ব্যাপক আর্থিক দুর্দশায় প্রবন্ধকার সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন। এই আর্থিক দুর্দশার কারণও ছিলো। পরবর্ত্তীকালে "ভারতী"তে[৯০] একটি প্রসঙ্গে এর ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে,—"বিশেষতঃ আমাদের দেশের

৮৭। শ্রীরামপুর গাঙ্গুলী প্রেস থেকে প্রকাশিত ; রচনাকাল ?

৮৮। The Science of a new life—John Cowan, M.D., p.—276.

৮৯। আর্য্যদর্শন—কার্তিক, ১২৯০ সাল।

৯০ ভারতী—ভাদ্র, ১৩১৬ সাল।

ভদ্র স্ত্রীলোকগণের জীবিকা উপার্জ্জনের পথ নাই বিবাহই এখানে ভদ্র স্ত্রীলোকের জীবিকা। সেইজন্য এ দেশে বিধবাদিগের কষ্ট এত অধিক।"

এ ছাড়াও আছে সাংস্কৃতিক সমস্যা। স্মৃতিকারদের বিধানে তা হয়ে উঠেছিলো ভয়াবহ। কাশীখণ্ডে বলা হয়েছে,—

"অমঙ্গলেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বিধবা হ্যত্যমঙ্গলা।
বিধবা দর্শনাৎ সিদ্ধিঃ ক্বাপি জাতু ন জায়তে॥
বিহায় মাতরং চৈকাং সর্ব্বাং মঙ্গলবর্জ্জিতাং।
তদাশিষমপি প্রাজ্ঞস্তজেদাশীবিষোপমাং॥[৯১]

বাল্যবিবাহ, অযোগ্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ থেকেই আমাদের সমাজে বিধবার সংখ্যা বেশি এবং যথারীতি সমস্যাও তীব্র। বিপত্নীক এবং বিধবাদের উপর প্রযোজ্যবিধির মধ্যে বিরাট পার্থক্যই স্বাধীন দৃষ্টিকোণকে উপস্থাপিত করেছে। H. Goodrich বলেছেন,—" Again, nearly one fifth (=19%) of all the woman in India are widows, although only one twentieth (=5%) of the men are widowers, the defference in the numbers of the widowed being mainly due to the large proportion of the girls who contract marriage in childhood, combined with the fact that men remarry as a rule and woman do not."[৯২]

বিপত্নীক পক্ষে সামাজিক আনুকূল্য এবং বিধবা পক্ষে সামাজিক কঠোরতা সমাজের স্বার্থপরতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন,—"এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য বশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না![৯৩] বিধবাদের পাশে বিপত্নীকদের কথা তুলে অনেকদিন আগে যুক্তিবাদী ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র "স্পেক্টেটর" বলেছেন।[৯৪]—"পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে

৯১। কাশীখণ্ড— ৪/৫০—৫১।

৯২। 'বিবাহ সংস্কার'—দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯৩। বহুবিবাহ (৪র্থ সং)—বিদ্যাসাগর—পৃঃ ১।

৯৪। বেঙ্গল স্পেক্টেটর—এপ্রিল ১৮৪২ খৃঃ।

স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষমা না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতাই কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধিমাত্র।" প্রথমে এটি ছিলো অনুযোগ, পরে তা দাবী আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে "নব্যভারত" পত্রিকায় ৯৫ গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "বিবাহ ও সমাজ" প্রবন্ধে বলা হয়েছে,—"বিধবাদিগের বিবাহ যেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ, বিপত্নীক পুরুষদিগের পুনর্ব্বিবাহের সেইরূপ নিষেধ করিলে নীতিগত সাম্যলাভ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করি না, বরং তাহা হইলে, পুরুষদিগের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

আমাদের সমাজে প্রাচীনকালে বিধবাবিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিলো. এমন কোনো প্রমাণ নেই। বৈদিকযুগকে টানিবার প্রয়োজন না থাকলেও বলা যায়, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৬।১।১৪ কিংবা অথর্ববেদের ৯।২০।৩ ইত্যাদিতে স্ত্রীর পুনর্বিবাহের দৃষ্টান্তে সমাজের আনুকূল্যই লক্ষ্য করি। পরে স্মৃতিযুগেও যে স্পষ্টভাবে নিষেধের কথা আছে তা নয়। কলিযুগের স্মৃতিশাস্ত্র পরাশর সংহিতায় স্পষ্ট লেখা আছে,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যান্নগচ্ছতি॥" ৯৬

বৃহন্নারদীয় বচনে ৯৭ "দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ" আদিত্য-পুরাণে—"দত্তকন্যা প্রদীয়তে" ইত্যাদির নিষেধ অথবা ক্রতুর ৯৮ "দত্তা কন্যা ন দীয়তে" ইত্যাদি নিষেধ বাগ্‌দত্তা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। অবশ্য আদি পুরাণে আছে,—

৯৫। নব্যভারত—শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল
৯৬। পরাশর সংহিতা—২৭-২৯।
৯৭। উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত।
৯৮। পরাশর ভাষ্যধৃত।

উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্ ॥৯৯

কিন্তু এগুলোর মূল্য পরাশরের বিধির কাছে তুচ্ছ হওয়া উচিত ছিলো। কারণ ব্যাসসংহিতায় আছে,—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥

স্মৃতির বাণী বহন করে বিদ্যাসাগরের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বও শিষ্টাচারের বা ব্যবহারের ক্ষমতা নষ্ট করতে পারেন নি। ব্যবহার বিরুদ্ধ বলে যা শাস্ত্র এবং মানবিক নীতিকে অতিবর্তন করতে চায় তার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপ ছিলো তীক্ষ্ণ। বহুবিবাহের সমর্থন করে বিদ্যাভূষণ তাঁর প্রস্তাবে লিখেছিলেন যে, —"বহুবিবাহ যে এদেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না।" বিদ্যাভূষণের মন্তব্যটিতে যুক্তির অসারতা দেখাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন,—"তদীয় ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া কল্য অন্য এক মহাশয় কহিবেন, কন্যাবিক্রয় যে এ দেশের শাস্ত্র নিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না। তৎ পরদিন দ্বিতীয় এক মহাশয় কহিবেন, ভ্রূণহত্যা যে এ দেশের শাস্ত্র নিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রমাণ; শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না।"১০০ অবশ্য একথা স্বীকার করা যায় যে শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী 'ব্যবহার' চলে না। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অনেকক্ষেত্রেই শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অচল। কারণ "প্রজাপতির্বৈস্বাং দুহিতরমভ্যধ্যায়ৎ"—এই শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তে সমাজ কখনই নিজ কন্যাকে বিবাহ করবার বিষয়ে অনুকূল হবে না। একটি কিম্বদন্তী আছে। একদা বিধবাবিবাহের সমর্থক পণ্ডিতদের ভোজসভায় মহিষ মাংস পরিবেষণ করা হয়েছিলো। তাঁরা আপত্তি করলে যুক্তি দেওয়া হয় যে গোমাংস সেবনই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ—মহিষ মাংস সেবন নয়। তখন পণ্ডিতরা 'ব্যবহার বিরুদ্ধ' বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।

বিক্রমপুরের রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ দানের প্রচেষ্টার বিরোধিতায়

৯৯। পরাশর ভাষ্যধৃত।

১০০। বহুবিবাহ (৪র্থ সং)—বিদ্যাসাগর—পৃঃ ১১৯।

নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বলেছিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র সম্মত তবু ব্যবহার বিরুদ্ধ। রাজবল্লভের প্রচেষ্টার কথা ছেড়ে দিলে সামষ্টিক প্রয়োজনে সামাজিক দৃষ্টিকোণ উনবিংশ-শতাব্দীর গোড়াতেই পাওয়া যায় "আত্মীয় সভার" আলোচনায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আত্মীয় সভায় আলোচনার অন্যতম প্রসঙ্গ—"the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy." তারপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের শেষাশেষি সময় ইয়ংবেঙ্গল দল বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বঙ্গানুবাদ ও আন্দোলন চালিয়েছে। অবশেষে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব এই দৃষ্টিকোণকে ব্যাপক করে তুল্‌তে সহায়তা করেছে। ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংস্কারমুক্ত পদক্ষেপই উনবিংশ শতাব্দীর প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ জাগ্রত করেছে। অবশ্য বিধবাবিবাহ সমর্থকদের সহানুভূতির আতিশয্যে। প্রাহসনিক দৃষ্টি বিধবাবিবাহ বিরোধীদের কেন্দ্র করে প্রকাশ পেলেও তা অনেকক্ষেত্রেই সিরিয়াস হয়ে গেছে। যথার্থ প্রাহসনিক দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে রক্ষণশীল সংস্কৃতির আনুকূল্যপুষ্ট বিধবাবিরোধীর মধ্যে। রক্ষণশীল পত্রিকা সংবাদ প্রভাকরের একটি সংবাদে এই দৃষ্টিকোণের বাস্তব অস্তিত্ব পাই। বিধবাবিবাহ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে। সংবাদ প্রভাকর বিবাহ অনুষ্ঠানটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,[১০১] ......"তাহার মধ্যে (=বিবাহসভার ব্যক্তিদের মধ্যে) বিদ্যালয়ের বালক ও কৌতুকদর্শি লোকসংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোক সমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সারজন সাহেবেরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন।" বিদ্যাসাগরের লেখা বিধবাবিবাহ পুস্তকটি সম্পর্কে আগ্রহাতিশয্য ছিলো—এর মূলেও সেই কৌতুক ও কৌতূহল। বিদ্যাসাগর জীবন চরিতে শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন[১০২] "বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিককাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল।" পত্র পত্রিকার বিক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রসঙ্গক্রমে বিধবাবিবাহ ও বিদ্যাসাগরকে কৌতুকের সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রচুর প্রহসনেও

১০১। সংবাদ প্রভাকর—পৌষ, ১২৬৩ সাল।

১০২। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত—পৃঃ ১২০।

বিদ্যাসাগরের নাম জড়িয়ে কৌতুকের সঙ্গে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। বিশেষ করে মেয়ে মহলের (যারা স্বভাবতঃ রক্ষণশীল) আলোচনায় 'সাগর' এবং "রাঁড়ের বে" এই কথা দুটি হাসির খোরাক যুগিয়েছে।

বাংলা প্রহসনে বিধবা সমস্যার অবতারণায় অনেক প্রহসনকার যথারীতি বিধবাদের মনোবিশ্লেষণ সহানুভূতির সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো" প্রহসনে (১৮৬৬ খৃঃ) বিধবা রামমণি ও গৌরমণির বক্তব্যে বিধবাদের যৌন ও আর্থিক সমস্যামুক্তির জন্যে আর্তি প্রকাশ পেয়েছে।—

রামমণি ॥ গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হলে তুই বিয়ে করিস ?

গৌরমণি ॥ আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা, কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না…। দিদি ! ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল করে সংসারধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায় ?

গৌরমণি ॥ দিদি ! বালিকা বিধবাদের কত যাতনা—একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বল্‌তে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না।·····দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাঠের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই, তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। ··"দেখ দিদি এসব পরমেশ্বর করেননি. মানুষে করেচে, তিনি যদি কত্তেন, তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম করে দিতেন।"

বিধবাদের মানসিক গতিবিধিও এই প্রহসনটির মধ্যে এদের দুজনের কথোপকথনেই উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে —

গৌরমণি ॥ যেদিন পতি মলেন সেদিন মনে করেছিলেম, আমি প্রাণকান্ত বিরহে একদিনও বাঁচবো না ; আর প্রতিজ্ঞা কল্লেম অনাহারেই মরবো—কিন্তু সময়ে শোকে মাটি পড়ে, এখন আর আমার সে ভাব নাই—আমি কি নিষ্ঠুর, যে পতি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসতেন, আমি সেই পতিকে একেবারে বিস্মৃত হইচি !

রামমণি ॥ অনেক সময় মেয়ে দ্বিতীয়ে বিয়ে না হতে বিধবা হয়েচে, তারা স্বামী কখন দেখি নি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি ?

গৌরমণি ॥ ছোট মেয়েটিই কি, আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই। বিধবা বিয়ে চলে গেলে কেউ বিয়ে করবে কেউ করবে না, এখন পুরুষদের মধ্যেও তো অমনি আছে, মাগ মলে কেউ বিয়ে করে, কেউ বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলে তো এমন কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, আমাদের শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে, সেকালে কত বিধবা বিয়ে হয়েচে—···সব লোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ পঞ্চানন পণ্ডিত !"

যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "চপলাচিত্তচাপল্য" নাটকে (১৮৫৭ খৃঃ) বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনে বলাৎকারমূলক নির্দেশের ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে বিনোদার উক্তির মধ্যে। বিনোদা বলেছে,—"সত্যি বল্‌তে কি, এখন আমাদের পুজো করবার বয়েস হয় নি, মনই স্থির থাকে না, কতদিকে যায়। তবে না কল্লে লোকে নিন্দে কর্ব্বে, আর গুরুপুরুত দেখা হলেই, আশীর্ব্বাদ করেন। "ধর্ম্মে মতি হোক" তাই বোন্ ধর্ম্ম করি।" আন্তরিক প্রেরণা ছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান মূল্যহীন। এই আন্তরিক প্রেরণার প্রত্যাশা এসব পরিবেশে সম্পূর্ণ অবাস্তব।

বিধবাবিবাহ বিরোধী এবং স্ত্রী নিগ্রহী শাস্ত্র সম্পর্কেও স্ত্রীপক্ষীয় দৃষ্টিকোণকে অনেক প্রহসনকার তুলে ধরেছেন ! রামনারায়ণ তর্করত্নের "নব নাটক"-এ নির্মলা ও চন্দ্রকলার কথোপকথনে আছে,—

নির্মলা ॥ "স্বামী মলো্য স্ত্রীর অমনি একেবারে গঙ্গাজল ধুয়ে খেতে হবে, আর পুরুষ স্ত্রী থাকতেও ১০।২০ যত ইচ্ছে বিয়ে করবে গে, এই বুঝি তোমার শাস্ত্রের বিধি ?··· (রাঁড়ের বে) না হতে দিক হবেই এর পর, তবে আমাদের অদেষ্টে হলো না।

চন্দ্রকলা ॥ হতো আমাদের হাতে কলম্ তো দেখ্‌তে পেত্তিস্ ; কেমন মনের সাধে শাস্ত্র করে ফেল্‌তেম।"

এই প্রহসনটির মধ্যেই একটি সুন্দর উপমায় বিধবাদের এই দুর্দশাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। চপলার উক্তিতে—

"দন্তঃহীন মুখ সম নারী পতিহীনা।
অন্যে অধিকার নাই শুধু জল বিনা ॥"

"শিমূয়েল পির বক্স্"-এর লেখা "বিধবা বিরহ" (১৮৬০ খৃঃ) প্রহসনে অপ্রত্যাশিতভাবে স্ত্রীপক্ষীয় একটি সমস্যার ইঙ্গিত পাই। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন অনেক বিধবার সুপ্ত যৌনবুভুক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিলো। সংস্কার এবং প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এদের অনেকেই আরও বেশি জ্বালা ভোগ করেছে। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন এই সমস্যা বৃদ্ধি করে কতোটা ক্ষতি করেছে, তার ইতিহাস আজ লুপ্ত। বিধবাবিবাহ আন্দোলন সংস্কারের প্রতিষ্ঠাকে শিথিল করে অনেক বিধবাকে ব্যভিচারের পথে প্রবৃত্ত করেছিলো কিনা, এটাও একটা বিবেচনার বিষয়। 'বিধবাবিরহ' প্রহসনের উদ্ধৃতিটি এই—

"এখন সেই সাগরের (= বিদ্যাসাগরের) ঐরূপ তেজ ও কল্লোল কিছুই নাই—এখন কেউ তাঁর রবও শুস্তে পায় না, একিবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন, বিধবাদিগের বিরহ আগুণে বারিপ্রদান না করে ঘৃত ঢেলে দিয়াছেন, কিনা যে কর্ম্মেতে হাত দিলেন তাহা শেষ ক'র্তে পাল্লেন না।"

বিধবাসমস্যা ও বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ অধিকাংশ প্রহসনেই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু শুধুমাত্র বিধবাসমস্যার যৌন দিকটিকে কেন্দ্র করে যে কয়েকটি প্রহসন রচনা হয়েছে, সেগুলোকে যথা মাত্রায় উপস্থাপন করা হলো,—অবশ্য প্রারম্ভিক বক্তব্য ও সাধারণ বক্তব্য যথার্থ সমাজ চিত্রদর্শনার্থে মাত্রানিরূপণ করবে।

চপলা চিত্ত চাপল্য (কলিকাতা—(১৮৫৭ খৃঃ)—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়॥ বিজ্ঞাপনে প্রহসনকার উদ্দেশ্যমূলকতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বিজ্ঞাপনের শেষে লিখছেন,—"এমত অবস্থাও (অসংলগ্ন অবস্থা) ইহার যা উদ্দেশ্য বোধহয় তাহা সাধন করিতে পারিবে, এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে এক একবার পাঠ করিলে আমার মানস সফল হইবে।"

কাহিনী।—জমিদার বাসব রায়ের বালিকা কন্যা চপলার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ আসে। তর্কালঙ্কার পরামর্শ দেন, "এখন ব্রতাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা চপলার পুণ্যসঞ্চয় করান, যাতে পুনর্জ্জন্মে সুখী এবং দীর্ঘকাল সধবা থাকিতে পারিবে।" বাসবের স্ত্রী মা হয়ে কেমন করে মেয়েকে দিয়ে একাদশী করাবেন? "কদিন এইটা মনে হচ্চে যে চপলা একাদশী কর্ব্বে, একসন্ধ্যা আলোচাল খাবে, আর আমি কেমন কোরে সব খাবো দাবো?" কিন্তু "পোড়া শাস্ত্র ত এমন নয় যে কিছুকাল একাদশী না কল্লে রেত পাবে।" বাসবের অন্য দুশ্চিন্তাও আছে।

"সত্যই বাল-বিধবার পিতাকে অসুখী থাকতে হয়। কারণ বয়ঃদোষে কলঙ্কের নিশান তারা তুলে ধরতে পারে।" চপলাকে প্রথম কয়েকদিন বিধবা হওয়ার পর খবর জানানো হয় নি। অবশেষে জানানো হয়েছে! চপলা নিয়মাচার যেভাবে পালন করে পাড়ার বিধবার তা সহ্য হয় না। একাদশীর দিনকে তার বিয়ের দিন বলে তারা ঠাট্টা করে। মোক্ষদাকে বিনোদ বলে,—"...তা ওমা সে পোনের বছরের মেয়ে, সে দুদ্‌গঙ্গাজল খেয়ে একাদশী করেচে।...কেন বোন্, সে বড়মানষের মেয়ে, সে সব কত্তে পারে, তাতে আর পাপ নেই। বোন্ সাধে বামন পণ্ডিতের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়।" বিনোদা বলে, সে নবছর বয়সে বিধবা হয়েছিলো। প্রথমবার একাদশীর দিন ভুলে সে ভাত খেয়ে ফেলেছিলো বলে সবাই তার বাবাকে একঘরে করতে চেয়েছিলো। পরের বার একাদশী এলে কেউ কিছু খেতে দিলেন না—নিরম্বু উপবাস। "আষাঢ়ান্ত বেলা, তাতে ন বছর বয়েস তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে লাগ্‌লো, শেষে বেলান্তে কেমন হয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেম। তখন মা করেন কি, গঙ্গাজল মুখে এনে দেন, তবে রক্ষা পাই।" এরাও বিধবা আর চপলাও বিধবা! বিনোদা ভবিষ্যদ্‌বাণী করে..."তা এই বিধবার বে চলিত হলে,, চপলারই কোন্‌দিন বে হয় দেখ। পরে আর যার হোক্।" বিনোদা আর মোক্ষদা নিজেদের বৈধব্যমহিমা জাহির করলেও সত্যিকথা কয়েকটা প্রকাশ করে ফেলে। বিনোদা বলে—"আমি ভাই পূজো করি বটে, কিন্তু মন্তর-টন্তর সকল সময় মনে থাকে না। ফুলচন্দনই জলে ভাসাই।" মোক্ষদা বলে,—"তুমি ভাই মনের কথা বল্লে, ভাই আমিও বলি, আমিও ত, একদিন সব মন্তর পড়ি না, হোলো ধ্যান কল্লেম তো জপ সমাপন কল্লেম না, এম্‌নি তো প্রায়ই হয়।"

চপলাকে বাসব যতদূর সম্ভব সইয়ে সইয়ে আচার পালন করাচ্ছেন। পার্বতীও এটাই ঠিক মনে করেন। এক প্রতিবেশী পার্বতীকে বল্‌ছিলো,—"অত আঁট কল্লে শেষে গেরো ফস্কে যাবে।"

এদিকে চারদিকে বিধবাবিবাহ নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে। মালিনী ভাবে, এবার তার ব্যবসা উঠ্‌লো। "ভাই এখন যাহোক অপ্‌পবইসি বিধবা ছুঁড়িগুলোর মন যুগিয়ে চল্‌তে পাল্লে যখন যা ধরি, তা তারা দেয় থোয়, আর বেঁধে গেলে কেউ পাঁচসিকে ছাড়ায় না, তা এমন ত মাসের মধ্যে হচ্চেই। তা যদি বিধবার বে চলিত হয়, তবে লুকিয়ে আর এ কর্ম্ম কর্ব্বে কেন, পেট বাঁধলে ওষুধ খাবেই বা কেন। তা যদ্দিন না হয় আমার পক্ষেই ভাল।" কামিনীর স্বামী

নাকি বলেছে,—"পোড়া কি এক সাগর, তার জ্বালায় আর মাগ্, নে নিশ্চিন্তি হয়ে শোবার যো নাই। যে বিধবা বের বিধি দিয়েছে। এখন আবার মেয়েগুলোর মন যুগিয়ে চল্‌তে হবে, তা না কল্লে বিষ খাইয়ে কি আর কোন্ রকমে মেরে ফেলে, আর একটা বে কর্ব্বে।" বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেককিছু মন্তব্য করলেও স্থদেব স্থবর্ণ—ইত্যাদি কয়েকজন ভদ্রলোক এর যৌক্তিকতা বোঝেন। বাসব একদিন স্থদেবকে বল্লেন—"আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত অনেক বই পড়েছি, বে না হওয়াতে যে কত মন্দ হতেচে, তাও অনেকদিন পর্য্যন্ত ভেবে দেখেছি।" বাসব বলেন, চপলার আবার বিয়ে দিলে কেমন হয়! স্থদেব বলেন, এতে তাঁর সমর্থন আছে। কথা প্রসঙ্গে স্থদেব ভূদেব বাবুর ছেলে চারুর কথা তোলেন। বলেন, সে সংস্কারযুক্ত; চপলার সঙ্গে যদি তার বিয়ে দেওয়া যায়, সে আপত্তি করবে না। বাসব তখন বলেন,—"ওহে সে কথা কোন কাযের নয়, লোকে মুখে অমত মত জানায় কিন্তু কায়ের বেলা হটে যায়।" স্থদেব আশ্বাস দেন, সেই ভয় নেই।

সত্যিই, চপলার বিয়ে দেওয়া ছাড়া গতি ছিলো না। চপলা একদিন পাঠ শুন্‌তে শুন্‌তে উঠে এসেছিলো। সখী কামিনীর কাছে সে কারণ খুলে বলে।—"আমার ও কথা শুন্‌তে গেলে কান্না পায়। কেষ্ট গোপিণীগণের বস্ত্রহরণ কোরে, কদমগাছে উঠ্‌লেন, রাধিকার মানভঞ্জন কল্লেন, নিকুঞ্জে বেহারে গেলেন, এসব রসের কথা কি আর ভাল লাগে? বিকেলবেলা কথা শুনে সমস্ত রাত অসুখে যায়।"

ইতিমধ্যে একদিন স্থদেব এসে খবর দেয়, ভূদেব বাসবের প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। ভূদেব নাকি বলেছে, গাঁয়ের লোক বাসবকে যদি একঘরে করতে না পারে, তাহলে তাকেও পারবে না। কারণ বাসবই সেদিক থেকে প্রধান আসামী—কন্যা সম্প্রদান করবে। বাসব বলেন,—"পূর্ব্বে গোপনভাবে সকল উদ্‌যোগ করা যাক্, পরে বিবাহের তুই দিবস পূর্ব্বে একথা প্রচার হবে, সেই সকল উদ্‌যোগ করা যাবে।"

এদিকে আর একটি ব্যাপার ঘটে যায়। চারু 'কথা' শুনতে যায় নেহাৎ কৌতূহলী হয়ে। এ অবস্থায় চপলা হঠাৎ চারুকে দেখে চোখ ফেরাতে পারে না। চারুও হঠাৎ চপলাকে দেখে মোহিত হয়ে যায়। মালিনী বুঝতে পারে এদের এমন একটা চল্‌ছে তখন সে ভাবে, এদের সে মেলাবে এবং তুপক্ষ থেকেই সে টাকা আদায় করবে। কিন্তু ভয় হয়, "চপলা তো ছুটলো গেরস্ত ঘরের মেয়ে

নয়। বড় ঘরে সিঁদ দেওয়া বড় শক্ত কায।" চারুর ধর্মকর্মে মতি দেখে সবাই প্রশংসা করে। চারু নিজে বলে,—"সকলে বলে, চারুচন্দ্র বয়সে নবীন বটে, কিন্তু পুরাণকথা শুনিতে বড় ভক্তি আছে। কিন্তু আমি যে জন্মে কথা শুনতে যাই তা ত তারা জানে না, না জানিলেই ভাল।" চপলা এবং চারু—দুজনের পক্ষ থেকেই পূর্বরাগ বেশ জমে ওঠে। আর ওদিকে বাসবের সঙ্গে ভূদেবেরই কথাবার্তা চলে।

৩রা বিয়ে,—পয়লা তারিখে বাসব যখন হঠাৎ দেওয়ান রাঘব মজুমদারকে এবং পুরোহিত তর্কালঙ্কারকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানালেন, তখন তাঁরা দিশেহারা হয়ে যান। তর্কালঙ্কার বলেন, বাসব এবং ভূদেব—দুজনেই পণ্ডিত, হিন্দুধর্মাক্রান্ত, সুব্রাহ্মণ, তবু কেন তাদের এ দুর্মতি হলো! দুদিন পর বিয়ে—এ বিয়ে বন্ধ করা যায় না। বাধ্য হয়ে তাঁরা অধ্যাপকদের কাছে পত্র বিলির জন্যে উদ্যোগী হন।

বিয়ের দিন বর দেখে চপলা অবাক হয়ে যায়। কামিনীর কাছে তখন সে তার পূর্বরাগের ইতিহাস প্রকাশ করে। কামিনীকে দিয়ে সে যার তত্ত্ব নেবার চেষ্টা করছে, সেই হয়ে গেলো তার বর!

বিধবাবিরহ (কলিকাতা ১৮৬০ খৃঃ)—শিমূয়েল পির বক্‌স্ (ইণ্টালি কামার ডাঙ্গায়) ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে কয়েকদিন পূর্বে পরলোকগত এক ব্রাহ্মণের আদেশে এই পুস্তক রচনা। "তাহার সেই আদেশানুসারে সেই বিষয়ে (যে যে বিষয়ে আদিষ্ট) এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাধারণ ভাষায় এতদ্দেশীয় সামান্য ও ভদ্র স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকেন, রচনা করিয়া ইহার নাম বিধবাবিরহ নাটক রাখিলাম।" (১লা অগ্রহায়ণ ১২৬৬ সাল)।

বিধবা সমস্যা থেকে যে ব্যভিচার অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, এই মত প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রহসনটি রচিত। বিদ্যাসাগরীয় আন্দোলনের সমর্থনে এটি রচিত। মনোহারীর উক্তিতে আছে,—"সাগর মহাশয়ের ইহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। তিনি যৎপরোনাস্তি সাধ্য পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন, কেবল যে তিনি একা তা নয়, তাঁহার স্বপক্ষ বৰ্দ্ধমানের মহারাজা ও কলিকাতার অনেক ২ রাজা আর বাবুগণ ছিলেন। ইহারা কি না করতে পারেন তবে এটা যে সিদ্ধ হল না সে কেবল আমরা যে অবলা বিধবা আমাদেরই ভাগ্য দোষ বলতে হয়। কেননা, যখন এই বিধবাবিবাহের উদ্যোগ হতেছিল, প্রায় সেই সময় দুষ্ট নিমকহারাম সিপাহীগণ যাহারা এতবছর অবধি সন্তান সন্ততির ন্যায় রাজ্যেতে

প্রতিপালিত হইল, একেবারে রাজ্য নিবার আশায় রাজবিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল।" আকস্মিক দুর্ঘটনাই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ, সমর্থনের অভাব নয় —এই মত প্রচারের মাধ্যমে নব্য দৃষ্টিকোণকে গ্রহণের চেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়।

কাহিনী।—উমাচরণ বাঁড়ুজ্যের মেয়ে মনোমোহিনী অল্পবয়সেই বিধবা। বাপের বাড়ীতেই থাকে। উমাচরণ বিধবাবিবাহের বিপক্ষে। অথচ দুটি স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুটি রক্ষিতা আছে। শোনা যায় বাড়ীর ঝি চাঁপাকেও তিনি একবার অন্তঃসত্ত্বা করেছিলেন।

মনোমোহিনীর জীবনে বৈচিত্র্য নেই। পদ্মমাসীর বড়মেয়ে মনোহরী তার সমবয়সী বিধবা। তাঁর সঙ্গে সে মাঝে মাঝে সুখ দুঃখের কথা বলে। মায়ের অনুমতি নিয়ে সে একবার মাসীর বাড়ী যায়। মনোহরীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলে, বিধবা হয়ে তার বড়ো "বিরহের" দুঃখ। "মা বাপ অতি শৈশবকালে বিবাহ দিয়েছিলেন আর স্বামীও সেই শিশুকালেই মরিলেন, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত প্রায় বারো চো৴ বছর হল বিধবা হয়েচি, স্বামীর সঙ্গে বাস করতে যে কি পর্য্যন্ত সুখ তার কিছুই অনুভব কর্ত্তে পেলুম না। সতত উপবাস ও ব্রত আদি পালন আর আতব চাল ভক্ষণ করে কাল কাটালুম।" বিধবাবিবাহ হলে বিধবাদের সমস্যা মিট্‌তো. কিন্তু তা হয় না বলেই এতো অনাচার। পেয়ারি দত্তের মেয়ে মুক্তকেশী নিমে তাঁতীকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে! তার নয় বছরে বিয়ে হয়ে দুই বছর পর রাঁড় হয়েছিলো। এখন নিমের বৌ মুচ্‌নি খোঁড়া আর চার পাঁচটা 'নেড়া গেড়া' ছেলে নিয়ে মুস্কিলে পড়েছে। দাঁতপড়া কুঁজো বুড়ো নিমেকে কি করে মুক্তকেশী পছন্দ করলো, ভাবতে অবাক লাগে। মনোহরী বলে, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ নিয়ে এতো উদ্যোগ করলেন। বিধবারাও আনন্দে নেচে উঠ্‌লো। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই সে আন্দোলনের জোর কমে গেছে। "এখন সেই সাগরের ঐরূপ তেজ ও কল্লোল কিছুই নাই—এখন কেউ তাঁর রবও শুন্তে পায় না একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন, বিধবাদিগের বিরহ আগুনে বারিপ্রদান না করে ঘৃত ঢেলে দিয়াছেন, কিনা যে কর্ম্মেতে হাত দিলেন তাহা শেষ কর্ত্তে পাল্‌লেন না।" মনোহরী বিদ্যাসাগরের নিন্দায় ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, দুষ্ট সিপাইদের রাজদ্রোহিতার জন্যেই এসব শেষ হলো না। মনোহরী সিপাইদের নিপাত কামনা করে।

মাসীর বাড়ীর থেকে বাড়ীতে এসে পৌছালে বামা তাকে একটা মর্মান্তিক খবর দেয়। মাধব চাটুজ্যের বড় মেয়েটি বিধবা। বাড়ীর চাকরের সঙ্গে

অবৈধ সংসর্গে গর্ভবতী হয়। ৬।৭ মাসের সময় 'পেট ফেলিয়া দিয়াছে।' বোধহয় জ্যান্ত হয়েছিলো। শিশুটিকে ছুরি দিয়ে গলা কেটে পুঁতে ফেলা হয়েছিলো। শিয়াল কি কুকুর সেটা মুখে করে ঘোষেদের বাড়ীর দরজার গোড়ায় ফেলে রেখেছে। বামা কুট্‌নিগিরি করলেও এটা নাকি তার অগোচরে হয়েছে। প্রাণনাথ চাটুজ্যে অবশ্য লোকলজ্জার ভয়ে গলায় দড়ি দিয়েছেন। মনোমোহিনী ভাবে, বিধবাবিবাহ না হলে এমন কতো কী হবে!

চাটুজ্যে বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা হতে হতে বিধবা-বিবাহের কথা উঠ্‌লো। ভট্টাচার্য বলেন, বিধবাবিবাহ হতে দেবার চেয়ে খৃষ্টান হয়ে যাওয়া ভাল। "এত উৎপাত করে কাজ কি একেবারে খ্রীষ্টীয়ান হয়ে যাও না কেন তাহা হইলে ঝন্‌ঝাটি থাক্‌বে না।" তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্যকে বোঝান, "নষ্টে মৃতে......" শ্লোকের অর্থ বাগ্‌দত্তার পুনর্বিবাহ নয়, কারণ পুনর্বিবাহ, ব্রহ্মচর্য ও সহগমন একই বিষয়ে দর্শিত হয়েছে। বাঁড়ুজ্যে বলেন, এটা কলিযুগে খাটে না। তর্কালঙ্কার বলেন, পরাশর কলিযুগের জন্যেই ব্যবস্থা করেছেন। আচার্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে তর্কালঙ্কার বলেন,—একবার দান করলেই আবার দানাধিকারী হওয়া যায় না বটে, কিন্তু সেটা অন্যক্ষেত্রে, আপন কন্যার ক্ষেত্রে নয়। কারণ এটা বাচনিক দান। পিতৃগোত্র অনুযায়ীই দান হবে—পূর্বমন্ত্রের অনুযায়ী। রক্ষণশীলরা বিতর্কে পরাজিত হলেও বিচলিত হন না। সংস্কারপন্থীরাও যুক্তি দিয়ে তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ দেখান না।

মনোমোহিনী নিজে বিধবাদের অনাচার দেখে অবাক হলেও শেষ পর্যন্ত নিজেই অধঃপতনে নাম্‌লো। 'নঙ্গরা' নামে এক হাড়ীর ছেলের ওপর আকৃষ্ট হয়ে বামাকে দিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। শিবতলায় নঙ্গরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নঙ্গরা এদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে মনোমোহনীকে পেয়ে বামাকে চার গণ্ডা পয়সা বক্‌শিস্‌ দেয়। মনোমোহিনী একা একা কামরায় রাত্রে ঘুমোয়। নঙ্গরাকে বলে নঙ্গরা যেন নটার সময় খিড়কীর দরজায় অপেক্ষা করে। সবাই ঘুমোলে পরে রাত্রে খিড়কীর দরজা খুলে তাকে তার ঘরে নিয়ে আস্‌বে। ভোরবেলায় আঁধার থাকতে থাক্‌তেই তাকে বার করে দেবে। বামা আরও পাঁচ টাকা বক্‌শিস্‌ পায়।

যথারীতি মনোমোহিনীর গর্ভসঞ্চার হয়। তার চালচলনে সকলে সন্দেহ প্রকাশ করে। উপায় না দেখে মনোমোহিনী কিছু টাকা সংগ্রহ করে নঙ্গরার

সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হয়। মনোমোহিনীর বাবা মা লজ্জায় দেশান্তরী হলেন। যাবার আগে মা কালীতলায় একটা পাঠ লিখে টাঙিয়ে দেন। তাতে লেখেন,—"হে দেববংশ হিন্দুলোকেরা তোমার আমার স্বজাতীয় লোক এইজন্যে তোমাদের নিকট নিবেদন এই যদি কুলশীলজাতিমান রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে শীঘ্র যাহাতে বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ হয় এমন চেষ্টা কর।"

বিধবাসমস্যা ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আরও অনেক প্রহসন লেখা হয়েছে। পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় দলই প্রহসন রচনায় তৎপর ছিলেন "**শুভস্য শীঘ্রং**" (১৮৬১ খৃঃ)—হরিশ্চন্দ্র মিত্র—প্রহসনটি বিধবা-বিবাহের সমর্থনে রচিত। এরকম আরও সমর্থনে বা অসমর্থনে রচিত প্রহসনের নাম পাওয়া যায়। যেমন—"**বিধবাপরিণয়োৎসব**" (১৮৫৭ খৃঃ)—বিহারীলাল নন্দী; "**বিধবা বিষম বিপদ**" (১৮৫৭ খৃঃ)—অজ্ঞাত; "**বিধবা বিলাস**" (১৮৬৪ খৃঃ)—যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়; "**সম্বন্ধ সমাধি**" (১৮৬৭ খৃঃ)—অজ্ঞাত;—ইত্যাদি। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে রচিত আরও কিছু প্রহসনের অস্তিত্ব হয়তো ছিলো, কিন্তু তা লুপ্ত হয়ে গেছে। লঙ্ সাহেবের তালিকার পর বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকার মধ্যবর্তী সময়ের শূন্যতা ভরাট করবার মতো উপযুক্ত নথিপত্রের অভাব। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিধবাবিবাহ বিষয়ে খ্যাত অখ্যাত ছোটো বড়ো সব রকম বইই রেখে-ছিলেন, কিন্তু সেগুলো আলোচনার বই, প্রহসন ধরনের বই তাতে বিশেষ নেই।

৫। বিবিধ।—

আমাদের সমাজে যৌন সমস্যা অত্যন্ত জটিলভাবে অবস্থান করায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিভিন্ন ফলাফলের অবকাশ সৃষ্টি করে প্রহসন লেখা হয়েছে। সমাজচিত্র হিসেবে এগুলোর মূল্য বিবেচনার অধীন। এ ধরনের প্রহসনের মূলে ছিলো সাংস্কৃতিক আক্রমণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাইভোর্স-এর চিত্র উল্লেখ করা যায়। সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিভাগে এই সমস্ত চিত্র আমরা মাত্রা দিয়ে বিচার না করলে ভ্রমাত্মক ধারণা লাভ করবো। আগে যে বৈবাহিক প্রথা ঘটিত দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাও যেমন বৈবাহিক দুর্নীতি, এটিও তাই। বৈবাহিক দুর্নীতি সমাজে কখনো মঙ্গলময় বিবেচিত হয় নি। অতএব ডাইভোর্স প্রথাও যে মঙ্গলময় বিবেচিত হবে না, এটা স্বাভাবিক। "বিবাহ সংস্কার" নামে একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে,—"আমাদের

বিবেচনায়, বিবাহ বন্ধন একটী সংসারের বন্ধন নয়, ইহা একটি ধর্ম্মবন্ধন। কেবল বিজ্ঞানসম্মত হইলেই ইহাতে মঙ্গল হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি সম্মত হওয়া একান্ত উচিত।"[১০৩] পাশ্চাত্য রীতিনীতি আমাদের যখন প্রভাবিত করেছে—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদির মধ্যে যখন পরিণতি লাভ করেছে, তখন 'ডাইভোর্স' ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অবকাশ থাকা অসম্ভব নয়। বৈবাহিক দুর্নীতি ঘটিত সমস্যা অধিক সমর্থনপুষ্টির সূচনা করে। তাই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত বিরোধে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে—যদিও এই অবকাশ সর্বদা দৃষ্টান্ত বহন করে না। একজন বিদেশীর ভাষাতেই পাশ্চাত্য বিবাহের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে!—"Nothing is easier than to get married in England; no papers to produce, no consent to obtain; a declaration, witnessed by two persons, to make before the registrar and that is all."[১০৪] বিবাহ যেখানে এতো সহজ ব্যাপার, বিবাহবিচ্ছেদও অত্যন্ত সহজ। এদেশীয় রক্ষণশীল ব্যক্তিরা মন্তব্য করেছেন যে, এদেশে Courtship প্রথার প্রচলনে যথেচ্ছ বিচ্ছেদ অনুষ্ঠিত হবে। Courtship প্রথার বিরোধিতার মূলে ছিলো সামাজিক স্বার্থ—যে স্বার্থ সমাজসভ্যের ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করে। বাল্যবিবাহ অথবা অভিভাবক পরিচালিত বিবাহে সমাজ স্বার্থ অটুট থাকে। আমাদের দেশের বিভিন্ন শাস্ত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ আছে—যদিও তা সর্তাধীন। বশিষ্ঠ সংহিতা—১৭ তে, নারদ সংহিতার ১২ বিবাদপদে, পরাশর ভাষ্য, নির্ণয়সিন্ধু, বিবাদ রত্নাকর, বীরমিত্রোদয় ইত্যাদিতে উদ্ধৃত কাত্যায়ন বচনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ আছে। তন্ত্র ও পুরাণেও—যেমন মহানির্বাণতন্ত্রে একাদশ উল্লাসে ৬৬ শ্লোকে কিংবা অগ্নিপুরাণে ১৫৪ অধ্যায়েও এর নির্দেশ আছে। কিন্তু তবু আমাদের সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ—অন্ততঃ স্ত্রীপক্ষীয় প্রচেষ্টায় বিবাহবিচ্ছেদ ছিলো সংবাদ বিশেষ। তাই সমাচার চন্দ্রিকায় সংবাদ হিসাবে একটি বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা পরিবেশন করা হয়—যা অন্যদেশে সংবাদ নয়। ১২৭৩ সালের একটি ঘটনায় দেখা যায়—নপুংসকের সঙ্গে একটি দশমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হয়। পরে আদালতের সাহায্যে বিবাহ খারিজ হয় এবং পুনরায় তার বিবাহ

১০৩। বিবাহ সংস্কার—দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—১২৯৫ সাল, পৃঃ ৩।

১০৪। John Bull and his Island—Max O'rell—P-40.

হয়।[১০৫] আমাদের দেশে অসমবিবাহ বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ ইত্যাদি দৌর্নীতিক বিবাহ প্রথাজনিত অসন্তোষেও স্ত্রীপক্ষ বিবাহবিচ্ছেদে অক্ষম ছিলো। অথচ 'বীরমিত্রোদয়' গ্রন্থের স্পষ্ট.উদ্ধৃতি টানা যায়,—

যদি সা বালবিধবা বলাত্ত্যক্তাথবা কচিৎ।
তদাভূয়স্তু সংস্কার্য্যা গৃহীত্বা যেন কেনচিৎ॥

শাস্ত্রীয় নির্দেশ সত্ত্বেও স্বপক্ষীয় প্রচেষ্টায় বিবাহবিচ্ছেদ ছিলো ব্যবহার-বিরুদ্ধ। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত ক্ষমতা সঙ্কোচনে বিভিন্ন অবকাশে এই ব্যবহার-বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে প্রহসনকাররা সামাজিক সমর্থন প্রার্থনা করেছেন।

বৈবাহিক দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম নিকট-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ। ইংরাজী Courtship প্রথায় নিকট-বিবাহ অনুমোদিত। আমাদের দেশে কুলীন সমাজে মেলবন্ধনের সঙ্কীর্ণতায়ও নিকট-বিবাহের অনুষ্ঠান দুর্লভ থাকে নি। শুধু নিকট-বিবাহ নয়, নিকট-সম্পর্কীয়দের মধ্যে ব্যভিচারও চলেছে। উভয় দিক থেকেই দোষ লক্ষ্য করে প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল—দুই পক্ষই প্রতিষ্ঠাগত কারণেই যৌন দিকটি উপস্থাপন করেছে। নিকট-বিবাহের সামাজিক কুফল আছে বলা বাহুল্য। Ruddock সাহেব বলেছেন—"A large proportion of those children who are born with defective sense—blind, deaf, dumb, & C,—are the offspring of near relation.[১০৬] কিন্তু এধরনের দৃষ্টান্ত সমাজে খুব ছিলো বলে মনে হয় না। হাস্যকরভাবে নিকট-বিবাহ অনুষ্ঠানকে উপস্থাপন করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিতে রক্ষণশীলরা অভিভাবক পরিচালিত বিবাহ প্রথার পোষণ করেছেন। প্রগতিশীলরাও কৌলীন্য বিচারের পুরোনো মানদণ্ড ধ্বসিয়ে দিতে চেয়েছেন।

যৌনবিজ্ঞানের মত এই যে, অসবর্ণ বিবাহ সন্তান জননের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ। কিন্তু আমাদের সমাজে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা এতো ভঙ্গুর ছিলো যে বৈবাহিক বন্ধনের ক্ষেত্রে কোনো দুর্বলতা স্বীকার করে নেওয়া সাহসিকতার কাজ ছিলো। স্মৃতিকাররা অনুলোম প্রথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সবর্ণা ব্যক্তিকেই প্রথমা স্ত্রী বলে স্বীকার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্ব স্ব বর্ণের মধ্যে বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও কন্যার অভাব না ঘটায় পুর্বোক্ত সাহসিকতা

১০৫। সমাচার চন্দ্রিকা—১৯শে পৌষ, ১২৮৩ সাল।

১০৬। Lady's Manual—Dr, Ruddock, P-114.

প্রদর্শনের কোনো আবশ্যকতা ছিলো না। তাই অসবর্ণ বিবাহও আমাদের সমাজে ক্রমে ক্রমে ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত আক্রমণের ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহ ও যোগ্যতা বিচারের অবকাশ সৃষ্টি করে রক্ষণশীলরা কোর্টশিপ প্রথার বিরোধিতার সঙ্গে প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন বর্ণের সাংস্কৃতিক মানের পটভূমিকায় তাকে হাস্যকরভাবে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন। অসবর্ণ বিবাহ যৌন দুর্নীতি বিন্দুমাত্র নয়। তবে অনেকক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব যৌন অশান্তি সৃষ্টির অবকাশ রেখে যায়। অনেকে এইদিক থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত আক্রমণ চালিয়েছেন।

বৈবাহিক দুর্নীতির সঙ্গে অত্যন্ত জটিল সম্পর্কে সম্পর্কিত অনেক অবকাশ বিভিন্ন প্রহসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তসহ প্রযুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও আরো কতকগুলো যৌন সমস্যার ক্ষেত্র দেখা যায়—যার মূলে থাকে পরিবেশ প্রভাব। দাম্পত্য-সন্দেহ এধরনের একটি যৌন সমস্যা। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, তুলনামূলক মনঃসমীক্ষা এবং পরিবেশ প্রভাব এতে অত্যন্ত সক্রিয়। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "ভণ্ড দলপতি দণ্ড" (১৮৮৮ খৃঃ) প্রহসনে কিছুটা ইঙ্গিত আছে। দিগম্বরী পাড়ায় বেড়াতে গিয়েছিলো—এতে তার স্বামী ধনপতি তাকে অকারণে সন্দেহ করে। দিগম্বরী বলে,—"আমি বুড়ো মাগি, পাঁচ ছেলের মা হলুম, আমি বাড়ীর বাইরে গেলে, ওঁর আবার মনে সন্দেহ হয়। ধন॥ আরে ক্ষেপী বাইরে যে দশ ছেলের বাবা অমন গণ্ডা গণ্ডা রয়েছে।" প্রফুল্ল নলিনী দাসীর লেখা "ষষ্ঠী বাটা" প্রহসনেও (১৮৮৭ খৃঃ) অনুরূপ ইঙ্গিত আছে।—

"বিনোদিণী॥ ভাই এই তোর কেমন অন্যায় কথা, একবার খানিকক্ষণ থেকে আহ্লাদ আমোদ কোরে আস্‌বি, এতে কি তোর ভাতার নিষেধ কর্ব্বে ?

বসন্তকুমারী॥ ওলো, তাতো জানিস্‌নে বোন ? তাদের আপনাদের মন যেমন, স্ত্রীলোকের মনও তেমনি দেখে।

বিনোদিনী॥ ভাই যা বল্লি, তা বড় মিথ্যা নয়, এখন এই রকমই চাল চলছে বটে, কালটা যেমন কুচক্রুরে হোয়ে পড়েছে যে, কুকর্ম্মেই সকলের মতি হয়ে থাকে, আর কেবল পুরুষের দোষই দাও কেন বল, স্ত্রীলোকেই হোচ্চে কু, আর পুরুষে হচ্চে কর্ম্ম, এই দুয়ে যোগ কোরে কুকর্ম্ম হয়, তা ভাই এক হাতে কখন তালি বাজে না।"

বাস্তবিক লাম্পট্য ব্যভিচার ইত্যাদিই ব্যাপক অনুষ্ঠান সুস্থ সমাজ জীবনে নির্দোষ দাম্পত্য বন্ধনের মধ্যেও আঘাত এনে দেয়। অংশীদারদের চারিত্রিক কোনো দোষ না থাকলেও সন্দেহ এসে দাম্পত্য বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি করেছে। "অ্যাসিষ্টান্ত সারজন শ্রীফকিরচাঁদ বসু দেব প্রকাশিত" "সংশয় প্রণয়ের কণ্টক" নামে একটি পুস্তকে এ সমস্যা নিয়ে কিছুটা আলোচনা আছে। পতি-পত্নীর পারস্পরিক সংশয়ে আত্মহত্যা, মানসিক যন্ত্রণা অথবা প্রতিশোধ বাসনায় ব্যভিচার প্রবৃত্তিঘটিত অনুষ্ঠান উভয়ের জীবনকে কলুষিত করে। শুধু সন্দেহ-প্রবণ ব্যক্তির পক্ষেই এসব ঘটে না, সন্দেহের পাত্রও একই পর্যায়ভুক্ত। এ অবস্থায় স্ত্রীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে লেখক বল্‌ছেন,—"...সে তখন ভাবে, যদি স্বামীই ভাল না বাসিল, যদি আমার দুর্নামই হইল, তবে আমার কিসের ভয়, যদি পাপ না করিয়াও কলঙ্কের ভাগিনী হইলাম, ধর্ম্ম পথে থাকিয়াও যদি অধর্ম্মের ভোগ ভুগিতে হইল, তবে কেন সেই অধর্ম্মের আনুসঙ্গিক সুখে বঞ্চিত থাকি।"

এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রহসনের স্থূলভতায় সেগুলি উপস্থাপন করা হলো। অবশ্য দাম্পত্য সন্দেহকেন্দ্রিক প্রহসন হয়তো বেশি না থাকলেও অনেক প্রহসনেই দাম্পত্য সন্দেহের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাবে।

ঝক্‌মারির মাশুল (১৮৭৭ খৃঃ)—অজ্ঞাত॥ 'চলন্তিকা' অভিধানে "ঝক্‌মারি" শব্দটির তিনটি অর্থ আছে—অপরাধ, নির্বুদ্ধিতা, হয়রানি। নির্বুদ্ধিতা প্রমুখ অপরাধ পরিণতিতে মানুষকে ক্ষতি স্বীকার করায়। অকারণ দাম্পত্য সন্দেহ এ ধরনের একটি অপরাধ। সুতরাং নামকরণের দিক থেকে লেখকের পক্ষ থেকে যে দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তারই পাশে অসমবিবাহ প্রসূত স্ত্রীপক্ষীয় অর্থলোভ প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে সমস্যা আর্থিক। তবে সবকিছু নিয়ে যৌন দিকটিই বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারিপার্শ্বিক চিত্র দাম্পত্য বিশ্বাসকে শিথিল করে তুলেছিলো। ব্যভিচারানুষ্ঠানের পরোক্ষ সামাজিক ফল হিসেবে অন্যত্র এর উপস্থাপনের অবকাশ থাকলেও উপস্থাপনের সুবিধার্থে এখানে এর স্থান দেওয়া যেতে পারে।

কাহিনী।—কালীকান্ত বাবুর চাকর ভূতো বুড়োবয়সে বিয়ে করে বড় বিপদে পড়েছে। তরুণী স্ত্রীর মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে। মন যোগাতে যোগাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তামাক চাইতে গেলে, ঝাঁটা মেরে বলে "ভাত পায় না খাট্টা খেতে চায়।" স্ত্রীর রাগ, প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এতোদিনেও কেন

চন্দ্রহার গড়িয়ে দিচ্ছে না তার স্বামী। বাদলী বোঝে না যে তার স্বামী বাবুদের বাড়ীর আড়াই টাকা মাইনের চাকর হয়ে কি করে চন্দ্রহার দেবে। কিন্তু এদিকে প্রহারের ভয়ে ভূতো তিন সত্যি করে—দুইদিনের মধ্যে চন্দ্রহার দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বাবুর বাড়ীতে চুরি করতে প্রবৃত্তি জাগে না। তাই কালীকান্তবাবুর বাড়ীর এক নির্জন ঘরে বসে ভাবতে থাকে। ইতিমধ্যে একটা চোর চুরি করতে এসে ভূতোর কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। ভূতোর মাথাতেও ফন্দি গজিয়ে উঠেছে। সে চোরকে বলে, তাকে ছেড়ে দিতে পারে এক সর্তে ; সে যদি পরদিন মেয়েমানুষ সেজে আসে। আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে চোর তাতেই রাজী হয়। ভূতো তাকে অর্থলোভও দেখায়। ভূতোর ফন্দি এই যে, তার মনিব এবং মনিবগিন্নীর কাছ থেকে সে ফাঁকি দিয়ে কিছু বক্‌শিস্ আদায় করবে। কর্তা গিন্নী আজকাল দুজনকে একটু একটু সন্দেহের চক্ষে দেখছেন—যদিও তাঁদের মধ্যে প্রেম যথেষ্ট। ভূতো ভাবে, সন্দেহটা মিথ্যা দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করিয়ে সে উভয় পক্ষ থেকেই কিছু পয়সা লুঠ্‌বে।

কালীকান্তবাবু সৎ লোক। সভাসমিতি নিয়ে সময় কাটান। অনেকদিন আস্‌তে দেরী হয়। এতেই হেমাঙ্গিনীর সন্দেহ। একদিন এমন সন্দেহের অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভূতো তাঁকে বলে বাবুর নজর খারাপ হয়েছে। হাতে নাতে সে দেখিয়ে দেবে যে বাবু আজ একটা রাঁড় বাড়িতে আন্‌বেন। মূল্যবান্ প্রতিশ্রুতির মূল্য স্বরূপ হেমাঙ্গিনী তাকে ৫০ টাকা বক্‌শিস্ দেন।

তারপর ভূতো বাবুর কাছে গিয়ে বলে, সে বিদায় নেবে। এসব খারাপ ব্যাপার চোখের সামনে দেখে এ বাড়ীতে কাজ করতে চায় না। গিন্নিমা নাকি কালীকান্তবাবুর অনুপস্থিতিতে পরপুরুষকে ঘরে ঢোকান। উৎকণ্ঠিত ও সন্দিগ্ধ কালীকান্তবাবু বলেন, সে যদি সামনাসামনি প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে চাপকানের সব অর্থই তিনি তাকে দিয়ে দেবেন।

ভূতো স্ত্রীবেশী চোরকে বাবুর বিছানায় উপুড় করে মুখ ঢেকে শুতে বলে। ভূতো তাকে বুদ্ধি দেয়, বাবু এসে কথা বল্‌লে সে যেন উত্তর না দিয়ে শুধু পা ছুঁড়ে মলের শব্দ করে। বাবু যথারীতি ঘরে এলেন। নীচু গলায় ভূতো কালীকান্তবাবুকে বলে, গিন্নিমা পর পুরুষকে লুকিয়ে রেখেছেন। স্বামীর উপস্থিতিতে কাজ হাসিল হবে না বলে মান করবার ভান দেখাচ্ছেন।

—যাতে স্বামী তাড়াতাড়ি চলে যান। ভূতো বাবুকে বারণ করে—খবরদার তিনি গিন্নিমার গায়ে হাত না দেন। তাহলে তিনি যদি রাগ করে চলে যান, কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। পরে আরও কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে।

এদিকে ভূতো হেমাঙ্গিনীকে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলো। তিনি আডাল থেকে দেখেন তাঁরই স্বামী একজন স্ত্রীলোকের মান ভাঙাতে চেষ্টা করছেন। স্ত্রীলোকটি স্বামীর বিছানায় শুয়ে। স্বামীর দুশ্চরিত্রতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হেমাঙ্গিনী পেলেন।

কালীবাবু এবং হেমাঙ্গিনী স্থানান্তরে গেলে ভূতো চোরটিকে পুরুষ বেশে সাজিয়ে বৈঠকখানা ঘরের বিছানায় শুইয়ে রাখে। চোরটি আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। ভূতো এসে হেমঙ্গিনীকে বলে, বাবুর ধারণা ছিলো হেমাঙ্গিনী বাইরে নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। ভূতোর মুখে তাঁর এখানে থাকার খবর শুনে বাবু রাঁড়টিকে একটি ঘরে চালান করে নিজে মাতাল অবস্থায় ওখানে পড়ে আছেন। ভূতো চোরটির প্রতি হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেমাঙ্গিনীকে ঘরে রেখে ভূতো বাইরে চলে যায়। হেমাঙ্গিনী পুরুষবেশী চোরকে মাতাল স্বামী মনে করে বলে,—"এখানে শুয়ে থেকে আর কি হবে, বাড়ী ভেতর চলো। অবার এখনি কেউ এসে আমাকে দেখে ফেলবে। বাইরে আমার থাকাটা ভালো হবে না!" হেমাঙ্গিনীর ভয়, তিনি বৈঠকখানায় এসেছেন, তাছাড়া স্বামীর বন্ধুরা তাঁকে মাতাল দেখে কি মনে করবেন? হেমাঙ্গিনীকে বৈঠকখানায় দেখেও বা কি মনে করবেন!

এদিকে আসল স্বামী কালীকান্তবাবুর কাছে ইতিমধ্যে ভূতো হাজির হয়ে তাকে নিয়ে আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখায়। পরপুরুষের সঙ্গে হেমাঙ্গিনী কথা বলছে! কালীকান্ত আর স্থির থাকতে পারেন না। সবলে চোরকে চেপে ধরেন। স্বামী যাকে ভেবেছিলেন তাকে হঠাৎ অন্য একজন লোক বুঝতে পেরে লজ্জায় ঘোমটা টেনে হেমাঙ্গিনী বলেন, "ওমা একি গো!"

ক্রমে বুদ্ধিমান স্বামী-স্ত্রী ভূতোর সব চালাকি ধরে ফেলেন। ভগবানকে কালীকান্ত ধন্যবাদ দেন দাম্পত্যজীবন ধ্বংস হয়নি বলে। "জেলাসি" স্বামী-বিচ্ছেদ ঘটায়।

এসব কাণ্ডকারখানার জন্যে সে রাত্রে ভূতো বাড়ী ফেরে নি। ভূতোর

চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ তার স্ত্রী বাদ্‌লী ঝাঁটা হাতে এ বাড়ী ধাওয়া করে আসে। এসেই ভূতোকে প্রহার করে। তখন ভূতো সবিনয়ে মনিবের কাছে সব খুলে বলে। আড়াই টাকা মাইনেতে কি করে চন্দ্রহার হয়। কালীকান্ত ব্যাপারটা সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার করে বলেন,—যে পঞ্চাশ টাকা ইতিমধ্যে বক্‌শিস্ পেয়ে গেছে, সেটা তিনি আর ফিরিয়ে নিতে চান না। ভূতোর অপরাধের সঙ্কোচ ভাঙিয়ে তিনি বলেন—ভূতো তাঁদের উপকারই করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সন্দেহ ভাঙলো। আর কোনোদিনই তাঁরা পরস্পরকে অকারণ সন্দেহ করবেন না।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে চোরও কিছু চায়। কালীকান্ত তার হাতে পাঁচ টাকা দিলেন। চোর গুলিখোর। সে মনে মনে ভাবে চার মাস ধরে সে এ নিয়ে গুলি খাবে।

ডিস্‌মিস্ (১৮৮৩ খৃ:)—অমৃতলাল বসু॥ এই প্রহসনটির মধ্যেও যৌন-সমস্যার একটি দিক—দাম্পত্য সন্দেহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে এবং তার নিষ্পত্তির মধ্যে দিয়ে স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থনও ব্যক্ত হয়েছে।

কাহিনী।—স্ত্রী প্রমদার চালচলন কৃষ্ণনাথ বাবুর ভালো লাগে না। প্রমদা বড়ো চঞ্চল। সবসময়ে গান গায়, সব কথাতেই তার রহস্য। স্বামী রাগ করলে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে। আর সেজেগুজে যখন তখন পাড়া বেড়ায়। কৃষ্ণনাথ একদিন প্রমদাকে বলেন, "ঐ রীতগুলো ছেড়ে দাও, নইলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। এই সেজেগুজে পাড়া বেড়ান, টপ্পা গাওয়া, যার তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা (করা)।" প্রমদা রেগে বলে ওঠে, "আচ্ছা, আজ থেকে আটপৌরে কাপড় প'রে বেড়াতে যাব, বাছা বাছা লোক দেখে হাসিঠাট্টা করবো, আর টপ্পা ভাল না লাগে, খেয়াল গাইব।" এমন স্ত্রীকে স্বামী কি করে বোঝাবেন। কৃষ্ণ মনে মনে ভাবে,—"মুখের সামনে না যেতে হয়, এম্নি তফাৎ তফাৎ থাকি, তাহলে খুব রাগতে পারি, রীতিমত ধমকাতে, শাসন করতে পারি। কিন্তু মুখ দেখ্‌লেই আর কথা সরে না, কি যে ঐ মুখখানিতে আছে, কেমন ভাবে যে একটু চায়, আমার মুণ্ডু ঘুরে যায়।"

কিন্তু প্রমদা আসলে অন্যরকম। তাস খেলবার নাম করে আতর গোলাপ ল্যাভেণ্ডার মেখে বাইরে যায় বটে, কিন্তু বাইরে গিয়ে সে—কারো অসুখে সেবা করা, কারো চুল বেঁধে দেওয়া, কারো কাঁথা সেলাই করে দেওয়া—এই সব পরের কাজ করে বেড়ায়। গয়লাগিন্নীর অসুখ, তার বৃদ্ধ স্বামী আর ছেলেরা

যখন প্রায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলো, তখন প্রমদা তাদের বাড়ী গিয়ে রেঁধে দিয়েছে। ভুলে পাড়ার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সে লেখাপড়া শেখায়। অনেক সময় টাকাও সাহায্য করে। তাই ভুলে পাড়া, গয়লা পাড়ার সবাই তাকে দেবতার মতো ভক্তি করে। ভুলে বৌয়ের ছেলের অসুখ। তাকে প্রমদা বেদানা কিনে দিয়েছে, আর ঝির হাত দিয়ে ভুলে বৌয়ের হাতে পাঁচ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। ঝি বলে, "বেদানা পেয়ে ছেলেটার কি আহ্লাদ! বউ ছুঁড়ী তো টাকা পাঁচটা হাতে পেয়েই কেঁদে ফেল্লে। আমায় বলে, 'মাসী, তোমাদের বৌমা মানুষ নয় দেবতা।" ঝির মুখে ঐসব কথা শুনে হাসি চেপে কৃত্রিম রূপ দেখিয়ে প্রমদা বলে ওঠে—"বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা,—রাস্তা বেড়ান কাপড়ে ঠাকুর ঘরে এইছিস্।" এমনি রহস্যপ্রিয় অথচ পরোপকারী প্রমদা। স্বামীকে নিয়ে মজা করবার জন্যেই ইচ্ছে করে বাইরে স্বৈরিণীর ভাব দেখায়।

প্রমদাই তার স্বামীকে অবশ্য কুপথ থেকে টেনে এনেছে। সে কৃষ্ণনাথ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। কৃষ্ণনাথবাবু আগে ঘোর মাতাল এবং চরিত্রহীন ছিলেন। কারণ প্রথম পক্ষের স্ত্রী এতো লাজুক ছিলো যে স্বামী সহবাসে তার লজ্জা করতো। তার ফলে কৃষ্ণনাথবাবুর এতো অবনতি ঘটেছিলো। প্রমদা তার নিজের বিয়ের পরের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে শিউরে ওঠে,—"বাবা রে! সে কথা মনে হলে আমার আজও গা কেঁপে উঠে! ফুলশয্যা হ'লো ঝিয়ের সঙ্গে! প্রথম ঘর বসত করতে এসে দেড় মাস রইলুম,—বাবু ঘরে শুলেন তিন দিন—খাটের তলায় বমিতে মুখ গুঁজড়ে।" কিন্তু প্রমদা ক্রমে তার এই লজ্জাহীনতা দিয়েই তাকে বশীভূত করেছে। আজ কৃষ্ণনাথ বাবু নিরীহ ভদ্রলোক।

ওদিকে কৃষ্ণনাথবাবু ভাবেন, স্ত্রৈণ হওয়া কিছু কাজের নয়। স্ত্রী এতে প্রশ্রয় পায়, ক্রমে ক্রমে সে স্বৈরিণী হয়ে ওঠে। পথে তর্কালঙ্কারকে দেখে তাঁকে তিনি ডাকেন পরামর্শ নেবার জন্যে। তর্কালঙ্কার ভাবে ব্যবস্থা নেবার জন্যে ডাকছে। তর্কালঙ্কার বলেন,—"অধ্যাপকের নিকট ব্যবস্থা নিতে হলে জান তো—" কথা হতে না হতেই কৃষ্ণনাথ বলেন,—"টাকা দিতে হয়—এই নিন।" দুটো টাকা তিনি তর্কালঙ্কারের হাতে গুঁজে দিলেন। মনে মনে খুশি হলেও বাইরে রাগের ভান দেখিয়ে তর্কালঙ্কার বলেন,—"কি! আমায় টাকা দেওয়া? নবদ্বীপের নিধিরাম স্মৃতিরত্নের ছাত্র আমি, বিক্রমপুরের সর্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র, আমায় টাকা দেওয়া? আমায়

অর্থ পিশাচ মনে করা ?" অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বকে চলেন অর্থহীন শাস্ত্রবাক্যের ভগ্নাংশ। অনর্গল বাজে বকে যান তিনি। অথচ কৃষ্ণনাথবাবুর স্ত্রীর কথা একটু তুলতে গেলেই তিনি বলেন, কৃষ্ণনাথবাবু বৃথা বাক্যব্যয় করছেন! "পাষণ্ড" "বেল্লিক" ইত্যাদি গাল দিয়ে তিনি চলে গেলেন। কৃষ্ণনাথবাবু মনে মনে ভাবেন, পরামর্শ চাইতে এসে তিনি টাকাও দিলেন, গালও খেলেন। কিছু লাভ হলো না। তারপর কৃষ্ণনাথবাবু পথে এগোতেই তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে দেখা। শ্বশুরের কাছে স্ত্রীর ব্যাপারে পরামর্শ চাইবার জন্যে কথা তুলতেই এক মাতাল এসে মাতলামী করে তাদের সঙ্গে। কৃষ্ণনাথ তাকে চলে যেতে বললে সে বলে যে এটা কোম্পানীর রাস্তা! মাতালকে গ্রাহ্য না করে আবার কথা তুলতেই বরফওয়ালা আসে এবং দাঁড়ায়। চলে যেতে বললে সে বলে সে যাবে না। শ্বশুর কৃষ্ণনাথকে বলে, "ছোটলোকের সঙ্গে কথায় কাজ নেই, যেতে দাও, চল, এগিয়ে দাঁড়াই।" তখন বরফওয়ালা চেঁচিয়ে বলে ওঠে,—"মু সামলাকে বাৎ কহো বুড্ডা।" এক ছোক্‌রা এক পয়সা দামের "গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা" বই বিক্রী করতে আসে। গোলমাল শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। শেষে কৃষ্ণনাথকে সে পাগল ঠাওরায়। এক ভিক্ষুকও এসে জোটে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ভিড় বেড়ে ওঠে। কৃষ্ণনাথের স্ত্রীর কথা আর বলা হয় না। মেজাজ চড়ে ওঠে। এমন সময় পাহারাওয়ালা এসে ভিড়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে কৃষ্ণনাথ মেজাজ রাখতে পারে না। ক্রুদ্ধ পাহারাওয়ালা তাকে থানায় নিয়ে চলে। প্রমদার ঝি এসব দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি প্রমদাকে খবর দেবার জন্যে বাড়ীর দিক ছোটে।

প্রমদা ঘরে একলা ছিলো। প্রমদা আজকাল লক্ষ্য করে, একটি ছোকরা প্রায়ই তার জানলার কাছে ঘোরাফেরা করে আর আদিরসের গান গায়। প্রমদা ভাবে, "ছোঁড়াটা 'ত ভারী পাজী, আমার উপর বাবুর চোখ পড়েছে? জব্দ কচ্ছি দাঁড়াও।" ছোকরাটাকে সে ঘরে ডেকে আনে। তিনকড়ি নিজের পরিচয় দেয়,—"স্কুলে যেতুম, সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছি, আর পড়াশুনো পোষায় না, এই সময় স্কুলে নষ্ট করবো, তবে আর ইয়ারকি দেবো কি করে?" তারপর সে নাটকীয় ভাষায় প্রমদার কাছে তার প্রেম জানায়। কথা প্রসঙ্গে সে বলে যে সে নাটক পড়েছে। প্রমদা হেসে বলে, বাবু প্রায় তার কাছ ছাড়া হন না। তিনকড়ি যদি ভূতের ভয় দেখিয়ে তার বাবুকে তাড়াতে

পারে, তবে প্রমদা নিরিবিলি থাকতে পারবে। তিনকড়ি ভূত সাজতে চলে যায়। প্রমদা কথা দেয়, আজ রাত্রেই প্রমদাকে সে পাবে! উল্লসিত তিনকড়ি বলে,—কোথায়? প্রমদা মুচকি হেসে বলে,—'স্বপ্নে'। তিনকড়ির সব উৎসাহ ফুৎকারে নিভে গেলেও সে আশা ছাড়ে না। ভূত সাজতে চলে যায়। সিঁড়ির কোণে নাকি সে লুকিয়ে থাকবে।

তিনকড়ি চলে যাবার পর ঝি হন্তদন্ত হয়ে আসে। এসে বলে পাহারাওয়ালা তার বাবুকে ধরে নিয়ে গেছে। প্রমদা তখন পাগলের মতো ও বাড়ীর দিদির কাছে ছোটে। বড়ঠাকুরের নাকি থানায় যথেষ্ট হাত আছে। আর ঐ দিকে ঝিকে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এদিকে কৃষ্ণনাথবাবু পাহারাওয়ালার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী এসে স্ত্রীকে দেখতে না পেলে তাঁর মেজাজ সপ্তমে ওঠে। স্ত্রী তাঁর ব্যভিচারিণী, আর সন্দেহ নেই। এবার তাকে আর ঢুকতে দেবেন না তিনি। ঘরে ঢুকেই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রমদা এসে দরজা ধাক্কা দেয়! কৃষ্ণনাথবাবু দরজা কিছুতেই খোলেন না। প্রমদা তাকে শুনিয়ে বলে ওঠে, দরজার সামনে সে নিজের গলায় তাহলে ফাঁসি দেবে। কৃষ্ণনাথ মন্তব্য করে,—"ঢের দেখেছি।" প্রমদা তখন গলায় কাপড় জড়ায়, তার মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। তারপর প্রমদা হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায়। কৃষ্ণনাথবাবু ওপর থেকে দেখলেন, এবার আর মিথ্যে নয়। তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন! প্রমদার অদ্ভুত অভিনয়। সে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। বাইরে কৃষ্ণনাথবাবু পড়ে থাকেন। ঝি এসে বাইরে বাবুকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর সব কথা একে একে খুলে বলে। কৃষ্ণনাথের মনে এবার অনুশোচনা আসে। তিনি স্ত্রীর কাছে মাফ চেয়ে দরজা খুলতে বলেন। স্ত্রী শেষে দরজা খোলে। ইতিমধ্যে শ্বশুর এবং তর্কালঙ্কার এসে পড়েন। ওদিকে কৃষ্ণনাথ হঠাৎ লক্ষ্য করেন যে একটা ছেলে ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে তাঁকে। তর্কালঙ্কার রাম নাম জপ করেন। কৃষ্ণনাথবাবু প্রমদাকে জিজ্ঞেস করেন—এ কে? প্রমদা তার কানে কানে বলে,—"আমার নাগর।" তারপর সব কথা খুলে বলে। তার সতীত্ব নষ্ট করবার জন্যে এই রসিক ছোকরাটির আমদানী। তর্কালঙ্কার চেঁচিয়ে বলে,—"ধর তো, খুব মার তো, এই রকম মানুষকে ভীতি প্রদর্শন! সতীর প্রতি আসক্তি।" তিনকড়ির মুখোস কৃষ্ণনাথ যখন খুলে ফেলেন, তখন তর্কালঙ্কার বলে ওঠেন,—"তিনকড়ি!

মদীয় জ্যেষ্ঠম পুত্রের মধ্যম পুত্র? আহা! ছেলেমানুষ! এখানে খেলা করতে এসেছিলে বাবু? কেষ্টবাবু, দেখ কেমন ছেলে!" কৃষ্ণনাথ তাকে মারতে যান। প্রমদা বারণ করে। বলে. "আমার মাথা খাও, কিছু বলো না, ছেলেমানুষ, তা নইলে এ মূর্ত্তি ধরে!"

আজ কৃষ্ণনাথ তাঁর স্ত্রীকে সত্যিকার চিনতে পারলেন। এমন দেবীর মতো স্ত্রীকে তিনি চিনতে পারেন নি এতোকাল! সন্দেহের খেসারত হিসেবে প্রমদাকে তিনি একটা হীরের নেকলেস গড়িয়ে দেবেন—কথা দিলেন।

কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২ খৃঃ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ দাম্পত্য সন্দেহের নিষ্পত্তির মধ্যে দিয়ে অথবা দাম্পত্য সন্দেহের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার পোষণে এবং পুরুষপক্ষীয় লাম্পট্যের বিরুদ্ধেও লেখকের মতবাদ সংগঠিত।

কাহিনী।—পূর্ণবাবু ডাক্তার। তাঁর স্ত্রী বিধুমুখী শিক্ষিতা ব্রাহ্মিকা—সমাজে যাতায়াত করে থাকেন। পূর্ণবাবুকে নাকি স্ত্রৈণ করে রেখেছেন। তাঁর কথাতেই পূর্ণবাবু ওঠেন বসেন। সম্প্রতি পূর্ণবাবুর চরিত্রদোষ হয়েছে। তিনি মদ্যপান করেন এবং শ্যামবাজারে কামিনী নামে একজন মেয়ে মানুষের কাছে যান। বাড়ীতে অবশ্য বলেন, একজন রুগী মরমর—তার কাছে তিনি যাচ্ছেন। তিনি নিজে ব্যভিচারী হয়েও সামান্য কারণে স্ত্রীকে সন্দেহ করেন। তাঁর ধারণা স্ত্রী সমাজের প্রেমনাথবাবুর ওপর আসক্ত।

পেরুরাম একজন বেকার লোক। সে পাওনাদারের তাড়ায় পালাতে পালাতে সমাজমন্দিরের সামনের একটা খালি পাল্কীর মধ্যে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করলো। পাল্কীটা আসলে বিধুমুখীর। তাকে সমাজমন্দির থেকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার কথা। তন্দ্রাচ্ছন্ন বেহারারা ভাবলো গিন্নিমা বুঝি পাল্কীতে চড়ে বসেছেন। তারা পেরুরামকে নিয়ে সোজা এসে পূর্ণ ডাক্তারের বাড়ীর ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। পেরুরাম বেরিয়ে এলো, বেহারারা চিনতে পারলো না। বাড়ীতে তখন কেউ ছিলো না। শুধু ভোলা নামে এক বুড়ো চাকর কোথায় যেন ছিলো। সে পেরুকে দেখতে পেলো না। পেরুরাম ঘরের মধ্যে ঢুকতে বাধ্য হয়। কিন্তু বেরোতে পারে না। বেরোবার রাস্তা বন্ধ। সে গোলকধাঁধার মতো বাড়ীর মধ্যে ঘোরাঘুরি করে।

এরমধ্যে পূর্ণবাবু আসেন। বিধুমুখীও আসেন। বিধুমুখীকে প্রেমনাথবাবু নিজের গাড়ীতে করে এগিয়ে দিয়েছেন। কারণ বিধুমুখী বাইরে এসে বেহারাদের দেখতে না পেয়ে তখন অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন। পূর্ণবাবু এসব কথা শুনে ভাবলেন—এ সবই বিধুমুখীর ইচ্ছাকৃত। পূর্ণবাবু শ্যামবাজারে কামনীর কাছে যাবার জন্যে সুযোগ খোঁজেন। বিধুমুখী স্বামীর ওপর এধরনের একটা সন্দেহ কিছুদিন থেকে করছে। বিধুমুখী সেটা প্রকাশ করলে, পূর্ণবাবু বলেন, সন্দেহটা অতি খারাপ জিনিস। ভালোবাসাকে বিষাক্ত করে দেয়। এই যে প্রেমনাথবাবুর সঙ্গে বিধুমুখী এতো মেলামেশা করে, কই, পূর্ণবাবু তো সন্দেহ করেন না! বিধুমুখী ভাবে, বিধুমুখীর কাছে পূর্ণবাবু কথায় হারবার নন।

বিধুমুখী একা ঘরে, এমন সময় পেরুরাম হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে ঐ ঘরে ঢুকে পড়ে। পেরুকে চোর কিংবা ডাকাত মনে করে বিধুমুখী। তাকে গয়নাগুলো নিয়ে প্রাণে মারতে বারণ করেন। পেরু তখন আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বলে। বিধুমুখী এবার বুঝতে পারেন—কেন বেহারারা তাঁকে না নিয়েই পাল্কী নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছিলো। যাহোক বিধুমুখী একলা ঘরে অপরিচিত পুরুষকে নিয়ে বিপদে পড়েন। তখন অনেক রাত্রি। স্বামী কিংবা চাকর ভোলা দেখলে বলবে কী! বাইরের দরজা বন্ধ। দোতলার জানালা থেকে লাফ দিয়ে পালাতে বলেন বিধুমুখী। কিন্তু পেরুরামের এসব কোনোদিনই অভ্যাস নেই। সে বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ বিধুমুখীর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে যায়। তিনি ভাবেন, পেরুকে তিনি সমাজের প্রেমনাথবাবু সাজিয়ে স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগিয়ে স্বামীর কথা মিথ্যে প্রমাণ করবেন। পেরুকে তাই তিনি বলেন, তাকে আজ থেকে সরকারের পদে বহাল করা হলো। তবে পেরু নাম বদলে প্রেমনাথ নাম নিতে হবে। বিধুমুখী বুঝতে পারেন, তাঁর স্বামী শ্যামবাজার থেকে ফিরে এসে পাশের ঘরে শুয়েছেন। স্বামীকে শুনিয়ে বিধুমুখী পেরুর সঙ্গে জোর গলায় প্রেমাভিনয় সুরু করে দেন। স্বামী আড়াল থেকে এ সব দেখে মনে মনে খুব চটে যান। বিধুমুখী চাকর ভোলাকে ডেকে জলখাবার আন্‌তে বলেন। রাত দুপুরে গিন্নিমা অন্য পুরুষকে ঘরে আনিয়েছেন দেখে ভোলা বাবুকেই মনে মনে ধিক্কার দেয়। বাবুকে সে ছোটোবেলা থেকেই মানুষ করেছে। তিনি গিন্নিকে শাসনে রাখতে পারেন না! যা হোক সে জলখাবার আনতে যায়। কিছুক্ষণ পর দেরী দেখে বিধু নিজেই যায়, পেরুকে বিছানায় বসিয়ে রেখে। এবার পূর্ণবাবু ঘরে ঢুকে পেরুর পরিচয় চাইলেন।

এই সঙ্গে তার অনধিকার প্রবেশের কৈফিয়ৎও চাইলেন। পেরু প্রথমে ভাবে, এ বুঝি বাবুর পুরোনো সরকার। তাকে ছাড়িয়ে পেরুকে রাখবার জন্তেই তার ওপর তার রাগ। সে পূর্ণকে বলে,—"তুই যদি এখন কর্মের যুগ্যি না হোস, সে তো আর আমার দোষ না।" কী—এতো বড়ো স্পর্দ্ধা! পুরুষত্বকে অপমান!! পূর্ণবাবু পেরুকে মারতে যান। ইতিমধ্যে বিধুমুখী ফিরে এলে পূর্ণবাবু তাঁকে গালাগালি দিলেন। বিধুমুখী তখন রাগের ভান দেখিয়ে ঘর থেকে চলে যান। হঠাৎ পূর্ণবাবুর কথায় পেরু চিনতে পারে, ইনি শুধু গিন্নিমার স্বামীই নন, ইনি সেই পূর্ণবাবু, অনুকূলবাবুর সুপারিশপত্র নিয়ে পেরু এই বাবুর খোঁজই করছিলো। এর বাড়ীতে সরকারের একটা চাকরি খালি আছে। পেরু তখন সব কিছু ভেঙে বলে। এমন কি সুপারিশপত্রটাও দেখায়। তাতে লেখা ছিলো,—"প্রিয় পূর্ণবাবু! এই পত্রবাহককে কোন একটা কর্ম্ম প্রদান করিলে বাধিত হব। ব্যক্তিটা নিতান্ত বোকা, কিন্তু আসলে লোক মন্দ নয়।" পেরুর ওপর তাঁর সব রাগ মিটে যায়। কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবলেন, স্ত্রী তাকে আচ্ছা জব্দ করেছে। তিনি যে ঈর্ষা করেন না—এটা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। যা হোক স্ত্রীকে জব্দ করতে হবে। দুজনে তখন ফন্দি অনুযায়ী দুটো তরোয়াল হাতে নিয়ে ছুটে বাগানে চলে যায় এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে মিছিমিছি তরোয়ালের শব্দ করে। কিছুক্ষণ পরে পূর্ণবাবুর গলার যন্ত্রণাসূচক আওয়াজ পাওয়া যায়। বিধুমুখী নিজের নির্বুদ্ধিতার ফল মনে করে আক্ষেপ করতে করতে মূর্চ্ছা যান। পূর্ণবাবু অগত্যা আবার ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌লেন। পূর্ণবাবু বল্‌লেন, তিনি এসব তামাসা করছিলেন। মিথ্যে তরোয়ালের যুদ্ধের কথাও খুলে বল্‌লেন। এদিকে ভোলাও আবার পেরুকে তরোয়াল হাতে ছুট্‌তে দেখে ধরে এনেছে। পূর্ণবাবু হেসে তাকে ছেড়ে দিতে বলেন।

পেরু চাকরি পেলেও তার মনে একটা দুঃখ ছিলো। শ্যামবাজারের যে কামিনীর কাছে পূর্ণবাবু যাওয়া সুরু করেছিলেন, তার ওপর সে অনেক দিন থেকেই আসক্ত। "প" লেখা এক প্রেমাস্পদের চিঠি কামিনীর বাড়ীতে আবিষ্কার করে তার মন ভেঙে যায়। আগেই বলেছি, পেরু একটু বোকা ছিলো। সে সেই "প" লেখা চিঠিটা পূর্ণবাবুর হাতে দিয়ে বলে, লোকটাকে আবিষ্কার করে দিতে হবে। পূর্ণবাবু বুঝতে পারেন, এটা তাঁরই লেখা চিঠি। ইতিমধ্যে বিধুমুখী এলে পূর্ণবাবু চিঠিটা লুকোতে গেলে বিধুমুখী সেটা কেড়ে নেন।

পূর্ণবাবুর হাতের লেখা তিনি চেনেন। এবার আবার অভিমানের পালা। পেরু তখন বুদ্ধি করে বললো, এটা একটা মিথ্যে চিঠি। গিন্নিমাকে রাগিয়ে মজা করবার জন্যে এটাও একটা তামাসা। বিধুমুখী বলেন, আর তামাসা ভালো না। কামিনীর ব্যাপারে ধরা পড়তে পড়তে পূর্ণবাবু পেরুর বুদ্ধিতে বেঁচে গিয়ে তার ডবল মাইনে করে দেবার কথা ভাবেন। সেই সঙ্গে ভাবেন, নিজের সরকারের প্রণয়িনীর সঙ্গে তিনি প্রেম করবার জন্যে এতোদিন অনর্থক শ্যামবাজারে যাতায়াত করেছেন। নিজের আভিজাত্যে তিনি ধিক্কার দেন। পেরুর জন্যে যে জলখাবার আনতে গিয়ে এতো বিপত্তি, এতোক্ষণে তা এসে পৌছোয়। সেই সঙ্গে কর্তা-গিন্নির জন্যেও দুটো ডিস্ আসে। সারা রাত ধরে হুড়োহুড়ি করে তাঁদেরও খিদে পেয়ে গেছে। তিনজনে মিলে জলযোগ শেষ করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের সমাজে যৌন-সমস্যা অত্যন্ত জটিলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু সব কিছু জেনেও এটা ভুললে অন্যায় করা হবে যে, যৌন সমাজচিত্রের যথাপ্রদত্ত মাত্রার বীভৎসতার একটি কারণ যেমন ছিলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত আক্রমণের পদ্ধতির অনুসরণ, তেমনি আর একটি কারণও বিদ্যমান ছিলো। ব্যবসাযবুদ্ধি এবং সহজ আকর্ষণের অন্যতম পদ্ধতি যৌন চিত্রের অবতারণা। হয়তো এই কারণে যৌন বিভাগীয় সমাজচিত্র আমরা যতোটা স্পষ্টভাবে পাই, অন্য বিভাগীয় সমাজচিত্রে ততোটা স্পষ্টভাবে আমরা পাইনে। সমাজচিত্র উপস্থাপকও তাই দায়িত্ব রক্ষার খাতিরে যৌন সমাজ-চিত্রের প্রয়োজনাতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছেন।

॥ আর্থিক ॥

১। বাবুয়ানা ও অর্থব্যয়

আমাদের সমাজে একটি প্রসিদ্ধ ছড়া আছে,—

ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার।[১]

১। বাংলা প্রবাদ—সুশীল দে।

"প্রাণকৃষ্ণ হালদার" নামটির স্থানে অনেক সময় নীলমণি হালদারের নামও করা হয়ে থাকে; অন্ততঃ এ ধরনের ছড়াও মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। গত শতাব্দীতে প্রকাশিত "সমাজ কুচিত্র" পুস্তকে "নিশাচর" বাবুর তালিকা দিতে গিয়ে বলেছেন, "যথার্থবাবু দোয়ারকানাথ ঠাকুর, নীলমণি হালদার, ছাতুবাবু, কালী সাণ্ডেল, ছাতু সিঙ্গী; জয় মিত্তির ফেলা যায় না।" (পৃঃ ৫৭) বস্তুতঃ এই সব বাবুদের আদর্শ করে একটি বিরাট বাবু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

মধ্যযুগে সামন্ত ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে বিলাসিতা থাকলেও সাধারণের মধ্যে তা অতোটা বিস্তার পায় নি। সঞ্চিত ধন মধ্যযুগে কম ছিলো না। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মধ্যযুগের শেষের দিককার ভারতবর্ষের সঞ্চিতধনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,—"···in the 17th century India was the richest country in the world—the agricultural mother of Asia and the industrial workshop of civilization." বিদেশী Commercial Capitalist-দের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণে আমাদের দেশের আর্থিক দুরবস্থা ঘটলেও দেখা যাবে যে আমাদের সাধারণের জীবনে সামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে গেছে। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এবং জন ম্যাল্কমের সুপরিচিত মন্তব্য দুটির মূলে Industrial Capitalist-দের বিরুদ্ধে স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন যতোই থাকুক না কেন, তখনকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, বর্তমানে বাবুয়ানার সামগ্রী বলতে যা বুঝি —তার চাহিদা ছিলো না। হেষ্টিংস লিখেছিলেন,—"The supplies of trades are for the wants and luxuries of a people, the poor in India may be said to have no wants. Their wants are confined to their dwellings to their food, and to a scauty portion of clothing, all of which they can have from the soil that they tread upon."[২] John Malcolm তখন ছিলেন বোম্বাইয়ের গভর্ণর। তিনি লিখেছিলেন,—"The Hindoo inhabitants are a race of man, generally speaking, not more distinguished by their lofty stature···· than they are for some finest qualities of

২। Minutes of Evidence & C. on the affairs of the East India Company, 1813, P-3 (Cf. Indian trade, Manufactures & Finauce—R. C. Dutt. P. 89).

the mind; they are brave, geneous, and human, and their truth is as remarkable as their courage. They are not likely to become consumers of European articles, because they do not possess the means to purchase them, even if, from their simple habits of life and attire, they required them."[৩]

এই মন্তব্য দুটির মধ্যে এদেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কথা যতোই থাকুক, সাধারণ বাবুয়ানার উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাও যে ছিলো না—এটা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের জীবনমানের এই পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে,[৪]—"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অভ্যুদয়ে চারিদিকে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার হইতেছে—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ চালিত হইতেছে—বাণিজ্যস্রোত বহিতেছে,—তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—উচ্চ আশা জাগরিত হইতেছে—জীবনের নূতন আদর্শ মনের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে—সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতেছে—অভাব বাড়িতেছে। আমরা ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ সহজে জীবনধারণ করিতে পারিতাম, এক্ষণে তাহা অসম্ভব, কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের জীবন ধারণোপযোগী নানা অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে।...যদিও সমাজ মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে অর্থের ব্যাপ্ত হইতেছে—অর্জ্জনের নানা পথ ক্রমে উন্মুক্ত হইতেছে—কিন্তু তথাপি অভাব, দারিদ্র্য, চারিদিকে বিকটবেশে বিচরণ করিতেছে।" অতএব আজকাল যাকে ঠিক বাবুয়ানা বুঝি, তা আমাদের সমাজে আগে ছিলো না। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের সঞ্চিত ধন নির্গমণের ব্যবস্থা ছিলো।

'বাবু' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে এক একজন এক একরকম কথা বলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে একটি মন্তব্যে বলা হয়েছে,—"স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মুসলমানদিগের নিকট হইতেই এই রত্নটী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। .কালে সংবাদপত্রের বহুল প্রচলন ও রাজপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়া প্রযুক্ত দেশশুদ্ধ বাবু হইয়া উঠিলেন।"[৫] রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'য় শব্দটির কোনো

৩। Ibid—pp. 54 & 57.

৪। অপচয় ও উন্নতি—বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র (১৮৯০ খৃঃ)—পৃঃ ২২৬

৫। "মধ্যস্থ"—চৈত্র, ১২৮০।

বুৎপত্তি দেখান নি।[৬] অনেকে এটাকে 'দেশজ' শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] শেষোক্ত মন্তব্যটিই ঠিক বলে মনে হয়। প্রাগার্য বাংলাদেশের স্থানীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত সিনোটিবেটীয় গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তিব্বতীয় ভাষায় 'বাবু' শব্দের অর্থ—অলস ব্যক্তি। নিন্দাসূচক এই মূল অর্থটিই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরে সম্মানসূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সমাজে বাবুয়ানা নব্য সংস্কৃতি নির্ভর। তাই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিক থেকে বাবুয়ানার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হলেও আর্থিক অপব্যয়ের কারণ হিসেবেও দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত ঊনবিংশ শতাব্দীর পুস্তকটিতে[৮] বলা হয়েছে,—"এ সম্বন্ধে একটি গুরুতর নিয়ম এই যে সর্ব্বদা অবস্থানুযায়ী অবস্থান করিবে, এবং আয় অপেক্ষা কদাচ অধিক ব্যয় করিবে না।......অনেক সময়ে মানসম্ভ্রম রক্ষা জন্য—বাহ্যিক দৃশ্য রক্ষা জন্য—লোকে ঋণ করিয়া থাকে। ভ্রান্ত মানব! তুমি ঋণ করিয়াই বস্তুতঃ মানসম্ভ্রম নাশের সূত্রপাত করিলে। অবস্থা অনুযায়ী অবস্থানই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক,—ইহাতে যাহারা তোমার প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহারা অদূরদর্শী—অন্ধ।" সমসাময়িক কালে রচিত একটি পদ্যেও বলা হয়েছে,[৯]—

"ফকির হইব তবু কি ছাড়িব,
ভিক্ষাতেও বাবুগিরি চালাইব।
যশের পতাকা তুলিয়া ধরিব,
উড়ি হে বাতাসে শন্ শন্ শন্॥"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'A Hindustani' রচিত "The Babu" নামে একটি প্রবন্ধ Bengali Magazine-এ প্রকাশিত হয়।[১০] তাতে বাবুর আটটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নীচে দেওয়া হলো।—

1. "The Babu has been represented, and justly represented as weak in body, timid in heart and imaginative in intellect."

৬। ৮ম সং—পৃঃ ৩৯৫।

৭। বিশ্বকোষ—দ্বাদশ খণ্ড।

৮। অপচয় ও উন্নতি—বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র (১৮৯০ খৃঃ) পৃঃ ২৪০, ২৪১।

৯। বাঙ্গালীর বাবুগিরি (১২৯৫ সাল)—বৈতালিক রচিত।

১০। Bengali Magazine—April, 1874.

2. "The Babu is said to be the very type of superficial, not solid education "

3. "This system again explains that other defects of the Babu's intellect so frequently pointed out and lashed. viz., its want of creative energy."

4. "The Babu is described as entirely denationalized by an outlandish education which has merely sharpened the imitative faculties of the soul, leaving its noble elements asleep in the back ground."

5. "The Babu is represented as having lost the sedateness and suavity of the national dispositions, as having become ill-tempered and ill-natured rude in his manners, and proud and presumptuous in his tone."

6. "The Babu's predilection of English, and his consequent neglect of the vernacular, have been the stock themes of ridicule, bitter sacasm and even ribaldry with a class of writers."

7. "The Babu's antagonism to the ruling class has provoked much righteous indignation, and his supposed ingratitude has been again and again censured in the bitterest terms concievable."

8. "And, lastly, the Babu is stigmatized as a grumbler and an agitator, one not will affected towards British rule, and ready in consequence to give vent to his spite in newspaper tirades and inflammatory speeches."

অনুরূপ ভাবে মধ্যস্থ পত্রিকাতেও কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১১] বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলে দুইটি বক্তব্যে অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

১১। মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০ সাল, পৃঃ ৭৫৩।

(১) "ইংরাজী স্কুল বা ইংরাজী প্রণালীর বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে। কত কাল বা কতদূর পড়া—তাহার নিশ্চয়তা নাই। দিনকতক ও পাতকতক পড়িলেই যথেষ্ট।" (২) "ইংরাজী বুলি কতকগুলি পাকা ধরনে, বাঁকা টোনে ও একেলে উচ্চারণে (অশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত ভাঁজাল দেওনার্থ) অভ্যাস করা চাই।" (৩) "তোমার বিষয় যেমন তেমন হউক, ইংরাজী জুতা, পীরান্, চিনাকোট, ফিরানো চুল, পায় হাফ মোজা, হাতে ষ্টিক্ একটা তো চাইই চাই, আর যদি উচ্চ ধরনের সাহেববাবু হইতে সাধ থাকে, তবে জ্যাকেট পেণ্টুলেন, চেন ঘড়ী, নাকে চশমা, চাঁপ দাড়ী, চুরোট, শীশ, কুকুর, ড্যাম্ হুট্ ইত্যাদি কয়েকটি প্রকরণের প্রয়োজন।" (৪) "ঘাড় নাড়িয়া সম্ভাষণ, সেক হ্যাণ্ড, নমস্কার, প্রণামে ঘৃণা, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরোক্ষ বা সমক্ষেও উপহাস, ভিক্ষুককে অনাদর, খবরের কাগজে আদর, রাজ্যের আগ্রহ, সভা-টভার নামে রোমাঞ্চ, দলাদলির নামে খড়্গহস্ত, কথায় কথায় স্বাস্থ্যরক্ষার উল্লেখ, সর্বদাই অস্বাস্থ্যের অভিযোগ, আহারের দিন দিন স্বল্পতা, পদব্রজে গমনের ক্লেশ জ্ঞাপন—এসব নইলে নয়।" (৫) "পুরোহিতের পুত্র হও তো পূজা ত্যাগ, অধ্যাপকের হও তো সংস্কৃত পড়া ত্যাগ, কায়স্থ হও তো ঘরে রাঁধুনী রাখা বা সঙ্গতি অভাবে মা বোন্‌কে দিয়ে সে কাজ সারা—তাঁকে হাঁড়ি ছুঁতে না দেওয়া; দোকানীর পুত্র হও তো দোকানের ত্রিসীমানায় লজ্জায় না যাওয়া; ময়রার হও তো তাড়ু ছাড়া; নাপিতের হও তো ভাঁড় জলে ফেলা; কলুর হও তো ঘান্‌গাছ পুঁতে ফেলা; চাষার হও তো হাল গরু বিলিয়ে দেওয়া—দেনা থাক্‌লে বেচে ফেলা! এ সব বাদে সকলকেই কতকগুলি পশম কিনে ঘরে কারপেটের কাজ কর্ত্তে দিতে হবে।"

বাবুদের মধ্যে ফুলবাবু, প্রগ্রেসিভ বাবু, স্বাধীন বাবু ইত্যাদির চালচলন প্রবন্ধকার সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।—

"যে যত বাপের মনে দুঃখ দিতে পারিবে, সে তত 'প্রগ্রেসিভ' বাবু হইবে! যে যত সমাজের বিপরীত আচরণ করিবে, সে তত সাহেবপ্রিয় বাবু হইতে পারিবে! যে যত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত প্রভৃতির প্রতি ভক্তি স্নেহ কাটাইতে, তাঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে এবং "বাবার পরিবার বাবা পুষুন, আমার পরিবার আমি পুষি" এই বিলাতী 'পোলিটিক্যাল ইকনমি' মূলক লোকযাত্রা-বিধান-তত্ত্বের অনুগামী হইতে পারিবে সে তত স্বাধীন বাবু বুক ফুলাইয়া বেড়াইবে! সেই সকল বাবু ইংরাজী পড়িয়া

এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া স্বাধীনতা নামা অমূল্য পদার্থের ঘোর ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন ; এমন কি স্বাধীন না হইলে তাঁহাদিগের অন্ন পরিপাক হওয়া কি জীবন ধারণ করাও ভার। কিন্তু রাজকীয় স্বাধীনতা পাইবার উপায় নাই—কেন না ইংরাজের মত এদেশে পার্লেমেণ্ট স্থাপনের প্রস্তাব করিতে গেলেই "কিকিং" বই আর কিছুই লাভ হইবে না !—সংবাদপত্রে কিম্বা পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন অভিপ্রায় প্রকাশের যো নাই—কেন না এখনি ছোটকর্ত্তা শ্রীঘরে পাঠাইতে পারেন ! তবেই হইল, উচ্চ অঙ্গের কোনো স্বাধীনতার মুখ দেখিবার কোনো প্রত্যাশা নাই, অথচ স্বাধীনতা ব্যতীতও প্রাণ হাঁপায় ! এ অবস্থায় কি করেন—আর কোথায় সে সাধ মিটাইবেন ! ঘরে বুড়ো বাপ-মা আছেন, তাঁহারা আপনারা না খাইয়া আপনাদের সকল সুখ নষ্ট করিয়াও—এতকাল খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন ; যাহাতে সন্তানের সুখ হয় তাহাই করিয়াছেন ; সকল আব্দার সহিয়াছেন ; সকল সাধ পুরাইয়াছেন ; এখন স্বাধীনতার সাধ পুরাইবার ভার তাঁহাদিগের বই আর কাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে পারেন ? তাহার পর নির্দ্দোষা যোষা সহধর্ম্মিনীদের মনে যে যত দুঃখ দিতে সমর্থ হয়, সে তত ফুলবাবু শিরোমণি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বাবুদের অগম্যাগমন ও অপেয় পান, এই দুটাই প্রধান গুণ। অধুনা এ দেশে এ শ্রেণীর বাবু যত, অন্য কোনো শ্রেণীর বাবু তত দেখা যায় না। এই বাবুরা একদিগে এবং প্রগ্রেসিভবাবুরা একদিগে এবং স্বাধীনবাবুরা মধ্যস্থলে, এইরূপ অর্দ্ধচক্রব্যূহ সাজাইয়া সামাজিকতার সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।......সূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ দর্শকের মতে ঐ তিনদল কদাচময়ী হইবে না অথচ পূর্ব্ব সামাজিকতাও যে অবিকল পূর্ব্বাবস্থায় থাকিবে, তাহাও বোধ হয় না। অবশ্যই কিছুকালে একটা রফা হইয়া উভয় অন্তিম সীমার মধ্যবর্তী কোনো একটা বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।"

অত্যন্ত দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে উপায়ান্তর বিহীন ভাবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সমাজচিত্রটি চয়নবর্জনে সর্বাঙ্গীণ পরিচয়লাভ সম্ভবপর হতো না। সাংস্কৃতিক চিত্রটি বড় হলেও এর সঙ্গে আর্থিক দিকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। আর দু'একটি উদ্ধৃতি টেনে প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত[১২] বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুপরিচিত থাকায় তার উদ্ধৃতি

১২। বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃঃ ৫১০-১২

দেবার আবশ্যক নেই। তবে বান্ধব পত্রিকায়[১৩] "ব্যুৎপত্তিবাদ" নামে একটি প্রবন্ধে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে ভ্রমাত্মক ব্যুৎপত্তি বিচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়েও বাবুর স্বরূপ জানা যাবে। "বাবু—বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, পরানুকরণে, ধৃষ্ট ব্যবহারে চ। ঔনাদিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়, উ থাকে, অকারের বৃদ্ধি। যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান গগণস্পর্শী, চিত্ত পরানু-করণরত এবং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমর সদৃশ, চিন্তা-শক্তি কিছুতেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না; অভিমানে শরতের মেঘ, গর্জে কিন্তু বর্ষে না; অথবা বর্ষার ভেক, নিয়ত শব্দ করে, কিন্তু নিকটে আসিতে সাহস পায় না; পরদেশীয় ছন্দানুবর্ত্তনে সর্বথা নিগারদিগের সমান, একবার আসবাব ও পোশাকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং ধৃষ্টতায় প্রুসিয়ান-দিগেরও প্রপিতামহ, কথায় বোধহয়, একলম্ফে সপ্তসাগর উল্লঙ্ঘন করাও বিচিত্র নহে।"

বাবু সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি বিখ্যাত শ্লোক আছে,—

"বহবঃ বাববঃ সন্তি বাবুয়ানা পরায়ণাঃ।
বঙ্গবাবু সমং বাবুঃ ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি॥"[১৪]

বিভিন্ন প্রহসনেও বাবুর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রিয়নাথ পালিতের "টাইটেল দর্পন" প্রহসনে (১৮৮৫ খৃঃ) আছে,—

"শুধু বাবু হয় নাই, আটটি লক্ষণ চাই,
তবে নাম জানিবে সকলে!
বেশ্যাবাড়ী ছড়ি ঘড়ি, বিকেলে ফিটন গাড়ি,
দিবানিশি ভাস লাল জলে।
গান বাদ্য কর সার, মাছ ধর রবিবার,
চুল কাট অ্যাল্‌বার্ট ফ্যাসনে।
বড়লোক বলি তবে, ঘুষিবে সুখ্যাতি সবে
সার কথা দীনবন্ধু ভনে।"

অমৃতলাল বসুর 'বাবু' নাটকেও (১৮৯৪ খৃঃ) বৈষ্ণবীদের কীর্তনে 'বাবু' সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তা বেশ আকর্ষণীয়। যথাস্থানে তা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

১৩। বান্ধব—আশ্বিন-কার্তিক ১২৮১, পৃঃ—৯৫।
১৪। রসিকতা—রাখালদাস অধিকারী ১৮৯৫।

নব্যবাবুয়ানা ছিলো নব্য সংস্কৃতি নির্ভর এবং তার মূলে ছিলো Industrial Capitalist-দের বাজার স্বষ্টির উদ্দেশ্য। বাবুয়ানার দ্রব্য সামগ্রী লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। দেশীয় জিনিষে বাঙালীর অরুচি ধরিয়ে তারা তাদের কাজ সিদ্ধ করেছে। দুর্গাদাস দে'র লেখা "ল—বাবু" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) তাঁতিনী বলেছে,—"দেখুন, যে বাঙ্গালীরা ছেলেমেয়ের অসুখ হলে আর খই বাতাসা খাওয়ায় না, যে বাঙ্গালীরা আফিস থেকে আসবার সময় এক পয়সার তামাক বাদে পনের আনা তিন পাইএর বিলাতী জিনিষ কিনে আনে, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা ফ্যান্সি পোষাকের জন্য স্বামী বেচারিকে ঋণগ্রস্ত করতে ত্রুটী করে না, যে বাঙ্গালীরা ছেলেমেয়েকে বিলাতী দাই এর দ্বারা লালন পালন করায়, সেই বাঙ্গালীরা কি আবার দেশীকাপড় কিনে পরবে এ আশা করেন?" দেবতাদের মধ্যে বাবু হচ্ছেন কার্তিক। কার্তিককে প্রতিভূ করে তাঁর বাবুয়ানার জন্যে ক্রেতব্য জিনিসের একটা তালিকা পাওয়া যায় অহিভূষণ ভট্টাচার্যের "বোধনে বিসর্জন" (১৮৯৬ খৃঃ) প্রহসনে। জিনিসগুলো এই,—"তোয়ালে একডজন, বর্ডারদার সিল্কের রুমাল একডজন, পিওর সোপ এক বাক্স, ফ্লোরিডা ওয়াটার, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, পমেটম, রোজ এ্যাটো আতর, আয়না, ক্রুস্, বার্ডসাই চুরুট, 'হোয়াইট্ টু লেডিজ কোম্পানী, পাম্প সুজ, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি, হুইল মুগো স্থতো ইত্যাদি।"

দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশীতে" (১৮৬৬ খৃঃ) মুক্তেশ্বরের জামাইয়ের চেহারার বর্ণনা নিমচাঁদের ভাষায়,—"তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ— মাতার মাঝখানে সিতে, গায় নিনূর হাফ্‌চাপ্‌কান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা; গরমিকালে হোলমোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গারটার, জুতো জোড়াটি বোধহয় পথে আস্‌তে কিনেচো, ফিতের বদলে রূপার বগ্‌লস, হাতে হাডের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি।" চুনিলাল দেবের "ফটিকচাঁদ" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) বাবুর আত্মকথার মধ্যে দিয়ে বাবুয়ানার দ্রব্যসামগ্রীর নমুনা পাই। ফটিকের ছেলেদুটি গান ধরেছে,—

"চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে যাব সঙ্গেতে ইয়ার।
কালা পেড়ে ইউনিফরম ফেট্টা চাদর চুনটদার।
বেলদার জামাগায়ে বলস্থ দিয়ে পায়ে
ফুলতোলা সিল্ক মোজা, সিল্কের গাটার,

হীরে পান্নার আংটি হাতে, বুকে চেনের কি বাহার।
যুঁয়ের গোড়ে গলায় দিয়ে, এসেন্স মাখা রুমাল নিয়ে।
ফ্রেঞ্চকট্—টেরী মাথায়, ঢালবো ল্যাভেণ্ডার
চল্‌বে বুলি মজাদারী, উড়বে খালি রোজ লিকার।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের "খোকাবাবু" প্রহসনে (১৮৯০ খৃঃ) বিবিয়ানার সামগ্রীর বর্ণনা আছে। দয়াল গিন্নি ঝি-কে বলে,—"যা শিগ্‌গির পিয়ারের সাবান খানা গোলাপ জলে ডুবিয়ে নিয়ে আয়। রেশ্‌মী রুমালখানা গস্‌নেলের ফ্লোরিডা ওয়াটারে ভিজিয়ে নিয়ে আয়। ল্যাভেণ্ডারের বড় তোয়ালে খানা ডুবিয়ে আন্। সিঁদুরে একটু বেলার আতর মিশিয়ে আন।" বিবিয়ানার বিরুদ্ধেও আর্থিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে তবে প্রদর্শনের স্থবিধার জন্যে সাংস্কৃতিক বিভাগে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বস্তুতঃ বাবুদের এই উন্নতমানের জন্যে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। শ্যামাচরণ ঘোষালের "বারইয়ারী" পূজা" প্রহসনে (১৮৭৮ খৃঃ) গ্রামের চাল-কাপড়ের দোকানদার বৈদ্যনাথকে বলে,—"আর কারবার! সে রামও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই, তবে কিনা বসে না থেকে ব্যাগার খাটি, দেখ এই রামবাবু আর নবীনবাবুর বাড়ী কাপড় দিয়েই বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হতো, এখন আর তাঁরা এখানে কেউ নেই, প্রায় সকলেই কলকাতায়, কাজে কাজেই লাভের দফা হয়ে গেছে।" শুধু মাত্র বিদেশী দ্রব্য সামগ্রীর জন্যে নয়, নব্য সংস্কৃতি নির্ভর বাবুয়ানার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো এমত কতকগুলো আচার যা রক্ষণশীলের কাছে অনাচার বলে রোধ হয়েছে। গ্রামে তার অনুষ্ঠান স্থবিধাজনক ছিলো না। বাবুদের নগরপ্রীতির মূলে এটাও একটা কারণ।

সংস্কৃতি ও অর্থনীতির দিক থেকে বাবুদের তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে।—(ক) ফোতো বাবু (খ) হঠাৎ বাবু এবং (গ) কাপ্তেন বাবু।

ফোতো বাবু ॥ বাবুয়ানার বাহ্য আকর্ষণ অর্থহীন ব্যক্তিকেও অপব্যয়ে প্ররোচিত করেছে। বৃথা মান ও প্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থহীন ব্যক্তি একই সঙ্গে সকলকে এবং নিজেকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করেছে।

"মধ্যস্থ" পত্রিকায়[১৫] ফতো বাবুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,—"বাইরে

১৫। মধ্যস্থ—চৈত্র ১২৮০ সাল।

বাবু নাম—ঘরে বাঙ্গারাম। অর্থাৎ বাস্তবিক ধনী নয়, অথচ ধনীর ন্যায় বাহ্য ভড়ং করিয়া চলিত তাহাকে লোকে "ফতোবাবু" বলিত।"

প্রিয়নাথ পালিতের "টাইটেল দর্পন" (১৮৮৫ খৃঃ) নাটকে দীনবন্ধু ছড়া কেটেছে,—

"মনে করি গাড়ি চড়ি বগি উল্টে পড়ে যাই।
মন ত সকের বটে হাতে কিন্তু পয়সা নাই।"

হরিহর নন্দীর "ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম" প্রহসনেও (১৮৭৭ খৃঃ) এধরনের ছড়া আছে,—

"জাগা নাই জমিন নাই, গল্প করে ভারি।
আগে পাছে লণ্ঠন, টাকার নামে ঠন্‌ঠন্
সদাই দৌড়ান গাড়ী ॥
কানে কলম গুঁজে ফিরে, ছেঁড়া কাঁথা গায় ওরে
বাত্তি জ্বালায় লেম্প
ইংরেজি বকেন সদা, ডেম্ ডেম্ মা ডেম্ ডেম্।"

এ ধরনের ফোতো নবাবী অবাস্তব ছিলো না। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বিধবার দাঁতে মিশি" (১৮৭৪ খৃঃ) প্রহসনে আছে,—প্রেমানন্দ দাস তাঁর বরানগর বাড়ীতে ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার একটা আমোদ দলে যোগ দিতে বরদা ও সাঙ্গোপাঙ্গকে নিমন্ত্রণ করেছেন। বিধু ও গোরা প্রেমানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করে। সে পোষাক-আশাকে খুব বিলাসী, তার দুটো মোসাহেব আছে—ভুপাল ঘোষ ও রমেশ সেন। প্রেমানন্দ বড় বড় বাৎ মারে। কিন্তু এদিকে হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্। গোরা মন্তব্য করে—"কলকেতার এক চোকো বাবুর জামাই চটকদাসও ঐ দরের লোক।" এই ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রতিষ্ঠাস্পৃহার স্বাক্ষর বহন করলেও বাস্তবতার স্বাক্ষরও বহন করে।

বাবুয়ানার সঙ্গে মিশেছিলো ফতো সাহেবীয়ানা। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "কাজের খতম" (১৮৯৯ খৃঃ) প্রহসনে মতি গণেশ ডাক্তারের সাংসারিক অনটনের কথা বল্‌তে গিয়ে বলে—"পোষাকেরই চটক বাবা! ঘরে হাঁড়ি চন্‌চন্ যেম্‌নি তুমি তোমার সহধর্ম্মিনীও তদুপযুক্ত; গাউনের জন্যে, আর ফাউলের জন্যে বাপান্ত না কর্‌ছে এমন দিনই নাই। ভাগ্যিস রমাকান্ত বাবুর **Family Doctor** হতে পেরেছিলে! তাই যা হোগ করে চেয়ার বদলে কেরোসিনের বাক্সোয় বস, আর টেবিলের বদলে কুলুঙ্গিতে খাচ্ছ, আর দু একটা

মর্ত্তমাণ রম্ভা বদনে দিতে পাচ্ছ।” গণেশের স্ত্রী রঙ্গিনী গণেশকে বলেছে.—“ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঞি !…অমন ফতো সাহেবের মুখে মারি জুতোর বাড়ী !! জজেদের মেমের মত খেতে পরতে দিবি, আর একশো টাকা করে মাসোহারা দিবি! এই লোভে জাত খুইয়ে বে করেছিলুম।”

ব্যক্তিগত চুক্তিমূলক আয়ে বাবুয়ানা সম্ভব হয় না। তাই এই সব ফতো-বাবুদের আয় হয়ে গেছে দৌর্নীতিক। বাড়ীর টাকা গহনা ইত্যাদি চুরি বা প্রতারণা দ্বারা সংগ্রহ করে তারা বাবুয়ানার খরচ চালিয়েছে। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের লেখা “ঘর থাকতে বাবুই ভেজে” (১৮৬৩ খৃঃ) প্রহসনে প্রমীলা ফোতোবাবুদের কথা বল্‌তে গিয়ে বলে—“এরা দশ টাকা মাইনে পায় পঁচিশ টাকার মেয়ে রাখে।” যামিনী জিজ্ঞেস করে—“উপরি রাখে বুঝি?” প্রমীলা বলে—“উপরি রোজগার বাড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে।” দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের “চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী” (১৮৭২ খৃঃ) প্রহসনেও আছে,—ফোতোবাবু পরেশের স্বগতোক্তি—“আজ শনিবার প্রাণটা উড় উড কচ্চে, মজাটজা করতে হবে। এমন মধুবারটা যে বুকের উপর দে কেটে যাবে, সেটা প্রাণে সইবে না। হাতে টাকাকড়ি নেই; তা কি করবো, মাগের একখানা গয়না বেচতে হবে, তা নইলে কি এমন মজা ছেড়ে দেব? যতদিন বাঁচব ইয়ারকি হদ্দমুদ্দ দেবো।” এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শনিবার হচ্ছে গত শতাব্দীর বাবুদের দুষ্কর্মের পর্বদিন। চন্দ্রকান্ত শিকদার এ সম্পর্কে “কি মজার শনিবার” নামে একটা ছড়ার বই লিখেছিলেন।[১৬]

প্রহসনে এইসব ফতোবাবুদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের অশ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যমে এই বাবুয়ানা ও ফতো সম্মানের অসারতা প্রচার করা হয়েছে। “বৈকুণ্ঠ” (ব্যয়কুণ্ঠ) বাবুকে উদ্দেশ করে বেশ্যাসমাজের একটি ছড়া উনবিংশ শতাব্দীতে সুচলিত ছিলো,—

“পয়সা কড়ি নেই নাগরের
শুধুই বলে টপ্পা গা।
বোসে যদি থাক্‌তে নারিস্‌,
ঘুম লাগে তো ঘরকে যা।”

১৬। কি মজার শনিবার—চন্দ্রকান্ত শিকদার, ১২৭৭ সাল।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বুঝলে কিনা" প্রহসনে (১৮৬৬ খৃঃ) ফতোবাবু অটল সম্পর্কে কোচোয়ান মন্তব্য করেছে,—

"খানেমে বড়া মক্‌বুদ, যৈসে ওয়েলর ঘোড়া,
লেকেন্‌ পয়সা দেনে মে বড়া আড়িয়ল হোতা।"

বস্তুতঃ ফতোবাবুর বাবুয়ানা প্রতারণামূলক হওয়ায় এই ধরনের বাবুয়ানার দৃষ্টান্তে সমাজসঙ্ঘের সাধারণ আয়-ব্যয়ের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে।

হঠাৎ বাবু ॥ অর্থ সম্পন্ন অথচ সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঐতিহ্যহীন বাবুরা যখন নব্য Industrial Capitalistদের শিল্পের জন্যে কাঁচামালের যোগানদার হলেন, তখন এই "a race incorigible"কে ইংরেজদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সম্মানের ব্যবস্থা করা হলো এবং অর্থ ও গ্রামীন সংস্কৃতির দিক থেকে জমিদাররা হয়ে উঠলেন প্রতিপত্তিশালী। ইংরেজদের আনুকূল্যে অতি সহজে এঁরা নগরাশ্রয়ী নতুন সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকলেন। তাই এদের মধ্যে অনেকে গ্রামত্যাগ করে শহরে এসে "হঠাৎ বাবু" হলেন। জমিদারদের এ ধরনের অপব্যয়ে ইংরেজদের সমর্থন ছিলো। এদেশের মূলধন যাতে লগ্নী কম হয়, সেদিকে ইংরেজদের দৃষ্টি ছিলো। ইংলণ্ডের Capitalistরা অনুভব করেছিলেন যে তাঁদের মূলধন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকলে Law of Diminishing Return এর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন খরচা বাড়বে এবং মুনাফায় আঘাত পড়বে। তখন Capital রপ্তানীর প্রয়োজন দেখা দিবে। Halt Mackanzie তখন পরামর্শ দিলেন ভারত থেকে যে অর্থ ওদেশে পাচার হয় তার থেকেই Capital গড়ে নেওয়া যেতে পারে এবং ভারতের মোটা মাইনের সাহেবরা তাদের দ্বৈত অর্থকে লগ্নী করতে পারবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বিদেশী মূলধন অক্টোপাশের মতো সর্বত্র লগ্নী হবার সুযোগ খুঁজছিলো। বিত্তবান জমিদারদের মূলধন লগ্নীর সুবিধে ছিলো। কিন্তু তারা ইংরেজদের চক্রান্তে একাধারে বাবুয়ানার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে বিদেশী শিল্পের বাজার দৃঢ় করেছে, অন্যদিকে তেমনি মূলধনের উপযোগী অর্থ অনর্থক অপব্যয় করেছে।

হঠাৎ বাবুদের বাবুয়ানার মূলে এই আর্থনীতিক চক্রান্তের ইতিহাসটির প্রাসঙ্গিকতা আছে। এই হঠাৎ বাবুরা আর্থনীতিক সংস্কৃতিতে দু নৌকায় পা দিয়ে চলেছে। তাই রক্ষণশীল আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ এবং প্রগতিশীল আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ উভয় পক্ষ থেকেই বিদ্রূপের পাত্র হয়েছেন। নব্য পরিবেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভাবে কেমন করে হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে

পৌঁছেন, অনেক প্রহসনে তার বর্ণনা আছে। সাধারণভাবে হঠাৎ বাবুর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দৃষ্টিকোণেই সংগঠিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল আর্থিক দৃষ্টিকোণও তার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সমাজে ফোতোবাবু এবং 'হঠাৎবাবুর' বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ধরা হয় না। অনেকক্ষেত্রে 'কাপ্তেনবাবু'কেও হঠাৎবাবু বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। গ্রন্থকার যে দিকটি লক্ষ্য করে 'হঠাৎবাবু'দের পৃথক গোত্রে ফেলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসন্দর্শক প্রহসনকাররা সর্বদা সেই অর্থে ফেলেন নি। হরিহর নন্দীর লেখা হঠাৎ বাবু (১৮৭৮ খৃঃ) প্রহসনটির বিষয়বস্তু পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে।

কাপ্তেনবাবু॥ "সমাজ সংস্কার" নামে একটি গ্রন্থে 'অবতারচন্দ্র লাহা' লেখেন,—"আমি দেখিতেছি 'বাবু' শব্দের পশ্চাতে কেবলমাত্র একটী করিয়া 'ঘোর' যুড়িয়া দিলেও বাবুদ্বয়ের প্রকৃতিগত ভাবার্থ তত স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং বিস্তর গভীর গবেষণার পর এই স্থির করিলাম যে 'ঘোর' শব্দের পরেও বাবু শব্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ দুয়ের দুয়ের মধ্যস্থলে আরও একটি করিয়া বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। শব্দটী কিন্তু জাহাজী ; তা করি কি—অর্থাৎ 'বাবু'—'ঘোর বাবু'—'ঘোর কাপ্তেন বাবু'।" (পৃঃ ২) লেখকের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝাচ্ছে যে কাপ্তেনবাবু বাবুর কোনো জাত নয় বাবুয়ানার মাত্রা মাত্র। শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'ভয়ঙ্কর বাবু'। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পরবর্তীকালে কাপ্তানবাবু বল্‌তে বুঝিয়েছে ধনীর বয়ে যাওয়া নাবালক পুত্র। ফোতোবাবুর ওপর মোসাহেবদের আকর্ষণ নেই। কিন্তু হঠাৎবাবু এবং কাপ্তেনবাবুদের ওপর মোসাহেবদের আকর্ষণ তীব্র। উল্লিখিত 'সমাজ সংস্কার' গ্রন্থে অবতার চন্দ্র লাহা লিখ্‌ছেন,—"......যেমন প্রফুল্ল সরোবরে পদ্ম ফুটলে ভ্রমরগুলো এসে গুন্ গুন্ করে, মধুর কল্‌সি ভেঙ্গে গেলে মাছিগুলো এসে ভ্যান্ ভ্যান্ করে, বসন্তের উদয় হলে কোকিলগুলো এসে কুহু কুহু করে, আপিস অঞ্চলে একটা চাকরি খালি হলে, চারিদিক থেকে উমেদার এসে ভেড়ে, আর গো-ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন শকুনির টনক নড়ে, তেমনি বাজারে একটা কাপ্তেন বেরুলে মোসাহেবগুলো যেন কোথা থেকে হামড়ে পড়ে।......অমনি মায়ে মারা, বাপে খাস্তান, হাড়হাবাতে উন্ পাঁজুরে, বরাখুরে প্রভৃতি মহা-মহোপাধ্যায় মোসাহেব মহোদয়গণ চারিদিক থেকে এসে ধাঁ করে বাবুকে ঘিরে বসলো—ওহো! সে দৃশ্য কি মহা শোচনীয়! যেন জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্ত

মহারথী ষড়যন্ত্র করে ব্যূহ বন্ধন পূর্ব্বক অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত! সে ব্যূহ ভেদ করে বালকের প্রাণ রক্ষা করে, কাহার সাধ্য?" (পৃঃ ৫)। কাপ্তেনবাবুর অর্থব্যয়ের উপায় করে দেয় এই সব মোসাহেব অনেকক্ষেত্রে অর্থব্যয়ে বাবুর অনিচ্ছা থাক্‌লেও মোসাহেবের তোষামোদে লোকের চোখে ঠুন্‌কো সম্মান বজায় রাখবার জন্যে বাবু খরচে প্রবৃত্ত হন। এমন কি নাবালগ অবস্থায় অর্থের অসুবিধায় এরা হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে—তাতে মহাজনের সঙ্গে মোসাহেবদেরও বখ্‌রা থাকে। চুক্তি হয় সাবালক অবস্থায় কাপ্তেনবাবু সে টাকা শোধ করবেন। মহাজনরা সাধারণতঃ নিশ্চিন্ত, কারণ একদিন কাপ্তেনবাবু বিষয় আশয় পাবেন। অনেক সময় অনেক মোসাহেব নিজের বেনামী টাকা কাপ্তেনবাবুকে ধার দিয়ে পরে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তাছাড়া কাপ্তেনবাবুর ঘড়ি বোতাম আঙটি ইত্যাদি উদ্যোগী হয়ে বিক্রী করে এরা ভালো মুনাফা পেয়ে থাকে। এদের সম্পর্কে বল্‌তে গিয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় একটি পুস্তকে লিখেছেন,[১৭] "ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে নিঃস্ব করিতে কিম্বা বিপদে ফেলিতে এই জানোয়ারেরাই মূল কারণ। কত কত ধনাঢ্য ব্যক্তি যে তাহাদিগের বুদ্ধিবশতঃ মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিলেই জানিতে পারিবেন। দুগ্ধকলা দিয়া কালসর্প পুষিলে যেমন ফললাভ হয় তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও সেইরূপ জানিবে। এমত অনেক দেখা গিয়াছে যে এই অন্নদাস জানোয়ার অনেকের অন্ন ধ্বংস করে শেষে অন্নদাতার এমত অনিষ্টসাধন করিয়াছে যে তাঁহার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়িয়াছে।"

বিভিন্ন প্রহসনে কাপ্তেনবাবুর এই সমস্ত অপব্যয় দর্শনে সঞ্চয়ের উপরেই একটা বিতৃষ্ণা ব্যক্ত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "চার ইয়ারে তীর্থ যাত্রা" প্রহসনে (১৮৫৮ খৃঃ) রামকৃষ্ণ বলেছে—"এই যারা পেটে না খেয়ে··· টাকা জমায় আর সেই টাকা তারি ছেলেপিলেকে মজাবার উপায় করিয়া দেয়, সেই প্রকার টাকা জমান অতি মন্দ।" কাপ্তেন শিকারীদের সম্পর্কেও প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কালীচরণ মিত্রের "কাপ্তেনবাবু" প্রহসনে (১৮৯৭ খৃঃ, রামকৃষ্ণ ভড় একজন কাপ্তেন-শিকারী মহাজন। তার সম্বন্ধে অমৃতলাল পাইন বলে,—"ব্যাটা কত ছেলের এমনি করে সর্বনাশ

১৭। আপনার মুখ আপনি দেখ—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৩ খৃঃ) পৃঃ ৩।

করেছে। একগুণ দিয়ে চারিগুণ আদায় করে।" একই প্রহসনে প্রহসনকার এই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রহসনের শেষে জজ সংবাদপত্রে এই কথা ছাপাতে বলেন—"অন্ত হইতে যদি কোন মহাজন নাবালককে না বুঝিয়া টাকা ধার দেন, তাহা হইলে তিনি টাকা পাইবার পরিবর্ত্তে আইনানুসারে দণ্ডভোগ করিবেন।"

এই ধরনের ধনীর বকাটে ছেলে কাপ্তেনবাবুর দল ক্রমেই ব্যপক হয়ে উঠেছিলো। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) প্রিয়নাথ এক জায়গায় বলেছে,—"পেনেটিতে ভাল পুষ্যিপুত্র দেখাও তো।" জগচ্চন্দ্র উত্তর দেয়—"ও গুলিখোরের দেশ, ওখানে আর পোষ্যপুত্র ভাল হবার যো আছে?" যদি—একজনের বাপ কতকগুলি বিষয় রেখে মরে যায় আর তার ছেলে যদি ছোট হয়, তাহলে পাঁচবেটা বওয়াটে এসে সেই ছেলেটির মোসাহেব হয়ে গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু ও মদ খাইয়ে অবশেষে পথের ভিখারি করে। তখন প্রিয়নাথ মন্তব্য করে—"শুধু ঐ দেশটা কেন? আজকাল ঐরূপ সব দেশ হয়েছে।"

বস্তুতঃ বাবুয়ানা আমাদের সমাজে অনর্থক অর্থব্যয়ের নামান্তর ছিলো। আমাদের সমাজে বিদেশীদের আর্থনীতিক শোষণে আমরা যে হীন পর্যায়ে পৌছেছি, সে অবস্থায় সঞ্চিত সামান্য অর্থ লগ্নিতে ব্যবহার না করে বাবুয়ানায় অপব্যয় করার অর্থ প্রকারান্তরে শিল্পপতি ইংরেজদের শিল্পের চাহিদা সৃষ্টি করা। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "কিছু কিছু বুঝি" (১৮৬৭ খৃঃ) গোড়াতে নট বল্‌ছে,—"কিছু কিছু বুঝি ঐ 'বুঝলে কিনারই' আদর্শ মত সুরাদোষ ইন্দ্রিয়দোষ যদেচ্ছাচার ও অনর্থক অর্থব্যয় প্রভৃতি দেশাচার সংশোধক বিষয়েই লিখিত হয়েছে।" মদ্যপানও বাবুয়ানার অঙ্গ হিসেবে এবং সাধারণ প্রবৃত্তিতেও সমাজে "অনর্থক অপব্যয়ের" দৃষ্টান্ত এনেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের "মোহন্তের এই কি কাজ" (১ম খণ্ড) নাটকে (১৮৭৩ খৃঃ) একজায়গায় এই মাত্রাতীত ব্যয়ের প্রসঙ্গ আছে।—

"মাধব। তোমার এই ২০ টাকা মাইনাতে কি করে সব হয়, তাও ত কই—পুর মাইনা একবারও পাও না?

কানাই। আরে বোকা ছেলে! যা পাই যেখানে, তার অর্দ্ধেক আগেই মায়ের হাতে, না হয় গিন্নির হাতে দি, আর বাদ বাকি মামাদের দি।

মাধব। মামা কারা?

ডি সুজা। শুঁড়ীরা, যারা মদ বেচে।"

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "ভাগের মা গঙ্গা পায় না" প্রহসনে (১৮৮৯ খৃঃ) মদ্যপানের অর্থঘটিত দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। ভয়ানকচন্দ্রের মাতাল পুত্র 'বেঁড়ে' "শালাবাবা"র কাছে টাকা চাইতে আসে। সে মদ খেয়ে মাতলামো করায় হাকিম তার পঁচিশ টাকা ফাইন করেছে। বাইরে সিপাই অপেক্ষা করছে। মাতলামো করবার জন্যে তার মা-কেও পাহারাওয়ালা আটক রেখেছে। ভয়ানক চন্দ্র রেগে গিয়ে বলে, প্রাইভেট ইস্কুলের মাষ্টারদের মাইনে মেরে একশো টাকা তার মায়ের হাতে দিয়েছে, সব খরচ করে আবার এই! তখন বেঁড়ে ভয়ানকের গলার কলার চেপে ধরে বলে,—"শালা—নিদেন-হামার পাঁচ টাকা দিবি কিনা বল্? নইলে এক সেলারি blow-তে তোর বদন বিগ্ড়ে দোবো।" ভয়ানক ভয়ে ভয়ে তাকে চেন ঘড়ি দিয়ে দেয়—বলে এটা বাঁধা দিয়ে সে টাকা সংগ্রহ করুক।

বাবুয়ানার অঙ্গ মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে আথিক দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে, তার মূলেও একটা বড়ো পরিকল্পনা থেকেছে। অমৃতলাল বসুর "বাবু" প্রহসনে (১৮৯৪ খৃঃ) তিতুরামের বক্তব্যটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তিতুরাম সমসাময়িককালের "ওপিয়ম কমিশন" সম্পর্কে বল্তে গিয়ে বল্ছে,—"ওপিয়ম কমিসন অর্থ ইংরেজদের নিজেদেরই লাভ, আফিমে দেশ সর্ব্বনাশে যাচ্ছে বলে কমিশন বসে নি। মদ্যে আরও সর্ব্বনাশ হচ্ছে। ইংরেজদের সর্ব্বত্রই লাভের প্রশ্ন। তাদের নিজেদের আত্মীয়দের মদ্যর ব্যবসায় আছে। তাই সেই ব্যবসায়ের লাভের জন্যই আফিম বন্ধ করছে। আফিম খোর আফিমের অভাবে মদ খাবেই। তাতে ইংরেজেরই লাভ।"

মদ্যপান ও অপব্যয় সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে সুলভ সমাচার পত্রিকায়[১৮] "অপরিমিত ব্যয়" নামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়ে ছিলো,—"চালে খড় নাই চুলে পোমেটম; জামার পকেটে একটি আধ্লা পায়সাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না, অথচ আস্তিনে রৌপ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ চারটা দু আনি; মা ছেঁড়া কাপড় পরে ঘরে গোবর দেন, নিজের বুট, পেণ্টেলুন, চাপকান, জোব্বা, এবং টাঁসল দেওয়া টুপি; বাড়ীতে ভাতে ভাত আফিসে রোজ দুই আনার কম টিফিন চলে না। অন্ন হউক না হউক মদ খাওয়াটা চাই এমন বাবুও অনেক দেখা যায়। তাঁহাদের যে কি কষ্ট

১৮। সুলভ সমাচার পত্রিকা—১৬ই ফাল্গুন—১২৭৭ সাল।

তাহা তাঁহারাই বিলক্ষণ জানেন। তাঁহাদের বিষয় আমরা যাহা কিছু জানি তাহা কেবল দেখে শুনে তাঁহারা ভুক্তভোগী।

আয় বুঝে ব্যয় কর হবে না অভাব ;
আয় ছাড়া ব্যয় করা মূঢ়ের স্বভাব।"

বাবুয়ানার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ ব্যাপক সমর্থনে পুষ্ট হয়ে উঠেছে! তবে বাবুয়ানার সঙ্গে নব্য সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকায় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিক থেকেও বাবুয়ানার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। নব্য সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, সমাজ-সংস্কার, দেশোদ্ধার, ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলোও তার সঙ্গে একত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

(ক) ফোতো বাবুয়ানা॥

"**ফোতো নবাবি**"—(প্রকাশকাল অজ্ঞাত)—অজ্ঞাত॥ আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতার বিরুদ্ধে যে আর্থিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায়, তারই কিছুটা প্রকাশ এই পুস্তিকায় থাকা সম্ভবপর। অথচ পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। একটিমাত্র কপিরই সন্ধান জানা থাকায় খণ্ডিত অংশের কাহিনী বর্ণনা করা ছাড়া উপায় নেই।

কাহিনী।—বাদশামোহন আর নবাবচাঁদ উপযুক্ত শ্যালক ভগ্নীপতি। চলন বলনে দুজনেরই আশ্চর্য মিল। অর্থ-সামর্থ্য তাদের কিছুমাত্র নেই অথচ বাইরে নবাবী ষোল আনা। কিন্তু পেট তো চালানো চাই। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে তারা করে রাঁধুনিগিরি কিংবা চুরি-চামারি। তবে বাইরে তার সাজ পোষাকের ঘটা দেখে সকলেই তাদের বাবু বলে ভুল করবে। দেশে বাদশার মা বাবা অর্থাৎ নবাবের শ্বশুর শাশুড়ী আছেন। সে অঞ্চলে সবাই জানে বাদশা কলকাতায় দেওয়ানী করে। জামাই নবাবকেও মস্ত ধনী বলেই দেশের সবাই জানে।

শীতকাল এসে পড়েছে। শীতকালেই জানা যায়, কে গরীব কে বড়োলোক। এতকাল তারা উড়ুনী পরে এসেছে। এখন বনেতের জামাও নেই, শালও নেই। একটা চীনেকোট সম্বল। সেটা পরে কতোদিন চলে? কলকাতার পাড়ার লোক তাদের নবাবীর স্বরূপ বুঝে ফেলবে। তাই এই চারমাস দেশে কাটানোই ভালো। কিন্তু দেশে—"ব্যাপ্তি রেপ্তি নাহি তথা সকলি অসার।" সে-কথা

মনে হলে—"ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ এ মত জীবন। বাবুয়ানা না করিলে নিশ্চিত মরণ।" আবার আর একটা জ্বালা আছে। তারা নিঃসম্বল। দেশে সকলে তাদের বড়োলোক বলেই জানে। কিছু না নিয়ে গেলে ওরা ভাব্বে কি? বাদ্শা মুখুজ্জে বাড়ী রান্না করে যা জমিয়েছিলো, সবই খরচ করে ফেলেছে। সে ভাবে, কোন একটা বিয়ে বাড়ী থেকে কিছু জুতো সরিয়ে তা দিয়ে একটা ব্যবস্থা করবে। জুতো চুরিতে সে অভ্যস্ত। নবাবের হাতেও মাত্র দশ টাকা। সে ভাবে, গিল্টির গয়না আর ঝুটো জরির কাপড় কিনে নিয়ে যাবে।

অনেকদিন পর ছেলে আর জামাইকে দেখে সরলা খুসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বাদ্শা বলে, তাদের এতো কাজের চাপ, যে চিঠি লেখার ফুরসৎ নেই। এক এক করে জিনিস বার হয়। বাদ্শার বাবা অর্থাৎ আজাভুক্ ভট্চাযের জন্যে বনাত, স্ত্রীর জন্যে চৌদানী, যোড়শবালা, জরির কাপড়—কতো কি! মা বলে, গয়না পরিয়ে বিকেলে পাড়ায় পাড়ায় সবাইকে দেখিয়ে আন্তে হবে।

নবাব আর বাদ্শা কলকাতার আবহাওয়ায় মানুষ। এখানে মনোমতো জায়গা নেই। অনেক খুঁজে দুজনে শেষে মেয়েদের স্নানঘাটের কাছে গিয়ে বসে। এক যুবতী স্নান করতে আসে। নবাব তাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করে। সে এসব বুঝতে পারে না, তবে পরিচয় দেয় যে, সে বিধবা,—বাইরে লাঞ্ছনা ভোগ করে, অন্তরে ভোগ করে পঞ্চশরের যাতনা। নবাবের সহানুভূতি প্রদর্শনে সে গলে পড়ে। নবাব তাকে বলে,

"তোমার যৌবন রথে সারথি করিয়ে।
আমারে লইয়া চল দেশান্তরি হয়ে॥"

যুবতী বলে,—সে অপরিচিত পুরুষ, যতোই মনের মিল থাকুক, কি করে তার সঙ্গে সে বেরোবে? নবাব তখন তার ঐশ্বর্যের বর্ণনা দেয়। কলকাতায় কতো আরামে সে থাকে,—সব কথা বলে। সে আরো বলে যে, তার সঙ্গে থাকলে যুবতীর গয়নার অভাব হবে না। (১২ পৃষ্ঠার পর এখানে খণ্ডিত)।

পুরু নজর (রচনাকাল অজ্ঞাত)—কালুমিঞা॥ প্রহসনটিও পূর্বোক্ত ফোতো বাবুয়ানাকে কেন্দ্র করেই রচিত। কোনও ভূমিকা না থাকায় লেখকের উদ্দেশ্য জানা যায় না। কিন্তু এই প্রহসনটির চতুর্থ কভারে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে "নীতিশিক্ষামূলক কিতাব" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কাহিনী।— খুদাবক্স রহমনপুরের এক যুবক। তার বিধবা মা অন্য বাড়ী ধান ভেনে আর দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে মুন্শীর কাছে লেখাপড়া শিখিয়েছে।

"আমার ঐ ছাওাল যেকন ছোট ছিল তখন তাহার বাপ মরে। রহিম মুনশীর নিকট কাঁদনা করে বলিলাম ছাওালডাকে এটু কালির আঁচড় সিকান।" আজ খুদাবক্স লায়েক হয়েছে। বিলাসিতাও শিখেছে। শহরে এক ধনীর দোকানে সে কাজ করে। তার মা গ্রামেই থাকে। এখন সে বুড়ী হয়েছে, কাজ জোটে না। যাহোক খুদাবক্সের স্ত্রী এবং সে—দুজনে মিলে খুব কষ্টে দিন কাটায়।

এদিকে খুদাবক্স আজকাল সরাব খায়, খারাপ জায়গায় যায়। তার দোস্ত গাজী তাকে এ পথে নামিয়েছে। গাজী তাকে একদিন বলে,—"তোমার বয়সকাল এখন আমোদ করিবার সোময়। চল তোমাকে বহুত মজা দেখাইব।" এই বলে তাকে গাজী নূরবিবির মহলে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। সেখানে গাজীর সঙ্গে খুদাবক্স রোজ স্ফূর্তি করে। গ্রামের খবর নেয় না। গ্রাম থেকে তাঁর মা মিঞাছায়েবকে তার কাছে পাঠালে সে বলে,—"তুমি চলিয়া যাও দেশের সহিত আমার কোন সমবন্ধ নাই।"

ইতিমধ্যে একদিন খুদাবক্স দোকান থেকে টাকা চুরি করে। মনিব তাকে তাড়িয়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে সে নূরবিবির কাছে গেলে নূরবিবি তাকে গলাধাক্কা দেয়। তখন ঘরের ছেলে খুদাবক্স ঘরে ফিরে চলে। গিয়ে দেখে, তার মা মারা গেছে এবং বৌ অন্য একজনকে বিয়ে করে ঘর সংসার করছে।

বক্কেশ্বরের বোকামি (১৮৮১ খৃঃ)—কামিনীগোপাল চক্রবর্তী॥ গরীব মায়ের রোজগার করা পয়সায় ফোতো বাবুয়ানা এবং লাম্পট্যচিত্র বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আর্থিক দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পেয়েছে। বাক্তিগত আচরণে নীতির অমার্জনীয় অসঙ্গতির বিরুদ্ধেই দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত।

কাহিনী।—বক্কেশ্বরের মা ফল বেচে সংসার চালায়। সে নিজে ফলের ঝুড়ি মাথায় করে শহরময় ঘুরে বেড়ায়। বক্কেশ্বর বসে বসে মায়ের ফলবেচা টাকায় খায়দায় এবং বাবুগিরি করে। বৌকে সে ইতিমধ্যে বাপেরবাড়ী পাঠিয়ে খাদ্যাভাব অনেকটা দূর করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাবুগিরির পেছনে প্রচুর অর্থ নষ্ট হয় বলে সংসারের কষ্ট আর দূর হয় না।

বক্কেশ্বর হালে বাবু হয়েছে। মদ ও বেশ্যাতে তার বিন্দুমাত্র অরুচি নেই। রাম তার কুকর্মের সহচর। মা তাকে কিছু বলতে গেলেই প্রহার খায়। মায়ের ওপর তার বিশেষ ভক্তি নেই। সে তার মাকে বলে,—"ড্যাম্, তুমি মাগী ক্রমেই ফেল হচ্চ, যত ওল্ড উওমেন্, ওদের না আছে বুদ্ধি, না আছে

কিছু, কেবল দাঁত ভরা ছাতা।" একদিন মা তাকে বলে,—সে যদি পোস্তা থেকে ফল কিনে এনে দেয়, তাহলে তার বিক্রীর সুবিধা হয়। বক্কেশ্বর মুটে ভাড়া চায়। মা অবাক্ হয়ে বলে,—"ওমা, এই পোস্তা হতে আন্তে আবার মুটে! আমি যে এই শহরময় ফলের বাজ্‌রা কাঁখে করে ফিরি।" বক্কেশ্বর উত্তর দেয়,—"তুমি পার, আমার সাজে না, আমাকে দশজনে জানে, মান্য করে।" মা কিছু বল্‌তে গেলে সে বলে,—"ন্যাও, তোমার আর লেক্‌চার মারাতে হবে না।" প্রতিবাসিনীরা বোঝাতে এলে বক্কেশ্বর বলে,—"মাগীদের আর বসে বসে কায নাই। দু-তিনজন জুটে, কিনা গ্রিন্ জুরির বিচার আরম্ভ করলেন। এ এ করলে, সে তা করলে, ওর বৌর কথা ভাল নয়, তার বৌর চলন বাঁকা, যত্নর মায়ের ডেলে নুন কম। এ সব কি?"

বেশ্যালয়ে বক্কেশ্বরের চালচলন অন্য রকম। ফলউলীর ছেলে বলে চেনা যায় না। গোলাপ বেশ্যাকে সে বলে,—"সোনাগাছির উর্বশী, মেছোবাজারের রম্ভা, চাঁপা তলার চাঁপা, আর জানবাজারের জেন্, এরা কতবার গাড়ী হাঁকিয়ে আমার ওখানে গেছে. আমি অমনি তাদের নিয়ে বাগানে গেছি। মদ, পোলাও, পাঁঠা, দু'শ রগড় করেছি। কত টাকাই যে খরচ হয়েছে, তা আর বল্‌তে পারি না। এখন তোকে ফেলে কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না।"

গোলাপ তাকে মুখসর্বস্ব বলে। বড়ো বড়ো কথার কামাই নেই বক্কেশ্বরের মুখে। বক্কেশ্বর তাকে বলে,—"কোন্ ব্যাটাকে ভয় করি? এখানে আর কাকেও আসতে দেবো না।" গোলাপ বলে,—সে বারাঙ্গনা—একাঙ্গনা নয়। তাকে রাখতে হলে অন্ততঃ পনের টাকা মাসে দিতে হবে। বক্কেশ্বর বলে টাকা তার কাছে অতি তুচ্ছ। এবার থেকে গোলাপ তার নিজস্ব রক্ষিতা। সন্দিগ্ধ হয়ে গোলাপ তাকে আপাততঃ পাঁচ টাকাই আন্‌তে বলে। বাড়ীভাড়া ও চালওয়ালার পাওনা শোধ করতে হবে। বক্কেশ্বর বলে, আপিসের মাইনে পেলে সে গোলাপকে বুটকাটা সাড়ী দেবে। ওখানে বক্কেশ্বরের মদ্যপান ও রাত্রিবাস চলে সেদিন।

মুখে বলা আর কাজে করা এক নয়। অনেক কষ্টে দুটাকা সংগ্রহ করে বক্কেশ্বর গোলাপ বেশ্যার বাড়ী যায়। টাকা দুটো তার হাতে দিয়ে সে বলে, আর তিন টাকা পরে দেবে। কারণ "দশজন পরিবার প্রতিপালন কত্তে হয়, লোক লৌকিকতা আছে।" মচ্‌কিয়েও মচ্‌কাতে চায় না বক্কেশ্বর।

তারপর মদ্যপান চলে। বক্কেশ্বর, ইয়ারবন্ধু রামচন্দ্র এবং গোলাপ বেশ্যা—

তিনজনে মিলে ফুর্তি করে। নেপথ্যে একজন জাম-উলী হেঁকে যায়। গোলাপ বলে, মদের মুখে নুন মাখা জাম আচ্ছা চাট্। সুতরাং জাম-উলীকে ডাকা হয়। জাম-উলী এলে বক্কেশ্বরবাবু দেখে তারই মা। ধরা পড়ার ভয়ে মুখে কাপড় দিয়ে বক্কেশ্বর বসে থাকে। এমন হাস্যকরভাবে বসে থাকার কারণ গোলাপ জিজ্ঞাসা করলে বক্কেশ্বর বলে ওঠে,—"ও মাগী ভারি খারাপ; ওর মুখ দেখলে নেকার আসে। রাম রাম, এখনি ওকে দূর করে দাও, মাগীর যে চেহারা !!" গলার আওয়াজে বৃদ্ধা তার ছেলেকে চিনতে পারে। গোলাপের সামনে সে নিজেকে বক্কেশ্বরের মা বলে পরিচয় দেয়। বক্কেশ্বর বলে—"ও শালী পাকা বজ্জাত।" বৃদ্ধা দুঃখ করে বলে,—"বাবা ! আমি তোমার মা, তা এখন শালী হয়ে গেলাম !" বক্কেশ্বর বলে,—"কে ওর ছেলে, মাইরি না, আমার বাবা দিনকতক ওকে রেখেছিল, তাই মাগী বাবা বাবা করে।" বৃদ্ধা তখন বলে,—"তা বাবা তুমি যার ছেলে, তার এইরূপই ঘটে থাকে। ওদিকে ঘরে ভাত নেই, মাথায় তেল নেই, চালে খড় নেই, এদিকে বাবার আমার পুরু নজর, মরণ আর কি !"

গোলাপ বেশ্যাগিরি করে, নেহাৎ বোকা নয়। বক্কেশ্বরের ভাঁওতায় আর সে ভোলে না। ঝাঁটা তুলে দমাদ্দম পেটায়। বলে,—"এই তোর বাবুগিরি—ব্যাটা মাকে ভাত দিতে পারিস্ নে। রাঁড় পুষতে এসেছিস্ !" ইয়ারবন্ধু রামচন্দ্র বক্কেশ্বরের হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে সেও প্রহার খায়।

বক্কেশ্বর আক্কেল ফিরে পায়। মার কাছে ফিরে এসে সে ক্ষমা চায়। বলে,—"এ কুপুত্র দ্বারা কি শারীরিক কি মানসিক কোন ক্লেশ পেতেই তোমার বাকী নাই।...আর যদি আমি কুপথগামী হই, আমার সর্ব্বনাশ হবে। আজ অবধি আমি তোমার সেবায়ই নিযুক্ত হলেম।" বক্কেশ্বর নিজের বোকামিকে ধিক্কার দেয়।

বৌবাবু (১৮৯০ খৃঃ)—কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়॥ বিমিশ্র সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থাকা সত্ত্বেও আর্থিক দিকটিই এক্ষেত্রে প্রকট। তবে পরিণতিতে লেখক-উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণটি সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য এজন্যে লেখকের কোনো সিদ্ধান্ত বা উপদেশ আমরা পাই নে। তবে গরীবের ছেলের বাবুয়ানা ও অনাচারের বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার কষ্টসাধ্য নয়।

কাহিনী।—বিক্রমপুরের রামহরি মুখোপাধ্যায় খড়ের ঘরে বসে পাট

কাটে। লেখাপড়ার ওপর তার খুব শ্রদ্ধা। পাট কেটে অতিকষ্টে সে যা পায়, তাতে তার নিজেরই খুব কষ্টে সংসার চলে, তবুও লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে বলে সে তার ছেলে রামকৃষ্ণকে কলকাতায় পাঠিয়েছে। রামকৃষ্ণ মানুষ হয়ে রামহরির দুঃখ দূর করবে, এই আশা সে পোষণ করে। চক্রবর্তীদের আট বছরের ছেলেকে সে বলে,—"না ল্যাহনে কি খাইবা? বাল ল্যাহনে বাব হুবি। দেহিস্ না, রামবন্দ্র আত্তি গোরায় চাপে, চিহন ধুত্তি, বাল্দিসী জোত্তা, কাটা মেরজাই পরণে। বেলা রাখ্নে গরি জোলে। গোরা মুচী জোত্তা বানায়ে পা দরি ডুকাই দেওন চায়। মোর রামকিষ্ট নি গোরার নিকট আংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করণে কলহত্তায় পাকা দালানে রয়। দেহিস্ হালসনে দালান ট্যাহায় আট লাগাইনা দিমু।"

এদিকে কলকাতায় রামকৃষ্ণ বিলাসব্যসনে মত্ত—নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে বৌবাজারে বিলিতি কনসার্ট পার্টি খুলেছে। রামকৃষ্ণ নাম বদলিয়ে সে এখন নাম নিয়েছে রমেন্দ্রকৃষ্ণ। নানা সমিতির সঙ্গে এখন তার যোগাযোগ। তার সুরা সংহারিনী সমিতি শুঁড়ির পাওনার ভয়ে আধমরা—99 এর বিলের ধাক্কায় অস্থির। তবে Native Progressive Club থেকে রামকৃষ্ণের ব্যক্তিগতভাবে কিছু লাভ হয়। যেজন্যে তাকে পাঠানো, তার কিছুই করে না। তার কথা থেকেই সেটা বোঝা যায়। সে বলে,—"I will do—whatever I please." Headmaster বল্লে, রমেন্দ্রকৃষ্ণবাবু। "Mathematics-এ you are miserably backward, carefully revise করে নিও। ভাই বল্‌বো কি class-এ Some Hundred Students-এর সামনে শালা এই কথা বল্লে। আমার আর সহ্য হল না, মাল্লুম এক Blow শালার ঘাড়ে, সেই হতে আর আমাকে কোন কথা বলতে সাহস কত্তো না।"

বেশ্যাদের পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে রামকৃষ্ণের মনে উৎসাহ জাগে। "বেশ্যা চিরকাল যদি বেশ্যার মত থাকবে, তবে আমরা জন্মিছি কি জন্য? ···We are ready to go with an association, entitled Prostitute Reformation Society. এমন কি তাতে কুলীন বেশ্যাদের কুলীন বরে বে দেওয়ার নিয়মও বিধিবদ্ধ হবে।"

স্কুলের দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে বন্ধু চারুকে সঙ্গে করে রামকৃষ্ণ ওরফে রমেন্দ্র একটি বেশ্যাকে দারোয়ানের ঘরে নিয়ে গিয়ে তোলে। রামকৃষ্ণ বলে,—"কার objection হইতে পারে? দারোয়ানের ঘর studentদের কেলিকুঞ্জ,

বিশেষ এ কার্য্যে আমাদের Honorable Proprietor মহাশয়ের মত আছে।" ঝিকে দিয়ে মালা আনানো হলো। দারোয়ানকে দিয়ে দুটো চেয়ার আনানো হলো। তারপর অনুষ্ঠান হয় স্বয়ম্বরা সভার। রামকৃষ্ণ এবং চারুর মধ্যে একজনকে মালা পরাতে হবে। বেশ্যা রামকৃষ্ণের গলায় মালা দিলো। উচ্ছ্বসিত গলায় রামকৃষ্ণ বলে ওঠে,—"এতদিনে আমার আত্মা পবিত্র হলো! Lifeএর value দশগুণ বাড়লো। লেখাপড়া শেখা সার্থক হল···এতদিনে আমার father—grand father. অধিক কি, চোদ্দপুরুষ বিনা পিণ্ডদানে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হল।"

রামকৃষ্ণের মা'র অসুখ। খবর পেয়েও রামকৃষ্ণের কোনো দুশ্চিন্তা নেই—দেশে যাওয়া সে দরকার মনে করে না। রামকৃষ্ণের খবর না পেয়ে তার বাবা ছুটে আসে। রামকৃষ্ণ তখন চশমা চুরুটে ভদ্রঙ্করবাবু। তাকে চিনতে না পেরে সাহেব বলে ভুল করে বাবা জিজ্ঞাসা করে,—"অ সাহেব' মোর রামহিষ্ট নি এহানে ?" পরে ছেলেকে চিনতে পেরে বলে,—"এ না দেহি! অ বাপ তুমি এমন হইচ!" অনিচ্ছুক রামকৃষ্ণকে সে যাবার জন্যে বার বার ধরলে রামকৃষ্ণ অত্যন্ত চটে যায় এবং পাহারাওয়ালা ডাকে। বাবা কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। যাবার সময় বলে,—"কি বলিস্? পাহারালা নি বারা করে দেওন চাস্? কৃটানি হচে? ওহানে কোষ্টা কাটনে গাটা ফুল্‌চে, এহানে সেই ট্যাযায় লবাব হ'চস্? আবার মারণ চাস? এ কি ধরম্?" রামকৃষ্ণের বন্ধুরা লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বলে,—"Who is this insolent fellow!" রামকৃষ্ণ জবাব দেয়, "One of our family servants."

রামকৃষ্ণ বহুবিবাহের বিরোধী। বিনোদ বেশ্যাকে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু অর্থলোভে আর একটি বিয়েতে রাজী হয়। ঘটকের মুখ থেকে সে জানতে পারে,—"excluding all expense—totally sixteen hundred" দেবে। বন্ধুদের কাছে রামকৃষ্ণ এই বিয়ের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলে,—তার স্ত্রী বিনোদ রবিবারে রবিবারে তার সঙ্গে সমাজে যেতো। হৃদয়ে আলোক প্রবেশ করায় এক 'ভ্রাতার' সঙ্গে সে প্রণয় করেছে। এক্ষেত্রে divorce করাই উচিত। বিনোদকে কিন্তু একথা বলতে আর সাহস হলো না। বিনোদ পরে জানতে পেরে অনুযোগ করলে রামকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বলে, বরং এ বিয়েতে তারই profit বেশি। মৌখিক প্রেমোচ্ছ্বাসে বিনোদ আর অনুযোগ করার অবকাশ পায় না।

নির্দিষ্ট দিনে যদুবাবুর মেয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে রামকৃষ্ণের বিয়ে হলো। রামকৃষ্ণ মিথ্যে পরিচয়ে নিজেকে অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত বলে প্রচার করেছে। ঘটকও অর্থলোভে এই প্রচারে সহায়তা করেছে। কিন্তু ক্রমে যদুবাবু যখন জামাইয়ের অনাচার ইত্যাদি দেখলেন, তখন অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে তিরস্কার করলেন। সাহেবিপনা দেখায় দেখাক্, কিন্তু নিজের মা মারা গেলে যে অশৌচ পালন করে না, সে কি মানুষ! এর মধ্যে একদিন রামকৃষ্ণের শিক্ষিতা শালী রামকৃষ্ণের পিতা গ্রাম্য রামহরির লেখা একটা চিঠি চীৎকার করে পাঠ করে রামকৃষ্ণের আভিজাত্যের মুখোস খুলে দাম্ভিক রামকৃষ্ণকে অপ্রস্তুত করলেন। রামকৃষ্ণ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী বিনোদিনী বাধা দিতে যায়। শিক্ষিতা স্ত্রীকে পদাঘাত করে রামকৃষ্ণ পালিয়ে গেলো। বিনোদিনীর মনে অনুশোচনা এলো, আত্মহত্যা করতে গিয়েও মরতে পারলো না। শেষে নিরুদ্দিষ্ট হলো।

অনেকদিন পরে রুগ্ণ স্বামীর সঙ্গে নিরুদ্দিষ্টা বিনোদিনীর দেখা হয়। এতোদিন সে পথে পথে ভিক্ষা করে স্বামীর খোঁজ করেছে। স্বামীরও এদিকে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রতি অভিমানে বিকারের ঘোরে রামকৃষ্ণ বলে ওঠে,—"আমি বাবু-বৌ চাই না। বিনোদিনী বলে,—"আমি তোমার বাবু-বৌ নই, তোমার বৌ বাবু, আমি তোমার বৌ বাবু!"

কর্ম্মকর্ত্তা (১৮৮২ খৃঃ)—সুরেন্দ্রনাথ বসু॥ ভূমিকায় লেখক বলেছেন,—"আজিকালি বঙ্গদেশস্থ সকল বিভাগের বিশেষতঃ সহর অঞ্চলের অবস্থা অতি শোচনীয়। যাঁহার অতিকষ্টে শাকান্ন ভোজনেও দিনাতিপাত করা দুঃসাধ্য, সে ব্যক্তিও আপনকার দারিদ্র্য সংগোপন পূর্ব্বক অশেষ ঋণে আবদ্ধ হইয়া সকলের নিকট মাননীয় হইবার চেষ্টা করেন; অবশেষে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারস্থ সকলকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। জনসমাজকে এই ভ্রমান্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়াসই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

কাহিনী।—নবীনবাবুর দুই ছেলে, আহ্লাদ আর পেহ্লাদ। আহ্লাদ সর্বদা নিজের পজিশন রাখবার জন্যে ব্যস্ত অথচ বেকার। লোক লৌকিকতা করতে গিয়ে সে অকাতরে ধার করে অথচ কম খরচ করতে বললে তার সম্মানে আঘাত লাগে। কিছুদিন আগে সে ঠাকুরদার শ্রাদ্ধ করেছে। তাতে এখনো চার পাঁচশো টাকা ধার হয়েছে। সামনে মায়ের শ্রাদ্ধ।

অথচ বাক্সে মাত্র সাতটি টাকা! ঘোষবাবু অনুগ্রহ করে আহ্লাদকে একটা চাকরী করে দিলেন, কিন্তু আহ্লাদ বলে, "আমি ৯০ টাকা মাহিনার কাজ না পেলে করবো না।" আহ্লাদের স্ত্রী মল্লিকার দুঃখের অন্ত নেই। "রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত রেঁধে রেঁধে আমার ব্যারাম জন্মে গেল। ছেলেটা এটা ওটার জন্যে কাঁদে। কিন্তু দিতে পারি না।" মল্লিকা তাকে কম খরচে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে পরামর্শ দেয়। কিন্তু আহ্লাদ জবাব দেয়,—"পাঁচ, ছ'শ টাকায় ভাল করে শ্রাদ্ধ করতে হবে। কুটুম সাক্ষাৎ যে যেখানে আছে নিমন্ত্রণ করবো।" আহ্লাদ অবাস্তব আশা করে। সে বলে,—"নিমন্তন্যেরা একটা করে টাকা নৌকতা না দিয়ে থাকতে পারবে না। তাহলেই যে অনেক টাকা হল!"

আহ্লাদ নিমন্ত্রণের বিরাট ফদ করে ভাই পেহ্লাদকে দিয়ে তার বোন 'দিয়া'কে ডাকিয়ে আনে। আহ্লাদের ফদ দেখে দিয়া মন্তব্য করে,—"যার মাগ ছেলে ভাত কাপড় পায় না, সে আবার চন্দন ধেনু দিয়ে মায়ের শ্রাদ্ধ করবে! ঠাকুর্দ্দার শ্রাদ্ধে চার পাঁচশো টাকা ধার। সংসারের খরচের জন্যে বামুনদের গিন্নি চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা পাবেন। এখন এই সব দুর্বুদ্ধি করলে কি চলে?" এমন সময় পেহ্লাদ দিয়াকে বলে, ঠাকুর্দ্দার শ্রাদ্ধের টাকার দরুণ পদে-ময়রা সেদিন একখানা সমন দিয়েছিলো। আহ্লাদ একথা শুনে রেগে পেহ্লাদকে মারতে যায়। এমন সময় জীবন মধু মহেশ—এরা সবাই এসে পেহ্লাদকে বাঁচায়। জীবন বলে,—"তোর ভাইকে তুই মারবি আমাদের কি? কিন্তু বড়বাজার থেকে গদা মুদি একখানা সমন দিয়েছিল; ভাগ্যে ও ছিল তাইতে ত ও এসে সাবধান করে দিলে, তা না হলে এতদিন জেলের ভাত খেতে হতো।" আহ্লাদ জীবনকে অপমান করে। তারপর একটি বঁটি হাতে নিয়ে পেহ্লাদকে মারতে যায়। এমন সময় আহ্লাদের বাবা নবীনবাবু এসে পড়ে আহ্লাদকে থামালেন। আহ্লাদকে ধম্‌কিয়ে বলেন,— "বসে বসে খেয়ে গায়ে জোর হয়েছে।" আহ্লাদও নবীনবাবুকে শাসায়, তাঁকে নাকি সে খুন করবে। নবীনবাবু তখন তাকে পদাঘাত করলেন। আহ্লাদ তখন 'পুলিস' 'পুলিস' বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায়। গিয়ে উপস্থিত হয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে। সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে, তার বাবা তাকে মেরেছে। তার বিরুদ্ধে সে নালিশ করতে এসেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট জমাদারকে হুকুম দেন,—"সালাকো ত্রিশ বেট ডেকে নিকালো।" আহ্লাদ

বেত খেতে খেতে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। নালিশ করতে এসে মার খেতে হলো !

মার খেয়ে আহ্লাদ বাড়ী ফিরে এসে আবার শ্রাদ্ধের উদ্‌যোগে মাতে। চাকরকে নিয়ে আহ্লাদ মুদীখানায় যায় জিনিস আনবার জন্যে। কিন্তু মুদী তাকে ধারে জিনিস দেয় না। এদিকে নিমন্ত্রিতরাও সবাই জানতে পারেন যে আহ্লাদের টাকা নেই অথচ লৌকিকতার খুব ঘটা। নবীনবাবুর মতে আহ্লাদ চলতে চায় না বলে নবীনবাবু তাকে বাড়তি টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করেছেন। নিজের বাবুয়ানা জাহির করবার জন্যে আহ্লাদই ধার করে এসব করছে। অথচ তার রোজগার বিন্দুমাত্র নেই।

কতকগুলো যুবক আহ্লাদ সম্পর্কে একটা মজার খবর বলাবলি করে। কর্মকর্তার সেদিন ছিলো নিয়মভঙ্গ। এরা কয়েকজন তার সঙ্গে পুকুরে স্নান করে একটা কপি ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আসছিলো। কর্মকর্তা আহ্লাদ তাদের কাছে নিজের প্রতিপত্তি জাহিরের জন্যে বলে, এটা তার শালার বাগান। তাই বলে সে কয়েকটা কপি তুলে তাদের হাতে দিতে যায়। মালী কাছেই ছিলো। সে তাকে মারতে মারতে বাবুর কাছে ধরে নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য বাবুর সঙ্গে তার কোনো আত্মীয়তা নেই। সে শ্যালকের মতো ব্যবহার করে না ! হাসতে হাসতে যুবকরা মন্তব্য করে,—"ঢের ঢের লোক দেখেছি, এমন বিদ্‌ঘুটে কর্ম্মকর্ত্তা কখনো দেখিনি।"

পাওনাদাররা বারবার আহ্লাদের কাছে এসে ফিরে যায়। আহ্লাদ বাড়ী নেই ! একদিন হরে নামে এক পাওনাদার চটে গিয়ে বলে ওঠে— "কোনো দিনই কর্ম্মকর্ত্তা বাড়ী থাকে না ! আমরা কি ভিক্ষা করতে আসি !" আহ্লাদ তখন ভেতরেই ছিলো। মধু এসে আহ্লাদকে একথা বললে আহ্লাদ হরেকে মারবার জন্যে এগিয়ে যায়। দিয়া মন্তব্য করে,—"আবার হয়তো মার খেয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে আসবেন। অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু এমনটি দেখি নি।"

আহ্লাদের পথে বেরোবার উপায় নেই। পাওনাদাররা টাকা চায়, বাচ্চা ছেলের দল তাকে দেখলেই ছড়া কাটে। ভদ্রলোকেরা তাকে দেখে ঠাট্টা করে। গলায় দড়ি দিয়ে সে মরতে যায়। বলে,—"আর সহ্য হয় না। মায়ের জন্য ঘটা করে শ্রাদ্ধ করিলাম, নাম হবার জন্যে, তাহা তো হইল না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার মত দুর্ব্বুদ্ধি শত্রুরও না হয়।"

কিন্তু মরা তার হয় না। এক চাষী এসে তাকে বাঁচায়। চেঁচামেচিতে আরো অনেকে এসে পড়ে। সবাই কর্মকর্তাকে চিনতে পারে। তাকে গুঁতো মারতে মারতে ছড়া কেটে বলে—

"এস বাবা কর্ম্মকর্ত্তা কাঁধে ওঠ ধন
গোবিন্দ হেরিতে চল শ্রীঘর এখন
বাবা শ্রীঘর এখন।"

কর্মকর্তার তখন অপমানে মারা যাবার অবস্থা। সবাই আবার বলে,—

"হরি হরি বল সবে পালা হলো সায়।
কাঁধে চোড়ে কর্ম্ম-কর্ত্তা টাইটেল নিতে যায়।"

শেষ কালে কর্মকর্তাকে হাজতে দেওয়া হয়। পাওনাদাররা অনেকেই তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। যথাদিনে বিচার হয়। নবীনবাবু বলেন, "যখন ও নবাবী করে, তখন আমি কত বারণ করেছি, কিন্তু শোনে নি। একটু টিট্ হোক তারপর যা হয় হবে।" জজের কাছে পাওনাদাররা একে একে তাদের পাওনার কথা বলে যায়। জজ সাহেব আহ্লাদকে বলেন, তাকে তিনি একদিন সময় দিচ্ছেন, এর মধ্যে তাদের টাকা শোধ করে দিতে হবে, নতুবা জেল। আহ্লাদ খেদ করে বলে,—"জজ সাহেব, আমার ঋণ শোধ কে করবে? আমার মেয়াদই দিন। আমাকে দেখে সকলে শিখুক—আমার মত পেটে খেতে না পেয়ে, ধার করে নাম বার কর্ত্তে ইচ্ছা করে, তাহার পরিণাম লৌহ কারাবাস ব্যতীত আর কিছু হয় না।" নবীনবাবুর মনে শেষে দয়া হয়। তিনি ছেলের টাকা শোধ করে দিলেন। আহ্লাদ তখন নবীনবাবুর পা ধরে বলে,—"আমাকে ক্ষমা করুন। পিতা কতকষ্টে টাকা দিয়ে আমাদের সংসার চালাইতেছেন। আমি অজস্র ঋণে আবদ্ধ ছিলাম। আমার এই পিতা মহাশয় কত উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু শুনি নি, এখন আমার হৃদয় তাপানলে দগ্ধ হইতেছে।" সভ্যগণকে উদ্দেশ করে আহ্লাদ বলে,—

"যে দৃষ্টান্ত সভ্যগণ; হেরিলে নয়নে,
ভিক্ষামাত্র এই, যেন থাকে তা স্মরণে;
অভাগার হীন দশা স্মরি মনে মনে,
কর্ম্ম-কর্ত্তা নাম যেন ঘোচে আকিঞ্চন।"

(খ) হঠাৎ বাবুয়ানা॥—

রাজা বাহাদুর (কলিকাতা ১৮৯১ খৃঃ)—**অমৃতলাল বসু॥ বিত্তবান্**

গ্রাম্য সংস্কৃতিশূন্য ব্যক্তির নাগরিক জীবন ও বিলাসিতার প্রতি তীব্র আসক্তি মাত্রাতিরেকের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কাহিনী।—গাণিক্যধন বাঙ্গাল—মফঃস্বলের গেঁয়ো জমিদার। কলকাতায় এসে ধরাকে সরা দেখছে। "সহুরে তুখোড় লোক" কালাচাদ ভাবে, গাণিক্যের মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু পয়সা উপায় করবে। চাঁদার নাম করে পয়সা রোজগারের পথ বড়ো পুরোনো হয়ে গেছে। ওতে তেমন কিছু আসে না। "মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার, চুনোপুঁটিতে আর নেই। জমীদার খুড়োকে রাজা হবার জন্যে যে রকম নাচন নাচিয়েছি, আর এদিকে ফিশ্ সাহেব হাতে আছে, এবারে কিছু গুছিয়ে বস্ছিই বস্ছি।" স্ত্রীকে সে বলে,—"মফঃস্বল থেকে এক জমীদার আমদানী হয়েছে, তার সঙ্গে জুটে তাঁকে রাজা খেতাব দোয়াব বলেছি।... মফঃস্বলের দেড়কাঠা ভূঁই থাকলেই কল্কেতায় এসে অনেকে জমীদার হয়, এ সেই গোছ; দেখেছে বড় বড় জমীদারদের গবর্ণমেণ্ট মান্য করে খেতাব টেতাব দেন, এও তাই খেপেছে; "অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খল্সে বুড়ী বলে আমিও যাই।"

ব্লকম্যান্ ফিশ্ দুর্দশাগ্রস্ত সাহেব। সখ পুরোদস্তুর আছে, কিন্তু পয়সা নেই। একদিন রাস্তায় সাহেবের কাছ থেকে এক শুঁড়ি মদের দাম চাইতে গেলে শুঁড়ির পেটে সে লাথি মারে। পুলিশকে ডেকে শুঁড়ি সাড়া পায় না, বাধ্য হয়ে সরে পড়ে। এদিকে নেশায় বুঁদ হয়ে রাস্তায় ফিশ্ শুয়ে পড়ে বলে,—"Long live the corporation!" মিঞাজানের সঙ্গে কালাচাঁদ সাহেবকে খুঁজতে এসে এভাবে তাকে আবিষ্কার করে। "My Lord" বলে সম্বোধন করে বলে, তাকে জমিদারের কাছে যেতে হবে। সাহেব অপরূপ শয্যার মায়া ত্যাগ করতে চায় না। "I smell sweet savour sent up from the Municipal drain, and I feel soft things these fine dust and horse droppings," বাধ্য হয়ে কালাচাঁদ তাকে প্রাপ্তিযোগের ইঙ্গিত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। মিঞাজান বলে,—"দেখ্ছ বাবা, খাঁটী ইংরেজ বাচ্ছা, তাশের বুলি ঝাড়ছে, রূপিয়া রূপিয়া কচ্ছে।" ফিশ্ সাহেবকে কালাচাঁদ টানাটানি করে, তাকে লর্ড মরিংটন সাজাবে বলে। মরিংটন সেজে ফিশ্ সাহেব গাণিক্যধনকে সনন্দ দেবে।

এদিকে গাণিক্যধনের অবস্থা—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। কলকাতায় বৈঠকখানায় সে মোসাহেবদের সঙ্গে বসে নিজেকে রাজা ভাবছে; আর মনে

মনে আনন্দ পাচ্ছে। ভট্টাচার্য আসেন। তাঁকে বলে,—"বট্টাচার্য্য একবার পঞ্জিকা দেহেন তো, এ বৎসরের আমার ফলাফলটা কি!" "আজ্ঞে মহারাজের কোন্ রাশিতে জন্ম?—জিজ্ঞেস করে ভট্টাচার্য নিজের থেকেই বলেন,—গাণিক্যধন রায়, গাণিকা, গ—শ কুম্ভ।" পঞ্জিকা দেখে দেখে ভট্টাচার্য কুম্ভ-রাশির মাসিক ফলাফল বলে যান। গাণিক্যও খুঁজে খুঁজে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে ফল সত্যিই ফলেছে। পৌষ মাসে কুম্ভরাশির সম্মান—একথা ভট্টাচার্য গাণিক্যকে জানাতেই গাণিক্য লাফিয়ে উঠে বলে—"কি কি? কি কইলে কি কইলে?—সম্মান! দেহিতে দেহিতে গুরু সৈত্য, গুরু সৈত্য। আর কি খুলে লেখ্বে গাণিক্যধন রাজা হবা!—এই জৈন্য আমি পঞ্জিকা না ছ্যাহে কোন কর্ম্মই করি না।"

প্রায় বছর ছয়েক আগে মৃত জমিদারের দত্তক পুত্র গাণিক্যধন। জন্মদাতা পিতা মাণিক্যধন অত্যন্ত দীনভাবে জীবন যাপন করছিলেন। একদিন তিনি কিছু সাহায্যের আশায় কলকাতায় গাণিক্যের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিন্তু গাণিক্যের দুর্বিনীত কথাবার্তায় তিনি বিস্মিত হলেন। তবুও সেদিন রাত্রে আর কোথায় যাবেন, সেখানেই থেকে যেতে চাইলেন। গাণিক্য তখন বল্লো, "আমি অ্যাহন রাজা অইছি; আহানে কোলকত্তার কতো বড্ডর ব্যক্তি আমার সাথে আজ রাত্তে আহার করবান্, তুমি সেথা রইতে পাবা না!" মর্মাহত হয়ে মাণিক্যধন বলেন, "ক্যান্ রে, তোর বাপ কি অবদ্দর?" গাণিক্য জবাব দেয়,—"তোমার চেহারা অতি নোংরা, কোলকত্তার বদ্দর সমাজে চল্‌বা না।" মাণিক্য পুত্রকে নিন্দা করলে গাণিক্য বাপকে গালি দেয়,—"তুমি হালা লুম্বুন্দি বাই-বাত্তারির বাই" ইত্যাদি বলে। শেষে কালাচাদ এসে মাণিক্যধনকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

কালাচাদ গাণিক্যকে বলে, সনন্দ তার পেতে আর দেরী নেই। উৎফুল্ল হয়ে গাণিক্য সাজগোছ আরম্ভ করে, তে কোচ্চা ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী, 'রেশমি ওয়াস্ কোট্,' পায় তাবা।—তার ওপর চাপায় 'কালাপত্তুর কাম করা' ওড়না। কেননা শাল পরলে ভেতরকার এসব পোষাক তো আর দেখা যাবে না। গাণিক্য চলাফেরা করে আতর দেওয়া নেউলমুখো ছড়ি হাতে করে। গাণিক্যধনের সাঙ্গোপাঙ্গরা গাণিক্যের সঙ্গে বাজারে ঘোরাফেরা করে, এবং গাণিক্যকে তোষামোদ করে নিজেদের খুশি মতো জিনিস কেনে। গাণিক্যও বিনা দ্বিধায় খরচ করে।

গাণিক্য অনেকদিন গ্রাম ছাড়া। গাণিক্যের স্ত্রী এর মধ্যে একদিন অনেক মহিলা সঙ্গে করে এনে কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে এলেন। দৈবচক্রে তাঁরা মাণিকাধনের কাছেই গাণিক্যের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন। মাণিক্য গাণিক্যের পালক পিতা নন, তাই তাঁকে তাঁরা চিন্‌তে পারেন নি। গাণিক্যের ওপর প্রতিশোধ নেবার বাসনায় মাণিক্য পাঁচীবাইজীর বাড়ীতে ওদের নিয়ে চলেন। কারণ তিনি জানেন, ওখানে গাণিক্যের রোজ যাতায়াত আছে। পথে যেতে যেতে পুত্রবধূকে তিনি গাণিক্যের অধঃপতনের কথা বলেন। তিনি মনের ক্ষোভে বলেন,—"বাপেরে বাপ বল্‌তি সরম পায়, বাদীর বিটা রাজা হইবার লগে কোলকত্তায় আইছেন। কোম্পানীর ঘরে টাহা আমানত কল্লিই রাজপদ পায়, রাজা তো আহন সরকে গরাগরি খায়। হও হালা রাজা, চাদার খাতার তারায় তোমারে পিলুড়ি বানাইবে। ম্যাজাজ অইছে, হালার পুতির ম্যাজাজ অইছে, কোলকত্তায় বদ্দর ব্যক্তির সাথে পোরচয় অইছে।"...

পাঁচীবাইজীর বাড়ী গাণিক্য যাবার আগেই সেখানে সবাইকে শিখিয়ে রাখা হয় যেন তারা তাকে রাজার মতো ব্যবহার দেয়। তাছাড়া শাস্ত্রোক্ত কয়েকটা শুভ লক্ষণ ঘটাবার জন্যে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতি চলে। এমন কি আধো আধো কথা শুনলে রাজা হয়—প্রবাদ আছে, তাই গাণিক্য আসবার পর আধো আধো গলায় বাইজী চৌরঙ্গীর খেলনার জন্যে আব্দার করে। আসবার পর অনেকগুলো শুভলক্ষণ একে একে ঘটতে দেখে গাণিক্য আহ্লাদে একেবারে আটখানা! বাইজীর গলায় গাণিক্য তার মুক্তোর হার পরিয়ে দেয়। এমন সময় গাণিক্যের স্ত্রী দলবল নিয়ে এসে পড়েন। গাণিক্যকে এসব করতে দেখে ছুটে গিয়ে তার গলায় গঙ্গাস্নানের গামছা বেঁধে চেপে ধরেন। তারপর গালাগালি দিতে দিতে এবং টান্‌তে টান্‌তে তাকে দেশে নিয়ে চলেন।

বিলাসী যুবা (কলিকাতা ১৮৯৬ খৃঃ)—অঘোরনাথ বসু চৌধুরী॥ প্রহসনটির মধ্যে ঐতিহ্যবিহীন বাবুয়ানা অর্থাৎ হঠাৎ বাবুয়ানার বিরুদ্ধেই দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বাবু-বিলাসের মধ্যে লাম্পট্যদোষকেই প্রধানভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রদর্শনের সুবিধার জন্যে এটিকে আর্থিক বিভাগে উপস্থাপিত করা হলো। তাছাড়া ললাট-লিপিতে লেখক বলেছেন,—

"পাইয়া বিপুল ধন প্রমত্ত যে জন।
নিশ্চয় হইবে তার অচিরে পতন॥"

তবে পরবর্তীগোত্র "কাপ্তেনবাবু" বিভাগীয় প্রদর্শনীর সঙ্গেও প্রহসনটির সম্পর্ক নিকট।

কাহিনী।—যজ্ঞেশ্বরবাবু ঈশান নামে এক পোষ্যপুত্র রেখে মারা গেছেন। ঈশান ছিলো গরীবের ছেলে। এখন হঠাৎ বাবু হয়ে সে ধরাকে সরা দেখছে। ঈশানের মোসাহেব তথা কুকর্মের নিত্য সহচর হলো কামদেব ও ধনঞ্জয়। কামদেব সেয়ানা মোসাহেব নয়, ধনঞ্জয় তাকে তাই বোকা বলে। "যার ধনে আমোদ প্রমোদ করবে, প্রতিপালিত হবে, তার সঙ্গে সমান উত্তর করে, তার অপ্রিয় পাত্র হতে চেষ্টা করা কি বোকার কাজ নয়?···সংসারের সার বস্তু ধন, নির্ব্বোধ ধনীর প্রত্যেক কথায় গৌরব না করিলে তার মনস্তুষ্টি হবে কেন?" যজ্ঞেশ্বর প্রচুর ধন রেখে গেছেন। পোষ্যপুত্র ঈশান সব উড়িয়ে দিচ্ছে। ঈশানকে ধনঞ্জয় পালক বলায় কামদেব মন্তব্য করে—"আশ্রিত পালক কি কেবল চাটুকার পালনে সমুৎসুক?" ধনঞ্জয়দের একটা মেয়েমানুষ এনে রাখবার কথা ছিলো। এর জন্যে পাঁচশত টাকা খরচ করেছে। কামদেবের ভাষায়—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" "জীনিষ কেমন? এমন নধর গঠন গৌরবর্ণ, সুটানা নয়ন ভরা যৌবন সহজে মিলে?" ঈশান শুনে মন্তব্য করে,—"পাঁচশত টাকা—খুব শস্তা, এত অল্পে কেবল তোদের বুদ্ধি কৌশলেই হয়েচে নতুবা কাহারও বাপের সাধ্য নাই।" মোসাহেব দুজন দুই শত টাকা করে পুরস্কার পায়। মেয়েমানুষটি নাকি ধনঞ্জয়ের ঘরে মজুত আছে। এদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় একজন বৈষ্ণব ভিক্ষা চাইতে এসে অসম্মান ও অপবাদ নিয়ে চলে যায়। এদের মধ্যে এদিকে স্ত্রীস্বাধীনতা ও সমাজের উন্নতি নিয়ে আলোচনা চলে। আজ আবার বাবুর্চি আসেনি, তাই হোটেল থেকে সব কিছু খাবার আনাতে হবে।

ঈশানবাবুর বাড়ীর পূজারী ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর তার একজন নিঃস্ব প্রতিবেশী বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। গঙ্গাধর বলেন,—"দেবসেবায় এই বাড়ীতে প্রায় জীবনটা কেটে গেল। প্রাচীন হয়ে পড়েচি, আর কতদিন না বাঁচবো? কিন্তু আমাদের অন্ন আর হওয়া ভার। দেবসেবার বরাদ্দ টাকার এক আনা রকম আর খরচ হয় না। বাবু যেরূপ আচার ভ্রষ্ট হয়েচেন, এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।" বিশ্বেশ্বর মন্তব্য করেন,—'গরিবের ছেলের হাতে প্রচুর ধন পড়েচে, সহচরগুলো অতিশয়

দুশ্চরিত্র, ঘৃণিত কার্য্যেই অনুরাগ বেশী ; তাদের কুমন্ত্রণায় সকল কার্য্যই হচ্চে।"
তারপর ওঠে ঈশানের লাম্পট্যের কথা। গঙ্গাধর বলেন,—

"সবদোষ ঢাকা পড়ে ধন মহিমায়।
ঘুরিছে সংসারে লোক ধন লালসায়॥
গুণের গৌরব নাই, ধনের আদর।
অর্থহেতু সমাদৃত পাষণ্ড বর্ব্বর।"

বিশ্বেশ্বরও বলেন,—

"কুক্রিয়ায় রত সদা ধনীর সন্তান।
সম্পদে মত্ততা বাড়ে, অন্যে তুচ্ছ জ্ঞান॥
করিছে অবৈধ কার্য্যে কত ধনক্ষয়।
পরহিত তরে কভু কপর্দ্দক নয়॥"

তাছাড়া বাঈখেমটার নাচ, সাহেবী খানাপিনা চলে। অবশ্য এখনো যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী মহামায়া জীবিত আছেন, তাই দোল-দুর্গোৎসব একেবারে বন্ধ হয়নি। ঈশানের স্ত্রী অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে গঙ্গাধর বলেন,—"বানরের গলায় মুক্তাহার। আহা, কনক পদ্মিনী যেন প্রমত্ত-মাতঙ্গ চরণে বিদলিতা। বৌটীর কি অদ্ভুত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। পতির প্রেমসোহাগে একেবারেই বঞ্চিতা। পতিসন্দর্শনেও তাহার অধিকার নাই। বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবায় অহর্নিশি ব্যাপৃতা আছেন।"

এদিকে ঈশানের বাড়ীতে স্ত্রীমহলেও আলোচনা হয়। যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী মহামায়া তাঁর ভ্রাতৃজায়া হৈমবতীর সঙ্গে এসব নিয়ে কথা তোলেন। ঈশান তাঁদের কোনো খবর নেয় না। হৈমবতী মন্তব্য করেন, মহামায়া গত হলে তাঁদের এ বাড়ীতে বাস দুর্ঘট হয়ে দাঁড়াবে। তখন মহামায়া বলেন বৃন্দাবনে তাঁর একটা বাড়ী আছে—তাঁর নিজের নামেই। এখানে বিশেষ কিছু অসুবিধা হলে সকলে যেন সেখানে গিয়ে ওঠেন। নগদ যা আছে, তাতে এঁদের জীবদ্দশায় বেশ ভালোভাবেই কেটে যাবে।

এমন সময় পরিচারিকা জাহ্নবীর সঙ্গে ঈশানবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা আসে। সে মহামায়ার পূজার সমস্ত ব্যবস্থা করে তাঁকে ডাকতে এসেছে ; মহামায়া চলে যায়। এমন সময় জাহ্নবী মহামায়ার অসাক্ষাতে বাবুর স্বভাবচরিত্র নিয়ে ভয়ে ভয়ে বিরূপ মন্তব্য করে।

ওদিকে ঈশানবাবুর খিড়কীর বাগানে মোসাহেব ধনঞ্জয় স্ত্রী বেশে এসেছে।

সে বলে,—"একবার নিতান্ত বোকার মত সাতশো আটশো টাকা নষ্ট করেও কিছু হল না। আমাদেরও কোন দোষ দিতে পাল্লে না। মেয়েটা বড়ই চতুরা ও বুদ্ধিমতী। বাবুর দুরভিসন্ধির জন্য টাকাটা যেন দণ্ড করিয়া লইল এবং সুকৌশলে সতীত্বও বাঁচায়ে গেল। টাকা খরচ করিলে কত শত সুন্দরী বেশ্যা বাড়ীতে আসিতে পারে। পরের বৌঝির প্রতি কুদৃষ্টি কেন? টাকা পেলেই সকলে ভুলে থাকে! আবার এখন বাড়ীর চাকরানীর প্রতি নজর পড়েচে।" ধনঞ্জয় ভাবে, টাকা দিয়ে তাকে অবশ্য বশ করা কঠিন হবে না।

বাসন হাতে জাহ্নবী এসে ধনঞ্জয়কে বামুন ঠাকুরের ঝি বলে মনে করে। ধনঞ্জয় তার সঙ্গে ভাব জমায়—"তবু ভাল চিনতে পেরেচ"-বলে,। নানা কথাবার্তার শেষে ধনঞ্জয় তার রূপের প্রশংসা করে বলে,—"তোমার অদেষ্ট বড ভাল। বাবু তোমার জন্য পাগল হয়েচে।" কথাটা বুঝতে সরলা জাহ্নবীর একটু সময় লাগে। ধনঞ্জয় বলে,—"তুই যদি তার কথা রাখিস্, তবে আর খেটে খেতে হবে না। আর সোনা রূপার গহনা, ভাল কাপড়, নগদ টাকা যা চাবি তাই পাবি।" শেষে সব বুঝে জাহ্নবী বলে,—"মা লক্ষ্মী মাথায় থাক্। এমন কথা বল্‌তে আছে? বামুনের মেয়ের মুখে এসব কি কথা?"

বহির্বাটীতে ঈশানবাবু মোসাহেব কামদেবকে নিয়ে বসে আছে। ধনঞ্জয়ের নতুন প্রচেষ্টার কথা নিয়ে ঈশান ও কামদেব অট্টহাসি হেসে ওঠে। তবে ঈশানের খেদ—"বাড়ীর চাকরানীটাকেও বশীভূত কল্লে পাল্লেম না।" ভোলানাথের বোনের ব্যাপারেও তো কিছু করা গেলো না। নিজনে তাকে টাকা ধরে দেবার পর যেই-না আসল ব্যাপারে আসবে, সেইসময় ভোলানাথ এসে পড়ায় ঈশানকে পালিয়ে যেতে হয়। ঈশান অবশ্য মন্তব্য করে,—"সুচতুরা সুরসিকা রমণী পরম সোহাগের বস্তু।" তবে বোকা জাহ্নবীর বিষয়ে ঈশানের সান্ত্বনা ছিলো—"এ পথের পথিক হলে কেউ কি বোকা থাকে? তখন তার হাবভাব দেখ্‌লে মুনির মনও টল্‌বে।" নিজের স্ত্রীর প্রতি অনাসক্তির কারণ স্বরূপ ঈশান বলে—"আজকাল স্ত্রী স্বাধীনতা হয়ে মেয়েমানুষগুলোর চোক্‌মুখ ফুটেচে, কথা কহিতে শিখেচে, সাহস বেড়েচে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে সেসব কিছুই নাই। লজ্জাবতী লতার মত সর্বদাই সঙ্কুচিতা। আমি কি তা ভালবাসি?" কামদেব অবশ্য তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,—"আপনার সহবাসে দুই চারিদিন থাকতে পেলেই চোক্ মুখ্ ফুটবে। আপনি সহসা হতাশ হবেন না।" ঈশান বলে,—"Woe to me, her conduct is neither tolerable

nor corrigible. I am not at all satisfied with her." ইতিমধ্যে ধনঞ্জয় ফিরে আসে। তারপর আদিরসাত্মক গান-বাজনায় সময় কাটে।

অন্যদিকে অন্নপূর্ণার শয়নঘরে অন্নপূর্ণা ও জাহ্নবী কথাবার্তা বলে। স্বামীর কুসঙ্গের জন্যে ও অধোগতির জন্যে স্ত্রী অন্নপূর্ণা খেদ করে। কুসঙ্গীদের অনুসরণ করার কারণ বল্‌তে গিয়ে সে বলে,—"চরিত্র কলঙ্কিত হলে লজ্জা ভয় থাকে না।" পরিচারিকা জাহ্নবী অন্নপূর্ণাকে সান্ত্বনা দেয়। এমন সময় হৈমবতী প্রবেশ করেন এবং একটা নতুন ঘটনার সম্ভাবনার কথা ভেবে দুঃখ প্রকাশ করেন। অন্নপূর্ণা লজ্জায় মৃত্যু কামনা করে। জাহ্নবী কারণ জানতে চায় এবং বলে যে, সে খুব সুখেই আছে। হৈমবতী বলেন যে, রাত্রি ১টার পর বাবু জাহ্নবীর খোঁজে আসবেন। জাহ্নবী ভয় পায় এবং অন্নপূর্ণা জাহ্নবীর চরিত্রের প্রশংসা করেন। হৈম জাহ্নবীর জায়গায় অন্নপূর্ণাকে থাকতে উপদেশ দেন। তারপর রাত্রে যথারীতি নিঃশব্দে ঈশান আসে এবং কাব্যময় ভাষায় জাহ্নবী-রূপিনী অন্নপূর্ণাকে প্রেম-নিবেদন করে। অন্নপূর্ণা মনে মনে দুঃখিত হয়েও অত্যন্ত নম্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন চিন্‌তে পারার পর ঈশান অন্নপূর্ণাকে পদাঘাত করে চলে যায়।

ঈশানবাবুর ঠাকুর বাড়ীতে মহামায়া ও গঙ্গাধর এসব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। অন্নপূর্ণার জন্য মহামায়া দুঃখ প্রকাশ করেন। গঙ্গাধর তাকে কাশীবাসের পরামর্শ দেন। কিন্তু মহামায়া দেবসেবা ফেলে সেখানে যেতে চায় না। তাছাড়া অন্নপূর্ণা এদিকে কঠিন মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত কিন্তু ঈশানের সেদিকে দৃষ্টি নেই। "তার সেই দুটো কালপেঁচা সঙ্গার সহিত সর্বদা বলে যে, কুনো পেত্নীটা এইবার নিশ্চয়ই মরবে, আমিও নিষ্কণ্টক হবো।" উভয়েই ঈশানের আশু বিপজ্জনক পরিণতির কথা ভাবেন। "এখন বিজ্ঞলোকের হিতকথায় কেহ কি কর্ণপাত করে?" তারপর বর্তমানকালের গতিবিধি নিয়েই আলোচনা হয়। এমন সময় ঈশান আসে এবং দুজনকে গালাগালি করে। সে তারপর মহামায়ার কাছে দুই শত টাকা চায়—ধনঞ্জয়কে ও কামদেবকে দিতে হবে। বুড়ী দিতে রাজী না হওয়ায় ঈশান অন্নপূর্ণার গয়নাগাঁটি নিয়ে দেবার কথা বলে!

ওদিকে ঈশানবাবুর অন্তঃপুরে রোগশয্যায় অন্নপূর্ণা। কাছে বসে হৈমবতী। অন্নপূর্ণা বাঁচতে চায় না; সে ওষুধ খেতে নারাজ; মহামায়া আসে অন্নপূর্ণার

গুণের কথা তুলে প্রশংসা করেন। হৈমবতী তার ভাগ্যহীনতার দোষ দেন। হৈমবতী বলেন,—"আজকাল বৌঝিগুলো লজ্জাহীনা ও মুখরা এবং পুরুষগুলো লক্ষ্মীছাড়া ও কুক্রিয়াসক্ত হয়েচে।" এদিকে অন্নপূর্ণার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। জাহ্নবীর কাছে অন্নপূর্ণা স্বামীসন্দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। এইসময়ে গঙ্গাধরের সঙ্গে ঈশান আসে। সে বলে ওঠে,—"কিসের গোল? Timid creatures করে কি?" যাহোক কিছুক্ষণ পরে ঈশানের চরণ স্পর্শ করে অন্নপূর্ণা মৃত্যু বরণ করে।

একদিন ঈশানবাবুর বাগানে ধনঞ্জয় ও কামদেব আলাপ আলোচনার সময় বলে যে, স্ত্রী মারা যাওয়াতে বাবুর একটুও দুঃখ হয়নি। বাবুর তো এদিকে টাকা প্রায় নিঃশেষ। গাছের গোড়ায় একটুও রস নেই। বাজারে দুই এক লাখ টাকা দেনা এবং হয়তো এক মাসের মধ্যেই বাবুর যা কিছু সম্পত্তি সব বিক্রী হয়ে যাবে। ধনঞ্জয় বলে, যেটুকু রস আছে এবেলা শুষে নিয়ে তাদের সরে পড়াই উচিত। কামদেব বলে, স্ত্রীর অভিশাপেই ঈশানের এমন দুরবস্থা হয়েছে। ধনঞ্জয়কে অতিরিক্ত লোভ প্রকাশ করতে সে বারণ করে। ধনঞ্জয় তখন জবাব দেয়,—"আমি ইঁদুরের সাহায্যে বিড়াল শিকার কত্তে এসেছি।" সে কামদেবকে কাপুরুষ বলে উপহাস করে। এইসময় একজন বৈষ্ণব ভিক্ষা চাইতে এসে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়। ইতিমধ্যে হঠাৎ ঘরে আগুন ধরে যায় এবং মোসাহেব দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়।

একদিন দেখা যায়, বহির্বাটীতে একটা ভাঙ্গা ঘরে নিঃসঙ্গ ঈশান অসুস্থ। কাছে কেউই নেই। ধনঞ্জয় আর কামদেব মরে গেছে। এই সময় বিশ্বেশ্বর আসেন। ঈশান তার সঙ্গে উন্মাদের মতো ব্যবহার করে। সে স্বপ্ন দেখে,— যেন ভৈরবী সেজে অন্নপূর্ণা তাকে হত্যা করতে আসছে। পাগলের মতো সে প্রলাপ বক্‌তে বক্‌তে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়। গঙ্গাধর এসে তার চোখেমুখে জল দিয়ে জ্ঞান করাবার চেষ্টা করেন। এমন সময় ওয়ারেণ্ট, পেয়াদা আসে, কিন্তু ঈশানবাবুর এমন অবস্থা দেখে সে প্রস্থান করে। কিছুক্ষণ পরে ঈশানের জ্ঞানলাভ হয়। সে সামনে বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গাধরকে দেখে তাঁদের কাছে ক্ষমা চায়। তখন তাঁরা তাকে উপদেশ দান করেন।

"মজার কাণ্ড বিধির বিধান।
হাসি কান্নার বিষম তুফান।"

(গ) কাপ্তেন বাবু ॥—

ফটিকচাঁদ (কলিকাতা ১৮৯৮ খৃঃ)—চুণিলাল দেব ॥ কাপ্তেন এবং কাপ্তেন শিকারীদের গতিবিধিকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে মূলতঃ আর্থিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্য সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ গৌণ নয়; কেননা প্রস্তাবনায় বৈষ্ণবীদের যে গীতটি উপস্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব প্রকট। —

"পুজোর ব্যাপার চমৎকার,
লম্পট বেশ্যার মহাপর্ব্ব, মাতাল শুঁড়ীর রৈ রৈ কার ॥
(বাবুর) ঠাকুর দালান লম্বা টানা, বছর বছর মাকে আনা,
পুজোর বেলায় আনা আনা; সাহেব পুজোয় দেনাদার ॥
পেলিটিস্ বেকারী কেলনারস্ ব্রাণ্ডি সেরী
উইল্সনস্ কোর্ম্মাকারী সাহেব পুজোর উপাচার ॥
(আগে) ছিল দেব দ্বিজ সেবা (এখন) গৌরাঙ্গের পদ সেবা
(ওগো সে গৌরাঙ্গ নয়!)
পদ রজ নেয় না কেবা সটান যেতে ভব পার ॥
(আগে) বামুন পণ্ডিত পেত দান, (এখন) নেড়ে পিয়াদা বার্ষিক পান,
অরফ্যানেজে ডোনেশন, অতিথ সেবা বিষম ভার ॥
ভিখারীকে গলা ধাক্কা, গুরু পুরুতের বাপ উদ্ধার ॥"

সুতরাং কাণ্ডারীর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ, কিন্তু সামগ্রিক পরিচয় আর্থিক দৃষ্টিকোণের স্বাক্ষরই বহন করে।

কাহিনী।—ফটিকচাঁদের বাবা মারা যাবার আগে তাঁর বিরাট বিষয়ের সবটাই দেবত্তর আর ফ্যামিলি এ্যানিউটী ফণ্ডে রেখে গেলেন। এতে ফটিকচাঁদের কাপ্তানী করার বড়ো অসুবিধা হয়। ফটিক বিবাহিত, তার স্ত্রী হেমলতা আছে, টুনো মুনো নামে দুই ছেলেও আছে। ফটিকের মা টুনো মুনোর পড়াশোনার জন্যে একজন মাষ্টার রাখে। মাষ্টারটি অত্যন্ত তৈরী। সে টুনো মুনোকে ছেড়ে দিয়ে তার বাবাকে পড়াতে সুরু করলো—কাপ্তানীর পাঠ। ফটিক "Trustee শালাদের আক্কেল" দেখে অত্যন্ত চটে যায়। বেশী টাকা চাইতে গেলেই তারা হিসেব চায়।

একধরনের মহাজন থাকে, তারা দালাল লাগিয়ে কাপ্তান ধরে বেড়ায়।

এই সমস্ত শিকারগুলো ভাবী উত্তরাধিকারী অথচ কাপ্তানী করবার পয়সা পায় না। মহাজনরা এদের চড়া সুদে টাকা ধার দেয় এবং শিকারগুলো যেই-না উত্তরাধিকারী হয়, তখন সব টাকা সুদে আসলে আদায় করা হয়। দালালরা স্বাধীন। এক মহাজনের কাছে বাঁধা নয়। আবার এসব কারবারে কাপ্তানকে ব্যাগে আনা একজন দালালের কর্ম নয়। তাই এক জোট বেঁধে এদের কারবারে নামতে হয়। 'মাষ্টার' হচ্ছে সেই ধরনের এক দালাল। তার ইচ্ছে, ফটিকচাঁদকে কাপ্তানী শিখিয়ে এভাবে টাকা ধার করিয়ে দুপক্ষ থেকেই সে কিছু কিছু মারবে। মাষ্টার ফটিককে অভয় দিয়ে বলে,—"Will কারুর কখনও টেঁকি নি। ঠাকুরবাড়া, দত্তবাড়ী, রাজবাড়ী, ঘোষবাড়ী, মিত্তিরবাড়ীর বড় বড় will set aside হয়ে গেছে, উইলের ভিতর বেশি clause রেখেছে কি মরেছ। তোমাদের উইলে মেলাই clause, এ বড় টেঁকচেন না।" তারপর Loan এর কথা তোলে। বলে,—শুধু একটু কলমের আঁচড়। ফটিক এতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলে,—বাজার থেকে টাকা ধার করলে পাব্লিকের কাছে Expose হতে হবে। মাষ্টার বলে, এতে সম্মান নষ্ট হয় না। গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং টাকা ধার করেন কোম্পানীর কাগজ দিয়ে। তাছাড়া নানান ষ্টেটের ব্যাপারেও ডিবেঞ্চার তার প্রমাণ। এমন কি বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কও টাকা ধার করে। Loan এর ব্যবস্থা না হলে Merchant office-গুলো উঠে যেতো। মাষ্টার ফটিককে দশহাজার টাকা ধার করবার কথা বলে। ফটিক বলে, এতো টাকা কী হবে! মাষ্টার বুঝিয়ে বলে, আসমানীর কাছে গিয়ে গিয়ে অন্য খদ্দের দেখে ফিরে আসাতে ফটিকের Disgrace. আসমানীকে সে kept রাখুক, নিজের বৈঠকখানায় একটু সাহেবী ঢং আনুক। এ সবে টাকা কম লাগবে না। তাছাড়া হোটেলে ক্রেডিট্ অ্যাকাউণ্ট খুলতে হবে, এতে দশ হাজারের কমে চলে না। শেষে ফটিক রাজী হয়।

রেজিস্ট্রী অফিসের সামনে সেনজা দালাল মাষ্টারের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে। "কাপ্তেন সব ফোত, যদি মাষ্টার ঐ বেটাকে বাগিয়ে আন্‌তে পারে, টাকা ত তার বাপ মার থেকে প্রস্তুত, তাহলে এ বছরটা টালে টোলে সারতে পারি।" সেনজার অধীনে এক বাঙ্গাল দালাল একটা কাপ্তান ধরতে অসমর্থ হয়। কাপ্তানটির দাদা নাকি চাবুক নিয়ে বসে থাকে। সেন তাকে বলে, "ও তোমার বাঙ্গালের কম্ম নয়, এ কাজে সহিসের চাবুক,

দারোয়ানের নাগ্‌রা, মাথায় রেখে যেতে হয়, তবে কাজ হলে হতে পারে।"
সেনজা নিজের প্রশস্তি গেয়ে বলে,—"এই হাত দিয়ে হাজার হাজার কাপ্তেন বেরিয়ে গেল, যে বেটা আমার হাত দিয়ে টাকা না নিয়েচে, সে বেটা কাপ্তেনের মধ্যে ধর্ত্তব্যই নয়। ছত্রিশ হাজার কাপ্তেনের লিষ্টি আমার মুখে।"

মাষ্টার ফটিককে পাকড়াও করে নিয়ে আসে। সেনজা ইতিমধ্যে একজন উকীল আর একজন মাড়োয়ারীকে নিয়ে এসে দশহাজার টাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। ভজহরি একটা পত্রিকার নামকাটা সম্পাদক। পত্রিকায় কুৎসা গালাগালি করতে গিয়ে শেষে কোর্টের ভয়ে পত্রিকা তুলে দিয়ে এখন বেকার। মাষ্টার তাকে আশা দিয়ে ফটিকের ইয়ারী করতে বলে। ফটিককে মাষ্টার বুঝিয়ে বলে, সম্পাদক হাতে রাখা ভালো ; যার বাবুয়ানা কাগজেই বেরুলো না, তার আবার বাবুয়ানা কি! উকীলও জুটে যায় ফটিকের ইয়ারের দলে। ফটিকচাঁদের কাপ্তানী পুরোদমে চল্‌লো।

ফটিকের স্ত্রী হেমলতার কাছে বাড়ীতে আজকাল মেম আস্‌তে আরম্ভ করেছে। সে হেমলতাকে স্বামী স্ত্রীর পূর্ব চলিত সম্পর্ক এবং বিবাহ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে উপদেশ দেয়। হেমলতা তার সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশিয়ে কথা বলে। মেমটির অবশ্য রং কালো। কিন্তু ইংরেজী ছাড়া কথা বলে না, বাংলা বোঝে না বল্‌লেই হয়। হেমলতার বাড়ীতে দুর্গাপূজো হবে শুনে মেমসাহেব হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করে—জিনিসটা কি? পদী ঝি উপস্থিত ছিলো। সে আর স্থির থাক্‌তে পারলো না। মেমের পূর্ব-পরিচয় সে জান্‌তো। সে বলে ওঠে,—"তোমার বাবা নন্দা ঢুলি চুঁচড়োর শীলেদের বাড়ী পূজোয় বাজাত, শীলেদের পাতে খেয়ে, তোর সাত গুষ্টি মানুষ, এখন মেম হয়েছেন, দুর্গাপূজা জানেন না?" পদীর বাংলা কথা মেম এবার বুঝতে পারে এবং শুধু তাই নয়, একেবারে হাড়ে গিয়ে বেঁধে। সে ক্ষেপে ওঠে। উপায়ান্তর-বিহীন হেমলতা পদীকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু মেমসাহেব আর থাকে না; ডাইভোর্স তত্ত্ব রেখে সে পালায়।

যাহোক ফটিকের বাড়ীর আবহাওয়া তেমন নষ্ট হয় না। তবে ছেলে দুটো একটু বখাটে হয়ে গেছে। ফটিক কিছু বল্‌তে গেলে ফটিকের কুকীর্ত্তির প্রকাশ্য কৈফিয়ৎ চায়—"কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলে?" ফটিক মারধোর করলেও মনে মনে কেঁচো হয়ে যায়। ছেলে দুটি অল্পবয়সেই বেশ্যাবাড়ীর গান গায়। এসব দেখে ফটিকের কাছে মাষ্টার মন্তব্য করে,—"Rule of

three কষে দেখ দেখি, এই বয়েসে যদি এতদূর হয়, তোমার বয়সে কতদূর দাঁড়াবে?"

এদিকে যথারীতি ফটিক, মাষ্টার, উকীল, ভজহরি আর সেনজা দালাল অর্থাৎ নটবর সেন এসে আসমানীর বৈঠকখানায় জড়ো হয়। যথারীতি মদ্যপান চলে। অসমানীর মা এলে মাষ্টার তাকে তোষামোদ করে তার গান শোনে, মদ খাওয়ায়। ফটিক অবাক হয়, বুড়ী বেশ্যাকে এতো তোষামোদ কেন? মাষ্টার গোপনে বুঝিয়ে বলে, বেশ্যাশাস্ত্র সকলের জানা উচিত। বেশ্যাকে হাতে রাখ্‌তে গেলে তার মাকেই আগে হাতে রাখ্‌তে হয়। আসমানীর মাকে মাষ্টার বলে, ফটিক একজন উঁচুদরের বড়োলোক। পূজোর খরচ বাবদ আসমানীর মা টাকা চায়। দ্বিরুক্তি না করে ফটিক তা মিটিয়ে দেয়। আসমানীর মা সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়। এবার ইয়ারদের ফাঁপানোর কাজ সুরু হয়। ভজহরি বলে,—"My dear friend আমি ফটিকবাবুকে advice করি, British Indian Association-এর মেম্বর হন. Step by step Legislative Council-এ Enter কর্ত্তে পারবেন।" ফটিক বলে, "আমি যে ভাল ইংরেজী জানিনে।" ভজহরি বলে—"Never mind একটু ত কইতে পারেন, আমরা বড় বড় Subject লিখে দেবো, আপনি মুখস্থ করে গিয়ে ঝাড়বেন; তারপর News paper এ Publish হলেই আপনার নাম জগৎ ঘোষিত হবে?" মাষ্টার এবার উকীলবাবুর কথা তুলে বলে,—"উকিলবাবু বড় সামান্য লোক নন্ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ওঁর মুটোর ভেতর।" উকীলবাবু প্রস্তাব করেন, এবার পূজোয় দারজিলিংয়ে সবাই মিলে যাওয়া যাক—সেখানে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দেবেন। মাষ্টার বলে, আসমানীকে নিয়ে Lowis Jubilee Sanitariumএ থাকা যাবে। আসল কথা, বিনে পয়সায় অর্থাৎ ফটিকের খরচায় দারজিলিংয়ে স্ফূর্ত্তি করা হয়। যাহোক এটা হয় না, কারণ বাড়ীতে পূজো। এখানে তাকে থাকতেই হবে। শেষে ঠিক হয়, ফটিকের বাগান বাড়ীতে সব জাত মিলিয়ে একটা পূজা করা হবে। এতে একটা হুজুক হবে। ভজহরি বলে,—"হুজুক হলো mother seigels syrup, Patriot হতে গেলে হুজুগ চাই।" মাষ্টার ইয়ারদের সব কয়জনের অনুমোদন চায়। সকলেই অনুমোদন করে। বাঙ্গাল দালাল বলে,—"আজ ষষ্ঠী, বাগানে কল্লারম্ভ হক, সুন্দরীর মেলা লাগান, ঢ্যাশের স্যারা লোগ ভ্যাংগে পড়্‌গ, আর আপনকার নাম বেজে যাউক।" সকলে আসমানীর

গান শোনে আর বাঙ্গাল দালাল মেয়েমানুষ সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ে। শেষে সে অনেক মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলে বাগানের দিকে পা চালায় সবাই।

ইতিমধ্যে ভজহরির সঙ্গে মাষ্টারের গোপন কথাবার্তা হয়ে যায়। ভজহরি নিরাশ হচ্ছে, নিজেদের কিছু লাভ হচ্ছে না। মাষ্টার আশ্বাস দিয়ে বলে,—"My friend, বড়লোকের ধাত জান না, প্রায় সব শালাই হুইম্‌জিক্যাল্ অন্ প্রিন্সিপল্, এক কথায় তুষ্ট, এক কথায় রুষ্ট। কেউটে সাপকে বিশ্বাস আছে, তবু এ বেটাদের বিশ্বাস নেই, বেটারা বোকা ঠাউরো না, সব বোঝে, তবে যে কিছু বলেন না, যতক্ষণ হাতের ভেতর থাকেন। এ বেটাদের কাছে পয়সা বার করা অনেক বুদ্ধির খেলা, তাদের Weakness টুকু বুঝতে পেরেছ কি, অমনি মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা কর, তোমার পয়সা পাবার পথ খুলে যাবে।" তবে ভজহরি ভয় করে, যে কাজে হাত দিয়েছে, সেটা না করতে পারলে লোকেও ঠাট্টা করবে, উকীল ও ঠাট্টা করবে, কারণ এতে উকীলের খুব একটা সায় নেই। এতে সম্পাদকেরই দাঁওয়ের অবকাশ। উকীলের দাঁওয়ের অবকাশ ছিলো দারর্জিলিংয়ে। সে তো আর হোলো না। মাষ্টার আশ্বাস দেয়, লোকসানের ভয় নাই, বরং লাভই আছে। তবে এখন কাজ হচ্ছে কতকগুলো সাহেবটাহেব যোগাড় করা। কিন্তু পুজোর বাজারে আসল সাহেবরা সবাই দারজিলিংযে নয় সিমলে পাহাড়ে। মাষ্টার বলে,—"তোমায় ভাবতে হবে না, আমি একটা ঠিক করেছি, দালাল বেটাদের বলিছি, গোরা আর সেলার যোগাড করে আনিস্, কুলি রিক্রুটের মত হেড পিছু চার আনা করে পাবি। দেখো বাগান লালমূর্তিতে ছেয়ে যাবে।" ভজহরিকে সে Reporter ঠিক করতে বলে—"Extra paper ছাপাখানার খরচা দিতে রাজী আছি, ফটিকের পুজোর কথা খুব ভাল করে ছাপিয়ে দিও, তা হলেই হল।"

ফটিকের বাগানে সব জাতি এসে মিলেছে। ভজহরি পৌত্তলিকতার পক্ষে বক্তৃতা দেয়। বলে, নিরাকারবাদী কেউ হতে পারে না, কারণ নিরাকার পন্থীরাও অন্তরে ভগবানের আকার কল্পনা করে। দুর্গা পাপপুণ্যের প্রতিমূর্তি। বালককে জ্যামিতি বোঝাতে গেলে যেমন কাল্পনিক বিন্দুকে পয়েণ্ট এঁকে দেখাতে হয়, তেমনি তার একটা পূজা করতে হয়। আর উপচারের কথা

তুল্‌তে গেলে European-দের Church এ Harvest Festival-এর কথা তুলে দেখানো যায়, ওরা যখন করে, আমাদের করলে দোষ নেই।

অনেকে জমা হয়েছে, ইতিমধ্যে ফটিকচাঁদ আসমানীকে সঙ্গে নিয়ে মাতলামি করতে করতে ঢোকে। 'ভদ্দর লোকদের' সামনে কেলেঙ্কারি করতে মাষ্টার বারণ করে। এতে আসমানী রেগে যায়; ফটিকও আরো ক্ষিপ্ত হয়। ভজহরি বলে, এসব কারণে কাগজে ফটিকের বদ্‌নাম বেরোবে। ফটিক জবাব দেয়,—"চাঁদার খাতায় টাকা দিলেই, আবার সুনাম বেরুবে। মাতালকে মাতাল বল্‌বে, তাতে দুঃখ কি? আমি তোমাদের মত ভেতর বাইরে দুরকম রাখ্‌তে চাইনে, বাবা ভদ্রলোক কখন মাতলামোর ভেতর আসে? আসে তোমার আমার মত ভদ্দর লোক, মাষ্টারের মতন ভদ্দর লোক আর ঐ ওঁর (উকীলের) মতন ভদ্দর লোক?" উকীল বলে ওঠে—সে নিজেকে অপমানিত বোধ করছে। কিন্তু চলে গেলে লোকসানই। তাই সে বলে,—"আমরা তোমাকে as a friend excuse কচ্চি।" ফটিক মন্তব্য করে,—"তোমাদের—মান থাক্‌লে ত অপমান? যে বেটারা মদের কাঙাল, যে বেটারা বড় লোক না হয়ে বড়লোকের সঙ্গে মেশে, I hate them as I hate hell তাদের আবার অপমান কি? যদি পোষায় থাক, নইলে বাগান থেকে বেরিয়ে যাও।" উকীল এতে আরও রেগে গিয়ে কোর্টের ভয় দেখায়। মাষ্টার তখন উকীলকে ডেকে বোঝায়, বড়লোকের সঙ্গে থাকতে গেলে 'বনিয়ে সনিয়ে' থাকতে হয়। Raw হলে চলে না। ভজহরির স্বপন ভেঙে যায় বুঝি। বাঁচিয়ে দেয় বাঙ্গাল দালাল। সে বলে,—পুজোর সময় শত্রুর সঙ্গেও ভাব করতে হয়। মিছামিছি গোলমাল করে স্ফূর্তিটা নষ্ট করা অনুচিত। উকীল আর ভজহরি বলে,—"ঠিক বলেছ! ফটিকবাবু Forget and Forgive আমরা বুঝতে পারি নি।" ফটিকও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে,—"তোমাদের উপর কি রাগ কত্তে পারি, তোমরা হচ্চ Bosom friend."

আসমানীকে নিয়ে স্ফূর্তি চলে। মদ্যপানাদির মধ্যে দিয়েই বাগানের দুর্গাপূজা শেষ হয়।

কাপ্তেনবাবু (কলিকাতা ১৮৮৯ খৃঃ)—কালীচরণ মিত্র (কুমারটুলি)॥ নামকরণের মধ্যে দিয়েই লেখকের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কাপ্তানী বা বাবুয়ানা অর্থাৎ সমাজবিগর্হিত ব্যয়ের বিরুদ্ধে এখানে লেখকের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত।

কাহিনী।—জমিদার সারদাপ্রসাদ ঘোষের পুত্র নরেন্দ্র পুরোপুরি কাপ্তেনবাবু। মন্মথ দত্ত নরেন্দ্রের ইয়ার; তার সবকিছু কুকর্মের বনিয়াদ। নরেন্দ্র বিবাহিত, কিন্তু স্ত্রীকে ছেড়ে সে বেশ্যা মনোমোহিনীর অনুরক্ত।

শুঁড়ীপাড়ার রামকৃষ্ণ ভড় চতুর মহাজন। সে হ্যাণ্ডনোটে নরেন্দ্রকে অধিক সুদে টাকা ধার দিয়ে যায়। সে জানে নরেন্দ্র একসময় পিতার বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হবে। তখন সুদে আসলে সব আদায় হবে। এ ধরনের দুশ্চরিত্র ধনীপুত্র রামকৃষ্ণের বড়ো শিকার।

পিতা সারদাপ্রসাদ বন্ধু অমৃতলালের সঙ্গে পরামর্শ করে অবশেষে খানসামা শিবনাথকে দিয়ে চিঠি পাঠান রামকৃষ্ণের কাছে। লিখে পাঠান—টাকা ধার দেওয়া বন্ধ না করলে টাকা সে পাবেনা, বিষয় বৌয়ের নামে লিখে দেওয়া হবে। রামকৃষ্ণ তাতে কর্ণপাত না করে খানসামাকে অপমান করে ফিরিয়ে দেয়।

এদিকে অশিক্ষিতা মনোমোহিনীকে শিক্ষিতা করবার ইচ্ছে জাগে নরেন্দ্রের। সে নিজে ফার্ষ্ট ইয়ার পর্যন্ত পড়েছে, কিন্তু মনোমোহিনীকে সে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত পড়াবে। কলেজে ভর্তি করাবার কথায় ইয়ার মন্মথ বলে, তার চাইতে বাড়ীতে মেম আনিয়ে পড়ানো ভালো। বেথুন কলেজ থেকে পাশ করা "বাঙ্গালী মেম" প্রমদা সরকারকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা হয়। দুই শত পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা পড়াবে। হ্যাণ্ডনোটে সই করে মন্মথকে দিয়ে নরেন্দ্র রামকৃষ্ণের কাছ থেকে দুই শত পঞ্চাশ টাকা ধার করে। মহাজন ভাবে, কিছুদিন দেখে নালিশ করবে। এদিকে প্রমদার কাছে মনোমোহিনী নিয়মিত ইংরেজী ট্রানশ্লেসন করে। ইংরেজী কথা জিজ্ঞাসা করলে সঙ্গে সঙ্গে তার মানে বলে। প্রমদা মনোমোহিনীর sharp memory র প্রশংসা করে। মন্মথ বলে, চার বছরে নয়, ছ-মাসেই Fourth year এর বিদ্যে আঁচলে বাঁধবে।

সারদা গিন্নির সঙ্গে পরামর্শ করেন। বলেন, প্রিয়নাথ দত্তের ছেলে মন্মথই নরেন্দ্রকে নষ্ট করেছে। গিন্নি বলেন, "তার চোদ্দ পুরুষ পরের সর্বনাশ করে আসছে তা সেই বা কেন না করবে?" নরেন্দ্র নাকি বলেছে, সম্পত্তি পেলেই মনোমোহিনীর নামে লিখে দেবে, তাই সারদা স্থির করেন নরেন্দ্রের বৌয়ের নামেই সবকিছু লিখে দেবেন।

একদিন বৈঠকখানায় সারদাপ্রসাদ, বৈবাহিক শরৎবাবু, বন্ধু অমৃতলাল

ইত্যাদি উপস্থিত আছেন। শরৎবাবু বলেন,—"এখন রক্ত গরম বয়েস হলে আপনিই বুঝবে।" একসময়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠানো হয়। নরেন্দ্র এসে বলে,—"আমি ঢের ঢের Father দেখেছি, তোমার মত এ রকম stupid Father দেখি নাই। যা বল্‌বার তা মুখেই বল, মাথায় হাতটাত্ দিও না বল্‌চি, আমার টেরি খারাপ হয়ে যাবে। এবার First time বলে Excuse করলুম।" অমৃতলাল ভাবেন,—"এখনকার পাসকরা নয় তো ছেলের মাথা খাওয়া।" শরৎবাবুকে কিছু বলতে বারণ করেন অমৃতলাল। সে হয়তো শ্বশুর বলে খাতির করবে না—মেরেই বসবে। নরেন্দ্র বলে,—"আমি এরকম Rusticদের সঙ্গে কথা কহিতে চাহি না। যে সব লোক Etiquette জানে না, যাদের Discipline দোরস্ত নয়, তাহারা আমার সঙ্গে কথা কহিবারও যোগ্য নয়।" সারদা বলেন, এখন Rustic বল্‌ছ, পরে পয়সার জন্যে কাঁদতে হবে। অমৃতলাল নরেন্দ্রকে তার "বাঁজারে পেত্‌নি" ছাড়তে বল্‌লে নরেন্দ্র জ্বলে ওঠে। বলে," Who are you ? You don't know how to speak with an educated young fellow." মা অন্তরাল থেকে কিছু বল্‌তে গিয়ে ধমক খান। "Go away you sorceress। Wizard দের সঙ্গে বাক্যব্যয় করতে ইচ্ছা করে না।"

তারপর বছর দুয়েক কেটে গেছে। একদিন মহাজন রামকৃষ্ণ মন্মথর কাছে টাকাশোধের কথা তুল্‌লে, মন্মথ বলে, সারদাবাবু নরেন্দ্রের স্ত্রীর নামে বিষয় আশয় লিখে দিয়েছেন। মহাজন বলে, আগামী মঙ্গলবারে শমন বেরোবে। এর মধ্যে নরেন্দ্র টাকা শোধ না দিলে জেল খেটে টাকা শোধ দিতে হবে। মহাজন মন্মথকে অবশ্য আশ্বাস দেয়, সে যদি মহাজনের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার কোনো অনিষ্ট করবে না। মন্মথ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়। তারপর রামকৃষ্ণ আরও কয়েকজন মিথ্যা সাক্ষী জোটাবার চেষ্টা করে। বলে, একা মন্মথকে বিশ্বাস নেই। যে এক কথায় বন্ধুর সর্বনাশ করে, সে যে কোন মুহূর্তে তারও সর্বনাশ করতে সমর্থ।

নরেন্দ্র মনোমোহিনীর কাছে বসে গান শুনছে, এমন সময় মন্মথ এসে খবর দেয়, মহাজন নরেন্দ্রের নামে নালিশ করেছে। হয় নরেন্দ্র টাকা শোধ দিক, নতুবা জেল খাটুক। নরেন্দ্র চোখে অন্ধকার দেখে। অর্থপ্রাপ্তির আর আশা নেই দেখে মনোমোহিনী সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেয়। তার কথায় প্রমদাও বিদায় নেয়। মহাজনের জোচ্চুরি নরেন্দ্র বুঝতে পারে। বুঝতে

পারে বাবার অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। শমন হাতে করে নরেন্দ্র আক্ষেপ করে।

জজ কোর্টে বিচার হয়। আসামীপক্ষের উকীল বলেন, নাবালককে টাকা ধার দিলে আইনে সবটাকাই Cancel হতে পারে। মন্মথ সাক্ষ্য দেয় নরেন্দ্র সাবালক অবস্থাতেই টাকা ধার নিয়েছে। সারদাবাবু পুরোহিতকে আনিয়ে ঠিঁকুজি কুষ্ঠী দিয়ে প্রমাণ করালেন যে নরেন্দ্রের বয়স বর্তমানে ১৮।১৯ তাছাড়া তিনি রামকৃষ্ণকে আগের থেকেই চিঠি দিয়ে যে সাবধান করেছিলেন, সে কথা জানালেন। এ ব্যাপারে শিবনাথ সাক্ষ্য দেয়। পুরোহিত আরও বলেন, মন্মথর মাধ্যমে হ্যাণ্ডনোটে যে দুই শত পঞ্চাশ টাকা ধার করা হয়, তার দুশো টাকা দিয়ে বাদবাকী টাকা মন্মথ আত্মসাৎ করেছে। নরেন্দ্রও সে দুই শত টাকাই পেয়েছে।

বিচার শেষ হয়। রামকৃষ্ণের সব টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। মিথ্যা হলফ এবং টাকা আত্মসাতের জন্যে মন্মথর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা এবং তিনমাস জেলের ব্যবস্থা হয়। মহাজন ভাবে,—"বাবা হদ্দ নাকাল, হাড়ির হাল। কেন জেনে শুনে ডান হাতে গু খেয়েছিলুম। অধর্ম্মের পথে গেলে কখনই জয়লাভ হয় না।"

নরেন্দ্র পিতাদের কাছে ফিরে গিয়ে বারবার ক্ষমা চায়, অনুশোচনা করে। স্ত্রীর কাছে গিয়েও সে ক্ষমা ভিক্ষা করে। তারপর বলে,—"যদি কেহ জ্ঞান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা আমাতেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন।"

চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী (১৮৭২ খৃঃ)—দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়॥ টাইটেল পেজে প্রহসনকার দুটি উদ্ধৃতি টেনেছেন।—

"চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্র পতিতা কৃষিঃ।
না শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে॥"

এবং,—"Preach gospel unto a devil, he will not hear you."

রানী স্বর্ণময়ীকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে গিয়ে প্রহসনকার বলছেন,—"বস্তুতঃ উদ্যান নির্ম্মাণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উদ্ভূত কণ্টকচ্ছেদ তৎপরে তৎপুনঃ সম্ভাবনা নিরাকৃত করিয়া পরিশেষে শোভন বৃক্ষ রোপন করাই উদ্যান পালের কার্য্য। আমি পোষ্যপুত্রগ্রহণের নির্ব্বুদ্ধিতার ও অধুনাতন জনগণের যথেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি।"

কাহিনী।—জমিদার জগচ্চন্দ্র পুত্রহীন। দুইটি মেয়েরই অবশ্য বিয়ে দিয়েছেন—দুই জামাই আছে। জগচ্চন্দ্র তাদের বিষয় আশয় দিতে চান না। মেয়েদের পুত্রসম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—তা সত্ত্বেও তিনি বিষয় ওদের দিতে চান না। অবশেষে তিনি স্থির করেন, একটা পোষ্যপুত্র নেবেন। জগচ্চন্দ্রের মামা প্রিয়নাথ বারণ করেন। পোষ্যপুত্র কে কবে পিতাপিতামহের নাম রেখেছে। চোরবাগানের মল্লিক কিংবা শোভাবাজারের রাজা—ত একটি উদাহরণ মাত্র। "যদি একজনের বাপ কতকগুলি বিষয় রেখে মরে যায়, আর তার ছেলে যদি ছোট হয়, তাহলে পাঁচ বেটা বওয়াটে এসে সেই ছেলেটীর মোসায়েব হয়ে গাঁজা, গুলি, চরস, চণ্ড ও মদ খাইয়ে অবশেষে পথের ভিখারি করে।" প্রিয়নাথ জগচ্চন্দ্রের কথায় সায় দিয়ে বলেন, শুধু পেনেটিতে নয় সব জায়গাতেই এমন ব্যাপার হচ্ছে। সবই বোঝেন জগচ্চন্দ্র, কিন্তু জামাইদের তিনি বিষয় কিছুতেই দেবেন না। তাই বাধ্য হয়ে পোষ্যপুত্র নেওয়াই সিদ্ধান্ত করলেন।

জ্ঞানদার স্বামী ভূপেন, প্রমদার স্বামী পরেশ। ভূপেন সচ্চরিত্র, কিন্তু পরেশ চরিত্রহীন ও বিষয়লোভী। ভূপেনকে দলে টানতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়; তবে শ্বশুর সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু পরেশ আশা হারায় না। ভাবে,—"সে যা হক কর্তা পোষ্যপুত্র নিলে হয়, তাহলে শালাকে দুদিনে তয়ের করে তুলব, আগে তামাক খাইয়ে, তারপরে লালজল পেটে ঢুকিয়ে এখনকার মত young Bengal করে ছেড়ে দেব, তারপরে চরে খাবে, আমাকেও আর পয়সা দে মামার বাড়ী যেতে হবে না, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গবো।" স্বামীর সম্বন্ধে প্রমদার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। একদিন সে জ্ঞানদাকে দুঃখ করে বলে,—"দেখ আমার স্বামী কলকেতায় গিয়ে মদ খেতে শিখেচেন; নূতনবাবু হয়েচেন, বাবার বিষয় দেখে ধরা সরা প্রায় জ্ঞান কচ্চেন, আমি কোন কথা বল্লে, তিনি বলেন আজকাল মদ খাওয়ায় সভ্যতার চিহ্ন, ইংরাজদের সঙ্গে সমান হওয়া।" জ্ঞানদা বলে,—"আমার যদি এমন স্বামী হতো, আমি তাকে দুদিনে সোজা করতুম।" কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে, "ওরা গরীবের ছেলে, আমরা জমিদারের মেয়ে, আমাদের বিয়ে করেছে বলে কি চোর দায়ে ধরা পড়িচি নাকি।" প্রমদা "পতি পরম গুরু" বলে নীতি উপদেশ দিতে গেলে জ্ঞানদা বলে ওঠে—"তুমি কি কেশব সেন হলে নাকি!"

জগচ্চন্দ্রও যে অবশ্য খুব সচ্চরিত্র—এমন বলা চলে না। কামিনী বেশ্যার

বাড়ীতে তিনি জানকীর সঙ্গে লুকিয়ে মাঝে মাঝে যান এবং সেখানে মদ্যপান করেন। "ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না, তাই আজকাল শিখিচি।" কামিনী ইংরেজী জানে না। জানকী বলে, ইংরেজদের সঙ্গে থাকলে কামিনী ইংরেজী শিখ্‌তে পারতো। কামিনী বলে,—"আমার ইংরেজ তোমরা, তোমাদের ইংরেজ হবার তো বাকি নেই!" আলাপের পর মদ্যপানের পালা। নটা বাজলে 'মামার বাড়ী'র দরজা বন্ধ। মদ মিল্‌বে না। জানকীকে সে কথা জগচ্চন্দ্র জানালে জানকী বলেন, Private door দিয়ে তিনি আনাবেন; নতুবা তিনি নিজে ডাক্তার, ডাক্তারখানা থেকে 'প্রেস্‌ক্রাইব্‌' করে আনাবেন। পুলিসের ভয় জানকী করেন না! "তাদের সঙ্গে মাসকাবারি বরাদ্দ আছে, মাঝে কিছু কিছু করে পায়, তাতে পুলিসের গুণের ঘাট নেই।" লালা Lemonade আর বরফ আন্‌তে যাবার সময় জগচ্চন্দ্র তাকে যুঁই ফুলের গোড়ে আন্‌তে বলেন। কামিনী বলে, সে ভিক্টোরিয়া গোড়ে পছন্দ করে। গোড়ের মালা এলে জগচ্চন্দ্র জানকী ও কামিনীকে দুটো মালা পরান, তারপর নিজে একটা পরেন। শেষে বলে ওঠেন,—"এখন ঠিক যেমন আমরা খড়দার গোঁসাই হলুম, আর এই কামিনী ঠিক যেন সোনার বেনেদের মেয়ে, আমরা যেন মন্তর দিতে এসেছি।" কামিনীর নৃত্য ইত্যাদি উপভোগ করবার পর রাত্রি চারটের তোপ দাগ্‌বার আগেই তাঁরা বাড়ী রওনা হন।

'শিবের বাবা' বুঝতে না পারলেও জগচ্চন্দ্রের স্ত্রী হৈমবতী অনেকটা আঁচ করেন। জগচ্চন্দ্র আজকাল তাঁর দিকে ঘেষতে চান না, বাইরের কেউ হয়তো তাঁকে 'গুণ' করেছে। ঝি হৈমবতীর কাছ থেকে প্রচুর অর্থদোহন করে তাঁর কথামতো বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহ করে দেয়। হৈমবতী জগচ্চন্দ্রকে তা খাইয়ে মেরে ফেলবার উপক্রম করেন। ভাগ্যগতিকে জগচ্চন্দ্র বেচে যান।

একদিন ঘটা করে জগচ্চন্দ্র শরচ্চন্দ্রকে পোষ্যপুত্র নেন। নবদ্বীপ, কাশী ইত্যাদি জায়গা থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে আনেন। শরৎচন্দ্র জগচ্চন্দ্রের দশরাত্রের জ্ঞাতি। পুত্র-সম্পর্ক-বিরুদ্ধ-সম্পর্ক এবং পিণ্ড তর্পণে বাধে, —এই যুক্তিতে তর্কালঙ্কার বলেন এই পোষ্যপুত্র নামঞ্জুর। অবশেষে সবাইকে পাঁচ টাকা করে ধরে দেওয়া হলে স্বয়ং তর্কালঙ্কারই বলেন, "এ বিষয়ে কোন দোষ নাই, মনু ভবভূতি প্রভৃতি বড় বড় গ্রন্থকারেরা মত দিয়েচেন। দত্তকে প্রতিগৃহীতে ঔরসশ্চেদুৎপদ্যেত তদা চতুর্থ ভাগ ভাগীস্যাৎ দত্তকঃ।" কাশীর

পণ্ডিত ছিলেন প্রকৃত পণ্ডিত। তিনি প্রতিবাদ করতে গেলে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে যায়। এই ভাবে অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয়।

জানকী জগচ্চন্দ্রের ইয়ার, পরেশেরও ইয়ার। জানকী আর পরেশ পরামর্শ করে শরচ্চন্দ্রকে দলে টানেন। "শালাকে দুদিনে তোয়ের করে তুলি, তাহলে ত্রিশদিন ছেড়ে দিনরাত্রই শনিবার করবো!" শনিবারের ওপর পরেশের খুব লোভ। "আজ শনিবার প্রাণটা উড়উড় কচ্চে, মজাটজা করতে হবে। এমন মধুবাবটা যে বুকের উপর দে কেটে যাবে, সেটা প্রাণে সইবে না।" শরচ্চন্দ্র আধুনিক। কথায় হার মানে না। সে বলে, মদ "civilization এর চিহ্ন, যারা Enlightened হয়েচে, তারাই ওর taste বুঝতে পেরেচে।·· আজকাল Enlightened না হলে লোকে গায়ে থুতু দেবে যে।" কিন্তু মদ এলে শরৎ একটু উস্‌খুস্ করে। কোনোদিন সে খায় নি, খাওয়া উচিত কিনা—এই নিয়ে দোটানায় পড়ে। পরেশ বলে, "আকাশ পানে মুখ করে ঢক্ করে খেয়ে ফেল, খেয়ে বাঁ পাশ ফিরে শোও। বড় মিষ্টি—এতে আর দোষ কি?" শরৎ তখন মদ্যপান করে। জানকী মত্ত অবস্থায় দেশের উন্নতি নিয়ে আলোচনা করেন! জনসাধারণের আলস্য, ক্যাম্বেলের শিক্ষাব্যবস্থা সবকিছু নিয়েই জানকী আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে মদ্যপানের সভায় ব্রাহ্ম বক্কেশ্বর আসে। কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে সে বলে,—"তুমি বোঝ না, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রোজ কত্তে গেলে চল্‌বে কেন? রবিবার যে দিন আকড্ডায় যেতে, সেইদিন সন্ধের পর চোক্ বুজিয়ে বস্‌তে পারলেই ব্রাহ্ম হলো। তারপর এক সপ্তাহ time পাওয়া গেল, তারির ভেতর মদই খাও, বেশ্যালয়েই যাও, আর খানায় পড, তাতে আর দোষ কি?" পদস্থ ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে বক্কেশ্বর বলে,—"পর নিন্দেয় অধোগতি, তা আমি বল্‌ব না। বুঝেই নেও না কেন? আমি তার নমুনা।"

মদ্যপান শেস করে শরচ্চন্দ্র বাইরে বেরোতে গিয়ে খানায় পড়ে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হৃষিকেশ মদ্যপানের সভায় এসে উপদেশ দিতে এসে চড় খেয়ে পালান। এই হৃষিকেশেরও কি কম বাতিক? তিনি স্ত্রীকে জোর করে সমাজে ধরে নিয়ে যান। আপত্তি করলে বলেন—"দূর খেপি—সভ্য হবি যে, রাস্তায় ঘাটে না বেরুলে হবে কেন?" স্ত্রী জগৎমোহিনী মাঝে মাঝে দুঃখ করেন,—কর্ত্তা নাকি তাঁকে বলেন—"তুমি মাচ খেয়ো না, থান ধুতি পর।" "আবার কিনা রাত্রে বিচানায় চস্‌মা চোখে দিয়ে সোবেন।······বিধাতা যেন কি এক অবতার

গোড়েচেন। তবে আমার অদৃষ্ট, ক্রমে রামছাগলের মত দাড়ি রাখেন না, কিন্তু ওঁদের দলবলের আছে।"

শরচ্চন্দ্র এখন পুরোপুরি 'ভোয়ের'। পরেশেরও আর বিষয় বঞ্চনার খেদ নেই। স্ফূর্তি সব কিছুই হচ্ছে। এর মধ্যে একদিন জগচ্চন্দ্রের আয়ু ফুরিয়ে আসে। মৃত্যুশয্যায় শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে মানসিক যন্ত্রণাও তাঁকে আকুল করে তোলে। "আমি পূর্ব্বেই জানতাম যে পোষ্যপুত্র কখন ভাল হয় না, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যে, দিন কতক বেঁচে উহাকে লেখাপড়া শিখাইয়ে বিষয়গুলি বুঝিয়ে পড়িয়ে দেব, আমার সে আশা বিফল হলো।" সকলের সব কুকর্মের ইয়ার জানকীও মন্তব্য করেন, "গরিবের ছেলে—যার বাপ পরের বাড়ীতে বেঁচে দিন গুজরান করত তার ছেলে কিছু বিষয় পেলে যেন সাপের পাচ পা কিম্বা ডম্বুরের ফুল দেখে।"

অবাক কাণ্ড বা জ্যান্ত বাপের পিণ্ডদান (১৮৯৩ খৃঃ)—বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ললাটে গ্রন্থকার শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্‌গরের দুইটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন—"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" এবং "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ইত্যাদি। উৎসর্গে তিনি প্রহসনটিকে "সত্যঘটনামূলক" বলে অভিহিত করেছেন। "এই ক্ষুদ্র সত্যঘটনামূলক প্রহসনখানি কেবলমাত্র সাধারণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া প্রচারিত হইল।"

কাহিনী।—দুই বন্ধু—ঈশান আর মাধব। দুজনেই ছাত্র। মাধব কলকাতার স্থানীয় বাসিন্দা। ঈশান পাড়াগেঁয়ে এক জমিদারের ছেলে। ঈশানের বাবা কৈলাস গ্রামের সম্পত্তি বেনামীতে লিখিয়ে কর্মচারীদের ওপর কাজের ভার দিয়ে কিছু মূলধন নিয়ে কলকাতায় কারবার খুলেছেন। ঈশান কলকাতাতেই ইস্কুলে পড়ে।

'ভেকেসনের ছুটি' পড়ে গেছে। মাধব ঈশানকে বলে, পশ্চিমে বেড়াবার ভান করে কমলমণিকে নিয়ে শহরতলীর এক নির্জন জায়গায় কিছুদিন আমোদপ্রমোদ করলে মন্দ হয় না! কমলমণি বেশ্যা। তারা তিনজন শুধু যাবে। ঈশান ভাবে, দেশে গিয়ে পাটবেচা নগদ টাকা কিছু না সরালে নয়, আবার এ প্রস্তাবও মন্দ নয়। কৈলাসকে ঈশান তার মনোবাসনা জানাতেই তিনি জ্বলে ওঠেন। বলেন, "দুপাত ইংরাজী পড়ে ভারি ভিরকুটী হয়েছে পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে যাবেন।...ব্যাটাকে জুতোর চোটে

দেশে পাঠাবো, সেখানকার ধান ভাঙ্গা চেলের ভাত আর পচাপুকুরের জলে সব সিধে হয়ে যাবে।"

কৈলাস ভাবেন, গ্রামে তিনি ভালোই ছিলেন। অর্থলোভে তিনি কলকাতায় এলেন। প্রতারণা ও ছলচাতুরী করে অর্থবৃদ্ধি করেছেন। ছেলেকে স্কুলে দিয়েছেন এই আশায় যে ছেলে একটু লেখাপড়া শিখ্লে তাকে দিয়ে বিলিতি ফাণ্ডে কিছু দান করিয়ে রাজাবাহাদুর খেতাব আনিয়ে রাজার বাপ হয়ে সদর্পে দেশে বাস করবেন। কিন্তু ছেলে হলো তার বিপরীত।

ঈশান তৈরি ছেলে। বাবা আড়ালে গেলে সে এক চাবিওয়ালার সাহায্যে বাবার ক্যাশ বাক্স খুলে নোটের তাড়াগুলো বার করে নিয়ে চলে যায়? একটা চিঠিও দিয়ে যায়। কৈলাস এসে মাথায় হাত দেন। অবশেষে চিঠিটা পড়েন। চিঠিতে সে লিখেছে যে ভৃত্যদের সামনে পিতা তাকে অপমান করায় তাদের কাছে সে আর মুখ দেখাতে পারবে না। তাই বাধ্য হয়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে। দুই হাজার টাকা সে নিয়েছে। এখান থেকে বম্বে হয়ে সে বিলেত যাবে—উপার্জনের কৌশল শিখতে। কৈলাসের ভয় হয়, দেশে যদি জান্‌তে পারে যে, ছেলে বিলেত গিয়েছে, তাহলে সবাই তাকে একঘরে করবে। কৈলাস একটা ব্যাগ নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করেন। যাবার সময় গদীর কর্মচারীদের বলে যান, যতোদিন তিনি না ফেরেন, ততোদিন কারবার বন্ধ থাকবে। কেউ তাঁর খোঁজ করলে কিংবা বাড়ী থেকে কেউ এলে তারা যেন জানায় যে কৈলাসবাবু পশ্চিমে গেছেন। মাধব ঈশানের খোঁজ করতে এসে আড়াল থেকে কৈলাসের মনোভাব প্রত্যক্ষ করে। বন্ধুর কর্ম সাফল্যে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

এদিকে কমলমণির ঘরে ঈশান বসে আছে, এমন সময় মাধবও আসে। ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে যায়। তাদের স্কুলের বি. এ. পাশ ব্রাহ্মণ হেডমাষ্টার পাঠক মশাই মদ্যপান করে পাশের ঘরে বিকট স্বরে গান করছিলেন। হঠাৎ বেশ্যাদের মধ্যে কোলাহল ওঠায় এরা জানতে পারে, হেডমাষ্টার তাঁর বেশ্যাটির একটি থালা চুরি করে পালাবার সময় ধরা পড়েছেন। হেডমাষ্টারের পিঠে বেশ্যাটির সম্মার্জনী বর্ষণও এরা প্রত্যক্ষ করে। ঈশান বলে,—"উনি অত বড় বিদ্বান হয়ে যখন এমন কল্লেন, তখন আমরা কোন্ ছার!"

মাধব এবারে তার প্ল্যানের কথা বলে। ঈশানকে সে বলে, কৈলাসের

মনোভাব সে জেনে এসেছে। তিনি নির্ঘাৎ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। সুতরাং এর মধ্যেই কিছু অর্থদোহন করা উচিত। কারণ পরে সে কিছুই পাবে না। মাধব বলে,—তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছেন। এই সুযোগে, পিতার দেহত্যাগ ঘটেছে, এই রটিয়ে ঈশান দেশে গিয়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি সম্পন্ন করে আসুক। ইতিমধ্যে মাধব দালালদের কিছু প্রণামী দিয়ে হ্যাণ্ডনোট যোগাড় করে রাখবে। ঈশান ফিরে এসে সেগুলোতে সই করে টাকা বার করবে। মাধব অবশ্য টাকাগুলো তার কাছেই রেখে যেতে বলে। কমলমণিকে আলাদা ভাড়াবাড়ীতে সে রেখে দেবে। ঈশান মাধবকে দেড় হাজার টাকা তখনই দিয়ে দেয়।

ঈশান চলে গেলে চতুর মাধব কমলমণিকে পাঁচশো টাকা দিয়ে নিজে এক হাজার টাকা রাখে নিজের জন্যে। কমলকে সে বলে, ঈশান আর ফিরবে না। শ্রাদ্ধ শেষ করে ঈশান ফিরতে ফিরতে তার বাবাও ফিরবেন। ঈশান ধরা পড়ে যাবে। জ্যান্ত বাপের শ্রাদ্ধ করেছে বলে চারিদিকে হুলুস্থূল পড়ে যাবে। লজ্জায় ও কি আর এসে মুখ দেখতে পারবে?

মাধবের ধারণাই ঠিক হলো। শ্রাদ্ধ বাসর। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদার্পণ ঘটেছে। ও পাশে কীর্তন চল্‌ছে। ঈশান পিণ্ডদানের জন্যে প্রস্তুত হয়, এমন সময় স্বয়ং কৈলাসবাবু আবির্ভূত হন। সকলে তাঁকে দেখে ঘাবড়ে যান। কৈলাসবাবুও বিস্মিত হয়ে এ সবের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ততোক্ষণে খিড়কীর দরজা দিয়ে ঈশান অদৃশ্য হয়েছে। কৈলাসবাবু যখন বুঝতে পারলেন, তখন চারদিকে লোক পাঠিয়ে অবশেষে ঈশানকে ধরে আনলেন। যথেচ্ছভাবে তাকে তিনি পাদুকাপ্রহার করলেন এবং তাকে ত্যাজ্যপুত্র বলে সবার সামনে ঘোষণা করলেন। কৈলাস খেদ করেন, অর্থ ই অনর্থের মূল। যে অর্থলোভে তিনি ব্যবসাতে প্রচুর প্রতারণার সাহায্য নিয়েছেন, সেই অর্থলোভেই পুত্র এ কাজ করেছে। তিনি আজ জ্ঞানচক্ষু লাভ করেছেন!

বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে দীনহীন অবস্থায় ঈশান মাধবের কাছে যায়। তার সব কথা খুলে বলে সে টাকা ফেরৎ চায়। মাধব বলে, সে তাকে চেনে না। ঈশান প্রথমে ভাবে, মাধব তাকে ঠাট্টা করছে। পরে সব ব্যাপার বুঝতে পেরে রেগে চোট্‌পাট্ করে। মাধবও তাকে অন্যায় জুলুমের জন্যে গালাগালি করে। ইতিমধ্যে একজন পাহারাওয়ালা এলে মাধব ঈশানকে

তার হাতে সমর্পণ করে। বলে,—এই চোর তার বাড়ীতে চুরি করতে এসে ধরা পড়েছে। ঈশান বোঝাতে চেষ্টা করলে পাহারাওয়ালা তা বুঝলো না; কারণ মাধবের পোষাক ভদ্র এবং ঈশানের জামাকাপড়ের মধ্যে অবিশ্বাস আরও প্রকট। সে তাকে মারতে মারতে ঠাণ্ডাঘরের দিকে নিয়ে যায়। ঈশান দর্শকদের উদ্দেশ করে বলে—"এখনকার অধিকাংশ বন্ধুই এইরূপ, যিনি না বুঝিয়া বন্ধুত্ব করেন বা কুসংসর্গে মজেন তাঁহাকেই আমার ন্যায় দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হতে হবে।"

সপ্তমীতে বিসর্জন (কলিকাতা—১৮৯৯ খৃঃ)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ কাপ্তেন-বাবুদের অবস্থা বর্ণনের মধ্যে দিয়ে কাপ্তানীর বিরুদ্ধে আর্থিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায়। "পূজার বাজারে কাপ্তেনবাবুদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই সামাজিক শ্লেষাত্মক পঞ্চরংখানি লিখিত।"[১৯] কাপ্তানীর সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারের বিচ্যুতি প্রদর্শন করে ভাবপ্রবণ গোষ্ঠীর সমর্থন লাভের চেষ্টা করা হয়েছে।

কাহিনী।—নতুনবাজারে এক সুদখোর মহাজন উকীল আর দালালদের নিয়ে ওঁৎ পেতে আছে, কাপ্তানবাবুদের আশায়। খানসামা ঠিকুজি হাতে খোকাবাবুকে সঙ্গে করে আনে; বলে—"খোকাবাবু সাবালক হয়েছে, কে হ্যাণ্ডনোটে ধার দেবে দাও, এই ঠিকুজি দেখে নাও।" দালাল বলে—"পাঁচশো টাকা কমিশন দিতে হবে। পঁচিশ পার্শেণ্টের দরে একমাসের সুদ আগম। দালালী বিশ পার্শেণ্ট; গদিয়ানী আর উকিল খরচা।" সই করতে সে কলম এগিয়ে দেয়,—হ্যাণ্ডনোট লেখাই আছে। উকীল হিসাব করে বলে,—কমিশনে পাঁচশো টাকা+একমাসে সুদ—দুইশো পঞ্চাশ টাকা=সাতশো পঞ্চাশ টাকা+দুইশো টাকা দালালী=নয়শো পঞ্চাশ টাকা। এক হাজার টাকা থেকে রইলো মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ঘড়ি চেন না দিলে উকীল খরচা চলে না। খোকাবাবু তখন ঘড়ি চেন খুলে দেয়। মহাজন তখন খোকা-বাবুকে টাকা দেবার জন্যে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে যায়।

আদালতের বেলিফ্ একজন ওয়ারেণ্টের আসামী নিয়ে যায়। আসামী একজন কাপ্তেন। স্ফূর্তি করবার জন্যে সে অনেকবার ধার-ধুর করেছে—এখন জেলে যাচ্ছে। তবে সে জেলে যাবার আগে পূজোর বাজারটা করতে

১৯। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৯৫।

চায়। চারশো টাকার কাপড় সে ধারে কিনবে এবং ধারেই দুইশো টাকার এসেন্সও কিনবে। সব কিছু তার রক্ষিতার জন্যে। বেলিফকে কথা দেয়, তাকেও সে দুই টাকার মদ খাওয়াবে,—অবশ্য দারোয়ানের কাছে দুই টাকা ধার করে। সে কথায় কথায় বলে,—এভাবে সে হরদম্ জেলে আসে। বাজারে সর্বত্রই তার ধার। বেলিফের সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হবে।

এদিকে গোবর্ধন আর প্যালা আসে। প্যালা একটা গণেশের মুখোস পরে এসেছে পাওনাদারের ভয়ে। গোলাপীও ঝাঁটা মেরেছে। এই মুখোস পরে গণেশ সেজে বোকা দিদিমাকে দৈবাদেশ দিয়ে কিছু টাকা সে হাতিয়েছে। মাত্র তিনশো টাকা, আর পারে নি। গোবর্ধন নতুন মেয়েমানুষ রেখেছে। পূজোর যা কিছু ধারেই চল্‌বে। মেয়েমানুষটা অবশ্য এখনো এসব টের পায় নি। প্যালারাম আর গোবর্ধন ফেরিওয়ালাদের দেখে আর পাঠিয়ে দেয় গোবর্ধনের মেয়েমানুষের ঠিকানায়—৩২ নম্বর তাঁবাগাছিতে।

গোবর্ধনের মেয়েমানুষ বিরাজ। বিরাজের মা বায়না ধরেছে এবার দুর্গাপূজো করবে। সেই অনুযায়ী বন্দোবস্ত চলতে থাকে। বিরাজের কাছে প্রমদাদাস বাবাজী গোঁসাইও যাওয়া আসা করতে আরম্ভ করে। তবে কাপ্তেন ধরনের যে মামাকে সে সঙ্গে করে আনে, তাতে গোবর্ধনের খুবই আপত্তি। একজন 'প্রেমিকা' দেবেন বলেই গোঁসাই মামাকে নিয়ে এসেছে বিরাজের কাছে। এদের বয়স দেখে বিরাজের মেজাজ সপ্তমে ওঠে। গোঁসাই তাকে মন যুগিয়ে বলে—"এই যে বিরাজ এসেছেন, তোমার যে রসিক নাগর আনবের আমার মনস্থ ছিল, এনেছি; এর সঙ্গে প্রেম কল্লে কৃষ্ণরাধার প্রেম হবে।" প্রেমিকা খুঁজতে গিয়ে বিরাজের গতিবিধি দেখে মামাবাবু হতাশ হয়। গোঁসাই বলে,—"পরম প্রেমিকা! এ সব কথা ত তুমি বুঝবে না, এ সব গুহ্যতত্ত্ব! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধার সাক্ষাৎ হয়, ভাগবতে একটা শ্লোক আছে,—'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপদ্‌কালে হ্যুপস্থিতে।' শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপেই রাধা সম্ভাষণ করেছিলেন।" বিরাজ এদের এড়াবার জন্যে বলে এখন সে দুর্গাপূজোর ব্যাপারে খুব ব্যস্ত। গোঁসাই যেন মামাবাবুকে নিয়ে শুক্রবারে আসে। গোঁসাই ক্ষুণ্ণ মনে বলে,—"ভেবেছিলেম,—বিরাজ, তোমায় একটু গুহ্যতত্ত্ব বলব; কি জান—শ্রীকৃষ্ণ একটু মধুপান করতেন এবং গোপিনী বিহার করতেন। এসব গুহ্য কথা, তোমায় কোনদিন বলব—কোনদিন বলব।" এদিকে বিরাজ কুমারটুলীতে ঠাকুর কিনতে পাঠিয়েছে—এখনো এলো না,—

অবশেষে সাতকড়ি একটা চালচিত্তির ঘাড়ে করে আসে। এসে বলে—"দুর্গা খুঁজলুম—নিদেন—গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, তা কি সপ্তমীর রাত্রে পাওয়া যায়?" বিরাজ হতাশায় ভেঙে পড়ে। দুর্গোৎসব তার বুঝি আর হবে না। বেদানাকে জব্দ করা যাবে না। "বেদানার বাড়ী সরস্বতী পূজো হলো, সেদিন—ধুমধাম্ বাজনা, নেত্যগোপাল মুখুয্যে আমায় কত টিট্‌কিরি দিয়ে গেল।" গোঁসাই তখন বলে,—"সে কি, মানস করেছে, দুর্গোৎসব হবে না? শোন এসব শাস্ত্রের মর্ম্ম ত কেউ বোঝে না! এই চালচিত্তির আর একটি কাৰ্ত্তিক হলেই চৈতন্যচরিতামৃতের মতে, যা বেদের ওপর—দুর্গোৎসব হয়।" বেগতিক দেখে সাতকড়িও বিরাজের মা-কে বলে,—"নদের টোল থেকে দাঁয়েরা এই ব্যবস্থা এনেছে, দেবকণ্ঠ পদরত্ন তাতে নামসই করে দিয়েছে; কাৰ্ত্তিক আর চালচিত্তিরতে যেমন শুদ্ধো পূজো হয়, এমন আর কিছুতেই নয়।" এতেও বিপদ। কাৰ্ত্তিক বাজারে নেই। শেষে গোঁসাই মামাবাবুকে বলে,—"দেখুন, আপনি পরম প্রেমিক, কাৰ্ত্তিক হয়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করুন।" বিরাজরাও বাধ্য হয়ে এতে রাজী হয়। মামাবাবুও অনেক আপত্তি করে শেষে ভয়ে ভয়ে কাৰ্ত্তিক সাজে। সে বিরাজের হাতী পেড়ে ঢাকাই পরে, মাথায় পাগড়ী বাঁধে। গত বছরের পেখম খুলে রাখা হয়েছিলো। সেগুলো লেজে লাগিয়ে সাতকড়ি ময়ূর সাজে এবং মামাবাবুকে ঘাড়ে নেয়। এরমধ্যে সাতকড়ির পেটে কিছু হুইস্কি পড়ে। সে পেখম মেলে উড়তে চায়। তখন বিরাজরা অনেক কষ্টে তাকে থামায়।

এমন সময় গোবর্দ্ধন, প্যালারাম এবং তাদের ইয়ারের দল এসে পড়ে। গোবরাকে বিরাজ এ ব্যাপারে পূজো হিসেবে গুরুত্ব দিতে বলে। ততোক্ষণে গোঁসাই হুইস্কি খেতে খেতে পূজো আরম্ভ করে দিয়েছে,—"তড়ং নমঃ, খড়ং নমঃ, মাতালায় নমঃ, সোনাগাছায় নমঃ"—ইত্যাদি। পূজো চল্‌ছে, এরমধ্যে সখের যাত্রাপার্টির একদল লোক আসে দুর্গাপূজোয় বায়না নেবার আশায়। তারা এসেই তাদের কৃতিত্ব জাহির করে। যশোদা কৃষ্ণের একটা দৃশ্য দেখিয়ে দেয় বিনে পয়সায়। শেষে পার্ট ভুলে এরা নিজেদের ঝগড়ায় মেতে ওঠে। এরা সবাই নেশা করে এসেছিলো।

তারা চলে গেলে আবার পূজো চল্‌তে থাকে গোঁসাইয়ের। গোঁসাই পাঁঠা এনে রাঁধতে বলে। প্যালারাম মত্ত অবস্থায় নিজেই একবার মোষ একবার পাঁঠা সেজে তাদের কাছে গিয়ে বলে, তাকে এরা একবার বলি দিক।

তার পেটেও কয়েক গ্লাস হুইস্কি পড়েছিলো। সে গোঁসাইকে অনুরোধ করে সিঁদুরের টিপ দিতে। বিরাজের মনটা খারাপ হয়ে যায়, পাঁঠা খাওয়া হলো না। একজন ইয়ার প্রস্তাব করে, কার্ত্তিককে বলি দিলে একটা নতুন কিছু হয়। এতে সকলে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মামাবাবু পালাবার পথ খুঁজে পায় না, এদিকে সাতকড়ি তাকে ধরে রেখেছে। শেষে ঝাঁটা দিয়েই বিরাজ তাকে বলি দেয়, তারপর গায়ে আলতা ছড়িয়ে দেয়।

এবার বিসর্জনের পালা। কার্ত্তিক ময়ূর—সবাইকে বেঁধে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয় গঙ্গায়। পাছে না ডোবে, এজন্যে গায়ে পাথর বাঁধবারও ব্যবস্থা হয়। মামাবাবু পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। পায়খানা করবার নাম করেও মামাবাবু রেহাই পায় না। গোবর্ধন পরামর্শ দেয়,—"মামা, তুমি ভাসান থেকে এসে পায়খানায় যেও, নয় ময়ূরের পিঠে পেট খোলসা কর।" উপায়ান্তর-বিহীন মামা পাহারাওয়ালা ডাকে। সবাইকে মাতাল অবস্থায় দেখে পাহারাওয়ালা গ্রেফ্‌তারের তোড়জোড় করে। এদিকে এরাও ওসব গ্রাহ্য না করে ভাসানের জন্যে তৈরি হয়। গোঁসাইকেও তারা বিসর্জন দেবে।

বাবুয়ানাকে কেন্দ্র করে রচিত আরও কয়েকটি প্রহসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া যায়। নীচে এ ধরনের কয়েকটি প্রহসনের পরিচয় দেওয়া হলো।

হঠাৎ বাবু (ঢাকা—১৮৭৮ খৃঃ)—হরিহর নন্দী॥ মদ্যপানের কুফলের বিরুদ্ধে লেখকের বক্তব্য অপ্রধান না হলেও সামগ্রিকভাবে বাবুয়ানার বিরুদ্ধেই লেখকের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত।

পদীর বেটা পদ্মলোচন (১৮৭৯ খৃঃ)—গোপালচন্দ্র মিত্র॥ সমাজের অত্যন্ত হীনস্তরের এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত পদীর পুত্রের অভিজাত নাম গ্রহণ এবং বাবুয়ানা প্রহসনে বিদ্রূপের সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে।

আজব জোলা (১৮৮৭ খৃঃ)—চন্দ্রকান্ত দত্ত॥ জোলা নামে সমাজের এক হীনস্তরের সম্প্রদায়ভুক্ত একব্যক্তি হঠাৎ বড়োলোক হয়ে বাবুয়ানা ও বিলাসিতা দেখায়। সে একবার তার শ্যালকের কন্যাকে বিবাহ করবার চেষ্টা করে। এই ধরনের বিবাহ হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে অভিজাত হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সম্পর্কের এবং অচল। সাংস্কৃতিক দিক থেকে জোলাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা দেখা যায়।

বাবুয়ানাকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে রচিত কয়েকটি প্রহসনের নাম আনুমানিকভাবে উপস্থাপিত করতে পারি, যদিও এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে

বিস্তারিত বিবরণ পওয়া যায় না। **"বাবু নাটক"** (১৮৫৪ খৃঃ)—কালীপ্রসন্ন সিংহ ; **"একেই কি বলে বাবুগিরি"** (১৮৬৩ খৃঃ)—কালাচাঁদ শর্মা ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়—ইত্যাদি কয়েকটি প্রহসন রচনার সংবাদ পাওয়া যায় যেগুলো একই বিষয়বস্তু নিয়ে সম্ভবতঃ রচিত।

২। 'টাইটেল' ও অর্থব্যয়

উপাধি বা Title মানুষকে বিশিষ্ট করে। এই বিশিষ্টতার মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা জড়িয়ে থাকে। শুধু যৌন বা আথিক নয়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাও মানুষের জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ। এইজন্যে তার জীবন সংগ্রামের অন্ত নেই। এজন্যে তারা অকাতরে অর্থব্যয়ও করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে Title-এর জন্যে অকাতরে অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার স্পৃহা আমাদের অন্যান্য বিবেচনা শক্তিকেও নষ্ট করে দিয়েছিলো।

উনবিংশ শতাব্দীতে পুরোণো সংস্কৃতির পাশে বিদেশী শাসকের অর্থনীতির আনুকূল্যে যখন নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তখন সেই সংস্কৃতির মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠায় অর্থব্যয় ছিলো একটা উপযুক্ত পথ। অর্থপিপাসু শাসকরাও এদের এই অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে অননুকূল ছিলো না। এইভাবে সাংস্কৃতিক অধিকার ও আভিজাত্য অর্জনের জন্যে উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজের অপব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ প্রদত্ত বিচিত্র টাইটেল এবং তার হিসেব ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায়[১] প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে,—"বঙ্গদেশের মধ্যে ১২ জন মহারাজা, ১৯ জন রাজাবাহাদুর, ১৪ জন রাজা, ৭ জন কুমার, ২৩ রায়বাহাদুর, ৪ জন খাঁ বাহাদুর, ২ জন সিম, ৭১ জন সর্দার, একজন বাবুবাহাদুর এবং ৪ জন নবাব বাহাদুর আছেন। মহারাজ রাজাবাহাদুরেরা পৈতৃক বিষয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের খেতাব পাইয়া থাকেন। যাঁহারা রাজাবাহাদুর প্রভৃতি খেতাব সকল পাইয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন ভাল কাজ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া সেই সকল খেতাব দিয়াছেন।"

১। সুলভ সমাচার—১লা জানুয়ারী, ১৮৭১ ; ৮ই পৌষ, ১২৭৭

এইসব খেতাব সৃষ্টির মূলে একটু আর্থনীতিক ইতিহাস আছে। এককালে আমাদের সমাজে বিত্তবান ছিলেন শেঠ ইত্যাদি প্রাতিভবিক গোষ্ঠী। এঁদের ভূমিমুখীন করবার একটা চক্রান্ত করা হয়েছিলো শিল্পপুঁজিপতি ইংরেজদের তরফ থেকে। বণিকপুঁজিপতি ইংরেজরাও একই পদ্ধতি নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, অর্জুনজী নাথজী কোম্পানীর কাছ থেকে জমি পেয়েও তাতে মূলধন লগ্নী করেন নি। বস্তুতঃ অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সে সময়ে বিত্তবান্দের জমিমুখীন করে তোলা সম্ভবপর হতো না। তাই সাংস্কৃতিক প্রলোভন দেখিয়ে অর্থাৎ জমিদারদের ওপর প্রাপ্যাতিরিক্ত সম্মান দেখিয়ে এই বৃত্তিতে সাধারণের আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে শিল্পপুঁজিবাদের (Industrial Capitalism) প্রভাবে ভূমিমুখীনতার চাপ আরও বেড়ে যায়। আথিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে পুঁজিপতিদের ব্যাপকভাবে জমিদার করে তুলতে পারলে ইংরেজদের ধনতন্ত্র নিরঙ্কুশ থাকে। পরন্তু জমিদারদের সহায়তায় কাঁচামাল সরবরাহ অ ত সহজেই সম্পন্ন হবে। এরা অবশ্য পুঁজিপতিদেরই যে জমিদার করেছে তা নয়। উপকার পেয়ে ইংরেজরা অনেককে ভূমিদান করেছে। এর মাধ্যমে এদেশের ব্যক্তিদের প্রকারান্তরে ইংরেজদের তোষামোদে আহ্বান করা হয়েছে। কাশিমবাজার এস্টেটে কান্তবাবু ছিলেন একজন পশম ব্যবসায়ী। আগেকার দিনের কলকাতার একমাত্র জমিদার রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংসের মুন্সি। হেষ্টিংসের আমলে বিশ্বস্ততার পুরস্কারে জমিদান একটা রীতির মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

বস্তুতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই বিত্তবান্‌রা ভূমিনীতির ফাঁদে পড়েছিলেন। সেই সঙ্গে খেতাবনীতি চালুর সঙ্গে সঙ্গে বিত্তবান্দের পক্ষে প্রলোভন জয় করা সম্ভবপর হয় নি। প্রথম দিনকার খেতাবগুলোর অধিকাংশই ছিলো সামন্ত পরিচয় জ্ঞাপক। এর ফলে খেতাব প্রাপ্তির পর অনেকে ভূমির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

প্রথমতঃ ভূমিনীতি খেতাবনীতির মূল হলেও পরে শিল্পপুঁজি বৃদ্ধির জন্যে অর্থের বিনিময়েও খেতাব প্রদত্ত হয়েছে। অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে অর্থগ্রহণ করা হয় নি। যেমন,—ইংরেজী শিল্প দ্রব্যসামগ্রীকে ইন্ধন করে গড়ে ওঠা বাবুয়ানা ও বিলাসিতার চূড়ান্ত এই খেতাব লাভের সহায়তা করেছে। এই বাবুয়ানা ও বিলাসিতার বৃদ্ধিতেই প্রকৃতপক্ষে এদেশে ওদের শিল্পের বাজার ও

চাহিদা সৃষ্টি। ফলে সাধারণ অনভিজাত ব্যক্তিদের অনেকেও এই ধরনের ইংরেজপ্রীতিতে অর্থ ব্যয় করে খেতাব সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। খেতাবের পেছনে এভাবে জাতীয় মূলধনের অপচয়ে সমাজের সাধারণের মনে দৃষ্টিকোণ সংগঠন হওয়া স্বাভাবিক। তা সে প্রচুর বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির ব্যাপারেই হোক কিংবা সাধারণ ব্যক্তির ব্যাপারেই হোক।

"অনুসন্ধান" পত্রিকায়[২] "রাজাবাহাদুর" নামে একটি 'সঙ্'-এর ছড়ায় বলা হয়েছে,—

"আমি রাজা বাহাদুর
কচু বাগানের হুজুর।......
জমি নাই, জমা নাই নাইকো আমার প্রজা!
আমি পেত্নীপুরের রাজা!
ওহে নই হে আমি গোঁজা!
অন্দরে অবলা কাঁপে খেয়ে আমার সাজা।
ওরে বাজা বাজা বাজা,
তা ধিন্ ধিন্ নাচি আমি
কচু বনের রাজা।"

একই তারিখের পত্রিকায় অন্যত্র একটি মন্তব্যে বলা হয়েছে,—"চাকির বলেই চক্চকে উপাধিমালা গলায় দোলাইয়া অনেক গোবরগণেশ গা ফুলাইয়া বেড়ায়। সেটা কিন্তু বড় ভাল নয়। দেখিতে শুনিতে কেমন লজ্জা লজ্জা করে না কি? যাহারা পরে তাহারা প্রায় আপন মুখ আয়নায় দেখে না। যাহারা পড়ায়, তাহাদের কৌতুক বটে! কান্নাকাটি কেবল ঘরের লোকের।"

ইংরেজদের প্রদত্ত 'রাজা' ইত্যাদি উপাধি আমাদের প্রাক্তন রাজধারণা ও সংস্কৃতির মূলে আঘাত হেনেছে। তাই তাদের আত্মসন্তুষ্টি হাস্যরসাত্মকভাবে প্রচার করে দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। উপাধিধারীর নিজ মর্যাদায় অবিবেচনাপ্রসূত অর্থব্যয়, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় বিভিন্ন ছড়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থব্যয়ের অযোগ্যতা নিয়ে একটি ছড়ার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় "চিত্রদর্শন" পত্রিকায়।[৩]

২। অনুসন্ধান—১৭ই আষাঢ় ১৩০৪ সাল।

৩। চিত্রদর্শন—১২৯৭ সাল—পৃঃ ৭১।

"আমি রাজা হয়েছি, আমি রাজা হয়েছি
সত্য স্বর্গ চতুর্বর্গ মুটোই পেয়েছি ॥
বাপ পিতেমো মুড়ো খেয়ে
সবাই মলো বুড়ো হয়ে
চ্যাকা খেযে ভ্যাকা হল জ্যাঠাখুড়ো মোর।
সুখ না চিনে দুঃখ কিনে করে জীবন ভোর।
রাজা হলেম ভাগ্যে আমি লেজা খেয়েছি।
জমী জমার নাইকো লেঠা,
বাস্ক কেবল তের কাঠা,
থাক না নীচে কপ্নি আঁটা ক্ষতি কি তায়
সাঁচ্চা দেওয়া আচ্ছা রকম পাগড়ী ত মাথায়,
বাড়ীর নাম রাজবাড়ী, আমার বল না আর ভাবনা কি ?"

এরকম 'সঙ' ধরনের গানই যে শুধু জনপ্রিয় ছিলো তা নয়, এইসব খেতাবের মূল কারণ বিশ্লেষণ করেও অনেক গান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বৈষ্ণবচরণ বসাকের সম্পাদিত "বিশ্বসঙ্গীত" সমসাময়িককালের জনপ্রিয় গানের সঙ্কলন। তার মধ্যে একটি গানে আছে,[৪]—

…"আবার উপাধি হয়েছে ব্যাধি
কত অবিদ্বানের ঘরে।
কেহ হলো সাহেব সুবা
রীতি মত সেলাম করে ;
আবার কেহ হলো রাজা নবাব
বড় বড় খানার জোরে।"

এবার প্রহসনের ক্ষেত্রে আসা যাক্। টাইটেলের প্রতি উন্মাদসুলভ আগ্রহ, অনর্থক অপব্যয়, আত্মসন্তুষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের ওপর ভিত্তি করে প্রহসনে দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে। একদা বিত্তবান্‌দের অর্থসাহায্যে সমাজের অনেক ব্যয়সাধ্য বিষয় সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু নব্য সংস্কৃতির পত্তনে, এই সামাজিক ব্যয়ে বিত্তবান্‌দের অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা প্রহসনে এ সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বিধবার দাঁতে মিশি" প্রহসনে

৪। সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত, ১২৯৯ সাল—পৃঃ ৪৫৭।

(১৮৭৪খৃঃ) নব্য গোরাচাঁদ প্রাচীনদের কাজের সঙ্গে নিজেদের—বিশেষ করে বরোদার কাজের তুলনা করে বলে,—"গাঁয়ের মাঝে কতকগুলো পুকুর কেটেছে, আর কতকগুলো মন্দির তৈরী কোরে তার ভেতর কতকগুলো পাথরের চাঁই বসিয়েছে, ও বার মাসে তেরটা মাটীর ঢিপি পূজা কোচ্চে বৈত নয়; এই ত ওদের সদ্ব্যয়। আর তুমি স্বদেশের হিতের জন্যে পরিণামযুবতী মনোমোহিনীদের জন্যে—যাদের কটাক্ষে ত্রিজগৎ ভস্ম হয়—তাঁদের জন্যে স্কুল স্থাপন কোরেছ, আর ডারটি রিভার সুরধুনীর পরিবর্ত্তে সুরাধুনীর আরাধনা কোচ্চো, এগুলো কি অসদ্ব্যয় হোচ্চে?" প্রকৃতপক্ষে স্কুল বা হাসপাতাল স্থাপন সামাজিক ব্যয়, কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যাবে তা শুধু ইংরেজদের অনুগ্রহলাভ চেষ্টার নামান্তর। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি" (১৮৮৯ খৃঃ) প্রহসনে মহেন্দ্রের একটি উক্তির মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি অনাথা স্ত্রীলোক দুটো শিশু সঙ্গে করে সাহায্যের আশায় মহেন্দ্রের কাছে আসে। মহেন্দ্র তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তার কৈফিয়ৎ হিসেবে বন্ধুকে বলে,— "ওঁদের দেওয়ায় বিশেষ লাভ কি? কখন কাগজে ছাপাও হবে না, বা আমি যে দিয়েছি, কেউ জান্তেও পারবে না।" কাগজে ছাপার দান অর্থই বিদেশী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ। নিমাইচাঁদ শীলের "এঁরাই আবার বড়লোক" প্রহসনে (১৮৬৭ খৃঃ) দানের ক্ষেত্র সম্পর্কে আভাস দেওয়া হয়েছে। রাজাবাবু কৃষ্ণকে ডেকে বলেছেন—লিম্‌সন্ সাহেবের রেল্‌ওয়ে মামলার চাঁদার খাতাতে তাঁর নাম নেই। সেখানে যেন একশত টাকা দেওয়া হয়। বিদেশী অবলাকুলের অনুকূলে সবরকম চাঁদাতেই যেন তাঁর নাম থাকে!—ইত্যাদি। অথচ সমাজের নির্ধন ব্যক্তিরা এই সব দাতাদের কৃপা থেকে বঞ্চিত। এখানেই এদের সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজের সাংস্কৃতিক বিরোধ। রাজকৃষ্ণ রায়ের "কানাকড়ি" প্রহসনে (১৮৮৮ খৃঃ) হরি বৃদ্ধার কাছে একটা কানাকড়ি দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—"একে কানাকড়ি, তার আবার আধখানা! কোন্ দাতাকর্ণ তোকে এমন অমূল্য বস্তু দান করেছে?" বৃদ্ধা জবাব দেয়,—"যাদের দরজার সেপাই-সান্ত্রিরির পাহারা।"

অথচ এই বড়লোকরাই টাইটেলের জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করে গেছেন। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠায় অর্থের যে যথেষ্ট শক্তি আছে, এটা তাঁরা মানতেন। পূর্বোক্ত "টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি" প্রহসনে স্বগতোক্তিতে মহেন্দ্র বলেছে, "আরে টাকায় না হয় কি? টাকায় জাত পাওয়া যায়, ধার্ম্মিক হওয়া যায়,

মান সম্ভ্রম পাওয়া যায় ; পরের ছেলে টাকায় বাপ বলে, আপনার উপাধি ত্যাগ করে, আর আমি টাকায় Title পাব না এ কখনই হতে পারে না।" এই টাইটেলের জন্যে এদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই—কোথাও অর্থব্যয়, কোথাও তোষামোদ, কোথাও মানত—সবকিছুই এঁরা করে থাকেন। দুর্গাদাস দে-র 'ল-বাবু' প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) দেখা যায়, টুনে একজন মুসলমান মুটের তোষামোদ করছে।—"আমি রায়বাহাদুর হব, পাড়ার লোকের মুখে চূণকালি দেব। মুটে ভাই তুমি মুসলমান, আমার জন্যে তুমি রেকমেণ্ড করবে কিনা বল।" অন্যত্র টুনে বল্‌ছে,—"…oh! oh! কত X'mas গেল! কত New years গেল, দু দুবার এমন জুবিলীটা গেল ; সাহেব ধর্ত্তে দার্জিলিংয়ে গেলুম, ভুটিয়াদের ভাত খেলুম, কালীঘাটে জোড়া মোষ মান্‌লুম, তারকেশ্বরে হত্যে দিলুম, কাশীতে বিশ্বেশ্বর প্রদক্ষিণ করলুম, বেণীমাধবের ধ্বজায় চড়লুম, ব্যাস কাশী গেলুম, দুগ্‌গো বাড়ীতে বাঁদর ভোজন করালুম, শ্মশানেশ্বরের মাথায় সগুষ্টিতে পড়ে গঙ্গাজল ঢাল্‌লুম, খোসামুদে ব্যাটাদের কত খিচুড়ী খাওয়ালুম তবু টাইটেল পেলুম না !"

স্বক্ষেত্রের মধ্যে টাইটেলধারী নিজের আভিজাত্য আস্বাদন করে তৃপ্ত পেয়েছে। সমাজে প্রকৃত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাজনিত সন্তুষ্টির অভাবে তারা নিজের পরিবারের মধ্যে এবং চাটুকার গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের অচরিতার্থ বাসনা মেটায়। প্রহসনকাররা এই উপাদানে তাঁদের দৃষ্টিকোণ সংগঠন করেছেন তাঁর মূলে রয়েছে পুরোনো সংস্কৃতির ব্যাপকতা এবং নব্য সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণতা প্রচার। অমৃতলাল বসুর "রাজা বাহাদুর" প্রহসনে (১১৯১ খৃঃ) একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে —যেখানে রাজা হবার আগে স্বক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমর্থনের চেষ্টা আছে।—

"মাণিক্যধন ॥ আহন আমি রাজা অইমু ?

কালাচাঁদ ॥ হাঁ হবেন, হবেন।

মাণিক্য ॥ রাজা অইমু ?

কালা ॥ হবেন।

বাঁশী ॥ আরে হাচ হাচ।

সকলে ॥ (নাকে কাঠি দিয়া হাঁচি—কীর্তিবাসের তুড়ি দেওন)

বাঁশী ॥ কীর্তিবাস খুরা হাচলা না ? তুরি মারলে যে ?

মাণিক্য ॥ কীর্তিবাস খুরা, তুমি হালা অতি পাজী, র‍্যালের মাশুল লয়ে আজি ঢ্যাশে রওনা হও।

কীর্তিবাস ॥ উজুর ! বেয়াদবি মাপ হয়, নাকের মধ্যি একটা গা অইছে, আবার খোচাখুচি করলে রক্ত বার অইতো, তুরিও শুব।"

খেতাব পাবার পর স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা আস্বাদনের হাস্যকর প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে কিশোরলাল দত্তের "হায়রে পয়সা" প্রহসনে (১৮৭৭ খৃঃ কাদম্বিনী ও কুমুদিনীর কথোপকথন চল্‌ছে। ঝি থাকমণিও সেখানে উপস্থিত কথায় কথায় খেতাবের কথা ওঠে। ঝি থাকমণি তাই শুনে তার ছেলের জন্যে একটা খেতাবের সুপারিশ করে। কুমুদিনী বলে,—এবার একজন খেতাব পেয়ে মাকে নাকি খেতাব ধরে ডাকতে বলেছিলো। যদি না ডাকেন, তাহলে তাঁকে জরিমানা দিতে হবে!—এ সব শুনে থাকমণি বলে, সে তার ছেলেকে খেতাব ধরেই ডাকবে।

বস্তুতঃ খেতাবের প্রতি আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতিহীন ব্যক্তির ব্যাপক মোহ অবিবেচনা প্রসূত ব্যয় সংঘটিত করে তাদের সর্বনাশ এনেছে; সেইসঙ্গে পরিবারের আর্থনীতিক ভিত্‌ ধ্বসিয়ে ফেলে প্রকারান্তরে সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। ইংরেজরাও খেতাবের শ্রেণীবিভাগ করে বিত্তনাশ প্রয়াসী বিভিন্ন পর্যায়ের ধনীর অর্থনাশের পুরোপুরি সুযোগ করে দিয়েছে। এর ফলে সাধারণ ধনীদের মধ্যেও খেতাবলাভের স্পৃহা জেগে উঠে ক্রমেই জাতীয় মূলধনের বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর অনেক প্রহসনকার এই বহ্ন্যুৎসবের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও ব্যাপক করে তোলবার চেষ্টা করেছেন।

সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর দিক থেকে 'টাইটেল' সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রহসনের সমাজচিত্রগত মূল্য আছে। কিন্তু আর্থিক দিকটিই সাধারণতঃ দৃষ্টিকোণে প্রাধান্যলাভ করেছে বলে আমরা এই প্রসঙ্গকে আর্থিক প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

টাইটেল দর্পণ বা সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় (কলিকাতা—১৮৮৫ খৃঃ)—প্রিয়নাথ পালিত (এম, এ, বি, এল্) ॥ মলাটে লেখক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন,—

"লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভা জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥"

টাইটেল লোভ জনিত অপব্যয় তথা আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ নাটক শেষে দীনবন্ধুর ছড়াতে অভিব্যক্ত।—

"মনে করি গাড়ি চড়ি বগি উল্‌টে পড়ে যাই।
মন ত সকের বটে,, হাতে কিন্তু পয়সা নাই।"

কাহিনী।—রাইচরণকে অনেক খোসামোদ করে আশুতোষবাবু সম্প্রতি রাজাবাহাদুর টাইটেল পেয়েছেন। এখন তিনি "নিঃসম্বল টোলার রাজা-বাহাদুর" বলে সকলের কাছে পরিচিত। রাইচরণকে তিনি অনেককিছু প্রেজেণ্টেশন দিয়েছেন। নেপোলিয়ন প্রাইসের সাবান এক বাক্স, গস্‌নেলের হোয়াইট্‌ রোজ,, স্মিথের ল্যাভেণ্ডার ইত্যাদি সৌখীন জিনিস ছাড়াও অনেক টাকার মিষ্টি ফলমূল তাঁকে ভেট পাঠিয়ে তবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। ভাগ্‌নে নদেরচাঁদ বলে,—"আজ্ঞে সিদ্ধি বলে সিদ্ধি—এখন চিরকালের জন্যে আপনার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অপ্পার টেন্‌ থাউজেণ্ডের মধ্যে গণ্য হবে। পূর্বেকার সব ইয়েই ঢেকে যাবে।" আশুবাবুর সান্ত্বনা আর কেউ তাঁকে আর নীচু জাত বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে পারবে না। রাইচরণকে তোসামোদ করে আশুতোষের মতো অনেকেই খেতাব পেয়েছেন বলে তাঁরা সকলে রাইচরণের বৈঠকখানায় গড়াগড়ি যান। রাইচরণের মান আরও বেশি উঁচু হয়ে ওঠে।

রাজা উপাধি মিলেছে। তাই ভাগ্নে নদেরচাঁদকে আশুতোষবাবু জাঁদরেল দেখে দুজন দারোয়ান সংগ্রহ করে এনে তক্‌মা আঁটিয়ে দরজায় খাড়া করতে বলে। অনেকদিন থেকেই এই তক্‌মা তিনি তৈরি করে রেখেছিলেন। তারা যেন ডাক শুনে "মহারাজ" বলে উত্তর দেয়, আর কথায় কথায় 'হুজুর' 'হুজুর' যেন বলে। দাসীরা আশুবাবুর স্ত্রী পান্নামতীকে যেন রানী বলে; তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে ছোটরানী বলে; আর পুত্র গোরাচাঁদের স্ত্রীকে যেন বৌরানী বলে। রাতারাতি রাজবাড়ীর চেহারা করে তোলবার চেষ্টা চল্‌তে থাকে। রাজাকে তাঁর 'পোজিশন' রাখ্‌তে হবে। তাই নদেরচাঁদ একটা ফর্দ্দ করে দেয়। "একখানা পেব্‌লের চশমা সোনা বাঁধান সলোমনের বাড়ী থেকে, সোনার ষ্টড্‌স আর লিঙ্ক হেমিল্‌টনের বাড়ী থেকে, বুড় আঙ্গুলের মতন মোটা পাতা ফেসানের চেন মেথুসনের বাড়ী থেকে, ভাল ষ্টিক্‌ মেকেঞ্জিলায়েলের ওখান থেকে, রথার হেম্‌ মেকারের সোনার ঘড়ি কুক কেলভির বাড়ী থেকে; বারাণসী চাদর, কিংখাপের পোষাক লিভিতে যাবার জন্যে; সার্টিনের পোষাক ইভ্‌নিং পার্টিতে যাবার জন্যে; মাদার ও পারলের অপেরা গ্লাস নিউমানের বাড়ী থেকে ......।" ইত্যাদি অনেক ফিরিস্তি।

এদিকে আশুতোষবাবুর রাজকোষ শূন্য। তিনি বলেন,—"বাজারে ক্রেডিট্ খুব তাই টাকা পেইছি, তারও ডিউ হয়ে এলো। দশ হাজার টাকা কেবল ফাণ্ড্ আর সাবস্ক্রিপ্সানে দিতে হয়েছে, রাজা কি মুফৎ হইচি রাজা হওয়া নয়তো, ইয়েতে বাঁশ যাওয়া।"

আশুতোষ রাজা হয়েছেন শুনে মোসাহেব হওয়ার জন্যে অনেকের অনেক দরখাস্ত এসে পড়ে। শেষে দীনবন্ধু নামে একজনকে বহাল করা হয়। সে সরকারের কাছ থেকে শান্তিপুরী ধুতি উড়নি, চাঁদনীচকের এক জোড়া সাইড্ স্প্রিং জুতো পায়। আশুবাবুর স্ত্রী পান্না এখন মহারানী। তাই সেও আশুবাবুকে ধরে।—মুক্তোর সরস্বতী হার, হীরের জড়োয়া গয়না, মুক্তোর ঝালর দেওয়া বারানসী সাড়ী, পাইনাপেলের সাড়ী—তার ফর্দও নেহাৎ কম নয়। রাজাবাহাদুর আশুতোষ চোখে অন্ধকার দেখেন।

গোরাচাঁদ এখন রাজপুত্র। তারও ঠাট চাই। সুতরাং সেও ইয়ারবাজী ও মাতলামি করে সময় কাটানো অভ্যাস করে। তারক, উত্তম, সুরেন, বিপিন,—এরা সব গোরাচাঁদের ইয়ার। ফাউ হিসেবে রাজার মোসাহেব দীনবন্ধুও রাজপুত্রের দলে মাঝে মাঝে যোগ দেয়। গোরাচাঁদ তার ইয়ারদের নিয়ে "বিলাসতরঙ্গিনী সভার" মিটিং করে।—"ইহার মোখ্য উদ্দেশ্য এই যে আমাদের দেশের রীতনীত কস্টম্, ফ্যাশন্ ইত্যাদি সংশোধন করণ।" সভা আরম্ভ হয় সিদ্ধিভক্ষণ দিয়ে। নেশা বেশ জমে ওঠে। দীনবন্ধু বলে,—"বিলাসতরঙ্গিনী সভায় বিলাসিনী না থাকলে জল্‌জমা হয় না।" জীবনটা স্ফূর্তি করবার সময়—এই সার বাক্যটুকু গোরাচাঁদের মনের মধ্যে সে ঢুকিয়ে দেয়। গোরাচাঁদ পুরোপুরি গা ভাসিয়ে দেয়।

আশুবাবুর খরচ নেহাৎ কম হয় না। রানীর জন্যে ষোল হাজার টাকার হার, গোরার জন্যে এল্‌বার্ট পোষাক দুই হাজার টাকা—এসব তো খরচ হচ্ছেই, তাছাড়াও রাধাবাজারের সেন ব্রাদার্সের মদের দোকানে গোরাচাঁদের বিল পাঁচ শত টাকা—মাত্র দু মাসের খরচ! আশুবাবু চিন্তায় পড়েন। নদেরচাঁদ গোরাচাঁদের হয়ে বলে,—"তা আপনি কেন ওঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দিন না? সে তো অল্প লেখাপড়া জানলেও হয়!" আশুবাবু বলেন,—"আমাদের কি কোন ক্ষমতা আছে? খালি সাহেবদের কথায় আমাদের ডিটো দিয়ে গোলামি কত্তে হয়।"

এদিকে অ্যাটর্নির চিঠি আসে। একটা কেসে আশুবাবুর হার হয়েছে।

খরচ দশ হাজার টাকা দিতে হবে। নদেরচাঁদকে আড়ালে ডেকে আশুবাবু তার পরামর্শ চাইলেন,—হাতে তো কিছুই নেই। নদেরচাঁদ আশুবাবুকে তাঁর ভদ্রাসন বাঁধা দিতে বলে। এদিকে কালই আশুবাবুর বাড়ী বাইনাচ হবে, সাহেবকে খানা দিতে হবে। আশুবাবু আক্ষেপ করে বলেন,—"টাইটেল নেওয়া তো নয়, ডান হাতে করে গু খাওয়া।" ইতিমধ্যে একে একে কয়েকজন এসে চাকরীর সুপারিশের জন্যে আশুবাবুর কাছে ধর্না দেয়। মিথ্যে স্তোক বাক্যে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ওদিকে রানীর মহলে ফেরি-ওয়ালীরা দামী দামী জিনিস ফেরি করে চলে যায়,—বিল একে একে আশুবাবুর কাছে এসে উপস্থিত হয়। রাজকুমার একটা কুকুর কিনেছে, এক সাহেব তাঁর কাছে পাঁচ শত টাকা বিল এনে উপস্থিত করে। আশুবাবু প্রমাদ গোণেন।

আশুবাবুর মনের অবস্থা এমন, আর বাইরে বিরাট নাচগান, খাওয়া দাওয়া। আজ বাইনাচ হবে। নাচঘরের চারদিকে সাজানো। আশুবাবুর একটা কাঁচা অয়েল পেন্টিং ঝুল্‌ছে। ত.ড়াহুড়ো করে এটা আঁকানো হয়েছে। অয়েল পেন্টিং না হলে আর রাজার দাম কি? গোরা দুঃখ করে, তার তাগাদা সত্ত্বেও তার নিজের অয়েল পেন্টিংটা এসে উপস্থিত হয় নি এখনো। চার তর্পা বাই আনা হয়েছে, আধমণ বরফ আনা হয়েছে। বিলের টাকা সব আশুবাবুকেই দিতে হবে। রাজার পাত্রমিত্ররাও ভাল ভাল জামা কাপড় কিনে ফেলে। এর দামও আশুবাবু মেটাবেন।

ইতিমধ্যে একটা গোলমাল শোনা যায়। আশুবাবুর বিধবা ভ্রাতৃবধূর নিরালা ঘরে নাকি গোরাচাঁদের ইয়ার সুরেন ধরা পড়েছে। অনেকদিন ধরে ছোটরানীর সঙ্গে নাকি সুরেনের অবৈধ প্রণয় চল্‌ছে। নদেরচাঁদ তাকে গলায় কাপড় বেঁধে টান্‌তে টান্‌তে রাজাবাহাদুরের কাছে এনে হাজির করে। "কি—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা?"—বলে রাজাবাহাদুর মারতে মারতে তাকে অজ্ঞান করে দেন। পুলিসের ভয়ে তখন সুরেনকে ছোটরানীর ঘরেই শুইয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘরটাই কোণের দিকে। পাছে লোক জানাজানি হয়, তাই রাজাবাহাদুর সব কিছু অনুষ্ঠানই বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। মোসাহেব দীনবন্ধু মনে মনে বলে,—"বাবা, রাজা হওয়া ত কম কথা নয়। পহা চাই। আর যেন কেও এমনতর রাজা টইটেল যেচে নিয়ে ধনেপ্রাণে মজে না।......এমন ফাঁকা টাইটেল নিয়ে কেবল নাকাল হওয়া আর বেউজ্জ্বৎ। ......একেই বলে সুখে থাকৃতে ভূতে কিলোয়।"

টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি? (কলিকাতা—১৮৮৯ খৃঃ)—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণেরই অস্তিত্ব এই প্রহসনে উপলব্ধি করা যায়। সরকারের আক্ষেপ লক্ষণীয়—"আমি উপাধিধারী অনেকের কাছে যাই, সকলেরই দেখি এই অবস্থা, দেনার জন্যে ব্যতিব্যস্ত, তথাপি উপাধির সম্ভ্রম রাখা চাই। হা উপাধি! কলির তুমিই সর্ব্বনাশের কারণ।"

কাহিনী।—জমিদার মহেন্দ্র রায় অর্থব্যয় করেন বটে, কিন্তু অযথা করেন না। পিতামাতার নামে অতিথিশালা স্থাপন করা কিংবা শ্রাদ্ধে সামাজিক ভোজ দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর খুব আপত্তি। কারণ তাতে নিজের খ্যাতি হয় না। তাঁর মতে, "Man being reasonable must try to cut a figure for himself." অর্থ সদ্ব্যয়ের উপায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"উপায় Title পাওয়া, Levea-তে যাওয়া, Ball and Supper এ হাওয়ার ন্যায় মেমদিগের সঙ্গে নৃত্য করা।" তিনি বলেন, দয়ালু বলে তাঁর পিতামাতার নাম সাধারণ লোকে ক'রে থাকে বটে, কিন্তু সংবাদপত্র মহলে কিংবা সাহেব মহলে তাঁর নিজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। "বেওয়ারিশ অসভ্য দেশের জন্য কোন কায করা on principle উচিত নহে;……আমার আবার সুখ্যাতির প্রয়োজন কি? যে ধনে ধনকুবের তার আবার সুখ্যাতির প্রয়োজন?" সে বলে,—"চাই Title, সেই titleএর জন্য আমার যত অর্থব্যয় হয় তা কর্ত্তেও প্রস্তুত আছি। Title ছাড়া নাম, লক্ষ্মীশূন্য গৃহ, আর পাখীশূন্য খাঁচা এ তিনই সমান।" এ সবেতেই আসল খ্যাতি। রাজা উপাধি লাভ করবার জন্যে মহেন্দ্র পাগল হয়ে ওঠেন। ঝিয়ের কথায়,—"কর্ত্তা পাগলা কুকুরের মতো ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে।" খ্যাতি পাবার জন্যে মহেন্দ্র সর্বত্র 'Donate' করে বেড়ান। বিষয় আশয় ও সঞ্চিত অর্থ ক্রমেই নিঃশেষিত হয়। গিন্নীর গয়নাও বাঁধা পড়ে। সরকার মশায় ভীত হয়ে ভাবে,—"এ কি উপাধি, না সমাধি।" "পাওনাদারের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন, কিন্তু চাঁদার খাতা সামনে এলেই দু চার হাজার দেওয়া আছে। তবিলে টাকা নাই, গহনা বন্ধক দাও, বাড়ী পাট্টা রেখে টাকা নিয়ে এস; এ করেও নাম চাই। বলিহারি কলিকাল!" ক্রমে ক্রমে সত্যিই বসত ভিটেও বাঁধা পড়ে। এমন দীন অবস্থায় একদিন মহেন্দ্র সরকার থেকে রাজাবাহাদুর সম্মান পেলেন। কিন্তু তাতে তাঁর দুর্দশা আরও চরমে পৌছোয়। তিনি রাজা হয়েছেন শুনে অনেকেই চাঁদার খাতা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। রাজার কাছে

কি তাঁরা খালি হাতে ফিরবেন! রাজা তখন প্রমাদ গণলেন। একদিকে রাজা উপাধির সম্মান, অন্যদিকে ঋণ! হাতে বাজার খরচেরও পয়সা নেই। পরে দেবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথম ধাক্কা তিনি সাম্‌লান। কিন্তু পেট চলে না। মাইনের অভাবে ঝি-চাকর সব বিদায় নিয়েছে। অথচ রাজা হয়ে চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করতে তিনি লজ্জা পান। "আজ উদরান্নের জন্য ব্যস্ত; ভিক্ষা কর্ত্তে পারি না; Title সে পথে আমার প্রতিবন্ধক; এখন স্বদেশের দিকে দৃষ্টিপাত না কল্লেও আমার নিস্তার নাই; আমি এখন বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় দেনায় বিদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্ কচ্চি।" অবশেষে বন্ধু জ্ঞানদার কৃপায় অর্থাগমের একটি উপায় হয়। বর্ধমানের দুর্ভিক্ষের প্রতিকারে গঠিত Famine Relief Fundএর Chairmanএর পদ রাজাবাহাদুরের ভাগ্যে জোটে। বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর নামে প্রচুর টাকা আসে মাণি অর্ডারে। মিথ্যে হিসেব দেখিয়ে তিনি তাই দিয়ে সংসারের খরচ চালান। মহেন্দ্র একদিন ঝির কাছে বলেন,—"বর্দ্ধমানে বড়—ওই যে কি বলে ছিয়াত্তর সাল হয়েছে, তাই লোকজন না খেতে পেয়ে মরে যাচ্চে, দেশের বড় বড় লোক আমার কাছে টাকা পাঠাচ্চে, আমি যাব টাকা ছড়াব আর তাড়িয়ে দিয়ে আসবো।" ঝি অবাক হয়ে বলে, সে টাকা তো লুকিয়ে লুকিয়ে বৌদির বাপেরবাড়ী যায় গয়না খালাস হবার জন্য। সহকারী ও কেরানী রমেশও টাকা সরাতে আরম্ভ করে। "কি বল্‌বো, এতে বেশ দু পয়সা পাওয়া আছে তাই এত করে পায়ে হাতে ধরে আছি তা না হলে কবে ছেড়ে দিতুম।" মহেন্দ্রের কাছেই অবশ্য তার দীক্ষা। মহেন্দ্র তার সামনেই বাজার খরচ দশ টাকা নিয়ে লিখতে বলে Advertisement খরচা হিসেবে। এই ভাবে মহেন্দ্রের দিন কাটে। তাঁর মতে "Charity begins at home." কিন্তু দুজনের বেপরোয়া তছরূপে শেষে তিনি ধরা পড়লেন। Chairman হিসেবে তিনিই দোষী, রমেশ নয়। একদিন পুলিশ মহেন্দ্রকে ধরে নিয়ে যায়।

মহেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে পরিবারের সবাই কাতর হয়। হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জ্ঞানদা এসে বলেন, মহেন্দ্র দিনকতকের জন্যে বিদেশে গিয়েছেন, মাঝে মাঝে দশ টাকা করে দেবার কথা জ্ঞানদাকে বলে গেছেন, তাই তার কথা মতো তিনি মহেন্দ্রের মাকে টাকা দিচ্ছেন! দাসী অবাক হয়ে ভাবে, ...তে কোনোদিন মার হাতে টাকা দিতেন না, মার জন্যে খরচের ...কা বৌদি বাপেরবাড়ী থেকে আনাতো! যাহোক জ্ঞানদার চেষ্টায়

Famine Relief Fund-এর Chairman-এর পরিবার অনাহারের হাত থেকে বাঁচে।

এদিকে কনষ্টেবল মারতে মারতে হাজতে নিয়ে যাবার পথে মহেন্দ্রকে বলে,—"ভদ্র হোকে কম্পানিকা রাজা হোকে, যো আদমি ঠক্‌লাতা উন্‌কো কোন্ বোলতা ; উত চামার হ্যায়।" কনষ্টেবলের মার খেতে খেতে রাজাবাহাদুর মহেন্দ্র রায় নিতান্ত কাতরভাবে দর্শকদের টাইটেলের মোহ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে যান। "দর্শকগণ! বন্ধুগণ! আমার ন্যায় আপনাদের মধ্যে যদি কেহ টাইটেল পাবার আশা করে থাকেন, তা ত্যাগ করুন, যদি কেহ ভণ্ড দেশহিতৈষী থাকেন, সে আশাও মনে মনে জলাঞ্জলি দিন, এ পথে আর অগ্রসর হবেন না। আমাদের মত লোকের টাইটেল কেন? রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, K. C. I. E., C. I. E. সামস্থলসালাম দুই দিনের জন্য ; আমরা খেতে পাইনে ; ইংরাজ আমাদের টাইটেল দিয়ে কেবল সর্ব্বনাশ কচ্চেন, তাই পাবার জন্য আমার ন্যায় চেষ্টা করবেন না।"

বক্তৃতায় অধৈর্য হয়ে "চল্ বে চল্"—বলে কনষ্টেবল গুঁতো নিয়ে রাজা-বাহাদুরকে নিয়ে যায়।

ল-বাবু (কলিকাতা—১৮৯৮ খৃঃ)—দুর্গাদাস দে॥ টাইটেলের লোভে আত্মমর্যাদা নাশের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় থাকলেও আয়ব্যয় অসঙ্গতি জনিত আর্থিক দৃষ্টিকোণের মূল্য দিয়ে প্রহসনটিকে এখানে উপস্থাপন করাই যুক্তিসম্মত। আয়ব্যয়ের অসঙ্গতি কেবল আয়ক-কে ধ্বংস করে না, তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল সমস্ত পরিবারেরও ধ্বংস সূচনা করে। প্রহসনকারের উদ্দেশ্য এই বক্তব্য প্রচার।

কাহিনী।—ন-বাবু টুনিরাম ভৃত্য শিবের উচ্চারণে ল-বাবু। ল-বাবু টাইটেল পাবার জন্যে পাগল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী যাতে সুপারিশ করে, সেজন্যে তাকে নিয়ে নিয়ে ঘুরেছেন। তাকে বিবিয়ানা শিখিয়েছেন। ছোটো মেয়েদের বিলিতি স্কুলে দিয়েছেন। তবু তাঁর টাইটেল মেলে না। এসব ব্যাপারে খরচ কম তিনি করেন না। তবে টুনের পেট্রন নরহরিবাবু আছেন তাই রক্ষে। তবে তিনিও আজকাল বড়ো হুঁশিয়ার হয়ে পড়েছেন। তাই ল-বাবুর আজকাল দুর্দশা।

আজকাল দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে। তাই মেয়েরা জোট বেঁধে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে বেরোয়। আণ্ডার গ্রাজুয়েটরা পেটের দায়ে সিঁড়ি কাঁধে বালতি আর পোঁচরা হাতে মেতুয়ার দলে মিশে কাজ করে। আর যেসব ছোকরার ওপর এখনো চাপ পড়ে নি, তারা বার্ডস্ আই সিগ্রেট্ ধরিয়ে মদ খেয়ে বেড়ায়, বেশ্যাবাড়ী যায়, গৃহস্থবাড়ীর ছাদে তাকায়।

নানা ব্যাপার দেখতে দেখতে চাকর শিবেকে সঙ্গে নিয়ে ল-বাবু নতুন-বাজার থেকে জিনিস কিনে মুটের মাথায় চাপিয়ে ফেরেন। সম্ভবতঃ টাইটেলের লোভে ভেট দেবার জন্যে এগুলো কেনা হয়। মুটেকে আজকাল বিশ্বাস নেই। তাই মুটের কোমরের খুঁটের সঙ্গে তিনি নিজের চাদরের খুঁট বেঁধে পথ চলেন? "মুটে ব্যাটাগুল তেমনি চোরের সদ্দার। এক এক ব্যাটা যেন হোসেন খাঁর নানা, চোকটী যদি পালটেছ, অমনি রাস্তা ভুলে গলি ঢোকবার চেষ্টা!" শুধু তাই নয়, ল-বাবু কুলিকে খোসামোদ করেন, পায়ে ধরেন। আজকাল খোসামোদেরই যুগ ইতিমধ্যে এক রসবতী তাঁতিনী আসে। ল-বাবু তার সঙ্গে রসিকতা এড়াতে পারেন না। তিনি রসিকতা করছেন, শিবেও তাতে যোগ দিচ্ছে, এরমধ্যে ফাঁক পেয়ে মুটে জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়ে। রসে হাবুডুবু খেয়ে হঠাৎ মাথা তুলে দেখে যে কুলি নেই! সঙ্গে সঙ্গে তিনি কুলির খোঁজে শিবের সঙ্গে ব্যর্থ ছোটাছুটি করেন। ভেট দেওয়া আর হয় না।

টুনিরামের 'সিজন ফ্রেণ্ড' জ্যাঠা-যেদো এক চাপরাশিকে টুনিরামের আড্ডাবাড়ীতে সসম্মানে নিয়ে আসে। টাইটেল পেতে গেলে গোড়ায় চাপরাশিদের খোসামোদ করতে হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সাহেবদের নজরে এলেই কেল্লা ফতে। কিছুক্ষণ আগেই এক মুদী বাকী পয়সা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে আদালত দেখাবে বলে শাসিয়ে গেছে। কিন্তু চাপরাশি ঘরে ঢুকলে টুনিরামের মেজাজ দরিয়া হয়ে ওঠে। এক উড়ে চাপরাশি এসেছে! জ্যাঠা-যেদো আর ল-বাবু দুজনেই তাকে অভ্যর্থনা করে,—"আইয়ে চাপরাসী সাহেব, আইয়ে, চেয়ার পর বৈঠিয়ে।" চাপরাশি চেয়ারের ওপর বসলে ল-বাবু তার পায়ের কাছে বসেন। শিবে ল-বাবুর আদেশে আলবোলা নিয়ে আসে। ল-বাবু স্বয়ং তার মুখে আলবোলা ধরেন। বলেন,—"সাহেব আমি রায়বাহাদুর হব তো? হবতো?" উড়িয়া চাপরাশি উত্তর দেয়,—"তু তো রায়বাহাদুর হচ্ছন্তি।" দিল্লীউলী বাঈজীকে সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্যে

ডাকা হয়। গান বাজনা চলে। ইতিমধ্যে হঠাৎ ল-বাবুর পেট্রন্ নরহরিবাবু এসে পড়েন। এ সব দেখে ঘৃণায় লজ্জায় ল-বাবুকে ধিক্কার দেন।—"এ যে আমাদের হুদ্দর পাইখানার চাপরাসী! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! টুনিবাবু! ছট্। চোবে! শালা লোক কো নিকাল দেও।"

চৌরঙ্গী রোডে জ্যাঠা-যেদো আর শিবে টুনিরামকে বদ্দিনাথের এঁড়ে সাজিয়ে নিয়ে আসে। ল-বাবুর গলায় চাঁদার থলে। টাইটেল পাবার জন্যে এই চাঁদা আদায়। নরহরিবাবু পয়সা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করেছেন। "মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে যেমন জামাইয়ের দরওয়ান হওয়া চাই, তেমনি সংসারে থাকতে গেলে মান চাই। টাইটেল্ চাই।" কিন্তু টুনিরামের থলেতে একটা আধলাও পড়ে না। তাঁর বন্ধু 'নূতনবাবু' এলে টুনে তাকে দুঃখ করে বলেন,—"টাইটেল পাবার লোভে তিনি সেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ ওথেলো আর জুলিয়াস সিজারের খানিকটা পড়ে ফেলেছেন। তবু মিল্‌ছে না।" গো-সাজে অনেকক্ষণ থেকে টুনিরাম কষ্টবোধ করেন, তাই শিবের কাছ থেকে মদ নিয়ে পান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নেশা হয়ে যায়। চ্যাংদোলা করে তাঁকে ফুটপাথে নিয়ে যাওয়া হয়। হঠাৎ এ ব্যাপার দেখে এক পশুক্লেশ নিবারণী সভার ইন্‌স্পেক্টরের চোখে পড়ে। গোহত্যা করবে ভেবে তিনি ছুটে আসেন। ভালো করে পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন মানুষ! সঙ্গে সঙ্গে চলে যান। কিছুক্ষণ পর পাহারাওয়ালা তাঁকে ঝোলাতে করে নিয়ে যায়।

ল-বাবু টুনিরামের শালা টেলিফোঁকুমার। তিনি বিজ্ঞান-পাগল। তবে তাঁর দুঃখ—ল-বাবু রায়বাহাদুর হলে মুরুব্বির জোরে তার একটা গতি হতো। সে এক বয়স্কা বারবণিতাকে ভালবাসে। বিজ্ঞানবলে নাকি সে তাকে যুবতীতে পরিণত করবে। যাহোক টেলিফোঁকুমার লালদীঘি বিজ্ঞানের জোরে মন্থন করে। লালদীঘির জলে সমুদ্রের চাইতেও নাকি বেশি রত্ন আছে। তেলাকুচা বিলাসিনী, এঁচোড় কামিনী, মোচামালিনী ইত্যাদি আধুনিকা স্বাধীনা মেয়েরা মন্থনের ফলে দীঘি থেকে ওঠে। এরা বলে—এরা নাকি সুখের পায়রা, প্রেমই এদের ব্যবসা। বাজে জিনিস উঠছে দেখে টুনিরাম শালাকে আবার মন্থন করতে বলেন। এবার ওঠে কতকগুলো স্কুলের ছোটো ছোটো বালিকা—চৌরঙ্গী চপলা, হেদুয়া বিরহিনী, চেতলা চাতকিনী ইত্যাদি এদের নাম। এরা নিজেদের পরিচয় দেয়। এরা নাকি "ছানা-জেনানা।" "বি এল এ ক্লে, সি এল এ ক্লে পড়ে মোরা বাবা চিনি না।"—"বিয়ে করে ফুটফুটে বর—করব কত

কারখানা"—তার স্বপ্নেই এরা মশগুল। এসব "এঁচোড়ে পাকা" "শিশুশিক্ষা বেটীদের" পেয়েও টুনিরাম সন্তুষ্ট হয় না। আবার মন্থন করতে বলে। এবার একটা টাইটেল গাছ ওঠে—গাছে অনেকগুলো লেজ ঝুলছে। সেই সঙ্গে এক কাঁদি কলাও ওঠে। দীঘি থেকে ওঠা মেয়েদের একজন মন্তব্য করে,— "তুমি যেমন দরের লোক তোমার তেমনি টাইটেল হয়েছে, নাও, টুনিবাবু লেজটা নাও। লেজ নিলে তোমার লাভ আছে।" মাতাল হয়ে টুনিরাম যখন আড়ষ্ট হয়ে শিবনেত্র হয়ে পড়ে রইবেন, আর মুখে মাছি ভন্‌ভন্‌ করবে, তখন মাছি তাড়াবার জন্যে লেজ খুব কাজ দেবে। যারা টাইটেল দেবে বলে চেষ্টা করছিলো, সেইসব খোসামুদে বাবুদের দেবার জন্যে এই কলার কাঁদি।

এদিকে টুনের বাড়ীতে বিবিয়ানা ঢুকেছে। টুনের মা বুড়ী পুজোয় বসেছেন। টুনের বড় মেয়ে মালঙ্ক এসে বলে, "ঠাকুর মা! তুমি স্বর্গস্থ পিতার সহিত প্রেম কর, তিনি তোমাকে পরিত্রাণ করবেন।" সামনের বিগ্রহটা ফেলে দিয়ে সে বলে, পুতুল পুজো ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরমা তার সঙ্গে স্কুলবাড়ী চলুক, সেখানে তাকে সে উপাসনা শেখাবে। বুড়ী ভাবে, টুনে নিজে উচ্ছন্নে গিয়েছে, এবং মেযেদেরও উচ্ছন্নে দেবার ব্যবস্থা করেছে! টুনিরামের স্ত্রী পুরোপুরি বিবি। নিজের ঘরে সে মেয়েদের নিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে মজ্‌লিশ বসায়। জেলাসী এসে বলে হিঁদুয়ানী ছাড়তে, ঘোমটা দিয়ে স্বামীর বাধ্য থাকার বিরুদ্ধে সে বক্তৃতা দেয়। টুনিরামের স্ত্রী রেবতী নিজে পুরুষের সাজে সেজেছে, অন্য সবাইকেও সাজিয়েছে। তারা সব জু-বাগানে বেড়াতে যাবে। টুনিরাম এসে এ সব দেখে স্ত্রীকে অনুযোগ করলে স্ত্রী বলে, —স্বামীই তো এ সব শিখিয়েছে, এখন পেছ-পা হলে চলবে কেন? তিনি এখন যেন নিজের টাইটেলের দিকেই মন দেন, এসব নিয়ে মাথা না ঘামান। টুনিরাম বোকা বনে যান। টুনিরামের এক মেয়ে তার বান্ধবীদের জুটিয়ে এনে বাড়ীতেই বিদ্যাসুন্দর থিয়েটার আরম্ভ করে দেয়। এমন সময় টুনিরাম আসেন। তাঁকে দেখে তাঁর মেয়ে (বিদ্যা সেজেছে সে) বলে ওঠে,—তিনি যেন তাঁর জামাইকে চোর বলে না ধরেন। তার বাবাকে সে বীরসিংহ ভেবে নিয়ে একথা বলে ওঠে। বাবা তখন তাকে অকথ্য গালাগালি দিলেন চোদ্দ-পুরুষ তুলে। মেয়ে তখন ব্রাহ্ম ঢঙ্গে বাবাকে বড়ো বড়ো বাক্য দিয়ে সান্ত্বনা দেয়। টুনিরাম আক্ষেপ করেন।

টাইটেলের লোভ টুনিরামের এখনো যায় নি। তিনি চাপরাশিদের সঙ্গে

নির্দেশ মতো জু-বাগানে গেলেন। চাপরাশিরা তাঁকে বল্লো, যে লেজটি টুনিরাম পেয়েছেন, সেটিই তিনি টাই হিসেবে পরুন। তারপর এই খাঁচার মধ্যে থাকুন। চাপরাশিরা তাকে একটা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। টুনিরাম আক্ষেপ করে। টাইটেলের লোভে তিনি নিজের পায়ে কুড়োল মারলেন!

জু-বাগানে ল-বাবু টুনিরামের বিবি স্ত্রী রেবতী দলবল নিয়ে বেড়াতে এসে খাঁচার মধ্যে নিজের স্বামীকে দেখে পুলকিত হয়। সঙ্গিনীরাও রেবতীর হজব্যাণ্ড্‌কে এই অবস্থায় দেখে, অত্যন্ত আমোদ পায়। স্বামীকে উদ্দেশ করে রেবতী বলে,—"যে স্বামী নিজের স্বার্থের জন্য পুত্রের গলায় ছুরী দিতে পারে, তাদের এ অপেক্ষা আরও বেশী সাজা পাওয়া উচিত। তোমার দোষেই আমি দোষী। আমি তোমায় দুট পয়সা ফেলে দিচ্ছি দড়ি কিনে গলায় দিও, আর আমিও পারি যদি দিব।"

বাঙ্গালির মুখে ছাই (কলিকাতা—১৮৭৫ খৃঃ)—গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়॥
নান্দীতে লেখক বলেছেন,—

"প্রণমি জগত শিবে করি এই আকিঞ্চন।
দোষ মম ত্যাগ করি করুন গুণগ্রহণ॥
মনে করি আজি গাই, বাঙ্গালির মুখে ছাই।
সভাজন বিরতি কেবল করিছে বারণ
আপনারা গুণস্বামী উপদেশ কি দিব আমি,
জনমে অহিত যাহা রায় বাহাদুর কারণ॥
যদি ভাব আমার স্মার, হবে হেন মুক্তি দ্বার,
ভাবিয়ে তাহাই মনে করুন ইংরাজ সেবন॥"

কাহিনী।—যাদববাবু একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি তাঁর বৈঠকখানায় পরাণ, বিপিন, লক্ষীনারায়ণ ইত্যাদি অনুগত লোকদের নিয়ে তাস খেলছিলেন। এমন সময় ব্রজদুলাল নামে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এসে যাদবের কাছে কিছু সাহায্য চায়। ব্রজদুলাল বলে—তার বাড়িতে প্রতি বছর দুর্গোৎসব হয়, তাছাড়া দুমাস ধরে নিত্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি পাঠ হয়। তারপর সঙ্কীর্তন হয়। এতে প্রায় হাজার টাকা খরচ হয়। বর্তমান বছরে অনাবৃষ্টি হওয়ার জন্যে অভাব পড়েছে। ভবানীপুরের হরিচরণ রায় যাদববাবুর কাছেই তাঁকে পাঠিয়েছেন। যাদববাবুর সাহায্য পাবার

আশায় তিনি এসেছেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে যাদববাবু বললেন—তিনি সম্প্রতি পাঁচ হাজার টাকা কোম্পানীকে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবে, যে ব্রাহ্মণকে হাত তুলে একটা পয়সা দিলে না, সে আবার পাঁচ হাজার টাকা দিবে। ব্রাহ্মণ চলে যাবার পর দারোয়ান্ এসে একটা বইয়ের সঙ্গে একটা চিঠি দিলো। তাস খেলা বন্ধ করে যাদব বল্‌লেন,—আজ বেলভেডিয়ারে একটা মিটিং হবে; এটা তার নোটিস। পরাণ জিজ্ঞাসা করে,—গেলোবারের মিটিংয়ে কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে! যাদব বলেন, "সহরের যত কানা, কুঁজো, খোঁড়া আছে তাদের থাকবার একটা স্থানের বিষয়।" বিপিন বলে,—এতেও ত সাব্‌সক্রিপ্‌সন দিতে হবে? যা হোক সাহেবরা বাঙ্গালীবাবুদের সব "বদ্দিনাথের এঁড়ে" করে তুলেছে। "যখনি যা বলে তখনি তাইতে ডিটো দিয়ে আসেন।" যাদব বলেন, "যদি একটা রায়বাহাদুর কিংবা রাজাবাহাদুর টাইটেল সামান্য দু হাজার কি পাঁচ হাজার টাকায় পাওয়া যায়, এর বাড়া আর সুখের বিষয় কি?"

যাদববাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী প্রতিবেশিনী বাদামীর সঙ্গে গল্প গুজব করে। তাদের কোন ছেলে নাকি পণ্ডিত হবে এক 'দৈবগ্যি' হাত গুণে বলেছিলেন। বাদামী বলে তার ১২ বছরের ছেলে এবার পাশ দিলেই তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। কাত্যায়নী কথা প্রসঙ্গে বলে, তার স্বামী মিটিংয়ে গেছেন। মিটিং কি বাদামী তা জানে না। সে ভাবে, সেটা বুঝি কল। সে মন্তব্য করে—কলে কাজ ভাল, বোসেরা তেলের কলে মানুষ হয়ে গেল। কাত্যায়নী বলে, তার যা কিছু ছিল সব গেছে, বাড়ীগুলো বাঁধা পড়েছে, খালি আটপৌরে গয়নাগুলোই সার হয়েছে। এই গয়নাগুলো নেবার জন্যে দুবেলা কতো মিষ্টি কথা বলেন। তাঁকে কিছু বলতে গেলে তিনি নাকি বলেন,—"শিগ্‌গিরই আমি তোমায় রাণী-বাহাদুর করে দিচ্চি।" বাদামী চলে গেলে কাত্যায়নী চুপ করে শুয়ে থাকে। যাদব স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে মনে মনে ভাবেন, আজ গঞ্জনার হাত থেকে তিনি বাঁচলেন! "আমি কি তেম্‌নি ইষ্টুপিড্, যে মাগের কথা শুনে যেখানে সেখানে যাওয়া আসা ত্যাগ করবো।" কিন্তু কাত্যায়নী জেগেই ছিলো। সে যাদবকে দেরীতে আসবার জন্যে কৈফিয়ৎ চায়। যাদব বলেন, তিনি খারাপ কোথাও যান না। তিনি নানা বিষয়ে লেক্‌চার দেন—"কিসে সহর থেকে ওসব কুব্যবহার যায় তার চেষ্টা করি, কত শত চাঁদা দি।" তাঁর নামে সাহেবদের কতো চিঠি আসে। এমনভাবে একদিন তাঁর কাছে রাজা

খেতাবেরও চিঠি আসবে। কাত্যায়নী এসব কথা বিশ্বাস করে না। সে রেগে গিয়ে বাপেরবাড়ী যাবার ভয় দেখায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রওনাও হয়। যাদব রাগ করেও কিছু বল্‌তে পারেন না, কেননা স্ত্রীর গয়নাই কেবল তাঁর শেষ সম্বল অবশেষে তাই তিনি স্ত্রীকে খুঁজতে যান—এতে রাত্রে সে কোথায় গেলো।

যাদববাবুর বাড়ীতে এমন কাণ্ড কারখানা, এসব নিয়ে বাগানে কয়েকজন যুবক আলোচনা করছিলেন। এরা বলে,—যাদববাবু এখনও ঠেকেও শিখছেন না। উনি ওঁর সব সম্পত্তি সাহেব মহাপুরুষদের দায়ে ফুকেছেন। তিনি নাকি রায়বাহাদুর কিংবা রাজাবাহাদুর হবেন। তাকে যদি বাড়ী বয়েও টাইটেল দিতে আসে, তাহলেও সে নেবে না। কেন না বন্দুক ঘাড়ে সেপাই রাখতেই প্রতিদিন পাঁচসিকে খরচ করতে হবে। এমন সময় যাদববাবুর ছেলে ক্ষেত্রকে আসতে দেখে যুবকরা ভাবে ক্ষেত্রর সঙ্গে তারা একটু রঙ্গরস করবে। ক্ষেত্র যুবকদের দেখে ভাবে, আগে এদের সঙ্গে তার কত সৌহার্দ্য ছিলো। অথচ এরা এখন তাকে রাজাবাবুর সন্তান বলে উপহাস করে। ক্ষেত্র তার বাবাকে কতো বুঝিয়েছে, কিন্তু বাবা কোনো কথা শোনেন না। ক্ষেত্র কাছে এলে যুবকরা তাকে বিশ্বকর্মার পুত্র বলে বিদ্রূপ করে। তারা বলে,— "বিশ্বকর্ম্মা যেমন কৌশল ও বিস্তর পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ কতকগুলি কীর্তি রাখিয়াছেন, এঁর পিতাও সেই প্রকার টাকা খরচ রূপ কৌশল এবং খোসামোদ জন্য পরিশ্রম দ্বারা রায়বাহাদুর ও রাজাবাহাদুর প্রভৃতি কতকগুলি রাখিতে চাহেন।" যুবকরা চলে গেলে ক্ষেত্র অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে বলে,—"তুমি কি নিমিত্তে আমার পিতাকে এই প্রকার কুপথ প্রদর্শন করান।" যদি বাবা মারা যান, তাহলে মার কি অবস্থা হবে। দেশের এতোবড়ো একজন লোকের ছেলে হয়ে কিভাবে ভিক্ষা করে খাবে। যাহোক ক্ষেত্র সঙ্কল্প করে, শেষবারের মতো তার বাবাকে অনুরোধ করবে, যদি না শোনেন, তবে, সমাজে যাতে মুখ দেখতে না হয়, সে পথ সে অবশ্যই দেখ্‌বে।

ক্ষেত্র অবশেষে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঝি ক্ষেত্রর মা কাত্যায়নীকে ডেকে আনে। কাত্যায়নী পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছেন বলে যাদব আক্ষেপ করেন। তিনি খেদ করে বলেন,—"তুমি ত আমাকে পুনঃ পুনঃ বলেছিলে, কিন্তু হতভাগ্য আমি ইংরাজ মদে মত্ত হয়ে তোমার সে সব কথা শুন্‌তে পাই নাই।" কাত্যায়নী ইতিমধ্যে শোকে পাগল হয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। যাদববাবু

তখন ঝি ভগীকে তার পেছনে পাঠিয়ে দেন, যাতে তার কোন বিপদ না ঘটে। কিছুক্ষণ পর ভগী ফিরে এসে সংবাদ দেয় যে কাত্যায়নী বঁটি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। একথা শুনে মূর্ছিত হয়ে গেলেন।

বিপিন আর পরাণ এসে ক্ষেত্রবাবুর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে। এমন সময় যাদব জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার বিলাপ করেন। বিপিনকে দেখতে পেয়ে যাদব বলেন,—"ধন মান প্রাণ সমুদয় গেল, আর আমার বিমান জীবনে প্রয়োজন কি।" পরাণ মন্তব্য করে, ক্ষেত্র যখন এতোদিন ধরে তাঁকে বুঝিয়েছে, তখন রায়বাহাদুর হবার লোভে তিনি তা তো কানে তোলেন নি। রায়বাহাদুর না রাজাবাহাদুর! "ধিক্ বাঙ্গালি জাত্‌কে।··· নিঘৃণ বাঙ্গালিরা কি একবার মনে ভাবেন না যে ইংরাজেরা তাদের এগুণের প্রশংসা করে না বরং ঘৃণা করে।···বাঙ্গালিকে ধিক্। সেই সকল মহাপুরুষ-দিগকে ধিক। চিরকাল বাঙ্গালিরা অর্থলোভে দাসত্ব করে কিন্তু এ সকল মহাপুরুষেরা অর্থ দিয়ে দাসত্ব করে। এমন বাঙ্গালিরা গলায় দড়ি দিক, ধিক এমন বাঙ্গালিদিগকে, এমন বাঙ্গালির মুখে ছাই।"

ভুটিয়া মানিক বা দারজিলিন্যের নক্সা (১৮৯৮ খৃঃ)—**ধীরেন্দ্রনাথ পাল**॥ মফঃস্বলের এক খেতাব পাওয়া নতুন রাজা বিলাসিতার জন্যে তার অনুচর তথা সহচর মানিকের সঙ্গে দার্জিলিঙে বেড়াতে আসে। সে পদে পদে হাস্যকর কাজ করে বসে—কেন না তার ইংরাজী জ্ঞান ছিলো অসম্পূর্ণ। তাছাড়া ইংরাজী আদব কায়দাও সে জানতো না—তবু ইংরাজী হালচালে তার চলা চাই। রাজাটিকে হাস্যকরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

'টাইটেল' মোহকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রচুর প্রহসনে বিদ্রূপের অবকাশ থাকলেও একমাত্র 'টাইটেল'-মোহের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণযুক্ত প্রহসন আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। তবে ব্যাপক অনুসন্ধান হয়তো এ ধরনের আরও কয়েকটি প্রহসন আবিষ্কারে সমর্থ।

৩। পণ-প্রথা

বিরাট আর্থিক চাপে পিষ্ট ও ক্ষয়িষ্ণু রক্ষণশীল স্বার্থ যখন স্বক্ষেত্রে বলাৎকার-মূলক আয়নীতি প্রয়োগ করে, তখন কয়েকটি অর্থঘটিত প্রথাপালনের ওপর চাপ পড়ে। পণ-প্রথার মূলে যে জটিল আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ আছে,

তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এখানে নয়। তবে একথা বলা চলে পৃথিবীর সব সমাজেই বিবাহ ক্ষেত্রে আর্থনীতিক সম্পর্ক কিছুটা থাকে—তা মুদ্রা বা দ্রব্য—দুইটির বা যে কোনো একটীর আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে সামাজিক ব্যয় ইত্যাদি মুদ্রায় সম্পাদিত হয়। অনেকের মত, আমাদের দেশের সামাজিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি বলে অর্থনীতি নিয়মে দুর্বল পক্ষের ওপর মুদ্রা দানের চাপ পড়ে। এই মুদ্রাই পণ—যা আমাদের সমাজের বিবাহ সম্পর্ক বন্ধনে অপরিহার্য অঙ্গ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় E.A. Gait সাহেবের তত্ত্বাবধানে আমাদের সমাজের পণ-প্রথার যে হিসেব সম্পাদিত হয়েছে, তা থেকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রহসনযুগের পণপ্রথা কিছুটা অনুমান করতে পারি—বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর সঠিক হিসেব পাওয়া যখন সম্ভবপর নয়। তাছাড়া E.A. Gaitএর হিসেবও মোটামুটি হিসেব। তাছাড়া এসময়ে সামাজিক আয়ের ওপর প্রভাবশালী তেমন কিছু আর্থনীতিক পরিবর্তন ঘটে নি।

Gait সাহেব বলেছেন, আমাদের বিবাহ চুক্তিতে প্রথার বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের বিবাহ অভিভাবক দ্বারা সম্পাদিত হয়। কোথাও বরের অভিভাবক কন্যার অভিভাবকের কাছ থেকে পণ-গ্রহণ করে। কোথাও আবার তার বিপরীত আদান-প্রদানও ঘটে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে (অত্যন্ত কম সংখ্যক সমাজ সঙ্ঘের মধ্যে) আর্থিক কোনো আদান-প্রদান ঘটে না।[১] যে ক্ষেত্রে আদান-প্রদান ঘটে না, সে ক্ষেত্রে দ্রব্য আদান-প্রদান ঘটে কি না, কিংবা অন্য আপাত নিষ্ক্রিয় চুক্তি থাকে কিনা, তার উল্লেখ Gait সাহেব করেন নি। এর কারণ তিনি পণ নিয়েই পরিসংখ্যান দিয়েছেন। সাধারণতঃ উঁচু জাতে বরপক্ষই পণ গ্রহণ করে। এই প্রথা আভিজাত্য সৃষ্টি করায় নীচুজাতের মধ্যে সচ্ছল এবং সম্ভ্রান্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এই প্রথার অনুসরণ দেখা যায়। "But generally, it is mainly a question of demand and supply ; the party who has to pay, and the amount he must give depends on the relative demand for brides and bridegrooms, and this again is determined to a great extent by the existence or otherwise of certain practices, such as hypergamy, widow

১। Census of India, 1901, Vol.-VI Part—I

remarriage, and the like২. যেখানে পণ কন্যার মূল্য হিসেবে পরিগণিত হয়, সেখানে তার মাত্রা নির্ভর করে তার বয়স, কিছুটা রূপ ও অন্যান্য আকর্ষণের ওপর। কুমারীর ক্ষেত্রে দর বাড়তে থাকে তার সামর্থ্য অবস্থা (maturity) পর্যন্ত। কিন্তু বিধবার ক্ষেত্রে প্রাক সমর্থকালীন মূল্যবৃদ্ধি একরকম নয়। তুলনামূলকভাবে সেখানে বিধবার মূল্য কুমারীর মূল্যের চাইতে কম। তাছাড়া বিধবারা সাধারণতঃ অধিসমর্থ বলেও তাদের মূল্য কমে যায়। তবে কয়েকটি জাতের মধ্যে দেখা যায় (যারা সাধারণতঃ শ্রম-জীবী) পরিণত এবং জীবিকা সক্ষম (expert in the work by which people of the caste ordinarily live) বিধবার মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কা এবং সুন্দরীর চেয়েও বেশি। বরপক্ষকে পণ দেবার সময় নতুন আর্থনীতিক কাঠামোতে উপযোগিতার কথা একই কারণে বিচার করা হয়। "The degree of B. A. is a very valuable asset in the matrimonial market." (p—251).

সাধারণ নিয়মে কন্যার পিতা পাত্রকে এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে তার সহগামী ব্যক্তিদের উপহার দিয়ে থাকেন। আগেকার দিনে পণ ষোল টাকাতেই নির্দিষ্ট থাকতো কিন্তু পরবর্তীকালে উপযুক্ত পাত্র সন্ধানের কষ্টসাধ্যতায় বরপক্ষ থেকে মাত্রাতীত পণ দাবীর সুযোগ আসে। পল্লী অঞ্চলের থেকে শহর অঞ্চলে পণের অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পায়। কুলীনদের মধ্যে ক্ষেত্র নির্বাচন ও বাঁধাবাঁধি অত্যন্ত বেশি থাকে বলে কুলীনদের মধ্যে দাবীর উগ্রতা লক্ষ্য করা গেছে। পাত্রী যদি রজস্বলা হয় কিংবা কুৎসিতা হয়, তাহলে আনুপাতিকভাবে বরপণ বেড়ে যায়। রজস্বলার ক্ষেত্রে পণবৃদ্ধির কারণ, তার আবার বিয়ের চেষ্টা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কুৎসিতার ক্ষেত্রে পণবৃদ্ধির কারণ পাত্রী ইচ্ছিত নয়। বরের উচ্চশিক্ষা বরপণের মূল্যবৃদ্ধিতে একটি বিশিষ্ট উপাদান। অলঙ্কার ছাড়াও এক হাজার টাকা নগদ পণ দেওয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষের সময় একটা সাধারণ ঘটনা। বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকাও নগদ বরপণ হিসেবে প্রদান করবার দৃষ্টান্ত আছে। শ্রোত্রিয় পাত্রীর পিতার পক্ষে পাত্র সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন ততোটা হতে হয় না। তার একটি কারণ সে তার কন্যাকে শ্রোত্রিয় এবং কুলীন উভয় সমাজের পাত্রকেই

২। C. I. (1901) Vol.,—VI, Part-I, P-251.

সমর্পণ করতে পারেন। আর একটি কারণ এই যে, কুলীন পরিবারে অন্তত একটি শ্রোত্রিয় কন্যা বিবাহ করবার একটি বাধ্যতামূলক নিয়ম ছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে শ্রোত্রিয় সমাজে কন্যাপণ দুইশ টাকা থেকে পাঁচশ টাকার মধ্যে ওঠানামা করেছে।

রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বরপণ প্রথা বীভৎসতার পর্যায়ে এসেছিলো। তবে নীচু সম্প্রদায়ের শ্রোত্রিয় বা বংশজের মধ্যেও অবস্থা বিপর্যয়ে এই অর্থ-লোভের দৃষ্টান্ত অস্বীকার করা যায় না। এই প্রথা বিভিন্ন জেলার অঞ্চল বিশেষে অত্যন্ত প্রকট। ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে সূপকারবৃত্তিগ্রাহী ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা গেছে যে তারা কন্যাপণ পাঁচশ টাকা পর্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছে, এবং অনেকে কন্যা সংগ্রহে আর্থিক অক্ষমতায় বহুদিন কৌমার্য অবস্থায় দিন যাপন করেছে।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ীসম্প্রদাযের অনুরূপ উপসম্প্রদায় দেখা যায়। তবে রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে যেখানে একটি উপসম্প্রদায় বংশজ নামে পরিচিত, বারেন্দ্রশ্রেণীতে সেই মানে অবস্থানকারী সম্প্রদায় 'কাপ' নামে পরিচিত। শ্রোত্রিয়রা তিনভাগে বিভক্ত—সিদ্ধ, সাধ্য এবং কষ্ট। বিবাহের প্রথাগত জটিলতা রাঢ়ীদের তুলনায় এদের মধ্যে কম, পণাঙ্কও তুলনামূলক বিচারে অল্পই দেখায়; তবে সাধারণ রীতিনীতি একই রকম। একজন কুলীন পাত্র কুলীন কন্যা বিবাহ করলে পঞ্চাশ থেকে একশ টাকা পেয়েছে বলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের হিসেবে দেখা যায়। শ্রোত্রিয় পাত্র শ্রোত্রিয় কন্যা বিবাহ করলেও একই ধরনের পণ পেয়েছে। অনেকক্ষেত্রে তারা কেবলমাত্র পিতৃগৃহ থেকে পাওয়া স্ত্রীর অলঙ্কারেই সন্তুষ্ট থেকেছে। কিন্তু শ্রোত্রিয়দের মধ্যে যারা নিজের কন্যার জন্যে কুলীন বা কাপ পাত্র ইচ্ছা করে, তারা মোটা অঙ্কের বরপণ দিতে —এমন কি এক হাজার টাকা দিতেও বাধ্য হযেছে। এক্ষেত্রে নীচু সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাপণ প্রচলিত আছে।

বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি সম্প্রদায় আছে—পাশ্চাত্য এবং দাক্ষিণাত্য। পাশ্চাত্য বৈদিকদের জাতপাত নিয়ে বেশি বাঁধাবাঁধি নেই। যা কিছু বাঁধাবাঁধি দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের মধ্যে। দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের মধ্যে কুলীন, বংশজ এবং মৌলিক—এই তিনটি উপসম্প্রদায় আছে। আগেকার দিনে বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোনো পক্ষের দিক থেকেই পণপ্রথা ছিলো না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষেও বাখরগঞ্জ জেলার বৈদিকদের মধ্যে পণপ্রথার

প্রচলন হয়নি। কিন্তু পণ যখন প্রথা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে, তখন একশ টাকা—পাঁচশ টাকার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পণ ওঠানামা করেছে। বিশেষ ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা পণের দৃষ্টান্তও আছে।

বাংলাদেশের কায়স্থদের দুভাগে ভাগ করা যায়—কুলীন এবং মৌলিক। কুলীনদের কুল পুত্রগত (isogamy)। একজন কুলীন তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে কুলীন ঘরের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে বাধ্য থাকে। অন্য পুত্রদের জন্য অবশ্য যে কোনো ঘরের কন্যা আনা যেতে পারে। মৌলিকদের মধ্যে সম্ভবস্থলে পুত্রকন্যাদের বিবাহসম্বন্ধ কুলীন পরিবারে সম্পাদিত হলে তার মান উন্নত হয়, অসমর্থতায় মান নেমে যায়। উত্তর রাঢ়ী কায়স্থদের মধ্যে সর্বত্রই বরপণ দেওয়ার রীতি আছে। অন্যান্য উপসম্প্রদায়ের মধ্যে পণ নির্ভর করে বরের শিক্ষা দীক্ষা আভিজাত্য আত্মীয়সম্পর্ক ইত্যাদিতে এবং কন্যার রূপ-গুণ ইত্যাদিতে। যেক্ষেত্রে উভয়ের মানই সমপর্যায়ের, সেখানে কোনো পক্ষেরই পণ দেবার রীতি অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দেখা যায়নি, তবে পাত্রীপক্ষ বরের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে কিছু অর্থ দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। একজন গ্রাজুয়েট কায়স্থ অনেক পণ দাবী করবার উপযুক্ত ছিলো, এমন কি তার সামাজিক পর্যায় পাত্রীপক্ষ থেকে হীন হলেও। ঢাকাতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমপর্যায়ের বিবাহ সম্বন্ধে একজন গ্রাজুয়েট পাত্র কন্যাপক্ষের কাছ থেকে এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করেছে এবং একজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট পাঁচশ টাকা থেকে সাতশ টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করেছে। বরপণ প্রথা ক্রমে ব্যাপক হয়ে ওঠায় এবং পণের অঙ্ক বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক বহুকন্যাসম্পন্ন পিতা নিঃস্ব হয়ে জীবনে পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতাব্দীতে বিরল নয়। রজস্বলা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা সমাজের চোখে দোষাবহ। তাই পিতা নিজেকে এবং পরিবারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেও সমাজের অনুবর্তন করেছে। তবে কায়স্থদের কন্যাপণের ক্ষেত্রে যেখানে অত্যন্ত বেশি চাপ দেখা গেছে সেখানে পাত্র অবিবাহিত থেকে গেছে। কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের তুলনায় এসব ব্যক্তির সংখ্যা কম।

বাংলাদেশের অন্যান্য জাতের মধ্যে সাধারণতঃ 'ঘরের' চেয়ে 'পাত্র' বিচারের ক্ষেত্রই বেশি। বিধবাবিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ হলেও বিপত্নীকদের বড়ো-একটা অবিবাহিত দেখা যায় না। এই কারণে কন্যার চাহিদা বেশি

লক্ষ্য করা যায়; এবং যথারীতি কন্যার পিতাই পণগ্রহণের অধিকারী হয়। এই সমস্ত জাতের মধ্যে উঁচু জাতের রীতিনীতি পালনের মাধ্যমে আভিজাত্য অর্জনের চেষ্টা থাকায় জাত নির্বিশেষে সচ্ছল ও বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের এবং আগুরী, সদ্‌গোপ, তিলি ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতের মধ্যে বরপণ প্রথার দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও দেখা গেছে। হাওড়া ও নদীয়ার চাষী কৈবর্ত্ত সমাজে বরপণ ক্রমেই বেড়েছে এবং ফলে আগেকার দিনের তুলনায় কন্যার বিবাহকালও অনেক পেছিয়ে গেছে, এটাও লক্ষ্য করা গেছে। নীচু জাতের মধ্যে বরপণ প্রথার দৃষ্টান্ত থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীতে তা বিরল ছিলো। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পাত্রপক্ষ পাত্রীর পিতাকে কন্যাপণ দিতো। পণের অঙ্ক কম ছিলো না। গোয়ালা এবং রাজবংশীয়দের মধ্যে দেখা গেছে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা থেকে কন্যাপণ তিনশ টাকা পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। Gait সাহেবের হিসেবে, কোচদের মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিত থাকায় তাদের সমাজে কুমারী কন্যাপণ সাধারণতঃ কুড়ি টাকা এবং বিধবা কন্যাপণ দশ টাকা। নমশূদ্র এবং পোদদের কন্যাপণ পনের টাকা থেকে একশ পঞ্চাশ টাকায় এবং বোষ্টমদের মধ্যে পঁচিশ টাকা থেকে একশ পঁচিশ টাকায় ওঠা নামা করে।[৩]

বিবাহে স্বাভাবিক লেনদেনের মধ্যে যখন বলাৎকার প্রকাশ পায়, তখনই তা সামাজিক দিক থেকে ক্ষতির সূচনা করে। পণপ্রথা সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি। তা বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত প্রচুর আলোচনা গ্রন্থ এবং তর্ক বিতর্কের অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায়। পরবর্তী যুগে (১৩৩৪ সাল) রাধিকাপ্রসাদ শেঠ চৌধুরী "বরপণ ও ক্ষতি" নামে একটি গ্রন্থের মলাটে পদ্য লেখেন—

"বরপণে বিষমক্ষতি। পড়লে বুঝবে যাবে ভ্রান্তি॥"

৬৪ পৃষ্ঠার বইটিতে তিনি ১৮ রকম ক্ষতির উল্লেখ করেছেন।

আমাদের আয়নীতি যখন প্রগতিশীল আর্থনীতিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তখন আমাদের রক্ষণশীল অর্থনীতি সমাজ এবং ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আয়নীতি প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছে। এই ধরনের আয়নীতির অন্যতম্ বিবাহব্যবসায়। অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমাদের এই বিকৃত গতিবিধিকে বিদ্রূপ করে একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে।[৪]

৩। C. I. (1901), Vol. VI, Part—I

৪। পাস করার ডাকাতি বা বরকন্যা বিক্রয়—মোহিনীমোহন সেনগুপ্ত বি. এল্. (২য় সং ১৩০৪) পৃ: ১৪-১৫।

"বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই ব্যবসায়ে আপনাদের নিকট প্রতিপন্ন হইবে। কে বলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নহে?' কে বলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ের উপকারিতা বুঝে না? কে বলে বম্বেবাসীদিগের নিকট বাঙ্গালী বাণিজ্যে পরাভূত? এমন বণিক জাতি কি পৃথিবীতে আছে?"

আগেকার দিনে জাঁতপাত নির্ভর সংস্কৃতির চাপে কুলীনদের কাছে বিবাহটা ব্যবসা হিসাবে গণ্য ছিলো। এই বিবাহে কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিলো না এবং আর্থিক দায়িত্ব বা খোরপোষের সমস্যা ছিলো না। তৃতীয়তঃ দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন ব্যবসায় লাভ অত্যন্ত নিশ্চিত করে এনেছিলো। কুলদীপিকায় বলা হয়েছে,—"কুলীনস্য সুতাং লব্ধ্বা কুলীনায় সুতাং দদৌ, পর্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ অত্র যত্ত্বন্যথা ভাবো ভবেদপি যথাবিধি, ক্রমাগতেষু বর্গেষু তদাহাবির্ভবিষ্যতি।" একটু আগে উল্লিখিত বইটিতে কুলীনদের বিবাহ-ব্যবসায় সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে,—"যদি অর্থব্যয় করিলে ইহলোকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, যদি ক.য়ক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ স্বর্গে গমন করে, তবে এমন মূর্খ কে আছে যে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া কুলীনে পুত্রকন্যা বিবাহ না দিবেন?" (পৃঃ ১২)

ক্রমে আর্থনীতিক বিবর্তনে কৌলীন্য ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বোক্ত লেখক বলেছেন,—"বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে পণগ্রহণের এক নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালের কুটিল স্রোতে দিন দিন বঙ্গসমাজে অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহপ্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রাচীন সমাজে যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না, প্রাচীন সমাজে যাহার প্রাপ্তিতে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিত, যে কৌলীন্যপ্রথা বঙ্গসমাজের অস্থি-মজ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, সেই প্রথার পরিবর্তে সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার সমাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। পিতামাতা বন্ধুভ্রাতা কন্যাকে বিদ্বান পাত্রে সমর্পণ করিতে ব্যস্ত, বিশ্ববিদ্যালযের উপাধিধারী পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে পিতা কৃতার্থ।" Gait সাহেবের সেই মন্তব্য স্মরণীয়—"The degree of B. A is a very valuable asset in the matrimonial market." বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমাগত শিক্ষা পণের অঙ্ক বৃদ্ধি করেছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর একটি সুপরিচিত গান।[৫]—

৫। সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত, ১২৯৯ সাল—পৃঃ ৪৫৮।

"বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয় ;
বাঙ্গালায় কন্যাদায় যত গৃহস্থ-লোকেরা মারা যায়।
না হতে এন্ট্রেন্স পাস, চায় গো রূপার থাল গেলাস,
বি. এ. সোনার ঘড়া গাড়ু, এমেতে সর্ব্বস্ব চায়।"

গানটি অমৃতলালের "চোরের উপর বাটপাড়ি" প্রহসনটি থেকে জনপ্রিয় হয়েছে।

অপর একটি গানে আছে[৬]—

"পাশ করা নয় বাঙ্গালীদের,
নাশ করা কেবল।
পাশের জ্বালায় পাশ ফেরা দায়,
এ পাশ ধরায় কে আন্‌লে বল !"

বরপণকে যে 'পাশ' অসম্ভব বাড়িয়ে তোলে এটা বল্‌তে গিয়ে চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বি. এ. বল্‌ছেন[৭]—"বঙ্গদেশে যে ব্যক্তির পুত্র আছে, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান্ পুরুষ অতি বিরল। তাহার উপর যদি সেই পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় প্রশংসাপত্র লাভ করে, তাহা হইলে রত্নকাঞ্চনের যোগ হয়, পিতা ধনসঞ্চয়ের উপায় পান ; পুত্র হইতে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইবে মনে করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। কেন না এ উপার্জ্জনে পরিশ্রম নাই, আয়াস নাই, ইহাতে রাজস্ব নাই। রাজকর নাই।"

বরপণের মতো কন্যাপণও আমাদের সমাজের একটা ব্যাধি। একদা কন্যাপণের যে যে ক্ষেত্র ছিলো সেগুলো বরপণের মধ্যে রূপান্তর লাভ করছে। কন্যাপণ আমাদের সমাজে এতো সাধারণ হয়ে গিয়েছিলো যে একটি প্রবাদের জন্ম হয়েছে—"বিয়ে ফাঁদতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি।" উনবিংশ শতাব্দীতে কন্যা বিক্রয়ের বিরুদ্ধেও দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। কন্যা বিক্রয় নিষেধার্থক বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বচনও অনেকে উদ্ধার করেছেন। অধিকাংশ লেখকই নিম্নোক্ত পরিচিত শ্লোক পাঁচটিই উদ্ধার করে গেছেন :—

১। শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভ মোহিতাঃ
আত্মবিক্রয়িন পাপা মহাকিল্মিষ কারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমম্ কুলম্ ॥

৬। সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত, ১২৯৯ সাল—পৃঃ ৪৫৭।
৭। বঙ্গ বিবাহ—চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বি. এ., ১২৮৮ সাল।

২। য কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষ হ্রদ সঙ্কুলং ॥
৩। ক্রয় ক্রীতাতু যা নারী ন সা পত্ন্যাভিধীয়তে।
৪। ন কুর্য্যাদর্থ সম্বন্ধঃ কন্যাদানে কদাচনঃ ॥
৫। ক্রয় ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে। —ইত্যাদি।

বাংলা প্রহসনে পণপ্রথা নিয়ে একদিকে যেমন বিদ্রূপও আছে, অন্যদিকে তেমনি সমাধানকল্পে বিভিন্ন চিন্তাও প্রচার করা হয়েছে। অর্থলোভ মানুষের দাম্পত্যাদিক সম্পর্কে বিবেচনাবোধকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করেছে। এই হৃদয়হীনতাকে "পাঁঠা-পাঁঠী বেচার" সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। অমৃতলাল বসুর "চোরের উপর বাটপাড়ি" প্রহসনে (১৮৭৬ খৃঃ) আছে,—

"ছি ছি বঙ্গবাসিগণ, ঘৃণায় কি পোড়ে না মন,
পাঁঠা-পাঁঠার মতন কোরে কি
বেটাবেটী বেচতে হয়।"

রাধাবিনোদ হালদারের "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" প্রহসনে (১৮৮৫ খৃঃ) কন্যাপণলোভী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে "পাঁঠী বেচা বামুন" বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কখনো কখনো গরু ব্যবসায়ীও বলা হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের "ঘর থাকতে বাবুই ভেজে" প্রহসনে (১৮৬৩ খৃঃ) প্রমীলা বল্‌ছে,—"আমাদের এখন সে সব (স্বয়ম্বরা) কিছুই নাই, যেমন গরুর ব্যবসায়ীরা আপনার মনের মত দাম পেলে, পালা পোষা গরুটাকে কশাইয়ের কাছে বেচতেও পেছোয় না, তেম্নি পণ পেলে এখানকার অনেক মা বাপ, কানাই হোক, আর কুজই হোক, মেয়েটা সুখে থাকুক বা না থাকুক, একটা যেমন তেমন বরের হাতে সোঁপে দেয়। বশ! বাপের কাজ কল্লেম আর কি!" এ ধরনের মেয়ের বাপ রায়মশায়ের বক্তব্য ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "কোনের মা কাঁদে" (১৮৬৩ খৃঃ) প্রহসনে প্রকাশ পেয়েছে। ঘোষাল ঘটককে রায়মশায় বল্‌ছে,—

"ও সকল কথা মুখে এনো নাক আর।
আমরা ধারিনে কোন কৌলীন্যের ধার ॥
লেখাপড়া বুঝে কিবা আছে প্রয়োজন।
বেশী পণ যেবা দিবে সুপাত্র সেজন ॥"

কন্যাপণের ওপর লেখা বিখ্যাত প্রহসন শিশিরকুমার ঘোষের "নয়শো

রূপেয়া" (১৮৭৪ খৃঃ)। রামধনের অর্থলোভ অত্যন্ত হাস্যকরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক জায়গায় সাতু রামধনকে বলেছে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে মেয়ে বেচতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম উঠবে। লোভ দেখিয়ে সাতু বলে, বিশেষ করে সোনার বেণেদের নজরে পড়তে পারলে অনেক টাকা রামধন আক্ষেপ করে,—"পাঁচ হাজার টাকা! পোড়া দেশ, সমাজ দুরন্ত, স্ব ইচ্ছায় কিছু করবার যো নাই।" অন্যত্র এক জায়গায় রামধন চিন্তা করেছে, বিধবা বে হলে মন্দ হয় না। বুড়ো মুখুজ্যে বর হিসেবে আটশ টাকা দিতে চেয়েছে। ও মরে গেলে আবার বে দেওয়া যাবে এবং পাঁচ সাতশ টাকা পাওয়া যাবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রামধন বলেছে,—"বামুনে কপাল, আশা কোরলে হয় কি? পোড়ার দেশে থেকে যে ইচ্ছামত কর্ম্ম কোরব, তা আর হবে না। এ মেয়েটীর বে হোয়ে গেলেই আমারও ফসল ফুরাল। আর যে সন্তানসন্ততি হবে সে ভরসা নাই।" শ্রোত্রিয় পাত্রদের অবস্থাও প্রহসনকার বর্ণনা করেছেন তাদের মুখের ভাষায়। কার্তিক বলেছে—"টাকা পাবো কোথা যে বে কোরবো? যা ছিল, বেচে কিনে বিবাহ কোরলাম। কথা হ'ল এই যে, আমার মেয়ে হলে তাহা বেচে ভায়াদের বে দেব। তা মেয়ে হবার আগেই গৃহশূন্য হলাম।" বিধবাবিবাহ, ব্রাহ্মিকা বিবাহ, বোষ্টমী সংগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিকৃত অভিলাষও তাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

কন্যাপণ আমাদের সমাজে আর্থিক দিক থেকেই যে শুধু ক্ষতি এনেছে, তা নয়, যৌন দিক থেকে অযোগ্য বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দাম্পত্য সুখ-শান্তি নষ্ট করেছে। এর পরিণতিতে অনেকের মৃত্যুচিত্র প্রহসনকারদের অনেকে দেখিয়েছেন। প্রফুল্লনলিনী দাসী নামাঙ্কিত "ষষ্ঠীবাটা" প্রহসনে (১৮৮৭ খৃঃ) মৃত্যুপথগামিনী চারুশীলা বলেছে,—"আমার এই বর্ত্তমান অবস্থা দেখে সতর্ক হোতে যত্নবান হবেন, যেন কেহ কন্যাকে অর্থের লোভে অসৎ পাত্রে প্রদান না করেন।"

একদিকে যেমন কন্যাপণ অন্যদিকে তেমনি বরপণ সামাজিক সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। বরপণলোভী আদর্শ বরের বাপকে চিত্রিত করেছেন রামকৃষ্ণ রায় তাঁর "লোভেন্দ্র গবেন্দ্র" প্রহসনে (১৮৯০ খৃঃ)।—

"শ্যাম॥ মহাশয়! বুঝলেম, আপনি টাকা পাবার জন্য সবই কোত্তে পারেন!

লোভেন্দ্র ॥ আজ্ঞে, সবই পারি। খুন খারাবি—চুরি চামারি—জুওচ্চুরি বাটপাড়ী—জাল জালিয়াতি—ফন্দি ফিকির—কলা কৌশল—ফাঁকিমি ঠকামি—ধূর্ত্তুমি মিথ্যেমি ইত্যাদি সমস্ত পুণ্যকর্ম্মই কোত্তে পারি।

শ্যাম ॥ ধন্য ধন্য! আপনি তবে যে সে নন—সাক্ষাৎ কলি।

লোভেন্দ্র ॥ আরও একটা।

শ্যাম ॥ কি সেটা?

লোভেন্দ্র ॥ Model Bridegroom's Father! যাকে বাঙলায় বলে আদর্শ বরের বাপ! অন্য অন্য বাবারা আমার কাছে ছেলেরূপ পাঁঠা বেচা শিখে নিক।"

বাস্তবিক বরপণের হারবৃদ্ধি বাজারকেই মনে করিয়ে দেয়। দুর্গাদাস দে'র লেখা "ছবি" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) কালাচাঁদ বলেছে,—"চালের দরের মতন ছেলের দর খুব বাড়ছে। ওর নাম কি আকালের সময় যদি ধরে রাখতে পাত্তুম তো কিছু হতো।" হীরালাল ঘোষের "রোকা কড়ি চোকা মাল" প্রহসনে (১৮৭৯ খৃঃ) বিকৃত রুচির সঙ্গে অনুরূপভাবে নাপিতের ছড়ার মধ্যে দিয়ে একই ভাব অভিব্যক্ত হয়েছে—

"গিয়েছিলাম ভোরে উঠে
বর খুঁজতে হাবড়ার হাটে,
হাজার টাকা বরের দর,
যে যার মেয়ে বে কর।"

"বিয়ের বাজার" শব্দটি আমাদের সমাজের অত্যন্ত বেশি ব্যবহৃত শব্দ। বিংশ শতাব্দীতেও এই শব্দটি একইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বোক্ত "লোভেন্দ্র গবেন্দ্র" প্রহসনে লোভেন্দ্র গান করেছে,—

"এক এক ছেলে দশ হাজারে
বেচবো কসে বের বাজারে
মেয়ের বাবার দফা রফা,
ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দেবো॥"

মেয়ের বাবার দফা যে রফা হয়, তা আমাদের সমাজে "কন্যাদায়" নামে পরিচিত শব্দটির ঘনিষ্ঠতাতেই উপলব্ধি করতে পারি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুঃখ মর্মান্তিক। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "কন্যাদায়" প্রহসনে (১৮৯৩ খৃঃ)

চন্দ্রনাথ দুঃখ করেছে,—"হাঃ ভগবান! হাঃ ভগবান! এমন অর্থ পিশাচ সমাজও হোলো যে টাকাই সব বলে গণ্য হ'ল। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করে দেড়েমুষে ছেলের বে-তে সর্ব্বগ্রাস করে, মেয়ের বাপ মাকে পথের ভিখারী করে, টাকা নিয়ে কি তারা স্বর্গসুখ পাবেন!" কন্যাদায়ে আর্থিক চাপের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সাংস্কৃতিক চাপ। অমৃতলাল বিশ্বাসের "গাঁয়ের মোড়ল" প্রহসনে আছে, —রামসদয় হরনাথের বিপক্ষে গেলে, দলাদলির কথা শুনে স্ত্রী উমা বলে, "যখন সে আমাদের দেশের বড মানুষ, তাকে সকলেই মানে, তখন তার বিপক্ষে দাঁড়ালে তুমি পারবে? আর এখন তোমার কন্যাদায়—কোথায় তুমি পাঁচজনের খোসামোদ করে কার্য্য উদ্ধার করে নেবে—তা নয়, কিনা আদোত যে পাড়ার মোড়ল, তাকেই চটান।" সাংস্কৃতিক চাপ শুধু পরিবেশগত ভাবে আসেনি; কিছুটা Institution-গত ভাবেও এসেছে। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "চপলা চিত্ত চাপল্য" প্রহসনে (১৮৫৭ খৃঃ) আছে,—বাসবের গৃহে কন্যাদায়গ্রস্ত ভিক্ষুক অনাগত এসেছে। সে বলে,—"মহাশয়, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত, তিনটি কন্যার এককালে বিবাহ উপস্থিত। ...জ্যেষ্ঠটির বয়স ১১, মধ্যমটির ৮, আর ছোটটির ৬ বছর বয়স। ...তিনটিকে স্বতন্ত্র ২ পাত্রে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা কি? একপণে তিনটি সমর্পণ করিতেই আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।" বাসব বলে, "একটি জামাতার যদি কাল হয়, তবে তিনটি বিধবা হবে।" অনাগত বলে তা সে সবই জানে কিন্তু তবুও সে নিরুপায়! আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে যুগ্ম বলপ্রয়োগে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "এই কি সেই" প্রহসনে (১৮৭৯ খৃ) শরৎ স্বগত ভাবে বলেছে, —"ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদায় যেরূপ বিষমদায় এমন দায় আর দুটী দেখতে পাই না! আগে এরূপ ছিল না, কিন্তু কালে এটি এমনি ভয়ানক হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যাঁহার অগাধ নগদ ক্যাশ ও যথেষ্ট বিষয় আছে, তাঁহারও কন্যা হোলে একটী ভয়ানক ভাবনা এসে উপস্থিত হয়।"

সমাজের এই দুরপনেয় পণপ্রথার লোপ সাধনে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন উপায় প্রহসনকাররা চিন্তা করেছেন। অনেকে পাত্রপাত্রী পক্ষ থেকে বিদ্রোহ কামনা করেছেন। কেউ কেউ প্রেমঘটিত বিবাহ অনুমোদন করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার অনেকে আইন প্রণয়নের সাহায্যে বন্ধ করবার জন্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। সমস্যাকে তুলে

ধরে অনেকে সমাধান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাও করেছেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "কন্যাদায়" প্রহসন (১৮৯৩ খৃঃ) থেকে ছাত্রদের কথোপকথন উদ্ধৃত করলেই সেটা বোঝা যাবে।—

কিশোরী তার ছাত্র বন্ধুকে বলে,—"তোমরা ত জানই যে, বিবাহে টাকা লওয়া আমার মত নয়। ছেলেবেলা থেকে ক্লাবে ঐ সম্বন্ধে Lecture দিয়ে এসেছি।—আজ যদি আমি আপনার মত আপনি না বজায় রাখতে পারি, তাহলে ত লোকে হাসবে।" ২য় ছাত্র বলে তারও ঐ মত। ১ম ছাত্র বলে,—"যা বল্‌ছো তা ঠিক বটে। কিন্তু কয়জন লোক ঐ মতে কাজ করে?" ১ম ছাত্র ছোটলাটকে একটা স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র পাঠাতে উদ্যোগী। ২য় ছাত্র বলে,—"একেবারে অতটা উঠলে কেন আগে, সমাজের বড়লোকের কানে ওটা তুল্লে হত না?" কিশোরী বলে,—"সমাজ, হিন্দুসমাজ! তারা বড়লোক, তাদের কানে কি ও কথা তুলতে এতদিন বাকি আছে! অনেকদিন হয়ে গেছে। অনেক লোক চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে, তবু চোখ ফোটে না। এখন Government-এর দ্বারা এরূপ একটা rate না বেঁধে নিলে গরীব গেরস্থ লোকেরা মারা যাবে। তুমি বড়লোকের কথা বল্‌ছো, তারা কি মানুষের মত মানুষ, নিজে টাকার উপর, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকেন, মনে করেন, সবাই বুঝি তাই।" ২য় ছাত্র বলে,—"কিন্তু এখন Government পত্র Social matter-এ interfere করলে হয়। Government বুঝিবেন না। তাঁরা ত আর অবুঝ নন, consent আইন, যাতে এত আপত্তি, তাও পাশ হল। আর Government এ কাজ করবেন না তা আমার বিশ্বাস হয় না।" ১ম ছাত্র বলে,—"পাশ হলেই উপকার ভিন্ন ত আর অপকার নাই।" কিশোরী বলে,—"উপকার বলে উপকার! অনেকে দেনা হতে বাঁচবে। এখন এমনি সমাজ হয়েছে, একটা মেয়ে জন্মালেই বাপ মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। ...টাকার ভয়ে কত পাষণ্ড বাপ মা, আতুরে নুন খাইয়ে মেয়েকে মেরে ফেলতে ক্রটি করেন না।" তখন ২য় ছাত্র মন্তব্য করে—"সকল Educated men যদি এই দিকে নজর দেয়, তাহলে আর ভাবনা কি?"

সামাজিক চিন্তাভাবনার ইতিহাসে এইসব বক্তব্যের মূল্য আছে, সন্দেহ নেই। প্রহসন রীতি অনুযায়ী সমস্যা বিশ্লেষণের অবকাশ কম। তাই এ ধরনের বিশ্লেষণ বিরল। তবে সাধারণভাবে অর্থলোভকে দৃষ্টিকোণের সমর্থন-

পুষ্টির মাধ্যমে অসঙ্গত হিসেবে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টাই দেখা যায়। অবকাশে প্রযুক্ত ঘটনাগুলোর মাত্রা নির্ণয়ের অবকাশ আছে। অবকাশে প্রযুক্ত ঘটনার মাত্রা বিচারের সঙ্গে লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতা সম্পর্কে ধারণা যথার্থ সমাজচিত্র উপস্থাপিত করবে।

কন্যাপণ ॥—

কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে (১৮৬৩ খৃঃ)—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ কন্যাপণের বিরুদ্ধে কন্যাকর্তার অর্থলোভের দিকটি উপস্থাপিত করে প্রহসনকার মুখ্যভাবে আর্থিক দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশ্য অযোগ্য পরিণয়ের বিরুদ্ধে যৌন দৃষ্টিকোণও অপ্রতিষ্ঠিত নয়।

কাহিনী।—রায়মশায়ের মেয়ে ডাগর হয়েচে। রায়মশায়ের ইচ্ছে, মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে কিছু টাকা রোজগার করেন। এজন্যে তিনি পাত্রাপাত্রের ধার ধারেন না।—

"লেখাপড়া বুঝে কিবা আছে প্রয়োজন।
বেশীপণ যেবা দিবে সুপাত্র সেজন।"

ঘটকরা এক একজন আসেন, পাত্রের সংবাদ দেন, কিন্তু দরে বনে না। রায়মশায় বলেন,—"আজকাল একটা আঁতুড়ে মেয়ের দর কত। আঁতুড় খরচ, আর এই যে এগারো বছর খাওয়ানো গিয়েছে, তাতে কি কম খরচ হোয়েছে? লোকে আমাদের পাঁটাবেচা বামুন বলে কিন্তু তলিয়ে বুঝে না, যে কত ধানে কত চাল হয়। আপনারা বে কোরবো টাকা দিয়ে, আবার মেয়ের বিয়েও যদি টাকা দে দিব, তবে আমাদের দশা কি হবে?" ঘটক ঘোষালমশায় রায়মশায়কে দরে একটু নরম হতে বললে রায়মশায় বলেন,—"একশ-একশ পঞ্চাশ টাকায় ভাল মেয়ে পাওয়া যায় সত্য; ওদিকে জেতের বিষয়ে অনেকেরও কর্ম্ম হোয়ে যায়।" ঘটক বড়ালমশায়কে রায়মশায় বলেন, "মোশায়! আমাদের ঘরের একটি মেয়ে পাবার তরে কত লোক মুকুয়ে থাকে, কত লোক আগামী দুশো-একশো টাকা বায়না দে রাখে, আমরা ভরদ্বাজী রায়, আমাদের ঘরে মেয়েরা প্রায়ই মা-গোঁসাই হয়, কেমন সুখে থাকে।" রায়মশায় অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেন না—কম দর উঠ্‌বে বলে। মেয়ে ফেলে রাখবার মতো তাঁর অর্থসঙ্গতি আছে। "আমাদের ঘরে মেয়ে একটু ডাশিয়ে না

উট্‌লে আমরা বেচিনে। আমরা তো হাঁড়ী চড়িয়ে থাকিনে যে গো ডিম বেচবো!"

অবশেষে এক পাত্রের খবর আসে। পাত্র অত্যন্ত বৃদ্ধ। যা হোক, সে নাকি তাঁকে আটশ টাকা পণ দেবে। রায়মশায় ভাবেন, এই আটশ টাকা হাতে পড়লে এ অঞ্চলে তিনি একজন 'গণ্যমান্য' মানুষ হবেন। রায়মশায় স্থির করলেন, বিয়ের খরচা তিনি পাঁচ-সাত টাকার মধ্যে সেরে দেবেন। বিয়ের রাত্রে বর, বামুন, পরামাণিক, আর দুজন বরযাত্রী। চিঁড়ে দই খাওয়ালে কতোই বা খরচা হবে!

এই সম্বন্ধটা অবশ্য রায়গিন্নির পছন্দ হয় না। অসমবয়সীর বিয়ে সুখের হয় না। তাছাড়া, আর একটি পাত্রকে তার পছন্দ হয়েছিলো। পাত্রটি ওকালতি পড়ে এবং যুবক। কিন্তু একশ পঞ্চাশ টাকার বেশি পণ দিতে পারবে না। এখানেই রায়মশায় বেঁকে বসেন। তাছাড়া আরও বলেন,—"সে উকিলী শিখ্‌চে, উকিলদিগের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক কোত্তে আছে! কোত্তা থেকে পাচিল ডিংগে উত্তরাধিকারী হোয়ে যথাসর্ব্বস্ব নে বোস্‌বে। হাউড়ি। উকিলকে কি আমি জামাই কোত্তে পারি?"

বিয়ের দিন। বর এসে বসে। প্রতিবাসীরা ভাবে, তামাসা করে বুঝি বরের ঠাকুর্দা টোপর মাথায় দিয়ে এসে বসেছে। বরকে দেখে কনের মা ডুকরে কেঁদে ওঠে—"ওরে বাবারে কি হোলোরে, আমাদের মিনসে আমার মেয়ের হাতে পায়ে দড়ী বেঁধে জলে ফেলে দিচ্চে।" কয়েকজন মাতাল এসে 'শিবের বিয়ে' বলে নন্দীভৃঙ্গী সেজে উৎপাত আরম্ভ করে। মাতালদের মধ্যে বরের ছেলেও ছিলো। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, বাপের বিয়ে দেখতে নেই। সে আড়ালে চলে যায়। তার বন্ধুরা উৎপাত চালিয়েই যায়। ঘটক এসে তাদের মাতলামির নিন্দে করলে মাতালদের একজন ঘটককে বলে,—"আমি মদ খেয়ে যে অমানুষতা করছি, তুমি তার চেয়েও যে বেশি করছ।"

বর দেখে রায় গিন্নি একেবারে বেঁকে বসেন। মেয়ে তিনি এমন বুড়ো বরের হাতে দিতে পারবেন না। চটে গিয়ে রায়মশায় বলেন, "তোর বাপের মেয়ে যে আট্‌কে রাখ্‌ছিস? আঁব বাগান বাঁধা আছে, উদ্ধার করতে হবে।" গৃহিণী প্রতিবাদ করে বলে, মেয়েটি রায়মশায়েরও বাপের নয়। শেষে রায়মশায় নরম হয়ে গিন্নীকে বলেন,—"টাকাগুলো তুমিই নাও, আমার মান রাখ।" টাকার গন্ধে গিন্নির মন গলে যায়। চোখের জল

মুছে হাসি ফুটে ওঠে। কনের মা কাঁদতে কাঁদতে টাকার পুঁটলি বাঁধতে ব্যস্ত হয়।

ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি (কলিকাতা—১৮৮৮ খৃঃ)—রাধাবিনোদ হালদার॥ মলাটে লেখক একটি সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন,—"ধিক তাঞ্চ তঞ্চ মদনাঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ।" পূর্বোক্ত প্রহসনের মতোই কন্যাপণ ও অসমবিবাহের বিরুদ্ধে যথাক্রমে আর্থিক এবং যৌন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। নামকরণ অবশ্য যৌন দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য সূচনা করে এবং বৃদ্ধের দুর্দশা প্রদর্শন ও প্রচারের মধ্যে দিয়ে অসমবিবাহ সংঘটনে বৃদ্ধের সক্রিয়তা রোধের চেষ্টাই লক্ষিত হয়। তবে কন্যাপণের দিকটি এখানে গৌণ নয় এবং কিছুটা প্রদর্শনীর সুবিধার্থেও প্রহসনটিকে এখানে উপস্থাপন করা অসমীচীন নয়।

কাহিনী।—ভজহরির একটি মাত্র সন্তান—সে কন্যা সুশীলা। সুশীলা সমর্থ এবং সুন্দরী। তাকে নিয়ে ভজহরি বিপদে পড়েছে। স্বজাতি যত পাত্র সব মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্য ভজহরির কানের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা অনুরোধ উপরোধ করে। এতে ভজহরির পাগল হবার যোগাড়। "ব্যাটারা যেন আমাকে পাগল পেয়েছে। যেমন লাটসাহেবের পেছু পেছু হাজার হাজার লোক ফেরে,—তেমনি আমার একটা মেয়ে আছে বলে ব্যাটারা যেন আমাকে লাটসাহেব করে ফেলেছে।" প্রথম প্রথম মেয়ের দর ওঠাবার জন্যে অনেক পাত্র যাচাই করেছেন, এখন বিরক্ত লাগে। বিশেষ করে, তার ইচ্ছামতো দর কেউই দিতে যায় না, খামকা আসে।

নটবর আসে। সে বলে, সে ভজহরির কথা মতো এক হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে। বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলে। ভজহরির মেজাজ খারাপ হয়েই ছিলো। সে অকথ্যভাবে নটবরকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। নটবর যাবার সময় শাসিয়ে যায়, "দেখবো কেমন করে তোর মেয়েকে আটকিয়ে রাখিস্!"

চারুশীলা ভজহরির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। সুশীলা তারই কন্যা। আশা অনেক। "আমি কি যার তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিব, কখনই তা দিব না। মেয়ে কখন উপর থেকে নীচে নাববে না, দাসদাসী খাটবে; জামাই জমিদারের ছেলে হবে,—বয়স হদ্দ ষোল সতের হবে—দেখ্‌তে যেন কার্ত্তিকটি হবে—দশটা পাস দেবে—নৈকুশ্চি-ফুলের মুকুটী কুলীন হবে;—মাসে লাক্

টাকা আয় থাকবে ;—আমার সুশীলা, একলা ঘরের ধ্বরবাড়ীর একটী আদরের বৌ হবে।” প্রথমা স্ত্রী সুহাসিনীর সন্তান হয় নি বলেই ভজহরি চারুশীলাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু দুই সতীনের ঝগড়ায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। তদুপরি কন্যাদায় !

চারু ভজহরিকে ভাত খাবার জন্যে ডাক্‌তে এসে কথা প্রসঙ্গে কন্যার বিয়ের কথা আলোচনা করতে গিয়ে দেরী করে ফেলে। এমন সময় সুহাসিনী দুজনকে একত্র দেখে ভাবে, সোহাগের কথা হচ্ছে। সে বলে ওঠে, “ও মাগো, যেন বাবা-কেলে ভাতার পেয়েছিস্‌ আর কি।” অপরাধ, কেন স্বামীকে অনাহারে রেখে গল্প করছে ! চারু বলে, সে তার “মৌরুষী করা ভাতারকে” নিয়ে দুধ খাওয়াক। সুহাসিনী চতুরা,—সে ইঙ্গিত বোঝে। চারু তাকে পরোক্ষে বৃদ্ধা বলে ঠাট্টা করেছে। সেও তখন বলে,—“আমি আগে ফল খেয়ে আঁটীটা তোকে দিয়েছি, তবে তুই পেয়েছিস্‌।” চারুও বলে চলে—“হাঁ তুমি পেট থেকে দিয়েছ কিনা তাই পেয়েছি।” ভজহরিকে খাওয়াবার ব্যাপারে চারু সুহাসিনীকে ডেকে বলে, “সে আসুক, মায়ের মতন যত্ন করে খাওয়াবে।” সুহাসিনীও চারুকে ডাকে,—সেই বরং আসুক, “মেয়ের মতন কাছে বসে বাতাস করবে।” শেষে নিজেদের বাড়ীর রান্না দিয়ে ঝগড়া বাধায়। ভজহরি ভাবেন,—“এমন জান্‌লে কোন্‌ শালা দুটো বিয়ে কর্ত্তো ! সাত জন্ম যদি ছেলে না হয় তবুও যেন এমন কুকর্ম্ম কেউ কখন করে না !”

ভজহরি অবশেষে সুশীলার জন্যে একটা পাত্র স্থির করেন। চারুকে বলেন, পাত্রটি অতি সুপাত্র। ত্রিসংসারে সে একা—স্বহস্তে পাক করে খায়। দশটা পাস না হলেও তিনটে বিয়ে দিয়েছে। পাত্র ছেলেমানুষ—চিরকালই ছেলেমানুষই থাক্‌বে ; দাঁত আর গজাবে না। বাড়ীতে কুলগাছ আছে অতএব কুলীন। গুণও কম নয়,—পাশা বা শতরঞ্চ খেলায় সে খুব ওস্তাদ। চারু কিছু বুঝতে পারে না। সে বলে, ভজহরি যা ভালো বোঝে, তাই করুক। বলাবাহুল্য অর্থলোভী বৃদ্ধের হাতেই সোনার প্রতিমাটি অর্পণ করেন।

বৃদ্ধ তারাচাঁদ ভট্টচাযের বাড়ীতে সুশীলার দুঃখের শেষ নেই। তার সমস্ত আশায় ছাই পড়ে। ফুঁপিয়ে কাঁদে, আর বলে,—“ওঃ মা—তোমার আদরের সুশীলার কি দুরবস্থা হোয়েছে, একবার দেখে যাও। এমন বাড়ীতে বিবাহ হয়েছে যতক্ষণ পূজা কোরে একমুঠো চাল আনবে ততক্ষণে হাঁড়ী চাপবে।

হাঃ পরমেশ্বর! এত আশা কোরে, শেষ কালে বুড় বয়ের সঙ্গে বিবাহ হোল!"

এদিকে অপমানিত নটবর কুট্‌নী কমলার সহায়তায় সুশীলার সঙ্গে পরিচয় করে। যুবতী সুশীলা অতি সহজেই নটবরের প্রেমাসক্ত হয়। কারণ বৃদ্ধের প্রতি, সাংসারিক কর্তব্য ছাড়া বিন্দুমাত্র টান ছিলো না। কারণ সেখানে দাম্পত্য আনন্দের প্রতিশ্রুতি নেই। ছেলেবেলায় স্কুলে যখন সুশীলা পড়তো, তখনই নটবরের সংগে সুশীলার পরিচয় ছিলো। তাই নটবর মণ্ডপ হওয়া সত্ত্বেও তার আকর্ষণ সুশীলার কাছে প্রবল হয়ে ওঠে।

একদিন বুড়ো নেই। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী নটবর আসে সুশীলার কাছে। তারাচাঁদের অনুপস্থিতিতে নিরাপদে প্রেমালাপ চলে। সুশীলা তার হাত ধরে বলে, চল বিদেশে যাই—সেখানে দুজনে থাকবো। নটবর বলে, দুজনার একসঙ্গে অনুপস্থিতি পাড়ার লোকের মনে সন্দেহ জাগাবে। সুশীলা কান্নাকাটি করে। এমন সময় বুড়ো এসে খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে দরজা ধাক্কা দেয়। সুশীলা দেখে বেগতিক। ভেতর থেকে সে বলে, "উঠতে ইচ্ছে করছে না পা কাম্‌ড়াচ্ছে।" বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে বলে,—"থাক্ থাক্ উঠ্‌তে হবে না। আমি দাওয়ায় চাদর পেতে শুচ্ছি। তবে দরজা খুল্‌লে পা-টা টিপে দিতাম। সুশীলা দরজা খুলে দিলে অন্ধকার ঘরে একটা লোক দেখে বুড়ো ভয় পেয়ে ওঠে। সুশীলা বলে, বোধহয় চোর। বুড়ো তখন সুশীলার আঁচলের তলে লুকোয়। নটবর বুড়োকে একটা ঘুসি মেরে পালিয়ে যায়।

কিন্তু বুড়োর ঘুম আর হয় না। ভাবে, চোর যদি আবার আসে! সুশীলা তাকে ঘুমোতে বলে। মনের ভাব গোপন রেখে বুড়ো বলে, কাল ষষ্ঠীপুজো আছে, মন্ত্রটা মুখস্থ করে নিতে হবে। সুশীলা রেগে বলে, ঘুমোও, নয়তো যাও। তুমি না যাও, আমি যাই। বুড়ো তাড়াতাড়ি উঠে এসে দাওয়ায় শোয়। নটবর বাইরে ছিলো, আবার ভেতরে আসে।

এভাবে লুকিয়ে প্রেম সুশীলা ও নটবর দুজনের কাছেই ভালো লাগে না। অথচ একত্র থাক্‌তে গেলে এ গাঁয়ে থাকা চলে না। তাই একদিন সুশীলা বুড়োকে বলে অন্যত্র ঘর বাঁধতে। সে বুড়োকে বলে,—ঘাটে সবাই বলে— "এমন বামুন দেখিনে—৮৪ বছর বয়স, একটা ছুঁড়ী বে কোরে উন্মাদ হোয়েছে। দুদিন বাদে মরে যাবে— আর একটা কুলধ্বজ রেখে যাবে।" সে কি অসতী?

বুড়ো ঠিক করে কাশীতে নিয়ে যাবে। সেখানে গেলে বিষে বিষক্ষয়

হবে—কাশীতে কাশি যাবে। একদিন সুশীলাকে নিয়ে বুড়ো কাশীতে রওনা দেয়। সুশীলার মনে আনন্দ হয়, এতোদিনে নটবরের সঙ্গে মিলতে পারবে। তাই মজা করবার জন্যে বুড়োকে বলে, তার কোলে চড়বে। তরুণী ভার্যার কথা সে ফেল্‌তে পারে না ; কিন্তু রাজপথ, লোকলজ্জা তো আছে। তাছাড়া তরুণীর ওজন বৃদ্ধের কাছে ভীতিদায়ক। সুশীলা তাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—

"আমার নাগর নাগর নাগর
তোমার টিকি কেন ডাগর
তুমি আমার প্রেমের সাগর !

স্ত্রীর সোহাগে বুড়ো গলে যায়। অবশেষে সে ঘোড়া হতে রাজী হয়। সুশীলা তার পিঠে উঠে হাঁকে—জলদি চলো। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াকে যেন বাঁধছে এই ভাণে বুড়োকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। হঠাৎ নটবর আসে। যেন ভয় পেয়েছে এই ভাব দেখিয়ে সুশীলা পালিয়ে যায় এবং অদূরে নটবরের সঙ্গেই মেলে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত সুশীলা নটবরকে বলে, বুড়োর টাকাকড়ি সব তার কাছে। বুড়ো আর দেশে ফিরতে পারবে না।

নয়শো রুপেয়া—(১৮৭৪ খৃঃ)—শিশিরকুমার ঘোষ॥ নামকরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে প্রহসনটি সম্পূর্ণ আর্থিক দৃষ্টিকোণ সর্বস্ব। পণপ্রথা দৌর্নীতিক আয়নীতির সামাজিক স্বীকৃতি। প্রহসনকার কন্যা এবং পণ্যদ্রব্যের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছেন।

কাহিনী।—রামধন মজুমদার একজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মোত্তর বেচে সে বিয়ে করেছিলো। কথা হয়েছিলো—রামধনের মেয়ে হলে তাকে বেচে ছোটো ভাই সাতুলালের বিয়ে দেবে। রামধনের একটা মেয়ে হয়েছে। সে মেয়ে আজ সমর্থ। রামধন ভাবে, মেয়ে বেচে অন্ততঃ হাজার খানেক টাকা নিতে হবে। তাই সে ভালো ভালো লোভনীয় সম্পর্কও ফিরিয়ে দেয়, বেশি পাবে না বলে। কানাই ঘোষালকে রামধন বলে,—"ঠিক যেমন গাইগরুর পেছন পেছন ষাঁড়গুলো ফেরে, তেমনি গালে গালে মিন্‌সেরা লেগে আছে। আবার টাকার সঙ্গতি কোরতে পারে না বোলে উল্টে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, এই জ্বালায় জ্বালাতন হোয়ে গেলাম। আমি টাকা দিয়ে বে কোরেছিলাম, যদি আমি উপস্বত্ব ভোগ না কোরব, তবে আমার টাকা খরচ করে বে করার দরকার কি ছিল ?"

এদিকে ছোটোবেলা থেকে প্রতিবেশী রঞ্জনের সঙ্গে রামধনের মেয়ে সরলা খেলাধূলা করে এসেছে। এখন দুজনেই যৌবন লাভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসাও জন্মে গেছে। তবে তাদের এই মেলামেশাতে কেউ কিছু মনে করে নি। কারণ দুজনের ব্যবহারে মন্দ কিছু প্রকাশ পায় নি। তাছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও দুজনের মধ্যে আছে বলেই লোকে জানে। রঞ্জন সরলাকে পড়া বলে দেয়, হাতের কাজ শেখায়। কিন্তু সরলার বিয়ে হবে ভাবলেই তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। সরলাকে সে বলে,—"আমার জীবনের সাধ যে তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিব।" সরলাকে লেখাপড়া শেখানোতে বাড়ীতে উৎসাহ দিচ্ছে—রঞ্জন ভাবে, এর কারণ সরলাকে বেশি দামে বিক্রী করা। রঞ্জনের উৎসাহ মাঝে মাঝে নিভে যেতে চায়।

কন্যার খোঁজে বনগ্রাম থেকে হলধর নামে এক ব্যক্তি আসে রামধনের বাড়ীতে। হলধরের উদ্দেশ্য জানতেই রামধন প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, কত টাকা? হলধর বলে,—"কত টাকা! আগে ঘর বর কেমন, তা শুনুন।" রামধন জবাব দেয়,—"ঘর বর ভাল হয়, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি কত টাকা দিতে পারবেন?" সে বলে—"আমার মেয়ের বয়স এই ষোল বছর। দেখ্‌তে সুশ্রী, তা দেখে নেবেন। তা এই সকালবেলা আপনাকে আর দর না বলে ঠিক কথা বলে দিচ্ছি। বারশ বলি পনেরশ বলি, হাজার টাকার কমে আমি মেয়ে ছাড়ব না।" প্রতাপকাটীর মুখুয্যেরা নাকি সাত শত ত্রিশ টাকা দিতে চেয়েছে। গ্রামের বুড়ো মুখুয্যে নিজেই বিয়ে করবার জন্যে আটশ টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছে, তবু রামধন মেয়ে ছাড়ে নি। হলধর তখন কতো বোঝায়, কিন্তু রামধন কোনো কথাই কানে তোলে না, তার ঐ এক গোঁ।—"আমি ওসব বুঝি না। যেমন মাল তেমনি দাম। দাম ফেল মাল লও, আমার কাছে স্পষ্ট কথা।" মুখুয্যে বংশের বিশ বছর বয়সের সুশ্রী বিদ্বান্ পাত্র হওয়া সত্ত্বেও রামধনের কাছে তা অবান্তর। হলধর ভাবে, কিছু কথা সেও শুনিয়ে দেবে। সে একে একে রামধনকে জিজ্ঞেস করে, "মাল সাচ্চা ত?……একটা কথা, মাল তাজা আছে ত? বাসি ত না? ……কেমন মাল, লাট দাগি হয় নি তো?" রামধন রাগ করলে হলধর বলে, —"রাগ করেন কেন, হাজার টাকার জিনিস, দেখেশুনে নিতে হয় না? রামধন আরও চটে গেলে. হলধর বলে,—"আপনি কটু বলে খদ্দের বিগ্‌ড়ে

দিচ্ছেন, আপনি ত ব্যবসা বুঝেন না, মাল বেচবেন কেমন করে? এরপর ও পচাসরা মাল নেবে কে?" "ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব! যদি আটশ টাকায় ছাড়ি, এখনি লোকে তিল তিল করে নে যাবে, মাল নেবে কে!" হেসে হলধর বলে,—"আট শো তাহলে দর হয়ে গেল। আর বিশ দেওয়া যাবে। এখন মালটা ছাড়ুন।" রামধন আপত্তি জানালে নমস্কার জানিয়ে হলধর চলে যায়। ছোটো ভাই সাতুলাল এসব শুনছিলো! সে গাঁজাখোর। রামধনকে সে বলে,—"মেয়ের বয়স ষোল বৎসর, কবে 'লব্' হয়ে যাবে, আর গণ্ডগোলে পড়বে।" রামধন জিজ্ঞেস করে,—"লব্ কিয়ে বানর?" সাতুলাল বলে,—"হি! হি! হি! দাদা লব্ কারে বলে জানেন না, তা তুমি নবেল পড় নি, তোমার অপরাধ কি?" রঞ্জনের সঙ্গে সাতুলাল সরলার বিয়ের প্রস্তাব তুললে রঞ্জন গরীব বলে রামধন আপত্তি তোলে। সাতুলাল বলে, সাতুলালের বিয়ের জন্যেই রামধনের টাকার দরকার। সে রামধনকে এই প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দিলো। সে বিয়ে করবে না। রামধন ভাবে, গাঁজা খেয়ে ছোটো ভাইয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

এর মধ্যে গোপীনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে একটা মজার ব্যাপার হয়ে যায়। গোপীনাথের জামাই গোপীনাথের মেয়ে বামাকে বিয়ে করেছিলো টাকা দিয়ে। সব টাকা শুধ্‌তে পারে নি বলে গোপীনাথ মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠায় না, কিংবা জামাইকেও এখানে এসে সংসর্গ করতে দেয় না। ইতিমধ্যে এই গ্রামে অন্য এক বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে জামাই এসেছিলো। কর্তাকে লুকিয়ে বামার মা তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। তারপর রাত্রে বামাকে শোবার জন্যে জামাইয়ের কাছে যেতে বলে! বামা কাঁদতে থাকে। বামার মা সান্ত্বনা দেয়,—"চুপ কর মা, ছি! কেঁদ না। তা বামুনের বে করতে গেলেই টাকা লাগে, তা কি শুধু জামাই বাবাজির লেগেছে?·· ···তাইতে বোলতেম বামা তুই পুঁথি পড়িস নে।" যাহোক শেষে বামা উত্তরদিককার কোণের ঘরে জামাইয়ের কাছে শুতে যায়। নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ঘরে ফিরে এসে গোপীনাথ মেয়ের ঘরে খিল দেওয়া আর প্রদীপ জ্বলতে দেখে ধাক্কা মারে। স্বামীর কীর্তি দেখে বামার মা লজ্জায় মিশে যেতে চায়। সে যতই বারণ করে, গোপীনাথ ততোই চেঁচামেচি করে। "রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী মেয়েটার দুইবার বে দিলে, দিয়ে টাকা নিলে, আমার একবারের টাকাগুলোও ফাঁকিতে গেল। যেমন জামাই, মেয়েটাও তেমনি জামাইকে পেয়ে আর দরজা খুলছে না।"

মেয়ের সম্বন্ধে সে মন্তব্য করে—"ওকে দেখে দৌড়ে গিয়ে পোড়েছেন, এখন বুঝি আর উঠ্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে না।" গোপীনাথ চীৎকার করে সবাইকে ডাকাডাকি করে যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। সাতুলাল ছুটে আসে। লজ্জায় বামার মা পালিয়ে যায়। সাতুলাল গোপীনাথকে বুঝিয়ে বলে পরদিন দেখা যাবে। গোপীনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে সাতুলাল জামাইকে চুপি চুপি ডেকে বলে, খিড়কীর দরজায় পাল্কী বেহারা সব ঠিক আছে! বামাকে নিয়ে এক্ষুনি সে পালিয়ে যাক্। ঐ ঘরেই গোপীনাথের তিন শত পঞ্চাশ টাকা পোঁতা ছিলো। সাতুর পরামর্শ মতো সেই টাকা নিয়ে ওরা পালিয়ে যায়। টাকার শোকে গোপীনাথ পাগল হয়ে যায়। স্ত্রীর চুল টেনে ধরে লাথি মারতে মারতে তাকে প্রায় বলে—"বল্ বল্ এখন হোতে মেয়ে বিওবি। না হয় এই লাঠির বাড়িতে তোর মাথা ভাঙ্গব। মান্‌যে বে করে কি করতে রে?" কখনো স্ত্রীকে বলে,—"আমা ছাড়া বুঝি মেয়ে হয় না।" বামার মা লজ্জায় জিব কেটে পালায়। পরিবেশজ্ঞানও গোপীনাথ হারিয়ে ফেলে।

গাঁজাখোর সাতুলাল শ্রোত্রিয়দের নিয়ে আমোদ করে। বিশেষ করে বিয়ের কথা নিয়ে। রঞ্জনের মামা কান্তি মজুমদারের অনেক বয়স হয়েছে, কিন্তু টাকার অভাবে বিয়ে হয় নি। তার ছোটো তিন ভাইও বিয়ে করে নি। বাড়ীতে কোনো মেয়ে নেই। বিধবা বোন বিন্দু রঞ্জনকে এখানে রেখে কাশী-তেই আছে। সাতুলাল একটা ফন্দি এঁটে, গ্রামের ভুবন মুখুয্যের চারজন প্রৌঢ়া কুমারী ভগ্নীকে গিয়ে বলে কান্তি মজুমদারের বাড়ী মহাভারত পাঠ হবে। কুলীন কন্যা বলে এদের বিয়ে হয় নি। যথা সময়ে তারা এসে দেখে, পাঠের কোনো ব্যবস্থা নেই। সাতু সেখানে ছিলো। তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে সে বলে নতুন মহাভারত হবে। এই বলে মজুমদারের চার ভাইয়ের সঙ্গে ভুবন মুখুয্যের চার বোনকে মিলিয়ে দেয়। ওরা ছিঃ ছিঃ করে মুখ ঢাকে। সাতু তখন বলে, সমাজই এজন্যে দায়ী।

কানাই ঘোষালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শশীর মার কাছে রঞ্জনের যাওয়া আসা আছে। রঞ্জনকে শশীর মা ছেলের মতো ভালোবাসে। শশীর মার ছেলে-মেয়ে পর পর দুটো হয়ে মরে যায়, তাই সকলের পরামর্শে কানাই ঘোষাল কাশী বলে একজনকে বিয়ে করেছে। সরলাও এই বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। একদিন সরলাকে নির্জনে পেয়ে রঞ্জন বলে, কাশী থেকে খবর এসেছে যে তার মা মারা গেছেন। তিনি কিছু দেনাও রেখে গেছেন। সেগুলো

মিটিয়ে সরলাকে বিয়ে করবার মতো এক হাজার টাকা যোগাড় করা খুব কঠিন হলেও হয়তো যোগাড় করতে পারবে। কিন্তু তার পরেই সে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সরলাকে সে বিয়ে করে খাওয়াবে কি? সরলা যদি তাকে ভালবাসে, তাহলে সে গাছতলাতেও থাকতে পারবে। আড়াল থেকে সাতু এ সব 'লব্' এর কথা শুনে ফেলে বলে ওঠে,—সরলা যে তার মামাতো বোন। শশীর মাও আসে। সেও আপত্তি করে। রঞ্জনের মুখ কালো হয়ে যায়। সরলা অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর সরলা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজী—সব রকম চিকিৎসাই চলে। তারা সকলেই একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসার নামে নিজেরাই তর্কাতর্কি করে, এদিকে রোগী পড়ে থাকে। সাতুলাল কিন্তু আসল রোগ টের পায়। সে বলে,—"এ লবের (Love) ব্যারাম, ইহাতে রোগী মরে না।" খবর পেয়ে রঞ্জনও আসে। সরলা সুস্থ হয়।

রঞ্জন হাজার টাকা দেবে শুনে রামধন রঞ্জনের সঙ্গে সরলার বিয়ে দেবে স্থির করে। রঞ্জনের এখন অশৌচ, কনে সম্পর্কে মামাতো বোন, তবু রামধন এ বিয়েতে আপত্তি তোলে না। রঞ্জনও খুব একটা আপত্তি করে না, কারণ সরলাকে পাবার জন্যে তার মন ছটফট্ করছিলো। পুরোহিত এবং বিদ্যাভূষণ টাকা খেয়ে ব্যবস্থা দেয়, বিয়ের উদ্‌যোগ করে। মেয়ে মহলে চপলা বলে,—"ছোঁড়ার মামার বাড়ী এখানে, তাইতে মাতামহের ঘর বলে, এ বে নাকি মোটে হয় না। তা এক শত টাকা খরচ কোরে ও সব দোষ কেটে গিয়েছে। টাকায় সব হয়! পুরোহিত ঠাকুর কিছু নিয়েছেন, বিদ্যাভূষণ ঠাকুর কিছু নিয়েছেন, এমনি সকলে ভাগ যোগ করে নিয়ে চুপে চুপে বে দিতে যাচ্ছেন।"

বিয়ের ব্যবস্থা হলেও সরলার মনে খটকা আসে। এটা যে অশাস্ত্রীয় এবং টাকার জোরের ব্যবস্থা এটা সে উপলব্ধি করে। সরলা তখন রঞ্জনকে চিঠি দিয়ে নির্জনে ডেকে পাঠিয়ে বিয়ে বন্ধ করতে বলে। রঞ্জন ভাবে সরলা বুঝি তাকে ভালবাসে না। তখন সরলা তাকে বুঝিয়ে সব কথা বলে। রঞ্জনের মন খারাপ হয়ে যায়। সরলা তখন রঞ্জনকে বলে, এ বিয়ে তাহলে হোক কিন্তু বিয়ের পর ভাই বোনের মতো থাকতে হবে। আর রঞ্জনকে আর একটা বিয়ে করতে হবে। শেষে রঞ্জনকে বলে,—"দেখ বিদ্যা-সাগর কিছু টাকা খেয়ে মিথ্যা কথা বলিবেন না। আমার উপরও তাঁর রাগ হবার কোন কারণ নাই। আর শুনেছি তিনি নাকি স্ত্রীলোকের বড় সাপেক্ষ লোক। (আঁচল দিয়া চক্ষের জল মুছন।) তাঁর কাছ থেকে এর পরে একখানি

ব্যবস্থা আনতে পারবে?" রঞ্জন বলে, বোধহয় সে পারবে। তখন সরলা ও রঞ্জন চলে যায়।

এদিকে কাশী থেকে এক হিন্দুস্থানী কানাই ঘোষালের নামে এক চিঠি নিয়ে আসে। মৃত্যুকালের স্বীকারোক্তি করে চিঠি লিখেছে। রঞ্জন নাকি তার ছেলে নয়, কানাইয়েরই প্রথম পক্ষের স্ত্রী শশীর মার ছেলে। বুড়ি ধাইকে কুড়ি টাকা ঘুষ দিয়ে রঞ্জনকে সে চুরি করেছিলো, শশীর মার ছেলেকে শিয়ালে খেয়েছে! সংবাদ জেনে কানাই আক্ষেপ করে। মিছামিছি সে শশীর মাকে এতোদিন কষ্ট দিয়েছে। এ সংবাদ সাতুলালও জানতে পারলো। কিন্তু মজা করবার জন্যে সে বিয়ের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো।

বিবাহ বাসর। বর বেশে রঞ্জন উপস্থিত হয়েছে। নবীন নামে রঞ্জনের ব্রাহ্ম বন্ধু এসে পৌত্তলিক হিন্দু বিবাহের নিন্দা করে বলে যে, এভাবে বিয়ে করা মানে উপপত্নী রাখা। সে অনুতাপ করতে বলে; ক্রন্দন করতে বলে। তারপর বলে,—"মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর!" এদিকে রঞ্জন দশ টাকা কম দিয়েছে। রামধন টাকার জন্যে তগাদা দিলে ম্লানমুখে রঞ্জন বলে, এখন সে এমন নিঃস্ব যে, টাকা চাওয়া মানেই বিয়ে করতে বারণ করা। রামধনকে সাতুলাল বলে, "জামাইয়ের হাতে মেয়েকে গরু পোষানীর মতো করে সঁপে দিক। এই গরু পোষানী দিয়ে থাকে জান না? জামাইকে মেয়ে পোষানী দিয়ে বোল্লে হোত যে, ভাত কাপড় দিয়ে পুষবে তুমি, দুধ তোমার বাছুর আমার।" এভাবে রামধন আরও কিছু মেয়ে পেতে পারবে। তারপর বলে—"এমন মাতাল আর কে কোথা আছে যে, পাত্রের সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে নিয়ে তাকে মেয়ে দেয়? যদি স্নেহ মমতাও না থাকে, তবু ত লোকে এটা মনে করে যে, এমন কোরে শুষে নিলে ত আবার আমাকেই চিরকাল মেয়েকে খেতে পরতে দিতে হবে।" নিষিদ্ধ সম্পর্ক এবং অশৌচ থাকা সত্বেও অর্থলোভে বিয়ে দিচ্ছে বলে বিদ্যাভূষণ-কে সাতু গালাগালি দেয়। বিদ্যাভূষণ বলে,—"ওহে বানর, সপিণ্ডকরণ হোয়ে গ্যাছে, উহাতে দোষ হয় না। এখন তোর সঙ্গে শাস্ত্রের বিচার কোরবো! এদিকে লোকজন যারা এসেছিলো,তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে, একে একে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। রামধন বলে মেয়ের বিয়ে আটকাবে না, এই রাত্রেই বুড়ো মুখুয্যের সঙ্গে বিয়ে দেবে। কান্তি বরকর্তা। সে টাকা ফেরৎ চায়। সে বলে, ফেরৎ না পেলে সে রামধনকে আদালত দেখাবে। কানাই ঘোষাল এমন সময় এসে চিঠির রহস্য খুলে বলে। রঞ্জন কানাইয়ের ছেলে॥

অতএব অশৌচ দোষও নেই, নিষিদ্ধ সম্পর্কও নেই। ধাইবুড়ীকে ডাকিয়ে তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে শেষে তার কীর্তি প্রকাশ করিয়ে দেয়। তখন আনন্দের মধ্যে দিয়ে রঞ্জনের সঙ্গে সরলার বিয়ে হয়ে যায়।

অসুরোদ্বাহ (কলিকাতা—১৮৬৯ খৃঃ)—"জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ" (প্রকৃত নাম অজ্ঞাত)॥ পরিচয় প্রসঙ্গে প্রহসনকার লিখছেন, "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কন্যাপণ সম্বন্ধীয় কুৎসিত ব্যবহার।" মনুসংহিতায়[৮] আসুরিক বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,—

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বাকন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে।"

কুল্লুকভট্টের টীকায়—"কন্যায়া জ্ঞাতিভ্যঃ পিত্রাদিভ্যঃ কন্যায়ৈ বা যৎ যথাশক্তি ধনং দত্ত্বা কন্যায়া আপ্রদানমাদানং স্বীকারঃ স্বাচ্ছন্দ্যাৎ স্বেচ্ছয়া নত্বার্ষইব শাস্ত্রীয়ধনজাতি পরিমাণনিয়মেন . আসুরো বিবাহ উচ্যতে।"[৯] অর্থাৎ কন্যাদানের বিনিময়ে পণগ্রহণ এবং আসুরিক বিবাহ একার্থবাচক, এই মতের প্রচার প্রহসনকার নামকরণের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করেছেন। স্মৃতিগ্রন্থে আসুরিক বিবাহ প্রশংসনীয় নয়।

কাহিনী।—শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হরিহর চক্রবর্তীর স্ত্রী কামিনীর কাছে প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষীরদা এসে এখনকার মেয়েদের বিয়ে নিয়ে আলোচনা করে। মেয়ের বাপের দয়ামায়া নেই। টাকার লোভে দাঁত পড়া, পাকা চুল বুড়োদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়। এটা তাদের মস্ত দোষ। কামিনী ক্ষীরদার কথার বিশেষ কিছু জবাব দেয় না। এমন সময় সৌদামিনী (সৌদামণি) নামে এক কায়স্থ কন্যাও বেড়াতে আসে। ক্ষীরদা তখন চলে যায় এবং সৌদামিনীর সঙ্গে কামিনীর কথাবার্তা চলে। কামিনীকে সৌদামিনী বলে, ও পাড়ার কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে কামিনী যদি তার কন্যা জ্ঞানদার বিয়ে দেয় তাহলে ভালো হয়। কামিনী বলে, কর্তা তাদের সঙ্গে বিয়ে দেবে না। কেননা কেদার হচ্ছে মায়ের একছেলে এবং তার বাবা নেই। বরং যেখানে বড়মানুষ ছেলে হবে সেখানে বিয়ে দিয়ে আরও দশ টাকা বেশি নেবে। শ্রোত্রিয় সমাজের কন্যাপণ নিয়ে কামিনী দুঃখ করেন। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের

৮। মনুসংহিতা—৩/৩১।
৯। মন্বর্থ মুক্তাবলী—৩য় অধ্যায়।

বৌগুলো যদি বছর বছর মেয়ে সন্তান প্রসব করে, তবে তাদের দুঃখ থাকে না!

কেদারনাথ ঠিক করেছে যে সে অর্থ উপার্জনের জন্যে বিদেশে যাবে। বন্ধু শ্যামাচরণ চক্রবর্তী বলে, এখানে যা কুড়ি পঁচিশ টাকা রোজগার হচ্ছে, তাই বরং ভালো। শ্যামাচরণও বিয়ে করে নি। কেদারনাথের জিজ্ঞাসায় শ্যামাচরণ বলে, হাজার টাকা ব্যয় করবার সামর্থ্য তার নেই। সেজন্যে এযাত্রায় তার বিয়ে করা বাকী রইলো।—

"আর কি বিয়ে হবে কপালে।···
সোনা দানা গয়না বিনে হয়না বিয়ে,
দেখ, যার আছে মেয়ে, তার বাপ মায়ে,
কোরে বসে পোণ, ধর্ম্ম ভঙ্গ পোণ,
নিব চারি পোণ, পোনাপণ।···
তবু দেখতে চায় না পাত্র কি প্রকার।"

এদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় কৈলাসচন্দ্র নামে কুলাচার্য ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে বিয়ের কথা হচ্ছিলো। কৈলাস বলেন, এখনকার ব্রাহ্মণদের অবিচারে নববিবাহিতদের ভীষণ অত্যাচার করা হচ্ছে ফলে কন্যা অযোগ্য পাত্রে পড়ছে। কৈলাস পণ বিষয়ে নানা রকম স্মৃতি পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি টেনে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, পণ নেওয়া পাপ। ক্রীত কন্যার সন্তান আইনসঙ্গত পুত্র নয়।

এদিকে কলকাতার থেকে জ্ঞানদার জন্যে একটা সম্বন্ধ এসেছে। চারশো পণের টাকা দেবে। গয়নাও নাকি খুব দেবে। সৌদামিনীর কাছে কামিনী এই খবর জানায়। সৌদামিনী অবাক হয়, ছত্রিশ বছর বয়সের একজনের সঙ্গে কামিনীর তিন বছরের জ্ঞানদার সম্বন্ধ হচ্ছে। কামিনী বলে কর্তার কাছে তারা বিয়ের জন্যে খুব তাগাদা দিচ্ছে, কিন্তু আরও পাচ টাকা বেশী না দিলে কর্তা নাকি বিয়ে দেবেন না। সৌদামিনী দুঃখ করে বলে হরিহরবাবুর খুব টাকার লোভ,. নইলে কেদারের সঙ্গেই জ্ঞানদার বিয়ে হতো। এমন সময় শিশু জ্ঞানদা এসে খবর দেয় একটা ছাগল বাইরে পাতা খাচ্ছে। পাতা খেলে পেট কামড়ায়, ছাগলের পেট কামড়াবে। তারপর জ্ঞানদা কামিনীর কোলে উঠে দুধ খেতে সুরু করে দেয়। জ্ঞানদার জন্যে ঘটক যে সম্বন্ধ এনেছে, তাতে

অবশ্য ঘটক অর্থলোভে অনেক কিছুই জেনে গেছে। পাত্র যে বেকার এবং নিঃসম্বল একথা হরিহরকে সে জানায় নি।

কেদারের সঙ্গে হরিহরের অবশ্য সম্পর্ক আছে। কেদারের ভাইয়ের সঙ্গে হরিহরের ভাইয়ের মেয়ে লক্ষীর বিয়ে হয়েছে। একদিন কেদারের বৈঠকখানায় কেদার, হরিহর এবং কেদারের বাবার বন্ধু গঙ্গাপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন; এমন সময় ঘটক কেদারের জন্য একটা সম্বন্ধ আনেন। মেয়েটা বয়সে একটু বড়ো। ঘটক ছয় শত টাকা দাবী করে। গঙ্গাপ্রসাদ বলেন, মেয়েটির জন্যে তিনি চার শত টাকা খরচ করতে পারেন, তবে মেয়েটিকে যদি এখানে এনে দেখাতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁকে ছয় শত টাকাই দেবেন। ঘটক বলেন, বিয়ের দিনই তিনি কন্যা দেখাবেন। মেয়েটার একটু বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু মানাবে ভালো।

একই দিনে জ্ঞানদার একটি পাত্রের সঙ্গে এবং কেদারের একটি পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়। হরিহরের বাড়ীতে আয়োজন বিশেষ কিছুই নেই। জ্ঞানদা এসে বুঝতে পারে না—বিয়ে কার? তার না তার মার বিয়ে! সৌদামিনীর মুখে কেদারের বিয়ের খবর শুনে কামিনী মন্তব্য করে,—"হোগ্, হোগ্, মাগি যেমন বৌ বৌ করে পাগল হয়েছিল, তা তেমন যুগ্‌গি মেয়ে হয়েচে।"

গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কেদারের বিয়ের জন্যে কন্যা কুমুদিনীকে এনে রাখা হয়। তারপর যথারীতি কেদারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ঐ দিনেই প্রৌঢ়ের সঙ্গে শিশু জ্ঞানদার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় হরিহরের বাড়ীতে। অবশ্য বিবাহ নিয়ে একটু গোলমাল হয়। বরের আসবার দেরী দেখে পুরোহিত কেদারের বাড়ীর কাজের জন্যে চলে গেছে, এমন সময় বর অন্নদাপ্রসাদ আসে। সৌদামিনী, ক্ষীরদা, বিদ্যুল্লতা ইত্যাদি মেয়েরা বর দেখে ক্ষুন্ন হয়। বুড়ো বরের সঙ্গে এতোটুকু মেয়ের বিয়ে দেবে। মেয়ে বড়ো হতে হতে বিয়ের স্বাদ আর পাবে না। কন্যার বাবা মা শুধু টাকা-পয়সাই বড়ো করে দেখেছে, ভালো বর পাবে কি করে! ততোক্ষণে কেদারের বিয়ে শেষ করে গঙ্গাপ্রসাদ এসে পৌঁছিয়েছেন। বরপণ নিয়ে এই সময়ে গণ্ডগোল সুরু হলো। বরের অত্যন্ত আগ্রহ দেখে, হরি কামিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে বরের কাছে বলে,—মেয়ের মানসিক আছে, তাই সেজন্যে পঁচিশ টাকা দরকার। বর তার যথাসর্বস্ব বিক্রী করে পাঁচ শত দশ টাকা সংগ্রহ করেছে। হরিহর ঘটকের কানে কানে বলেন, বর যদি টাকা না দেয়, তবে তাঁর মেয়ের

বিয়েতে বরের অভাব হবে না। বুড়ো বরের ছোটোবেলা থেকেই নাকি বিয়ের সাধ ছিলো। কিন্তু এতোদিন সুযোগ পায় নি। এতোদিন পর আজ সেই সুযোগ পেয়েছে। অতএব হরিহরের কথায় বর রাজী হয়। টাকা পেয়ে হরিহর আবার কামিনীর কাছে গিয়ে পরামর্শ করে এবং এসে আরও চল্লিশ টাকা চায়। বরকর্তা অভয়াচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন রেগে গিয়ে চুক্তিপত্র দেখান। কিন্তু অন্নদাপ্রসাদ ঐ টাকা দিতেও স্বীকৃত হয়,—পাছে বিয়ে ভেঙে যায়! প্রশ্রয় পেয়ে হরিহর আরও কুড়ি টাকা এবং বিদায় খরচের কথা তুলে চাপ দেয়। বরের আদেশে বরকর্তা সব দাবীই মিটিয়ে দেন। এমন কি বরের আদেশে অভয়াচরণ আঁতুর খরচার জন্যেও হরিহরের হাতে পঞ্চাশ টাকা তুলে দেন। বিয়ে করে বর বুঝতে পারে, সে বিয়ের নামে ভিক্ষুকের অবস্থাই লাভ করেছে।

ওদিকে কেদারের বিয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও পরে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে ওঠে। কেদারনাথ জাহানাবাদ থেকে একটা অস্পষ্ট খবর শুনতে পেয়েছিলো, পরে জান্‌তে পেরেছে যে, যাকে সে বিয়ে করেছে, সে বিধবা! অর্থলোভে তার আর একবার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে মেয়েমহলে আলোচনা চলে। ক্রমে এটা সমাজের কর্তা-স্থানীয় ব্যক্তিদের একটা বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। সমাজের বিধানে কেদারকে হয়তো একঘরে হতে হবে। শ্যামাচরণ কেদারকে বিধবাবিবাহ সমর্থক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পরামর্শ দেয়। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে কন্যাবিক্রয় উঠে যাবে,—একথা অনেকে বলেছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টকে সমাজ সমাজের কাজে হাত দিতে দিচ্ছে না। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু তা ছিলো অন্যরকম। কেদার বলে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করে বিধবাবিবাহে মত দিলে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব—সবাই শত্রু হয়ে পড়বে!

কেদারের নববিবাহিতা স্ত্রী কুমুদিনী নিজের অতীত চিন্তা করে। তার আগেকার বিয়ের কথা মনে পড়ে না। তখন সে ছেলেমানুষ ছিলো। কিন্তু তবুও সতীত্বের সংস্কার তার মনকে বিচলিত করে। সে আক্ষেপ করে বলে, ভগবান কেন তাকে নীচু ঘরে জন্ম দেয় নি, কুৎসিত রূপ কেন দেয় নি। তাহলে হয়তো তাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না। কেদারের বাড়ী তার কাছে অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। কেদারের মা রেবতী এসে দেখেন কুমুদিনী কাঁদছে। তিনি তাকে আদর করেন এবং চোখের জল মুছিয়ে দেন।

সৌদামিনীর জিজ্ঞাসায় রেবতী বলেন, বৌ ছেলেমানুষ, মায়ের জন্যে কষ্ট হচ্ছে। সৌদামিনী তখন মন্তব্য করে, টাকার পুঁটুলি বেঁধে মেয়ের বাবা-মা-রা আর জামাইয়ের মুখ দেখ্‌তে চায় না। রেবতী বলেন, আর পাঁচজন যখন টাকা নিচ্ছে, তখন ওঁরাও বা নেবেন না কেন। দেশের যা রীতি, তা তো মানতেই হবে।

সবাই কেদারকে বলে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে। কেদার তার নিরপরাধা অনাথা স্ত্রীকে ত্যাগ করবার কথা কল্পনাতেও আন্‌তে পারছে না। এমন সময় শ্যামচরণ আসে। সে কেদারকে বলে,—"আমাদের দেশে যে ক'একজন অকর্ম্মা হতভাগ্য ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, এরা এক একজন এক এক অবতার। ইহারা ব্রহ্মোত্তর জমির ধান খায় আর লোকের একটু দোষ পাইলে পর্ব্বত-প্রমাণ করে।" আর প্রায়শ্চিত্ত অর্থই ব্রাহ্মণভোজন অর্থাৎ তাদেরই সুখ। কেদাব কি করবে ভেবে পায় না।

শেষে দশজনের পরামর্শে স্থির হ' যে, বাপেরবাড়ী পাঠানোর নাম করে কুমুদিনীকে না জানিয়ে নির্বাসন দেওয়া হবে। কেদারের বোন বিদ্যুল্লতা কুমুদিনীকে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করায়। রেবতী কুমুদিনীর মুখচুম্বন করে কাঁদতে থাকেন। তার ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে। গঙ্গাপ্রসাদ এ'দিকে তাগাদা দেন। রেবতীকে প্রণাম করে কুমুদিনী পাল্কীতে ওঠে। বেবতী তাকে বলেন, কুমুদিনী ফিরে এলে তাকে 'চৌদানী' গড়িয়ে দেবেন। এখন দিতে পারছেন না বলে সে যেন কিছু মনে না করে।

মুথাডাঙার কাছাকাছি এক মাঠে পাল্কী এসে নেমেছে। সঙ্গে এসেছেন হরিহর এবং একজন নীচু জাতের মেয়ে—আহ্লাদী। হরিহর আহ্লাদীকে নির্দেশ দেয়, কুমুদিনীর গা থেকে সব গয়না খুলে নেবার জন্যে। কুমুদিনী নিজেই সব গয়না খুলে দেয়। তারপর একটা ছেঁড়া কাপড় পরে। আহ্লাদী তাকে বাপেরবাড়ী নিয়ে চলে। কালিপ্রসাদ সাহা ছিলো কুমুদিনীর মামা তথা কন্যাকর্তা। তার কাছে আহ্লাদী কুমুদিনীকে নিয়ে গিয়ে একটা চিঠি দেয়। তাতে লেখা আছে যে,—লোক পরম্পরায় তারা জানতে পেরেছে যে কেদারনাথ কুমুদিনীর দ্বিতীয় স্বামী। কেদারনাথ কুমুদিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে নারাজ। কালিপ্রসাদ তার বিধবা ভাগ্নীর বিয়ে দিতে গিয়ে গোড়াতেই ভেবেছিলো যে এমন একটা হবে। অনেক চালাকী করে ঘটককে ঘুষ দিয়ে, গঙ্গাপ্রসাদ কৌশলে জালে ফেলে নিরীহ ভদ্র সন্তানটির সর্বনাশ করে

টাকা এনেছে। কুমুদিনী এখন আবার নিজের ঘাড়ে পড়ছে দেখে, তাকে তাড়াবার জন্যে কালিপ্রসাদ গালাগালি দিয়ে বলে, তার মতো ব্যভিচারিণীর মুখ সে দেখতে চায় না। যেখানে খুশি যেতে পারে। তার মায়ের কথা তুলেও নিন্দে করে। মায়ের জন্যে কুমুদিনীর খুব কষ্ট হয়। অনেক কথাই তার মনে হয়। সমাজকেই সে দায়ী করে। "কন্যাপণ তুই নৃশংস চণ্ডাল স্বরূপ!" একান্ত দুঃখিনী বলেই কন্যাপণ তাকে স্পর্শ করেছে। নইলে স্বামীসুখ পেয়েও তা তার ভাগ্যে ফল্‌লো না। এখন তার জীবন ধারণের একমাত্র উপায় বেশ্যাবৃত্তি বা দাসীর কাজ। কিংবা আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা সে জুড়োতে পারে। "হে ভগবান্, আমি আত্মঘাতী হইয়া সংসারযাত্রা সংবরণ করি। মৃত্যু আশ্রয় ব্যতীত এই হতভাগিনীর আশ্রয় নাই। তোমার কাছে যেন স্থানচ্যুত না হই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" কন্যাপণের ওপর তীব্র ঘৃণা এবং সমাজের ওপর তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে কুমুদিনী আত্মহত্যা করে।

বরপণ ॥—

রোকা কড়ি চোকা মাল (১৮৭৯ খৃঃ)—হীরালাল ঘোষ॥[১০] প্রহসনকার নামকরণে পাত্রকে পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করে তার ব্যক্তিক এবং মানবিক মর্যাদার মূল্যহীনতা প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছেন। আর্থিক দৃষ্টিকোণে ব্যাবসায়িক যান্ত্রিকতার দিকটিও উপস্থাপিত করা হয়েছে।

কাহিনী।—রাখালচন্দ্র রায় গোবরডাঙ্গার একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তার মেয়ে কুসুমকুমারী সমর্থ হয়েছে। রাখালের স্ত্রী এলোকেশীর এজন্যে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। "কুমুদিনী দুধের মেয়ে, তারও বে হোল, কিন্তু তোর পোড়া বর আর জোটে না; আবার শুনছি নাকি বিশ আইন জারি হবে, যে লোক চার হাজার টাকা দেবে তারি মেয়ের বে হবে,—আর ছেলেরা চার পাস না ফিরে বে কত্তে পারবে না।" যথারীতি ঘটকী আসে। ইছাপুরের এক সম্বন্ধের কথা বলে। পাত্রের বয়স ৪৫ বছর। ঘটকী বলে,—"তারা বলে,

১০। বিজ্ঞাপনে 'প্রকাশক' কেনারাম দাস দত্ত (ইছাপুর) লিখ্‌ছেন,—"রোকা কড়ি চোকা মাল' আমাদিগের উভয়েরই পরিশ্রমে ও পরস্পরের সাহায্যে, জনসমাজে প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম।" সাহিত্য পরিষদ সংরক্ষিত গ্রন্থে একটি পাতায় হস্তাক্ষরে লিখিত,—"Presentod to Sreemutby Hari Dassy with the authors best complements—K. P. Dutta."

বর দেখে দরদস্তুর হলে তারপর—গিযে মেযে দেখে আস্‌বো, নইলে শুধু হাঁটাহাঁটি করে কি হবে।"

রাখালের অত তাড়াতাড়ি মেযে বিযে দেবার ইচ্ছে নেই। তিনি বলেন, "ইছাপুবের ঐ সম্বন্ধটা যদি না হয তবে আমি ব্রাহ্মমতে আমার মেযের বে দেবো। তাতে আমার সিকি পযসাও খবচ হবে না। মেযে—বড হলে কত বেটা বাবা বলে বে কত্তে পথ পাবে না। আমাব তো ও মেযে নয, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।" বিযে দেবার এতো ইচ্ছে সত্বেও এলোকেশী মেযেকে বুডোব হাতে দিতে চান না। রাখাল বলেন, ছোক্‌রা জামাই আন্‌তে যে অর্থ খরচ করতে হবে, তাতে তিনি অসমর্থ। এলোকেশী কন্যা প্রসব করেছেন বলে তাঁর ওপরেই তিনি দোষারোপ করেন। টাকা ছাডতে হবে বলে দত্তপুকুরেব বোস, বাবাসতের মিত্তির—এদের সম্বন্ধকে তিনি আমল দিচ্চেন না।

অবশেষে একটি সম্বন্ধেব খোঁজ পান। খাঁটুরা নিবাসী বসন্তকুমার ঘোষেব এক বিবাহযোগ্য পুত্র আছে। সংবাদ পেযে রাখাল তাঁব ভাই রাসবিহারীকে খাঁটুরায গিযে পৌঁছোন। বসন্তবাবুব বৈঠকখানায এ নিযে আলোচনা স্বরু হয। ছেলে কোন্ ক্লাসে পড়ে—রাখাল তা জিজ্ঞাসা কবলে বসন্ত বলেন,—"কোন্ কেলাসে।-কোন কালেজে বলুন। তাই তো বলি যে—আগে ইদিককার না চুকলে ছেলে আন্‌বো না। ক্রমে ক্রমে পাস করে এখন আউট হযে বসেছে, ওর দর কত, ওকে কি হট্ বল্‌তেই যাকে তাকে দেখান যায, ঘরের পরিবাব আনা যায, তবু অমন ছেলে দেখিযে দেখিযে খেলো করা ভাল নয।" শেষে বলেন,—"এই ফরদটা নেও, এতে রাজী হও তো ছেলে দেখাবো নযতো আমার ঘরের ধন ঘরেই থাক।" বাজারদর সম্বন্ধে বসন্ত সচেতন। তিনি বলেন,—"আপনারা উপহাস কোরবেন না, আগে বাজারটা দেখে আসুন, পরে দরদস্তুর করবেন। রোকা কডি চোকা মাল, যেমন জিনিস তার তেমনি দর।"

বসন্তবাবু ছেলেকে আনালেন। ছেলের নাম চারুচন্দ্র। চারুকে রাখাল বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে গণ্ডাকিযা ধবেন। চারু তার উত্তর দিতে পারেন না, বলে সে ডিভাইড্ ইত্যাদি কষতে পারে। ইংরেজী অংশের মানে যখন ধরা হয, তখন চারু সম্পর্কবিহীন ভুল অর্থ বলে। এই সময়ে ঘরের পাশ দিযে ভৃত্যটিও যেতে যেতে মনে মনে মন্তব্য করে,—"এ বাপ বেটার চেয়ে আমি বিদ্বান্ আছি, আমায় বে দিলেন না কেন?"

রাখাল ও রাসবিহারী মনে মনে একটা ফন্দি আঁটেন। তারপর বসন্তকে বলেন যে, তাঁর ফর্দের সব কিছুই তাঁরা মেটাতে রাজী আছেন। আশ্বাস পেয়েই বসন্ত পূর্বকৃত দুর্ব্যবহারের জন্যে বার বার তাঁদের কাছে ক্ষমা চান। বিয়ের দিনও সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে যায়—২০শে আষাঢ়।

যথাদিনে রাখালের বাড়ীতে বিবাহ বাসর বসে। বরযাত্রী, কনেযাত্রী এবং সভাসদ্দের ভিড় হয়। বসন্তবাবুও আসেন। কিন্তু রাখালবাবু পণদেবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ করেন না। অনেকক্ষন ধৈর্য রক্ষা করে তারপর আর না পেরে বসন্তবাবু রাখালবাবুকে সেটা স্মরণ করিয়ে দিলে রাখালবাবু বললেন,—পণ কাছেই প্রস্তুত আছে। আরও কিছুক্ষণ পর আর থাক্‌তে না পেরে অধৈর্য হয়ে বসন্তবাবু মন্তব্য করেন,—"কুমীরকে কলা দেখাচ্য যে!" রাখালবাবু হাসিমুখে বলেন,—"আপনার পাওনার মধ্যে কন্যাটী, সেই পর্যন্ত আমার সংখ্যা, আমি এর বেশি কিছুই দিতে পারবো না।" "রাখাল নাপ্‌তেনীকে দিয়ে কুসুমের সোনার প্রতিমার মতো চেহারাখানি সবার সামনে এনে দাঁড় করালেন। কুসুমের রূপ দেখে চারু মোহিত হয়ে যায়। ক্রুদ্ধ বসন্তবাবু চারুকে নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলে চারু বেঁকে বসে। কুসুমকে বিয়ে না করে সে যাবে না। বসন্তবাবু অক্ষেপ করে চারুকে বলেন, "তুই তো রাঙ্গা মেয়ে পেয়ে ভুলে গেলি, আমি ভুলি কিসে?" জোর করে কনেপক্ষের লোকেরা চারুকে ভেতরে ছাদনাতলায় নিয়ে যায়। বসন্তবাবু তখন নিরুপায়।

কন্যাদায় (কলিকাতা—১৮৯৩ খৃঃ)—যতীন্দ্রচন্দ্র শর্মা (মুখোপাধ্যায়)॥ একদিকে কন্যাদায়ের দুরবস্থা অন্যদিকে বরপক্ষের পণলোভ উভয় দিক চিত্রণের মাধ্যমে লেখক দৌর্নীতিক আয়বিশেষের বিরুদ্ধে আর্থিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করেছেন। এই দৌর্নীতিক আয় ব্যবস্থার সামাজিক পোষণে সমাজকে সমর্থন-শূন্য করবার চেষ্টা প্রহসনকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। কন্যাদায়গ্রস্তা কামিনীদের গীতে আছে,—

"নয়ন জলে বয়ান ভেসে, চল সবে ভেসে যাই।
দয়া মায়া নাইকো যেথা, সে সমাজে কি কাজ ভাই॥"

আবার,—

"যে সমাজে নারী কাঁদে, সে সমাজের ভাল নাই।
সকল জেতে দেয় গো যেন, সে সমাজের মুখে ছাই॥"

পণপ্রথার বিরুদ্ধে চন্দ্রনাথের দীর্ঘ মন্তব্য প্রকারান্তরে প্রহসনকারের প্রচার প্রচেষ্টা।—"হাঃ ভগবান্! হাঃ ভগবান! এমন অর্দ্ধপিশাচ সমাজও হোলো যে টাকাই সব বলে গণ্য হল। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করে দেড়ে মুষে ছেলের বে-তে সর্ব্বগ্রাস করে, মেয়ের বাপ মাকে পথের ভিখারী করে, টাকা নিয়ে কি তারা স্বর্গ সুখ পাবেন!…বড়লোকেরা একদৃষ্টে এ সকল দেখেও বিলেতে কোন বেটার শ্রাদ্ধের জন্য ২/১০ লাখ টাকা খরচ করছেন। টাকা দান করিতে কাকেও বল্ছি নি, ছেলের বে-তে টাকা লওয়া নিয়মটা তুলে দেওয়াও একি তোমাদের অসাধ্য। তা না হয় তোমরা না পার, কোম্পানির একটা আইন করিয়া দাও। এত আইন চালাতে যাচ্ছ—আর এটা কি তোমাদের কারো মনে পড়ে না, অর্থাভাবে মেয়ের বে দিতে না পেরে কত বাপ মা গলায় দড়ি দিয়ে মরছে, সমাজের সব লোক যেন মজা দেখ্‌ছে। হায়! হায়! কি হিন্দু সমাজ ছিল কি হল! দু-কাহন কড়ি পণ দিয়ে এককালে বে হয়ে গেছে, এখন. দশ দশ বিশ হাজারেও হয় না—এমন সমাজের সর্ব্বনাশ হয় না কেন।"

কাহিনী—চন্দ্রনাথবাবু কন্যাদায়গ্রস্থ কায়ত। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সুহাসিনী —দুজনেরই ইচ্ছে মেয়েটি ভালো ঘরে পড়ে। কিন্তু চন্দ্রনাথ বলেন, "ভাল ঘরে দেব এমন টাকা কৈ, পাঁচ সাত হাজার না হলে ত আর গেরস্তর ঘরে পড়বে না।"…"এত সম্বন্ধ আস্‌ছে, মেয়ে দেখার কথাই নাই, কেবল গোলমাল টাকার জন্য, উপায় ঠাউরিয়ে রেখেছি তাই করতে হোলো।" ভিটে বিক্রী করবেন—চন্দ্রনাথবাবু তাই স্থির করলেন। এজন্যে কামিনী দালালকে তিনি ডেকে পাঠালেন। কামিনী সব শুনে বলে, "আমাগোর এই কার্য্য, দেখ্‌লেম বন্দকী বাটি প্রায় খালাস হয় না। আপনার সাথে আলাপ পরিচয় বহুদিন, আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে তার লাইগা এই পরামর্শ দিই।" কন্যাপণের দৌরাত্ম্যের কথা ভেবে কামিনী মন্তব্য করে,—"আপনাদের কলকাতায় ঐ নিয়ম ছ্যাখ্‌ছি, কন্যার ব্যা-তে অনেক ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হইতেছে, আমাগোর ছ্যাশে ও নিয়ম নাই। আমরা বরং পুরুষের ব্যা-র সময়, কন্যাকর্ত্তাকে অর্থ দিয়ে ব্যা করি। কহেন মুশোয় তাকি উচিত নয়?" সে বলে, চন্দ্রনাথবাবু ওদেশে গেলে বরং চার শত টাকা পণ আদায় করতে পারবেন। তাছাড়া বন্ধকী ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়ানী জেলের ভয় থাকে। কিন্তু সব শুনেও চন্দ্রবাবু সঙ্কল্পে অটল থাকেন। "কি করবো! মেয়ের বে তো দেওয়া চাই।"

অবশেষে চন্দ্রবাবু ঘটকালি অফিসে গিয়ে ধর্ণা দেন। বিপিনবাবু টেবিল চেয়ার সাজিয়ে নিয়ে বসেছেন। তিনি বি. এল্. হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যবসাতেই নেমেছেন। "বোশেখ জষ্ঠির মর্শুম শেষ হলো। এবার দিনকতক মন্দ যাবে। তবে মোটামুটি এটা লাভেরই ব্যবসা। কিন্তু যাহোক বি. এল্. দিয়ে উপায়-বিহীন উকিল হওয়ার চেয়ে এরকম একটা Indipendent কাজ শতগুণে ভাল।" বিপিনবাবু আশা করেন, কিছুদিনের মধ্যেই "Old illiterate" ঘটকদের ভাত মারা যাবে। তিনি কয়েকজন সরকারও রেখেছেন। তাদের কাজ, ঘর খুঁজে বার করা। কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে বন্দোবস্ত করে Address বুকে তাদের নামধাম টুকে রাখা। চন্দ্রবাবু এসে বিপিন বাবুকে সবকথা বল্‌লে বিপিনবাবু বলেন,—"কন্যা ত নয়, যেন টাকা গেলবার যম। তা কি করবেন বলুন, আজকাল যে সমাজের গতিক, তাতে কন্যার বে দেওয়া বাপ মরা দায়ের চেয়ে অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।" চন্দ্র বলেন, তাঁর তিন কন্যা। বড়োটির বিয়েতে কোম্পানীর কাগজ গিয়েছে। মেজোটির বিয়েতে স্ত্রীর গহনা এবং আসবাবপত্র গিয়েছে। ছোটোটির জন্যে হয়তো ভিটেমাটি বেচতে হবে। বিপিনবাবু বলে ওঠেন, চন্দ্রবাবু ভাগ্যবান্ পুরুষ। অন্যের তো প্রথমটি পার করতেই ভিটেতে টান পড়ে। চন্দ্রবাবু কেমন পাত্র চান, বিপিন তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,—"এই ছেলেটি পাশ করা হবে—বাপ মা থাকবে, আর কিছু খাবার পরবার সংস্থান থাকে, তাহলেই হল।" আঁচ কত—জিজ্ঞেস করলে চন্দ্রবাবু বলেন তিন হাজার টাকা তিনি দিতে সক্ষম। বিপিন যেন অসম্ভব কথা শুনেছেন, এইভাবে বলেন,—"হাঃ হাঃ হাঃ—ওতে আজকালের বাজারে ভাল ঘরে এমন পাত্র পাবেন না। তবে যদি ব্রাহ্ম মতে বে দিতে চান, তাহলে ওর চেয়ে কমে করে দিতে পারি।" চন্দ্রবাবু বলেন, "ছিঃ ছিঃ—কি বল বাবা বেহ্মদত্তির ঘরে? তা কি কখন হিন্দু হয়ে পারি, 'যাক্ প্রাণ থাক্ মান'।" বিপিন বিজ্ঞের চালে বলেন, "পাঁচ হাজার টাকার কমে আজকাল মাঝামাঝি কায়স্থ ঘরের ছেলে পাওয়া যাবে না।" চন্দ্রবাবু দুঃখ করে বলেন,—"আমার মত মধ্যবিৎ লোকের কি মেয়ের বে হবে না? বেশী টাকা নাই বলে কি মেয়ের বে বন্ধ থাকবে!...এত অত্যাচার দেখেও এত বড় হিন্দু-সমাজ, যাতে এত বড় বড় লোক, এও স্বদেশ হিতৈষী, কেমন করে চুপ মেরে আছে! সমাজের ঘোর অধঃপতন, তা না হলে আর এমন দুর্দ্দশা! দেশে পাড়াপড়শীর আত্মীয় বন্ধুর মেয়ের বিয়ে হয় না। আর কিনা স্বদেশ হিতৈষী

বুদ্ধির মাথা খেয়ে বুক ফুলিয়ে ভারত উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট।" বিপিনবাবু কথা-প্রসঙ্গে চন্দ্রবাবুকে বলেন, তাঁকে দশ টাকা দিলে কমের মধ্যে বিপিনবাবু একটা ভালো পাত্র যোগাড় করে দিতে পারবেন। চন্দ্রবাবু বলেন,—সে টাকাটা দিয়ে বরং বেশি পণ করে তাই দিয়ে তিনি নিজেই ভালো পাত্র জোটাতে পারবেন। চন্দ্রবাবু মাত্র এক শত টাকা দিতে চাইলেন অবশেষে। মক্কেল হাতছাড়া হয় দেখে বিপিনবাবু তাতেই রাজী হলেন। মনে মনে অবশ্য বিপিনবাবু ফন্দি আঁটলেন—একরকম করে তিনি আদায় করবেনই।

চন্দ্রনাথবাবু যে পাত্রটির সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধ স্থির করলেন, তার নাম কিশোরী। সে বি. এল্. পাশ দিয়েছে। স্বভাব চরিত্র ভালো। তার বাবা শ্যামাচরণ বাবুর সঙ্কল্প, তিনি পণ নেবেনই, কিন্তু কিশোরীর তাতে অমত। ছেলেবেলা থেকেই পণের বিরুদ্ধে ক্লাবে সে অনেক বক্তৃতা দিয়েছে। আজ যদি নিজে তা পালন না করে, লোক হাসবে। দেশের বড়ো লোকদের দৌড় জানা গেছে। তাই নিজের থেকেই সে একটা স্বাক্ষর সমেত দরখাস্ত ছোটোলাটফে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করে।—যাতে গভর্ণমেণ্ট পণের একটা মাত্রা বেঁধে দেন। কিন্তু বিয়েতে যা কিছু কর্তৃত্ব সবই শ্যামাচরণবাবুর ওপর। সুতরাং পাঁচ হাজার টাকার কম খরচের আশা নেই। বৃদ্ধ জমিদার যোগেনবাবুর কাছে বাড়ী বাঁধা দিয়ে চন্দ্রবাবু অর্থসংগ্রহ করেন। বিয়ের সম্বন্ধ পাকা। এ সময় হঠাৎ বাড়ী বন্ধকের খবরটা কিশোরীর কানে গেলো। কিশোরী সকলের অগোচরে যোগেনবাবুকে টাকা দিয়ে দলিলটা ছাড়িয়ে এনে চন্দ্রবাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। সব জান্তে পেরে 'দেবতুল্য জামাইয়ের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তিনি। ওদিকে কিশোরীর মা কান্না জুড়ে দেন,—ছেলের এর মধ্যেই শ্বশুরবাড়ীর দিকে ঝোঁক হলো—ছেলে পর হয়ে গেলো! কিশোরী অর্থের দিক থেকে পিতাকে দুঃখ দিতে অনুতাপ করে। সে ভাবে ওকালতি করে এর শোধ দেবে। বিয়ের পর কিছুদিন কিশোরী নিরুদ্দিষ্ট রইলো। শ্যামাচরণ ভাবেন, তাঁর অর্থলোভের জন্যেই ছেলে অভিমানে বিরাগী হয়ে গেছে! তখন তাঁর মনে হয়, ছেলে আসলে তো খারাপ কাজ করে নি! এদিকে নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় কিছুদিন ওকালতী করে প্রচুর অর্থ এনে কিশোরী তার বাবার পায়ে ঢেলে দিলো। বাবার আর দুঃখ রইলো না।

যে যোগেন ঘোষের কাছে বাড়ী বাঁধা রাখা হয়েছিলো, সেই লোকটি খুব অর্থলোভী। তিনি এবার ভাবেন, ছেলের বিয়েতে মস্তবড়ো একটা দাঁও

মারবেন। এই সময়ের মধ্যে প্রমদা নামে এক বৃদ্ধা বেশ্যা তার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে বিপিনের কাছে। মেয়েকে নিজের পথে টানবার ইচ্ছে তার নেই। একটা ভালো ঘরে যদি তার বিয়ে দেওয়াতে পারেন, তাহলে বিপিনবাবুকে সে এক হাজার টাকা ঘটক বিদায় দেবে। বিপিনবাবু উল্লসিত হয়ে ওঠেন। যোগেনকে ধরে তিনি বলেন, একটি মেয়ে আছে—বিধবার একমাত্র মেয়ে। বিধবাটির কিছু সম্পত্তি আছে। পরে মেয়েই পাবে। তাছাড়া বিয়েতে আট দশ হাজার টাকা পণ দেবে। পণের লোভে যোগেনবাবু ঘর জিজ্ঞেস কববার মতো ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কোনোরকমে বিয়েটা হয়ে গেলেই তিনি বাঁচেন।

যোগেনবাবুর ছেলের সঙ্গে প্রমদাবেশ্যার মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়। পরে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় পুত্রবধূর মা বেশ্যা। পাড়ার লোকেরা সবাই মিলে যোগেনবাবুকে টিটকারী দিতে আরম্ভ করে দেয়। বিপদ বুঝে যোগেনবাবু ছুটে যান প্রমদার কাছে। বলেন, টাকা আর মেয়ে দুইই সে ফিরিয়ে নিক। প্রমদা বলে, অগ্নিসাক্ষী করা হিন্দুবিবাহ—এতে মেয়ে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। প্রমদা নালিশের ভয় দেখায়। যোগেনবাবু অকুল পাথারে পড়েন। ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রতিবেশী এসে যোগেনবাবুকে বেশ্যার সঙ্গে গল্প করতে দেখে বিদ্রূপ করে। প্রমদা তাদের বলে, যোগেনবাবুকে সে দশ হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, এখন যোগেনবাবু নাকি বলেন, ছেলের বিয়ে হয় নি। সবাই মিলে তখন ঠাট্টাবিদ্রূপ করে যোগেনবাবুকে অপদস্থ করে। যোগেনবাবু আক্ষেপ করে বলেন,—"এখন নাকে খৎ, ছেলের বে-তে টাকাই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে টাকা টাকা করে পাগল হয়ে যেমন জাতকুলের দিকেও নজর দিই নি, তেমনি তার প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম।"

লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (১৮৯০খৃঃ)—রাজকৃষ্ণ রায়॥ পুত্র বিক্রয় অর্থাৎ পণ-গ্রহণে পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত প্রহসনকার এখানে উপস্থাপিত করেছেন গবেন্দ্র চরিত্রটির মাধ্যমে। লোভেন্দ্রের মুখ থেকেই তার পরিচয় প্রকাশ করেছেন প্রহসনকার। লোভেন্দ্র বলেছে, সে হচ্ছে "Model Bridegrooms Father! যাকে বাংলায় বলে আদর্শ বরের বাপ! অন্য অন্য বাবারা আমার কাছে ছেলেরূপ পাঁঠা বেচা শিখে নিক।" পৈশাচিক বৃত্তির দিক সাধারণের ব্যাপক আকর্ষণেই প্রহসনকার চরিত্রটিকে আদর্শ বলে পরিচয় দিয়ে সাধারণের এই দুষ্প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন।

কাহিনী।—কলকাতার লোভেন্দ্রবাবু অত্যন্ত অর্থলোভী মানুষ। এতো-দিনে সে অর্থাগমের একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছে—পাঁঠা বেচে টাকা করা ; অর্থাৎ ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগার করবে সে। কিন্তু তার দুঃখ একটা বৈ ছেলে নেই। ছেলে গবেন্দ্রকে বাজারে চড়াদামে হাঁকবার জন্যে লোভেন্দ্র তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখায়, পাউডার ক্রিম কিনে দেয়, ছানা মাখন খাওয়ায় ; ছেলেকে হাতখরচের টাকাও দেয়—যে টাকা রক্তের মতো। কিন্তু সে জানে সব কিছুই আসলে Investment—সুদে আসলে ফিরে আসবে। ছেলেও নিজে অনেকখানি তৈরী হয়ে উঠেছে। বাড়ীর খোনা চাকর রঙ্গার সহায়তায় সে গাঁজা, চরস, আফিম মদ—সব কিছুতেই নেশা করতে শিখেছে। ইস্কুল পালিয়ে সে পান্নাবেশ্যার বাড়ী যায়। এক কথায়, অধঃপাতে যাবার তার আর কিছু বাকী নেই।

লোভেন্দ্র এদিকে ভাবে, তার স্ত্রী যদি অন্ততঃ কুড়িটা ছেলে প্রসব করতে পারে, তাহলে তাদের বিয়ে দিয়ে লোভেন্দ্র মতিলাল শীল, রামদুলাল সরকার এদের কাছাকাছি হতে পারবে। কলকাতায় ধনী বলে তার নাম হবে। রঙ্গাকে দিয়ে ষষ্ঠীপুজোর উপকরণ এনে নিজের স্ত্রীকে বেদীতে বসিয়ে জীবন্ত মা ষষ্ঠী বলে পুজো করে সে। মা বলে সম্বোধন ক'রে স্ত্রীকে বলে, সে যেন কুড়িটা সন্তান প্রসব করে। লোভেন্দ্রের সৃষ্টিছাড়া ব্যবহারে স্ত্রী গোলাপসুন্দরী বিব্রত হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে গবেন্দ্র যষ্টি হাতে এসে পড়ায় ষষ্ঠীপুজো পণ্ড হয় "আমি হেন একমাত্র কুলের মুখোজ্জ্বল গ্যাস্‌-লাইট ছেলে থাকৃতে, তিনি আবার ছেলের জন্যে ষষ্ঠীপুজোয় মন দিয়েচেন !"

গোবিন্দপুরের পরাণবাবুর মেয়ের সঙ্গে গবেন্দ্রর সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। লোভেন্দ্র চোদ্দ হাজার টাকার এক পয়সাও ছাড়বেন না। পরাণবাবু এদিকে পাঁচ মেয়ের বাবা। সর্বস্ব খুইয়ে প্রথম দুজনের বিয়ে দিয়েছেন। কিরণবালার বয়স বারো, আর বেশিদিন ঘরে রাখা যায় না। অন্যত্র বিয়ে দেবার উপায় নেই। বড়ো মেয়ে ও মেজো মেয়ের বিয়ে দেবার সময় লোভেন্দ্রের কাছে বাড়ী বাঁধা রেখে দুদফায় মোট আট হাজার টাকা নিয়েছেন। হ্যাণ্ড নোটেও দুহাজার নিয়েছেন। এখন সুদে আসলে সাড়ে তেরো হাজারে দাঁড়িয়েছে। লোভেন্দ্র বলেছে,—"বন্ধকী বাড়ী দশ হাজার টাকায় বিক্রী লিখে দিয়ে, তাছাড়া আরো চার হাজার টাকা নগদ দিয়ে, আমার পুত্র শ্রীমান গবেন্দ্রচন্দ্রের সহিত তোমার তৃতীয়া কন্যার বিবাহ্ দাও নৈলে পনর দিনের মধ্যে নালিশ কোরে

খরচা সমেত সাড়ে তেরো হাজার টাকার ডিক্রী কোরে বাড়ী সিজ্ করবো।" পরাণের বন্ধু শ্যামবাবু এবং হরিবাবু অবাক হয়, এমন অর্থপিশাচ তাঁরা জীবনে দেখেন নি। শ্যামবাবু ফন্দি করেন, লোভেন্দ্রকে হাবুডুবু খাওয়াতে হবে, সেই সঙ্গে পরাণবাবুকেও বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে। শ্যামবাবু আর হরিবাবু ভাবী-জামাই গবেন্দ্রকে তার নিজস্ব পরিবেশে দেখে নেয়। গবেন্দ্রের চাকর বা ইয়ার রঙ্গা বাবুর পরিচয় দেয়,—"ইনি বাবুর বাবু পেল্লায়বাবু। ইনি ছানা মাখন ঘি দুধ খান—কালিয়া কোপ্তা পোলাও খান—প্যাজ রসুন খান—অএল্ম্যান্—ইষ্টোরের চাট্নি খান—উইল্সেন হোটেলের পাউরুটি বিস্কুট খান—ইস্পেন্সার হোটেলের বরগাণ্ডি খান—হোটেল্ ডি ইয়ুরোপের বোরদো কেলারেট খান—ইষ্ট্রঙ্ দাস্তো টি খান—কেল্নার কোম্পানির হাইল্যাণ্ড হুস্কি খান—ঘুস্কীর ফুস্কি খান—।" বাবুর বিলাসের কথাও বলে। "আমার গবুবাবুর পায়ে ডসনের দশ টাকা জোড়া বিলীতী জুতো, হাতে ফুলের তোড়া, আইভরি ছড়ি;...মাথায় আলবাৎ টেড়ি, পোমেটম্;—পেয়ারের চোদ্দ পোর দেহখানি পিয়ারের সাবানে দিনে দশবার ঘসা ধোয়া, সেই দেহে বাহার জমাটে জামা, ডাইনে বাঁয়ের পাকেটে ভার্কেনার ভাবনার খোস্‌বুদার রেস্‌মী রুমাল, মনিব্যাগ, 'আমি তোমারি,' 'মধুর চুম্বন', 'ফরগেট মি নট,' ছাপদার চিঠির কাগজ, বাক্স-ভরা বাহাদুর চুরুট, ব্রায়াণ্টের ম্যাচ্‌বাক্স, জামার বুক পকেটে সোনার ট্যাক ঘড়ী, ওয়াচগার্ড, জামার কাফে আর বুক-চেরায় সোনার বোতাম, কটিতটে সাড়ে সতেরো টাকা জোড়ার ফরাসডাঙ্গার ধুতি,—বুকে বাঁধা ঐ দরের উড়ুনী, উড়ুনীতে বুকবাহারে গোলাপ ফুল গোঁজা।" গবেন্দ্রকে "মানুষ-গরু" বলে মন্তব্য করে পরাণের বন্ধুরা চলে যান।

গবেন্দ্র মার কাছে পাঁচশ টাকা চায়। পরশু দিনই দু'শো টাকা নিয়েছে আজ আবার টাকা চাইতে দেখে গোলাপসুন্দরী অবাক্ হয়। গবেন্দ্র টাকা নেবেই নইলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ। সে যুক্তি দেখায়, কলিযুগে দান ধ্যানেই সবচেয়ে বড়ো পুণ্যি। তার পুণ্যিতে মা বাপেরই পুণ্যি। এমন পুণ্যির লোভ মা সামলাতে পারে না। অথচ কাছে মাত্র একশ টাকা আছে। শেষে হাতের বালা আর গলার হার খুলে দেয়। টাকা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গবেন্দ্র পান্নার বাড়ীতে ছোটে।

এদিকে বেশ্যা পান্নাবাঈ চটে অস্থির। পাঁচশত টাকা দেবে বলে গবা গা ঢাকা দিয়েছে। "আর গবা এলে তার বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেবো।"

ইতিমধ্যে গবেন্দ্র এলে ভেতর থেকে পান্না গালাগালি দেয়, খিল খোলে না। বাধ্য হয়ে গবেন্দ্র চার শত টাকার গয়না আর একশত টাকা নগদ পকেটে দেখালে পান্না খিল খুলে দেয়। চাকর রঙ্গা ভাবে,—"ও বাবা! একটা ঘুণ-ধরা কেঠো কপাটের খিল খোলার দাম পাঁচশো টাকা!" এদিকে খবর পেয়ে লোভেন্দ্র ছুটতে ছুটতে এসে বলে, পকেটে যে গয়না আছে, সেগুলো বের করে দিক। গবেন্দ্র দিতে আপত্তি করলে লোভেন্দ্র তাকে চপেটাঘাত করে, গালাগালি দেয়। পান্নাবাঈ তার সম্পত্তি হাতছাড়া হয় দেখে বলে ওঠে, এটা তার জিনিস, গোবেন্দ্র যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে পাহারাওয়ালা ডাক্‌বে। পিতার প্রহারে অসহ্য হয়ে গবেন্দ্র বলে,—"তোমার মত বাবা নেহি মাঙ্‌তা। তোম্‌রা মুখ নেহি দেক্তা; এই কপাটমে খিল লাগাতা।" লোভেন্দ্রকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পান্নাকে নিয়ে গবেন্দ্র ঘরের কপাট বন্ধ করে। লোভেন্দ্র তো হতবাক্‌। এমন সময় শ্যামবাবু আসেন। তাকে লোভেন্দ্র বলে,—এখন সে ফকির। তার একমাত্র ছেলে—সেও নাগালের বাইরে। শ্যামবাবু বলেন, একটা কাজ করলে লোভেন্দ্র বড়োলোক হতে পারে। কাঁকুড়গাছির কাছে একটা বাগানে এক যোগী সন্ন্যাসী এসেছেন। তিনি তামাকে সোনা করতে পারেন। কাল সকালেই তিনি হরিদ্বার রওনা হবেন। একথা শুনে লোভেন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

এদিকে শ্যামবাবুই সন্ন্যাসী সেজে মানিকতলার পুলের কাছে যথাস্থানে বসে ছিলেন। লোভেন্দ্র তাকে মণ পঞ্চাশেক সোনা করে দিতে বলে। সন্ন্যাসী অভয় দিয়ে বলেন, লোভেন্দ্রকে তিনি কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে ধনী করে দেবেন। এমন সময় কাফ্রীর মুখোস পরে গোপাল, হরি আর মধু তলোয়ার হাতে ছুটে আসে। সন্ন্যাসী রেহাই পেয়ে চলে যান। লোভেন্দ্রকে তারা চেপে ধরে, বলে,—লোভেন্দ্র বিশ হাজার টাকা এক্ষুনি দিক, নচেৎ কেটে ফেল্‌বে। বলা বাহুল্য পূর্বেই এর নির্দেশ ছিলো। পকেট থেকে লোভেন্দ্র পাঁচ-ছয় টাকা বের করে বলে,—"মদ খাও গে বাবারা।" কিন্তু এরা নাছোড়বান্দা। অথচ টাকা তার কাছে নেই। বাড়ীতে ছেলের কাছে চিঠি লিখে টাকা আন্‌তে বলে। হরির নির্দেশমতো লোভেন্দ্র গবেন্দ্রকে চিঠি লেখে। সে মুস্কিলে পড়েছে, পত্রপাঠ কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে সে যেন দেখা করে, নইলে প্রাণে মারা পড়বে। এরা লোভেন্দ্রকে আটকিয়ে রাখে, হরিবাবু নিজেই চিঠি নিয়ে লোভেন্দ্রের বাড়ী যান। টাকা নিয়ে গবেন্দ্র ও তার মা গোলাপসুন্দরী

আসে। টাকা কেড়ে নিয়ে হরিবাবুর দল প্রস্থান করে। লোভেন্দ্র কপাল চাপড়ায়,—লোভে পড়ে সব খোয়া গেলো। চাকর রঙ্গা আশ্বাস দেয়,—"কি হাজার টাকা! আপনার জীবন্তা ষষ্ঠী ঠাক্‌রুণের গব্‌ভ কোষ টাঁকশাল! লাখ লাখ টাকা তোয়ের হবে।"

পাশ করা ছেলে (কলিকাতা—১৮৭৯ খৃঃ)—দুর্গাচরণ রায়॥ প্রহসনকার তাঁর নামকরণে পাশকরা ছেলের গতিবিধিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ নামকরণে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণই মুখ্য। বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় প্রহসনকার লিখ্‌ছেন—"আমার পাশকরা ছেলে পিতাকে don't care করে। সে আমাকে কলঙ্ক সমুদ্রে নিমগ্ন করিবে জানিয়াও ভদ্রসমাজে ইস্তাহার দিতে বাধ্য হইলাম। এখন আমার অদৃষ্ট ও পাঠকমহাশয়ের হাতযশ।" বিজ্ঞাপনে একই দৃষ্টিকোণ আপাতভাবে প্রধান হয়ে দেখা দিলেও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে মুখ্য দৃষ্টিকোণ হয়ে পড়ে আর্থিক।

কাহিনী।—বারাণসীর তারাপ্রসন্ন কালেক্টারের সেরেস্তাদার। তাঁর মেয়ে নগেন্দ্রবালা বড়ো হয়েছে। তাই তারাপ্রসন্নবাবু তার বিয়ের চেষ্টা করছেন। বি. এ., স্টুডেন্ট নসীরাম পাত্রী দেখতে এসে নগেন্দ্রবালাকে নিজের নাম এবং বাংলার গভর্ণরের নাম জিজ্ঞাসা করে। নগেন্দ্রবালা নিজের নাম ছাড়া আর কিছু বল্‌তে পারলো না। নসীরাম রাগ করে চলে যায়। তারাপ্রসন্নের জ্ঞাতি কানাইয়েরও একটা পাশ করা ছেলে আছে। তার বিয়েতে সে কি চেয়েছে, কথা প্রসঙ্গে তারাপ্রসন্ন তা বলে। "বৌমার মাথায় সোনার আঁব কাঁঠালের বাগান আর তাঁর চকে, নাকে, বুকে, পিঠে, কুঁচকি, কণ্টায় যত সোনা লাগ্‌বে এবং কোমর হতে পা পর্য্যন্ত রূপো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আর আমার গঙ্গারামের আঙ্গুলে দশ আংটী, সোনার ঘড়ি, সোনার চেন, রূপোর দানসামগ্রী, ভাল খাট মশারী, পড়ার খরচ মাসিক চোদ্দ টাকা আয়ের একখানি তালুক যে দেবে, তাকে ছেলে দেবো।" কানাই বলে, এমন কিছু বেশি চাওয়া হয় নি।

রামদাস শর্মা গরীব ব্রাহ্মণ। তাঁর ছেলে কিশোরী অত্যন্ত সৎ। অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখ্‌ছে। রামদাস ভাবে, কিশোরীর সঙ্গে যদি তারাপ্রসন্নের মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে শ্বশুর কিশোরীকে একটা চাকরী জুটিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই। কারণ তিনি মহৎ লোক। রামদাসের স্ত্রী রামমণি বলে, —"আমার যে পাশ করা ছেলে। শ্বশুরের চাকরী তার দরকার নেই।

লাটসাহেব শুনলে সে সঙ্গে করে নিয়ে চাকরী দেবে।" রামমণি প্রতিবেশিনী দুইটি মেয়েকে গয়নার ফর্দ করে দিতে বলে। ঐগুলো তারাপ্রসন্নের কাছ থেকে চাওয়া হবে। কিশোরী এসে নিজের বিয়ের কথা শোনে। সে বলে, সে পরের বাড়ী রেঁধে নিজের পড়াশোনা করে। তার বিয়ে করা শোভা পায় না। রামমণি দুঃখ করে বলে, তার বিয়ের সময় সে সর্বস্ব খুইয়ে বিয়ে করেছে, আর তার পাশ করা ছেলে অর্ধেক রাজত্ব পেয়েও বিয়ে করতে চায় না। যাহোক কথা যখন দেওয়া হয়েছে, তখন মুখ হেঁট যেন না করতে হয়।

তারাপ্রসন্নের বসবার ঘরে সখীর সঙ্গে নগেন্দ্রবালা কথা প্রসঙ্গে বল্‌ছিলো যে, কুলীনেরা বিয়ে করতো অনেক, কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দেউলিয়া করতো না। এখন কুলীনের জায়গায় হয়েছে পাশকরা ছেলে। পরে এমন দিন আসবে যে বাঙালীঘরে মেয়ে হলে সূতিকা ঘরে মেরে ফেল্‌বে। ঘটককে নিয়ে তারাপ্রসন্ন এবং জ্ঞাতি তুলসীরাম ঘরে ঢুকলে সখীদের নিয়ে নগেন্দ্রবালা বেরিয়ে যায়। ঘটক তারাপ্রসন্নকে রামদাস শর্মার দেওয়া লম্বা গয়নার ফর্দ দেখায়। তারাপ্রসন্ন ঘটককে তখন জানায়,—পরীক্ষায় রামদাসের ছেলে পাশ হলে তারপর এ বিষয়ে কথাবার্তা হবে। কেরাণী কাঙালী এসময় এসে ঢোকে। সে বলে, মেয়েকে সে পার করতে নি। ছল করে সে বেয়াইকে বলেছিলো যে গয়না দেবে, কিন্তু দিতে পারে নি। এইজন্যে সে নালিশ করবে বলে গাল দিতে দিতে চলে গেলো। কানাই তার ছেলে গঙ্গারামের বিয়ের জন্যে যা চেয়েছিলো, তা লেখাপড়া করে নেবার জন্যে ষ্টাম্প নিয়ে এসেছে। তারাপ্রসন্ন কানাইকে বলেন, কানাইয়ের বেয়াই তালুক লিখে দিলে তাদের থাকবে কি? তখন কানাই জানায়,—"তা জানিনে, মেয়ে জন্ম দেয় কেন?" ঠিক এমন সময় পিওন এসে তারাপ্রসন্নকে একখানা গেজেট দেয় এবং কানাইকে একটা পত্র দিয়ে চলে যায়। কানাই দেখ্‌লো, তার পুত্র পাশ করতে পারে নি। আর তারাপ্রসন্নের যেটি জামাই হবে, সে ফেল করেছে। তখন তারাপ্রসন্ন ঘটককে বলে, সে সিকি নিয়ে রাজী আছে কিনা।

কিশোরীর সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিয়ে হয়ে গেছে। নগেন্দ্রবালা কিশোরীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী এসেছে। একেতেই কিশোরীরা গরীব, ওর ওপর এটা পাড়াগাঁ। বড়োলোকের মেয়ে নগেন্দ্রবালার মন টিকছে না। বাড়ীতে সে কতো আদর পেতো, কতো ভালো ভালো জিনিস খেতো। এখানে কিছুই সে পায় না। সকলকে এজন্যে সে নানারকম কটূক্তি করে। কিশোরী

বেচারার খরচ বেড়েছে। মাকে কিশোরী দোষ দেয়,—সে আগেই বিয়েতে অমত করেছিলো! কিশোরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,—"এই আমার যৌবন আরম্ভ। জীবনে যে সহবাস সুখ চেয়েছিলাম, তাহা আর হলো না। অবিবাহিত থাকিয়া আমি সুখীই ছিলাম। আমার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তি এলেই হউন, আর বি. এ-ই হউন, বা এমেই হউন, যেন বড মানুষের মেয়ে বে না করেন।" নগেন্দ্রবালার চাপে অবশেষে কিশোরী তাকে তারাপ্রসন্নবাবুর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখে এবং নগেন্দ্রবালাও তারাপ্রসন্নবাবুর বাড়ীতে কিশোরীকে থাকতে বাধ্য করে,—কেননা তারাপ্রসন্ন কিশোরীকে একটা চাকরী করিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছা সত্বেও কিশোরী বাড়ীতে গরীব মা বাবার সংবাদ নিতে পারে না। এমন কি নগেন্দ্রবালা কিশোরীর মাইনেটুকুও নিজের কাছে কেড়ে নিয়ে রেখে দেয়।

তারাপ্রসন্নের জ্ঞাতি জামাই হরিদাসও চাকরির লোভে শ্বশুরবাড়ীতে পড়ে আছে। তারাপ্রসন্ন একেও টেলিগ্রাফে কাজ জুটিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে থেকে থেকে সে হতাশ হয়ে পড়ে। গেজেট দেখে যে চাকরীর দরখাস্ত যে দেবে, তারও উপায় নেই। কেননা পাঁচ টাকায় সকলেই এল্. এ চায়। স্ত্রী ইন্দুবালা উপস্থিত ছিলো। হরিদাস তাকে পড়তে বলে। কেননা সে যদি চাকরীর জন্যে বাধ্য হয়ে আন্দামান কিংবা সিংহলে যায়, তাহলে স্ত্রীর পত্র না পেলে আর বাঁচতে পারবে না। ইন্দুবালা পড়তে বসে। কিন্তু তখনই ভেতর থেকে ডাক আসে—তার ছেলেকে দুধ খাওয়াবার জন্যে। ইন্দুবালা চলে যায়। শ্বশুরবাড়ীতে হরিদাসের দিন এমনিভাবে কাটে।

শ্বশুরবাড়ীতেই কিশোরী আছে। হঠাৎ একদিন বাবা-মা সম্পর্কে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সে বিচলিত হয়ে পড়লো। কাউকে কিছু না জানিয়ে সে সেই দিনই সকালে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে চলে গেলো। নগেন্দ্রবালা সকালে উঠে স্বামীকে না দেখে বুঝতে পারলো, স্বামী বাবা-মার কাছে ফিরে গেছে। এখন সে বুঝলো, স্বামীকে সে কতো গঞ্জনা দিয়েছে। মাইনের টাকার এক পয়সাও সে কিশোরীর বাবার কাছে পাঠাতে দেয়নি। সবই সে নিজে কৌশল করে নিয়ে রেখেছে। স্বামীর সঙ্গে একদিনও সে মিষ্টিমুখে কথা বলে নি। তারা-প্রসন্নও যখন সব জানলেন, তিনিও খেদ করতে লাগলেন। তিনি বলেন, কিশোরী সত্যিই ভালো ছেলে ছিলো। পাড়ার কোনো খারাপ ছেলের সঙ্গে সে মেশে নি। "স্বস্ত্রীক সম্মিলনীতে" যোগ দেয় নি। কিন্তু তিনি তার

সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নি। এখন বেয়াইয়ের কাছে মাফ চেয়ে নগেন্দ্রবালাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোই ভালো। এমন সময় কাঙ্গালী দৌড়োতে দৌড়োতে আসে। পেছন পেছন তার বেয়াই লাঠি নিয়ে তাড়া করে আস্‌ছে। কাঙ্গালীর পেছন পেছন বেযাই এসে ঢুকে বলে, কাঙ্গালী তাকে ঠকিয়েছে। আজকের বাজারে পাশ করা কায়েতের ছেলে পাওয়া যায় না। কাঙ্গালীকে মেরে সে ফাঁসি যেতেও রাজী। বেয়াই কাঙ্গালীকে মারতে লাঠি তুল্‌লে তারাপ্রসন্ন তাকে থামায়।

ওদিকে, রামদাস শর্মা দারিদ্র্যের জ্বালায় একটা ছুরি নিয়ে আত্মহত্যা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় কিশোরী এসে ঢোকে। কিশোরীকে দেখে রামদাস ও রামমণি খুশি হলো। পেছন পেছন নগেন্দ্রবালাও এসে উপস্থিত হওয়াতে সকলে আনন্দ করতে লাগ্‌লো। রামদাস ও রামমণি পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করেন।

বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু॥ বিবাহে পণ লোভে পাশ দেওয়াবার কুফল প্রদর্শনের মূলে রক্ষণশীল সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় আছে; কিন্তু পাশ দেওয়া ব্যক্তির গতিবিধি চিত্রণের মূলে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সামাজিক বিষকে অন্য একটি সামাজিক বিষের প্রতিষেধক হিসেবে উপস্থিত করা। এই দিক থেকে লেখকের প্রধান দৃষ্টিকোণ আর্থিক।

কাহিনী।—গোপীনাথ সরকারের ছেলে নন্দলাল ফ্রি চার্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌, কলেজ ডিপার্টমেণ্টে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। পাশ করা ছেলের বিয়ে দিয়ে প্রচুর টাকা পাবেন আশা করে গোপীনাথ সর্বত্র যথেচ্ছভাবে দেনা করে বেড়ান। ধোপা, মুদি থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর ঝির মাইনে পর্যন্ত বছর দেড়েক ধরে বাকী রেখেছেন। সবাইকেই তিনি ঠেকিয়ে রেখেছেন। বলেন, ফুলশয্যার পরের দিন সব মিটিয়ে দেবেন। গোপীনাথ ভেবেছিলেন ছেলে আর একটা পাশ দিলে হয়তো ডবল টাকা আদায় হয় কিন্তু পাওনাদারদের তাগাদায় তার কটূক্তিতে শেষে এবারেই ছেলের বিয়ে দেবার তিনি চেষ্টা করেন। ধনী প্রতিবেশী চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে তিনি বলেন, হোগলকুঁড়ের মন্মথ মিত্রের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করছেন। মেয়ের বয়েস বারো উত্তীর্ণ হতে চল্‌ছে, ঘরে রাখা যায় না, গোপীনাথের দরেই তাকে ঘাড় পাততে হবে। চন্দ্রবাবু বলেন,—"আপনারা তো মৌলিক, কুলীনের মেয়ে আন্‌তে হবে—তাতে এমন কি টাকা পাবেন যে, সব দেনা শুধবেন?" জবাবে গোপীনাথ বলেন, "এখন

কি আর বল্লালি কুলীন চলে? এখন কুলীন মর্য্যাদা কলেজের পাশ, মুখ্যী কনিষ্ঠ উঠে গিয়ে এখন এম্. এ, বি. এ, হয়েছে। ...আমি যদি সোনার ষোড়শ-কোট করি, তাহলে তাই দিয়েই মেয়ে পার কত্তে হবে।" গোপীনাথ আরও বলেন,—"চক্ষুলজ্জা কল্লে ব্যবসা চলে না, আপনারা কি সুদের বেলা কমতি করেন?" চন্দ্রবাবু স্বীকার করেন,—"তাও তো বটে, ছেলের বিয়ে আর তেজারতি একই কথা।" এমন সময় ঘটকও এসে পড়ে। ঘটক বলে, মেয়ে সুশ্রী একহারা চেহারার। খুব মোটা-সোটা নয় বলে গোপীনাথ নিরাশ হয়ে পড়েন। স্থুট হিসেবে গয়না নিলে মোটা মেয়েতেই লাভ। "তবে স্থুট হিসেবে চল্‌বে না, গহনা সব হাল্কা হয়ে পড়বে, ও ভরি হিসেবে ধরাই ভালো।" চন্দ্রবাবু বলেন, ওটা সোনার বেণের ঘরেই চলে, বামুন কায়েতের ঘরে এটা ভালো দেখায় না। ঘটক প্রতিবাদ করে বলে,—"মহাজনো যেন গত স পন্থা, তা সোনার বেণেরাই হল জাত মহাজন।" তখন-তখনই পাওনা ঠিক করে ফেলে। কিন্তু পাওনা জিনিসের দাম ধরে নিতে চায়। যথা—সোনা একশো ভরির দাম আঠারো টাকা হিসেবে। রূপো দেড়শো ভরির জন্যে দেড়শো টাকা। বানির জন্যে ভরি হিসেবে মোট তিনশো টাকা—মোটামুটি তেইশশো টাকা। গহনার বদলে নগদ টাকা নিতে গিয়ে কেন গোপীনাথ বানি ধরছে, তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলে—"টাকাটা স্যাক্‌রাকে না খাইয়ে জামায়ের ঘরে গেলে মিত্তিরজা মশায়ের লাভ না লোকসান?" জড়োয়া জিনিস কেনা মানে টাকা জলে দেওয়া। প্রাপ্য সিঁথির বদলে আড়াইশো আর মুক্তোর বদলে আড়াইশো দিলেই চল্‌বে। রূপোর বাসন নেওয়া মানে চোরের উপদ্রব বাড়ানো। আর, ভালো ঘর না হলে খাট বিছানা এনে কী হবে। অতএব দুয়ে মিলে আর সাতশো। তাহলে হলো মোট পঁয়ত্রিশশো। তাছাড়া পাঁচশো টাকা নগদ তো আছেই। অবশ্য ফুলশয্যার দুশো নগদের কথা আলাদা ধরতে হবে। তাহলে হলো মোট চার হাজার দুশো টাকা। ছেলের সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি আর সোনার চশমার জন্যে অবশ্য টাকা চায়না। কারণ বরের তো নিজের সাধ আহ্লাদ আছে। ঘটককে গোপীনাথ বলে এর ওপর ঘটক আর যা করতে পারবে, তার আধাআধি বখরা পাবে।

নন্দলালের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। নন্দলাল এল্. এ পড়তে এসে দুদিনেই সাহেবী চাল শিখে নিয়েছে। তার আদর্শ নীলরতন সিংহ অর্থাৎ মিঃ সিং এবং মিসেস বিলাসিনী কারফরমা। মিঃ সিং যাওয়া আসা

ধরে মোট দশমাস বিলেতে ছিলেন। তাঁর অনেকগুলো ডাক্তারী টাইটেল আছে। বিলাসিনীর স্বামী জিজ্ঞাসা করেন,—"এই মাস আষ্টেকের ভিতর আপনি এতগুলো টাইটেল পেলেন? মেলাই একজামিন দিতে হয়েছিল দেখ্‌ছি।" সিং বলেন—"Nothing of the kind; বিলাতে আমাদের মত জেন্টলম্যানকে একজামিন দেবার ইচ্ছা না থাকলে compell করে insult করে না। আমাদের ইংলিশ manners দেখ্‌লেই বিদ্যা হয়েছে বুঝে নেয়, ফি দিলেই বুঝতে পারে, respectable, আর ডিগ্রি দেয়; আমার একটু প্র্যাক্‌টিশ জমলেই ওভারল্যাণ্ড মেলে এম্‌. ডি'টা আনিয়ে নেবার ইচ্ছা আছে।" বাংলা কথা ভুলে যাবার কায়দা জান্‌তে চাইতে নন্দকে তিনি বলেন,—"That's a secret amongst our fraternity." পরে 'প্রাইভেটলি' বলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর আছেন বিলাসিনী কারফরমা। ইনি শিক্ষিতা ও প্রগতিশীলা মহিলা। বি. এ. পাশ করে physics নিয়ে এম্‌. এ. পড়বার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। গৃহস্থালীর কাজ স্বামী গৌরীকান্তই করেন। বিলাসিনী বলেন,—"পতির প্রধান গুণ স্ত্রীভক্তি, যে পতি স্ত্রীকে না ভক্তি করে, সে ব্যভিচারী, পুরুষ বেশ্যা; আর আমরা যদি স্বামীকে দমন কত্তে না পারবো, তবে আমাদের হাই এজুকেশনের ফল কি?"

বিলাসিনীর কাছে নন্দ যখন নিজের বিয়ের খবর দেয়, তখন "অপবিত্র সেকেলে বেআইনী মতে কেন নন্দ বিয়ে করছে"—বিলাসিনী তা জিজ্ঞেস করেন। নন্দ বলে,—"দেখুন, আমি এক ঢিলে তিন পাখী মারবো। সমাজকে শাসিত করবো, বাবাকে শিক্ষা দিব, আর আমার শ্বশুর হবার যে বেয়াদবি রাখে, তারেও শাস্তি দিব।" টাকাটা হাত করে নিয়ে নন্দ বিয়েটা null and void করিয়ে দেবে। মেয়েটির ভাগ্য? "There are ten thousand bachelors to choose from." নন্দ মেম ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। "I will get one milk white wife with a pair of cats eyes." যে টাকাটা সে হাত করবে, তাই দিয়েই সে বিলেত যাবে।

গোপীনাথ ভাবেন, কি ভাবে টাকা হাতে রেখে উদ্বৃত্ত থেকে দেনা শোধ করবেন। গিন্নী এসে গোপীনাথের বুদ্ধিকে ধিক্কার দেন। "কর্ত্তাপনা করা অমন মেনীমুখোর কাজ নয়।" "তাদের সর্ব্বনাশ হলো তো আমার কি? আহা কে আমার সাতপুরুষের কুটুম গো। নন্দলালের পায়ে মেয়ে দেবে, তাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে; এতে পোড়ার মুখো মিন্‌ষের টাকা খরচ

কত্তে হাতে আগুন লেগে যায়। আর মাগীই বা কেমন? মেয়ের মা?—চোখ-খাগীর জামাইকে দিতে চোখ টাটায়? গায়ে গহনা-টহনা নেই—বেচুক না।" গিন্নি বলে,—"আচ্ছা এবার তুমি কোচ্ছ কর—আমি আর হাত দেব না, কিন্তু বছরের ভেতর বৌটোর যদি ভাল মন্দ হয়—নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে, দেখ দেখিন—তখন ছেলের ফের বে দিয়ে আমি দোতলা বাড়ী, আর নিজের গা-ভরা গহনা কত্তে পারি কি না।" বাড়ীর ঝি এসব শুনে মন্তব্য করে,—"এরা কায়েত না কসাই? কোত্থেকে এক উনুনের পাশ পাশ হয়েছে—ছেলে পাশ হলো তো অমনি হাঁসের মত পেট হলো, যত দাও খাই আর মেটে না।" সে চিন্তা করে,—"ঘাটে ঘাটে যেমন মড়া পোড়ানোর রেট বেঁধে দিয়েছে, ছেলে মেয়ের বেরও তেমনি একটা কিছু করে দেয়, তাহলে মুদ্দফরাস বরের বাপগুলো জব্দ হয়।"

গোপীনাথ মেয়েকে আশীর্বাদ করতে গেলেন না, পাছে গহনা দিতে হয়। বলেন, বাড়ী থেকে আশীর্বাদ করলেই যথেষ্ট। মন্মথবাবু ভগ্নীপতি লোকনাথকে সঙ্গে করে নন্দলালকে আশীর্বাদ করতে গোপীনাথবাবুর বাড়ীতে আসেন। নন্দকে আশীর্বাদ করবার আগে তার সঙ্গে কথা বল্‌তে গিয়ে তার দুর্বিনীত ভাব দেখে ক্ষুণ্ণ হন। মনে মনে সান্ত্বনা পান এই ভেবে যে—নতুন কলেজে ঢোকে বলে এল্. এ-র ছাত্রদের একটু গরম মেজাজ থাকে। তাছাড়া গোরাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় বলে হয়তো গোরার মেজাজ এসে গেছে। নন্দলাল আত্মপ্রশংসা করে। সে "চাদর নিবারিণী সভার" প্রতিষ্ঠাতা। "Graduate's Guardian"-এ তার প্রকাশিত একটা বক্তৃতা সে মুখস্থ বলে যায়। একটা Pamphletও মন্মথবাবুর হাতে গুঁজে দেয়। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘটক বলে,—"দেখুন মন্মথবাবু, লোকনাথবাবু দেখ্‌ছেন? একেবারে দ্বিতীয় কেশব সেন।" মন্মথবাবু সোনার মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করলে নন্দলাল নির্বিকারভাবে সেটা পকেটস্থ করে। উদ্‌বিগ্ন হয়ে গোপীনাথ বলে ওঠেন,—"ওটা আমার কাছে; নয়—তোমার গর্ভধারিণীর কাছে রেখে যাও, হারিয়ে ফেল্‌বে।" নন্দলাল জবাব দেয়,—"তুমি আর আমাকে Political Economy শিখিও না। Good morning to all of you"—বলে নন্দলাল চলে যায়।

বিয়ের দিন মন্মথ মিত্রের বাড়ীতে সবাইকে নিয়ে গোপীনাথ এসে উপস্থিত। ছাতনাতলায় বরকে বসিয়ে আরও পাঁচ শত টাকার জন্যে গোপীনাথ মন্মথবাবুর ওপর চাপ দিলেন। মন্মথবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি সঙ্কিত

সব কিছু দিয়েছেন, বাড়ী বাঁধা দিয়েছেন,—এক রকম সর্বস্বান্ত। কাষ্ঠহাসি হেসে গোপীনাথ বলে,—"কি জান ভাই—দেখ্‌লে তো আমি ওর একটা পয়সা ছুঁয়েছি? তোমার জামায়ের হাতেই সব, তাকে যাতে সন্তুষ্ট কোত্তে পার কর। আমি এক পয়সা—গো-রক্ত।—সে শালা!—মধুসূদন! রাম! রাম!" গোপীনাথ বলেন,—বেযানের কাছে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। বরপক্ষের পরামাণিককে কানে কানে গোপীনাথ বলে,—"পরামাণিক চট্‌ করে যা, নন্দর কানে কানে বলে দিগে, নিদেন আধাআধি। আর ছ্যাখ, সব টাকা আজকের মত নন্দ নিজে রাখে, আমায় যেন সাফ রাখে; আর আমার হাতে টাকা না থাকলে—গুরু, পরামাণিক, ঠাকুর প্রণামী, শয্যা তোলাগুলোর জন্যে পেড়াপীড়ি কোত্তে পারবে না।"

বাসরঘরে মেয়েদের মধ্যে নন্দ সাহেবীপনা দেখায়। নৃত্যকালী একটা থিয়েটারের গান গায়। নন্দলাল "চমৎকার! Bravo!" বলে তারিফ করে। নৃত্যকালী নন্দকে একটা থিএটারের গান গাইতে বল্‌লে নন্দ বলে,—"থিয়েটারের গান! পবিত্র বিবাহ বাসরে ভগ্নীদের সামনে অপবিত্র থিয়েটারের গান গাইব, আপনাদের কি কুরুচি!" মোহিনী বলে ওঠে, তাহলে নৃত্যকালীর মুখে থিয়েটারের গান শুনে তারিফ্‌ করলো কেন? নন্দ তখন জবাব দেয়,—"থিয়েটারের গান গাইলেন! থিয়েটারের গান শুনলেম! ওঃ তাই এত অশ্লীল! এ কথা আমায় আগে বল্‌তে হয়, আমি উঠে যেতেম; মিসেস কারফরমাকে জিজ্ঞাসা করে এর প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হবে।" নন্দলালের 'ভগ্নী-ভগ্নী' করা দেখে মেয়েরা তার স্ত্রীর দিকে আঙুল দেখায়। নন্দ বলে,—"হ্যাঁ, উনিও ভগ্নী—গৃহে স্ত্রী হতে পারেন, কিন্তু সমাজে ভগ্নী!" সবাই হেসে ওঠে। সুরতকুমারী বলে,—"দূর শালা বোন-মেগো!"

তখন প্রায় শেষ রাত। নন্দ ভাবে, "আর দেরি করা হবে না, সকাল হবে, সব ফস্‌কে যাবে, এই বেলা সট্‌কাতে হচ্ছে।" 'আমার পেটটা কেমন কচ্ছে' বলে সে খিড়কী দিয়ে বাইরে চলে যায়। ঠান্‌দি গাড়ুতে জল ভরে নৃত্যকালীকে বাইরে রেখে আসতে বলে।

ভোরবেলা কুমুদিনীকে নিয়ে বাসি বিয়ের উদ্যোগ হয়, কিন্তু বরকে পাওয়া যায় না। গাড়ুভরা জল তেমনিই পড়ে আছে। কনেপক্ষের সবাই চোখে অন্ধকার দেখে। গোপীনাথ বলে, তার কাছে টাকা ছিলো। হয়তো কেউ রাহাজানি করেছে। নতুবা টাকার লোভে বাসরঘরের মেয়েরা তাকে খুন

করে গুম্ করে রেখেছে। ঝি এসে তখন নন্দলালের চরিত্র ফাঁস করে দিয়ে বলে,—"নন্দলাল বয়াটে ছেলে, টাকা দেবে না বলেই হয়তো পালিয়েছে। গোপীনাথ কিভাবে পাওনাদারদের কাছে জোচ্চুরি করে বেড়াচ্ছে, সে কথাও ফাঁস করে দেয়। প্রতিবেশীরা এসে গোপীনাথকে গালাগালি করে। "বলি হাঁ৷ হে, মাথা শোণের মুড়ী করেছ, মুদ্দফরাস খোস্তা নিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে, আজ বাদে কাল মরবে, তোমার এ কি জোচ্চুরি!" ঘটককেও তারা আটকিয়ে রাখে।

লোকনাথবাবু ট্রেন ফেল্ করে লেটে পৌছিয়েছেন ভোরের গাড়ীতে। বিয়ে দেখা তার হয় নি। সকালে এসে দুঃসংবাদ শুনে মর্মাহত হলেন। হঠাৎ তার মনে পড়লো নন্দর মতো একজনকে সাহেবী পোষাক পরে তিনি হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে দেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে ছোটে হাওড়ার দিকে।

নন্দকে হাওড়ায় বিলাসিনী আর মিষ্টার সিং সি অফ্ দিতে এসেছেন। নন্দর "পালানোর Manoeuvre" মনে করে বিলাসিনী হেসে ফেটে পড়েন। চেলির কাপড় পরে অনেকটা রাস্তা সে দৌড়িয়েছে। নন্দলাল বলে,—"অমন সময় বড় লোক চল্তে সুরু হয় নি ; হেদোর কাছে এক ব্যাটা পাহারাওয়ালা আট্‌কে ছিল, তারে বল্লেম, আমার বাবার শ্বাস হয়েছে, গঙ্গাযাত্রা করবো, তাড়াতাড়ি খাট কিনতে যাচ্ছি।" সিং বলে, এতো যখন Presence of mind, তখন নন্দ একজন ফাষ্ট ক্লাস সাহেব হবে।

হন্তদন্ত হয়ে গোপীনাথ, মন্মথ, লোকনাথ আর গোপীনাথের ঝি এসে সামনে হাজির হয়। নন্দকে সম্বোধন করে গোপীনাথ বলেন,—"বলি, ও কায়েতের ঘরের গণ্ড মুখ্যু, এ কি কাজ তোর? একেবারে মাথা খেয়েছ? আমায় ফাঁকি দে, বাসি-বের কনে ফেলে—টাকাগুলো নিয়ে এই আর মাগী বেশ্যাকে নিয়ে পালাচ্ছ।" বিলাসিনী এতে অপমানিত বোধ করেন। মিষ্টার সিং গোপীনাথকে মারতে যায়। ঝি মিষ্টার সিংকে চিন্‌তে পারে। "কলুটোলার পিতু সিঙ্গীর ছেলে! সে তার বিধবা মার সিন্ধুক ভেঙে যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে বিলেতে পালিয়েছিলো, মাকে আর বৌকে কাঁদিয়ে। ফিরে এসে মেড়েপাড়ায় কোন্ এক মোছলমানীকে নিয়ে আছে।" মন্মথ বলেন, তিনি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাবেন। নন্দ বলে,—"এ সঙ্গত কথা, আপনি বাবার কাছ থেকে ড্যামেজ আদায় কোত্তে পারেন।" নন্দ বলে, সে নিরাপদ, বাবাকে সে টাকার রসিদ

দেয় নি। আদালতের ভয় দেখিয়ে মন্মথরা চলে যান। "বাপ বেটায় বুঝুগ্ গে" বলে ঝিও চলে যায়। নন্দ বাবাকে বলে, সে পলিটিক্স বোঝে, নিজে টাকা পাবার জন্যে ছেলেকে যার তার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা যেমন করেছে, তেমন আক্কেল পেয়েছে। যাহোক বিলেত থেকে কৌন্সলি হয়ে ফিরে এসে বাবাকে ইন্‌সলভেণ্ট নিয়ে খালাস করে দেবে—ফি নেবে না। নন্দ চলে যায়। গোপীনাথ আক্ষেপ করেন। ভাবেন,—"ভগবান……আমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দিলেন।……ও যেমন শোনা আছে, পাঁঠী ব্যাচা টাকা থাকে না—পাঁঠীর পোষানীর টাকাও থাকে না।" গিন্নি আবার সিন্দুক খুলে বসে আছে—টাকা ভরবার জন্যে। বৌয়ের হাত ধরে ঘরে নিয়ে এসে যাতে একটা মিটমাট হয়, সেজন্যে গোপীনাথ পা বাড়ান।

রহস্যের অন্তর্জ্জলী (খৃষ্টাব্দ অজ্ঞাত) লেখক অজ্ঞাত॥ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের পণপ্রথা ও অর্থলোভকে কেন্দ্র করে লেখক তাঁর দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করেছেন। অর্থলোভীর দুর্দশাচিত্রণের মাধ্যমে লেখক অর্থলোভের সমর্থনকারীর ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করবার চেষ্টা করেছেন।

কাহিনী।—স্বকৃতভঙ্গ কুলীন চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ হরচন্দ্র চক্রবর্তী—তুজনেই অর্থলোভী। প্রথমজন নিজে বিবাহ করে অর্থ উপার্জন করেন, দ্বিতীয়জন মেয়ের বিয়ে দিয়ে অর্থ উপার্জন করেন। চাতরায় সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চন্দ্রকান্ত মন্তব্য করেন,—"আজ্‌কালের ছোঁড়ারা আবার সভা হয়েছে, বলে কৌলীন্য প্রথায় অনিষ্টের মূল।…. তোরা বলিস্ কুলীনদের বে করা ব্যবসা; অবশ্য তা স্বীকার করি, কিন্তু এ ব্যবসা না চালালে পেট চালাই কোত্থেকে? পেটে তো বোমা মাল্লে 'ক' বেরোয় না?……রেখে দে তোদের উনবিংশ শতাব্দীর রুচি, অমন রুচিতে প্রস্রাব করে দিই, ও রুচি তো আমাদের আর খাতির, মান সুখ দিতে পার্ব্বে না।…..আমরা স্ত্রীকে ভালবাসিনে, আমরা ভালবাসি টাকা। টাকা দাও—স্ত্রীর কাছে শুচ্চি, না দাও অন্য শ্বশুরবাড়ী যাচ্চি, স্ত্রী যদি মাথা খুঁড়ে গলায় দড়ি দে মরে তবুও ফিরেও চাইনে।"

আর, হরচন্দ্র টাকা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেন। তাই অনেকেই তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট। কোন নাপিত তাঁর অর্দ্ধেক দাড়ি গোঁফ কামিয়ে আর কামায় নি। তিনি খেদ করে বলেন,—"শেষে জোর করাতে বল্লে কিনা পাঁঠী বেচাদের পক্ষে অর্দ্ধেক কামানই যথেষ্ট; ছোটলোকের এত বাড় তো ভাল নয়? কি বল্‌বো

আমি বুড়ো হয়েছি, গায়ে একটু জোর থাকলে জুতিয়ে বেটার মুখ ভাঙ্গতাম।" চন্দ্রকান্তের সঙ্গে ইতিমধ্যে হরচন্দ্রের দেখা হয়। হরচন্দ্রের "হরগৌরী গোচ" কামানো দেখে চন্দ্রকান্ত কারণ জান্‌তে চাইলে হরচন্দ্র "বিশু গুয়ো" অর্থাৎ বিশ্বনাথ পরামাণিকের কাণ্ড বলে রাগ প্রকাশ করে। সে ছোটো জাত,—তার সঙ্গে মনান্তরের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পয়সা পাবে কামাবে—কিন্তু একি অন্যায়! চন্দ্রকান্ত বলেন, জমিদার চন্দ্রশেখর মিত্র এবং তাঁর ভাই শশিশেখরকে বলে দিলেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হরচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেন, —তাঁরা কি তেমন আছেন! ইংরেজী পড়ে খৃষ্টান হয়েছেন। তার সঙ্গে আরও সাহেবী চালের ছোকরা জুটেছে—তাদের আস্কারাতেই নাপিত এতো বেড়েছে। স্বয়ং জমিদারই বিধবার বিয়ে দিতে যান, কন্যাপণ ওঠাতে যান। চন্দ্রকান্ত ভাবেন,—"ও বাবা কালে কালে ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হবে নাকি?"

বিশ্বনাথ এমন সময় ছুটে এসে হরচন্দ্রকে বলে,—"এখনো তার পাঁচ চুলো" করে কামানো বাকী। হরচন্দ্র চটে ওঠেন,—"গুওটা! পাজি! নাছার! তোর যদ্দুর মুখ্ তদ্দুর কথা! ও বেটা! অহঙ্কারে ব্রাহ্মণ দেবতা মানো না—ওরে গুওটা! তোর অত বাড় ভাল না, মরণ-পালক উঠেছে, অধঃপাতে গেলি—গেলি!" চন্দ্রকান্তও তাকে গালাগালি করেন। বিশ্বনাথ চন্দ্রকান্তকেও বলে, সে যদি কামাতো, তাকে কুলীনী কেতায় কামানো হতো। চন্দ্রকান্তর মাথায় সে হাত দিতে যায়। চন্দ্রকান্ত বিশ্বনাথের গলা টিপে ধরে। বিশ্বনাথ হাত বলপ্রয়োগে ছাড়িয়ে কামাতে যায়। এমন সময় প্রমথ মিত্র এসে পড়ে বিশ্বনাথকে বারণ করে। সে চন্দ্রশেখরবাবুর পুত্র। বিশ্বনাথ লজ্জায় ছেড়ে দেয়। চন্দ্রকান্ত তখন ইনিয়ে বিনিয়ে বিশ্বনাথের নামে অভিযোগ করে। প্রমথ জোর করে হাসি চেপে রেখে বাইরে বিশ্বনাথকে তিরস্কার করে। ব্রাহ্মণদের বুঝিয়ে প্রমথ বলে,—"আজ্ঞে বিশ্বনাথ একটু আমুদে, তাই আপনাদের নিয়ে আমোদ কচ্ছিলো।" বিশ্বনাথও বলে,—"আজ্ঞে নাপিতেরা তো রাজা রাজড়ার মাথায় হাত দ্যায়, তাতে তো তাঁদের অপমান হয় না! বিচার করে দেখুন, এঁদেরও সেই রকম করেছি, তবে উপরাঙ্গের মধ্যে এই করেছি, চক্রবর্তীমশার অর্দ্ধেক দাড়ী গোঁপ কামিয়ে রেখেছি, আর মুখুয্যেমশায়কে জ্যাপ্টে ধরে কামাচ্ছিলেম, তা এতে আমাকে দোষ দিতে পারেন না।" প্রমথ তাকে মৃদু তিরস্কার করে পাঠিয়ে দেয়। তারপর প্রমথ এঁদের বলে, সে চন্দ্রশেখরদের বলে একে শাসিত করবে।

চন্দ্রকান্তের এক স্ত্রী নীরদবালার দুঃখের শেষ নেই। সে তার কুঁড়ে ঘরের সম্মুখে পৈতে কাটতে কাটতে দুঃখের গান গায়। একদা সে মায়ের আদুরে মেয়ে ছিলো, এখন তার এই হাল। দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে বার বার সুতোর খেই হারিয়ে যায়। বিরাজ এসে তাকে বলে,—"দিদি! এত বেলা হলো তবুও পৈতে তুল্‌চিস্ রাঁদবি বাড়বি কখন ?" নীরদ তখন জবাব দেয়, —"আমার আবার রাঁদা বাড়া !! বোন আগে যোগাড় করে নিই তবে রাঁদবো !" কথাপ্রসঙ্গে সে বলে,—যেদিন সে পৈতে বিক্রী করতে পারে না, সেইদিন তার উপবাসে যায়। সকৃত ভঙ্গের সঙ্গে বিয়ের ফল। বিরাজ নিজে বংশজ মেয়ে। সে বলে, তাদেরও দুর্দশা কম নয়। বিরাজের এখনো বিয়ে হয় নি। "ষেটের কোলে তো চোদ্দ বচ্ছর হলো।" দুঃখ করতে করতে বিরাজ চলে যায়। বিরাজকে তার বাবা মা হাত পা বেঁধে এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, তাতেই তার যারও দুঃখ। ক্ষেমা নাপ্তেনী মন্তব্য করে যে প্রবোধের সঙ্গে বিয়ে দিলেই ভালো হতো। প্রবোধ ঘোষাল চাতরারই একজন ব্রাহ্মণের পুত্র। ক্ষেমা বলে,—"মিন্সের কি আক্কেল ? বড় মেয়ে প্রমোদাকে তো হাজার টাকা নিয়ে এক পাকাচুলো বাঙ্গাল বামনের সঙ্গে বে দিয়ে দ্বীপান্তর করেছে। মেজোটাকে এগারোশো টাকা পণ নিয়ে এক সতীনের হাতে সমর্পণ করে দেছে। আবার সোণার পিত্তিমে বিরাজকে কিনা মিন্সে বারো শো টাকা পণ ঠিক করে ও পাড়ার মৃগীরোগা থুথ্‌রে বুড়ো শঙ্কর ঘোষালের সঙ্গে দিচ্চে ; এতে বিরাজ কাঁদবে না ?"

এমন সময় নীরদবালার স্বামী চন্দ্রকান্ত আসেন আকস্মিকভাবে। পৈতের লাঠি আর সুতো রেখে নীরদ অভ্যর্থনা করে। ক্ষেমা চন্দ্রকান্তকে তার বামুন-দিদির হয়ে কিছু বলে। "বামুনদিদির কষ্টের কথা কি বোলবো, পৈতে তুলে উপোস করে কাল কাটাচ্চে, তবুও কুঁড়ের বার হয় না, অমন সত সাধ্বী মেয়ে কি আছে ? কিন্তু ভাই! তুমি বড় নিষ্ঠুর! এমন জগদ্ধাত্রী পিরতিমের দিকে ফিরেও চাও না।" চন্দ্রকান্ত জবাব দেন,—টাকা পেলেই তিনি আসেন। ক্ষেমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"সে কি দাদাঠাকুর, ইস্ত্রী আবার স্বোয়ামীকে টাকা দেয় না কি ? একথা তো কখন শুনিনে ? স্বোয়ামীই ইস্ত্রীকে টাকা দেয় জানি।" চন্দ্রকান্ত বলেন,—"আরে ক্ষেমা। কুলীন জাতে তা নয়, স্ত্রীই স্বামীকে টাকা দেয়।" ক্ষেমা নীরদবালার আর্থিক দুর্দশার কথা বলে যায়। এই সময় নীরদবালা একঘটি জল এনে স্বামীকে পা ধুতে বলে।

চন্দ্রকান্ত বলেন,—"পা ধোব শেষে, আগে কি টাকা রেখেছ এনে দাও। নীরদবালা পৈতে বেচা দুটাকার কথা বলে। চন্দ্রকান্ত বলেন, তিনি দশ টাকার কমে পা ধোবেন না। নীরদবালা কেঁদে বলে,—"আমি দশটাকা কোথায় পাবো? পেটে না খেয়ে পৈতে বিক্রী করে দুটি টাকা পুঁজি করে রেখেছি; এমন কি মালায় জল খাচ্চি, তবু এ ভাঙ্গা ঘটীটা বদ্‌লে টাকা খরচ করে একটি নতুন ঘটী কিনিনি।" চন্দ্রকান্ত তখন চটে গিয়ে বলেন,—"রেখে দে তোর নাকে কাঁদা—টাকা দিবি কিনা বল? না হয় আমি এই চল্লেম, তোর বাপের কত পুণ্যি ছিল, তাই আমা হেন কুলীন জামাই পেয়েছে। আমি অন্য অন্য শ্বশুরবাড়ী গেলে পঞ্চাশ টাকার কম পা ধুই নে। তোর কাছে তবু দশটাকা চেয়েছি। এসে আবার নাকে কান্না!" নীরদবালা বারবার তার দুরবস্থা বুঝিয়ে বল্‌তে চেষ্টা করে। কিন্তু চন্দ্রকান্ত তখন রেগে গিয়ে বলে,—"কোথায় পাবি তা কে জানে, বেশ্যাবৃত্তি করে এনে দে।" নীরদবালা কাঁদে। চন্দ্রকান্ত চলে যেতে চাইলে সে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে। তখন চন্দ্রকান্ত তাকে পদাঘাত করে চলে যান। নীরদবালা মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

এদিকে ১৫ই আষাঢ় বিরাজের বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। প্রবোধ বিরাজকে মনে মনে ভালবাসে। বিশ্বনাথের কাছে সে জান্‌তে পারে, তার বিয়ের জিনিষ পত্র কেনাকাটা সুরু হয়ে গেছে। বিরাজ নাকি কাঁদছে। প্রবোধ এসব শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আরও খবর পাওয়া যায়, নীরদবালা নাকি বেরিয়ে গেছে। স্বামী তাকে নাকি লাথি মেরে চলে গিয়েছিলো। প্রবোধ চলে গেলে বিশ্বনাথ ভাবে, সে একটা ফন্দি এঁটেছে। কাজটা শেষ হলে হয়। মুখুয্যেমশায় তার ওপর খুবই চটেছিলো, অথচ কয়েকদিন আগে তাঁকে দু টাকা দিয়ে একটু স্তবস্তুতি করতেই তিনি গলে জল। "সেদিন শ্রীরামপুরের চমৎকারের ঘরে মুখুয্যেমশায়কে মদটদ্ খাইয়ে দিয়ে খুব খুশি করে দেওয়া গেছে,...কথায় বলে নাপিতের সাত চোঙার বুদ্ধি—কথাটা মিথ্যে নয়!" এমন সময় চন্দ্রকান্ত এসে বিশ্বনাথের কাছে সেদিনের মদ মেয়েমানুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিশ্বনাথ বলে,—"ছুঁড়ীটাও আপনার ওপর পড়তা।" চন্দ্রকান্ত আরও গলে পড়েন। চন্দ্রকান্ত বিশ্বনাথকে বলেন, তাঁকে আবার সেখানে নিয়ে যেতে পারলে তিনি একশো টাকা পর্যন্ত বিশ্বনাথকে ঘুষ দিতে রাজী আছেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, "বিশ্বনাথ! পূর্ব্বে তোকে বড্ড বদমাইস্ বলে আমার মনে বিশ্বাস ছিল, এখন দেখি তোর বেশ মন খোলাসা।"

শ্রীরামপুরের চমৎকার বেশ্যা আসলে ছদ্মবেশী নীরদবালা—যে চন্দ্রকান্তেরই স্ত্রী। শশিশেখর, চন্দ্রশেখর ও বিশ্বনাথ একটা বিরাট ফন্দি এঁটে চন্দ্রকান্তকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় নীরদাকে বেশ্যা সাজিয়েছে। চন্দ্রকান্ত আসবার আগে চন্দ্রশেখররা আসে। শশিশেখরকে নীরদবালা জ্যাঠামশায় বলে ডাকে, শশিশেখর চন্দ্রশেখর দুজনেই তাকে স্নেহ করেন। 'চমৎকার' (নীরদবালা) তাঁদের বলে, বিশ্বনাথ যখন বলেছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। চন্দ্রশেখররা পাশের ঘরে বসে। তারপর যথারীতি চন্দ্রকান্ত ও বিশ্বনাথ আসে। চমৎকারকে দেখে উচ্ছ্বসিত চন্দ্রকান্ত তাকে "বিবিসাহেবা" বলে সম্বোধন করে প্রেমপ্রলাপ বকে চলেন। চমৎকারও যথাসম্ভব অভ্যর্থনা করে। চন্দ্রকান্ত গান গা'ন,—"বাসনা লো বিধুমুখী হব তব পোষা পাখী।" কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে বিশ্বনাথ এসে বলে,—"মুখুয্যেমশায়। একেবারে যে রসের আড়ত খুলে বসলেন!" চমৎকার কিছুক্ষণের জন্যে পাশের ঘরে যায়। এমন সময় বিরাজ আসে। শশিশেখর চন্দ্রশেখরও আসেন। চন্দ্রশেখর মন্তব্য করেন,—"বাঃ! মুখুয্যেমশায়! খুব যে রসিক হয়েছে, এই মুক্তিমণ্ডপ অবধিও যে আগমন হয় দেখ্‌চি; এই জন্যেই স্ত্রীর কাছে তোমার টাকার দরকার? এই জন্যে তোমরা লাথি মারো।" চন্দ্রকান্ত ঘাব্‌ড়ে গিয়ে আমতা আমতা করেন। এমন সময় চমৎকার একথাল ভরতি টাকা আনে। প্রণাম করে চন্দ্রকান্তকে বলে, এবার নিশ্চয় তাকে চন্দ্রকান্ত গ্রহণ করবেন। এই বলে চমৎকার তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে এবং নীরদবালা হয়ে দেখা দেয়। চন্দ্রকান্ত একে বেশ্যাবৃত্তি করে টাকা উপার্জন করে এনে দিতে বলেছিলেন, স্বামীর আদেশ সে রক্ষা করেছে! "জেঠামশায়। ইনি তখন দশটাকার জন্যে আমাকে লাথি মেরে পরিত্যাগ করে গেছলেন, এখন আমি অনেক বিষয় করেছি, তা সমস্তই লিখে দিচ্ছি, এখন আপনারা বিচার করে বলুন! ইনি এখনও আমাকে গ্রহণ কর্বেন কিনা!" লজ্জায় চন্দ্রকান্ত মুখ ঢাকেন। চন্দ্রশেখর তখন চন্দ্রকান্তকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, চন্দ্রকান্তের দোষেই যখন বেশ্যাবৃত্তি করেছে, তখন তাকে গ্রহণ করতেই হবে। শশিশেখরও বলেন, তিনি অল্পেতে ছাড়বেন না। বিশ্বনাথ তখন তার ফন্দি ফাঁস করে বলে যে, সে দিদিঠাকরুনের কান্না সহ্য করতে না পেরে চন্দ্রকান্তকে শিক্ষা দেবার জন্যে এইসব করেছিলো। চন্দ্রকান্ত তখন সজল নয়নে বলে—"বিশ্বনাথ। আমাকে রীতিমতো শিক্ষা দেছ, কুলীনের মুখে বিলক্ষণ কালীচূন দেছ। চন্দ্রশেখর শশিশেখরবাবু! আজ

অবধি আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি আর জীবন থাকতে নীরদকে পরিত্যাগ করবো না, এতে আমাকে একঘরে হতে হয় তাও স্বীকার।" বিশ্বনাথ তখন নাচতে নাচতে বলে—"বাবা! এই রহস্যের গঙ্গাযাত্রা করা হলো, এখনও অন্তর্জ্জলী বাকি আছে।"

এদিকে বুড়ো শঙ্কর ঘোষালের সঙ্গে বিরাজের বিয়ে হবে। বিরাজ কাঁদছে। এসব দেখে বিশ্বনাথ ভাবে, "আমার ইচ্ছে করে পাঁঠীবেচা বামুনগুলোকে ধরে ধরে জবাই করি। বিশ্বনাথ টোপর নিয়ে বিয়েবাড়ী যায়। পথে ভোলানাথ কামারের সঙ্গে দেখা। কামারও চক্কোত্তিমশায়ের বাজুর ফরমাস অনুযায়ী বাজু দিতে যাচ্ছে। বিশ্বনাথ স্থির করে বিয়ের ভরপুর মজলিসে চন্দ্রকান্তের বেশ্যা গ্রহণের কথা ভাঙা হবে।

শঙ্কর ঘোষাল টোপর পরে যেই না ছাদনা তলায় বসেচে, বিশ্বনাথ তখন মন্তব্য করে.—"বুষকাঠের মাথায় টোপর দিয়ে ঘাটে পুঁতে রাখলে যেমন দেখায়, ঠিক্ সেই রকম না?" হরচন্দ্র রেগে যান। তাঁরই জামাই শঙ্কর ঘোষাল। শঙ্কর আপত্তি করতে গিয়ে রুদ্ধ ক্রোধে কাশতে আরম্ভ করে। শেষে কাশতে কাশতে শ্বাস ওঠবার যোগাড় হয়। বিশ্বনাথ মন্তব্য করে.—"এই বিপদ ঘটালেন দেখচি. হরকুমার, বসন্তকুমার বাবু!—খাটের যোগাড় করা আছে তো?" বিয়ের দ্রব্যসামগ্রীর বদলে শ্রাদ্ধের দ্রব্যসামগ্রীরই ব্যবস্থা করতে বলে। এই সময় চন্দ্রশেখর নীরদের সব ঘটনা খুলে বলে সবার সামনে। বিশ্বনাথকে দিয়ে চন্দ্রশেখর নীরদের এইরকম বেশ্যার অভিনয় দেখাবার ব্যবস্থা করিয়েছে। আসলে নীরদবালা বেশ্যাবৃত্তি করে নি। সে সম্পূর্ণ সতী। চন্দ্রকান্ত আহ্লাদে গদ্গদ্ হয়ে বিশ্বনাথের গলা জড়িয়ে ধরে। "ভাই বিশ্বনাথ! আয় তোকে কোল দিই, তোকে কে বলে নাপিত, তুই ব্রাহ্মণের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তুই আমার কুলকে চিরকালের মত পবিত্র করেছিস্।" চন্দ্রকান্তের মনের যন্ত্রণাও দূর হয়েছে। চন্দ্রশেখর সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন,—"সকলে আরও শুনুন,.—আমার নীরদবালার যাতে চিরকালের জন্য ভরণপোষণ হয়, সেইজন্য দশ হাজার টাকার আয়ের একখানি তালুক মার নামে দিয়েছি।" শঙ্কর ঘোষাল এসব শুনে এতো অবাক্ হয়ে যায় যে, সে বসে পড়ে। সবাই তখন, 'মরছে' 'মরছে' বলে হরিবোল দিয়ে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যায়। বিশ্বনাথ বলে, শঙ্কর ঘোষালের ক্ষয়কাশ এবং মৃগীরোগ দুইই আছে। হরচন্দ্র রেগে যান,—"বেরো গুণ্ডা বিশে। আমার বাড়ী থেকে বেরো!"—

"জামাইবাবুর কি হয়েছে?"—"নোকের ভিড়ে সর্দ্দিগর্ম্মী হয়েছে, এখনি সামলাবেন।" বিশ্বনাথ মন্তব্য করে,—"একবারেই সামলাবেন, চিতের সঙ্গে সামলাবেন। সম্প্রদান হয় নি এই আপনার পরম ভাগ্যি।"

নেপথ্যে কান্না আসে। ঘোষালের মেয়ে কাঁদছে বলে মনে হয়। হরচন্দ্র ভাবেন, ঘোষালের নিশ্চয়ই কাল হয়েছে। হরচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে হাতে পায়ে ধরেন, এখনই তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিন. নইলে তাঁর জাত যায়। চন্দ্রশেখর তখন প্রবোধের কথা তোলে। সে বরযাত্রী এসেছে। ওদিকে নেপথ্যে অন্তর্জলীর মন্ত্র শোনা যায়,—"গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রামঃ। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রামঃ। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রামঃ।" বিশ্বনাথ বলে, ওদিকে অন্তর্জলী আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর সে প্রবোধের হাত ধরে উঠিয়ে বলে,— "প্রবোধবাবু! আর দেখেন কি--উঠুন—পাথরে পাঁচ কিল।" আর একদিকে শোনা যায় বিয়ের মন্ত্র, অন্যদিকে শোনা যায় অন্তর্জলীর মন্ত্র।—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রামঃ।

বরপণ ও কন্যাপণকে প্রসঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে রচিত প্রহসনের সংখ্যা অগণিত হলেও পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে রচিত প্রহসনের সংখ্যাও কম বলা চলে না। বিষয়বস্তুর পরিচয় জানা যায়, এরকম আর একটি প্রহসনের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।—

পাশ করা জামাই (১৮৮০ খৃঃ)—রাধাবিনোদ হালদার॥ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ এতে অবশ্য অপ্রধান নয়। কাহিনীটি এই।—কেদার বি. এ. পাশ দিয়েছে। এখন সে সাহেবী চালে চলে। অনেক কষ্টে ধার করে তার বাবা তার পড়ার খরচ যুগিয়েছেন। তাঁর আশা ছিলো, কেদার পাশ দিলে বিয়ের বাজারে তার দাম বাড়বে, এবং মেয়ের বাপের কাছ থেকে তিনি মোটা টাকা আদায় করতে পারবেন। ননীগোপাল নামে ভদ্রলোক অবশেষে পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী হন এবং তাঁর মেয়ের সঙ্গেই কেদারের বিয়ের ব্যবস্থা হয়। অবশেষে একদিন বিয়ে হয়। প্রথা অনুযায়ী বিয়ের রাত্রে বরকে বাসরঘরে কনের প্রতিবেশিনী মেয়েদের মধ্যে কাটাতে হয়। সেখানে গান বাজনা ঠাট্টা তামাসা চলে। পাশ করা জামাই উগ্র মেজাজের। সে এই সব 'অর্থহীন' 'কুরুচিপূর্ণ' তামাসা পছন্দ করে না। শেষে এক সামান্য কারণে সে বাসরঘরের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে পালায়। অর্থলোভী বরের বাপ বেয়াইদের সামনে অপদস্থ হন।

এ ছাড়া আরও কতকগুলো প্রহসনের নাম জানা যায়, সেগুলোর বিষয়-বস্তুর পরিচয় জানা সম্ভব না হলেও আনুমানিকভাবে এখানে উপস্থাপন করা করা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—**"পরের ধনে বরের বাপ"** (১৮৬৩ খৃঃ)—ব্রজমাধব শীল ; **"কন্যা বিক্রয়"** (১৮৬৩ খৃঃ)—নফরচন্দ্র পাল (কন্যাপণ বিষয়ক), **"বঙ্গমাতা"**—(কলিকাতা—১৮৭৫)—? (কন্যাপণ বিষয়ক); ইত্যাদি। **"কুলীন কায়স্থ নাটক"** (১৮ ১ খৃঃ)—অম্বিকাচরণ বসু, এবং **"কুলীন বিরহ"** (১৮৮৩ খৃঃ)—প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য,—এ দুটির উপস্থাপন সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নয়।

৪। বৃত্তি ও আয়নীতি।

আমাদের সমাজে আর্থিকক্ষেত্রে বিভিন্ন বৃত্তির চৌর্যমূলক, প্রতারণামূলক বলাৎকারমূলক ইত্যাদি নানাপ্রকার আয়নীতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন প্রহসনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অনেক সময় প্রতিগ্রহমূলক কিংবা স্বার্থদলিত চুক্তিমূলক আয়নীতির বিরুদ্ধেও অনেক দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব অনুভব করে থাকি। সমাজ নিন্দিত এইসব আয়নীতির অবকাশ এবং দৃষ্টান্ত অনৈতিহাসিক নয়, তবে প্রহসনকারের উদ্দেশ্যমূলকতা বিশ্লেষণ করলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার স্পৃহা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদের অর্থনীতিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) গ্রামীণ অর্থনীতি এবং (খ) নাগরিক অর্থনীতি। গ্রামীণ অর্থনীতির আওতায় পড়ে জাত ব্যবসা ও ধর্মীয় বৃত্তি এবং সামন্ততন্ত্র। নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির মধ্যে পড়ে নব্য আমলাতন্ত্র ইত্যাদি। বিরোধ মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক এবং নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির মধ্যে। তার একদিকে ব্রাহ্মণ, ঘটক, জমিদার ইত্যাদির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণের সূচনা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কেরানী, ডাক্তার উকিল ইত্যাদির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া যৌন সমস্যার বিরুদ্ধে কতকগুলো দৃষ্টিকোণ স্বাভাবিকভাবে কয়েকটি বৃত্তির আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেও গৌণভাবে উপস্থাপিত হয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে নিজস্ব মর্যাদা লাভ করেছে। তবু এগুলোর আয়নীতিঘটিত চিত্রের মূল্য প্রদর্শনীতে নগণ্য তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রাহ্মণগোষ্ঠী ও আয়নীতি॥ বাংলা প্রহসনে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ প্রধান একটি স্থান অধিকার করে আছে। ধর্মীয় অর্থনীতির সাংস্কৃতিক ভাঙ্গন

অনাধুনিক। সংস্কৃত প্রহসনের বিষয়বস্তুতে ভণ্ড ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করতে আলঙ্কারিকরা নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই আলঙ্কারিক সংস্কারের বশবর্তী হয়ে অনেকেই প্রহসনে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ টেনেছেন। নাগরিক অর্থনীতি-নির্ভর সংস্কৃতি পুরোনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্বার্থসর্বস্ব সমাজপতি ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গ টেনেছেন প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে। কোথাও আলঙ্কারিক সংস্কারে আবার কোথাও বা নাগরিক অর্থনীতির সংস্কারে ব্রাহ্মণরা হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ শিকার। তাই বাংলা প্রহসনে বৃত্তিগত আয়নীতিতে ব্রাহ্মণদের যে প্রসঙ্গ আছে, তার সমাজচিত্র অনেকাংশে এই সব ব্যাপার থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অবশ্য এসব অবকাশের সমাজচিত্রগত মূল্য কম নয়। বলাবাহুল্য প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণও আর্থিকক্ষেত্রে সমাজচিত্রের মানসিক দিকটির ঐতিহাসিকতা অনেকাংশে বহন করে।

আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের আয়ের বিভিন্ন দিক ছিলো। ব্রাহ্মণদের কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে মনু লিখেছেন,—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥[১]

এর থেকে এঁদের জীবিকারও সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যগত সাধারণ এবং আপৎকালীন জীবিকা আয়ের পরিধি বিস্তার করেছে। তবে জীবিকার বিশুদ্ধতার মধ্যেই সামাজিক মর্যাদা অবস্থান করেছে। পরবর্তীকালে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠায় অনেকে বৃত্তিগত বিশুদ্ধতায় ফিরে আসবার চেষ্টাও করেছেন। ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর বৃত্তিগত আয় আপাতদৃষ্টিতে ছিলো প্রতিগ্রহমূলক। কিন্তু এগুলো সমাজের সাংস্কারিক চর্চার পারিশ্রমিক তথা চুক্তিমূলক আয়ের নামান্তর ছিলো। (ক) পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে অনেকে অকারণে ব্রাহ্মণভোজন করাতেন কিংবা দান দক্ষিণা দিতেন। (খ) সমাজের সাংস্কৃতিক চর্চা, অধ্যাপন ইত্যাদির জন্যে সামন্ত বা ধনী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণদের নিয়মিত বৃত্তি দিতেন। (গ) ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের বিনিময়ে এঁদের দক্ষিণা দেওয়া হতো। ধর্মীয় ও সামাজিক (প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি) অনুষ্ঠানে সাধারণভাবে এদের দানধ্যান করা হতো। (ঙ) যজমানের বা শিষ্যের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দক্ষিণা বা বৃত্তি ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর অন্যতম আয়

১। মনুসংহিতা ১/৮৮।

ছিলো। ভূমি, ধেনু, ধাতু, শস্য ইত্যাদি সব রকম দানই ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেছেন।

আগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এইসব বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কারিক চাপ তথা বলাৎকারমূলক আয়নীতি যে ছিলো না তা নয়। অন্যান্য সমাজ-নিন্দিত আয়-নীতির অস্তিত্বও ছিলো। দানপ্রতিগ্রহ, ভোজন, বৃত্তিগ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে একটা সাংস্কারিক সংগঠনের চেষ্টা দেখা যায়। এই চেষ্টা থেকে, অন্ততঃ সাংস্কারিক চাপসৃষ্টির যে অবকাশ ছিলো, এটা উপলব্ধি করা যায়। যেমন ভোজনের ব্যাপারে পরাশর সংহিতায় আছে,—

একপংক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহ ভোজ।
যদ্যেকোহপি ত্যজেৎ পাত্রং শেষমন্নং ন ভোজয়েৎ ॥[২]

বিভিন্ন স্মৃতির বিধান সাংস্কারিক চাপের অনুকূল ছিলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ এবং চিন্তাভাবনার বিশিষ্টতা পুরোনো সংস্কৃতিকে ক্রমে ক্রমে স্থানচ্যুত করেছে। এক্ষেত্রে একান্ত সংস্কারনির্ভর সাংস্কারিক বা ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর আর্থনীতিক অবস্থা এবং তদনুযায়ী আয়নীতির অবস্থার পরিবর্তনও স্বাভাবিক। অবশ্য ব্যক্তিগত প্রবণতা থেকেও যে আয়নীতি পরিচালিত হয়েছে, তাও স্বীকার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর আয়ের ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছিলো। শাসক জাতির ভাষা বা বিদ্যা শিক্ষা অর্থকরী ছিলো বলে সংস্কৃত পঠনপাঠনের গুরুত্বও হ্রাস পেয়ে এসেছিলো। এই সময় থেকেই সঙ্কীর্ণ পরিধির রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে সাংস্কারিক চাপ সৃষ্টি করে দৌর্নীতিক আয়ের চেষ্টা বেশি চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নগরকে কেন্দ্র করে যখন নব্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং ক্রমেই পরিধি বিস্তার করেছে, তখন পল্লী অঞ্চলে সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে সামাজিক শাস্তির ভয় দেখিয়ে বলাৎকারমূলক আয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন সংস্কৃতিনির্ভর সমাজ অনিবার্য ক্ষয়রোধের ব্যর্থ চেষ্টায় এবং আয়-নীতির হ্রাসে অশাস্ত্রীয় বিধানেরও ব্যবস্থা করেছে।

গত শতাব্দীর প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ কখনো প্রাথমিক অনুশাসন লঙ্ঘনে, আবার কখনো বা দ্বৈতীয়িক অনুশাসন লঙ্ঘনে প্রযুক্ত হয়েছে। এই দ্বৈতীয়িক অনুশাসন কখনো প্রাচীন এবং কখনো নব্য সংস্কৃতি-নির্ভর। চৌর্যমূলক,

২। পরাশর সংহিতা—১১/৮।

প্রতারণামূলক এবং বলাৎকারমূলক আয়নীতির সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিগ্রহমূলক আয় —যা আর্থিক এবং আত্মিক দুইক্ষেত্রেই সঙ্কীর্ণতা আনে,—সব কিছুর বিরুদ্ধেই দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণদের আর্থিক দুর্গতির চিত্র অনেক প্রহসনের উক্তির মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের আর্থিক দুর্দশা চিত্রণের অন্যতম কারণ ছিলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা। আর্থিকক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ যেখানে দুর্দশাগ্রস্ত, সেখানে তাঁদের পরিচালিত সংস্কৃতিও মূল্যহীন—কারণ এঁরা সহজেই বাইরের আর্থিক চাপে সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতেও পশ্চাৎপদ হবেন না,—এমন সম্ভাবনাই বেশি। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক বৃত্তি অবলম্বী বর্ণ-ব্রাহ্মণদের দুর্দশা ঐতিহাসিক। এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে নতুন আর্থনীতিক সমাজে বৃত্তি গ্রহণের জন্যে আহ্বানও জানানো হয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো ছিলো ব্রাহ্মণদের জীবিকার একমাত্র উপায, এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের আগমনের সঙ্গে অনেকে একটি জিনিসের উপমা দিয়েছেন—যা রুচিসম্মত না হলেও উপমা ক্ষেত্রে সার্থক। অজ্ঞাত ব্যক্তির অজ্ঞাত খৃষ্টাব্দে (উনবিংশ শতাব্দীর) লেখা "পোঁটাচুন্নির বেটা চন্নন বিলেস"[৩] প্রহসনে ব্রাহ্মণ ভোজন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—"হ ভাগাড়ে মড়া পড়েছে, শুকুনির টনক নড়েছে।" অহিভূষণ ভট্টাচার্যের "বোধনে বিসর্জন" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) বিশেষ সময়ে গুরুপুত্রের আগমনে মন্তব্য করা হয়েছে,—"লোকে কয় যে, বাগাড়ে মরুই পড়লে হুকুনীর মাতায় টনক পড়ে, এডা ঠিক কতা।" অনেকে চাকরী গ্রহণ করেও সেই সঙ্গে যজমানী পুরুতগিরিতে উপরি আয় করতেন, আজকাল তাও নেই। সেখানে সাংস্কারিক বৃত্তি সর্বস্ব ব্যক্তির আর্থিক দুরবস্থা আরও মর্মান্তিক হওয়াই স্বাভাবিক। কেদারনাথ মণ্ডলের "বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাসা" প্রহসনে (১৮৯৪ খৃঃ) পণ্ডিতের উক্তি,—"পূর্বে লোকের গুরু ব্রাহ্মণে ভক্তি ছিল, পাঁচ জায়গায় কিছু কিছু পাওয়া যেত, এখন কাল পড়েছে বিপরীত, একটি পয়সার প্রত্যাশা নাই, কাজেই চাকরি মাত্র ভরসা।" এঁদের অনেকেই বাধ্য হয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁদের আর্থিক দীনতার কথা স্বীকার করে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) প্রথমে স্বগতভাবে পরে প্রকাশ্যভাবে ভট্টাচার্যের উক্তি আছে।—"আর মিচিমিচিই বা কত বক্‌বো, এইবার নমস্কার করিয়ে ছেড়ে দিই,

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত।

আর পারি না, ··এইবার আমায় যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য কর তাহলেই কিছু জলটল খাইগে।···চিরজীবী হয়ে বেচে থাক বাবা আর তোমায় কি আশীর্বাদ করবো, আমরা যতদিন বাঁচবো আমাদের প্রতিপালন করো।" ব্রাহ্মণকে দিয়ে অনেক প্রহসনকার মুদ্রার প্রশস্তিও গাইয়েছেন। জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের "সুধা না গরল" প্রহসনে (১৮৭০ খৃঃ) ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ বামাচরণবাবুর প্রায়শ্চিত্তে বিদায় ব্যবস্থার কথা স্মরণ করে বলেছেন,— টাকাতে কি না হয়? মুদ্রা আহা হা শ্লোকটা বিস্মৃত হলেম যে—'মুদ্রা মোক্ষগুণং সুধাঢ্য কলসং'—আহা হা ভুলে গেলেম্।—অর্থাৎ মুদ্রার গুণ হচ্ছে মোক্ষ আর সুধাঢ্য কলসং অর্থাৎ মুদ্রার দ্বারা সুধার কলস পাওয়া যায়।"

অনেকে সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের এই সমস্ত প্রতিগ্রহমূলক আয় নীতিকে অস্বাভাবিক দেখে সেটাকে অনুচিত অর্থলোভ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মত, এই জন্যেই দেশে এতো অনিষ্টজনক অনুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাব। সাংস্কারিক বৃত্তি অবলম্বী নিজে নির্লোভ হয়ে সমাজে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, অনেকে এটা চেয়েছেন। কিন্তু প্রাথমিক চাহিদা যেখানে মেটে না সেখানে নির্লোভ থাকবার প্রশ্ন হাস্যকর। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "মর্কটবাবু" প্রহসনে (১৮৯৯ খৃঃ) আছে,—"অর্থলোভে চির পবিত্র দ্বিজকুলের অধোগতিই দেশের সকল অনিষ্টের মূল্।" প্রহসনকার অবশ্য, এঁদের অর্থলোভের মূলে যে আর্থনীতিক চাপ আছে, তার কথা চিন্তা করেন নি। ১২৬৪ সালে সিমুলিয়ার কালীপ্রসাদ দত্ত উদ্যোগী হয়ে নিজের গৃহে একটি সভা করেন। তাতে প্রস্তাব করা হয় যে সকলের স্ব-স্ব বৃত্তিতে কাজ করা উচিত। এ সম্পর্কে 'সংবাদ ভাস্কর"[৪] মন্তব্য করেন,—"কোন দেশেই একপ্রকার নিয়ম চিরকাল স্থায়ী হয় না, কালের পরিবর্ত্তনীয় নিয়মক্রমে সকল দেশেই প্রচলিত নিয়মাদির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এই সময়ের লোকেরা আপনাদিগের বিবেচনায় যে নিয়মকে উত্তম বোধ করেন, অন্য সময়ের লোকেরা সেই নিয়মকে অন্যায় বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমাদিগের এই রাজ্য মধ্যে জাতিভেদের গ্রন্থি অতি কঠিনরূপে বদ্ধ হওয়াতে এবং ধর্ম্মের সহিত দেশীয় নিয়মের সম্যক সংযোগ থাকিবার এ পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত রহিয়াছে।··· এইক্ষণে অনেক ব্রাহ্মণে চাকুরী ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া মাসে চারি পাঁচ শত টাকা

৪। সংবাদ ভাস্কর—৪৭। জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৪।

উপার্জ্জন করিতেছেন, তিনি কি বাবু কালীপ্রসাদ দত্তের স্থাপিত সভার আদেশানুসারে সেই উপার্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসায়াবলম্বনে আতপ তণ্ডুল ও রম্ভাফলাহরণে সন্তুষ্ট হইবেন? অতএব প্রাগুক্ত সভার নিয়মাদিতে একপ্রকার উন্মত্ত প্রলাপ প্রকাশ পাইয়াছে।" এই মন্তব্যে অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই প্রগতিশীলতা অনেক প্রহসনকারের মনে স্থান পায় নি, অথচ পুরোনো সংস্কৃতির বিচারে ব্রাহ্মণদের এই অর্থপরায়ণতা সমাজের কাছে দৃষ্টিকটু লেগেছে।

অবশ্য সবক্ষেত্রে সাংস্কারিক গোষ্ঠীর এই অর্থপরায়ণতাকে ক্ষমা করা যায় না। ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি যখন অত্যন্ত রক্ষণশীলতায় সমাজসর্বস্ব হয়ে উঠেছিলো তখন সেই সঙ্কীর্ণ-ক্ষেত্রের সমাজসভ্যের ওপর বলাৎকারমূলক আয়নীতির প্রযোগ সত্যিই অমানবোচিত। সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে এর নিদর্শন পাওয়া যাবে।

একদিকে পুরোনো মর্যাদা অন্যদিকে অর্থতৃষ্ণা—দুইয়ের চাপে সাংস্কারিক সম্প্রদায় অর্থের বিনিময়ে অনেক অশাস্ত্রীয় বিধান দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি। আমাদের যে কোনো ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে স্মার্ত বিধান অপরিহার্য। স্মৃতির বিধানকে অতিক্রম করে পুরাণ ইত্যাদির দৃষ্টান্তও বিধান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কাব্যের দৃষ্টান্তও যে গ্রহণ করা হয় নি তা নয়। সংস্কৃত বচন মাত্রেই বিধান তা প্রাচীনই হোক বা অর্বাচীনই হোক এবং যে কোনো বিষয়ের গ্রন্থের উক্তিই হোক। ফলে আমাদের বিধানের ক্ষেত্রও অনেক বিস্তৃত হয়েছে যেমন, তেমনি মনোমত যে কোনো একটি বিধান আবিষ্কার করা কঠিন হয়ে ওঠে নি। পরবর্তীকালে সংস্কৃত চর্চা সাধারণের মধ্যে হ্রাস পাওয়ায় অথচ রক্ষণশীলতা দূরীভূত না হওয়ায় পণ্ডিতেরা অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে সংস্কৃত বচনের ভুল অর্থ করে তাই-ই বিধান বলে চালাতে ইতস্ততঃ বোধ করেন নি। অথচ বিধানের অপরিহার্যতায় এই সব ব্রাহ্মণদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় ছিলো না। পূর্বে উল্লিখিত "মরকটবাবু" প্রহসনে ভূতনাথ পণ্ডিতকে বলে,—"ডাক্তারের সার্টিফিকেট নৈলে যেমন লিভ গ্রাণ্ট হয় না, তেম্নি আপনার চিঠি নৈলে শ্রাদ্ধাদিও সম্পন্ন হয় না।" পণ্ডিত তখন জবাব দেন,—"বাপুহে! অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।" যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "চপলা চিত্ত চাপল্য" প্রহসনে (১৮৫৭ খৃঃ), বিধবা চপলার একাদশীতে অশাস্ত্রীয় আচরণ সম্পর্কে বিনোদা বলে, "তর্কালঙ্কার নাকি বলেছে। মা এ তুমি খাও, মা পাপ

হবে তা আমার হবে!" মোক্ষদা তখন বলে যে তর্কালঙ্কার রায়েদের কাছ থেকে এর জন্যে অনেক টাকা পাবেন। "তিনি সেই টাকা নিয়ে দানধ্যান করে আপনার পাপ ক্ষেয় কর্ব্বেন।" বস্তুতঃ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এটা অপবাদই হোক বা সত্যিই হোক,—এ ধরনের ধারণাসৃষ্টির মূলে যে সামাজিক দৃষ্টান্ত ছিলো, এটা মনে করা সঙ্গত। প্রসন্নকুমার পালের লেখা "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটকে" (১৮৬০ খৃ.) দীনদয়াল গোস্বামী জাতভান্ধার, জাতবিচার ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে বলেছেন,—"ওহে বাপু কিছু বোজ না, সুদ্ধ হাঁড়িতে কি পাতবাঁদা চলে, বলে কড়ি বিনে বন্ধু কৈ, কড়ি হোলেই সব চলে যায়।" এই সব দৃষ্টান্ত সাধারণের মনে যে ধারণা গড়ে তুলেছিলো, তারই বশবর্তী হয়ে ঈশানচন্দ্র মুস্তফীর "জলযোগ" প্রহসনে (১৮৮২ খৃঃ) 'মহারাজ' বলেছেন,—"রেখে দিন সমাজ। অর্থেষু সর্ব্বে বশাঃ পয়সাতেই সব।"

প্রহসনে বৃত্তিগত আয়নীতির বর্ণনায় ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এর মূলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা প্রয়াস যতোই থাকুক, নতুন অর্থনীতি স্বার্থদলিত হীনবৃত্তি গ্রহণ—কিংবা রক্ষণশীল সমাজে সাংস্কারিক চাপ সৃষ্টি করে বলাৎকারমূলক আয়নীতি গ্রহণ—অথবা মর্যাদা ও অর্থনীতির দ্বন্দ্বে ছলনা-প্রতারণা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে আর্থিক দিক থেকে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের জন্ম দিয়েছে।

বেশ্যাবৃত্তি ও আয়নীতি। পারিবারিক শ্রমবিভাগে গৃহস্থালীর দায়িত্ব গ্রহণ করে স্ত্রীলোক তার ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে। যেখানে স্ত্রীলোক পরিবারান্তর্গত থাকে, সেখানে তার আর্থিক নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকে পরিবার-কর্তার। অনেক সময় স্বক্ষেত্র পরক্ষেত্রগত সমস্যা (যথা বিধবার ক্ষেত্র ইত্যাদি) দেখা দেয়। তখন সেসব ক্ষেত্রে—যতোক্ষণ স্ত্রীলোক সেই পরিবারের অন্তর্গত থেকে পারিবারিক বিধি নিয়ম স্বীকার করে, ততোক্ষণ পরিবার-কর্তাকেই দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ সমাজ দিয়ে এসেছে। পরিবার বহির্ভূত অর্থাৎ 'স্বাধীনা' স্ত্রীলোকের অর্থোপার্জনের দিক থেকে যথেষ্ট সমস্যা থাকে। উপার্জনের উপযুক্ত গুণের বা ক্ষমতার অভাব, কিংবা চূড়ান্ত অর্থলোভ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোককে বেশ্যাবৃত্তির ক্ষেত্রে নিয়ে যায়। বেশ্যা কাদের বলে তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Action সাহেব বলেছেন,—"Every unchaste woman is not a prostitute. By unchastity a woman becomes liable to lose

character, position, and the means of living, and, when these are lost, is too often reduced to prostitution for support, which, therefore, may be described as the trade adopted by all woman who have abandoned or are precluded from an honest course of life, or who lack the power or the inclination to obtain a livelihood from other sources."[৫]

বেশ্যাবৃত্তির মূলে কিছুটা ব্যক্তিগত এবং কিছুটা পরিবেশগত কারণ থাকে। একটি প্রবন্ধে নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছিলো।[৬] (1) Poverty (2) Illtreatment by the husband or relatives (3) Temptation (4) Necessity 5) Example (6) Want a suitable occupation (7) Last not least vicious religion, আমাদের সমাজে বৈবাহিক প্রথাঘটিত সামাজিক দোষ এবং অন্যান্য যৌন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের একান্ত পরনির্ভরতা, উপার্জনের উপযোগী শিক্ষার অভাব, সামাজিক কঠোরতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ অনেক স্ত্রীলোককে অনিচ্ছাকৃতভাবে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করেছে। যৌন-জীবিকা তদানীন্তনকালের বেশ্যা সমাজের একমাত্র আয়ের পথ থাকা সত্ত্বেও, সমাজের বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সমর্থনপুষ্ট থাকায় বেশ্যাদের বলাৎকারমূলক আয়ের বিরুদ্ধেও যথারীতি দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। বেশ্যাদের স্বার্থে বলাৎকারমূলক আয় তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। বেশ্যাদের মূল আয় যৌনকর্মে। এটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়, অতএব এখানে যৌবন রক্ষার প্রশ্ন বড়ো। অথচ যৌবন চিরদিন থাকে না। তাই যৌবনকালের মধ্যেই সারা জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে হয় এবং সঞ্চিত ধনে পরবর্তী জীবনে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হয়। অনেক সময় 'বাড়ীউলী' বা মাসী হিসেবে এরা পালিতা কন্যা-বেশ্যার আয় থেকে বখ্রা নিয়ে থাকে বটে, তবে এই ধরনের চুক্তিতে অনেকক্ষেত্রেই তাদের প্রতারণার সম্মুখীন হতে দেখা গেছে। অনেক সময়েই বৃদ্ধা বেশ্যাকে 'বোষ্টমী' হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে দেখা গেছে। অতএব এককালীন সঞ্চয়ের ওপরেই বেশ্যার নির্ভর। তাই এখানে বলাৎকারমূলক আয়নীতি গ্রহণ স্বাভাবিক।

৫। Cf. Calcutta Journal of Medicine—Nov.-Dec. 1873, Prostitution.

৬। C. J. M.—Nov.-Dec. 1873, Prostitution and the Modern Remedy of some of its evil. P-359.

অন্যদিকে এই বলাৎকারমূলক আয়নীতি সাধারণ সমাজে বেশ্যাসক্তের অমিত-ব্যয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শুধু বেশ্যাসক্তিমূলক নয়, যে কোন ধরনের অমিতব্যয়ই সামাজিক ক্ষতি আনে এবং তাই অমিতব্যয় অপরাধ হিসেবে গণ্য। অপরাধ বিজ্ঞানী ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল লিখ্ছেন,—"অমিতব্যয়িতা একটি সামাজিক অপরাধ উহা অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি করে থাকে। এই অমিতব্যয়িতার কারণে অর্থের অভাব ঘটে থাকে এবং এই ঘাটতি অর্থ পূরণ করার জন্যে মানুষ অসাধু উপায় অবলম্বন করতে প্রায়ই বাধ্য হয়।"[৭] বেশ্যাসক্তিতে অর্থব্যয় একই সঙ্গে সামাজিক মনে দৃষ্টিকোণের সূচনা করেছে।

বেশ্যাসক্তের অর্থব্যয়, বেশ্যার বলাৎকারমূলক আয়নীতি—সব কিছুকেই পোষণ করেছে বস্তুতঃ সংস্কৃত প্রহসনরীতি ও আলঙ্কারিক নির্দেশ। যে কারণে প্রহসনে ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আছে, একই কারণে বেশ্যার প্রসঙ্গ এসে গেছে এবং সেইসঙ্গে যথারীতি বেশ্যা সম্পর্কিত যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাও এসে উপস্থিত হয়েছে।

কামসূত্রের ৬ষ্ঠ বা বৈশিক অধিকরণে বেশ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে,—(ক) এক পরিগ্রহা, (খ) বহু পরিগ্রহা, (গ) অপরিগ্রহা। আর্থিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয় শেষোক্ত দুই শ্রেণীর বেশ্যার। অপরিগ্রহা শ্রেণীভুক্তা বেশ্যার আর্থিক সমস্যা মর্মান্তিক। অথচ এরাই ছিলো নির্দয় সমাজের হাস্যরসের উপযুক্ত ইন্ধন।

"রক্ষিতা"-শ্রেণীর বেশ্যারা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত জীবন যাপনে সক্ষম। দায়িত্বহীন বেশ্যাসক্তদের চাইতে রক্ষিতাসক্তদের বরং সমাজে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। রক্ষিতাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে একটি অবাঞ্ছিত জীবন সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে। রক্ষিতাসক্তদের কথা বলতে গিয়ে অপরাধবিজ্ঞানী ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল লিখ্ছেন,—"... তাঁরা তাঁদের এই সকল কার্য্যের দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকারই করেছেন, অনেক হারানো নারীকে তাঁরা এইভাবে সযত্নে রক্ষা করায় তাঁদের আমি নমস্য বলেই অভিহিত করি।"[৮] বাবুরা যে শুধু জীবিতকালেই রক্ষিতাদের রক্ষা করে গেছেন তা নয়, মৃত্যুর পরও তাদের

৭। অপরাধ বিজ্ঞান (৩য় খণ্ড)—পঞ্চানন ঘোষাল—পৃঃ ২৩৪।

৮। অপরাধ বিজ্ঞান (৩য় খণ্ড)—পঞ্চানন ঘোষাল—পৃঃ ১৮৯।

আর্থিক দিক থেকে সুব্যবস্থা করে গেছেন। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার৯ একটি সংবাদে আছে,—"নিমতলা নিবাসী ...... বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ...... বন্দ্যোপাধ্যায় কায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকালে এরূপ উইল করিয়াছেন যে, তাঁহার যে বিষয় প্রাপ্য হইবেক, তাহার দুই আনা উকিল গেলওর সাহেব, সাত শত টাকা রক্ষিতা বেশ্যা, ... মুখোপাধ্যায়ের পুত্রগণ আট আনা, এবং বক্রী অংশ ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবিল সোসাইটি প্রাপ্ত হইবেক।" (পত্রিকায় প্রকাশিত নামগুলোর প্রয়োজনহীনতায় উহ্য রাখা হলো।)

অথচ দেখা যাচ্ছে, আমাদের সমাজে রক্ষিতা গ্রহণের বিরুদ্ধেও দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। রক্ষিতাদের মধ্যে "উপরি খদ্দের" ধরা ইত্যাদি প্রতারণা-মূলক আসনীতির কথা প্রচার করা হয়েছে অনেক প্রহসনেই। বস্তুতঃ পারিবারিক জীবনে যৌন ও আর্থিক শান্তির জন্যেই এই প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে।

সাধারণ বেশ্যাদের দায়িত্বভার কেউ গ্রহণ না করলেও অধিকাংশ বেশ্যা "বাঁধা বাবু" বা "টাইমের বাবু" ছাড়া একজন করে "পিরীতের বাবু"ও জোটায়। এটা এদের দাম্পত্য জীবনের কৃত্রিম চরিতার্থতা। "কুচো খান্‌কী" গোত্রীয় বেশ্যাদের মধ্যেও এ নিয়মের বড়ো-একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অনেক সময় বেশ্যারা বাৎসল্যবৃত্তির টানে শিশুও সংগ্রহ করে। এদের অনেকে "গুর্গা"-গিরি (বেশ্যাবাড়ীর চাকরের কাজ) করে অথবা চুরি ডাকাতি করে পালিকাকে সাহায্য করে। কন্যারা পরে সমর্থ হলে বেশ্যাবৃত্তি করে এবং পালিকা বেশ্যা অর্থাৎ বাড়ীউলী মাসীর আজ্ঞাধীন থাকে। স্বক্ষেত্রে অবশ্য বেশ্যাদের আসনীতি সম্পর্কিত শাসন-ব্যবস্থা আছে। এজন্যে দুপুরে বাড়ীউলিদের পঞ্চায়েত বসে। অন্যের বাবু ভাঙানো কিংবা 'নিমক হারামি' করা—ইত্যাদির জন্যে শাস্তিও হয়। সাধারণের কাছে আশ্চর্যের বোধ হলেও এটা সত্যি যে এরাও একটা ধর্ম (Religion) ও তদনুযায়ী আচার মেনে চলে।

ক্ষেত্রমোহন ঘটকের "কামিনী" নাটকের (১৮৬৯ খৃঃ) মধ্যে পেত্নীজান বেশ্যার কথা বল্‌তে গিয়ে কৃষ্ণমোহন বলেছেন,—"কলিকাতার বেশ্যাদের যেমন প্রথমে বসন্ত, গোলাপ থেকে আরম্ভ করে অবস্থার পর্যায়ক্রমে কামিনী, নিস্তারিনী, বামা, দুগ্‌গোমণি, রামমণি, প্যালার মা, অবশেষে বৈষ্ণবীতে শেষ হয়, এদেরও সেই রকম।" প্রহসনকার নামকরণের মধ্যে দিয়েই বেশ্যাদের অবস্থার

৯। সংবাদ প্রভাকর—১৩ই আষাঢ়, ১২৫০।

ক্রমবিকাশ চিত্রিত করেছেন। পরবর্তীকালের বেশ্যাজীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে "বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী" নামে একটা পদবন্ধের প্রচলন দেখা যায়। ঐ নামে একটি প্রহসনও প্রকাশ পেয়েছে।১০ বৃদ্ধ অবস্থায় অনেক বেশ্যা কায়িক পরিশ্রমেও জীবনযাত্রা চালিয়েছে—যথা দাসীবৃত্তি, রেজানীবৃত্তি ইত্যাদি গ্রহণ করে। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "কাজের খতম্" প্রহসনে (১৮৯৯ খৃঃ) রেজানীবেশী বেশ্যাদের গানে আছে,—

"বেশ্যাগিরি কি ঝকমারি করবো নাক আর।
জেনে শুনে প্রা.ণ প্রাণে সমজিছি এবার।
গিয়েছে যৌবন কেটে, (দিতে) একমুঠো ভাত পেটে
জোটে নাক মোটে,
(এখন) ছাত পিটি পট্পট্, করি খিদের জ্বালায় ছট্ফট্
নাচার হয়ে আচার হারা, হারিয়েছি বিচার।"

বেশ্যাদের যৌবনকালের আয়নীতি সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রহসনে আভাস আছে। যৌবনকালের আয়নীতি অনুযায়ী গ্রাম্যবাবু অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কারণ প্রতারণামূলক আয়নীতির অত্যন্ত সহজ শিকার ছিলেন এই গ্রাম্যবাবু সম্প্রদায়। প্রহসনে এই তথ্য প্রচারের মূলে হঠাৎ বাবুয়ানার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণের যতোটা প্রতিফা আছে, বেশ্যাজীবনের আয়নীতি সম্পর্কিত সমাজচিত্রেরও ততোটা না হলেও কিছুটা মূল্য স্বীকার্য। চুনীলাল দে'র "ফটিক চাঁদ" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) উপস্থাপিত বারান্দায় বেশ্যাদের কথোপকথন এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।—

"২য় বেশ্যা॥ ···মেয়েমানুষ রাখা তো মুখের কথা নয়, কত রাজা রাজড়া ঘোল খেয়ে যায়। কলকেতার লোক সব জোচ্চোর, ফাঁকি দিতে পাল্লে কেউ ছাড়ে না। একটা বাঙ্গাল টাঙ্গাল জোটে, তাহলে বুঝতে পারি।

৩য় বেশ্যা॥ যা বলিচিস্ ভাই! বাঙ্গালগুলো খুব দেয় থোয়, দেখ্লি নবুনে বাঙ্গাল এক বছরের ভেতর তেলাকুচোকে চারখানা বাড়ী করে দিয়েছে। গয়নার উপর গয়না, কাপড়ের উপর কাপড়, মুখের কথা খসাতে না খসাতে এনে দিচ্ছে।"

১০। "রাঁড় ভাঁড় মিথ্যাকথা" প্রহসনের বিজ্ঞাপন।

যাত্রা বা থিয়েটার বেশ্যাদের বৈকল্পিক আয় ছিলো। থিয়েটার যুগের আগে অনেক বেশ্যা যাত্রার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছে। তবে সাধারণতঃ এইসব যাত্রার অধিকর্ত্রীও ছিলো বেশ্যা। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "মরকটবাবু" প্রহসনে (১৮৯৯ খৃঃ) তরলা বগলার কথোপকথনে এই বৃত্তির উল্লেখ আছে। তরলা বগলাকে বলে, বগলা যখন ভালো গাইতে পারে, তখন যাত্রার দল খুলুক। বগলা তখন বলে,—"খাঁদা পদ্দ (পদ্ম) এক মাচা গোঁপ দাড়ি মুখে দিযে রাজা সেজে খাসা বকত্তিতা করতো,..... বেটী যা কিছু করেছিল যাত্রার দল করে সব খুইয়েছে। ঘট্টী, বাট্টী, পালংখানি, গদী, বালিসটি পর্য্যন্ত দেনার দাযে সব গিযেছে। বেটী এখন দোরে দোরে ফ্যান্ চেঁখে ব্যাড়াচ্ছে, ওতে আর কাজ নেই বোন্।" বস্তুতঃ এই ধরনের বেশ্যা পরিচালিত যাত্রার জনপ্রিয়তা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিলো। নৃত্যগীতে রোজগারের যা সম্ভাবনা ছিলো, তাও নষ্ট হয়েছে উত্তর-পশ্চিমা বাঈজীদের আমদানীতে। এদের জনপ্রিয়তায় অতি সাধারণ পটুত্ব নিযে অনেক পশ্চিমা বেশ্যা এ সমযে কলকাতার অপেক্ষাকৃত মধ্যবিত্ত বাবুদের তোষণে নিযুক্ত থাকে। এতে বাঙালী বেশ্যাদের এই সব বৃত্তি নিরর্থক হযে দাঁড়ালো তবে এই সময়ে থিয়েটারে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে বেশ্যার প্রচলন হয। বেশ্যাদের এই বৃত্তির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমসাময়িক-কালে প্রচুর আলোচনা হযেছে। রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনার অভিনয়ের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে "আর্য্য দর্শন" পত্রিকা চারটে দিক তুলে ধরেছিলেন।[১১] প্রথমতঃ এই ধরনের অভিনয়ে পৌরাণিক সমর্থন আছে। অপ্সরা যারা নৃত্যগীত করতো, তারা প্রকৃতপক্ষে বেশ্যা। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী-ভূমিকায স্ত্রীলোকের অভিনয়ে অভিনয় প্রকৃতিগত হয়। কিন্তু কুলবধূকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে টেনে আনা সমাজের পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক। তৃতীয়তঃ, বেশ্যারা তাদের বৃত্তিস্বভাবে মনোরঞ্জন ও অভিনয়ে অভ্যস্ত এবং পটু। চতুর্থতঃ, এতে বেশ্যাদের মনের উন্নতি হয়। শেষোক্ত কারণটিই বৈকল্পিক সুস্থ আয়নীতি হিসেবে অনেকে উল্লেখ করে গেছেন। এডুকেশন গেজেটে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন,[১২] —"Some of the prostitutes are trying to receive education. If a few of such educated woman are secured happy consequences will out-weigh any mischief done."

১১। আর্য্যদর্শন পত্রিকা—ভাদ্র, ১২৮৪।

১২। Cf, Indian Stage—Vol. II—H. N. Dasgupta—p. 228.

কিন্তু এ ধরনের আয়ে সমাজের অনেকেরই আপত্তি ছিলো। "ভবরোগের টোট্‌কা" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায়[১৩] ৮ম গীতে আছে,—

" ৩। সেই সকল কুলনাশিনী, কলঙ্কিনী, দেবদেবীদের মূর্তি ধরে।
হাবভাব লাবণ্য ফাঁদে জড়িয়ে বেঁধে, দর্শকের মন হরণ করে॥

৬। যে সকল সাধ্বী সতী, পতিব্রতার নাম করিলে পাপী তরে।
সেই সকল সতীর বেশে বেশ্যা এসে, শুনিলেও হৃদয় বিদরে।"

এ ছাড়া আরও অনেক আপত্তি ছিলো যা 'থিয়েটার' সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

বস্তুতঃ বেশ্যাদের জীবিকা ছিলো অত্যন্ত জটিল। এদের পক্ষ থেকে অনেক রকম নীতি গ্রহণ করে অগ্রগমের চেষ্টা দেখা যায়। এক সময় Black mailing ইত্যাদি পন্থায় এবং অত্যন্ত সহজেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। রসময় দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির চেষ্টায় এই উপার্জন বন্ধ হয়। "সংবাদ ভাস্কর পত্রিকায়"[১৪] আছে —"বেশ্যারা আদালতে মান্যব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত যে তাঁহারা তাহাকে রাখিয়াছেন এবং এ মাস হইতে বেতন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মান্যব্যক্তিরা বেশ্যাদিগের সহিত মোকদ্দমা করিতে যাইতে পারিতেন না, ঘরে ২ রফা অর্থাৎ সন্ধি করিয়া টাকা দিতেন, বেশ্যাদিগের উপার্জনের এই পথ উত্তম হইয়াছিল।"

বেশ্যাদের সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম ছিলো হেঁয়ালী। এই ধরনের হেঁয়ালী আগে সাধারণ স্ত্রীসমাজে প্রচলিত ছিলো। এই সব হেঁয়ালীর মধ্যে দিয়ে বেশ্যাদের আর্থিক জীবনেরও কিছু পরিচয় থেকে গেছে। "নবকট্‌বাবু" প্রহসনে সোনাগাছির বগলা তরলার উক্তি-প্রত্যুক্তিতে আছে,—

বগলা॥ সোনামুখী ভাউলেখানি ভাস্‌লো সাঁজের ব্যালা,
পারঘাটাতে লাগ্‌লো চমক, যাত্রী যায় না ঠ্যালা॥
কেউ ফেলে দাড়, কেউ তোলে পাল, কেউ বা ধরে হাল।
যেন ভাটার জোরে, চড়ায় পড়ে, হয় না বান্‌চাল॥

তরলা। অল্প জলে ভাউলে চলে পুঁটি মাছের প্রাণ।
পাটনাগে ঝড় পাথ্‌লে বোঝাই খেতে পড়ে টান॥

১৩। ভবরোগের টোট্‌কা -প্রথম সংখ্যা—কলিকাতা, অগ্রহায়ণ—১২৯৩।

১৪। সংবাদ ভাস্কর—১৯শে মাঘ, ১২৬০।

…ছিল যখন দোকানে মাল আস্‌তো বাবু ভেয়ে।
এখন ভোল ফুরালো নগ্‌দা গেল
মরি এখন উট্‌নো যোগান দিয়ে ॥
জল শুকালে নাম ডোবে না, তালপুকুর বলে।
রেখেছি ঠাট্‌, খুলে কপাট—কেবল ধূনো-গঙ্গাজলে ॥

বেশ্যালয়ে দুপুরবেলার তাসখেলার সময় ঐ সংক্রান্ত নানা হেঁয়ালীর মধ্যেও আর্থিক জীবনের চিত্র আছে।[১৫]

স্বল্প পুঁজি বেশ্যাদের বর্ণনা অনেক প্রহসনেই নগ্নভাবে পাওয়া যায়। প্যারী-মোহন সেনের লেখা "রাঁড়-ভাঁড় মিথ্যাকথা" (খৃষ্টাব্দ অজ্ঞাত) প্রহসনে আছে,—

"কি করে গো কাযে কাযে, বসে আছে পথ মাঝে
যদি কেহ জোটে কোন মতে।
বারাণ্ডা ছাতেতে কত, আধবুড়ী মাগী যত
বসে আছে ওই আশয়েতে ॥
শুকাইয়া গেছে কুচ, কাঁচলিতে করে উচ
বুড়ী যেন ছুঁড়ি হইয়াছে।
তাহে গিল্‌টির গহনা, দূরেতে না যায় জানা,
সব বোঝা যায় গেলে কাছে ॥"

বেশ্যার ক্ষেত্রে দামী গয়না পরা নিরাপদ না হলেও এইসব চিত্রের মধ্যে, মুষ্টিমেয় বেশ্যাগোষ্ঠী ছাড়া সাধারণ বেশ্যাসমাজের দারিদ্র্যই প্রকাশ পেয়েছে। বাড়ীউলীর সাধারণ বখ্‌রা ছাড়াও, দালালদের দৌরাত্ম্যে এদের অনেককেই আয়ের অনেক অংশই বিসর্জন দিতে হতো। এসময় বাড়ীউলী ছাড়া একালের মতো বেশ্যাবণিক ব্যক্তির আভাস পাওয়া যায় না। তবু সাধারণ বেশ্যাসমাজের দারিদ্র্য অস্বীকার করা চলে না।

অনেক প্রহসনে স্বল্প পুঁজি বেশ্যার আয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে স্বল্প পুঁজি বেশ্যাদের মোটা লাভ ছিলো। বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে বলিষ্ঠ করবার জন্যেই মূলতঃ এই ধরনের চিত্র দেওয়া হয়েছে। অবশ্য অবস্থা বিশেষে স্বল্প পুঁজি বেশ্যার আর্থিক লাভ যে ঘটে না

১৫। দৃষ্টান্ত: "মা এসেচেন" প্রহসনে (ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৩ খৃঃ) বেশ্যালয়ে মোহিনী-কামিনীর উক্তি-প্রত্যুক্তি ইত্যাদি।

তা নয়। এ ধরনের দৃষ্টান্ত থেকে গেছে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কষ্টিপাথর" প্রহসনে (১৮৯৭ খৃঃ)। পানওয়ালা-পানওয়ালী বেশ্যালয়ের বর্ণনা করে একটি গান গেয়েছে,—

"সহরের পাযে নমস্কার !!—বিশেষতঃ সোনাগাজী টিরেটা বাজার।
টিরেটা সুঁটকী মাছের হাট, বাপ্ লোকের কি জমাট
যার গন্ধে পেটের নাড়ী ওটে, তাইতে মনের আট !
বলিহারি সুঁটকী খেকোয, বলিহারি নোলায তার !!
রুই কাতলার গলায দড়ি, যখন তাজা শুকো নেই বিচার !!
সোনাগাজী বাজার পিরীতের, পিরীত টাকা টাকা সের,
যত শুকো চিম্‌সে রুখো আম্‌সী ভাপনাতে জাহের ;
তবু গাড়ী জুড়ী ভুঁড়ির বহর দিনে রেতে ঠেলা ভার—
কমল মরে মধু বযে, খড কাটে ভ্রমরার সার !!"

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় খদ্দেরদের অনেকেই এইসব ব্যবসাযিনীর কবলে এসে পড়ে। তাই এ ধরনের আযের দৃষ্টান্ত একেবারে অস্বীকার করাও চলে না।

অধিকাংশ প্রহসনেই বেশ্যার প্রসঙ্গ তথা বেশ্যার যৌন ও আর্থিক জীবনের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তার উপস্থাপনে লেখকের উদ্দেশ্য গৌণ। বেশ্যাসক্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত যৌন সমস্যাযুক্ত প্রহসনে এ ধরনের প্রসঙ্গ কিছু পাওয়া যাবে। বাবুয়ানা ও অন্যান্য অপব্যয়মূলক আর্থিক সমস্যাযুক্ত প্রহসনেও কিছুটা পাওয়া যাবে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের প্রভাবও, বিভিন্ন ধরনের ভণ্ডামি উন্মোচনের ক্ষেত্রে বেশ্যার প্রসঙ্গ দেখা যায। ফলে অপাঙক্তেয় একটি সমাজ জীবনের চিত্র আমরা প্রহসনের মাধ্যমে স্পষ্ট-ভাবে পেযেছি। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে এতে অতিরঞ্জন আছে এবং অনেক প্রহসনকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোরকম অভিজ্ঞতাই ছিলো না। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

কেরানীগিরি ও আয়নাতি ॥ কেরানী বা করণিকরা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধিক গোত্রীয ব্যাবহারিক শাখা। ব্যাবহারিক হিসেবে চুক্তি অপরপক্ষের নিযন্ত্রণে সম্পাদিত হয়। এ কারণে এদের দুরবস্থার চিত্র স্বাভাবিক। নব্য অর্থনীতি নির্ভর সংস্কৃতিতে এরা পুষ্ট তাই এদের এই দিকটিই রক্ষণশীল প্রহসনকারদের অনেকেই তুলে ধরেছেন। একদিকে কারিগরী ও জাতব্যবসা

অন্যদিকে ভূমিনির্ভর আয় ইত্যাদিতে নব্য সম্প্রদায়ের কেরানীদের ছিলো উন্নাসিক দৃষ্টি। এর মূলে আর্থনীতিক কারণ আছে।

মেকলে সাহেবের সেই সুপরিচিত শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবটি স্মরণ করলে এই নব্য কেরানীসম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উক্তিটি সকলেরই পরিচিত এবং বহুচর্চিত,—"We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals. and in intellect.' এর সঙ্গে জড়িত ছিলো Industrial Capitalism-এর স্বার্থ! Industrial Capitalist-রা জানতেন যে শুধু opinion, morals, এবং intellect যেখানে "English taste"-এ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেখানে জীবনমানও অনেকটা উন্নত হবে—যা এদেশে তাদের শিল্পের বাজার সৃষ্টি করবে। English taste সৃষ্টি করতে গেলে যে ধরনের আর্থনীতিক আয়নীতি প্রয়োজন অন্ততঃ জাতীয় স্বার্থে,—তার বিন্দুমাত্র বিবেচনাবোধ শিল্প-পুঁজিপতি ইংরেজদের ছিলো না। তাঁরা জানতো, English taste বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও বাড়বে। ইংরেজদের ওপর নির্ভর করে নব্য জমিদার, মুচ্ছুদ্দী এবং কেরানী—এই তিন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিলো। ইংরেজরা এদের মান উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলো। বিলিতি শিল্পদ্রব্যের মেলা ছিলো নগর অঞ্চলে। অতএব এরা সকলেই নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। যারা গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে রইলো, তাদের সঙ্গে আর্থনীতিক সংস্কৃতির দিক থেকে একটি বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হলো—যা পরবর্তীকালে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

দেশীয় কেরানীসম্প্রদায় সৃষ্টির মূলে ইংরেজদের মিতব্যয় নীতি কার্যকরী ছিলো। হল্ট ম্যাকেঞ্জী তাঁর ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টারী ভাষণে বলেছিলেন যে, শাসন খাতে ব্যয় কমবার জন্যে এদেশীয় ব্যক্তি নিয়োগই প্রশস্ত। ওদেশে বেকার সমস্যা ছিলো বটে, কিন্তু ইংরেজ নিয়োগে মোটা অর্থ প্রয়োজন। অবশ্য এদেশের উঁচু চাকরীগুলোতে ইংরেজদের মোটা মাইনেতে রাখা হয়েছে। তার কারণ তাদের প্রাপ্ত বেতনের উদ্বৃত্ত স্বজাতীয় মূলধন হিসেবে লগ্নী হবে।[১৬] উচ্চপদে ইংরেজরাই বহাল থাকতেন। যদিও

১৬। P. Com. Pp.—735—II of 1831—32 Q—1909.

পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের Act XV অনুযায়ী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি কয়েকটি পদে ভারতীয় নিয়োগ করা হলেও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদে ইংরেজদের এদেশে অবাধ প্রবেশ অধিকার হওয়ায় ভারতীয়দের নিযোগ অত্যন্ত কম ক্ষেত্রেই ঘটতো। Hailybury-র শিক্ষা প্রথমে তো বাধ্যতামূলকই ছিলো. তবে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ ব্যক্তিদের আন্দোলনে এই বাধ্যতামূলকতা না থাকলেও, অগ্রগণ্য হতো Hailybury College-এর শিক্ষিতরাই।

বলাবাহুল্য কেরানীদের দুর্দশার অন্ত ছিলো না। যে ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কেরানীসম্প্রদায়ের পত্তন, সেই একই উদ্দেশ্যে কেরানীদের বেতন হ্রাসের চেষ্টাও পরে ঘটেছে। অন্যান্য বৃত্তি থেকে সরিয়ে এনে যখন বিশেষ বৃত্তিতে চাপের সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন উপযুক্ত আগ্রহান্বিত ব্যক্তির আধিক্যে ইংরেজরা বেতন কষাকষি সুরু করেছে। কেরানীদের এই দুর্দশাগ্রস্ত আয়নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলো উচ্চপদস্থ সাহেবদের অত্যাচার। বিদেশী ইংরেজদের এদেশ সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলো। এদেশের অনভ্যস্ত পরিবেশে এবং সমাজবিযুক্ত মনের অস্বাভাবিকতায় এদের মন ও কার্য পদ্ধতি অত্যন্ত complex হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাছাড়া এদের সঙ্গে দেশী কেরানীদের বেতনেরও যথেষ্ট পার্থক্য ছিলো। শাসনখাতে খরচ কমানোর জন্যে মূল চাপ পড়েছে কেরানীদের ওপরেই। অথচ সমসাময়িককালের গ্রামীন অর্থনীতি-নির্ভর বৃত্তি থেকে যে আয় হতো তার তুলনায় কেরানীদের আয় খুব কম ছিলো না। কিন্তু কেরানীদের জীবনমানের উন্নতিতে যে ব্যয় বৃদ্ধির সূচনা হয়েছে, তা কেরানীদের যতোটা দুর্দশাগ্রস্ত করেছে, পূর্বোক্ত বৃত্তির ব্যক্তিদের ততোটা করে নি। নতুন আর্থনীতিক কৌলীন্যের তাগিদে পুরোনো বৃত্তিতে ফেরবার বাধা একদিকে, অন্যদিকে তেমনি ক্রমবর্ধিত জীবনমানে এরা হয়ে উঠেছিলো নিরুপায়। এই সমস্যাই আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদের সমাজে দৃষ্টিকোণ সংগঠিত করেছে।

সাংস্কৃতিক বিরূপতা-জাত দৃষ্টিকোণে অনেক সময় কেরানীসম্প্রদায়কে হাস্যকরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। নব্য নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি-নির্ভর সংস্কৃতিপুষ্ট ব্যক্তিদের অতি ব্যাবহারিক গোত্রীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরূপতাও দৃষ্টিকোণকে আরও পুষ্ট করে তুলেছে। চিত্রদর্শন পত্রিকার একটি সংখ্যায়[১৭] কেরানীর আত্মকথা ব্যক্ত হয়েছে একটা Comic figure অঙ্কনের মাধ্যমে।—

১৭। চিত্রদর্শন—১২৯৭ সাল—পৃ. ৭২।

"কেরাণী জীবনে নাহি তিলেক সুখ
সবাই দেখে কালি কলম,
বোঝে না যে কত দুখ ॥
সকাল থেকে সন্ধ্যা ধরে
কেবল মরি মাছি মেরে,
ফুল্‌লো কপাল ছেলাম করে,
উন্নতি নাই এতটুক ॥
খেতে বসি বেলা মেপে
শুতে গেলে উঠি কেঁপে
স্বপন দেখি 'উইদাউট পে'
উড্‌ সাহেবের রাঙা মুখ ॥"

"হালিশহর পত্রিকায়" কেরানীগিরির ওপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেটি পরে "হক কথা" নামে একটি পুস্তিকায়[১৮] অন্য প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্কলিত হয়। "হক কথা"র বিজ্ঞাপনে বক্তব্যগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে হক্ কথার একটী কথা মিথ্যা নয়!" কেরানীগিরি এবং এর ওপর সাধারণের অত্যন্ত আকর্ষণের কথা বল্‌তে গিয়ে লেখক বল্‌ছেন,—"কেরাণিগিরি শুন্‌তে বড় সুখের চাকরি। দশটা চারটে খাটুনি, চেয়ারে বসে পাকার বাতাস খেতে পাওয়া যায়, পরবে সরবে ছুটীটে আসটাও আছে এর উপর আবার 'উপরিও' আছে। এই জন্যই আমাদের বাঙ্গালি ভায়াদের কেরাণিগিরি করবার ভারি সাধ। কেরাণিগিরি করতে হবে বলিয়াই যেন বাপ মা ছেলের বালককাল হতে 'হাতের লেখাটা যাতে ভাল হয়' এ বিষয়ে তদবির করেন। কেরাণি বাজার সস্তা, একটা মোট ববার জন্য একজন নগদা মুটে পাওয়া ভার কিন্তু কোন আফিসে একটা কর্ম্মখালি হলে সাতশ ওমেদার এসে হাজির হয়। ...ওমেদার বাবুরা কেরাঞ্চি গাড়ির ঘোড়ার মত, দেড় বুড়ি Being given to understand application (দরখাস্ত) পকেটে করে রাস্তায় রাস্তায় ধুলো খেয়ে বেড়ান, আর মধ্যে মধ্যে সাহেবের চাপরাসিদের নিকট নিমগোচের অর্দ্ধচন্দ্রও খেয়ে থাকেন।"

শিক্ষানবিশী কেরানীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। তার চিত্র দিতে গিয়ে

১৮। হক কথা—কলিকাতা ১২৮০ সাল, দ্বিতীয় কোপ।

লেখক বল্‌ছেন,—"সওদাগরদের বাড়িতে, রেইলওয়েতে ও অপরাপর আফিসে, Apprentice ভর্ত্তি করে। তাতেও আবার সুপারিস চাই। কোন যাযগায় বসতে চেয়ার দেয়, কোন কোন যাযগায় ওমেদার বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ার নিযে গিয়ে আফিসের কায করতে হয়। কেউ তিন বৎসর কেউ পাঁচ বৎসর কেউ সাত বৎসর খাট্‌চেন, কবে যে চাকরি হবে তাহা জগদীশ্বরই জানেন।"

সাহেব চাকুরে এবং দেশী চাকুরের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা দৃষ্টিবে অত্যন্ত বেশি পীড়া দেয়। শুধু সাহেব নয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—অন্ততঃ যাদের চেহারায় সাহেবী রক্তের ছাপ পাওয়া যায় না, তারাও আনুকূল্য লাভ করে থাকে—এমন কি নেটিভ খৃষ্টানও। এই পার্থক্যের কথা বল্‌তে গিয়ে লেখক বল্‌ছেন,—"অনেক আফিসেই প্রায় ঘড়ি ধরে হাজরে লওয়া হয়, সাড়ে দশটার উপর এক মিনিট হলেই অমনি সেদিনের মাইনে বন্দ। একদিনের কামাযে তিনদিনের মাইনে বাদ, বাপ্‌কে ঘাটে নিযে খবর দিলেও র‍্যাত নাই। কিন্তু সাহেবদের দরকার পড়লেই Privilege leave নিযে হাওয়া খেতে ছুটি পান!... আবলুসেব চেযে এক পোঁচ বারনিস্ কালো ফিরিঙ্গিরা 'সাহেব' বলে মোটা মোটা মাইনে পান। আর বৎসরের মধ্যে সাতজনকে ডিঙিযে তিনবার Promotion পান।"

কেরানীদের হীন আযনীতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়ায় আমাদের জাতীয় আযনীতিই হীন পর্যাযে নেমে এসেছিলো। হীন আয়নীতিজনিত মানসিক অবনতি আমাদের সমাজে ক্ষতি এনেছে। তেমনি এনেছে বিবেচনা বিরহিত ব্যযনীতির অনুসরণ। পূর্বোক্ত লেখক এ সম্পর্কে বল্‌ছেন,—"কেরাণিদের অফিসে ত এই সুখ ঘরেও ততোধিক। অল্প বেতন, ডাইনে আন্‌তে বাঁএ কুলোয় না—ত্রিশ টাকা মাইনে পান খরচ পঞ্চাশ টাকা, কি করেন, বেনীদরের সুদ দিযে টাকা ধার করেন।"

বিভিন্ন প্রহসনে কোথাও নগরকেন্দ্রিক অতিব্যাবহারিবের পক্ষ থেকে, আবার কোথাও বা গ্রামকেন্দ্রিক রক্ষণশীলের পক্ষ থেকে নব্য সংস্কৃতিভুক্ত কেরানীদের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হযেছে। এমন কি কতকগুলো প্রহসন শুধুমাত্র কেরানীদের কেন্দ্র করেই লেখা। 'বৌদ্ধিক' হিসেবে আভিজাত্য থাকলেও তার 'নিম্নব্যাবহারিকতা' অর্থাৎ অত্যন্ত হীন স্বার্থ অবস্থা যেন বুদ্ধিহীনতাকেই ব্যক্ত করে। তাই প্রাতিষ্ঠিক গোষ্ঠীর কায়িক এবং বৌদ্ধিক শাখার পার্থক্য মূলতঃ নেই—এই মত প্রচার করেছেন অনেক প্রহসনকার। কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর

"চক্ষুঃস্থির" প্রহসনে (১৮৮২ খৃঃ) উন্মত্ত যতীনের প্রলাপ—"বাঙ্গালী আবার বাবু কিসে, যারা চিরকাল চাকর, তারা আবার চাকর রাখে কেন ? ও চাকর বাবু, তবে তোদের গুমর কিসে।" ছড়াতেও যতীন বলেছে,—

"অধম গোলাম জঘন্য বাঙ্গালী
গোলামী করিয়া বাবু নাম কেন। ?
যতই পোশাকে সাজাও ও দেহ
গোলাম বলিয়া কেবা চিনিবে না।"

অন্যত্র,—

"পদে পদে লাথি পদে পদে জুতা,
খেয়ে তথাপিও লজ্জা নাহি হয় ?
বাবু বাহাদুর, যত নাম লও
গোলামী নিশান ঐ সমুদয় !"

মর্যাদানাশ সত্ত্বেও আমাদের সমাজের অনেকেই নিজ বৃত্তি ত্যাগ করে কেরানীগিরি করবার জন্যে উন্মত্ত। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "চার ইয়ারে তীর্থ যাত্রা" প্রহসনে (১৮৫৮ খৃঃ) নিতাই আবৃত্তি করেছে,—

"যার কর্ম্ম নিক্তি ধরা, সোনা রূপা তৌল করা
সেজন কেরানী হয়ে কুঠী যায় চলিয়া।
হাতুড়ি পিটিয়া যার পিতা গেছে যমদ্বার
তার পুত্র রহিয়াছে টেবিলেতে বসিয়া॥
গোয়ালা পেযালা লয়ে, মারে টান বাবু হয়ে
ডেভিল বলিয়া উঠে টেবিলে ঘা মারিয়া।
দুগ্ধ দোয়া গেছে ঘুরে, গান গান তানপুরে
গরম মেজাজ বাবু পমেটম মাখিয়া।"

এর ফলে সঙ্কীর্ণবৃত্তির ওপর ব্যাপক চাপে গড়ে উঠেছে বেকার সমস্যা। উল্লিখিত বৃত্তির পাথেয় ইংরেজী স্কুল কলেজের শিক্ষা। তাই ক্রমে শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়েও কেরানীর চাকরী মেলে না। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "মরকট্ বাবু" প্রহসনে (১৮৯৯ খৃঃ) প্রেমনাথ মন্তব্য করেছে,—"ও আপিসটে (টোটো কোম্পানির আপিস)—আজকাল ভারি গুল্‌জার। কত লোক এম্. এ., বি. এ. পুনঃ বিয়ে

পাশ করে ঐ আপিসের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "কেরানী চরিত" প্রহসনেও (১৮৮৫ খৃঃ) হীরার আক্ষেপ স্মরণ করা চলে। হীরা বলেছে,—"ওহে (ছেলে) বি. এ. পাশ কল্লে আর হবে কি বল? আজকাল বি. এ. ওয়ালারে কেউ পোছে কি?" অনেক প্রহসনকার জাতীয়-বৃত্তি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং কেরানীগিরির ওপর শিক্ষিত বেকারদের এই চাপকে হ্রাস করবার সেটিই একমাত্র উপায় বলে ইঙ্গিত করেছেন। অমৃতলাল বসুর "একাকার" প্রহসনে (১৮৯৫ খৃঃ) আছে,—রাধানাথ এম্. এ. (বিজ্ঞান) পাশ করেও কামারের জাত ব্যবসা ধরেছেন। রাধানাথ বলেন,—"আপিসের চাকরী বই যদি অন্নের অন্য উপায় না থাকে, তাহলে লাটসাহেবী থেকে বস্তাবন্দিগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত চাকরীগুলি দেশের লোককে দিলেও সবার সঙ্কুলান হয় না। উপস্থিত বেকারদের সংখ্যা তো কম নয়, তারপর সাল সাল বাড়ছে কত তা দেখবার জন্য বেশিদূর গিয়ে কাজ নাই, একবার এই কলিকাতার স্কুল কটা ঘুরে এলেই বুঝতে পার্ব্বে।"

বাস্তবিকই নব্য সংস্কৃতিজনিত আত্যন্তিক চাপ এই বৃত্তির ওপর পরিলক্ষিত হওয়ায় বৃত্তিগ্রাহীর দুর্দশা যেমন চরমে পৌঁছিয়েছে, তেমনি নব্য সংস্কৃতির তাগিদে অমিতব্যয়িতা তাকে মর্মান্তিক করে তুলেছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "কলির হাট" প্রহসনে (১৮০১ খৃঃ)—'ভূত'কে চাকরীর বাজার সম্বন্ধে বল্তে গিয়ে 'দুর্ভিক্ষ' বলে,—"চাকরীর বাজার বড় গরম। দশ পনের টাকা মাইনের ওপর নেই। তাও ত পোসাক প্রভৃতির খরচা সাত টাকায় দাঁড়ায়। এতেও লোকে শ্মশান ঘাটে খবর নেয় কেরানী মলো কিনা।"

জমিদারী ও আয়নীতি॥ ব্যুৎপত্তির দিক থেকে জমিদার ভূস্বামী একার্থক নয়। শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,—"The word Zaminder generally rendered landholder, is a relative and indefinite term , and does no more necessary signity an owner ot land than the word poddar signifies an owner of money under his charge, or an Aubdar, the owner of the province which he governs, or, in millitary language, the owner of the company ot sepoys belongs to, or Kelladar, the propritor of fort he defends, or, Thanadar, the owner ot the police post he has

charge of."[১৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকানা দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সেখানেও মালিকানার মূলে ছিলো তহশীল সরবরাহ। "Every proprietor of land (which term whenever it occurs in any regulation is to be considered, to include Zaminders independent Talukdars and all actual proprietors of land, who pay the revenue assessed upon their estates immediatly to the Government."[২০] সুতরাং রাজস্ব সরবরাহের চুক্তিতেই জমিদারদের আর্থনীতি অবস্থান করতো। বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ৯১৪৫৮-টা তৌজীতে দুই কোটি ষোল লক্ষ চব্বিশ হাজার নয় শত উনিশ টাকা রাজস্ব ধার্য করা হয় এবং অনির্দিষ্ট জমার ৩০০১-টা তৌজীতে পনর লক্ষ সাত হাজার এক টাকা রাজস্ব ধায করা হয়েছিলো। অবশ্য পরে ক্রমবিভাগের ফলে নির্দিষ্ট জমার তৌজির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে গেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে গভর্ণমেণ্ট আদায়ী জমার শতকরা নব্বুই টাকা সরকারে রাজস্ব নিয়ে অবশিষ্ট দশ টাকা মাত্র জমিদারকে লাভ হিসেবে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু এইলাভ নিয়ে জমিদাররা সন্তুষ্ট থাকেন নি। তাঁদের অনেকেই, প্রজাদের সঙ্গে সরকারের অপ্রত্যক্ষতার সুযোগে বিভিন্নরকম চাপ সৃষ্টি করে মুনাফালাভের চেষ্টা করেছেন। সাংস্কৃতিক চাপ সৃষ্টিও তাঁদের পক্ষে সহজ ছিলো, কারণ সাংস্কারিক গোষ্ঠী 'বৃত্তি' ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এঁদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এঁদের সহায়তায় জমিদারের পক্ষ থেকে ধর্মীয় এবং সামাজিক চাপসৃষ্টি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জমিদারী মুনাফা ও অত্যাচারের ইতিহাস আধুনিককাল থেকেই সুরু হয়েছে। "আইন-ই-আকবরী"র যুগেও অন্য-দেশে শস্য ভূমিকর হিসেবে গৃহীত হয়েছে অথচ কাশ্মীর, বাংলাদেশ ইত্যাদি স্থানে মুদ্রা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া এইসব প্রত্যন্ত প্রদেশের জমিদারদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করে বাদশারা তোষণই করে গেছেন—স্বার্থরক্ষার খাতিরে। সুদূর রাজধানী থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করতে গিয়ে এই তোষণনীতি ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। এইসব জমিদার ছাড়াও অন্যান্য কর আদায়কারীর দৌরাত্ম্য প্রজারা আরও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছে। সরকারের সঙ্গে প্রজার অপ্রত্যক্ষতা জনিত

১৯। The Zamindery Settlement of Bengal, Appen IV. Part—I. P-27.

২০। Bengal regulation III—1974. Sec. 2.

মুনাফার আধিক্য প্রজাদের দুর্দশা চরমে এনেছিলো। সেযুগে পঞ্চায়েত দ্বারা রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছে বটে, কিন্তু এখানেও যে দুর্নীতি থাকে নি, এটা জোর করে বলা যায় না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ইংরেজদের পক্ষে জমিদারদের প্রত্যক্ষতা স্থাপন হলেও প্রজাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নি। Industrial Capitalist-দের জন্যে কাঁচামাল সরবরাহের যন্ত্র হিসেবে গভর্ণমেণ্ট সবক্ষেত্রেই এঁদের অনুকূল হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ক বিষয়ক আইনগুলো পর্যবেক্ষণ করলেই তা উপলব্ধি হবে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১ এর আইনের ৮ নং ধারার কথা বল্‌তে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখ্‌ছেন,—'কর্ণওয়ালিস প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন—জমীদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না, কেবল বলিলেন যে, 'প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরল যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন।' তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজনা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।"[২১] কিন্তু প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই থেকে গেলো। অবশ্য ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স [illegible] একটু আক্ষেপ করে কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৫ আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর, প্রজাদের যেটুকু স্বত্ব ছিলো, তাও নষ্ট হলো। এই নিয়ম অনুসারে, জমিদার প্রজাকে যে কোনো হারে পাট্টা দিতে পারবেন অর্থাৎ এক কথায়, জমিদার প্রজাদের কাছে যে কোনো হারে খাজনা আদায় করতে পারবেন।[২২] অর্থাৎ কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা তা জমিদারের ইচ্ছাধীন। এতে জমির ওপর কৃষকের মালিকানা রইলো না। কৃষক হয়ে গেলো জমিদারের নিযুক্ত মজুর মাত্র। এই সুবিখ্যাত "পঞ্চম" আইনের আগেই ক্রোকের আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিলো—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৮-এর আইনের ২নং ধারায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়,—"জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরেজরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন, অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইনসঙ্গত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৫-এর আইনে যা ছিলো অস্পষ্ট, তা ১৮-এর আইনে আরও

২১। বঙ্গদেশের কৃষক—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

২২। Revenue Letter to Bengal 9th May, 1821, II 54 (Cf. বঙ্গদেশের কৃষক)।

স্পষ্ট হলো।[২৩] এই আইনে জমিদাররা কায়েমী প্রজাদেরও তাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করবার অধিকার পেলেন। পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০-এর আইন কিংবা তারই অনুলিপি ধরনের ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৮-এর আইনে প্রজাদের সামান্য কিছু উপকার হয়েছিলো। তবে প্রজাদের সঙ্গে সরকারের বিশেষ কিছু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন হয় নি। শাসন ব্যবস্থার জন্যে আদালত ইত্যাদি স্থাপন হয়েছে বটে, কিন্তু জমিদারের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করতে গেলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মোকদ্দমার ব্যয়সাধ্যতা, আদালতের দূরত্ব, মোকদ্দমার শম্বুকগতিজনিত অসুবিধা, বিচারকের অযোগ্যতা ও অর্থলোভ ইত্যাদি জমিদারী অত্যাচারের অনুকূলেই ছিলো। অতএব প্রজাদের সমস্যার বিশেষ কোনো সমাধানের ইঙ্গিত আইনগুলোর মধ্যে দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তক-পুস্তিকায় জমিদারদের অত্যাচারের বিবরণ এবং বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। এসবের মধ্যে থেকে উপলব্ধি করা যায় যে নব্য সংস্কৃতি জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। গ্রামীণ প্রজাদের পক্ষ থেকে দৃষ্টিকোণের বলবত্তা থাকা সত্ত্বেও প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ হওয়ার অবকাশ পায় নি, কিন্তু সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এই দৃষ্টিকোণকে প্রাহসনিক করে তুলেছে। "জমিদারশ্রেণীর অবনতি" নামে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি পুস্তিকায়[২৪] জমিদারদের পক্ষ গ্রহণ করে বলা হয়েছে, —"জমিদারশ্রেণী অনেকের চক্ষুঃশূল ; এ সম্প্রদাযের সম্যক্ পতন দর্শনে অনেকের বাসনা। আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। দীন বঙ্গভূমির যদি কিছু পূর্ব্ব গৌরব রক্ষার সম্ভাবনা থাকে, তাহা জমিদারশ্রেণীর প্রতি নিভর করিতেছে। অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায় জমিদারবর্গের নাম শ্রবণমাত্রেই খড়্গহস্ত। এমনকি অনেক জমিদার কর্ম্মচারীর সন্তানগণ বি. এ., বি. এল্ উপাধিপ্রাপ্ত মাত্রেরই পিতৃপিতামহের আশ্রয়স্থান জমিদারের প্রতিকূলাচরণে ব্যাকুল।" (পৃঃ ১৭)। মন্তব্যটি থেকেই বোঝা যায় যে, নব্য সংস্কৃতিজনিত বিরোধ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ক্রমশঃ দেখা দিয়েছে।

২৩। Revenue Letter to Bengal 9th May, 1821, II 54 (Cf. বঙ্গদেশের কৃষক)।

২৪। জমিদারশ্রেণীর অবনতি—জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, কলিকাতা ১২৯০ সাল।

জমিদারদের আয় সম্পর্কে কতকগুলো তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিলো ১২৭৭ সালের "সুলভ সমাচার" পত্রিকায়।[২৫] একটি প্রেরিত পত্রে "কোন গ্রামবাসী" ছদ্মনামে এক ব্যক্তি "জমিদারের দশবিধ আয়" সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি লিখ্‌ছেন,—

"মহাশয়, দরিদ্র অজ্ঞান কৃষকগণের প্রতি উৎপীড়ন করিতে পারিলে কেহই ছাড়েন না। প্রথম উৎপীড়ক জমিদার। প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে প্রদান করিয়াছেন, এই ক্ষমতা দ্বারা জমিদারেরা পল্লিগ্রামের সমস্ত আধিপত্য করিয়া থাকেন। একপ্রকার তাঁহাদিগকে পল্লিগ্রামের জজ, ম্যাজিষ্টেট ও কলেক্‌টর বলিলেও বলা যায়।" শুধু রাজস্ব আদায় ছাড়াও আরও আদায় আছে—এ প্রসঙ্গে "বাজে আদায়"-এর কথা বল্‌তে গিয়ে তিনি বলেছেন,—"প্রজারা পরস্পর কলহ করিয়া জমিদার-দিগের কাছারিতে উপস্থিত হইলে, জমিদার তাঁহার নগদীগণকে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষকেই গোয়ালবাড়ী লইয়া যাইতে আজ্ঞা দেন। গোয়ালবাড়ী দ্বিতীয় যমালয়, তথায় যমদূতসম নগদীরা জুতা, কিল, লাথী মারিয়া বুকে বাঁশ ও ডাবা চাপা দিয়া উত্তমরূপে পাট করে, তৎপরে বন্দোবস্তের কথা উপস্থিত হইলে দশ-কুড়ি-পঞ্চাশ টাকা জরিমানা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম বাজে আদায়।"

বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যে জমিদারের অনুমতি আদায়ও প্রজার পক্ষে আর্থিক যন্ত্রণা বিশেষ। "কোনপ্রকার দুর্গোৎসব, দোল, পুরাণ, অথবা অন্য কোন ক্রিয়া করিতে হইলে জমিদারের নিকট আজ্ঞা লইতে হয়, জমিদার পঞ্চাশ-ষাট-একশ অথবা অবস্থা বুঝিয়া আরও অধিক টাকা নজর লইয়া আজ্ঞা দিয়া থাকেন।" এ ছাড়া জমিদারদের নিজস্ব পালনীয় সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাথট আদায় রীতি তো আছেই। এ সম্পর্কেও পূর্বোক্ত পত্রলেখক বলেছেন,—"জমিদারের পুত্রকন্যার বিবাহ, পিতামাতার শ্রাদ্ধ, পূজা অথবা অন্য কোন কর্ম্মোপলক্ষে এ প্রজার পুষ্করিণীর মৎস্য, ও প্রজার ক্ষেত্রের বার্তাকু, আলু, সে প্রজার বাগানের মোচা, থোড, কলা, পাত ও সকল দ্রব্যই প্রজাদের নিকট হইতে আদায় হয়; এইরূপ আদায়কে মাথোট আদায় কহে।"

২৫। সুলভ সমাচার—১২ই মাঘ, ১২৭৭ সাল

জমিদারদের অত্যাচারের কথা বল্‌তে গিয়ে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার[২৬] সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে,—"পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ২ জমিদার ও ইজারদার বাড়ীদারদিগের অত্যাচারের ব্যাপার আমরা পুনঃ ২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া থাকি, ঐ সকল দৌরাত্ম্য কোনকালে নিবারণ হয় এমত বোধ করি না, দীন-দুঃখিদিগের দুঃখ বিবরণ বর্ণন করিতে আমাবদিগের কাষ্ঠের লেখনী করুণারসে আর্দ্রা হইতেছে।"

বাস্তবিকই বিভিন্ন প্রকার অর্থ আদায়ে প্রজাদের দুরবস্থা অত্যন্ত চরমে এসে পৌঁছিয়েছিলো। এই সমস্ত বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাহসনিক দৃষ্টিকে সিরিয়াস করে ফেলেছে। এসব ক্ষেত্রে প্রহসনের মাত্রাবিচারের অবকাশ অপেক্ষাকৃত কম।

নীলকর ও আয়নীতি॥ নীলকরদের কেন্দ্র করে কোনো প্রহসন রচিত না হলেও অনেক প্রহসনেই প্রসঙ্গক্রমে নীলকরদের কথা এসে গেছে। এদের আয়নীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ থাকলেও তার তীব্রতা নেই। নীলকরদের বলাৎকারমূলক আয় একদা রায়তদের অত্যন্ত উৎপীড়িত করে তুলেছিলো, তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমসাময়িককালের একটি দরখাস্ত তুলে ধরা যায়—যার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না।[২৭] —

"বাদী—শ্রীএছম মণ্ডল সাং আন্দলপোতা থানা চাপড়া প্রতিবাদী—বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানীর তরফ মেনেজার রাবট হারবি সাহেব তরফ মোকাম কুটী টেঙ্গরার কর্ম্মাধ্যক্ষ মেং ছোট সাহেব তাঁহার নাম অজ্ঞাত। ইত্যাদি···

মোকদ্দমা—মোকদ্দমা জবরদস্তী দ্বারা নিলের দাদন গতান ও মারপীট করা ও কয়েদ রাখা ইত্যাদি বাবত।

বিবরণ এই যে গত ১১ পৌষ তারিখে উক্ত লাঠীয়াল আসামীয়ান আমাকে টেঙ্গরার কুটীতে ধৃত করিয়া লইয়া দেওয়ান ও সাহেব আসামীর নিকট দিলে দেওয়ান ও সাহেব আসামী মৌছুক আমাকে নিলের দাদন লইতে বলায় আমি অস্বীকার হইলে আমাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়া ও মারপীট করিবার হুকুম দেওয়ায় লাঠীয়াল আসামীয়ান আমাদিগকে মারপীট ও গুদামে কয়েদ করিয়া নাং সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখিয়াছিল পুনরায় সাহেব ও দেওয়ান আসামীয়ান

২৬। ১১ই আষাঢ় ১২৫৮ সাল।

২৭। A Collections of Bengali Petitions & C. 1896 ; No 16.

আমাকে ডাকাইয়া মারপীট দ্বারা জবরদস্তী দ্বারা নীলের দাদন দুই টাকা ও হাতচিটা গতাইয়া ছাড়িয়া দেন আমি নাচার হইয়া প্রাণের ভয়ে টাকা ও হাতচিটা হাতে করিয়া আসিয়াছিলাম এক্ষণে উক্ত টাকা কাগজ সংলিত হুজুরে দরখাস্ত করিয়া উক্ত অত্যাচারের উচিত সাস্তি দিতে আজ্ঞা হয় নিবেদন ইতি সন ১২৭১ সাল তারিখ ১৬ পৌষ।"

দরখাস্তের তারিখটি নীল আন্দোলন যুগের কিছু পরের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নীলকর অত্যাচার উনবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি। ১২৭৪ সালের ১০ই বৈশাখ তারিখে লেখা কৃষ্ণগঞ্জ থানার প্রতাপপুর নিবাসী মথুরনাথ বিশ্বাসেরও এ ধরনের একটা দরখাস্তের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৮] আগে অবশ্য অত্যাচার ছিলো আরও ভয়াবহ। ১২৬০ খৃষ্টাব্দের "সংবাদ ভাস্কর পত্রিকায়[২৯] উনত্রিশে ফাল্গুন তারিখের একটি পত্র মুদ্রিত হয়। পত্রটি লেখেন মহারাজপুরের গরীবউল্লা মণ্ডল ও বকীউল্লা মণ্ডল। "কোন নীলকুঠীর সাহেব আমার দিগের লাঙ্গল ও মজুর ও নীল লইয়া তাহার মূল্য না দেওয়ায় আমরা তাহার নীল করাতে অসম্মত হওয়ায় প্রশংসিত সাহেব রাগান্ধ হইয়া হুকুম দেওয়ায় তাহার তবক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আটকুঠীর আটজন দেওয়ান ৪০০/৫০০ শত সড়কীওয়ালা ও অস্ত্রধারী সমেত চারি তরফ হইতে গ্রামে পড়িয়া প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুট ও ৪/৫ জনকে জখম ও দুই জনকে খুন করিয়া উঠাইয়া লইয়া যাইয়া ঐ দুইলাস পলদহের বিলে ডোবাইয়া রাখিয়া ছিল। এ সকল ভয়ানক সড়কীওয়ালারা দোকানহাট লুটিয়া ও দুঃখি লোকদের পাঁঠা পাঁঠি ধরিয়া খাইতেছে বিচার কর্ত্তার নিকট জমিএত বস্তের দরখাস্ত করিলে নথির সামিল হুকুম দেন এদিগে দেশ পয়মাল হইল তাহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না।"

নীলকরের প্রসঙ্গ নিয়ে অবকাশ প্রহসনে কম থাকায়, নীলকর ও নীলচাষ সম্পর্কে বিশেষ করে শিল্প-পুঁজি-পতিদের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি নিয়ে আলোচনা এখানে নিরর্থক। তবে নীলকরের অর্থনীতি প্রসঙ্গে কিছু না বলা হলে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

২৮। A Collections of Bengali Petitions & C- 1896, No. 13.

২৯। সংবাদ ভাস্কর—৬ই চৈত্র, ১২৬০।

অন্যান্য বিভিন্ন বৃত্তি ও আয়নীতি ॥ আমাদের সমাজের চিত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। আর্থিক ক্ষেত্রে এদের আয়ব্যয়নীতির প্রসঙ্গও বাংলা প্রহসনে স্থানলাভ করেছে। বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক বিরোধিতা যে যে ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে বৃত্তিগ্রাহীর আয়ব্যয়নীতি একটু বেশি অবকাশ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে প্রধান উকিল, ডাক্তার বা কবিরাজ, পুলিস ইত্যাদি। সম্পাদক বা স্বাদেশিকদের অবকাশ থাকলেও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের প্রাধান্যে আর্থিক সমাজচিত্রের মূল্য বিবেচনার বিষয়।

উকীল।—উকীল শব্দটি ইসলামী। ইসলামীযুগেই উকীল বৃত্তি অন্যতম প্রধান একটি বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বাস্তবিক অর্থে উকীল প্রতিনিধির কাজ করে থাকেন। আমরা জানি ইসলামী যুগে ভূম্যধিকারীরা বাদ্‌শার দরবারে একজন করে উকীল নিযুক্ত করতেন। এঁরা কোন কিছু আশঙ্কার সম্ভাবনা দেখ্‌লে নিয়োগকারী ভূম্যধিকারীর পক্ষ সমর্থন করে বাদ্‌শাকে তুষ্ট করতেন। আবার শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক ধরনের দালালের অস্তিত্ব অনেকদিন থেকেই ছিলো। ইসলামী আইন-কানুনের জটিলতায় এ ধরনের দালালরা স্বীকৃতি লাভ করলেন। এঁরা বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিনিধিত্ব করে পারিশ্রমিক লাভ করতেন। বিচারকও উকীলের উপস্থিতিতে বিচারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চিন্তা করবার সুযোগ পেতেন।

প্রাগ্‌ ইসলামীযুগে বিচারের সুবিধার জন্যে "রাগাল্লোভাদ্‌ভয়াদ্বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণ"[৩০] সভ্যকে বিচার সভায় আহ্বান করা হতো। বিভিন্ন সংশয়ের নিরসন ঘটতো বলে এঁদের ব্যবহারজীবী বলা হয়েছে। কাত্যায়ন লিখ্‌ছেন,—

> "বি-নানার্থেঽব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে
> নানা সন্দেহ হরণাৎ ব্যবহার ইতি স্থিতি ॥"[৩১]

ব্যবহার তত্ত্বে বলা হয়েছে,—

> "নানা বিবাদ বিষয়ঃ সংশয়ো হ্রিয়তে হনেন ইতি
> ব্যবহারঃ। ভাষোত্তর ক্রিয়ানির্ণায়কত্বং ব্যবহারত্বং।"

৩০। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—২/৪।

৩১। বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু।

তবে এই 'ব্যবহার' যারা বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতেন, তারা বাদী বা প্রতিবাদীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। ইসলামী আমলেই পারিশ্রমিক রীতির প্রচলন দেখা যায়। পরবর্তীযুগের ব্যবহারজীবীরা বিচারকের সহায়তার বদলে বাদী বা প্রতিবাদীর ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠিক সত্তা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ইংরেজী বিচার ব্যবস্থায় উকীল সম্পূর্ণ প্রতিনিধি বলেই গণ্য হলেন। এবং বিচারকের সহায়ক হলেন জুরী। পরবর্তীকালে উকীলের কাজ যেন তেন প্রকারেণ সুবিচারের বাধা ঘটিয়েও মক্কেলকে জয়ী করা। অবশ্য সব কিছুর মূলে আছে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন। গত শতাব্দীতে আইন শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ব্যবহারজীবী সমাজে পাশ করা উকীলের সংখ্যা বেড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পাশ উকীলদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের সাংস্কৃতিক বিরোধকে স্পষ্ট করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত চাপে ব্যবহারজীবীদের প্রতিষ্ঠা উন্নতই ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নব্য সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই বৃত্তির ওপর আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ফলে কেরানীগিরির মতো ওকালতীতেও নব্য সংস্কৃতিবানদের অনেকে ঝুঁকেছিলেন। তাই এই বৃত্তির মধ্যেও কেরানীগিরির মতো দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া রক্ষণশীল পক্ষের আর একটি অভিযোগ নব্য আইন শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের যোগ খুব স্বল্প। তাই বৈষয়িক ক্ষেত্রে নেমে এঁরা যে দুর্দশাগ্রস্থ হবেন, এটা স্বাভাবিক।

উকীলকেও হাস্যস্পদ চরিত্র হিসেবে উপস্থিত করে গত শতাব্দীতে অনেক ছড়া কবিতার জন্ম হয়েছে। চিত্রদর্শন পত্রিকায়[৩২] একটি ছড়ায় আছে,—

"(আমি) সাম্‌লা নিয়ে পড়েছি কি মুস্কিলে।
(যে) মগজে জড়ালো কম্‌লি,
ছাড়ে না ছেড়ে দিলে॥
কোন্ বোকা কয় ওকালতি রোকা কড়ির কাজ,
এক বেলা চড়তেছে হাঁড়ি দশ বার দিন আজ,
(আবার) যায় না আশা, তবু মরি
মানুষ দেখে ঢোক্ গিলে॥

৩২। চিত্রদর্শন—১২৯৩ সাল, পৃঃ ৭১।

…ছেঁড়া ইজের, শতেক তালি, গায়েতে চাপকান্
গলায় দড়ি—পাক্ লাগানো উড়ানি আধ্খান্।
(এখন) বাঁচি যে যম এইটা ধরে হড়াস্ করে টান দিলে ॥"

'কবিরত্ন' ভনিতায় ওকালতি সম্পর্কে একটি গান ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় হয়েছিলো।৩৩—

"সুখ নাই উকিল মহলে।
ওকালতির প্যাঁচ লেগেছে, উকিলের গোলে
কোর্টে নাই মিছিল মামলা ভাবছে বসে সকল আমলা,
উকীলেরা বেচ্চে সামলা, কিসে দিন চলে।"

বাংলা প্রহসনে উকীলদের ব্যঙ্গ করে প্রচুর প্রসঙ্গের অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে রমানাথ সান্যালের লেখা "নব্য উকীল" প্রহসনের (১৮৭৫ খৃঃ) শেষে কবিতা আকারে বিনোদের খেদ প্রকাশ পেয়েছে,—

"বাঙ্গালী উকীল যেন আর কেহ হয় না,
দালালের পায়ে তেল যেন কেহ দেয় না,
শামলা মাথায় যেন, গাছতলে বসেন না,
উকিলের দশা দেখে লোক যেন হাসে না।
মোক্তারের পেছু পেছু আর যেন ধায় না।
কুকুর সমান যেন আর তাড়া খায় না।
নিরাশ্রয়, যেন আর রোদে টোটো করে না,
সময়ে সময়ে যেন মরমেতে মরে না।"

একই প্রহসনে দুর্দশাগ্রস্ত উকীলের আয়ের কথা আছে। আদালতের এক দালাল নফর একজন মক্কেলের কাছ থেকে সোয়া আট আনা নেয়। পাঁচ পয়সার কাগজ এবং আট আনা কোর্ট ফিস্। কুড়ি টাকার মোকদ্দমা। মক্কেলের কাছ থেকে মাত্র তিন টাকা পায়। তিন টাকা থেকে দুই টাকা চার আনা খরচাতেই যাবে। বাকি বার আনা থেকে উকীলই কি নেবে, আর মোক্তারও বা কি নেবে। নফর বিনোদকে (উকীল) ছয় আনা পয়সা দেয়. বিনোদ চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ছয় আনাই হাত পেতে নেয়

৩৩। বিষসঙ্গীত, ১২৯৯ সাল—বৈষ্ণবচরণ বসাক সঙ্কলিত, পৃঃ ৪৬৭।

এবং পকেটে রাখে। রাখালদাস ভট্টাচার্যের "সুরুচির ধ্বজা" প্রহসনেও (১৮৮৬ খৃঃ) উকীল প্যারী নিজের দুর্দশার কথা নিজেই স্বীকার করেছে। সে রহস্য করে বলে, তার ছয় মাসে মোট এক লক্ষ টাকা রোজগার হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম মাসে এক বন্ধুর কাজ করে এক টাকা পেয়েছে। তারপরের পাঁচ মাস শূন্য চল্‌ছে। চারু একথা শুনে মন্তব্য করেছে,—"Bar-এ এমনই দুর্দশা হয়েছে বটে। নাই বা হবে কেন? 'মরা গাং কুমীরে ভরা।' অন্য স্বাধীন বাণিজ্যের দিকে ত আর কেউ চাবেন না।"

উকীলদের দুর্দশা নিয়েই যে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে তা নয়, দুর্নীতি নিয়েও দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মক্কেল ভাঙানো, টাকা আত্মসাৎ, ইত্যাদি বিভিন্ন দুর্নীতির প্রসঙ্গ বিভিন্ন প্রহসনে প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়া আসামী পক্ষ সমর্থনে মিথ্যা ভাষণের কথা তো আছেই—যা সাধারণতঃ বৃত্তির অঙ্গ হিসেবেই পরিচিত। যেমন, বৈকুণ্ঠনাথ বসুর "বারবাহার" প্রহসনে (১৮৯১ খৃঃ)—পাঁচ শত টাকার হ্যাণ্ডনোটের নালিশে অভিযুক্ত মক্কেলকে উকীল বিজয়বাবু পরামর্শ দেন,—মক্কেল ধার স্বীকার করুক। তিনি প্রমাণ দেখাবেন যে টাকা শোধ দেওয়া হয়েছে, তবে হ্যাণ্ডনোটটা ফিরিয়ে দেবে বলে ফরিয়াদী তা ফিরিয়ে দেয় নি। সাক্ষীদের দিয়েই তিনি এসব কথা বলাবেন। নীতি-দুর্নীতি সব উকীলের কাছে তুচ্ছ—সবচেয়ে বড়ো টাকা। এই টাকার খাতিরেই মক্কেলের সঙ্গে উকীলের ঘনিষ্ঠতা, এবং উকীল-মক্কেলের প্রতিনিধি। উকীল-মক্কেলের এই 'প্রেম'কে ব্যঙ্গ করে দুর্গাদাস দে র "ছবি" প্রহসনের (১৮৯৬ খৃঃ) রামু মন্তব্য করেছে,—"আইনে বড একটা প্রেম পাওয়া যায় না। তবে উকিলে-মক্কেলে প্রেম হয়, সে প্রেমে কোকিল ডাকে না, ফুলও ফোটে না, তবে ঘুঘু ডাকে, শরষে ফুল ফোটে।"

উকীলের প্রসঙ্গে যে আর্থিক সমাজচিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণে নিয়ন্ত্রিত হলেও চৌর্যমূলক, প্রতারণামূলক, বলাৎকারমূলক ইত্যাদি সমাজবিগর্হিত আমদানীর অবকাশ অবাস্তব নয় এবং তাই আর্থিক সমাজচিত্র প্রদর্শনাতে অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা চলে না।

ডাক্তার।—উকীলের মতো, নব্য সংস্কৃতির বাহক হিসেবে অতিব্যাবহারিক গোষ্ঠী হয়েও ডাক্তাররা বিদ্রূপের পাত্র হয়েছেন। অবশ্য এই বিদ্রূপের মূলে কেবল সংস্কৃতিগত কারণকেই একমাত্র কারণ বলে স্বীকার করা যায় না। কেন না 'ডাক্তারবাবু" প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ) "জনৈক ডাক্তার" (ভুবন-

মোহন সরকার) স্বয়ং ডাক্তারের বিভিন্ন দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। ১২৮২ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠের তারিখযুক্ত ভূমিকায় কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলছেন—"ডাক্তার হইয়া ডাক্তারদিগের দোষগুণ বর্ণনা করিতে হইলে স্বভাবতঃই চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হইতে পারে, আমি এই নিমিত্ত আত্মগোপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে আমি গৃহছিদ্র কেন প্রকাশ করিলাম। আমার উত্তর এই যে, আমি সমাজকে আমার সহযোগীদের অপেক্ষা অধিকতর যত্নের সামগ্রী বলিয়া মনে করি।" ডাঃ ভুবনমোহন সরকার ডাক্তারের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করতে গিযে ভূমিকায় লিখেছেন,—"আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে আমার ইহাই বোধ হয় যে, ডাক্তারেরা অনেকেই আপনাদিগকে সাধারণ সমাজের অপেক্ষা কিয়ৎদূর উচ্চ পদবীর লোক বলিয়া মনে করেন, এবং সমাজও ঐরূপ ভাবিয়া তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই হউক, বা যে কারণেই হউক কেহ কেহ রোগীদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হন। বোধ হয় আমাদের সমাজ সুশিক্ষিত হইলে এতদূর প্রতারণা হইতে পারিত না। অথবা শুদ্ধ সুশিক্ষিত হইলেই হয় না, প্রতারিত হইবার আরও দুই একটি কারণ দেখা যায়। রোগী ও তাহাদিগের আত্মীযেরা স্বভাবতঃ সরলবিশ্বাস হইয়া থাকে, অধীরতাবশতঃ ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইতে হয়। এই নিমিত্ত তাহারা অন্ধের ন্যায় ডাক্তারদিগের অনুসারী হইয়া থাকে।"—ইত্যাদি। দীর্ঘ মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ডাক্তারদের দৌর্নীতিক আযনীতি সমাজে সাধারণভাবে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করেছে, যার দ্বারা ডাক্তারও প্রভাবিত হয়েছেন। 'বান্ধব' পত্রিকায়[৩৪] ডাক্তারের কয়েকটি দিক কটাক্ষ করে শব্দটির বিদ্রূপাত্মক ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে। "ডাক্তর—। ডক ছেদনে, ভেদনে, কৃন্তনে, বিলুণ্ঠনে চ। তরণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধার অকার স্থানে আকার। ডাক, ডাকাডাকি, ডাকাত, ডাকাবুকা, ডাকিনী প্রভৃতি শব্দও ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যোগে এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।"

ঈশ্বর মানুষকে জীবন দান করেন এবং চিকিৎসক মানুষকে নবজীবন দান করেন। তাই চিকিৎসককে সমাজের সাধারণে শ্রদ্ধা করে থাকে। অথচ ডাক্তারের হৃদয়হীনতা সাধারণ মানুষের সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে।

৩৪। বান্ধব—আশ্বিন, কার্তিক—১২৮১ সাল।

তাই ডাক্তারদের দুর্নীতি সমাজে আরও মর্মান্তিক। বিভিন্ন প্রহসনে ডাক্তারদের হৃদযহীনতার কথা উল্লেখ করা হযেছে। রাজকৃষ্ণ রাযের "কানাকড়ি" প্রহসনে (১৮৮৮ খৃঃ) স্বযং ডাক্তারের মুখ দিযেই বলানো হযেছে, —"রুগী যদি আমার ভিজিট চুকিযে না দিযে মরে যায, তাহলে তার বাপ, খুড়ো, জ্যেঠা, ছেলে, মা, মাসী, এমন কি, তার স্ত্রীর কাছ থেকেও ভিজিট আদায করি। যদি সহজে না দেয তো নালিস করে ডিক্রী করি।" এ ধরনের হৃদযহীনতাই শুধু নয, ছলচাতুরীর আশ্রযও অনেক ডাক্তার করে থাকেন, প্রহসনকার সেগুলোও উদ্‌ঘাটন করেছেন। ডাক্তারী সুবিধার খাতিরে মন্ত্র বিক্রয ডাক্তার সমাজের একটা বড় কলঙ্ক। তা ছাড়া সুস্থ রোগীকে ভয দেখিযে নাভাস করে তাকে বেশিদিন হাতে রাখাও ডাক্তারের দুর্নীতিকেই ব্যক্ত করে। সামান্য ওষুধ দিযে বেশি দাম নেওযা, ডাক্তারে ডাক্তারে চুক্তিতে কমিশন, ডিস্পেন্সারীর সঙ্গে কমিশন, অন্যের রোগী ভাঙানো ইত্যাদি অসংখ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রহসনকারেরা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে লেখনী ধারণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক নিযন্ত্রণ খুবই কম, সুতরাং সমাজচিত্র হিসেবে এগুলোর যথেষ্ট মূল্য আছে আর্থিক ক্ষেত্রে। অবশ্য ডাক্তারকে নিযে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণও যে হয নি, তা নয। দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যাযের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) জানকী ডাক্তার আক্ষেপ করেছে,—কালীঘাটের কালী যদি তাকে মেযেমানুষ করতো, তাহলে সে সোনার বেনে ও জমিদারদের কাছ থেকে কত রোজগার করতো। কিন্তু অদৃষ্টবশে সে ডাক্তার হযেছে। "পাঁচ বছর মেডিকেল কলেজে নরক ঘেটে মাসে পাঁচটা টাকা পাই না, যেমনি আমার দুর্দশা তেমনি সালের পাকৃড়ি বাদা উকিলদেরও।" এখানে রক্ষণশীলের পক্ষ থেকে প্রহসনকার সংস্কৃতিগত আক্রমণ চালিযেছেন। তবে এ ধরনের দৃষ্টান্তের কথা ছেড়ে দিলে ডাক্তারের আযনীতিগত বাস্তবতাকে সন্দেহ করা চলে না।

ডাক্তার বলতে সাধারণতঃ অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারকেই অবশ্য বোঝানো হযেছে। হোমিওপ্যাথি এবং কোব্রেজী নিযেও দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব আছে, তবে তা অনেকটাই সাংস্কৃতিক। বিশেষতঃ কবিরাজ ছিলেন রক্ষণশীল দলেরই অন্তর্গত। 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায[৩৫] "আযুর্ব্বেদের অবনতির কারণ" প্রবন্ধে

৩৫। আর্য্যদর্শন—অগ্রহাযণ ১২৮৮।

প্রবন্ধকার পতনের চারটি কারণ নির্দেশ করেছেন যথা—সংস্কৃতভাষার পতন, বৈদেশিক রাজ্যশাসন, শাস্ত্রের সংক্ষেপসাধন, ভ্রান্তিপূর্ণ অনুবাদ প্রচলন—ইত্যাদি। অন্য একজনের প্রদর্শিত কারণও প্রাবন্ধিক উদ্ধৃত করেছেন,—"অধুনাতন বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায়, এবং ইংরেজী চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় সাধারণের বিশ্বাস নাই। যে ব্যবসায়ে সাধারণের বিশ্বাস না থাকে, তাহাতে উপযুক্ত অর্থাগমের প্রত্যাশাও থাকে না। অর্থাগমের প্রত্যাশা না থাকিলে তদ্ব্যবসায়ীগণেরও তৎপ্রতি সমাদরের লঘুতা জন্মে। অন্য কেহ সেই দিকে প্রবেশ করে না, এই জন্য ক্রমেই তাহার লোপ পাইয়া আইসে, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ।" কবিরাজগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পতনের ইতিহাস যাই থাকুক, ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় কোথাও কোথাও তাদের বলাৎকারমূলক আয়নীতি বেদনার কারণ হয়েছে এবং প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণেরও জন্ম দিয়েছে।

বাংলার প্রহসনে আর্থিক দৃষ্টিকোণে এই সমস্ত চিকিৎসকের আয়নীতির সঙ্গে অন্যান্য আরও দুর্নীতির প্রসঙ্গও জড়িত হয়েছে। চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের শক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে "মধ্যস্থ" পত্রিকায় লেখা হয়েছে,[৩৬]—"এরূপ আচরণ বা দুরাচরণের শাসন হওয়া উচিত। আইন আদালতে ইহার প্রতীকার হইতে পারে না—সমাজ কর্ত্তৃকই এই সর্ব্বনেশে সামাজিক অপরাধের দমন হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজ আর নিরীহ মেষপাল একই কথা। বচন ভিন্ন আমাদের কার্য্য নাই। সেই বচনও যদি যথোপযুক্ত প্রণালীতে পরিচালিত হইতে থাকে, তবে তাহা সামান্য অস্ত্র নহে। চতুর্দিগে ইহার মৌখিক আলোচনা হইলেও ডাক্তার ভায়ারা ভীত, লজ্জিত ও সতর্কিত হইতে পারেন। সেই আলোচনার জন্য সংবাদপত্র ও নাটক প্রহসনাদি উপায় যেমন আশু কার্য্যকর সাধন এমন আর কিছুই নয়।"

অন্যান্য —সমাজের বৃত্তির শেষ নেই, সুতরাং সমাজ জীবন প্রসঙ্গে অনেক বৃত্তির প্রসঙ্গই এসে পড়ে। কিন্তু স্বল্প অবকাশে উল্লিখিত বৃত্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশিত দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করা কিংবা সমাজচিত্রে মাত্রানিরূপক আলোচনার স্থান অল্প। সম্ভবস্থলে কিছু কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে।

৩৬। মধ্যস্থ পত্রিকা—আশ্বিন ১২৮২।

অন্যান্য বৃত্তির আয়নীতির প্রসঙ্গে পুলিসের কথা আগে উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা সরকারের সবরকম আনুকূল্য পেয়ে বলপ্রয়োগে অর্থহরণ, উৎকোচ গ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অত্যাচার সহজভাবে সম্পন্ন করেছে। এ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন আলোচনা সত্ত্বেও সরকার পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা সাধারণকে ক্ষুব্ধ করেছে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় আক্ষেপ করে বলা হয়েছিলো,[৩৭] "যাহারা রক্ষকের পদে নিযুক্ত আছে, তাহারাই সর্ব্বভক্ষক হইয়াছে, আমরা পুনঃ ২ সারজন, থানাদার, চৌকীদার প্রভৃতির অত্যাচারের বিষয় প্রমাণ দিয়া লিখিতেছি, তথাচ কর্ত্তা মহাশয়েরা তাহাতে নেত্রপাত করেন না।" বিভিন্ন প্রহসনে পুলিসের বিভিন্ন অত্যাচারের প্রসঙ্গে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ সেনের 'নাপিতেশ্বর' নাটকের (১৮৭৩ খৃঃ) শেষে পুলিসের দুর্নীতি নিয়ে কবিতা আছে,—

"পুলিসে প্রবেশ করি লম্পট ফুলিস্।
প্রহারিছে অত্যাচার কঠোর কুলিশ॥
পুলিসের হাতে পড়ে গেল জাতি কুল।
অকুল সাগরে যেন নাহি পাই কূল॥
পুলিসের সৃষ্টি—সুখ শান্তির কারণ।
অত্যাচার অবিচার হবে নিবারণ॥
ঘুস খায় মেরে ফেলে ঘুষি লাঠি মেরে।
কুলবধূ ফুলমধু অন্বেষণে ঘোরে॥
পুলিশ হয়েছে সব অনর্থের গোড়া।
ছারখার কৈল দেশ যেন ঘর পোড়া॥
অতএব করি নিজ বিক্রম বিস্তার।
পুলিস্ হইতে দেশ করহ নিস্তার॥

লর্ড নর্থব্রুককে সম্বোধন করে যে আবেদনটি বিবৃত হয়েছে, তার মধ্যে সমসাময়িককালের পুলিস দুর্নীতির চিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

অন্যান্য বিচিত্র বৃত্তির বিচিত্র ধরনের আয়নীতির কথা প্রহসনে অসংখ্য। অনেকে ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি গঠন করে এবং তার তহবিল থেকে দুর্নীতিমূলকভাবে অর্থহরণ করে। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "বৌবাবু" প্রহসনে

৩৭। সংবাদ প্রভাকর—৬ই বৈশাখ, ১২৫৬ সাল।

(১৮৯০ খৃঃ) Native Progressing Club-এর কথা নিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে চারুর কথোপকথন হয়।—

"চারু ॥ Subscription আদায় হয় ত ?

রামকৃষ্ণ ॥ Subscription? Early in the month, সব Subscription collect হয়ে যায়। যিনি দিতে বিলম্ব করেন, তাঁর Deposit এর টাকা কেটে নিয়ে দূর করে তাড়িয়ে দিই।

চারু ॥ Members দের Deposit কর্ত্তে হয় নাকি ?

রাম ॥ My dear ! এটা বুঝতে পাল্লে না, Deposit-টেই হচ্ছে Secretary-র লাভ। Rule-এ লেখে যে, Association leave off কল্লে deposit-এর টাকা return করা যায়। কিন্তু কোন দোষ কল্লে সে টাকা Forfit হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য যে, শেষকালে একটা দোষ দেখিয়ে Deposit-টে Forfit করে নিই।

চারু ॥ Policy মন্দ নয়, কিন্তু দেশের উন্নতি হচ্চে কৈ ?

রাম ॥ Vast Progress, long circulate, most number of members are graduate, collect lots of money supporting the···

চারু ॥ Wants of Secretary."

স্বদেশীতেও দৌর্নীতিক আয়নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে। স্বদেশপ্রেমের দুর্বলতার সন্ধান জেনে অনেকে বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করেছে ; প্রহসনকাররা তাদের কথাও তুলে ধরেছেন। অমৃতলাল বসুর "বাবু" নাটকটির (১৮৯৪ খৃঃ) মধ্যে ফটিক এবং ষষ্ঠীর কথোপকথনটি স্মরণ করা চলে।—

"ষষ্ঠী ॥ ফটিক ! পবলিকম্যান হওয়ার একবার কি ঝঞ্ঝাট দেখেছ, পরের কাজ করতে করতেই গেলেম।

ফটিক ॥ কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে ? ছেড়ে দাও না,···তবে কি জান, ছাড়তে পাচ্ছ না, কেমন ? আপনা আপনির ভিতর বল্‌ছি, কাজটা নেহাত বেমুনাফারও নয়।"

বাস্তবিক "পবলিক ফণ্ড" আত্মার্থে ব্যয় করে এইসব "পবলিকম্যান্" স্বদেশপ্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখান। রাখালদাস ভট্টাচার্যের "স্বাধীন জেনানা" প্রহসনে (১৮৮৬ খৃঃ) "পবলিকম্যান্" নেপাল পাওনাদার সিদ্ধেশ্বরকে বলে,—"দেখুন আর একটা পবলিক ফণ্ডের যোগাড় হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সেটা

পুরে উঠ্‌বে। তখন এককালে আপনার সকল টাকা যায় সুদ শোধ কর্ব্বো।" কিংবা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি" প্রহসনে (১৮৮৯ খৃঃ), স্বাদেশিক মহেন্দ্রের কেরানী রমেশ "পবলিক ফণ্ডের" হিসেবের খাতায় যথারীতি লিখে ফেলেছে—মহেন্দ্রের বাজার খরচ দশ টাকা। সে যা দেখেছে, তাই লিখেছে। তখন মহেন্দ্র বলেন,—"তোমাতে আমাতে সেটা একটা tacit contract." বাজার খরচ কেটে ওটা Advertisement-এর খরচ বলে লিখতে বলেন মহেন্দ্র। উনবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের দুর্নীতিও কম নয়।

কমিশনারদের দুর্নীতির কথাও কয়েকটি প্রহসনে চিত্রিত হয়েছে। এগুলোর মূলে হয়তো ব্যক্তিগত তথা সাংস্কৃতিক আক্রমণ আছে, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ মেনে নিলেও বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "পোঁটাচুন্নির বেটা চন্নরবিলেস" প্রহসনে" (?) কমিশনার চন্নরবিলেস করদাতাদের ডেকে বলেছে,—"আমি গ্রামের ভোট পাই নি, এক্ষণে সরকারী কমিশনার, আমার ক্ষমতা অনেক, আমাকে সন্তুষ্ট রাখ, তোমাদের মঙ্গল· · ” ইত্যাদি। তখন একজন করদাতা বলে,—"আমরা তা কি আর জানি নে? সেবার রমজান বড়িলি দেয় নি বলে তার এবার দু পয়সার জায়গায় দু আনা টেক্স হয়েছে, আর সেদিন কাসিম বেগুন দেয় নি বলে তার বেড়া নিয়ে কত গণ্ডগোল হলো। আর একদিন মুকুয্যে বামুনের পাচিলটে নিয়ে কি নাজেহাল কল্লে, আমরা চক্ষে দেখেছি চেয়ারম্যানকে একেবারে বোকা করে, যা তুমি বল্লে, তাই করিয়ে নিলে।'

বিভিন্ন ধরনের দালালদের আয়নীতি নিয়ে প্রহসনে যথেষ্ট কটাক্ষ দেখা যায়। গ্রাম্য দলাদলির মাধ্যমে এক ধরনের লোক নিজের কাজ হাসিল করে। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "ভণ্ড দলপতি দণ্ড" প্রহসনে (১৮৮৮ খৃঃ) এ ধরনের একজন ব্রাহ্মণ ধর্মদাস তার স্ত্রীর কাছে তার আয়নীতির কথা প্রকাশ করে বলেছে,—"দূর ক্ষেপী, তা কেন? একটা দলাদলি বাধলেই আমার উভয় পক্ষ হতেই বিলক্ষণ লাভ হবে। দেখ এম্‌নি করেই দুই হাতে টাকা কুড়াব।" কাপ্তেন শিকারী মোসাহেবের কথা একই প্রহসনে প্রকাশ পেয়েছে। এই মোসাহেবরা বাবুয়ানার সব রকম ইন্ধনেরই দালালী করে মোটা টাকা রোজগার করে এবং বাবুকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে তোলে। মোসাহেব কেনারাম স্বগতোক্তিতে বলেছে,—"আমি তোমারও অনুগত নই

আর তোমার বাবারও অনুগত নই। তবে আমি যার অনুগত, সে তোমার সিন্দুকে দিনকতকের জন্য বাসা নিয়েছে, এইমাত্র তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক।" এই গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত গোয়ালিনী, মালিনী, নাপ্তেনী, বৈষ্ণবী ইত্যাদি কুট্টনীর কথা এবং তাদের আয়নীতির কথা প্রহসনের অনেকক্ষেত্রে প্রসঙ্গ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এদের চাইতে সাংস্কৃতিক দিক থেকে একটু মর্যাদাসম্পন্ন ঘটকগোষ্ঠীর আয়নীতির প্রসঙ্গ অধিকাংশ বিবাহ সম্পর্কিত প্রহসনেই দেখা যায়। অর্থলোভে এরা পাত্র-পাত্রীর বিবাহ যৌন আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও ঘটাতে ইতস্ততঃ বোধ করে না। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "বৌবাবু" প্রহসনে (১৮৯০ খৃঃ) ঘটক বলেছে,— "আমরা না পারি এমন কাজই নাই। সব দলেই আছি।

ঘটক ঘোটকশ্চৈব ধাবন্তি স নানা দেশে।
অন্ধ খঞ্জ সুপাত্রাণাং দদতে কুমারী সহঃ॥

কত মুচীর ছেলে শর্ম্মারামের হাতে পড়ে শুচি হয়ে গেল, কত বামুনের মেয়ে কায়েতের ঘরে, কায়েতের মেয়ে শুঁড়ির ঘরে চালিয়েছি, তার আর ইয়ত্তা নাই। আবার—

বনামন্ত্র বিনাতন্ত্র নব্য পুরোহিতং স চ।
বরাঙ্গনা দেবী পূজনে গৃহিতঞ্চ টাকা সিকি॥

আমরা সর্ব্বঘটেই বিদ্যমান।" এ ধরনের আরও প্রচুর বৃত্তি ও আয়নীতির উল্লেখ পাই। প্রহসনে সেগুলোর গুরুত্ব বা অবকাশ কম থাকায় উপস্থাপনা নিষ্প্রয়োজন।

বৃত্তিগত আয়নীতি নিয়েই আলোচনা করা হলো। ব্যয়নীতি নিয়ে আলোচনায় বৃত্তির সম্পর্ক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাবুয়ানা, লাম্পট্য ইত্যাদি অপব্যয় ও দৌর্নীতিক ব্যয় নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং এটি ব্যয়নীতি আলোচনার ক্ষেত্রও নয়। আয়ব্যয় নীতির সম্পর্কে অন্যান্য বক্তব্য "বিবিধ" শীর্ষক আলোচনায় সম্ভব মতো উপস্থাপন করা হয়েছে।

ডাক্তারী ॥ —

ডাক্তারবাবু (কলিকাতা—১৮৭৫ খৃঃ)—'জনৈক ডাক্তার' (ভুবনমোহন সরকার)॥ ভূমিকায় প্রহসনকার লিখ্‌ছেন,—"ডাক্তার হইয়া ডাক্তারদিগের দোষগুণ বর্ণনা করিতে স্বভাবতঃই চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হইতে পারে, আমি এই

নিমিত্ত আত্মগোপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে আমি গৃহচ্ছিদ্র কেন প্রকাশ করিলাম। আমার উত্তর এই যে, আমি সমাজকে আমার সহযোগীদের অপেক্ষা অধিকতর যত্নের সামগ্রী বলিয়া মনে করি। আমি যতদূর দেখিযাছি তাহাতে আমার ইহাই বোধহয় যে, ডাক্তারেরা অনেকেই আপনাদিগকে সাধারণ সমাজের অপেক্ষা কিয়ৎদূর উচ্চ পদবীর বলিয়া মনে করেন, এবং সমাজও ঐরূপ ভাবিয়া তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই হউক, বা যে কারণেই হউক, কেহ কেহ, রোগীদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হন।" প্রহসনকার গ্রন্থটির উদ্দেশ্যমূলকতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন,— "এস্থলে ইহাও বলা কর্তব্য যে, আমার নাটক বাস্তবিক নাটক হইল কিনা, আমি সে বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখি নাই. আমি কেবল ইহাই দেখিযাছি যে, আমার নাটকে ঘটনাসকল প্রকৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।" (কলিকাতা, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২)। প্রহসনকার গ্রন্থশেষে ভট্টাচার্যের মুখে একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়েছেন, তাতে ডাক্তারের দৌর্নীতিক আসের কথা বলা হয়েছে।—

'কিবা ফন্দি ডাকতারি, বলি হারি যাই,
এ হেন শুঁড়ি ভায়াব, মুখে দিলে ছাই।
নাহি লাগে ঘুসঘাস, নাহি লাইসেন্,
ডজন ডজন আসে, ব্রাণ্ডি শ্যামপেন।
মদকে ওষুধ বলে বেচে দিনরাত,
চেয়ে থাকে এক্সাইস্, গালে দিয়ে হাত।
বাপের একাউন্টে ছেলে মদ খেয়ে বাঁচে,
রসিদে এসেন্স লেখে, ধরা পড়ে পাছে।
শুঁড়িখানা রাতে বন্ধ, আছে আইন জারি,
কত ভায়া তরে যায়, পেয়ে ডিস্পেন্সারি।"

প্রহসনকার সমর্থনপুষ্টির জন্যে প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী কতকগুলো যৌন দিক উপস্থাপিত করেছেন। এগুলো ছেড়ে দিলে মোটামুটি বৃত্তিগত আসনীতিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

কাহিনী।—বিনোদবন্ধু হালদার সেকেণ্ড গ্রেডে ডাক্তারী পাশ করেছে। তার গর্বের অন্ত নেই। সে ভাবে প্র্যাকটিস্ করবে। নবীন তাকে "সার্জিন"

'এণ্টার' করতে বল্‌লে সে বলে, প্রথমতঃ কোথায় ঠেলে দেবে, দ্বিতীয়তঃ অল্প মাইনে, তৃতীয়তঃ সারজেনের অধীনে হুকুমের চাকরের মতো কাজ করতে হবে; চতুর্থতঃ প্রাইভেট প্রাক্‌টিসের সুবিধে নেই। নন্দের কথায় শেষে বিনোদ ডিস্‌পেন্‌সারি খোলে। অবশ্য সেটাও তার মনঃপূত ছিলো না। "আমার বিবেচনায় ডাক্তারদের ডিস্পেন্‌সরি করা উচিত নয়। ডাক্তার হয়ে দোকানদারী করা ভাল দেখায় না। বিলাতী ঔষধ ব্যবসায়ীরা Apothecary, physician নয়।" যাহোক অবশেষে বিনোদ ডাক্তারখানাই খোলে। তারপর সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে উমেদারী করে— যাতে তাকে ডাকে। নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ী বিনোদ উমেদারী করতে গেলে নীলকণ্ঠবাবুর বন্ধু বসুজ বলেন, ডাক্তার উমেদার এই প্রথম দেখ্‌ছেন।

শ্যামবাজারে বিনোদের ডাক্তারখানা। হরিশকে কম্পাউণ্ডার করে বিনোদ ডাক্তারখানা সাজানোতে মন দেয়। বিনোদ বলে,—"ওষুধ যত থাক্ আর না থাক ভড়ংটা চাই।" জমাদার অর্থাৎ দরোয়ানকে সে খদ্দের ধরার কায়দা কানুন শিখিয়ে দেয়। মদের বোতলে ওষুধের লেবেল লাগায়। আবার দরজায় লিখে দেয়,—"Medical Advice gratic from 8 to 9 A. M."— এতে লোকে ডাক্তারকে খুব দয়ালু ভাববে। কিন্তু পরামর্শ করতে এলেই ওষুধ না কিনে তারা পার পাবে না—এটা সে জানে। ডাক্তারখানার নাম দেওয়া হলো—The New British Indian Medical Hall. ওষুধ তৈরীর ঘরে No Admittance লেখা। এতে বাইরের ভড়ং বজায় থাকবে, তাছাড়া ভেতরের জলীয় কাণ্ডকারখানা খদ্দেরদের অজানা রইবে। বন্ধুবান্ধবদের কপট খরিদ্দার সাজিয়ে বিনোদ ডাক্তাখানায় সব সময়েই ভিড় করে রাখে। কৃষ্ণ ডাক্তারকে বিনোদ হাত করার চেষ্টা করে যাতে তাঁর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনগুলো সব তাঁর নির্দেশে এই ডাক্তারখানায় আসে। তিনি বল্‌বেন, অন্য ডাক্তারখানায় ভেজাল ওষুধ, এরা খাঁটি দেয়।

কৃষ্ণ ডাক্তার মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত। তার কাছে কোনো রোগীই আসে না। দু একজন যারা আসে, তাদের জল ও কুইনাইন কিংবা ফিট্‌কিরি দুই/তিন টাকার ওষুধ বলে prescribe করে দরমাহাটার ডাক্তারখানায় পাঠায়। দরমাহাটার ডাক্তারখানার সঙ্গে তার কমিশনের বন্দোবস্ত আছে। রোগীদের কথাবার্তায় জানা যায়, এদের অবনতি ছাড়া আরামের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে বিনোদ এসে টাকার লোভ দেখিয়ে তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে।

কৃষ্ণও আগেকার চুক্তি অতিসহজেই ভেঙে দিয়ে বিনোদের কথায় রাজী হয়। বিনোদ তাকে রোজ আধবোতল মদ খাওযাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কৃষ্ণ ডাক্তার স্ত্রী স্বাধীনতার ধূযো তুলে ডাক্তারখানায় মদের আনুষঙ্গিক হিসেবে 'মেয়েমানুষ' নিয়ে ডাক্তারখানায় যাবার প্রস্তাব করে। বিনোদ অগত্যা স্বীকৃত হয়।

বিনোদ ওষুধের ব্যবসাতে দ্রুত উন্নতি করে ফেলে। নন্দ বলে, "মদ বেচেই আণ্ডিল হযে গেল।" মন্তপ কুমারকৃষ্ণ চিঠি লিখে বিনোদের ডাক্তারখানা থেকে প্রাযই মদ আনায। কুমার তার বন্ধুকে সগর্বে বলে,—"কেমন পন্থা বল? ধরতে ছুঁতে নাই। টাকা চাই নে, পযসা চাইনে, কেবল এক কলম কালীর ওযাস্তা। বাবা টের পান না, ওষুধের বিলের সামিল চলে যায, শুঁড়ির খোসামোদ নাই, যে আনে, সে পর্য্যন্ত টের পায না।" কেন না কুইনিন মিক্শ্চারের লেবেল আঁটা। ভবানীর তথ্যে প্রকাশ পায যে ডিস্পেন্সারিওযালারা ওষুধের মেমো দিযে মদ বিক্রী করে। তাছাড়া "মদের রসিদে নালিশ চলে না ব'লে ডিস্পেন্সারিওয়ালারা কোন ওষুধ বা এসেন্সের নাম রসিদে লিখিযে নেয।"

ডাক্তারখানায বসে বিনোদ রোগী দেখে। সামান্য জিনিস দিযে অসম্ভব দাম চায়। যথা ৩০ গ্রেণ ফট্‌কিরি আর ১২ আউন্স জল লিখে কম্পাউণ্ডারকে মিকশ্চার তৈরী করায এবং দেড টাকা দাম চায। রোগীর চোখ উঠেছে। বিনোদ বলে,—"দু ফোঁটা করে দিন দুচ্চায় চোখে দাও গে, সেরে যাবে।" রোগী বলে.—"আজ্ঞে, তবে এতখানি ওষুধ নিযে আমি কি করবো? এযে আমার সাত পুরুষের চোকে দিলেও ফুরুবে না।" কিছু কমিযে দিতে বলে। তখন রেগে গিযে বিনোদ বলে,—"যা পেযেছ নে যাও না, দেক কর কেন? তুমি কি আমার চেয়ে বোঝো?" সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে যারা মাগ্‌নায পরামর্শ নিতে আসে, তাদের বিশেষ সুবিধা হয না। একজন অসুখ পরীক্ষা করিযে prescription লিখিয়ে নেয়। অবশেষে বলে. তার মনিবের ডাক্তারখানায এমনিতেই সে ওষুধ পাবে। তখন বিনোদ ডাক্তার prescription-টা ছিঁড়ে ফেলে বলে ওঠে,—"এখান থেকে যদি ওষুধ না নেবে, তবে কেন লোককে নাহক ত্যক্ত করতে আসো?" একটা বেশি দামের prescription এসেছে। সার্ভ করতে গিয়ে ডাক্তারকে কম্পাউণ্ডার বলে, —"লাইকার ইষ্ট্রিক্‌নাইন্ টে নাই।" বিনোদ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে,—"আঃ ৮ মও যেমন, কতটা লিখেছে দেখি, বিশ ফোঁটা বৈ ত নয়, তার জন্যে আর

ভাব্চ কি ; ওটা না দিলে কেউ ধরতে পারবে না, ওর রংও নাই, গন্ধও নাই। আড়াইটে টাকা কি ছেড়ে দেওয়া যায়—আর ফিরিয়ে দেওয়াতেও অপযশ আছে।" একজন লোক তিন টাকা দামের prescription নিয়ে ভুল করে এই ডাক্তারখানায় চলে আসে। তার ভুল না ভাঙিয়ে prescription সার্ভ করে বিদায় দেওয়া হয়।

অবশেষে ডাক্তারখানায় বসে হরিশ ও বিনোদ খদ্দের ধরবার নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করে। বিনোদ ডাক্তার বলে,—"অনেক prescription পথে মারা যায়। এটা দূর করতে গেলে prescription এন্‌ভেলাপে পুরে সেঁটে দিয়ে আমাদের ডাক্তারখানার নাম লিখে দিতে হবে।" আবার বলে,—prescribe করা ওষুধের এমন নাম ডাক্তার দেবে যাতে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারই শুধু সেটা বুঝতে পারে। যেমন "আমার অমুক আরক" "অমুক পুরিয়া" ইত্যাদি। শেষে স্থির করা হয়, ল্যাটিন ভাষায় prescription করবে—যাতে অন্য ডাক্তারখানার লোকেরা ওষুধ দিতে না পারে। যেমন My Quinine Mixture না লিখে Mist Quinse লিখবে, My Fever Mixture না লিখে Mist Febris লিখ্‌বে। তবুও ধরা পড়বার ভয়। শেষে স্থির করে Quinine-এর বদলে Pulv Albi লিখ্‌বে। তারপর এক গরীব রোগী দেখে ব্যাপার ভেবে বিনোদ ডাক্তার সাধারণতঃ তাকে অন্যত্র যেতে পরামর্শ দেয়। কোনো অনুনয়ই শোনে না।

ডাক্তারীতে সর্বত্রই দুর্নীতি আর দুষ্কর্ম। নবীন বলে, যত সভ্যতা বাড়ছে, ততো দুষ্কর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে। লেখাপড়া শিখ্‌লে হবে কি, hypocrisy আর dishonesty-তেই খেয়ে দিয়েছে। এদের শাস্তি দেবার বা সমাজচ্যুত করবার উপায় নেই। "এরা এলে লোকে উঠে দাঁড়াতে পথ পায় না। তার কারণ কেহ বা বড় মানুষ, কাহার বা উচ্চপদ, কাহারও Public life অত্যন্ত brilliant, সুতরাং লোকে এদের খাতির না করে থাকতে পারে না।" কথা প্রসঙ্গে মন্মথ ডাক্তারের কথা ওঠে। মন্মথ ডাক্তার মদ্যপানের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে। মর্যালিটির উপর বক্তৃতা দেয়, কিন্তু স্বয়ং লম্পট, মদ্যপ এবং বেশ্যাসক্ত। সর্বপরিচিত দুশ্চরিত্র নন্দ বলে,—মন্মথ তার "এক সান্‌কির ইয়ার"। "তোমরা তার একদিক দেখেছ, আমি তার দুদিক দেখেছি ; বোতল বোতল মদ উড়াতেও দেখেছি, আবার মদের বিপক্ষে তা ফুলিস্কেপ লিখ্‌তেও দেখেছি।"

নীলকণ্ঠবাবুর মেয়ে হেমলতার অসুখ। খাবারে অরুচি। পেটে ব্যথা—পেটে ডেলা পাকিয়ে ওঠে, বুক সেঁটে ধরে। মন্মথকে ডাকা হয়। মন্মথ ডাক্তার তাকে চিৎ করে শুইয়ে পেট দেখে, এবং বুকও যথাসম্ভব চিকিৎসাপদ্ধতি বহির্ভূতভাবে হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে পরীক্ষা করে। ডাক্তারের কাছে সব সইতে হয়—এই ওজুহাতে এবং নীলকণ্ঠবাবুর স্ত্রী রেবতীর সমর্থনে—মন্মথ যথেচ্ছভাবে হেমলতার স্পর্শসুখ অনুভব করে। ডাক্তারকে অনেকক্ষণ ধরে যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করতে দেখে নীলকণ্ঠবাবুরও আনন্দ হয়। ডাক্তার বলে, কাল আবার দেখে ওষুধ দেবে। ডাক্তারের হাবভাব মেয়েদের মনে একটু সন্দেহ জাগায়। সাধারণতঃ পুরুষ মানুষ না থাকা অবস্থাতেই মন্মথ ডাক্তার রোগীর বাড়ী বেশি যাতায়াত করে। এরকম এক সময় দেখে মন্মথ নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ী একদিন যায়। হেমলতা তখন অনেকটা সুস্থ। ভাত খেয়েছে। বাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই। রেবতীর শরীরও সুস্থ নয়। মন্মথ ডাক্তার অহেতুক এসেছে হেমলতার খোঁজ নিতে। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তথা কামপরবশ হয়ে। হেমলতা কৃতজ্ঞতার স্বরে বলে যে তার মিছিমিছি আসবার দরকার নেই, সে ভালোই আছে। সৌদামিনী নামে বাড়ীর ঝি-টি সামনে ছিলো। সে থাকলে মন্মথ-র কার্য সিদ্ধি হয় না। তাই তাকে মন্মথ জল আনতে পাঠায়। এবার নির্জনে হেমলতাকে পেয়ে মন্মথ হেমলতার গায়ে হাত দিয়ে প্রেমালাপ করতে যায়। মন্মথ উদ্দেশ্য সৎ নয় বুঝতে পেরে হেমলতা মন্মথকে সজোরে চপেটাঘাত করলো। হেমলতার চীৎকারে সবাই ছুটে আসে। মন্মথর স্বরূপ সবাই তখন চিনে ফেলে। সবাই তাকে ধিক্কার দেয় এবং ঘরে আটকিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে হেমলতার ভাই কুমারকৃষ্ণ এসে সব শুনে মন্মথকে উত্তম মধ্যম দেয় এবং তার আদেশে মন্মথ নাকে খৎ দেয়। মেয়েরা তখন মন্তব্য করে, মানুষ চেনা দায়।

কুমারকৃষ্ণ মদ্যপ। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। নীলকণ্ঠ ডাক্তারের prescription নিয়ে চাকরকে দিয়ে ওষুধ আনাতে দেয়। ডাক্তারখানায় ওষুধ পাওয়া গেলো না। কারণ ঐ prescription পড়ে কম্পাউণ্ডার কিছু বুঝতে পারে নি। নীলকণ্ঠ দেখেন prescription লেখা অস্পষ্ট কিছু নয়। তখন তিনি বাঙালী কম্পাউণ্ডারদের দোষ দেন। এই কম্পাউণ্ডারটিকে তিনি চাকর দিয়ে ডাকতে পাঠান। কম্পাউণ্ডার এসে বিনোদের সব কারচুপি ফাঁস করে দেয়। তারপর যখন বিনোদ আসে, তখন বিনোদকে তিনি তার এই

হীনপন্থার জন্যে ধম্‌কান। নীলকণ্ঠের ভাইপো অখিল উকিল। বিনোদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করবার জন্যে নীলকণ্ঠ অখিলকে বলে। অখিল বিনোদকে গালাগালি দিয়ে এবারের মতো ক্ষমা করে।

বিনোদ নিজের বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে। নবীন ইত্যাদি কয়েকজনের ডাক্তারদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা ছিলো, কিন্তু বিনোদের কথায়, তা ভেঙে যায়। বিনোদ বলে,—"আমি ত আর মেয়েমানুষ নই যে লোকের দুঃখ দেখে কাঁদব। ডাক্‌লে গেলেম, ব্যবস্থা করলেম, টাকা নিয়ে চলে এলেম, তার আবার ভাবনাই বা কি আর দুঃখই বা কি? রোগী বাঁচবার হয় বাঁচবে, মরবার হয় মোরবে, তবে যেগুল শীঘ্র মরে, তাদের জন্যে একটু আপ্‌সশ্‌ হয় বটে, যে তারা আর কিছুদিন বাঁচলে, দশ টাকা আরও পেতেম।" কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তারের দাঁওয়ের কথা বলে নন্দ জিজ্ঞাসা করে,—"ডাক্তারিতে আবার দাঁও কি হে?" বিনোদ বলে,—"বিলক্ষণ, দাঁও ছাড়া কি ব্যবসা আছে? তেমন বড মানুষের নজরে যদি পডা যায়, আর যদি তেমন মুরুব্বির জোর থাকে, তাহলে আর আমাদের পায় কে? লেখাপড়া শিখ্‌লেও হয় না, সৎ হলেও হয় না, আমাদের পড়তাই হল আসল।" Consultation-এর জন্যে যে ইংরেজ ডাক্তার ডাকা হয়, তাদের সঙ্গে বখরার প্রসঙ্গে—বিনোদ বলে, "টাকা নগদ দেয় না, তবে কি জান, বেশী ভিজিট দিতে পারলে তারা আমাদের কেছু বাধ্য থাকে, আর পাঁচ জায়গায় সুখ্যাতও করে।" সাহেব ডাক্তাররা এসে প্রায়ই রোগ শক্ত বলে গৃহস্থকে কেন ভয় দেখায়, তার কারণ বল্‌তে গিয়ে বিনোদ বলে,—"ওটা আমাদের পলিসি, প্রথম থেকে রোগটা শক্ত বলায় অনেক লাভ আছে; যদি আরাম হয়, লোকে বল্‌বে খুব শক্ত ব্যারাম আরাম করেছে, আর যদি মারা যায়, তাহলেও লোকে বড আমাদের দুষবে না, বল্‌বে আয়ুর্দায় ছিল না, মারা গেছে, আর প্রথম থেকে সহজ বলে, যদি রোগী মারা যায়, তাহলে লোকে বল্‌বে, ডাক্তারটা কি মূর্খ!" মদ্যপান অভ্যাস করলে বড়ো সার্কেলে মেশা যায়, তাই ডাক্তারদের নাকি মদের অভ্যাস থাকা ভালো। সর্বদা ব্যস্তভাব দেখানো ভালো, তাহলে লোকে ভাববে বড়ো ডাক্তার—অনেক রোগী অপেক্ষা করছে।

কৃষ্ণ ডাক্তার একদিন একটা বেশ্যাকে পুরুষ সাজিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে আসে—তার বন্ধু পরিচয় দিয়ে। প্রাইভেট রুমে যেখানে মদ্যপান চল্‌ছিলো, একেবারে সেখানে তাকে এনে বসানো হয়। সকলেই নবাগতের

সঙ্গে আলাপ করে। একটু আধটু সন্দেহ হয় অনেকের। এমন সময় এক অচেনা খদ্দের এসে ব্রাণ্ডি চায়। বিনোদ ছিলো না। কম্পাউণ্ডার হরিশ পাঁচ টাকার লোভে এক বোতল ব্রাণ্ডি বার করে দেয়। খদ্দেরকে পুলিশে ধরে। খদ্দের তখন দোকান দেখিয়ে দেয়। কান্নাকাটি করে খদ্দের ছাড়া পায়। সার্জেন্ট পাহারাওয়ালাকে দোকানটার ওপর নজর রাখতে বলে।

বিনোদের অবশেষে ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হলো। অধঃপতনও চরমে দাঁড়ালো। এক বিধবার শিশুপুত্র নষ্ট করে দেবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভে কাজে নামলো। কিন্তু তখন তার দুঃসময়। যাদের কাছে সে মাল নিয়েছে, পাওনার জন্যে তারা তাগাদা দিচ্ছে। অথচ বড় মানুষদের সকলকে সে ধারে ঔষধ আর মদ সরবরাহ করেছে। এদিকে বাবাও মাল দেওয়া বন্ধ করেছে। নীলকণ্ঠবাবুও সকলের কাছে তার স্বরূপ জানিয়ে পসার নষ্ট করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বিনোদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ হয়। একজন স্ত্রীলোক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করে যে, ব্রজদুলালবাবুর পরামর্শে বিনোদ ডাক্তার বিষ খাইয়ে তার ছেলেকে হত্যা করেছে। বিনোদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। সে নন্দকে হাতে ধরে বলে,—"যত টাকা লাগে আমি দেব, তুমি ভাই এ দায় থেকে আমায় উদ্ধার করে দাও।" কিন্তু নন্দ তাকে আর আশ্বাসের বাণী শোনাতে পারে না। হতাশ করে দেয় সম্পূর্ণ। বিনোদ তখন কৃতকর্মের জন্যে আক্ষেপ করে। ইতিমধ্যে সার্জেন্ট ও পাহারাওয়ালা এসে বিনোদকে ধরে নিয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু (১৮৯০ খ্রীঃ)—রাজকৃষ্ণ রায়। এই প্রহসনেও ডাক্তারের দুর্নীতিমূলক আয়নীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হলেও, যৌন ও সাংস্কৃতিক দিক তুচ্ছ নয়। তবে প্রদর্শনীর সুবিধার জন্যে এখানেই এটি উপস্থাপন করা যুক্তি সঙ্গত।

কাহিনী —শ্যামপুরের নিতাই মুদী ধার্মিক, কিন্তু ব্যবসায়ে পোক্ত। বাবাজীকে, নেড়ানেড়ীকে এক আনা পর্যন্ত দেয়, অথচ আধ পয়সার নুনও ধারে ছাড়ে না। একটা ক্ষুধার্ত ছোটো মেয়ে একটু মুড়ী চাইলে, তাকে দিয়ে পাকা চুল তুলিয়ে নিয়ে তারপর মুড়ী দেয়। কালীচরণ নিতাইয়ের আত্মীয়। সে এসে খবর দেয়, নিতাইয়ের দাদা গৌর প্রায় মরো-মরো। গৌর থাকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে জগৎপুর গ্রামে। নিতাই এ গাঁয়ের ভজহরি কোবরেজের

কথা তোলে। সে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। তাকেই নিয়ে যেতে হবে। হাতুড়ে জয়-ডাক্তার দেখছে। তাকে বিশ্বাস নেই। কালীচরণকে নিয়ে নিতাই কোবরেজের বাড়ী পা বাড়ায়।

ভজহরি কোবরেজ চণ্ডীমণ্ডপে বসে রোগী দেখছে। একজনের মাথা ধরেছে। তাকে ভজহরি বলে,—"হুঁ, এ দেখছি গন্ধর্বরাজ সান্নিপাতিকের লক্ষণ, এ রোগে যমদণ্ড-প্রহার মোদক ব্যবস্থেয়। যমদণ্ড-প্রহার মোদক আমার প্রধান ঔষধ, এর অপর নাম সর্বজীবন্ধ।" দামের কথায় ভজহরি বলে,—"হাতে রেখে বলবো না ঠিক বলবো?" ভজহরি কথাটা বুঝিয়ে বলে,—"ওরে বাবু! কবিরাজ, বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিমেরা টিপ রেখে রোগীর চিকিৎসা করে। যে রোগটা এক তিল, তাকে তাল করে রোগীর অর্থশোষণ করে। আবার যে রোগটা আট আনা, একটি করে ঔষধ খেয়ে সাতদিনে সেরে যেতে পারে, সে রোগটাকে তিন-চার মাস ঔষধ খাইয়ে হপ্তায় হপ্তায় টাকা লোটে, একেই বলে হাতের টিপ।" শেষে কোবরেজ রোগীকে এক টাকা পাঁচ আনা নিয়ে ওষুধ দেয়। আর এক রোগীর পা ফুলেছে। অসুখ যখন পায়ের, তখন হাতের নাড়ী টিপে লাভ নেই বলে কোবরেজ পা টিপে দেখেন। তারপর বলেন, রোগী নিশ্চয়ই দইয়ের সঙ্গে ঘোল মিশিয়ে খেয়েছে। কোবরেজের অনুমান প্রায় ঠিক বলে রোগী স্বীকার করে যে, সে দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে খেয়েছে। কোবরেজ বলে,—ও একই কথা। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' বলে দুধে ঘোল মিশিয়ে খাবার নির্দেশ দেয় কোবরেজ। সে তাকে একটা বড়ি দেয়—"পঙ্গু চূড়ামণি বটিকা।" শুকনো শালপাতার রসের সঙ্গে মেরে খাওয়াতে হবে। শুকনো শালপাতা থেকে রস বার করবার কথায় রোগী অবাক্ হলে ভজহরি বলে, দু আনা ধরে দিলে সে নিজেই সেই রস করে দিতে পারবে। শুকনো থেকে রস নিঙড়িয়ে বের করা তার কৃতিত্ব, পেশাও বটে।

নিতাই এসে ভজহরিকে তার দাদার অসুখের কথা বলে। ভজহরি বলে,—"গো-বদ্দি গো-ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে কি রোগ ঠাওরানো যায় বাপু? আমি ভিন্ন অন্য কে তন্ন তন্ন করে রোগ ঠাওরাতে পারে?" যাহোক অনেক ধরা কওয়ার পর কোবরেজ ষোল আনার জায়গায় পৌণে ষোল আনা নিতে রাজী হয়। শ্যামপুর থেকে জগৎপুর আট ক্রোশ। স্বতন্ত্র পাল্কী ভাড়া এবং দর্শনী, সেই সঙ্গে ওষুধের খরচা—সব নিয়ে সে পনের টাকা চায়।

নিতাই বলে, টাকার জন্যে ভাবনা নেই, তবে রোগ ভালো হবে তো? ভজহরি গর্বের সঙ্গে বলে, তার ওষুধে রোগী অরোগী—সবাই সারে।

এদিকে জগৎপুরে একটি ঘরে নিতাইয়ের ভাই গৌর যন্ত্রণায় কাতরায়। তার স্ত্রী নিস্তারিণী তাকে হাওয়া করে। জয় ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিলো। জয় ডাক্তার আসে। নিস্তারিণী আড়ালে যায়। ডাক্তারকে দেখে গৌর মুখভঙ্গি করে যন্ত্রণা জানালে জয় ভাবে, এবার তাহলে তার ওষুধ লেগেছে। গৌরকে মেরে ফেললে নিস্তারিণী তার বশে আসবে। পাশের ঘরে নিস্তারিণীকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুনে জয় ডাক্তার মনে মনে ভাবে,—"এইবার ও আমার ফাঁদে পড়েচে। ধন্য আমার ডাক্তারী শিক্ষা! ধন্য ইংরাজের মেডিকেল কলেজ স্থাপন!" গৌরের নাড়ী দেখে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে জয় একটু জোরে হাঁক দিয়ে বলে,—"ইস্, তাই তো, বড গোলযোগ যে। ওগো, ও ঘরে আছ কে, শোন, গতিক বড় ভাল নয়, এই এখন সন্ধ্যে, বোধহয় নটা দশটার মধ্যেই—তাইতো, আহা, লোকটা বড় ভাল ছিল।" ডাক্তার যাবার ভান করে! নিস্তারিণী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ডাক্তারের পায়ে পড়ে। ডাক্তার ভাবে,—"ওঃ! ছুঁড়ী কি সুন্দরী, যেন অপ্সরী। মুখখানি যেন ঢলঢলে পদ্মফুল ঘোমটা ফুটেও আভা বেরুচ্ছে; চোখ দুটি ফুটে জল বেরুচ্ছে, আমার চোখে বোধ হচ্চে যেন ফোটা পদ্মে শিশির বিন্দু।" নিস্তারিণীকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে ডাক্তার তাকে তার উদ্দেশ্য জানায়। "তুমি বড় সুন্দরী, আমি তোমাকে তেমন ভালবাসি, তুমি যদি আমাকে তার শতাংশের একাংশও ভালবাস, তাহলে আমি আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে পাই।" এ কথায় নিস্তারিণী ভয়ে লজ্জায় আরো ফুঁপিয়ে কাঁদে। ডাক্তার তখন তার হাত ধরতে যায়। সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। ঠিক এমন সময় নিতাই আর কালীচরণ ভজহরি কোবরেজকে নিয়ে আসে। বাইরের দরজায় নিতাইদের গলা শুনে ডাক্তার ভয় পেয়ে ঘরের তক্তপোষের তলায় আত্মগোপন করে। নিতাই ঘরে ঢুকে বড়বৌকে অজ্ঞান দেখে তার চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান করায়। জ্ঞান পেয়েই নিস্তারিণী প্রলাপের ঘোরে অত্যন্ত ভয়ের স্বরে বলে ওঠে,—"ডাক্তারবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছুঁয়ো না।" একটু ধাতস্থ হয়ে তখন নিস্তারিণী তার করুণ কাহিনী বলে যায়। নিতাই খুব রেগে যায়। ডাক্তারের খোঁজ করে। পালাবে কোথায়, বাইরের পথে তো তারাই আছে। ঘরেই নিশ্চয় কোথাও লুকিয়েছে! তবে

পালিয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। ভজহরি মন্তব্য করে,—"তা আশ্চর্য নয় বাপু, ডাক্তারগুলো সবই পারে ; ওরা যখন বোতলের ভিতর থেকে হাওয়া বার কোত্তে পারে, তখন নিজেরাও যে বেমালুম হাওয়ায় মিশে যাবে, তার সন্দেহ কি ?" হঠাৎ জয় ডাক্তার তক্তপোষের তলা থেকে হেঁচে ফেলে। সঙ্গে তক্তপোষের তলায় ডাক্তারকে দেখে নিতাই আর কালীচরণ তাকে টেনে বার করে। তারপর চলে গালিগালাজ এবং ক্রমাগত মার। মারের চোটে জয় ডাক্তার বলে,—"দোহাই নিতাই আমার ঘাট হয়েচে। আমায় মাফ্ কর, আর এমন কর্ম্ম করবো না, আমি ডান হাতে কোরে গু খেয়েচি।" নিতাই তাকে নাকে খৎ দেওয়ায়। নিতাইয়ের কথায় নিস্তারিণীকে জয় ডাক্তার মা বলে ডাকৃতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়। গৌরকে জয় ডাক্তার বাবা বলে ডাকে, নিতাইকে খুড়ো বলে ডাকে, আর কালীচরণকে বোনাই বলে ডেকে তারপর রক্ষা পায়। তখন নিতাই তাকে লাথি মেরে ঘর থেকে বার করে দেয়। জয় ডাক্তার আক্ষেপ করে বলে,—"আজ আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! সতীর অপমান যারা করে, তাদের ভাগ্যে এইরূপ পদাঘাত। আমার মতন যারা তারা সাবধান হও।"

ঠেঙ্গাপাথিক ভুঁইফোড় ডাক্তার (১৮৮৭ খৃঃ)—কুঞ্জবিহারী দেব॥ অশিক্ষিত চরিত্রহীন, নীতিহীন এক লম্পট যুবক ছিলো। একবার দূরের এক গ্রামে সে গিয়ে নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিয়ে সেখানে পসার নিয়ে বস্‌লো। গ্রামের অনেক লোককে সে মদ আর গাঁজা ওষুধের নাম করে খাইয়ে অভ্যাস করিয়ে একেবারে নষ্ট করিয়ে দিলো। এইসব লোক ডাক্তারের খুব সমর্থক হয়ে দাঁড়ালো এবং সকলের কাছে পঞ্চমুখে ডাক্তারের খুব প্রশংসা করতে লাগ্‌লো। ঐ গ্রামে একদল শিক্ষিত লোক ছিলো। তারা এই লোকটিকে হাতুড়ে বলে ঘৃণা করতো। পাছে ধরা পড়ে যায়, এজন্যে ডাক্তার এদের এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করতো। তারা একদিন যুক্তি করে হাতুড়ে লোকটিকে ডেকে পাঠায়। তারপর তাদের মধ্যেকার একজন সবল লোককে রোগী সাজানো হয়। রোগী বলে, সে তার পেটের যন্ত্রণায় অসহ্য ভুগ্‌ছে। হাতুড়ে ডাক্তার তখন "Strong Blister" প্রেস্‌ক্রাইব্‌ করে। তখন সকলে মিলে তার ওপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধোর করে বুঝিয়ে দেয় যে এটা হচ্ছে ঠেঙ্গাপাথিক চিকিৎসা। হাতুড়ে ডাক্তার তখনি গ্রাম ছেড়ে পালায় এবং নতুন ব্যবস্থার উপযোগিতা স্বীকার করে।

ডাক্তারী বৃত্তিটিকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি প্রহসন রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—**গত নিকাশ** (১৮৭৩ খৃঃ)—শ্রীনাথ কুণ্ডু। **যেমন রোগ তেমনি রোঝা** (১৮৮২ খৃঃ)—রাজকৃষ্ণ দত্ত কিংবা **ভিষক্ কুল তিলক** (১৮৯৯ খৃঃ)—চণ্ডীচরণ ঘোষ ইত্যাদি প্রহসন বিদেশী প্রহসনের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ। সুতরাং একই ধরনের বিষয়বস্তু হলেও এগুলোর প্রসঙ্গ টানা চলে না।

ওকালতী।—

নব্য উকীল (হরিনাভি—১৮৭২ খৃঃ)—রমানাথ সান্যাল।[৩৮] মলাট পৃষ্ঠায় প্রহসনকার সংস্কৃত শ্লোক দিয়েছেন,—

"মধুলিহ ইব মধু বিন্দুন্
বিরলানপি ভজত গুণলেশান্।"

প্রহসনকার কোনো ভূমিকা না দিলেও নাটক শেষে ওকালতীর বিরুদ্ধে বিনোদের খেদ ব্যক্ত করেছেন, যা ইতিপূর্বে বৃত্তি ও আয়নীতি সম্পর্কে প্রারম্ভিক বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিগ্রহমূলক আয়নীতির বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত। তবে রক্ষণশীলের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণও যথেষ্ট মূল্য পেয়েছে।

কাহিনী।—নিত্যানন্দ তাঁর পুত্র বিনোদকে অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছেন—ধার করে, কখনো বা গয়না বাঁধা দিয়ে। বিনোদ বি.এল. পাস করেছে। ওকালতীর লাইসেন্সের জন্যেও পঞ্চাশ টাকা অতি কষ্টে দেন। নিত্যানন্দের আশা—"এখন ধারধুর করে যা-ই দিক, পরে বিনোদ—এই কোন মাসে পাঁচশো কোন মাসে সাত শ, আবার কোন মাসে বা হাজার বারশ টাকা রোজগার করবে।" "এখন ওরা জর্জ, মেজেষ্টার, কালেক্টার সবই হতে পারে।" তবে ওতে নাকি বাঁধা মাইনে। "বাঁধা মাইনেতে কি লোক বড় মানুষ হয়!" তাছাড়া তাদের বদলি তো লেগেই আছে। বিনোদের পিতা নিত্যানন্দ ও মাতা হরিদাসী দুজনে মিলে বিনোদের ওকালতী নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনেন।

৩৮। প্রকাশক রমানাথ সান্যাল সরকারী নথিতে লেখক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু "যোগীন্দ্রনাথ সান্যাল" নামে একজনের নাম জানা যায়। তিনি প্রহসনটির প্রকৃত লেখক হতে পারেন।

বিনোদেরও প্রচুর আশা। চারপাশে কেবল সাবেকী উকীল। বি.এ., বি.এল্. চোখেই পড়ে না। মোকদ্দমা সব তারই হাতে আসবে। প্রথম পাওয়া মোকদ্দমা সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলো, কারণ আপীলের কোনো গ্রাউণ্ডই খুঁজে পাওয়া গেলো না। দ্বিতীয়তঃ বিনোদ ভাবে, প্রথমেই হার হলে অখ্যাতি আস্‌বে। তৃতীয়তঃ অর্থ চাইতেও তার সঙ্কোচ হচ্ছিলো। বিনোদের সমবয়স্ক কেরানী ভুবন তিরিশ টাকার কেরানীগিরি করে। ভুবনকে বিনোদ বলে,—"আফিসে? কেরানীগিরি? ছোঃ নন্‌সেন্স! কেরানীগিরির মাথায় সাত জুত মারি। বড় পয়জারি কাজ। বরং মাষ্টারী কায দু-চার দিনের জন্যে কর্ত্তে পারি যদি অনেক মাইনে হয়। ওকালতী আর ডাক্তারির মতন কি আর কাজ আছে? এতে কত স্বাধীনতা। কত মনের সুখ।।" ভুবনকে সে কোরানীগিরি ছেড়ে মোক্তারী পড়তে বলে। ভুবন নারাজ হলে বিনোদ বলে, 'তিরিশ টাকার মায়া ছাড়তে পারছে না, এজন্যেই বাঙালীর এতো দুরবস্থা'।

জজ-আদালতের সামনের আমগাছ তলায় শামলা বগলে নিয়ে বিনোদ ঘুরে বেড়ায়। মোকদ্দমা পাওয়া তো দূরের কথা, কেউ ফিরেও জিজ্ঞাসা করে না। তার মতে, শামলাটা হচ্ছে গোদের ওপর বিষফোড়া। শামলা আছে বলেই গাড়ী করে আসতে হয়, ভাড়া গুণতে হয়, নইলে হেঁটেই মেরে দিতো। মাধব আর একজন উকীল। সে বলে, মানের ভয় ত্যাগ করুন, নইলে ওকালতী করতে পারবেন না। "এ আপনার কালেজ নয়। এখানে কত লাথি খেয়ে মানুষ হতে হয়।" জমিদার বা মোক্তারকে হাতে রাখ্‌তে হয়। বিনোদ এতে অপারগ ব'লে প্রকাশ করলে মাধব তাকে ভেরেণ্ডা ভাজতে পরামর্শ দেয়। বিনোদ একা একা দুঃখ করে, ক্ষুধা তৃষ্ণা পেলে দু পয়সার জলখাবার কেনবারও পয়সা নেই।

অবশেষে বাধ্য হয়ে বিনোদ এক মোক্তারকে বলে, সে কিছু অর্থ চায় না, শুধু ওকালত-নামায় তার নামটা ঢুকিয়ে দিক। মোক্তার জবাব দেয়,— উকীলের নাম মক্কেলের অনুরোধেই দিতে হয়, তার কোনো হাত নেই, তবে সে চেষ্টা করবে। আর একজন মোক্তারের সঙ্গে দেখা হলে বিনোদ তার সঙ্গে মোকদ্দমা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং বলে, তাতে সে মাত্র সিকি বখ্‌রা নেবে। অতি তুচ্ছভাবে মোক্তারটি বলে বিবেচনা করে সে দেখবে। বিনোদের এতে খুব উল্লাস হয়। মাধব কিন্তু বিনোদকে বলে, মোক্তারদের কোনো কথাই বিশ্বাস করতে নেই। এরা উকীলের কাছ থেকে মক্কেল ভাঙিয়ে নিজের

উকীলের কাছে নিয়ে যায়। বিনোদ ভাবে, বি. এল্. পাশ না করে মোক্তারী পড়লেও দু পয়সা উপায় হোতো। "মোক্তারেরাই মক্কেলের রসটুকু চুসে নেয়, তারপর সিটেটা কেবল উকীলরা চিবিয়ে মরেন।" মোক্তাররা দালালী করে দুপক্ষ থেকেই কিছু হাত করে। মক্কেলকে গরীব বলে উকীলের প্রাপ্য থেকেও অনেকটা সে নিজে মেরে নেয়।

চার বছর না হলে হাইকোর্টে ঢোকা যায় না, তাই বিনোদ জজকোর্টে এসেছে। এখানে অনেক অসুবিধে। জেলা হিসেবে এনরোল্‌ড্ থাকতে হয়। অন্য জেলার মোকদ্দমা পাবার উপায় নেই। তার ওপর নতুন উকীলদের বছর বছর পঁচিশ টাকা করে লাইসেন্স ফি ধরে দিতে হয়। হাইকোর্টে যেতে গেলে সার্টিফিকেটের জন্যে জজের খোসামোদ করতে হয়। মুন্সেফ-আদালতে যেতে বিনোদের সঙ্কোচ হয়। সেখানে হাকিমই বি. এল্.। নিজে বি. এল্. হয়ে কি করে তাঁর উকীল হবে। মাঝে মাঝে বিনোদ আদালতে যেতে চায় না। এমনিও রোজগার নেই, অমনিও রোজগার নেই। বরং বাড়ীতে বসে থাকলে গাড়ী ভাড়াটা বাঁচে। কিন্তু ঘরে থাকা হয় না, স্ত্রীর তাড়নায় বিনোদ ভাগ্য পরীক্ষায় বেরোয়।

একজন দালালের দয়ায় বিনোদ আধাআধি বখ্‌রায় ছ আনা পয়সা পায়, এবং তাই নিতে বাধ্য হয়। মোক্তাররা কখনো মক্কেল ভাঙায়, কখনো কখনো অন্য উকীলের নামে চিঠি নিজে নিয়ে মক্কেলের কাছ থেকে খরচা আদায় করে। বিনোদ এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেলে নফর বলে,—"আপনি চুপ করুন। এমন না কোল্লে কি কখন টাকা রোজগার করা হয়? এখানে যুধিষ্ঠির হলে চলে না।"

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটে যায়। বিনোদের পিতা নিত্যানন্দ এক কপিওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করতে গিয়ে মেজাজ হারিয়ে পায়ের খড়ম ছুঁড়ে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দেন। তার জন্যে ফরিয়াদী হরমোহন ঘোষ নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করে। অন্যদিকে আবার জমিদার মুখুয্যেরা পাওনা আদায়ের জন্যে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। নিত্যানন্দের ইচ্ছে,—অন্য উকীল দিয়ে এসব করানো ভালো, যেমন ডাক্তাররা নিজেদের কিছু দেখে না। কিন্তু বিনোদ পিতার মোকদ্দমার জন্যে পিতাকে ধরা কওয়া করে তাঁর সম্মতি আদায় করে। তাঁর জন্যে সেই ওকালতী করবে। বিচারে নিত্যানন্দের দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। বিনোদ

উদ্যোগী হয়ে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল রুজু করায়। কিন্তু আপীলে প্লীড্ করতে গিয়ে ফল হলো বিপরীত। দু-মাসের জায়গায় পিতার হলো ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। বিনোদ আঙুল কামড়ায়। নফর সান্ত্বনা দেয়, যাক্, মোকদ্দমা তো একটা জুটলো।

বিনোদেরও কপাল ভাঙে। সে মোহনলাল নামে একজনের টাকা আদালত থেকে উঠিয়ে নেয়, তার ভাইয়ের ফি পাওনা ছিলো, এই অজুহাতে। এতে চটে গিয়ে মোহনলাল নালিশ করে। কোর্ট বিনোদকে ডিস্‌বোর্ড করবে, এই দুশ্চিন্তায় বিনোদ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। ওকালতী রেখে দিয়ে উমেদার হয়ে চাকরীর খোঁজে বিনোদ পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ভাবে,—"কাল কি কঠিন পড়েছে। এখন দেখ্‌ছি, চাকরী হওয়া বড় সুকঠিন। সহায় না থাকলে আর কাযকর্ম্মের সুবিধা নেই। বাঙ্গালীরা…যে টাকা গুণে ছেলেকে পাস করাতে খরচ করে, সেই টাকাতে যদি তারা তাদের আর কিছু ব্যবসায় শিখায় তাহলে পরিণামে কত ভাল হয়।" বিনোদ ঘুরে ঘুরে হয়রান্। যেখানে যায়, সেখানে তারা বলে, "আমরা এল্. এ, বি. এ নিয়ে কি করবো? কাজের মানুষ চাই।" কেরানী ভুবনকে সে একদা বলেছিলো যে কেরানী-গিরির মাথায় সে জুতো মারে. কিন্তু ভুবনের সঙ্গে শেষে দেখা হলে এবার সে বলে,—"এখন একটা কেরাণীগিরি পেলে ভুটাকার মুখ দেখে বাঁচি।"

বারবাহার (১৮৯১ খৃঃ)—জানকীনাথ বসু (বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রকৃত লেখক)॥ মলাটে প্রহসনকার Goldsmith-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন,—"Manners, not men, have always been my mark." পূর্বের প্রহসনটি যেমন প্রতিগ্রহমূলক আয়নীতির বিরুদ্ধে, 'বারবাহার' তেমনি প্রতারণামূলক আয়নীতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণ সমন্বিত। আপাতভাবে বাবুয়ানার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে ওকালতীও প্রতারণার বিরুদ্ধেই লেখকের মত অভিব্যক্ত হয়েছে।

কাহিনী।—কাশীনাথের কলকাতার বাড়ীতে তাঁর সন্তান অমরনাথ বাবুয়ানা করে বিষয়-আশয় সব শেষ করে দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাশীনাথ কলকাতায় থাকেন না, তাই এসব তিনি জানেন না। এদিকে পাওনাদারদের সঙ্গে ছল চাতুরী করে অমরনাথ দিন কাটায়। পাওনাদার ক্ষীরোদকে সে বলে, তার নামের আদ্যক্ষর 'ক্ষ'; বর্ণমালা অনুযায়ী পাওনা মেটাতে হচ্ছে বলে তার দেরী হবে। ক্ষীরোদ জবাব দেয়, অমরের আদ্যক্ষর 'অ'। কোর্টও বর্ণমালার

নিয়ম মেনে সবচেয়ে আগে তার নামে ডিক্রী দেবে। ভৃত্য তিনকড়িকে দিয়ে অমরনাথ তার হীরের আংটি, পান্না বসানো পানদান, হীরের বোতাম ইত্যাদি বিক্রী করে টাকার সন্ধান করেন। বলাবাহুল্য খুব কম দামেই বিক্রী হয় এবং তিনকড়ি তার থেকে মোটা টাকা আত্মসাৎ করে। ঝি বিমলার কাছে তিনকড়ি বলেছে, সে এভাবে অনেক রোজগার করেছে।

অমরনাথের সঙ্গী জোটেন—যতো রাজা মহারাজা। রায়বাহাদুর কিষণলাল, রাজাবাহাদুর বিশ্বেশ্বর এবং মহারাজ বাহাদুর অচিন্ত্যপ্রকাশ সকলেই অমরনাথকে গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন। পদমর্যাদা অনুযায়ী অমরনাথ তাদের নিমন্ত্রণে গুরুত্ব দেয় এবং এইসব নিমন্ত্রণের মধ্যে দিয়েই তার সময় চলে যায়। এতে তার দেনাই বেড়ে ওঠে। কারণ তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমরনাথ নিজের মান বাঁচাতে চেষ্টা করে।

বিজয়লাল জেলাকোর্টের একজন উকীল। ওকালতী করে তাঁর রোজগার প্রায় কিছুই হয় না। তবে তার বিধবা বোন হৈমবতীর টাকা আছে। হৈমবতী বিজয়লালের কাছেই থাকেন। হৈমবতী ও বিজয়লালের সঙ্গে কাশীনাথের পরিচয় আছে। কাশীনাথ ও বিজয়লাল দুজনেরই ইচ্ছে, অমরনাথের সঙ্গে বিজয়লালের কন্যা লীলার বিয়ে দেন। এতে শুধু হৈমবতীর আপত্তি। তিনি অমরনাথের চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। অবশ্য বিজয়লাল ও হৈমবতী কেউই অমরনাথকে দেখেন নি।

বিজয়লাল যান্ত্রিক উকীল। লীলার বিয়ের ব্যাপারে একদিন হৈমবতীর সঙ্গে কথা হয়। হৈম বিজয়কে বলেন, তিনি যেন অমরের সঙ্গে লীলার বিয়ে না দেন, কারণ শুনেছেন, অমরনাথ বকাটে ও দেনাগ্রস্ত। বিজয় বলেন, আদালতের আইনে 'শোনা কথা' বা 'অসাক্ষাতের কথার' কোনো মূল্য নেই। শেষে আইনের কচকচি আরম্ভ হয়। 'আমার ঘাট হয়েছে' বলে হৈমবতী চলে যেতে চাইলে বিজয় তাঁকে আটকালেন। হৈম বিজয়কে বলেন, তারপর তিনি 'দেখেছেন' সে মাতাল। বিজয়বাবু বলেন,—"তাহলে প্রাসঙ্গিক বটে। তা তাতে আর হয়েছে কি? মদ খাওয়া তো আর সভ্যতা বিরুদ্ধ নয়! হাঁ, তবে যদি নেশার ঝোঁকে কোন অপরাধ করে, তাহলে তার মার্জ্জনা নাই বটে।" অমরের সম্পদ নেই বলে হৈম আপত্তি জানালে বিজয়বাবু বলেন, তিনি আদালত দিয়ে সব ফিরিয়ে আনবেন। হৈমবতী বিজয়বাবুর মতিগতি দেখে

মাথা কুটে মরতে চান। বিজয়বাবু আঁৎকে ওঠেন—তাহলে ৩০৯ ধারার মধ্যে পড়ে যাবে! হৈম ভবেন, "হায় হায় উকীল হলেই কি এমন সং হয়!"

অমর এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে বিমলার সহায়তায় লীলার সঙ্গে প্রেম চালায়। হৈমবতী বুঝতে পেরে চিঠিপত্র বা দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করার চেষ্টা করে। লীলা স্থির করে, সে অমরের বাড়ীতে গিয়ে সেখানে বসে আলাপ করবে। তাহলে পিসীমা বুঝতে পারবে না।

একদিকে প্রেম, অন্যদিকে দেনা। একদিন ক্ষীরোদ দুজন পেয়াদার সঙ্গে আদালতের সমন নিয়ে অমরনাথের কাছে এসে উপস্থিত হয়। অমরনাথ প্রমাদ গোণে। অমরনাথ টাকা দিতে পারে না, কাজেই তাকে ধরে নিয়ে চলে ক্ষীরোদ। ইতিমধ্যে অমরনাথ লক্ষ্য করে, দূরে বিজয়বাবু যাচ্ছেন। বিজয়বাবুকে সে চেনে, অথচ বিজয়বাবু তাকে চেনেন না। পেয়াদাদের সে বলে, বিজয়বাবু জামীন হলে সে ছাড়া পাবে কিনা। বিজয়বাবুকে তারা ভালো করেই চিন্‌তো। তাই এককথায় তারা রাজী হয়। বিজয়বাবুকে জনান্তিকে ডেকে সে বল্‌লো, সে পুলিশ কোর্টের দালাল। এ দুজনের গরু চুরির মোকর্দমা আছে। বিজয়বাবুর কাছে তারা পরামর্শ চায়। এই তুচ্ছ মোকদ্দমা নিয়ে পরামর্শ—এই ভেবে সহাস্য পেয়াদাদের ডেকে নেন—রাজী আছেন বলে, এবং অমর ছাড়া পেয়ে উধাও হয়। পেয়াদারা ভাবে, জামীনের জন্যেই বুঝি তিনি ডাকছেন।

একটি হ্যাণ্ডনোটের মামলায় মিথ্যে সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করে অবশেষে তিনি যখন পেয়াদাদের মোকদ্দমা শুন্‌তে প্রস্তুত হন, তখন তাদের কথা শুনে তিনি অবাক্ হয়ে যান। ভাবেন, এরা বুঝি তাকে ঠাট্টা করছে। কিন্তু যখন তিনি সব বুঝতে পারলেন তখন অগত্যা দণ্ড দিয়ে রেহাই পেলেন।

একদিন অমরনাথ নিজের ঘরে বসে লীলার সঙ্গে প্রেমালাপ করছে, ইতিমধ্যে রাজাবাহাদুরের দল আসেন। প্রেমালাপ স্থগিত রেখে তাড়াতাড়ি অমরনাথ বৈঠকখানায় রাজবাহাদুরদের আপ্যায়ন করে। এদিকে বেরোতে না পেরে লীলা অন্তঃপুরে আটক থেকে যায়।

হঠাৎ কাশীনাথ বিনা খবরে এসে দরজায় উপস্থিত হন। ঝি বিমলা ভাবে তিনি ভেতরে ঢুকলেই লীলার বিপদ। তাই বাইরে তাঁকে ধরে রাখবার জন্যে সে নানা গল্প ফাঁদে। ইতিমধ্যে পাওনাদার এসে একহাজার টাকা চায়। এতে কাশীনাথ অবাক হন। বিমলা বলে, হৈমবতীর বাড়ীটি অমরনাথ দশ

হাজার টাকায় কিনেছে। নয় হাজার টাকা মাত্র তার কাছে ছিল, তাই এক হাজার টাকা তাকে ধার করতে হয়েছিলো। উৎফুল্ল কাশীনাথ পাওনাদারকে বলে, কালই তার ধার শোধ করে দেবেন।

কাশীনাথ বিমলাকে ডেকে বলেন, তাহলে তোরঙ্গটা নতুন বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বিমলা তখন তাকে সাবধান করে দেয় হৈমবতী বর্তমানে পাগল। এখনো জানেন না যে ও বাড়ী এখন তাঁর নয়। সুতরাং হৈমবতী যদি নিজের অধিকারের কথা প্রকাশ করেন, তাহলে তাতে কাশীনাথ যেন কিছু মনে না করেন। এই সময়ে হৈমবতী লীলার খোঁজে এ বাড়ীতে এসে কাশীনাথকে দেখে উৎফুল্ল হন। কাশীনাথ তাঁর সঙ্গে সন্দেহের সঙ্গে কথা বলেন। এদিকে হৈমবতীকে বিমলা জানায় যে, যথাসর্বস্ব চুরি যাওয়ায় কাশী-নাথ পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর অসংলগ্ন কথায় হৈম যেন কিছু মনে না করেন। কাশীনাথ হৈমকে বলেন, হৈমের বাড়ীতে তিনি জিনিসপত্র রাখতে চান। হৈমের মনে তিনি আঘাত দিতে চাইলেন না। হৈম খুশি মনে বলেন,—তিনি স্বচ্ছন্দে রাখতে পাবেন। কাশীনাথ তখন হৈমকে বলেন, পাগলা গারদে তাঁকে রাখবার প্রস্তাবে বিজয়বাবুরা ভুল করেছেন। কারণ হৈমের কথাবার্তা সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থের মতো। কাশীনাথের সহানুভূতির ফল হলো বিপরীত। হৈম বলেন,—কাশীনাথই পাগল। ক্রুদ্ধ কাশীনাথ তখন হৈমকে বলেন, নোটিশ দিয়ে তিনি তাঁদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। হৈমবতী ভাবেন, কাশীনাথের পাগলামি অসহনীয়। তিনি বিজয়বাবুকে ডাকতে চলে যান।

ভেতর থেকে রাজাবাহাদুরদের হাসির শব্দ আসছিলো। কাশীনাথ বিমলাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিমলা বলে, বাড়ীতে আজকাল ভূতের উপদ্রব হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজাবাহাদুরের দল বাইরে এসে কাশীনাথের পরিচয় জেনে সন্তুষ্ট হন। কাশীনাথ প্রথমে তাদের ভূত ভাবেন, শেষে তাঁদের পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, 'আমি আপনাদের গোলাম।' রাজাবাহাদুর বলেন, কাশীনাথ গোলাম হতে পারেন, কিন্তু তার পুত্র গোলাম নন, বন্ধু। এমন পুত্রের পিতা হওয়া কাশীনাথের কাছে পুণ্যের ব্যাপার।

কাশীনাথ ক্রমে ক্রমে সব বুঝতে পারলেন। ক্রুদ্ধ কাশীনাথ তাঁদের পথ দেখতে বলেন। এতোকাল ছেলের পয়সায় তাঁরা যথেষ্ট খেয়েছেন, আর নয়।

রাজাবাহাদুরের দল অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হন। যাবার সময় বলেন,—ছোটলোকের পয়সা হয়েছে, শিষ্টাচার শেখেনি।

এবার কাশীনাথ গৃহকোণ থেকে লীলাকে আবিষ্কার করেন। তার কাছে কৈফিয়ৎ চান। লীলা নীরব থাকে। এই সময়ে হৈমবতীর তাড়নায় বিজয়-লাল ট্রেসপাসের ভয় দূরে রেখে হঠাৎ এসে উপস্থিত হন। হৈমও এসে উপস্থিত হন। কাশীনাথ, অমর এবং লীলাকে একত্র দেখে তিনি ভাবেন, কাশীনাথ বুঝি অমরের সহায়তায় তাদের অনিষ্ট করার সাধনায় মেতেছেন। কিন্তু বিজয়বাবু উৎফুল্ল হন। ইতিমধ্যে তিনি অমরনাথের প্রতারণার পরিচয় পেয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর মতো ঘাগী উকীলকে অমর যখন ঠকাতে পেরেছে, তখন সেই তাঁর উপযুক্ত জামাতা। অমর বিজয়বাবু এবং বাবার কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু কাশীনাথের রাগ তখনো কমে নি। বিজয়বাবু বলেন, তিনি ওকালতী করবেন এবং একটা এটর্নির অফিস্ খুল্‌বেন। সেখানে অমরকে ম্যানেজিং ক্লার্ক করে দেবেন। অবশেষে কাশীনাথের সব ক্ষোভ নষ্ট হয়ে যায়। বিমলার কীর্তিও সব প্রকাশ পেলো। তিনি হৈমকে বলেন, তিনি যেন কিছু মনে না করেন, বিমলার জন্যেই এরকম বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেলো। আজই তিনি বিমলাকে ছাড়িয়ে দেবেন। বিজয়বাবু নরসুন্দর কন্যা বিমলার বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছেন। তিনি বল্‌লেন, তাঁর ওকালতী ডিপার্টমেণ্টে বিমলাকে বরং তিনি মুহুরী রাখবেন।

কাশীনাথ দেখেন সব মিটমাট হয়ে যায়। লীলার ওপর তাঁর কোনো রাগ থাকে না। সানন্দে বলেন,—"লীলা শুনিছি বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ওকে ঘরে এনে আমি বড় সুখী হব।"

কেরানীগিরি ॥—

কেরানী চরিত (১৮৮৫খৃঃ)—প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়॥ বৃত্তিসঙ্কোচে কেরানীগিরি বা সমগোত্রীয় বৃত্তির ওপর চাপে আর্থনীতি বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে প্রতিগ্রহমূলক। পুরোনো আর্থনীতিক সংস্কৃতির পক্ষ থেকে এই বৃত্তি-গ্রহণের ব্যাপকতার বিরুদ্ধে সমর্থনপুষ্টি প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন এই প্রহসন। দুর্দশা প্রদর্শনের মূলে বৃত্তিবিশেষের বিরুদ্ধে সমর্থনপুষ্টির চেষ্টাই প্রকাশ পেয়েছে।

কাহিনী ।—হীরালালের পুত্র জ্ঞান বি.এ., পাশ করেছে। তার ইচ্ছে 'ল' পাশ করে ওকালতী করে। কৃপণ হীরালাল কিন্তু আর খরচ যোগাতে চায়

না। সে চায় জ্ঞান হাতের লেখা আর একটু পাকা করে কাজ জুটিয়ে নিক। "চাকরি একবার হলে কি শিগ্গির যায়, তবে ঢোকাই মুস্কিল!" হীরালালের বন্ধু নন্দও কেরানী। কেরানীগিরিতে পরিশ্রম যথেষ্ট। সে বলে, "পরিশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করো না, ভুৎনন্দি গাধাখাটুনি। হুজুরদের কেবল আমাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, ওদের কাছে এগোবার যো নাই।" সাহেবদের সম্বন্ধে বলে, "ওরা কাজ-পাগ্‌লা, দিনরাত্রি খাটলে আর বড় কিছু কত্তে পারে না।" নন্দ অবশ্য অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে খাটিয়ে সাহেবের সুনজরে আছে। নন্দর দুই স্ত্রী। সামান্য মাইনেয় চলে না। সে বলে, "কোন রকম করে হাতিয়ে-হুতিয়ে এদিগ-ওদিগ করে আরো কিছু নিই বই কি।" দেশে জমি-জমা থাক্‌তেও সেখানে সচ্ছলভাবে থাক্‌তে চায় না। বলে, "ওহে চাকরির একটা ইজ্জত আছে, দেশে হাজার বিষয় থাকলেও Civilized Society-তে সে ইজ্জতটুকু হয় না। তাছাড়া দেশে যে দলাদলির ঘোঁট, আমি একদিনও গিযে তিষ্টতে পারিনে।"

নন্দ খবর দিয়েছিলো, তাদের সাহেবের অফিসে একটা অ্যাপ্রেন্টিসের পদ খালি আছে। হীরালাল সাহেবের কাছে গিয়ে দেখে ঐ পদের জন্যে ১০০০ আবেদন পত্র। তার মধ্যে ৫০ জন বি.এ., ১১০ জন এল্.এ., ২৮০ জন এন্‌ট্রেন্স্ এবং বাদবাকী সব "experienced and have good testimonials." সাহেব উপদেশ দেয়, বামুনের ছেলে, চণ্ডীপাঠ জানা আছে, তাঁর খান্‌সামার কাছে জুতো সেলাইটা শিখে নিক্, তারপর যেন উমেদার হয়। "আজকাল কেডাণি লোককা বড়া Hard Competition আছে।" সাহেব মন্তব্য করে, "বাঙ্গালি লোক বহুট্ আচ্ছা কেডাণি আছে। এ লোক জলডি Improve কড়িতে পারে।...আবতক দুই একজন বাবুলোক ব্যবসা বাণিজ্য কড়িতেছে যব ও লোকভি কেড়াণি বন্ যাগা টব বাঙ্গলা দেশ বড় সুন্দড় সভ্য স্থান হইতে পাডে।"

অবশেষে জ্ঞানের অ্যাপ্রেন্টিসের চাকরি হয়, কিন্তু স্বামীর হাবভাব দেখে স্ত্রী সুধা চিন্তিত হয়। দুঃখ করে বলে, "বেলা দশটা বাজতে না বাজতে নাকে মুখে দুটো ভাত গুঁজে দৌড়িতে দৌড়িতে যান আবার সন্ধের সময় যেন বুকফাটখানি হযে বাড়ী আসেন· ·সুক্‌নো সুক্‌নো দেখে একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে গেলাম না মার মুখো!" সুধা ভাবে, "সাহেবদের অফিসে কাজ করে, মেমটেম দেখে, তাই মেজাজ একটু গরম হয়েছে।" জ্ঞানের চাকরী হবার পর থেকে পোষাক যেন দিন দিন ক্রমেই ময়লা হচ্ছে। সুধা মন্তব্য করে, "বলি

বুড় ত আর নির্ব্বোধ নয়—ও জানে যে, যে টাকা পোষাকে খরচ হবে, তা একটা সাহেবকে নজর দিলে উপকার হবে।" সত্যিই হীরালাল রোজ মুরগীর ডিম, চাঁপা কলা ইত্যাদি সাহেবের বাড়ী পাঠান।

কানে কলম হাতে কাগজের তাড়া দিয়ে জ্ঞান অফিস থেকে ফেরে। আজ রাত্রের জন্যে এগুলো এনেছে। এইসব বাড়তি কাজের জন্যে মাইনে পায় কিনা, সুধা তা জিজ্ঞেস করলে, সে বলে, সে অ্যাপ্রেণ্টিস্। দিনের কাজেই মাইনে পায় না, তা আবার রাত্রির! সে বলে, "চাকরি না হতেই প্রভু সুর ধরেছেন যে you are fool, you do not labour হাজার পরিশ্রম করি, মন পাইনে।" অবশ্য জ্ঞান নাকি 'promise' পেয়েছে সাহেবের কাছ থেকে—কিছু দিন পর 'ভেকেন্সি' হলে সেই চাকরিটি পাবে।

অবশেষে জ্ঞানের চাকরী হয়েছে। নন্দ এসে বলে, তারই জন্যে হয়েছে, যদিও তা সত্যি নয়। সে একটা feast চায়। কথা প্রসঙ্গে কেরানী নন্দ তাকে উপদেশ দেয়—"সাহেবদের সবকথাই টুকে রেখে দিতে হয়। আমরা কেরানিগিরিতে বুড়িয়ে গেলাম। আমরা সব জানি, সাহেবদের প্রত্যেক কথাই certificate.। অনেকে আজকাল ওদের সকল কথারি True copy রেখে দেয় এতে বড় কাজ হয় হে।"

ভট্টাচার্যও আসেন আশীর্বাদ করতে। তিনি বলেন,—"ওহে তোমার চাকরিটে কিন্তু বড় সহজে হয় নি ঠাকুদের অনেক তুলসী দিতে হয়েছে, উঠ্‌তে বস্‌তে আশীর্ব্বাদ করিছি তবে না. যা হ'ক ভায়া বিদেয়টা কিন্তু ভাল করে কত্তে হবে।"

অথচ কেরানীগিরি যে সুখের চাকরী—তাও নয়। সাতকড়ি দুঃখ করে, তার বাড়ী শুদ্ধ অসুখ, এক সপ্তাহের ছুটি চাইলে কলমের সামান্য আঁচড়ে সাহেব তা নাকচ করলে। "আমাদের ত আর Service নয় drudgery—drudgery." "আমাদের আবার ১৭ জনা মনিব, কার মন যুগিয়ে যে কাজ করব তা জানিনে। এর উপর প্রায় সমস্ত মাসের মাইনেটা ঘরে আন্‌তে হয় না অর্দ্ধেক মাসের মাইনে প্রায় fine এ যায়। ...আমাদের দশটার পর এক মিনিট হলে সেদিনকার মাহিনাটি বাজেয়াপ্ত হয়।"

জ্ঞান তার দুঃখের কথা প্রকাশ করে। একদিন জ্বর সত্বেও নতুন চাকরী বলে বাধ্য হয়ে অফিসে গিয়েছিলো। সেদিন দুর্ভাগ্য ক্রমে Special Report due ছিল। সাহেব বড়বাবুকে সন্ধ্যার সময় বলে, আজই এটা নকল করে

দিতে হবে। বড়বাবু তাতে দ্বিরুক্তি না করে নিজের কার-গুজারি দেখাবেন বলে সন্ধ্যার সময় জ্ঞানের ঘাড়ে চাপালেন। জ্ঞান বলে, "আমার শরীর অসুস্থ।" বড়বাবু তখন সাহেবের কাছে জ্ঞানের নামে নালিশ করেন। সাহেব রেগে বলে,—"you must be kicked out, go and copy this immediately" "কি করে অম্লান বদনে রাত এগারোটা পর্যন্ত সেই জ্বর গায়ে নকল করে report খানি প্রভুর কাছে পাঠাইয়াছিলাম।" মধু নামে আর এক কেরানী—সেও চাকরী নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। "ভাই চাকরির মদমজা আমার মিথ্যা সাক্ষী প্রতারণা না কল্লে আমার এতদিন চাকরি কত্তে হত না।" 'আমার প্রভুর সরস্বতীর সঙ্গে বাদাবাদি যদি যদস্টং তৎলিখিতং কর তাহলে পাদুকা প্রহার আর যদি বিদ্যা খাটাতে চাও তাতেও মুস্কিল, হয়ত Forgery case এ তোমায় শ্রীঘরে বাস কত্তে হবে।"

সহকর্মীদের মতোই জ্ঞানের কষ্টের শেষ নেই। প্রত্যুষে ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত প্রভুর বাঙ্গলোয় 'তিথির কাগের মত" দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সেখানে যত 'বিটকেল" বকেয়া কাগজ ও "কুচ কটালে' বাগুলির শ্রাদ্ধ করতে হয়। তার ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্নানাহার ও অফিসের সাজসজ্জা, ১০টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অফিসের গাধাখাটুনি, ৬টা থেকে ৭টা বাসায় এসে নিঃশ্বাসত্যাগ, ৭টা থেকে ১০টা আহার নিদ্রা, তারপর ১১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত কুস্বপ্ন—সাহেবের বিকট মূর্তি দর্শন। রবিবারেও তার বিশ্রাম নেই।

একদিন জ্ঞান রিপোর্টে ভুল করে। সাহেব তার চাপরাশি একবাল হোসেনকে দিয়ে বাঙ্গলোয় ডেকে পাঠায়। তারপর Rascal বলে গালি দেয়। জ্ঞান প্রতিবাদ করে বলে, সে gentleman, গালি দেওয়া অনুচিত। ব্যস আর যায় কোথায়' ক্রুদ্ধ সাহেব তাকে পাদুকাপ্রহার করতে গেলে 'beg your pardon" বলে জ্ঞান পালায়। হর মাষ্টার সাধারণের হিতৈষী। জ্ঞান তাঁর কাছে সাহেবের অভদ্রতার কথা তুললে তিনি বলেন, "ভাই এতে কেবল ওদের দোষ নয় আমাদেরও অনেক দোষ আছে। সেই জন্যে না ওরা আর অধিক পেয়ে বসে। ওহে সাহেবরা যদি এক গুণ চায় ত আমরা দশগুণ করি।"

অফিসের কাজ ছেড়ে কেরানীরা যাতে স্বাধীন ব্যবসা ধরে সেজন্যে একটা মিটিং হয়ে যায়। তাতে প্রভাবিত হয়ে জ্ঞান সাহেবকে একটা resignation পত্র দেয়। সাহেব বলে, তাকে সে pity করে, চিঠি সে withdraw করুক।

জ্ঞান তাই করে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন জ্ঞানের চাকরী যায়। বড়বাবু তাঁর নিজের একজন লোককে ঢোকাবার জন্যে উদ্যোগী হন। তাই তিনি সাহেবের কাছে তার নামে লাগান। সাহেব কেরানী ছাঁটাই করতে বলে। বড়বাবু কৌশল করে একজন দপ্তরীকেও চাকরী থেকে ছাঁটাই করালেন সাহেবকে বলে। আসল কারণ, দপ্তরীটি বড়বাবুর ব্যক্তিগত কাজ বেশি কিছু করে দিতো না। সাহেবের কাছে স্পষ্টবাদী দপ্তরী তাদের ছাটাই হওয়ার কারণগুলো প্রকাশ করে দেয়। ফলে বড়বাবুরও চাকরী যায়। বড়বাবু চোখে অন্ধকার দেখেন। তিনি সাহেবের কাছে ধরাধরি করেন এবং পদে পদে অশ্রাব্য গালাগালি হজম করেন। শেষে সাহেব মারতে গেলে তিনি পালিয়ে যান।

ভাগ্য সকলেরই অপ্রসন্ন। নন্দবাবুরও চাকরী গিয়েছে। তাদের বড়বাবু নাকি সাহেবের কাছে মিথ্যা ক া লাগিয়ে তার চাকরী খেয়েছেন। কথায় নন্দ হারবার নয়। সে জ্ঞানকে বলে, তার চাকরী যাবার নয়, সাহেবের মন সে গলিয়েছে।

মধুদের অফিসে সবারই ভাগ্য খারাপ। তাদের ছোটো-সাহেব সবাইকে tool বলে গালি দেওয়ায় তারা সকলে মিলে যুক্ত স্বাক্ষর দিয়ে দরখাস্ত করে। তাতে অগ্নিশর্মা সাহেব সকলকে suspend করেছে।

হীরা আর নন্দ সাহেবকে খুব সাধাসাধি করে বাঙ্গলোয় গিয়ে।—যাতে নন্দ আর জ্ঞানের চাকরী দুটো আবার হয়। হীরালালকে সাহেব বলে,—"টোমাডা স'টান কো এ কাম মিল্‌বে না, ও ভদ্র আছে।" নন্দ ধরাধরি করতে গেলে সাহেব বলে যে, তাকে নাচতে হবে। "মেমসাহেব বাবুলোককা নাচ বহুত পছন্দ কড়তা হায়।" একবালকে সাহেব আদেশ দেয়, তাকে পাক্‌ড়িয়ে মেমসাহেবের কাছে নিয়ে যেতে। নন্দ দৌড়িয়ে পালায়,—বল্‌তে বল্‌তে যায়—"বাবারে বাবা, ছেড়ে দে কেঁদে বাঁচি, আমার নাকে কানে খৎ আর কেরাণিগিরি নাম করব না, এ অতি পেজম! অতি বাঁদরাম।"...নন্দ পালায় দেখে সাহেব তাড়াতাড়ি হীরালালকেই পাকড়াতে বলে।

কেরানীগিরির প্রসঙ্গ নিয়ে আরও প্রচুর প্রহসনের তালিকা দেওয়া চলে। তবে কেরানীগিরিকে কেন্দ্র করে আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত আর একটা প্রহসনের কথা উল্লেখ করা চলে—**'কেরানীদর্পণ'** (১৮৭৪ খৃঃ)—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। **'বড়বাবু'** (১৮৯১ খৃঃ)—নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রহসনটির

বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পরিচয়ও জানা যায় না। অফিসের বড়বাবুকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি রচনা না হওয়া অসম্ভব নয়, কেননা একই নামের অন্য একটি প্রহসনের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র।

জমিদারী ॥—

দেশের গতিক (কালকাতা—১৮৭৪ খৃঃ)—হরিমোহন ভট্টাচার্য (শান্তিপুর—দত্তপাড়া)॥ নামকরণে বৃত্তি ও আগনীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে কোনো ইঙ্গিত না থাকলেও কাহিনীর মধ্যে বিশেষ বৃত্তির আগনীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট। জমিদারদের গতিবিধির সঙ্গে পুরোনো সংস্কারকে জড়িয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য নব্য নগরভিত্তিক সংস্কৃতির পক্ষ থেকে এই চিত্র আক্রমণাত্মকভাবে উপস্থাপিত।

কাহিনী।—মথুরাপুরের জমিদার জগবন্ধু। তার দেওয়ান জগদীশ চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলেছে। ইন্‌স্পেকটার এসে বলে যান, হাতের লেখা, ষত্বণত্ব, মানসাঙ্ক কিছুই ছাত্ররা শেখে নি। জগদীশের এতে মাসে আড়াই টাকা মাইনে। ইন্‌স্পেকটারই এক একবার এসে তিন মাসের মাইনে দেন একসঙ্গে। এবারও তিন মাসের মাইনে দিলেন। যাবার আগে জগবন্ধুর কথায় ইন্‌স্পেক্টর খেয়াল করে সাড়ে সাত টাকা পকেট থেকে বার করে দেন। ইন্‌স্পেকটারকে যে মেয়রারা এনেছিলো তাদের একজন মন্তব্য করে,—"মোর ছেলে কাদা যোগান দে মাসে চার টাকা মেইনে পায়। গুরুমশায় হ্যাকপড়া শেখার কপালে আগুন। এর চেয়েও কেন কোষ্টা কাটুগ না, তাহলে মাসে চার-পাচ ট্যাকা রোজকার হবে।"

টুকটাক্ জমিদারীর অনেক কাজও তাকে করতে হয়। মাইনে কম হলেও তাতে তার আয় মন্দ নয়। হেড্‌মুহুরী তার ভাইয়ের সঙ্গে জগদীশের কাছে আসে। সে বলে, পরাণে ধোপা ২/৩ মাস হলো ঘর করেছিলো, এখন বাড়ী বেচে চলে যাচ্ছে। "বাবু বলে গেলেন, কাল ভোরে তোমরা ধোপা ব্যাটাকে ধরে চৌটের বিলি কোরো, যদি ফোস্‌কে যায়, তাহলে তোমাদের ঐ টাকার দাযী হতে হবে।" অবশেষে পরাণের কাছ থেকে হেড্‌মুহুরী পঁচাত্তর টাকা পেয়েছে। হেড্‌মুহুরী নিজে নেবে দশ টাকা। জগদীশ তাকে বুদ্ধি দেয়, সরকারকে পঞ্চাশ টাকা জমা দিলেই চল্‌বে। আর বাকী পঁচিশ টাকার মধ্যে পনের টাকা হেড্‌মুহুরীকে নিতে বলে আর কুড়ি টাকা

নেবে জগদীশ নিজে। হেড্‌মুহুরী ভাবে, আমরা কেবল শিকার খুঁজব, পশুরাজ ঘরে বসে খাবেন।" জমিদার জগবন্ধু যথাসময়ে এলে জগদীশ তাঁকে বলে, পঞ্চাশ টাকা মাত্র পাওয়া গেছে। জগবন্ধু অবাক হয়ে বলেন, তিনশ টাকায় বাড়ী বিক্রী করে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। হেড্‌মুহুরী বল্‌লো, পরাণে তো দিতেই চায় না। এরা অনেক চেষ্টায় কুড়ি টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকায় উঠিয়েছে। এদিকে এরা তো একশ টাকার কমে নেবে না। "তারপর ঐ পাড়ায় হিরে ছুতোর বলে এক ব্যাটা আছে, সে পূর্ব্বে কলকেত্তায় কাজ করত আর নাইট স্কুলে পড়েছেল, সে বলো, আপনি চৌট বাবদ যে টাকা চাচ্ছেন, পরাণ তাই দেবে, কিন্তু আপনার একখানি রসিদ দে টাকাটা নিতে হবে।" তাই বাধ্য হয়ে পঞ্চাশ টাকাই নিতে হলো। জগবন্ধু এসব শুনে বলেন,—"ছুতোর বেটাকে শেখাতে হচ্চে, একটু না শেখালে সমস্ত প্রজা বিগ্‌ড়ে দেবে।" দারোয়ান রামদীনকে দিয়ে হীরে ছুতোরকে ডেকে আনানো হয়। আসল ব্যাপার প্রকাশ পেয়ে যায় ভেবে জগবন্ধুকে জগদীশ টাকার সম্বন্ধে কিছু না বলে এমনি শাসন করতে বলে। কারণ না জেনে অকারণ ধমক খেয়ে হীরে অবাক হয়। সে বলে,—"আপনারা সেকালে যা করেচেন, তাই শোভা পেয়েচে, এবারকার নূতন ফৌজদারি আইন দেখেচেন?" "আইন দেখাতে এয়েচ"—বলে জগদীশ তাকে পদাঘাত করে। হীরে নালিশ করবার ভয় দেখিয়ে চলে যায়। জগদীশ বলে, "হবে তো সামান্য জরিমানা—সে তো জমিদার মশায়ের একদিনের বাজার খরচ।"

এদিকে হীরালালের মা থানায় এসে সাব্‌ ইন্‌স্পেক্টার কৃষ্ণচন্দ্রকে বলে, জগবন্ধু নাকি তার ছেলেকে বাড়ীর মধ্যে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করেছে। কৃষ্ণচন্দ্র আশ্বাস দিয়ে তারপর ভাবে,—"আজ যেন মাহেন্দ্রযোগ মাহেন্দ্রযোগ ঠেকচে। জগবন্ধু অনেকদিন কিছু দেন নি, দেখি আজ কি হয়!...প্রায় ৬ মাস হতে একটী পয়সা পাওনা নেই, কেবল মাইনে সত্তরটী টাকার উপর ভরসা। পূর্বে তিরিশ টাকা মাইনের দারোগাগিরি করে কত বাজে খরচ বাবুগিরি করেচি।"

জগবন্ধু তাঁর শ্বশুরকে মাসোহারা পাঠান। স্ত্রী বিনোদিনীর হাতেও কম পয়সা জমে নি। যাহোক এইসব কথা নিয়ে যখন আলোচনা চল্‌ছিলো, এমন সময় থানা থেকে কৃষ্ণচন্দ্র এসেছে শুনে জগবন্ধু ছুটে গিয়ে বৈঠকখানায় কৃষ্ণচন্দ্রকে বসান, আদর যত্ন করে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। জগদীশকে বলেন,

"কৃষ্ণবাবুর যে আমাদের এখানে বার্ষিক ছেল, তা ওকে দেওয়া হয়েচে?" জগদীশের উত্তরে, দেওয়া হয় নি জেনে, জগবন্ধু তক্ষুনি কৃষ্ণকে পঁচিশ টাকা দেবার জন্যে জগদীশকে হুকুম করলেন। টাকা পেয়ে কৃষ্ণ নিজের পকেটে টাকা কয়টি রেখে বিনয়ের সঙ্গে বলে,—"আমরা আপনাদের আশ্রিত, প্রতিপালনের ভারই আপনাদের।" তদারকে যেতে হবে বলে কৃষ্ণচন্দ্র বিদায় নেয়। জগবন্ধুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

কার্তিক জগবন্ধুর মোসাহেব। হরনাথ বিদ্যালঙ্কার মোসাহেব না হলেও পেটের দায়ে জগবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন—আশীর্বাদ করবার জন্যে। কার্তিক তাঁকে বলে,—"যে ইংরিজি পড়ার ধুম, এর পর কি আর কেউ কোন ক্রিয়ে-কম্ম করবে। এই বেলা ভিযেনটিযেনগুলো শিখে রাখ। তা না হলে আখেরে খাবে কি করে।" হরনাথ জগবন্ধুকে বলে,—"বাব, এই সময় আপনার পিতার বাৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হয় না?" কার্তিক মন্তব্য করে, বিদ্যালঙ্কারের আজকাল কিছু খাঁকতির পালা। বিদ্যালঙ্কারকে সে পরামর্শ দেয়,—"তুমি এক কম্ম কর, উপসী শকুনগুল যেমন খুব উঁচুতে উঠে ভাগাড়ের খবর নেয়, তুমিও তেমনি দয়ে হাটায় বসে থেকে দেশ বিদেশের খবর নাও গে।" বিদ্যালঙ্কারের স্বরূপ সে প্রকাশ করে দেয়।—"তোমরা শাক্তের কাছে শাক্ত, বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব, হল যেমন তেমন গাপগাপ চক্ষু কান বুজে এক আধ গ্রাস মেরেই দিলে। আমাদের কি সাধ্য যে তোমাদের মতো হবেক মূর্তি ধরি।"

বিনোদিনী জগবন্ধুকে ধরে বলে, ছেলে জ্ঞানেন্দ্রকে কলকাতায় লেখাপড়া শেখাবার জন্যে সে পাঠাতে নারাজ। সে বলে, বরং জগবন্ধু জমিদার, তিনিই গ্রামে একটা স্কুল করুন। জ্ঞানেন্দ্র জমিদারের ছেলে, বেশি লেখাপড়া শিখেই বা কী করবে। নাম দস্তখত করতে জানলেই হলো। জগবন্ধু স্ত্রীর পরামর্শে অবশেষে স্থির করেন, সাতদিনের মধ্যেই তিনি স্কুল বসাবেন। পাড়ার দু চারজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু সাহায্য অবশ্য নিতেই হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই একজন পণ্ডিত ও তিনজন মাষ্টার আসেন। তাঁরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত. অম্বিকা মাষ্টার তো B. L. পাশ করে পাঁচ বছর ওকালতীও করেছে। কিন্তু তাতে কিছু হলো না দেখে সে চাকরীর চেষ্টা করেছে অনেক। না পেয়ে শেষে এই সামান্য মাইনের মাষ্টারী! "মশায় তার চেষ্টার ত্রুটি করি নি। আজকাল মুরুব্বির জোর ভিন্ন, ও সব চাকরি (ম্যাজিষ্টেট বা মুন্সেফের চাকরি) হবার যো নেই। লেখাপড়া জানাও চাই;

সহায়ও চাই, বরং লেখাপড়া না জান্‌লে চলে, কিন্তু মুরুব্বি ভিন্ন কিছুই হয় না।"

গ্রামে স্কুল বস্‌লো বটে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রের মন পড়ে রইলো কলকাতায়। দুঃখ করে সে বলে,—"সব বরবাদ গেল, এখানে কিছুই হবার যো নেই।" মোসাহেব বন্ধু গোবিন্দ তখন বলে,—"মথুরাপুরের তো কথাই নেই, পয়সা থাক্‌লে অরণ্যকে মেছোবাজার করে তোলা যায়। জ্ঞানেন্দ্র তখন বলে,—পয়সা যতো লাগে সব সে দেবে, শুধু দেখে শুনে সংগ্রহ করবার ভার থাকবে তাদের ওপর। জ্ঞানেন্দ্রের ইচ্ছা "রাত্রে একটু আধটু আমোদ করা যায়, এমন একটা মেয়ে মানুষ" আনা হোক। কালাচাঁদ বলে, এমন মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। ইচ্ছে হলেই আনানো যায়। মদ না হলে তো চলে না। এখানে তো সব দেশী মদ—ধান্যেশ্বরী। চুঁচ্‌ড়ো থেকে কয়েকটা বি হাইভ ব্রাণ্ডির বোতল আনাতে হবে। জ্ঞানেন্দ্রের ব্যক্তিগত চাকর নগে চুঁচ্‌ড়োয় রওনা হয়। এদিকে মুরগীর মাংসের জন্যে কসিমুল্লা দরজীকে আগাম টাকা দেওয়া হয়। সেই কিনে কেটে রেঁধে বেড়ে ঠিক করে রাখ্‌বে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন দীনু ডাক্তার একটু স্বাধীনচেতা। জগবন্ধুকে জমিদার বলে মান্য করেন না বলে জগবন্ধু তার ওপর বেশ খানিকটা চটা। ডাকমুন্সী বীরেশ্বরের বাপের শ্রাদ্ধ। সেখানে নিমন্ত্রণে যাবার জন্যে দীননাথ তৈরি হন। এমন সময় জগবন্ধু এসে দীননাথকে বলেন,—আজ যদি দীননাথ বীরেশ্বরের বাড়ী নিমন্ত্রণে যান, তাহলে কাল ইমাম্‌ দে মণ্ডলও তার বাড়ীতে দীননাথকে নিমন্ত্রণ করবে। বীরেশ্বরের বাড়ী যারা যাবে, তাদের জগবন্ধু একঘরে করবেন। এ কথা শুনে দীননাথ চটে গেলেন। জগবন্ধুর মুখের সাম্‌নেই বল্‌লেন, "বীরেশ্বরের বাড়ী খেলে ত মুসলমান বাড়ী খাওয়া হয় না, আপনার বাড়ী খেলে মুসলমান বাড়ী খাওয়া হয়। আপনার ছেলে আজকাল কি করচে, তা কি টের পাচ্ছেন না?" জ্ঞানেন্দ্রের সব কথাই তিনি জগবন্ধুকে জানিয়ে দিলেন। দীননাথ বল্‌লেন, কেউ না গেলেও তিনি নিজেই একা যাবেন। জগবন্ধু আক্ষেপ করে বলেন,—"এখন ঘোর কলি, এখন সামান্য লোকের জয় হবে, মানীর অপমান হবে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা যা বলে গেছেন, তার একটুও অন্যথা হবে না।"

ডিক্রি-ডিস্‌মিস্‌ (১৮৮০ খৃঃ)—অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ বিরুদ্ধ প্রতীকের দুর্দশা প্রদর্শন না করে, দৃষ্টিকোণে অসহায়তা প্রকাশের মধ্যে ব্যাপক

সমর্থনপুষ্টির স্পৃহা এই প্রহসনে লক্ষ্য করা যায়। এটিও অন্যতম প্রাহসনিক পদ্ধতি। প্রহসনকার ভূমিকা ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো নিজস্ব বক্তব্য প্রচারেও আগ্রহশীল হন নি।

কাহিনী।—অত্যাচারী জমিদার বসন্ত তার প্রজা রাজারামকে খুব মেরেছে—খাজনা অনাদায়ে। গাঁয়ের এক ভদ্র যুবক নন্দকিশোর তাকে ঠেকায়। এ ব্যাপার নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় খুব আলোচনা চলে।

নন্দকিশোর তার বৈঠকখানায় রাজারামকে জিজ্ঞেস করে, কেন তাকে মেরেছে? রাজারাম জবাব দেয়, তিন মাসের খাজনা বারো টাকা সে দিতে গিয়েছিলো, জমিদার তা নেয় নি। জমিদার হাতচিটে চেয়েছিলো, কিন্তু তা হারিয়ে গিয়েছে। নন্দকিশোর তাকে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পরামর্শ দেয়। রাজারাম জবাব দেয়,—"মামলা করতে যে যেতে বল্‌ছেন—আমি জীবনে কখন তাকে মেয়াদ খাটতে দেখি নি। কেবল হয় decree নয় dismiss এই দুইয়ের একটি হয়ে থাকে।" কিশোরী গাঁয়ের একজন নামকরা উকীল। নন্দ তাকে বলে,—"তোমরা পাড়ায় রয়েছ, একজন বিনাদোষে মারবে? যদি আমাকে সাক্ষী মানে—I must fight for truth." কিশোরীর মধ্যে সক্রিয়তা না পেয়ে নন্দকিশোর রাজারামকে তার একজন বন্ধুর কাছে নিয়ে যায়। বন্ধুর ভাই বেশ বড়ো উকীল।

নন্দকিশোর মহৎ হলেও তার স্ত্রী বিরাজমোহিনী দুশ্চরিত্রা এবং কলহপ্রিয়া। তার ধারণা তার স্বামী বাইরে অকাজ-কুকাজ করে বেড়ায়। উকীলকে ফি দেবার জন্যে মা বিমলার কাছে নন্দ দশ টাকা চাইতে আসে। বিমলা তার বৌকে দেখিয়ে দেন। 'টাকা নেই' বলে বৌ তাকে মিথ্যা করে ফিরিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে নন্দ বিমলার কাছ থেকেই টাকা নেয়। বিমলাকে টাকা দিতে দেখে বৌ অত্যন্ত চটে গিয়ে শাশুড়ীকে গালাগালি দিয়ে বলে,—"এখুনি শুঁড়ির দোকান থেকে মদ খেয়ে এসে মারধোর করবে। আমার উপর দিয়েই সব বিপদ যাবে।" শেষে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। নন্দকিশোর শেষে ঝগড়া থামিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সরে যায় অন্য ঘরে।

নন্দকিশোরের এসব কাজে তার স্ত্রী বিরাজমোহিনী অসন্তুষ্ট। সে ভাবে, —"বসন্ত একজন জমিদার, তার দিকে কত লোক রয়েছে। আমি কত বারণ করলাম। কিশোরীর সঙ্গে ঝগড়া করলে। আমার অদৃষ্টে যে কত কষ্ট

আছে।" প্রতিবেশী কানন তাকে বুঝিয়ে বলে, নন্দকিশোর বুদ্ধিমান। সে নিজেই মোকদ্দমা চালাবে। কানন বিরাজকে নিয়ে ঘাটে যায়।

এদিকে উকীল কিশোরী নন্দর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে বৈঠকখানায় বসে তার বন্ধুকে বলে,—নন্দ নাকি ওভারসিয়ার হবে। তার মতো মূর্খ ভূ-ভারতে নেই। এমন সময় উকীলের কাছে স্বয়ং বসন্ত আসে। কিশোরীকে মামলাটা হাতে নেবার জন্যে ধরে। কিশোরী বলে, সে কোনো পক্ষেই থাক্‌বে না। এদের কথাবার্তা চল্‌ছে, এর মধ্যে আত্মারাম মাতাল হয়ে এসে পড়লে, তাকে পদাঘাত করে বার করে দেওয়া হয়।

কিশোরী উকীলকে নন্দকিশোর দুঃখ করে বলে যে, মামলাটা ডিস্‌মিস্‌ হয়ে গেছে। যাহোক এবার সিভিলকোর্টে কি হয় দেখা যাবে। এমন সময় আচার্য এসে কতকগুলো অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।—নন্দর মা কেমন আছেন?—পিতার শ্রাদ্ধ কবে হবে?—ইত্যাদি। নন্দ এতে বিরক্ত হয়। কিন্তু ভাবে, একে ছাড়িয়ে দেওয়া যা . না—মা রাগ করবেন। তবে ওঁর বৃত্তি কমিয়ে দিতে হবে। এমন সময় শিরোমণি এসে নন্দর কাছে জিজ্ঞেস করে মোকদ্দমায় কার হার হলো—কতো খরচ হলো—পিতার শ্রাদ্ধ কবে—ইত্যাদি প্রশ্ন। নন্দ সেসব কথা মাকে জিজ্ঞেস করতে বলে বিরক্ত হয়ে চলে যায়।

বিরাজমোহিনী এদিকে কিশোরীর স্ত্রী হয়েও সংসারে মন বসাতে পারে না। সে অপূর্ব নামে একজনকে ভালবাসে। "অপূর্ব্বকে কেন ভালবাসলুম, যদি অপূর্ব্ব আমাকে সেরকম ভালবাসে তবে আমি তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হই।" নির্দেশ মতো অপূর্ব এই সময় এসে পৌছোয়। আহ্লাদে গদ্‌গদ্‌ হয়ে বিরাজ-মোহিনী তাঁকে প্রেম নিবেদন করে। অপূর্বও তাকে আদর করে। বিরাজও তার কাছ ঘেঁষে অনুযোগের স্বরে বলে,—"চল, আর এখানে থাকবো না।" তারপর যথারীতি বিরাজ অপূর্ব্বর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে।

এদিকে নন্দ তার বৈঠকখানায় বসে ভাবছে, বিরাজ কেন এখনো আস্‌ছে না। এমন সময় ভৃত্য তাকে একটা চিঠি দেয়। চিঠিতে লেখা—তার স্ত্রী বিরাজকে নাকি জমিদার বসন্ত আটক রেখেছে। সাক্ষাতের আশা থাকলে বসন্তের কাছে যেন সে যায়। নন্দকিশোর চটে গিয়ে তখন পুলিশে রিপোর্ট দিতে যায়।

নন্দকিশোরের সব চেষ্টা বিফল হলো। বিচারালয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট নন্দকে জিজ্ঞেস করে, কেন সে নালিশ করেছে! নন্দ জবাব দেয়—চিঠির কথা

মতোই সে নালিশ করেছে। সে বৌকে অবশ্য চলে যেতে দেখেনি। স্ত্রী কোথায় আছে, সে জানে না। ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করে—বসন্তর নামে নন্দ মিথ্যা নালিশ করেছে। এই দোষে নন্দর তিনমাসের কারাদণ্ড সাব্যস্ত হলো। এজাহার নিয়ে নাকি জানা গেছে বসন্তবাবু নির্দোষ। অতএব মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা গেলো।

গাঁয়ের মোড়ল বা গৃহস্থের সর্বনাশ (কলিকাতা—১৮৮৫ খৃঃ)—অমৃতলাল বিশ্বাস ॥ প্রহসনকার বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি তাঁর বন্ধু পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে উপহারপত্রে লিখেছেন,—"নানা চিন্তার পর বহু আয়াসে এক সত্যঘটনা অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র 'প্রহসন'-খানি প্রচার করিয়া চিরস্মরণের নিমিত্ত তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।"[৩৯] বৈকল্পিক নামকরণে লেখকের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

কাহিনী।—মদনপুর গাঁয়ের মোড়ল হরনাথ চট্টোপাধ্যায়। সে বলে,—" আমি কিছুতেই ভয় খাইনে, আর আমি এ বেশ গুমর করে বলতে পারি যে আমার মত মামলাবাজ গোঁয়ার আর দুটি নেই।। আমার যখন দশ বৎসর বয়স, তখন থেকে আদালত ঘর করছি, এখন প্রায় চল্লিশ হয়ে গেল, প্রায় ত্রিশ বৎসর এই কায করচি, আমায় হারান যে সে লোকের কর্ম্ম নয়, আমি মামলার পোকা, মাম্‌লা বোঝে কটা লোক?" এই রকম লোক হরনাথ। পরের কুৎসা রটাবার অবকাশ পেলেও তার উৎসাহ বেড়ে যায়। রায়-পাড়ায় বেণী মুখুয্যের মেয়ে সম্বন্ধে বিনা ভিত্তিতে কুৎসা রটায়। গৌরীকান্ত বলে, মেয়েটি বেরিয়ে গেছে, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলে বাধা হয়ে হরগোবিন্দ (হরনাথের আর একজন সমর্থক) বলে,—"বেরয় নি, বাড়ীতেই আছে, তবে সে নষ্ট বটে।" হরনাথ বলে ওঠে, "আমার রায়পাড়ার উপর ভারি রাগ আছে, এইবার বেণী মুকুর্য্যেকে ঠিক একঘরে করব, ক্রমে ক্রমে রায়পাড়ার সব ব্যাটাকেই একঘরে করবার ইচ্ছা আছে।"

দুঃস্থ রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে তার কোনো সহানুভূতি নেই। জয়নাল ও হানিফ খাজনা মকুবের জন্যে এলে সে বলে, "আমার কাছে র‍্যাং ক্যাং না, আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে, আমি একটি পয়সাও রাখব না। হানিফ কাকুতি করে বলে,—"আপনি

৩৯। কলিকাতা, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২ সাল।

হচ্ছ মুনিব, মুনিবকে রাইওৎদের এক আধ্‌টা কতাভা রাখ্‌ত্তি হয়।" হরনাথ বলে, "দেখ দেখিন্‌, লেড়েদের আদপে বিশ্বাস কত্তে নেই," কথায় বলে, "লেড়ের নেই ইষ্টি, তেঁতুলের নেই মিষ্টি।" একথা মেনে নিয়েও হানিফরা যখন মনিবের কাছে দয়া ভিক্ষা করে, তখন "টোঙ্গর লেড়ে," "শোরখেগো লেড়ে," "শালা লেড়ে," "গুখেকোর বেটা লেড়ে",* "ভেড়ের ভেড়ে লেড়ে" ইত্যাদি আপত্তিকর গালাগাল দিয়ে তাদের পদাঘাত করে। তাদের অপরাধ, তারা দুঃস্থ, এবছরে খাজনা দেওয়া তাদের সাধ্যের অতীত। হরনাথ ভাবে, নালিশ করে এদের বলদ ঘরবাড়ী সব দখল করে নেবে।

রামকুমার বাঁড়ুয্যে হঠাৎ মারা গেলে, তাঁর অসহায়া বিধবা স্ত্রী থাকমণি ছুটে আসে মোড়লের কাছে কাঁদতে কাঁদতে—সৎকারে সাহায্যের আশায়। কাষ্ঠহাসি হেসে হরনাথ বলে, "মোকদ্দমা ছেড়ে ত তোমার মড়া বইতে পারিনি।" হরনাথের সঙ্গী গৌরীকান্তও বলে,—"তুমি জানই তো, আমার পরিবারের পাঁচমাস অন্তঃসত্ত্বা, আমার দ্বারা হবেই না।" প্রত্যাখ্যাত হয়ে, নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্যে থাকমণি চলে যায়। মনে মনে বলে,— "যেন এ পোড়া দেশে মানুষে বাস করে না, আর এরকম গ্রামের মোড়ল থাকতে দেশের কখনই ভাল হবে না।"

প্রতিবাসী পেন্সনার রামসদয় মুখোপাধ্যায় তাঁর তেরো বছরের একমাত্র আদুরে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন অনেক কষ্টে। রামসদয় রায়-পাড়ায় থাকেন। বেণী মুখুয্যেও একই পাড়ায় থাকেন। হরনাথ খবর দিয়ে পাঠান, বেণী মুখুয্যেকে এ বিয়েতে নিমন্ত্রণ করলে তারা কেউ আসবে না। বেণী মুখুয্যের মেয়ে নাকি ভ্রষ্টা। রামসদয়ের স্ত্রী উমা মেয়েটিকে ভালো করে চেনেন, তিনি বিশ্বাসই করতে চান না। তিনি অবাক হন এই ভেবে যে এ পাড়ায় কেউ জানে না, অথচ ও পাড়ার সবাই জেনে বসে আছে।

২৪ তারিখে বিয়ে। পাড়ার সকলেই হৃদ্যতা দেখায়। বলে টাকার অসুবিধে হলেও রামসদয় যেন চিন্তা না করেন, অথচ হরনাথের সিদ্ধান্তের কথাতে সকলেই দুর্বল। তারা বলে, তারা জানে বেণী মুখুয্যের মেয়ে সৎ, কিন্তু হরনাথের বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে পারে না।

হরনাথের দলের গৌরীকান্ত বেড়াতে বেড়াতে রামসদয়ের বাড়ী আসে। বলে, রামসদয় রায়পাড়ার অর্থাৎ তাঁর নিজের পাড়ার কাউকে নিমন্ত্রণ না করলে হরনাথ রামসদয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে। এতে রামসদয় চটে যায়।

পরের মেয়ের নামে অকারণ কুৎসা রটায় বলে হরনাথের নিন্দা করেন। বলেন, সে নিজে কি? তিন বছর ধরে ঘোষেরের একটা মেয়েকে নিয়ে আছে! "তাকে কত ফুস্‌লে ফাস্‌লে, কত টাকা কড়ি দিয়ে, তবে তাকে নষ্ট করেছে।…তেমনি ওর স্ত্রীটা এক গয়লার সঙ্গে রয়েছে, অধর্ম্ম করা কদিন চলে? যেমন দর্প তেমনি দর্প চূর্ণ হয়েছে।" গৌরীকান্ত অধোবদনে সব শুনে যায়। শেষে "আচ্ছা দেখা যাবে" বলে চলে যায়। রায়পাড়ার প্রতিবেশীরা বলে, রামসদয়ের পেছনে তারা আছে, রামসদয় যেন ভয় না পায়।

রামসদয়ের কথাটা সত্যি। ঘোষেদের বাগানে কুমুদিনীর সঙ্গে হরনাথ গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করে প্রায়ই। কুমুদিনীর ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তার কাছ থেকে হরনাথ টাকাকড়ি শুষে নেয়। এবার কুমুদিনীর বাগানখানা হাত করবার চেষ্টায় আছে। কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা হলে এবার সে বলে, মোকদ্দমায় হেরে গিয়েছে সে। প্রচুর টাকা না দিলে খালাস পাওয়া যাবে না। তার জেল হবে। কুমুদিনী শুধু গয়নাগাঁটি দিয়েই নিশ্চিন্ত হয় না। বাগানটাও লেখাপড়া করে দেয়।

রাতে হরনাথ বেরিয়ে পড়ে, এদিকে গরু তোলা শেষ করে যথারীতি হরনাথের স্ত্রী কমলার শোবার ঘরে চাকর রাধানাথ ঢোকে। গিন্নির সঙ্গে তার অবৈধ প্রেম আছে। গিন্নি বলে, "দেখ আমার ছেলেপুলে হয় না বলে, আমি কি বছর কার্ত্তিক পূজ করি, এবার আর কার্ত্তিক ঠাকুর কিনবো না, (চিবুক ধরিয়া) তোমায় এবার পূজ করব।" চাকরকে কমলা বলে, "এই বশেখ মাসের দিনে যখন তুমি কাঠ কাট, গরুর জাব দাও, দর্‌দর্‌ করে যখন তোমার গা দিয়ে ঘাম পড়তে থাকে, তখন ওম্‌নি আমার প্রাণটা করকর করে ওঠে, ইচ্ছে হয়, তখুনি ভিজে গামছা দিয়ে তোমার গাটা পুঁছিয়ে দিই।" কমলা রাধানাথের ক্লান্ত অঙ্গ টিপে দেয়। তারপর রাধানাথের জন্যে ভালো ভালো জলখাবার নিয়ে আসে। জলখাবার আনার পর দুজনে মিলে এঁটো করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে।

চাকরের সঙ্গে গিন্নির প্রেমলীলা চল্‌ছে, এমন সময় হরনাথ দরজা ধাক্কা দেয়। গিন্নি তাড়াতাড়ি চাকরকে দালানে শুইয়ে ঘুমোবার ভাণ করতে বলে। চাকর যথাস্থানে গেলে কমলা বাইরের দরজা খুলে দেয়। ভেতরে রাধানাথকে দেখে হরনাথ অবাক্ হয়ে যায়। ভাবে, তাহলে রটনার সবটুকুই সত্য! কিন্তু গিন্নিকে হরনাথ ভয় করে। "স্বচক্ষে দেখলেও আমার বাবার

ক্ষমতা নেই যে গিন্নিকে এক কথা বলি।" গিন্নি কৈফিয়ৎ দিলো, হরনাথ কখন ফিরবে ঠিক নাই। কমলা হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। তাই দরজা খোলবার জন্যে রাধানাথকে সে ভিতরে শুতে দিয়েছে। রামসদয় গিন্নির সম্বন্ধে যে 'অপবাদ' দিয়েছে, সেটা হরনাথ ক্ষীণস্বরে গিন্নিকে বললে গিন্নি মহাভারতকে স্মরণ করে শুচিশুদ্ধি করে। তারপর বলে, রাধানাথ তার কাছে বাড়ীর ছেলেপুলের মতো। রামসদয়ের ওপর কমলা চটে যায়। হরনাথকে বললো রামসদয়ের মেয়ের যাতে বিয়ে না হয়, তার ব্যবস্থা হরনাথকে করতেই হবে। সে না গাঁয়ের মোড়ল! হরনাথের দুর্বলতায় কমলা আঘাত দেয়।

মনিরামপুরের শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ ধনী লোক। তার ছেলের সঙ্গেই রামসদয়ের মেয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। হরনাথ খোঁজ নিয়ে শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানায় চিঠি লেখে। চিঠিতে জানায় যে, রামসদয়ের কন্যাটি রামসদয়ের ঔরসজাত নয়।

বলাবাহুল্য বিয়ে ভেঙে যায়। শম্ভুচন্দ্রের স্ত্রী বিরাজ বলে,—"ধর্ম্ম রক্ষে, এমন বৌয়ে কায নেই, মেয়ে ত নয়? ছেলের বে না হয় দুদিন পরেই দেবো, শেষে কি আমাদের ঘর খোঁটার ঘর হবে?" এটা শত্রুতা—এই সন্দেহ মনে ঢুকলেও শম্ভুচন্দ্র বলেন,—"জাত যখন যাচ্ছে না, এ সন্দেহের মধ্যে ডুবেও বা লাভ কি?"

সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত রামসদয় এ খবর পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেন। খবর শুনে রামসদয়ের মেয়ে আত্মহত্যা করলো। রামসদয় সপরিবারে কাশী যান। যাবার আগে বললেন—"এক্ষণে সাধারণ বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম নিবাসীদিগের নিকট আমার বিশেষ বক্তব্য ও অনুরোধ এই, যেন তাঁহারা হরনাথের ন্যায় নীচপ্রকৃতি লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।...আর গ্রামের মধ্যে এইরূপ মোড়ল থাকা যে কতদূর হানিজনক তা বলা বাহুল্য, দেখলে কে আর শুনতে চায় বল? এরূপ অত্যাচারে যে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?..."

জমিদারীবৃত্তিকে কেন্দ্র করে আরও প্রচুর প্রহসনের উল্লেখ করা চলে। তবে যৌন ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেই সেগুলোর মূল্য প্রধান বলে এখানে সেগুলোর উপস্থাপনা নিরর্থক। যথাস্থানে সেগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

বেশ্যাবৃত্তি ॥ —

ঘোষের পো (কলিকাতা—১৮৮৮ খৃঃ)—সারদাকান্ত লাহিড়ী[৪০] ॥ বেশ্যাবৃত্তির দৌর্নীতিক আয়ের বিরুদ্ধে অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে যে কয়টি অল্পমাত্র প্রহসনের নিদর্শন পাওয়া যায়, এইটি তার অন্যতম। তবে নামকরণ প্রহসনকারের উদ্দেশ্যকে এই প্রত্যক্ষতার সমর্থক হিসেবে প্রমাণ দেয় না। এখানেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করে এব উপস্থাপনা ক্ষেত্রকে এখানেই নির্দেশ করা যেতে পারে।

কাহিনী।—সোনাগাছির পুঁটেহরি বেশ্যা ভাবছে, তার মা তার কাছ থেকে মিথ্যে কথা বলে সব গয়না নিয়ে নিচ্ছে। সে কিছুই পরতে পারছে না। ভূপেনবাবুর কাছ থেকে পুঁটেহরি সর্বস্ব শুষে নিয়ে সবই তার মাকে দিয়েছে, তবুও তার মা তাকে কোনো গয়না পরতে দেয় না। এইজন্যে সে সঙ্কল্প করে যে সে তার মায়ের প্রত্যেকটি কথার জবাব উল্টোভাবে দেবে। মা যা করতে বলবে, সে তা করবে না। এমন সময় পুঁটেহরির মা গয়ামণি এসে তাকে স্নান করে সেজে নিতে বলে, এবং ভূপেনবাবুকে ছেড়ে নতুন বাবু ধরতে বলে। পুটি তা অস্বীকার করে। গয়া তাকে অনেক করে বোঝায়, কিন্তু পুঁটি তা শোনে না। গোলাপী এলে তার কাছে মেয়ের নামে সে অভিযোগ করে। বলে আমাদের পয়সা রোজগার করবার জন্যেই এই ব্যবসা। ভালবাসলে কি চলে? গয়া চলে গেলে পুঁটেহরির সঙ্গিনী গোলাপী বেশ্যা তাকে উপদেশ দেয়। বলে যে, সে এখনো ছেলেমানুষ। গোলাপী কেমন করে তিনজন মানুষকে একেবারে ফকির করে দিয়েছিলো, সেকথাও সে বলে। শেষে মায়ের কথা শুনতে এবং সে অনুযায়ী চলতে গোলাপী পরামর্শ দেয়। পুঁটে তাকে বলে যে এই 'মাগী' কম পাজী নয়, তাকে ফাঁকি দিচ্ছে। যতোগুলো গয়না ছিলো, তা চাইলে বলে, বাবুর কাছ থেকে টাকা নাও, ছাড়িয়ে আনি। বলে দুজনে চলে যায়। ভূপেন এই সময় ঘরে ঢোকে। মনে মনে সে ভাবে, বাবা মারা যাবার পর তিনলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মতো ছিলো। তা কেমন করে এতো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলো! এখনো হ্যাণ্ডনোটের টাকা শোধ

৪০। গ্রন্থে প্রকাশক হিসাবেই তাঁর নাম মুদ্রিত।

বাকী আছে। মদ ছেড়েছি ; আফিং ধরেছি। আবার শুন্‌ছি বাড়ীতে কয়লা নেই। পুঁটের গায়ে গয়না নেই। এখন পুঁটের এমন সুন্দর রূপ যৌবন, তাতে কি গয়না না হলে মানায়! বাপ মা যে বিয়ে দেয়, তা হচ্ছে একরকম শাস্তি বিশেষ। মনের মিল না হলে কি বিয়ে হয়! পুঁটেবিবি কতো সরল, কতো ভালো! ভূপেনকে সে কতো ভালোবাসে। তাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। যদি মরে, তাকে নিয়েই মরবে।—এসব কথা ভাবছে, এমন সময় পুঁটে এসে বলে, সে এতো ভাবছে কেন! বেলা হয়েছে, ভূপেন এখন স্নান করুক। তারপর দুজনে গান শেষ করে চলে যায়।

পুঁটের মা গয়ামণি শোবার ঘরে বসে আছে, এমন সময় ভোলাখুড়ো গয়ার কাছে আসে টাকা ধারের জন্যে। গয়া তাকে অনুরোধ করে নতুন একজন নাগরের জন্যে। ভোলানাথ একজন দালাল। ভোলা তাকে খবর দেয়, কুমুদনাথ নামে একজন লোক আছে, তার অনেক টাকা। তাকে সে আনতে পারে। গয়া বলে, তবে ভোলা তাকেই আনুক। ভূপেনকে সে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবে। তারপর দুজনে মিলে আমোদ স্ফূর্তি গান বাজনা করে। এমন সময় পুঁটে আসে। গয়া টাকা আনতে যায়। ভোলা পুঁটেকে নতুন নাগরের কথা বলে। গয়া দশ টাকার একতাড়া নোট ভোলাকে দেয়। ভোলা গয়াকে বলে, পরদিন পুঁটেকে নিয়ে তৈরি থাকতে। তারপর সে চলে যায়। গয়া মেয়েকে বলে, ভূপেনকে এবার তাড়াতেই হবে। সে যদি না যায়, তবে তাকে বিষ খাওয়াতে হবে। পুঁটে বলে, সে আর তার মা-র অবাধা হবে না। গয়ার কথা সে শুনে চল্‌বে। গয়া বলে, সে সবই ঠিক করেছে। এখন যেন পুঁটে মাঝপথে সব ভেস্তে না দেয়।

পুঁটেহরির শোবার ঘর। আফিম খেতে খেতে ভূপেন আসে। সে মনে মনে ভাবে, তার এই অবস্থার জন্যে ভোলাখুড়োই দায়ী। সে তাকে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা লিখিয়ে মাত্র পাঁচ শত টাকা দিয়েছে। এখন এক টাকা ধার চাইলে কেউই দেয় না। "আমার এ দুঃসময়ে কেউ এসে জিজ্ঞাসাও করে না কেমন আছি।" গয়া ও পুঁটে কিছুক্ষণ পরামর্শ করবার পর পুঁটে ভূপেনের কাছে আসে। সে ভূপেনের কাছে মাত্র এক টাকা চায়। ভূপেন তাও দিতে পারে না। ভূপেন শুনতে পায় নেপথ্যে ভোলাখুড়ো গয়াকে মারছে এক টাকা ধার শোধ না দেবার জন্যে। ভূপেন গয়াকে রক্ষা করবার জন্যে সেখানে যেতে চাইলে পুঁটে তাকে বাধা দেয়। পুঁটে তারপর নিজেই গিয়ে

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলে যে, সে তার শান্তিপুরী শাড়ীটা দিয়ে ভোলাকে বিদায় করেছে। তার মায়ের শেখানো মতো পুঁটে বলে, তাদের এখন ভাত-কাপড় জুটছে না। সে যেন আর না আসে। ভূপেন কাঁদতে আরম্ভ করে—পুঁটেহরির সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে বলে। এমন সময় গয়া এসে ভূপেনকে বলে, "এখানে লেংটি পরিয়া 'ঘোষের পো' হইয়া যদি থাকিতে চাও, তবে থাকিতে পাব।" ভূপেন তাতেই সায় দেয়। গয়া বলে, "পুঁটে তোমারই, কেবল পয়সার জন্য এই চালাকী করতে হচ্ছে।"

ভূপেনকে কাপড় পরিয়ে মাথায় ফেরতা দিয়ে চাদর গায় দেওয়ানো হয়। পুঁটে ভালো করে শিখিয়ে দেয়, 'ঘোষেব পো' বলে ডাকলে কিভাবে উত্তর দিতে হবে। দূরে থাকলে 'যাই' এবং কাছে থাবলে 'হাঁ' বল্‌তে হবে। এমন সময় গোলাপ আসে। পুঁটে গোলাপকে ভূপেনের কাছে বসিয়ে রেখে কুমুদবাবুর কাছে যায়। গোলাপী ভূপেনেব অবস্থা দেখে নানা উপদেশ দেয়। বলে,—"আমাদের ভালবাসা ব্যবসা। যখন যেমন দরকাব তাই করে টাকা রোজগাব করা। আপনার সঙ্গে পুঁটির ঠিক তাই।" ভূপেন এ কথা শুনে বিশ্বাস করতে চায় না। ভূপেন মনে করে, পুঁটে শুধু তাকেই ভালবাসে। এমন সময় অন্য ঘর থেকে 'ঘোষেব পো'—এই ডাক শোনা যায়। গোলাপী মনে করিয়ে দেয়, ভূপেনকেই পুঁটে ডাকছে। তাড়াতাড়ি ভূপেন চলে যায় হুকুম তামিল করতে।

ভূপেন একদিন হুঁকো পরিষ্কার করতে করতে বলে এখানে এক বছর তিন মাস হলো, কুমুদবাবু এসেছেন। প্রতি রাত্রেই প্রায় দুই শত আড়াই শত টাকা মতো খরচ করেন। আবার সেই ভোলাখুড়ো জুটেছে। তার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছিলো, তেমনই এর সঙ্গে করছে। এখন শুন্‌তে পাচ্ছে কুমুদবাবুরও প্রায় সব শেষ হতে চলেছে। ভূপেন কুমুদবাবুর জন্যে দুঃখপ্রকাশ করে। তাঁর বসতবাটীও নাকি এর মধ্যে চলে যাবে। এই দালাল ব্যাটারাই সব সর্বনাশ করে। এদের সঙ্গে বেশ্যাদের বন্দোবস্ত থাকে। "আমরা কি গাধা! আমিও অধঃপাতে গিয়েছি, আবার একজন ভদ্রসন্তানের সর্বনাশ দেখ্‌ছি। ঘোষের পো হয়েছি বলেই বুঝতে পারছি।" "ঘোষের পো" বলে নেপথ্য থেকে ডাক আসে। গালাগালিও ভেসে আসে সে কেন দেরী করছে—এই দোষে। পুঁটে এসে বলে আজ রাত্রে খুব ধুম হবে। শাল বাঁধা দিয়ে কুমুদবাবু পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে। গয়া যেমন করে শিখিয়ে দিয়েছে,

ভূপেন যেন তেমনি করে। ভূপেন হুঁকো নিযে গেলে পুঁটে মনে মনে ভাবে, —"ব্যাটা ছেলেগুলো এতো মূর্খ। আমাদের ব্যবসাদারী ভালবাসা বোঝে না। একবার ওদের দিকে তাকালে নিজেদের ধন্য মনে কবে। ঝগড়া, মাযা, নাচ, গান সকলই তোদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গবার জন্য। আমার এই ১৫ বৎসর বযসে তুইজনকে কাঙাল করিলাম।"

পুঁটেহরির শোবার ঘরে কুমুদনাথ একদিন তাঁর মাথা ধরেছে বলে 'ঘোষের পো'-কে ডাক দেন। ঘোষের পো তামাক নিযে এলে তাকে জিজ্ঞেস করে, কালকের পঞ্চাশ টাকার মধ্যে কিছু অবশিষ্ট আছে কি না। ঘোষের পো বলে, কিছু নেই। তখন কুমুদনাথ ভোলাখুড়োর খোজ নেয এবং পুঁটেহরিকে আসতে বলেন। ঘোষের পো বলে, পুঁটিবিবি ঘুমোচ্ছেন। কুমুদ মনে মনে ভাবেন, কাল তিনি বড়ো মাতাল হযে পডেছিলেন। গান-বাজনার পর টাকার জন্যে রাগারাগি হয। খাওযা দাওয়া হযেছিলো কিনা. তাঁর মনে নেই। এখন পেট জ্বলছে। একটু মদ হলে হতো, কিন্তু ঘোষের পো ছোটোলোক, তার কাছে চাইবেন কেমন করে! শেষে লজ্জা সরম বিসর্জন দিযে কুমুদ, ঘোষের পোর কাছে এক টাকা চাইলেন। বলেন, "বড মাথা কামডাচ্ছে, গা-গতর কামড়াচ্ছে। আমার হাতে টাকা নেই, নিয়ে এস তোমাকে দিযে দেব।" ঘোষের পো বলে,—আমি চাকর বাকর মানুষ, আমি টাকা কোথায পাব। কুমুদ তখন তাকে বলেন পুঁটুবিবিকে ডেকে আনতে. তারপব ভাবেন. গোটা তুই টাকা পেলে মনটা স্থির হয। "আমি পূর্ব্বে মদের বিরুদ্ধে কত বক্তৃতা দিয়েছি, কত ঘৃণা ছিল, এখন এই পথেই সর্ব্বনাশ হল। কতকগুলি ইয়ার জুটে আমার এই অবস্থা। বন্ধুদের উপর আমার বিশ্বাস ছিল, আমি বেশ জানি বেশ্যারা কখনও ভালবাসতে জানে না। ভালবাসবার জন্য কতকগুলি টাকা নষ্ট করলাম।" সবনাশের মূল তাঁর বন্ধুরা। ভোলাখুড়োকে এখন আর পাওযা যায় না।

ঘোষের পো-কে দিয়ে পুঁটুকে ডাকা হযেছিলো। পুঁটুবিবি এসে বলে,— "কেন নাথ! আজ কি জন্য ডাকছিলে? পুঁটু তারপর নানা কথায় ভালবাসা দেখায়। কুমুদনাথ বলেন, ওসব এখন তাঁর ভালো লাগছে না। এখন একটু মদের প্রয়োজন। তারপর অসুবিধে দেখে কুমুদনাথ রেগে চলে যেতে চাইলে, পুঁটেহরি তাঁকে "প্রাণনাথ" বলে পথ আটকায়। ঘোষের পো মনে মনে ভাবে,—"আমি ভাবতাম পুঁটু সরল, এখন দেখছি কি সর্ব্বনেশে।"

সে নিজে সত্যিই প্রতারিত হয়েছে। আর, কুমুদেরও একই অবস্থা। পাছে মদের টাকা দিতে হয়, এই জন্যে পুঁটে গান গেয়ে আর নেচে ওসব প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিতে চাইছে। "আমার মতন বেকার অভাব নেই, এখন আক্কেল হলো।" কুমুদনাথ ভাবেন, হয়তো পুঁটেহরি এখনো মদের নেশায় আছেন। টাকার কথায় পুঁটি বলে,—"টাকা মদের নেশায় জলের মতো উড়িয়েছে, এখন আমার এই দুখানা গহনা আছে।" এসব দেখে ভূপেন ভাবে, একেও ঘোষের পো করবার তালে আছে। এখন ভূপেনের দিব্যজ্ঞান হযেছে। কুমুদনাথের একটি কথার জবাবে পুঁটে বলে, ভোলাখুড়ো আর আসবে না। এক হাজার টাকা লিখিয়ে একশ টাকা নিযে বাড়ীটা লেখা পড়া করে দিয়েছে কুমুদনাথ মদের ঝোঁকে। এখন সে টাকা ধার করলে আর শুধ্‌তে পারবে না। কুমুদনাথ ভাবে, এবার তিনি পথে বসেছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বল্‌লেন,—আমার কি আছে না আছে সে জানবে কি করে! আমার এখনও অনেক সম্পত্তি আছে। মাতামহের জমিদারী পেয়েছি বিশ/তিরিশ লক্ষ টাকার। পুঁটে একথা শুনে মনে মনে ভাবে,—কুমুদের এখনো যা আছে, তাতে তাকে আরও ৪/৫ বছর ঝুলিয়ে চালানো যাবে। এই ভেবে কুমুদনাথকে হাতে রাখবার জন্যে সে বলে,—মদ খেলে কুমুদনাথের জ্ঞান থাকে না,—

"তাইতে নিষেধ করি যাদুমণি।
সহজে হবে না মজাবে দুঃখিনী।"

পুঁটেহরি বেশ্যা টাকা আনতে চলে যায়। কুমুদনাথ ঘোষের পো-কে মাথা টিপতে বল্‌লেন। এতোদিনের ছদ্মবেশী ঘোষের পো এক কালের ধনী ভূপেন কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়। কুমুদনাথ অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে ঘোষের পো বলে,—কুমুদকে এবার ঘোষের পো হতে হবে, আর তার এবার ছুটি। তখন ভূপেন সব ঘটনা খুলে নিজের পরিচয় দেয়—সে ছিলো বর্ধমানের ধনী জমিদার ভূপেননাথ মুখোপাধ্যায়। এখন তাদের দুজনেরই মৃত্যুই মঙ্গল।—

"প্রেম যে করেছে সে মজেছে, তুই মজিস্‌ নে সই।
তুই মজিস্‌ নে সই ওলো তুই মজিস্‌ নে সই।"

বেশ্যার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রচুর প্রহসন থাকলেও আর্থিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য প্রহসনের বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না বলে এখানে সেগুলো উপস্থাপন করা চলে না।

ঘটকালি ॥—

ঠাকুর পো (১৮৮৬ খৃঃ)—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ প্রহসন শেষে প্রহসনকার একটি ছড়া দিয়েছেন,—

"জন্ম গেল, কর্ম্ম গেল
গুরো ডাকে কড়োর কোঁ।
আছি আমি সখীদিদির
জগৎ মোহন ঠাকুর পো !"

ব্যক্তিগত আক্রমণযুক্ত এই প্রহসনটির মধ্যে সমসাময়িক ঘটনার ইঙ্গিত যা-ই থাকুক না কেন, এই সমস্ত ঘটনার অবকাশ সমসাময়িক সমাজজীবনে আকস্মিক নয়। বৈবাহিক প্রথাঘটিত যৌন ও আনুষঙ্গিক আর্থিক দুর্নীতি সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যা উপস্থাপন করা হয়েছে, তার থেকে এই চিত্রটির বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ অবাস্তব।

কাহিনী।—জ্যোৎস্না রাতে গ্রাম্য পথে সমাজ সংস্কারক পকেট ঘোষ (He-pocket) চলেছে। একা-একাই সে মন্তব্য করে, অনেক কষ্টে চালাকী করে সে একটা ঘড়া সরাতে পেরেছে। লংলাল—ইয়ারী যার পেশা—আড়ালে লুকিয়ে তার মন্তব্য শুনতে লাগ্‌লো ! পকেট বল্‌তে লাগ্‌লো ঘড়াটা সে দশ আনায় বিক্রী করেছে,—তাও মদের খরচে তা চলে গেছে। যদি থাকতো তাহলে কয়েকদিন খাওয়ার জন্যে ভাবতে হতো না। পকেট দিনের বেলা কোথাও বেরোতে পারে না। রাত পোহালেই তার উপবাস। পকেট নানা কথা ভাবছে, এমন সময় লংলাল আত্মপ্রকাশ করে। পকেট তাকে বলে, সে এবং তার স্ত্রী দুজনেই সমাজ সংস্কারক। এবার তার বাড়ীতে সভায় নিজেকেই সভাপতি হতে হবে। দ্বিজবর নামে একজন এই সভার সভ্য হয়েছে। পকেট মন্তব্য করে শুঁড়ীর দোকানেই অবশ্য এই নামটা বেশি শোনা যায়, দ্বিজবর যদি সেই প্রকৃতির লোক হয়, তবে বেশ মৌতাত করা যাবে। পকেট টাকা রোজগারের একটা চালাকীর কথা লংকে বলে। উপায়টা এই,—বঙ্গবাসী কাগজে একটা নতুন পুস্তকের বিজ্ঞাপন পাঠাতে হবে। যে ব্যক্তি বিশ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ করে দেবে তাকে এক সেই পুস্তক এবং মায়ের নথ পুরস্কার দেওয়া হবে। পুস্তকের মূল্য অগ্রিম নিতে হবে। পরে অবশ্য পুরস্কার বা অন্য কিছুই দেওয়া হবে না। একথা বলার পর লংলালকে নিজের

ইয়ার করে নেয়। সে বলে,—"তোমার পেটে ভাত নাই। সভায় বক্তৃতা দিতে উঠলে পেটের কাপড় খুলে যাবে। তবুও ভারী বুদ্ধি ধর।" শেষে পকেট লংলালকে নিয়ে ভূতীর মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। ভূতীর মার প্রশংসা করে পকেট বলে,—"ভূতীর মা খুব ভাল লোক। বয়স মোটে এই ৬০; বেশ আদর যত্ন করে। ওর কাছে তার পাঁচ পয়সা জমাও আছে। খাসা মেয়েমানুষ!"

এদের সমগোত্রীয় আর একজন আছে—সে তিলকঠাকুর। একটা ভাঙা ঘরে 'রক্ত-বাহিনী সভার' সে সভাপতি। সভাপতির ভাষণে সে বলে, যাতে দেশের ছেলে মেয়েদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার মতে, "পঞ্চম বর্ষ হইতে পঞ্চাধিক নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত শুভ বিবাহের প্রসিদ্ধ কাল।" সভাপতির স্ত্রীও বক্তৃতা দেয়। সে বলে,—ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিয়ে দেওয়া দোষের। পকেটও সেই সভায় উপস্থিত ছিলো। এসব কথায়, বিশেষ করে তিলকের কথায় বাধা দিয়ে পকেট বলে, এসব প্রলাপ বকবার কোনো অর্থ হয় না। রক্ত-বাহিনী সভার উদ্দেশ্য এটা নয়। সুরেশ প্রস্তাব করে, স্ত্রীলোক যাকে ইচ্ছে, তাকেই পতিত্বে বরণ করবে, এটাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নারী স্বাধীনতার অভাবেই তো এদেশের এমন দুর্গতি! সভা ভঙ্গ হয়। সবাই চলে যায়। থাকে শুধু তিলকঠাকুর। এমন সময় সখীদিদি আসে। সখীদিদি গুরুদাসের মা। গুরুদাস হাবা-কালা। সখীদিদি তিলককে বলে, তার ছেলে হাবা গোবা বলে কি তায় বিয়ে হবে না! কুড়ি বছরেও কি সে বৌয়ের মুখ দেখবে না! তিলক আশ্বাস দেয়। ঘটকালির জন্যে টাকাও চায় সে। সখীদিদি বলে,—"আমিই তোমার ঘটকালী।" তিলক একথা শুনে আহ্লাদে বলে ওঠে,—তবে একদিনেই সে বিয়ের ব্যবস্থা দিতে পারে।

পকেটেরই এক সম্পন্ন প্রতিবেশী অনাথনাথের অন্তঃপুরে মেয়ে মহলে গুরুদাসের বিয়ে নিয়ে জল্পনা চলে। একাজ তিলক ছাড়া আর কেই বা করবে! আরো শোনা যাচ্ছে, তিলক নাকি সখীদিদিকে চুমো খেয়েছে। সখীদিদির এখনো রস আছে! গুরুদাসের ভয়ে পাত্রীটি এখানে পালিয়ে এসেছিলো, কিন্তু তিলক তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়।

তিলকঠাকুর সখীদিদির কাছে যায়। সখীর কাপড়ের বাহার দেখে তিলক উচ্ছ্বসিত স্বরে স্তাবকতা সুরু করে। যাহোক দুজনেই বেয়াইয়ের আসবার

অপেক্ষায় থাকে। এমন সময়ে এদের মধ্যে ঠাট্টা ইয়ারকি চলতে থাকে। শেষে নসীরাম মাস্‌চটক্ নামে ভদ্রলোক প্রতিবেশী ভোলানাথের সঙ্গে আসেন। তিলক হুঁকো-তামাক আনবার জন্যে কৃত্রিম হাঁকাহাঁকি জুড়ে দেয়। তিলক এঁদের কাছে পঞ্চমুখে ছেলের গুণের কথা বলে। অনেক দেরী হওয়ায় নসীরাম আর ভোলানাথ সন্তুষ্ট হয়ে সম্বন্ধ স্থির করে চলে যায়। সখী হেসে বলে, "ঠাকুর পো তামাকটাও পর্য্যন্ত খরচ হলো না, তোমার বুদ্ধি আছে।" তারপর আরও খানিকক্ষণ ঠাট্টা ইয়ারকি চলবার পর তারা চলে যায়।

বিয়ের দিন। নসীরামের বাড়ী কন্যাপক্ষের লোক বসে আছে বরের আশায়। সকলে মন্তব্য করে, বড়লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ করবার মানেই এমন! তাদের সময় ঠিক থাকে না। অনেক পরে শেষে তিলকঠাকুর আসে। এসে সে বলে,—বরের খুড়োকে মাঝপথে হঠাৎ সাপে কামড়েছে। এই কারণে লগ্ন পার হবার ভয়ে বিয়ের বাদ্য সকল ছেড়ে বরকে নিয়ে সে-ই শুধু একা এসেছে। সকলে মিলে বরকে ভেতরে নিয়ে যায়। পিঁড়িতে বসিয়ে পুরোত্ তার নামগোত্র জিজ্ঞেস করলে তিলকই তা বলে দেয়। তিলক মন্তব্য করে,—"বর বড়লোক, সুখের পায়রা, চেঁচিয়ে বলা তাদের অভ্যাস নয়। এই সময় দশটা বাজে। অধৈর্য তিলক হেঁকে ওঠে—শীঘ্র বিনামন্ত্রে বিয়ে দাও। স্ত্রী আচারের ব্যবস্থা করো।"

ছায়ামণ্ডপে বরকে ঘিরে বসেছে রঙ্গিনীরা। তারা সবাই মিলে বরের পিঠে কিল মারতে সুরু করে। কিল খেয়ে গুরুদাস কোঁ কোঁ গোঁ গোঁ করে। ব্যাপার দেখে রঙ্গিনীরা ভয় পেয়ে চীৎকার করতে থাকে। সবাই এবার বুঝতে পারে, বর হচ্ছে বোবা আর কালা। নসীরাম অত্যন্ত চটে গিয়ে তিলক-ঠাকুরকে ধরতে যায়। পালাতে গিয়ে তিলকঠাকুর ধরা পড়ে যায়। তিলক-ঠাকুরের পিঠে রঙ্গিনীরা ক্রমাগত ঝাঁটা মারতে থাকে। বিয়ের আগে তিলক নসীরামের কাছে পাঁচশো টাকা চেয়েছিলো। "এই দিচ্ছি"—বলে লাথি মারলো তিলকঠাকুরের পিঠে। লাথি খেয়ে তিলকঠাকুর সখীদিদি আর গুরুদাসকে ডাকতে থাকে উদ্ধারের আশায়। খেদ করে তিলকঠাকুর বলে,—"চিরকাল চালাকী করে এসেছি। সকলের অমঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে এসেছি। আর এখন রক্ত-বাহিনীর সভ্য হয়ে গয়লানীর ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে দিতে এসে এখানেই পরাজয় হল।" তিলকঠাকুর শেষে নাকে খৎ দিয়ে ছাড়া পায়। যাবার সময় বলে যায়, এমন কাজ আর কি কেউ

করে। কেউ যেন আর রক্ত-বাহিনীর সভ্য না হয়। "এমন যে তুকান-কাটা, কালামুখো, বেহায়া তিলকঠাকুর আমি, সেই আমিই সাধ্বী সতী সখীদিদির জন্ম ঠকা জগৎমোহন ঠাকুর পো। এখন অনুমতি হয়, বিদায় হই, হয়ত এখুনি আবার হাসপাতালে যেতে হবে!!!"

অন্যান্য ॥—

বেল্লিক বাজার (১৮৮৭ খৃঃ)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। "বেল্লিক" শব্দটি ব্যালিক থেকে সম্ভবতঃ এসেছে। অর্থাৎ বেল্লিকপনা বলতে নির্লজ্জতাই বোঝানো হয়েছে। যৌননীতি ও আর্থিক আয়ব্যয়নীতিতে এই স্বার্থসর্বস্বতা নির্লজ্জতার নামান্তর। নামকরণের মাধ্যমে প্রহসনকার লজ্জাবোধ তথা ভাবপ্রবণতার প্রচার করে সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করেছেন। 'বাজার' শব্দটা প্রয়োগ করে ব্যাপকতা সম্পর্কে সতর্কের জন্যে আবেদন পরিস্ফুট। তবে হ্যাণ্ডনোট শিকারী দালালদের আয়নীতি সম্পর্কে প্রহসনকার প্রধানভাবে প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন।

কাহিনী।—নিমতলা ঘাটের রেজিষ্ট্রার কান্তিরাম শুই ভাবে, মানুষ আজকাল আর মরতেই চায় না। তার এবং মুদ্দফরাসদের প্রা প্ত সুযোগ একেবারে বন্ধ হয়েছে। এখানে এসে জোটে পুটীরাম ডাক্তার ও খুদিরাম উকীল। কিন্তু তাদের দিন আর চলে না। কেস্ আজকাল মেলেই না। তুজনেরই অবস্থা সমান, কিন্তু তুজনেই নিজের নিজের বৃত্তি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে। খুদিরাম বলে, "আগে শুনেছি, একটা গাছের ডাল নিয়ে ক্রোড় টাকার প্রপার্টি পার্টিসন্ হয়ে গেল—ফ্যাক্ট, তাদের ছেলেরা এখন সার্ভিং ক্লার্ক গিরি করছে।" পুটীরাম বিলেতে ডাক্তারদের সুবিধের কথা বলে।—"আমার একটি ফ্রেণ্ড বিলেত থেকে এসেছে, তার মুখে শুনলেম, সেখানে রোগ ক্রিয়েট্ করে সে ছ-মাস ছিল, তার ভিতর দেখে এসেছে সত্তরটা নতুন রোগ তয়ের হলো। আরও ডাক্তারদের কত দিকে কত লাভ। ডিস্পেন্সারির কমিস্‌ন, মদের দোকানের কমিসন্, ডাক্তারের রেকমেণ্ডেসন ছাড়া কি মিট্ কি ড্রিঙ্ক্, লোক কিছুই ইউজ্ করে না।" এদেশে কিছুই সুবিধে নেই, তবু বৃত্তিটা খারাপ নয়। "তেমন ভাল নার্ভাস পেষেণ্ট হলে ছমাস কেন এটেণ্ড কর না।" খুদীরামও বলে—"তেমন জিদি লোক হলে একটা সুটে যে তিন জেনারেসন কাটানো যায়।"

দোকাড় সেন হ্যাণ্ডনোটের দালাল। সে জান্‌তে আসে বুড়ো দয়াল নন্দী মরেছে কিনা। বলে, "মহাজনের হাতে টাকা প্রস্তুত, তার ছেলের কাছা গলায় দেখ্‌লেই দেয়।" অভ্যাস বশে রেজিষ্ট্রার দোকড়ির মুখে দয়াল নন্দীর নামটা শুনেই ভুল করে মৃত্যুর তালিকায় লিখে ফেলে। উকীল খুদিরাম পরামর্শ দেয়,—"ও চলে যাবে এখন, ঐ একটা বুড়ীকে অন্তর্জ্জলী করছে, ও নামটা আর লিখ না, তোমার টোটেল বৈত নয়—অমন তো কর!" উকীলের কথায় রাগ্‌তে গিয়ে রাগ্‌তে পারে না, কারণ উকীল তার ছেলের একটা চাকরীর আশা দিয়ে রেখেছে।

দোকড়ি সেন পুটীরাম ও খুদিরামকে বলে, কেস্ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। দয়াল নন্দীর বাড়ীতেই তাদের দুজনের চলে যাবে। "ক্যাশ (case) খুব জবর। পার্টিসন্ কেস এক্‌জবিসন্ হতে পারে। মদ খেয়ে হাত পা ভাঙ্গা অন্ততঃ মাসে দুটো পাবেন। মারামারির মোকদ্দমা পুলিসে হপ্তায় একটা ধরেন। রাঁর মোটা করবার জন্য টোনিকটা রোজ চল্‌বে, রাঁরের বাবী খারদের লেখাপড়াও হবে। ইয়ার বান্ধর লিভার আস্‌টাও আছে, মার আর পারবারের খোরাকির নালিশটা একেবারে পাকা করে রাখুন। আর কত বল্‌বো, আপনারা ইংরাজী পড়ছেন, আরও কত কি কার নিতি পারবেন।"

দয়াল নন্দী মারা গেছেন, সংবাদ পাওয়া গেলো। মরবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন 'বেল্লিক' জুটে গেলেন। তিনি ভট্টাচার্য, বিধান দিয়ে কিছু অর্থ আত্মসাৎ করতে চান তিনি। তিনি জানেন, বড়লোকের ছেলে কষ্ট পেতে চায় না। উপযুক্ত সহায় হলেন দয়াল নন্দীর পুত্র ললিতের পিসীমা। তবে দয়ালের স্ত্রী বিধানের নামে এতোটা অশ্রদ্ধা চান না। পিসী বলেন, এ হাবাষ্য করতে পারবে না—দুধের ছেলে! ললিত বলে, নিরামিষ ভালো, শীতকালে ভালো, তরীতরকারী। মাঝে মাঝে হাঁসের ডিম ভাতে দেওয়া যাবে। পিসী ললিতকে পশমের জুতো পরাবার জন্যে বিধান চায়। ভট্টচার্য বলেন,—"বড়লোকে এমন দেয়, বলি শ্রাদ্ধ কিরূপ হবে? দান সাগর শ্রাদ্ধে সকল দোষই খণ্ডে যায়।" পিসী পাছে ভট্টাচার্যকে ছেড়ে নবদ্বীপ থেকে ব্যবস্থা আনান, সেই ভয়ে ভট্টাচার্য বলেন,—"তা সাহেববাড়ী থেকে মৃগ চর্ম্মের জুতা করে নাও না, হরিণের চামে দোষ নাই। নবদ্বীপের ভট্টাচায্যি ব্যবস্থা দিতে পারে, আমি আর পারি নি? ব্যবস্থার মত পয়সা দেয় কে? পিত্যেসের মধ্যে একটী মধু পর্কের বাটী! দান সাগর শ্রাদ্ধ হলো রাজসিক শ্রাদ্ধ, তা

যদি করেন তো সকল বিধিই আছে। মনু বলেছেন, কলৌ তামসিক শ্রাদ্ধ রাজসিক ধনেশ্বরে। ত্রেতায়াং সাত্ত্বিক শ্রাদ্ধ সংগ্রাম নরবানরে॥ দ্বিজ পুরোহিতো তুষ্টা, সর্ব্বদোষ হরে হর। কলৌ ধন্য ধনাঢ্যেন, যৎ কৃত্বা দান সাগর॥ কিনা, কলির হলো গে তামসিক শ্রাদ্ধ, আর যারা বড়লোক, তারা রাজসিক করবে, ত্রেতায় ছিল গে সাত্ত্বিক শ্রাদ্ধ বড় কঠিন, বিভীষণ করেছিল সইলো না, নরবানরের যুদ্ধ হলো ; বামুন পুরুতকে সন্তুষ্ট করতে পারলো স্বয়ং মহাদেব নিজে সব দোষ অপহরণ করেন। কলিতে দান সাগর করলে ধন্য ধন্য হয়, দান সাগর শ্রাদ্ধ কর, ললিতবাবু সব করতে পারেন।

এদিকে ললিত পুরোহিতের টিকি চেপে ধরে আমিষ খাবার ব্যবস্থা চায়। ভট্টাচার্য বলেন, "তা আপনার যা ইচ্ছে করবেন, কিন্তু হ-হ-হবিষ্যি ভোজন গোপনে করতে হয়, গোপনে করতে হয়।" কিন্তু ললিত গোপনে করতে চায় না, পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে টেবিলে বসে খেতে চায় সে। ভট্টাচার্য তখন বলেন, "কি জানেন ললিতবাবু, গরীব ব্রাহ্মণ আছি, দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন, আমি আপনার হয়ে সব নিয়ম পালন করে দেব, আমাব মূল্য ধরে দেবেন ; পুরোহিতের উপর সব ভার চলে, সব ভার চলে।" ব্যবস্থা দিয়ে পুরোহিত পরিত্রাণ পায়।

অপর বেল্লিক দোকড়ি ইতিমধ্যে এসে জোটে। নাবালক ললিতের শ্বশুর executor হয়েছেন। অথচ তিরিশ হাজার টাকা ললিতের দরকার। দোকড়ি বলে, ললিত যতো ইচ্ছে টাকা পেতে পারে—শুধু একটা সই !

পুটীরাম ও খুদিরামও যথাসময়ে এসে পড়লো। উকীল খুদিরামকে বলে, এটা যখন তার পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তি, তখন ললিত উইল সেট্ অ্যাসাইডের নালিশ করুক, তাহলেই এক্‌জিকিউটার থাকবে না। বন্ধু পুটীরাম ডাক্তার সাক্ষী দেবে যে উইল লেখবার সময় পিতার মস্তিষ্ক দোষ ছিলো ; পরে খুদিরাম বলে, "ফাদারের মৃত্যুজাল, উইল জাল, ললিতের শ্বশুর ট্রান্সপোর্ট হবে। শ্বশুর আব দোকড়ি দালালের কন্‌স্পিরেসীতে একটা রীতিমতো ফর্জারি কেস।" দোকড়ি টাকা সাহায্য করে—এই জন্যে ললিত দোকড়িকে জড়াতে বারণ করলে খুদিরাম বলে, সে কম সুদে টাকা ধার করিয়ে দেবে। দোকড়ির উপকার পেয়ে বেল্লিক খুদিরাম শেষে দোকড়িরই সর্বনাশে তৎপর হয় !

এদিকে পুটীরাম ডাক্তারের চেষ্টা থাকে ললিতকে বিলাষিতা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠার লোভ দেখিয়ে কিছু অর্থ দোহন করবে। ললিতকে সে বলে, কেন

তিনি "এই বাজারে নারকেল তেল মাখা পব্‌লিক ওম্যানগুলোর সঙ্গে মিক্‌স্‌" করেন ? English Armenian German লেডিস্‌দের সঙ্গে সে আলাপ করিয়ে দেবে, সেই অনুযায়ী পোষাকেরও ব্যবস্থা করিয়ে দেবে। উৎসাহের আতিশয্যে খুদিরামও বলে,—"সুট ফাইল করুন—বড় বড় বেরিষ্টারের সঙ্গে আলাপ হবে, তাদের থ্রুতে আপনার এমন পজিসন করে দেব যে লিভিতে (Levee) পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ হবে আর এনজয়মেণ্টও ফাষ্ট ক্লাস হবে।" পুঁটী ডাক্তার ললিতকে বোঝায়, "একটা পলিটীক্যাল পার্টি করবো আমরা—.. যাতে স্ত্রী স্বাধীনতা হয়, বিধবা বিবাহ হয়, খাওয়া দাওয়ার রেষ্ট্রীকসন্‌ উঠে যায়, ন্যাশন্যাল এনারজি বাড়ে, এমন সব কায করতে হবে।" পুঁটীরাম খুদিরামকে ডেকে চুপি চুপি বলে,—"সর্ব্বদা ওকে চোকে চোকে রাখ্‌তে হবে, এ সহরে তো সুধু তুমি আর আমি ছিপ্‌ নিয়ে ফিরছি নি, এত বড় কাত্‌লা গা ভাসান দিলে অনেকেই গাঁথবার চেষ্টায় ঘুরবে। মদ মেয়েমানুষের চার, বড জবর চার।" এরা একা সামাল দিতে পারবে না, তাই অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিসেবে পুঁটীরামের ভাইপো 'নসে' এবং খুদিরামের সাভিং ক্লার্ক থাক্‌বে। এরা "কলিঙ্গের বিবি আর জাহাজি গোরা এনে ওর সঙ্গে ইয়ারকি দেওযাবে, মিছিমিছি কাকেও বল্‌বে মেজিষ্ট্রেট, কাকেও বল্‌বে বেরিষ্টারের মেম।"

নসীরাম ও মুক্তারাম নিযুক্ত হলো। নসী ললিতকে বুদ্ধি দেয়, বাড়ীতে একটা "ইণ্টারনেশন্যাল পলিটিকো-সোসিয়েল প্রসেসন" হোক। সে বলে,— "আমাদের ইণ্টারনেশন্যালের মতলবটা কি জান ? যেমন উইলসনের হল্‌ অব্‌ অল্‌ নেসন, তেমনি খ্রীষ্টমাস হবে পরব অব্‌ অল্‌ নেসন। ইহুদী, পার্শি, মোগল, চীনেম্যান, মাদ্রাজি, সব জাত একসঙ্গে গান বাজ্‌না আহারাদি করবে।" ললিত বলে, সাহেবদের সঙ্গে বাংলা কথা কইলে তারা মুখ্যু ঠাওরাবে। সে বরং উল্টো বাংলা কথা কইবে, সাহেবরা জান্‌বে মাদ্রাজী কথা বলছে। নসী বলে,—"সে মন্দ নয়, একটা বিজাতীয় ভাষায় কথা কওয়া চাই, তাতে রেসপেক্‌টেবিলিটী বাড়ে।" সাহেবদের সঙ্গে মিশ্‌তে ললিতের সঙ্কোচ নেই, তবে ঘুসির ভয়। মুক্তারাম বলে, "তুই একটা আমোদ করে মারে, সয়ে যাবে, এই আমরা যে কত গোরার ঘুসি খেয়েছি।" নসী বলে,—"মাগী গুলো (ললিতের মাতৃস্থানীয়া গুরুজনরা) তফাৎ হয় সে ভাল, রিফরমেসনের পথে বিষম কণ্টক।"

ললিতের অনাচার দেখে ললিতের মা বাপেরবাড়ী যান, পিসী যান

বৃন্দাবনে। শ্বশুর শিবু চৌধুরী ভাবেন Deputy Commissioner-কে চিঠি লিখে জানাবেন। দোকড়ি ব্যাপার দেখে পুঁটীরামদের কাছে হার মানে।

বড়দিনে ললিতের বাড়ীতে "বিবির নাচ" হবে। ললিতের স্ত্রী বাপের-বাড়ীতে। ললিত মুটিয়াকে দিয়ে শুয়োর আর গরুর মাংস শ্বশুরকে ভেট পাঠায় আর বলে পাঠায়, এই নাচে তার স্ত্রীকে দরকার। ভেট ফিরিয়ে দিয়ে শ্বশুর বলে,—"আজ থেকে সে আর জামাই নয়, আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে।"

ললিতের বাড়ীতে মহা ধুমধাম। দোকড়ি রাস্তা থেকে দুজন মাতাল গোরাকে বিনে পয়সায় মদ খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে। খুদি আর পুঁটী নিজেদের পরিবার সাজিয়ে কামিনী আর প্রসন্ন নামে দুই বাজারে-বেশ্যাকে নিয়ে আসে। ললিত বলে সে রায়বাহাদুর হতে চায়। নসী বলে, এ ভাবে দুটো খ্রীষ্টমাস করে কাগজে ছাপালেই রায়বাহাদুর হয়ে যাবে। মদ্য-পানোৎসবের মধ্যে নসীরাম হঠাৎ বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে ওঠে,—"আমি আর কারুর কথা শুনবো না; আমার দম ফেটে যাচ্ছে, আমি স্পীচ আরম্ভ করি। লেডিস্ এণ্ড জেণ্টেলমেন্, না জাগিলে সব ভারতললনা, এ ভারত কভু জাগে না জাগে না।" মত্ত গোরারা খ্রীষ্টমাসের গান গায়। বেল্লিক-বাজার মেতে ওঠে বড়দিনের উৎসবে।

কানাকড়ি (১৮৮৮ খৃঃ)—রাজকৃষ্ণ রায়॥ সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিভিন্ন বৃত্তির ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাগত মূল্য এখানে বিশেষ দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে বৃত্তিগ্রাহী ব্যক্তিদের আয়নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গ এতে বর্ণিত আছে বলে এবং সামগ্রিকভাবে আর্থিক মূল্যকে প্রধানভাবে দেখা হয়েছে বলে প্রদর্শনীর সুবিধার জন্যে এটি এখানে উপস্থাপন করা অসঙ্গত হবে না। কানাকড়িতে উপস্থাপিত "মাল" গুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সেগুলো উপস্থাপনের মূলে যৌন আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক—তিন প্রকার চেতনাই বিদ্যমান, কিন্তু দ্বিতীয়টির মূল্য প্রধান। প্রধানভাবে উপস্থাপিত—(১) এটর্নি; (২) ডাক্তার; (৩) এডিটার; (৪) অফিসের হেডবাবু; (৫) ক্রিটিক। তাছাড়া "পচা ধসা ঘসা অসার অপদার্থ নিরেট মূর্খ জানোয়ার"-দের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। "গ্রন্থকার—কবি—ব্যবসাদার—হাকিম—সংবাদ-পত্রে ঔষধ-পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপনদাতা—শিক্ষাগুরু—দীক্ষাগুরু—দাতা—কৃপণ—মহাজন—উকীল—ব্যারিষ্টার—ভণ্ড চূড়ামণি—মুখোসপরা বন্ধু—মাতাল—গুলীখোর—চণ্ডুখোর—গাঁজাখোর—আফিংখোর—ফোতো নবাব

—ফোতোবাবু—মেগের বশ—বেশ্যা—বেশ্যাভক্ত লম্পট—বখাট—বদমায়েস—চোর—জুয়াচোর—দালাল—মোক্তার—উকীল—বদ্‌ইয়ার—মুখে মধু পেটে বিষ—সুদখোর লোভী—চুগলখোর—থিয়েটারে ঢুকে উচ্ছন্ন যাওয়া বখাট—মিথ্যাবাদী—কুকর্ম্মী—অধর্ম্মী—পরশ্রীকাতর—খল—অখাদ্যখাদক—পরনারীগামী—জ্ঞাতি-কুটুম্ব রমণীগামী—গুরুতল্পগামী—পরস্বাপহারী—ব্রহ্মস্বাপহারী—দেবস্বাপহারী—ব্যভিচারী—ব্যভিচারিণী—পরনিন্দুক—হিংস্ক—পশুঘাতক—নরঘাতক—রাজদ্রোহী—প্রভুদ্রোহী—মিত্রদ্রোহী—নিমকহারাম—খোসামুদে—মোসাহেব—আত্মশ্লাঘাকারী—চোর—গ্রন্থকার—পরের মন্দ ভাগানুকরণপ্রিয় ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।” তালিকাটি লক্ষ্য করলে বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

কাহিনী।—মেসার্স মেকেঞ্জি লায়েল এণ্ড কোম্পানীর নীলামঘরের কাছে নন্দলাল বসু, ছন্নামল্‌ জহুরী, হরেকচাঁদ নাথুরাম মাড়ওয়ারী, আবদুল মিঞা ও জগবন্ধু উড়িয়া এসে জড়ো হয়। তখন এগারোটা বাজে নি। এগারোটা বাজলে টম্‌সন্‌ সাহেব এলেন হরিবল্লভ কেরাণী আর লট্‌কু কুলীকে নিয়ে। লাটের মাল একে একে বার করা হয়। এক নম্বর লাট এটর্নী। মালের পরিচয় মাল নিজেই দেয়।—“আমি না পড়ে পণ্ডিত। উকীলরা বি. এল্‌. পাশ করে তবে ওকালতী করতে পায়, কিন্তু আমি হেন এটর্নী শর্ম্মা বিনা পাশে উত্তীর্ণ হয়ে মক্কেলের ভিটেয় ঘুঘু চরাই।······যে মামলাটা দশ হাজার টাকার কমে মিট্‌বে না, সেটা দু-তিন শ টাকায় মিট্‌বে বলে মক্কেলের পো-কে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলি। ফাঁদে একবার জড়াতে পাল্লেই বস্‌—আর যায় কোথা! শেষে ফাঁকির খাঁচাতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দু'শর জায়গায় দশ হাজার টাকা।······আর দেখুন, কোন কোন মক্কেলের কাছে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যারিষ্টারের পো-কে বড় জোর হাজার টাকা দিয়ে কাজ সারি—চার চার হাজার একদমে মারি।··· বেশী কি বল্‌বো,—গুরুমন্ত্র শুনুন—“এটর্নী খেল্‌লে ফিকির মক্কেলের পো অম্নি ফকির।” বড্ড ওম্‌দা চিজ ভাবে মিয়া সাহেব। এটর্নী বলে, এটর্নী মানে অতরণী অর্থাৎ তরণীর সতো তরায় না, ডোবায়। খদ্দেরদের মধ্যে আট কড়া কানাকড়ি দিয়ে আব্দুল মিঞাই তাকে কিনে নেয়।

তারপর দু নম্বর মাল বেরোয়—ডাক্তার। মাল নিজের পরিচয় দেয়।—“আমি আগে ছিলেম নিটিব ডাক্তার—ক্রমে আসিস্টাণ্ট সার্জন—শেষে হয়েছি সিভিল সার্জন, ক্রমে ক্রমে এল্‌, এম্‌, এস্‌, এম্‌, বি, এম্‌, ডি, এল্‌, আর, সি, পি,

এচ্, সি, এম্, সি, ইত্যাদি ইত্যাদি টাইটেল হোল্ডার হই।" নন্দলাল মন্তব্য করে এগুলো Title নয় Tie tail অর্থাৎ বাঁধ লেজ। বানান আলাদা হলেও মানান এক। ডাক্তার নিজের আরও পরিচয় দেয়। সে প্রথমে Anatomy শিখ্‌তে গিয়ে রোগীর হাড়ে দুব্বো গজাবার ফিকিরটা শিখে নিয়েছে। ডিসেক্‌সন্ অর্থাৎ মড়া কাটার বিদ্যে সে রোগীর বাড়ীতেও অ্যাপ্লাই করে। রোগী মারা গেলে ভিজিটের দরুণ ছলে বলে কিংবা কোর্টে নালিশ করে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। এও এক রকম মড়া-কাটা। এ ব্যাপারে ডাক্তার কাউকে ডরায় না—এমন কি যমকেও না। কারণ সে নিজেই যম। "মক্কেলের যম মোক্তার, রুগীর যম ডাক্তার।" এক কানাকড়ি দামে উড়ে জগবন্ধু খাগুইত কটকী ডাক্তারকে কিনে নেয়। ডাক্তারকে কিনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"এহে ডগতর! তুম্ভে কঁড় কঁড় জিনিস খাইবাকু লাগ?" ডাক্তার উত্তর দেয়—Bread, meat and wine। অনেক কষ্টে তার অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হলে জগবন্ধু ঘৃণায় বলে ওঠে—"ছি ছি ছি! জগন্নাথ প্রভু। এ মোতে কঁড মিলিলে? গুটে মতাড়! হায় হায়, তিনগুটে কানা কৌড়ি ইমিতি করি মু মিচ্ছামিচ্ছি নাশ করিল!" শেষে জগবন্ধু সিদ্ধান্ত করে—"ডগতরকু মু কঁড় ব্রাহ্মণর দান দিবে।"

তিন নম্বর মাল ওঠায়—এডিটর। নন্দলাল নিজেই এডিটরকে চিন্‌তে পেরে খদ্দেরদের চিনিয়ে দেয়।—ইনি Editor নন, Aid-eater. "এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে 'সাহায্য ভক্ষক' কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ জুয়াচোর।" "এডিটররা দুর্ভিক্ষ পীড়িত, রোগপীড়িত, চা-কর পীড়িত, নীলকর পীড়িত, হাকিম পীড়িত, মহামারী পীড়িতদের জন্যে পত্রিকার তরফ থেকে চাঁদা আদায় করেন।" এডিটরই নিজের পরিচয় দেয়—"আমার বিদ্যের দৌড় বটতলার শিশুবোধ পর্য্যন্ত। ফার্ষ্ট বুক অব্ স্পেলিং খানারও পাত পাঁচ ছয় ওষুধ গেলার মত দিন কয়েক আউড়েছিলেম।' চাকরীর চেষ্টায় এডিটর নানা জায়গায় ঘুরেছে, কিন্তু "বিদ্যের তেজ দেখে চাকরী ঠিকরে পালাতে লাগলো। কিন্তু এদিকে ক্ষিদে কমে না—ওদিকে সিদে জমে না।...ঝাঁ করে একখানা খবরের কাগজ প্রকাশ করে আকাশ ধরলেম। বেকার অবস্থায় বেঁড়ে ছিলেম, কিন্তু খবরের কাগজ খানা আমার মহাদীর্ঘ লাঙ্গুলস্বরূপ হলো। মেপে শেষ করে কার সাধ্য! কৌশল করে মাথামুণ্ডু ছাইভস্ম যা লিখি তাতেই পোয়া বারো। আজ যা লিখি, কাল তা নিজেই কাটি—অর্থাৎ থুথু ফেলে আবার চাটি।"

ভট্টাচার্যের বিধানে পিরু মিঞার হাতে মুরগীর মাংস খেযে এডিটর হিন্দুধর্মের সংস্কারও করেছে। এডিটরের এতো গুণ দেখে এক কানাকড়ি দিয়ে হরেক চাঁদ তাকে কিনে নেয়। সে এর মাথায় আড়াইমন বিলিতি কাপড় চাপিয়ে রাস্তায় সেগুলো বেচবে।

তারপর চার নম্বর লাট—অফিসের হেডবাবুকে ওঠানো হয়। হেডবাবু নিজের পরিচয় দেয়—সে 'G—'office-এর হেডবাবু। "যেমন খাইবার পাশের পশ্চিমে কাবুল—পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া, তেম্নি আমার ডাইনে সাহেব—বাঁয়ে বাঙ্গালী, .. আমার পথ দিয়ে বাঙ্গালী কেরাণীবাবুকে সাহেবের কাছে যেতে হয়। কিন্তু আমাকে আগে পরিতুষ্ট না করলে কার সাধ্য সাহেবের কাছে ঘেষে? আমার উপরওয়ালা সাহেব মহোদয়গণের যুতসই জুতো আঁটিত পায়ে বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘড়ি ঘড়ি পড়ি। তাই তো আমি নব্বই টাকা মাইনে থেকে আজ নয়শত নিরানব্বই টাকার ধাক্কায় পড়েছি। আর এক টাকা হলেই বস্—এক হাজার টাকা! কিন্তু এরূপ পায়ে পড়ার শোধ তুলে নিতেও আমি খুব মজবুত। তাই আমার অধীনস্থ কেরাণীদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমার পায়ে পড়াই।" পরোপকারী বলেই সে নাকি অযোগ্য জেনেও আত্মীয় কুটুমদের আর তোষামুদেদের পঞ্চাশ টাকা পোষ্ট্ দিয়ে থাকে। নীলামের হাঁকে শেষে দুই কানাকড়ি উঠিয়ে ছন্নামল জহুরী তাকে কিনে ফেলে।

পাঁচ নম্বর লাট ওঠে ক্রিটিক্‌বাবু। মাল ওঠানো হয়েছে, এমন সময় এক খোঁড়া বুড়োকে বাক্সগাড়ী করে টান্‌তে টান্‌তে এক বুড়ী আসে। প্রথমে সাহেব ভাবে, এরা ভিখারি। গুণকীর্তন ততোক্ষণে সাহেবের কেরানী হরিবল্লভই সুরু করে দেয়।—"এই জিনিসটির নাম সমালোচক, কিন্তু কাজে লোচন শূন্য নিরেট পেচক! এঁদের বিদ্যেশূন্য ইয়ার বন্ধুরা ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু যা লিখুক, এঁরা তাদের স্বর্গে তুলে দেন। কেউ কিছু ঘুষ-ঘাস দিলে তাকেও মাথায় করে ঢাক বাজান। কিন্তু এক গ্লাসের ইয়ার না হলে, বা যাকে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা গোছের গ্রন্থকারেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ভাল ভাল পুস্তকাদি লিখ্‌লে এঁরা কঞ্চিকলমের এক খোঁচায় সাত কুঁচি করে জবাই করে।...এক ছটাক মদ দাও, তুমি দশ বৎসর পরে যে বই লিখ্‌বে, আজ তার দেড়গজী লম্বা সমালোচনা করে পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবেন। এই সকল গর্দ্দভরূপী সমালোচকেরা গরীব গ্রন্থকারদের গ্রন্থসকল না পড়ে—কেবল মলাটের এ পিঠ ও পিঠ দেখেই, যা খুসী তাই সমালোচনা করে, সুতরাং

বাবাকে শালা আর শালাকে বাবা বলে সমালোচকত্ব ফলিয়ে বসে।" সমালোচকের গুণকীর্তন শুনে খদ্দেরদের সবাই পিছিয়ে পড়ে। শেষে বুড়ী বলে, তার কাছে আধখানা ভাঙা একটা কানাকড়ি আছে। তাই দিয়ে সে মালটা কিনতে পারে। দ্বিরুক্তি না করে টমসন সাহেব আধখানা কানাকড়ি দিয়ে ডাক স্থরু করে। কিন্তু আর ডাক আসে না। স্থতরাং বুড়ীই সমালোচককে কিনে নিয়ে চলে। সে তাকে ধেঁ ডাব্‌ডোর বাক্সগাড়ীতে যুতে দেয়। বুড়ো তাকে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে চলে।

লাটের মাল সব ফুরিয়ে যায় যায়। লাঙ্গল কাঁধে হুঁকো হাতে একজন চাষা আসে। তার নাম জগু জেনা, বাড়ী কাঁসীপাড়া। এখানে গঙ্গার ওপারে হাপ্‌ড়্যাপ থাকে। নীলাম হবে শুনে সে এখানে এসেছে। সে শোনে পাঁচটা মাল নীলাম হয়ে গেলো। সে তখন আক্ষেপ করে, ঘণ্টা দুয়েক আগে এলে সে পাঁচটা মালই কিনতো। "চাব পেগ্যা দাম্‌ড়া গরুগুলোর বোড়ো বেশী দাম, বাবু। এ দুপেগ্যা দাম্‌ড়া গরু গুলা নীলামে খুব সস্তায় মিলে। সেই পাকে এখেনকে এস্যাছিনি।" হরি তাকে আশ্বাস দেয়,—"আবার এই রকম পচাধসা ঘষা অসার অপদার্থ নিরেট মূর্খ জ নোয়ার তাঁদের চোখে পড়লেই তাঁরা এখানে পাঠাবেন।" মিঞাসাহেবের কাছে চাষা খরিদ দামের চেয়ে কিছু বেশি ধরে দিয়ে মাল চাইতে গেলে মিঞাসাহেব বলে,—"উহুঁ! পারমু না—পারমু না। আমরা আসামের চা বাগিচায় এই কন্‌ডারে পাঠাইমু। সেহানে কুলীর বড় অভাব অইছে।"

হরিবল্লভ চাষাকে বলে কাল এমন অবণ্ড কিছু লাট বিক্রী হবার আসা আছে। ঐ কানাকড়ির ডাকেই হবে। হরিবল্লভ প্রচুর মালের ফিরিস্তি দেয়। চাষা আনন্দের চোটে বগল বাজাতে বাজাতে বলে,—"কানাকড়ি দুবো, দুবো, দুবো,—সেগুলার মুড়ি লুবো, লুবো, লুবো।" বৃত্তি ও অর্থনীতিকে প্রসঙ্গ করে রচিত প্রহসনের তালিকা বৃদ্ধি করা চলে। বৃত্তি ও অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রহসনকারের বক্তব্য অনেকটা মুখ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এমন কতকগুলো প্রহসনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত মূল্য বেশি থাকায় সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে নিছক আর্থিক দিক প্রধান হওয়ায় কয়েকটি প্রহসনের পরিচয় উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না।—

বারণাবতের লুকোচুরি (১৮৭৩ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত ॥ বারণাবত নামে একটি পুরাণপ্রসিদ্ধ স্থানকে (পৌরাণিক অভিধান, ২য় সং, ৩৪১ পৃঃ) প্রহসনে

উপস্থাপিত করে সেখানকার অর্থাৎ প্রকারান্তরে মফঃস্বলের পুলিশ কর্মচারীদের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য কুকাজ নিয়ে প্রহসনটি লেখা হয়েছে।

আড়কাটি (১৮৯৭ খৃঃ)—হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়॥ Mr Alpin নামে এক সাহেব তার দেশীয় দালাল আত্মারামের সহায়তায় মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে স্ত্রী পুরুষ কুলী সংগ্রহ করে মফঃস্বলে চালান দিতো। নাগসর্দার Mr Alpin-কে আটকিয়ে রাখে এবং প্রতিজ্ঞা করায়—যাতে কোনোদিন কুলীধরা ব্যবসা আর না করে। এইভাবে কুলীরা উদ্ধার পায়। মফঃস্বল থেকে কুলী চালানের ইতিহাস এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

পরিচয় বিহীন প্রচুর প্রহসনের তালিকা শেষে আছে। সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক প্রহসন আত্মগোপন করে আছে, যা হয়তো এখানে উপস্থাপন করা সম্ভবপর ছিলো। কিন্তু বর্তমানক্ষেত্রে গ্রন্থকার নিরুপায়।

৫। বিবিধ ॥—

সমাজের আর্থিক গোত্রের অন্তর্গত চিত্রের অবশিষ্ট উপকরণ এই বিভাগের মধ্যে ফেলা যায়। আয়ব্যয়নীতি এবং অবস্থা সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিকোণ অনেক ক্ষেত্রে নিছক পরিবেশনিরপেক্ষ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছে। যুগের সমাজচিত্রের দিক থেকে এগুলোর প্রত্যক্ষ মূল্য বিশেষ নেই। আপাতদৃষ্টিতে পরিবেশনিরপেক্ষ ব্যবহারও প্রকৃতপক্ষে সমাজ-সাপেক্ষ। সুতরাং সমাজমনোবিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে এসমস্ত উপকরণকে উপযোগী করে নেওয়া চলে। তাছাড়া সাধারণভাবে দেখ্‌লেও দেখা যায় যে দৃষ্টিকোণ যে-ভাবেই মুখ্যত উপস্থাপিত হোক না কেন, গৌণভাবে অন্যান্য যে দিকের সাক্ষাৎকার লাভ করি, তার মূল্য অন্য কোনো বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তাই আয়নীতি এবং ব্যয়নীতিঘটিত কতকগুলো প্রহসনকে এখানে উপস্থাপিত করতে পারি।

(ক) আয়নীতি ঘটিত।—

(কক) অর্থলোভ॥—

যে কোনও ধরনের রিপুর প্রাবল্য অনিষ্ট সাধন করে বলে সমাজ হিতৈষীরা এগুলোর বিরুদ্ধে প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করেছেন। জীবন ধারণের

রসদ অর্থ সম্পর্কে অত্যন্ত লোভও সমাজে গর্হিত বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। একদিকে তা যেমন অন্যান্য রিপুকে আনুষঙ্গিক হিসেবে মূল্য দেয়, তেমনি বণ্টনগত দিক থেকে সমস্যার সৃষ্টি করে সামাজিক বিশৃঙ্খলার নব নব ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনে এ ধরনের চারিত্রিক রিপুসর্বস্বতার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব পাই। সূক্ষ্ম বিচারে এর মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিকটির নিয়ন্ত্রণও হয়তো উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীর্ণ।

পোঁটাচুন্নির বেটা চন্দনবিলেস—(প্রকাশ কাল অজ্ঞাত)—লেখক অজ্ঞাত॥ ললাট লিখনে আছে,—

"বর্দ্ধনং চা য সম্মানং খলানাং প্রীতয়ে কৃতঃ।
ফলন্ত্য মৃত সেকোঽপি ন পথ্যানি বিষদ্রুমাঃ॥"

প্রহসনের শেষে একজন অপরিচিত ব্যক্তির গীত আছে। গীতটির বক্তব্য এই যে, অকৃতজ্ঞতার শাস্তি অবধারিত। গীতটির মধ্যে সাধারণের আচরণীয় নীতিও উল্লেখ করা হয়েছে,—

"হিতৈষী জনের হিত কর্ম্ম করি,
তাঁর পদতলে দাও গড়াগড়ি,
কৃতজ্ঞতা কর জীবনের সার,
তাহাতে পাইবে আনন্দ অপার।"

কাহিনী।—পোঁটাচুন্নী আর তার স্বামী কালীঘাটে শেষ বয়সে ভিক্ষা করে খায়। ব্রাহ্মণ হয়েও অন্যান্য ভিখারীর মতো অপমান ও চড়চাপড় খেতে হয় মাঝে মাঝে। কারণ যাত্রীরা মনে করে, এরা জাত-ভিখারী।

এদেরই দুই ছেলে চন্দনবিলেস আর ষণ্ডামার্ক। কুলীন, তাই দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। চন্দনবিলেস এখন বড়োমানুষ হয়ে বাবা মাকে দেখে না। ছোটো ছেলে তার কাছে থাকে, বাজার করে, খায় দায়। বারাসতের কাছে চণ্ডীপুর গ্রামে তাদের আবাস। "বড়টি হাইকোর্টে কেরাণীগিরি কত্তো, কিন্তু কার বিপক্ষে খবরের কাগজে লেখায় কর্ম্ম যায়, এক্ষণে বারাসতে ওকালতী করে, ২০/৪০ বিশ চাল্লিশ টাকা পায়।" ছোটোটি বেকার।

ওকালতীতে আয় না থাকলেও চন্দনবিলেসের অন্যান্য দিক থেকে আয় বিলক্ষণ আছে। "মিউনিসিপ্যাল কমিসনর হয়েছে, তাতে লোকগুলোকে যৎপরনাস্তি বিরক্ত করিয়া আর ঠিকে আসৃটা লইয়া কিছু পাই।" প্রতারণাও

সে অনেক করে। কল্যাণপুরের কাশীমণি বেওয়াকে ঠকিয়ে তার বাড়ীটি সে হস্তগত করেছে। অসদুপায়ে আয় সে মোটামুটি করলেও, তার নাকি সংসার চলে না। অর্থাৎ সে পুরোদস্তুর কৃপণ। বাড়ীতে খরচ নেই। চাকর-বাকর, পুজা-আর্চা, লোক-লৌকিকতা কিছু নেই। ছোটো ভাইকে ইস্কুলে দিয়েছে, তারও মাইনে লাগে না। ফাঁকি দিয়ে ব্যবস্থা করেছে।

অবশেষে একদিন চন্দনবিলেসের বাবা মারা যায়। বাধ্য হয়ে পোঁটাচুন্নী ছেলের বাড়ী এলো। কিন্তু এখানে তার নিত্য নির্যাতন। দাসীর মতো দিন কাটাতে হয়। একদিন বাজার খরচ নিয়ে চন্দনবিলেস তাকে কটূক্তি করে। মর্মাহত মা বলে ওঠে—সে থাকে—খেটে খায়, বসে খায় না! একথা শুনে চন্দনবিলেস রেগে যায়, বলে,—"বেরো হারামজাদী যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!" পোঁটাচুন্নী জবাব দেয়,—তাড়াবে বল্লেই তাড়ানো যায় না, এটা ওর মামার বাড়ীর ভিটে। ক্রুদ্ধ চন্দনবিলেস ঝাঁটা দিয়ে তার মাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। মা আর্তনাদ করতে করতে চলে যায়।

পোঁটাচুন্নী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো সেঁকোবিষ খেয়ে। কিন্তু তার দরকার হলো না। ঝাঁটার প্রহারে পিঠে দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেছিলো। তার যাতনাতেই সে মৃত্যুবরণ করলো—কালীঘাটে তার দিদির বাড়ীতে।

নিজের মাকে হত্যা করে চন্দনবিলেসের মনে একটু অনুতাপ এলেও, শ্রাদ্ধের খরচ নিয়ে ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার বচসা হয়। তার ইচ্ছে বারোজন ব্রাহ্মণকে শুধুমাত্র খাওয়াবে। ভট্টাচার্য বলেন, বিশ ত্রিশজন না খাওয়ালে লোকে ছি-ছি করবে। শেষে সে রাজী হয়, তবে ব্রাহ্মণদের শুধু চিড়ে দৈ খাওয়াবে, আর কিছু নয়। মন্তব্য করে,—"হু ভাগাড়ে মড়া পড়েছে, শুকুনির টনক নড়েছে!"

চন্দনবিলেসের স্ত্রীরও কষ্টের অবধি নেই। সে একদিন স্বামীকে বলে, তার কিপ্টেমি ও নৃশংসতার নিন্দা পাড়ায় সর্বত্র। গায়ে গয়না নেই। সে বাড়ীতে দশমাসের পোয়াতি হয়েও দাসদাসী শূন্য বাড়ীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। এভাবে সে থাকতে পারবে না, বাপেরবাড়ী যাবে। চন্দনবিলেস একথায় রেগে উঠে তাকে লাথি মেরে বলে,—"তুমি আমার শাসনকর্ত্তা, তোমাকে ভয় করে কাজ কত্তে হবে! যতদিন বাঁচবে, ততদিন কাজ কত্তে হবে।" লাথি খেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। কিছুক্ষণ

পর সেও সংসারের কাজ থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি পায়। স্ত্রীর জন্যে অবশ্য শ্রাদ্ধের খরচা করতে হয় না।

কিছুদিন পর চন্দনবিলেস আবার একটা বিয়ে করবে মনস্থ করলো। ষণ্ডামার্ক বলে, পুত্র যখন আছে, বিয়ে করা কেন? তাছাড়া হরিদাসী গাওনাওয়ালী, কাশীমণিবেওয়া, কৈবর্ত পাড়া—সব কিছুর সঙ্গেই তো ঘনিষ্ঠতা আছে। ছোটো ভাইয়ের ইঙ্গিতে দাদা চটে উঠে ষণ্ডামার্ককে চড় মারে। ষণ্ডামার্কও সঙ্গে সঙ্গে দাদার গলা টিপে ধরে বলে, তাকে বিশেষ সুবিধে করে উঠ্‌তে পারবে না। তার ইয়ার দলে খবর দিয়ে তাদের দিয়ে যে-কোনো মুহূর্তে দাদাকে সে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে। দাদা এতে ভীত হয়ে পড়ে।

চন্দনবিলেস বংশরক্ষার জন্যে বা আদিমরিপুর তাড়নায় এ সঙ্কল্প করে নি। করেছে অর্থলোভে। কারণ সে কুলীন, জানে—বিয়ে করলেই টাকা। টাকাটা নাকি তার খুব দরকার। শেষে এক শিক্ষিতা পাশ করা কনে পাওয়া গেলো। সে ভাবে—পাশকরা মেয়েরা কাজকর্ম করতে চায় না। কিন্তু শেষে সে তাকেই বিয়ে করবার জন্যে তৈরী হয়।

একদিন চন্দনবিলেসের বিয়ে হয়। তার সম্পর্কে কন্যামহলে জল্পনা চলে। সে নাকি খুব বড়োলোক। স্ত্রীর নামে বারোহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লিখে দেবে। বাসর ঘরে যখন সকলের মাঝখানে চন্দনবিলেস নিজেকে উঁচু করে তুলে প্রচার করছে, এমন সময় একজন মহিলা তার স্বরূপ সবার কাছে প্রকাশ করে দেয়। সে বলে, তার বোনপো এদের চেনে, তার কাছ থেকে সে অনেক কিছুই শুনে এসেছে। জামাই এমন কিছু বড়লোক নয়, নইলে পঞ্চাশ টাকার জন্যে শ্বশুরের সঙ্গে বচসা করতো না। পঞ্চাশ টাকা টাকা মাইনে পায়। কিন্তু কৃপণ। ভাতে ভাত খেয়ে খেয়ে পাঁচশ টাকা জমিয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এমন কি, লাথি মেরে মা এবং বৌকে হত্যা করে সে যে গ্রামে একঘরে হয়ে আছে,—একথাও মহিলাটি বলে দেয়। চন্দনবিলেস তার ওপর চটে যায়। তবে তাকে কিছু না বলে আর সবাইকে নিজের ঐশ্বর্যের গল্প করে। মহিলাটি তখন বিদ্রূপাত্মক তারিফ করে বলে,—"বেশ বেশ, একেই তো বলে উকিল, যার ষোল আনা মিথ্যে, সেই তো ভাল উকিল।" বর রেগে গেলে সবাই মিলে তাকে শান্ত করে। যাহোক তিন-চারশ টাকা মাইনে পেয়েও বর শেষে শয্যাতোলানিতে মাত্র পাঁচ টাকা দেয়।

চণ্ডীপুরে বৌ নিয়ে সে ফিরে আসে। বৌভাতে খুব ধুমধাম করবার

ইচ্ছে সে জানায়! ভাই ষণ্ডামার্ক মন্তব্য করে,—মায়ের শ্রাদ্ধে চিড়ে দৈ, আর বৌভাতে পোলাও কালিয়া কি করে সম্ভব! চন্দনবিলেস বুঝিয়ে বলে, বৌভাতে খরচ নয়, রোজগার!

করদাতাদের ডেকে চন্দনবিলেস বলে, সে কমিসনর, তার ক্ষমতা অনেক, তারা যেন তাকে সন্তুষ্ট রাখে। করদাতারা বলে,—"আমরা তা কি আর জানিনে? সেবার বিচিলি দেয়নি বলে তার এবার দু'পয়সার জায়গায় দু'আনা টেক্স হয়েছে, আর সেদিন কাসিম বেগুন দেয়নি বলে তার বেড়া নিয়ে কত গণ্ডগোল হলো। আর একদিন মুকুয্যে বামুনের পাঁচিলটে নিয়ে কি নাজেহাল কল্লে, আমরা চক্ষে দেখেছি, চেয়ারম্যানকে একেবারে বোকা করে, যা তুমি বল্লে, তাই করিয়ে নিলে।" চন্দনবিলেসের বৌভাতে করদাতারা অনেকেই প্রচুর নজর আনে। তাতেই বৌভাতের খরচ চলে যায়—কিছু বাঁচে।

চন্দনকে ষণ্ডামার্ক একদিন বলে, গাঁয়ের সবাই তাদের একঘরে করেছে। এবার ছেলেমেয়েদের পুজো কোথায় সে দেখাবে! বাস্তবিকই চন্দনবিলেসের আর থাকবার উপায় ছিলো না। একদিন সে ষণ্ডামার্ককে বল্‌লো, সে কাশী যাচ্ছে। সেখানে থেকেই সে রামবাবুর বিরুদ্ধে কাগজে লেখালেখি করবে। রামবাবুর চেষ্টাতেই নাকি সে একঘরে হয়েছে। অবশ্য একথা চন্দনবিলেস সম্পূর্ণ ভুলে গেছে যে,—রামবাবুর চেষ্টাতেই তার যা কিছু লেখাপড়া হয়েছে। তিনিই স্বেচ্ছায় তাঁর স্কুলে ভর্তি করিয়ে চন্দনবিলেসের ওকালতী জীবিকার গোড়াপত্তন করেন।

বুঝলে? (কলিকাতা—১৮৯০ খৃঃ)—বিপিনবিহারী বসু॥ ভূমিকায় (১লা জুলাই) লেখক কুসাহিত্য রচনাকে ভবিতব্য বলেছেন। "বেকারের সময় বিস্তর। সেই সময়ের সু কিংবা কু ব্যবহার এই প্রহসন রচনারূপ অনর্থের মূল, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যেরও দুর্ভাগ্য। যদি ভবিতব্য মানিতে হয়, তাহা হইলে লেখক উপলক্ষ মাত্র।" এর থেকে অনুমান করা সহজ যে প্রহসনে সাহিত্য সৃষ্টিকে গৌণভাবে রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার সেরিদানের "স্কিমিং লেফ্‌টন্যাণ্ট" প্রহসনের কাহিনীটির সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য সম্পর্কে প্রহসনকার সচেতন। কিন্তু লেখকের পদক্ষেপ একটি পুষ্ট দৃষ্টিকোণকে বহন করে সুরু হয়েছে। তাই প্রহসনটির সমাজচিত্রগত মূল্য অস্বীকার করা যায় না। (প্রহসনটি উত্তরপাড়ার জমিদার বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত।)

কাহিনী।—রামহরিপুরের জমিদার নিশিকান্ত তার ভাই শীতলাকান্তকে কুচক্রান্ত করে ফাঁকি দিয়ে সবটুকু সম্পত্তি ভোগ করছে। শীতলাকান্ত সচ্চরিত্র। সরলভাবে দাদার কথায় বিশ্বাস করে সে সব খুইয়েছে। শীতলার বিশ্বাস দাদা তাকে দুঃসময়ে ফেরাতে পারবে না। মাঝে মাঝে সাহায্য পাবার আশায় সে দাদার কাছে যায়। দাদা তাকে প্রত্যেকবারই অপমান করে ফিরিয়ে দেয়। তবুও দাদার ওপর ভার শ্রদ্ধা দেখে গ্রামের লোক তাকে "আহাম্মক" বলে। শীতলাকে সবাই ছেড়ে গেছে. কিন্তু চাকর শ্রীদাম তাকে ত্যাগ করতে পারে নি। তাছাড়া সে নিজেকে চাকর বলে মনেও করে না। নইলে অনেকদিন আগেই চলে যেতো। "কৈ তুমি আমাকে কুবেরের ধন দিয়ে বশ কর দিকি। চাকর যেন ঘটিবাটির মধ্যে—উঃ।" এরা দুজনেই সৎ হলেও শ্রীদাম খুব একটা সংযমী নয়। নিশিকান্ত সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যও সে মাঝে মাঝে করে থাকে। সে বলে,—"আগে আগে আমাদের গেরামখানা ছেল ভাল—এতু ফিরিবি জুচ্চুরি ছেল না। যেদিন থেকে নেকাপড়া ঢোকে, সেইদিন থেকে নানান পেরকার বদমায়েসি স্বরু হয়। আমরা মুখ্যু হই যা হই তবু সাদাসিদে লোক।" নিশিকান্তের তিন স্ত্রী মারা গেছে—কিংবা নিশিকান্তই মেরে ফেলেছে। আবার নাকি বিয়ে করবে, তাই নাচনাওয়ালী ভাড়া করেছে। "ভগবানের হিসেব বুঝে ওঠা দায়। মন্দ লোকেরও এত ভাল হয়? অবশ্য তার মন্দ যে হয় নি তা নয়, কলকাতায় গিয়ে কতকগুলো ইহুদী মাড়োয়ারীর সঙ্গে মিশে আফিমের খেলা খেলে সবটুকু বিষয় আশয় সে নষ্ট করেছে। কেবল ঠাটটুকুই তার আছে আসলে কিছু নেই। দেওয়ান অবশ্য এ কাজে নামতে বারণ করেছিলো, নিশিকান্ত তা শোনে নি। গুজব ওঠে নিশিকান্ত নাকি চতুর্থ বিয়েতে চার লাখ টাকার সম্পত্তি পাবে। মায়াপুরে হরিহরবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে। ঘটকী সম্বন্ধটা ঠিক করে দিয়ে আশা করে ছিলো যে, ভালো বিদায় পাবে। নিশিকান্ত মাত্র পাঁচ টাকা দিতে চাইলে ঘটকী রেগে অভিশাপ দিয়ে চলে যায়।

ভাগ্য অনুসন্ধানে কেনারাম ও ভজহরি নামে দুই প্রতারক রামহরিপুরে এসেছিলো। দুজনে পরস্পর অচেনা ছিলো। কিন্তু পথেই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয়ে যায়। নতুন কিছু দাঁও-এর আশায় ভজহরি একটা মুদী দোকান খোলে এবং পাশেই কেনারাম একটা হোটেল খুললো।

নিশিকান্ত শীতলাকান্ত ঘটিত ব্যাপারটি দৈবাৎ তাদের কানে গিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে ঘট্‌কী শিবসুন্দরী একলা বক্‌তে বক্‌তে যাচ্ছিলো, ভজহরি ও কেনারাম তাকে ডেকে নিয়ে আরো ভালো করে সব শোনে। কেনারাম তাকে যত্ন করে বিনা পয়সায় খাওয়ায়। ভজহরি ভাবে,—"ফের যেন দাঁও দাঁও গন্ধ পাচ্ছি।"

বলাবাহুল্য, শীতলাকান্ত নিশিকান্তের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো। ফিরে এসে শ্রীদামকে নিয়ে সে কেনারামের হোটেলে ওঠে। ওখানে বসে সকলে বসে নিশিকান্তকে জব্দ করবার পরামর্শ আটে। শীতলা এতে সায় দিতে চায় না, কিন্তু ভজহরি শিখিয়ে দেয়, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। যে নিশিকান্ত ভাইকে দুই টাকা আর ঘট্‌কীকে পাঁচ টাকা দিতে চায়, সেই আবার খেম্‌টাওয়ালীদের এক একখানা করে গয়না এবং কুড়িটা করে টাকা দিয়েছে। ভজহরি ঘট্‌কীর কাছে জান্‌তে পারে, মায়াপুরের হরিহরবাবু পাত্র অর্থাৎ নিশিকান্তকে এখনো দেখেন নি। "তাদের একজন কুটুম্ব একটা চাকরকে সঙ্গে করে বর দেখে যায়, তাও নামমাত্র দেখা। চতুর্থপক্ষের বে, খালি ঘরোয়ানা ঘর নিয়ে বে হচ্চে।"

স্থির হয়, কেনারাম আর ভজহরি (দুজনেই নিশিকান্তের অচেনা) মায়াপুরের লোক সেজে নিশিকান্তকে বলে আস্‌বে যে বিয়ের দিনটি পালটিয়ে পরের দিন করা হলো। কেননা জ্যোতিষীর মতে, সেইদিনটা আরো ভালো দিন। ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট দিনেই অবিবাহিত শীতলার সঙ্গে হরিহরবাবুর মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে—তাদের কাছে সব কথা খুলে বলা হবে। তাঁরা এতে খুশিই হবেন। তাছাড়া "এতে মেয়ের বাপ পতিত হবেন না। দাদার পরিবর্তে ছোট ভাই জামাই হবে।" ঘট্‌কী শিবসুন্দরী বলে ওঠে, সফল হলে তারকনাথের জন্যে সোনার ত্রিশূল আর কালীঘাটের কালীর জন্যে সোনার জিভ গড়িয়ে দেবে।

নিশিকান্ত নর্তকীদের নিয়ে ইয়ারদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ারকি করছে আর গান শুন্‌ছে। মন তার আনন্দে ভরপুর। কারণ চার লাখ টাকার সম্পত্তি যে-সে ব্যাপার নয়। এমন সময় কেনারামরা আসে। বলে, মায়াপুর থেকে হরিহরবাবু বলে পাঠিয়েছেন—যেদিন বিয়ের দিন, তার পরের দিন বিয়ে হলে অসুবিধে আছে কিনা? ইয়ার বন্ধুদের মত নিয়ে পরের দিনই বিয়ে করতে রাজী হয় নিশিকান্ত।

গাঁয়ের সকলেই নিশিকান্তকে দেখতে পারতো না, শীতলাকান্তকেই

ভালোবাসতো। তাই নিশিকান্ত লুকিয়ে লুকিয়ে অল্প কয়েকজন বরযাত্রী সংগ্রহ করে। চতুর্থপক্ষের বিয়ে—বরযাত্রী বেশি না হলেও চল্‌বে। কিন্তু ইতিমধ্যেই হরিহরবাবুর মেয়ের সঙ্গে শীতলাকান্তর বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের পরের দিন ইয়ার বন্ধুদের বরযাত্রী করে নিয়ে নিশিকান্ত নিজে বর সেজে হরিহরবাবুর বাড়ী গিয়ে পৌছোয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে অপদস্থ হয়। মাথা গরম করতে গিয়ে তারা গালাগালি খায়। ভজহরি প্রতিবেশীদের সহায়তায় নিশিকান্তকে ভালোরকম উত্তম মধ্যম দেওয়ায়।

হরিহরবাবু তখনো পর্যন্ত কিছুই জান্‌তেন না। তিনি বরকে কোনোদিনই দেখেন নি। শীতলাকান্তকে নির্দিষ্ট দিনে বরযাত্রী নিয়ে আসতে দেখে তার সঙ্গেই বিয়ে দিয়েছেন নিশিকান্ত ভেবে। ভজহরি এবং শিবসুন্দরী ঘট্‌কী হরিহরবাবুকে সব কিছু খুলে বলে। খুশিতে হরিহরবাবুর মন ভরে ওঠে। গাঁয়ের সকলেই শীতলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—হরিহরবাবু নিজেই শোনেন। একটা চরিত্রহীনের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচানো গেছে, এই ভেবে তিনি ভজহরিদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভজহরিরাও আশান্বিত হয়, এবারে তাদের একটা ভালো ধরনের দাঁও মিল্‌বে।

হতাশ নিশিকান্ত হরিহরবাবুকে বলে, "হ্যাঁ মশাই, আমি কি খালি ফিরে যাব? ভজহরি তার জবাব দেয়। সে বলে,—"ওটা ভুল বুঝলে? একলা ফিরে যাবে কেন—বালাই। আক্কেল সঙ্গে যাবে—বুঝলে?"

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু (১৮৭২ খৃঃ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়॥ লোভ সম্পর্কে পরিণামজ্ঞাপক প্রসিদ্ধ প্রবচন নামকরণ হিসেবে ব্যবহার করে প্রহসনকার লোভের বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টিকোণকে সমর্থন পুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। কৌলীন্য তথা পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রহসনকার যদিও তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তবু প্রদর্শনীর সুবিধায় প্রহসনটিকে এখানে উপস্থাপিত করা অসঙ্গত নয়।

কাহিনী।—বৃষধ্বজ একজন কুলীন ব্রাহ্মণ। তার ষোলটি বিয়ে। বিয়ের ব্যবসা ছাড়াও অনেক অসৎ পন্থায় সে পয়সা রোজগার করে থাকে। বসন্তবাবু একজন ধনীর সন্তান। রোজগারের আশায় তাঁর মনে সে কুপ্রবৃত্তি জাগায়। বৃষধ্বজের মেজমামীর বোন্‌ঝি কুলীনকন্যা বিধবা। বয়স ষোল। কুলীনের ছেলে সাধারণতঃ মামার বাড়ীতেই কাটায়। সেই সূত্রে বৃষধ্বজের

সঙ্গে তার পরিচয় আছে। বিমলা নাপতেনীর সহায়তায় তাকে হাত করতে হবে। বসন্ত ভয় পেলে বৃষধ্বজ সাহস দিয়ে বলে—"ভয় কি? পুরুষ বাচ্ছা কেস্কি ডর্? আমি তোমার মন্ত্রী রয়েছি, মন্ত্রীর জোর থাক্‌তে রাজা মাৎ হবে?" এতে অবশ্য কিছু টাকা ঢালা দরকার। বসন্তকে সে বলে, এজন্যে অন্ততঃ পাঁচশত টাকা লাগ্‌বে। বসন্তের নগদ অর্থ নেই। অবশেষে গরচার বাগান বাঁধা রেখে পাঁচ টাকা মাসিক সুদে বৃষধ্বজই টাকার ব্যবস্থা করে দেয়। আসলে বৃষধ্বজের নিজেরই টাকা—বেনামীতে বন্ধ। বৃষধ্বজ ভাবে,—'আর মাস দুই এ বেটার সঙ্গে থাক্‌লেই বেটার ভিটেয় ঘুঘু চরাব। তিনমাসে বেটার সাতহাজার টাকা খরচ করিয়েচি। সেই সাতহাজারের মধ্যে চারটি হাজার শর্ম্মার গৃহগত। ছোঁড়াটার ডব্‌কা বয়েস্, এই সময়ে নতুন নতুন আমোদ দিতে পারলেই হাত মারা যায়।" সে ভাবে, 'তার টাকা তারই থাক্‌বে, কারণ পাঁচশত টাকার চারশত টাকাই তার নিজের রইবে, তাছাড়া গরচার বাগানটা তার হয়ে গেলো। সে আবো ভাবে, বসন্তবাবুকে শেষ করে গোকুলবাবুর ছেলেকে ধরতে হবে। এইভাবেই সে নবীনবাবু,—নীলকমলবাবু—এদের ডুবিয়েছে। লাভ হয়েছে প্রচুর। গোপীমোহনের ভাষায়—"বেটার এই এক বিশেষ মায়া যার সর্ব্বনাশ করবে তার বিপদে বুক দিয়ে, গেঁটের টাকা দিয়ে পর্য্যন্ত উপকার করে, শেষে কুড়ুলের ঘা মারে।"

বসন্তবাবু খরচ করলেও তাঁর অবশ্য লাভ হয় নি। যে মুহূর্তে বাগানে সেই মেয়েটির সঙ্গে প্রেমালাপে প্রস্তুত হয়, ঠিক সেসময় এক অঘটন ঘটে। গরুর সন্ধানে দুজন লোক ঐ পথে আস্‌ছিলো। নেপথ্যে একজন চীৎকার করে অন্যজনকে বলে,—"কোন্‌দিগে গেচে, কোন্‌দিগে গেচে?" আর একজন জবাব দেয়,—"খানা পেরিয়ে বাগানের ভেতর গেচে।" প্রথমজন জিজ্ঞেস করে,—"দুটোতেই কি গেচে?" দ্বিতীয়জন বলে—"হাঁ, দুটোতেই গেচে।—আমি ঠিক দেখেচি।" প্রথম জন বলে—"তবে চল যাই, এই বেলা ধরিগে।" নেপথ্য থেকে এইসব শুনে ভয়ে বসন্তবাবুরা চম্পট দেন।

প্রতারণায় বৃষধ্বজ পটু। সে নাকি বিশু খুড়োকে খত্ লিখিয়ে এক হাজার টাকা দিয়েছিলো। একদিন বিশুখুড়ো বৃষধ্বজকে টাকা নিয়ে যেতে বলেন। বৃষধ্বজ বিশুখুড়োর বৈঠকখানায় যায়। বিশুখুড়ো তাকে আসল একহাজার টাকা এবং সুদ পঞ্চাশ টাকা গুনে দেন। বৃষধ্বজ বলে, খত্‌টা আনতে সে ভুলে গেছে, বিশুখুড়ো লোক সঙ্গে দিক, এক্ষুনি সে পাঠিয়ে দিচ্ছে। লোক সঙ্গে

গেলে বাড়ী পৌঁছিয়ে বৃষধ্বজ তাকে বলে দেয়, পরিবার কোথায় রেখেছে, এখন সে ঘাটে। কাল ওটা বিশুখুড়োকে দিয়ে দেবে। অনেকদিন ধরে কাল কাল বলে ঘুরিয়ে বৃষধ্বজ লুকিয়ে কোর্টে নালিশ করে। হতভম্ব বিশুখুড়ো সুদাসলের সঙ্গে মোকদ্দমার খরচ বৃষধ্বজকে দিতে বাধ্য হয়।

রঘুনাথ নামে এক ডাকাতের সঙ্গে বৃষধ্বজের বন্দোবস্ত ও বন্ধুত্ব অনেক দিনের। একবার রামকৃষ্ণপুর থেকে একজন মেয়েকে তারা দুজনে বার করে এনেছিলো। এখন অবশ্য মেয়েটি নাম লিখিয়েছে। চৌদ্দ আইনে পড়ে মাসে দুবার করে তাকে এক্‌জামিন দিতে হয়। আর একটি মেয়েরও তারা সর্বনাশ করেছিলো। সে চৌদ্দ আইনের ভয়ে ফরাশ ডাঙ্গা পালিয়েছে। বৃষধ্বজের যুক্তিতেই বিশ্বম্ভরপুরের ঘোষেদের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে। পরের চেষ্টায় তাকে নাকি খুন করা হবে'

শুধু তাই নয়, বরানগরের এক ধনী শ্বশুরকে খুন করবার জন্য বৃষধ্বজ রঘুনাথকে পরামর্শ দেয়। "শ্বশুরবেটাকে মেরে ফেল্‌তে পাল্লেই আমি নিশ্চিন্ত। যে জাল উইল তৈরী করিচি, তাতে আর কোন্ শালা দন্তস্ফুট কর্ত্তে পার্ব্বে না। সমুদয় বিষয়টাই আমার হবে, আমি একজন মস্ত জমীদার হব, তাঁবে হাজার লেঠেল রাখ্‌ব, আর মাসে হাজার সতীত্ব বাজেয়াপ্ত করবো।"

ঘোঁট পাকাবার ব্যাপারে বৃষধ্বজ কম নয়। বেচারাম একজন ধনী ব্যক্তি। তাঁর দলগত বিদ্বেষের সুযোগ নিতেও বৃষধ্বজ ছাড়ে না। সে ভাবে, এই সুযোগে ধনী বেচারামের আর্থিক অনুগ্রহ মিল্‌বে, ইতিমধ্যে বৃষধ্বজ খবর পায়, তার বাবা দেহত্যাগ করেছেন। সে পিতৃশ্রাদ্ধের উদ্যোগ করে এবং বেচারামের দলের লোকদেরই নিমন্ত্রণ করে। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে তার বাবা আসেন। সবকিছু দেখে শুনে তিনি রেগে ওঠেন। বৃষধ্বজ তাঁকে কায়দা করে দেশে পাঠায়। কিন্তু এদিকে বৃষধ্বজের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ হয়। সমাজেও বৃষধ্বজ একঘরে হয়।

কোর্টে বিচারে বৃষধ্বজ নিজের দোষ স্বীকার করে অনুশোচনা করে। সে তার সারা জীবনের অপরাধ সর্বসমক্ষে স্বীকার করে এবং বলে ওঠে,—এরই নাম "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

পাপের প্রতিফল (১৮৭৫ খৃঃ)—কেদারনাথ ঘোষ॥ পূর্বোক্ত প্রাহসনিক পদ্ধতিতে লোভের পাপ ও পরিণাম প্রদর্শন করে এ ধরনের লোভের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এই প্রহসনে অভিব্যক্ত হয়েছে।

কাহিনী।—বংশীধর মল্লিক বর্ধমানের একজন ধনী বণিক। বংশীধরের স্ত্রী জীবিত না থাকলেও পুত্র যাদবচন্দ্র বর্তমান। স্ত্রীর বোন বিমলার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়জাত সহবাসে বিমলার গর্ভে বংশীদাসের চারটি পুত্র জন্মায়। মতিলাল, হীরালাল, চুনীলাল আর কানাইলাল। কলকাতায়ও বংশীধরের বাড়ী আছে। সেখানে থেকে যাদবচন্দ্র বংশীধরের বিষয় কর্ম দেখে। সবকিছু তিনি যাদবের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতে সাড়ে তিন লাখ টাকা রাখেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, আর পঞ্চাশ হাজার হলে চার লাখ টাকা হবে। চার লাখ পুজিয়ে রাখলে বিমলার চার সন্তানকে এক এক লাখ টাকা করে তাহলে দিয়ে যেতে পারবেন। বার্ষিক ছয় লাখ টাকার বিষয় যাদবেরই থাক্‌বে।

একদিন তিনি যাদবের কাছে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য জানিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইলেন। যাদব বলে,—সে তাঁর জারজ সন্তানদের এক পয়সাও দেবে না। বংশীধরেরও ব্যবসাদারী জেদ। তিনি বলেন, তিনি নেবেনই। পনেরো তারিখে তিনি আবার আসবেন—এই বলে বর্ধমানে তিনি ফিরে গেলেন।

পিতা পুত্র দুজনেরই সমান গোঁ। যাদবের বোন ভাবিনী বলে, দোষটা তার দাদারই। সামান্য টাকা সে ছাড়তে পারছে না! যাদবের স্ত্রী সুলোচনা যাদবকে বোঝাতে গিয়ে উল্টে গালি খায়—শ্বশুরের নিন্দে শোনে। ওদিকে বংশীধরের শালী বিমলা যাদবের ওপরে রেগে যায়। বংশীধরকে বলে, —"তোমার দুধের বাছাদের এই কটা টাকার ওপরে চোক।" সে বলে, টাকা সে চায় না—এমনিতে যা আছে, তাতেই দিন কেটে যাবে।

এদিকে যাদব ভাবতে থাকে। আজ বারো তারিখ। পনেরো তারিখে বাবা আবার আসবেন! যাদবের বন্ধু কমল বলে,—এ অবস্থায় বংশীধরকে যদি খুন করা যায়, তাহলে ঐ সাড়ে তিনলাখও হাতে আস্‌বে। সে বলে,—"কর্ত্তা বুড়ো হয়েছেন, আর কতদিন বাঁচবেন, তবে ওঁর দুদিন আগে মারিলেই ক্ষতি কি!" যাদব আপত্তি জানিয়ে বলে,—"তুমি কি আমাকে এমন পিশাচ জ্ঞান কর যে সামান্য অর্থের লোভে এমন কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে?" কমল তখন অভিমানের সুরে বলে, বন্ধুর কথা রাখ্‌বে না, এটা যদি সে জান্‌তো তাহলে এ ব্যাপারে সে নাক গলাতো না। সে বলে,—"কর্ত্তা আপনার উন্নত শির অবনত করিতে বলিয়াছে। আর আপনার প্রতিজ্ঞার কথাও সহরে প্রচার হইয়া গিয়াছে।" কর্ত্তার কথায় হয় সম্মতি দেওয়া নতুবা তাঁকে খুন করা—এ ছাড়া অন্য পথ নেই। যাদব বলে, এর কোনোটিই সে পারবে না। কমল তখন

ইতিহাস টেনে বলে, মুসলমান রাজাদের সিংহাসন নেবার ব্যাপারে এমন খুন খারাবি সাধারণ ব্যাপারই ছিলো। তারপর ধর্মতত্ত্ব টেনে বলে,—"জীবন কাহারও নিজের নয়, ঈশ্বর ঋণস্বরূপ জীবকে প্রাণ দিয়াছেন, যখন ইচ্ছা হইবে তখনই লইবেন—সেই ঋণ যদি তিনি সময়ের অগ্রেই পান, তবে বিরক্ত হইবার কারণ কি?" শেষে যাদব বলে, কমল যা ভালো বোঝে করুক, সে নিজে খুন করতে পারবে না। কমল বলে, সে আগে থেকেই লোক ঠিক করে রেখেছে। কমল মনে মনে ভাবে,—"ব্যাটাকে একবার হাড়িকাঠে ফেলিতে পারিলে হয়, তারপর আর যায় কোথা? যখন যা বলিব, তখন তাহাই করাইব।"

যাদবের পিতৃবিদ্বেষের কথা জেনে তার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু দেবেন্দ্র এসে তাকে বলে,—পরমগুরু পিতার আদেশ শিরোধার্য—তিনি যতোই অন্যায় করুন না কেন। তাই শুনে যাদব বলে,—"ভদ্র সমাজে বাবার নিন্দায় মুখ দেখাইবার যো নাই, তাতে আবার একবার অসম্মত হইয়াছি। এখন সম্মত হইলে সকলে আমাকে কাপুরুষ বলিবে।" দেবেন্দ্র ব্যর্থ হয়ে চলে যায়। ওদিকে তলে-তলে বংশীধরকে খুন করবার উদ্যোগ চলে।

বিমলার দুঃস্বপ্ন দেখা মনের কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করে বংশীধর পনেরো তারিখে আবার কলকাতায় এলেন। যাদব এবারেও যথারীতি তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করলো। বংশীধর চটে গিয়ে বললেন, "আজ থেকে তিনি যাদবকে ত্যাগ করলেন। সম্পত্তি তিনি বিমলার চার ছেলের নামে উইল করে দিয়ে যাবেন। যাদব শুধু কলকাতার বাড়ী আর একশ টাকা করে মাসোহারা পাবে। বংশীধর চলে যান। পিতাকে কটূক্তি করে যাদবের মন একটু খারাপ হলে, কমল বলে, গত বিষয়ের অনুশোচনায় নতুন দুঃখের বীজ বপন করা হয় মাত্র।

ট্রেন ফেল্ করে বংশীধর বর্ধমান ষ্টেশনে দেরীতে এসে পৌছোলেন। যে গাড়ী তাঁকে নিয়ে ফেরবার কথা ছিলো, সে গাড়ী চলে গেছে। বাধ্য হয়ে একটা ভাড়াটে গাড়ী করে তিনি বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন। পথের মধ্যে হঠাৎ পাচজন শিখ এসে বংশীধরকে গুলি করে চলে যায়। সহযাত্রী মোসাহেব কিংবা কোচোয়ানও রেহাই পায় না।

পিতাকে হত্যা করে যাদব একটু মুষড়ে পড়ে। কমল ভাবে, যাদব দিন দিন যেমন হয়ে যাচ্ছে, শিগ্গিরই মরে যাবে,—তারপর কমলের হাতেই সব

আসবে। যাদবকে হাজতে পাঠালে কার্যসিদ্ধি আরও তাড়াতাড়ি হবে। নাবালগরা আর কীই বা করবে! তার কৌশলের কাছে তাদের আর টি঳কতে হচ্ছে না। ফন্দি সে মনে মনে তখনই এঁটে ফেলে। যাদব এলে সে যাদবকে বলে, যে পাঁচজন শিখ তার বাবাকে মেরেছে, তারা পাওনা টাকা চাইতে আসবে। যাদব দারোয়ানকে বলে দিক, শিখরা এলেই দারোয়ান তাদের হাতে পাঁচটা ঘটি দিয়ে চোর বলে যেন তাদের থানায় পাঠিয়ে দেয়। "সে বেটারা মেড়ুয়াবাদীর জাত, সাহেব দেখে ভয়ে মরে, কোর্টে গিয়ে যে কোন বজ্জাতী করিবে তা হঠাৎ পারিবে না; তাছাড়া পুলিষ কমিসনর প্রভৃতি আপনাদিগের ত হাত ধরা।" ব্যক্তিত্বশূন্য যাদব তদনুযায়ী কাজ করে।

কিন্তু ফল হলো উল্টো। ঘটি চুরির তদন্ত করবার সময় শিখরা সবকিছু ফাঁস করে দিলো। পুলিশ কমিসনর যাদবকে গ্রেফ্তার করতে আদেশ দিলেন। যাদবকে ধরে নিয়ে গেলে ''লাচনা দেবেন্দ্রের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে। দেবেন্দ্রের অনেক কিছুতে হাত আছে, সে যদি তাকে ছাড়াতে পারে। দেবেন্দ্র কথা দেয়, সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

কলকাতা হরিণবাড়ীর জেলে যাদব আক্ষেপ করে। কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে এসে কমল একটা ছুরি ফেলে রেখে দিয়ে গেল—কুমতলব নিয়ে। অস্থিরমতি যাদব ভাবে কমল বন্ধুর কাজই করেছে। সে আত্মহত্যা করলো। এইভাবে সে পাপের প্রতিফল পেলো।

এই কি সেই? (কলিকাতা—১৮৭৯ খৃঃ)—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ মলাটে প্রহসনকার একটি বক্তব্য কবিতা আকারে প্রকাশ করেছেন,—

> বধিল জনক
> স্বহস্তে জীবন সদৃশ পুত্রে?
> ধন্য অর্থ!!
> অসাধ্য ঘটনা আয়ত্ত তোমার!!
> পড়হ পাঠক, জান সবিস্তার॥

১২৬৪ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" নাম দিয়ে অনেকটা অনুরূপ ঘটনার এক বিবরণ প্রকাশিত হয়। এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনার দৃষ্টান্ত প্রহসনটির মাত্রা বিচারে সহায়তা করতে সক্ষম।

কাহিনী।—বিপ্রদাস গাঙ্গুলী দাবা খেলে। খেলার লোভে প্রতিবেশী

চারুচরণ দত্ত এবং আত্মীয় প্রতিবেশী শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায়ই এসে থাকে। বিপ্রদাস যে খুব ভালো খেলে তা নয়, তবে খেলার নেশা আছে। খেল্তে খেল্তে টুক্‌টাক্ কথাবার্তা হয়। মুখুয্যেবাড়ী শরৎ নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে। "যার পয়সা আছে, তার খাওয়া হলো, আর যার পয়সা নাই তার কেবল গেলা মাত্র।" বড়োলোকদেরই অভ্যর্থনা কেবল। ২০০/২৫০ জন ব্রাহ্মণ আছে, তাদের ডেকেও কথা কয় না, কিন্তু বড়োলোক প্রাণকৃষ্ণবাবুর ছেলে এলে মুখুয্যেমশায় যেন ইন্দ্রের চক্ষু পান। তার যাতে সামান্য অসুবিধে না হয়, তার জন্যে কি ব্যস্ততা! বিপ্রদাসকে শরৎ বলে, "গাঙ্গুলী খুড়ো, তাই বল্‌চি যে, যে রকমে হোক্ অর্থ উপার্জ্জন কর। তা না হোলে সংসারে আর সুখ নাই।"

চাকর প্রেমচাঁদ খেলার আসরে এসে খবর দেয়—একজন অতিথি ব্রাহ্মণ এসেছেন। আজকের মতো এখানে থাক্‌তে চান। খেলায় মত্ত বিপ্রদাসের হুঁস ছিলো না। হুঁস হতেই ব্যস্তভাবে তাঁকে এনে বসাতে বলে। ব্রাহ্মণ এলে বিপ্রদাস তার সঙ্গে আলাপ করেন। ব্রাহ্মণের নিবাস কুমারগঞ্জ। কলকাতা থেকে এদিক দিয়ে ফেরবার সময় নিশ্চিন্তে রাত কাটাবার জন্যে এখানে উঠেছেন। গাঙ্গুলীর আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ বলে, তার ব্যাগে কিছু টাকাকড়ি এবং গয়না আছে। ব্রাহ্মণ পিতৃশ্রাদ্ধের জন্যে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। গিন্নি বলেছিলেন, যে মরে গেছে তার জন্যে অর্থব্যয় করা মানে ভস্মে ঘি ঢালা। তার চেয়ে তাঁর গয়না গড়িয়ে দেওয়া ভালো। তাই ব্রাহ্মণ কলকাতা থেকে গয়না গড়িয়ে ফিরছেন।

ব্রাহ্মণ একসময়ে ব্যাগ থেকে দুটো সোনার বালা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন; বালাদুটো দেখে বিপ্রদাসের স্ত্রী সরলা বিপ্রদাসকে বলে, তার জন্যে অমন দুটো বালা দরকার। সে অনুযোগ করে, ব্রাহ্মণীর ওপর ব্রাহ্মণের এতো টান, অথচ তার ওপর বিপ্রদাসের কিছুই টান নেই। বিপ্রদাস প্রথমে রেগে যায়। সরলা কাঁদে। তখন নিজের ওপর বিপ্রদাসের ধিক্কার আসে। ভাবে, স্ত্রীর জন্যে স্বামী হয়ে সামান্য দুটো গয়নাও দিতে পারে না। প্রথমে সে ভাবলো, চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করে তাই দিয়ে সে গয়না গড়িয়ে দেবে। পরে ভাবে, এজন্যে আবার কে চাঁদা দিতে যাবে? হঠাৎ তার খেয়াল হয়, ব্রাহ্মণ রাত্রে ঘুমোলে তার গয়না চুরি করলে মন্দ হয় না। তবে হত্যা না করে উপায় নেই। বিপ্রদাস আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে ভাবে, স্ত্রীর জন্যে তো লোকে কতো কি করে!

এদিকে শরৎচন্দ্রও নিজের অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে। সে কন্যাদায়গ্রস্ত। তার মেয়ের বয়স বারো-তেরো। পাত্রপক্ষ থেকে অনেকেই দেখতে এসেছে। কিন্তু তাদের দাবী বড় সাংঘাতিক। "আবাগের বেটারা বোঝে না যে তাদেরও ত কন্যা আছে, না থাকে—হবে।" অর্থ না থাকলে কোনো কিছুই চলে না। ইতিমধ্যে চারুও এসে পড়ে। চারুকে নিজের অসুবিধের কথা প্রকাশ করলে চারু বলে, "অর্থলাভ প্রত্যাশা কত্তে গেলে ধর্ম্মভয়টুকু রেখো না।" শরৎ হেসে বলে, "আরে পাগল, আমাদের মত ছেলেরা যদি ধর্ম্মভয় করবে, তবে বুড়োরা কি বসে কেবল Pension ভোগ করবে।" চারু বল্‌লো, ব্রাহ্মণটার কাছে বেশ কিছু টাকা আছে। এখন তাকে কেটে পুঁতে ফেল্‌তে হবে, নইলে সে-টাকা পাওয়া অসম্ভব। শরৎ অবশ্য এতোটা অধর্মের কথা ভাবে নি, সে একটু ঘাবড়ে যায়। চারু বল্‌লো, এতোক্ষণ তাহলে কী বলা হলো? শরৎ তখন বলে, সে নিজে খুন করতে পারবে না, তবে এ বিষয়ে অন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে। তার বদলে শুধু কিছু টাকা চায়। কিন্তু শরৎ চারুকে বলে, বিপ্রদাস এটা করতে দেবে কেন? চারু বলে,—টাকা এমন জিনিস যে, লোভ দেখালেই সেও এসে যোগ দেবে। এমন সময় বিপ্রদাস আসে। সে এদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলো। সে এসে বল্‌লো যে সে নিজেই কাটবে। চারু বিপ্রদাসের বীরত্বের প্রশংসা করে!

বিপ্রদাস ব্রাহ্মণকে পরম পরিতোষে খাওয়ায়। ব্রাহ্মণও তার আতিথেয়তায় খুশি হয়ে তার সঙ্গে গালগল্প করেন, পরে বৈঠকখানায় শুতে যান। এদিকে তিন বন্ধুতে মিলে ষড়যন্ত্র চলে।

বিপ্রদাসের একটি ছেলে ছিলো—নাম প্রবোধ। বয়স তার ষোল কি সতেরো। ইংরাজী স্কুলে পড়ছে। এ বছর Extrance দেবে। সে সুরেন-বাবুর লেকচার শুনতে গিয়েছিলো। অনেক রাত করে এসে বৈঠকখানায় কড়া নাড়ায়। ব্রাহ্মণকে দেখে সে অবাক হলো। ব্রাহ্মণ তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। প্রবোধের অসুবিধে দেখে ব্রাহ্মণ নিজের থেকেই নিজের শয্যায় প্রবোধকে শুইয়ে অন্যত্র শুতে গেলেন। হঠাৎ ব্রাহ্মণের কানে ভেসে আসে ষড়যন্ত্রের দু-একটা কথা। তারা হত্যার প্রস্তুতি চালাচ্ছিলো। ব্রাহ্মণ নিজের নিরাপত্তার অভাব দেখে সেই রাত্রেই বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলেন। ওদিকে ক্লান্ত প্রবোধ ব্রাহ্মণের শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

বিপ্রদাস অন্ধকারে ব্রাহ্মণ বলে ভুল করে নিজের সন্তান প্রবোধকেই কেটে

ফেলে। তারপর তিনজনে মিলে নৃত্য করে—টাকা তাদের হাতের মুঠোয়। তারপর তারা মৃতদেহটি ঘাড়ে করে যখন পুঁততে যায়, তখন সেটা হাল্কা দেখে সন্দেহ হয়। এ যে বালকের মৃতদেহ! এই কি সেই? এই কি প্রবোধ!! বিপ্রদাস যখন নিজের ছেলেকে চিনতে পারে, তখন আক্ষেপ করে বলে, "প্রবোধ আমার একমাত্র ধন, এর বদলে কোটি কোটি ধন সমতুল্য হতে পারে না।"

তুমি কার? (১৮৮৪ খৃঃ)—গগণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের পণঘটিত অর্থলোভের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পেলেও পণপ্রথা সম্পর্কে প্রহসনকারের নীরবতা প্রহসনটিকে বর্তমান উপ-বিভাগে উপস্থাপনের কারণ। যৌন দিক থেকেও অবশ্য প্রহসনকার কিছু বক্তব্য রেখে গেছেন।

কাহিনী।—রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তার স্ত্রী মোক্ষদা. এবং একটি কন্যা বর্তমান। বিধবা বোন স্বর্ণলতা রাধাকৃষ্ণের কাছেই থাকে। ননদ স্বর্ণলতা মোক্ষদাকে দেখতে পারে না। তার নামে দাদার কাছে লাগিয়ে প্রায়ই মার খাওয়ায়। একদিন সে দাদাকে বলে মোক্ষদা ভাঁড়ার থেকে তেল বিক্রী করেছে। মোক্ষদা এর প্রতিবাদ করলেও তার কপালে আবার প্রহার জোটে।

রাধাকৃষ্ণের মেয়েটির অবশেষে বিয়ে হয় তারাচাঁদের সঙ্গে। তারাচাঁদের মা গৌরমণির অনুরোধে তারাচাঁদ এ বিয়েতে রাজী হয়। গৌরমণির ইচ্ছে, তিনি মরবার আগেই বৌয়ের মুখ দেখেন। তারাচাঁদ জানে, তারা কুলীন নয়, কেউই মেয়ে দেবে না। তাছাড়া পঁচিশ বিঘে জমি ছাড়া আর কিছুই নেই। তারাচাদ লেখাপড়াও শেখে নি যে চাকরি করবে. সকলকে খাওয়াবে। কিন্তু নিতান্ত অনুরোধে পড়ে সে বিয়ে করে। বিয়ের পর তারাচাঁদ বলে, বিয়ে করেছে, এখন খাওয়াবে কি। জমিজমা যা কিছু ছিলো. তা বিক্রী করে এতোদিন চল্‌লো। শেষে সে বলে, কিছুদিনের জন্যে সে বিদেশ যাচ্ছে। টাকা রোজগার করে বাড়ী ফিরবে। স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ীতে রেখে যাচ্ছে। গৌরমণি যেন শ্বশুরবাড়ী মাঝে মাঝে তত্ত্ব পাঠায়। সে বলে. সেখানে পিস্‌-শাশুড়ীই সব, শ্বশুর একেবারে ভেড়া।

গোপীপুরের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু ব্রহ্ম-বৈষ্ণবী। সে অত্যন্ত ভণ্ড এবং দুশ্চরিত্রা। রাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণবীকে ভালবাসে। বৈষ্ণবী তাকে আদিরসের

গান শোনায়, প্রেমের মাহাত্ম্য শোনায়। রাধাকৃষ্ণ তাকে গুরু বলে, তার পায়ে পড়ে। রাধাকৃষ্ণের ইচ্ছে, মোক্ষদাকে দূর করে এবং স্বর্ণলতার আর একটি বিয়ে দিয়ে কাঁটা সরিয়ে ফেলে। ভন্ড বৈষ্ণবীকে সে পিসী বলে ডাকে। মনপ্রাণ সঁপে দিতে চায়। স্বর্ণলতারও বৈষ্ণবীর ওপর খুব ভক্তি। সে বৈষ্ণবীর কাছে গিয়ে বলে, ঐ মোক্ষদার জন্যে সে কিছু করতে পারে না। এর কি একটা উপায় হয় না? বৈষ্ণবী তখন স্বর্ণলতাকে বলে, সে তাকে একটা গুঁড়ো দেবে। পানের সঙ্গে সেটা মোক্ষদাকে খাওয়াতে পারলেই মোক্ষদার মৃত্যু হবে। বৈষ্ণবী স্বর্ণলতাকে আরও বলে যে, তার জন্য একটা পাত্র ঠিক করা হয়েছে। এখন থেকে আর তাকে একাদশী উপবাস করে মরতে হবে না।

বৈষ্ণবীর কথা মতো স্বর্ণলতা পানের সঙ্গে গুঁড়ো মিশিয়ে মোক্ষদাকে খাওয়ায়। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে মোক্ষদা মারা যায়। বাড়ীতে থাকে শুধু রাধাকৃষ্ণের বিধবা বোন স্বর্ণলতা আর মোক্ষদার বিবাহিতা কন্যা—যার সঙ্গে তারাচাঁদের বিয়ে হয়েছে। তারাচাঁদ তখনো বিদেশে।

বৈষ্ণবী রাধাকৃষ্ণকে জানায় মেয়েটির আবার বিয়ে দেওয়া হোক। কেন না সেই স্বামী কবে যে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, আর আসছে না। নিশ্চিন্দিপুরে বৈষ্ণবীর একটা বাড়ী আছে। মেয়েটি সেখানে থাকুক। লোকের কাছে বলা হবে যে মেয়েটির বিয়ে হয় নি। বৈষ্ণবীর কথা মতো রাধাকৃষ্ণ তার মেয়েকে বৈষ্ণবীর বাড়ীতে রেখে তার সঙ্গে একজন লোকের বিয়ে দেয় আবার। এবং সেই টাকায় কালীমতী নামে এক তরুণীকে বিয়ে করে নিয়ে আসে।

ওদিকে তারাচাঁদ পশ্চিমে এক বড় ব্যবসায়ীর কাছে চাকরী করে। ভালো পয়সা রোজগার করে। একদিন দৈবাৎ খরিদ্দার রামব্রহ্মের সঙ্গে আলাপ করে সে জানতে পারলো যে, সে নিশ্চিন্দিপুরের রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিয়ে করেছে। টাকা ধার করে সে বিয়ে করেছে। কি করে শোধ দেবে, সে তাই ভাবছে। তারাচাঁদের মনে খট্‌কা লাগে। টাকার লোভে ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকেই আবার বিয়ে দেয় নি তো! রাধাকৃষ্ণের তো মাত্র একটাই মেয়ে! তারাচাঁদ সঙ্কল্প করে—একটা কিছু এর ব্যবস্থা সে করবেই।

তারাচাঁদ বাড়ী ফিরলে গৌরমণি খুব খুশি হয়। কিন্তু তারাচাঁদ অপেক্ষা না করেই নিশ্চিন্দিপুরের পথে পা বাড়ায়। তারাচাঁদের আসবার খবর পেয়ে স্বর্ণলতা তাড়াতাড়ি দাদাকে গিয়ে খবর দেয়। রাধাকৃষ্ণ ভয়ে কালীনাম এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগ্‌লো। তারাচাঁদ রাধাকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তার স্ত্রীর

খোঁজ চায়। রাধাকৃষ্ণ আমতা আমতা করে। খোঁজ দিতে পারে না। অন্য কথায় তাকে ভোলাতে যায়। তারাচাঁদ তখন বুঝতে পারলো, তার অনুমান সত্যি। সে তখন রাধাকৃষ্ণকে বললো যে, তার মা কয়েকদিন হলো মারা গেছেন, সংসারে কেউ দেখবার নেই। অন্ততঃ শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের স্ত্রী কালীমতী যদি তার বাড়ীতে থাকে, তাহলে তারাচাঁদকে এতো কষ্ট করে থাকতে হয় না। শ্রাদ্ধের দিন যেন রাধাকৃষ্ণ গিয়ে কালীমতীকে ওখান থেকে নিয়ে আসে। শ্রাদ্ধের তারিখ সে জানিয়ে দেয় এবং রাধাকৃষ্ণের তরুণী স্ত্রী কালীমতীকে নিয়ে বাড়ীতে রওনা হয়। শ্রাদ্ধের দিন রাধাকৃষ্ণ তারাচাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখে শ্রাদ্ধের কিছুই আয়োজন নেই। রাধাকৃষ্ণ এলে কালীমতী তাকে "বাবা" বলে সম্বোধন করে। রাধাকৃষ্ণ এতে রেগে যায়। তরুণী কালীমতী যুবকের সঙ্গ আস্বাদন করে রাধাকৃষ্ণের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে। তারাচাঁদের কথা মতোই কাজ করে সে। রাধাকৃষ্ণ খুব রেগে গেছে, ঠিক এমন সময় কনষ্টেবল এসে রাধাকৃষ্ণকে তার নামে ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে গ্রেফ্‌তার করে। স্বর্ণলতা বৈষ্ণবীর খুন আর মোক্ষদার বিষ খাওয়াবার কথা নিজ মুখেই স্বীকার করেছে। অসহায় রাধাকৃষ্ণ কালীমতীকে জিজ্ঞেস করে, —"তুমি কার ?" কালীমতী তারাচাঁদের কাছে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাধাকৃষ্ণকে "বাবা" বলে ডাকে। ওদিকে কনষ্টেবল রাধাকৃষ্ণকে ঘাড় ধরে নিয়ে চলে।

হায়রে পয়সা! (কলিকাতা—১৮৭৭ খৃঃ)—কিশোরলাল দত্ত॥ শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের ভাষায় অর্থ-ই হচ্ছে অনর্থ। অর্থলোভে মানুষের পরিণাম দুঃখাবহ হয়। তাই জীবনধারণের প্রধানতম রসদ অর্থকে এইদিক থেকে দায়ী করে ধিক্কার দেওয়া ব্যতীত উপায় থাকে না। প্রহসনকার তাঁর নামকরণ এভাবে দিয়েছেন ; এর কারণ অর্থের দাস মানুষের মধ্যে বন্ধন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে এবং মানবিক ব্যক্তিত্বকে আঘাত করে জাগাতে চেয়েছেন। অতএব প্রকারান্তরে অর্থলোভের বিরুদ্ধেই লেখকের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত।

কাহিনী।—স্বামী কেশবের লাম্পট্যের খরচ যোগাবার জন্যে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী সতীত্ব নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছে। স্ত্রীর অধঃপতনে কেশবই দায়ী। একদিন কেশব এসে হঠাৎ কাদম্বিনীর কাছে পাঁচশো টাকা চায়। কাদম্বিনী বলে, টাকা নেই। কেশব বুদ্ধি দেয়, দিগম্বর ধনী প্রতিবেশী, কাদম্বিনী তার বাড়ী থেকে ম্যানেজ করে টাকা আনুক। কাদম্বিনী এতে রাজী হয় না। বলে, তার ওপর দিগম্বরের এখন আর তেমন প্রেমভাব নেই।

কেশব তখন বলে, কতকগুলো সাক্ষী জুটিয়ে ওর নামে "অ্যাডাল্টরির" নালিশ-করলে ও দশহাজার টাকা দিতে বাধ্য হবে। আর কাদম্বিনীর কলঙ্কের জন্যে ভাবতে হবে না। টাকা থাকলে দুনিয়াটা মুঠোর মধ্যে। কাদম্বিনী মন্তব্য করে,—"গঙ্গাজলে ধোয়া মেয়ে আছে কজন! তাহলেও সতী নামটা থাকলেই হলো।" কেশব বলে, "মাথা নেই মাথা ব্যথা। সতীত্ব কোথা ঠিক নেই, অসতী বল্‌বে তাই ভাবনা।" কাদম্বিনী বলে, "তোমার মতো নবাবী করতে টাকার জন্যই তো আমার এই দশা।" কেশবও বলে, "তোমার বড়মানুষিতে আমার দেনা, আত্মরক্ষার জন্য সতীত্ব নষ্ট করাই।" এমন সময় সুরামত্ত অবস্থায় কেশবের প্রথম পক্ষের সন্তান রমণ এসে টাকা চায়। কেশব তাকে বেয়াদবি করতে বারণ করে। রমণ বলে,—"এখন ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত চালু হয়েছে। সংস্কৃতে আছে,—ষোল বছর হলেই বাপবেটায় ইয়ারকি দেবে। এবারে "Municipal Commissioner-রা শান্তিরক্ষার জন্যে বলে দিয়েছেন, সৎমাকে Mother in law—আইন মতে মা না বল্লে তাকে Municipal Market-এ highest bidder-এ দেবে।" কেশব ছেলেকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। "উত্তম রজনী"—বলে ছেলে চলে যায়।

কেশবের সমগোত্রীয় একজন আছে, নাম যোগেন্দ্র। অবশ্য তার স্ত্রীটি ভালো। স্ত্রীর নাম প্রমীলা। সে যোগেন্দ্রকে খুব ভালোবাসে। একদিন যোগেন্দ্র তার কাছে একশো টাকা চাইতেই প্রমীলা আনন্দের সঙ্গে বলে, একশো দুশো যা চাইবে, তাই পাবে। এই বলে তক্ষুনি টাকা আন্‌তে যায়। যোগেন্দ্র ভাবে, সে সত্যিই রমণীরত্নই পেয়েছে। কিন্তু প্রমীলা জানে না যে এই টাকা দিয়ে তার স্বামী কি করবে! এই বলে যোগেন্দ্র পকেট থেকে কাদম্বিনীর চিঠি বার করে পড়ে,—"তোমাকে নিতান্ত ভালবাসি বলিয়াই বুঝি আমার প্রতি অযত্ন। একশটি টাকা লইয়া আসিবে —কাদম্বিনী।" কেশবের স্ত্রী কাদম্বিনীরই অন্যতম শিকার এই যোগেন্দ্র।

কাদম্বিনী দিগম্বরকে ঘরে এনেছে। দিগম্বর কাদম্বিনীকে বলে, "তোমাকে ছাড়াও আমার আর একজন ভাল লেগেছে। সে প্রমীলা। তুমি যদি তাকে আন্‌তে পার এক হাজার টাকা পাবে।" ইতিমধ্যে কাদম্বিনীর ঝি থাকমণি যোগেন্দ্রের আসার খবর দেয়। বিপদ বুঝে কাদম্বিনী দিগম্বরকে অন্যদিক দিয়ে চলে যেতে বলে। তারপর যোগেন্দ্র এসে কাদম্বিনীর হাতে একশো টাকা দেয়। বলে,—"আমার স্ত্রী সতী লক্ষ্মী। তাহার টাকা নিয়েই তোমাকে

দিচ্ছি।" কাদম্বিনী দিগম্বরের কথা ভেবে বলে,—"আগে প্রমীলাকে আমার নিকট পাঠাতে। এখন পাঠাও না কেন?" যোগেন্দ্রের ওপর অভিমানে কাদম্বিনীর স্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। কাদম্বিনীর কান্না দেখে যোগেন্দ্র বিচলিত হয়ে বলে,—"আমিই তাকে সঙ্গে করে লইয়া আসিব।"

কাদম্বিনীর অনুরোধের কথা যোগেন্দ্রের মনে ছিলো। যোগেন্দ্র প্রমীলাকে বলে যে আজ তাকে সঙ্গে করে সে এক জায়গায় নিয়ে যাবে। এই সময়ে চাকরের ডাকে যোগেন্দ্র বাইরে গেলে থাকমণি কথাচ্ছলে প্রমীলাকে বলে, সে বৌঠাকুরুণ (কাদম্বিনী) ও দিগম্বরকে এক জায়গায় বসতে দেখেছে। প্রমীলা আর সব খবর জিজ্ঞেস করলে থাকমণি বলে, কাদম্বিনী—যোগেন্দ্র আর প্রমীলাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেছে। যোগেন্দ্র থাকমণিকে পাঠিয়ে দেয়। প্রমীলা মনে মনে ভাবে, স্বামীর সঙ্গে যাবে, এতে ভয়ের কি আছে।

ওদিকে কাদম্বিনী কেশবকে টাকার ভাগ দিতে চায় না। বলে,—"আমি কাজ জোটাব আর উনি এসে ভাগ নেবেন, তা চলবে না। কেশব মনে মনে রেগে চলে যায়। ইতিমধ্যে দিগম্বর আসে। কাদম্বিনী চুক্তিমতো আগাম হাজার টাকা দিগম্বরের কাছ থেকে নেয়। কাদম্বিনী তাকে তাড়াতাড়ি লণ্ঠনের আলো রাখা শিকেয় উঠতে বলে। এমন সময় যোগেন্দ্র ও প্রমীলা আসে। কাদম্বিনী যোগেন্দ্রকে বলে, তার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে, এই বলে বাইরে নিয়ে যায়। ঘরে প্রমীলা একা থাকে। আর শিকেয় ঝোলে দিগম্বর। প্রমীলাকে একা পেয়ে দিগম্বর বলে,—"তোমার প্রেমতরঙ্গে, রসরঙ্গে, উঠেছি বাবা সিকেব সঙ্গে—।" দিগম্বরের আচরণে প্রমীলা অত্যন্ত চটে যায়। দিগম্বর তখন তাকে প্রথমে একহাজার, তারপর দুহাজার টাকার নোট দেয়। প্রমীলা তা ছিঁড়ে ফেলে। এমন সময় থাকমণি একটা লাঠি নিয়ে এসে দিগম্বরের শিকেয় দোলা দেয়। দিগম্বর দুলতে থাকে। তারপর কেশব, কাদম্বিনী আর যোগেন্দ্র প্রবেশ করে। কেশব হঠাৎ দিগম্বরের বদলে যোগেন্দ্রকে শিকার পেয়ে বলে ওঠে—সে যোগেন্দ্রর বিরুদ্ধে কাদম্বিনীর ওপর ব্যভিচারের নালিশ করবে। ভৃত্যরা সাক্ষী আছে। কিন্তু কাদম্বিনী অসতীত্বের অভিযোগও মেনে নিতে পারে না। অর্থলোভে কেশব কাদম্বিনীকে টেক্কা দিতে চায়। কাদম্বিনী বলে,—"আমিও নালিশ করবো। এতো লোকের সামনে যখন তুমি আমাকে কলঙ্কিনী করলে তখন আমিও ছাড়বো না।" প্রমীলাও কেশববাবুকে বলে—অর্থের জন্য স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করেছে কেশব।

তার একাজ অত্যন্ত জঘন্য রুচির পরিচায়ক। পয়সার ওপর প্রমীলার ধিক্কার আসে। পয়সার জন্যেই মানুষ এতো হীনকাজ করে। প্রমীলা বলে,—"হায়রে পয়সা! আদালতে যাবার দরকার নেই। তিনহাজার টাকার মুক্তোর মালা ছড়াটি দিচ্ছি বিক্রী করে নাও গে।" কাদম্বিনী হারটা ধরতে গিয়ে ফেলে দেয়। মুক্তোগুলো ছড়িয়ে পড়ে। তখন কাদম্বিনী কেশব থাকমণি—সকলেই মুক্তো কুড়োতে ব্যস্ত হয়। অসহায় দিগম্বর বলে,—"আমি কি দোলায় ঝুলবো!" প্রমীলা তার স্বামী যোগেন্দ্রকে মৃদু অনুযোগে বলে,—"ঘরে সতী নারী থাকতে পরে কি কাজ, ইহাতে ধনমান যায়।" এই বলে প্রমীলা চলে যায়। কাদম্বিনী কেশবকে অত্যন্ত প্রহার করে, তারপর গোবরডাঙায় ঘর ভাড়া করতে যায়। কেশব ভাবে,—

"ধন গেছে মান গেছে স্ত্রী ছিল ভরসা
লোভে মূলে সব খোয়ালেম, হায়রে পয়সা!"

যমের ভুল (১৮৯৪ খৃঃ)—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়॥ বৈকল্পিক ইংরাজী নামকরণ সাধারণতঃ বাংলা নামকরণের অনুবাদ হলেও এই প্রহসনটির ইংরাজী নাম—"The devil incarnate"। তীব্র অর্থলোভ এবং লোভজনিত অন্যান্য পাপ বুদ্ধিবলে নিষ্পরিণাম। এক্ষেত্রে ঐশ্বরিক বিধানের দুর্বলতা প্রচার করা হলেও অর্থলোভের বিরুদ্ধে সৌনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নেই। চরিত্র-বিশেষের প্রতি প্রহসনকারের সহানুভূতি অবশ্য তাঁর দৌর্নীতিক দৃষ্টিকোণেরও ইঙ্গিত বহন করে না। তবে অর্থলোভের চিত্র প্রহসনকার মাত্রাতীতভাবে উপস্থাপিত করেন নি। যৌন দৃষ্টিকোণ প্রহসনটির মধ্যে স্পষ্ট। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিকও তুচ্ছ নয়। এ ধরনের বিমিশ্র অবস্থায় প্রদর্শনের সুবিধার জন্যে একটি গোত্রেরই অঙ্গীভূত করা হলো।

কাহিনী।— কৈবর্তপাড়ার চৈতন গাঁয়ের মোড়ল। অকাজ কুকাজে তার মন যায় বেশি। কারো জমিতে ভালো ধান হলে লোক দিয়ে কাটিয়ে এনে গোলাজাত করা. ডাকাতদের সঙ্গে মালের বখ্‌রা রাখা শত্রুতায় কিংবা অর্থলোভে লোক দিয়ে মানুষ খুন করানো—এ সব সে হামেশাই করে থাকে। নিজের জামাইকেও টাকার লোভে খুন করবার ব্যবস্থা সে করেছে। তাছাড়া সে মহাকৃপণ। কিন্তু কুকাজে সে টাকা খরচ করে জলের মতন। বিশেষ করে লাম্পট্যের ব্যাপারে। তার লাম্পট্যের ব্যাপারে গাঁয়ের প্রায় সকলেই অসন্তুষ্ট। গৃহস্থবাড়ীর বৌ ঝিদের ওপর তার নজর। এ ব্যাপারে তার প্রধান

সহায় "থাকি।" "থাকি" বিধবা ব্রাহ্মণী। কিন্তু চৈতন মোড়লের সহবাসে সে অভ্যস্ত। অথচ এদের দুজনেরই ধর্মের ভণ্ডামি আছে।

একদিন কৃষ্ণ নাপিত রাত্রে থাকি-বামণীর বাড়ীতে চৈতন মোড়ল ও থাকিকে এক বিছানায় দেখে চুপিচুপি ঐ ঘরে তালা আটকিয়ে রেখে গাঁয়ের তারা মান্না, বিনোদ গুঁই—এদের খবর দেয়। তারপর সকলের সামনে হারা ডোমের হাতে চাবি দিয়ে চৈতন ও থাকিকে বেঁধে আনতে বলে। এদিকে পঞ্চায়েতের সভা বসে। বিচারক হলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। গাঁয়ের সকলের কথায় ভট্টাচার্য বলেন, এক পক্ষের কথায় চৈতন বা থাকিকে শাস্তি দেওয়া চলে না। ওরা আসুক, ওদের কথাও শোনা যাক। যথাসময়ে থাকি-বামণী আর চৈতন মোড়লকে আনা হয়। থাকি ভট্টাচার্যকে পাল্টা অভিযোগ জানায়। মাতাল হারা ডোম থাকি-বামণীর ঘরে ঢুকে বলাৎকার করবার চেষ্টা করে। থাকি আপত্তি জানালে তাকে সে বেঁধে নিয়ে আসে। পথে চৈতন মোড়ল ঠেকাতে গেলে তাকেও বেঁধে এনেছে। থাকির বুদ্ধির মনে মনে তারিফ করে সেও থাকির কথা সমর্থন করে। সে নাকি ভোরের বেলা মাঝের গাঁয়ে মেধো সর্দারের কাছে খাজনা আদায় করতে যাচ্ছিলো। ভট্টাচার্য বিচারে বলেন, কৃষ্ণ নাপিত ছাড়া অভিযোগের কোনো সাক্ষী নেই। তখন কয়েকজন চাষা এসে বলে তারা সাক্ষী আছে। চৈতন আর থাকি বারবার নানারকম শপথ করে বলে নির্দোষ। ভট্টাচার্য বলেন,—"আচ্ছা, এ মন্তব্য প্রমাণের অভাবে তোমাদের বেকসুর খালাস দিলেম।" তারপর থাকমণি আর চৈতন পরস্পরকে "মা-বাবা" সম্বোধন করে মুক্তি পায়। খালাস পেয়ে চৈতন লোক লাগিয়ে কৃষ্ণ নাপিত ইত্যাদি কয়েকজন লোককে খুন করে গুম্ করে ফেলবার ব্যবস্থা করে। তারপর চলে আর একটা কুকর্মের প্রস্তুতি।

মনোহর কলকাতায় কাজ করে। বছরে বার দুয়েক গ্রামে আসে। তার স্ত্রীটি খুব সুন্দরী। তাকে যদি হাত করা যায়! থাকোমণিকে চৈতন কিছু টাকা দিয়ে শশিমুখীর কাছে পাঠায়। শশিমুখী মোড়লকে মনে মনে ধিক্কার দেয়, কিন্তু সে অসহায়া। মোড়লের প্রস্তাবে সে আপত্তি জানালে মোড়ল হয়তো তাকে লোক দিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। তাই আপত্তি না করে আশা দিয়ে দিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে মনোহর এলে শশিমুখী তাকে সব খুলে বলে। দুজনে মিলে তখন চৈতনকে জব্দ করবার ফন্দি আঁটে। মনোহর বলে, "আজ থাকি এলে, রাত্তিরে চৈতন মোড়ল বেটাকে তোমার কাছে

আসতে বোলো। আমি মামারবাড়ী যাবার ভান কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বোসেদের বাড়ী বসে থাক্‌বো। শালা এলে আচ্ছা কোরে নাকাল করবো। দেখ, আলমারীটা খালি করে রেখো।"

রাত্তিরে খবর পেয়ে চৈতন আসে। "কোথা গো, বউ ঠাকুরুণ কোথা? অনেক আশা করে অতিথ এসে ঘরে আশ্রয় নিলে, মিষ্টি কথা কয়েও কি তাকে তুষ্ট কোরতে নেই?" শশিমুখী তাকে অভ্যর্থনা করে এবং কপট প্রেমালাপ করে। আদরের ভান দেখিয়ে সে জলখাবারের আয়োজন করে। যখন বেশ জমে উঠ্‌ছে এমন সময় নেপথ্য থেকে মনোহর হাঁক দেয়। ততোক্ষণে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে শশিমুখী। চৈতনকে সে আসন্ন বিপদ জানিয়ে খালি আলমারীর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে বলে। শশিমুখীর কথা মতো চৈতন লুকোলে শশিমুখী দরজা খুলে দেয়। মনোহর এসে বলে, পরশুই এখানকার ঘরকন্না উঠিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সে কলকাতায় যাবে। ঘরের ভারী ভারী আসবাবপত্র নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। বিশেষ করে আলমারীটা বিক্রীর জন্যে আজ রাত্রেই পাঠাতে হবে। মুটেদের দিয়ে আলমারী বাইরে নিয়ে গিয়ে মনোহর সকলের সামনে 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়' এবং চৈতনকে সবার সামনে আলমারী খুলে ছেড়ে দেয়। চৈতন মুখ চুণ করে চলে যায়। এমন অপমান সে জীবনে হয় নি। চৈতন ভাবে, লোক দিয়ে সে শশিমুখীকে তার গুপ্তঘরে ধরে এনে যথেচ্ছভাবে ধর্মনাশ করবে এবং মনোহরকেও কিছু শিক্ষা দেবে।

চৈতন লাম্পট্যের শাস্তি বার বার ভোগ করেও শিক্ষা পায় না। অন্যদিকে তেমনি চলে তার অশোভন অর্থলোভ এবং কার্পণ্য। অর্থের জন্যে সে কোনোরকম পাপ কাজকেই অনাচরনীয় ভাবে না। কিন্তু এই চৈতনের নির্জলা পাপজীবনে হঠাৎ গোদানের পুণ্য ঘটে গেলো। তার পুরোহিত অনেকদিন থেকেই একটা বকনাবাছুর চেয়েছিলো। কিন্তু কৃপণ চৈতন তা দেবে কেন? একদিন হঠাৎ তার চাকর এসে খবর দেয় যে তার শ্যামলা এঁড়েটা মরো মরো। চৈতন দেখে সর্বনাশ! একটু পরেই মরবে, কিন্তু ভাগাড়ে ফেল্‌তে তো পয়সা লাগবে। খবর পাঠিয়ে তখনই চৈতন পুরোহিতের ছেলেকে ডেকে পাঠায়। আনুষ্ঠানিকভাবে এঁড়েটা তাঁকে দান করবার পরই এঁড়েটা মরে যায়। পুরোহিতের ঘাড়েই ভাগাড়ে ফেলবার খরচ পড়লো। চৈতন আশ্বস্ত হলো।

একদিন হঠাৎ চৈতন অসুস্থ বোধ করে। সকলের উদ্বেগের মধ্যে

সে মারা গেলো। মরবার আগে অবশ্য সে তার ছেলে হারাধনকে বলেছিলো; সৎকার, হবিষ্যি, শ্রাদ্ধ—ইত্যাদি খরচ এক উপায়ে বাঁচবে। "আমি মোলে লাটি মেরে আমার মাথা ভেঙ্গে গা হাত পা থেঁতো করে চুপি চুপি চৌমাথায় ফেলে দিয়ে এস।...আমায় ওই দশায় মরে পড়ে থাকতে দেখলে পুলিশ ঠাওরাবে কেউ আমায় মেরে ফেলেছে। দারোগা জুলুম কোরে পাড়াশুদ্ধ লোককে টানাটানি করবে, তাহোলেই দারোগার গুঁতোয় সকলে মাথুট করে তোমাদের কিছু দিয়ে মুখবন্ধ করবার যোগাড় করবে। আমায় পোড়াবার খরচ, তোমাদের হবিষ্যির খরচ, আমার শ্রাদ্ধের খরচ, তা থেকেই কুলান হবে। ঘরের কড়ি আর বের কর্ত্তে হবে না।"

মারা যাবার পর যমপুরীতে বেঁধে নিয়ে যাবার পর যমরাজাকে সে এই ব্যবহারের জন্যে গালাগালি করে। যমরাজা বলে, চৈতনের জীবনে সবই পাপ, পুণ্যি একটুও নেই। তখন চিত্রগুপ্তকে চৈতন ভালোকরে খাতা দেখ্‌তে বলে। চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বলে,—ভাগাড় খরচ বাচাবার জন্যে চৈতন এক ব্রাহ্মণকে এঁড়েদান করেছে। ঐ এঁড়েটা মাত্র চারদণ্ড সময় জীবিত ছিলো। ব্রাহ্মণকেই ভাগাড় খরচ যোগাতে হয়েছিলো। চৈতন পুণ্যের ফলটুকু চায়। যম জিজ্ঞেস করে, আগে পুণ্যের ফল নেবে, না পাপের ফল নেবে! চৈতন ভাবে, সে মহাপাপী, চিরকালই তো যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। কতোকাল পরে পুণ্যের ফলভোগ করবার সময় আস্‌বে, তা জানে না। তার চেয়ে পুণ্যের ফলই ভোগ করবে আগে। যম তখন তাকে একটা আজ্ঞাবাহী এঁড়ে দেয়। চারদণ্ড সময় পর্যন্ত সে চৈতনের যা ইচ্ছে, তাই পূরণ করবে। এঁড়েকে পেয়েই চৈতন আজ্ঞা দেয়, "এই যম বেটার পেটে সিং পুরে দে। লাথিয়ে লাথিয়ে, ওর মাথার খুলি ভেঙ্গে দে....তাহলে কেউ মরবে না, সকলেই অমর হবে। আর এই মুহুরী বেটাকেও সঙ্গে সঙ্গে।" তাই শুনে নিজের নিজের আসন থেকে যমরাজ আর চিত্রগুপ্ত উর্দ্ধশ্বাসে পালায়। তখন চৈতন যমরাজের সিংহাসনে বসে হুকুম দেয়—পাপীদের স্বর্গে নিয়ে যেতে। যমদূত বলে, স্বর্গে যাবার তার অধিকার নেই। তখন ক্ষমতামত্ত চৈতন নিজেই পাপীদের উদ্ধারের জন্যে নরকে যায়। ইতিমধ্যে চারদণ্ড উত্তীর্ণ হয়েছে। চৈতন নরকেই আট্‌কা পড়ে যায়। আবার যমরাজ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবকে নিয়ে এসে উপস্থিত হয় সমস্যা সমাধানের জন্যে। বিষ্ণুকে দেখেই যমরাজাকে

ধমক দিয়ে চৈতন বলে ওঠে, শত তপস্যা করে যে-বিষ্ণুর দর্শন পাওয়া যায় না, আজ কৌশলে তাঁর দর্শন পেয়েছে। সুতরাং এখন আর তার ওপর যমরাজের অধিকার নেই। বেকায়দায় পড়ে গিয়ে বিষ্ণু চৈতনকে সমর্থন করতে বাধ্য হন। বিষ্ণুর সঙ্গে সে বৈকুণ্ঠলোকে যায়।

চোরের উপর বাটপাড়ি (১৮৭৬ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু॥ অনুবাদে সমাজচিত্র পরোক্ষ। অনুবাদের তাগিদে একটি বিশেষদিক দৃষ্টিকোণ গত তাগিদ। ভাবানুবাদ আরো একটু প্রত্যক্ষ। এই হিসেবে "চোরের উপর বাটপাড়ি" প্রহসনটি উপস্থাপনের সার্থকতা। মোলিয়েরের School for wires প্রহসনের অনুকৃতি অর্থ সমাজচিত্রের উপকরণহীনতা বোঝায় না। পূর্বোক্ত প্রহসনের মতোই যৌন ও আর্থিক দুটি দৃষ্টিকোণেরই প্রকাশ এতে আছে। লাম্পট্য ও অর্থলোভের বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণের সমর্থন পুষ্টিতে পদক্ষেপে এ ধরনের চয়নকার্যে সামাজিক কারণ স্বীকৃত। সাধারণ লম্পট ও অর্থলোভীর বুদ্ধি যে অন্যের বুদ্ধির কাছে পরাভূত হওয়া সম্ভবপর, তারই প্রচার এর মধ্যে দেখানো হয়েছে।

কাহিনী।—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় বিষয়ী লোক; কিন্তু সচ্চরিত্রের নয়। চোরাই মাল নিয়ে স্বর্ণকার কাঙ্গালীচরণের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত। তাছাড়া ঘরের বৌ-ঝিদেরও সে বার করে থাকে। সে নিজে মদ্যপ। স্ত্রীকেও মদ খাওয়া শিখিয়েছে। এককথায় তার সবরকম দোষই আছে।

একদিন কাঙ্গালীচরণের দোকানে গুপ্ত কথাবার্তা বল্‌তে গিয়ে অপরিচিত এক যুবককে দেখে নিরস্ত হয়। কালীচরণ অঘোরকে অভয় দিয়ে বলে, ছেলেটি বেকার বরং একে দলে টানা যেতে পারে। ছেলেটির নাম নারায়ণ। নারায়ণ নিজের পরিচয় দেয়। "আজ্ঞে এই মিউনিসিপ্যাল ট্রামওয়ে উঠে যাওয়া অবধি বেকার বসেছিলেম, আবার ট্রামওয়ে হবে বলে ভাবছি; মধ্যে দিন আষ্টেক সেনসাসে ঠিকে খেটেছি—সেই অবধিই মিস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, এইখানেই আপিস করেছিলেম।" সেনসাস করেছে, তাহলে পাড়ার সবার সঙ্গে তার জানাশোনা আছে ভেবে অঘোর উল্লসিত হয়। তখনই তাকে কাজে লাগিয়ে দেয়। অঘোর নারায়ণকে একটা বাড়ীর নিশানা দেয়। "এই রাস্তা লম্বা ধরে গিয়ে যে ডানহাতি গলীটে আছে জান, সেটায় যেও না, তার আগে আধরশিটাক গিয়ে ময়রার

দোকান আছে জান, তারির তিন দরজা পশ্চিমে"—। অঘোর চলে গেলে কাঙ্গালী নারায়ণকে বলে,—"মন্দ নয়, আমাদের এই (টাকা বাজাইযা অভিনয) হলেই হল।"

অঘোরের নির্দেশ মতো এসেও নারায়ণ বাড়ী ঠিক করতে পারে না। শেষে একটা দরজা দেখে সেটাকেই সেই বাড়ী বলে মনে হয। একদল বাউল বাউলনী গান করতে করতে চলে যায। নারায়ণ ভাবে,—এদের দেখবার জন্যে পাড়ার সবাই ছাদে উঠ্বে, তাবও সুবিধে হবে। হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জল। জানলা থেকে একজন গিন্নি নারায়ণকে ইসারা করে। ঝিকে দিযে নারায়ণকে সে ভেতরে নিযে যায।

গিন্নির ঘরে ঢুকে নারায়ণ বুঝতে পারলো যে, গিন্নি ভ্রষ্টা। তখন নারায়ণ বল্লো,—"আমি তোমার কথা শুনে অবধি পাগল হযে বেড়াচ্ছিলেম, ক-দিন ধরে রোজ এই রাস্তায পাল্টি মেরেছি, আর এই খড় খড়ি পানে তোমার আশায হাঁ কোরে চেযে থেকেছি।" গিন্নি আহ্লাদে গলে পড়ে। নারায়ণের হাত ধরে বলে,—"বাস্তবিক ভাই, কে জানে, তোমার চোখে কি আছে, এক চাউনিতেই পাগল করেছ।" নারায়ণ তার অসুবিধের কথা বলে,—"ভদ্রলোকের ছেলে, হাতে পয়সা না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না, কাজকর্ম্মের চেষ্টায ঘুরবো না আমোদ করবো?" গিন্নি বলে,—"কোথায তুমি কাজকর্ম্ম করতে যাবে? তাহলে তোমায আমি দিনের বেলায পাব না, তোমার যখন যা দরকার হয আমায বলো—তাতে আর লজ্জা কি? আমার যা, তা তোমারই।" নারায়ণ ভাবে, এতে আহার ওষুধ দুইই চল্বে। গিন্নিকে সে বলে, "ভাই আমায যা বল্বে, তাই করতে প্রস্তুত আছি। আজ অবধি তোমার কেনা গোলাম হযে রইলেম।" নেপথ্যে 'গিন্নি' বলে হাঁক আসে। গিন্নির কর্ত্তা এসেছে। নারায়ণ ঘাবড়িযে যায। গিন্নি তখন নারায়ণকে টেবিলের তলায ঢুকিযে টেবিল ক্লথ টেনে দেয। তারপর নিদ্রাজড়িত স্বরে জবাব দেয,—"অ্যাঁ—যাই।" অঘোরই ঘরে ঢোকে। সে বলে, ভেতরে কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গিন্নি বলে, অঘোর কাছে থাকে না, ঘুমিযেও সুখ নেই। বদ্‌স্বপ্ন দেখ্ছিলো। অঘোর ভাবে, তাহলে স্বপ্নের ঘোরে গিন্নি কথা কযে থাক্বে। অঘোর বলে, রাত্রে আস্তে তার একটু দেরী হবে—একথা বল্তে এসেছে শুধু। অঘোর চলে গেলে গিন্নি নারায়ণকে বাইরে এনে জলটল খাওয়ায।

নারায়ণ কাজের ছুতো করে বিদায় চায়। গিন্নি তার হাতে অঘোরের মানিব্যাগ্‌টা গুঁজে দেয়।

নারায়ণ ভুল করে অঘোরের বাড়ীতেই ঢুকে পড়েছিলো। অঘোরকে সে সব কথা খুলে বলে, তারপর মানিব্যাগ্‌ দেখায়। অঘোর ভাবে, সর্বনাশ! তারই মানিব্যাগ্‌। কিন্তু সে কিছু বল্‌তে পারলো না। এমন মানিব্যাগ্‌ তো অন্যেও কিন্‌তে পারে। নারায়ণ ঘরের যে বর্ণনা করে, তার সঙ্গে আঘোরের শোবার ঘরের হুবহু মিল। সিন্দুক আর পিপের কথাও নারায়ণ বলেছে! কিন্তু, স্ত্রী কি তাহলে সত্যিই চরিত্রহীনা? মানিব্যাগের দুশো টাকায় অঘোর আর বখ্‌রা নেয় না। আরও বেশী হলে নেবে। অঘোর ভাবে—"ব্যাটা কি শেষকালে আমারই সর্ব্বনাশের যোগাড় কল্লে—অ্যাঁ! যাই হোক্‌, কাল তক্কে তক্কে থাক্‌তে হবে।"

পরের দিন যথারীতি নারায়ণ গিন্নির কাছে যায়। গিন্নি নারায়ণকে মদ খাওয়ায়, নিজে খায়। চাকরী গিয়ে অবধি নারায়ণ এ নেশা একরকম উঠিয়েই দিয়েছিলো। নারায়ণ পুলকিত হয়ে মদ খায়। নেশার ঝোঁকে গিন্নি আদিরসাত্মক গান গায়—নারায়ণকে উদ্দেশ করে। এমন সময় নেপথ্যে দরজা ধাক্কা। অঘোর এসেছে। গিন্নি তখন নারায়ণকে পিপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। অঘোর ঘরে ঢুকেই টেবিলের তলা খোঁজে। ইতিমধ্যে পেটে খুব যন্ত্রণা বলে গিন্নি বসে পড়ে। অঘোর তখন বসন্ত ডাক্তারকে ডাকতে যায়। নারায়ণ এই সুযোগে প্রেমলীলা মিটিযে চলে যায়। আজ আর টাকা পাওয়া গেলো না! অঘোরের সঙ্গে নারায়ণের দেখা হলে আজকের ঘটনা হুবহু সে বলে যায়। অঘোর মনে মনে ফোঁসে। ভাবে,—"বার বার তিনবার! কাল এস্পার কি ওস্পার। কিন্তু ঐ ঘরে কোথায় লুকুবে? যাই, কাল আমি সাড়ে তিনটার সময় হাজির হচ্ছি।" নারায়ণকে সে তিনটের সময় ওখানে যেতে বলে।

যথারীতি গিন্নির বাড়ীতে আবার নারায়ণ যায়। মনে মনে ভাবে,—দীনবন্ধু মিত্রের সেই উক্তিটা,—

"ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।
আনাড়ীর ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে ॥"

"পরের তালুকে কি মৌরস বন্দোবস্তই আমার হয়েছে, তবে বুড়ো বেটাকে কিছু কিছু দালালী দিতে হবে; তা দিলেমই বা, গিন্নির আমার

উপর যে রকম নেকনজর দেখ্‌ছি, এখন এ বাড়ী ঘরদোর সব আমারই। বুড়োটা আমায় কিছু সন্দেহ কচ্ছে, তাকে টাকাকড়িরই ভাগ দেবো, গিন্নি আমার।" গিন্নির সঙ্গে প্রেমালাপ সবে জমে উঠেছে এমন সময় আবার নেপথ্য থেকে অঘোরের হাঁক আসে। গিন্নি নারায়ণকে সিন্দুকের মধ্যে ভরে রাখে। অঘোর ঘরে এসেই পিপে দেখে, টেবিলের তলা দেখে, কোথাও পায় না। তখন গিন্নিকে নষ্টা বলে গালাগালি দেয়। গিন্নি কান্নার ভান দেখায়। বলে,—এক্ষুনি সে বাপেরবাড়ী চলে যাবে। অঘোর বলে,—"যাও বাপকা বাড়ী, নেই চাতা হ্যায়, তোমার মত মাগ আমার ঢের ঢের মিলেগা, আমার মেজাজ গরম হয়ে গেছে।" গিন্নি তখন তার বাপেরবাড়ীর জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে যেতে চায়। অঘোরকে সে বাপের-বাড়ীর সিন্দুক মাথায় করে বাইরে আসতে বলে। ওর মধ্যে তার বাপের-বাড়ীর সব কিছু আছে। সিন্দুকটি বইতে বইতে তার থেকে অঘোরের মাথায় জল গড়িয়ে পড়ে হঠাৎ। গিন্নি বলে,—"মা তারকেশ্বরে গেছলেন, চন্নামেত্ত দেছলেন, দুষ্প্রাপ্যি জিনিস—আহা বুঝি পড়ে গেছে—।" অঘোর তাড়াতাড়ি জিভ দিয়ে সেই জল যতোটুকু পারে চেটে নেয়।

গিন্নিকে বাপেরবাড়ীতে রেখে এসে অঘোরের মনটা খারাপ হয়ে যায়। হয়তো সবকিছুই তার মিথ্যে সন্দেহ! নারায়ণের সঙ্গে অঘোরের দেখা হলে গত ঘটনাটা নারায়ণ হাসতে হাসতে বলে। অঘোর দেখে—নারায়ণ যা বল্‌ছে, সব কিছুই মিলে যাচ্ছে। "সিন্দুক মাথায় কোরে সে চল্লো, আমি ভয়ে আড়ষ্ট। শেষে মশাই, ভয়ে পেচ্ছাপ কোরে ফেল্লেম! তা ছুঁড়ীর কথায় মিন্‌ষে তাই তারকেশ্বরের চন্নামেত্ত বলে চাট্‌লে!" অঘোর ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। "অ্যা, পেচ্ছাপ, পেচ্ছাপ! গুয়েখেগোর বেটা, পেচ্ছাপ! ওয়া! ওয়াঃ—ওয়াক্—থুঃ থুঃ!" অঘোর নারায়ণকে প্রহার করে। নারায়ণ অবাক হয়ে বলে,—"একি মহাশয়, ক্ষেপলেন না কি? সে আপনার কে? তার মুখে পেচ্ছাব করেছি, বেশ করেছি, তাতে আপনার কি?" অঘোর উত্তর দেয়,—"সে আমার বাবা রে শালা! পেচ্ছাপ করেছ, থুঃ! ওয়াক্ থুঃ! শালা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!!!"

নারায়ণ চলে যায়। অঘোর আক্ষেপ করে,—"আমি যেমন দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে ভদ্রলোকের মেয়েদের ওপর নজর দিতেম, গিন্নী আমার তেমনি মুখের মতন জুতো দেছেন।—চোরের উপর বাটপাড়ি হলো মোর ভালে!"

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি (১৮৬৮ খৃঃ)—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (ইছাপুর, নদীয়া)॥ প্রহসনকার বিজ্ঞাপনে বলেছেন,—"কয়েক বৎসরাবধি অস্মদ্দেশে বঙ্গভাষায় বহুবিধ নাটক রচনা ও তাহার অভিনয়াদি আরম্ভ হইয়াছে, তদ্দর্শনে আমিও কৌতূহল পরবশ হইয়া ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি নামে এই নাটক-খানি রচনা করিলাম।" সমাজচিত্রে পূর্ববর্তী নাট্যসংস্কার প্রহসনকার স্বীকার করেছেন, কিন্তু সমাজচিত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সংস্কারও ছিলো। প্রহসনের একস্থানে নট বলেছে,—"বর্ত্তমান ঘটনায় লোককে যেমন মোহিত করে, বোধহয় কোন প্রাচীন ঘটনায় তেমন করে না।" বলাবাহুল্য নৈতিকতার জন্যেই প্রহসনটির শেষে একটা অনাবশ্যক কাহিনী সংযোগ করা হয়েছে যেটি পৃথকভাবে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

কাহিনী।—শ্যামলাল ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দুই ভাই—জগদীশপুরের জমিদার। বিশ্বনাথ তাঁর স্ত্রী দয়াময়ীর প্রবোচনায় শ্যামলালকে দেশান্তরী করেন—নিষ্কণ্টকভাবে বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যে। শ্যামলাল কাশীবাসী হন। দয়াময়ীর স্বভাব তার নামের ঠিক বিপরীত। বিশ্বনাথ নিজেই তার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,—"দয়াহীন লজ্জাহীন এমন স্ত্রীলোক কখন কোথাও দেখি নাই। কি দেখে যে ওর পিতামাতা ওর দয়াময়ী নাম রাখিয়াছিল, তা বলিতে পারি না।" শ্যামলালের একটিমাত্র ছেলে বিপিন বিশ্বনাথের কাছে থাকতো। তাকে হত্যা করবার জন্যে দয়াময়ী বিশ্বনাথকে উত্তেজিত করে। অবশেষে এক রাতে বিশুবাবু হারাণে রত্না রাম সিংহ প্রভৃতি অনুচরকে দিয়ে বিপিনকে খুন করালেন। হত্যার সংবাদে দয়াময়ী খুব খুশি। আহ্লাদে মত্ত হয়ে মৃত বিপিনকে উদ্দেশ করে বলে,—"ওরে পোড়ার মুখো ছেলে! এখন বিষয়ের ভাগ লও-সে, রূপার থাল গড়িয়ে লও-সে, বাড়ীর অর্দ্ধেক পাচিল দিয়ে ঘিরে লও-সে। কি চোপাই ছিল, এখন কেমন! খাও ভাগ খাও!"

আসলে অস্ত্রাঘাতে অচেতন বিপিনকে নদীর ধারে রেখেই বিশুবাবুর অনুচররা চলে গিয়েছিলো। বিপিন মরে নি। সকাল বেলায় টোলের পণ্ডিত ও পুরোহিত জানকী ভট্টাচার্য স্নান করতে গিয়ে রক্তাক্ত অজ্ঞান বিপিনকে শায়িত দেখেন। ছাত্র মদন এই দুর্ঘটনার কারণ অনুমান করেছিলো। জানকীর কাছে সে তথ্য উদ্‌ঘাটন করলো। একদিকে জমিদারের আক্রোশ—অন্যদিকে সাধারণ মানবতাবোধ। উভয় সঙ্কটের মধ্যে

থেকে তারপর শেষে জানকী অচেতন বিপিনকে প্রাথমিক সেবাশুশ্রূষার পর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুল্‌লেন। কবিরাজের চিকিৎসা চল্‌লো।

বিশুবাবুর মনে দুশ্চিন্তা এলো। কারণ যথাস্থানে লাশ নেই। পরে লাশ লুকিয়ে ফেল্‌তে গিয়ে তা আর পাওয়া যায় নি। প্রতিবেশী মোক্তার মহানন্দ বসুকে তিনি বললেন যে, কে নাকি বিপিনকে মেরে ফেলে লাশ থানায় নিয়ে গেছে! মহানন্দ বুঝেও সব চেপে গেলেন। চাকরদের মুখে বিশুবাবু শুনলেন, তাদের এই হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধ বংশীময়রা দেখেছে। ময়রাকে তিনি ঘরে আট্‌কিয়ে রাখবার জন্যে আদেশ দিলেন।

থানায় ময়রা সাক্ষী দিলো। বল্‌লো, কেবল প্রাণের ভয়ে সে বিপিনকে রক্ষা করতে পারেনি। বিপিনের আংটিটা সে দারোগাকে দিলে দারোগা তা বেমালুম নিজের আঙ্গুলে পরে মহানন্দের সঙ্গে দশহাজারের একটা বন্দোবস্তের প্রস্তাব তুল্‌লো—চুপি চুপি। তখন মহানন্দ বংশীকে বল্‌লো—"মর বেটা রাইয়ৎ হইয়া এ প্রকার নিমক হারামী, বেটা যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।" আরও বল্‌লো,—"তুমি বুড়ো হতে চলেছ, এ কর কি? একটা ব্রহ্ম হত্যা করবে নাকি? ক্ষান্ত হও, তুই বল্, যা তুই বলিয়াছিস্ সব মিথ্যে।" এমন কি পাঁচশো টাকার লোভও সে দেখায়। তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ বংশী বলে,—"আর মহাশয় আমার আর রাজা হইনা কাজ নাই, মরিলে টাকা সঙ্গে যাইবে না, আমায় মেরে ফেলিলেও মিথ্যা বলিতে পারিব না, ধর্ম্ম থাকেন, বিচার কর্ব্বেন।" দারোগা তাঁর অনুচরদের আদেশ দিলেন, বংশীকে রুদ্ধ রেখে যেন প্রহার করা হয়। সকলের প্রস্থানের পর মূর্তিমান্ ধর্ম এসে কিছু তত্ত্বকথা বলে প্রস্থান করেন।

ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন থানা পরিদর্শনে। থানা শূন্য দেখে বিরক্ত হয়ে কটূ মন্তব্য করেন। এমন সময় চারজন লোক একটি কাগজ এবং চারশত টাকা নিয়ে এসে দারোগা ভ্রমে ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে তা অর্পণ করলো। কাগজটির একদিকে বিশুবাবুকে মহানন্দবাবুর চারশত টাকা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি ছিলো। কাগজটির অন্যদিকে সেই চিঠিটিরই উত্তর ছিলো। বিশুবাবু লিখেছেন যে তাঁর অনুচর চারজনকে যেন বাঁচানো হয়। আভাসে কিছু কিছু বুঝে ম্যাজিষ্ট্রেট লোক চারজনকে তখনই গ্রেফ্‌তারের আদেশ দিলেন। তারপর প্রহৃত অবস্থায় অর্দ্ধমৃত বংশীধরকে ম্যাজিষ্ট্রেট আবিষ্কার

করলেন। বংশীধর সব কিছু ফাঁস করে দিলো এবং তাকে প্রহার করবার কি কারণ, তাও সে জানালো।

এদিকে দারোগা আর মহানন্দ দাবা খেল্‌ছিলেন। চাপরাশি এসে সর্বনাশ-বার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছিযে দেয। তারা হন্তদন্ত হযে থানায ছুটে আসেন। মহানন্দকে সঙ্গে সঙ্গে কয়েদের আদেশ দেওয়া হলো।

জানকীর গৃহে বিপিনের চিকিৎসা চল্‌ছে। কিন্তু রোগ নিরাময়ের কোন লক্ষণ দেখা দিলো না। উপায়ান্তর না দেখে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করা হলো। ডাক্তার এসে কবিরাজকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্যে দোষারোপ করলেন। কবিরাজ তখন তাকে বেল্লিক, নাস্তিক, অহংকারী ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করে চেঁচিযে বলে ওঠেন,—"ওরে আমার ডাক্তার রে, ওঁদের আগে আর কেহ চিকিৎসা করিত না!"

বিপিনকে লুকিযে রাখবার কথা জানকী এতোদিনে প্রতিবেশীদের বলেন নি। কিন্তু ক্রুদ্ধ কবিরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে তা জানিযে দিলেন। ফল ভালোই হলো। ম্যাজিষ্ট্রেট জানকীর বাড়ীতে এসে তাঁর এবং ডাক্তারের প্রশংসা করলেন। ডাক্তারকে আদেশ দিলেন বিপিনকে তার ডিস্পেন্‌সারিতে নিযে যাবার জন্যে। সাক্ষ্যদানে ভীত জানকীকে ১৮৫৫ সালের দুইযের আইনের ভয দেখানো হলে জানকী শেষে সাক্ষী দিতে রাজী হলেন। অবশেষে জজের বিচারে রামসিং, রতা ও হারাণে সহ বিশুবাবুব যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ভীচন নামে অনুচরটি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায বেকসুর খালাস পায। মহানন্দের তিন বছর জেল হয। দারোগা আর চাপরাশির হয পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

কাহিনীটি সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য আছে। মুদ্রিত গ্রন্থে এই কাহিনীর পর একটি রোমান্টিক কাহিনী সংযুক্ত হযেছে যা নামকরণের প্রবচনটিকে আবার প্রমাণ করে। একই লেখকের অন্য একটি পুস্তিকা থেকে[১] জানা যায়, গ্রন্থকার "পদ্মগন্ধা" নামে একটি নাটক লিখেছিলেন, তা "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" নাটকটির সঙ্গে সূত্রান্বিত করা হযেছে। কারণ সেই নাটকটিও একই প্রবচনের প্রমাণ দেয। নাটকটি সম্পর্কে এরূপ একটা সমস্যা থাকায এই নাটকটির "পদ্মগন্ধা" কাহিনী বর্জন করে বিবেচনাধীনভাবে উপস্থাপন করা হলো। কারণ সামগ্রিক বিচারে নাটকটি মিলনান্তক হলেও প্রহসন বলা চলে না।

১। কমল বাসিনী?

শাশুড়ী জামাই (১৮৮৩ খৃঃ)—শম্ভুনাথ বিশ্বাস ॥ গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "তুমি কার" কাহিনীটির অনুরূপ হলেও সামান্য পার্থক্য থাকায় এটিকে এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এখানে নামকরণ সমাজচিত্রের রুচির ইতিহাস প্রকাশ করে। এই কাহিনীতে "তুমি কার" প্রহসনটির মতো বৈষ্ণবীর ভূমিকা নেই।

কাহিনী।—এক অর্থপিশাচ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলো। তার স্ত্রী আগেই মারা গেছে। একটি মাত্র কন্যা আছে। ব্রাহ্মণ তার বিয়েও দিয়েছে একজন যুবকের সঙ্গে। যুবক বিদেশে থাকায় স্ত্রীকে অনেকদিন বাপেরবাড়ীতে রাখে। এই অনুপস্থিতির সুযোগে ব্রাহ্মণ তার কন্যার আবার একটি বিয়ে অন্যত্র দিয়ে পণ গ্রহণ করে। পণের টাকা সে প্রচুর পেলো। টাকা পেয়ে খুশি ব্রাহ্মণ বুড়ো বয়সে আর একটা বিয়ে করলো। স্ত্রীটি তরুণী। ইতিমধ্যে তার মেয়ের আগেকার জামাই ফিরে আসে। সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায়। পরে সবকিছু জানতে পেরে সে খুব চটে যায়। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় সে বুদ্ধি খাটিয়ে তার নতুন শাশুড়ীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। সুন্দরী যুবতী শাশুড়ী যুবক-জামাইয়ের সঙ্গে ঘর করতে অনায়াসেই রাজী হয়।

মানিক জোড় (১৮৯০ খৃঃ)—বিপিনবিহারী বসু ॥ দুই ভাই ছিলো। তাদের একজন ছিলো লম্পট এবং অন্যটি নব্যপ্রচারক। একজন লাম্পট্যে জলের মতো টাকা খরচ করতো, অন্যটি অসদুপায়ে সম্পত্তি নেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। প্রথমজন—তার ইয়ারদের কাছে করা ধারগুলো শোধ করবার জন্য আসবাবপত্র বিক্রী করে। দ্বিতীয়জন—অতিলোভে তার সম্পত্তি হারায়। ঠিক এই সময়ে তার কাকা তীর্থ থেকে ফিরে আসেন। তিনি তাদের চরিত্র পরীক্ষা করবার জন্যে ছদ্মবেশে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি অপব্যয়ী ভাইটিকে সম্পত্তির অধিকারী করে তার চরিত্রের আশ্চর্য পরিবর্তন আনেন।

দশ আনা-ছ আনা (১৮৯৬ খৃঃ)—দুটি যুবক একটি বাক্স চুরি করে। বোঝাই মাল দশ আনা ছ আনায় ভাগ করবার জন্যে তারা স্বীকৃত হয়। কিন্তু অবস্থা বিপাকে তাদের জেল হয়। একজনের—যার দশ আনা ভাগ—তার দশমাসের জেল, এবং অন্যজনের ছয়মাসের জেল!

আশ্চর্য-কেলেঙ্কার (১৮৮০ খৃঃ)—উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল ॥ এক ব্যক্তি অত্যন্ত

অর্থলোভী। তার বোনের একজন উপপতি ছিলো। সে ধরা পড়লেও লোকটি তাকে ক্ষমা করলো। স্থির হলো, বদলে তাকে কিছু টাকা দিতে হবে, তাহলে সে লোকটির কুকর্ম গুপ্ত রাখবে। কিন্তু বোনের উপপতিটি আর টাকা দেয় না, এতে লোকটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। প্রতিশোধ বাসনায় সে নিজেই নিজের বোন সেজে লোকটির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে। এতে তার নিজের বোনেরই নিন্দা রটে, কিন্তু সে মনে মনে খুশি হয়—লোকটাকে জব্দ করেছে ভেবে। (সম্ভবতঃ এটি ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক রচনা।)

অর্থলোভকে কেন্দ্র করে রচিত বিভিন্ন প্রহসনের পরিচয় দেওয়া হলো। এগুলোর সঙ্গে অবশ্য প্রহসনকারের অন্যান্য বক্তব্যও বিমিশ্রভাবে আছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, এগুলোর অনুপস্থিতি অনেক উপকরণের লুপ্তি ঘটাতে সহায়তা করে। কারণ শুধুমাত্র মুখ্য দৃষ্টিকোণের মূল্য এবং সমাজচিত্রের মূল্য এক নয়।

(খ) ব্যয়নীতি ঘটিত

(খক) কার্পণ্য ॥—

আয়নীতি সম্পর্কে বল্‌তে গিয়ে সংস্কৃত হিতোপদেশে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও অতিসঞ্চয়কে অকর্তব্য বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঞ্চয়ের পরিমাণ যা-ই হোক সদ্ব্যয়ই কর্তব্য একথা সমাজ হিতৈষীরা বলে গেছেন। বিলাসিতা গর্হিত, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যয়ের অপ্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সামাজিক দানের অবকাশ আছে। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে[২] "দাতালঘুরপিসেব্যো ভবতি ন কৃপণো"। কৃপণের দুর্দশার কাহিনী সমাজে বহুল প্রচারিত। তবে কৃপণের আয়ব্যয়নীতির ও বর্ণনায় যুগের প্রভাব থাকা সম্ভবপর। গতশতাব্দীর কবি ঈশ্বরগুপ্তকে অন্যান্য বিষয়ের মতো কার্পণ্যও আকৃষ্ট করেছিলো।—

"কৃপণ-কাহিনী কথা এইরূপ হয়।
ব্যয়হীন কোন কালে প্রিয় কারো নয়॥
নামশুনে সকলেই উপবাস করে
পথে দেখে ঠারে ঠোরে উপহাস করে॥

২। পঞ্চতন্ত্র ২/৭৫।

প্রাতে উঠে কেহ তার নাহি করে নাম।
যদি করে জীব (= জিভ) কেটে করে রাম রাম॥
নাম নিলে সেদিনেতে, অন্ন নাহি হয়।
পরিবার সহ সবে উপবাসে রয়॥
সর্বশেষে নিবেদন শুন পুরজন।
হয়ো না কৃপণ কেহ হয়ো না কৃপণ॥"[৩]

এখানে কৃপণ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। গত শতাব্দীর অন্য একজন লেখকও একটু নীতি ও তত্ত্বভিত্তিক মন্তব্য করেছেন। চন্দ্রমোহন গুহ তাঁর 'সংসার বা মনুষ্যজগৎ' গ্রন্থে লিখেছেন,—[৪] "অপরিমিতব্যয়ী হওয়া যেমন নিতান্ত অন্যায়, তেমনি আবার এক কালে কৃপণ হওয়াও যারপরনাই অসুখের বিষয়। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ এবং অপরিমিতব্যয়ী, এ উভয়েই আত্মবঞ্চক, নিজেকে নিজে বঞ্চনা করিয়া থাকে।" আয়ব্যয়নীতি ও অবস্থা ছাড়াও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রসঙ্গও সমাজচিত্রের উপকরণ স্বরূপ গৃহীত হওয়া সম্ভব।

চিনির বলদ (খৃষ্টাব্দ অজ্ঞাত)—লেখক অজ্ঞাত॥ নামকরণের ব্যাখ্যা প্রহসনটির মধ্যেই দেওয়া হয়েছে,—

"সঞ্চয় করিলে মধু খায় তো ভ্রমরে।
চিনির বলদ বৃথা বোঝা বয়ে মরে॥"

কার্পণ্য সম্পর্কে গিন্নির উক্তি—"কৃপণের ধন তথা বিফল সদাই।" বস্তুতঃ কার্পণ্যের বিরুদ্ধেই প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ প্রধান।

কাহিনী —বেগুসরাইয়ের প্রসিদ্ধ কৃপণ কর্তা-মশায়। কর্তা কোম্পানীর কাগজ কিনে অনেক টাকা করেছে। এই টাকা আবার সুদের কারবারে বা তালুক বাঁধা রেখে কর্জ দিয়ে সেই টাকা ছারপোকার বংশের মতো বৃদ্ধি করেছে। পাঁচজনকে খাওয়াতে নারাজ বলে কর্তাকে পাড়ার লোকে কৃপণ বলে। কর্তা তার মেয়েকে কম খরচে এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। সেই ভানুমতীরই ছেলের অন্নপ্রাশন। গিন্নি তাকে বলে দশজনকে খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু কর্তা খাইয়ে টাকা খরচ করতে রাজী নন। এমন সময়

৩ ঈশ্বরগুপ্ত গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং, পৃঃ ২৬৫-৬৬।
৪। কোচবিহার, ১২৯৩ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ১০২।

বাজার নিযে কলে-নাপিত আসে। কলে কর্তাকে বলে,—বাজারে আর যেতে হয় নি। বন্ধু ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু পুঁটিমাছ সে চেযে এনেছে। আর সাহেবের বাগান থেকে ফেলা কপির পাতা কুডিয়ে এনেছে। বিনা খরচায় বাজার হওযায কর্তার মনে খুশি আর ধরে না। গিন্নিকে বল্‌তে বলে,—গাছ থেকে আধখানা কাঁচকলা কেটে এনে গিন্নি যেন রান্না করে। কলের মুখে গিন্নি এ ধরনের অদ্ভুত কথা শুনে অবাক হযে কারণ জিজ্ঞেস করে—"আবার আধখানা কেন।" কর্তা বলে,—ঐ কলা ঘরে থাকলে বাডতো না, কিন্তু ঐ আধখানা গাছে থাকবার জন্যে পরদিন তিন আঙুল পরিমাণ বেডে যাবে। কর্তার বুদ্ধি দেখে গিন্নি হাসবে না কাঁদবে—ভেবে পায না। সে মন্তব্য করে,—কৃপণদের ঘটে এতো বুদ্ধি আছে! কর্তা গিন্নিকে শুরকী কুট্‌তে বলে। কারণ বাজার থেকে হলুদ কিন্‌লে বেশি খরচ হবে। গিন্নি রাজী না হওয়ায় কর্তা ভাবে, কলে আর সে—দুজনে মিলেই শুরকী কুট্‌বে। ইতিমধ্যে কলে কর্তার জন্যে তামাক সেজে এনে দেয। হুঁকোর ফুটো বডো থাকায তামাক তাডাতাডি পুডে যাবে—এই ভযে কর্তা হুঁকোর নল্‌চের মধ্যে একটা কাঠি গুঁজে দেয।

কর্তার বাডীতে অতিথি কেনারাম এসে আহারের বাসনা জানায়। তারপর কর্তার হাত থেকে হুঁকোটি নিতে যায। কর্তা হুঁকো দিতে চায না। কেনারাম বলে,—"আমিও ব্রাহ্মণ, যার-তার হুঁকা খাই না।" তবু কর্তা হুঁকো দিতে চায না। গিন্নি এসে বলে, ভদ্রলোকের ছেলেকে এভাবে হুঁকো না দেওযাটা অভদ্রতা। হুঁকো যদি না দেয তো গিন্নি এক্ষুণি গলায ফাঁস লাগাবে। কর্তা তখন বলে,—"তুমি মরবে কেন এই আমিই যাচ্ছি।"—বলে সে চলে যায। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নিও তার মান ভাঙাবার জন্যে পেছন পেছন ছোটে। কেনারাম বোঝে, লোকটা কৃপণ।

রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁডিযে কর্তা গিন্নির কথা চলে। গিন্নির অনুরোধে কর্তা বলে, সে আর এমন করবে না। গিন্নি কর্তাকে বলে, ভানুমতীর ছেলের ভাত, দশ টাকা খরচ করতে হবে। কর্তা বলে, খরচ সে করবে; কিন্তু, লোকে না হয় কৃপণ বলে, তাই বলে স্ত্রীও কৃপণ বল্‌বে? স্ত্রীর ওপর কর্তার অভিমান হয়। যাহোক সে যাত্রা মিট্‌মাট্‌ হয়। এই সময় স্নানের তেলের জন্যে কেনারাম আসে। গিন্নি তাকে তেল দেয়। কর্তা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে। এসেই কেনারামের তেলশুদ্ধ হাতের চেটো দিয়ে নিজের গালে

চড় কষে। তারপর কেনারামকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। এই অদ্ভুত ব্যবহারের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে কর্তা বলে, যতটুকুই হোক—গালে যে তেল মাখা হলো আর তো সেখানে মাখতে হবে না। গিন্নি কর্তাকে বুঝিয়ে বলে,—"তুমি যদি মেয়েকে বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে না দিতে তবে এই খরচ করতে হতো না।" কর্তা জবাব দেয়, সে জানতো না যে বুড়োর কিছু টাকাকড়ি নেই। অনেক আছে জেনেই বিয়ে দিয়েছিলো। বুড়ো মরলে সেই সম্পত্তি সে নিজে পাবে এই আশাতেই। তারপর কর্তা কলে নাপিতকে বলে কুমোরবাড়ী থেকে যেন একটা হাড়ী আনে। হাঁড়ীতে যেন পাঁচটা খোপ থাকে। কর্তা মনে মনে ভাবে, সেই খোপগুলোতে উত্তম, মধ্যম, অধম, তস্যাধম, অধমাধম—এই পাঁচ রকম সন্দেশ রেখে পরিবেশন করা হবে। এতেই খুব সুবিধে।

কেনারাম স্নান করে এসে গিন্নির কাছে দুটো চাল জল চায়। গিন্নি তাকে সন্দেশ দেয়। কেনারাম সন্দেশ খেতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় কর্তা এসে হাত দিয়ে তার মুখের সন্দেশ বার করে নতে চায়। কর্তা বলে, সে নিজেই ঐ এঁটোটা খাবে। গিন্নি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে যায়। সে কর্তাকে মরবার ভয় দেখায়—ফাঁসী দিয়েই সে মরবে। কর্তা বলে,—"না, তুমি মরবে কেন আমিই চল্লাম।" গিন্নি তখন কর্তার পিছু পিছু ছোটে মান ভাঙাবার জন্যে।

কর্তাকে গিন্নি বুঝিয়ে বলে, ভদ্রলোকের ছেলের তেষ্টা পেয়েছিলো। তাই জল না দিয়ে একটা সন্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। যাহোক, কর্তার এন্তোটা করা অনুচিত হয়েছে। তারপর কর্তা খেতে বসে। গিন্নি বলে, বাইরে সবাই কর্তাকে কৃপণ বলে হাসাহাসি করে। খাওয়া ছেড়ে কর্তা উঠে পড়তে যায়—কর্তা তাদের মারবে! এমন সময় কেনারাম তাড়াতাড়ি এসে কর্তার থালার ভাত খেতে আরম্ভ করে দেয়। সম্বিৎ পেয়ে কর্তা কেনারামকে মারতে যান। গিন্নি তখন জোর করে কর্তাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে বসে কর্তা কলে-কে সামনে রেখে ফর্দ করছে। কিভাবে কপির পাতা, ঘিয়ের বদলে তেলের লুচি চালানো যায়, তার পরামর্শ চলে। নিমন্ত্রণে ত্রিশজনের নাম ধরা হয়েছে! প্রত্যেকেই একটাকা নিয়ে আসবে। ত্রিশ টাকার তুলনায় খরচ বেশি হবে না। গিন্নি এসে বলে, নাতিকে কি গয়না দেবে। কর্তা বলে, আর একটা পয়সাও সে খরচ করবে না।

অন্নপ্রাশনের দিন। কর্তা বৈঠকখানায় বাক্সখানা নিয়ে আছে টাকার আশায়। কিন্তু কেউই টাকা দিলো না। কিন্তু সে যে তাদের যেচে সন্দেশ খাইয়েছে। শেষে শোকে অস্থির হয়ে জ্বরের অজুহাতে সরে যায়। পাশের ঘরে মেয়ে-জামাই শুয়ে আছে। এ ঘর থেকে কর্তা তাদের যথেচ্ছ-ভাবে গালাগালি দেয়।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে কর্তা দেখে যে, তার গলায় বাঁধা সিন্দুকের চাবিটা নেই। তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে গিয়ে সিন্দুক খুলে দেখে তার মধ্যে শুধু ছাই রয়েছে। টাকা পয়সা গয়না গাঁটি কিছুই নেই। কর্তা বুঝলো, কলে নাপিতই এ-কাজ করেছে। কলে-কে কর্তা বিশ্বাস করতো। একটা তাগাও তাকে করে দেবে বলেছিলো। গিন্নি সবকিছু দেখে মন্তব্য করে, কৃপণের ধন এমনি করেই যায় এ ধন রাজা জমিদার ও চোর—এই তিনজনে ভোগ করে। বাপের বাড়ীতেও সে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছে। কর্তা দুঃখ করে বলে,—"আমি এত কষ্ট করে টাকা করেছিলুম। আমার এক্ষণে চক্ষু ফুট্‌লো। আমার দুর্দ্দশা দেখে কৃপণদের চক্ষু ফুটুক। তুমি আমাকে প্রবোধ দেও। টাকার শোকে আমি আর বাঁচবো না।"

হিতে বিপরীত (১৮৯৬ খৃঃ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'নূতন দাদা'॥ 'নাতিনী' নলিনীর শুভবিবাহে এটি উপহার। সুতরাং 'দাদু' হিসেবে প্রহসনকার বৃদ্ধের বিবাহ সাধের যে পরিণতির চিত্র দিয়েছেন, তাতে অযোগ্য-বিবাহের বিরুদ্ধেও লেখকের দৃষ্টিকোণ পরোক্ষ। কার্পণ্যের ব্যাখ্যাও একই দিক দিয়ে করা চলে। কিন্তু সমসাময়িক পুষ্ট দৃষ্টিকোণের সমর্থনেই প্রহসনকার প্রকারান্তরে সমাজচিত্রের মূল্য দিয়েছেন।

কাহিনী।—বৃদ্ধ ভজহরি অত্যন্ত কৃপণ। তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী মারা গেছে। বয়স এখন সত্তর। তাই লোক-লজ্জায় বিয়ে করতে পারছে না। একাই থাকে সে। সঙ্গে থাকে তার চাকর রামধন। আর তার নাতি কুঞ্জবিহারী।

রামধনকে ভজহরি সংসারে যাতে সাশ্রয় হয়, তার কায়দা শিখিয়ে দেয়। ভদ্রলোক এলেই তাঁর এক ডাকে যেন রামধন তামাক সেজে এনে না দেয়। "দশবার 'তামাক দে' 'তামাক দে' বল্‌তে বল্‌তে একবার নিয়ে এলে—গেরস্তঘরে এই রকম করে কাজ করলে তবে একটু সাশ্রয় হয়—বুঝলে?" ভজহরি নির্দেশ দেয়—এঁটো পাতের নুন যেন তুলে রাখে।

নুন নাকি কখনো এঁটো হয় না। এতেও অনেক খরচ বাঁচে। ভজহরির ধারণা চাকর রামধন তার পয়সা মেরে দিয়েই বড়োলোক হয়ে গেলো। তাই রামধনকে আট পয়সা দিয়ে সে নানারকম মিষ্টি কিন্‌তে বলে—যতোরকম যা আছে। রামধন ভাবে আটপয়সায় দু তিনটে জিবেগজা ছাড়া আর কিছু জুটবে না, তবু একপয়সা তার থেকে না মেরে উপায় নেই। ছয় মাসের মাইনে বাকী রামধনের। তাও মাসে মাইনে মাত্র আড়াই টাকা !

কুঞ্জ থিয়েটারের বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করে। নিজের মান রাখবার জন্যে একদিন সে তাদের নিজের বাড়ীতে এনে খাওয়াতে চায়। ভজহরিকে একথা সে বল্‌লে সে বল্‌লো, "খ্যাট আবার কি? তারা বাড়ীতে খেতে পায় না নাকি।" অনেক কষ্টে বুঝিয়ে ভজহরিকে রাজী করালে, ভজহরি বাক্স থেকে মাত্র দুটাকা বের করে দেয়। সে-টাকা না নিয়ে রাগ দেখিয়ে কুঞ্জ চলে যায়।

ভজহরি ভাবে, রামধন যেমন চোর,—ভজহরি একটা বিয়ে না করলে রামধনের চুরির মাত্রা বেড়েই যাবে। "লোকে একটু হাস্‌বে, এই বৈ তো নয়—তাতে আর কি—আমার টাকা তো বাঁচবে—আর আমার বয়সও এমনই কি হয়েছে হদ্দ ৭০ বৈ তো নয়—লোকে যে ৯০ বৎসরেও বিয়ে করে—তা পুরুষমানুষের এতে লজ্জা কি!" রামধনকে ভজহরি বলে, "দেখ রাম, সংসারে তুমি বই আমার কেউ দেখবার লোক নেই—তাই তোমার জন্য আমায় বড়ই কষ্ট পেতে হয়—কিন্তু তোমার কষ্ট লাঘব হয়, তার, উপায় আমি একটা ঠাওরেছি।" নিজের ইচ্ছেটা ভজহরি রামধনকে অকপটে জানায়। বলে,—"দেখ বাপুরাম, আমি রং টং চাইনে, রূপটুপ, চাইনে, দু চারটে পাকা চুল তুল্‌তে পারবে—আর খুব হাত কষা হবে—নিক্তির ওজনে খরচপত্র করবে, বুঝেছ? আমি এই শুধু চাই।"

কুঞ্জবিহারী চিন্তিত। বুড়োর কাছ থেকে কি করে টাকা হাতানো যায়। রামধনের কাছ থেকে সে বুড়োর বিয়ে করবার সখের কথা শুনেছিলো। হঠাৎ তার মনে হয় থিয়েটারের বন্ধুদের কনে, কনেকর্তা, ঘটক ইত্যাদি সাজিয়ে বুড়োকে ভোগা দিতে হবে। থিয়েটারের বন্ধুরা আসে কুঞ্জের বৈঠক-খানায়। প্রহ্লাদ চরিত্রের হাতী সাজবার রিহার্সাল হবে। একজন পেছনের পা, একজন সামনের পা, আর একজন হাত দুটো উঠিয়ে রাখ্‌বে। দলপতি বলে,—"মোদ্দা কথা, কুঞ্জবাবু, প্রহ্লাদ চরিত্রের নাটকে এমন হাতী কলকাতার

সহরে কোন থিয়েটারের স্টেজে আনতে পারবে না—তা বেঙ্গল থিয়েটারই কি, আর ষ্টার থিয়েটারই কি—লোকে যদি জলজ্যান্তো আসল হাতী না ঠাওরায় তো আমার নাম নেই—এই এক কথা আমি বলে দিলুম।" যাহোক কুঞ্জ এ-সময় তার ফন্দির কথা প্রকাশ করে। বুড়োকে জব্দ করবার জন্যে বিয়ের একটা অভিনয় করে বুড়োর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে। শুভদিন দেখে তারা কেউ কনে, কেউ ঘটক, কেউ কনেকর্তা ইত্যাদি সাজে। চতুর্থ পক্ষের বিয়ে—বরের বাড়ীতেই হবে। রামধনকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে তারা ভজহরির বাড়ীতে যায়। কনে ঘোমটা দিয়ে থাকে। ঘটক বলে,—"কনেটি বড়ই সুশীলা ও সুলক্ষণা আর এমন লজ্জাশীলা যে কি বলব—বাপেরবাড়ীতেও দেখেছি, রাত দিন ঘোমটা দিয়ে থাকে—কারও পানে মাথা তুলে চায় না।" কনেকর্তা বলে, "অত কথায় কাজ কি, আমি ওর যে বাপ, আমার কাছেই মুখ দেখায় না, তো অন্য পরে কা কথা। লোকে বলে ভারি সুন্দরী, এই পর্য্যন্ত আমি কানে শুনেছি।" ভজহরি বলে,—"সুন্দরী টুন্দরী কোন কাজের কথা না—আসল কথা হচ্ছে লজ্জা। লজ্জাই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার। সে তো ভালই। মুখ নাই দেখ্লুম।" ঘটক বলে, দোষের মধ্যে মেয়েটির হাত একটু কষা। ভজহরি উল্লসিত হয়,—এই তো যোগ্য মেয়ে! কনে বাপের কানে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে, বাপ ভজহরিকে বলে, কনে বল্‌ছে, ভজহরির প্রদীপে দুটো সল্‌তে পুড়ছে—তার দরকারটা কি—একটা সল্‌তেতেই তো যথেষ্ট আলো হয়। ভজহরি স্বীকার করে, "কন্যাটি অমূল্য রত্ন।"

কুঞ্জ রসুনচৌকির বন্দোবস্ত করতে গেলে খরচার ভয়ে ভজহরি আপত্তি করে। শেষে কুঞ্জ বলে থিয়েটারের লোকরা এমনিই বাজিয়ে দেবে, তখন সম্মত হয়। রামধন পিদিম কিন্‌তে চাইলে ভজহরি বছর দুয়েক আগেকার পিদিমগুলোর থেকে ঝুল ঝেড়ে অল্প কয়েকটি নিতে বলে। বেশি নিলে তেল পুড়বে। এগুলো এককালে দেওয়ালীর জন্যে আনা হয়েছিলো। কুঞ্জ টোপরের কথা বললে ভজহরি বলে,—"একটা টোপর ধারধোর করে আন্‌লে চল্‌ত না কি, ভায়া? মিছি মিছি পয়সা নষ্ট করা কেন? আর কতক্ষণেরই বা মামলা!" কুঞ্জ বলে, থিয়েটারের বন্ধুরা ফুলের টোপর—ইংরাজীতে বলে Fool's Cap—তাই বানিয়ে দেবে বিনে পয়সায়। ভজহরি আশ্বস্ত হয়।

বাসর ঘরে "ফুল্‌স্ ক্যাপ" পরে ভজহরি—সঙ্গে ঘোমটা দেওয়া কনে। থিয়েটারওয়ালারাই শালী সেজে আসে। ভজহরি মশা বলে অন্যমনস্কভাবে

নিজের পিঠে চাপড় মারলে। শালীরা বলে,—"এই আমরা মশা মারচি আমরা থাকতে তোমাকে মশা খাবে?" ভজহরির পিঠের ওপর চড় চাপড়ের বৃষ্টি পড়তে থাকে। মারের হাত এড়াবার জন্যে শালীদের ভজহরি গান গাইতে বলে। তারা বাসরের উপযুক্ত গান গাইলে, ভজহরি বলে—এ গানে সে রস পাচ্ছে না। তখন শালীরা চাল ডাল আলু পটলের বাজারদর নিয়ে একটা গান গায়।—

"বল বল প্রিয়ে বল আলুর আজ ভাও কি ?
কত হল সের আজি পটলের বল দেখি।"

গান শুনে ভজহরি খুশিতে ডগমগ। "এতক্ষণে গানে একটু রস পাওয়া গেল! বাঃ! বাঃ!" বাসরঘরে কনের সঙ্গে বাজারের আজকালকার দরদাম নিয়ে আলোচনা করে মধুযামিনী কাটায়। কথাপ্রসঙ্গে কনে বলে, ভজহরি যেন পুরোনো গামছা না ফেলে দেয়, ওগুলো যুড়ে ধুতি হয়। শেষে ভজহরির ঘুম পায়। ততোক্ষণে শালীরা চলে গেছে। কনে ভজহরির গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। ভজহরি ঘুমোবার আগে টাকার বাক্সের চাবিটার দিকে কনেকে নজর রাখ্‌তে বলে। কিছুক্ষণ হাত বোলাতেই ভজহরি ঘুমিয়ে পড়ে। কনে তখন বাক্স খুলে টাকাগুলো নিয়ে চম্পট দিয়ে বন্ধুদের আড্ডায় চলে আসে।

আজ সকলেই খুব খুশি। রামধন ভাবে—ছমাসের মাইনে এভাবে আদায় হলো, মন্দ নয়। বাবুদের সে অম্বুরী তামাক খাওয়ায়। কুঞ্জ বন্ধুদের নিয়ে হোটেলের দিকে চলে,—"খাইগে কসে কেক রুটি কারি কাটলেট অয়স্‌টার প্যাটি" বলে। সবাই হাস্‌তে হাস্‌তে পথ চলে। আর ওদিকে বুড়ো ভজহরি কপাল চাপড়ায়।

বিষয়সর্বস্বতাতে বিভিন্ন দিক থেকে কটাক্ষ করা হয়েছে। দাম্পত্য ক্ষেত্রে ব্যয়কুণ্ঠা, পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যয়কুণ্ঠা, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়কুণ্ঠা—সবকিছুর মূলে চারিত্রিক দিকটিই মুখ্য, তবে বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনাও আনুষঙ্গিক। সমাজচিত্রের মূল্য নিরূপণ সেই দিক থেকেই করা উচিত।

(গ) বিষয়বুদ্ধিহীনতা ॥—

বিষয়সর্বস্বতার মতোই বিষয়বুদ্ধিহীনতা সমাজে প্রশংসিত নয়। বিদ্যাজীবীদের বিষয়বুদ্ধিহীনতাকে কটাক্ষ করবার মূলে কিছুটা সাংস্কৃতিক

কারণ থাকা সম্ভবপর। বুদ্ধিজীবীদেরও বিষয়বুদ্ধিহীনতা তথা যান্ত্রিকতা একই দৃষ্টিকোণ বহন করে। কিন্তু কয়েকটি প্রহসনকে আয়ব্যয়নীতি ও অবস্থার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করা অসঙ্গত হয় না। এ ধরনের একটি প্রহসনের পরিচয় দেওয়া হলো।

নাকে খৎ (১৮৮৫ খৃঃ)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ প্রহসনটি বুঝতে হলে একটি সাময়িক ঘটনাও জানা দরকার। বিপিনবিহারী গুপ্ত "পুরাতন প্রসঙ্গ" গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের আত্মস্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে একস্থানে কৃষ্ণকমলের স্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে—যা প্রহসনটি সম্পর্কে আলোকপাত করে। কৃষ্ণকমল বলেছেন,[৫] "হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচশত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেমবাবুর নিকটে যায়। হেমবাবু ঐ ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। এই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে একটু টীকা বোধহয় আবশ্যক।

"কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি—ওরফে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি	—আমি (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
ধনুর্দ্ধর ওরফে 'গুণেন্দর'	—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
অগ্নিভট্ট ওরফে 'ধূমখালি'	—উমাকালী
চাঁদ কবি	—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
রত্নসভা	—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।"

প্রহসনে চরিত্র বর্ণনায় কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি সম্পর্কে প্রহসনকার লিখেছেন— "বন্ধুসমাজে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি নামে পরিচিত। একজন নানা শাস্ত্র বিশারদ্ বহু ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি প্রায় নাই। সম্প্রতি রত্নসভা ইহাকে অনেক টাকার বৃত্তি দিয়া অধ্যাপকত্বে বরণ করিয়াছেন।" 'রত্নসভা' সম্পর্কে প্রহসনকার ফুটনোটে লিখেছেন,—"রত্নসভা নানা জাতীয় পণ্ডিতের একটী বৃহৎ সভা; কোন ধনশালী রাজা প্রতি বৎসর এক একজন অধ্যাপককে

৫। পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত—পৃঃ ২৪১।

মনোনীত পূর্ব্বক অনেক টাকা বৃত্তি দিবার ভার এই সভার প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।”

কাহিনী।—‘কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি’ একজন নানা শাস্ত্রবিশারদ বহু ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি প্রায় কিছুই নেই। কিছুদিন আগে রত্নসভা তাঁকে অনেক টাকার বৃত্তি দিয়ে অধ্যাপক করেছে। প্রচুর টাকার নোট তাঁর টেবিলের সামনে ইতস্ততঃ ছড়ানো। তিনি ভাবেন, নামের পিঠে ছাপ্পা নিয়ে অনেক পণ্ডিত রত্নসভার দোহাই দিয়ে পেটের জ্বালা জুড়োচ্ছেন। তিনশো টাকা তিনি সাংসারিক খরচের জন্য রাখলেন। চারশো টাকা অম্বরবাবুর দেনা শোধবার জন্যে আলাদা করে রাখ্‌লেন। পাঁচশো টাকা বড়ো গিন্নিকে দেবেন বলে রাখেন, অনেকদিন ধরে কথা দিয়ে রেখেছেন। হঠাৎ কষ্টকল্পের মনে পড়ে, লাইসেন্সের পঞ্চাশ টাকা এখনো দেওয়া হয় নি। হাইকোর্টের উকীলদের প্রত্যেক বছরে পঞ্চাশ টাকা করে জমা দিতে হয়। ভুল করে কষ্টকল্প পঞ্চাশ টাকার জায়গায় পাঁচশত টাকা তুলে রাখেন লাইসেন্সের জন্যে। বড়ো গিন্নি অর্থাৎ রাঙাবৌ এলে মাকে দেবার জন্যে সাংসা[illegible]তিনশত টাকা তার হাতে দিলেন। আর গিন্নিকে গয়নাগড়াবার জন্যে পাঁচশত টাকার জায়গায় ভুল করে পঞ্চাশ টাকা দিলেন। গিন্নি নোট কাকে বলে জানে না। “ছেঁড়া কাগজ এক টুক্‌রোর মূল্য যখন কষ্টকল্প বুঝিয়ে দিলেন, তখন গিন্নি সেটা সিন্দুকে তুলে রাখ্‌লো। কষ্টকল্প বল্‌লেন, ওটা দিয়েই দশনলী আর একছড়া গোট করা যাবে।

বাপ্পা পাঁড়েকে দিয়ে কষ্টকল্প পঞ্চাশ টাকা বলে পাঁচশত টাকার নোট একটা খামে ভরে ছাত্র এবং উকীল অগ্নিভট্ট বা ধূমখালির কাছে পাঠালেন। সঙ্গে একটা চিঠিও দিয়ে দিলেন। পঞ্চাশ টাকার জায়গায় পাঁচশত টাকা দেখে অধ্যাপকের বিষয়-বুদ্ধির অবস্থা মনে করে তিনি মনে মনে কৌতুক অনুভব করেন। একটু রেগেও যান তিনি। এই বিষয়-বুদ্ধি নিয়ে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করেন, রত্নসভায় অধ্যাপনা করেন! ধনুর্দ্ধর বা গুনেন্দ্র একথা শুনে বলেন, ওঁকে না জানিয়ে টাকাটা বরং তাঁর বাড়ীতে দিয়ে আসা ভালো।

ধনুর্দ্ধর আর অগ্নিভট্ট দুজনে মিলে বিদ্যেনিধির বাড়ী যান। বাড়ীর সকলে বাইরে গিয়েছিলো। বাড়ীতে ছিলো শুধু বিদ্যেনিধির বড় গিন্নি বা রাঙাবৌ, আর ঝি মোক্ষদা। অগ্নিভট্ট ভাবেন, তাঁর লজ্জা কি? রাঙাবৌ তো গুরুপত্নী। তিনি ভেতরে ঢুকতে চান, পান খেতে চান। মোক্ষদা তীব্র দৃষ্টি

হানে তাঁর দিকে। কলকাতা শহর জায়গাটা বড়ো ভালো নয়। দারোয়ানটাও এখন নেই। কিন্তু রাঙাবৌ অগ্নিভট্টকে ডেকে এনে ঘরে বসায়। ধনুর্ধর তাকে সব কথা খুলে বলে পাঁচশত টাকার থেকে পঞ্চাশ টাকা কেটে রেখে চারশত পঞ্চাশ টাকা তার কাছে রেখে দিতে বলেন। অবশ্য রাঙাবৌ বাইরে আসে নি। মোক্ষদার মাধ্যমেই কথাবার্তা চলে। রাঙাবৌ সিন্দুক থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে ধনুর্ধরকে দিয়ে বলে, এই পাঁচশত টাকা দিয়ে গেছেন। অগ্নিভট্ট আর ধনুর্ধর দুজনেই বুঝতে পারে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে হযে গেছে। ধনুর্ধর শিখিযে দেয—চারশো পঞ্চাশ টাকা+পঞ্চাশ টাকা=মোট পাঁচশো টাকা সে তুলে রাখুক। রাঙাবৌ যেন কষ্টকল্পকে চারশো পঞ্চাশ-টাকার কথা না জানিযে শুধু পঞ্চাশ টাকা দেখিয়ে যেন আরও চারশো পঞ্চাশ টাকা আদায করে তাকে নিযে একটু মজা করে। অবশ্য পরশু বিকেলবেলা এঁরা আবার আসবেন।

ছোটোবৌ খবর [illegible] বড়ো গিন্নিকে বিদ্যেনিধি পাঁচশো টাকা দিযেছেন। চটে [illegible] বিদ্যেনিধিকে অনুযোগ করেন—তার পাবার কিছুই কি অধিকার [illegible]—শুধু ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো। বিদ্যেনিধি বলে, আজ তার পকেট একেবারে খালি। ছোটোবৌ সেযানা। সে বিদ্যেনিধিকে নিযে "প্রমিসরি নোট" লিখিযে নেয।

"I. O. U.—আই প্রমিস্—সাত শো টাকা সাড়ে,
অন্‌ ডিমাণ্ডে দেবো আমি সুদে যত বাড়ে ,
মাসে মাসে টাকা টাকা সুদ দিতে স্বীকার ,
না যদি দি—সতীন বৌ-এর শ্রীপদ-প্রহার।"

খৎ লিখিয়ে নিযে ছোটোবৌ কষ্টকল্প বিদ্যেনিধিকে মুক্তি দেয়।

যথারীতি দু-একদিন পরে অগ্নিশর্মা আর ধনুর্ধর বিদ্যেনিধি বাড়ীতে আসেন। দেখেন বিদ্যেনিধি মুখ ব্যাজার করে আছেন। ধনুর্ধর এর কারণ জিজ্ঞেস্ করলে বিদ্যেনিধি সে কথা বলতে লজ্জা পান। ইতিমধ্যে তাঁর মেয়ে ডাক্‌তে এলো। তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন। শেষে বাড়ীর ভেতর চলে যান। অগ্নিশর্মা আর ধনুর্ধর শুনতে পান বাড়ীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া। "এই নেও সে জালী কাগজ" বলে পঞ্চাশ টাকার নোট রাঙাবৌ বিদ্যেনিধির সামনে ছুঁড়ে ফেলে বলে,—"জুয়াচুরি এমত তরো কদ্দিন শিখেছ?" 'বিদ্যেনিধি' উপাধি এবং 'রত্নসভা'কে রাঙাবৌ ধিক্কার দেয়। বিদ্যেনিধি অসহায় হয়ে ভাবেন, তবে

কাকে ভুল করে পাঁচশো টাকা দিলেন? শেষে অগ্নিশর্মাকে তিনি বলেন,—"শর্ম্মা ভায়া, হ্যাঁ হে তোমার চিঠির ভেতর মোড়া নোটখানা সে কত টাকার?" অগ্নিশর্মা অবাক হবার ভান করে বলেন, তিনি তো ঠিকই দিয়েছেন। শেষে বিদ্যেনিধি বলেন, কাকে কি দিয়েছেন, কিছু মনে পড়ছে না। তিনি কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছেন না। তিনি বলে ওঠেন—"নাকে দিনু খৎ—এ ঝকমারি আর করবো না—দেখবো অন্য পথ।" বিদ্যেনিধির অবস্থা দেখে ধনুর্ধর একটু নরম হন। তিনি বলেন,—বিদ্যেনিধি আগে রাঙাবৌয়ের চরণতলে নাকে খৎ দিন. তাহলে তিনি হিসেব মিলিয়ে দেবেন। সেই সঙ্গে যেন ভালো ফলারের আয়োজন থাকে। চাঁদকবি আর ইয়ার বক্স কথকতার ভার নেবে। বাধ্য হয়ে স্বীকৃত হয়ে বিদ্যেনিধি বলে ওঠেন,—

> "এক জায়গায় দাসের খৎ—এক জায়গায় নাকে
> অধ্যেপকি কনু ভালো—চরকার পাকে পাকে ॥"

(ঘ) বৃত্তি ও আয়ব্যয় অবস্থা।—

(ঘক) পঠনপাঠন ও অর্থনীতি ॥--

শিক্ষকতা-বৃত্তিকে কেন্দ্র করে রচিত কতকগুলো প্রহসনের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। কিন্তু দৃষ্টিকোণের বিচারে এগুলোকে বৃত্তি ও আয়নীতির মধ্যে ফেলা যায় না। কারণ এগুলো নীতিঘটিত নয়, বরং এগুলোকে অবস্থাঘটিত বলা সঙ্গত। অবশ্য এই সব অবস্থার বর্ণনায় প্রতিগ্রহমূলক আয়নীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন যে ঘটেনি তা বলা যায় না। কেরানী ইত্যাদি বৃত্তির প্রতিগ্রহমূলক আয়নীতির বিরুদ্ধে যে সাংস্কৃতিক ও আর্থিক দৃষ্টিকোণ সক্রিয়, তার সাক্ষাৎকার যে এসবক্ষেত্রে দুর্লভ তা নয়। কিন্তু শিক্ষা ও অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তা এবং কর্ম সম্পর্কে প্রহসনকারের সচেতনতা বেশি থাকায় প্রহসনকারের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কেরানী ইত্যাদির মতো শিক্ষকসমাজ নন।

শিক্ষাখাতে আমাদের ব্যয় স্বল্পতা শিক্ষকদের আর্থিক মর্যাদা নষ্ট করেছে। "হক কথা" নামে একটি পুস্তিকায় "প্রথম কোপে" বলা হয়েছে[৬] "জীবন

৬। হক কথা—কলিকাতা ১২৮০, হালিসহর পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সঙ্কলন।

উপায়ের জন্ত যত বৃত্তি অবলম্বন কোরেছে, মাষ্টারী কায (উঁচু দরের কলেজী মাষ্টার নবাব সরকারের চাকর-মহাশয়রা ছাড়) সব অপেক্ষা ওঁছা। হাড়ভাঙ্গা খাট্‌নী, চোকে মুখে রক্ত উঠে যায়, শেষে যক্ষ্মা এসে ধরে, আর ডি. জোন্সের আশ্রয় লয়ে চিরকালটা আধমরা গোছ হয়ে থাকতে হয়। সর্ব্বত্র ছেলের মুখের উপর দোষ, গুণ, যশ, অযশ, নিভর করে।...মান সর্ব্বত্র সমান, ভাল বল্‌বে তুমি গালি দিয়ে।”

এডেড স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা আরো মর্মান্তিক। পাড়াগাঁয়ের এডেড স্কুলের স্থাপন হয় সাহেবদের কাছে নাম কেনবার জন্যে, এমন অভিযোগ আছে হরিমোহন ভট্টাচার্যের “দেশের গতিক” প্রহসনে (১৮৭৪ খৃঃ) সেকেণ্ড মাষ্টারের মুখে। সেকেণ্ড মাষ্টার আরও বলেছেন,—“আমি জানি পাড়াগেঁয়ে এডেড্ স্কুল মাত্রেই এইরূপ হয়ে থাকে। এদিকে দেখুন, আমরা মাসকাবার যে টাকার রসিদ দেই, তা অপেক্ষা প্রত্যেকেই ২০, ১০, ৫ টাকা কম পাই, তাও আবার মাস মাস পাব না? এমন চাকরি কি ভদ্র লোকে করে?” পূর্বে উল্লিখিত “হক কথা” পুস্তিকায় এডেড স্কুল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে,—বিশেষ এডেড স্কুলের মাষ্টারী করার মত এমন ঝক্‌মারির কায আর দুটা নাই।...এতে দশজন মনিব যিনি দু আনা চাঁদা দেন, তিনিও একজন সর্দ্দার। সকলের মন জুগিয়ে না চল্‌তে পারলেই প্রমাদ।” এডেড স্কুল সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যাবে—পরে উপস্থাপিত হরিশ্চন্দ্র মিত্রের লেখা “হতভাগ্য শিক্ষক” (১৮৭২ খৃঃ) প্রহসনের মধ্যে।

অনেকে শিক্ষকদের অর্থনীতির দিককে মূল্য না দিয়ে সংস্কৃতির দিকটি তুলে ধরে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোনো বৃত্তিতেই এভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর “শিক্ষা বিষযক প্রস্তাব” গ্রন্থে[৭] লেখেন,—“যদি অর্থপ্রযাসে আসিয়া থাক, তবে শীঘ্র এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অনুসন্ধান কর। যেহেতু শিক্ষকের কর্ম্মে যথা কথঞ্চিৎ রূপেও ধনাশা পরিপূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন দেখিবে, যে তোমাদিগের অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি, অল্পবিদ্যা, অল্পপরিশ্রমী এবং অল্প বয়স্ক লোকে অন্যান্য রাজকার্য্যে বা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইয়া তোমাদিগের অপেক্ষা ধনশালী এবং জনসমাজে অধিক মাননীয় হইতেছে, তখন তোমাদিগের মনোবেদনার

৭। শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব—১৭৭৮ শকাব্দ, কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভাযন্ত্রে মুদ্রিত। পৃঃ ৭-৮।

পরিসীমা থাকিবে না।" কিন্তু এই অবাস্তব দৃষ্টিকোণের প্রচার সমাজে বাস্তব দৃষ্টিকোণের পরিপুষ্টিকে রোধ করতে পারে নি।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দ্বন্দ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিভিন্ন অনুকূল বৃত্তির কথা টেনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ যে যে বিশেষ বৃত্তিগ্রহণের ওপরে ভিত্তি করে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে গ্রামীণ সংস্কৃতি নির্ভর আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত সক্রিয় ছিলো। কিন্তু শিক্ষাখাতে ব্যয়স্বল্পতার কথা অনেক প্রহসনকারই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করবার কথা ভোলেন নি। শিক্ষক পোষণ অর্থ অপব্যয়েরই নামান্তর মনে করা হয় অনেকক্ষেত্রে। তাই গৃহশিক্ষকের বেতনও দেওয়া হয় পাঠনকার্য ছাড়াও অতিরিক্ত বৌদ্ধিক বা কায়িক কাজের বিনিময়ে। দুর্গাদাস দে-র লেখা "Encore 99 !" (১৮৯৯ খৃঃ) প্রহসনের মধ্যে একজন কৃপণের ব্যবহারকে এ সম্পর্কে চিত্রিত করা হলেও এই কার্পণ্য স্বাভাবিক ব্যয়ীর পক্ষে অসত্য বললে অন্যায় বলা হয়। চিত্রটি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা হলো।

শ্রীমতীর বাবা পেত্নীবল্লভ কৃপণ। তার সঙ্গে তার পুত্র বাঁদুরেগোপালের পয়সা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে। এমন সময়ে বাঁদুরেগোপালের টিউটর 'মাম্‌দো মাষ্টার' এসে উপস্থিত হয়। পেত্নীবল্লভ বলে,—"মাষ্টার, মাষ্টার, কাল যে যাবার সময় গরুর জাব্ দিয়ে যাও নি। তামাক ক' কল্কে সেজে যাও নি, জান তোমার প্রতি আমার রোজ দু-পয়সার ওপর পড়ে।" বলে,—"কাল থেকে আর তোমায় আসতে হবে না। আমাদের পরামানিকের ছেলে এবারে পাশ হয়েছে। সে দেড় পয়সা করে নিতে চেয়েছে। তাকে দিয়ে তোমার চেয়ে ঢের কাজ পাব। খেউরি করা, জল তোলা, তামাক সাজা, তামাক দেওয়া, গরুর জাব দেওয়া। আর ছেলেটাকে পড়িয়ে দুটো মাথা কামিয়ে যেতে পারে, তাতেও তো দু-পয়সা পাবে।" মাষ্টার মাইনে চুকিয়ে নিতে চায়। তখন পেত্নীবল্লভ বলে,—"মাষ্টার কীই বা করেছে, তার কৃতিত্ব কিছু নেই। বাঙ্গালির ছেলেকে পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শেখাতে হয় না। আপনি শেখে।" মাষ্টার ধৈর্য হারিয়ে মন্তব্য করে,—"ব্যাটা মাইজার।" তখন পেত্নীবল্লভ বলে ওঠে,—"চাকর আর কুকুর সমান। দে বেটা, পুজার সময় যে উত্তম কা-কা-কাক মার্কা থানের আট হাত প্রমাণ কোরা ধুতী দিয়েছি —ফিরিয়ে দে।" মাষ্টার তাকে—"মেটেবুরুজের নবাবের খানসামার ব্রাদার ইন্ ল-এর নানা পো" বলে ব্যঙ্গ করে। যাবার সময় মাষ্টার ভাবে,—"চাকরে৷

কুকুরে সমান—একথা ঠিক কথা। মরবার সময় ছেলে বেটাকে বলে যাবো যে, বাবা যদি খেতে না পাও রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে খাও, সেও ভাল, তবু বাঙ্গালীর বাড়ী চাকরী করো না।”

বস্তুতঃ শিক্ষকতা-বৃত্তির সর্বক্ষেত্রে আর্থনীতিক দুরবস্থার চিত্র অত্যন্ত বাস্তব। এই দুরবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষকতা বৃত্তি-কেন্দ্রিক কয়েকটি প্রহসনকে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

হতভাগ্য শিক্ষক (ঢাকা—১৮৭২ খৃঃ)—হরিশ্চন্দ্র মিত্র॥ শিক্ষকের বিশেষণ থেকেই নামকরণে প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ এবং বলিষ্ঠ। এই দুরবস্থার সমাধানের ইঙ্গিত প্রহসনকার একটি কবিতায় রেখে গেছেন। পাখীদের উদ্দেশ করে শিক্ষকের উক্তি—

উড়িয়া যাইয়া ইংলণ্ড, যথা।
রাজ্ঞী পাশে কহ মোদের কথা॥
স্বচক্ষে সতত যা দেখ ভাই।
তাই বল আর কিছু না চাই॥

কাহিনী।—আতাইগঞ্জ একটি পল্লীগ্রাম। প্রবোধ এই গ্রামের এক এডেড স্কুলের শিক্ষক। আক্ষেপ করে প্রবোধ বলে, সবাই জানে এডেড স্কুলের শিক্ষক পনেরো টাকা মাইনে পায়। “এদিকে যে নাম গোয়ালা, কাঁজি ভক্ষণ, তার খোঁজ কে রাখে?” প্রবোধের বাল্যবন্ধু কার্যগতিকে এই গ্রামে বেড়াতে আসে। প্রবোধের নাম শুনে দেখা করতে আসে। সে জমিদারীতে তহশীলদারের কাজ করে। তার মতে অতি জঘন্য কাজ। প্রবোধের কাজের প্রশংসা করে বলে,—“পণ্ডিতীর মত আর কি সুখের চাকরী আছে? দাঙ্গা নাই, হাঙ্গামা নাই, মোকদ্দমা নাই, অহরহ কেবল বিদ্যাচর্চ্চায়, জ্ঞান-চর্চ্চায় আছেন, মাস ২ সরকার হোতে ১৫্ টাকা কোরে বেতন পাচ্চেন। ... ...বড় ২ বিজ্ঞলোকেরা শিক্ষকতা কর্ম্মের প্রশংসা করে গিয়াছেন।” প্রবোধ মন্তব্য করে,—“আমাদের কর্ম্ম মুজরী হতেও ঘৃণিত।” প্রবোধের চাকরী সম্পর্কে দয়ালের ধারণা,—স্থানীয় লোকের চাঁদা, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য আর ছাত্রবেতনে মিলিয়ে অনেকই টাকা এতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রবোধ তাকে জানায়, বড়ো বড়ো লোকরা এলো; বড়ো বড়ো বক্তৃতা হলো। মাসিক চল্লিশ টাকা দাতব্য

স্বাক্ষরিত হলো। ধন্যবাদ দেওয়া হলো দাতাদের। কিন্তু আসলে শেষে টানাটানি দেওয়ার সময় কেউ নেই। প্রথমবার পঞ্চাশ টাকা কিছু হলো। কিন্তু পরে আর ওঠে না। দয়াল জিজ্ঞেস করে,—"আপনি না নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন?" প্রবোধ জবাব দেয়,—"মহাশয় এখনকার দিনে সার্টিফিকিট হোতে উপরোধের জোর জেযাদা।" দু মাস পর গভর্ণমেণ্ট অবশ্য পচিশ টাকা মঞ্জুর করেছেন। "মশায়, স্বাক্ষরের বেলায় অনেকেরে পাওয়া যায়, কিন্তু 'ম্যাও ধরবার' সময় অনেকে পেছু হটেন, যাঁরা এই ২৫ টাকার চান্দায় বইলেন, তাঁদেব মহিমা শুনুন ত গভর্ণমেণ্টের নিয়ম এই স্থানীয় দাতব্য সমুদায় আদায় করে বিল পাঠালে পর সাহায্যের টাকা মঞ্জুর হয়ে বিল আসে। ৩৪ মাসেও এক মাসেব চান্দা আদায় হয় না, আমাকে উপরের মাস্টার বল্লেন, তাঁকে নাকি ডেপুটীবাবু বলে দিয়েছেন, চান্দা আদায় না হলেও হয়েছে এরূপ স্বীকার করে বিল লেখে পাঠাতে হবে। নতুবা গবর্ণমেণ্টের টাকা পাওয়া যাবে না।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবোধ পেটের দায়েই এই কাজে নেমেছে। এখন শুধু ছাত্রেব বেতন আর গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে—এতেই জীবনধারণ চলে। ছাত্র বেতন মোট দশ টাকা। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পেয়ে হয় পাঁচশ টাকা+দশ টাকা=পঁয়ত্রিশ টাকা। মাষ্টারের বেতন পঁচিশ টাকা গেলে বাকী দশ টাকা থাকে—যা প্রবোধের পাওয়া উচিত। কিন্তু তা আর হয় না। চার পাচ টাকা স্কুলে বাজে খরচ লেগেই আছে। আর এদিকে বাসাভাড়া আর রান্নার লোক রেখে ভদ্রলোকের পোষায়? দয়াল বলে,—"কেন, না হয় মাষ্টারবাবুকে কুড়ি টাকা দিন, আপনি পনেরো টাকা নিন।" প্রবোধ জবাব দেয়,—"তাব যো কি? আমি হচ্চি নীচের শিক্ষক, মাষ্টারবাবুর হাতেই সব।" তিনি চাঁদা আদায় করে নাকি বেতন নিতে বলেন। পেটের জ্বালাতে প্রবোধ মাঝে মাঝে চাঁদা আদায়ে বার হয়ে থাকে। "কিন্তু যেয়েও সুসার নাই। যাঁরা বাইরে মস্ত ২ বিদ্যোৎসাহী, চান্দার বইয়ে যাঁদের কাছে ৪০/৫০ টাকা চান্দা বাকী রয়েছে, তাঁদের কাছে ১০/১৫ দিন উমেদারী করে ২ টাকা আদায় করা ভার হয়।" বড়ো বড়ো লোক প্রচুর বাকী। এক মোহনলাল বসু সেরেস্তাদার দুই টাকা মাসিক+অগ্রিম চব্বিশ টাকা দিয়েছেন। এতেই মাষ্টারের গত পুজোয় বাড়ী যাওয়া হয়। বছরে তো ঐ একবারই পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাও কুড়ি টাকা পাওনাদারদের মিটিয়ে দশ টাকা নিয়ে বাড়ী যেতে হয়েছে।

একথা শুনে দয়াল মন্তব্য করে,—"কি দুঃখ! পূজার সময় আমাদের চাকর বেহারারাও ২০/২৫৲ টাকা নিয়ে বাড়ী যায়।" এতো কষ্টের কথা একদিন প্রবোধ ডেপুটীর কাছে গিয়ে বলে। সদরে যেতে তার দুই তিন টাকা খরচ হয়। ডেপুটী চাঁদা দাতাদের কাছে এক একটি চিঠি দেয়। কিন্তু চিঠি নিয়ে এসেও ফল হয় না। কেউ দুই টাকা চার টাকা দিলেন, কেউ বলেন দিচ্ছি, কেউ বলেন, তাঁর ছেলে তো এখন স্কুলে পড়ে না, কেউ বা আবার চটেই ওঠেন। তাঁদের নামে ডেপুটিকে বলা হয়েছে, এতেই তাঁদের রাগ। বাড়ীতে প্রবোধের যা কিছু ছিলো, ভেঙে ভেঙে খেয়েই প্রবোধ তা শেষ করেছে। অবশেষে দয়াল স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে সেই নিজে সুখে আছে। প্রবোধ তাকে বলে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে আট টাকা বেতনের একটা চাকরী খালি ছিলো। ডেপুটীকে এ জন্যে ধরতেই তিনি বলেছেন,—"তুমি ১৫৲ টাকার পণ্ডিতীতে আছ, তোমার ৮ টাকার মোহরেরীতে প্রয়োজন কি?" প্রবোধ নায়েবীর জন্যেও চেষ্টা করেছিলো। মাধববাবু বলেছিলেন,—"তুমি পণ্ডিত, শুদ্ধ শান্ত ধাম্মিক মানুষ, নায়েবীতে দাঙ্গাহাঙ্গাম কত কিছু চাই, তোমা দিয়া যে কাজ চলা কঠিন, বিশেষ তুমি স্কুলে ১৫৲ টাকা বেতন পাচ্চো, নায়েবীর বেতন হচ্চে ৮৲ টাকা, ১৫৲ টাকা ছেড়ে ৮৲ টাকায় যাবে কেন?" প্রবোধ দুঃখ করে বলে,—সে এতো খাটে, তাও ডেপুটী এক সার্কুলার দিয়েছেন যে, শপথ করে বিলে লিখে দিতে হবে—"প্রতিদিন ১০টা হতে ৫টা পর্য্যন্ত নিয়মিত মত স্কুলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেছি। তবে বিল মঞ্জুর।" একথা শুনে দয়াল মন্তব্য করে,—সে যে অশিক্ষিত জমিদারের অধীনে কাজ করে, তবু কথায় কথায় ফিরে কাটে না। দয়াল কথা দেয়, প্রবোধের জন্যে সে অন্যত্র চেষ্টা করবে। দয়াল চলে গেলে প্রবোধ দুঃখের সঙ্গে ভাবে যে, দয়াল তার ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু ছিলো, এতোদিন পর দেখা হলো, অথচ তাকে সে খাওয়াতেও পারলো না।

প্রবোধ 'কাস্তে'-কে দিয়ে পাড়া থেকে বেগুন চেয়ে আনে। কাস্তে বলে,—"ঘোষেদের বাড়ীর ছোট ঠাউরান্ মুখ ব্যাঁকা করে বলেছেন,—যা, যা, কিয়ের বাইগুন দিমু পণ্ডিত দরমা পায় না? অখন আর হেই দিনের গুরুমশগিরী নাই যে, চাইল, ডাইল তার তরকারি দিমু। পয়সা দিয়া কিনা লৈতে ক গিয়া।" কাস্তেও অবশ্য জবাব দিয়েছে। তার কর্তার কাছে পণ্ডিতের কুড়ি টাকা পাওনা আছে। তার থেকে সে বেগুনের দাম কেটে নিক। তখন

ঠাকরুণ চুপ মেরে গেলেন। অনেক ধার।—মুদির দোকানেই আট-দশ টাকা। কান্তে বলে—"আপনে না খাইযা, না পাইযা কতকাল বেগার খাটবেন? ওই যে খ্যাতে হাওলাবা হাইলে বলদ খাটাইবার লাগচে, কাম হারা হৈলে, ইয়ারগোও পেট বইরা গাস জল দিব, আপনে স্কুল থনে রাওখালী কৈরা আইবেন, আপনার লাইগা আপনাব গীরস্তেরা ত গাস কুডা কোন তাই দেয না, আঃ ঠাকুর।"

ওদিকে প্রবোধের নিজেদেব গ্রামে তাব বাড়ীতে প্রবোধের স্ত্রী সুশীলা শিশু কোলে করে দুঃখ করে আর ভাবে,—"কপালে সুখ না থাকলে কিছুতেই কিছু হয না আমি ঠিক বুঝেছি। নইলে উনি কি লেখতে পডতে অক্ষম, না চাকরী কোবচেন না বরলে কি হয?" নিজেব জন্যে দুঃখ কবে না সুশীলা, কষ্ট পায ছেলেটির মুখে তাকিযে। "সন্তানকে পেটভরে খাওযান, পোষাক গহনা, লোকে যাই বলুক না কেন, আমি ওঁব মন জানি। আপনার মাগ, ছেলেকে ভাল খাওযাতে ভাল পরাতে কার অসাধ? উনি কি পারতে আমাদিগেব কষ্ট দিচ্চেন? 'মেযেব ভাতার পুরুষ, পুরুষেব ভাতার টাকা'—টাকা রোজগাব কত্তে না পাবলে সংসারে যে কত ক্লেশ ভোগ কোত্তে হয, তা, যে আমাদের মত অবস্থায আছে, সেই জানে।" —সুশীলা এসব ভাবছে। এমনসময প্রবোধের মা খবর দেন, ঘোষেব বাড়ীর লোক আতাইগঞ্জ থেকে এসেছে। সঙ্গে প্রবোধের চিঠি আর তাব দেওয়া পাঁচ টাকা। সে জ' নিযেছে, সামনেব মাসে টাকা পেলে স্কুলে থাকবে, নতুবা চাকবী ছাডবে। মা অনুযোগ করে বলেন, প্রবোধটা বরাববই একথা বলে, কোনোবারই তো ছাডে না। পাঁচ টাকা হাতে পেযে সুশীলা মার জন্যে একটা কাপড কিনতে চায। শীত—অথচ তাঁর কাপড নেই। মা বলেন—দু-টাকা খোকার দুধের জন্যে আর তিন টাকা ধান কেনার জন্যে বরং রাখা হোক। আর তাছাডা, কাপড সুশীলার নিজেরও তো নেই। তারপর সুশীলা নিজেকে লেখা প্রবোধের চিঠি পড়ে। প্রবোধ দুঃখের সঙ্গে লিখেছে যে, প্রিযার তাবিজ ভেঙে খোকার বালা গডাতে গিযে সে বারবার ওটা রেখে দিযেছে, ভাঙতে পারে নি। "এইরূপ কষ্ট পাইযা এক একবার মনে করি, চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাই, অমনি মনে হয, এতগুলি টাকা ছাডিযা গেলে, আর পাওয়া যাইবে না। যাই বা কোথায? মজুরের ভাত আছে, তবু আমার মত চাকরীজীবী

মানুষের উপায় নাই।" ঘোষেদের বাড়ীর লোক কালই আতাইগঞ্জে চলে যাবে। তাই চিঠি লিখ্‌তে বসে সুশীলা।

শহর থেকে মাধব এসেছেন যাদবের কাছে বেড়াতে। পুকুরের ধার দিয়ে দুজনে পথ চলেন। মাধব পাড়াগাঁয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করেন। যাদব জবাব দেন, গাঁয়ে ওপর-ওপর ভালো, ভেতরে খারাপ। হঠাৎ তারা দেখে 'আনন্দ' নামে এক সার্কেল-পণ্ডিত পিঠে বোঁচকা গামছা পরে বিল পার হচ্ছেন। মাধব তাকে ইতর লোক মনে করে। যাদব ভুল ভাঙিয়ে দেয়। গভর্ণমেণ্ট থেকে লোকটি নৌকো ভাড়া পেলেও এ বিলে নৌকো চলে না—কাদা। তার মধ্যে দিয়েই এভাবে পার হতে হয় আর চাকরী রাখতে হয়। পারে উঠে আনন্দ গায়ের জোঁক ছাড়ায়। সে দুঃখ করে বলে, এ দুঃখ ইংলণ্ডের রানীর কাছে কে পৌঁছিয়ে দেবে? এসব দেখে মাধব ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের নামে দোষ দেন। তখন যাদব বলেন,—"ও কথা বল্‌বেন না, কেবল ওঁরাই দোষী নন, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে আগুন লেগেছে। বড কর্ত্তা সিমলে ছাডবেন না মেজো কর্ত্তাদের মধ্যে গিরিবিহারী বিলক্ষণ আছেন। ছোট কর্ত্তাদের মধ্যেও বারিবিহারী বিরল নয়! শিক্ষক বেচারাদের খবর কে নেয় বলুন।" এদের সামনে ময়লা পোষাক পরে দাঁডাতে সঙ্কোচ হয় আনন্দের। "তখন ভেবেছিলাম মান অপমান কি, কিন্তু জাত স্বভাবে এখন একটু একটু লজ্জা বোধ হোচ্ছে। মধ্যবিৎ ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ কোরে নির্দ্ধন হওয়া কি কষ্ট!"

আনন্দ এদের বলে, "অধিক কি আমাদিগের হয়ে যে ব্যক্তি কিছু সহায়তা করেন, তাঁর ঘাড়েও আমাদের রোগ চেপে বসে।" মাধব বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের এখন বড়ো অস্বচ্ছল অবস্থা। আনন্দ জবাব দেয়,—"মশায়, ও কথা বোলবেন না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের কৃপণ নন, সেই সে বৎসরে শিক্ষা বিষয়ে যত টাকা দেওয়া হয়েছিল, সে সমুদয় ব্যয় হয় নাই, কতকটাকা মজুতও থাকে। কেবল শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগেই না সেই দেওয়া টাকাগুলি ব্যবহারে এলো না।" তিন তিন মাস পর নাকি পুরস্কারের রীতি আছে! কিন্তু এদের ভাগ্যে তা মেলে নি। "পুরস্কারের যত টাকা কখন ২ ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টরেরা সেই পরিমিত টাকার পুস্তকাদি পাঠান, তা কেমন পুস্তক পাঠান, যা সচরাচর বিক্রীত হয় না, তাই বিক্রয় করে টাকা লতে হয়। ডিপুটী ভায়ারা খাতিরে এরূপ করেন, আর

কি ?" মাধব বলেন,—"হ্যাঁ, ভায়াদেরও দোষত্রুটি বিলক্ষণ আছে। বিশেষতঃ ষ্টাণ্ডার করা তাঁদের হাতে থাকাতে কর্য়ো অনেকে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের অকর্ম্মণ্য পুস্তকও পাঠ্য করে দেন, অনেক কাজের পুস্তকও গড়াগড়ী যায়।" আনন্দ বলে,—"আর দেখুন, আপনি বোল্লেন, গবর্ণমেণ্টের বড অসচ্ছল অবস্থা আমাদের বেলায এই কথা। এদিকে বড ২ কর্ত্তাদিগে যে লম্বা ২ বেতন দিচ্ছেন, তাঁরা কাজ যত কচ্চেন, তা জগদীশ্বরই সাক্ষী, তাঁদের কোথাযও কথা নাই।"

কথোপকথনে জানা যায সংস্কৃত-গন্ধী বাংলা বই অচল করা হযেছে, পদ্য উঠিযে দেওযা হচ্ছে। আনন্দ বলে, "শুনুন, এখন বাংলা স্কুলের প্রতি লোকের পূর্ব্ববৎ আস্থা নাই। গ্রাম্য লোকদের সংস্কার এই, এরকম স্কুল কেবল খ্রীষ্টান, বা ব্রহ্মজ্ঞানী কোরবার জন্যে।" আনন্দের অধীনের স্কুল তিনটির অবস্থা মর্ম্মান্তিক। সারকেলগুলো অনেক ব্যবধানে। প্রতি মাসে ১০ দিন পডানো অথচ অতোগুলো বই—কি করে শেষ হবে? যাদব বলেন, বাংলা পাঠশালা ভালো হবার উপায নেই। সচ্ছলরা নিজের ছেলেদের ইংরেজী স্কুলে দেয, বাংলা পাঠশালায দেয দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত। বাংলা শেখাতে কেউই চায় না। কেননা শিখে তো এই চৌদ্দ টাকা মাইনের পণ্ডিত হওযা। মাধব বলেন,—"এ সময ইংরেজী শিক্ষার যে উপাদেয ফল ফল্‌ছে তা বাঙ্গলা শিক্ষার আর কি অনুরাগ থাকবে বলুন। ফল এক্ষণে চাকরী দুর্লভ। ১০্ টাকা বেতনের একটা সরকারী চাকুরী খালি হোলে দশদশে শ জন প্রার্থী উপস্থিত হন।" গভর্ণমেণ্ট এখন একটা কৃষিশিল্প বিদ্যালয স্থাপন করছেন। এতে দেশের উপকার হবে।

প্রবোধের বাড়ীতে প্রবোধ আর সুশীলা।—প্রবোধের মুখে বেদনা—সুশীলা বুঝতে পারে। সুশীলা সান্ত্বনা দেয—"আমাদের চেযেও দুঃখী পৃথিবীতে আছে, ধৈর্য্য ধর।" প্রবোধ বলে, তার কাছে মুদির পাওনা পঞ্চাশ টাকা। সে নাকি ছোট আদালতে নালিশের ভয় দেখিয়েছে। তারপর কাপডের টাকা চেযেছে কাপড়ওয়ালা। ছয় মাসের দরমার টাকা সে পাযনি, কিন্তু একথা বলে সে রেহাই পায় নি। কারণ কামারকে ডেকে গয়না গডাতে দেখেছে এরা। সে কাপড়ওযালাকে সব খুলে বলেছে। শেষে আর তাবিজ দিয়ে আর বালা গড়ানো হয় নি, কাপড়ওয়ালাকে প্রবোধ দিয়ে এসেছে। প্রবোধ অশ্রুপাত করতে করতে আক্ষেপ করে,—

"দেখ দেখি আমি কেমন স্বামীর কাজ করেছি।" বাসার ধারে এক মহাজন আছে। তার কাছে হাওলাতের জন্যে চাকরকে পাঠায়। মহাজন বলে পাঠায়—জিনিষ বন্ধক দিতে হবে। তখন "সটীক রঘুবংশ" দিয়ে পাঠায়। মহাজন বই দেখে অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে পাঁচ কড়াতেও এটা কেউ নেবে না। শেষে বইটা দু-টাকা দিয়ে প্রবোধ তার এক ছাত্রের কাছে বেচে বাসার খরচ চালায়। প্রবোধ বলে, "মুদীর নালিশে মোকদ্দমা খরচা সমেত ৬০/৬৫ টাকার ঝোঁকে ঠেকেছি। মোকদ্দমার ডিক্রী হয়েছে—হয় টাকা দাও নয় জেল। ঘরে ২৲ টাকার জিনিসও নেই। শুধু পৈতৃক ভদ্রাসন।" সুশীলা বলে,—"তাই বাধা দিয়ে ঋণমুক্ত হও। পরমেশ্বর সহায় থাকলে শীঘ্রই ঋণশোধ করে উঠ্‌তে পারবে। দুঃখ কিছু চিরদিন থাকে না।" প্রবোধ ক্ষোভ করে বলে,—"সর্ব্বস্বান্ত হলেম, আর শিক্ষকতা! মজুরী করি, তাও কবুল, এরূপ শিক্ষকতার খুড়ে দণ্ডবৎ।"

স্কুল মাষ্টার (১৮৮৮খৃঃ)—আশুতোষ সেন॥ কলকাতার কতকগুলো প্রাইভেট ম্যানেজমেণ্ট পরিচালিত স্কুলের সম্পূর্ণ নিয়মানুবর্ত্তন-শূন্যতার অভিযোগ এতে উপস্থাপিত। ম্যানেজার শুধু আর্থনীতিক সাফল্যের উদ্দেশ্যেই ইস্কুলের দিকে চেয়ে থাকেন। এবং এইভাবে নিয়মানুবর্তিতা, নীতি এবং শিক্ষা—সবই টাকার কাছে বলি দেওয়া হয়।

শিক্ষা ও অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রহসন রচনা না হলেও বিভিন্ন প্রহসনে প্রসঙ্গ হিসেবে এর সাক্ষাৎকার দুলভ নয়।

প্রহসনে বিবিধ ধরনের অর্থ-চিন্তা প্রসঙ্গ ক্রমে প্রকাশ পেয়েছে। এগুলোও সমাজচিত্রের অন্তর্গত হিসেবে ধরা যায়। সমাজের আর্থিক দিক থেকে এইসব চিন্তাভাবনা আমাদের আর্থিক মনের ইতিহাসে অনেক উপাদান দিতে সক্ষম হলেও গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে এগুলোর উপস্থাপন থেকে গ্রন্থকার বিরত হতে বাধ্য হচ্ছেন।

॥ সাংস্কৃতিক ॥

১। জাতপাঁত ও সংস্কৃতি ।—

জাতপাঁত সম্পর্কিত সংস্কৃতি আমাদের সমাজে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। উনবিংশ শতাব্দী সমাপ্তির পরেও "রূপ ও রঙ্গ" পত্রিকায়[১] এ বিষয়ে বলা হয়েছে,—"জাতিভেদ ভারতবর্ষের মাটীর গুণ, ভারতবাসীর শোণিত সম্পর্ক। ভারতবর্ষে জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া অনেকেই নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন যে মুসলমান জাতি ও ইসলাম ধর্ম্ম ভারতবর্ষের মাটীর গুণে তাহাতেও জাতিভেদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। রিজ্‌লি সাহেব বলেন যে ভারতের বহুস্থানে ইতর মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রবল আছে। আমাদের শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজি সভ্যতার মোহে পড়িয়া জাতিভেদ উঠাইবার জন্য এখনও ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, এসব চেষ্টা ঠিক জাতিভেদ প্রথা উঠাইবার পক্ষে নহে, ব্রাহ্মণ্য মর্য্যাদা চূর্ণ করিবার পক্ষে বিফল প্রয়াস মাত্র।" বলাবাহুল্য মন্তব্যটি রক্ষণশীল উপস্থাপিত। বস্তুতঃ জাতিভেদ পৃথিবীর কোনো সমাজেই দূর হয় না। তবে মর্যাদার স্তর বিপর্যয় প্রত্যেক সমাজেই ঘটে থাকে। এই স্তর বিপর্যয়ের বিরুদ্ধেও রক্ষণশীল গোষ্ঠী সক্রিয় থাকেন। জাতপাঁতের সংস্কৃতিতে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর শক্তি আমাদের সমাজে চিরদিনই ক্ষমতা প্রয়োগ করে এলেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাঙাগড়া প্রতি সমাজের মতো আমাদের সমাজেও ঘটেছে। বিভিন্ন জাতপাঁতের স্তর বিভাগ যে সর্বক্ষেত্রেই একটি বিরাট সোপানেই সংযুক্ত, তা নয়। প্রত্যেক পাঁতের মধ্যে প্রত্যয়গত দ্বন্দ্ব থাকবার জন্যে এই একত্ব থাকা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাসাধনের মধ্যে দিয়ে একত্বের চেষ্টা চলে থাকে। বস্তুতঃ পাঁত সৃষ্টির মূলে প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর সমর্থন ইত্যাদিই মূল কারণ হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে সমসাময়িক অনেকেই বাহ্য কতকগুলো কারণ দেখিয়েছেন, সেগুলোকে একত্র উপস্থাপন করা যেতে পারে।—(১) বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস হেতু পাঁত সৃষ্টি (বারেন্দ্র, রাঢ়ী ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত); (২) হীন জীবিকা গ্রহণ বা

১। রূপ ও রঙ্গ—৩রা শ্রাবণ, ১৩০৮।

ত্যাগে পাঁত সৃষ্টি (দৃষ্টান্ত—দাগ গোয়ালার পাতিত্য) ; (৩) হীন না হয়েও ভিন্ন জীবিকাগ্রহণে পাঁত সৃষ্টি (চৌরাশিয়া বারই ও জয়স্বার বারই দৃষ্টান্তস্বরূপ স্মর্তব্য) ; (৪) সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনে পাঁত সৃষ্টি , (৫) কুলকলঙ্ক-জনিত পাঁত সৃষ্টি (পিরালী ব্রাহ্মণের পাতিত্য এর দৃষ্টান্ত) ; (৬) সামাজিক শাসনব্যবস্থার বিশৃঙ্খলাজনিত পাঁত সৃষ্টি ; (৭) গোষ্ঠী বিশেষের অত্যন্ত উন্নতিজনিত পাঁত সৃষ্টি ; এবং (৮) জাতিগত ভিন্নতাজনিত পাঁত সৃষ্টি ;—পাঁত সৃষ্টির এই কয়টি কারণই সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত বিচারে দেখা যাবে, এর কারণ বাহ্য দিক থেকে দেখাতে গেলে অনেক জটিলতা এবং সীমাতীত পর্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়। বস্তুতঃ সাংস্কৃতিক প্রত্যয় প্রতিষ্ঠাকে এভাবে স্থূল কারণ দেখিয়ে বোঝানো সম্ভবপর নয়।

বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন অর্থনীতিতে বৃত্তি বিপর্যয় এবং সামাজিক শাসনব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা যখন জাতপাঁত সম্পর্কিত পুরোনো কাঠামো নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছে, তখন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিরুদ্ধ পক্ষের ক্ষেত্রে জাতপাঁত সম্পর্কিত সংস্কৃতির হীনতা প্রতিপন্নার্থে উপস্থাপিত করে প্রত্যয়কে বলিষ্ঠ করবার চেষ্টা চলেছে। জাতপাঁতের সাধারণ কাঠামো সম্পর্কে কিছু বলা না হলে সমগ্র সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিশেষতঃ তার সামাজিক ক্ষেত্র সম্পর্কে পরিচয় অস্পষ্ট থেকে যায়। অবশ্য প্রহসনের দৃষ্টিকোণ বিচার করে জাতপাঁতের আলোচনা হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হলো।

আমাদের সমাজে সামাজিক মর্যাদায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সবচেয়ে উঁচুস্থানের অধিকারী। খাঁটি ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীভুক্ত—(ক) রাঢ়ী (খ) বারেন্দ্র এবং (গ) বৈদিক। এ ছাড়া কনৌজী বা মৈথিল ব্রাহ্মণ, উৎকল ব্রাহ্মণ, মধ্যমশ্রেণী ব্রাহ্মণ (মেদিনীপুর), কামরূপী ব্রাহ্মণ (উত্তর বাংলায় রাজবংশীদের পুরোহিত) ইত্যাদি আরও কয়েকটি শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণরা কায়স্থ ও অন্যান্য নবশাখ গোত্রীয় জাতের ওপর আধিপত্য রেখে চলেছেন। বৈদিকদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক শূদ্রদের পৌরোহিত্য করে থাকেন। পাশ্চাত্য বৈদিক বৈদিকশ্রেণীর অন্য একটি পাঁতের নাম। এঁদের মধ্যে অনেকেই রান্নাবান্না, ভিয়েন, পূজা আর্চা ইত্যাদির কাজ করে থাকেন, কিন্তু জাতিপাত হতে দেখা যায় না। কামরূপী ব্রাহ্মণরা প্রকৃতপক্ষে হীন না হলেও, সাধারণ ব্রাহ্মণরা যাঁরা নবশাখের সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন, তাঁদের মতো সম্মানের অধিকারী নন।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা নবশাখের চেয়ে নীচুজাতের পৌরোহিত্য করে থাকেন, তাঁরা বর্ণব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এবং মর্যাদার দিক থেকে একটু হীন। যজমানের বাড়ীতে এঁরা আহার্য গ্রহণ করে থাকেন। উঁচুজাতের লোকেরা এঁদের জলগ্রহণ করেন না। সমাজে এঁদের চতুর্থ ধাপের মধ্যে রাখা যায়। এঁদের পাঁত ওঠানামা করে যজমানের জাতের সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী। এই পাঁতের মধ্যে সবচেয়ে নীচু সম্প্রদায় হচ্ছেন ব্যাসক্ত ব্রাহ্মণরা। এঁরা চাষী কৈবর্তের বাড়ীতে পৌরোহিত্য করে থাকেন। যাঁরা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন, তাঁরা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এবং করকোষ্ঠীর বিচার যাঁরা করেন, তাঁদের বলা হয় আচার্যি ব্রাহ্মণ। এঁরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পতিত। ভাট সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণত্ব বিতর্কমূলক, কিন্তু বর্ণব্রাহ্মণদের মতো তাঁদের স্তর নীচু নয়। ভাটরা জলচল সম্প্রদায়ভুক্ত। অগ্রদানীরা উঁচু জাতের কাজ করে থাকেন, আচার্যিরা কিন্তু সব জাতেরই কাজ করে থাকেন। বর্ণব্রাহ্মণরা এক একটি জাতের ওপর আধিপত্য পেয়ে থাকেন। পিরালী নামে এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ আছেন, জনশ্রুতি আছে যে, এঁরা নাকি একদা গোমাংস সেবন কিংবা আঘ্রাণ করতে বাধ্য হয়েছিলো মুসলমানদের দ্বারা। বলাবাহুল্য এঁরা পতিত। মাহিষ্য প্রধান অঞ্চলে এক একটি ঘরকে ব্রাহ্মণের পদবী (চক্রবর্তী ইত্যাদি) গ্রহণ করতে দেখা যায় এবং তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করে থাকেন। এঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণশ্রেণীর আচার-আচরণে মিল খুব অল্প।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কৌলীন্য নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হওয়ায় পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা প্রহসনে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ জাতপাঁত বিবাদও আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে নব্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই প্রাহসনিক দৃষ্টি সক্রিয়।

উঁচুজাতের শূদ্রদের ওপরে একটি ধাপ আছে। ক্ষত্রিয়রা এই ধাপে মর্যাদা পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশে খাঁটি ক্ষত্রিয় জাতের মধ্যে কাউকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তবে বিদেশ থেকে এসে অনেক ক্ষত্রিয় বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর অঙ্গীভূত হয়েছেন। পরবর্তী বিভিন্ন পাতের এই পাঁতে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

এরপর নাম করা চলে বৈদ্য এবং কায়স্থ সম্প্রদায়ের পাঁত। চাকরী ইত্যাদি দিকে প্রতিষ্ঠায় নব্য সংস্কৃতিতে এদের মর্যাদা অনেক উন্নত। কায়স্থ বড়ো কি বৈদ্য বড়ো—এ নিয়ে আমাদের সমাজে তুমুল বিতর্ক চলেছে, কিন্তু কোনো

সমাধান আসে নি। অবশ্য মধ্যশ্রেণীর কায়স্থদের সমাজে পতিত বলে গণ্য করা হয় এবং এঁরা সমাজে তৃতীয় ধাপের অন্তর্ভুক্ত। আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয়দের দ্বিতীয় ধাপের সবচেয়ে নীচুস্তরের বলে মনে করা হয় তাদেরই তরফ থেকে। কিন্তু অনেকে বলেন, এঁদের বরং তৃতীয় ধাপের অন্তর্গত বলে বিবেচনা করা যায়। ক্ষত্রিয় এবং সদ্‌গোপের মিশ্রণে আগুরীদের উদ্ভবের কথা W. B. Oldham সাহেব উল্লেখ করে ছলেন।[২] এদের অনেকেই গৃহভৃত্যের কাজ করে থাকেন। এদেব মধ্যে "জন" নামে সম্প্রদায় উপবীত ধারণ করেন, যদিও ব্রাহ্মণদের মতো এঁরা বিশেষ কোনও পবিত্র অনুষ্ঠান করেন না। মেদিনীপুরের করণদেব এই ধাপে ফেলা যায়, যদিও স্পষ্ট-করণরা তৃতীয় ধাপের অন্তর্গত। এঁরা অবশ্য বাংলাদেশের চেয়ে উড়িষ্যাতেই সংখ্যায় বেশি।

দ্বিতীয় ধাপের কয়েকটি সম্প্রদায়ের কৌলীন্য নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। কৌলীন্যের দিক থেকে পাত বিভাগের আলোচনা তাই অবান্তর।

তৃতীয় ধাপে পড়ে নবশাখ গোত্রীয় জাতপাত। এঁরা সৎশূদ্র পর্যায়ের এবং এঁদের জল উঁচু সমাজে প্রচল। উঁচু ব্রাহ্মণরা এঁদের পৌরোহিত্য করে থাকেন। নবশাখ নাম হলেও এঁদের সংখ্যা পরে সতেরোটিতে দাঁড়িয়েছে। আদিতে নবশাখ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন নিম্নোক্ত সম্প্রদায়—বারুই, কামার, কুমোর, মালাকর, ময়রা (মোদক), নাপিত, সদ্‌গোপ, তাঁতী, এবং তেলী ও তিলি। পরে এঁদের পর্যায়ে এসেছেন—গন্ধবণিক, কলিতা, কাঁসারী, কাস্ত, কুরী, মধুনাপিত, পাতিয়াল, রাজু, শাঁখারী, শূদ্র এবং তামলী। এইসব জাতের পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য অঞ্চলবিভেদে বিভিন্ন রকম। অনেকের মতে—এই সতেরোটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আদি নবশাখ সম্প্রদায়ের মর্যাদা উঁচুতে। অনেকে বলে থাকেন যে শূদ্র বা গোলাম কায়স্থরা এঁদের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী এবং তাদের মতে এরা দ্বিতীয় ধাপের শেষ পাতে থাকতে পারেন। অনেকে সদ্‌গোপদের এই ধাপে উঁচু মর্যাদা দিয়ে থাকেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে সদ্‌গোপ সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় ধাপের মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়। সদ্‌গোপ এবং বারুই, তিলী এবং তেলী—ইত্যাদি

২। Some Historical and Ethical Aspects of the Burdwan District P.—18.

জাতের পার্থক্য বিচার লক্ষণীয়। পূর্ববঙ্গে তেলীদের মধ্যে উঁচু হচ্ছেন তইপাল; এঁরা মধ্য ও পশ্চিম বাংলার তিলীজাতের সমমর্যাদা প্রাপ্ত। তেলীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা কলুজাতের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ এই সব জাতপাঁত নিয়ে চুলচেরা বিচার করা সম্ভবপর নয়। অনেকে তেলী এবং তিলীর পার্থক্য টেনে বলেন যে, তেলী এবং কলু অভেদ সুতরাং এঁরা আটের ধাপে মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত। তিলী সম্প্রদায় সাধারণতঃ মধ্য এবং পশ্চিম বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঢাকা অঞ্চলের উঁচুজাতের তেলীরা নিজেদের তইপাল বলেন। মেদিনীপুরে অশ্বিনী তাঁতীদের আচরণীয় বলা হয় এবং অন্যান্যরা নীচুস্তরে পড়েন। সদ্‌গোপদের মধ্যে অনেকে নিজেদের বৈশ্য বলে দাবী করেন এবং কায়স্থদের ওপরে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু অনেকের মতে এই দাবী সংস্কৃতিগত যুক্তিতে দৃঢ়তাশূন্য। শূদ্র বা গোলাম কায়স্থরা প্রায়ই নিজেদের কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং বিত্তবানদের মধ্যে এ ধরনের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা বেশি থাকে. এবং দৃষ্টান্ত থাকাও অসম্ভবপর নয়। পাতিয়ালরাও নিজেদের কায়স্থ বলে পরিচয় দেন। মেদিনীপুরের বারুই এবং কায়স্তরাও এ ধরনের দাবী তুলেছে। "Some well to do Kastas of Midnapore are reported to have gained general recognition as Kayasths. The similarity of names (is it accidental?) is said to help them.[৩] মেদিনীপুরে রাজু নামে যে জাত আছে তঁদের মধ্যে দুটো ভাগ—ডাহন এবং বাঁয়া। ডাইনদের মধ্যে বিধবাবিবাহ চালিত আছে এবং এঁরা জাতে একটু নীচু। কলিতারা প্রকৃতপক্ষে আসামের জাত, তবে উত্তর বাংলায় এঁদের অনেককেই দেখা যায়। খ্যান বা খেন জাতও উত্তর বাংলায় সীমাবদ্ধ। অনেকে এঁদের—এই ধাপ ও পরের ধাপের মধ্যবর্তী পর্যায়ের মর্যাদা প্রাপক হিসেবে রাখতে চান; আবার অনেকে বলেন, এঁরা পরের ধাপে সবচেয়ে উঁচুতে মর্যাদা পাবার অধিকারী।

চতুর্থ ধাপটি ছোটো। এই ধাপে পড়েন চাষী কৈবর্ত এবং গোয়ালা সম্প্রদায়। এঁদের জল চলে, কিন্তু এঁদের পূজারী ব্রাহ্মণরা পতিত।

৩। Census of India—1901, Part-I, P-371

চাষী কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলে দাবী করে নিজেদের আরও উঁচু-স্তরে রাখ্‌তে চান। চাষী কৈবর্তদের থেকে জালিয়া কৈবর্তদের পার্থক্য নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ এখনো আছে। কিন্তু জালিয়া কৈবর্তদের পূজারী ব্রাহ্মণরা মর্যাদার দিক থেকে আরও বেশি পতিত—যতোটা চাষী কৈবর্ত বা গোয়ালার পূজারীরা নন। জালিয়া কৈবর্তরা গৃহভৃত্যের কাজ করে থাকেন। এঁদের স্ত্রীলোকরা জাত্যাচার পালন করেন না। ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, বীরভূম, নোয়াখালি ইত্যাদি অঞ্চলে উঁচুজাতে এঁদের জল চলে না। শুধু ২৪ পরগণা জেলায় এঁরা তৃতীয় ধাপের মর্যাদা পেয়ে থাকেন। এমন কি অনেক অঞ্চলে গোয়ালার পূজারী ব্রাহ্মণরা পতিত হন না। অবশ্য গোয়ালাদের মধ্যে দাগ-গোয়ালা—অর্থাৎ যাঁরা বলদের গায়ে দাগা দেন, তাঁরা জল-অচল গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন।

সমাজের পঞ্চম ধাপের আগে একটি স্তরে বিভিন্ন রকম জাতের অবস্থান দেখা যায়। এইসব জাতগুলোর কোনটির সঙ্গে কোনটির মেলে না। এদের পাশাপাশি রাখবার একমাত্র যুক্তি এই যে এইসব সম্প্রদায় আগেকার ধাপের নীচে, অথচ পঞ্চম ধাপের একেবারে অন্তর্ভুক্ত বলা ভুল হবে। গাঁয়ের নাপিতরা এঁদের চুল কাটেন, কিন্তু এঁদের নখ কাটেন না বিয়েতেও সহায়তা করেন না। বোষ্টম, ভুঁইয়া, যুগী, কাছারু, লোহাইত, কুরী, নট, মুরী, সবাক স্বর্ণকার, শুঁড়ী (সাহা), সুবর্ণবণিক, সুরাজবংশী, সূত্রধর ইত্যাদি সম্প্রদায় এই গোত্রে পড়েন। অনেক অঞ্চলে ভূঁইয়ারা সৎশূদ্র বলে পরিগণিত এবং এঁদের হাতে জল চলে। বোষ্টম (বৈষ্ণব এবং বোষ্টম বলাবাহুল্য একার্থবাচক নয়) এবং যুগীর সামাজিক স্থান বিতর্কমূলক। বোষ্টমরা ঠিক কোনো জাতের মধ্যে পড়েন না। তবে এঁরা হচ্ছেন এমন এক সম্প্রদায় যাঁরা নিজের নিজের জাত ছেড়েছেন। এঁদের মধ্যে যেমন অনেকে উঁচুজাত থেকে এসেছেন, তেমনি অনেকে নীচুজাত থেকেও এসেছেন। তবে এঁদের মধ্যেও পাঁতের কথা অনেকে বলে থাকেন। 'কায়স্থ-বোষ্টম' 'চণ্ডাল-বোষ্টমের' হাতে জল খান না। বোষ্টম জাতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল বলা চলে। তবে এঁদের পূর্বপুরুষ জল চল কিংবা জল-অচল জাত হলে সেই অনুযায়ী সমাজে তাঁদের জল চল বা জল-অচল জাত হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। তারপর নাম করা যায় যুগী সম্প্রদায়ের। এঁদের কোনো ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না এবং মৃতদেহকে এঁরা সমাধিস্থ করেন। অবশ্য কালক্রমে এঁরা আর্য

আচার-বিচার অনুসরণ করেছেন। এঁদের ধর্ম এমন একটি বিষয় যা সাধারণ ধর্মগুলোর আওতায় আনতে পারি নে। এঁদের হাতে জল চলে না এবং অনেক জেলায় ধোপা নাপিত এঁদের কাজ করতে অসম্মত হন। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে এঁরাই আগে জঙ্গী (যুগী) নামে পরিচিত ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের বিধান অনুযায়ী গুড়ী সম্প্রদায়কেও এই ধাপে রাখা যায়। সুবর্ণবণিকদের জল চলে না। কিন্তু একদা সমাজে এঁদের স্থান এতো নীচুতে ছিলো না—জনশ্রুতি এরূপ ইঙ্গিত দেয়। সমাজের তৃতীয় ধাপের বিভিন্ন জীবিকার সম্প্রদায়ের চাইতে স্বর্ণকার বা সূত্রধরের জীবিকা বিচারে স্থান নীচু হওয়া উচিত না হলেও এঁরা এই ধাপেরই অন্তর্গত। শোনা যায়, স্বর্ণকার সম্প্রদায—ব্রাহ্মণের স্বর্ণ চুরির অপরাধে এবং সূত্রধর সম্প্রদায ব্রাহ্মণের যজ্ঞকাষ্ঠ সরবরাহে অসম্মতির অপরাধে 'পতিত' হয়েছেন। সাধারণ ধোপা নাপিতরা অবশ্য এঁদের কাজ করে থাকেন। লোহাইত কুরী—কৈবর্ত ও ময়রা বা কুরীদের সঙ্কর বলে দাবী করে থাকেন। এঁদের মধ্যেও আবার দুটো পাত আছে। সরাকরা আচরণীয় হলেও এঁরা পতিত,—কারণ হিসেবে একটা জনশ্রুতি আছে। "... That they used a cow made of rice paste (which they after wards boiled) during some ceremonial observance.[8] শুঁড়ীদের মধ্যে বারেন্দ্ররা নিজেদের জাতের মধ্যে উঁচু মর্যাদার দাবী করেন। এঁদের অনেকে অবস্থাপন্ন হলেও মর্যাদার দিক থেকে পাতিত্য নষ্ট হয় নি। নাপিতরা চুল কাটেন, কিন্তু নখ কাটেন না।

সমাজের নীচু স্তরে আরো কয়েকটি ধাপ আছে। এই ধাপের মধ্যে পড়েন—বাগদী, বইতি (চুনারী), বেরুয়া, ভাস্বর, চাইন, চাষাধোপা, চাষতি, দাওয়াই, ধোবা, গাঁড়ার, ঘোরই, হাজাং, জালিয়া, কৈবর্ত, কলু, কান, কণি,, কাপালি, কাওয়ালী, কোটাল, মালো (ঝালো), মেচ, মোরঙ্গিয়া, নইক, নমশূদ্র (চণ্ডাল), পলিয়া, পাটনী, পোদ, পুরো, রাজবংশী ও কোচ, শুরী, তিপারা, তিয়ার ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে ধোপা সম্প্রদায় এঁদের কাজ করেন। নাপিত এঁদের মধ্যে অল্প কয়েকটি সম্প্রদায়েরই চুলদাড়ি কামান। নমশূদ্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিজের নিজের জাতের নাপিত আছে। বাগদীদের মধ্যে লেট এবং ভোল্ল নামে দুটি সম্প্রদায় আছেন। অনেকে তাঁদের আলাদা জাতও

৪। Census of India—Part I

মনে করেন। বেরুয়ারা নমশূদ্রদের প্রশাখা হতে পারে। এঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু এদের পুরোহিত এক। পলিয়ারা রাজবংশীদের শাখা বলে ধরা হয়, এবং এঁদের মধ্যে সাধু পলিয়ারা চাষ-বাস ও গো-পালন করেন। এঁরা নিজেদের পদ্মরাজ বা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বর্ধমানে এঁদের স্থান আরো নীচে। নমশূদ্ররা অস্পৃশ্য এবং এই ধাপের অধিকাংশ জাতের চেয়ে তাঁদের স্থান অনেক নীচুতে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে দুটো পাঁত আছে। ওপরের পাঁতের রাজবংশী সম্প্রদায়রা পতিত নন এবং ব্রাহ্মণরা এঁদের কাজ করে থাকেন। এঁরা নিজেদের ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেন। অনেকে বলেন, এঁরা তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের মাঝামাঝি স্তরে স্থান পাবার অধিকারী। কিন্তু এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। শুঁড়ীদের মধ্যে যে দনীপুরে চাষী শুঁড়ী বা সোলাঙ্কীরা উৎকল ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যের সুবিধে পেয়ে থাকেন এবং এঁদের চতুর্থ ধাপের মধ্যে মর্যাদার দাবী করা হয়। তিয়াররা রংপুরে রাজবংশীদের সমপর্যায়ভুক্ত হলেও আরো দক্ষিণে এঁদের আরো নীচুতে স্থান দেওয়া হয়। এসব অঞ্চলে এঁরা আচরণীয় নন, এবং সদ্ ব্রাহ্মণদের সুবিধেও এঁরা পান না।

সমাজের সপ্তম ধাপে যাঁরা আছেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ, ধোপা বা নাপিত কারো সুবিধে পান না। এঁদের মধ্যে আছেন—বাউড়ী, চামার, ডোম, গাড়ো, হাড়ী বা ভুঁই মালী, ক্যাওরা, কোনাই, কোরা, লোধা, মাল, মুচী, এবং শিয়ালগির সম্প্রদায়। তার মধ্যে আবার ডোম এবং হাড়ী সম্প্রদায় সব চাইতে নীচু মর্যাদা পেয়ে থাকেন।

শুধু হিন্দু সমাজে নয়, মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজে জাতচ্যুত বা ধর্মান্তরিত হয়েও পুরোনো সংস্কৃতি অনেক ব্যক্তির মধ্যে বিভেদের সূচনা করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজচিত্রে এ ধরনের প্রচুর ঘটনার স্বাক্ষর আছে। অন্যান্য ধর্মীয় সমাজ নির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি বর্তমান থাকলেও উক্ত সমাজগুলোর মধ্যে থেকে উপযুক্ত প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের অভাব আলোচ্য যুগে অনুভূত হয়। এই কারণেই অন্যান্য ধর্মীয় সমাজের জাতপাঁতের আলোচনা এখানে বর্জনীয়। বলাবাহুল্য পাঁত-মর্যাদায় হিন্দুসমাজ ভিন্ন-ধর্মীয় বা ধর্মান্তরীকৃত ব্যক্তিকে হীন দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই উন্নাসিকতাও প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণে অনেকক্ষেত্রেই অনুভূত হয়।

সমাজে জাতপাঁত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার যুক্তি এই যে, বাংলা প্রহসনে

জাতপাঁতের প্রসঙ্গ অনেক ক্ষেত্রেই এসে গেছে। নব্য নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি যখন ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করেছে, তখন আমাদের সমাজের সমাজপতিদের অনেকের পক্ষ থেকেই প্রহসনকারেরা এদের পূর্ব-সংস্কৃতিকে উন্মোচন করে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছেন। প্রহসন রচনা সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের পক্ষ থেকেই সম্পাদিত হয়েছে। তাই এইসব প্রহসনে জাতপাঁত সম্পর্কে সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব তীব্র। নিম্নবর্ণে বিভিন্ন পাঁতের মধ্যে বিশৃঙ্খলায় নিজ নিজ জাতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রস্থ স্বার্থচ্যুতির সম্ভাবনায় অনেকে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণকে পুষ্ট করেছেন—যদিও তারা উচ্চবর্ণের নন।

নতুন অর্থনীতি থেকে যে নতুন কৌলীন্য ধারণার সূত্রপাত হয়েছে—তার কারণের অনেকটাই হলো শিল্প-পুঁজিবাদের ক্রমপ্রসার। আমরা জানি, ইসলামী আমলে আমাদের সমাজে রাজতন্ত্রের পাদপীঠ আশ্রয় করেও এক নতুন কৌলীন্য ধারণার উদ্ভব ঘটেছিলো। কিন্তু সেক্ষেত্রে অর্থনীতি ছিলো দুর্বল। তাই ইসলামী যুগে 'যবন-দোষে' মর্যাদা নষ্ট হয়েছে, কিন্তু ইংরেজ আমলে শেষের দিকে সাহেবীয়ানা হয়ে উঠেছে কৌলীন্যের স্বাক্ষর। ইসলামী যুগে রক্ষণশীল হিন্দু কৌলীন্য মর্যাদা-ব্যবস্থা পরাজয় বরণ না করলেও পরবর্তী-কালের নতুন অর্থনীতির চাপে অতি সহজেই পরাভূত হয়েছে। এই পরাভবের বিষজ্বালা বিভিন্ন প্রাহসনিক দৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পুরোনো হিন্দু কৌলীন্য মর্যাদার বিধি-ব্যবস্থার মূলে ছিলো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে তাঁদের একদল অতি সহজেই নতুন অর্থনীতির শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সাংস্কারিক বৃত্তির ক্ষেত্রসংকরণ নতুন আয়পন্থা অনুসরণে বাধ্য করেছে, তাই বৈতসিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নতুন অর্থনীতি-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছেন। পুরোনো কৌলীন্য মর্যাদার কাঠামোটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার তাগিদও অনেক নতুন কুলীন সম্প্রদায় অনেকক্ষেত্রে অনুভব করেছেন। কারণ সাংস্কৃতিক মর্যাদায় হীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ববর্তী ব্যবস্থাজনিত ক্ষোভ নব্য ব্যবস্থায় প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে এবং নব্য ব্যবস্থা এই ক্ষোভ সম্পূর্ণ দমন করতে সক্ষম হয় নি।

আগে থেকেই বিভিন্ন পাঁতের মধ্যে প্রতায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলে এসেছে। কৌলীন্য অর্জনের জন্যে সমাজের নিম্নস্তরের সম্প্রদায়রা নিজের কুলের কলঙ্ক প্রচার করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বর্ণসাঙ্কর্যের কথা তাঁরা যেভাবে স্বীকার করেছেন, তাতে

স্বক্ষেত্রে যতোই মর্যাদা আনুক, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হীনতাই অনুভব করায়। কৌলীন্যলাভের এ ধরনের একটি বিকৃত পথ খুঁজে পেয়েছিলেন সেকালের অনেক সম্প্রদায়।

কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার অন্য একটি পথও ছিলো পরে সেটির অনুসরণই বেশি দেখা যায়। উচ্চবর্ণের আচার পালনের মাধ্যমে কৌলীন্য অর্জন করা যায়—এমন একটি ধারণা আমাদের সমাজে অনেক সম্প্রদায় পোষণ করে থাকেন। আমাদের দেশে কৌলীন্য মর্যাদা কতকগুলো হাস্যকর বাহ্য আচার-বিচারের মধ্যে অবস্থান করে। উপবীত ধারণ, অপরকে জলদান বা আহার্যদান করবার অধিকার অর্জন, অপরকে স্পর্শ করবার অধিকার অর্জন, সমপঙ্‌ক্তিতে আহার্য গ্রহণের অধিকার অর্জন ইত্যাদি অতি সামান্য সামান্য দিকগুলো আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে প্রধান হয়ে উঠেছিলো। ক্ষুদ্ধ হীন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও এই সমস্ত আচার-বিচারে অধিকার অর্জনের তীব্র প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। অব্রাহ্মণ বিভিন্ন সম্প্রদায় উপবীত ধারণের জন্যে আন্দোলন করেছেন, যার স্বাক্ষর পাওয়া যাবে কতকগুলো প্রস্তাবমূলক সাম্প্রদায়িক পুস্তিকা এবং রক্ষণশীল সমাজের অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য সম্বলিত আলোচনার মধ্যে।

পদবী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পুরোনো সংস্কৃতির সঙ্গে আপোসের চেষ্টা নব্য কুলীনদের অনেকেই করেছেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোর্টের সহায়তায় পদবী পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত সম্বলিত নথিপত্র যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলেও দেখ্‌বো যে পুরোনো সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষের চেষ্টা এখনো একইভাবে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ ধরনের পদবী পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত অবশ্য এতো ব্যাপক ছিলো না। যে সমস্ত পদবী বিশেষ কোনো বৃত্তিজ্ঞাপক, সে সমস্ত পদবী বর্জন করে রায়, চৌধুরী ইত্যাদি অস্পষ্ট পরিচয় বাহক পদবী গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনেকে শ্রুতিসাম্যের সুযোগ গ্রহণ করে বৃত্তিজ্ঞাপক পদবী নষ্ট করে অন্য একটি শব্দকে পদবীস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। নতুন সংস্কৃতিতে থেকে পদবীর নিকৃষ্টতা কৌলীন্যের মর্যাদা নষ্ট করে এবং পদবী কণ্টকস্বরূপ হয়ে ওঠে। বাংলা প্রহসনে রক্ষণশীলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বিদ্রূপাত্মক নব্য কুলীন চরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, তাদের পদবীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হীন জীবিকার পরিচয়বহ করে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকারান্তরে রক্ষণশীল গোষ্ঠী নব্য কৌলীন্য মর্যাদার অসারত্ব প্রতিপন্ন করবারই চেষ্টা করেছেন।

কৌলীন্য অর্জনের বিকৃত পথগুলোকে প্রহসনকাররা নির্মমভাবে বিদ্রূপ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর্যত্বের আওতায় ঐক্যবদ্ধ হবার এক প্রচেষ্টা চলেছিলো। "আর্য্যদর্শন পত্রিকায়"[৫] একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে,—"আমরা আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিই—হিন্দু বলিয়াও পরিচয় দিই। উভয় উপাধির মধ্যে আর্য্য উপাধিটী যেন আমাদের স্বোপার্জিত বস্তু, কর্ণপ্রিয় ও গৌরবের ধন। যখন মনে হয়, 'আমরা আর্য্য'—তখন এমন একটি অপরিস্ফুট অভিমান সুখের উদয় হয়, যাহার মূল উপলব্ধি হয় না? কিন্তু হিন্দু মনে হইলে সেরূপ ভাবের উদয় হয় না। কেন হয় না? তাহা জানি না।' ('আর্য্য ও হিন্দু উপাধি প্রবন্ধ'—পৃঃ-৫৩)। কিন্তু বিভেদপন্থী রক্ষণশীল এই ঐক্যের মধ্যে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। আর্যজাতি সম্পর্কিত একটি অনুরূপ পন্থাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "কষ্টিপাথর" প্রহসনে (১৮৯৭ খৃঃ)। চত্রটি উপস্থাপিত করা হলো।—

জগন্নাথ মান্না শম্ভু শিরোমণিকে বোঝায়,—আমরা যে আর্য্য সন্তান, তা ত আপনাকে স্বীকার কত্তে হবে?" উমেশ উপস্থিত ছিলো। সে মন্তব্য করে,—"ওঁর বাবাকে স্বীকার কত্তে হবে। পাঁচ-পাঁচটি সাজোয়ান আর্য্যের ঔরসে এক একটি মান্নার উৎপত্তি, পরাশর একথা খুলে লিখে গেছেন।" জগন্নাথ বলে,—"উমেশ থাম্। যখন এক বংশ হতেই আমাদের সকলের উৎপত্তি ..।" কথা শেষ না হতেই উমেশ বলে,—"সকলকে জড়িও না বাবা।" শিরোমণি জবাব দেয়,—"তুমি মূর্খ। তুমি মান্না, আর আমি মুকুটী বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, তোমার আমার এক বংশ হতে উৎপত্তি?" জগন্নাথ বলে,—"আপনি ভুল কচ্চেন, আমি সে বংশের কথা বল্‌ছি না,...আমি সেই আর্য্যাবর্ত্তের আদিম অধিবাসীগণের কথা বল্‌ছি। যে বংশ হতে ভারত সন্তানের প্রথম উৎপত্তি। এ বংশ সে বংশ তো হালের নির্ব্বাচন। অতএব যদি এক কথা স্বীকার করা যায় যে আমরা আর্য্য সন্তান, দেখ্‌তে হবে আমাদের এ অধঃপতনের কারণ কোথায়?—আমাদের এত দুর্দ্দশার কারণ আমরা অনাচার পরায়ণ। আমাদের অনাচার পরায়ণতা আমাদের সর্ব্বনাশ কচ্ছে।.. আমাদের বিদ্যার্জ্জনে কিছু হবে না, বক্তৃতায় কিছু হবে না, সংবাদপত্রে কিছু হবে না, যতদিন আমরা আমাদের কদাচারিতার মূলে কুঠারাঘাত কত্তে না পার্ব্ব,

৫। আর্য্যদর্শন—জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ সাল।

ততদিন আমাদের দুর্গতির বৃদ্ধি বই হ্রাস হবে না। পবিত্র পঞ্চনদবাসী দেবস্বভাব সেই আর্য্য রাজর্ষিগণের বংশধরেরা যেদিন ম্লেচ্ছ প্রসাদ মস্তকে ধারণ করে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেছে,··আর্য্যাবাস ভারতবর্ষ যেদিন দুষ্ট রেইলওয়ে—কাল সর্পের দেহলতায় আবৃত হয়েছে··।" জগন্নাথের বক্তৃতার সঙ্গে উমেশও বলে চলে,—"যেদিন আর্য্য সন্তানগণ কলের জলে স্নান করেছে, সালসা খেয়েছে, Cod liver oil কিনেছে··।" জগন্নাথ বলে,—"ঠিক, উমেশ ঠিক, তোমার পরিহাস বড় গভীর, মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু বড় সস্তা।" উমেশও বক্তৃতার ভঙ্গীতে জগন্নাথকে বিদ্রূপ করে। 'যেদিন'-এর মাত্রা চড়াতে চড়াতে উমেশ বলে,—"যেদিন মান্নাবংশ লাঙল ছেড়ে Lecture দিতে শুরু করেছে,···।" ইত্যাদি। তখন জগন্নাথ অনেক ক্লান্ত। শিরোমণিও বলে, —"স্নানাহারান্তে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব এখন নয়, বেলাধিক্য হয়েছে।"

বাংলা প্রহসনে জাতপাত নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রচুর পরিমাণে যত্রতত্র প্রকাশ পেয়েছে। জাতপাতের মর্যাদাগত সমস্যা নিয়ে নিরপেক্ষ আলোচনায় এঁদের কেউই মাথা ঘামাতে চান নি। এই সমস্ত কুরুচিপূর্ণ প্রসঙ্গ সমাজচিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। সুতরাং প্রদর্শনীর প্রারম্ভিক বক্তব্যে এসব নিয়ে আলোচনা অবান্তর।

(ক) ত্রিপুরা রাজবংশ ঘটিত জাতপাত আন্দোলন ॥ —

বিশেষ বংশঘটিত প্রসঙ্গ আলোচনা অপরাধজনক এবং কুরুচির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যের প্রতি আনুগত্য রাখতে হলে এবং প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখতে হলে এই প্রসঙ্গ অতিবর্তন করা ঐতিহাসিকের পক্ষে অন্যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এই বিখ্যাত আন্দোলনকে অস্বীকার করা তাই গ্রন্থকারের পক্ষেও অসম্ভব। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এ নিয়ে প্রচুর মন্তব্য ও আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। বংশ বিশেষের প্রতি সম্মান রক্ষার্থ সেগুলো উল্লেখ করতে বিরত হলাম।

ত্রিপুরার রাজবংশের জাতপাত ও মর্যাদা নিরূপণে অনেক অঞ্চলের পণ্ডিতরা বলে থাকেন, এঁরা জাতে রাজবংশী—সুতরাং জল-অচল গোত্রে

পড়েন। অন্যদিকে বলা হয়—এঁরা চন্দ্রবংশোদ্ভব এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ। "রাজমালা ও ত্রিপুরার ইতিহাস" গ্রন্থে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে,—৬

"শুন শুন মহারাজ হইয়া সাবধান।
তোমার বংশের কথা করিছি বাখান॥
চন্দ্রবংশে মহারাজ যযাতি নৃপতি।
নিজ বাহুবলে শাসে সপ্তদ্বীপ ক্ষিতি॥
তান পঞ্চপুত্র হৈল যেন কল্পতরু।
যদুতুর্ব্বসু আর দ্রুহ্যু অনু পুরু॥
শুক্রকন্যা দেবযানীর দুই হইল পুত।
রাজকন্যা শর্মিষ্টার হৈল তিন সুত॥

*   *   *

বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা তনয়।
দ্রুহ্যু নামে রাজা হৈল ইন্দ্রের আলয॥"

এ ধরনের সামাজিক স্তরের বিরাট পার্থক্য নিয়ে মতভেদ বা বিতর্ক খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। সেইজন্যেই এই বিষয় নিয়ে সে সময়কার সমাজে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিলো। অনেক ব্রাহ্মণ ত্রিপুরা রাজবংশকে চন্দ্রবংশ বলে স্বীকার করে নিয়ে রাজপ্রাসাদে আহার্য গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ নাকি অর্থলোভে অন্যায় বিধান দিতে কিংবা অন্যায় ভাষ্য দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সুতরাং গৌণভাবে ব্রাহ্মণদের অর্থলোভের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে—যাকে আমরা আথিক ও সাংস্কৃতিক—উভয় দৃষ্টিকোণ বলে স্বীকার করতে পারি।

ত্রিপুরা আলোন্দন সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিই যথেষ্ট।—

"১৮৮২ খৃঃ অব্দে, মহারাজ বীরচন্দ্র দেব বর্মন মাণিক্য বাহাদুর কতিপয় স্বার্থপর কুচক্রী ব্যক্তির কুপরামর্শে পর্ব্বতবাসী সমস্ত টিপরাজাতিকে ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূত বলিয়া প্রচার করেন এবং রাজপরিবারের লোক বলিয়া তাহাদের সংস্পৃষ্ট জল সকলকে পান করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে কতকগুলি অর্থগৃধ্নু পণ্ডিতপুঙ্গব ও চাকুরীপ্রার্থী উমেদার, ত্রিপুরাজাতির সংস্পৃষ্ট জলসহ কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করেন। ইহা লইয়া ত্রিপুরা, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টবাসী হিন্দুগণ মধ্যে দাবানল প্রায়

৬। রাজমালা ও ত্রিপুরার ইতিহাস—কৈলাসচন্দ্র সিংহ—পৃঃ ৩১।

ত্রিপুরপতির জাতিঘটিত এক ঘোরতর সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং ভীষণ সমাজযুদ্ধে মহারাজ বাহাদুর বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হযেন। তাহার কর্মচারি ও ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত জলাচরণ ভয়ে ত্রিপুরা হইতে পলায়ন করে। এই জলাচরণ ব্যাপার উপলক্ষে অপরিমিত অর্থ ব্যয়িত হওযায়, ঋণজালে রাজসংসার ডুবুডুবু হইয়া উঠে।"[৭]

জলযোগ (ঢাকা—১৮৮২ খৃঃ)—ঈশানচন্দ্র মুস্তফী॥ অভয়াচরণ দাস প্রকাশিত। টাইটেলে প্রহসনকার লিখেছেন,—"জলযোগ অর্থাৎ পশ্চিমপুরের পণ্ডিতদিগের কিঞ্চিৎ জলপান। নামকরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণে ত্রিপুরা রাজবংশ অসৎশূদ্র পর্যায়ের বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং পাঁত সম্পর্কে সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ রাখা হয় নি। বরং বিশেষ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই সাংস্কৃতিক আক্রমণ প্রকাশ পেয়েছে।

কাহিনী।—পূর্বপুরের রাজা দিলীপচন্দ্র বড়ো মন-মরা। এতোদিন তাঁর ধারণা ছিলো তাঁরা জাতে ক্ষত্রিয়। কিন্তু কোন্ বইযে তথ্য দেওযা আছে যে, তাঁরা 'জল-অচল' অস্পৃশ্য জাতের লোক। বইটি তিনি দেখেন নি। তাঁর মন্ত্রী রাজকার্য উপলক্ষে চাকলায গিয়েছিলেন, সেখানে এক ভদ্রলোকের মুখে শুনতে পেযে তা তিনি রাজাকে জানান। ভদ্রলোক বলেছিলেন,—"তাহা পাঠ করিতে ২ একস্থানে দেখ্‌তে পেলেম আমাদের মহারাজার জল অস্পর্শনীয, এমন কি, তিনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতির গৃহে প্রবেশ কল্লেও খাদ্যদ্রব্যাদি অশুচি হয়।"

মন্ত্রীদের মধ্যে পরামর্শ চলে। এ সব কথা সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক প্রকাশ পেলেই মুস্কিল। সুতরাং প্রতিবিধান করা উচিত। নায়েব বলে,—"সমাজের সহায়তা ভিন্ন কিছুই করে উঠতে পাচ্ছেন না। আমি বিলক্ষণ জানি, এ দেশের সমাজ ভিন্ন ২ দলে বিভক্ত, এক ২ গ্রামে এক একটি সমাজ, সেই প্রত্যেক সমাজের মত জিজ্ঞাসা এবং অনুমতি গ্রহণ করতে হবে; নচেৎ এ কাজ সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।" মন্ত্রী ভাবেন,—পূর্ব ও পশ্চিমপুরের পণ্ডিতদের হাত করলেই সমাজ হাত হবে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"কেন, আমার ত বেস স্মরণ পড়ে, গত শারদীয় পূজার সময় যখন পশ্চিমপুরের পণ্ডিতগণ এখানে উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কোন রত্ন, নাম মনে পড়ে না,

৭। জীবন-কাহিনী—রাজবিহারী দাস (১ম ভাগ)—পৃঃ ১৮২।

কথায় ২ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, সমাজ কি, আমরাই সমাজ, যা ইচ্ছা করি করতে পারি, সমাজ কেবল উপলক্ষ মাত্র।" একদিকে পরামর্শ চলে অন্যদিকে রাজার খেদ বেড়েই চলে,—"আমি চিরকাল জানি আমরা যযাতির সন্তান, চন্দ্রবংশোদ্ভব। আজ যে কোথা হতে এই—অশাস্ত্রীয় অমূলক কথার সৃষ্টি হলো তার কোন প্রমাণ বিদ্যাবত্ন, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি প্রভৃতি আমাদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলে অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন। আমরা ছত্রধারী এবং স্বাধীন। ক্ষত্রিয় সন্তান ভিন্ন অন্যত্রে ইহা সম্ভবে না। তবে কেন আজ এই কুলকলঙ্ক প্রচার হল?'

অবশেষে মহারাজের অনুগত ও হিতৈষী নগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মন্ত্রীদের মনে পড়ে। তাঁরা ভাবেন, একমাত্র নগেশবাবুই হস্তক্ষেপ করলে এ কলঙ্ক দূর হতে পারে। কারণ পশ্চিমপুরের সব পণ্ডিতই তারই হাতে। বিশেষ করে "আবৃত নগরের" "সুধীসভা" তার প্রতিভূ। এই সভা অর্থলোভে অযোগ্য ব্যক্তিরও সম্মানদানে পশ্চাৎপদ হয় না। "হিন্দু সমাজ কামধেনু গাভী, মনে করলেই দুগ্ধ দোহন করা যায়।" এঁদেরই সাহায্যে পশ্চিমপুরের কোন্ এক সমাজে পতিত বাবুও সমাজে উঠলেন। "অর্থেষু সর্ব্বে বশাঃ, পয়সাতেই সব।"

নগেশবাবু নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। তিনি কথা দেন, তিনি এর প্রতিবিধান করবেন, তাছাড়া তিনি নিজেও রাজার পূর্বপুরুষকে ক্ষত্রিয় বলেই বিশ্বাস করেন। আহারের অনুরোধ এলে কিন্তু নগেশবাবু বিনীতভাবে বলেন,—"আজ্ঞে না, আমাকে মাপ করবেন। যেখানে খাই, মহারাজেরই খাচ্ছি।"

নগেশবাবু উকীল, তিনি প্রথমে ডিফেমেশন কেসের কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু এটা সমাজঘটিত ব্যাপার বলে অবশেষে "আবৃত নগরের" "সুধীসভা"র শাখাসভা করবেন বলে পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণের পরিকল্পনা করেন। এতে সব পণ্ডিতকেই একত্র পাওয়া যাবে। তারপর তাঁদের কৌশলে জলযোগ করিয়ে দিতে পারলেই "জল-চল"-বিধান আপনিই হয়ে আসবে।

পূর্বপুরের কাছাকাছি একটা শহরে নগেশবাবু থাকেন। সেখানে ফিরে গিয়েই তিনি "আবৃত নগরের" অন্তঃপাতী "অশনিপাত" গ্রামে পণ্ডিত নির্মল-শশধর তর্করত্নকে চিঠিতে জানালেন যে মহারাজ নিজ আলয়ে একটি সুধীসভা স্থাপন করতে চান। সুতরাং নির্মলশশধর যদি পশ্চিমপুরের ও স্রোতস্তটের পণ্ডিতদের সঙ্গে করে তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছান তাহলে ভালো হয়। এদিকে

মন্ত্রীকেও নগেশবাবু একটি চিঠিতে জানালেন যে এ জন্যে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা খরচ হবে। নগেশ ভাবেন, নির্মলশশধরকে হাতে রাখলে সমাজ আর কিছু করতে পারবে না।

স্রোতস্তটের ত্রিনেত্র তর্কালঙ্কার, মধুসূদন আহ্লাদ সার্বভৌম, জনার্দন বিদ্যারত্ন ইত্যাদিকে সঙ্গে নিয়ে নির্মলশশধর তর্করত্ন নগেশবাবুর বাড়ী আসেন। নগেশবাবু তাঁদের কাছে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। মহারাজ যে ক্ষত্রিয় এ কথা উচ্ছ্বসিত হয়ে সকলে স্বীকার করলেন, কিন্তু সেখানে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা নীরব রইলেন। জনার্দন পণ্ডিত বলেন,—"এতে দোষ নেই, তবে সমাজে গোল হতে পারে।" পণ্ডিতরা ভয় করেন স্রোতস্তটে গোল না হলেও পশ্চিমপুরে হতে পারে। বারাণসী পণ্ডিত বলেন,—সমাজের এখন কীই বা ক্ষমতা আছে! ব্যাদনপাড়া গ্রামের কোন ভদ্রলোক জাত্যন্তরিত হয়েও সমাজে উঠলেন, তখন সমাজ প্রতিবাদী হয়ে কি করেছিলো? পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক কথাই হয়। তবে নগদ উত্তম রকমের বিদায়ের কথা শুনে নির্মলশশধর পণ্ডিতদের আহার্য গ্রহণে রাজী করান।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে পণ্ডিতরা পূর্বপুরের রাজভবনে এসে উপস্থিত হন। পণ্ডিতরা এসেই রাজাকে তোষামোদ করেন,—বলেন, ইনি নবরূপে অবতার ইত্যাদি। প্রশস্তি করে সংস্কৃত শ্লোকও তাঁরা আওড়ালেন। তারপর সভা বসে। নির্মলশশধর সভাপতি হন এবং সকলে এই সভায় রাজাকে যযাতির বংশধর বলে স্বীকার করেন। তারপর জলখাবার প্রসঙ্গে তর্কবাগীশ বলেন,—"আচ্ছা জল খাব তাতে দোষ কি? জল স্বয়ং নারায়ণ।" বারাণসী বিদ্যারত্ন বলেন,—"গোমতীর ব্রহ্মপুত্রের সহিত পরম্পরা সংশ্রব আছে······সংসর্গগুণে গোমতীরও পাবকত্ব আছে।" শুধু জলযোগ নয়, লোভার্ত পণ্ডিতেরা রাজকীয় খাদ্যসামগ্রী পেয়ে ভূরিভোজন করেন। তারপর প্রচুর বিদায় নিয়ে তাঁরা আশীর্বাদ করতে করতে চলে যান।

এই জলযোগের সংবাদ ক্রমে সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। নির্মলশশধরের মেয়ে 'ফল' দেখেছে। তাই নিয়ে যে উৎসব—তাতে পড়শীরা পানসুপারী গ্রহণ করে না। মেয়েরা পর্যন্ত ঘোঁটে যোগ দিয়েছে। "ফলের ষোল রেতের মধ্যে বিয়ে"—কিন্তু বিয়ে কি করে হবে—আশঙ্কিত হন নির্মলশশধর। তাঁর টোলের ছাত্ররাও একে একে সরে পড়ে।

এদিকে আবৃত নগরীর কোর্টে বিপক্ষের উকীলের জেরায় জনার্দন পণ্ডিত

সব কিছু প্রকাশ করে ফেলেছেন। নগেশবাবু আক্ষেপ করেন। পণ্ডিতরাই আশা দিয়েছিলেন, অথচ হিতে বিপরীত হলো। চারদিকে শত্রু—পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। তবে পাটপাসার মুখুয্যেরা যদি একটু দেখেন!

প্রহারেণ ধনঞ্জয় (১৮৮৪ খৃঃ)—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ বিজ্ঞাপনে প্রহসনকার লিখছেন,—"টিপরা ঘটনায় বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা বর্ণন করাই এই প্রহসনের উদ্দেশ্য। যদিও ইহা আয়তনে একান্ত ক্ষুদ্র তথাপি পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করি। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন ঘটনাসংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ ইহাতে প্রকারান্তরে বিবৃত হইয়াছে। সান্নয়ে নিবেদন, ব্যক্তি বিশেষ আমাদের লক্ষ্য নহে। তবে যদি নিজগুণে কেহ ধরা দেন সে দোষে আমরা দূষি হইতে পারি না কিমধিকমিতি। বংশবদস্য।" টিপরা-দোষের গুরুত্ব প্রহসনকার বিশ্বনাথের মুখে প্রকাশ করেছেন। বিশ্বনাথ মালিনীকে বলেছে,—"আজকাল যে দিন পড়েছে, তাথে ঐ সকল দোষ (অর্থাৎ বয়সকালের দোষ) দোষের মধ্যেই নয়। গো-বধ, ব্রহ্মবধ, যত মহাপাপ আছে, কোন পাপেই দোষ হয় না। কেবল টিপরা হলেই দোষ। তার প্রমাণ দেখ, রামধন মুখোর্য্যার বিধবা ভগ্নীতে ধোপা পরিবাদ ছিল, শিরোমণির সন্তান মহারাজ ঘটক ভরার মেয়ে বিয়ে করেছে। হলধর চাটুর্য্যার কন্যার বিয়ার পর ছয় মাসে সন্তান হয়েছে, এই সমস্ত দোষ লোপ। কারো কোন অপরাধ নাই, তর্করত্ন মহাশয় আগড়তলা গিয়াছিলেন, তিনি টিপরা, প্রাচিত্ত কত্যে হল।"

কাহিনী।—ত্রিপুরার রাজার হাতে জল চলে না। টাকা খেয়ে অনেকে 'আগড়তলায়' গিয়ে রাজার পক্ষে বিধান দিয়েছেন। তাঁদের পণ্ডিত সমাজ একঘরে করেছেন। অনেকে প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠেছেন। অনেকে জেদের বশে প্রায়শ্চিত্ত না করে অসুবিধা ভোগ করছেন।

ঠিক এমনি একজন হচ্ছেন তর্করত্ন মশায়। "মেয়েটি ঋতুমতী হয়ে রৈল বিয়ে দিতে পারি নে। এদিকে ধোপা, নাপিত, গুরু, পুরোহিত সমস্ত বন্ধ।" টিপরা হওয়া যেন পাপের চেয়েও বড়ো পাপ। "খানা খাও, মুরগী খাও যা ইচ্ছে তাই কর কোন দোষ নাই কিন্তু যদি বল আমি আগড়তলার মহারাজের পক্ষ, তবেই মাথায় বাড়ি।" নগণ্য বিশ্বনাথও তর্করত্নকে বলে,—তাঁকে প্রণাম না করলেও দোষ হয় না। কারণ তিনি টিপরা। কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বনাথ এক

তর্কলঙ্কারের গল্প বলে। কোন তর্কালঙ্কার নাকি নৌকোয় করে যেতে যেতে তালতলার বাজারের কাছে নৌকো থামাতে বললেন। মাঝিটা ছিলো জাতে চণ্ডাল। যা হোক তার হাতে দু আনা পয়সা দিয়ে কাঁঠাল কিনে আনতে বললেন। মাঝিটা নিয়ে এলো কলা। বাজারে যথেষ্ট কাঁঠাল ছিলো, তবু কেন কলা আনলো, তার কারণ বলতে গিয়ে চণ্ডাল মাঝি বলে,—"যদি কাঁঠাল আনিতেম তবে আমি ভাঙ্গিলে আপনি খাইতেন না যেহেতু আমি চণ্ডাল। আর যদি আপনি ভাঙ্গিতেন তবে আমি খাইতাম না যেহেতু আপনি টিপরা, এইজন্য দুয়ের ভালার জন্যেই কলা আনিয়াছি।" গল্পটা বলা শেষ করে বিশ্বনাথ মন্তব্য করে—দিন কতক পরে তর্করত্নদের মুসলমানও ছুঁতে চাইবে না। তর্করত্ন তখন ভাবেন, "কালস্য কুটিলা গতি !!" বিশ্বনাথের সঙ্গে তর্করত্নের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় এক অতিথি এসে একরাত্রির আস্তানা পাবার জন্যে বলে। সে মুন্সীগঞ্জে মোকদ্দমা তদ্বির করতে যাবে। বিশ্বনাথ তাকে বলে, তর্করত্ন টিপরা। অতিথি অসহায় বোধ করেন। তখন তাঁকে নিজের বাড়ীতে বিশ্বনাথ নিয়ে যায়। অতিথির নাম দাশরথী শশী।

তর্করত্নের স্ত্রী দুর্গা খেদ করে। "সাত জন্ম যেন মেয়ে আইবর থাকে, তবু যেন বামন পণ্ডিতের কাছে বিয়ে হয় না। ভালমন্দ হিত বিপরীত কিছুই জ্ঞান নেই কেবল শাস্ত্র ২ করে অস্থির, কোথায় অনুস্বার পড়েছে, কোথায় বিসর্গ বোসেছে দিনরাত কেবল এই কথা এই চিন্তা এই আলাপ। ধোপা, নাপিত, গুরু পুরোত সব বন্ধ হয়ে কেবল শাস্ত্র ধোয়ে জল খাব।" অগ্রদানী বামুন ডাকিয়ে তিলপাত্র উৎসর্গ করে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে সে তর্করত্নকে অনুরোধ করে। তর্করত্ন বলে,—"সাধে বলে লোকে সতর হাত কাপরেও কাছা হয় না। পুরাণ দেখ, তন্ত্র দেখ, বচন প্রমাণ শোন আগে বিচার কর রাজা দুষী কিনা চন্দ্রবংশীয় কিনা জল আচরণে কোন দোষ আছে কিনা তারপর দু কথা শক্ত বল রাজি আছি একি কিছুর মধ্যে কিছু না কেবল বল প্রায়শ্চিত্ত কর।" দুর্গা বলে, রাজার হাতে জল চালানোর চেয়েও তার সংসার চালানো আরও বড়ো কথা। তর্করত্নের ভগ্নীপতি চাটুর্যাও তর্করত্নকে প্রায়শ্চিত্ত করতে অনুরোধ করেন। তর্করত্ন বলেন, বিবেচনা করে তিনি দেখবেন।

বিশ্বনাথকে কথাপ্রসঙ্গে চাটুর্যা বলেন,—"শ্রীকুলের বাবুদের গতিকেই এতদিন এ গোলমাল আছে। নচেৎ সমস্ত মিটে যেতো।" মালিনী উপস্থিত ছিলো। সে বলে,—"শ্রীকুলের বাবুরা না জেতে তেলি। তাঁরা তো বামুন পণ্ডিত নয়

তবে তাঁদের কথা লোকে মানে কেন।" চাটুর্যা বলেন,—"ইচ্ছায় মানে টাকায় মানায়।" বিশ্বনাথ ভবিষ্যৎবাণী করে,—"এই চাটুর্যে্য, মুখোর্যে্য, বাড়ুর্যে্য, কায়েত, বৈদ্য, হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল যত লোক কেন টিপরা হোক না, সকলেরই অব্যাহতি আছে কিন্তু তেলি মহাশয়দিগের অব্যাহতি নেই। তার প্রমাণ দেখুন বিক্রমপুরে কার বাড়ীর উপর দিয়ে মগ না গিয়াছিল—কিন্তু সকলে রেহাই, দোষের ভাগী তেলি, তাদের নাম হল "মগ"-তেলি, আর কয়েক দিন যেতে দিন, সকলে রেহাই পাবে। তেলি মহাশয়রা টিপরাতেলি হবেন। বিশ্বনাথের কথা পুত্রান্তে ফল।"

ক্রমে তর্করত্নের দুদশা চরমে পৌছোয়। একদিন তর্করত্নের বাড়ীতে প্রচুর দুধ আসে। তার কারণ আর কিছুই নয়। তর্করত্ন বাজারে গিয়ে যে যে দুধের হাঁড়িতে হাত দিয়ে ছুঁয়েছিলেন, সেই দুধ আর কেউ কিনলো না। "সকলে বল্লে, এ দুধ টিপরায় ছুঁয়েছে, আমরা এ দুধ নিব না। কাজেই বাধ্য হয়ে সমস্ত দুধ নিয়ে বাড়ী এলেন।"

তর্করত্নের মেয়ে নবকুমারীর সঙ্গে রাসবিহারী বাঁড়ুযোর ঘনিষ্ঠতা আছে। বিয়ের সব ঠিকঠাক, তবু বরপক্ষ থেকে আপত্তি এই যে, তর্করত্নের টিপরা দোষ হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত না করলে বিয়ে বন্ধ। নবকুমারীর সঙ্গে রাসবিহারীর প্রণয় অবশ্য অটুট আছে। লুকিয়ে রাসবিহারী নবকুমারীকে চিঠিও লেখে, কিন্তু নবকুমারীরই দুর্ভাগ্য, নইলে টিপরা বলে তর্করত্নের বাড়ীতে ডাকপিওন চিঠি দিতে আসতে চায় না কেন!

তর্করত্নের মনের মধ্যে একটু দ্বন্দ্ব আসে। দত্তবাড়ী জামাই এসেছে শুনে নাকি তাঁর মেয়ের চোখটা ছলছল করে উঠেছিলো। তাই দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো, মান মর্যাদা শাস্ত্র, জ্ঞান সবকিছু ছেড়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন। শেষে চাটুর্যার কথায় তর্করত্ন বলেন,—"উচিত অন্যায় বোধ এখন আমার লোপ হয়েচে, তোমরা পাঁচজনে যা বলবে তাই আমার উচিত। আমি আর যেঞ্জালত সহ্য কত্তে্য পারি না।" চাটুর্যা বলেন যে পশ্চিম বিক্রমপুরে অনেকে প্রায়শ্চিত্ত করছে। তর্করত্নও বলেন, ঈশ্বরী পাড়ার বাবুরা টিপরা ছেড়ে দিয়েছেন। মহাপাশার মুখুয্যেদের কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। শাভ্র গ্রামের বিদ্যাবাগীশ—যিনি লক্ষ্মীনগরের বাবুদের ইষ্ট দেবতা—তিনি দুইবার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। বাবুদের বাড়ীতে বসে প্রায়শ্চিত্ত করে গ্রামের লোকেরা নাকি বলেছিলা, তাদের সামনে আর একবার প্রায়শ্চিত্ত না করলে তাঁকে তারা

সমাজে নেবে না। শ্রীকুল খুব টাকা ঢাল্ছে। কিন্তু টাকাতে কিছু হয় না। "টাকায় হলে এতদিনে হয়ে যেতো, কারণ মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এই ঘটনার আদি, তিনি মহারাজার সংসার হতে এই উপলক্ষে কম টাকা আনিয়া, নন্থ, যগু, রাম, শ্যাম, নিধ, বিধিকে বিতরণ করেন নাই। কিন্তু তাথে আটা-আটী আরো বৃদ্ধি হয়েছে। মহাদেব বন্দোপাধ্যায় নিতান্ত অর্ব্বাচীন, অসামাজিক এবং স্বার্থপর লোক। তার মূর্খতাতেই এই হুলুস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে, নচেৎ মহারাজার জল অনায়াসে বিক্রমপুরে চলন হইত। কাণ্ডাকাণ্ড-বিহীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থ'চিত্ত আসা ও অর্থস্পৃহাই এতাদৃশ অনর্থের মূল।"

অবশেষে তর্করত্ন প্রায়শ্চিত্ত করলেন। "তাও যে সে প্রাচিত্ত নয় চক্ষের ভুরু পর্যান্ত ফেলিয়া দিয়াছেন একে তো চেহারাখানা সংক্রান্ত পুরুষের মত, তাথে আবার সমস্ত অঙ্গ ক্ষৌরী হওয়ায় এক চমৎকার রূপ হইয়াছে।"

গঙ্গাচরণ শর্মা ঘটক। সে বলে,—"ঘটকের অবলম্বন মিশ্রিগ্রন্থ, আমি তাথে অষ্টবস্তা, সাধারণ বর্ণ জ্ঞানে পারাপ্ত অথৈবচঃ তবে কিনা— অপধৌতিক চিকিৎসায় আমার সহিত কেহ আটে না। আগডতলা মহারাজের বাড়ীতে বসিয়া তর্করত্ন দর্প করিয়াছিলেন যে—'যেমন মহাতপা ভগীরথ সগরবংশ উদ্ধার জন্য সুরধনীকে মর্ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন আমিও তদ্রূপ মহারাজার জল লইয়া বিক্রমপুরে চলিলাম।' আমি জিজ্ঞেস করি—আজ, সেই অভিমান, সেই সগর্ব্ববচন, বিক্রমপুরের একাধিপত্য কোথায় রহিল!"

এদিকে প্রায়শ্চিত্ত করে তর্করত্ন মশায় মহাদেব বাড়ুয্যে—যিনি সবকিছু নষ্টের গোড়া—তাঁকে উদ্দেশ করে গালাগালি করেন। তিনি ভেবেছিলেন, টাকার লোভে বিক্রমপুর বশীভূত হবে। "কিন্তু বিক্রমপুর সে স্থান নয়। সামাজিকতার উগ্র শোণিত ধোপা নাপিতের শরীরে পর্য্যন্ত বিরাজমান আছে। টাকার শ্রাদ্ধ কম হয় নাই—কিন্তু তাথে কি হবে। মহাদেব বাড়ুয্যাকে ফাঁকি দিয়া এই টিপরার টাকা না খেয়েছে বিক্রমপুরে এমন লোক অতি অল্প। কিন্তু এই অর্থেই অনর্থ ঘটিয়েছে। মহাদেব বাঁড়ুয্যা নিতান্ত মূর্খ। তার মহাপাপে আমাকে দগ্ধ হইতে হইল!" ঘটকের সঙ্গে দেখা হলে তর্করত্ন দুঃখ করে বলেন, ঈশ্বরপাড়ার বাবুরা এখন টিপরা সংস্রব নেই বলেই অব্যাহতি পেয়েছেন। আগডতলায় যাবো না বলেই দুর্গাপদ তর্কালঙ্কার মুক্তি পেলেন। প্রায়শ্চিত্ত করে এসেছি বলে মহাপাশার মুখুয্যেমশায় গ্রামে ঢুকলে গ্রামের লোকরা মেনে নিলো। কিন্তু তার বেলা অগ্রদানীকে দান করতে

হলো, মাথা নেড়া করতে হলো ! জিদ করে এতোদিন থাকা তাঁর ভালো হয় নি। "ঐযে কথায় বলে,—হবি বিনা জাত, বিনা তৈলেন মাধব, কদন্নে পুণ্ডরীকাক্ষ প্রহারেণ ধনঞ্জয়,—আমার তাই হযেছে।"

ত্রিপুরা রাজবংশ ঘটিত আন্দোলন নিয়ে লেখা আরও কতকগুলো প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়। নীচে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো।—

ত্রিপুরা শৈল নাটক (১৮৮২ খৃঃ)—শরচ্চন্দ্র গুপ্ত ॥ নাটকটি প্রসঙ্গে সমসাময়িককালের Calcutta Gazette লিখ্ছেন,—"The work is written with the view of exposing some Brahmins of East Bengal who were lately induced by large presents of money to dine at the palace of the Maharjah of Tipperah, who is considered by everybody in that part of the conutry to be outside the pale of Hinduism. A keen controversy is now going on this subject in Eastern Bengal."

গোবর্ধন (১৮৮৩ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত ॥ Calcutta Gazette পত্রিকার সমসাময়িককালের সংস্করণে এই প্রহসনটি সম্বন্ধেও মন্তব্য আছে। প্রহসনটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"The work is directed against the Rajah of Hill Tipperah, being written in connection with the caste question, which has thrown the Hindu Community of Dacca, Vikrampur, and other places into a ferment, and devided it into two bitterly hostile parties."

বিভিন্ন প্রহসনে ব্যক্তি, স্থান, সংস্থা ইত্যাদির নাম ছদ্মরূপ গ্রহণ করলেও প্রকৃত নাম উদ্‌ঘাটন যে কোনো উৎসুক পাঠকের পক্ষে অসাধ্য নয়। সেইজন্য গ্রন্থকার সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই উৎঘাটিত করেন নি।

ত্রিপুরার রাজবংশঘটিত আন্দোলন নিয়ে লেখা অন্য কোনো মুদ্রিত প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত আন্দোলন নিয়ে অন্য কোনো প্রহসন লেখা হয় নি।

(খ) উপবীত গ্রহণ আন্দোলন ॥—

প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, উচ্চবর্ণের বাহ্য আচার পালনের মধ্যে দিয়ে কৌলীন্য অর্জনের পথ সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় সম্প্রদায়ের অনেক খুঁজে

পেয়েছেন। যুগী সম্প্রদায়ের উপবীত গ্রহণ আন্দোলন বিভিন্ন উপবীত গ্রহণ আন্দোলনের অন্যতম যুগীদের জাত নিয়ে সমাজে মতভেদ আছে। অনেকের মতে, এঁরা ভিন্ন ধর্মীয় ছিলেন, পরে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হয়েছেন। অনেকের মতে এঁরাই "যুঙ্গী" নামে লুপ্ত একটি নামের ইঙ্গিত বহন করে থাকেন। পাঁত-সৃষ্টির মূলে যে কারণগুলো দেখানো হয়েছে, তার একাধিক কারণই যুগীসমাজের পাতিত্যের কারণ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপবীত গ্রহণ সম্পর্কে সমসাময়িক-কালের সংবাদপত্রে বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়েছে। যুগীদের উপবীত গ্রহণ আন্দোলনের কিছু পরে সুবর্ণবণিকদেরও অনুরূপ একটি আন্দোলন চলে। সে সম্পর্কে অনুসন্ধান পত্রিকায়[৮] মন্তব্য করা হয়,—"বড় আশঙ্কা হয়—আমাদের হিন্দুসমাজে যেন এই ধ্বংসের স্রোত আজিকালি বড় খরবেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেবস্থালীতে মদিরা বিতরণের ন্যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমাদের প্রাচীন হিন্দু সমাজকে চূর্ণীকৃত করিবার প্রয়াসে প্রতিনিয়ত ঢুঁস মারিতেছে। সম্প্রতি এইরূপ আর একটি ধাক্কা আমাদের সমাজ দেয়ালের পুরান গায়ে লাগিয়াছে। এই ঢুঁসটী—সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় প্রদত্ত,—সেই যুগীদল দত্ত ঢুঁসের সমজাতীয় ভায়রা ভাই বিশেষ। এবারেও সেই পৈতা-সঙ্কটের ঢুঁস।" পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য থেকেই উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ যে সমাজের রক্ষণশীল উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণের স্বরূপ কি।

যুগীদের উপবীত আন্দোলন নিয়ে লেখা একটি প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রহসনটির পরিচয় উপস্থাপন করা হলো।—

যুগীর পৈতে রঙ্গ (১৮৮৭ খৃঃ)—শ্রীনাথ লাহা ॥ Calcutta Gazette-এর পরিচয়ে বলেছেন,—"The recent assumption of the holy thread by jogis, a caste always regarded as outside the caste organization of the Hindus, is viewed with disapprobation by almost all classes of men in Bengal." এ ছাড়া প্রহসনটির আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপবীত আন্দোলনকে বিদ্রূপ করে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রহসনকারের লেখা পুস্তিকা প্রকাশের সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু উপস্থাপনের উপযোগী প্রকাশিত পুস্তিকা উনবিংশ শতাব্দীতে আর পাওয়া যায় নি।

৮। অনুসন্ধান—১৭ই আষাঢ়, ১৩০৪।

(গ) জাতপাঁত সম্পর্কিত বিবিধ ॥—

একাকার (১৮৯৫ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু ॥ নব্য অর্থনীতি প্রভাবে সংঘটিত বৃত্তিবিপর্যয়কে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পেয়েছে। জাতিভেদ প্রথার ওপর লেখকের আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় রাধানাথের উক্তিতে। শিক্ষিত রাধানাথের মুখ দিয়ে লেখক জাতিভেদ প্রথার পক্ষে দীর্ঘ যুক্তি টেনেছেন।—"কাজ ভাগাভাগি করে নিতেই হবে, শরীর খাটাতেই হবে, তবে আজ বা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘণ্টা নাড়, আবার তোমার ছেলে কাল জুতো সেলাই কত্তে বসুক. আমার ছেলে বিহারীলাল কর্ম্মকার নাম বদলে বিহারানন্দ স্বামী হযে গেরুয়া পরে ধর্ম্মপ্রচার কত্তে বেরিয়ে যান, এই রকম পোড়া ধরা খিচুড়ি চল্‌তে থাকবে। কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত ভারী পাকা, ভারী কায়েমি। এই জাতিভেদই সাম্য। সাম্য মানে তোমারও ঘটী আছে. আমারও ঘটী আছে নয়, তোমার না হয় ঘটী আছে, আমার না হয় বাটি আছে। যেমন পরকালে তরবার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে জোড়হাত করে দাঁড়াতে হবে, তেমনি ব্রাহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা-নিবারণের জন্য তাঁতির দ্বারস্থ হতেই হবে, প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, জোর আছে।···এটি বেশ মনে রেখ, মেয়েদের গোঁফ বেরুলেই আর পুরুষেরা ঘোমটা দিলেই সাম্য হয না।"

কাহিনী।—হঠাৎ গোলমাল শুনে গন্ধর্বলোকের রাজা চমকে ওঠেন। রানী ভাবেন, দৈত্যেরা বুঝি গন্ধর্বলোক আক্রমণ করবার জন্যে মেতেছে। দূত এসে তাঁদের খবর দেয়—ধরায় সব একাকার—উঁচু নীচু ভেদ নেই। পশু পক্ষীরাও মানুষের সম্মান চায়। পৃথিবীর কাণ্ডকারখানা দেখবার জন্যে গন্ধর্ব-রাজ রানীকে নিয়ে পৃথিবীর দিকে পা বাড়ান।

সাহেবের অনুগ্রহে ছোটোজাতরা এখন হয়েছে বড়ো, তারাই এখন বামুন কায়েতদের ছোট্‌জাত বলে গাল দেয়। ছোটোজাতরা এখন বড়ো চাকুরে, সমাজে তাদের কৌলীন্য। বামুন কায়েতরা তাদের মুখাপেক্ষী। কলু বংশের 'মধো' এখন মধুবাবু—অফিসের বড়বাবু। প্রেমচাঁদ চক্কোত্তি ও বেচারাম ঘোষকে মধুবাবুর বাড়ীতে দৈনিক একবার গিযে খোসামোদ না করলে চাকরী থাকে না। মধুবাবুর ভাষায়,—"যে স্থলে চাকরী কত্তে হয, সে স্থলে দুবার আসা যাওয়া রাখতে হয়।" বেচারাম ও প্রেমচাঁদ এ কয়দিন মধুবাবুর বাড়ীতে

হাজরে দিতে পারে নি বলে সাহেবকে বলে এস্‌টাব্লিসমেণ্ট কমাবার জন্যে রিডাক্‌সন লিস্ট করে এদের দুজনকে বাদ দিয়েছে। এতে মধুবাবু সাহেবের নজরে পড়বে, প্রতিশোধও নেওয়া হবে। প্রেমচাঁদ ও বেচারাম তখন মধু-বাবুকে অনুরোধ উপরোধ করে—শুধু পা ধরতে বাকী রাখে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। মধুবাবুর রাগের আসল কারণ জানা যায়। কলু মধুবাবুর বাড়ীতে কতো বামুন কায়েত এসে খেয়ে যায়। কিন্তু বেচারাম এ বাড়ীতে খেতে চায় না। মধুবাবুর চাকর সোনা বলে,—"কেন, কলু অমন্দ জাতটা কি ?" উমাচরণ মিত্রের মা মারা গেছেন। সাহেব ছুটী দিতে চায় না, বলে একটা ছুটীটুটী দেখে শ্রাদ্ধ সারলেই চল্‌বে। মধুবাবুও সাহেবকে বলে, পুজোর ছুটীর সময় উমাচরণ শ্রাদ্ধ সারতে পারে। এ ব্যাপারে উমাচরণ মধুর বাড়ীতে এসে অনুযোগ করলে মধুবাবু বলে,—"আমি ত ভাই তোমাদের মতন ইয়ং বেঙ্গল নই যে, সাহেবের সঙ্গে তোমাদের এতন কথা কাটাকাটি করবো, তা যদি কত্তুম, তাহলে আজ যে আমার অবস্থা দেখ্‌ছো, তা কখনই হত না।" ছুটী নেবার অনৌচিত্য দেখাতে গিয়ে মধুবাবু বলে, তার যে ছোটো শালাকে তিনি অফিসে ঢুকিয়েছেন, তার বৌয়ের 'সাধ'। মধুবাবুর স্ত্রীকেও যেতে হবে। সুতরাং ছোটো শালা এবং মধুবাবু দুজনকেই অফিসে কিছুদিনের জন্যে ছুটী নিতে হবে। ছোটো শালার আবার দুজন বন্ধুও অফিসে চাকরী করছে—তারা দুজনও যাবে। তাই এই চারজনের অনুপস্থিতির মধ্যে উমাচরণকে অতি সামান্য ব্যাপারে ছুটী দেওয়া চল্‌তেই পারে না।

মধুবাবু পুকুর প্রতিষ্ঠা করে বামুন কায়েতদের খাইয়েছেন। ঈশান বাঁড়ুজ্যে তার তেলের কলের তেল কলুবংশীয় মধুবাবুর বাড়ীতে সাপ্লাই দিয়েছে। মধু-বাবুর মা ভালো তেল চেনেন। তিনি নাকি বলেছেন, বাজে তেল আনা হয়েছে। সোনা বলে,—"বাবু যেন সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে। মার মাথায় ঘানি আছে ;...মার বাবাও এখনও গাছ চালায়।" মধুবাবু তাড়াতাড়ি সোনার মুখ বন্ধ করে। উমাচরণের সামনেই ঈশান বাঁড়ুজ্যের সরকার বিল নিয়ে এসে-ছিলো। উমাচরণ ভাবে, "চমৎকার দৃশ্য ! কলুবাড়ী বামুন তেলের দামের জন্য হাজির, কলুর গোলাম তার জিনিসের দোষ ধচ্ছে, দাম কাটছে।"

এহেন মধুবাবুকেও তোষামোদ করতে হয়—সাহেবের চাপরাশি বাবুজান আর নিজের কলুবৌকে। সাহেবের মেজাজের খবর বাবুজানই রাখে। সাহেবের বেসরীফ মেজাজের খবর দিয়ে সে মধুবাবুকে ওঠাতে বসাতে পারে।

আর কলুবৌ! তার জিভের কাছে মধু দাঁড়াতে পারে না। কলুবৌ সেদিন আগুন! "গলায় দড়ী, গলায় দড়ী, মুখে আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন আপিসের, মুখে আগুন তোমার সাহেবের, মুখে আগুন অমন ট্যাকায়।" পাঁচজন অফিসের কেরানী নিয়ে মধুবাবু বাইরে বসে আছে। এমন সময় কলুবৌ এভাবে অকথা কথা বলতে বলতে বাইরে আসে। বড়বাবুর স্ত্রী হয়ে তার বাইরে আসা অনুচিত। মধুবাবু এটা মনে করিয়ে দিলে কলুবৌ বলে,—"বাইরে—তা কিসের লজ্জা, কাকে লজ্জা, ছোট লোকের—ইস্তিক জেতের আর কি লজ্জা কি? এক জাত নিয়ে যেথায় সেথায় অপমান! ঘাটে পথে লাঞ্ছনা!" কলুবৌ মধুবাবুকে বলে,—"এর একটা বিহিত কর, হয় জেতে ওঠ, নয় যেমন কলু, তেমনি কলুর মত থাক, দাও আমায় ঝুড়ি করে গোবর আনিয়ে দাও, আমি রাস্তায় গিয়ে ঘুঁটে দিচ্ছি। তোমার ঐ চাপকান পাকড়ি চুলোয় দাও, দিয়ে ঘানি কেন, পুজোর দালানে গাছঘর কর।" সোনা কেরানীদের সামনেই মন্তব্য করে,—"শুন্‌ছো গো বাবুরা, মাকে রাগান অমনি নয়, ঐ অত বড় যে বড়বাবু, যাকে আপনারা শুদ্ধ ভয় কর তাকেই একদিন কাঠের চেলার বাড়ী ধপাধপ্ পিটে দিলে।"

গঙ্গার ঘাটে কায়েত-গিন্নি বামুন-গিন্নি সুখ দুঃখের কথা বলে। বামুন-গিন্নির ছেলে অনেক কষ্টে মানুষ হয়ে কোনোরকমে দুটো পাশ দিয়ে আজ দুবছর যাবৎ বেকার। বামুন-গিন্নির বাপেরবাড়ীর নাপ্তেনীর ছেলে এখন জজ হয়েছে। গাজির গাঁয়ে নতুন বাড়ী করেছে। সেখানে বামুন গিন্নি গিয়েছিলো ছেলের যাতে কিছু হয়। বাইরে থেকে "নাপ্তেবৌ" ডাকতেই দুটো ঝি এসে শুধু মারতেই বাকী রাখলো। নাপ্তেনীর বেটার বৌ—গা ভরা গয়না—সে তো হেসেই খুন। হিষ্টিরিয়ার ধাত। ফিটই হয়ে গেলো। ফিট্ ভাঙাতে ঝিদের কতো রকম চেষ্টা। নাপ্তেবৌ তো চিনতেই চায় না। শেষে বললো, কাজের এখন সুবিধে নেই, তবে ছেলেটি যদি সেখানে থেকে কাগজপত্র নকল করে, বাচ্চা দুটিকে পড়ায় এবং বাসায় রাঁধে, তাহলে পনেরো টাকা করে পেতে পারে। কায়েত গিন্নি বলি-মাহাত্ম্যের কথা বলে। বামুন গিন্নি কায়েত-গিন্নির কথাবার্তা চলছে, এমন সময় বিশুর মাকে সঙ্গে নিয়ে কলুবৌ স্নান করতে আসে। পথের কাঁকরে কলুবৌয়ের পা জলে যায়। বিশুর মা বলে, বাবুর এতো বেয়ারা বসে বসে মাইনে খায়, বললেই তো গাড়ী থেকে চেয়ারে চড়িয়ে গঙ্গায় চান করিয়ে আনবে। কিংবা বাবুকে বলে ব্যবস্থা

করা যায়,—গাড়ীর কোল থেকে ঘাটের শেষ সিঁড়ি পর্যন্ত বনাত-টনাত পেতে দেওয়া যেতে পারে। "তা তোমার নিজের শরীরের ওপর একটু যত্ন নেই, অমন তুলোর মতন পা, চলে যেতে পদ্ম ফোটে, ধুলো কাঁকর মাড়িয়ে চল্লে ও পা আর ক'দিন থাকবে?" কলুবৌ রাবড়ি খেয়েছে, ঢেকুর তোলে। কায়েত-গিন্নি মন্তব্য করে,—'বাছার আমার শুটকি মাছ দিয়ে চিচিঙ্গে খাবার ধাত, জোর করে রাবড়ি মালাই খাওয়ালে সইবে কেন?" কায়েত-গিন্নি তার সঙ্গে একটু রসিকতা করতে গেলে চটে গিয়ে কলুবৌ বলে ওঠে,—'আ মর মাগী, কোথাকার ছোটলোক গা?"

হাওয়া খাওয়ার পোষাক পরে ধোপাবৌ রাখালের মাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে আসে। সে মুন্সেফের বৌ। ধোপাবৌ বলে,—"বাবু বলেন যে, রজকেরা আদত রুসিয়ান, সেখানকার কোজ্যাক না—কি, তাই রুসিয়ানের রুজ আর কোজ্যাকের জ্যাকটা নিয়ে কি একটা র‍্যাজাক করে নিয়েছে।" রাখালের মা তোষামোদ করে বলে,—'রজক বড় সৎজাত। সিঙ্গেপুর না কি, সেখানে রজকের মান্যি বামুনের চেয়ে বেশী।" কলুবৌকে দেখেও ধোপাবৌ যেন চিনতে চায় না। অথচ কলুবৌয়ের সঙ্গে ধোপাবৌয়ের "আতর" পাতান ছিলো। কলুবৌ সেটা মনে করিয়ে দিলে ধোপাবৌ বলে, এটা তার পক্ষে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক, কেননা সে এখন আতরের বদলে ল্যাভেণ্ডার অডিকোলন মাখে। ধোপাবৌ নিজের শিক্ষার গর্ব করে। বলে, —"শুনেছি, মুন্সেফি করে করে বাবুদের বুদ্ধির গতর বাড়ে, তারপর সবজজ হলে এমনি হয় যে, তখন পরিবারকে সব পরামর্শ দিয়ে রায় লিখে দিতে হয়, আমাদের একটু পড়াশুনা না করলে চলবে কেন?' এমন কি ধোপাবৌ বেফাঁস বলে চলে,—'আমাদের বাবু যাকে খুনী, তাকে জেল দেয়, এর ধন তাকে দেয় জেলার জজ সাহেবেরা শুনেছ, এই গুণে আমাদের বাবুকে বেশী ভালবাসে।" বাবুর সব বিচারেই আপীল, অতএব সব রায়ই জেলার জজ কাটেন। যাহোক জেলার জজকে কোম্পানী রেখেছে, বসিয়ে তো রাখতে পারে না—তাই। নইলে বাবুই বড় হাকিম। ধোপাবৌয়ের কলকাতার গরম সহ্য হচ্ছে না, দার্জিলিং যাবে। শরীরটাও ভালো নয়। বাচ্চাটাকে নিজের দুধ না দিয়ে গাধার দুধ খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছে। কায়েত-গিন্নি হেসে ভাবে, গাধার দুধ—এও জাত মহিমা। কলুবৌকে চটাবার জন্যে ধোপাবৌ 'কুন্তলীন' সম্বন্ধে মতামত চায়। কলুবৌ বলে, তার সাহেব বাড়ী থেকে আনা

বিছানাপত্তর এক ধোপাকে দিয়ে কাচতে গিয়ে খারাপ করে ফেলেছে। খস্‌খসে বিছানায় ঘুম হয় না। ধোপাবৌ যদি তার বাড়ী গিয়ে একবার ভালো করে কেচে দেয়,—অবশ্য সাবানটাবান কলুবৌ-ই দেবে। ধোপাবৌ বলে, কলুবাড়ীর কাপড়চোপড় তেলচিটে। কলুবৌ বলে—ধোপাবৌ তো সব রকম ময়লাই ওঠাতে পারে। বিশেষ করে তার বাবা নাকি মরবার সময় ধোপাবৌকে সব মশলা বলে দিয়ে গেছে। ধোপাবৌ তখন বলে ওঠে—"ওমা আমি কচ্ছি কি? এখনই যদি এখান দিয়ে বাবুর কোন চাপরাসী যায়, তাহলে তো দেখ্‌তে পাবে যে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেরানীর মাগের সঙ্গে কথা কচ্ছি তাহলে কি হবে?" কলুবৌও পাল্টা বলে,—সে ভুলেই গেছিলো যে—আজ তাদের বাড়ী কতকগুলো বামুন কায়েতের পোলাও খাবার নেমন্তন্ন আছে। "তোমার মুখ দেখে গেলে ভাই তো পোলোর হাঁড়ি কিছুতেই টিকবে না।" ধোপার মুখ দেখ্‌তে নেই! কলুবৌ চলে গেলে ধোপাবৌ ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলে যায়, কিছু জবাব মুখে আসে না।

মধুবাবুর আপিসের সম্মুখের দরজার সামনে কয়েকজন কেরানী ধর্ণা দেয়। দশটা বেজে দশ মিনিটে জমাদার দরজা বন্ধ করেছে। এরা সব লেট-কামার। জমাদারকে এরা তখন সবাই খোসামোদ করে। মুখার্জিকে জমাদার বলে,—"আজ ঘর যাও বাবা, কেয়া করে গা, দু রোজ কা তলপ যা গা, কোষ্ট হোয়, হামাকে বলিও, হামি তোমাকে দুটো রোপেয়া করজ দেবে, সামনে মাসে কেসিয়ার বাবুকে বোল্‌ দিও, নও সিকা হামকো দে দেয়।" এমনভাবে সব কেরানীকেই সে নানান কথা বলে নিরাশ করে। ফ্রাঙ্কি সাহেব কড়া। জমাদারের ইজ্জৎ রাখ্‌তে জানে না, জমাদার তাই ঝুঁকি নিতে চায় না। কেউ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, কেউ পূজা আর্চা করে, এভাবে আসতে দেরী হয়ে যায়। উমাচরণের আবার আফিমের নেশা। ঘুম ভাঙতে নটা বাজে। "আমার দেখ, কেদারায় যেমন চাদর বাঁধা থাকে, তেমনি ঠিক আছে। এই করে বার বছর কাটালেম, এখন শেষাশেষি কি চাল বদলান যায়।" নতুন এম্‌. এ. পাশ দিয়ে যাদব মেজাজের সঙ্গে দরজা খুল্‌তে বলে—অ্যাপ্লিকেশান হাতে নিয়ে। জমাদার আপত্তি করে। ইতিমধ্যে টমাস সাহেব আসে তখন সাড়ে দশ! জমাদার বলে,—"আপকা বি হুজুর আজ লেট হো গিয়া।" টমাস বলে,—"হাঁ মেমসাব হাসপাতাল মে হ্যায়, উনকো খবর লেকে আতা।" বাবুদের উদ্দেশ করে টমাস বলে,—"Babus, you can go home to-day.

আর দাঁড়িয়ে কি করবে বাবা? আজ ঘরে গিয়ে তাসটি খেলিয়ে লেও; তোমাদের বাঙ্গালীর বাবা ঐ দোষটা আছে, punctuality রাখ্‌তে পার না, time এর ভ্যালুটি বোঝ না!" যাদব টমাসকে তার নিজের ইচ্ছে জানায়; এমনভাবে কথাবার্তা বলে যেন পাশ দিয়ে এসে গবর্ণমেণ্টকে অনুগ্রহ করবার জন্যেই দরখাস্ত নিয়ে এসেছে। যাদব Congress man কিনা জিজ্ঞেস করলে, সে জবাব দেয়,—"I don't think I am bound to answer that question here Sir." টমাস তখন বলে ওঠে,—"Oh! you have a long tongue I see!" দরজা ভালো করে বন্ধ করতে আদেশ দিয়ে টমাস ভেতরে চলে যায়। যাদব ভাবে, কালই সে এসব অত্যাচার নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখ্‌বে। মেমসাহেবের ফরমাস আর সাহেবের হুকুম তামিল করে বাবুজান ভেতরে ঢোকে যথেষ্ট লেটে। বিনোদকৃষ্ণ নন্দন জাত ব্যবসা ছেড়ে কেরানীগিরি করবার জন্যে কানাইবাবুর সুপারিশ নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু ভেতরে চিঠিটা দেবারই সুযোগ পায় না। বাবুজান বড় সাহেবের চাপরাসী। "চাপরাসী" বলে সম্বোধন করে তার হাতে বিনোদ চিঠিটা দিতে গেলে বাবুজান বলে ওঠে,—"ভদ্দর লোকের সঙ্গে কথা কইতে জান না!"

এমন সময় বড়বাবু অর্থাৎ মধুবাবু আসে। কেরানীরা সবাই তাকে তোষামোদ করে, হাতে পায়ে ধরে; কিন্তু মধুবাবু কাষ্ঠহাসি হেসে বলে,—"আমি কি করবো, সাহেবের কড়া হুকুম জান তো আর সাহেবেরই বা দোষ কি, তোমরা আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি করে তুলেছ, হামেশা লেট!" পীতাম্বর মুখুজ্যে, প্রায় লেট হয়—পুজো আর্চা শেষ করে অফিসে আসতে গিয়ে। মধুবাবু বলে,—"বলি ঠাকুর, পরের চাকরী কত্তে গেলে এত বামনাই পোষায় না, পুজো আহ্নিক-ফাহ্নিকগুলো রবিবারে কল্লেই হয়। আর নিজে রেঁধে খাওয়া বল্লে বুঝি—ওটা বাপু ভিট্‌কিলিমি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! পুজোফুজো ভট্‌চায্যি-গিরি এখন শিকেয় তুলে রাখ, পেন্সেন হলে তখন যা হয় করবে।" পীতাম্বর অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে,—"যে কলুকে আমার পিতৃপুরুষেরা ঘৃণায় পাদোক জল দিতেন না, সেই কলু আমায় ধমকে পুজা আহ্নিক বন্ধ করতে বলে!" চাকরী করবে না বলে পীতাম্বর চলে যায়। মধুবাবু মন্তব্য করে, "ছোট লোকদের বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে!" বাবুজান বারান্দা থেকে বাইরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, বাইরের গোলমালে সাহেব বিরক্ত হচ্ছেন, এবার তিনি চাবুক খুঁজছেন। একথা শুনে কেরানীরা একে এক সরে পড়ে।

পুলিশ কোর্টে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট দুজন এবং ইণ্টারপ্রেটার আছেন। কেনারাম উকীলও আসে। হাকিমীর অনুরোধ পেয়ে মধুবাবু ঘরে এসে ঢোকে। কনষ্টেবল "কাঁহা যাও, হিঁয়া হিঁযা বলে টানাটানি করে মধুকে কাঠগড়ায় ঢোকায়। মধুবাবু বলে,—সে হাকিম। কনষ্টেবল ক্ষমা চায়। সে বলে—তার দোষ নেই। "এক রোজ এক বাবুকো দেখ্‌তা আসামী হোকে খাড়া হায়, দোসরা রোজ ওহি হাকিম বন যাতা।" সাহেব মধুকে Colleague বলে কাছে এনে বসায়। নবাব সাহেবও অভ্যর্থনা করেন। সাহেবের পাশে একত্র বসা কাজটা বেয়াদবি—মধুবাবু এটা জানালে, সাহেব হেসে কাছে টেনে বসায়। মামলা চলে, এদিকে মধুবাবু ঘুমিয়ে পড়ে। মাতাল গোকুলের মামলায় সই করবার জন্যে মধুবাবুকে সাহেব ডাকতে গেলে গোকুল কাঠগড়া থেকে বলে ওঠে,—"হুজুর, বৃদ্ধ মানুষ ঘুমুচ্ছেন, ওঁকে আর কষ্ট দেবেন না, আপনি নামটা লিখে দিন, উনি জেগে উঠে কলম ছুঁয়ে দেবেন।"

নীলকমল তরফদার খারাপ সরষের তেল বিক্রী করবার জন্যে অভিযুক্ত হয়েছে। "টেক্সবাবু" বলেন, হেল্‌থ্‌ অফিসারের রিপোর্টে প্রকাশ, তেলের দোষেই সহরের স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। নীলকমল বলে,—"রাস্তার ধুলো, নর্দ্দমার গন্ধ, নটা বাজতে না বাজতেই কলের জল বন্ধ, কলে সাপ, বেলা দশটা পর্য্যন্ত রাস্তায় মেথরের ভিড়, গ্যাস মিট্‌মিট্‌, এইসব আমার তেলের দোষে হচ্ছে?" নীলকমল আরো বলে,—"হাগা বাবু আমার তেলে এইসব খারাপ হচ্ছে, তুমি দেখেছ?" সঙ্গে সঙ্গে আসামী পক্ষের উকীল তেড়েমেরে ইন্‌স্‌পেক্টরকে বলে,—"Yes, did you saw? did you saw? did you saw?" নীলকমল বলে,—সোরগোজা না মেশালে সরষে ভালো ভাঙা হয় না, যারা কলু তারা এটা জানে। হঠাৎ নীলকমল দেখে, তারই জামাই মধোকলু হাকিমের আসনে। তাকে সে বলে,—"বলতো বাবা, সোরগোজায় কিছু কোন শরীরের অমন্দ করে? কেরাণী হও আর দারোগাই হও, হাজার হোক কলুর ছেলে তো বটে বাবা, তোমার অছাপা তো আর কিছু নেই, মুটো মুটো নাইসেন্‌ দেয়, একটি সোরগোজা না চালিয়ে দিলে চল্‌বে কেন?" সবার কাছে নীলকমল নিজেকে মধুবাবুর শ্বশুর বলে পরিচয় দেয়। তার মেয়ে কেঙ্‌লীর সঙ্গে সে মধুর বিয়ে দিয়েছে। কেঙ্‌লী ভারি পয়মন্ত, সে পেটে থাক্‌তে ছখানা ঘানিগাছ বাড়ে। পাঁচ বছরেই কেঙ্‌লী ভালো ঘুঁটে দিতে পারতো। মধুবাবুর চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। নবাব অস্বস্তি প্রকাশ করেন।

তাঁর আভিজাত্যে বাধে। তিনি কলুর সঙ্গে এতোক্ষণ একত্র বসে ছিলেন! সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে গেলেন। সাহেবও চলে গেলেন। এবার মধুবাবু নীলকমলকে ছোটলোক বলে গালাগালি করে। নীলকমলও তখন চটে যায়, সে বলে,—"ভুলে গেছ ব্যাটা, আমি যে জেতের মোড়ল, আমি মনে কল্লে তোকে একঘরে কত্তে পারি।" তাছাড়া মধু যতোই নবাবী করুক তার বাড়ী নীলকমলের কাছে এখনো বাঁধা আছে। মধু বলে,—একঘরে করবার তার ক্ষমতা নেই। সে "বেহ্মজ্ঞানী" হবে। "এখনই নীচের কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট্ করে যাচ্ছি যে, আমার সাধুখাঁ পদবী বদলে আজ থেকে বেহ্মানন্দ পদবী নিলুম। আর সাহেবের হাতে পায়ে ধরে সার্ভিস বয়ে আর গ্রেডেশন লিষ্টে সাধুখাঁ কাটিয়ে বেহ্মানন্দ করে নেব, আজ থেকে মধুসূদন সাধুখাঁ নয়, মধুসূদন বেহ্মানন্দ।"

গন্ধর্বলোকের সবাই পৃথিবীর এসব কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি রাখবার জায়গা খুঁজে পায় না।

ঘোঁটমঙ্গল বা খোঁটাঘরের মোটা মেয়ে (কলিকাতা—১৮৭৭ খৃঃ)—রামনধি কুমার॥ বৈকল্পিক নাম দুটোর মধ্যে লেখকের দৃষ্টিকোণ অস্বচ্ছ। তবে প্রথমটির মধ্যে জাতপাত সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে।

কাহিনী।--অঘোরকালী তার মেয়ের বিয়ের কথা ভাবে। মেয়েটি বড় হয়েছে। তার ওপর এমন একটা দোষ আছে যে, কেউ জানতে পারলে মেয়েটির আর বিয়ে হবে না। এমন সময় ঘটকী সবজয়া এক সম্বন্ধ নিয়ে এলো। যশোবন্ত সিংয়ের পুত্রের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভালো ঘর। অতএব অঘোরকালী যেন তার ঘটকালীটা ভালোভাবে মিটিয়ে দেয়। অঘোরকালী প্রতিশ্রুতি দেয়।

সবজয়া যশোবন্ত সিংয়ের বাড়ী গিয়ে তার কাছে মেয়েটির সম্বন্ধের কথা বলে। যশোবন্ত সিংয়ের কোনো জাত নেই। সে তার স্ত্রীকে বলে, সমাজে থাকতে হলে একটা জাত না থাকলে চলে না। ভরসা পেয়েছে এই বিয়েতে টাকা খরচ করলে সে জাতে উঠ্‌তে পারবে। মোড়ল এজন্যে হাজার চারেক টাকা নেবে। যশোবন্তের শাশুড়ী অর্থাৎ স্ত্রী বিলাসিনীর মা দয়ালমণি ভাবে, এমন দরাজ লোকের হাতে সে তার মেয়ে দিয়েছে! বিলাসিনীকে সে উপদেশ দেয়, যেন সে তার আখের গুছিয়ে নেয়।

ভক্তরাম মোড়ল জাতে নাপিত। সে যশোবন্তকে জানায়, মোট দশ হাজার টাকা না হলে তারা এ ব্যাপারে মোটেই রাজী হতে পারে না। তার অনুগৃহীত প্রতিবেশী শিশুপাল, এবং ঘটক অগ্নিশর্মা সেখানে উপস্থিত ছিলো। যশোবন্ত অনেকক্ষণ দরাদরি করেও দশ হাজারের নীচে নামতে পারে না। শেষে দশ হাজার টাকাতেই বাধ্য হয়ে রাজী হয়। যশোবন্ত চলে গেলে ঘটক অগ্নিশর্মা মোড়লের কাছে টাকার বখ্রার বন্দোবস্ত করে ফেলে।

শিশুপাল ভক্তরামকে বলেছিলো, এ বিয়েতে কেউ আস্‌বে না। অল্প কয়েকজন যারা এসেছিলো, তাদের দেখিয়ে ভক্তরাম শিশুপালকে বলে, এই তো সকলেই এসেছে। ভক্তরামের কুটুম বীরভদ্র, কবিরাজ সোনার চাঁদ, কবিরাজের বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র, শিশুপাল এবং আর কয়েকজন মাত্র এসেছে। এরা সকলেই ভক্তরামের আত্মীয় কিংবা অনুগৃহীত। ভক্তরামের কথায় শিশুপাল বলে,—এরা সকলেই তো প্রায় ভক্তরামের আত্মীয়। পাড়ার আর কেউ আসে নি! শিশুপাল বলে,—পাড়ার আর দশজন যদি সভায় না যায়, তাহলে শিশুপাল যাবে না। ভক্তরাম শিশুপালের কথায় খুব চটে যায়। শিশুপালের কাছে সে জামানতটা ফেরৎ চায়। ভক্তরামের জামীনের জন্যেই শিশুপাল একটা চাকরী পেয়েছিলো। মুটে মজুরদের নিয়ে খোট্টা যশোবন্ত সিং এসে উপস্থিত হয়। ভক্তরাম তাকে শহর থেকে কতকগুলো গাড়ী ভাড়া করে আন্‌তে বলে। অন্ততঃ খালি গাড়ীগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেও লোকে জানবে অনেক লোক আছে।

বিয়ে বাড়ী। বর সভায় বসেছে। কন্যাকর্তা জিজ্ঞেস করে—বরপক্ষে লোকজন কই? ভক্তরাম নানা কৈফিয়ৎ দেয়। বরের জল তেষ্টা পেলে জল খেতে যাবার সময় সে একজোড়া জুতো সরিয়ে নেয়। যথাসময় কনেকে সভায় আনা হয়। আনামাত্রই গর্ভবতী কনে একটা পুত্রসন্তান প্রসব করে। যশোবন্ত সিং এসব ব্যাপার দেখে হা হুতাশ করতে লাগলো। সভা পণ্ড হয়ে যায়। কন্যাপক্ষের কয়েকজন লোক ভক্তরামকে ধরে ঘা কতক দিলো। ভক্তরামের সঙ্গেই এই কন্যার বিয়ে দেবার জন্যে তারা প্রস্তুত হলো। ভক্তরাম নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বল্‌লো—"আমি ছোটজাত হয়ে জাতে তুল্‌তে চেয়েছিলাম। আমার দর্পচূর্ণ হল।"

জাতপাঁত নিয়ে লেখা আর একটি প্রহসনের নাম জানা যায়। বইটি দুষ্প্রাপ্য। প্রাপ্ত পরিচয়টুকুর সঙ্গে সেটা উপস্থাপিত করা হলো।—

কালের কি কুটিল গতি (১৮৭৯ খৃঃ)—রামপদ ভট্টাচার্য ॥ কালের গতিকে সামাজিক অধঃপতনের যুগ চলছে। যারা এককালে ছিলো উঁচু, তাদের মর্যাদা এখন নষ্ট হয়েছে। এখন এক বেশ্যাপুত্রও কি করে সমাজে সম্মান এবং প্রতিপত্তি পায় এবং সবাই কেমন করে তাকে তোষামোদ করে তার চিত্রই প্রহসনটির মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

জাতপাঁতের সংস্কৃতি নিয়ে প্রচুর প্রহসনে প্রচুর প্রসঙ্গ আছে। সেগুলো উপস্থাপন করা অনাবশ্যক। বিভিন্ন গোত্রীয় প্রদর্শনীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলোর সন্ধান পাওয়া যাবে।

২। নব্য সভ্যতা—অনাচার ও ভণ্ডামি ॥—

জাতি-সংশ্লেষে সমাজের আচার-বিচারে পরিবর্তন আসে। বাণিজ্যিক কারণ জাতি-সংশ্লেষের অন্যতম প্রধ' া কারণ হিসেবে বিদ্যমান থাকায় নগরকে কেন্দ্র করেই নব্য আচার বিচারের পত্তন হয়। প্রগতিশীল সংস্কৃতির আবাসস্থল তাই নগর। বিনয় ঘোষ তাঁর "বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ" (১ম খণ্ড) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে সরোকিনের উদ্ধৃতি টেনেছেন। একটি গ্রন্থে সরোকিন্ বলেছেন;—"The rural community is similar to calm water in a pail and the urban community to boiling water in a Kettle · · stability is the typical trait of one · mobility is the typical for the other.[১] উপমাটির সাহিত্যগত উৎকর্ষ যাই থাকুক না কেন, সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়ে এমন উপমা চলে না। গ্রামে stability-কেই সত্য বলে মেনে নিলে সমাজের বিবর্তনও অচল। কারণ শুধু গ্রাম্য সমাজ কিংবা নাগরিক সমাজকেই সমাজ বলা যেতে পারে না। বস্তুতঃ কোনো সমাজে mobility এবং stability পাশাপাশি বিরাজ করতে পারে না। বরং বলা চলে যে, গ্রামের তুলনায় নগরে প্রগতি আরও দ্রুত। বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুবিধার্থে গ্রামকেন্দ্রিক ক্রয়বিক্রয় সংস্থা বিদেশীর পক্ষে অচল। নগর অঞ্চলে ভিন্ন জাতীয়ের প্রাচুর্যও এর আর একটি কারণ। স্বাভাবিক আচার-বিচার পরিবর্তনে জাতি-সংশ্লেষ সম্পর্কে একথা বলা চলে।

১। Sorokin and Zimmerman: Principles of Rural Urban Sociology. (New York 1929).

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা ইত্যাদি শহরকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে নব্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আমরা জানি, শিল্প পুঁজিবাদের প্রভাবে আমাদের দেশে, নগরের গুরুত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সমাজের গুরুত্বও বেড়েছে। নগরাঞ্চল আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র হওয়ায় ক্রমে ক্রমে গ্রামীণ সংস্কৃতি তার কাছে পরাজয় বরণ করেছে। নাগরিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কোনো সংস্কার থেকেই মুক্ত হওয়া যায় অর্থব্যয়ের বিনিময়ে। এই বৈশিষ্ট্য নাগরিক সংস্কৃতি নির্ভর চাল-চলনে প্রভাব ফেলেছে। নব্য সভ্যতাতেও এই বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে। অর্থব্যয়ই সভ্যতার নামান্তর। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা রীতিনীতিই তাই প্রকারান্তরে সভ্যতা নাম গ্রহণ করেছে। এর মাপকাঠিতে অন্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিই অসভ্য।

সভ্যতা শব্দটির ব্যুৎপত্তি দেখতে গেলে দেখা যায় যে, 'সভা' শব্দটির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। 'সভা' শব্দটি সামাজিক মিলনের ইঙ্গিতবাহক। আদিম যুগে মানুষ ছিলো নিজের নিজের। তখন মানুষ ছিলো অসভ্যের চূড়ান্ত। সুতরাং সমাজের পরিধির ক্রমবিস্তারেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ। তবে আত্মার বিকাশ ছাড়া সমাজ পরিধি-বিস্তারে অচল। অতএব এইভাবে সভ্যতার গৌণ অর্থ আত্মার বিকাশ—যা পরে সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে শাস্ত্রকাররা স্বীকার করেছেন। সভ্যতা মানুষকে ক্রমে পরিবার, গোষ্ঠী জাতি, অন্তর্জাতি ইত্যাদিতে ক্রমবিকাশ ঘটায়। আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিতে—'বিশ্বমানবের সঙ্গে ব্যক্তিমানবের মিলনে বিশ্বমানবসমাজ স্থাপনেই সভ্যতার চূড়ান্ত বলা হয় না। "এহ বাহ্য" পথে এগিয়ে তারা বলেছেন যে, মানব ও অন্যান্য মানবেতর জীব নিয়ে এক সমাজ গঠনই সভ্যতা। আরও এগিয়ে তাঁরা বলেছেন যে, জীব ও জড়—সব যখন নিজের কাছে অভেদ ও আত্মীয় বলে মনে হবে, তখনই মানুষ চরম সভ্য। যেখানে সর্বভূত নিয়ে একটি সমাজ সেখানেই প্রকৃত সভ্য সমাজ। তাঁরা অবশ্য আরও এগিয়েছেন, তবে সে কথা অবান্তর।

তত্ত্ব হিসেবে ভারতীয় দৃষ্টিতে সভ্যতার যথেষ্ট মূল্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে এর মূল্য নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য তথাকথিত সভ্যতার অর্থ যে আরও কতো অবাস্তব এবং হাস্যকর—সেটা ব্যাখ্যা করলেই অনুভব করা যাবে।

পাশ্চাত্য ধারণায় সভ্যতা হচ্ছে—নাগরিক সভায় যাবার উপযুক্ত হওয়া—(ক) বেশ-বাসের দিক থেকে, (খ) আচার-বিচারের দিক থেকে, (গ) চলন-

বলনের দিক থেকে। আমাদের সমাজে নব্য মনে সভ্যতা সম্পর্কে অনুরূপ ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাগরিকতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য রক্ষণশীল সংস্কৃতি থেকে মুক্তির চেষ্টা, সেই সঙ্গে নব্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে অনুকরণপ্রিয়তাও আমাদের আচ্ছন্ন করেছে।

'সভ্যতা'র বাহ্য দিকটি সম্পর্কে কটাক্ষ করে "কল্পনা" পত্রিকায়[২] "সভ্যতার অত্যাচার" নামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে,—"..দৃষ্টিমাত্র অনেক জিনিষের বাহ্য শোভা মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের গুণ তাহার সহিত না মিশিলে বুঝিয়া উঠা বড়ই দুষ্কর। দেখিতেছি, আমাদের এ সভ্যতার বাহ্য শোভা খুবই জাঁকাল। যাহা কিছু এদেশে ছিল না, সভ্যতা সাতসমুদ্র তের নদী পার হইতে তাহা এদেশে আনিয়া দিয়াছে। কোট্ পেণ্টালুন, ফ্রগ গাউন, বুট মোজা, ষ্টিক্ চশমা, চেন, চুরুট—হরেক রকম ভাল ভাল জিনিষের আমদানি হইয়াছে। Freedom, Fraternity, Female Emancipation Mass Education প্রভৃতি লম্বাচৌড়া অনেকগুলা কথা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া এ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। দেখিতে শুনিতে বড়ই ভাল। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত সভ্যতা? "লম্বা শাটপটাবৃত" হইয়া কথায় কথায় ইংরাজির তীব্র রসালমধুর বুকনি ব্যবহার করাকেই কি যথার্থ সভ্যতা বলে? বাহ্য শোভায় আকৃষ্ট হইয়া অনেক দিন ইহার উপাসনা করিয়াছি, করিয়া এতদিনে বুঝিয়াছি, যেন ইহা সভ্যতা নহে—যেন—যেন আর কিছুই নহে—কেবল সাহেবিয়ানা মাত্র।"

বিদেশী সংস্কৃতির বাহ্য অনুকরণের সঙ্গে একত্র যুক্ত হয়েছে নাগরিক বিষ,—যা সংস্কার মুক্তির পদক্ষেপে ছদ্মবেশে অবস্থান করেছে। তাই এই তথাকথিত সভ্যতা সাধারণের মনে বিতৃষ্ণাই জাগিয়েছে। "আর্য্যদর্শন পত্রিকা" লিখছেন,—[৩] "আমরা কি সাধে বলিতেছি সভ্য হইতে অসভ্য ভাল?—সভ্য অপেক্ষা অসভ্য অধিক সভ্য।—সভ্যের কাজ দেখিয়া আমরা সভ্যকে অসভ্য অপেক্ষা অধিক অসভ্য বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা অসভ্যদিগকে অশ্রদ্ধা করিতে পারি। আপনারা সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, আপনাদের সুখের সীমা নাই বলিয়া চারি দিকে ঢাক বাজাইতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা,

২। কল্পনা—১২৯৩—পৃঃ ৫।

৩। আর্য্যদর্শন—চৈত্র, ১২৮২।

কি? বাস্তবিক আমাদের কার্য্য কিরূপ?—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে আমরা অসভ্য হইতেও অধিক অসভ্য, আমাদের কাজ দেখিয়া অসভ্যেরাও ভীত হয়, লজ্জিত হয়।" (পৃঃ ৫৪৪)

বেশবাসের দিক থেকে বিজাতি-অনুকরণকে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হাস্যকর বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মনোমোহন ঘোষ ১২৯৩ সালে পৌষ মাসের 'বীণায়' বাঙ্গালী সাহেবদের ব্যঙ্গ করে একটি গানে বলেছেন,—

"হায়! দেশের হলো কি—সব্ দেখি মেকি!
প্রবল ধলোর নকল শিখে, দুর্বল কালোর বুজ্‌রুকি।
সেই কালোর গায় ধলোর পোষাকে, ময়ুর পাখ্ যেন দাঁড়কাকে
সেই, বিটকেল জন্তু দেখে তাকে, বিজ্ঞ লোকে হয় সুখী।"

গানটি সমর্থন-পুষ্টিহেতু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪] আমাদের সমাজের এই অদ্ভুত অনুকরণপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করে সুলভ সমাচার লিখ্‌ছেন,—[৫] "লক্ষ্যশূন্য হইয়া কাজ করিবার পক্ষে বঙ্গদেশকে কেহ হারাইতে পারিবে না এবং কেবল নকল করিতেই দেশটি চিরদিন মজবুত।" এই নকল-প্রিয়তাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "কলির হাট" প্রহসনে (১৮৯২ খৃঃ)।—

"২য় মাতাল ॥ ওরে শুনেছিস্, বিলেতে মড়া পোড়ান সুরু হয়েছে!
১ম মাতাল ॥ এইবার তবে আমাদের গোর দিতে সুরু করা উচিত।
২য় মাতাল ॥ কেন?
১ম মাতাল ॥ সভ্য জাতির অনুকরণ করা চাই। তারপর আমরাও যত সভ্য হোতে আরম্ভ করবো, ওমনি দুএকটি করে জ্বালান ধোরবে।"

নকলে অযোগ্যতা শুধু মনোমোহন বলেন নি, বিভিন্ন প্রহসনেও এ নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে। দুর্গাদাস দে-র "Encore 99!" (১৮৯৯ খৃঃ) প্রহসনে প্যালারাম বলে,—"বাবা রসগোল্লার অম্বল খাওয়া যায় না, প্যাঁজের পায়েস খাওয়া যায় না। আর বাঙ্গালী সাহেব সাজলে সওয়া যায় না।" একই প্রহসনকারের লেখা "ছবি" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) একটি সাহেবের বিবৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে সাহেবীয়ানার মূল অনুপ্রেরণা ধ্বসিয়ে দেবার চেষ্টা

৪। বিশ্বসঙ্গীত—পৃঃ ৪৭৬।
৫। সুলভ সমাচার—৬ই জুলাই।

করা হয়েছে।—"আমি অনেকদিন বাঙ্গালায় আছি. বাঙ্গালায় অনেক আচার-ব্যবহার দেখেছি,...বাঙ্গালীরা সামান্য শিক্ষার দোষে সাহেব সাজিতেছে, বিলাত যাইতেছে, বিলাতি আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে। হিন্দুদিগের যে দেবতাদিগকে দেখিলে আমাদের প্রাণে ভক্তি হয়, সেই দেবতাদিগকে হিন্দুরা আপনারাই অপমান করিতেছে, ঠিক্ হিন্দুদিগকে। হিন্দুরা আমাদের সকল বিষয় অনুকরণ কবিতে যাইয়া জানোয়ার পদে অভিষিক্ত হন, আমরা সেই জানোয়ারকে লইয়া নাচাইয়া থাকি।" অন্যান্য বিভিন্ন প্রহসনে একই তত্ত্ব বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পেয়েছে। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যাযের "মুই হ্যাদু" প্রহসনে (১৮৯৪ খৃঃ) পাণ্ডাদের কথোপকথন লক্ষণীয়।—

"১ম পাণ্ডা॥ আঃ এই নামকাটা সেপাইরা সকলকে অস্থির করে তুল্লে, কাক হয়ে ময়ূরের পোষাক পোরে গা ফুলিয়ে বেড়ান, মনে করেন কোট প্যাণ্টুলনে ওদের চেহারা বড্ড খুপ্সুরত দেখায়, বেহায়ারা মনে করেন, সাহেবি পোষাক পড়লে, সাহেবি খানা খেলে, সাহেবি চালে চল্লেই সাহেবদের সমান হবেন। কিন্তু ভ্রমেও ভাবেন না যে ওঁরা সাহেবদের চক্ষুঃশূল, মুখের সামনে চক্ষুলজ্জায় কিছু না বলুক, আড়ালে ব্লডি নিগার বই অন্য সম্বোধন করে না।

৩য় পাণ্ডা॥ এখন যে কাল পড়েছে, বিলেত না গিয়েও কত লোকে তাহা সাহেব হয়ে পড়েছে। উটকে দেখ্লে সাহেবি খানা সংক্রামক রোগের মত প্রায় সকলের ঘরেই ঢুকেছে, এখন বিলেতফেরৎরা সমাজকে তাচ্ছিল্য না করে যদি প্রায়শ্চিত্ত করে চুপি চুপি ঘরে ঢোকে, তাহলে সব গোলযোগ চুকে যায়। তা নয়, বাবুরা বেশি বাহাদুরী দেখিয়ে শেষে একুল ওকুল দুকুল হারান্।"

রক্ষণশীল গোষ্ঠী উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণে ব্যঙ্গাত্মকভাবে এই বিশেষ ধরনের জীবকে চিত্রিত করা হয়েছে। অনেকে এদের 'বানর' নামে অভিহিত করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বিধবার দাঁতে মিশি" প্রহসনে (১৮৭৪ খৃঃ) উন্মাদ শারদাকান্ত প্রলাপে বলেছে,—"কুলাঙ্গাররা সাতসমুদ্দুর তেরনদী পার হয়ে ধাপায় গিয়ে বানবদের মত সভ্যতা, ভব্যতা, নব্যতা শিখে বানরী বিয়ে করে, সম্পূর্ণরূপে বানর সেজে দেশে ফিরে এলেন। দেশে এসে সকলকে চিনেও চিন্তে পারেন না। শাকভাত খেকো মেজাজ বদলে গেছে,

মুখে আর সে দেশী ভাষা বেরোয় না, দিনরাত বানরী ভাষায় কিচিরমিচির করেন, দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হলে নীচু যেতে বলেন, আবার বানর বলে না ডাকলে মুখ খিঁচিয়ে কামড়াতে আসেন।"

বাস্তবিকই আমাদের সমাজে অনাচারের দিক থেকে সব ধর্মই একাকার হয়ে গিয়েছিলো। পূর্বোক্ত "মুই হাঁদু" প্রহসনে বাউলনীর গানে আছে,—

"কে হিন্দু কে ম্লেচ্ছ যবন ঠাওরান যে দায়।
সাবেক ধরণ ছেড়ে এখন বনেছে বানর বজায়।"

বুড়োদের মধ্যেও এই বৈশ্বসিকতাকে রক্ষণশীলদের অনেকে ক্ষমা করতে পারেন নি,—"আবার বুড়োগুলো আদর করে গোলাবে বিস্কুট খাওয়ায়।" আচার-বিচারে সংস্কার মুক্তি বিজাতি অনুকরণ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর বিষদৃষ্টি লাভ করেছে। এই অনাচার কলিরই বৈশিষ্ট্য স্মরণ করেছে। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "কাজের খতম" প্রহসনে (১৮৯৯ খৃঃ) বলা হয়েছে,—

"ঘোর কলি ভাই আর ত টাঁকে না।
ভাবের ঢেউ নিত্যি নতুন অবাক কারখানা।
ইংরেজি দপাত পড়ে মাথার দফা ওমনি ওড়ে,
হ্যাটকোট্ ধরে তেড়ে, ধুতি চাদর রোচে না।
যত সব বেতর ধাঁজ ঠন্ ঠন ঠন্ ডিসের আওয়াজ,
চামচে কাঁটা হাতে আঁটা ফাউল কারীর চাই খানা।"

অনুকরণের সঙ্গে সংস্কারমুক্তি—এককথায় অনাচার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকায়, শুধুমাত্র অনুকরণ বলে স্বীকার করে নিলে সভ্যতার মর্যাদাহানি করা হয়। কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাপরে কলি' প্রহসনে (১৮৮৬ খৃঃ) অম্বিকা যখন বলেছে যে—"ইংরাজী শিক্ষা উপকারী" তখন তার কথার সমালোচনা করে মহেশ বলেছে,—"এই উপকার—অখাদ্য খাওয়াতে শেখায় আর গুরুভক্তি লোপ পাওয়ায়।" এদেশে প্রবাসী ইংরেজ সমাজের মধ্যে অবশ্য অনাচার যে বৃদ্ধি পেয়েছিলো, এটা অস্বীকার করা যায় না। এদেশের ইংরেজরা ছিলো "হাই সার্কল্"-এর লোক অর্থাৎ সভার উপযোগী। এদের অনুকরণ করতে গেলে মদ্যপান ও নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন অপরিহার্য পড়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসনে (১৮৬০ খৃঃ) হরকামিনী বলেছে,—"আজকাল কলকেতায় যাঁরা লেখাপড়া শেখেন, তাঁদের

মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে।" বিভিন্ন প্রহসনে চারিত্রিক পরিবর্তনের কারণ স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। রাখালদাস ভট্টাচার্যের "স্বাধীন জেনানা" প্রহসনে (১৮৮৬ খৃঃ) কালীপদ মেঃ রায় সম্পর্কে বল্‌ছেন,— "মেঃ রায় লোকটি বড মাজ্জিত লোক। তবে একটু ড্রিংকিং হেবিট আছে। তা তাঁকে যে সব সাহেবের সার্কেলে মুভ কর্ত্তে হয় তাতে সে দোষটা পাডনেবল্।" জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের "সুধা না গরল" প্রহসনে (১৮৭০ খৃঃ) শম্ভুর কথা প্রসঙ্গে রাজেনও অনুরূপ কথা বলেছে। "দেখ শম্ভু আগে একজন নিরীহ বালক ছেল; এণ্টান্স পাশ করে আঠার টাকা স্কলশিপ পেয়ে সকলকেই অগ্রাহ্য কত্তো. সকলকেই অযথোচিত কথা বল্‌ত, মানুষকে মানুস জ্ঞান কত্তো না। বল্‌তো যে আমার মত ইংরাজী লেখে এ সুবর্ব্বে নেই, আমার সকল হাইসার্কেলে ইয়ার্কি আমার মত শাইনিং ষ্টুডেণ্ট ইউনিভার্সিটিতে নেই—আজ এর বিপক্ষে প্যামফ্লেট লেখে, কাল ওর ডবয়ে বয়সের কত গ্রোণ অপ্ ম্যান্‌কে মোরালিটির এড্‌ভাইস্ দিতে চায়, সকলের কাছেই সুপিরিয়ারিটি ফলাতে চায়—কিন্তু চিরকাল কিছু সমান যায না, পাপের ফল ভুগ্‌তেই হয, হাই-সার্কেলে ইয়াকি দিযে বড লোক হতে গিয়ে ঘোর মাতাল হয়ে উঠেছে।" সভ্যতার সঙ্গে মদ্যপান এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে যে মদ্যপান এবং সভ্যতা একার্থবাচক বলে সভ্যের মনের ধারণা হয়েছে। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) মদ্য প্রশস্তি করে শরৎচন্দ্র বলে,—"ওতো মন্দ জিনিষ নয। Civilization এর চিহ্ন। যারা Enlightened হযেচে, তারাই ওর Taste বুঝতে পেরেছে, আপনার মতো old fool যারা, তারা কেবল ডেঙ্গাপথে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, জলপথের নাম শুনলে ভয়ে কেঁপে ওঠে।" মদ্যপান করে তথাকথিত খাতির প্রত্যাশীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করে "কামিনী" নাটকে (১৮৬৯ খৃঃ) ক্ষেত্রমোহন ঘটক গোপালের মুখে একটি আক্ষেপ প্রয়োগ করেছেন,—"আগে মনে করেছিলাম, মদটদ্ খেয়ে সাহেবী চাল দেখালে মাগীটের কাছে আর বাজে লোকের খাতির পাবো, এখন দেখ্‌চি এতে আর মজা নেই।"

নব্যের প্রগতিশীলতা ও সাহেবীয়ানা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কতকগুলো অনাবশ্যক "এটিকেট"কে কয়েকটি প্রহসনে বিদ্রূপ করা হয়েছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের "লোভেন্দ্র গবেন্দ্র" (১৮৯০ খৃঃ) প্রহসনে গবেন্দ্র শ্যামকে বলেছে,—"ইংরেজি এটিকেট হচ্চে যে যত জোরে, কোসে টিপে, মুচড়ে হেঁচড়ে,

যার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কোরবে, তার সঙ্গে তত বেশী ভালবাসা, পীরিত আছে, তাই বোঝাবে।" অমৃতলাল বসুর "বাবু" প্রহসনেও (১৮৯৪ খৃঃ) এ ধরনের একটা হাস্যকর ঘটনা দেওয়া হয়েছে। শ্বশুরবাড়ীতে এসে ষষ্ঠীকৃষ্ণ বাইরের থেকে খবর পাঠায় এবং কার্ড দেয়। উড়িয়া চাকর ভাগবতের ভাষায়—"মু ত কহি দিলা আপনি জমাই মনুষ্য আছ, ঘরের মানুস ধা 'কড়িকিড়ি উপর চড়ি যাউ, ত মতে ইংরাজী কিসিমিচ কড়ি কড়ি কহিলা, মু ত বুঝল না, কহিল, তু ভসাণ্ড দিউ, নইতো স্মাটির্ক্রি = এটিকেট। হব না—না কঁড কহিলা।"

পোষাক-আশাকে প্রগতিশীলতার মধ্যেও অংশ্য অনুসরণই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। সাহেবী পোষাকে নাকি সমাজে খাতির পাওয়া যায়। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "গাধা ও তুমি" প্রহসনে (১৮৮৯ খৃঃ) বরদা বিলিতি পোষাক পরা দেখে সারদা মন্তব্য করে,—"Ah Just like a perfect gentleman of Nineteenth Century type." সারদা বলে—"এই সব্য সজ্জায় ভুইবাই যে কোন সমাজে যাইবো, খাটির পাইব, আডর পাইব, সেলামের জালা বোঝাই হইয়া যাইবে। রাস্তায় বাহির হইলেই পাহারাওয়ালা সেলাম ডবে। বড় বড় সাহেবলোগের পিয়াডা, কানসামা, মোশালচি, বাবুর্চি, বিষ্টি, মেথর মেথরানী এমন কি Porter পর্যন্ত শেলাম ভিটে বাড়া হইবে।' সারদাকান্তের এই কল্পনার সামাজিক দৃষ্টান্ত ছিলো। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এই কি সেই" প্রহসনে (১৮৭৯ খৃঃ) শরৎচন্দ্র বলেছে,—"সেদিন রেলওয়ের টিকিট কিনতে গেলুম, অনেক লোক হোয়েছে, রেলওয়ে কর্মচারী অবতার. টিকিট দ্বারের দ্বারবানেরও প্রভুত্বের জোর হোয়েচে। ময়ূরের পুচ্ছ পরে একটী দাঁড় কাক এলেন, অবতার তাকে মহা অবতার বোলে তখুনি দ্বার খুলে দিলেন, আর যে বাঙ্গালি পয়সর পয়সর আল বাঁধতে পারলে তারই উপর জোয়ারটা নরম পোড়লো।" বাস্তবিকই আমাদের সমাজে বদেশী সংস্কৃতির ওপর ভক্ত ক্রমেই বেড়ে উঠেছিলো। সব চাইতে রক্ষণশীল যে স্ত্রীসমাজ তাদের মহলেও এই নব্যতার প্রতি মোহময় দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। "সুলভ সমাচারে"[৬] এক জায়গায় বলা হয়েছে,—"দেশের মেয়েদের গল্পের সময়ে সেদিকে কান

৬। সুলভ সমাচার—১০ই চৈত্র, ১২৭৮।

পান্তিলে পাস করা ছেলে, নেকচর প্রভৃতি অমন কত ইংরাজি কথা কানে প্রবেশ করিবে।”

শুধু পোষাক আশাকে সাহেবীয়ানা নয়, কিংবা অখাদ্য ভোজনেও নয়, সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘনে নব্য সমাজ যে ভাবে অগ্রসর হয়েছেন, তা নিন্দার্হ বলেই প্রচার করা হয়েছে। যৌথ পরিবার প্রথার বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্যবাদের সংঘাতের আনুষঙ্গিক হিসেবে যৌন ও আর্থিক অনাচার বিভিন্ন প্রহসনে বিভিন্ন পথে প্রকাশ করা হয়েছে। পূজাপার্বন ইত্যাদি পবিত্র অনুষ্ঠানে তাচ্ছিল্য করায় রক্ষণশীল সমাজ তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। বিভিন্ন প্রহসনের কাহিনীর মধ্যে এগুলোর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে।

এই সাথে সবার মূলে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা—তার বিরুদ্ধে অনেক প্রহসনকারদের বক্তব্য উপস্থিত হয়েছে। “তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকা একদা মন্তব্য করেছেন,[৭]—“ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে এতদ্দেশীয় অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে শিক্ষা সম্যক ফলোপদায়িনী হইয়া উঠে নাই। এ শিক্ষার এই মাত্র ফল লক্ষিত হইতেছে যে অনেকেই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জঘন্যবোধে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুসরণে কোন বিশেষ ফল নাই, যদি এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরা সাহস দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদগুণের অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না।” পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তি একদিকে যেমন সভ্যাচারের অনুকূল হয়েছে, আনুষঙ্গিকভাবে তেমনি বুদ্ধিকেও সঙ্কুচিত করেছে। “পূর্ণিমা” পত্রিকায় তাই বলা হয়েছে,—[৮] “যদি ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করত স্বভাবের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে না পারিল, যদি স্বদেশীয় লোকদিগকে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, প্রভৃতিতে উৎসাহিত করিতে না পারিল, যদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় কলযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সমাজের কষ্ট নিবারণে সক্ষম না হইলে, তবে তাহাতে কি ফল দর্শিল।”

৭। তত্ত্ববোধিনী—পৌষ—সম্বৎ—১৯১৪।

৮। পূর্ণিমা—জ্যৈষ্ঠ—১২৬৬ সাল।

কিন্তু ইউরোপ-ভ্রমণ স্বজাতি-বিদ্বেষ আরও বাড়িয়েই দিয়েছে। গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের "একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব" প্রহসনে (১৮৭৪খৃঃ) এর কারণ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। "বিলাতে গেলে…স্বজাতির প্রতি অনাস্থা ঘৃণা এসকল জন্মে কেন ?" বৃন্দাবন কথিত এই প্রশ্নের কারণ বল্‌তে গিয়ে নিবারণ বলেন,—"দেশের দোষ বল্‌বো কেমন করে ? শুনেছি বিলাতে যারা বাস করে, তাদের মত স্বজাতিপ্রিয় স্বদেশপ্রিয় পৃথিবীতে আর কোন জাতিই নাই। তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখে এমন নীচ অধম আত্মঘাতী পাপাশয় মনের মধ্যে জন্মাবে, এ ত কখনই বিশ্বাস হয় না তবে এ আমাদের পোড়া কপালের দোষ বল্‌তে হবে, আর কতকটা কালের মাহাত্ম্য ধর্ত্তে হবে…।" বৃন্দাবনও আর একটি কারণ অনুমান করেন,—"আমার বোধ হয়, তারা বিলেতে গিয়ে খুব উঁচু দরের লেখাপড়া শেখে, আর তেমন দরের লেখাপড়া যারা বিলেতে যায় নাই, তারা তো জানে না, সুতরাং তাদের সঙ্গে এসে মিশ্‌তে মনটা কেমন ঘৃণা ঘৃণা করে, তাইতে সমাজের প্রতি তাদের স্নেহও নাই, মায়াও নাই, তফাতে থাকতে ভালবাসে।" স্বজাতি-বিদ্বেষ যে কি ধরনের ছিলো, তা ব্যঙ্গভাবে চিত্রিত করেছেন রাখালদাস ভট্টাচার্য "তাঁর স্বাধীন জেনানা" প্রহসনে (১৮৮৬ খৃঃ)। বান্ধবীর গানে নেপালকে অমনোযোগী দেখে মিঃ রায় তাকে ungrateful race বলে। মিঃ রায় কোন্ জাতির নেপাল তা জিজ্ঞেস করলে মিঃ রায় বলেন,—"এ ! ব্লাকি ! নিগার ! আমি অনায়াসে এংলো ইণ্ডিয়ানের পক্ষ লইতে পারিতাম। কেবল এক ভয়ে—The fact that Raja Sivaprasad burnt in effigy—no—no—ভয়ে নয় ; তোমাদের প্রতি পূর্ব্ব অনুরাগে আমি তোমার জাতিকে—যাহাতে আমি কোনদিন জন্মেছিলাম এবং যাহাদিগকে আমি শৃগালের দল বা মেষপাল বলিয়া ঘৃণা করি—তাহাকে আমি পোষণ করিয়াছিলাম।"

সাহেবীয়ানা এবং স্বজাতি-বিদ্বেষ আধুনিক শিক্ষারই দোষ—একথা প্রচার করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বড়দিনের বকশিস্" প্রহসনে (১৮৯৪ খৃঃ) সন্তানের শিক্ষণ পরীক্ষার একটি হাস্যকর দৃশ্য দেওয়া হয়েছে।—

"গয়া ॥ গদাই ছেলেমেয়েরা সাবান ইউজ করে ?

গদাই ॥ আলবত।

গয়া ॥ টুথ্‌ব্রুস দিয়ে টিথ্‌ ক্লিন করে ?

গদাই ॥ অফ্‌কোরস্।

গয়া ॥ সকাল বেলা উঠে তিনবার গড নেই বলে ?

গদাই ॥ এভ্‌রি ডে, বে ওজোর।

গয়া ॥ এ বছর ক্লসমাসে কি শেখালে ?

গদা ॥ ভুলুবাবা আর মিসিবাবা ?

ছেলে ও মেয়ে ॥ সার ?

গদাই ॥ কি কবে ঘোড়ায় চড়বে ?

ছেলে ও মেয়ে ॥ টগাবগ ! টগাবগ।

গদাই ॥ কি করে বল্‌ড্যান্স কর্ব্বে ?

ছেলে ও মেয়ে ॥ মেবি মেরি ··অ্যাস।[৯]

গদাই ॥ কি করে পথ চল্‌বে ?

ছেলে ॥ ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ নেটিভ কালা।

মেয়ে ॥ খাবি হুইপ্‌ সরে পালা ”

একদিকে আছে এই চাল-চলন, অন্যদিকে বৃত্তি-সঙ্কোচ। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের "নবরাহা" প্রহসনের (১৮৯৭ খৃঃ) অন্যতম চরিত্র বিষ্ণু, জুড়িগাড়ীর চালক কজন শিখের মুখে এক বিদ্যালয় সম্পর্কে শোনে—"আরে নেই নেই, কারখানা উরখানা কুচ নেই, ফিরিঙ্গি লোক তিয়াঁ গোলামবাছা কো পেঁড় বানাতে।" বস্তুতঃ ইংরাজী শিক্ষা এদের করে তুলেছে যান্ত্রিক এবং ব্যাবহারিক জ্ঞানে অজ্ঞ। বিভিন্ন প্রহসনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

অনেকে বলেছেন, নীতিশিক্ষার অভাবেই পাশ্চাত্যশিক্ষা এভাবে বেশবাস আচার-বিচার ও চলন-বলনের দিক দেখে এই কুফল এনে দিয়েছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর "সেকাল আর একাল" পুস্তিকায়[১০] বলেছেন,—"শিক্ষা বিষয়ক আর একটি অভাব···নীতিশিক্ষা।···কলেজে ও স্কুলে বিশেষ করিয়া নীতিশিক্ষা দেওয়া হয় না, ও বালকেরা সন্নীতি পালন করে কিনা, এ বিষয়ে তত তত্ত্বাবধারণ নাই।" কটন শাহেবের বইয়েও বলা হয়েছে,—"The Professors of the Educational Department do their official duty, but they make no attempt to exert a moral influence over their pupils to form their sentiments and habits, or to

৯। কাহিনী দ্রষ্টব্য।

১০। সেকাল আর একাল—সাহিত্য পরিষৎ সং পৃঃ ৫০।

control and guide their passions.[১১] কিন্তু নীতিশিক্ষার স্বরূপ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে যে গবেষণা চলেছে তাতে তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে এবং প্রয়োগের সুফল সম্পর্কে সকলে একমত নাও হতে পারেন।

মাতৃভাষার চর্চা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে একদিকে যেমন কমে এসেছে, অন্যদিকে তেমনি ইংরাজী ভাষায় কথাবার্তার প্রচলন ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এই ভয়াবহ বিষয়কে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন,—"The industrious student of Shakespeare and Milton in the Hindu College could scarcely spell his name in his own mother tongue.[১২] এই মাতৃভাষা জ্ঞানহীনতা এবং বিদেশী ভাষার চর্চা যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এই বোধ উনবিংশ শতাব্দীর অনেক ব্যক্তিই উল্লেখ করে গেছেন। 'নব্যভারত' পত্রিকায়[১৩] পাঁচকড়ি ঘোষ "মাতৃভাষা" প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এই সমস্যার উল্লেখ করেছেন। তিনি আমাদের এই সাহেবীয়ানার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,—"ইংরাজী ভাষার দুই চারি বুকনি গলাধঃকরণ করিয়াই আমাদিগের মনে 'শিক্ষিত' বলিয়া অভিমান জন্মে, এবং অন্যবিধ সহস্র গুণ সত্ত্বেও, ইংরাজি অনভিজ্ঞ মাত্রকেই নগণ্য মূর্খ বিবেচনায় ঘৃণার চক্ষে দেখি। রোগ এরূপ গুরুতর হইয়াছে যে, আমরা ইংরাজিতে কথা কই, ইংরাজিতে পত্র লিখি, ইংরাজি ভঙ্গিতে বেড়াই—অধিক কি মনে মনেও ইংরাজি ভাবে চিন্তা করি। দেশীয় পরিচ্ছদ আমাদিগের চক্ষুঃশূল, দেশীয় চালচলন আমাদিগের মর্মপীড়ক,—শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার নামটা পর্য্যন্ত দেশীয় ভাষায় উচ্চারণ করিতে অপমান বোধ করেন।" অনেকেই এভাবে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলাকে রোগ বলে অভিহিত করেছেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের "নব নাটকে" (১৮৬৬ খৃঃ) আছে—

"নাগর ॥ হেল্লো, গুড্ মরনিং। সানন্দে করস্পর্শ)।
গ্রাম্য ॥ তবে এখন তোমার সে পীড়াটা সেরেছে ?
নাগর ॥ হাঁ, এখন আমার হেল্থ্ মচ্ ইম্প্রুবড্ বটে, কিন্তু অনেকদিন এবার কলিকাতায় ছিলেম, টৌনের ভিতরটা নাকি বড় ডার্টি,

১১। Cottons New India—Pop Edition. P. 140.
১২। Life and Teaching of K. C. Sen—Pratap Ch Ghosh, P. 5
১৩। নব্য ভারত—অগ্রহায়ণ, ১২৯৬, পৃঃ ৩৯৩।

তাতে ষ্টুং ফিল কচিনে। তা ভাই তুমি একটু ওয়েট্ কর, আমার একটী ফ্রেণ্ড আস্‌বে, দেখি আস্‌ছে কিনা।

গ্রাম্য॥ (স্বগত) হরিবোল হরি! ওঁর সে পীড়া সালো কি হবে? মাতৃভাষায় অরুচি এই একটী মহৎ পীড়ান্তর উপস্থিত। আর ওঁদের তত দোষ নাই, এখন এমন সময় হয়ে উঠেছে, যারা ইংরাজি ছোঁয় নি, তারাও অন্ততঃ দুচাটে ইংরেজি কথা কয়ে বসে—তা এ সকল লোকের সঙ্গে আমাদের কথা কওয়া এখন ভারি কঠিন হয়ে উঠেছে।"

শব্দ চয়নকে উক্ত প্রহসনকার দোষের ধরেন নি। গ্রাম্যের উক্তির মধ্যে তিনি বলেছেন,—"বাঙ্গলাতে যে সকল কথা নাই, ইংরাজি থেকেই হোক, আর অন্য ভাষা থেকেই হোক, সে সব কথা নিয়ে ভাষা শরীর পরিপুষ্ট করা উচিত, কিন্তু তা বলে, যা বাঙ্গলাতে আছে, তার পরিবর্ত্ত করো ভাষান্তরীয় কথা ব্যবহার কেন?" উক্ত লেখকই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর Hindu Metropolitan এ বক্তৃতায় ইয়ংবেঙ্গলদের বলেন,—"তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে, বাঙ্গালাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে। বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না।"

বস্তুতঃ বাংলাভাষা সম্পর্কে উদাসীনতাবোধ জাগবার মূলে সাহেবদের সক্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না।

"দেশভাষা" প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "সংবাদ প্রভাকরে" লেখেন,[১৪]—"হায় কি আক্ষেপ! নব্য বেঙ্গাল বাবু সাহেবেরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা এদেশের ভাষার প্রতি কিরূপ যত্ন করেন, তাহা কি দেখিতে পান না?" নব্যদের মনের একটি দুরুৎপাট্য ধারণা ছিলো—"বিশেষ যা English তা যে on Every respect 'naturely' ভাল হতেই হবে।"[১৫] সুতরাং ইংরাজী ভাষার ওপর নব্যদের এই টানের স্বাভাবিক কারণ আছে।

এই বিজাতীয় ভাষাপ্রীতির বিরুদ্ধে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। অনেকে বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মুখে অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন,—

১৪। সংবাদ প্রভাকর—১ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১২৬০।

১৫। রামকৃষ্ণের উক্তি—বৌবাবু—কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

"ল্যাজ কাটা কোট গায়ে মাথায় ধুচুনি
আমায় বাবার দেখিস্ যদি হাত পা খেঁচুনি"

কিংবা, "আমার বাবা কিচ্ মিচ্ করে,
আর বলে না বোল দিশি,
আহ্লাদে যাচ্ছে বলে, বগলে
ঝুল্‌ছে পিসি।"

উদ্ধৃতি দুটি অমৃতলাল বসুর "কালাপানি" প্রহসন (১৮৯৩ খৃঃ) থেকে গ্রহণ করা হলো। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "ঝকমারির মাশুল" (১৮৭৭ খৃঃ) প্রহসনে —হেমাঙ্গিনীর মুখে প্রহসনকার বলেছেন যে, বাঙালীর সাহেবীয়ানার দাপট সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে, বাইরে নয়। হেমাঙ্গিনী বলেছে,—"এত লেখাপড়া শিখে শেষ এই বিদ্যেয় দাঁড়াল আর শিখেছেন ওঁর মাথা। কেবল আমার কাছে ইংরিজী ফলান হয়। উনি আবার লেকচর দেবেন! বাড়ীতে একজন সাহেব এলে কোন্ দিক দিয়ে পালাবেন তার পথ পান্ না।" এই ধরনের বাঙালী সাহেবদের খিচুড়ি ভাষা ব্যবহারে ইংরাজী ভাষার অজ্ঞতার কথাই প্রচার করা হয়েছে অনেক প্রহসনে। শুধু ইংরাজী শব্দের প্রাচুর্য নয়, বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণে সাহেবীয়ানা রক্ষা পায়। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "গাধা ও তুমি" প্রহসনে (১৮৮৯ খৃঃ) সারদা বলেছে যে তার বিকৃত বাংলা ইচ্ছাকৃত। সে বলে,— "ওরূপ করিয়া কহিটে আমাডের বিলাট ফেরট ডলকে সাবডান হইটে হয়, পাছে pure বাঙ্গালা বাহির হইয়া পডে? ... নেহাৎ colloquial কহিলে বিলাট ফেরট বলিয়া কেহ স্বীকার করিটে চাহিবে না।" ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সভ্যরা এই ধরনের ভাষাবিকৃতির মাধ্যমে নিজেদের নাগরিক সভার উপযুক্ততা অর্জন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

নব্যের চলন-বলনের দিক থেকে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তাদের সমাজ সংস্কার ও তথাকথিত দেশপ্রেম। এই সংস্কার বা দেশপ্রেমের মূলে যে প্রেরণা ছিলো, এটা অস্বীকার করা যায় না, তবে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকেরই সন্দেহ ঘটবার কারণ ছিলো। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা মানুষকে কর্মশূন্য ভাববিলাসী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। ফলে নব্য গোষ্ঠীর সংস্কার প্রচেষ্টা ও দেশপ্রেম পারিবারিক ও সামাজিক উৎপীড়ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। আধুনিক শিক্ষা মানুষকে যতোটা বাচাল করেছে, ততটা কর্মী

করে নি। "বৌ ঠাকুরুণ" প্রহসনের (১৮৮১ খৃঃ) চরিত্র সত্যপ্রিয় ভাবে,—"এখন যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা পাপের স্রোত এবং অধর্ম্মের প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। এদের না আছে কর্ত্তব্য জ্ঞান, না আছে, ধর্ম্ম ভয়। স্ত্রী শিক্ষা, বিধবাবিবাহ বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি হিতজনক কথা উঠিলেই বক্তৃতা দিতে মূর্ত্তিমান, কিন্তু আসল জ্ঞানের সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং এখন সদ্বিষয়ে অন্দোলন করা কঠিন হয়েছে।" দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে (১৮৬৬ খৃঃ) কালেজীবিদ্যার কথা বলতে গিয়ে রাজীব বলেন,—"কালেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তান হয়, টাকার পন্থা দেখে না।"

একদিকে Industrial Capitalist-দের নির্দেশের সঙ্গে কর্মবিধি আবদ্ধ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য জাতীয়ভাবের সঞ্চার উভয়ের একত্র উপস্থিতিই এই বিকৃত স্বাদেশিকতা এনে দিয়েছে। এই স্বাদেশিকদের লক্ষ্য ছিলো দুই দিকে—ভারতোদ্ধার এবং সমাজ সংস্কার। রাষ্ট্রীয় সহায়তাতেই পৃথিবীর সব সমাজে সংস্কার সাধন চলে, কারণ যে কোনো ধরনের স্ফুরিত ব্যক্তিত্ব রক্ষণশীল গোষ্ঠীকে অতিক্রম করতে একাকী সক্ষম হয় না। আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারে রক্ষণশীলতার চাপ এতো বেশি যে রাষ্ট্রীয় সহায়তাও সেখানে ক্ষমতাহীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির পর "রঙ্গালয়" পত্রিকায়[১৬] একটি পর্যালোচনায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ যখন সর্ব্বস্বপণ করিয়া বাঙ্গালায় বিধবাবিবাহ চাপাইতে পারেন নাই, তখন আপাততঃ বাঙ্গালায় কাজের মত কোন কাজই হইতে পারে না। ইংরেজের সভ্যতা, আইন, আদালত, রেলগাড়ি, স্কুল, কলেজ প্রভৃতির প্রভাবেই যা কিছু পরিবর্ত্তন আমাদের সমাজে হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিয়া পরামর্শ করিয়া, দল বাঁধিয়া কখনই কোন সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হই নাই—হইলেও কোন কিছুই কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই।" ঊনবিংশ শতাব্দীতে এতো সমাজ সংস্কারক এবং এতো আন্দোলনের আবিভাব সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এই উক্তি বিস্ময়কর হলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। এর কারণ আমাদের সমাজের দুষ্প্রতিরোধ্য রক্ষণশীল শক্তি। সমাজ সংস্কারের মূলে যদি কিছু আন্তরিকতা থাকেও, তাও পুষ্ট রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে হয়ে উঠেছে হাস্যকর। সুতরাং সমাজ সংস্কার সম্পর্কে যে দৃষ্টিকোণ প্রহসনে প্রকাশ পেয়েছে তার মাত্রা বিচার আপেক্ষিক। অবশ্য

১৬। রঙ্গালয়—৩রা জ্যৈষ্ঠ—১৩০৮।

সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর স্বার্থ ছাড়া অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। পণপ্রথা সম্পর্কিত সামাজিক আন্দোলন এ ধরনের একটি সংস্কার প্রচেষ্টা। বলাবাহুল্য এ প্রচেষ্টাও মূল্যহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে—যা বর্তমান-কালের সমাজ পর্যবেক্ষণ করেও উপলব্ধি করতে পারি। পূর্বোক্ত রঙ্গালয় পত্রিকায়[১৭] "সমাজের কথা" সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে,—"সমাজের কথা লইয়া মধ্যে মধ্যে দেশে কেমন একটা হুজুগ উঠে, হুজুগ উঠে বলিলাম, কেন না, কথায় গণ্ডগোল খুব হয় বটে, কাজে কিছুই করে না—করিতেও পারে না। পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থোপার্জ্জন করা অমানুষিক ব্যাপার, একথা মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ সকলের পুত্রের বিবাহের দানসামগ্রী গণ-পণের হিসাব নিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বলিতে বাধ্য, সামাজিক সকল কথারই আন্দোলন হুজুগে কাণ্ডমাত্র।" সমাজে শিল্প-পুঁজিবাদের ক্ষত মন্তব্যকার ইঙ্গিত না করলেও আমরা তা উপলব্ধি করি তার এই উক্তিতে,—"সমাজে প্রচলিত কোন কুব্যবহারের বিরোধী হইতে হইলে কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। বিলাসী আমরা কষ্টও সহ্য করিতে পারি না। ক্ষতিও স্বীকার করিতে সাহসী হই না। অথচ সুনাম সুযশের খাতিরে সভ্যসমাজে উন্নতিশীল পদবী পাইবার আশায় আমাদের অনেকেই লম্বা চৌড়া কথা বলিয়া থাকেন। যেখানে সেখানে কোলাকুলি।—বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে বুদ্ধির মাত্রা কেন নাই—সকলেই সকলের ওস্তাদি বুঝিতে পারে, ফলে কেবল কথা কাটাকাটি হয়, কেবল বক্তৃতা, কেবল প্রবন্ধ পাঠ।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে রক্ষণশীল স্বার্থের চাপ কিছুতেই একমাত্র সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। এদিক থেকে সমাজচক্রের মূল্য অস্বীকার করলে অন্যায় করা হয়। এইসব কথা থেকেই ভণ্ড সভ্যদের ঐতিহাসিকতা স্বীকৃত। "বিশ্বসঙ্গীত"[১৮] পুস্তকে সঙ্কলিত একটি জনপ্রিয় গানে আছে,—

'ভাইরে ভাই, কলির মানুষ চেনা ভার,
মানুষের উপর ভিতর দুই প্রকার॥'

গীতিকার গানটির মধ্যে ভণ্ড সভ্যদেরই কটাক্ষ করেছেন। এই ভণ্ডামির কথা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ভুবনমোহন সরকার তাঁর "ডাক্তারবাবু"

১৭। রঙ্গালয়—৩রা জ্যৈষ্ঠ—১৩০৮।

১৮। বিশ্বসঙ্গীত—১২৯৯ সাল—পৃ. ৪৫০।

প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ)। নবীন বলেছে,—"যত সভ্যতা বাড়ছে, তত দুষ্কর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে। লেখাপড়া শিখলে হবে কি, হিপক্রিসি (hypocrisy) আর ডিজনেষ্টিতেই (dishonesty) খেয়ে দিয়েছে।...এদের বিদ্যাবুদ্ধি, রীতিনীতি, কার্য্যদক্ষতা দেখ্‌লে মনে হয় আর আমাদের ভাবনা কি; কেহ টাউন হলে লেকচার দিচ্ছেন, কেহ লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে বিল্ ড্রাফ্‌ট্ করছেন, কেহ কেহ Social Reformation নিয়ে ব্যস্ত কেহ religion নিয়ে বিব্রত, কেহ Politics নিয়ে পাগল, কেহ Science নিয়ে উন্মত্ত, কেহ ডাক্তার হয়ে শিষ্ট চালে বাড়ী বাড়ী বেড়াচ্ছেন, কেহ বা হাইকোর্টে ওকালতি করছেন, কেহ হাকিম, কেহ মাষ্টার, কেহ সদাগর, কেহ মুচ্ছুদ্দি, কেহ সিবিলিয়ন হয়ে আস্‌ছেন, কেহ ব্যারিষ্টারের গাউন পরছেন; গৌরবের আর সীমা নাই; কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকের গুপ্ত চরিত্রের পরিচয় পেলে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়।"

স্বাদেশিকদের কলম এবং বক্তৃতার জোর—এই দুটি দিককেই বিভিন্ন প্রহসনে তীব্রভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। স্বাদেশিকদের বক্তৃতাসর্বস্বতার কথা বল্‌তে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বসুর "বেজায় আওয়াজ" প্রহসনে (১৮৯৩ খৃঃ) একটি গানে বলা হয়েছে,—

> "বাংলার এবার স্বাধীন হলো বক্তৃতার জোরে!
> বাংলা ছেড়ে জাহাজ চড়ে
> সাহেব কাল পালাবে ভোরে॥
> ফোয়ারা যখন ছোটে বক্তৃতার—
> কে তোড়ে টেকে তার।
> গোলার আওয়াজ জড়সড় শুনে হুহুঙ্কার।
> মেজাজ গভীর বক্তৃতাবীর বাঙ্গালীর কারে ডরে॥"

বক্তৃতা অর্থাৎ "ভেদবমি"র কার্যহীনতার কথা রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কষ্টি-পাথর" প্রহসনে (১৮৯৭ খৃঃ) একটি গানে আছে।—

> "স্ত্রীগণ॥ শুধু হাত পা ছোঁড়ায় কাজ হবে না ওহে রসময়
> কর যা রয় সয়—
> পুরুষগণ॥ জয় ভারতের জয়, জয় আর্য্যবংশ জয়
> জয় জয় জয় বাঙ্গালীর জয়॥

স্ত্রীগণ ॥ হরু বলে, ভারতমাতা জাগ একবার
নরু বলে, জাগিবে কে নাড়ী যে নেই তার
ঘুম সোজা ত নয় ॥

পুরুষগণ ॥ জয় ..

স্ত্রীগণ ॥ হরু বলে, ধর্ম্মভেদে মারা গেল দেশ
নরু বলে, ধর্ম্মভেদ নয়, ভেদ বমিতেই শেষ
বুক বিদীর্ণ হয় ॥

পুরুষগণ ॥ জয় .. ।"—ইত্যাদি।

এদের মুখে বড়ো কথার বিরাম নেই। জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের "সুধা না গরল" প্রহসনে (১৮৭০ খৃঃ) শম্ভু বলে,—"কিসে দেশের উপকার হয় আর কিসে না হয়, সে বিষয়ে আমি sound opinion pass কত্তে পারি। Firm patriotism excites my very soul to action.'

অন্যদিকে এদের তেমনি কলমের জোর। হরিমোহন রায়ের "গাধাবলী" নামে একটি পুস্তিকায় (পদ্যনীতি) ৮০ রকম গাধার দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে এক রকম গাধার দৃষ্টান্ত।—

"ঢাল তরবাল নাই আশবটী সার।
তাতেই করিতে চায় ভারত উদ্ধার ॥
একটী কলম তাও দৈবদোষে বোঁচা।
স্বাধীন হইতে চায় দিয়ে তার খোঁচা।
যাদের এমন আশা মনে অনিবার।
তাদের সমান গাধা নাহি দেখি আর ॥"

বিভিন্ন প্রহসনেও কলমের জোরকে কটাক্ষ করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি" প্রহসনে (১৮৮৯ খৃঃ) মহেন্দ্র বলে যে, এখন Nineteenth Century, দেশোদ্ধারের জন্যে রক্তপাত Brutality র নামান্তর। এখন "Pen is mighter than sword."

স্বাদেশিকদের পদ্ধতির মধ্যে প্রচুর অবাস্তবতা বিদ্যমান ছিলো। আমাদের দেশের পরিবারকেন্দ্রিক সমাজে পারিবারিক স্বার্থের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন, পদ্ধতিতে প্রাথমিক ত্রুটি এনেছে বলে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল' চরিত্রটির মতো এরা নিজের পরিবারকে সেবা

দেশসেবা থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে কোথাও বা স্ত্রৈণতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বরূপ উপস্থিত করা হলেও তাতে পারিবারিক সমস্যা কমে নি, বরং বেড়েছে। অধিকাংশ প্রহসনকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশমাতৃভক্ত ব্যক্তির নিজ মাতার প্রতি আচরণটি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অমৃতলাল বসুর "বাবু" নাটকের (১৮৯৪ খৃঃ) একটি চরিত্রের আচরণ উল্লেখ করা চলে। ষষ্ঠী তার নিজের মাকে "অসভ্য ড্রেসে" অর্থাৎ শতছিন্ন কাপড়ে বৈঠকখানায় আসতে বারণ করে। দুবছর আগে একখানা থান তাকে ষষ্ঠী দিয়েছিলো, তাও আবার ষষ্ঠীর স্ত্রী আধখানা নিয়ে বাক্সের ঢাকনা করেছে, আর আধখানা দিয়ে ষষ্ঠী পতাকা করেছে। পরা শতচ্ছিন্ন কাপড়টি সে বোনের কাছ থেকে চেয়ে এনে পরেছে। মাকে ষষ্ঠী মাসে তিন টাকা করে খোরাকী দিচ্ছিলো। স্ত্রীর পরামর্শে এবার তার থেকে আরও বারো পয়সা কেটে নেয়—মাসে দুটো একাদশী পড়ে বলে।

কিংবা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি" প্রহসনটিতে (১৮৮৯ খৃঃ) উপস্থাপিত চিত্রটি ধরা যেতে পারে। মহেন্দ্র দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দশ হাজার টাকা খরচ করেছেন, অথচ খাতায় কিছুমাত্র লেখা নেই। মহেন্দ্র চোখ বুঁজে পড়ে থাকেন। মহেন্দ্রের মা কমলমণি এসে দেখেন, সন্তান ঘুমোচ্ছে। মা বলে ওঠেন, "আহা—থাক থাক বাছা আমার একটু জিরুক, খেটে খেটে বাছা আমার আধখানা হয়ে গেছে। মহেন্দ্র উঠে অকারণে মাকে নিন্দা ও তিরস্কার করে। কমলমণি বলেন,—"বাবা রাগ করিস কেন? আমি তোর মা, সেই ভারতের মা-ই তোর বড় হলো।" মহেন্দ্র তাঁকে বুঝিয়ে বলে, মার সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক শুধু খাটনির। "বিখ্যাত রামপ্রসাদ বলে গেছে, মাগো ঘোর তুমি চোখ ঢাকা বলদের মত।" মা-র সংস্কারাচ্ছন্ন স্নেহ পুত্রকে স্নেহের চেয়ে কুসংস্কারটাই মনে করিয়ে দেয়। তাই পুত্র বলে,—"স্ত্রীশিক্ষা বিলাতের ন্যায় কবে Freely আমাদের দেশে introduce হবে, কবে এই illiterate-দের সংস্কার হবে?"

মহেন্দ্রের একটি উক্তি 'নন্দলাল'কে সম্পূর্ণভাবে মনে করিয়ে দেয়।—"আমি স্বদেশের জন্য জীবন তোফা রকমে দিতে পারি, কেননা তাহলে লোকে আমাকে martyr বল্‌বে, কিন্তু মার জন্যে প্রাণটা বিঘোরে হারালে হদ্দ কথামালায় একটা গল্প হব বৈ ত নয়? ছোঃ আমি 'বাঘ ও বকের' সঙ্গে থাক্‌বো! কখনই নয়।"

বিভিন্ন প্রহসনে স্বাদেশিকদের এই মৌলিক ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অমৃতলাল বসুর "গ্রাম্যবিভ্রাট" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষের গানে আছে,—

"পুং ॥ আজ থেকে দেশের কাজে কর্ব্বো প্রাণ পণ।

স্ত্রী ॥ বলি, সেইটুকু মন সংসারেতে দাও না প্রাণ ধন ॥"

অথবা রাখালদাস ভট্টাচার্যের "স্বাধীন জেনানা" প্রহসনে (১৮৮৬ খৃঃ) বীরুর উক্তিতে বলা হয়েছে,—"Physician heal thyselt. তুমি রিফরম কর্চ্চে যাচ্চ কিন্তু তুমি নিজে রিফরমড কৈ?—তুমি দরিদ্র, অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ছেড়ে তুমি যে দেশের দরিদ্রতা ঘুচাতে যাচ্ছ, তাতে কি তুমি দেশের দরিদ্রতা বাড়াচ্ছ না?"

স্বাদেশিকদের অবাস্তব গতিবিধির চিত্র রাখালদাস ভট্টাচার্যেরই "ভণ্ডবীর" প্রহসনে (১৮৮৮ খৃঃ) প্রকট হয়েছে। সংগঠন প্রচেষ্টার মৌলিক ত্রুটি এতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। মফঃস্বলের কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের মধ্যে দলবল নিয়ে গিয়ে অপরূপ উপস্থিত হলে তারা বলে—"মো'রা কত্তা চাষাভূষ লোক মোরা ও কাম পারবু না।" অপরূপ দাঙ্গা একটি পিস্তল নিয়ে বন্দুকের ড্রিল শেখাতে গেলে এবং চাঁদা চাইলে—১ম কৃষক জিজ্ঞাসা করে—"কি সমুন্দির ড্যাশের বোল কি কয় মুই তো কিছু সমজাতি পারি নি, বড় মোড়ল কিছু সমজেচিস গা?" ২য় কৃষক বলে,—"তুইও যেমন ঠুনুন্দ্র বাবা—আবার লোড়ংসজির পথকর বসাতি চায়।" শেষে সে বলে—'না বাবা মোদের বাদসাইতে কাম নেই মোরা দরী লোকের ছাওয়াল, তোমরা সব মোগোল মোড়ের ছাওয়াল, তোমরা বাদসাই কর।"

জ্ঞানসঙ্কীর্ণতা এবং আত্মগুরুবিশ্বাস স্বাদেশিক ব্যক্তিদের চরিত্রকে অপবিত্র করেছে। প্রহসনকার বিভিন্ন উক্তি ও চিত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। অমৃতলাল বসুর "বাবু" নাটকে (১৮৯৪ খৃঃ) স্বদেশীদের একজনের বক্তব্য এই ইঙ্গিত দেয়। সজনী বলেছে,—'ষষ্ঠী বটব্যাল আর তার চেলারা লেকচারের কুহকে ভুলিয়ে যে খামকা ভারত উদ্ধার করে নামটা কিনে নেবে তা কখনই প্রাণে সহ্য হবে না, ভারত উদ্ধার যদি আমাদের দ্বারা হয় ত হবে, না হয় ভারত উৎসন্ন যাক।" নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের "অপূর্ব্ব ভারত উদ্ধার" প্রহসনে (১৮৮০ খৃঃ) স্বাদেশিক আত্মশর্মার বর্ণনায় বলা হয়েছে,—"উনি অনাবশ্যক

লোকের সঙ্গে বড আলাপ করেন না, পৃথিবীর খবরও বড রাখেন না। স্থিরভাবে আপনার ঘরে বসে ভারতবাসীর হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জেলে দিচ্ছেন।"

সংস্কারক ও স্বাদেশিকদের বিজাতীয় চাল চলন সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছে। এই চাল-চলন পদ মর্যাদার যতোটা বিরোধী ছিলো, ততোটা ছিলো বাস্তব পদ্ধতি গ্রহণে বিরাট বাধা স্বরূপ। অনেক রক্ষণশীল প্রহসনকারই সংস্কার ও স্বাদেশিকতাকে সাহেবীয়ানারই প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্টির উপায় স্বরূপ এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা অসম্ভবপর নয়, কিন্তু নব্য গোষ্ঠীর নব্য স্বাদেশিকতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনের যে যোগ ছিলো না এবং এদের রীতিনীতি যে বিজাতীয় বোধ হয়েছে, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দুর্গাদাস দে-র "পড়ে গেলো গাজী" (১৮৯১ খৃঃ) প্রহসনে গঙ্গারাম বক্তৃতায় বলছে,—"কবে আমরা বলতে শিখিব যে শাস্ত্র ননসেন্স, মুনি ঋষিরা ড্যাম ব্লক হেড, কবে আমরা বাল্যবিবাহ উঠিয়ে দিব—"গো টু হেল" বলে কাল পাথরে পা ও খাওয়া ছেড়ে দেব ? কবে আমরা নববিবাহিতা নিদেন আঠারো বৎসরের প্রণয়িনীকে গাউন পরিয়ে হাত ধরে বাগানে বেড়াতে পারবো ? কবে জাতিভেদ উঠিয়ে দিয়ে দশইয়ারের কাছে স্ত্রীকে ইনট্রোডিউস্ করে বেড়াব।" রাখালদাস ভট্টাচার্যের "ভণ্ডবীর" প্রহসনে (১৮৮৮ খৃঃ) Regenerating Club এর 'গত' শনিবারের (১৮০৯ শকাব্দ) মিটিংয়ে নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়।—"This is hereby laid down for the guidance of the members of this Regenerating Club that none of them will henceforth be allowed to carry on any sort of comunication whatever in the English language, nor will any of them be permitted even to intermix a single word with their mother tongue. Breach of this rule on the part of a member will result in his immediate excommunication." প্রহসনকার এই নিয়মটি ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ অবস্থায় উপস্থাপিত করে অগোচরীভূত বিজাতীয়তার কথাও বলেছেন। অবশ্য একই প্রহসনে উক্ত ক্লাবের একজন সদস্যের প্রস্তাব লক্ষণীয়। "বিশেষতঃ কাছা দিয়া কাপড় পরিধান fighting এর পক্ষে great obstacle, I therefore propose যে এখন হইতে প্রত্যেক ভারত উদ্ধারক ধুতি চাদর ছাড়িয়া প্যাণ্টুলন ধরুক।"

ভণ্ড এবং অক্ষম স্বাদেশিক ও সংস্কারকদের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আছে, যা রক্ষণশীল পক্ষীয় হলেও তাদের দৃষ্টিকোণের রাজনৈতিক দিকটিও উন্মোচিত করে দেয়। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের "আচাভূয়ার বোম্বাচাক" প্রহসনে (১৮৮০ খৃঃ) রতিকান্তর স্বাদেশিকতায় শ্রীহরি স্বগত মন্তব্য করেছে,—"শালাদের তো ভারি বাড়াবাড়ি হে মরবার পালক উঠেছে দেখ্‌চি।" রতিকান্তদের পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যাবার পর শ্রীহরি বলেছে,—"কই বাবা! এখন তোমাদের বীরত্ব কোথা? রঙ্‌মহলে হানা দিয়ে ফেল্‌ ফেল্‌ করে চেয়ে থাকলে কি হবে, কোটাল বাবার হাতে পড়েছ, এখন এগোও না। ভারত মাতাকে উদ্ধার কর—মাতৃভূমির মুখো-জ্জ্বল কর।" প্রহসন শেষে মূল বক্তব্য প্রহসনকার শ্রীহরির মুখেই উপস্থাপিত করেছেন। সুতরাং শ্রীহরি কথিত বক্তব্যটি প্রহসনকার উপস্থাপিত দৃষ্টি-কোণেরই স্বাক্ষর বহন করেছে।

বস্তুতঃ সংস্কারক বিরোধী দৃষ্টিকোণের মধ্যে যতই জটিলতা থাকুক না কেন, এইসব সংস্কারক ও স্বাদেশিকরা তাদের গতিবিধি দ্বারা সমাজে হাস্যকর দৃষ্টান্তই উপস্থিত করেছে বলে ধরা হয়। তাই অনেক প্রহসনকার স্বাদেশিক-দের ও সংস্কারকদের লঘুত্ব তাঁদের বক্তব্যের বিশিষ্টতার মধ্যেই প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত অমৃতলাল বসুর "সম্মতি সঙ্কট" প্রহসনে প্রদত্ত একটি গান।—

"গা' লো সই গা' লো সই গা' লো জয় জয়।
জয় সংস্কারের জয়, দেশ উদ্ধারের জয়,
গা' লো লেকচারের জয়, গা' লো এডিটারের জয়॥"

এইসব স্বাদেশিক ও সংস্কারক ছিলেন নব্য নাগরিক প্রগতিশীল সংস্কৃতির বাহক রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাই এই নব্য গোষ্ঠীর অনাচার ও ভণ্ডামির প্রসঙ্গে একই সংস্কৃতির আশ্রয়ভুক্ত অবাস্তব স্বাদেশিকতা ও সংস্কারের কথা এনে নব্য গোষ্ঠীর সমর্থনের পরিধি সঙ্কুচিত করবার চেষ্টা করেছেন। এমন কি নব্য হিন্দুয়ানী আন্দোলনে আচার ও ধর্ম সম্পর্কে যতোই আনুকূল্য থাকুক, স্বার্থের প্রশ্নই সেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে এবং এই সব আন্দোলনও কটাক্ষিত হয়েছে। মানুষের সাংস্কৃতিক স্বার্থ এক একটি দিকে এক একটি মাত্রায় বিরাজ করে। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার বিভিন্ন মাত্রা পরিধি সৃষ্টিতে,

জটিলতা এনেছে। ফলে সাংস্কৃতিক স্বার্থ সংঘাতে সমাজ সদস্যকে নির্দিষ্ট করা যায় না এবং আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি বিরোধও বিরল নয়। নব্য হিন্দুয়ানী এবং ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক স্বার্থ সংঘাতকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একই সদস্যের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার পুষ্ট দৃষ্টিকোণে সংযুক্ত হওয়ার কারণও এক।

নব্যের অনাচার ও ভণ্ডামির প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী বিষয়কেও সংযুক্ত করা হয়েছে দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করার জন্যে। তাই মদ্যপান, লাম্পট্য, বেশ্যাসক্তি ইত্যাদি নব্যের আচারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুধুমাত্র সমর্থনপুষ্টির জন্যেই নয়, যৌন বিষয়ের উপস্থাপনে সহজ আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যও প্রহসনকারের মধ্যে দেখা দিয়েছে। সুতরাং স্বাদেশিকদের পূর্বোক্ত চরিত্রগত প্রবৃত্তি সমাজচিত্রের দিক থেকে মাত্রাবিচারের অপেক্ষা রাখে। তবে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক সহাবস্থান এবং নব্য বৈবাহিক প্রগতি তথা যৌন অনাচারের চিত্রণ বাস্তবতা সম্পূর্ণ অপ্রমাণ করা যায় না। তবে তাও দৃষ্টিকোণে নিয়ন্ত্রিত হয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

আভ্যন্তরীণ জটিলতার কথা ছেড়ে দিলেও প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর একটি সাধারণ পরিধি আছে। এক্ষেত্রে যে কোনো প্রকার প্রগতিশীলতাই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর কাছে অবাঞ্ছিত। প্রগতিশীল সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়ার বিরুদ্ধে সাধারণ পরিধিযুক্ত রক্ষণশীল গোষ্ঠী নিজ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ সমর্থনপুষ্ট করবার জন্যে তার মাত্রা যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনি, অনুকরণীয় বিদেশী সমাজের অসহনীয় প্রগতিশীলতার দৃষ্টান্ত তুলে প্রগতিশীল পদক্ষেপে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। "অনুসন্ধান" পত্রিকায়[১৯] এ ধরনের একটি সংবাদ ও মন্তব্য পাওয়া যায়।--

"সম্প্রতি আমেরিকায় 'চুম্বন' শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেমন করিয়া চুম্বন করিতে হয়, তথায় তাহাই হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সভ্য যাঁহারা তাঁহাদের সকলই সাজে! এ দেখিয়া এখন আমাদের সভ্য ভ্রাতার দলও ইহার অনুকরণ না করিলে বাঁচি।"

নব্যের তথাকথিত সভ্যতা এবং সভ্যতার সঙ্গে জড়িত অনাচার ও ভণ্ডামিকে রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাঁদের দৃষ্টিকোণে প্রহসনের মধ্যে তুলে ধরেছেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উভয় দিক থেকেই এগুলো সমাজচিত্র

১৯। অনুসন্ধান—১৫ই মাঘ, ১২৯৫।

হিসেবে মূল্যবান্। প্রগতিশীলতার মাত্রা ও গুণের অবস্থাবিভেদের গোষ্ঠী পরিধি পরিবর্তনের সমাজতাত্ত্বিক সত্যটুকু ধরে নিয়েই অবশ্য সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনাকে মূল্য দেওয়া উচিত।

(ক) শিক্ষার বিকৃতি ॥—

পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা যে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা সম্পর্কিত জ্ঞানকে বিকৃত করে এবং সবকিছুকেই পুঁথিগত সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে বিচার করবার প্রবণতা বৃদ্ধি করে, এই মত সংগঠক বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিভিন্ন প্রহসনে উপস্থিত করা হয়েছে। সম্পাদক, ডাক্তার, উকীল ইত্যাদির এই অব্যাবহারিক জ্ঞানের কথা প্রচারের মূলে সাংস্কৃতির সংঘাত বিদ্যমান্। এই ধরনের 'শিক্ষাবিকৃতিকেই কেন্দ্র করে দুই-একটি প্রহসনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানবাবু (১৮৮৮ খৃঃ)—সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ॥ আমাদের দেশে রক্ষণশীল সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে যে অভিযোগ করেন, তার বিপরীত অভিযোগই করেন বৈজ্ঞানিকরা। "কুসংস্কার পরিশূন্য করিয়া মানসিক বৃত্তির পরিস্ফুরণ করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই যে বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, একথা এ কালের পণ্ডিতাগ্রণী হক্‌স্লে ও স্পেন্সর প্রভৃতি অকাট্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।"[২০] Indian Medical Gazette পত্রিকায়[২১] "Education in Natural and physical Science" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—"In drawing this article to a close, we would venture to indicate the urgent necessity for appointing a teacher of Natural Science, in all important School and Colleges. This will be expensive no doubt. But if the greatest efficiency be the greatest economy the measure will eventually repay all expenditure laid put on it. Almost any reasonable amount of mony spent in converting the present book-worms of the University into practical men, would be will expended."

এক্ষেত্রে রক্ষণশীল উপস্থাপিত শিক্ষাবিকৃতির ঐতিহাসিকতা যতোটা আছে,

---

২০। বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা—বিজয় মজুমদার।

২১। Indian Medical Gazette—June—1869.

তত্তোটা আছে পদ্ধতিগত আপেক্ষিকতা। বিজ্ঞান-শিক্ষায় অতিপ্রত্যয়ী মনোভাব এবং দেশীয় সাধারণ জ্ঞানের অভাব প্রহসনকার নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। বিজ্ঞানবাবু যখন কোথাও বলেছে,—"বিজ্ঞানে M. A. পাশ দিয়ে আমি কি Dumb inert as Egyption mummy হয়ে থাক্‌ব। আপনি দেখবেন আমি By sheer science আপনার হিমালয়কে গরম করব তাকে মানুষের ন্যায় কথা কওয়াব ocean কে সাহারাতে পরিণত করব।" অথচ রামের পিতা দশরথের প্রসঙ্গ তুল্‌তে গিয়ে যখন তাঁর নাম মনে করে উঠ্‌তে পারে না। "আপনি জানেন বোধ হয় রামচন্দ্রের Father (নামটা আমার ঠিক স্মরণ হচ্চে না। Talboys Wheeler এর রামায়ণে অনেকদিন হল পড়েছিলাম) স্ত্রৈণ হেতু একটা স্ত্রীর কথায় রাম, লক্ষণ ও রামের wife-কে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়ে পুত্রশোকে নিজের vitality নষ্ট করে ফেলে ও ক্রমে collapse অবস্থা প্রাপ্ত হয়; রামের আর দুটো ভাই ছিল, তাদের নাম, বড় queer, হঠাৎ মনে পড়া দায়, তারা করে কি তাদের Father-কে embalm করে রেখে দিলে, till the return of their banished brothers." বস্তুতঃ বিজ্ঞান-শিক্ষার বিজাতীয়ত্বই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ সংগঠনে প্রবৃত্ত করেছে।

কাহিনী।—গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কলকাতার একজন বিশিষ্ট ধনী। তাঁর একমাত্র ছেলে যখন বিজ্ঞানে এম্‌. এ. পাশ করে বিজ্ঞান-পাগল হয়ে গেছে। তার "বাম হস্তে শিক্‌ বাঁধা, দক্ষিণ হস্তে Ganot, চক্ষে চশমা পরা।" বাবাকে সে এমন বিচিত্র বেশ ধরবার কারণ বলে। জীবনের অটল স্থায়িত্বের জন্যে সে অর্ডার দিয়ে লোহার শিক্‌ আনিয়ে non-conductor হয়েছে। তার কারণ—"সদাই বিজ্ঞানের চর্চ্চা করলে মানুষের শরীর থেকে electricity বহু পরিমাণে নির্গত হয়ে যায়। যাতে volatile আর একটা পদার্থ surcharged with electricity এসে হঠাৎ আপনার শরীরে enter করতে না পারে, তারই জন্য এই conductor; এতে শরীরের সঙ্গে আর frictional electricity ওয়ালা আর একটা bodyর সঙ্গে যাতে সদাই equilibrium থাকে, তারই জন্য scienceএ এই conductor বাঁধার প্রথা প্রচলিত আছে। Take for instance, Government Palace, Writers Buildings, Electric ring, আর কত চান্‌।" আমেরিকার বৈজ্ঞানিক

Voxley সাহেবও নাকি তা অনুমোদন করেন। তাঁর মতে বাড়ীর চেয়েও মানুষের শরীরে এটার দরকার বেশি। চশমা সম্পর্কে তার কৈফিয়ৎ—"বিজ্ঞানের ভিতরেই বা কেন, সমস্ত উচ্চশিক্ষার ভিতর যে অতি minute particles আছে, যা আমাদের naked eyeতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তা দেখবার জন্য চশমা ব্যবহার করা চাই।" ছেলের পাগলামিতে গৌরহরি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, যাদের টাকা নেই—তারাই পেটের চিন্তার জন্যে বিজ্ঞান পড়ে। মাখনের জমিদারী দেখাশোনা করাই উচিত। মাখন বলে,—"আমি সেই বিজ্ঞান-বলে জমিদারী কোন্ ছার Worldকে Nepoleon এর ন্যায় শাসন করবো।" ছেলের এই সব কথাবার্তা শুনে গৌরহরির মনে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়, কারণ মিতাক্ষরা মতে উন্মাদ পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। মা চন্দ্রমুখী লক্ষ্য করেন, রাতে ঘুমের ঘোরে মাখন 'পটাস' 'পটাস' করে এবং 'বিগেন' 'বিগেন' বলে চীৎকার করে। চন্দ্রমুখীর ধারণা, মাখন 'বিগেন' (= বিজ্ঞান) নামে কোনো একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে। চন্দ্রমুখীর মতে, পাগলামিটা মাখনের ভান মাত্র। "লেখাপড়া শিখেছে, বাপ মার কাছে কি বিয়ের কথা বল্‌তে পারে, তাই একটু আধটু পাগলামি করে বাপ মাকে জানায় যে আমি বিয়ে করব।" বাড়ীর ঝিয়ের ধারণা, মাখন কাউকে গোপনে বিয়েও করেছে, কেননা, সধবা মেয়ের মতো দাদাবাবুও হাতে লোহা দিয়েছে। বাবা তার বিয়ের কথা তুল্‌লে সে বলে,—"Marriage is nothing but a social union, সেই social union যদি বিজ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়, তাহলে আমরা বলি marriage, আর আপনারা যাহাকে বিবাহ বলেন, তার প্রয়োজন কি?" ছেলেকে সাংসারী করা বা বৈষয়িক করবার চেষ্টা বৃথা ভেবে বাবা মা চুপ করে থাকেন।

বিজ্ঞানবিদ্ মাখনের অন্ধ সমর্থক নগেনবাবু, তিনি তাঁর বাবার ডাক্তারীর কাজ অনেক সময় নিজেও চালান। এমনকি পত্রিকাও একটা সম্পাদনা করেন। তিনি বলেন,—"স্বকলম অপেক্ষা বকলমে আমার বড় জোর! কিন্তু কপির বড় অভাব। সর্বভুক্ মুদ্রাযন্ত্রকে তুষ্ট করা বড় দায়!" শনিবার পত্রিকা বেরোবে। কম্পোজিটার এসে কপি চায়। দিশাহারা নগেন অবশেষে নিজের উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীকে সম্পাদনার ভার দেন। স্ত্রী সানন্দে রাজী হন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করেন। ইতিমধ্যে একজন নোট-বই লেখক তার বই ছাপাবার জন্যে প্রেসে দিলে নগেনের স্ত্রী হেমন্তকুমারী

তার দেওয়া নোট বইটির পাণ্ডুলিপি পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে কম্পোজিটারের হাতে দিয়ে স্বস্তি লাভ করলেন।

এদিকে নগেনের সঙ্গে সঙ্গে নগেনের স্ত্রী হেমন্তকুমারীও মাখনের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেন। এই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ক্রমে প্রেমে রূপান্তরিত হলো। হেমন্তকুমারী মাখনের সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণ করেন, কেননা—শিক্ষিতা হয়ে শিক্ষিতকেই পছন্দ করা উচিত। তাঁরা পরস্পর বিয়ের পরামর্শ করেন। হেমন্ত বলেন,—"এ স্বীকারেও একটা সুন্দর contract আছে, সেই contract অনুসারে আজ আমি Mackenzie Lyall এর highest bidderএ আমার দেহ বিক্রয় করবো, যদি আপনার মত ক্রেতা পাই, I would be only happy." মাখন এতে উৎসাহিত হয়। উকীল রামকান্ত তাদের পরামর্শ দেয়, বলে, বিধবাবিবাহ আইনে নিষিদ্ধ কিন্তু সধবাবিবাহ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই, সুতরাং তা আইনসিদ্ধ। সধবাবিবাহ শুধু আইনসিদ্ধ হলে চলবে না, বিজ্ঞানসিদ্ধ কিনা, সেটাও দেখা দরকার। এজন্যে মাখন আমেরিকার Dr. Voxley-কে তার করে। উত্তরে Voxley তা অনুমোদন করে তার পাঠালেন।

ইতিমধ্যে পত্রিকায় সংবাদের বদলে নোটবইয়ের কথাগুলো ছাপা হয়ে গেলে নগেন উদ্বিগ্ন হয়ে স্ত্রীর কাছে ছুটে যায়; তার কাছে এরকম দায়িত্বহীনতার জন্যে কৈফিয়ৎ চায়। নগেনের স্ত্রী হেমন্তকুমারী তখন বলেন, তিনি এখন পত্রিকার সম্পাদক নন, কারণ তিনি এখন মাখনের বিবাহিতা স্ত্রী। অতএব পত্রিকার ব্যাপারে তার কোনো দায়িত্বও এখন নেই।

নোটবইয়ের লেখক কাগজে তাঁর বই ছাপা দেখে ছুটে এসে অবিবেচনার জন্যে নগেনবাবুকে গালিগালাজ করেন। দুঃখের সুরে নগেনবাবু তাঁকে বলে,—তিনি হারিয়েছেন তার 'বই', কিন্তু সে নিজে হারিয়েছে তার 'বৌ' !!!

(খ) সভ্যতা ও অনাচার॥—

একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০ খৃঃ)—মাইকেল মধুসূদন দত্ত॥ নামকরণের মধ্যে সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে প্রহসনকার প্রকারান্তরে সভ্যতার অনাচার—যা বাহ্যভাবে সভ্যতার চিহ্ন বলে বোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়—তার গতিবিধি উপস্থাপন করেছেন। মাত্রাবৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক অনুশাসনবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সভ্যতার বাহ্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা

জাগায়। প্রহসনকারের সংস্কারের সঙ্গে পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণ বিরাজ করায় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাত্রাবোধ সমাজচিত্রকেই উপস্থাপিত করেছে।

কাহিনী।— কর্তামশায় পরম বৈষ্ণব। বৃন্দাবনেই প্রায় থাকেন। তাঁর ছেলে নববাবু কলকাতায় কলেজে পড়া সাঙ্গ করে কলকাতাতেই স্ফূর্তি করে বেড়ায়। অবশ্য সে বিবাহিত এবং তার স্ত্রী হরকামিনী বিদ্যমান। পড়াশোনা শেষ করে নববাবু তার কতকগুলো ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে "জ্ঞানতরঙ্গিনী" নামে এক সভা স্থাপন করেছে। এতে জ্ঞানের উন্নতি হোক বা না হোক, মদ ও মেয়েমানুষ এর অন্যতম উপকরণ হয়ে "জ্ঞানতরঙ্গিনী" সভার সভ্যদের বিশেষ করে নববাবুকে একেবারে অধঃপাতে নিয়ে যায়।

কর্তা অনেকদিন পর বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলেন। এতোদিন কর্তার অসাক্ষাতে নববাবু যথেচ্ছভাবে স্ফূর্তি করছিলো। এবার সে বড়ো অসুবিধায় পড়লো। কর্তা সবসময় নববাবুকে চোখে চোখে রাখেন। দশমিনিটের জন্যে বাড়ীছাড়া হলেই খোঁজ করেন। নববাবু ভাবে, জ্ঞানতরঙ্গিনী উঠিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নববাবুর ইয়ার কালীবাবু ভাবে,—"হাঃ! এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্তে এলো? এই নব আমাদের সর্দ্দার আর মণিম্যাটারে এ-ই বিশেষ সাহায্য করে, এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।"

কালীবাবু নববাবুর বাড়ী এসেছে। কালীবাবু নববাবুকে নিয়ে সভাতে যাবেই। কিন্তু নিজের পরিচয় সে নববাবুর বাবার কাছে কি দেবে। নববাবু কালীবাবুকে বলে, তার বাবা গোড়া বৈষ্ণব। তাঁর কাছে কালীবাবু যদি বৈষ্ণববংশের সন্তান বলে পরিচয় দেয়, তাহলে সে তার বাবার সুনজরে পড়বে, তাহলে ছেলেকে কালীবাবুর সঙ্গে ছেড়ে দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করবেন না। কালীবাবুর কোন্ এক খুড়ো বৈষ্ণব ছিলেন, বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেছিলেন। নববাবু কালীবাবুকে তাঁর পরিচয় দিতে বলে। তাছাড়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আর জয়দেবের গীত গোবিন্দ—বইদুটোর নামও শিখিয়ে দেয়। দুই-একটা বৈষ্ণব গ্রন্থের নাম না জানলে চল্‌বে কেন? কর্তা এলে কালীবাবু নিজের পরিচয় দেয়। সে পরমবৈষ্ণব ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র। নববাবুর সঙ্গে কলেজে পড়েছে, এখন কাজকর্মের চেষ্টা করছে। তারপর সে কর্তামশায়কে জ্যেঠামশায় সম্বোধন করে বলে,—"আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা

করুন।" সে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নাম করে। সেখানে তারা যাবে। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে বলে,—"আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হযেছিল, তা. আমাদের জাতীয ভাষা ত কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায একত্র হযে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।" সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কেনারাম বাচস্পতি এদের শিক্ষক। পাঠ্য পুস্তকের কথা বল্‌তে গিযে নববাবুর বলা বইদুটোব নাম ভুলে গিযে বলে,—"শ্রীমতী ভগবতীব গীত, বোপদেবের বিন্দাদূতী।" কর্তামশায শুনতে না পেযে আবার জিজ্ঞেস করলে নববাবু ঠিক নাম দুটো বলে দেয কালীবাবুর হযে। কর্তামশায এসব শুনে উচ্ছ্বসিত হযে ওঠেন। কালীবাবুব সঙ্গে ছেলেকে ছেড়ে দিতে কর্তাবাবুর আর আপত্তি থাকে না।

কিন্তু পাঠিযে দিযে তাঁর কেমন একটা খট্‌কা লাগে। কলকাতা জাযগাটা বড়ো ভালো নয। তার ওপর সকদার পাড়ার রাস্তায ক্লাব। কালীবাবুরা চলে যাবার পর সভাটা একবাব দেখে আসবার জন্যে তিনি তাঁর অনুগত এক বাবাজীকে পাঠালেন।

বাবাজী সিকদার পাড়া ষ্ট্রীটে এসে বোকা বনে যায। কযেকজন বেশ্যা সেখানে চলাফেরা করছিলো, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাব কথা জিজ্ঞেস করতে গিযে সে বেযাকুফ্ বনে যায। তারা ভাবে, তরঙ্গিনী নামে কোন্ এক বেশ্যার খোঁজে বাবাজী এখানে চলাফেরা করছে। তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তাদের হাত থেকে বেঁচে সে আবাব পুলিস সার্জেণ্টের খপ্পরে পড়ে। চোর বলে সে বাবাজীকে ধরে। শেষে তাব থলি ঘেঁটে চারটে টাকা পায। সেগুলো নিযে সার্জেণ্ট তাকে ছেড়ে দেয। অনুচর চৌকিদারকে সে সাবধান করে দেয, একথা যেন প্রকাশ না পায। তারপর একটু এগিযে বাবাজী দেখে পথ দিয়ে বেলফুল আর বরফ হেঁকে যাচ্ছে। মুটের মাথায নিষিদ্ধ মাংস আর মদ যাচ্ছে। বাবাজী বলে,—"উঃ" থু, থু, রাধেকৃষ্ণ। আমি তো জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বিষয কিছু বুঝতে পাচ্চি না।"

নববাবু আর কালীবাবু আসে। হঠাৎ বাবাজীকে দেখে নববাবু কালীবাবুকে বলে,—"কেমন ভাই কালী, আমি বলেছিলেম কিনা যে, কর্তা একজন না একজনকে অবশ্যই আমার পেছন পেছন পাঠাবেন।" কালীবাবু বলে,—"বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল, কাটলেট, কি মটন চপ খাইয়ে

দি, শালার জন্মটা সার্থক হোক।" কিন্তু নব একটু চিন্তিত হয়। সে বাবাজীকে সম্ভাষণ করে জান্‌লো, বাবাজী এদিক দিয়ে যাচ্ছিলো, 'নববাবুদের সভাভবনটা একবার দেখেযাই'—ভেবে এখানে এসেছে। শেষে নব তাকে টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করে। কালীবাবু মন্তব্য করে,—"আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক হয়েছি। শালা এদিকে মালা ঠক ঠক করে, আবার ঘুস খেয়ে মিথ্যে কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট।"

নববাবু যখন কালীবাবুর সঙ্গে বাইরে গিয়ে বাবাজীকে বুঝিয়ে বশ করছিলো, তখন ওদিকে সভার সভ্যরা অস্বস্তিবোধ করছিলো। নববাবু না এলে সভা আরম্ভ কি করে হবে? তখন নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী। তাই তারা বাধ্য হয়ে চৈতনবাবুকে চেয়ারম্যান করে। চেয়ারম্যান হয়েই চৈতনবাবু "নাউ টু বিজ্‌নেস" বলে খানসামাকে বাণ্ডি তামাক ইত্যাদি আনতে বলে। খানসামা আদেশ পালন করে। তারপর মদ্যপান চলে। ইতিমধ্যে ঘোম্‌টাওয়ালী নিতম্বিনী আর পয়োধরী তাদের যন্ত্রীদের নিয়ে এসে ঘরে ঢোকে। গান চলে, সেই সঙ্গে চলে মদ্যপান। নববাবু একটু দেরী করে এসে কৈফিয়ৎ দেয়। শিবু তাকে মত্ত অবস্থায় বলে,—'হ্যাট্ ও লাই।" চটে গিয়ে বলে,—"হোয়াট, তুমি আমাকে লায়ার বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি সুট্ করবো" চেয়ারম্যান চৈতন বলে,—"একটা টাইফলীং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন?" আরো চটে গিয়ে নববাবু বলে,—'ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লেনা কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্লে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু লায়ার—এ কি বরদাস্ত হয়।" অনেক কষ্টে চৈতনবাবু তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে। সে মদ খায়। পয়োধরীদের দেখে তার সব রাগ জল হয়ে যায়—তারপর তার বক্তৃতা সুরু করে। নব বলে,—"জেণ্টলমেন! আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারিষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে এ দেশের সোসিয়াল রিফর্মেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।" "জেণ্টেলমেন! তোমরা মেয়েদের এজুকেট্ কর,—তাদের স্বাধীনতা দাও,—জাতিভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তাহলে এবং কেবল তাহলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে,—নচেৎ নয়।"...

"কিন্তু জেণ্টেলমেন, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা, এই গৃহ কেবল আমাদের লিবার্‌টি অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান, এখানে যার যা খুসী, সে তাই কর। জেণ্টেলমেন! ইন্ দি নেম্ অফ ফ্রীডম্, লেট অস্ এঞ্জয় আওয়ারসেল্‌ভ্‌স্!"

নববাবুর বক্তৃতার শেষে যথেচ্ছভাবে নাচগান মদ্যপান, আর সেই সঙ্গে হৈ হুল্লোড় চল্‌তে থাকে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার জ্ঞানচর্চা এভাবে শেষ করে তারা সকলে মত্ত অবস্থায় নিজের নিজের বাড়ীতে ফেবে।

নববাবুর বাড়ীতে নববাবুর স্ত্রী হরকামিনী ঠাকুরঝিদের নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাস খেল্‌ছিলো। নববাবুর মা আবার তাস্ টাস্ খেলা পছন্দ করেন না। তাস খেল্‌তে খেল্‌তে হরকামিনী নববাবুর মদ খাওয়ার কথা তোলে। একদিন নাকি নবকুমার মদ খেয়ে এসে সামনে বোনকে দেখে তাকে ধরে তার গালে একটা চুমো খেয়েছিলো। "ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বল্লেন যে, কেন, এতে দোষ কি? সায়েবেরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?"

মেয়েরা নানাকথা আলোচনা করছে, এমন সময় চীৎকার করতে করতে নববাবু বাড়ীতে ঢোকে। চাকর বৈদ্যনাথ আস্তে কথা বল্‌তে বলে,—কর্তা মশায় ও ঘরে ভাত খাচ্ছেন। নববাবু বলে,—"ড্যাম্ কত্তা মশায়! আমি কি কারো শঙ্কা রাখি?" ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে—চীৎকার করে সে হুকুম করে,—"ল্যাও ব্রাণ্ডি—ল্যাও—জল্‌দি।" হরকামিনীকে দেখে 'পয়োধরী' বলে সম্বোধন করে নববাবু অশ্রাব্য কথা বল্‌তে সুরু করে দেয়। তারপর "এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড্ স্লেভ" বলে এগোতে গিয়ে নববাবু মাটিতে পড়ে যায়। হরকামিনীদের ভয়ার্ত চীৎকারে নববাবুর মা ছুটে আসেন। নববাবুর মুখ দিয়ে বদ্‌গন্ধ বেরোচ্ছে। গিন্নি ভাবেন, কেউ বুঝি বাছাকে বিষ খাইয়েছে। চীৎকার শুনে কর্তা মশায়ও এসে পড়েন। নবকুমারকে এ অবস্থায় দেখেই তিনি সব বুঝতে পারলেন। তীব্র ভাষায় তাকে তিনি গালাগালি করতে লাগলেন। গৃহিনী রেগে গিয়ে বুড়োকে পাগল ঠাওরায়। তারপর বলে,—"একি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করে বকুচো কেন?" নব মদের ঘোরে—"হিয়ার হিয়ার!—হুরে।" বলে চেঁচিয়ে ওঠে। গিন্নি ভাবেন, বাছাকে বুঝি ভূতে পেয়েছে। কর্তা সরোষে বল্লেন, ছেলে মাতাল হয়েছে। নববাবু "মদ ল্যাও" বলে চেঁচিয়ে

উঠ্‌লে গিন্নি এবার বুঝতে পারে। তিনি বলেন,—"ওমা, আমার দুধের বাছাকে এসব কে শেখালে গা?" কর্তা জবাব দেন,—"আর শেখাবে কে? এ কলকাতা মহাপাপ নগর, কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত।"

পরদিন সকালেই তিনি সকলকে নিয়ে আবার বৃন্দাবনের দিকে রওনা হন। হরকামিনী ভাবে,—"ছি ছি ছি! বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবদের মত সভ্য হয়েছি, হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?"

সভ্যতা সোপান (কলিকাতা—১৮৭৮ খৃঃ)—প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়॥ প্রহসনকার দৃশ্যকে "সমাজচিত্র" বলে উল্লেখ করেছেন। নামগুপ্ত রেখে তিনি নিজ পরিচয়ে বলেছেন,—"প্রজা হিতাকাঙ্ক্ষিণা কেনচিদ্বাঙ্গবেনাভিপ্রণীতম্।" মলাট পৃষ্ঠায় একটি ইংরাজী উদ্ধৃত দেওয়া হয়েছে,—

"He that depends
Upon your favor Swims with fins of lead,
And hews down oaks with rushes.
—Coreolanus.

নামকরণে লেখক প্রগতির পথে বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সচেতন হতে বলেছেন।

কাহিনী।—মহেন্দ্র কলকাতার এক ধনীর পুত্র। সে ইয়ারদের সঙ্গে মদ খেয়ে এবং বেশ্যাবাড়ী গিয়ে টাকা ওড়ায়। তার বন্ধু নবীন সচ্চরিত্র যুবক। সে তাকে পরামর্শ দেয়,—"শুঁড়ীর দোকানে না দিয়ে যদি Science Association এ দিতে, তাহলে দেশের অনেক উপকার হতো। অনাহারী দরিদ্রদের দিলেও তো তারা তোমার প্রাসাদে আহারীয় পেতো।" Public Road-এ expose করবার জন্যে মহেন্দ্র তাকে মৃদু তিরস্কার করে। তারপর বলে,—"আমরা হচ্ছি Reformer, সকল সঙ্গত করে নিচ্চি, দেশীয় প্রাচীন সঙ্গীত চর্চ্চা খালিয়ে নিচ্চি। ইউ মষ্ট বেয়ার ইন মাইণ্ড, আমি আমার ওয়াইফকে রিফরমড্ করে নিচ্চি। তার এতদূর রিফরমেশন হয়ে গেছে যে আমি তার regeneration করিচি বল্লেই হয়। সে হিসাবে আমি সেকেণ্ড প্রজেনিরেটারের মত রিজেনরেটর।"

ঐ পথেই পিতম্বর গোস্বামী আর পাদরি গ্রাউট আসে। মহেন্দ্রদের দেখেই

অমনি বক্তৃতার ভঙ্গীতে পাদরি বলে,—"হে প্রিয় মনুষ্য, প্রিয়টম বালক প্রেয়সী বালিকাগণ, টোমরা আর এট ক্ষুদ্র নাই যে মাটার চুচি পান কর, এক্ষণে সকলে ঢর্ম্মের বিষয় বুঝিতে পারিযাছ, আমরা সকলে পাপী, পাপের পরিট্রান আবশ্যক। যোহন বলিযাছেন, স্বর্গ হইটে আইসে যে জীবনরূপ খাড্য টাহার কারণ প্রার্ঠণা করহ যেন তোমরা টাহা ভক্ষণকারী সকলে মবিবা না কিণ্টু অনণ্ট জীবন পাইবা। ডেখ আমবা কি অডভূট শিক্ষা পাই। ঢর্ম্মের নিমিট্ট সকলি টুচ্ছ করিটে শিক্ষা পাই কারণ লিখা আছে যঠা—টোমরা সকলের ঘৃণাস্পড হইবা। ডেখ হিণ্ডুরা কি মূর্খ। গোপাঙ্গনাডিগের সহিট কামকারী যে কৃষ্ট, স্বামীবক্ষ পডা যে কালী—উঃ কালীর নাম করিটে আমার আটঙ্ক হয—টাহাডিগকে পূজা করে। ঈশ্বর নির্ম্মিট ড্রব্য, ফুলচণ্ডন ডিযা ঈশ্ববেব আরাঢনা করে, কিণ্টু বাইবেলে লিখে ঈশ্বর আট্মা স্বরূপ যে কেহ টাহার আরাঢনা করিবে, আট্মা ও মন ডিযা আরাঢনা করুক।" মহেন্দ্র বলে,—"মন ও আত্মাও তো ঈশ্বর সৃষ্ট।" সাহেব তখন বলে,—"তুমি বুঝিবা না, বুঝিটে পারিবা না।" শেষে তর্কে হেরে গিযে সাহেব বলে,—"অড্য সময অঢিক হইযাছে সমযাণ্টরে বুঝাইযা ডিব।" এই বলে পালিযে গিযে সাহেব হাঁফ ছাড়ে।

মহেন্দ্রের বৈঠকখানায তার ইথাররা এসে জড়ো হযেছে। মহেন্দ্র কামাখ্যা নামে এক বাঙ্গালকে এনে হাজির করেছে। মহেন্দ্র সকলের সঙ্গে কামাখ্যার পরিচয করিযে দেয। 'বাঙ্গাল' শব্দটা শুনতে পেযে কামাখ্যা হঠাৎ চটে যায। বলে,—"অ'রে বাঙ্গাল বাঙ্গাল কইচো ক্যান্? বাঙ্গাল এহ নাহি? আংরেজের পোলা সাএব আইচেন।" কমল ছড়া কাটে,—

"অল্‌দিগুড়া হুক্কাপাতা হিন্দল হিকই
মজাইল হর্ব্বধন কেমনে কুল্লই॥"

আরও চটে গিযে কামাখ্যা বলে ওঠে,—"কোন পুঙির পুতি ল্যাক্‌চে কোন্—ছ্যাহো না মহেন্দ্রবাবু আপনার এযানে মোর অপমান করচে মরে কতোইয়া কইচে।" শেষে নবীন কামাখ্যাকে শান্ত করে। তারপর গোঁসাইবাবুর গান সুরু হয। গানের মাঝখানে কামাখ্যা গর্দভস্বরে গান জুড়ে রসভঙ্গ করে দেয়। গোঁসাইবাবু বলে,—"বাঙ্গাল বৈদ্য জাতই আলাদা। সেনের কুলে বাতি দিয়ে প্রভুরা ধ্বজা খাড়া কচ্চেন। বল্লাল সেন কুলীন কল্লে, লক্ষ্মণ সেন অধীন কল্লে আর ফল্‌না সেন অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কল্লে।" নবীন কাছে থাকায মহেন্দ্রের বন্ধুরা

কুকাজ করতে পারছিলো না। কমল কায়দা করে নবীনকে ভাগিয়ে দেয়। নবীন অবশ্য সরল মনেই চলে যায়। কমল বলে ওঠে,—"আপদ গেল। শালা কেবল Lecture দেবেন। ওর সমুখে কোন কাজ হতে পারে না। উনি ব্রাহ্ম।" মহেন্দ্র বলে,—"ওহে ব্রাহ্মেরা ব্যাঙাচির দল, ন্যাজটি খস্‌লিই ব্যাঙ হন।" তারপর সকলে মিলে মদ্যপান করে এবং আবোল তাবোল বকে। শেষে হল্লা সুরু হয়। তখন মহেন্দ্র বলে,—"মেরে ফেল্‌লে বাওয়া—এমন মজলিস এখানে শোভা পায় না। চল বাগানে যাই।" সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে মহেন্দ্র বাগানবাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

মহেন্দ্রের এই স্বভাবের জন্যে মহেন্দ্রের স্ত্রীর বসন্তকুমারীর খুব কষ্ট। "শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসে অবধি একবারও সোয়ামীর মুখ দেখ্‌তে পাই নি। আমার যেমন কপাল তেমনি তো হবে চাই। বাপ মা তো ভাল দেখেই দিয়েছিলেন, আমার কপালেই ভাল নেই, তাদের দোষ কি। আমি তো এ কষ্ট আর সইতে পারি নে।" স্বামীর ওপর তার মাঝে মাঝে ঘৃণাও হয়। সেদিন নাকি তার স্বামী এক কচি মেয়েকে বার করে এনেছেলে।—বসন্ত এসব কথা ভাবছে, এমন সময় মহেন্দ্র আসে। মহেন্দ্র যাতে বিরাজী নামে বেশ্যাটির সংস্পর্শ ছাড়ে, সে জন্যে বসন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ জানায়। বসন্ত বলে,—সে মহেন্দ্রের স্ত্রী, মহেন্দ্র তার স্বামী। মহেন্দ্র মন্তব্য করে—"তুমি আমার স্ত্রী হতে পার, কিন্তু আমি তোমার স্বামী নই। স্বামীকে ইংরাজীতে বলে husband আর মানুষকে বলে man, তাই তোমার স্বামী হলে সভ্য সমাজে আমায় husband man বলে ডাকবে।" বসন্ত তখন মাথা কোটে। মহেন্দ্র বলে,—"তুমি আজও সভ্যতা সোপানে আরোহণ করো নি। কাল তোমায় হরবাবুদের শিশুবর্দ্ধিনী সভায় নিয়ে যাব।" স্ত্রীর আর বলবার কিছু থাকে না।

এই সভ্যতার সোপানে এরা সকলে ধাপে ধাপে পা ফেলে চলে। ইতিমধ্যে টমাস গ্রাউট একটা কুকাজ করে ফেলে। ধর্ম প্রচার করতে যাবার জন্যে সহিসকে ডাক দেয়। সহিস আসতে কয়েক মিনিট দেরী করায় গ্রাউট তাকে "ড্যাম নিগর" "বদমাস" "শালা" "Scoundral" "Scara mouch Rogue" ইত্যাদি বলে গালাগালি দেয় এবং দমাদ্দম পেটাতে সুরু করে। মার সহ্য করতে না পেরে সহিস হঠাৎ পড়ে মরে যায়। সহিসের স্ত্রী এসে কাঁদতে লাগলে গ্রাউটের বন্ধু জোন্স তাকে ধমক দেয়, শেষে তাকেও

মারে। শেষে বাধ্য হয়ে বলে,—"চুপ করো সাথ আও রোপেয়া ডেগা গোল্ মট্ করো। গোল ক'সে উস্‌কো কুকুর ডেকে খেলাওযে গা।"

নবীন কাছাকাছি জায়গায় ছিলো। সে পাদ্রীদের ওপরে তার এতোদিনের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। "বেটা একটা খুন করে অনায়াসে বল্লে কিনা পীলে ফেটে মরে গেছে।" অর্থের লোভে ডাক্তার ফ্রেমেন পরীক্ষা করে এই কথা বল্‌বেন বলে গ্রাউটের কাছে স্বীকৃত হয়েছেন। একজন প্লীডারও নাকি গ্রাউটের হয়ে পীড্ করবেন। নবীন ভাবে, অর্থের কি মোহিনী শক্তি! সাহেব শুধু ডাক্তার উকীলকেই হাত করে নি, চাকরবাকরদেরও মিথ্যা বলবার জন্যে তোতা পাখির বুলির মতো শিখিয়ে দেয়। নবীন সবকিছু নিজের কানে শুনে ভাবে—"এ আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, টাকার জোর বড় জোর!" যা হোক নবীন স্থির করে, সত্যঘটনা সে পুলিশকে জানাবে এবং দরকার হলে আদালতে দাড়াবে।

নবীনের চেষ্টায় একদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গ্রাউটের বিচার হয়। অবশ্য বিচারের নামে প্রহসন। বিশেষ কাজ থাকায় গ্রাউট নিজে আসতে পারে নি। তার বদলে তার বন্ধু জোন্স এসেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নে জোন্স জবাব দেয়, "He died accidentally. I know particulars about it." সরকারকে জেরা করা হলে সরকার ঘাবড়িয়ে বলে ওঠে—সাহেব সহিসকে অনেকক্ষণ ডেকে সাড়া পায় নি। শেষে সহিস এলে সাহেব রেগে আস্তে কিল মারে। পরে ও মরে গেলো। ডাক্তারকে ডাকা হলে সে বলে, আসলে সে মার খেয়ে মরে নি, রোগেই মরেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন, টমাস গ্রাউট নির্দোষ। সমাগত সাহেবরাও বলে ওঠে,—"Not guilty." ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন,—"ঐ সাবের কোন দণ্ড হটে পারে না। ডয়া করে কেবল ঐ মৃটের বিটবাকে মাসিক কিছু ডিবেন। আর নবীনবাবু মিঠ্যা সাহেবের নিণ্ডা করায়, টিনমাস কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাবাসের আডেশ পান। পরিবর্টে তিন শত টাকা জরিমানা।" নিরপরাধ নবীন সাজা পেলো এবং খুনী পাদ্রী গ্রাউট ছাড়া পেলো।

মহেন্দ্র এদিকে ইয়ারদের নিয়ে স্ফূর্তি করে। বলে, মজা করতেই পৃথিবীতে আসা। "যে সকল লোক আহাম্মুখ তারাই ধর্মের ভয় করে। পাপ কি? নরক? নরক বলে কিছু নেই। সুতরাং পাপ যদিও বা থাকে, তার ফলভোগ নেই।" ইতিমধ্যে সরকার হঠাৎ ছুটতে ছুটতে আসে।

সে সম্পূর্ণ উন্মত্ত এবং আতঙ্কগ্রস্ত। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে সে বিবেকের দংশনে পাগল হয়ে আত্মার যন্ত্রণায় ছটফট্ করে। সরকার বলে, সে গ্রাউটকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। ভুল করে মহেন্দ্রের মদের বোতলেও সে বিষ মিশিয়ে ফেলেছে। মহেন্দ্রের সে বোতল খাওয়া তক্ষুনি শেষ হলো। মহেন্দ্র যন্ত্রণায় ছটফট্ করে। সে স্বীকার করে—নরক সত্যিই আছে। পাপপুণ্যও আছে। যন্ত্রণা পেতে পেতে মহেন্দ্র বলে চলে,—"ওহে নাস্তিকগণ ওহে ভণ্ডদল, ও দাড়ীযুক্ত ব্রাহ্ম যুবকেরা তোমাদের চেয়ে অধিক কাপট্য আমার ছিলো। কিন্তু আমার ন্যায় ফাঁদে পড়ো না। এখনও সময় আছে, আমার সময় নাই। আমি ঠেকে শিখ্‌লাম তোমরা দেখে শেখো।"

তারপর সকলকে উদ্দেশ করে সে বলে চলে,—"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ, তোমাদের কুরীতি, কুসংস্কার, কুসংসর্গ ও জঘন্য দেশাচার এখনও ত্যাগ করো। ইংরাজী সভ্যতা শিখো না। সভ্যতার সঙ্গে পাপ বাড়ে।· · যুবকগণ, আর সভ্যতা সোপানে আরোহণ কত্তে ব্যগ্র হয়ো না। এই সভ্যতা-সোপান। ইংরাজদের গুণ নিতে পারিনি দোষটুকু নিইচি। বক্তৃতা দিতে দিতে মহেন্দ্র ঢলে পড়ে যায়?"

সভ্যতার পাণ্ডা (১৮৯৪ খৃঃ)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ॥ তথাকথিত সভ্যতার বাহ্য বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অনুশাসনবিরোধী গতিবিধি চিত্রণের মধ্যে প্রহসনকারের সমর্থনপুষ্ট দৃষ্টিকোণই প্রকাশ পেয়েছে। নামকরণে নব্য সংস্কৃতির নেতৃত্বের দিক কটাক্ষিত হলেও পূর্বোক্ত রূপে সভ্যতার স্তর পর্যবেক্ষণের মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে।

কাহিনী—নতুন বছরকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে 'সভ্যতা' ভাবে নতুন বছরে নতুন কতো কি দেখে যাবে। "একি কেউ সম্ভব ভেবেছিল, হিঁদুতে মুরগী খাবে? বামুন খৃষ্টান হবে? কুলের বধূ মেম সেজে হাওয়া খাবে, পূজায় সাহেবের খানা হবে, বাপ-ব্যাটায় গার্ডেন পার্টি করবে, বেশ্যার সঙ্গে, স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেবে, বাপ-মাকে পৃথক করবে।" অসম্ভব কিছুই নয়। চৌরঙ্গীর রাস্তায় বেঙ্গল ক্লাবের সামনে একজন বিউগেল বাদক ও ছয়জন হ্যাণ্ডবিল ওয়ালা ঘোষণা করে—খৃষ্টমাসের দিন সাতপুকুরে বরের নীলাম হবে—যেমন বর চাইবে, তেমনি পাবে।

ভবতারিণীর বাড়ী বিশ্বেশ্বরী আসে। দুজনেই আধুনিকা। বিশ্বেশ্বরী নিজের

বিয়েতে কন্যাযাত্রীর নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। ভবতারিণী কথা দেয়।—"আমি তোমার কোন বে-তে কন্যাযাত্রী যাই নি বল? প্রথমকার বে-তে বাসর জাগি, দ্বিতীয় বে-তে তেরাত্তির ছিলুম, যদি না ঝঞ্ঝাটে পড়তুম, তুমি জোড়ে ফিরে আসা অবধি তোমাদের বাড়ীতে থাকতুম। তুমি কি ভাই আমার পর?" ভবতারিণীর অনেক কাজের চাপ। "এক ভোরে ওঠা, টিথ বুরুষ দিয়ে দাত মাজা, গোসলখানায় যাওয়া, ছোটহাজরে বড় হাজরে খাওয়া—কর্তার সঙ্গে বসে খেতে হয়। কর্তা একলা খায় না—টিফন, ডিনার, তিনবার ড্রেস করা, তারপর মেয়েকে বৌকে পড়ানো।" যাহোক, এইসব ঝামেলায় অনেকসময় বিয়েতে যাওয়া ইত্যাদি লৌকিকতা রাখা অনেক কষ্টদায়ক হয়। বিশ্বেশ্বরী ভবতারিণীকে নিজের নতুন বিয়ের কথা বলতে গিয়ে বলে,—"আমার স্বামী মরতে রুমলে একটু অডিকলোম দিয়ে মুখে দিলুম। অডিকলোমের ঝাজে চোক দে জল পড়তে লাগলো আর ফোঁপাতে লাগ্‌লুম। একথা শুনে ভবতারিণীর দুঃখ উথলে ওঠে। তার কর্তা মরেও না, পছন্দ করে একবার বিশ্বেশ্বরীর মতো বিয়েও করতে পারে না।

বিশ্বেশ্বরী চলে গেলে ভবতারিণীকে তার স্বামী নীলকান্ত বলে, সে ফ্যান্সী বাজারে নতুন কনে কিনতে যাচ্ছে। ভবতারিণী উৎসাহিত হয়ে বলে,—সেও যাবে বরের নীলামে বর কিনতে। তারপর মহড়া দিয়ে নিয়ে সেই অনুযায়ী দুজনে কাঁদে। নীলকান্ত বলে,—"বেশ কথা। তবে এস, দু'জনে কাঁদি।" ভবতারিণী বলে—"নাও, এই এসেন্স চোখে দাও।" তারপর কিছুক্ষণ ধরে কান্না শেষ হলে দুজনে চলে যায়। আইনে আর বাধবে না। কেননা নীলকান্ত আগেই নিজের 'ডেথ্‌ রেজেস্টারী সার্টিফিকেট' বারিয়ে নিয়েছে।

সর্বেশ্বরের বাড়ীতে বিবাহ-সভা বসেছে। নসীরামবাবুর মামা শশিভূষণ নসীরামের জন্যে মেয়ে দেখবার জন্যে দীনুকে নিয়ে সর্বেশ্বরের বাড়ীতে এসেছে। সর্বেশ্বর এদের অভ্যর্থনা করে বসায়। সর্বেশ্বর বলে, পাত্রীর পিতা তিরিশ বছর আগে পরলোকগমন করেছেন। "বিন্দাবন বিশ্বাসের কন্যা, তিরিশ বছরে বিধবা হন, আজ দশবছর আমার প্রণয়িনী, আজ শুভদিনে নসীরাম-বাবুর হস্তে অর্পণ করবো।" পাত্রী আসলে সর্বেশ্বরেরই স্ত্রী। শশিভূষণ এসবে অভ্যস্ত নয়। সে ঘাব্‌ড়ে যায়। দীনু তাকে আশ্বস্ত করে বলে, বেহাই বলে সর্বেশ্বর এমনি ঠাট্টা-মস্করা করছে।

এমন সময় নাচগান করতে করতে বিশ্বেশ্বরী ও কুমুদিনী আসে। সামনে

মামাশ্বশুর হিসেবে দীনুর পরিচয় পেয়ে তাকে হ্যাণ্ড শেক করে। দীনু ভাবে, এদের বুঝি থিয়েটার থেকে আনা হয়েছে। দীনু 'থিয়েটার' শব্দটা উচ্চারণ করলে সর্বেশ্বর বলে,—"কি! আমার পরিবারের সামনে অশ্লীল কথা আপনি উচ্চারণ করেন!" 'থিয়েটার' শব্দটাই নাকি অশ্লীল শব্দ।

নসে বর সেজে আসে। সর্বেশ্বরকে সে কনে সম্প্রদান করতে বলে। নসের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরীর বিয়ে হবে। কুমুদিনী অবশ্য নাকি বরের নীলাম থেকে দেখে শুনে নেবে একটা। ইতিমধ্যে পুরুতও এসে পড়ে। পুরুত বলে,—"আমায় চেনেন না, আমি স্মৃতিরত্ন, নতুন স্মৃতি করেছি, তাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে যে, কন্যা সম্প্রদান করতে পাবে, এক বাপ—আর স্বামী।" পুরুত শশীকে অনুরোধ করে—তার নিজের ব্রাহ্মণীটাকে যেন শশী বিয়ে করে। যাহোক মামা ভাগ্নে অর্থাৎ শশী আর নসীর কনে জোটে। দীনুর মন খারাপ হয়, তার কনে জুটছে না। তখন কুমুদিনী বলে,—"যদি স্বীকার পাও, তিন দিনের ভেতর মরবে, আমি তোমার কনে হতে স্বীকার।" ভয়ে ভয়ে দীনু রাজী হয়।

বর-কনে কেনবার জন্যে নীলকান্ত ও ভবতারিণী এখানে এসে পড়ে। পুরুত তখন বুদ্ধি দেয়,—দীনু ভবতারিণীকে নিক, আর কুমুদিনীকে নিক নীলকান্ত। তাহলে "রাজচটক" হবে। তারপর মন্তর পড়ে বিয়ে হয়,—শশীর সঙ্গে পুরুতনীর, দীনুর সঙ্গে ভবতারিণীর, নসের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরীর এবং নীলকান্তর সঙ্গে কুমুদিনীর।

সাত পুকুরের বাগানে নীলামঘর। বিডার স্বয়ং নসীরাম। তাছাড়া সেল-মাষ্টার রাইটার, ক্যাশার, বুক কিপার, বেহারা, বৃদ্ধা, বিশ্বেশ্বরী এবং কতকগুলো ফিমেল ক্রেতা আর বর রয়েছে। ক্রয়ার একটা পাঁচশের চাইতে কম বয়সের জুল্পি, মাঝখানে সিঁথে, নেশাখোর, স্ত্রী অত্যাচার-সহিষ্ণুকে ওঠায়। আটআনা থেকে দর উঠিয়ে বৃদ্ধা ধনমণি পোদ্দার সব মেয়েকে ডিঙিয়ে তাকে কিনে নেয়, পৌনে বারো আনা দিয়ে। বৃদ্ধা সধবা। রাইটার তাকে টিকিট দেয়। টিকিট নিয়ে ক্যাশ ঘরে টাকা জমা দিয়ে সেখানে রসিদ দেখিয়ে মাল ডেলিভারী নিতে হবে। পরের লাটের নম্বর চাষা বরকেও বৃদ্ধা পাঁচআনা থেকে দু-টাকায় দর উঠিয়ে কিনে নেয়। বৃদ্ধা কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলে,—"কি জানেন, পাঁচটা স্বামী আমার মারা গিয়েছে, গোটা পাঁচ ছয় কিনে রাখি, যটা, মরে যটা থাকে।" পরের যুবাকেও বৃদ্ধা কিনে নেয়। "মেয়েকে হার্মনিয়াম

শেখাবে, জুলজিক্যাল গার্ডেন দেখাবে, হাই সার্কেলে ইনট্রোডিয়ুস্ করিয়ে দেবে।" তারপর চুয়াত্তর বছরের এক বৃদ্ধ বর আসে। "খোঁপা বেঁধে দেবে সেজ সাজাবে, ছারপোকা মারবে, মশারি সেলাই করবে, আর যদি কেউ ভদ্দরলোক দেখা কর্ত্তে আসে, তখনি সেখান থেকে সরবে।" চা'র পয়সা দামে তৃতীয়া স্ত্রী মনোমোহিনী কুণ্ডু তাকে কিনে নেয়। সে বিধবা। বৃদ্ধও তেজপক্ষের। তার একটি সার্কাস করতে গিয়ে খোয়া গেছে, আর একটি ব্রাহ্ম বিয়ে করেছে। তারপর ক্রায়ার নতুন মাল ওঠায়—পাঁচ বছরের ক্ষুদে বরকে তোলে—সে নাকি হেসে হেসে কথা কয়—হুইস্কি টানে খুব। ক্রায়ার মালের দর দেয় পঞ্চাশ টাকা। বৃদ্ধার তখন কেনবার ঝোঁক বেড়ে যায়। অন্য মেয়েরা তখন সঙ্কল্প করে—সবাই মিলে তারা একসঙ্গে ঐ বর কিনে নেবে, বৃদ্ধাকে কিনতে দেবে না। মেয়েরা মালের দর ওঠায় একশো টাকা। যুব বর এদিকে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং টুল ঘাড়ে করে পালায়। সঙ্গে সঙ্গে লাটের অন্যান্য মালগুলোও হাওয়া হয় মেয়েরা হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

ওদিকে জুলজিকাল গার্ডেনে তামাসা চল্‌ছে। কিপার আর কিপারেসরা পশুদের নিয়ে তামাসা দেখায়। প্রথম তামাসা—সংস্কারক বৃষ ও গাভী। গাভীকে ষাঁড় দুধ দিতে বারণ করে, গাভী ষাঁড়কে ঘাস খেতে বারণ করে, শেক হ্যাণ্ড করে। প্রতিজ্ঞা করে তারা, উলঙ্গ ষাঁড় বা গাভী দেখ্‌লে তারা গুঁতোবে। তাছাড়া আরও প্রতিজ্ঞা করে,—এমনিতে মরবে না, জবাই হয়ে মরবে। তারপর দ্বিতীয় তামাসা—অধ্যাপক গদভ। সে এসে বলে,—"ছেলে বয়সে এক বোঝা বই মাথায় চাপালে মাথাটা চেপ্টে গেল। চড়িয়ে মুখ লম্বা করলে। তারপর পিঠের ওপর দুছালা বই দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লুম, চারপায়ে হাঁটতে শিখলুম। কান দুটো টেনে টেনে লম্বা হলো, আর লেজ বেরুলো আপনি।" সে ঠিক করেছে, ট্রেনিং স্কুল করবে। "যারা ভর্ত্তি হবে, তারা ঠিক আমার মতন হয়ে বেরুবে।" তৃতীয় তামাসা—স্মার্ত্ত বানর বানরী। বানরীর প্রশ্নে বানর জবাব দেয়, বানর বানরীরা মানুষের অনুকরণ করতে বাধ্য, কেননা বিজ্ঞানমতে তারা স্বজাতের। অতএব চুরি করতে, বড় বানরের লেজ ধরতে, ঝগড়া করতে, ডাইভোর্স করতে—ইত্যাদিতে এরা বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে বানরী বানরকে ডাইভোর্স করে চলে যায়। চতুর্থ তামাসা—ভলেন্টিয়ার ভেড়া—ভেড়া নাকি কাঠের ঘোড়া চড়ে নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে। কেউ

লড়াই করতে এলে পালাবে। পঞ্চম তামাসা—হাডগিলে কমিসনার। সাহেবদের এঁটো হাড় গিলে তার এই নাম। "টেক্সর বিলের" মধ্যে তার বাস। সে এখন নাকি ভোট নিতে এসেছে। রেযোতের হাড়মাস খাবে। তারপর সবশেষে ষষ্ঠ তামাসা—পূজারী ভালুক আর যজমানী ভালুকী। ভালুক মহুযার নেশায় মাতাল, কার পূজা হবে জানে না. অথচ বলে, নৈবেদ্য সাজাও, শাঁখ বাজাও। শেষে সে সবাইকে বলে, তাকে ধরে শুইযে দিতে। দাঁড়াতে পারছে না। আবার বলছে,—কুস্তি লডবে—কিন্তু কার সঙ্গে লডবে জানে না। শেষে বলে. নাচবে। এবার অবশ্য বলতে পারে কার সঙ্গে সে নাচবে। ভালুকীর সঙ্গে সে যথারীতি নাচতে আরম্ভ করে।

বছরে বছরে নতুন নতুন রীতিনীতি চাল-চলন হচ্ছে। ১২৯৫ সালকে নতুন বছরের পদে বহাল করা যায কিনা, এ নিয়ে কথা উঠলে ১২৯৫ সাল এ ভাবে ভেল্কী দেখিযে দিলো। ১২৯৫ সালের কার্যক্ষমতা সম্পর্কে সবাই আশ্বস্ত হয়। সানন্দে তাকে বরণ করা হয।

সধবার একাদশী (১৮৬৬ খৃঃ)—দীনবন্ধু মিত্র॥ সভ্যতার নামে যৌন দুর্নীতি ও অন্যান্য অনাচারের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। সধবার যৌনক্ষুধার ক্ষেত্র প্রদর্শন নামকরণের দিক থেকে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলেও সভ্যতার গতিবিধি চিত্রণেই লেখকের উদ্দেশ্য নিয়োজিত হয়েছে।

কাহিনী।—কলকাতার কাঁসারিপাডার জীবনচন্দ্র বেশ ধনবান। তার পুত্র অটলবিহারীর সম্প্রতি চরিত্রদোষ দেখা দিয়েছে। সে গৌরমোহন আঢ্যের ইস্কুলে এবং হেযার সাহেবের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ে পড়াশোনা ছেডে দিলো। সেইসঙ্গে তার সঙ্গে জুটলো কতকগুলো ইয়ার। তাদের মধ্যে নিমচাঁদ উচ্চ শিক্ষিত। কথায কথায সে শেক্সপীযরের কোটেশান দেয়। শ্যামবাজারের মহেশ্বর ঘোষ অর্থাৎ শালার বাডীতেই সে থাকে। মদ খাওয়ার অভ্যাস তার ছিলো. অটলকেও সে মদ ধরিয়েছে। হাইকোর্টের উকীল নকুলেশ্বরকে সে বলে,—"আমি আমার জন্যে বলি, সুরাপান-নিবারিনী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয়, আমার ভারি অমঙ্গল—বড় মানুসের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি ধেনো খেয়ে মরবো—এক ব্যাটা বড় মানুসের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।"

অটল নাকি হেযার সাহেবের স্কুলে "In the Baboo's class"-এ পড়েছে। নিমচাঁদ বলে,—"Rather in the king's hell." হেয়ার সাহেবের স্কুলের

হেডমাষ্টর জান্তো বড় মানুসের ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এড়ে, আপনারাও পড়বে না কারো পড়তে দেবেও না—তাইতে একটা বাবুজ, কেলাস করে সব কেলাস থেকে রমানাথের এঁড়ে বেচে সেই কেলাসে দিয়েছিল।” সে-ও নিমচাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলেছে—হেয়ার সাহেবের স্কুলে “Merchant of venerials” পড়েছে। মুক্তেশ্বরবাবুর জামাই ভোলানাথও এই গোত্রীয়। সেও ইরিজী ছাড়া কথা বলে না—যদিও তা চীনেবাজারী ইংরিজী। সেও অটলের একজন ইয়ার। বিনেপয়সায় ভালো মদ পেলে কে না ইয়ার হতে চায়!

কিছুদিনের মধ্যেই অটল একজন পাকা মদ্যপ হয়ে দাড়ালো। আনুষঙ্গিক অন্য দোষও এলো। সে-সময় কাঞ্চন নামে এক বেশ্যা ছিল তখনকার বাজারের সবচেয়ে উঁচুদরের। সবচেয়ে উঁচুদরের বেশ্যাকে রক্ষিতা রাখাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো বাবুয়ানা। অটল তাই কাঞ্চনকে মাসে তিনশো টাকা মাসোহারা দিয়ে রক্ষিতা রাখে। বাবাকে লুকিয়ে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার জন্যে বাড়ী করে ঘর সাজিয়ে দেয়। তাকে নিয়ে ইয়ারদের সঙ্গে অটল ফূর্তি করে।

অটল বিবাহিত। বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী কুমুদিনী আছে. কিন্তু ভুলেও সে তার কাছে যায় না। জীবনবাবু চিন্তিত হয়ে অটলের খুড়শ্বশুর চিৎপুরের গোকুলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেন। মাস দুই তিনের মধ্যে অটল নাকি তিরিশ হাজার টাকা খরচ করেছে। গোকুলবাবুকে তিনি অনুরোধ করেন, তিনি যদি অটলকে হৌসে নিয়ে গিয়ে হৌসের কাজ শেখান. কিংবা প্রত্যেক রাত্রে তাকে একটু একটু করে যদি পড়ান, তাহলে হয়তো তার চরিত্র শোধরাতে পারে। গোকুলবাবু বেশ্যাসংসর্গ ছাড়তে বললে অটল বলে,—“আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়ে গেল—কাল আমি দশহাজার টাকা ভেঙ্গে তার গহনা কিনে দিলেম, ঘর সাজিয়ে দিলেম, আজ আমি তাকে ছেড়ে দিই, আর উনি গিয়ে ভর্‌তি হন—।” —একথা শুনে অটলকে শোধরাবার আশা দুজনের মন থেকেই নিভে যায়। মায়ের আস্কারা পেয়েই অটলের এমন অধঃপতন। অটলের খরচের ইন্ধন তিনিই যোগান। জীবনবাবু অটলকে কিছু বলতে গেলে রাগ করেন, কান্নাকাটি করেন। জীবনবাবু অটলকে কিছু বলতে গেলে অটল মার নাম করে বাবাকে ভয় দেখায়। জীবনবাবু অনেকটা স্ত্রৈণ।

অটল আজকাল বড়ো বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। মদ খেয়ে সে ইয়ারদের

সঙ্গে যত্রতত্র মাতলামি করে বেড়ায়, শুধু তাই নয়,—কাঞ্চনকে আজকাল নিজেদের বাড়ীর বৈঠকখানায় আন্‌তে সুরু করেছে। একদিন অটল খুব মদ খেয়ে নিজেদের বাড়ীর বৈঠকখানায় কাঞ্চনের গলা জড়িয়ে নাচতে আরম্ভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সব লোক এসে একে একে জড়ো হলো। পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক, সম্পর্কে অটলের বড়কাকা,—তিনি এসে কাঞ্চনকে গালাগালি দিতে লাগলেন। কাঞ্চন জাত বেশ্যা। সে তাঁকে মানবে কেন? সে-ও গালাগালি দিলো। তখন তিনি কাঞ্চনকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। কাঞ্চন অটলকে গাল দিয়ে গেলো, আর বলে গেলো,—"তোর বাপ যদি আমায় আসতে বলে, তবেই তোর সঙ্গে আর দেখা, তা নইলে এই পর্য্যন্ত।" কাঞ্চন চলে গেলে বড়কাকাকে অটল "শালা বাঞ্চৎ" বলে গাল দিলো। তিনি বেরিয়ে গেলে অটল বন্দুক নিয়ে আত্মহত্যার ভান করে। মা তখন তাকে হাত ধরে নিয়ে আসে। অটল বলে, তার কাঞ্চনকে এনে না দিলে সে মরবে। জীবনবাবু একথা শুনে অটলকে লাথি মারেন। অটলের মা তাঁকে বকুনি দেয় আর কাঁদতে আরম্ভ করে। অতিষ্ঠ হয়ে তখন জীবনবাবু কাঞ্চনকে ডাকিয়ে এনে বাড়ির ভেতর পাঠালেন। অটলের মা কাঞ্চনের হাত দুটো ধরে বল্‌লেন,—"তোমার হাতে ছেলে সঁপে দিলেম, দেখ বাছা যেন আমি গোপাল হারা হইনে।"

হাইকোর্টের উকীল নকুলেশ্বর অটলের বন্ধু। নিমচাঁদ বেওয়ারিশ। মদের লোভে নকুলেশ্বরের কাঁকুড়গাছার বাড়ীতে তার যাওয়ার অভ্যাস আছে। সেখানে কাঞ্চনবেশ্যা এসে উপস্থিত হয়। নকুলেশ্বর তাকে ডাকিয়ে এনেছে। কাঞ্চন এসে বলে,—"মাইরি ভাই, আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম, আদুরে ছেলে, আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে, কারো কাছে যেতে দেয় না। ওর মায়ের জন্যে আমি ভাই এত সহ্য করি। আমি যদি কারো সঙ্গে কথা কই, ব্যাটা ওম্‌নি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তিনি আমায় ডেকে পাঠান, কত মিনতি, করেন—তাইতে ভাই বাগানে আসা ছেড়ে দিইচি।" তারপর যথারীতি মাতলামো এবং ইয়ারকি চলে। এদের সঙ্গে এসে জোটে ঘটিরাম ডিপুটী এবং বাঙ্গাল রাম মাণিক্য।

নিমচাঁদের কাছ থেকে অটল জান্‌তে পারে, কাঞ্চন নকুলেশ্বরের বাগান-বাড়ীতে গেছিলো। তারপর একদিন যখন অটলের বৈঠকখানায় কাঞ্চন এসে ঢোকে, তখন অটল অভিমান করে মরতে চায়। কাঞ্চন কারণ জেনে হেসে

বলে,—"এমন কল্লো লোকে যে ঠাট্টা করবে। এ ত আরো গৌরবের কথা, অটলবাবুর মেয়েমানুষ নকুলবাবুর বাগানে গিয়েছিলো, আবার তোমার বাগানে একদিন নকুলবাবুর মেয়েমানুষ আসবে।" একথায় অটলের মনে সান্ত্বনা আসে না। সে দেয়ালে মাথা কোটে। কাঞ্চন তখন বলে,—"অটল তুই পাগল হলি না কি? আমি তো আর তোর ঘরের মাগ নই যে বাগানে গিইচি বলে তোর মুখ হেঁট হবে।" অটল উত্তর দেয়,—"ঘরের মাগ বেরিয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না —তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে কেন গেলে তা বলো?" গলায় রুমাল বেঁধে মোড়া দিতে দিতে অটল মূর্ছিত হয়ে পড়ে। গলা দিয়ে তার রক্ত পড়তে থাকে। কাঞ্চন তাড়াতাড়ি অটলের মাকে ডেকে আনে। মুখে জল দিলে তার জ্ঞান হয়। তখন কাঞ্চন বলে, —"নাও বাছা তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তুমি যে কথা বলেছ আমার গা কাঁপছে। আমি চলোম বাছা, এমন খুনের দায়ে ভদ্রলোকে থাকে!" কাঞ্চন চলে যায়। "ও কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, আমার মাতা খাস না যাস্‌নে, তোমায় না দেখ্‌লে গোপাল আবার গলায় দড়ি দেবে।"—বল্‌তে বল্‌তে অটলের মা ছুটে যান। কিন্তু কাঞ্চনকে ধরতে পরেন না।

অটলের জ্ঞান হলে সে কাঞ্চনের চলে যাবার কথা শুনে ভাবলো, তাকে শিক্ষা দিতে হবে। কাঞ্চনের চেয়েও সুন্দরী ভদ্রঘরের কোনো বউকে বাইরে বের করে বাগানে এনে তুল্‌বে। কাঞ্চনের ধার আর মাড়াবে না। হঠাৎ তার মনে হয় খুড়শ্বশুর গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বের করতে পারলেই উপযুক্ত হয়। অটল নিমচাঁদকে বলে,—"এমন সুন্দরী তুই কখন দেখিস নি, ঠিক যেন ইহুদির মেয়ে। আমার রীত খারাপ বলে আমার সমুখে আসে না, তা নইলে গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম।" অটলের খুড়শাশুড়ী বয়সে অটলের স্ত্রীর চাইতেও মাস কতকের বড়ো। অটল বলে,—"মাইরি আমি যথার্থ বল্‌চি, কাঞ্চনের বড় অহঙ্কার হয়েছে, তাহলে একবার দেখাই।"

খুড়শাশুড়ীকে বের করবার ফন্দি ঠিক হয়ে যায়। অটল বলে,—"কাল আমাদের বাড়ীর ভিতর মেয়ে-কবি হবে, একটা দ্বিতীয় বিয়ে আছে, গোকুল-বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা সব আসবে, সেই সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস্‌, গোকুলবাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈঠকখানায় আনিস্‌।" নিমচাঁদ বলে,—"একি ভদ্রলোকে পারে?" সে অমত করলো। বাধ্য হয়ে

অটল তখন একজন হিজড়েকে ঠিক করে। অটল তাকে দামী বারানসী সাড়ী এবং গয়না গাঁটি দেয়—যাতে বড়মানুষের মেয়ে বলে মনে হয়। এগুলো সে আর ফেরৎ নেবে না। অটল শিখিয়ে দেয়, যার কোমরে অ্যাল্‌বার্ট চেনওয়ালা ঘড়ি দুল্‌ছে, তাকে যেন ধরে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ওদিকে গোকুলবাবুর স্ত্রী পরিবেশন করবেন বলে, ঘড়িটা অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর কাছে রাখ্‌তে দিলেন। হিজ্‌ড়ে কুমুদিনীকেই বৈঠকখানায় নিয়ে আসে। কুমুদিনী প্রথম ভয় পেয়ে যায়, তারপর স্বামীকে চিন্‌তে পেরে ধিক্কার দেয়। ইতিমধ্যে অটলের কাকা রামধন এসে অটলকে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে জুতো মারেন।—"ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি সর্ব্বনাশ কল্লি বল্ দেখি, হারামজাদা, পাজি মাতাল।" অটল তখন নিমচাঁদের নামে দোষ দেয়, যদিও নিমচাঁদ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিলো। এ-সব ব্যাপার দেখে নিমচাঁদ পাশের ঘরে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিলো। রামধনবাবু তাকে টেনে বের করে বেদম প্রহার লাগান। নিমচাঁদ রামধনবাবুকে বলে,—"আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলিন যারপরনাই Edifying, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে, Lock on Human Understanding পড়ে এরূপ হয় নি। নিমচাঁদ বুঝতে পারে, অটল সব দোষ তার ঘাড়েই ফেলেছে। মাতলামির উদারতায় সে অটলকে ক্ষমা করে বলে, —"তোমার মাগ তুমি নিয়ে এলে বাবা, এখন আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্ছো।" নিমচাঁদ মন্তব্য করে,—"সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।" অটল নিমচাঁদকে বলে,—"আমি তোর মুখ আর দেখ্‌বো না,—জুতোর চোটে আমার গাল জ্বল্‌চে, আমি মদ ছেড়ে দেব।" নিমচাঁদ বলে,—"তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জান্‌তিস্ তোর কথায় রাগ কত্তেম।... বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বল্‌চি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্‌নে আপনার ঘরে গিয়ে শুস্।" অটল মন্তব্য করে,—"আর তুমি কাঞ্চনের বাড়ীতে রাত কাটাও!" নিমচাঁদ তখন বলে,—"আপনি কাছে থেকে যেন রাত বাঁচালে, দিন বাঁচাবার উপায় কি, নকুলের বাগানের উপায় কি? কাঞ্চনের সতীত্ব যেন চৌকি দিয়ে রক্ষা কল্যে, তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ?"

রামধনবাবু ইতিমধ্যে চলে গেছেন, সম্ভবতঃ জীবনবাবুকে ডেকে আন্‌তে। অটল বলে,—"নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আস্‌তে আস্‌তে আমরা বাগানে যাই, যে মার খেইচি, অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না।" নিমচাঁদ ভাবে,

তার মৃতদেহে বুঝি আবার জীবন সঞ্চার হলো। অটলের প্রশস্তি পেয়ে সে ছড়া কাটে,—

"মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি!"

সমাজ সংস্করণ (কলিকাতা—১৮৮৩ খৃঃ)—ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল (টি.এন্.জি.)॥ কালেজী শিক্ষা এবং নব্য সভ্যতাবোধ থেকে বিভিন্ন প্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত। ছদ্মনাম গ্রহণ বক্তব্য বিষয়ে নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয়।

কাহিনী।—'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অনাচার অসহ্য। পুজোয় তাদের ভক্তি কিছুই নেই, অথচ আমোদটুকু পুরোপুরি তাদের চাই। বিজয়ার পর গোপালবাবুর বৈঠকখানায় তারা পুজোর আমোদ নিয়ে কথাবার্তা বলে। গোপাল বলে,—"ওল্ড ফাদারের" জন্যে সে তার "কেপ্ট উওম্যানকে" একটা ভাল কাপড় কিনে দিতে পারে নি। কৃষ্ণকিশোর বলে, সে বাবাকে লুকিয়ে মার কাছ থেকে তিনশত টাকা চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বাগানবাড়ীতে দু পাঁচজন তরফাওয়ালী আর মদ নিয়ে স্ফূর্তি করেছে। দিনবাবু বলে, গোলাপী বেশ্যার বাড়ীতে তারই পয়সায় উইলসনের বাড়ী থেকে মদ মাংস আনিয়ে খুব আমোদ করেছে। বনমালী ইয়ং বেঙ্গলের আর একজন সভ্য। কথাপ্রসঙ্গে গোপাল তাকে জিজ্ঞাসা করে, তার পরিবার "এন্ লাইটেণ্ড" কিনা। বনমালী বলে,—"সে আমার বড দাদা। আমার কোনদিন একডোজ হলেও হয়, না হলেও হয়; কিন্তু তার না হলে নয়।" ছেলেটিও নাকি তৈরী হয়ে উঠেছে।

এই ইয়ং বেঙ্গলদের নানা রূপ। বিলেত ফেরং সিভিলিয়ান ও ব্যারিষ্টারী পাস নীলমণিবাবু প্রণাম ইত্যাদি "সেকেলে মূর্খ হিন্দুদের ব্যাড্ হ্যাবিট্" এখনো ছাড়তে পারে নি। তার ভয়, বাবা তাকে ত্যাজ্য পুত্র করলে সে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। একজন এ ব্যাপারে মন্তব্য করে,—"আমরা সব এডুকেটেড ইয়ংমেন বাপ পিতামহের মাথায় বিনামা সহিত পা লাগিলে বেগ ইওর পার্ডন বলি; তাহলেই সফিসেণ্ট হলো।" নীলমণি হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে রীতিমতো আপোষ করে চলে। বিলেত থেকে এসে পঞ্চগব্যের বদলে শুধু গঙ্গাস্নান করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এতো সহজে প্রায়শ্চিত্ত—এতে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে সে বলে, পণ্ডিতদের প্রচুর টাকা দিয়ে তাদের বিধান সে আদায় করেছে।

ইয়ং বেঙ্গলের এক সভ্য নিজেদের চাল-চলন সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে বলে,—"ঘরে এক পুরোনো সিদ্ধেশ্বরী আছে, যেথায় যা পাও তার পায়ে রেখে প্রণাম কর, আমরা সে সব পারি নি পারবোও না; যাহারা এজুকেটেড্ ইয়ংমেন, তাহাদিগের ভিউজ সব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। আমরা যেমন দশটী টাকা রোজগার করি, তেমনি বিশটাকা ব্যয় করি। আমরা হোল্ ইয়ারে যে টাকার পারফিউমারি কিনি, সে টাকায় ছোটখাট একটী ফ্যামিলি সপোর্ট হতে পারে। আমি বড় হবার পূর্ব্বে কত টাকা চুরি করিয়া নিজের পজিসন্ রক্ষা করতাম।"

হিন্দুসমাজের ওপর এদের আস্থা নেই। যদুনাথ বলে, "রেখে দাও ও সব কথা। হিন্দু কে হে! লোকের প্রাইভেট্ ক্যারেকটার দেখ্‌তে গেলে কিছু থাকবে না। যাহাদের লইয়া হিন্দুসমাজ এবং যাঁহারা হিন্দুসমাজের প্রধান বলিয়া নিজে নিজে গৌরব করেন, তাঁহারাই নিজে নিজে দোষী।" সমাজ-পতিরা স্বার্থপর। পরের বেলায় ষোল কাহন কড়ি উৎসর্গ, আর নিজের বেলায় "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়।" নাইন্‌টিন্‌থ্ সেঞ্চুরী নিয়ে ইয়ং বেঙ্গলের গর্বের সীমা নেই। ইয়ং বেঙ্গলের অনাচার নিয়ে মন্তব্য শুনে গণেশবাবু বলে, "এখন নাইনটীনথ সেন্‌চুরী, তুমি এখন কোনও কথা বল্‌লে তোমার নামে স্যুট্ আন্‌ব।"

কেনারামবাবু বয়স্ক। তার বাগানে তিনি যুবকদের আমোদ করতে অনুমতি দিয়েছেন বটে—তবে অনেকটা ভয়ে। কেনারামবাবু বলেন,—"এখনকার কালে যে সকল ইয়ং বেঙ্গল হয়েছে, তাদিগের সঙ্গে কথা কহিতে ভয় হয় কি জানি আমরা সব সেকেলে লোক কি বল্‌তে কি বল্‌ব এরা সব তামাসা করবে।"

ইয়ং বেঙ্গল দল তার বাগানে ফূর্ত্তি করে চলেছে, তিনি একটু পৃথকভাবে সেখানে অবস্থান করছিলেন এবং এইসমস্ত সাহেবদের চাল-চলন পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে তিনি রঘুনাথ নামে এক যুবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—শেক্সপীয়রের অমুক এডিসনের অমুক পাতায় কি বিষয় লেখা আছে? নিরুত্তর রঘুনাথ অবশেষে স্বীকার করে,—"মহাশয় আমরা কেবল সিলেক্ট পিস্ পড়িয়াছি মাত্র, আপনাদিগের সময় পুস্তকের সকল স্থান পড়া হইত, সেজন্য সেকেলে লোকেরা লিটারেচার ভাল জানেন।" এবার এণ্ট্র্যান্স পাস হরনাথকে ডেকে একটু অঙ্ক জ্ঞান পরীক্ষা করেন। তাকে কেনারামবাবু

জিজ্ঞাসা করেন, একহাজার পণে কত টাকা হয়। আনা ও পণ যে এক, হরনাথ তা জানে না। শেষে সেটা বলে দেওয়া হলে—সে বলে,—"শ্লেট পেন্সিল না হলে বল্‌তে পারব না মহাশয়।" কেনারামের সঙ্গে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবেন, এখন কি ধরনের লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে! কেবল আচলা আচলা টাকা, নতুন নতুন মাষ্টার আর নিত্য নূতন বই! তিনি মন্তব্য করেন,—"এখনকার লেখাপড়া কেবল সাহেব হব আর কোট হেট পরব। সাহেবদিগের মত আহার করব তাহা হলেই মহামান্য হব। পূর্ব্বে সাহেবেরা এদেশের লোকদিগকে যথেষ্ট মান্য করিত কিন্তু এক্ষণে যত ইয়ং বেঙ্গলেরা তাহাদিগের পাতে খাইতেছে বলিযা আর তাহারা সেরূপ মান্য করে না। পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হলে বাবুরা বলিল—মরা গরুর ঘাস কাটিয়া কি হইবে। দুর্গোৎসবের নাম করিলেই অমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিল কিন্তু হোর হাউসে অথবা ওযাইন্ সেবনে কোন দোষ ধরেন না।"

অবলা-ব্যারাক ১৮৮৭ খৃঃ।—রাখালদাস ভট্টাচার্য॥ সভ্যতার ছদ্মবেশে সমাজে যৌন দুর্নীতির যে সব অবকাশ আছে, প্রহসনকার তাঁর রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে তা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। স্ত্রীপুরুষের সামাজিক সহাবস্থান এবং স্বাধীন-প্রণযের কুফল সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা প্রহসনটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

কাহিনী।—ভাগাধর তলাপাত্র পূর্ববঙ্গ থেকে সদ্য কলকাতায এসে হঠাৎ বাবু হয়েছে। তার কোনো সন্তান নেই। একটি শুধু ভ্রাতুষ্পুত্রী—চপলা আছে। ভাগাধরের ভাষায় প্রকাশ পায়, সে টাকার জন্যেই কলকাতায় এসেছে। ভাগাধর হঠাৎ মানোমোহিনী নামে এক ভদ্রমহিলাকে দেখে মুগ্ধ হযে যায়। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী চপলার মারফৎ সে মনোমোহিনীর সঙ্গে ভালবাসার আদান-প্রদান চালাবার ইচ্ছে করে। যথারীতি চপলা একদিন মনোমাহিনীকে তাদের বৈঠকখানায় নিযে আসে। সুহাসিনীও আসে। উচ্ছ্বসিত স্বরে ভাগাধরী বলে,—"ছ্যাহেন, আপনকার লাগি আমি গৃহ-শয্যা করে ভাবতেছি, পঞ্চ শত টাহার পুস্তক খরিদ করে লাইবারি করচি; কাওয়া ফুক্‌রাণি বৃহৎ ঘটিকা ক্রয় করচি, ভাল ভাল চিত্রপট, টেবল, মঞ্চে দালান ভর্‌চি। আর কেমন যরডন আন্‌চি একবার চাকি ছ্যাখবেন।" এই বলে

মনোমোহিনীর হাত ধরে তাকে নিয়ে সরে পড়ে। সুহাসিনী মন্তব্য করে, চপলার কাকার যখন মনোমোহিনীর ওপর এতো অনুগ্রহ, তখন এরা হয়তো সুখীই হবে। কিছুক্ষণ পর ভাগ্যধর আবার ফিরে এসে সুহাসিনীদের আপ্যায়িত করে।

কালীপদ একটা "অবলা ব্যারাক" বা মহিলা আশ্রম করেছে। এই কালীপদর সঙ্গে সুহাসিনীর বন্ধুত্ব আছে। দুজনেই শিক্ষিত। কালীপদকে সুহাসিনী "Male friend" বলে পরিচয় দেয়। মিঃ ভাদুড়ী নামে একজন বিলেত ফেরতের কাছে সে কালীপদর পরিচয় ক'রিয়ে দিচ্ছে—"খুব highly educated, সর্ব্ব বিষয়ে উচ্চ culture রাখেন। A great champion of the weaker sex, and a great genious too." মিঃ ভাদুড়ী মন্তব্য করেন,—"Add as much length to his tail as you can." যাহোক কালীপদ অনেক রমণী উদ্ধার করে তাঁর রমণী উদ্ধার আশ্রমে রেখেছেন। সুহাসিনীকেও যেন উদ্ধার করেন।

সুহাসিনীর মতো কালীপদর প্রণয়প্রার্থিনী আর একজন মহিলা আছে, নাম হেমাঙ্গিনী। সে কালীপদর আশ্রমে থাকে। কিন্তু তার প্রেম নিতে কালীপদ নারাজ। হেমাঙ্গিনীকে কালীপদবাবু পরামর্শ দেন, আশ্রমের সম্পাদক বিপিনবাবুকে পরিতুষ্ট করে সে থাকুক।

এই কালীপদর আশ্রমেই থাকে মনোমোহিনী। মনোমোহিনীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ভাগ্যধর আশ্রমে আসে। মনোমোহিনীকে দেখে ভাগ্যধর সম্ভাষণ করে। মনোমোহিনী তাকে বলে, যদিও ভাগ্যধর উন্নতিশীল দলের মধ্যে পরিগণিত তবুও সে বয়সে প্রাচীন তো বটেই। কিন্তু মনোমোহিনী নার্সের কাজ করে। তাকে পাঁচ জায়গায় যেতে হয়। ভাগ্যধর যদি তার সঙ্গে প্রেম করে, তাহলে এ সব বজায় রাখবার ব্যাপারে ভাগ্যধরের আপত্তি আছে কিনা, মনোমোহিনী জানতে চায়। ভাগ্যধর বিনা আপত্তিতে সবটাতে সায় দিলো। মনোমোহিনী তখন বলে, তার ব্যক্তিগত আয়ও এখন ভাগ্যধরেরই। তবে সে যদি তার পাঁচ ছেলের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারে তবেই ভালো। মনোমোহিনীর ছেলেমেয়ে মোট সাতটি। প্রথমপক্ষের বড় ছেলে চাকরী করে। দ্বিতীয়পক্ষের একটা ছেলে, দুটো মেয়ে নাবালগ। তৃতীয়পক্ষের দুটো ছেলে ও একটা মেয়ে। আর পক্ষে কোন সন্তানাদি হয় নি। মনোমোহিনীর অষ্টমপক্ষ এবার ভাগ্যধরের সঙ্গে।

মা-র এবারকার পক্ষ নিয়ে মনোমোহিনীর দুই ছেলে আলাপ আলোচনা চালায়। এখন, কোথায় মা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবে তা নয়, মা-র বিয়ের ব্যবস্থা সন্তানদের করতে হচ্ছে! এবার কে বাবা হয়ে বসবে;—সে কথা ভাবছে তারা। তবে ভাগ্য ভালো যে বিপিনবাবুর সঙ্গে তাদের মা-র বিয়ে হচ্ছে না। বিপিন তাদের চেয়ে বয়সে ছোটো। "সে যে একটা ছোঁড়া! younger than myself." কিন্তু সন্দেহ যায় না। "ছোঁড়াটার উপরই mother favourably inclined ছিলেন।" তবে একটু মত পাল্টেছে বলে মনে হচ্ছে। আরো একটা candidate যোগাড় হয়েছে। সে ভাগ্যধর তলাপাত্র। তাকে বাবা বলতেও এরা সঙ্কুচিত! "That old bullock? তাকে father বলে সম্বোধন কর্ত্তে হবে!" মনোমোহিনী এসে একথা শুনে ছেলেদের বলে,—"পাত্রটি উপযুক্ত কিনা ভাল করে examine করে দেখ। জান ত Love always blind!" এমন সময় সেখানে ভাগ্যধরবাবুও এসে পড়ে বলে, তারা পাত্র পরীক্ষা করবে শুনতে পেয়ে সে নিজেই এসে হাজির হয়েছে।

এদিকে আশ্রমের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ বেধে যায়। বিপিনকে নিয়ে মনোমোহিনী ভেতরে ঢুকলে ভাগ্যধরবাবু মনোমোহিনীর আঁচল ধরে টানে। এ দেখে মনোমোহিনীর ছেলেরা ভাগ্যধরকে লাঞ্ছনার একশেষ করে। তখন উপায়ান্তর-বিহীন ভাগ্যধর মনোমোহিনীর কাছে প্রদত্ত টাকার দাবী করে। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। ওদিকে কালীপদকে ধরে সুহাসিনী আর হেমাঙ্গিনী টানাটানি করে। কারণ দুজনকেই কালীবাবু বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছিলো।

লণ্ডভণ্ড (১৮৯৬ খৃঃ)—সিদ্ধেশ্বর ঘোষ॥ উপসংহারে Panorama-তে. বিদ্যাধরীর গানে আছে,—

> "এক বড়েতে কিস্তিমাৎ
> দাও হে সবাই নাকে খৎ
> সোজা পথে চল্লে কভু ঠেক্‌বে নাক আর,
> হবে সুখী যেমন আছে যার,
> নইলে লণ্ডভণ্ডর হ্যাপায় পড়ে শ্মশান কবর হবে সার।"

নবীন-পরিচালিত রিফর্মেশনই সমাজে বক্রতা এনে দিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে

এসেছে লণ্ডভণ্ড ভাব। লেখক অন্ততঃ তাঁর বক্তব্যে স্থিতি-পন্থী। প্রস্তাবনায় বিদ্যাধরীর গানে লেখকের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট।—

"এমন নবীন যুগের নবীন ধ্বজা, উড়ছে কেমন হচ্ছে মজা,
প্রেজুডিস্ জ্বালায় ভাজা, রিফরমেসন্
হো হো হো রিফরমেসন্ ষোলকলায় দাড়ি'ছে.
আবাল বুড় কোযাড্রুপেড্স সিভিল'ইজ্ট্ হয়েছে।…
নাইক এতে একাকার, কিম্বা তাতে নৈরাকার,
গোলাপী নূতন মিকশ্চার সভ্যতাতে জমেছে।
হেউ হেউ কর হজম, কান্‌ট্রি ব্রেডের নবক কবম,
চুরি করে ওয়েসষ্টার্ন সাদায় কালায় জো'ট খেয়েছে।"

কাহিনী—রাঘবরামের দুই স্ত্রী। প্রথমপক্ষের বরদাসুন্দরী, দ্বিতীয়-পক্ষে জেসমিন্‌সুন্দরী। জেস্মিন্ শিক্ষিতা এবং আধুনিকা। রাঘরাম তাকে ভয় করে চলেন এবং তার অনাচার প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন। তার ভয়ে বরদার সঙ্গে আলাপ করতে কিংবা তাকে নিয়ে কোথাও যাতায়াত করতে তার সাহস হয় না। বরদার দুই ছেলেমেয়ে নারাণ আর শশিমুখী। জেস্মিনের এক ছেলে ও দুই মেয়ে—হিরোপ্রসাদ এবং স্পিনা ও বেকে। জেস্মিনের ছেলেমেয়েরা আধুনিক। মদ্যপান থেকে সুরু করে প্রেম করা ইত্যাদিতে তারা সুপটু। পরস্পরের সঙ্গে এসব নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে তারা লজ্জাবোধ করে না। বরদার ছেলেমেয়ে নারাণ আর শশিমুখীকে তারা পদে পদে সেকেলে বলে অপমানিত করে। বার্ডস্ আই সিগারেট না খেয়ে নারাণ তামাক খায় বলে হিরো তাকে বলে,—"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে চাকরের হ্যাবিটগুলো কপি করছিস!" এদের আধুনিকতার বহর দেখে প্রাইভেট টিউশানি করতে এসে অনাহারী বেকার বিদ্যাধরও মন্তব্য করে,—"শিক্ষা ত সকল রকমই এই বয়েস বিলক্ষণ হয়েছে দেখ্‌চি—এখন যদি লড়াই শেখাবার বাসনা থাকে, তাহলে ওদের কেল্লায় পাঠিয়ে দিন।…এমন মাতব্বরি করে কে জানের গলায় পা দেবে বাবা? এক রক্ম এক রক্ম মেয়ে যেন এক এক ইযারের যাও; স্বয়ং গন্ধধারিণীই Eighth wonder of the world. বলিহারি যুগের সভ্যতা।"

ইয়ং রিফর্মার 'নির্বিকার' এবং "এ কান্‌ট্রি এজুকেটেড্ ইয়ুথ" লোহারাম

এদের বাড়ী যাতায়াত করে। নিবিকারের সঙ্গে জেস্‌মিনের অবৈধ প্রণয় আছে। অবশ্য জেস্‌মিনের পক্ষ থেকেই আগ্রহটা বেশী। নিবিকার কিন্তু জেস্‌মিনের চতুর্দশী মেয়ে 'বোকে'-কেই ভালবাসে, তবে জেস্‌মিনের সদাসর্বদার সাহচর্যে সেটা বোকে-কে জানতে পারে না। বরং বোকে তাকে মায়ের "লভার" বলেই ধরে নিয়েছে। এদিকে লোহারামের সঙ্গে বোকের ভালবাসা একটু জমে উঠেছে। নিবিকার দোটানার মধ্যে থাকে।

জেস্‌মিনের স্বেচ্ছাচারিতা রাঘবরামের কাছে অসহ্য লাগে, তবু সহ্য করেন। বরং শুভঙ্কর ইত্যাদি হিতৈষীরা কিছু বল্‌তে এলে উল্টে তাদেরই গালমন্দ করেন। বিশেষ করে যেদিন রাঘবরামকে বাগানবাড়ীর দারোয়ান বানিয়ে দরজায় খাড়া রেখে স্ত্রী জেস্‌মিন্ নিবিকারের সঙ্গে গার্ডেন পার্টিতে স্ফূর্তি করছিলো, সেদিন স্ত্রীর ওপর তাঁর ঘৃণা অত্যন্ত বেড়ে গেলো। এদিকে জেস্‌মিন বুড়ো স্বামীকে divorce করতে চায়। কিন্তু অনিচ্ছুক 'নিবিকার' হঠাৎ কিছু করা উচিত নয় বলে সময় কাটিয়ে দেয়। এদিকে রাঘবও এতোদিন পর তাকে ত্যাগ করতেই চায়।

জেস্‌মিন্ বোকে-কে লোহারামের হাতে দিতে চায়, কিন্তু রাঘবের এতে আপত্তি। শুভঙ্কর পরামর্শ দেয়, বোকের সঙ্গে মদ্যপ ধনী জমিদার রামকান্তর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে তারপর জেস্‌মিন আর লোহারামের বিরোধিতার কথা যদি তার কাছে প্রকাশ করা যায়, তাহলে ঈর্ষা এবং জেদের বশে রামকান্ত জেস্‌মিনের সঙ্কল্প পণ্ড করে দেবেই। তারপর রমাকান্তর সঙ্গে বোকের বিয়ে হওয়া বা না হওয়া সেটা পরের ব্যাপার।

একদিন নিবিকার বোকে-কে নির্জনে পেয়ে খুব দামী দুটো ব্রেসলেট আর নেকলেস্ দেয় এবং প্রেম জানায়। বোকে ভাবে,—"কি করা যায়? লোকটা ত আজ এক কথাতেই দুহাজার টাকার জিনিষ আমায় দিলে—এই প্রকৃত লভারের লক্ষণ। অ্যাপ্লিকেসনের সঙ্গেই এই, না জানি ফাইন্যালে কত মজাই আছে। লোহারামটার কেবল মুখেই লভ্, খরচ পত্রের নামটি নেই, শুধু মিষ্টি কথায় কি আর স্ত্রীলোক ভুলে থাকতে পারে?" কিন্তু ভয় হয়, নিবিকারের সঙ্গে পাকাপাকি হলে মা রেগে যাবে। যাহোক নির্বিকার অভয় দিলে বোকে রাজী হয়।

নিবিকার বোকে-কে নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয় এক্‌স্‌মাসের আগের দিন। টিভ্‌লি গার্ডেনের গেটের থুকাছে জেস্‌মিন্ নিবিকারকে খুঁজে বেড়ায়। আজ যে তার

সঙ্গে জেস্‌মিনের এক্স্‌মাস্ এন্‌গেজমেণ্ট! নির্বিকার কোথায় গেলো? এদিকে লোহারাম খবর পেয়েছে যে বোকে-কে নিয়ে নির্বিকার পালিয়েছে। এখানে হয়তো আস্‌তে পারে, এই ভেবে সে একটা পিস্তল পকেটে নিয়ে পায়চারী করে। এ সব তার অসহ্য। এদিকে টিভ্‌লি গার্ডেনের মধ্যেই বোকে-কে নিয়ে নির্বিকার প্রেমগুঞ্জনে মত্ত। দারোয়ানকে আগেই বলা ছিলো, জেস্‌মিন্‌কে যেন ঢুক্‌তে দেওয়া না হয়—বাবু নেই এই অজুহাতে। কিন্তু জেস্‌মিন অধৈর্য হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে নির্বিকার ও বোকে-কে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে বলে ওঠে,—"আমি কি ড্রিম দেখ্‌ছি! তুমি কি সেই নির্বিকার! তুমি কি সেই— যার হ'তে আমার মনের এমন চেঞ্জ হয়েছে। নির্বিকার বলে, "Dont howl here. Who are you now?" জেসমিন্ বোকে-কে বলে, "বোকে, তুই না আমার মেয়ে? এই কি তোর এজুকেসনের ফল?" নির্বিকার বলে,—"Let her have her own way, why do you interrupt?" জেস্‌মিন্ হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ে। এমন সময় লোহারাম এসে এ সব দেখে বোকে-কে বলে,—"বোকে, বোকে, একি! এই কি তোমার সতীত্ব? এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা!" নির্বিকার বলে,—"I say Mr. Loharam what's the good of dealing with dry matter." লোহারাম নির্বিকারকে গুলি করে। জেসমিনের ও বোকের চীৎকারে দুজন সার্জেণ্ট আসে। ততক্ষণে নির্বিকার মৃত। সার্জেণ্ট লোহারামের সঙ্গে সঙ্গে নির্দোষ জেস্‌মিন্‌কেও ধরে নিয়ে যায়। বোকেকেও ছাড়ে না। তাকে সাক্ষী দিতে হবে। ইতিমধ্যে রমাকান্ত—অর্থাৎ বোকে আর লোহারামের বিয়ে ভেস্তে দেবার জন্যে যার সঙ্গে রাঘব বিয়ের একটা কপট সম্বন্ধ করেছিলেন, সেই রমাকান্ত এসে বোকে-কে নিয়ে যেতে চায়। কালই তাকে সে বিয়ে করবে। শেষে সার্জেণ্ট না ছাড়লে বোকের পেছন পেছন সেও চলে। জেস্‌মিন্ বলে,—"আজ আমার চোক্ ফুটেছে, আজ বেশ বুঝতে পাচ্ছি, আজন্মকাল স্বামীর বুকে আঘাত করে এসেছি বলে তাই আজ আমার বুকে এমন বজ্রাঘাত হ'ল। এ মুখ আর দেখাব না, এ জীবন আর রাখব না আমার মরণই ঠিক।"

এদের সবাইকে বিদায় দিয়ে রাঘব ভাবেন, নিজের স্ত্রীকে তিনি দুশ্চরিত্রা জেনেও প্রশ্রয় দিয়েছেন। রাঘবের এই পাপেই এতো সর্বনাশ হলো। এবার তিনি সর্বস্ব বেচে বড় বৌকে নিয়ে কাশীবাসী হবেন আর অবশিষ্ট জীবন প্রায়শ্চিত্তে কাটাবেন। রাঘব সভ্যদের উদ্দেশ করে বলেন,—"যদি

আপনাদের মধ্যে কেউ আমার মত অন্ধ থাকেন, তাহালে আর এ জগতে শিক্ষিতা নারী চরিত্রে দেহমন প্রাণ সমর্পণ কর্ব্বেন না, তাহালে অনেকেরই সোনার সংসার এইরূপ লণ্ডভণ্ড হবে।"

টাট্‌কা টোট্‌কা (১৮৯০ খৃঃ)—রাজকৃষ্ণ রায়॥ প্রগতিশীলের স্বাধীন প্রণয়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠনে লাম্পট্যচিত্র উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও লাম্পট্যচিত্র এবং পরিণতির চিত্র দিয়ে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পরিধিবৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যায়। "টোট্‌কা" অর্থ মুষ্টিযোগ।[২২] মুষ্টিযোগের একটি বিকৃত সুপরিচিত অর্থ প্রহার—যা মুষ্টি দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রকৃত অর্থেও দণ্ডই সামাজিক ঔষধ হিসেবে প্রহসনকার স্বীকার করেছেন।

কাহিনী।—চণ্ডীপুরের হেমচন্দ্র কলকাতায় কলেজে বি. এ. পড়ে। কলকাতায় থেকে সে মদ্যপ ও লম্পট হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মের ছুটীতে বা পূজোর ছুটীতে সে যখন গ্রামে আসে, তখন গ্রামের বৌ-ঝিদের ঘাটে যাওয়া বন্ধ হয়। কারণ সে তাদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে এবং কুপ্রস্তাব করে। মাধব ঘোষ চাষবাস করে। তার স্ত্রী চন্দ্রমুখী যুবতী এবং সুন্দরী। কিছুদিন থেকে তার ওপর হেমচন্দ্রের নজর পড়েছে। চন্দ্রমুখী তার স্বামীকে বলে,—"হেমা বামনাটার মত হতভাগা পাজী নচ্ছার আর আমাদের চণ্ডীপুর গাঁয়ে কেউ নেই। চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে জল আন্‌তে যাওয়া ভারী ন্যাটা হয়েচে।" মাধব মনে মনে বলে,—"দাঁড়া বামনা শালা! এই ঢেরা-ঘুরুণির মত তোরও ঘুরঘুরুনি ঘুরুবো। মাধব তখন পাট কাট্‌ছিলো। চন্দ্রমুখীকে সে বলে,— "ওর কেলাজে পড়ার ল্যাজে আগুন দিচ্চি রও।" চন্দ্রমুখী ভয় পেয়ে বলে, হেমচন্দ্রের অনেক টাকা, তাছাড়া দুষ্ট বুদ্ধিতে ওর জুড়ি নেই। ওর সঙ্গে বিবাদ করার চেয়ে এখানকার ভিটে ছেড়ে অন্য গাঁয়ে বাস করা উচিত। মাধব বলে, এতে সমস্যার সমাধান হবে না, বরং ওর ভিটেতেই ঘুঘু চরাবার ব্যবস্থা হবে। মাধব চন্দ্রমুখীকে শিখিয়ে দেয়, বিকেলে ঘাটের পথে নির্জন পেয়ে হেমচন্দ্র চন্দ্রমুখীর সঙ্গে রঙ্গরস করতে আস্‌বে, তখন চন্দ্রমুখী যেন বলে,—"বাবু! তুমি আজ রেতের বেলা আমাদের বাড়ী যেও। আমার সোয়ামী কদমপুরে কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন রাখতে গেচে; দুচারদিন আস্‌বে না।" পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলবার কথা চন্দ্রমুখী কল্পনাই করতে পারে না। সে ভয় পেলে, মাধব

২২। চন্দ্রিকা—৮ম সং—পৃঃ ২১৮।

তাকে অভয় দিয়ে বলে যে, সে কাছেই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। চন্দ্রমুখীর গায়ে হাত দিতে গেলে মাধব তাকে শিক্ষা দেবে। তারপর মাধব বলে,—"রক্ষের তরেই তো এই অরক্ষের কাজটা কোত্তে হচ্চে। সোয়ামী রুক্ষু না হোলে, ইস্তিরী রক্ষে পায় না।"

মাধবের সঙ্গে চন্দ্রমুখীর কথা হচ্ছিলো, এমন সময় মাধবের নাতি সম্পর্কের নিমচাঁদ নামে এক বালক আসে। নিমাইকে মাধব বলে, এক বদমাসকে জব্দ করবার জন্যে তার সাহায্য দরকার। নিমাই বলে, সে নিজেই তো বদমাস। মাধব জবাব দেয়, নিমাই তো "নিরামিষ্যি বদমাস" কিন্তু যাকে জব্দ করতে হবে, সে "আমিষ্যি বদমাস"। "পাজী ব্যাটা কেলাজে ছুটী পেয়ে লঙ্কা দগ্ধ কোত্তে এয়েচে। ছুঁচোটার জ্বালায় গাঁয়ের ঝি বউড়ী ভয়ে ধড়মড়িয়ে মরে—ঘর থেকে যেতে চায় না।"

সত্যি, হেমচন্দ্রের জন্যে যুবতীরা বাইরে বেরোতে পারে না। তাদের দেখ্‌লেই—"ভোমরা আমি ফুলবাগানে নিতুই নিতুই করি খেল"—ইত্যাদ আদিরসের গান গায়। সে ভাবে,—"বারো মাস যদি ভেকেশন্ হয়, তাহলে সোনায় সোহাগা। তবু মন্দের ভাল, দেড়মাস সমার ভেকেশনের ছুটী হয়েচে। দেড়মাস বাড়ী বোসে কোসে ঠুসে আমোদ লুটবো।" হেমচন্দ্র লুকিয়ে এক বাক্স ব্রাণ্ডও শহর থেকে এনেছে। সে বলে,—"বিকেল বেলা চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে গিয়ে, গোলাপী নেশায় গোলাপ ফুলদের সঙ্গে রঙ্গভঙ্গ কোরবো। সাদা চোখে রঙ ফোটে না—রাঙা চোখেই রঙ ফোটে।"

এদিকে মাধব নিমাইকে কাঁচুলি, পরচুলো, সাড়ী ইত্যাদ পরিয়ে মেয়ে সাজায়। সত্যকারের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে কিনা সেটা পরীক্ষা করবার জন্যে সে চন্দ্রমুখীকে দিয়ে পরীক্ষা করবে ভাবে। চন্দ্রমুখী আসতেই মাধব স্ত্রীবেশী নিমাইয়ের কাছে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রণয় জানায়। মাধবের ব্যবহারে চন্দ্রমুখী খুব চটে যায়। মাধব নিজেই "হেমা বামনার বাবা!" মাধবকে গালাগালির পর চন্দ্রমুখী নিমাইকেও গালাগালি করে—"বলি হাঁালো হারামজাদী বাঁদী! তোর কি বুকের পাটা! আমার ভাতারকে হাত কোত্তে চাস! আমার সাম্নে, আমার বুকে বোসে আমার দাড়ি ওপড়াতে চাস্!" ছদ্মবেশ ঠিক হয়েছে ভেবে মাধব পুলকিত হয়। নিমাইকে চিন্‌তে পেরে চন্দ্রমুখী খুব লজ্জা পায়।

চন্দ্রাবতী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হেমচন্দ্র আদি রসাত্মক কবিতা আবৃত্তি করে।

মেয়েরা আঁৎকে ওঠে।—"ওলো—একি সর্ব্বনাশ! কোলকাতার কালেজ বন্ধ হয়েছে।" তারা পালায়। হেমচন্দ্র বলে,—"Don't fear my beautiful young ladies! Don't fly. Look at me, I am not a tiger, but a honey fly.' তৎক্ষণে ঘাট যুবতীশূন্য। এই সময়ে চন্দ্রমুখী জল নিতে আসে। নির্জনে চন্দ্রমুখীকে পেয়ে হেম খুব খুশি মনে গান গায়। চন্দ্রমুখী মাথা নীচু করে হেমচন্দ্রকে বলে,—"বাবু! আমাকে দেখলে আপুনি এমন কর কেন?" হেমচন্দ্র গদ্‌গদ্ হয়ে বলে,—"সুন্দরি! আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে, নির্জনে বোসে দুজনে প্রেমালাপ রসাভাস করি। ভগবান কি এমন সুদিন দেবেন?" চন্দ্রমুখী নীচুগলায় বলে, "দেবেন!" হেমচন্দ্র ব্যগ্র হয়ে বলে ওঠে, "বল কি! কোথায় সে নির্জন স্থান?" তখন চন্দ্রমুখী মাধবের শেখানো কথাগুলো বলে যায়। মাধব কদমপুরে তিনচার দিনের জন্যে গিয়েছে। বাড়ী ফাঁকা। হেমচন্দ্র এর মধ্যে যেন তাদের বাড়ীতে যায়। হেম ভাবে,—"তা খুব ভাল, মাধব গেছে কদমপুর, হেম যাবেন কদমতলায়।" হেম তো তক্ষুনি যেতে চায়। তখন বিকেল বেলা। চন্দ্রমুখী তাকে রাত্রে যেতে বলে, বিকেলে অনেক লোকজন থাকে পথে ঘাটে। হেমচন্দ্র চলে গেলে মাধব চন্দ্রমুখীকে বলে,—"যা তুই জল নিয়ে ঘরে, আমি গা ঢাকা দে বেলাটা কাটাই।"

এদিকে মেয়ে সেজে মাধবের ঘরে নিমাই বসে থাকে। মাধব নিমাইকে ধুতি উড়ুনি বক্‌শিস্ দেবে, এতে নিমাই খুব পুলকিত। "অন্ন নয়, ধুতী উড়ুনি বক্‌শিস্, হে ভগবান্, আজ যেন আমার মুখ রক্ষে হয়, ঠাকুদ্দার মুখ রক্ষে হয়।" নেপথ্যে শিসের শব্দ ভেসে আসে। ঘোমটা দিয়ে গিয়ে নিমাই দরজা খুলে হেমচন্দ্রকে ভেতরে এনে দরজা বন্ধ করে দেয়। হেমচন্দ্রের গদ্‌গদ্ ভাব। দরজা খুলতে গিয়ে চন্দ্রমুখীর পায়ে ধূলো লেগেছে, এটুকু হেঁটে পায়ে ব্যথা হয়েছে বলে হেমচন্দ্র নিমাইয়ের পা ধোয়াতে যায়, পা টিপতে চায়। নিমাইকে সে চন্দ্রমুখী বলেই ভুল করে। শেষে বলে,—"চন্দ্র, ঘোমটারূপ মেঘ সরাও, চাঁদমুখখানি একবার আশ মিটিয়ে নিরীক্ষণ করি।" ঠিক এমন সময় নেপথ্যে "বৌ" "বৌ" বলে হাক আসে। হেমচন্দ্র খুব ভয় পেয়ে যায়। কি করবে ভেবে পায় না। একবার ভাবে মাধব এলে সে তার সামনে চন্দ্রমুখীকে মা বলে ডাকবে, তাহলেই রক্ষা পাবে। এদিকে দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা পড়ে। নিমাই দরজা খুলে দিতে গেলে হেমচন্দ্র আপত্তি করে, আর

ভাবে, কি করে এ যাত্রার বাঁচা যায়। ওদিকে ঘুণ ধরা দরজা ভেঙ্গে পড়বে, তাই হেমচন্দ্র ঘরের একটা মাদুরে নিজেকে জড়িয়ে রেখে মেঝেতে পড়ে থাকে। নিমাই দরজা খুলে দেয়।

মাধব ঘরে ঢুকেই নিমাইকে বলে,—"বৌ! মনে কোরেছিলুম, তিন চার দিন আস্‌বো না, কিন্তু পথে যেতে যেতেই পেটের ব্যামো হোলো। ছবার খানার ধারে পুকুর পাড়ে বাহ্যে বোসেছি। আর কথা কইতে পাচ্চি না। শোবো, বৌ, শোবো।" মাধব তাড়াতাড়ি শোবার জন্যে মাদুরের ওপরে পা দেয়। মাদুরেই সে শোবে। ওদিকে হেমচন্দ্রের পেটের ওপরে মাধবের পায়ের চাপ পড়ায় সে "ক্যাক" করে ওঠে। হেমচন্দ্র শেষে উঠে বলে ওঠে,—"মাধব, তুমি আমার বাবা! আমি তোমার ছেলে।" মুচ্‌কি হেসে অভয় দিয়ে মাধব তাকে মাদুরে ঢোকবার কারণ জিজ্ঞাসা করে। মাধব বলে,—"মাধব বাবা, ছোটলাট সাহেব আমাদের কৃষিবিদ্যে শেখবার জন্যে একটা নোটিশ জারি কোরেচেন চাষবাস না শিখলে বি. এ. পাশ দিতে দেবেন না। তাই তোমার বাড়ী সন্ধ্যের সময় এসেছিলুম। তুমি চাষবাসে বড় পাকা, তোমার কাছেই যাবে শেখা।" তারপর নাকি হঠাৎ জ্বর হওয়ায় মাদুর জড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। মাধব হেসে বলে,—"তার জন্যে ভাবনা কি, বাবু? আমরা জেতে চাষা, তোমরা ব্যাভারে চাষা! জন্মচাষার চেয়ে কর্ম্মচাষা খুব নিরেট! শেষে তোমায় চাষামি শেখাবো, আগে তোমার পশুনি বাইজ্বর সেরে দি।" ডাক্তারী ওষুধে এ সব বাই জ্বর সারে না। এর জন্যে "টাট্‌কা-টোট্‌কা" দরকার। নিমাই ঝাঁটা এনে হেমচন্দ্রকে দমাদ্দম পেটায়। হেমচন্দ্র আর্ত্তস্বরে বলে,—"বৌমা! তুমি হেমের গর্ব্ভধারিণী! আর নয়, থামো মা! খুব টাট্‌কা টোট্‌কা। বাই তো বাই, পিত্তি পর্য্যন্ত ছুটে গেছে। থামো মা।" নিমাই তখন স্বরূপ প্রকাশ করে। হেমচন্দ্রের ওপর নিমাইয়ের এমনিতেই রাগ ছিলো। হেমচন্দ্র নাকি একদিন নিমাইকে চাবুক মারতে চেয়েছিলো। নিমাই ঝাটা মারতে মারতে বলে,—"ও হেমবাবু! আমায় চাবুক মারবে না?" হেম তখন নিমাইয়ের কাছে ক্ষমা চায়।—"মাধব বাবা, নিমাই বাবা! ক্ষমা কর—ছেড়ে দাও, পলাই। আজ রেতেই বরাবর কোলকাতায় যাই। আর কোন্ ব্যাটা এ জন্মে বাড়ী আসবে—আমার ভিটেয় ঘুঘু চরুক।" তারপর হেমচন্দ্র বলে,—"আমার যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল। ধর্ম্ম কখনও মানুষের পাপকর্ম্ম সয় না—আমার মত আর যদি কেউ থাক, মনে রেখো—এই "টাট্‌কা-টোট্‌কা!"

একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব (১৮৭৪ খৃঃ)—গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় (বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য) ॥ ভূমিকায় লেখক বলেছেন,—

"বাংলার উন্নতিশীল নব সভ্যগণে,
বাঁধিতে স্বজাতি প্রেম ডোরের বন্ধনে ॥
উপহাস রূপ টুপি শিরের ভূষণ
গড়লেম "বাঙ্গালী সাহেব" নব্য প্রহসন ॥
যদি কারো মস্তকেতে এ টুপি হয় ফিট্।
হিণ্ট লয়ে শুধ্‌রে যাও হয়ে পড় টীট্ ॥"

প্রহসনটির মধ্যে একস্থানে 'বাবাজী'র গাওয়া একটি গানে (এবার ডুবলো হিঁদুয়ানী) লেখকের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। গানটিতে আছে,—

"…কলির প্রথম ঢেউ রামমোহন তুলে, একাকারের পথ দিল খুলে,
সহমরণটা উঠিয়ে দিয়ে, কল্লে পাপের বীজ বুনানি।
ও তারপরে রামগোপাল এসে, খানা খাওয়াটা শিখিয়ে দেশে,
জেতের দফা কল্লে রফা, চালিয়ে ব্রাণ্ডি রাঙা পানি।
ও তার শেষে যা যা বাকি ছিল, সেন্‌জামশায় সব শুধিল,
ধোপানী ব্রাহ্মণী হলো, ব্রাহ্মণী ধোপানী ॥
এলো মড়ার উপর মাল্লে খাড়া, যত বিলেত ফেরা হুজুরেরা
পরে সাহেবি চূড়ো ধড়া তেজি দিশি চাল চলুনি ॥"

কাহিনী।—রামধন বসু হরিপুরের একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ। তাঁর পুত্র গোপাল সবাইকে লুকিয়ে বিলেতে গিয়েছিলো। সম্প্রতি সে সিবিলিয়ানশিপ পাস করে পুরোদস্তুর সাহেব সেজে ফিরে এসেছে। রামধনবাবু চিন্তিত হন,—"এখন কিসে সকল দিক বজায় থাকে, কিসে জ্ঞাতি কুটম্ব স্থলে, সমাজে, স্বর্গীয় কর্ত্তাদের নাম সম্ভ্রম, মানমর্য্যাদা বজায় থাকে, কিসে আবার ক্রিয়া কলাপের সময় বাড়ীতে সকলের পায়ের ধুলো পড়ে, আমি সেই সকল ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়েছি।" সাহেব-সুবোর সঙ্গে বৈষয়িক প্রয়োজনে সে সাহেবীখানা দেখাক, ক্ষতি নেই ; বাড়ীতে সাহেবীয়ানা করাতেই যত কিছু বিপদ।

সংবাদ পেয়ে গ্রামস্থ অধ্যাপক রঘুনাথ শিরোমণি আসেন। ভাবেন,—"যাহোক্, এখন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা দানসাগর গোচের প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে পাল্লেই সুন্দর লাভের পন্থা হয়।" রামধনবাবুকে তিনি বলেন,—"উপযুক্ত

প্রায়শ্চিত্ত করায়ে আপনার পুত্রকে পুনঃ গ্রহণ কর্ত্তে পারেন। শাস্ত্রে বলে, 'মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্য প্রায়শ্চিত্তেন মানবাঃ।' হিন্দুশাস্ত্রে সবরকম অবস্থাতেই প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। যেমন ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটয়ঃ তেমনি অসংখ্য বিধি অবধি যা তত্ত্ব করবেন রত্নগর্ভ্‌া হিন্দুশাস্ত্রে তাই পাবেন, কিসের অভাব? তবে এখন কলিকাল—কাল মাহাত্ম্যে সব লোপ হলো। এখন আর কেউ আমাদের মত যত্ন করে শাস্ত্র দেখে না।" "ম্লেচ্ছ বাসং পরিধানং ম্লেচ্ছযানমারোহণং, ম্লেচ্ছ খাদ্যং ভোজনাঞ্চ, ম্লেচ্ছদেশে নির্বাসিতং, ম্লেচ্ছধর্ম্মং পরিগ্রাহী, পতিতং যান্তি তে নরাঃ। তবে যাদের দুএকটি বাদ আছে, তারা 'উৎকট' প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজস্থ হতে পারে। 'উৎকট' শব্দে এখানে ব্যয়সাধ্য বিবেচনা কর্ত্তে হবে, কিঞ্চিৎ বেশী অর্থের প্রয়োজন। দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে হবে, এবং তাদের বিদায়ের বিষয়টা দস্তুরমত বিবেচনা কর্ত্তে হবে, আর সে বিষয়ের অধ্যক্ষতা আমাকে স্বয়ং কর্ত্তে হবে, নচেৎ সকলই পণ্ড।"

গোপালকে আনানো হয়। 'বাবু' সম্বোধন সম্পর্কে গোপাল বলে,—"Baboo—that beastly title I hate with all my heart." প্রণাম সম্পর্কে মন্তব্য করে,—"What barbarous custom." ধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করে,—"I don't like to trouble my brain with puzzles like religion." গোমাংসের সে খুব প্রশংসা করে। "It is capital food. It gives strength. আমি কেট বে পরিমাণ আগে ঢের দিন গটো হইল, হিন্দুস্থানে সবলোক গরু খাইট, আর ভদ্দরই খ করিবট, but since you Brahmans, you rogues, with your vile priest craft have put a stop to it, you have robbed the nation of its strength and spirit." প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিরোমণিমশায় তাকে গোবর খেতে অনুরোধ জানালে ক্রুদ্ধ গোপাল বলে,—"You dirty, infernal rogue, I have half a mind to cram the dung down your ugly throat and choke you with it, you unmitigated villain! Eat dung indeed! I hate with all my heart your barbarous Hindoo Community." অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যায় গোপাল। পিতা বিরক্ত হন। শিরোমণি ভয় পেয়ে প্রস্থান করেন।

বাঙালী সাহেব গোপাল বিলিতি কায়দায় খাওয়াদাওয়া করে—যদিও সরঞ্জাম নেই। ধামা উপুড় করে তার ওপর গুণছুঁচ (কাঁটা) এবং কুসি (চামচ)

দিয়ে আহার করতে আরম্ভ করেছে। স্ত্রীকে একত্র খেতে বলে এবং বলে, "আমি টুমাকে শিক্ষা ডেবে কেটাব পরিটে, লিখিটে, কারপেট বুনিটে, পিয়ানো বাজাইটে, নাচিটে, গাইটে, সব শিক্ষা ডেবে, আর টুমাকে গৌন পরায়ে এবং টেবেলে বসায়ে খানা খাইটে শিক্ষা ডেবে, and then my সবলা you will make a capital memsahib." সবলা বলে, লেখাপড়া শিখতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু গরমে গাউন পরতে বা অখাদ্য খেতে সে নারাজ। Superstitious সবলাকে গোপাল ভাবত আশ্রমে পাঠাতে চায়। "সেখানে Bengalee স্ত্রীলোকডের মেমসাহেব বানায়—সেখানে reformation এবং সভ্যটা মেয়েলোকডের শিক্ষা ডেয়।" সরলা আক্ষেপ করে বলে,—"বাপ মার মনে দুঃখ দেওয়া কি বিলাতি সভ্যতার ফল? কৈ সাহেবরাও বাপ মাকে ভক্তি করে শুনেছি, তবে একি বাঙ্গালি সাহেব হলে পাপপুণ্যি কিছুই জ্ঞান থাকে না?" প্রতিবেশী বৃন্দাবন যখন দুঃখ করে বলেন,—"যদি সাহেব না হয়ে একটা বাক্ষট্রাহ্ম হয়ে ঘরে থাকতো, তবে সারটা রক্ষে থাকতো।" নিবারণ অন্য একজন প্রতিবেশী। তিনি বলেন,—"ও এপিট আর ওপিট, ও সবই সমান। যে ভেতরের কথা জানে না সে ওদের সুখ্যাত করুক। লৌকিক ব্যবহার, অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বজাতি ও স্বদেশ প্রীতি ইত্যাদি ব্রাহ্মদের মধ্যে আছে?" বৃন্দাবন বলেন,—"ইংরিজি লেখাপড়া শিখলেই যেন আগে পিতামাতার প্রতি অভক্তি দাঁড়িয়েছে।"

নবীন গোপালের মামা। গুরুজনদের নির্দেশে সে গোপালকে বোঝাতে এসে হার মানে। নবীনকে গোপাল বলে,—"এখন বুঝলে, আমি কেন সাহেবিতর বাঙ্গলা কোই? তুমি কি মনে করেছ যে আমি তিন চার বৎসর বিলেতে গিয়ে বাঙ্গলা ভুলে গিয়েছি? তা কখনই নয়, কেবল policy শেখবার জন্যে duplicity play করতে হয়। জানো আমরা civilian, একদিন না একদিন the reins of government might come to our hands, and then আমাদের country govern করতে হবে, তখন আমাদের statesmanship দেখাতে হবে। যদি আমরা এখন থেকে policy practice না করি, তবে কেমন করে Political purpose serve করবো?" সে আরও বলে,—"আমরা যদি তোমাদের barbarous, superstitious, Idolatious কমিউনিটির সঙ্গে mix করি, তবে আমাদের civilian brother officers, আমাদের learned colleagues-দের কাছে আমরা কখন sympathy পাব

না, and father বাঙ্গালীর চেলে চল্লে আমরা সকল বাপ পেঙ্গে নেবে, তারা বাবু বলে ডাকবে, খোদাবন্দ কি হুজুর, এসব just honors due to the convenanted service আমরা কখনই পাব না ; Consequently for the sake of keeping one's position and honor, আমাদের সাহেবি চেলে চল্‌তে হয়।" গোপাল আশাবাদী। সে বলে,—"In America স্থানে ২ true principles of progress introduce হচ্চে, সেখানে free love, abolition of marriage, common wealth প্রভৃতি উঁচুদরের সভ্যতার সূত্রপাত হচ্চে, আর দেখ্‌বে India-তে কি at least বেঙ্গলে অতি শীঘ্রই…ঐ সকল principles of true progress introduce করবো, যদি আমাদের most kind and paternal government help করেন—ভরসা করি আমাদের most illustrious Lieutenant Governor Sir Geogre (Campbell) personal গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সঙ্গেই those principles of social improvement বেঙ্গলে introduce করবেন।" সবাই গোপাল সম্পর্কে নিরুৎসাহ হলেও নবীনের মা ভাবিনী মেয়ে মহলে গোপাল সম্পর্কে মন্তব্য করেন,—"উচক্কা বয়েসে অমন ঢের ছেলে বিগড়ে যায়, আবার একটু বয়েস হলে আপনা আপনি ঠাণ্ডা হয়—তা ভয় কি!" কিন্তু এতে কেউই আশ্বস্ত হন না।

গোপালকে রামধন বশে আন্‌তে পারছেন না। সকলে তাঁকে একঘরে করবে। বাধ্য হয়ে গোপালকে ত্যাজ্যপুত্র করাই তিনি স্থির করলেন। পুত্রবধূ সরলা দোটানায় পড়ে। স্বামী ছাড়া আর কে গতি আছে! কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীকে ছাড়তে তার ইচ্ছে হয় না। সে কাঁদতে থাকে। অন্নপূর্ণা রামধনের স্ত্রী। তিনি রামধনের সঙ্কল্পে আপত্তি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষে ঠাকুর-দেবতাকে ডাকতে থাকেন।

নিবারণবাবু এদিকে গোপালকে একটু বশে এনেছেন। তিনি রামধনকে বলেন, গোপালের কোন দোষ নেই—নব্যদের কোন অপরাধ নেই। তাছাড়া বিলেত গিয়ে জ্ঞান উপার্জন করে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, উচ্চপদ পেয়ে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করছে—এর কিছু মূল্য নিশ্চয়ই আছে। নিবারণবাবু আরও বলেন, —"নব্যদের উপর প্রাচীন দলের একটু স্নেহ ও শৈথিল্য প্রকাশ করা উচিত। সকল পক্ষে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার না কল্লে সামঞ্জস্য হয় না, সমাজও থাকে না, আর বিশেষতঃ কালের গতি দেখ্‌তে হবে, চিরকাল কোন সমাজের কি কোন

জাতির অবস্থা একভাবে চলে না, থাকেও না।...এখনকার কালে সত্যযুগের মতন আচার ব্যবহার কখনই সম্ভবে না। এখন বিলেতে যাওয়া কি ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্যদেশে গমন করা যদি পাপ বলে গণ্য করা যায়, তাহলে বাঙ্গালির আর উন্নতি হবার কোন পথই থাকে না—এ স্থলে অবশ্য বিবেচনা কত্তে হবে যে এখন আর উৎসাহশীল নব্যদের বিলেত যাওয়ার দরুণ প্রায়শ্চিত্ত কত্তে পেড়াপিড করা নিতান্ত অনুচিত কার্য্য।" নিবারণবাবু মন্তব্য করেন,—"প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ অর্থ যা থাকে থাক, তবে তার বাঙ্গালা মানে আমরা যা মোটামুটি বুঝি সে কেবল কিছু দান...।" বৃন্দাবনবাবু রামধনবাবুকে বলেন,—"আজকাল মন্ত্রপড়ার কাজ সব প্রতিনিধিতে চলে—...শিরোমণি মহাশয়কে দশটাকা বেশী করে দেবেন তিনি একজন প্রতিনিধি খুঁজে দেবেন, সেই প্রতিনিধি গোপালের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে, গোময় ভক্ষণ কত্তে হয়, সেই করবে, তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।" এইভাবে গোপালের প্রায়শ্চিত্তের সমস্যাটা ক্রমেই সমাধান হয়ে গেলো। কিন্তু ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেলো।

নিবারণবাবু Tod-এর লেখা 'রাজস্থান' বইটি এনে প্রতাপের দেশাত্মবোধের অংশটি ভালো করে গোপালকে পড়ে শোনালেন এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো। দলিত হিন্দুজাতির মধ্যে একতা ও সংগ্রাম শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করবার কথাই তার মনকে অলোড়িত করে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বাঙ্গালী সাহেব গোপাল সব সাহেবীয়ানা ভুলে গিয়ে সবাইকে অবাক্ করে দিয়ে বলে ওঠে,—"প্রায়শ্চিত্ত আর গোময় ভক্ষণের কথা কি বলেন, সেতো সামান্য কাজ, আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন কত্তে পারি।"

একেই বলে বাঙ্গালি সাহেব (১৮৭৬ খৃঃ)—গিরি গোবর্ধন (গোপালচন্দ্র রায়, রাঁচি)॥ বাঙালী সাহেবের চাল-চলন ও অনাচারকে প্রহসনকার প্রশংসা না করলেও সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন, এবং তুলনামূলকভাবে জাতীয়তাপন্থী দেশীয় সমাজের নির্মমতার কথাও তুলে ধরেছেন। পূর্বোক্ত প্রহসনের জবাব হিসেবে মূল্য থাকায় এবং সাহেবিয়ানার প্রসঙ্গ প্রধান থাকায়, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ সত্ত্বেও প্রদর্শনীর সুবিধায় এখানে প্রহসনটিকে উপস্থাপন করা হলো।

কাহিনী।—গুলির আড্ডায় ইস্কুল মাষ্টার নবীন তাঁতী ঝিমোচ্ছে। পাঁচালীদলের ঢুলী মাধবগুঁই গুলি তৈরী করছে। এমন সময় গায়ে তেলমাখা

অবস্থায় গামছা নিয়ে গাঁয়ের পুরুৎ কালাচাঁদ ভট্টাচার্য আসে। সে বলে যে, গোলক বসুর ছেলে গদা নাকি বিলেত থেকে ফিরছে। তার এসেছে। দুই তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে। মাধব অবাক হয়ে বলে গদা এর মধ্যেই পাস হয়ে গেলো। সেও ইচ্ছে করলে পাঁচালী দলে না ঢুকে বিলেত গিয়ে ফিরে এসে ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতো। কালাচাঁদের ইচ্ছে, সে তার ছেলেকে পূজোর মন্ত্র না শিখিয়ে বিলেতে পাঠায়। নবীন মাষ্টার বলে বিলেত যাওয়া অতো সস্তা নয়। মাধব বলে কেন, হাজার দুই টাকা হলেই যাওয়া যায়। কালাচাঁদের ইচ্ছে গদা বিলেত থেকে ফিরলেই ছেলের জন্যে অন্তত একটা সেরেস্তাদারীর কাজ ধরেকোয়ে জোটাতে পারবে।

গদাধর আসছে শুনে বদলগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা বসে যায়। কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ জানায় যে যাবনিক আচার ব্যবহার করে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। মোড়ল নিধুরাম মণ্ডলও তাতে সায় দেয়। ব্রাহ্ম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলে , শাস্ত্রে এমন বিধি আছে যে—ধন উপার্জন, বিদ্যাশিক্ষা, আর রাজকর্ম সাধনে বিদেশ গমন আচারবিরুদ্ধ নয়। তর্কবাগীশ গৌরীশঙ্করকে নিন্দা করে বলে, সে নিশ্চয়ই খৃষ্টান হয়েছে, আর গোপনে গোলাশটা আশটা হয়ে থাকে। নতুবা সে এমন বলবে কেন? গৌরীশঙ্কর বলে যে, যারা সমাজ বাঁচাবার ধুয়া তোলে আবার তারাই, দেখা যায় কার সর্বনাশ আর কার সতীত্বনাশ করবে, এই কথাই সর্বদা ভাবে। কোথায় গদার মতো লোকদের জন্যে দেশের মুখোজ্জ্বল হবে, তা নয়, এদের মুখে শুধু সমাজের কল। অমন সমাজ উচ্ছন্নে যাওয়া ভালো। 'গোলক' (গোলোক) গদার পিতা। সে এসব দলাদলির মধ্যে পড়ে বলে যে এর চেয়ে মুসলমান হওয়া ভালো। গোলক ঠিক করেছিলেন, গদাকে তিনি অন্যবাড়ীতে তুলবেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর আর কালাচাঁদ সাহস দিলে নিজের বাড়ীতেই তুলবেন বলে গোলক স্থির করেন।

গদাধরের ড্রইংরুম। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গৌরদাস মিত্র গদাধরের বন্ধু। সে গদাকে বলে যে বিলিতি কাগজ হাতে নিলেই দেখা যায়, সেখানে মাঝে মাঝেই divorce। আমাদের দেশে ওটা নেই। গদা বলে যে, সেখানকার প্রতি গ্রামে সংবাদপত্র আছে। তাই ওতে সব সংবাদই প্রকাশ পায়। আমাদের এখানে তা নেই। এদেশে কুলীনরা কি না করছে। ভদ্রলোকের ঘরে ভুনায় আছে, আমরা জেনেও নিস্তব্ধ থাকি। মিথ্যাবাদিতা, পরাধীনতা,

ধূর্তবুদ্ধি, অভিমান, স্বার্থপরতা আমাদের জাতীয় গুণ। আমরা স্ত্রীকে বার করব না। কিন্তু অপর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবো,—এটা স্বার্থপরতার চিহ্ন। এজন্যেই সাহেবরা বাঙালীকে অবিশ্বাস করে। সেখানকার লোকেরা বই পড়ে, গৃহকর্ম করে, সমাজে যায়, নাট্যশালায় যায়, পুস্তক রচনা করে, আর ধর্মকর্মেও মন আছে। উকীল কৃষ্ণদাস তলাপাত্র এবং দ্বারকানাথ বাচস্পতিও (ইস্কুল পণ্ডিত) গদাধরের ড্রইংরুমে উপস্থিত ছিলো। তারা এসব অস্বীকার করে না। এমন সময় পুরুত কালাচাঁদ জামাইকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকে। গদাধর নিজে খুব পরিশ্রান্ত বলে সবাইকে বিদায় দেয়। সে ঠিক করে, কাল থেকে একটা বিজ্ঞাপন দেবে—সাক্ষাতের সময়—৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত।

এদিকে গদাধরের বাবা গোলক বসু অস্থির হয়ে উঠেছেন। ধোপা কাপড় কাচে না। নাপিত দাড়ি কামায় না। ছেলে সাহেব হয়ে গিয়েছে হিন্দু-সমাজে সে আর থাকতে চায় না। এ সংসারে থেকে আর সুখ নেই, মৃত্যুই ভালো।—এসব কথা গোলক ভাবেন। তাঁর স্ত্রী বলে, ছেলেকে বরং ত্যাগ করে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করুন। এমন সময় কালাচাঁদ আসে। গোলক তার সঙ্গে পরামর্শ করেন। কালাচাঁদ গোলককে প্রায়শ্চিত্ত করতেই বলে। অগত্যা গোলক স্ত্রী ও সকলের কথা শুনে প্রায়শ্চিত্ত করাই স্থির করেন।

কলকাতার হাউসের মুৎসুদ্দী হরুগোঁসাইয়ের বৈঠকখানা। ডেপুটি গৌরদাস, উকীল কৃষ্ণদাস, কেরানী চুনীলাল দত্ত, হরুগোঁসাই—সবাই মিলে মদ খেতে খেতে বিলেত ফেরত বাঙালী সাহেবদের নিন্দে করে। এরা গণেশের আসবার অপেক্ষায় থাকে। গণেশ এলে সবাই মিলে "Nationalityর health drink" করে।

বড়লগ্রামের রাস্তায় গদাধর সাহেবী পোষাক পরে দুজন খানসামাকে নিয়ে পথ চলছিলো। গদাধর ভাবে,—এই সব রাস্তায় ছোটোবেলায় সে বেড়িয়েছে। কিন্তু এখন সবই নতুন দেখাচ্ছে। এমন সময় গোলকনাথ ও গৌরীশঙ্করকে সে পথ দিয়ে আসতে দেখে। বাবাকে দেখে গদাধর তাঁকে জড়িয়ে ধরে। তাঁর শরীর অসুস্থ ছিলো কিনা, মা কেমন আছে ইত্যাদি আগ্রহের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করে। গোলকের নির্লিপ্ততা দেখে গৌরীশঙ্কর বলে, বোধহয় অত্যধিক স্নেহে গোলক বাক্‌রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা সে বলতে বাধ্য হয়। সে বলে, গোলকের শারীরিক কোনো অসুখ হয় নি, মানসিক অসুখই হয়েছে। আর গোলক যে নেড়া—তা শারীরিক কারণে

অন্নের জন্যে নয়, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে। তিনি সর্বসমক্ষে একরার নামা দিয়েছেন যে, সন্তানের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখবেন না। ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে শুনে গদাধর অনুশোচনা করে। গোলক তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেন,—"আমি মোড়ল নিধু মণ্ডলের বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম। সে নাকি পাড়ার এক স্ত্রীলোক-কে বে আব্রু করে সতীত্ব নাশ করেছে।" গদাধর বলে,—"চলুন আগে সেখানেই যাওয়া যাক্।"

নিধু মণ্ডলের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা। রাধাগোবিন্দ দত্ত, কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ ইত্যাদি উপস্থিত হয়েছে। কনষ্টেবল নিধুকে বাঁধছে। গদাধর তখন নিজে গিয়ে জামীন হয়ে নিধু মণ্ডলকে ছাড়িয়ে দেয়। নিধু নাকি পাড়ার এক বিধবা স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করতে গিয়েছিলো। বিচারক হুকুম দিয়েছে তাকে বেঁধে আনতে। নচেৎ পাঁচশত টাকা জামীন দিতে হবে। নিধু ছাড়া পেয়ে গদাধরের অনেক সুখ্যাতি করে। পরে তর্কবাগীশ ও রাধাগোবিন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে। যেমন করেই হোক গৌরীশঙ্করকে সে ১০ দিনের মধ্যেই জেলে দেবে। তর্কবাগীশ ও রাধাগোবিন্দ মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী হয়। গৌরীশঙ্কর কেন সব বিষয়ে মাথা গলায়? তার শাস্তি তাকে পেতে হবে।

গোলক বসুর বৈঠকখানা। গদাধর nightdress পরে আপন মনে ভাবছে।—"সমাজের কি অবস্থা! বিলেত থেকে ফিরে এসে সমাজে স্থান পাইনি, সাহেবদের মধ্যেও স্থান পাইনি, এ যেন অরণ্যে বাসের মত। স্ত্রীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়ার জন্য School boarding এ দিতে হবে। এখানকার ইংরাজদের হিংসা ও জাতিবৈরাগ্যই প্রধান। অন্যের কথা মান্য করতে গিয়ে কেন অপদস্থ হব। আমার সংসারই আমার সমাজ। পিতামাতার স্নেহই আমার সব।"—গদাধর এসব ভাবছে, এমন সময় তার স্ত্রী এসে বলে,—"আমাকে এখানে বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্চে। সকলে বল্‌চে, স্বামীকে বিলেত ছেড়ে দিয়ে এখানে আমাদের ভাসাচ্চে। আমাকে তোমার সঙ্গে রাখ।" গদাধর সমাজের পঙ্কিলতা দেখে দুঃখ প্রকাশ করে। মেছুনী, ধোপানী, নাপ্তেনী —এদের সঙ্গে দিদি পাতানো করে। এমন জঘন্য সমাজ কোথাও নেই!

গদাধরের আগমনে অফিসের সকলে কিছু অপ্রসন্ন। সদরআলার বৈঠকখানায় রামলাল ন্যায়রত্ন, গদাধরের নাজির রামপদ, এ ছাড়া মোক্তার

চাটুকার এরা সব বসে নানা কথা আলোচনা করে। চাটুকার সদরআলার পুত্র নবকুমারের প্রশংসা করে পঞ্চমুখে। কিন্তু অবস্থাগতিকে নবকুমারেরই গালাগালি খেতে হয় তাকে। স্থায়রত্ন বলে, ও গুলো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নাজির বলে,—নতুন এক সাহেব এসেছে। তার চাল-চলনে নাজিরের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সময়ে পৌঁছানো চাই, দেখ্‌লে সেলাম করতে হবে, নচেৎ ফাইন দিতে হবে। এমন সে আগে কোনোদিন দেখে নি! যারা সত্যিকারের সাহেবের জাত, তাদের দু'পাঁচটা লাথি খাওয়া যায়, কিন্তু এখনকার মতো বাঙালী সাহেবদের এসব দেখে আর সহ্য হয় না। সদরআলা বলে,—"সব উচ্ছন্নে যাবে, বাঙ্গালী আছিস আমাদের মত খাবে দাবে থাকবে তা নয়। পরে দেখ্‌বে কালামুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। সাধে কি 'একেই বলে বাঙ্গালি সাহেব' নাটক বেরিয়েছে।"

গদাধরের ড্রইংরুম। আজ রবিবার। গদাধর স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে গল্প-গুজব করছে। বিলেতের রবিবারের কথা তার মনে হচ্ছে। এই দিনে সেখানকার সাহেবরা মদ খেয়ে আনন্দ করে বেড়ায়। চার্চে যায়। এমন সময় ড্রইংরুমে ডাক্তার বোস এলেন। তিনি সিবিল সার্জন। গদাধরকে তিনি East India Association-এ আসতে অনুরোধ করলেন। সেখানে সব জমিদাররা মিলে বিষয় সম্পত্তির আলোচনা করে। ডাক্তার বসু বলেন,—"যখন বিলাতে ছিলাম তখন কত আশা ছিল যে দেশে ফিরে এসে সমাজের মঙ্গল করব। আমিই যেন একজন Reformer হয়ে জন্মেছি। কিন্তু দেশে এসে সেসব কোথায় জুড়িয়ে গেল। উপার্জ্জন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আর সময়ই পাই না। আমাদের দেশে বাক্য দ্বারা 'Reformer' করতে গেলে চলে না। মহিলা বিদ্যালয় এই যে স্থাপন করা হলো, তাহা ছাত্রী অভাবে বন্ধ হতে চলেছে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হবে কি করে। এই সকল কুরীতিগুলো তুলে দিতে হবে। এই সকল পরিবর্ত্তন করলেই দেখবে ১০ বৎসরে ভারত উন্নত হয় কিনা।" গদাধর বলে,—"আমাদের দেশের লোক মোটা ভাত কাপড় হলে সন্তুষ্ট। সভ্যতার সঙ্গে এই ভোগবৃদ্ধি বেশী হতে থাকে। বিলাতে জনপ্রতি খরচ বেশী। সকলে রব তুলেছে যে, আমি বাঙ্গালিকে ঘৃণা করি। এমন কি বাবারও ঐ বিশ্বাস হয়েছে। শিখ্‌তে পড়তে শিখেছে অনেকেই, কিন্তু বিবেচকশক্তি নেই। এইরূপের সংখ্যাই বেশী।" বসু তখন বলেন,—এইসব দেখে শুনেই সমাজের ওপর বিরক্তি জন্মে গেছে। সকলে

নিজের নিজের কর্তব্য করা যাক। তারপর যা হবার তা হবে। (প্রহসনটি এখানে খণ্ডিত।)

আজব কারখানা বা বিলাতী সং (কলিকাতা—১৮৯৪ খৃঃ)—অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র॥ প্রকাশক—কেদারনাথ সেনগুপ্ত। প্রহসনটির ললাটে লেখা আছে, "বাবুয়ানা বিবিয়ানার ঝকমকে আয়না।" বৈকল্পিক নামকরণ এবং পরিচয় প্রদানে লেখক তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সমাপ্তিতে স্ত্রীপুরুষের সমবেত গানে নামকরণ ব্যাখ্যার প্রয়াস আছে।—

"আমাদের সং বিলিতি ঢং।
বিলিতি আচার, বিলিতি ব্যাভার
ডউল ডাণ্ডা লে বং—
আমাদের সং বিলিতি ঢং॥
নাচ বিলিতি, গান বিলিতি, ডিং ডং ডিং ডং—
আমাদের সং বিলিতি ঢং॥
বিলিতি পরা, বিলিতি খাওয়া,
বিলিতি বসা, বিলিতি শোওয়া,
বিলিতি ধরন, বিলিতি করন,
ঠিক বিলাত সং—
আমাদের সং বিলিতি ঢং।
নাচ বিলিতি, গান বিলিতি, ডিং ডং ডিং ডং—
আমাদের সং বিলিতি ঢং॥

কাহিনী—কলকাতার অবিদ্যাপ্রকাশবাবু বিবাহিত। স্ত্রী মাতঙ্গিনী বর্তমান। কিন্তু তিনি চকোরিণী নামে একজনের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত। চকোরিণীদের ফ্যান্সি ফেয়ারে চকোরিণীর কার্পেট দেখে সুখ্যাতি করে বেশী দাম দিয়ে অবিদ্যাপ্রকাশ কিনেছিলো। তারপর থেকে আলাপ জমে ওঠে। চকোরিণী পর পর পাঁচজন স্বামীকে ছেড়েছে। একজন অবশ্য মরে গেলে মামলা মোকদ্দমা করে তার বিরাট সম্পত্তি হস্তগত করেছে। বর্তমান স্বামীকে সে ভোলামাতালের সহায়তায় শ্লো পয়জন করে পাগল করে রেখেছে। এই ভাবে সে ব্যভিচার চালিয়ে যাচ্ছে। অবিদ্যাপ্রকাশকে প্রকাশ্যে বিয়ে করা তার সখ, কিন্তু অবিদ্যাপ্রকাশ বিয়ের ব্যাপার এড়িয়ে গিয়ে ভালবাসার দোহাই দেন।

চকোরিণী বলে সে তার পাগল স্বামীকে যে কোনো মুহূর্তেই ডাইভোর্স করতে পারবে। কিন্তু অবিদ্যাপ্রকাশ সাহস পায় না।

অবিদ্যাপ্রকাশবাবু 'ভালবাসা ক্লাবের' সভাপতি। ধিনিকেষ্টর ভাষায়,—"আমাদের ভালবাসা ক্লাবের মূলমন্ত্র সুইট্‌হার্টের সেবা করা। স্ত্রী ট্রী ওসব আমাদের মালামাল কেনাবেচার সামিল। সুইট্‌হার্টই আমাদের পিতা বল—মাতা—ভ্রাতা বল—ভগিনী বল—আর খুড়োখুড়ী, পিসে পসী মেসো মাসী যাই বল—সকলি আমাদের।" এই ক্লাবের মেম্বার মোট বারো জন। অবিদ্যাপ্রকাশকে হাতে রাখবার জন্যে চকোরিণী এই ক্লাবকে কয়েক হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে অনুগৃহীত করে রেখেছে।

অবিদ্যাপ্রকাশের বোন চঞ্চলাও পুরোপুরি বিবি। "তিনি সেমিজ এঁটে বিবি হয়ে ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়বেন।" তার স্বামী মিঃ ধাড়া বিলেতে গিয়েছিলো। তারপর কলকাতায় এসে অবধি চঞ্চলার খোঁজ খবর নেয় নি। চঞ্চলার অবশ্য এতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। সে তার মাষ্টার ধিনিকেষ্টর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে স্বামীর অভাব পুষিয়ে নিয়েছে। ধিনিকেষ্টকে অনেক দিন আগেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা না একটা ছুতো করে সে রোজ পাঁচটার সময় খবরের কাগজ বা বই হাতে করে চঞ্চলার কাছে আসে। বারণ করবার কেউ নেই। পুরুষমানুষ অবিদ্যাপ্রকাশ তো বাইরে বাইরেই থাকে। ধিনিকেষ্টও অবিদ্যাপ্রকাশের সেই "ভালবাসা ক্লাবের" মেম্বর। ধিনিকেষ্ট আর চঞ্চলার রুদ্ধ কপাটের কামকলাপ দেখে অবিদ্যাপ্রকাশের স্ত্রী মাতঙ্গিনী শিউরে ওঠে। তবু স্ত্রী-জনোচিত কৌতূহলে সে দরজার মাঝখানে একটা ছেঁদা করে রেখে মাঝে মাঝে তাদের লীলা দেখে। গয়লাবৌ মাতঙ্গিনীকে এইসব বিলিতি ঢংয়ের কথা বলতে গিয়ে বলে,—"আর দিদি, বিলিতি ঢংয়ের কথা আর বোলো না। আগে শুনতেম কায়েত বামুন আর বাবু ভেয়েরাই ঐ সব করে, গরিব দুঃখী ছোট লোকের ঘরে ও সব ঢং ছিল না, এখন আর তোমায় বোলবো কি বৌদিদি! ছোট জেতের ভেতর হাড়ী, মুচী, মেথর, মুদ্দফরাস পর্য্যন্ত সবার বাড়ীতে বিলিতি ঢংয়ের ঢেউ।" স্বামী এবং ননদ দুয়ের ব্যাপারেই যথেষ্ট ক্ষোভ। কিন্তু সে নিরুপায়।

ভালবাসা ক্লাবের তরফ থেকে বড়দিনে এক অদ্ভুত ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা হয়। ঘোড়দৌড় হবে নিমতলায়। "ভালবাসা ক্লাবের সমস্ত মেম্বরগণ প্রত্যেকে তাহার নিজ নিজ সুইটহার্টকে পৃষ্ঠে বহন করে—গ্রাণ্ড্ রেস অর্থাৎ

মহান্ দৌড় দৌড়ুবেন।” ধিনিকেষ্ট চঞ্চলাকে খবর দিতে আসে। সব মেম্বরদের সুইট্‌হার্টের মত হয়েছে, শুধু চঞ্চলার হলেই হয়। ধিনিকেষ্ট চঞ্চলাকে পিঠে নিয়ে দৌড়োবে। চঞ্চলা বলে, তার ভয় আর লজ্জা হচ্ছে, সভ্য হলেও মেয়েমানুষ তো বটে। এইতেই কতো লোকে কতো কথা বলে, রেস হলে তো মুখ দেখাবারই উপায় থাকবে না। ধিনিকেষ্ট বলে,—“মরাল কারেজ সৎস্বভাববিশিষ্টা মহিলার কি কোন বাধা বাধা-জ্ঞান হয়?” চঞ্চলাকে ধিনিকেষ্ট বিশ্বেশ্বর মোহিনীর উপন্যাস এবং কুঞ্জবালার জীবনচরিত পড়তে বলে। চঞ্চলা বলে,—“তোমাদের সুইট্‌হার্টদের স্বামিরা তো সেথায় গিয়ে পড়তে পারে।” ধিনিকেষ্ট বলে,—“সেইটুকুই সুইটহার্টদের কারদানি। তারা সকলেই স্ব স্ব স্বামিকে ভোগা দিয়া ভুলাইয়া কোন না কোন নিজেদের কাজে পাঠাইয়া, অপর স্থানে স্বামী রহিল, স্থির নিশ্চয় করিয়া তবে আসিবেন।” তা ছাড়া মিঃ ধাড়ার সেখানে যাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। চঞ্চলা এদিক থেকে নিশ্চিত। গাউন প’রে চঞ্চলাকে সেখানে যেতে হবে। চঞ্চলা ছেঁড়া গাউন সেলাই করতে বসে।

এদিকে চকোরিণী “পাবলিকলি” বিয়ে করবার জন্যে অবিদ্যাপ্রকাশকে ধরাধরি করলে অবিদ্যাপ্রকাশ বলেন,—“তুমি অশেষ গুণে পারদর্শিনী হোয়ে কখনও কখনও একটু স্ত্রীস্বভাব সুলভ কথা কও। এতোদিন যখন নিরাপদে কেটে গেল—আর অল্প দিনের জন্যে কেন অর্থব্যয় কোরে লোক দেখানো বিবাহ! তোমায় আমায় যদি মিল রইল তবেই কি যথেষ্ট হোলো না?” আজ ভালবাসা ক্লাবের মিটিংয়ে অবিদ্যাপ্রকাশের প্রিজাইড্ করবার কথা আছে। অবিদ্যাপ্রকাশ চকোরিণীকে বলেন, আজ তারা যুগলে একত্রে প্রিজাইড করবেন। তিনি ভালবাসেন কিনা, এতেই প্রমাণ হবে। মেম্বররাও চকোরিণীকে কন্‌গ্রাচুলেট্ করতে চায়, কারণ চকোরিণীর টাকাতেই ক্লাব এতো সচ্ছল হয়েছে।

ভালবাসা ক্লাবের হলঘরে বারোজন মেম্বর জমায়েৎ হয়েছে। প্রেসিডেণ্টের চেয়ারে অবিদ্যাপ্রকাশ বসেন। কিছুক্ষণ পরে চকোরিণী এসে প্রেসিডেণ্টের পাশের চেয়ারে বসে পড়ে। তারপর সভার কাজ আরম্ভ হয়। প্রোগ্রামের ফার্স্ট আইটেমে রেসের স্থান স্থিরীকৃত হয়—নিমতলা ঘাটে। দ্বিতীয় আইটেমে ঘোড়সওয়ার সুইটহার্টদের পোষাক স্থিরীকৃত হয় ‘ব্যালেট ড্রেস’।

তৃতীয় আইটেমে স্থির হয়, সার্কাসের মতো গোলাকার পথে, গড়ে পঞ্চাশ ফুট করে প্রত্যেক দলকে দৌড়োতে হবে। চতুর্থ আইটেমে চারজন চারজন করে তিনবার দৌড় ঠিক হয়। পঞ্চম আইটেমে স্থির হয়, প্রত্যেক মেম্বরের মুখে রাশ লাগানো থাক্‌বে, আর পিঠে 'ইয়ুজুয়েল জিন্‌ রেকাব' বাঁধা থাকবে। একজন মেম্বর প্রস্তাব করে, প্রত্যেক মেম্বর গাধা ঘোড়া ইত্যাদি এক একটার মুখোস পরে রইবে। মুখোসের কথা সুইট্‌হার্টদের আগে বলা রইবে, নইলে আবার তাঁরা নিজের নিজের ঘোড়া চিন্‌তে পারবে না।

এদিকে তলে তলে অবিদ্যাপ্রকাশের স্ত্রী এক ফন্দি আটে। সে কতকগুলো চিঠি লিখে তারপর ভালবাসা ক্লাবের মেম্বরদের ঠিকানা জেনে নিয়ে তাদের স্ত্রীদের কাছে চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেয়। গয়লাবৌকে ধরে গয়লার সহায়তায় চিঠিগুলি বাড়ী বাড়ী পৌছিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে কৌশলে চঞ্চলার স্বামী মিঃ ধাড়াকেও খবর পাঠিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে আবার সুইট্‌হার্টদের স্বামীদেরও খবর পাঠা_া হয়। নিমতলা ঘাটের রেসের খবর সে চঞ্চলার ঘরে আড়ি পেতে সব শুনেছিলো।

নিমতলা ঘাটের সামনে ঘোড়দৌড়ের জন্যে জায়গা প্রস্তুত করা হয়। তার চারিদিকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়। অর্ধচক্রাকারে ব্যাণ্ড পার্টি দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ড্‌ বাজাতে আরম্ভ করে দেয়। মুখোস পরে ভালবাসা ক্লাবের মেম্বররা হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকে। মেম্বরদের আপন আপন স্ত্রী এসে পৌছেছিলো। তারা স্বামীদের মুখোস চিন্‌তো। তারা গিয়ে নিজ নিজ স্বামীদের পিঠে চড়লো। তখনো মেম্বরের সুইটহার্টরা এসে পৌছোয নি। রেস মাষ্টার সব ব্যবস্থা ঠিক দেখে রেস সুরু করে দেয়। স্ত্রীরা স্বামীর ওপর চড়ে মনের আনন্দে স্বামীদের ছুটিয়ে নিযে চলে। এমন সময় সুইট্‌হার্টরা এসে স্ত্রীদের গালাগালি করতে আরম্ভ করে। এসব শুনে পুরুষরা মুখোস খুলে—"ও বাবারে মাগ যে, অ্যাঁ!"—বলে জিভ কাটে। ইতিমধ্যে সুইট্‌-হার্টদের স্বামীরাও এসে পড়ে। সুইট্‌হার্টরা চম্‌কিয়ে বলে ওঠে,—"ও বাবারে--ভাতার যে!" স্বামীরা তাদের স্ত্রী তথা মেম্বরদের সুইট্‌হার্টকে মারধোর আরম্ভ করে দেয়। সেইসঙ্গে মেম্বরদের ওপরেও প্রহার চল্‌তে থাকে। শেষে মাতঙ্গিনী নিজেই ওদের থামায। মাতঙ্গিনী মিঃ ধাড়াকে বলে,—"ওঁদের এই কেলেঙ্কারি, কৌশল কোরে তোমাদের এনে যে, দেখাতে পেরেছি, এই যথেষ্ট হোয়েছে, আর আমাদেরও এঁদের বদলে ঘোড়া হাঁকানোর

সুখটা হযে গেছে। এখন ওঁরা যেমন জ্ঞানপাপী তেমনি কানে ধোরে ওঁদের জ্ঞান দিযে দাও। যেন এমন কর্ম্ম আর না করে। আর সভ্য জেতের ধারায় মাগ ড্যামেজের সব টাকা ধোরে নাও।" ভালবাসা ক্লাবের মেম্বররা সবাই পাঁচশত টাকা করে ধার দিতে রাজী হয। প্রত্যেক স্ত্রী নিজেদের লম্পট মেম্বর-স্বামীদের কান ধরে এব প্রত্যেক সুইটহার্টের স্বামী বা ভচারিণী 'সুইট্‌হার্ট'দের কান ধরে নিমতলাব ঘোডদৌডের মাঠে নাচতে সুরু করে।

মরকট্‌ বাবু (কলিকাতা—১৮৯৯ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত ॥ মলাটে একটি পদ্যে বলা হযেছে,—

"গিযাছে গ্রাম্যতা—নাহি সমাজ শাসন,
কাণ্ডারিবিহীন তরী—তুফান যেমন।
ধর্ম্মের তরঙ্গ কত লাগে তার গায,
উঠিছে আনন্দ বাযু অর্থের আশায।

কাহিনী।—মরকত-বাবু জনৈক গ্রাম্য কৃপণ ধনী বংশীধর সিংহের পুত্র। বংশীধর সারাজীবন গ্রামেই কাটিযেছে। কৃপণ হলেও তার একটা সখ ছিলো ছেলেকে কালেজে পডাবে। কলকাতার কলেজে ছেলেকে পডিযে সখ মিটিযেছে। "ছেলেও দিনকতক কালেজে ঢু মেরে, এখন কালেজ আউট হযে বসে বসে খচাখচ হ্যাণ্ডনোট কাট্‌ছেন।"

বংশীধর সিংহের পুত্র মরকত 'পাল্ল'। এমন স্বাধীনচেতা অর্বাচীন যুবক সহজেই অর্থসন্ধানী চতুর লোকের শিকার হয। সাহেবীযানার সঙ্গে সঙ্গে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত করিযে এরা অতি সহজেই তার কাছ থেকে অর্থদোহন করে। এমন এক শিকারী প্রেমচাঁদ সত্যিই বলেছে,—"পযসাই আজকাল সংসারে সার বস্তু! যার পযসা নাই তার মরণও ভাল। পযসার জন্যে লোকের কর্ম্মাকর্ম্ম, গম্যাগম্য, পাত্রাপাত্র, খাদ্যাখাদ্য কিছুই বাছাবাছি নেই।" প্রেমচাদ ভুষিমালের দালালী ছেডে "পাকামালের" দালালী ধরেছে। "আজকাল যে মালের জন্যে লোকের সর্ব্বস্ব পযমাল হচ্ছে, সেই মালের আকর সোনাগাচির দালালী ধরিছি।"

অপর এক শিকারী ভূতনাথ। একা শিকার চলে না, তাই ভূতনাথকে প্রেমচাঁদ সহকারী করতে চায়। ভূতনাথ অতি সহজেই রাজী হয়। প্রেমচাঁদ বলে, তার বর্তমান শিকার মরকত পাল্ল। ভূতনাথ বলে সে বখরা চায় না, বেয়ারিং পোষ্টে ইয়ারকি দিতে পারলেই সন্তুষ্ট।

মরকত-বাবু দেশী সাহেব। বিলিতী জিনিস ছাড়া কিছু তার পছন্দ নয়। ভৃত্য ভজার মতে,—"বিলেত হতে টীনের মধ্যে কাগজ জড়ান গোবর এনে এখানে অনেক বাবু বিলাতী বেল মোরব্বা বলে চাঁটতে থাকেন।" সাহেব সমাজে মরকতের খাতির নেই। তাই কোটপ্যাণ্ট পরে ঘরে বসে ভৃত্যের কাছে তারিফ পেতে চায—সাহেব হিসেবে কেমন মা'নয়েছে!

ইতিমধ্যে বংশীধরের মৃত্যুসংবাদের টেলিগ্রাম আসে। মরকত ভাবে এ এক হ্যাঙ্গামা, তবে বিষয়গুলো হাতে আস্‌বে। মরকত চিন্তা করছে, কি করা যায়, এমন সময় দুই শিকারীর প্রবেশ। প্রেমচাঁদ মরকতের সঙ্গে আলাপ সুরু করতেই প্রতিভাবলে ভূতনাথ তাকে ডিঙিয়ে মরকতের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করে। ভূতনাথ তাকে 'মর্কট' বলে ডাকে। প্রেমচাঁদ ভয় পেলেও মরকত সন্তুষ্টই হয এই সম্বোধনে—কারণ ইংরাজী ত-এর উচ্চারণ ট। হঠাৎ পিতার মৃত্যুতে বিলেত যাত্রার ব্যাঘাতের কথা মরকত প্রকাশ করে। প্রেমচাঁদ বলে,—"এইখানে বসে যদি বিলাতের কায হয়, তবে মিছে জাতটা খোয়ানর দরকার কি?" বিলেতে গেলে কাপ্তেন হাতছাড়া হবে এই ভয়ে প্রেমচাঁদ একথা বলে। কিন্তু জাতের কথায় মরকত তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে,—"হোয়াট্‌ ইজ দি মিনিং অফ্‌ জাত! আমি সে ভয় করিনে, যে সকল উপকরণে অন্যের দেহ গঠিত হয়েছে, আমারও তাই।"

বাঙালী-সাহেব হয়েও মরকতের মুখ ফস্‌কে শ্রাদ্ধের কথা বেরিয়ে পড়লে শিকারী দুজন তাকে নিরুৎসাহ করে বলে,—"ও অসভ্যতায় আপনার কায নাই, অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান্‌ পার্‌টি দেখ্‌লে বড় ঘৃণা করবে।" কিন্তু অনুষ্ঠানেই অর্থদোহনের সুযোগ। এমন সুযোগটা ছাড়া যায় না। তাই তারা বলে,—"শিক্ষিত লোকের পিতৃশ্রাদ্ধটা গ্র্যাণ্ডগোছ—ফ্যাসানে বেস্‌ হওয়া আবশ্যক।" বড়লোকদের আপন হাতে সব কাজ করতে নেই। শ্রাদ্ধের আসল কাজ দেশের দেওয়ানজীর হাতে দেওয়া ভালো। এখানে কেবল পার্টি দিলেই চল্‌বে। এদের কথায় মরকত আশ্বস্ত হয়। কালোকোট কালো-পেড়ে ধুতিতেই শোকচিহ্ন প্রকাশ পায় বলে পোষাক বদলাবার দরকার বোধ করে না সে।

সঙ্গে সঙ্গে করিৎকর্মা শিকারীর আগ্রহে শ্রাদ্ধের লিষ্টও তৈরি হয়ে যায়। —ব্রাণ্ডি ৬ ডজন, লেমনেড ১২ ডজন, বরফ একমণ। শ্রাদ্ধে মাছ চলে না, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে মাংস আনবার ব্যবস্থা হয়। মেয়ে কীর্তনীয়া বায়না

করবার বদলে—খেম্‌টাওয়ালীর ব্যবস্থা করা হয়। যুক্তি এই যে, একই টাকা নিয়ে কীর্তনীয়া শুধু গান গাইবে, কিন্তু খেম্‌টাওয়ালী গান ও নাচ দুই-ই করবে।

শ্রাদ্ধের পুরোহিত হবেন অজপতি বিদ্যাদ্বীপ। তাঁর মত,—"টোল তো ইংরাজী শিক্ষার আঘাতে প্রায় স্বগোল হয়ে উঠ্‌লো, এক শ্রাদ্ধশান্তির নিমন্ত্রণ—তাও একরকম বন্ধ, ... কত কষ্টে যদি কোন ব্যাটা মলো, অম্নি তার ছেলে ব্যাটা ম্লেচ্ছ মতে মত দিয়ে... পিতৃশ্রাদ্ধটা পর্যান্ত লোপ করলে, কাজেই এখন আমাকেও ঐ মতে মত দিতে হয়েছে; গ্রাস আচ্ছাদনে সংস্থানটা তো চাই।"

পাকা মালের দালাল প্রেমচাঁদ বগলা ও তরলা—দুই বেশ্যাকে বায়না করে রাখে। এ বিষয়ে সে সুপটু। তারা শ্রাদ্ধ বাসরে খেম্‌টা নাচ্‌বে। ওদিকে রাস্তায় রাস্তায় হ্যাণ্ডবিল্‌ আর পোষ্টার। নিউস্‌ পেপারে বিজ্ঞাপন—তাতে সবান্ধবে নিমন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে মদমাংসের প্রলোভন দেখানো হয়। আরো বলা হয়, সুন্দরীরা এলে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে "বিদায়" দেওয়া হবে।

যথাদিনে শ্রাদ্ধ হয়। সাহেবী কায়দায় শ্রাদ্ধ। দরজায় দেবদারু পাতার গেট। তাতে রং বেরঙের পতাকা। বৈঠকখানা সুসজ্জিত চেয়ারে আর টেবিলে। সকলে একে একে আসে। তারপর বক্তৃতা সুরু হয়—পিতার সদ্‌গতির জন্যে। পরে বাবুর্চি কাঁটাচামচ ডিস এবং মদমাংস পরিবেষণ করে যায়। অভ্যাগতরা মদমাংস সেবন করে। সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও আরম্ভ হয় বেশ্যাদের খেম্‌টা নাচ।

শ্রাদ্ধের পুরোহিত অজপতি বিদ্যাদ্বীপকে মদ খেতে বলা হলে তিনি চটে গেলেন। ভূতনাথ যখন বলে,—"আপনার অতিরিক্ত সম্মান, প্রতি গেলাসে পাচ টাকা দক্ষিণা। অজপতি অর্থলোভে বলে,—"হা হা বাপু হে, আমাদের তান্ত্রিক মতে কারণের বিধি আছে।" তারপর গেলাসের পর গেলাস মদ্যপান করে চলে অজপতি। প্রেমচাঁদ দেখে, ব্রাহ্মণটা অনায়াসেই অর্থদোহন করছে। এতে তার গাত্রদাহ হয়। সে তখন তরলা বেশ্যাকে ইঙ্গিত করে তার দিকে ঠেলে দেয়। তরলা খুব চতুরা। সে অজপতির কোঁচা চেপে ধরে বলে,—"ঠাকুর আমার টাকা দাও—অনেক টাকা ফাঁকি দিয়ে গলি ছেড়েছ।" তরলা রীতিমতো তাকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে। অজপতি চোখে অন্ধকার দেখে। প্রথমে সে গালাগালি করে। কিন্তু পাকা বেশ্যার কাছে ফল হয় তার

বিপরীত। শেষে সে করযোড়ে অনুনয় করে—এমন কি পরে পদতলে পড়ে মুক্তি চায়। অজপতি জানে এটা মিথ্যে—কিন্তু এ ব্যাপার রাষ্ট্র হলে তার সম্মান থাকে কোথায়!

ইতিমধ্যে একজন প্রতিবেশী ভদ্রলোক এসে লক্ষ্য করেন—সাহেবী শ্রাদ্ধ কতোদূর গড়িয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ও অর্থলোভী ব্রাহ্মণের কুকর্মকে ধিক্কার দিয়ে তিনি শ্রাদ্ধবাসর ত্যাগ করেন।

(গ) সংস্কার ও দেশোদ্ধার ॥—

সংস্কারক প্রহসন (কলিকাতা—১৮৭৬ খৃঃ)—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ॥ বিজ্ঞাপনে প্রহসনকার বলেছেন,—"বঙ্গীয় যুবকদিগের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপের ইতিহাস মাত্র।...যাহাতে বঙ্গীয় যুবকগণ নিজ নিজ দুষ্কর্ম্ম, এই পুস্তক পাঠে বুঝিতে পারিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত হন, ইহাই গ্রন্থকারের একান্ত বাসনা।" প্রহসনের মধ্যে নব্য সমাজগৃহে বিনোদিনীর গানে প্রহসনকার ব্যাপক অনাচার থেকে মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।—

"বঙ্গ তব দুঃখ দেখে ফাটে রে হৃদয়।
অভাগিনী বঙ্গবালা হায় কত দুঃখ সব॥
কেবা আছে এ জগতে, এ ঘোর দুঃখ নাশিতে।
যে আছে, সে জন আহা বড় সহৃদয়॥"

কাহিনী।—সাধারণ মধ্যবিত্ত হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ নব্য যুবক এবং "উন্নতমনা সংস্কারক।" তার বন্ধু নবীনবাবু ও কালীপ্রাণবাবুও একই গোত্রীয়। যোগীন্দ্র নবীনকে বলে,—"শুধু আমি একা চেষ্টা করিলে Whole Indiaর Reformation হওয়া অসম্ভব।" এজন্যে নবীনদেরও নাকি প্রয়োজন আছে! নবীন বলে,—"আমাদের সমাজে প্রথমে বিধবাবিবাহ প্রচলন করা, তারপর জাতিভেদ উঠান ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলকে পরম ব্রহ্মের প্রেমে মগ্ন করান কর্ত্তব্য।" পরিশেষে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলনের কথাও সে বলে। যোগীন্দ্রের সংস্কারের হাত থেকে তার বিধবা বোন কামিনীও পরিত্রাণ পায় না। সে নাকি কামিনীকে বলে,—"কামিনী তোর বে কর্ত্তে হবে।" কামিনী এতে খুব লজ্জা পায়। "আমি শুনে পালিয়ে আসি। এ দুঃখিনীর সাধের ধন সতীত্ব রত্ন তাহাই যেন নির্ব্বিঘ্নে রাখতে পারি।" প্রতিবাসী হরিহর মুখোপাধ্যায়কে যোগীন্দ্র বলে,—"আপনি Old

foolদিগের গুরুমন্ত্র সার করিয়াছেন।······আপনার মতো Niggardদিগের সাহায্যের জন্য কিছুমাত্র প্রার্থনা করিব না। দেখি বক্তৃতা ও দৃষ্টান্তে কি করিতে পারি।" হরিহর ভাবে, "এরা বলে কি? এরা সমাজের কি বুঝে যে সমাজ সংস্কার করবে।"

যোগীন্দ্র চাঁদা তুলে সমাজ সংস্কারের নামে বৌবাজারে একটা বাড়ী করেছে। নাম দিয়েছে "নব্য-সমাজ"। একটা বিধবা কায়েতের মেয়েকে বের করে এনে সে সেই বাড়ীতে রেখেছে। কৃষ্ণনগরের রামচন্দ্র ঘোষের শিক্ষিতা বিধবা মেয়ে কুমুদিনী প্রলোভনে পড়ে সেখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তাকেই নাকি যোগীন্দ্র বিয়ে করবে। রামচন্দ্র খবর পেয়ে নালিশ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। ভয় পেয়ে যোগীন্দ্রের মা প্রসন্নময়ী স্বামীকে তার হাতের বালা খুলে দিয়ে ছেলেকে বাঁচাতে বলে। কিন্তু হারাধন আপত্তি করে বলে,—"না —ছেলের শিক্ষা হওয়া দরকার।" যোগীন্দ্র বাড়ী এলে হারাধন তাকে বিয়ে করবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলে। যোগীন্দ্র বলে,—"হ্যাঁ, বিয়ে করতে পারি যদি মেয়ে শিক্ষিতা ও বিধবা হয়।" হারাধন তাকে কুলাঙ্গার বলে গালি দেন। যোগীন্দ্র বলে,—"আমার বক্তৃতা দিতে যেতে হবে, আমি যাচ্ছি।"

ওদিকে বৌবাজারে নব্য-সমাজের ঘরে যোগীন্দ্র—নবীন, কালীপ্রাণ ও বিনোদিনীকে নিয়ে মদ্যপান ও অন্যান্য অনাচারের কাজ করে। একদিন মদ্যপানের সময় বিনোদিনী যোগীন্দ্রকে বলে, তার বিধবা বোন কামিনীকে সে এখানে নিয়ে আসুক, তাহলে আরও মজা হবে। যোগীন্দ্র বিনোদিনীকে কথা দেয়—তিন চার দিনের মধ্যেই তাকে নিয়ে আসবে। এই সময় হারাধন ওদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হন। যোগীন্দ্র বাবার পরিচয় এই বলে যে—এই লোকটি তাদের বাড়ীর বাজার সরকার। তাঁকে যোগীন্দ্র Waiting room-এ অপেক্ষা করতে বলে নিজেদের কুকর্মে মন দেয়।

কামিনী দুঃখ করে। তার মা মারা গেছেন। বাবাও নিরুদ্দেশ হলেন কয়েক দিন হলো। দাদার এমন মতিগতি,—কেমন করে সে বেঁচে থাকবে। এমন সময় যোগীন্দ্র এসে তার কাছে বলে, সে কামিনীর বিয়ের ব্যবস্থা করেছে নবীনের সঙ্গে। কাল গাড়ী আসবে। কামিনী যেন নগদ টাকাকড়ি নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকে। কামিনীকে সে অভয় দিয়ে বলে, অখ্যাতির কোনো ভয় নেই। ওদের সমাজেই সে থাকবে। সেখানে আরও অনেক মেয়ে আছে। কামিনী আপত্তি তুলে বলে, সে সতীত্ব নিয়েই বেঁচে থাকবে। "যে

পুরুষ হিন্দু রমণীকে বিবাহের পরামর্শ দেয়, সে মহাপাপের পাপী।" কিন্তু তবু যোগীন্দ্র কামিনীকে জোর করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়। প্রতিবেশী হরিহর এসে আক্ষেপ করেন,—হায়—হায়, আর একটু আগে এলেই তিনি কামিনীকে রক্ষা করতে পারতেন। বাংলাদেশের "পিশাচগণের পৈশাচিক কাণ্ড" দেখে তিনি মর্মাহত হন।

বৌবাজারে 'নব্য-সমাজের' বাড়ীতে গিয়ে কামিনী অস্বস্তিবোধ করে। বিনোদিনীর ব্যবহার তার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগে। সে বিনোদিনীকে প্রকাশ্যেই "বেশ্যা" বলে গালাগালি দেয়। বিনোদিনী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিকারের আশায় যোগীন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করে। যোগীন্দ্র একথা শুনে চটে যায় এবং কামিনীকে গিযে পদাঘাত করে। কামিনীর এতে মৃত্যু হয়।

ওদিকে নবীন বিনোদিনীকে বলে, তাকে সে ভালবাসে, কিন্তু বিয়ে করবার উপায় নেই, কেন না যোগীন্দ্রকেই বিনোদিনী বিয়ে করবে এবং যোগীন্দ্রবাবু বিনোদিনীকে ভালবাসে। প্রতিবাদ করে বিনোদিনী বলে, যোগীন্দ্র ইদানীং তাকে ভালবাসছে না। তার সঙ্গে বিয়ে হলে বিনোদিনী সুখী হবে না, বরং নবীনকেই সে বিয়ে করবে। তাছাড়া যোগীন্দ্র নিজের বোনকে মেরে ফেলেছে। আজ হোক, কাল হোক, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাবে। অতএব যোগীন্দ্রের সঙ্গে থাকা নিরাপদ নয়।

'নব্য-সমাজ'-এর বাড়ীতে যোগীন্দ্র বিনোদিনীকে বলছিলো যে তাকে স্ত্রী-স্বাধীনতার ওপরে বক্তৃতা দিতে হবে। এমন সময় পুলিশ সঙ্গে করে হরিহরবাবু এসে যোগীন্দ্রকে দেখিয়ে দিলেন। পুলিশ যোগীন্দ্রকে গ্রেফ্‌তার করে। নবীন আর বিনোদিনী সাক্ষীতে বলে যে, তারা যোগীন্দ্রকে দেখেছে কামিনীকে প্রহার করতে। এই বলে নবীন আর বিনোদিনী চলে যায়। যোগীন্দ্রের জিজ্ঞাসায় বিনোদিনী জবাব দেয় যে, সে নবীনের স্ত্রী হবার জন্যে যাচ্ছে। বিলাপ করতে করতে যোগীন্দ্র তখন বলে,—"এতদিনে আমার চৈতন্য হলো। আমি কি কুকার্য্যই করেছি। কেন আমি হরিহরবাবুর উপদেশ শুনিনি।" নিজের বোনকে সে হত্যা করেছে। শত শত নরকেও এর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। "উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাভিমানী সমাজ সংস্কারকগণ! তোমরা দেখিয়া যাও আর শিখিয়া যাও, যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের সংস্কার নেই। তোমরা সৎকার্য্য ভ্রমে কতই সর্ব্বনাশ করিতেছ। সাবধান হও। বঙ্গ সমাজ রসাতলে দিবার সঙ্কল্প করিও না।"

গাধা ও তুমি (বড়বাজার—১৮৮৯ খৃঃ)—অতুলকৃষ্ণ মিত্র ॥[২৩] মলাটে প্রহসনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—"ভাক্ত সমাজ সংস্কারকের নিখুঁৎ ফটোগ্রাফ।" মলাটে পুস্তকপাঠরত সাহেবী পোষাকে সুসজ্জিত একটি গর্দভের চিত্র প্রদত্ত হয়েছে। সমসাময়িকযুগের তথাকথিত সংস্কারকের বুদ্ধিশূন্যতা প্রকারান্তরে প্রচার করে আত্মসমর্থনের আকাঙ্ক্ষা প্রহসনকারের পক্ষ থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

কাহিনী।—বামনদাস গুঁই কলকাতার একজন বিত্তশালী লোক। তবে একটু রক্ষণশীল। তাঁর দুই ছেলে—সারদা দাস আর বরদা দাস। বড়ো ভাই সারদা সদ্য বিলেত থেকে এসেছে, এতে ছোটো ভাই বরদা খুব গর্ব অনুভব করে। এতোদিন সে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েও নাম কিনতে পারে নি। "গোলদীঘি, বিডন পার্ক, এল্‌বার্ট হল, টাউন হল, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসান, ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দুসমাজ—কোথাও শ্রোতা জোটে না, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, যে বিষয়ে বক্তৃতা করতে যাই না কেন, শ্রোতা জোটে না, কাজেই নাম কিনতে পারি না।" সে ভাবে, দাদাকে আশ্রয় করে সে একটা "Society paper" বার করবে। দাদার কলমে আর ভাইয়ের গলার জোরে সহজেই সমাজ-সংস্কারক হিসেবে তারা পরিচিত হবে। "দাদার কলম—আমার গলা। দেখবো তেষ্টা এগোয় কি জল এগোয়? সব সেঙ্গাৎকে পায়ের তলায় আনবো তবে ছাড়বো।" দাদা এসে ভাইকে প্রথমেই দেশী পোষাক ছাড়িয়ে বিলিতী পোষাক পরালো। "Blood and poison—একি পোষাক? উলঙ্গ রইয়াছ বাই।......টোমার ঐ উলঙ্গকারি বষ্ট্র ছিঁড়িয়া—হামার পোর্টম্যাণ্ট মড্যষ্ট বিলাটী স্থুট পরিয়া স্থকি করিতে হইবে হামার অণ্টঃকরণকে।" তারপর ছোটো ভাইকে সংস্কারে দীক্ষা দেয়। "টুই বাযে একট্র হইয়া সমাজ সংস্কারের Pioneer হইলে মেষের ডল—ঠিক ডোউরিটে ডোউরিটে হামাডের পৃষ্ঠে আসিবে। তাহা হামি কুব ভারাত্মক শপট করিয়া বলিটে সাহস করি।" সমাজ-সংস্কারে তাদের কর্মসূচী স্থির হলো—"হামার সমাজ সংস্কারের প্রঠম প্রোগ্রাম পোষাক বড্‌লান্, ডিটীয় স্বাটীন সবাবা বেশ্যা বিবাহ। কেন না বেশ্যারা জন্মাবটি স্বাটিনা; জন্মাবটি স্বাটিনা স্ট্রী না হইলে বাঙ্গালার উট্‌টার ককনো হইটে পারে না।......স্বাটিনা রমণীর

২৩। উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত "দাদা ও আমি" নাটকের উত্তরে।

সণ্টানগণ ডলে ডলে Napoleon, Garibaldi, Mazzini রূপে বঙ্গের গরে গরে, হাটে হাটে বাজারে বাজারে আবিভূ´ট হইয়া আর বিষ বট্সরের মঢ্যে বাঙ্গালাটাকে শ্বাঢিন করিয়া ফেলিবে।" সারদা যে শুদ্ধ বাংলা বল্‌তে পারে না, তা নয়, কিন্তু তবু সাহেবী বাংলা সে বলে। "ওরূপ করিয়া কহিটে আমাডের বিলাট ফেরটডলকে সাবডান হইটে হয়, পাছে Pure বাঙ্গালা বাহির হইয়া পডে? ....নেহাৎ coloquial কহিলে বিলাটফেরট বলিয়া কেহ স্বীকার করিটে চাহিবে না।"

সারদা বাড়ীতে ঢুকেই শোনে পিতা মোকদ্দমার জন্যে বর্ধমানে গিয়েছেন। "That miserly old hypocrite", "that abominable wretch of a father"-এর ট্রেন অ্যাক্‌সিডেণ্টে মৃত্যু কামনা করে। বরদার অনুরোধে সারদাকে একবার বাধ্য হয়ে অন্তঃপুরে যেতে হয়! কিন্তু কি করে যাবেন! তাঁরা যে উলঙ্গ!—অর্থাৎ দেশী পোষাক পরা! শেষে চোখ বুঁজে ভাইয়ের হাত ধরে অন্তঃপুরে ঢোকে। ফিরে এসে চোখ খুল্‌বে। সারদার কথা শুনে বরদার স্ত্রী হেমন্তকুমারী বলে,—"একি ঠাকুরঝি! বঠ্‌ঠাকুরও যে সেই থিয়েটারওয়ালাদের মত টেনে টেনে স্বর করে কথা কয়।" সারদার বোন ক্ষেমঙ্করী বলে,—"ওলো ছুঁড়ী ও সব বিলিতি কথা কওয়া।" ভাদ্রবধূর মিষ্টি গলা শুনে আধ্‌খোলা চোখে হেমন্তকুমারীকে দেখে সারদা মোহিত হয়। সারদা বলে ওঠে,—"Oh ভাদ্রবধূ! অত লজ্জাবতী ম্রিয়মানা কেন? আর ওরূপ এক হাত ঘোমটার ভিতর কেন? ভাদ্রবধূ বিলাতী মতে আদরের জিনিস, Embraceএর সামগ্রী।" হাত ধরে সারদা টানাটানি করতে গেলে হেমন্তকুমারী আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে, সবাই ছি ছি করে; বরদা উঠে পালিয়ে যায়। বামনদাসবাবু এসে সারদাকে বকে ওঠেন; বলেন, আজ থেকে সারদা বৈঠকখানায় খাবে থাক্‌বে, ভেতরে যেন না ঢোকে।

এবার বেশ্যা বিবাহের তোড়জোড় করে দুই ভাইয়ে মিলে। বামনদাসের বুড়ো আচার্যের ছেলে পেলারাম বেশ্যাসংগ্রহে পটু। দুই ভাইয়ে এসে পেলারামকে ধরে—বিয়ের জন্যে দুজন বেশ্যাকে এনে দিতে হবে। পেলারাম অনেক খুঁজে লালনমণি আর তার মেয়ে ল্যাভেণ্ডারকে সংগ্রহ করে। তাদের সে সব কথা খুলে বলে, এমন কি বাবুদের মাথা খারাপের কথাও। লালন বয়স্কা, অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। তার প্রথমে ধারণা হলো, বাবুরা তাদের সম্পত্তি হাত করবার জন্যে এই চাল চেলেছেন। তাই সে আপত্তি

করলো। পেলারাম অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদের রাজী করালো। বল্‌লো, সম্পত্তি কিছুই খোয়া যাবে না, বরং লাভই হবে। মায়ে ঝিয়ে বিয়ে করতে রাজী হলো অবশেষে। লালনের বাড়ীতেই বিয়ে হবে।

বিয়ের সব ঠিকঠাক্‌। পেলারাম হয়েছে পুরোহিত। বিকৃত সংস্কৃতে সে শ্রাদ্ধের মন্ত্র আওড়ায়। জিজ্ঞাসিত হয়ে সে বলে,—"মন্তরের এইটুকুই তো আমার শেখা Sir! তা শ্রাদ্ধই বল আর বিবাহই বল।" দুই ভাইয়ে মিলে মা আর মেয়েকে বিয়ে করতে বসে। অনুষ্ঠান বেশ চল্‌ছে. এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে যায়।

লালন ছিলো সারদার বাবা বামনদাসের রক্ষিতা। ল্যাভেণ্ডারও বামনদাসেরই ঔরস কন্যা। সম্প্রদানের সময় দারোয়ান এসে হঠাৎ খবর দেয়—লালনের বাবু এসেছেন জামাই সাহেবকে নিয়ে। সবাই পালাবার পথ খোঁজে। কিন্তু ইতিমধ্যে বামনদাস আর John Bull এসে ঢুকে পড়েন। দুই ভাই তখন বেপরোয়া। তারা দুজনে দুই বেশ্যার হাত চেপে ধরে রাখে। কারণ বিয়ের পর বেশ্যাদের ওপর তাদের আইনগত অধিকার আছে। অবশেষে বাবার কড়া ধমকে ছোটো ভাই হার মানলো এবং সব কথা তাঁকে খুলে বল্‌লো। বল্‌লো, সব পরামর্শের মূলে—"দাদা ও আমি"। John Bull বামনদাসকে এদিকে বলে যে, সে বিলেত থেকে সারাদাকে ধাওয়া করে এখানে এসেছে। সারদা বিলেতের দাগী আসামী। ওখানকার জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। Bull সারদাকে জেলে পুরতে চায়। পিতা বামনদাস তখন কান্নাকাটি করে, তার হাতে পায়ে ধরে। অবশেষে নাকে খৎ দিয়ে দুজনে রেহাই পায়। ল্যাভেণ্ডারের ঘরে একটা গাধার মুখোস ছিলো। Bull সেটা আনিয়ে সারদাকে পরতে বলে। তারপর ইংরেজী একটা বই তার হাতে দিয়ে বলে,—"দেখ্‌, তোম্‌ গাধা হ্যায়—এই কিতাবঠো পড়ো, পড়নেসে বুঝোগে Social Reformation কেস্কো বোলে।" সারদা সমাজ-সংস্কারের পরিণাম নিয়ে পয়ার আবৃত্তি করে। শেষে দর্শকদের উদ্দেশ করে সে বলে,—"সভ্য মহাশয়, আমরা ভাক্ত সমাজ সংস্কারক. আপনাদের মধ্যে আমাদের মত কেউ আছেন কি? থাকেন তো সাবধান !!!"

বক্কেশ্বর (১৮৮৯ খৃঃ)—অতুলকৃষ্ণ মিত্র। টাইটেলে লেখা আছে,—"বক্কেশ্বর—The Discomfited lover—A faithful picture of the

growing evils of an unworthy cause." সমাজ-সংস্কারার্থে Free love আন্দোলনের সমর্থক নব্য গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ সংগঠিত। প্রহসনের মধ্যে একটি সভায় গানে আছে,—

এবার মদ্দামাদী এক হয়েছি জুটে
সমাজ বাধা আপনি যাবে টুটে
ভাই ভগিনী সবাই মিলে বল্‌বো গো মুখফুটে,—
যারে দেখ্‌বো ভাল, বাস্‌বো ভাল,
মেরে বিয়ের মুখে ঝাঁটা।"

কাহিনী।—অজ্ঞান খাস্তগীর বিলেত ফেরত এবং Free love আন্দোলনের প্রবর্তক। এই আন্দোলনে তার সহায়ক তার বন্ধু চালাক গড়গড়ি। বিশেষ করে চালাক হচ্ছে একজন কাগজের সম্পাদক। চালাকের সহায়তায় অজ্ঞান monied man খোঁজে, কারণ পেছনে টাকা থাকলে যে কোনো আন্দোলনই সার্থক হয়। বৈঠকখানায় বসে অজ্ঞান ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশস্তি গায়। চালাক আসে, কথা প্রসঙ্গে বলে,—এই আন্দোলন "বাঙাল portion take up করেছে, তবে এদেশীরা নানান বায়না তুলছে।" সে আশ্বাস দেয়,—বিপক্ষদলে ধনী লোক খুব কম আছে—সুতরাং আন্দোলনে ব্যাঘাত ঘটবার কোনো ভয় নেই।

এইবার অজ্ঞান জোড়ায় জোড়ায় 'রোল্‌বল্‌' করে। একটি করে পুরুষ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর হাত ধরাধরি করে ঘরে ঢোকে। এমনি করে অনেক জোড়া এসে ঘরে উপস্থিত হয়। তারপর অজ্ঞান তাদের কাছে Free love আন্দোলনের মাহাত্ম্য বোঝায়। বলে,—"হায়, না জানি কবে—আর কত বৎসর পরে ঘৃণিত বিবাহ প্রথা উঠিয়া গিয়া নরনারীর মধ্যে স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। (তারা) প্রেমলীলার চূড়ান্ত অভিনয় দেখাইবে।" "অভিনয়" শব্দটা ব্যবহারে চালাকের পক্ষ থেকে আপত্তি আসে। "Beg your pardon for this interruption. আপনি অভিনয় কথাটা ব্যবহার করিবেন না। ও কথাটা অশ্লীলতা বাচক—immorality ও obscenity পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ তথায় অশ্লীল ভ্রাতা ও ভগিনীগণ গতায়াত করিয়া থাকেন।" অজ্ঞান এটা মেনে নেন। Free love প্রশস্তিমূলক একটা গানের পর জোড়া জোড়া হয়েই তারা চলে যায়।—

"হাঁটি হাঁটি পা পা, গায়ের ওপর দিয়ে গা।
গুটি গুটি চল ভাই, জোড়া গেঁথে বাড়ী যাই॥"

ইতিমধ্যে অজ্ঞানের মেয়ে Miss অবলা খান্তগীর তাদের বাড়ীর বামুন ঠাকুরের সঙ্গে প্রেম করে। স্বাধীন প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এতে প্রকাশ পায়। স্বাধীন প্রেম আন্দোলনের নেতা হয়েও অজ্ঞান মেয়ের এই Free love বরদাস্ত করতে পারলো না। বামুনঠাকুর রামকিঙ্করের ওপর অজ্ঞান চোট্‌পাট্‌ করে। অবলা অন্তঃসত্ত্বা। রামকিঙ্কর বলে,—"ঘাঁটাবেন না, রামকিঙ্কর জামাইবাবু খ্যাতি রটবে।" রামকিঙ্করকে মারতে গিয়ে অজ্ঞান কেঁচো হয়ে যায়। অজ্ঞান অবশেষে বিয়ের মতো একটা ঘৃণ্য কাণ্ডও মেয়ের ব্যাপারে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়। কেননা গর্ভবতী কুমারীকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। অবশ্য একজন মেথর জমিদার আছে। তার সঙ্গে বিয়ে দিলে অবশ্য একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে আসে। চালাকই এই পরামর্শ দেয়। অজ্ঞান এতে সানন্দে রাজী হয়। বক্কেশ্বর মাষ্টার অবলাকে পড়ায়। অবলা নিজের উদ্ধারের আশায় প্রেমের দোহাই দিয়ে বক্কেশ্বরকে অনুরোধ করে—তাকে বিয়ে করবার জন্যে। বক্কেশ্বর বিবাহিত। অবলা তাকে স্ত্রী ত্যাগ করতে বলে। অবলার প্রেম নাকি নভেলের Heroine-এর ভালবাসার চাইতেও বড়ো।

অন্যদিকে আবার বক্কেশ্বরের স্ত্রী চতুরা মেথর-জমিদার চৌখসরামের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে যুক্ত। বক্কেশ্বর একদিন হাতে নাতে তার স্ত্রীকে ধরে ফেলে। তারপর তিরস্কার করে বলে, তার সঙ্গে বক্কেশ্বরের বন্‌ছে না। চতুরা চৌখস্‌কে বলে, স্বামী তাকে divorce করেছে, সে তাকে পুষুক। চৌখস্‌ বলে,—"তোর ভাতারের মুখে লাতি মেরে হামার সাতে চল্‌—তোর জন্মে দশ্‌টা নকর, দাসী দরওয়ান রাখিয়ে দিব।" চতুরা সানন্দে চৌখসের হাত ধরে বেরিয়ে আসে।

এদিকে অবলা বক্কেশ্বরের বাড়ীতে রাত করে গিয়ে বলে,—কাল তাকে মেথরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাই আজই বক্কেশ্বর তার ওপর অধিকার প্রয়োগ করুক। অবলার পূর্ব প্রণয়ী বামুনঠাকুর এই সময় অবলাকে নিতে আসে। "ওর নড়া ধোরে নে গিয়ে উলুবেড়ের জাহাজে চড়াব।" বক্কেশ্বর প্রতিবাদ করলে বক্কেশ্বরের ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে সে চলে যায়।

অজ্ঞান বৈঠকখানায় বসে ভবিষ্যৎ ভাবছে। এমন সময় বক্কেশ্বর এসে

অবলাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে। চৌখসরাম উপস্থিত ছিলো। অজ্ঞান চৌখসের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা আগাম নিয়েছে। সে কনে ছাড়বে কেন? বক্কেশ্বর হতভম্ব হয়ে যায়। এমন সময় চৌখসের মা মেথরাণী চিকণ-বিবি এসে চৌখসকে বলে যে, যাকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, সে অন্তঃসত্ত্বা। তখন চৌখস টাকা ফেরৎ চায়। অজ্ঞান টাকা খরচ করে ফেলেছে—কি করে টাকা দেবে! চৌখসকে সে তার অসামর্থ্য জানায়। চৌখস বলে, এক উপায় আছে। অজ্ঞান এবং চালাক-কে দুই ভাঁড় 'ময়লা' কাঁধে করে ডিপোয় নিয়ে যেতে হবে। বাধ্য হয়ে অজ্ঞান আর চালাক ময়লা ঘাড়ে করে পথ চলে। বক্কেশ্বর হতাশ হয়ে স্থির করে, সে বোষ্টম হবে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানের বাড়ীর ঝি বলে ওঠে, সে তার বোষ্টমী হতে চায়। ঝিকে বোষ্টমী করতে বক্কেশ্বর রাজী হয়।

বউ-ঠাকুরুণ বা সমাজকলঙ্ক (কলিকাতা—১৮৮১ খৃঃ)—জি. সি. রায়॥ বৈকল্পিক নামকরণে লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। প্রহসনোক্ত প্রধান চরিত্রের নামকরণে একটি বিশেষ দিককেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কাহিনী।—ভারতবন্ধু ভণ্ড সমাজ-হিতৈষী। তার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে, বাড়ীর সকলেই আমোদ করছে, কিন্তু তার মুখে হাসি নেই। কারণ তার বিধবা বৌদিও অন্তঃসত্ত্বা। এখন তিনমাসের। ভারতবন্ধুর দ্বারাই একাজ হয়েছে। চোদ্দ বছর আগে ভারতবন্ধুর দাদা মারা গেছে। বৌ-ঠাকুরুণ শ্যামার পক্ষেও প্রলোভন জয় করা সম্ভবপর হয় নি। ভারতবন্ধু ভাবে, —"পাপ তো অনেক করেছি! কলেজে পড়বার সময়ে অনেকের মাথা খেয়েছি। কিন্তু এমন বিপদে পড়িনি। দেখা যাক্। লেখাপড়া করেছি বলে লোকে সম্মান করে। সুতরাং অখ্যাতি প্রচার হলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।" ভারতবন্ধুর মা এটা জেনেছে। তার ধারণা কামদাই এজন্যে দায়ী। "ঐ সর্ব্বনাশী, পোড়ামুখী, কুলকলঙ্কিনীই তো আমার বাছার মাথা খেয়েছে। নইলে প্রতিমার মতো বউ থাকতে ওর কুহকে ভোলে!" ভারত তাকে বলে,—"দেখো, একথা যেন অন্য কেউ শুনতে না পায়, যে কোরেই হউক একটা বুদ্ধি বের করতে হবেই।" মা চলে গেলে ভারত মনে মনে ভাবে,—"ওষুধ দিয়ে যে করেই হোক সন্তান নষ্ট করতে হবে। আমি যখন 'শ্মশান বহ্নি' নাম দিয়ে একটা আর্টিকেল লিখেছিলেম, তখন অনেকেই বিধবাবিবাহ দেওয়ার জন্য মত

প্রকাশ করেছিল। তখন যদি বিয়ে দিতুম তাহলে আর আমাকে এতো ভাবতে হতো না।"

বৈঠকখানায় বসে সত্যপ্রিয় ভাবে, যারা এখন শিক্ষিত হচ্ছে, তারাই পাপের স্রোত আর অধর্মের প্রবাহ বৃদ্ধি করছে। এদের না আছে কর্তব্যজ্ঞান, না আছে ধর্মভয়। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ-নিবারণ ইত্যাদি সমাজহিতের কথা উঠতেই এরা সবাই বক্তৃতা দিতে পটু, অথচ আসল কাজের সময় এদের পাত্তা পাওয়া যায় না। সুতরাং এখন সদ্বিষয়ে আন্দোলন করা কঠিন হয়ে উঠেছে। সত্যপ্রিয় এসব কথা ভাবছে, এমন সময় সুধীর বীরচন্দ্র আর ভারতবন্ধু এসে ঘরে ঢোকে। সত্যপ্রিয় এদের কাছে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। কার্যগতিকে সে কয়েকটি পল্লীগ্রামে গিয়েছিলো। প্রত্যেক গ্রামেই পরিবারে দু-একটা দুঃখিনী বালবিধবা আছে। সেই সঙ্গে গ্রাম্য পণ্ডিতমূর্খদের অত্যাচার। অনেক অনাথা এদের হাতে পড়ে সতীত্বে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মাসেই ভ্রূণহত্যা হচ্ছে, সংসার ছারখারে যাচ্ছে। সত্যপ্রিয়কে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী জেনে এক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করে বলে যে, তার দুটি বিধবা মেয়ে আছে। একটি দশ, অন্যটি বারো বছরের। এই আগুনের ডালি নিয়ে সে জ্বলছে। এদের ধর্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোকের মন শুষ্ক ও অবসন্ন। ভদ্রলোকের অন্য কোনো সন্তান নেই। তিনি বেশিদিন বাঁচবেনও না। তাই তিনি অকূলে পড়েছেন। ভদ্রলোক হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন,—যারা লেখাপড়া শিখে সভ্য হচ্ছে, তারাই এদের সর্বনাশ করছে। কিন্তু এরা শাসনের অতীত।

সত্যপ্রিয়ের মুখে এসব ঘটনা শুনে ভারতবন্ধু বলে,—"এ বিষয়ে একটি পুস্তক লিখে, মিটিং করে প্রচার করা যাক। আমি প্রস্তাবটি লিখব।" সুধীর মন্তব্য করে,—"বক্তৃতা দিয়ে আর বই লিখে এ সমস্যার সমাধান হবে না।" ভারতবন্ধু সম্পর্কে দেবেশ মন্তব্য করে,—"এমন অহঙ্কারী মুখসর্ব্বস্ব লোক বড় দেখা যায় না। তাহার বড় বিশ্বাস সে একজন বিদ্বান্ ও সুলেখক, আপনারাই উহাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন।"

অন্তঃপুরে মলিনবেশে বসে বৌ-ঠাক্‌রুণ কামদা ভাবে, ছেলে বেলায় সে বাবা মার কতো আদরের ছিলো। যার হাতে পড়েছিলো, তাকে ভালো করে চেনবার আগেই—ভগবান তাকে কেড়ে নিলেন। এই পাষণ্ডই তাকে ভুলিয়ে নরকে ডুবিয়েছে। তার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু মনোরমাও তাকে ত্যাগ করেছে।

এমন সময় মনোরমা এসে ঘরে ঢোকে। সে বলে,—"তুমি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছ। তুমি যে জঘন্য কাজ করেছ, তাতে তোমাকে সাহায্য করা ঘোর পাপ। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। তোমার মুখে ধর্ম্ম উপদেশ শুনেছি। পশুর মতো ইন্দ্রিয় সুখ না করলে কি জীবন যায় না?" কামদা সখীর মুখে এসব কথা শুনে কাঁদে। মনোরমা জান্‌তে পেরেছে যে, একজন লোকের সঙ্গে কামদার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। সে বলে, —"তুমি নিজে মজেছ, তার সঙ্গে সঙ্গে একজন নির্দ্দোষ চরিত্র ভদ্রলোককে মজাবে কেন?" কামদা বলে, ভারতবন্ধু নাকি বলেছে, বিয়ের পর এ বিষয়ে আর কেউ নাকি টের পাবে না।

বীরচন্দ্র ইত্যাদি কয়েকজনের সহায়তায় ভারতবন্ধু গোপনে কামদাকে প্রিয়নাথ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে দেয়। সুধীরকে বীরচন্দ্র বলে,—"পাত্রী যে পরিবারের তাত জানই, গোপনে বিয়ে না হলে সম্ভব হতো না। ভারতবাবু সকলকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন।" ভারতবন্ধু নাকি এ বিয়েতে সব খরচা দিয়েছে। বিধবা বিবাহ হয়েছে জেনে সত্যপ্রিয় ও দেবেশ উল্লসিত হলেও পরে সব ব্যাপার শুনে ঘৃণায় ভারতবন্ধুকে ধিক্কার দেয়। সত্যপ্রিয় বলে,—"ভারতবন্ধু ভাল লোক নয় জানি, কিন্তু সে যে এমন জঘন্য চরিত্রের লোক, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।" প্রিয়নাথ এই সময়ে তাদের কাছে এসে বলে, বাড়ী থেকে খবর এসেছে, কামদা মরণাপন্ন। সর্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে। উত্থানশক্তি রহিত। বাড়ীতে যাওয়ার পয়সা নেই যে যাবে। সত্য তাকে টাকা দেয় এবং বলে, গিয়ে স্ত্রীর যেন চিকিৎসা করায়।

প্রিয়নাথও শেষে সবকিছু জান্‌তে পারে। একদিন শিশু কোলে নিয়ে জ্ঞানদা মনে মনে ভাবে, এই শিশুর কোনো দোষ নেই, কিন্তু তার অদৃষ্টের দোষে তার পবিত্র মুখের দিকে চাইতে ঘৃণা হচ্ছে। এমন সময় প্রিয়নাথ এসে উগ্র মেজাজে তাকে বলে,—"আমি তো তোমার কোন সর্ব্বনাশ করি নাই, তবে আমার জীবনটা বিনাশ করলে কেন!" তারপর প্রিয়নাথ বুঝতে পারে, সবকিছুর মূল ঐ ভারতবন্ধু।

ভারতবন্ধু সুধীরের বৈঠকখানায় বসেছিলো। সুধীর ভারতকে বলে,—"তোমার সকল ব্যাপার আমি জেনেছি। তুমি কি জঘন্য কাজ করে অপর লোকের উপর সর্ব্বনাশ করেছ। তুমি শিক্ষিত হয়ে তোমার চরিত্রের একি অবনতি! তুমি ইহার শাস্তি অবশ্যই পাইবে।" প্রিয়নাথ এসে ওখানে হঠাৎ উপস্থিত হয়। সে চীৎকার করে বলে,—"কোথায় সেই পাষণ্ড—যে আমার

সারা জীবনটা নষ্ট করে দিল!" সামনে ভারতবন্ধুকে দেখে প্রিয়নাথ তাকে সজোরে পদাঘাত করলো। ভারতবন্ধু মাটিতে পড়ে যায়, তারপর উঠে পালিয়ে যায়।

পাঁচ কনে (কলিকাতা—১৮৯৬ খৃঃ)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ॥ প্রগতিশীলের বিবিধ অবাস্তব গতিবিধি প্রচারে প্রহসনকারের প্রচেষ্টা নিয়োজিত। অবশ্য অর্থলোভ ও দৌর্নীতিক আয় ঘটিত আর্থিক চিত্র এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। তবে সে সম্পর্কে প্রহসনকারের বক্তব্য অপ্রকাশিত।

কাহিনী।—লক্ষ্মীচরণ তার পুত্র কালাচাঁদকে এম্. এ. পাশ করিয়েছে। তার ইচ্ছে ছেলের বিয়ে দিয়ে অনেক টাকাকড়ি হাতে আনে। ছেলের নাম অমূল্য। অমূল্যকে সে বলে,—"এই এমে পাশ করেছিস্, তোর বে-তে বাগান, বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ আর তোর ওজনে সোনা নেব।" কালাচাঁদ নামে এক প্রতারক ঘটককে সে ঠিক করেছে। কালাচাঁদ প্রতারক হলেও গরীবদের কোনো অনিষ্ট করে না। সে ভাবে, শান্তিরামবাবুর চতুর্দশী কন্যা বনবিহারীর সঙ্গে অমূল্যর বিয়ে দিইয়ে শান্তিরামবাবুর কিছু উপকার করে।

অমূল্য এদিকে মস্ত Reformer. ডালহৌসি ইন্‌স্টিটিউটে সে পুরুষ ও স্ত্রী ডেলিগেটদের নিয়ে মিটিং করে। একজন স্ত্রী ডেলিগেট পূজো সংস্কারের ভার নেয়। বিলিতী প্রথায় পুজো হবে, বাজনা হবে বিলিতী, যাত্রাগানের বদলে উঁচু লেকচার দেওয়ানো হবে। কিচেন সেক্‌সনে কাদম্বিনী দাসী রন্ধনে সংস্কার-মুক্তির ভার নেয়। বিবাহ সেকসনে একজন ডেলিগেট আছে; তার মতে ৩০ বছরে বিবাহের বয়স নির্ধারিত হবে। পণপ্রথা থাক্‌বে না। যৌতুক শুধু একটা লালপেড়ে শাড়ী। স্ত্রী-আচার বারণ, বাসর ঘর নিষিদ্ধ। মনোমোহিনী দাসী স্ত্রী শিক্ষা সেক্‌সনে। তার মতে Entrance না পাশ করলে কুটনো কুটতে পারবে না, I. A. পাশ না করলে রাঁধতে পারবে না ইত্যাদি। একজন পুরুষের নব্য ড্রেসের ভার নেয়, একজন মেয়েদের নব্য ড্রেসের ভার নেয়।

ইতিমধ্যে অমূল্যের সহযোগী নসীরাম এসে খবর দেয়, পুনার খোট্টারা Social Reformation-এর বিপক্ষে Political Congress-এর পক্ষে এক দল করেছে। অমূল্যরা লাল নিশানের দল, তারা সবুজ নিশানের দল। তারপর সবুজ নিশানের দল এলো। লাল নিশানের দল তাদের কাছে ওয়ার ডিক্লেয়ার করে।

লালনিশানের দলের অমূল্যকে উস্কিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করবার আশায় কালাচাঁদ অমূল্যকে বলে, একটি লোক আছে, খুব বীর। অমূল্যর বাবার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। অমূল্যর বাবার বিপক্ষে সে হয়তো লড়বে না। তাই তার মেয়েকে বিয়ে করলে তাকে হাত করতে পারবে। কালাচাঁদ শান্তিরামকেই সেই যোদ্ধা বলে পরিচয় দেয়। শান্তিরামকে কালাচাঁদ সব শিখিয়ে সব কিছুতে সায় দিয়ে যেতে বলে। অমূল্যর সামনে সবকিছুতে সায় দিয়ে যায় শান্তিরাম —কন্যাদায় হতে উদ্ধার হবার জন্যে। কালাচাঁদ বলে, শান্তিরামের মেয়ের বয়স তেত্রিশ। নসী বলে, অমূল্য একে বিয়ে করলে Practical Reformation হবে। কালাচাঁদ মনে মনে ভাবে,—"বুড়োর ঢের খেয়েছি দেখি যদি মেয়েটা পার কত্তে পারি।"

এদিকে লক্ষ্মীচরণের কাছে তার ছেলের জন্যে একটাও সম্বন্ধ আসছে না। শাঁসাল সম্বন্ধ এনে দেবে এই কথা দিয়ে কালাচাঁদ তাকে সাতবছর ঘুরিয়েছে আর টাকা নিয়ে গেছে। কালাচাঁদের ওপর তার রাগ হয়। ঠিক এমন সময় কালাচাঁদ এসে লক্ষ্মীর কাছে উপস্থিত হয়। সে এসে বলে, এক রাজার ছেলের ফরমাসে কালাচাঁদ একটা মাণিক ছড়ানো মেয়েকে যোগাড় করে দিয়ে লাখ লাখ টাকা পেয়েছে। এই ধরনের মেয়েদের বাইরে দেখে বোঝা যায় না। থাকেও সাধারণ জায়গায় নয়। একে লালদীঘির তলা থেকে আনতে হয়েছে। এ রকম আরও কয়েকটা কনে হাতে আছে। একজন বোসেদের পাৎকোর তলায় লুকিয়ে আছে। এরা হাঁচলে, কাশলে, দাঁড়ালে, বসলে, হাসলে কাঁদলে, মোহর টাকা সিকি দুয়ানি—এসব বের করে। এতো টাকা পেয়েও কালাচাঁদ দীনভাবে আছে—সে শুধু ইনকাম ট্যাক্স দেবার ভয়ে। লক্ষ্মীচরণ ভাবে, কালাচাঁদ প্রতারণা করছে। কালাচাঁদের শেখানো মতো নিধি আর সিদ্ধেশ্বর লক্ষ্মীচরণের কাছে ছুটে আসে। নিধি বলে, তার মেয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা জানতে পেরে নিয়ে যাবে ভেবে সে পাৎকোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। কালাচাঁদ জানতে পেরেছে। সিদ্ধেশ্বর বলে, সেও তার মেয়েকে ড্রেনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। কালাচাঁদ জেনে গেছে। এখন রাজা রাজড়া ধরে নিয়ে গেলে মোহর বা টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। লক্ষ্মীচরণ তার ছেলে অমূল্যর সঙ্গে বিয়ে দেয়। আর লক্ষ্মীচরণ তাদের সঙ্গে আধাআধি বখরায় রাজী থাকে, তাহলে দুকূল রক্ষা পায়। লক্ষ্মীচরণ বিশ্বাস করেও বিশ্বাস করতে পারে না। ভাবে, এরা সব গাঁজা খেয়েছে। এরা চলে গেলে গিন্নী এসে বলে,—"হ্যাঁ গা! এ তিন

তিন্‌টে মেয়ে হাতছাড়া কল্লে!" সে আড়ালে বসে সব শুনেছে। গিন্নী বলে, তার গঙ্গাজলও নাকি একথা বলেছে। গিন্নী প্রস্তাব করে,—"দাও, ছেলের বে দাও, চুপি চুপি তিনটে মেয়ে ঘরে নিয়ে এসো। আমি পুঁইমাচার নীচে ঘুঁটের ভেতর লুকিয়ে রেখে দেবো।" লক্ষ্মী আক্ষেপ করে বলে,—"ছেলে যে বে কর্ত্তে চায় না, তা নৈলে ত বে দিতুম! মিত্তিররা বাড়ী বাগান সোনার তাল দিয়ে বে দিতে চেয়েছিল।" এমন সময় অমূল্য আস্তিন গোটাতে গোটাতে আসে। দেখে মনে হয় এখনি কোথাও মারামারি করতে যাবে। গিন্নী বলে,—"কিরে, মারামারি কব্বি না?" অমূল্য জবাব দেয়,—"একেবারেই না। প্রথমে আস্তেন গুড়িয়ে, মুখে শাসানি। বেটাছেলেরা সব শাসাবে, আর লেডিজ্‌রা দাঁত খিচুবে। নসে বোধহয় লেকচার দিলেও দিতে পারে। শেষটা যা হয়—জান্‌ দিতে হয় দেব! কি এত বড় স্পর্দ্ধা! সোসিয়াল রিফর্ম্মেশন চায় না।" গিন্নী তাকে ভাত খেতে ডাকলে মেজাজের সঙ্গে অমূল্য জবাব দেয়,—"কখন না, ওযার ডিক্লেয়ার করেছি, ভাত খাব? শুকনো ছোলা পকেটে রেখে চিবোব—তা নইলে এনার্জি বাড়বে না।" অমূল্য চলে গেলে হতাশ হয়ে গিন্নী লক্ষ্মীচরণকে বলে,—"দেখগা, দেখগা, আমার সতীন হয় হবে, তুমি মেয়ে তিনটে হাতছাড়া কর না।" গিন্নী স্বামীকে পরামর্শ দেয়, কালাচাঁদের সঙ্গে আধাআধি বখরার চুক্তি করলে লোভে পড়ে কালাচাঁদ রাজী হবে।

এবার কালাচাঁদের পাত্রী সংগ্রহ করার পালা। ভদ্রক থেকে এক উড়েনী আসে। সে পুণায় যাবে। সেখানে গিয়ে সে সাহেব বিয়ে করবে। "মু উড়্যা বিয়া করিব নি, সাব বিয়া করিবু, মু ইংরাজী ভাষা শিখুচি, ম্যাজিক শিখুচি, মু উড্যা বিয়া করিবু? সাব বিয়া করিবু।" উড়েনী বলে চলে,—"মু যব সাব দেখিব, এমতি হাত ধরিব। বলিব জাণ্টুম্যান সেক্‌টণ্ডা! সে বলিব মিসিবাবা কঁড বলুচি। মু বলিব তোতে বিয়া করি কিসি করিব, সে হাসি কিরি বলিবে লেডী!" সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে কালাচাঁদকে সে টাকা দেবে। ঘটি বাঁধা দিয়ে দুটাকা দেবে প্রতিশ্রুতি দেয়।

সাহেবও যোগাড় হয়েছে। এক উড়েকে পাকড়াও করে তাকে বলে যে, কোম্পানী নাকি একজন উড়ে রাখবে। সাহেব সাজলে উড়েটা এ যাত্রায় প্রাণে বাঁচতে পারে। ইংরাজী না জানলেও ক্ষতি নেই। ছদ্মবেশী লাট-সাহেবের বেটা বলে চালানো যাবে। কালাচাঁদ উড়েকে একটা পুরোনো

সাহেবী পোষাক দেবে বলে। উড়েনীকে কালাচাঁদ বলে রেখেছিলো, তার হাতে যে লাটসাহেবের বেটা সাহেব আছে, সে উড়ের মতো থাকে, কিন্তু সাহেব।

তারপর ঘরে কনে পাকড়াও করে। সে একজন কাঠকুড়ুনী। মুর্শিদাবাদের রাজার নজর তার ওপরে পড়েছে। রাজা তাকে বিয়ে করবে। সে রাজরানী হবে। প্রথমে আপত্তি করলেও পরে উড়িয়ে দিতে পারে না। কালাচাঁদও নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথ খোঁজে। এক টহলদারকেও পথে পেয়ে যায়। তাকে বলে, পশ্চিমে এক লালার মেয়ে তার প্রেমে পড়েছে। মেয়ের বাবা মস্তো জমিদার। মেয়েকে অন্য বাড়ী পাঠাবে না। ঘরজামাই রাখ্‌বে। টহলদার এমন একটা কনের খবর পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। মেহনতের চাকরী কে চায়! কালাচাঁদ তাকে শিখিয়ে দেয়, নিজেকে যেন সে মুর্শিদাবাদের রাজা বলে পরিচয় দেয়। টহলদার জান্‌লে মেয়েটি আবার বিগ্‌ড়ে যাবে। আর, এ ব্যাপার নিয়ে টহলদারদের সঙ্গে সে যেন পরামর্শ না করে, কেননা শত্রুর অভাব নেই, তারা ভাংচি দিয়ে নিজেরা বিয়ে করবার চেষ্টা করবে।

এবার কালাচাঁদ এক বাঙাল বোষ্টমীকে সংগ্রহ করে। এক গোঁসাইয়ের প্রলোভনে সে কুল ছেড়েছিলো, এখন বোষ্টমী। তাকে বলে, বড়দিনের দিন তাকে নতুন করে বোষ্টমী হবার মতো 'কনে'-র সঙ দিতে হবে। এতে তার প্রাপ্তিযোগ আছে। বাঙাল বোষ্টমী সহজেই রাজী হয়। এই কনে স্বয়ং লক্ষ্মীচরণবাবুর জন্যে কালাচাঁদ ঠিক করে। কনেগুলোকে বাগানবাড়ীর এক জায়গায় এসে জড়ো হবার নির্দেশ দেওয়া হলো। বরগুলো অন্যত্র রাখা হয়। নির্দেশ মতো আস্‌বে।

বাগানে এসে সকলে উপস্থিত হয়েছে। সবাইকে যুবতী দেখে নসীরামের সন্দেহ হয়। এ বিয়েতে তাহলে আর Practical Reformation কি হবে? কালাচাঁদ কনেদের আগের থেকেই শিখিয়ে রেখেছিলো। কালাচাঁদ বলে,—"জিজ্ঞাসা করুন, মশাই! মেয়েমানুষ, দুবছর কমিয়ে বল্‌বে, তবু বাড়িয়ে বল্‌বে না।" নসীরামের প্রশ্নে উড়েনী জবাব দেয়—"দ্বিকুড়ি পাঁচ," কাঠকুড়ুনী জবাব দেয়,—"পচাশ হো চুকা।" বাঙাল বোষ্টমী বলে,—"এই যাইট বলেন পঁয়ষট্টি বলেন।" কালাচাঁদ নসীরামকে বলে, জল হাওয়ার গুণে চেহারা এখনো এমন আছে। কালাচাঁদ উড়েনীকে পাৎকোর মধ্যে নাম্‌তে বলে। তাকে

বোঝায়,—সাহেবদের দেশে নিয়ম এই যে, পাৎকোর মধ্যে মেম বসে থাকে, সাহেব তাকে সেখান থেকে তুলে এনে বিয়ে করে। উড়েনী আহ্লাদের সঙ্গে পাৎকো-র মধ্যে নামে। তারপর কাঠকুড়ুনীকে ড্রেনের মধ্যে বসে থাকতে বলে। সৌখীন জমিদার তাড়ি খায় খুব। ড্রেনই সে ভালবাসে। ড্রেনের মধ্যে কনে পেলেই সে লুফে নেবে। কাঠকুড়ুনী ড্রেনের মধ্যে নেমে বসে থাকে। বাঙাল বোষ্টমীকে কিছু পারা-মাখানো পাই পয়সা চারপাশে ছড়িয়ে বসে থাক্‌তে বলে। শাস্তিরামের মেয়ে বনবিহারিণীও এসে উপস্থিত হয়েছে।

নির্দেশ মতো উড়ে এসে পাৎকো-তে নেমে উড়েনীকে টেনে বার করে। দুজনে দুজনকে দেখে গদ্‌গদ্। টহলদার এসে ড্রেন থেকে কাঠকুড়ুনীকে টেনে তোলে। দুই বরে আর দুই কনে-তে মালাবদল হয়ে যায়। শাস্তিরামের মতো বড়ো যোদ্ধাকে হাত করবার জন্যে অমূল্য তার চতুর্দশী কন্যাকে তেত্রিশ বছরের প্রৌঢ়া ভেবে মালাবদল করে। যৌতুকের জন্যে অবশ্য মন খুঁৎখুঁৎ করে তার। কালাচাঁদের নির্দেশে শাস্তিরাম ভান দেখায়—যেন এখনি সে অনেক কিছু দানপত্র লিখে দিচ্ছে।

লক্ষ্মীচরণ এসে পাৎকো-র কনে আর ড্রেনের কনে দেখে আর সন্দেহ মনের মধ্যে পুষে রাখ্‌তে পারে না। বোষ্টমীকে পারা-মাখানো পাই পয়সাগুলোর মধ্যে বসে থাক্‌তে দেখে ভাবে, এ বুঝি সেই সিকি আধুলি বের করা কনে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সে বিয়ে করে ফেলে। সিকিগুলো পরীক্ষা করে কালাচাঁদের সব প্রতারণা বুঝতে পারে। জাত খুইয়েছে বলে সে আক্ষেপ করে। কালাচাঁদকে যথেচ্ছভাবে গালাগালিও করে।

ইতিমধ্যে সবুজ নিশানওয়ালা দল এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের লেক্‌চার আর লেডিজ্‌দের বিকট মুখভঙ্গির মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময় যুদ্ধের কাছে এক সাহেব এসে উপস্থিত হয়। এ সব দেখে সে মন্তব্য করে—"বহুৎ আচ্ছা।" তারপর এক ভট্টাচার্যও এসে জোটে। সে দুইদলকে হাত দেখিয়ে বলে—"থামো, থামো, সাহেব বল্‌ছে সব জিত। এস সকলে মিলে সাহেবদের স্তোত্র পাঠ করি।" সকলে মিলে তখন নিশান টিশান ফেলে সাহেবের স্তোত্রপাঠ করতে আরম্ভ করে।

পয়জারে পাজী (কলিকাতা—১৮৯১ খৃঃ)—দুর্গাদাস দে॥ 'পয়জার' শব্দের অর্থ "চটিজুতা"। সমাজের নিকৃষ্ট স্তরের ব্যক্তির অনিষ্টমূলক কর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করে লেখক তাদের পূর্বোক্ত নামকরণে অভিহিত করলেও কাহিনীর

মধ্যে তার অস্বাভাবিকত্বও প্রচার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভণ্ড নব্য সংস্কারকের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠন থাকলেও অন্যপক্ষের বিরুদ্ধেও গৌণভাবে দৃষ্টিকোণের উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়।

কাহিনী।—কলকাতা শহরটা যতো সব পাজীর আস্তানা। পথে দাঁড়ালেই কতোরকম জানোয়ার চোখে পড়ে। ইস্কুলের ছাত্রীরা আসে। বিসবৃক্ষ বসাক, শব্দকল্পদ্রুম সারকেল, মাধবীকঙ্কণ মোদক, কপালকুণ্ডলা কাঁই, কল্পতরু কুণ্ডু—পথে গান গেয়ে চলে। এনট্রান্স পাশ করে সকলে নাকি ফ্রি-লভে নাম্‌বে। লজেন্সওয়ালা এলে মাধবীকঙ্কণ দু'ডজন কেনে, বিষবৃক্ষ বলে, তার মাস্টারমশাই তাকে কতো এনে দেয়। শব্দকল্পদ্রুম লজেন্স কেনে না। কল্পতরু তাকে জিজ্ঞেস করে, "তুই নিবি নি ভাই?" শব্দকল্পদ্রুম জবাব দেয়,—"না ভাই, বাবা বলেছেন অশ্লীল।" রেওড়ীওয়ালা এলে এরা সবাই রেওড়ী কেনে। এক পয়সা ঠোঙা। এই রেওড়ী খেলে নাকি যৌবন মেলে, সেই সঙ্গে লভারও মিলে যায়।

বিশেষ করে বিডন গার্ডেনটা একটা চিড়িয়াখানা বল্‌লেই হয়। X'mas-এর দিনে সবরকম জাতের জানোয়ার এখানে এসে মেলে। স্বাধীনা যুবতীরা ক্রিকেট খেল্‌তে আসে। তারা বলে, আড় নয়নেই তারা অনেককে আউট করে দেবে। কতগুলো বকাটে লোক তাদের বাহবা দেয়। বঙ্গভট্ট নামে এক পণ্ডিত তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে,—"বলি হ্যাঁগা, তোমরা কারা গা? তোমরা কি সোনাগাছি থাকো? ওগো বাড়ীর লম্বর কত?" এমন সময় একটা উড়েনী আসে। তাকে দেখে বঙ্গভট্টের মনটা তার দিকে পড়ে যায়। উড়েনীকে ডেকে বঙ্গভট্ট বলে,—"উড়েনীং, তুমিং মমং গৃহিনীং বৎ। উড়েনীং জগন্নাথ বলং জগন্নাথ বলং।" পণ্ডিতের রকম দেখে একজন লোক মন্তব্য করে,—"বাগানটা দেখ্‌ছি বড়দিনে মাৎ করে দিলে। কলকাতায় কত জানোয়ার এসে জোটে তার নিরাকরণ নেই। এমন মজার জায়গা বাবা ভারতে নেই।" ওদিকে উড়েনীও গদ্‌গদ্‌। সে বলে,—"ভট্‌চরজী তো মুখ দেখি মু ভুলি গলা।" পণ্ডিত বলে,—"থুবুং যতনং কৈরাং ভক্ষণঞ্চ চাঁপা কলা।" উড়েনী বলে,—"তোমর মাথায় চৈতন ফক্কা, দেল ছাতিরে বড় ধক্কা।" বঙ্গভট্টও বলে চলে,—"মম প্রাণং হলোং অক্কা।" উড়েনী বলে,—"ঠাকুর কঁড় করিলা, মুতো অবড়া বড়া।" নদের চাঁদ বিডন বাগানে বেড়াতে এসেছিলো। সে মন্তব্য করে,—"ও শালা টিকিওয়ালা, তোমার এই কাণ্ড? শালা ভারি

মেয়েমানুষ-খোর হে। দেখ দেখি, এক বেটী উড়েনীকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারটা করলে! বাবা তোমার নস্যির নেশাতেই এই, না জানি মামার জল পেটে পড়লে আরো কত কি করতে।" তখন বঙ্গভট্ট জবাব দেয়,—"বাবা, এ বড় বিষম দায়রে। যে এ দায়ে ঠেকেছে, সেই বুঝেছে।"

এবার গয়ারাম আসে। মুখে তার সব সময়ে সাম্য সভ্যতা স্বাধীনতার বুলি। সে এসেই লেক্‌চার স্থুরু করে দেয়। "সাম্য, সভ্যতা, স্বাধীনতা মানুষে যতদিনে না পাচ্ছে ততদিন আমার প্রাণ কোনরকমে স্থির হতে পাচ্ছে না। আহা কবে সেদিন আস্‌বে, যেদিন সভ্যতার প্রভাবে বামুন হাড়ি হবে, মুচি আচার্য্য হবে আর ডোম্ মিশনারী হয়ে ঘরে ঘরে ধর্ম্ম প্রচার কর্ব্বে? কবে আমরা উচ্চৈঃস্বরে বল্‌তে শিখবো যে আমাদের বিধবারা অসতী, কোর্টশিপ না করে ছেলেবয়সে বিবাহ দিলে সে ছেলে জোয়ান্ হয় না, স্থরুচি-সম্পন্ন হয় না।..... কবে আমরা নববিবাহিতা নিদেন আঠারো বৎসরের প্রণয়িনীকে গাউন পরিয়ে, হাত ধরে বাগানে বেড়াতে পার্ব্বো? কুরুচিসম্পন্ন মা বাপকে ত্যাগ করে, তাদের বাড়ী ত্যাগ করে, কেবল মাকে খোরাকি দিয়ে প্রাণপ্রিয়া প্রণয়িনীকে নিয়ে মেসে থাকতে পার্ব্বো?" লেকচার দিতে দিতে গয়ারামের গলা শুকিয়ে ওঠে। মদ না খেলে গলা ভিজবে না। তাই সে বক্তৃতার ভঙ্গীতেই বলে,—"সভ্যগণ, তোমরা সকলেই অবগত আছ যে লেকচার দিয়ে জল খান, কিন্তু এখানে জল নাই, আমি জল খেতেও চাই না; কিন্তু আমি যা চাই. সভ্যতার খাতিরে বল্‌তে পারিব না? সভ্যগণ, আমি একবার —আমি একবার—আমি—আমি· ·।" বক্তৃতা শেষ হয় না। সকলে গয়ারামের কান মলে দিয়ে চলে যায়।

এক খেলুড়ে নানা রকম আজব জীব দেখলে তাকে ধরে রাখতো খেলা দেখাবে বলে। একদিন পথে সে হাঁক দেয়,—"একাদশীর খেলা।" পথের সবাই একটা করে পয়সা দিয়ে খেলা দেখতে দাঁড়ায়। খেলুড়ে প্রথমে কাবুলে সম্পাদককে বের করে নাচায়। পরের ভাত খেয়ে এর নাকি খুব তেল হয়েছে। তারপর নাচে বঙ্গভট্ট। "টিকি লুকায়ে গোপনে গোপনে রামপাখী খেতে" এর মতন কেউ পারে না। তারপর বস্তাপচা সম্পাদক নাচে। এর বিদেশের সব খবর নখদর্পণে, কিন্তু স্বদেশের কোনো খবরই এ রাখে না! তারপর নাচে রামনিধি সমাজ-সংস্কারক। —"বুড়া, বিষ বরষ্‌কা লেডীকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে পার্ব্বে?"—"হুঁ"—"বুড়া তোম বিলাত্তি দরজীকা দোকানসে

ভাল পোষাক কিন্‌কে তোমারা বাইশ বরষ্‌কা কুমারী বহীনকা দেনে শেখে গা ?"—"হুঁ !" এইভাবে জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে একে একে এইসব জোয়ানদের কৃতিত্ব প্রচার করে।

গয়ারাম এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে দেখেই খেলুড়ে তাকে পাকড়াও করে ফেলে। এই অদ্ভুত জানোয়ারটাকে ধরবার জন্যে সে অনেক ঘুরেছে। গয়ারাম খেলুড়েকে সভ্যতার বুলি শোনায়। গরিব হয়েও খেলুড়ে গয়ারামের মতো একটা উঁচু লোককে আপন ভাবছে,—এই সাম্যবোধ নাকি একটা শুভ-লক্ষণ। কিন্তু সে খেলুড়েকে ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করে। "আমাকে কিন্তু একবার ছেড়ে দিতে হবে, আজ বড়দিন, আমার ত্রিশ বৎসরের বিধবা পিসির, আঠারো বৎসরের বিধবা ভগ্নীর আর আমার শ্রীমতীর শুভ বিশুদ্ধ পরিণয়; তারপরে তোমার কাছে আস্‌বো, আমার লাগাম ছেড়ে দাও।" খেলুড়ে তাকে শক্ত করে ধরে রাখে। এই সময় একদল মাতাল গান গায়,—

"মা এবার স্বাধীন খাবো
চাটে স্বাধীন গ্লাসে স্বাধীন, বোতলে স্বাধীন মেশাবো।
যখন আসবে শুঁড়ী, চাইতে কড়ি, স্বাধীন মুখে ঢেলে দেবো ॥"

এদিকে গয়ারামের বাড়ীতে পিসিমা বলে,—"গয়ারামটার হলো কি? বৌ ছুঁড়ীটাকে ত ঘরে রাখ্‌তে চাইছে না, বলে ঘরে রাখ্‌লে পেটের ব্যারাম হবে।" গয়ারামের বিধবা যুবতী বোন কুমুদ দাদার বুলির খুব তারিফ করে। বিধবার বিয়ের ব্যাপারেও সে দাদার মতের সমর্থক। "দাদার অনেক কথা আমার বেশ লাগে।" কুমুদ আরো বলে,—"পিসিমা, আমাকে ত সমস্ত রাত্তিরটা জ্বালাতন করে, কখন বলে ভগ্নী, কখন বলে ভ্রাতা, কখন বলে এখনি চল। রাত্রে একদিন সাম্য স্বাধীনতা সভ্যতা বলে এমনি চীৎকার করে উঠ্‌লো যে পাড়ার লোক জেগে উঠ্‌লো।" পিসি ভাবেন, যেমন ভাই, তেমনি বোন,—একেও রোগে ধরেছে।

খেলুড়ের অসতর্কতায় গয়ারাম হঠাৎ পালিয়ে গিয়ে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। পিসিমাকে সে বলে, তাঁকে আর একাদশী করতে হবে না, থান পরতে হবে না, এখন তাঁকে গাউন পরতে হবে। "কাবুলে সম্পাদক ও টিকিওয়ালা ভট্‌চায কি দয়ালু! দেশের একটা মহৎ উপকার করছে।" তারপর গয়ারাম আজ ক্রিষ্টমাসে পিসিদের সবাইকে বিয়ে দেবার প্রস্তাব করে। গয়া তক্ষুনি

প্রসেশনের ব্যবস্থা করে আসছে। এদেশে বিধবাদের দুঃখ দেখে তার প্রাণ নাকি কেঁদে ওঠে। "দিন নাই, রাত নাই, বিধবার বিরহ-সংবাদ পাইলে আমি ছুটিয়া গিয়া রোগ শাস্ত করি।" দাদার কথায় কুমুদ গলে যায়। অসম্মত পিসিকে সে বলে,—"তুমি সেকেলে মাগীদের কথা ছেড়ে দাও, বিদ্যাসার মশাই যা বলে গেছেন, সে কথা কি মিথ্যা ?" পিসি আতঙ্কিত হন। 'বিদ্যাসার' মশাই চল্লিশ বছরের ছেলেওয়ালা বিধবার বিয়ে দিতে বলেন নি। যা হোক গয়ারামের কাছে কারো আপত্তি টিকতে পারে না। বিধবা বোন আর পিসির বিয়ে তো দেবেই, তা ছাড়া নিজের স্ত্রীরও বিয়ে দিতে সে চায়।

স্বাধীনতার উত্তেজনায় গয়ারাম পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তায় এক যুবতী চামারণীকে দেখে গয়ারাম বলে ওঠে,—"আহা চামারণী ত নয়, এ যে কমলিনী, স্বাধীন, স্বাধীন না হলে কি রাস্তায় গান করে বেড়ায় ? ভগ্নী তোমার মুখ দেখে আমার প্রেম হচ্ছে। মুচিনী বলে আমার কোনো ঘৃণা নাই, সাম্য, সাম্য, সাম্য।" মুচীও পেছন পেছন আসছিলো। গয়ার মুখে একথা শুনে মুচিনীকে সাদী করবার জন্যে গয়ারামকে প্রস্তাব করে। মুচী কাছে আসতেই গয়ারাম তাকে দূরে সরে যেতে বলে, তাকে যেন না ছোঁয়। গয়ারাম বলে,—"মুচে ! এ অসভ্যতা, তোমার সঙ্গে আমার এখন সাম্যভাব হয় নাই। ঐ অনাথা বালিকার সঙ্গে আমার সাম্যভাব হয়েছে।" "কেমন জবর প্রেম দেখেছ"—এই বলে মুচী জুতো দিয়ে গয়ারামকে খুব করে পেটায়।

ওখান থেকে গয়ারাম চলে এক গুলির আড্ডায়। গয়া তাদের কাছে গিয়ে বলে, তাদের প্যারেড করতে হবে। গুলিখোররা বলে,—"উঠে হেঁটে পারবো না বাবা, বসে বসে যদি ছিটে চালাতে বল ত পারি।" গয়ারাম বলে,—"ছিটে চালাতে হবে না, গুলি গোলা চালাতে হবে।" তখন গুলিখোররা আক্ষেপ করে বলে,—"চালাতে পারবো না কেন ? বাবা ছিটের খরচই চলে না, আমি একা চোখ না চাইতে চাইতে বাইস পুরিয়া পাচার করি। কাপ্তেন কে বাবা, যে হরদম্ মাল মসলা জোটায়।" যাহোক গয়ারাম তাদের প্যারেড করায়। গুলিখোররা বসে বসে প্যারেড করে।

বিডনের বাগানে গয়ারাম আবার এসেছে। ফিমেল ব্যাণ্ড পার্টি সে আনিয়েছে। সে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলে,—"আজ আমাদের কি শুভাদন, সভ্যতা, সমতা, স্বাধীনতার জোরে আমি বিধবা পিসির ও ভগিনীর এবং সধবা পত্নীর বিবাহ দিতে লইয়া আসিয়াছি, কিন্তু পাত্র এখন জোটে নাই।"

গুলিখোররাও এসেছে। সকলে মিলে স্বাধীনতার গান গায়, গুলিখোররা বসে বসে প্যারেড করে। ওদিকে ব্যাণ্ড বাজতে থাকে। হঠাৎ পলাতক জানোয়ার গয়ারামের খোঁজে খেলুড়ে ঘুরতে ঘুরতে বাগানে এসে পড়ে। এবার আর তাকে সে ছাড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে সে শক্ত করে গয়ারামের মুখে লাগাম পরিয়ে নিয়ে চলে!

ঘোড়ার ডিম (ঢাকা—১৮৮৯ খৃঃ)—হরিহর নন্দী॥ বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অবাস্তবতা প্রচার করে এবং আন্দোলনকারীদের বাক্‌সর্বস্বতাকে বিদ্রূপ করে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিখ্যাত কবিতা আছে।

"বাক্যের অভাব নাই, বদন ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কালহরা।
মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা॥"

—এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় প্রহসন শেষে মন্তব্যে।—

"সংস্কারক বলে যেই লোকের কাছে কয়।
কার্য্যকালে পাছে হাটে সেই মহোদয়॥
আপনাগুণ সভার কাছে করেন সুখ্যাতি।
কার্য্যের নামে ঠনঠনাঠন কেবল যুক্তি গুতাগুতি॥"

কাহিনী।—বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থক কিংবা সমাজ-সংস্কারক হিসেবে অনেকেই বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, কিন্তু কাজের সময় তাঁরা পিছিয়ে যান। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে মাণিক সভাসমিতিতে যেতে ওঠে। প্রচারপত্র পড়িয়ে বেড়ায়। "শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরদুঃখে কাতরতা, অটল অধ্যবসায় ও অক্লান্ত শ্রমশীলতাদিগুণে এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের কৃপাদৃষ্টিতে হিন্দুবালা বিধবাদিগের চিরদুঃখ বিমোচনের পথ মুক্ত ও নিষ্কণ্টকিত হইয়াছে।"......"এক্ষণে কোন বিধবা ইচ্ছা করিলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মতে পুনর্ব্বিবাহ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।" গোবর্ধনের সঙ্গে মাণিকের দেখা হয়। গোবর্ধনকে সে

বলে, এ ব্যাপারে আসছে শনিবার "পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে" একটা মিটিং হবে। গোবর্ধন মাণিককে জিজ্ঞাসা করে—সে কোন্ পক্ষে? মাণিক জবাব দেয়,—"আমার আর পক্ষাপক্ষ কি? যেদিগে জয়, সেই দিগেই আমি।" গোবর্ধন বলে,—যাদের স্বামী নিরুদ্দিষ্ট বা যারা স্বামী পরিত্যক্তা—তাদেরও পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত। মাণিক একথা সমর্থন করে। গোবর্ধন বলে,—"ইহা ব্যতীত দেশের উন্নতি হইবার কোন পথ নাই, এই দেখুন ইংরাজেরা বিদেশী, তথাপি আমাদের দেশের হিতের জন্য কতদূর করিতেছেন।"

আন্দোলনের প্রচার খুব চল্‌ছে। বিধবাদের মধ্যে একটা আশা জেগে ওঠে। এবার তাদের বিয়ে হবে ভেবে তারা আনন্দ প্রকাশ করে। কামিনী মনমরা হয়েছিলো। রাজলক্ষ্মী তাকে এই খবর দিলে কামিনী উল্লসিত হয়ে ওঠে।

মিটিং নিয়ে অনেক প্রচারের পর শনিবার যথাস্থানে যথারীতি মিটিং বসে। প্রচুর জনসমাবেশ। দীনদয়াল রায় বহুবিবাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তন নিয়ে বক্তৃতা করবেন। তিনিই এই সভার সভাপতি। সভাপতি দীনদয়ালবাবু উঠেই বক্তৃতার মধ্যে বললেন,—মৌখিক সংস্কারক হয়ে কোনো ফল নেই। যার যে বিধবা আত্মীয়া আছেন, তাদের বরং বিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। এসব শুনে একে একে শ্রোতাদের আসন শূন্য হতে সুরু করে। শেষে দেখা গেলো—সভাগৃহ শূন্য। মাণিক এ সব দেখে বলে,—"ঘোড়ার ডিম! কেবল সভাই সার! যাহারা মুখসর্ব্বস্ব দেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা কার্য্যে কিছুই না।"

কষ্টি পাথর (কলিকাতা—১৮৯৭ খৃঃ)—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজের বিভিন্ন তথাকথিত সংস্কারকের আচরণ যে ভানমাত্র, এই তথ্য প্রমাণের জন্যে প্রহসনকার কৃত্রিমতা নিরূপক একটা প্রস্তরখণ্ডের কল্পনা করে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব হলেও মনোভাব এবং আচরণের পার্থক্য এভাবে প্রকাশ করে প্রহসনকার একটি সহজতর পদ্ধতিরই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। প্রহসনকার একে নিজেই "ব্যঙ্গ নাট্য" বলে অভিহিত করেছেন।—"সুহৃদ্বর শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়কে এই ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাট্য সাদরে উপহার প্রদত্ত হইল।"

কাহিনী।—স্যার দীনেন্দ্রদয়াল ধনী জমিদার। তাঁর গলগ্রহ হয়ে কয়েকজন দেশোদ্ধারের হুজুগে মেতেছে। নবীন উন্নতিশীল বাবু। সে বলে,—"এ হাড় কখানা দেশের জন্য যাবে, তা অপেক্ষা উচ্চ অভিলাষ আমার

নাই।......ইংরাজরাজ্য রামরাজ্য, জানিনা রামরাজ্যেও এত সুখ ছিল কিনা;......ইংরাজরাজ আমাদের সব দিয়েছেন, তবে আমাদের নিজেদের আত্মনির্ভর না থাকলে সমস্ত মিছে।" পূর্ণবাবু বরানগরে জাতীয় নগরকীর্তন করতে গিয়ে মার খেয়ে আধমরা হযে ফিরে এসেছেন। শুনে বিষ্ণু বলে,—"দেখি কত মারে, মার খেয়ে খেযে তাদের পরাস্ত কর।" বিষ্ণুও একজন উন্নতিশীল বাবু। তাঁর মুখেও সর্বদাই বড় বড় দেশের বুলি। তাঁদের দলে একজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোকও জুটেছেন। তিনি "ভারতের ভবিষ্যত আশার ধ্রুব নক্ষত্র," Calcutta University-র glory শ্রীমতী রঙ্গিনী গুপ্তা।

দীনেন্দ্রবাবুর আর একজন গলগ্রহ আছে—তাঁর সম্বন্ধী উমেশ। সে মদ্যপ ও চরিত্রহীন। কিন্তু তার মধ্যে এদের মতো ভণ্ডামি নেই। তবে বিষ্ণুর মতো তথাকথিত ভণ্ড স্বাদেশিকদের ওপর তার রাগ যথেষ্ট। কুক্রিযায় এই-সব ভণ্ডদের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই, অথচ এরা উমেশকে দোষারোপ করে। রঙ্গিনীদেবী সম্পর্কেও উমেশের ধারণা উঁচু নয়। সে জানে রঙ্গিনী একজন ছদ্মবেশী গণিকা। তাই একদিন তাদের সভায প্রকাশ্যভাবে নিজেকে খারাপভাবে প্রচার করে রঙ্গিনীর সম্বন্ধে নিজের ধারণাটাও প্রকাশ করে। রঙ্গিনীকে দেখে সে বলে ওঠে,—"এ যে বেড়ে জিনিস হে!" আজকাল কি বাড়ীতে মেয়েমানুষ আনা হচ্ছে! ভালো মদের লোভ দেখিয়ে রঙ্গিনীকে তার সঙ্গে যেতে বলে। উমেশ বলে,—"আমার কেমন যে স্বভাব, সেই ছেলেবেলা থেকে গো, মেয়েমানুষ বড় ভালবাসি, আর বেটা ছেলেকে বড় ঘেন্না করি।" সকলে উমেশকে ধিক্কার দেয়।

বিষ্ণুর দলে আরও দুজন আছেন। একজন মিঃ মুখার্জী—পলিটিসিয়ান্। বিষ্ণুবাবু তাকে যদি বিলেতে পাঠায়, তাহলে সে নাকি ভারতের হয়ে ওখানে একটা আন্দোলন আন্‌বে। বিলেতে যাবার একটা পথ যদি পেয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর কাছে কাছে ঘোরে। আর একজন—অর্থাৎ, রামহরি উকীলের অবশ্য তেমন কোনো বাসনা নেই, তবে স্বাদেশিকদের দলে মিশে যদি কেস্‌টেস্ পাওয়া যায়, তা মন্দ কি? কিন্তু দুজনেই নিজেদের উদ্দেশ্য গোপন রেখে দেশের বুলিতে মুখর।

বিষ্ণুর মোসাহেব গাঙ্গুলী। তার আসল উদ্দেশ্য অর্থদোহন, কিন্তু স্বাদেশিকের কাছে মোসাহেবী করতে গেলে স্বাদেশিক হতে হয়। নাস্তিক বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে সেও নাস্তিকতার ভান দেখায়। দরকার হলে

বাধ্য হয়ে মুসলমান পীরের সিন্নি দেয়। কিন্তু হিন্দুর দেবতা মানে না। মানিকপীরের সিন্নি দিয়ে এসে কৈফিয়ৎ দেয়, "মানিকপীর ত ততটা হিঁদুর দেবতা নয়, আপনার ত হিঁদুর ঠাকুরকেই মান্‌তে মানা।" গাঙ্গুলী অনেক জায়গায় মোসাহেবীয়ানা করেছে। সার বুঝেছে, মদ বেশ্যায় না ভেড়াতে পারলে বাবুর কাছ থেকে অর্থ দোহনের আশা নেই। গাঙ্গুলী একদিন কথা প্রসঙ্গে পিয়ারা বেশ্যার কথা বলে। সে না'কি বিষ্ণুর জন্যে ভেবে ভেবে পাগল হয়েছে। বিষ্ণুর যাতে ভালো লাগে, সেজন্যে "যারে বিদেশী বঁধূ" ইত্যাদি গান ছেড়ে স্বদেশী গান শিখছে। বিষ্ণু তাকে আশ্রমে নিয়ে আসতে বলে। "যাদের কেউ নাই, তাদের আমরা আছি তুমি তাকে বলো।" গাঙ্গুলী বলে,—"তার সকলই আছে। মল্লিকদের বাড়ীর ছেলেরা অষ্টপ্রহর ঘিরে আছে।" যা হোক, বিষ্ণু সেখানে যাবার কথা বিবেচনা করে।

যথাদিনে পিয়ারার ঘরে বিষ্ণুকে নিয়ে গাঙ্গুলী একদিন পদার্পণ করে। কিছুক্ষণ ইয়ার্কি দেবার পর গাঙ্গুলী বিষ্ণুকে পিয়ারার ঘরে রেখে সরে পড়লো। বিষ্ণুকে পিয়ারা অহেতুক প্রশংসা করে এবং নিজের আকর্ষণ ব্যক্ত করে। বিষ্ণু পিয়ারাকে তাদের সম্প্রদায়ে আসতে বলে। এমন সময় স্বাদেশিক দলের রঙ্গিনী গুপ্তা পিয়ারা বেশ্যার বাড়ীতে আসেন। পিয়ারার বেয়ারা বিষ্ণুর চাকরকে ঠিকানা জানিয়ে এসেছিলো। চাকরের মুখে ঠিকানা জেনে রঙ্গিনী এখানে এসেছে। বেশ্যাবাড়ী বিষ্ণুকে দেখে বলে,—"You are a Blackguard—I know it—Bistoo" পিয়ারার সহায়তাকারী নাপ্তিনী তাকে বামা বাড়ীউলির নতুন রাড ভেবে বলে,—"ওরকম ধাত হলে এ লাইনে ত সুবিধা কত্তে পার্ব্বে না বাবু।" পিয়ারাও তাকে অন্য বেশ্যা ভাবে,—"নিজের লোককে নিজে সাম্টাতে পার না, পরের সঙ্গে ঝগড়া করে মর কেন? ঘৃণা করতে লজ্জা হয় না, আমি ত আর আমার বাবুকে ধত্তে তোমার ঘরে যাইনি, তোমাকে আমায ঘরে আস্‌তে হয়েছে।" মিস্ গুপ্তা তাকে বেশ্যা ভাবতে মানা করে, মুখ সামলাতে বলে। তখন পিয়ারা বলে,—"বেশ্যার বাবা মনে করব। আমরা গোঁফ দেখে বেরাল চিনি, দেখেই চিনিছি তুমি কি? লোকে আপাততঃ নিখরচায় ইয়ারকি পেলে কেন পয়সা খরচ করবে? আমাদের বৃত্তিকে ত ঘৃণা করে ফেল্লে, তোমাদের বৃত্তিটা একবার তলাও দেখি? আমরা ত দিনে সাবিত্রী, রেতে গায়িত্রী সাজি না। ...আমরা যা করি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কিছু করি না। তুমি কি? ব্যবসা

বাণিজ্য, চাল, চলন সবই আমাদের নিয়েছ, কেবল একটা মুখোস পরে আছ, ভদ্দর আমার!" হঠাৎ উমেশ এসে পড়ে। উমেশকে দেখে লোকলজ্জার ভয়ে বিষ্ণু, গাঙ্গুলী, রঙ্গিনী পালিয়ে যায়।

দীনেন্দ্রকে সভাসমিতি করা দেখে উমেশ বলে, এসব করা বৃথা। এদের ধারণা, শহরের মুষ্টিমেয় লোকই দেশের সমগ্র লোক। "এত বড় ভারতবর্ষটা কি তুমি ঠাওরাও, জন দুচ্চার খপরের কাগজওয়ালা, দুজন বিলেত ফেরত Native Anglo-Indian, দুদশজন Title লোভী জমীদার আর দশবিশজন আমা হতেও নিষ্কর্ম্মা হুজুকপ্রিয় বাক্যসার লোকের সমষ্টি। তোমরা বিনা মাশুলে তাদের অগ্রণী হয়ে দেশের রাজার কাছে তাদের হয়ে বলে নিজের সুবিধে করে নিচ্চ। সে গরিবদের লাভ এই, তোমাদের actionএর জন্য তারা suffer কচ্চে। সব নিজের নিজের উদ্দেশ্যে ঘুচ্চ, কেউবা নামের জন্যে, কেউবা ভড়ংএর ব্যাপায়, কেউ বা শুধু হুজুগে, কেউ বা উরির ভেতর থেকে দু পয়সা টানবার ফিক্রেসে।"

ইতিমধ্যে উমেশ সাধুর কাছ থেকে একটা মজার কষ্টিপাথর পেয়েছে। মানুষ কোন্‌টা ভেজাল, কোন্‌টা খাঁটি, এটা দিয়ে সেটা টের পাওয়া যায়। মানুষের গায়ে পাথরটা ঠেকালেই সে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে সব কথা বলে দেয়। পাথরটা একটা সাধু তাকে দিয়েছে।

একদিন ভণ্ড স্বাদেশিকদের সভায় উমেশ ঢোকে পাথরটা সঙ্গে দিয়ে। নবীন ভারতের উন্নতি নিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বক্তৃতা করছিলো। তার টেবিলে পাথরটা ছোঁয়াতেই নবীন বলে ওঠে, দীনদয়ালকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে যদি সে তার ছেলেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করে দিতে পারে, তাহলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিষ্ণুকে পাথর ছোঁয়ালে—বিষ্ণু তার পিয়ারার ঘরে থাকার কথা নিয়ে লোকলজ্জার ভয় ব্যক্ত করে, তাছাড়া উমেশ যদি বলে দেয়, সেই ভয়ও তার আছে—এটাও ব্যক্ত করে। আজকের মিটিংয়ের ব্যাপার কাগজে থাকবে, তার নাম বেরোবে, Patriot হিসেবে তার খ্যাতি হবে, সে চিন্তাও বিষ্ণু প্রকাশ করে দেয়। মিঃ মুখার্জী কষ্টিপাথরের ছোঁয়াতে বলে ওঠে,— "দিন কাটলেই হল—তা যে হুজুক নিয়েই হক, তাই দেশের হুজুকটা বড় respectable। আমার পেটটাও চলে, নামটাও বাজে। যাহোক দেশের উপকার হলে তা সত্যিই ভালো হয়।" শেষের কথাটার জন্যে উমেশ তাকে এদের মধ্যে খাঁটী বলে স্বীকার করে। পাথরের গুণে রঙ্গিনী গুপ্তা বলে,—

"বিষ্ণুর জন্যই ত এখানে আমার আসা, নইলে ভরত রইল কি মল, আমার বয়ে গেল।" রামহরি উকীল বলে,—"এমন Public Occasion নেই যেথায় যোগ না দিচ্ছি, ঐ Public Spirited, Patriotic হচ্ছি, কিন্তু case ত একটাও জুটছে না।" গাঙ্গুলী বলে, টেবিলের রূপোর গোলাপ-পাশ আর আতর দান দুটো সে লুকিয়ে নিয়ে যাবে। দীনেন্দ্র দয়ালবাবু স্বয়ং উমেশের কষ্টিপাথরের গুণাগুণ তথা ভণ্ডদের স্বরূপ সামনে বসে থেকে জানলেন। দীনেশচন্দ্র নামে একজন নীরব ব্যক্তি ছিলেন, পাথর তাঁর গায়ে ছোঁয়াতেই তিনি দেশের প্রতি তার গভীর প্রেম ব্যক্ত করলেন। উমেশ তাঁকে সভক্তি প্রণাম জানায়।

অপূর্ব্ব ভারত উদ্ধার (ভবানীপুর—১৮৮০ খৃঃ)—নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ॥ টাইটেলের আগে লেখা আছে,—"বঙ্গীয় সমাজ (প্রথম চিত্র)।" প্রহসনটিকে লেখক "দর্পণ" বলে পরিচয় দিয়ে মলাটে পদ্যে বলেছেন,—

"গড়েছি দর্পণ দেখ ভারত সন্তান।
করে ধরি আপনার স্বরূপ বয়ান॥"

প্রহসন শেষে গীতে প্রহসনকার বলেছেন,—

"ভারত জাগানে গীত মেকি কাঠ গায়।
সাহেবি চীৎকারে কেহ গগন ফাটায়॥
চখে ধূলা দিয়ে তোরে কেমন ভুলায়।
পবিত্র ভারত নামে কলঙ্ক মাখায়।
ভারতের জগদীশ বিপন্নের নাথ।
পাপীর মুণ্ডেতে যেন হয় বজ্রাঘাত॥"

কাহিনী।—আত্মশর্মা একজন "ভারতসন্তান" অর্থাৎ ভারত উদ্ধারকামী। তিনি অতি নিকৃষ্ট স্বদেশমূলক কবিতার বই লেখেন। একটা কাগজও তাঁর নিজের আছে। শ্রীপতিবাবু নামে এক ধনী ব্যক্তি আছেন। তাঁর স্ত্রীকে কাব্যের বুলিতে হাত করে তাঁকে দিয়ে কৃপণ শ্রীপতির কাছ থেকে তিনি টাকা আদায় করেন এবং অতি নিকৃষ্ট কাব্যগুলো সেই অর্থেতেই ছাপা হয়। শ্রীপতিকে সন্তুষ্ট করবার ব্যাপারে অবশ্য আত্মশর্মার ত্রুটি নেই। শ্রীপতিবাবুকে সে "ভারত সন্তান" বইটি উৎসর্গ করেছে।

শ্রীপতিবাবু তাঁর স্ত্রী মতিমালাকে শিক্ষিতা করে তোলবার জন্যে বাক্য-

সর্বস্ব নামক এক স্বদেশী বাগ্মীকে শিক্ষক রেখেছেন। আত্মশর্মা ও বাক্যসর্বস্ব— উভয়ের উদ্দেশ্য এক। শ্রীপতিবাবুর স্বদেশের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে কিছু অর্থ দোহন করতে তাঁরা চান। এঁদের দুজনেরই ভয় শ্রীপতিবাবুর ভাগ্নে সুনীতিকে। সে অত্যন্ত চালাক ও স্পষ্টবাদী। সুমতির সামনে একদিন ভারত সন্তান আবৃত্তি করছিলেন, সেই ছন্দে সুমতিও বলেছিলো, "কবিতার জোরে ইংরাজ তাড়িতে—হাত বাড়াইয়া লম্ফে শশাঙ্ক ধরিতে—বাতুল আলয়ে শেষে জীবন ক্ষয়িতে···" ইত্যাদি। লেকচারের মহিমায় বাক্য-সর্বস্বও পঞ্চমুখ। "লেকচারের মহিমা তুমি কি বুঝবে? পৃথিবীর এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্য্যন্ত লোকে বাঙ্গালের বক্তৃতা পড়ে মোহিত হয়েছে।" আত্মশর্মা ও বাক্যসর্বস্বের মধ্যে বিতর্ক চলে। একজনের মতে কবিতাই দেশ উদ্ধারের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। অন্যের মতে লেকচারের মতো অস্ত্র আর নেই। বখ্‌রাতে বড়ো দাঁও মারবার চেষ্টায় নিজেকে বড়ো করে দেখবার জন্যে দুজনেই তৎপর।

একই ব্যবসাতে অন্যলোক এলে তার সঙ্গেও আলাপ হয়ে যায়। তাদের দলে এভাবে এলেন সর্ববর্ধনবাবু। তিনি বলেন, তাঁর কাজ হচ্ছে, পরের গুণ যশ, মান, ক্ষমতা গৌরব ইত্যাদি বাড়িয়ে বলে জীবিকা অর্জন করা। তাছাড়া দেশ হিতার্থী সেজে তিনি অনেক রোজগার করেছেন ইতিমধ্যে। তবে এতে লাভ কম। তিনি বলেন,—"আমার এক একটী যুক্তি যেমন প্রকাশ হতে লাগ্‌লো, তার সঙ্গে সঙ্গে সেটি অমনি সাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠ্‌লো। এক এক বেশের উপর তিন চারশ লোক। সেইজন্য সেগুলি আর লাভের ছিল না।" আর্য সন্তানের দলে প্রচুর ভিড় দেখে এই পথ ধরেছেন। সর্ববর্ধনবাবুর প্রতারণার পথ চার রকম। (১) অভিধানিক—অর্থাৎ ডাক্তার সেজে ওষুধের প্রশংসা করে কিংবা এম্.-এ. সেজে গ্রন্থকারের প্রশংসা করে বিক্রী বাড়িয়ে দেন, সেইসঙ্গে নিজেরও কিছু হয়। (২) রূঢ়—বই বিক্রীর জন্যে বইটিকে অশ্লীল বলে পড়তে নিষেধ করা হলো, কিন্তু বলা হলো যে— বাজারে যেমন আগ্রহের সঙ্গে লোকে কিনছে এতে পাঠকদের কুরুচির পরাকাষ্ঠাই প্রকাশ পাচ্ছে। বলাবাহুল্য পনেরো দিনের মধ্যেই কপি নিঃশেষিত। (৩) যোগরূঢ়ি—কয়েকজন রাজামহারাজার নাম করে হয়তো বলা হলো যে অমুক বাবু একটি উৎকৃষ্ট বই লিখেছেন—তাতে এঁরা ছাপা খরচা দুই শত টাকা করে দিয়েছেন—আপনারাও সাহায্য করুন। নিজের

সম্মান রাখবার জন্যে অন্য ধনীরা এতে টাকা সাহায্য করেন। যাঁদের ইতিমধ্যে নাম করা হয়েছে, তাঁরাও এ নিয়ে কথা বলেন না, কারণ বিনা দানেই তাঁরা দাতা নাম পেয়ে গেছেন। "এরূপ ফুলান চিকিৎসা ব্যবসা, বক্তৃতা, সভা, লাইব্রেরী, ডাক্তারখানা সকল বিষয়েরই উপকারে আসে।"

এঁদের দলে আর একজনও আছেন। তাঁর নাম সভাকর। তাঁর মতে সভাতেই একমাত্র দেশ উদ্ধার হতে পারে। তার সভার নাম দেশতারিণী ভারত উদ্ধারিণী সভা। সভ্যদের সাধারণতঃ এই নিয়ম মানতে হবে।— যথা,—হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে হবে, হিন্দু আচার বিচারও। একান্নবর্তী পরিবারে থাকা চল্‌বে না। নিজের নির্বাচনে বিয়ে হবে এবং প্রেমের দামই সেখানে বড়ো হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন চালাতে হবে। "প্রণয় প্রেম পাত্রের সুখ কামনা করে। আপনার স্ত্রী যদি স্থানান্তরে সমধিক ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করে, তাতে আপনার দুঃখবোধ হতেই পারে না।"

যাহোক সকলেরই লক্ষ্য শ্রীপতিবাবুর মতো শাঁসাল ব্যক্তির অর্থ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি শ্রীপতিবাবুর সুনজর লাভ করেছেন আত্মশর্মা। তিনি অবিবাহিত। কিন্তু ঘোষেদের মেয়ে সাধনের কাছে প্রেমপত্র দিতে কিংবা শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী মতিমালার সঙ্গে প্রণয় করতে তাঁর ব্যগ্রতা অস্বাভাবিক। মতিমালার দাসী তরঙ্গকে তিনি তোষামোদ করেন, যাতে সাধনের কথা মতিমালা না জানে, কেননা, মতিমালার প্রেমই তার জীবিকার সহায়। বৃদ্ধ শ্রীপতিবাবুর যুবতী স্ত্রী মতিমালা দোটানার মধ্যে অনেকটা আত্মশর্মার কথায় সায় দিয়ে চলে। সতীত্বের গুরুত্ববোধও অনেকটা কমে গেছে আত্মশর্মার শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে। এ কাজেও সুমতিকে আত্মশর্মার ভয়, কারণ সে বোধহয় সন্দেহ করছে। শ্রীপতিকে বলে অবশ্য আত্মশর্মা ভাগ্নে সুমতিকে উইলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করিয়েছে।

বুড়োকে ঘুম পাড়িয়ে কথামতো মতিমালা আত্মশর্মার কাছে আসে। সে খবর দেয়, গোলাপীর বাড়ীতে বাক্যসর্বস্ব, সভাকর ইত্যাদি মদ খেয়ে মাতলামো করছিলো। বুড়ো শ্রীপতি তাদের ও অবস্থায় দেখে ভীষণ চটে গেছে। আত্মশর্মা ভাবে এবার সে নিষ্কণ্টকভাবে শ্রীপতিবাবুর মাথায় হাত বোলাতে পারবে। মতি আত্মশর্মাকে বলে, বুড়ো বোধ হয় মনে মনে তাকে ভালোই বাসে। আত্মশর্মা তাই শুনে মন্তব্য করে,—বুড়ো বাঁদরের গলায় কি মতিমালা শোভা পায়। মতি বলে, এখনও সে ধর্মবিক্রয় করে নি। আত্মশর্মা

তখন বলে, মতির ধর্ম অক্ষত আছে বলেই সে অতি সাবধানে চলে না। ধর্ম ছাড়লে আপনা হতেই তার মনে সাবধানতা আসবে, লোকেও সন্দেহ করবে না।

এমন সময় শ্রীপতিবাবু এসে ঢোকেন। পদশব্দ পাবার আগেই মতিমালা নির্দেশ মতো পাশের ঘরে লুকিয়ে পড়ে। ঘরে একা আত্মশর্মা থাকেন। ঘরে ঢুকে শ্রীপতিবাবু কথাপ্রসঙ্গে মতিমালার দুশ্চরিত্রতার কথা বলেন। আত্মশর্মা বলেন, মতিমালার শিক্ষক বাক্যসর্বস্ব এবং সুমতি—দুজনে মিলেই তাকে নষ্ট করেছে। যা হোক শ্রীপতিবাবু এটা মেনে নিলেন। ইতিমধ্যে পাশের ঘরে একটি মেয়েমানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে শ্রীপতিবাবু সচেতন হলেন। জিজ্ঞাসা করাতে আত্মশর্মা বলেন,—"আমি অবিবাহিত পুরুষ। স্ত্রীসংসর্গ নাই। স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্তা ও তাদের হৃদয় পরীক্ষার অন্য উপায় নাই। সেইজন্য একজন বারবণিতাকে সময়ে সময়ে এনে তার সহিত কথাবার্তা কহিয়া থাকি। স্ত্রীলোকের ভাব ও প্রকৃতি পরীক্ষা না করলে কবিতা পূর্ণ হয় না।"

দুজনের কথাবার্তা চলছে, ইতিমধ্যে চাকর এসে খবর দেয়—সুমতি আসছে। সুমতির মুখ দেখবেন না বলে শ্রীপতিবাবু তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেলেন। যাবার আগে আত্মশর্মা অনেক বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। শ্রীপতিবাবু অবাক হয়ে দেখেন, ঘরে তাঁরই স্ত্রী মতিমালা। সুমতি এসে পড়েছিলো। সে শ্রীপতিবাবুকে বলে,—দেখুন কে পরম শত্রু। আত্মশর্মা হারবার পাত্র নন। তিনি বলে ওঠেন, মতিমালার সতীত্ব নষ্ট করবার জন্যে সুমতি তাকে এখানে এনেছে, এবং আত্মশর্মা স্বয়ং তাকে রক্ষা করবার একটা চেষ্টাতে ছিলো। কিন্তু মতিমালা আত্মশর্মার কথা অস্বীকার করে সবকিছুই প্রকাশ করে দেয়। আত্মশর্মা তার ধর্ম নষ্ট করবার জন্যে তাকে কতোবার সাধাসাধি করেছে, চেষ্টা করেছে—সবই সে বলে। সুমতির সম্পূর্ণ নির্দোষতার কথাও মতিমালা বলে। ঝি তরঙ্গও এর মধ্যে এসে পড়ে মতিমালার কথা সমর্থন করে। ঘোষেদের মেয়ে সাধনের চিঠিও দেখাতে সে ভোলে না এবং তার ভণ্ডামি ও ব্যভিচারের মুখোস খুলে দেয়। ক্রুদ্ধ শ্রীপতিবাবু সেই অবস্থাতেই আত্মশর্মাকে বাড়ী ছেড়ে এবং গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

বেজায় আওয়াজ (কলিকাতা—১৮৯৩ খৃঃ)—দেবেন্দ্রনাথ বসু॥ তথাকথিত স্বাদেশিকদের বক্তৃতাসর্বস্বতাকে বিদ্রূপ করে প্রহসনটি রচিত।

দেশোদ্ধারে বক্তৃতার কার্যকারিতার ওপর অত্যন্ত প্রত্যয়কেও এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রহসনে প্রদত্ত একটি গানে আছে,—

"বাংলা এবার স্বাধীন হলো, বক্তৃতার জোরে।
বাংলা ছেড়ে জাহাজ চড়ে সাহেব কাল পালাবে ভোরে ॥
ফোয়ারা যখন ছোটে বক্তৃতার, কে তোড়ে টেকে তার
গোলার আওয়াজ জড়সড় শুনে হুহুঙ্কার।
মেজাজ গভীর বক্তৃতাবীর বাঙ্গালী কারে ডরে ॥"

কাহিনী।—নিশিকান্ত বিষ্ণুপুরের একজন ব্রাহ্মণ। কলকাতায় তার শ্যালক লবধনের বাড়ীতে একবার সে দেখা করতে এসে কলকাতার হালচাল দেখে অবাক হয়। চারদিকে বক্তৃতার বেজায় আওয়াজ—ইংরেজদের বক্তৃতার জোরেই তাড়াতে হবে। হঠাৎ গোবর্ধন ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে,—"বক্তৃতাযুদ্ধে গোলাযুদ্ধ বিশারদ ইংরাজ পরাস্ত হইয়াছে এবং মেম সাহেবের অনুরোধে সন্ধি প্রার্থনা করিতেছে।" ওদের ওপর নিষ্ঠুর হওয়া অনুচিত বিবেচনায় সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত স্থির হয়। সর্ত্ত এই,—যখন অস্ত্রযুদ্ধ হবে—বাক্‌যুদ্ধ বিশারদরা সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পাবেন। বক্তৃতা করবেন। "গোলাগুলির আযত্ত স্থান অতিক্রম করিয়া গোরা রক্ষিত শিবিরে বসিয়া বক্তৃতা করিবেন মাত্র। যুদ্ধে রক্তক্ষয় গোরার, অর্থব্যয় ইংরাজের, কিন্তু গৌরব বাঙ্গালীর হবে। ইংরাজ দাবী যেন না করে।" এই সঙ্গে বাঙ্গালীদেরও কিছু নিয়মকানুন মান্‌তে হবে। ইংরেজী বুলি বক্তৃতায় ছাড়া চল্‌বে না। ইংরেজদের পল্‌কা ড্যান্স আমাদের শিখ্‌তে হবে। টিকি রাখা চল্‌বে না। কোর্টশিপ ছাড়া বিয়ে চল্‌বে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় পার্লামেণ্টের বৈঠক হবে। তাতে দেশের পক্ষে হিতকর নিয়মাবলী প্রস্তুত হবে।

নিশিকান্ত ভাবে, এরা বোধহয় গাঁজাখোর কিংবা সঙ্‌। তবে অসময়ে সঙ্‌ কেন? কাঁসারিপাড়ার সঙ্‌ তো বাণফোঁড়ার দিন বার হয়। নিশিকান্ত তাদের জিজ্ঞেস করে,—কিসের সঙ্‌? তারা বলে, সঙ্‌ নয়, রাজ্যলাভ করেছি। নিশিকান্ত ভাবে, হাল আমলের স্বদেশী সঙ্‌। যাহোক বিষ্টুপুরী সঙ্‌কে হার মানিয়েছে! নিশিকান্ত তাদের নিয়ে রঙ্গ করতে গেলে তারা ড্যাম ষ্টুপিড্‌ বলে গালাগালি দেয়। নিশিকান্তও মজা পেয়ে প্রত্যুত্তরে গালাগালি দেয়। মনে মনে ভাবে,—"গোরাটে বাঙ্গালী ভালো সঙ্‌।" এর

মধ্যে একদল মেয়ে এসে গান গায়—"বিয়ের আগে অনুরাগে আসবে লো ভাতার। ভাতারগিরির খাট্‌বে এপ্রেন্‌টিস্।" এও একটা সঙ, মনে করে নিশিকান্ত ভাবে,—"তাইতো বলি, তবে তো খুব এসে পড়েছি, কলকেতায় রগড় দেখা যাবে, এখনো বেলা হয় নি, একটু মজা দেখে যাই।" নিশিকান্ত রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

একটা নাপিত আসে। চীৎকার করে সে বলে, টিকি থাকলে জরিমানা। নিশিকান্তের টিকি দেখে সে বলে ওঠে,—"টিকি রাখছেন কেন জরিমানা দেবেন কি?" নিশিকান্ত অবাক হয়। নাপিত বলে,—"মশায়ের বাড়ী বুঝি কলকেতায় নয়!" টিকিটা ভালো করে দেখে সে বলে,—"ইস্ আপনি এত বড় টিকি রেখেছেন? দু টাকা জরিমানা হতো—দু-টা-কা।" তারপর কুচ্ করে টিকিটা কেটে দিয়ে সে বলে ওঠে,—"দিন, আট গণ্ডায় কাজ সাফাই হলো।" নিশিকান্ত ভাবে—এটা আর এক সঙ! কিন্তু সঙ কি টিকি কাটে? হয়তো সে তাকেও সঙ ভেবে প..চুলোর টিকি মনে করেই কেটেছে। একে একে আরও অনেক সঙ এসে পৌঁছোয়। উকীল এসে নিশিকান্তকে দেখেই বলে,—"মশায় ফারখৎ নেবেন না, আসুন আমি খুব কমে জমে করে দেবো।" 'রাজনীতিবাগীশ' এক ভট্টাচার্য এসে বলে, সে বিধান দিতে পারে। "এই বিধবা বে-র, মুরগী খাবার, বিলেত যাবার, দো পড়া মেয়ে বে দেবার।" বিধান দেবার জন্যে সে সাধাসাধি করে। হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাদের হোটেলে "গঙ্গাজলে পাক" "ব্রাহ্মণীর রান্না" উত্তম ফাউলকারী খেতে বলে। গুণনিধি তর্কপঞ্চানন নাকি এ ভাবে খাবার বিধান দিয়েছেন। নিশিকান্ত ভাবে, সঙ্‌এর কি আর শেষ নেই? হঠাৎ উকীল ধাক্কা দিয়ে নিশিকান্তকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়। বলে রামনিধি বাচস্পতি—বিশপ্ অফ্ রসাপাগলা আর শ্রীনাথ স্মৃতিরত্ন আর্চবিশপ আসছেন। যথাসময়ে খোল করতাল বাজিয়ে শালগ্রাম নিয়ে সাহেবপাড়ামুখো চলেন। নিশিকান্ত অবাক হয়। সে বলে, ঐ দিকে তো মন্দির নেই!—মন্দির নয়, এঁরা গীর্জায় যাচ্ছেন। চূড়ো মন্দিরেরও আছে গীর্জাতেও আছে। খৃষ্টানদের তাড়িয়ে বাঙালীদের পুজো হবে এখন। মন্দির ভেঙে আজকাল রাজনৈতিক টোল করা হচ্ছে। সঙ অনেকরকম দেখে নিশিকান্ত বিষ্ণুপুরের সঙ্গে কলকাতার তুলনা করতে করতে লবধনের বাড়ীর দিকে পা চালায়।

লবধনের বিশ্বাস—সে বঙ্গসেনার কর্ণেল, এবং তার স্ত্রীর বিশ্বাস—সে

বঙ্গসেনার লেফ্‌টেনাণ্ট। অবশ্য সবই কালনেমির লঙ্কাভাগ। নিশিকান্ত যখন শ্যালকের বাড়ী পৌঁছোয়, তখন ওরা পারস্পরিক দাঙ্গায় ব্যস্ত ছিলো। দাঙ্গা শেষ হতো না, যদি খিদে এবং ক্লান্তি না আসতো। নিশিকান্ত লবধনকে চিন্‌তে পেরে তারপর খবর জিজ্ঞাসা করে. নিজের খবর দেয়। কলকাতায় তার ছাতা চুরি গেছে, ব্যাগ কেড়ে নিয়েছে, টিকি কেটে নিয়েছে। সব দুঃখের কথা সে একে একে বলতে স্বরু করে। লবধন ও তার স্ত্রী নিশিকান্তর কথা না শুনে হিন্দীতে সিপাই মেজাজে কথাবার্তা বলে। নিশিকান্ত ভাবে শালারাও বুঝি সঙ্‌-এ মেতেছে। নিশিকান্তও সেইভাবে মজা করে উত্তর দেয়, কোনও সন্দেহ জাগে না। কিন্তু এভাবে কতোক্ষণ চলে! স্নান করতে হবে, খাওয়া দাওয়া সারতে হবে। লবধন নিশিকান্তকে হাবিলদার হতে বলে এবং সেইভাবে কথাবার্তা বলে। স্ত্রীও তার ওপর হাবিলদারের মতোই ব্যবহার করে। নিশিকান্ত এতে চটে গিয়ে বলে,—"লবা, তোর মাগকে শাসিত করতে পারিস্ নি, যা নয়, তাই বল্‌ছে।" এই শুনে লবধন নিশিকান্তকে গালাগালি দেয়। বলে, অপমানবোধ করলে ডুয়েল লড়ুক। স্ত্রী অস্ত্র নিতে বলে। নিশিকান্ত ভাবে পাঁচ বছরে কলকাতায় সঙ্‌-এ এতো পরিবর্তন! নিশিকান্ত এসব কথা ভাবছে, এমন সময় লবধনের খুড়তুতো ভাই গণেশ তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। এদের দু জনের ধারণা, এরা বাংলার বাদশা-বেগম। রাজা বলে,—শাসনক্ষমতা আমার, রানী বলে, আমার। তাই এদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই আছে। গণেশ স্ত্রীকে বলে,—"তুমি অবলা, রাজ্যভার তুমি কিছুতেই বইতে পারবে না।" স্ত্রী বলে,—"তুমি একে পুরুষ, তায় বাঙ্গালী,—খালি চাকরী করতে মজবুত, ভূত দেখ্‌লে মাগের আঁচল ধর, তাই বলি আমি হই বাদশাজাদী……তোমায় রাজার হালে রাখ্‌ব, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আমার ভাণ্ডারগিরি করবে. চুরোটটা পর্যন্ত আপনি ধরিয়ে খেতে হবে না।" নিশিকান্ত ভাবে, এরা সঙ্‌ হোক বা যাই হোক,—এদের ওপর উলুইচণ্ডী ভর করেছে। যতোই রাজা সাজুক, নিশিকান্ত গণেশকে চেনে। "গণেশ" বলে সে যখন ডাকে, তখন গণেশের স্ত্রী গণেশকে বলে ওঠে, রাজা সাজলেই রাজা হওয়া যায় না, নইলে গণেশ বলে ও চিন্‌লো কেন? অতএব রাজক্ষমতা রানীরই পাওয়া উচিত। গণেশ মন্ত্রী বলে হাঁক ছাড়লে দুজন মন্ত্রীও এসে উপস্থিত হয়। দুজনেই বলে, আমি মন্ত্রী—এ নয়। শেষে তারা মারামারি করে। নিশিকান্তকে মধ্যস্থ মেনে তার ওপর তারা দুজনে

ঘুষি চালিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কার ঘুষির কতো জোর? রেলগাড়ীর ধকলের ওপর ঘুষির চোট এসে পড়ায় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত নিশিকান্ত কাহিল হয়ে পড়ে। ভাবে, "আজ সঙের দিন জানলে কি কল্‌কেতায় আসতাম।"

ভাটের সহায়তায় রাজা এবার কয়েকজন লোককে উপাধি বিতরণ করে। একে একে নানান লোক আসে, রাজার আদেশে নিল-ডাউন হয়ে বসে, তারপর মৌখিক উপাধি নিয়ে চলে যায়। হরিহর পাকড়াশি হয় চব্বিশ-পরগণার ডিউক। বড়লাটের কাজ সে-ই করবে। তার স্ত্রী তার সঙ্গেই থাকবে। তারপর গণেশ নিশিকান্তর কথা চিন্তা করে। নিশিকান্ত যেহেতু কর্ণেলের বোনাই, অতএব খেতাব পাবার যোগ্য। গণেশ নিশিকান্তর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে তার নাম ধাম বলে। নিবাস বনবিষ্ণুপুর, হাল সাকিন বনহুগলী, মাতুল আশ্রয়ে বাস। বনহুগলী শহর কি গ্রাম এবং সেটা "বাঙ্গালা জুরিশ-ডিকসনের" মধ্যে কিনা গণেশ তা জিজ্ঞেস করে। কারণ বাংলাদেশই শুধু স্বাধীনতা পেয়েছে এবং এটাই তাদের রাজত্ব। এক মন্ত্রী জ্ঞান দেয়, হুগলীর সন্নিকটের একটা বন বলেই এমন নামকরণ। অন্যজন বলে, কর্ণেলের বোন ওখানে থাকতেন বলেই বনহুগলী। গণেশ নিশিকান্তকে নিল-ডাউন হতে বলে, নিশিকান্ত আপত্তি জানালে সকলে মিলে বলপ্রয়োগ করে তাকে বসায়। বেগতিক দেখে একটু সুযোগ পেয়ে নিশিকান্ত সেখান থেকে ছুটে পালায়। চাদরটা ওখানেই পড়ে রইলো।

এদিকে যথাসময়ে এরা সভ্যদের নিয়ে পার্লামেন্ট বসায়। সেক্রেটারী গোবর্ধন বলে, রাজ্যপ্রাপ্তির পর সিংহাসনের দাবী নিয়ে গোলযোগ বেধেছে। নারী নেবে কি পুরুষ নেবে। পুরুষ সিংহাসন পেলে বাংলাদেশের নারীরা সকলে একজোটে বিদ্রোহিনী হবে। নারীদের ক্ষমতা কারো অজানা নেই। শোনা যায় মুরগীহাটা থেকে তারা আগেই পিস্তলের ক্যাপ কিনেছে। গোলা ছোটে না, শুধু আওয়াজ হয়। কিন্তু আওয়াজও কম ক্ষতিকর নয়। অনেকে চেলাকাঠ, নোড়া, বঁটি ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ করবার জন্যে এগিয়ে আসছে। বেড়ি দিয়ে গলা চেপে ধরলে কি হবে? এই ভয়ে একজন বলে, মেয়েদেরই সিংহাসন ছেড়ে দেওয়া উচিত। ঢাকার বাঙ্গাল এক সভ্য অবশ্য বলে যে, সে তার আড়তের ঝাঁকামুটেদের দিয়ে মেয়েদের সবাইকে পদ্মা পারে চালান করে দেবে, কোনো ভয় নেই। তবুও সভ্যদের সকলের মনে ভয় ঢোকায় মেয়েদেরই সিংহাসন ছেড়ে দিতে তারা

মনস্থ করলো। তবে রাজকার্যে তাদের হাত দিতে দেওয়া হবে না। গোবর্ধন বলে,—"কারণ বক্তৃতা আদি সব আমরাই করব ; স্ত্রীলোক কেবল সিংহাসনে থাকবে।" অবশ্য ঢাকার বাঙ্গালটি আশঙ্কা প্রকাশ করে,—"একবার নি উঠাইলে গারে পা দিয়ে চলবে।" তাদের সিদ্ধান্ত যখন এই, এমন সময় একদল নাগরিকা এসে বলপ্রয়োগ করে সিংহাসনের অধিকার মত করিয়ে নেয়। রাজকার্যের সবকিছুই তারা চালাবে। সভ্যরা নিস্তেজ হয়ে তাতেই মত দেয়।

ওদিকে লবধনের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে ইডেন গার্ডেনে এসে নিশিকান্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক্, এখানে আর সঙ্ নেই। একটা লোককে গম্ভীর-ভাবে চলাফেরা করতে দেখে সে আশ্বস্ত হয়। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে নিশিকান্তর ভুল ভেঙে যায়। এও যে সঙ !! লোকটি বলে,—"জান এখন আমি মহাভাবে মগ্ন।" কথা বলতে সে আপত্তি করে, কারণ সামান্য একটু কথা বলতে গিয়ে তার ভাব ছুটে যাচ্ছে। সে ভারত জাগানোর ধ্যানে মত্ত। চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সে নিশিকান্তর কাছ থেকে একটু দূরে নিজন জায়গায় যায়—আবার মহাভাবে মগ্ন হয়। নিশিকান্ত তার কথা ভাবছে, এমন সময় একটা মাতাল এসে নিশির জুতো ধরে টানাটানি করে। তার একপাটি জুতো নাকি নিশিকান্তই চুরি করেছে। মাতালের পায়ে একপাটি বগ্‌লেস দেওয়া কালো জুতো, আর নিশিকান্তর পায়ে ফিতে দেওয়া সাদা জুতো। মাতালের যুক্তি, তার কালো জুতো নিশিকান্ত রগড়ে রগড়ে সাদা করেছে। তবে জুতোর ফিতে বগ্‌লেস্ সংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে মাতাল জুতো খুলে নিয়ে যায়। ইডেন গার্ডেন ছেড়ে নিশিকান্ত ফোর্টের দিকে পা বাড়ায়।

নিশিকান্ত বাড়ী ফেরবার কথা ভাবছে, এমন সময় পার্লামেন্টের সেক্রেটারী গোবর্ধন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলে, সর্বনাশ হয়েছে ! সাহেবরা নাকি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে, গ্যাসলাইট, কেরোসিন ল্যাম্প—সব নিয়ে যাবে। তবে কি এরা দেল্‌কো জ্বালিয়ে পার্লামেন্ট করবে ? বাংলা দেশ ছেড়ে যাবার আগে তারা নাকি বাঙ্গালীদের সারবন্দি করে দাঁড় করিয়ে তোপ দেগে রয়েল স্যালিউট দেবে। ওদের জুলুমে বাঙ্গালীরা যদি রাজ্য ছেড়ে চলে যায়, তাহলে ওরা "তুরুক সহর" (তুরুক-সওয়ার) দিয়ে ধরে আনবেন। সেলামী তোপ নিতেই হবে। ইংরাজ ডেপুটির কাছেই গোবর্ধন সব জানতে

পারে। গোবর্ধনের কথা শুনে সকলে পালায়, সেই সঙ্গে নিশিকান্তও। "ও বাবা, সে যে বেজায় আওয়াজ !"

ভণ্ডবীর (১৮৮৮ খৃঃ)—রাখালদাস ভট্টাচার্য॥ অবাস্তব সখের দেশপ্রেম ও ভণ্ডামি এবং হুজুগপ্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রহসনকার দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করেছেন। নামকরণে ভণ্ডামির দিকটিকেই মূল্য দেওয়া হয়েছে।

কাহিনী।—অপরূপ একটা রিজেনারেটিং ক্লাব খুলেছে। কিছু সভ্যসভ্যাও জুটিয়েছে। সমিতির উদ্দেশ্য ভারতোদ্ধার। সভ্যকে অনেক বিধিনিষেধ মান্‌তে হবে। প্রথমতঃ ইংরাজীতে কথা কওয়া কিংবা ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করা আইন বিরুদ্ধ। আইনভঙ্গকারী সমিতি থেকে বিতাড়িত হবেন। দ্বিতীয়তঃ ভারত উদ্ধারে সুবিধার জন্যে সকলকে কাছাছাড়া কাপড় পরতে হবে। কারণ কাছায় অনেক বিপত্তি। প্রথমে অবশ্য পেণ্টুলন কোট ধরবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তাতে অনেক খরচ। তৃতীয়তঃ, ভারতোদ্ধারকদের খাদ্যাখাদ্যবিচার বড়ো বেমানান। তাই সভ্যদের অখাদ্য খাবার অভ্যাস করতে হবে। চীনেরা অখাদ্য খায়। ডাঃ রামদযাল নাগ তাঁর "History of কুঁচনিপাডা"তে হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছেন যে চীনেরা খাঁটি আর্য। অতএব আমাদের মতো আর্যসন্তানের অখাদ্য গ্রহণে কোনো দোষ নেই।

অপরূপের দেশপ্রেম সাধারণের কাছে খ্যাপামি বলেই বোধ হয়। কালাচাঁদ মাষ্টার সদুপদেশ দিতে গেলে অপরূপ তাকে হত্যা করবার ভয় দেখায়। তখন কালাচাঁদ তার গোঁয়াতুর্মি নিয়ে ঠাট্টা করে। অপরূপ বলে ওঠে,—"This is what is called heroic feat, not গোঁয়ারতুমি।" কালাচাঁদ যাবার সময় টিপ্পনি কেটে যায—"লাল পাগড়ী দেখলে তিন কলসী জল খান. উনি আবার ভারত উদ্ধার করবেন।"

দেশমাতার ওপর ভক্তি থাকলেও নিজের মার ওপর অপরূপের ভক্তির যথেষ্ট অভাব। মা ডাকতে আসে,—বলে, "খাওসে, অত লেখাপড়া করলে যে মগজের ঘি শুকিয়ে যাবে ; এস উঠে এস।" যে মা সামান্য খাবারের জন্যে তাকে ডাকেন, সেই মা-র ওপর ভক্তি আসবে কেন ? অপরূপ ভাবে,—"হায়রে আমার অদৃষ্ট ! এঁকেই আবার বঙ্গীয় ম্যাট্‌সিনির মা বলে লোকে পূজা করে ! এ শিয়ালী বেটীর গর্ভে কখনই আমার ন্যায় সিংহ শাবকের জন্ম হয় নি।...... হয়তো কোন্ Warrior caste উজ্জ্বল করেছি, পরে ঘটনাচক্রে কোকিলের

বাচ্ছার ন্যায় কাগের বাসায় তা খাচ্ছি।" অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে টেবিলের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে মা যখন কাৎরান, তখন টেবিল নষ্ট হলো বলে দেশপ্রেমিক অপরূপ মাকে ভৎ'সনা করে।

কন্যা মোহলতাকে অপরূপ Papa ডাক ডাকতে শিখিয়েছে। খানা আশানুরূপ না জুটলেও মোহলতাকে সে খানা খাওয়ার ফর্মূ'লা মুখস্থ করবার জন্যে নিয়মিত লেসন দেয়। এদিকে "Kitchenএর management"এর ব্যাপারে অপরূপ সন্তুষ্ট নয়। মায়ের ওপর সে চোটপাট করে। তাঁদের রান্নায় নাকি বলকারক কিছুই নেই। যা হোক, অখাদ্য ভোজন অন্ততঃ বাড়ীতে হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে তার খুড়ো এর সবচেয়ে বিরোধী।

অপরূপের স্ত্রী বিজলী অপরূপকে সমর্থন করতে অবশেষে বাধ্য হয়েছে। স্ত্রীর কাছে অপরূপ বলে,—"সে হবে—ভাইস্‌রিগেল কাউনসিলের মেম্বর সমেত, কে. সি. আই. জে. নয়, এই বিশাল সাম্রাজ্যের Empeıor, আর বিজলী হবে তার Empress।" বিজলী মনে করিয়ে দেয় শ্যালক শশীর ওপর যেন অপরূপের নজর থাকে, তার একটা ব্যবস্থা করিয়ে দেওয়া চাই। অপরূপ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে,—"কি বল, তোমার ভাই, তায় আমার শ্বশুরের ছেলে, সে ত আমার সহোদরের বাবা। ...ইহলোকে শ্যালক সুখের পায়রা, পরলোকে শ্যালক অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, বেখরচায় পোষ্যপুত্তুর।"

অপরূপ এক সময়ে গল্প করেছিলো যে সে দেশোদ্ধারের হিড়িকে বিজলীকে লঙ্কার হাওয়া খাইয়ে নেবে। বিজলী মেয়ে-মহলে সবার কাছে সে সংবাদ দিতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছে। তারা বলেছে,—গরীবের বউয়ের এ সখ কেন? বৌ এ নিয়ে স্বামীর কাছে অনুযোগ জানালে, অপরূপ বলে, ক্লাবের অ্যানিভার্সারির পর তারা সিংহলে যাবেই।

শাশুড়ীর বিরুদ্ধে বিজলীর অভিযোগ অনন্ত। অপরূপের কাছে এ নিয়ে সে কান্নাকাটি করলে অপরূপ বলে,—"The old hag will very soon meet her ultimate fate. Fightingএর সূত্রপাত না হয় তাকে দিয়েই আরম্ভ হক, Let charity begin at home." বোয়ের কান্না থামাতে গিয়ে অবশেষে মায়ের দ্বাদশীর allowance বন্ধ করতে হলো।

পরিবারে অপরূপের অনাচার অসহনীয় হয়ে ওঠে। অপরূপের প্ররোচনায় বিজলী খুড়শ্বশুরকে অসম্মান করে। বিজলী ও অপরূপ ঘরে একা আছে জেনে 'গোলক' গলা খাঁকারি দেন। বিজলী সরে যেতে চাইলে অপরূপ বলে,—

"তবে আর তোমার moral courage রইল কোথা? এই যে শেখালেম যে কি গুরুজন, কি লর্ড, কি সাহেব, কি সিক্‌, কাউকে ভ্রূক্ষেপও করবে না, রেলওয়ে স্টেশনে তাদের গা ঘেঁসে গড়্‌গড়্‌ করে বেড়াবে, সমান শ্বশুরের সামনে চেয়ারে বসে ইয়ার করবে, পরে ক্রমে তাদের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পা বাড়াতে সুরু করবে।" স্ত্রীকে ভীরুতা দমন করবার জন্যে সে ভারতের জয়গান করতে বলে!

ইতিমধ্যে শ্বশুর প্রবেশ করলে বিজলী যখন পালাতে চাইলো, তখন অপরূপ তার হাত চেপে ধরে তিরস্কার করে। গোলক অপরূপকে এভাবে মাতলামি করবার জন্যে ভর্ৎসনা করেন। খুড়োকেও অপরূপ যা-তা বলে। অপমানিত গোলক অপরূপের শ্বশুর-নির্ভরতা নিয়ে কটাক্ষ করেন। এতে বিজলী 'ইন্‌সাল্‌টেড্‌' বোধ করে খুড়শ্বশুরকে শিক্ষা দেবার জন্যে এগিয়ে যায়। বিজলী বলে,—"লুকুচ্ছো কোথা গোলক শ্বশুর! Coward fool! অবলা রমণীর challengeএ ভয় পেলে?" অপরূপ হাততালি দিয়ে Bravo Bravo করে নারীর বীরত্বকে ধন্যবাদ জানায়। অপরূপের মা তিরস্কার করতে এসে অপদস্থ হন। অবশেষে অপরূপ নিজেই বীর রমণীকে নিরস্ত করে। লজ্জায় দুঃখে গোলক আত্মহত্যা করতে গিয়ে 'অপু'র অকল্যাণের ভয়ে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত হন।

গোলক সংস্কৃতজ্ঞ এক যুবকের সঙ্গে মোহলতার বিবাহ স্থির করেছিলেন। মোহলতা বলে,—"I won't Marry him, Certainly not, I won't. একে ইংরাজী জানে না, ফোঁটা কেটে পূজো করে! আবার শুনিছি যে ঘোড়ায় চড়তে পারে না।" মোহলতার সঙ্গে গোলকের দাদুনাতনী সম্পর্ক। তাই গোলক ঠাট্টা করে বলেন,—"শালি তুই আমাকেই বে কর। তোকে ওয়েলারে চাপাবো।" অপরূপ তাঁর কথা শুনে সত্যি ভেবে গোলককে তিরস্কার করে বলে,—"তোমার মত বর্ব্বরের হাতে দেওয়ার চেয়ে auctionএ sell করাও শ্রেয়ঃ।" গোলকের মনে সবসময়ে ভয় জাগে—কোনদিন বুঝি তারা খ্রীষ্টানের ঘরে জাত দেয়!

এ তো গেলো ঘরের অবস্থা। Regenerating Club-এর কার্যবিধিও অস্বাভাবিক হয়ে প্রকাশ পায়। অপরূপের চেলা ক্ষেত্রপ্রসাদ রামমণি ময়রাণীকে অপরূপের কাছে আনে। রামমণি নারীচক্রের সম্পাদিকা। নারীচক্রে পুরুষের গমন নিষেধ, কিন্তু তবু অপরূপ সে-চক্রে রামমণির অ্যাসিষ্টাণ্ট হতে

চায়। সে বলে, Female like male-এ কাজ চল্‌তে পারে। অবশেষে ক্ষেত্র প্রস্তাব করে যে, Regenerating Club-এর সঙ্গে নারীচক্র জুড়ে দিলে হরগৌরীর এমেলগ্যামেশন হবে। বিশেষতঃ ফিমেল সঙ্গীত ছাড়া সভা জমে না। এ সবে অবশ্য কোনও স্থির সিদ্ধান্ত আসে না।

অপরূপ চেলাদের দিয়ে ছেলে পটিয়ে বেড়ায়। ক্ষেত্র অজপ্রসাদকে পটাতে পেরেছে। অজপ্রসাদ বকাটে ধরনের ছেলে। কিন্তু বিপদ তার বাবাকে নিয়ে। তিনি বড়ো সেয়ানা। অপরূপ তাঁকে পরজন করতে উপদেশ দেয়। কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে,—"ঈশ্বরের সব কার্য্যই defectএ পরিপূর্ণ. আমরা positivist সেই সকল defect এর remedy করাই আমাদের প্রধান Service of humanity." কিন্তু অজপ্রসাদের তা করা সম্ভবপর হয় না। এতে অপরূপ চটে যায়। কেন অজ পিতার দুর্ব্যবহারে "then and there heroic measure নিয়ে তার unfit পিতাকে কিছু Severe lesson" দিয়ে এলো না। তাই অজপ্রসাদকে অপরূপ ভল্যান্টিয়ার হবার অযোগ্য মনে করে, অবশেষে ফাইনের সর্তে তাকে গ্রহণ করে।

অপরূপের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় একটা ঘটনায়। চন্দ্রগ্রহণ রাত্রে "সৌন্দর্য্য সন্ধানে" রামামাতাল গঙ্গার ধারে ঘুরছিলো। তার সঙ্গে জুটে অপরূপ গোপনে মদ্যপান করে। তারপর যথারীতি চেঁচামেচি আরম্ভ করে। সম্মুখে ছিলো সাহেবের কুঠি। চাপরাশি এসে তাদের ধমক দিলো। পরিচয় দিতে গিয়ে অপরূপ বলে,—"ইণ্ডিয়ান্ গ্যারিবল্ডী হ্যায়।" ইতিমধ্যে সাহেব ছুটে এলে অপরূপ রণে ভঙ্গ দেয়। সাহেব গ্যারিবল্ডীর বীরত্ব দেখে হেসে এ সংবাদটা পেন্সিলে লিখে চাপরাশির হাতে দেয়—English man অফিসে পাঠাবার জন্যে।

অপরূপ চেলাচামুণ্ডা সঙ্গে নিয়ে সর্বাঙ্গে নিশান বেঁধে সঙ্কীর্তন করতে করতে রাজপথে যায়। এসব পাগলামি সকলের হাসির উদ্রেক করে। কালাচাঁদ মাষ্টার গম্ভীরভাবে তাকে ঘরে ফিরতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন,—"আগে গৃহ উদ্ধার কর পরে ভারত উদ্ধার করো। আগে ঘরের লোকের জন্য কাঁদতে শেখ পরে দেশের জন্য কেঁদো।...আগে হৃদয় ভিত্তি পাকা কর পরে তার উপর প্যালেস ফেঁদো। তোমার স্বধর্ম্মে অনুরাগ নাই, জাতির আচার ব্যবহার ভক্তি নাই তুমি স্বদেশের মর্ম্ম নিঃস্বার্থভাবে কিরূপে বুঝবে?" মূর্খকে উপদেশ দেওয়া

স্বধা। অপরূপ কালাচাঁদকে গালি গালাজ করে "কুইকমার্চ" বলে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে যায়।

অপরূপ ভাবে, Regenerating Club শহরে সীমাবদ্ধ রাখ্‌লে চলে না। গ্রামে গ্রামে ভারতোদ্ধারের প্রচার চাই। তাই একসময় মফঃস্বলে এক মাঠে কৃষকদের মধ্যে দলবল নিয়ে অপরূপ গিয়ে পড়ে। কৃষকরা বলে,—"মোরা কত্তা চাষাভূষ লোক মোরা ও কাম পারবু না।" একটা ভাঙা পিস্তল দেখিয়ে অপরূপ বলে,—আগে বন্দুকের ড্রিল শেখ আর কিছু চাঁদা দাও, ভারত উদ্ধার তোমাদের স্কন্ধেই নিহিত। বড় মোড়ল ভাবে—"আবার লোডসেজির পথকর বসাতি চায়।" তাই বলে,—"না বাবু মোদের বাদ্‌সাইডে কাম নেই, মোরা দরী লোকের ছাওয়াল, তোমরা সব মোঙোল মোঙের ছাওয়াল, তোমরা বাদসাই কর।" এই বলে তারা চলে যায়।

দেশ স্বাধীন হলে কে কি হিসেবে বখরা পাবে, তাই নিয়ে এবার সভ্যদের মধ্যে আলোচনা স্থরু হয়। ক্ষেত্রপ্রসাদ স্থবুদ্ধি দিতে গিযে বিতাড়িত হয়। এদিকে বখরা নিয়ে তর্কাতর্কি চল্‌ছে, পুলিশ অফিসার ও কনষ্টেবল নিয়ে ক্ষেত্র এসে উপস্থিত হয। অপরূপ ও অক্ষপ্রসাদকে গ্রেফ্‌তার করা হলো। খুড়ো খুড়ো বলে অপরূপ কাঁদতে থাকে। যাবার আগে আক্ষেপ করতে করতে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলে,—"ওঃ বাপ্‌রে! এমনি করেই ভণ্ডামির ভাঁড ভাঙ্গেরে, যেমন হুজুকের বুজরুকি করে আসল ছেড়ে নকলে মোজেছিলুম, তেমনি উপযুক্ত সাজা আজ জনবুলের হাতে পেলেম। ভাই সকল চৈতন্যলাভ কর। বুক না ফুটিলে কেউ মুখ ফুটিও না।"

(ঘ) নব্য হিন্দুয়ানী ॥—

কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা (১৮৯৩ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু॥ সমসাময়িক যুগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি লিখিত। ইতিমধ্যে অনেকে সমুদ্রযাত্রা করলেও এই সময়ে আন্দোলন ব্যাপক হযে ওঠে।

এই প্রহসনটি রচনার মূলে একটি সভার ইঙ্গিত দেওয়া চলে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্টে বিকেল পাঁচটার সময় শোভাবাজার রাজবাড়ীতে বিনয়কৃষ্ণ দেবের উদ্যোগে এক সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় আছে[২৪]—"(১) যদি হিন্দুগণ হিন্দু আচার

২৪। সংবাদ প্রভাকর ১০ই ভাদ্র ১২৯৯ সাল।

ব্যবহার মত সমুদ্রপথে বিদেশে গমন এবং তথায় অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জাতি যাইবে কিনা? (২) হিন্দুদিগের পক্ষে বর্তমানে হিন্দু আচার প্রণালীতে সমুদ্রযাত্রা এবং বিদেশে অবস্থান এক্ষণে সম্ভবপর কিনা? (৩) সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণে সহানুভূতি এবং সহযোগিতা করিবেন কিনা?" অন্যত্রও এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা চলেছিলো।

"হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা" নামে পুস্তিকায়[২৫] সমুদ্রযাত্রার পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন,—"এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য বিলাত যাত্রা নয়। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে হিন্দুভাব ও হিন্দুরীতি রক্ষা করিয়া বিলাতে গমন করা যায় এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা বা অপর কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারা যায়, কেবল তাহারই একটা মীমাংসার নিমিত্ত আমরা এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল বিলাতযাত্রার কোনরূপ একটা সুবিধা বা সুযোগ করিবার জন্যই আমরা এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি—এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা যাঁহারা অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে তাহা অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত করিতে দিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করি।" লেখক বৃহন্নারদীয় পুরাণের কাশীনাথ ভট্টাচার্য কৃত টীকা উল্লেখ করেছেন,—"অথ সমুদ্রযাত্রা স্বীকার শব্দেন মরণমুদ্দিশ্য সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ মহাপ্রস্থানগমনঞ্চ মরণমুদ্দিশ্য হিমালয়গমনং ইত্যেবঞ্চাপি সুধীভি-র্ব্বিভাব্যং।" তারানাথ তর্কবাচস্পতির টীকাও উল্লেখ করেন।—"সমুদ্রযাত্রা স্বীকার ইত্যাদৌতু ধর্ম্মরূপ সমুদ্রযাত্রা স্বীকারস্যৈব কলৌ নিষেধাৎ বাণিজ্য রাজাজ্ঞাদিনিমিত্তকস্য তস্য নিষেধাভাবেন তদ্বিষয়কত্বাসম্ভবাৎ।" তা ছাড়া তিনি প্রাচীনকালে আমাদের সমুদ্রযাত্রার বিবিধ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

প্রহসনকার এই সব নব্যবিধান প্রদাতাদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন। নব্য হিন্দুয়ানা যে প্রকারান্তরে সাহেবীয়ানা এ কথা প্রহসনকার বলে গেছেন। প্রস্তাবনায় নারীর গীতে আছে,—

"ভক্ত নাই আমাদের কর্ত্তাদের মতন।
হিঁদুমতে সাহেব হতে সতত যতন॥
যদি খাবে বিস্কুট, আগে দেবে হরির লুট,
ভক্তি ভরে ঠাকুর ঘরে করে নিবেদন।"

২৫। ১২৯৯ সাল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর আলবার্ট হলে ভাষণে প্রদত্ত।

নব্য বিধান-কারদের সম্পর্কে মেজবৌয়ের মন্তব্য,—

"যত ন্যায় ভুটভুট বিদ্যানিধি
বলে দেছে বিধি।
সাহেব হলে হিঁদুর মতে,
স্বর্গে যায় সোনার রথে॥"

হলধরের মুখে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ উপস্থাপিত হয়েছে,—

"গোমাংস ভক্ষণং যজ্ঞো হয়মেধস্তথৈবচ,
সমুদ্রযাত্রা চাণ্ডাল সংস্পৃষ্টান্নস্য ভোজনম্।
কলৌ সর্ব্বং নিষিদ্ধং স্যাৎ মহেশানি ন সংশয়ঃ
কুম্ভীপাকে তু তৎকর্ত্তা নিবসেৎ কৃমি সঙ্কুলে।"

আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রহসনকার লিখেছেন,—

"ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা সমুদ্রে হবে যাত্রা
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা, গৃহে মরণং॥
আস্‌ছে সব বিধি লিতে, এমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেন নি যা বিধির পিতে, চৌদ্দ ভুবনং॥"

প্রহসনকারের মতে এই আন্দোলন হুজুগেরই নামান্তর।—

"মিছে শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম্ম,
শর্ম্মাদের মর্ম্মকথা নামটী জাহির ভাই।"

কাহিনী।—দুলালচাঁদ কলকাতার একজন ধনী যুবক। সে হুজুগ বাধিয়ে নিজের নাম প্রচার করতে চায়। দেশের লোক তাকে চিন্‌বে, জান্‌বে, এই তার সখ। তার দুইজন সঙ্গী—সাধুরাম আর মাখনলাল। তার মধ্যে মাখনলাল আবার কাগজের সম্পাদক।

দুলালচাঁদ বিলেত যাবে। অধীনস্থ প্রজা তর্কচূড়ামণি এতে সই দিচ্ছেন না। দুলাল চাঁদ তাই সাধুরামকে বলে,—"আজি নোটিশ লিখে দেবেন তো যেন তিনদিনের ভিতর সমস্ত খাজনা চুকিয়ে দিয়ে আমার জমী ছেড়ে উঠে যায়।" সাধুরাম আইনের প্রশ্ন তুললে দুলাল বলে, বিশেষ করে সেই কারণেই সে বিলেত যাবে।—"একবার বিলাতে যেতে পারলে, ষষ্ঠীবাবুকে দিয়ে গোটা দুই লেকচার ঝাড়াব, আর বিলিতি সাহেবদের হাত করে, এখানকার আইন করার কাজটা নিজের হাতে নেব।" যাহোক আইন বাঁচিয়ে সাধুকে সে

নোটিশ দিতে বলে। সম্পাদক মাখন বলে, তর্করত্নের জমি খালি হলে তার নিজের একটি লোককে যেন বসানো হয়। সেই লোকটির ইচ্ছে সে একটা "হিন্দুমতে ইংরাজি হোটেল" খুলবে। দুলাল বলে,—"বেশ সে যদি হিন্দুমতে ইংরাজী হোটেল করে, তাহলে সে তো একজন দেশহিতৈষী তাকে যায়গা দেওয়া তো আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।" মাখন দুলালবাবুর Duty, Uprightment, Straightforwardity, Moral Class book Courage, Spirit ইত্যাদির প্রশংসা করে। মাখনবাবু বলে,— "এডিটোরিয়াল ফেটালিটীর মধ্যে আমার মত Braverousness খুব কম এডিটারের আছে, একথা আমি জাঁক করে বলতে পারি, আপনি বড়লোক বলে আপনাকে ভয় করে আমি যখন রাইট বুঝব, তখন যে আমার সুখ্যাতি লিখতে ছাড়ব, তা Don't do in your mind কখনই মনে করবেন না।" এডিটরকে দুলাল একটা আদরের ধমক দিয়ে বলে, কোন্ বিধবাকে দুলাল পাঁচ টাকা দান করেছে, এটা কেন মাখন তার কাগজে ছাপিয়েছে! শুধু তাই নয়, নামের আগে মহারাজও জুড়ে দিয়েছে। মাখন বলে, ওটা Printer's Devil. দুলাল বলে, যাহোক একাজ ভালো হয় নি। কারণ "যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পই পই করে মানা করে দিয়েছি, যেন একথা না প্রকাশ করে।"

প্রতিবেশী তিনকড়ি আসে। হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা করবার জন্যে শাস্ত্রের সুবিধা ও ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে সে তীব্র বিদ্রূপ করে। বলে,—"গোপিনী হরণটীর বেলা মেনে নেবে, আর গোবর্দ্ধন ধারণের বেলা পেছোবে? গরজ বুঝে শাস্ত্রের একটা কথা সত্যি একটা কথা মিথ্যে!" দুলাল বলে, সে হিন্দু অনুচর, হিন্দু খাবার আর আলাদা জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে, এতে আপত্তির কোনো কারণই থাকতে পারে না। তিনু বলে,—"তোমার টাকা—তুমি যা ইচ্ছে কর। দুলাল বলে,—বিদেশে গেলে মনের উন্নতি হয়। তিনকড়ি বলে,—"ভারতবর্ষের ভিতর বোধ হয় বরানগর, হাওড়া, দমদমা, বালিগঞ্জ প্রভৃতি এক রাজার দেশ থেকে অন্য রাজার দেশ, সকল গুলিই মশায়ের দেখা হয়েছে, এখন বাকি খালি বিলাত।" দুলাল বলে, সে ভারত উদ্ধারের জন্যে বিলেত যাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতবাসীরা বড় বড় চাকরী পায় না। তার উপায় করবার জন্যেই সে বিলেত যাচ্ছে। তারপর সে বলে, বাণিজ্যের উন্নতির জন্যেও সেখানে যাওয়া দরকার। তিনকড়ি মন্তব্য করে,—"উন্নতি তো পরে করবে; সুরুটা এখন থেকে করে নমুনা দেখাও না কেন? এই যে পুরুষানু-

ক্রমে রেয়তের রক্ত, হ্যাণ্ডনোট, আর কোম্পানীর কাগজের সুদে দেহখানা পুষ্ট কোচ্ছো, অপাত্রে দানের ভয়ে মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্তও বন্ধ করা হয়েছে।" সাহেব টেক্‌নিসিয়ান্ এনে কলকব্জার উন্নতি করবার কথা তিনু বল্‌লে, মাখন বলে ওঠে,—"সাহেবদের কাছে শেখা—never never !" তিনকড়ি বলে,—"শাদা কথা বল না বাবা, সাহেব হতেই হবে ; তবে মেয়েটা আসটার বিয়েও আছে, পুঁক্তি ভোজনের লুচি খাবার লোভও ছাড়তে পাচ্ছ না, তাই এই শাস্ত্রে বাণিজ্যি হ্যান্‌ত্যান্ একটা ঢং তুলেছ। এখনও ঢের কাজ আছে যে দেশে থেকেই করতে পার , আর নিতান্তই যেতে হয়, তার জন্য এত মিটীং ফিটীং বহ্বাড়ম্বর কেন ?" তিনকড়ি আরও বলে, বিলেত-ফেরতরা এদেশে ফিরে এসে একঘরে হয়, না নিজেরাই নিজেদের একঘরে করে রাখে ? তারা তো নিজেরাই সাধারণের সঙ্গে মিশতে 'কমপ্লেক্স' বোধ করে। যাহোক এভাবে উপদেশ তিরস্কার দিয়ে তিনকড়ি চলে যায়, কিন্তু দুলালচাঁদের মন অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

দুলালচাঁদ সপরিবারে যাবে। তাই স্ত্রী পুত্র কন্যাদের মধ্যেও বিলেত যাবার জন্যে তোড়জোড় লেগে যায়। কাপ্তেনকে বলে নাকি ব্যবস্থা করা হয়েছে—"জাহাজের খানিকটে জায়গা গোবর ছড়া দে টবে করা তুলসীগাছ দিয়ে ঘিরে রাখ্‌বে, সে গণ্ডীর ভেতর আর কেউ আসতে পারবে না।"

দুলালবাবুর সদর বাড়ীর উঠোনে অনেক ভট্‌চায এসেছেন বৎসরান্তে বিদায় নেবার জন্যে। পূর্বপুরুষ থেকে তাঁরা এবাড়ী থেকে বার্ষিক পেয়ে আস্‌ছেন। কিছুক্ষণ পর দুলালচাঁদ আসে। সঙ্গে আসে পণ্ডিতজী—তার প্রতি কথায় ভুল, তবু ইংরাজী বলা চাই। সে বলে,—'See see my Babu, all Brahmin mouth open stand have"—সব বামুন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভট্‌চাযরা দুলালের রূপের প্রশংসা করে চাটুবাক্যে। তারপর পিতৃ-পুরুষের প্রশংসা করে এই বার্ষিকের পুণ্য ব্যবস্থার জন্যে। ব্রাহ্মণরা উচ্ছ্বসিত-ভাবে বলেন, তাঁরা তার যে কোনোরকম ব্যবস্থা দিতে রাজী আছেন। দুলালচাঁদ সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থার কথা বলে। পণ্ডিতজী বলেন, "Who who sign arrangement letter (=ব্যবস্থাপত্র) he he get farewell (=বিদায়)।" ব্রাহ্মণরা মহা সমস্যায় পড়েন। সার্বভৌম বলেন,—"কঠিন সমস্যা, কঠিন সমস্যা ! কৈ আমি গঙ্গাস্তবের ভিতর তার তো কোন উল্লেখ দেখি না !" আর একজন বলেন,—"মনসাপূজার মন্ত্রেও তো কৈ বিলাত এমন

কোন কথাই নাই।" একজন বলেন,—"কি মনসাপূজা গঙ্গাস্তব বল্‌ছো, সমস্ত ব্রতমালা আমার কণ্ঠাগ্রে, তার মধ্যে তো বিলাত শব্দই প্রয়োগ নাই।" সার্বভৌম বল্‌লেন, বাড়ী গিয়ে তিনি শুভঙ্করের পুঁথি ঘেঁটে দেখ্‌বেন, হয়তো থাক্‌তে পারে। পণ্ডিতজী ভট্চাযদের বলেন, সই না করলে বার্ষিক বন্ধ। মনসাপূজোর ভট্চায বলে ওঠেন,—"ও সার্বভৌম! আর কচকচিতে কাজ নাই, যে যাবার উচ্ছন্ন যাবে, আমাদের কি, একে তো আমাদের মতো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অন্ন মারা যেতে বসেছে, যা কিছু পাওনা গণ্ডা হয়, ছাড কেন, দাও একটা আঁচড়ে; আর শাস্ত্রেও তো আছে—"যস্মিন্ দেশে যদাচার", দেশ বুঝে আচার করবে।" সকলে একে একে সই করে বার্ষিক নেন। আপত্তি করেন হলধর তর্কনিধি। তিনি বলেন, তিনি বিক্রমপুরের লোক। কাউকে ভয় পান না। অর্থলোভে তিনি চাটুকারিতা পছন্দ করেন না। সংহিতার শ্লোক আওড়ে তিনি বলেন যে, কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। অর্থলোভী ব্রাহ্মণদের নিন্দে করে তিনি বলেন,—

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রানি ব্যবতিষ্ঠন্তি যে নরা,
রৌরবে নরকে তে বসেযুঃ যুগ সপ্তকম্।"

দুলালচাঁদকে ধিক্কার দিয়ে বলেন,—"প্যাচ্ছাব করি তোমার স্বাক্ষরে আর প্যাচ্ছাব করি তোমার বিদায়ে, এ হেজিপেজি অধ্যাপক পাও নাই, আমার বারী পূব্ববঙ্গ, অত অর্থলোভ রাহি না, লাঙ্গল তো আছে, শাস্ত্র লোপ হয়, ছাশে চাষ করে খাইমু, অর্থলোভ দেহাযে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লও, উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও, নরকের কীট অইযে রও।" বিদায় না নিয়েই তিনি চলে যান। পণ্ডিতজী ভারতচন্দ্রের প্রবাদ তর্জমা করে বলেন,—"Low if high float, intellegent fly goose."

উড়িয়া পণ্ডিত অর্জুনঠাকুর এসে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা দেয়। সে বলে,—

"পুরুষোত্তম সন্দর্শে ক্ষেত্রে চৈব ডমাপতে।
সমুদ্রযাত্রা চাণ্ডাল স্পৃষ্টান্নস্যাপি ভোজনম্॥
সুপ্রশাস্তম্ সদা প্রোক্তং নৈব নিন্দম্ তথা বুধৈঃ।
জাত পাপং যস্মাৎ লীয়তে বিষ্ণু দর্শনাৎ॥

—ইতি শাস্ত্রবচনং—টীকাকার অর্থ কড়িছন্তি, সমুদ্রযাত্রা কুড়ু, চণ্ডাল অন্ন ভোজনং কুড়ু, পরন্ত জগডন্নাথ বিদ্যমান। পুরুষোত্তম ঠাকুড় দডশণ যেঠি করিছন্তি,

সেঠি পাপ ন বর্ত্ততে , জগডন্নাথ যে ঠাঁযেড, সে ঠাঁযেড সকল জাতেড় অন্ন খাও, আর জাহাজ চডিকিডি সমুদ্র যাও।"

ব্যবস্থা খুব সহজ হযে যায। জগন্নাথের মূর্ত্তি নিযে বিলেতে যাবার ব্যবস্থা হয। কারণ "যেখানে জগন্নাথ সেইখানেই শ্রীক্ষেত্র।" দুলালের মাথায একটা ফন্দি খেলে যায। সে বলে,—"রসুন, এর একটা কমিটি করছি, তাতে ঝাঁ করে (Resolution) রেজো লিউসন পাশ করে দিব যে, হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য জগন্নাথকে নিযে আমরা বিলেত যাব, আজই একটা ব্রাঞ্চ সভার আযোজন করা যাক্ আসুন, তার নাম রাখা যাবে "হিন্দুধর্ম্ম মহা বিস্তারিণী গণ্ডগোল।" ব্যবস্থা নিতে গিযে দুলালচাঁদ ভাবে, এবার একঢিলে দুই পাখী মারা যাবে, তার নাম বিখ্যাত হযে যাবে।

দুলালচাঁদের হিন্দুমতে বিলেত যাবার খবরে চারদিকে হৈ চৈ পডে যায। এডিটার মাখন এসে দুলালকে বলে,—"হাটে বাজারে—বাইরে ঐ কথাই কেবল। ও municipal বলুন Leper Assylum, Consent Billই বলুন, পাঁচ-সাত বছরের ভিতর যত কাজে হাত দেওযা গেছে, কোন হুজুগ এমন জমেনি নাই।" সে আরও বলে,—"কত রাজারাজডা তো হিন্দুমতে বিলেত গিযেছে, কিন্তু তাতে কি এত হাঙ্গামা পডেছে? এই সভা, এই মিটিং, এই Lecture, তর্ক বিতর্ক, Pamphlet ছাপন না করলে কাজটার Importance বাডতো না।"

দুলালের যাবার সব ঠিকঠাক। এমন সময তিনকডি আসে। সে বলে,— 'মোদ্দাৎ বাবা তোরা দেশ ছেডে চল্লি কিন্তু এখানে একটা বোধ হয ভালরকম হুজুগের শ্রাদ্ধ পাকবে, তোরা থাকবিনি মাতবে কে তাই ভাবছি।" সবাই উৎকর্ণ হয। তিনু বলে—"আজকের কাগজে দেখছিলুম, একটা সাহেব এক ব্যাটা ভিখিরীকে পুলিশে দিযেছিল, মেজেষ্টর তাকে ছেডে দিযেছে, সেইজন্যে সাহেব নাকি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাবে, কাগজওযালাও তাই নিযে নাকি খুব লেগেছে, এদিক ওদিক দুচারটে ভিখিরী ধরাপাকডা কচ্ছে, যে রকম গোডা-পত্তন, কাজটা জমালে জমতে পাবে, কিন্তু তোরা যাচ্ছিস্, জমায কে তাই ভাবছি।" দুলাল বলে,—"এ ব্যাপারটা যখন আমাদের দাতব্য সভার Jurisdiction এর ভিতর এসে পড়েছে, এটা না সেরে এখন যাওয়া হতে পাচ্ছে না।" দুলালের সঙ্গে যারা যাবার জন্যে উদ্গ্রীব ছিলো, তারা বিনে পযসায বিলেত যাওযা বন্ধ হয় দেখে ক্ষুণ্ণ হয়। দুলাল বলে,—"এ্যাজিটেসন

করবার জিনিষ ছিল না, তাই ঐ Subject নেওয়া গেছেল; বিশেষ আমাদের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, হুজুগ জমে গেছে, নাম বেজে গেছে, এখন গেলেও চলে, না গেলেও চলে, তা বলে হালফিল একটা হুজুগের ধূয়া পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে পায়ে ঠেলা যায় না।"

হিন্দু মতে সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করে তখন সবাই একে একে ঘরে ফিরে চলে।

হ-য-ব-র-ল (১৮৯৩ খৃঃ)—কুঞ্জবিহারী বসু॥ সমসাময়িককালে বিদেশে হিন্দু ও ব্রাহ্মমিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিশেষতঃ বীরচাঁদ গান্ধী, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তির বিভিন্ন ধর্ম্মের পক্ষ থেকে বিদেশ গমন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের সূচনা করেছে। প্রতাপ মজুমদার যখন ব্রহ্মসমাজের মিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিলেতে যান, তখন রক্ষণশীল দলের পক্ষ থেকে যেমন বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি খৃষ্টীয় ধর্মের বিশ্বাসপ্রবণ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেও বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। "মধ্যস্থ" পত্রিকা[২৬] এ বিষয়ে লিখেছিলেন,—"ভারতবর্ষ তো ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, ভারতের বিশাল সমাজ তো সম্পূর্ণ সংশোধিত হইয়াছে এবং আমরা নিজেও তো জীবন্মুক্ত হইলাম! ইঁহারা ইহা না ভাবিলে, ইঁহাদের কর্ত্তারা কি ধর্ম্ম বিষয়ে ইংলণ্ড জয় করিতে যান্? পূর্ব্বে ইঁহাদের বড় কর্ত্তা গিয়াছিলেন, তিনি বড় কিছু করিতে পারেন নাই; সম্প্রতি মধ্যম কর্ত্তাটী বিলাত হইতে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ড যে অল্পকাল মধ্যেই কৈশব হইয়া উঠিবে, এমন আশা ও সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দিতেছেন।" খৃষ্টান হেরাল্ড পত্রিকাতেও এ বিষয়ে বিদ্রূপ করে লেখা হয়েছে,[২৭]—"The Missionary of the Brahma Samaj of India to the English in England, thus records his triumph for the edification of his brethren in this country, I am working in this great country with faith and patience and with a sure hope of success,'......So Babu Pratap Chandra Mazoomdar's mission of love is a faith accompli! England is a Bahma country, and all her sons and daughter, are Brahmas! We marvel that Mr.

২৬। মধ্যস্থ—ভাদ্র—১২৮১, পৃঃ ২৩২।

২৭। মধ্যস্থ—ভাদ্র—১২৮১ সাল।

Mazoomdar, while in India, should not have conjured his religion in India should not have conjured his religion of the Brahma samaj into all his fellow country men." প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতো নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাগ্যেও অনুরূপ বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণ জুটেছিলো। একদিকে এঁদের ধর্মপ্রচারের আন্দোলন, অন্যদিকে সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত সমসাময়িককালের আন্দোলন—উভয়েরই সম্পর্কে প্রহসনকারের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রহসনকার মূল বক্তব্য প্রকাশ করেছেন খোট্টার একটি গানে।—

"বিলাত যাতে বাউরা বাঙ্গালী, উতরে কালাপানি।
ঝাঁসা সে সমজাথা সবকো, রাখেঙ্গে হিঁদুয়ানী॥
গঙ্গাজলমে পাপ না পশ্‌কে, পায়েস খানে জাত না যাকে,
ডাউল তরকারি আউরা চাউল মে, দেখাওয়েঙ্গে কারদানী॥
শিবালয় মন্দির বানানে যাতে, সাত্‌মে পণ্ডিত পুরোহিত লেতে,
ধরম্‌কো হরদম্ তামাসা করতে এই সেই সাফ্ বেইমানি॥"

কাহিনী।—হরেন্দ্র শিক্ষিত নব্যবাবু। তিনি ন্যায়বাগীশ আর তর্কচঞ্চুকে নিয়ে বিলেতে এসেছেন। "উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্যাশিক্ষার্থী হিন্দু সন্তানদের এই ম্লেচ্ছদেশে জাতকুল বজায় রেখে বিদ্যাভ্যাসের জন্য একটী চতুষ্পাঠী এবং একটী শিবালয় ও হিন্দুমঠ সংস্থাপন করা।" জাহাজ থেকে নেমে লণ্ডনের রাজপথে এসে তারা দাঁড়ালে তাদের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে Thomas বলে,—"They would surely makes the fine ladies faint, if perchance any would meet them on the way." Dick বলে,—"Oh! What a revolting sight! They repel even adult men at first sight." পণ্ডিত দুজন বিলেতের চেহারা দেখে ভাবেন, এটা বুঝি পরীস্থান। তর্কচঞ্চু সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কিছু বুঝতে পারে না। দোভাষী ফিরিঙ্গীকে অবশ্য সঙ্গে আনা হয়েছিলো। তাকে বলে,—"আরে কওনা মুশায়? ইযারা গ্যাড্‌ম্যাড্ করে কি বল্‌বার লাগ্‌ছে, আমাগোর বুঝাযে দ্যান্।" Thomas মন্তব্য করে,—"I believe these fellows are the subject piece of study of Dr. Darwins Theory in size and form. They seem like men, but this must be their first leap from the ape race." হরেন্দ্রবাবু সাহেবদের কাছে

সবিনয়ে হোটেলের ঠিকানা চান। Thomas সাহেব মন্তব্য করে,—"It were better to show you straight to some Kennel hard by. A hotel! Likely place for such a set of niggers to put up in indeed." দোভাষী তর্কচঞ্চু সাহেবদের বক্তব্য বুঝিয়ে দিলে তর্কবাগীশ বলে,—"এক চরে উগুগোর সিদা না করতি পারি? বলি ও বাবু মুশয়! আপনি চুপ রইলেন ক্যান্? রৈস, টুটী দরা নাকে না দংশন দিমু।" তর্কচঞ্চুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সাহেবরা চলে যায়। সেই সঙ্গে ফিরিঙ্গী দোভাষীও। তর্কচঞ্চু কাৎরায়—"মারি না হাব প্যাঁঙ্গি দিইচে, দর দর আমি মলাম।" ন্যায়বাগীশ বিলেতের নিন্দে করলে হরেন্দ্র বলেন, দু'একজনের নমুনা দেখে বিলেতকে খারাপ বলা চলে না। তর্কচঞ্চু হরেন্দ্রর ওকালতিতে চটে ওঠে। বলে,—"শাস্ত্রকারেরা এই দেশেই ম্লেচ্ছদের সঙ্গে সংশ্রব রাখ্‌তে বারণ করচেন। ম্লেচ্ছ বাস পরিধান, ম্লেচ্ছ যান আরোহণ, ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন, এমন কি ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতে বারণ করচেন। এহন এ পাপ দেশ হইতে পলাতে পারলে বাঁচি।" স্নানাহ্নিকের জন্যে ন্যায়বাগীশ হিন্দু আশ্রম খোঁজে, শেষে ব্যর্থ হয়ে একটা বিলিতি হোটেলে এসে উপস্থিত হয়। তর্কচঞ্চু ভাবে,—"একেবারে গঙ্গাচান্‌টা করে আইলেই বাল অইত্তো, কিন্তু বড়ই শীত লাগ্‌চে, চানের বড়ই কষ্ট অইচে।" হোটেলে কলকাতার এক ধনীপুত্রের সঙ্গে হরেন্দ্রের দেখা হয়। নাম গজপৎ। গজপৎকে হরেন্দ্র তাদের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা জানান। গজপৎ বলেন, "সাহেবদের মনোরঞ্জন করবার জন্য, বল্‌নাচের সরঞ্জাম করতে, সাহেবী খানা দিতে, ঘোড় দৌড়ের টিকিট কিন্‌তে, মিছে কাজে চাঁদা দিতে, আর থিয়েটার দেখ্‌তে যে টাকাটা খরচ পড়ছে, তার অর্দ্ধেক টাকায় একটি হিন্দু আশ্রম ও স্কুল অনায়াসে স্থাপিত হতে পারে সত্য, কিন্তু এদেশে কি তা হয়ে ওঠে, আর হলেই বা কি টেঁকতে পারে?" তর্কচঞ্চু সাহেবের হাতে মার খেয়ে কিছুটা আক্কেল পেয়েছেন। তিনি বল্‌লেন,—"অ মুশয়! সৈত্য কইচেন, সৈত্য কইচেন। এহন আমারও তাই সংস্কার দাঁরাইচে। কি ভয়ঙ্কর দ্যাশ, কি বীষণ মনুষ্য!" গজপৎ তাঁর হোটেলে এদের নিয়ে যেতে চাইলেন। Hotel Keeper ঘড়ি দেখে বলে,—Now—now—just pay a pound for occupying the room for 13 minutes 31 seconds and walk out. These blackmen are veritable cheats to the back bone. Lord

Macaulay's description of the national character of the Bengalis is a trite truth, I see." হরেন্দ্র প্রতিবাদ করতে গেলে Hotel keeper বলে, "No more trifles. I won't stand any. Now pack up and clear the room for better customers." এদিকে পণ্ডিত দুজন সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসে গেছে। সাহেব এসে তাদের ধাক্কা মারে। সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্র জপ করতে করতেই ন্যায়বাগীশরা পথে বেরোয়।

গজপৎ বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরেছে। সাহেবের অপমান তাঁর কাছে অপমান বলে বাজে নি, কিন্তু এখানকার অপমান সহ্য হয় না। "এর সমুচিত প্রতিশোধ না দিলে কখনই নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি নে। বিলেতে গিয়েছিলেম বলে বেটারা আমায় ঠাকুর বাড়ীতে ঢুকতে দিলে না!" গুরুজী পরামর্শ দেয়,—"জাতে উঠবার আর ভাবনা কি? নবদ্বীপ, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবীড়, কান্যকুব্জ থেকে ভাল ভাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করে এনে উচ্চ বিদায় দেওয়া যাবে।" গজপৎ ঠিক করেন, বাঁদরের বিয়ে দেবেন। জানির মানির সঙ্গে ভুলোর বিয়ে দেবেন। তয়ফা, খেমটা নাচ, রাসধারী যাত্রা, ভাঁড়ের নাচ ঝুমুর নাচ, তরজা ইত্যাদি দেবার জন্যে মোসাহেবদের কাছ থেকে বায়না আসে। চঞ্চু পাকাচার্য স্বয়ং খাবারের ভার নেবে। রোসনাইয়ের কথা গজপৎ বলেন,—"বরের বাড়ীর থেকে কনের বাড়ীর পর্য্যন্ত দুধারি রূপোর খাসগেলাসের ঝাড় হাতে করে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, বর পোঁছলেই সেগুলো লুট হবে।" বিশ-বাইশ লাখ টাকার ধাক্কা? টাকার ভাবনা কি? "ধনদাসের ধনাগার বজায় থাক, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমার সই করবার ক্ষমতা।" গজপতের কাছে মতিবিবি বাঈজী ছিলেন। সুযোগ বুঝে জহুরী আবরজঙ্গ একটা দামী মতিমালা নিয়ে এসে বিবিকে দেখায়, বলে, এই একনর মতিমালা "লক্ষৌকো খাস বেগম্‌সাহেবকো পেয়ারা চিজ থা; ইস্ কিসম কি জহরৎ সারা দুনিয়ামে মিল্‌না মুস্কিল, লেকেন ইস্কা কিস্মত ভারি। আপি লায়েক, গহনা দেখ্‌-লিজিয়ে।" মালা দেখে মতিবিবি ছাড়তে চায় না, অথচ জহুরী বল্‌চে এর দাম এক লাখ সাইত্রিশ হাজার টাকা। বাধ্য হয়ে গজপৎ বলে,—"তবে নাও আর কি করবো; ওটা ভুলোর বিয়ের খরচের 'শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতুল কর্ত্রীর' ঠিক নীচে লিখে রেখো।" যথারীতি ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হয়। এমন কি বিলেতের হিন্দুধর্ম প্রচারক তর্কচঞ্চু ও ন্যায়বাগীশও নিমন্ত্রণপত্র পায়। তারপর বাঁদরের বিয়ের প্রসেসন চলে নির্দিষ্ট দিনে। ঢোল, রোসন চৌকি, ব্যাণ্ড,

নিশান-বরদার, খাস্‌গেলাস-বরদার, আশা শোটাওয়ালা নিয়ে। সেই সঙ্গে সুখাসনে বর বসে। তারপর চলেছে বরযাত্রী আর পূর্ণকুম্ভ নিয়ে মেয়ের দল। মেয়েরা গান করতে করতে বলে,—

"সেকেলে শোলোকে কয়, 'কড়ি ঢাল্‌লে সবই হয়' ;
সে কথা ভাই মিথ্যে নয়, সাক্ষী দেখ্‌, তার ভুলোর বিয়ে ॥"

Encore ! 99 !!! শ্রীমতী !!! (কলিকাতা—১৮৯৯ খৃঃ)—দুর্গাদাস দে ॥ প্রহসনকার প্রহসনটির পরিচয়ে "সামাজিক ব্যঙ্গকাব্য" বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সভ্যতার অনাচার ও ভণ্ডামির সাধারণ বর্ণনা ছাড়াও, পুরোনো হিন্দু রীতিনীতি ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টাকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং যথারীতি প্রগতিশীলের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে পুষ্ট করবার প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে। প্রগতিশীল সংস্কৃতি-নির্ভর বিভিন্ন গতিবিধিকে লেখক "সখের ঢেউ" বলে অভিহিত করেছেন। সৌখীন মহিলাদের একটি গানে আছে,—"এই সকেরই সহরে, লহরে লহরে, উঠ্‌ছে কত সখের ঢেউ।"

কাহিনী।—নচ্ছারবাবু বড়লোক বাপের বয়ে যাওয়া ছেলে। সারাক্ষণ মোসাহেব নিয়ে আর আজেবাজে স্ফূর্তিতে দিন কাটায়। ইয়ারদের নিয়ে সে একটা 'ননসেন্স ক্লাব' খুলেছে। এই ক্লাবে শুধু খেমটাওয়ালীর নাচই হয় না, বিলেতফেরৎ নিস্তার কীর্তনওয়ালীর গানও হয়। মিস্ নিস্তার বলেন,— "আঙ্গি আমি বিলেত ফেরত কেত্তনওলী ম্যাডাম পেটীর ছাত্র ; ম্যাক্সমূলারের টোলে পড়ে টাইটেল পেয়েছি, এখানে সভ্য সমাজের শ্রাদ্ধে কীর্ত্তন করে থাকি।" সাধারণতঃ শ্রাদ্ধের সময়েই কীর্ত্তনওয়ালী আনাবার রীতি। কিন্তু নন্‌সেন্স ক্লাবে সব সময়েই সব চলে। মিস্ নিস্তারকে দেখে নচ্ছারবাবুর মনে একটা আইডিয়া আসে। সে বলে,—"দেখ, এই হিন্দু ধর্ম্মটা সাড়ে আঠার ভাজা, কিন্তু ঘিয়ে ভাজা নয়, তেলে ভাজা ; আমার ইচ্ছে, আজ এই সাড়ে আঠার ভাজাকে ঘিয়ে ভেজে, একটু মাষ্টার্ড অর্থাৎ সরিষের গুঁড়ো মাকিয়ে সমাজে বেচি।" বিশেষ করে হিন্দুদের ড্যামেজ্‌ড্‌ চরিত্র অসভ্য কৃষ্ণকে উদ্ধার করতেই হবে। তাকে হিন্দুদের হাত থেকে মুক্ত করে সাহেব বানাতে হবে। প্রাচীন কৃষ্ণলীলা অসহ্য।

যথারীতি তারা নিজেরাই একটা অ্যামেচার নাট্য সম্প্রদায় গড়ে তোলে। প্রচুর কলেজ গার্ল গোপিনী সাজবার জন্তে নিজেদের ইচ্ছায় এদের দলে ভেড়ে।

পেত্নিবল্লভ ভড়ের কন্যা নচ্ছারের স্ত্রী এন্‌কোর নাইনটি নাইন শ্রীমতী সাজে। থিয়েটার আরম্ভ হয়।

কৃষ্ণ ওরফে ধিনিকৃষ্ণ গোপিনীদের ব্যারাকে গিয়ে লুকিয়ে টোষ্ট মাখন খায়, এইভাবেই শ্রীমতীকে রাগিয়ে ক্রমে ক্রমে তার প্রেমে পড়েছে। তারপর বিডন বাগানে গিয়ে শ্রীমতীর সঙ্গে প্রেমালাপ চালায়। এভাবে কৃষ্ণ এক সময় বিডন বাগানে শ্রীমতীর জন্যে অপেক্ষা করচে। শ্রীমতীর ট্রাম আস্‌তে যতো দেরী হচ্ছে, তার উদ্বেগও বাড়ছে। শেষে গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীমতী আসে। হাতে তাদের ব্যাট্‌ বল। রাখালদের সঙ্গে তারা ম্যাচ্‌ খেলবে। অবসর মতো ধিনিকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর আলাপ চলে। ধিনিকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলে,—"তোমাকে ভালবাসি বলে বাবা-মাকে আম হাউসে রেখে এসেছি।" শ্রীমতী বলে,—"যদি না ভালবাস বারাণ্ডা থেকে ইট্‌ মাববো।"

শ্রীমতীর হঠাৎ ইচ্ছে করে, রাখালদের একটু হয়রান্‌ করায়; সেই সঙ্গে ধিনিকৃষ্ণকেও। সে "অ্যামেচার হিষ্টিরিয়া" করে। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে বিডন বাগানে পড়ে যায়। অজ্ঞান হবার আগে অবশ্য গান করে বলে নেয়, এসেন্স, গোলাপ জল, ডাব, ডাক্তার এসব যেন 'রেডি' থাকে। ফেদারের পাখার হাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া,—

"গাড়ী করে আন ধরে, এস্‌. সি. সেন ফটোগ্রাফার।
আবার ডেকে আন পাঁচকড়িরে, যিনি বসুমতীর এডিটার।
ব্লক দিয়ে ছাপলে ছবি, লাগ্‌বে না আর উপহার॥"

যথারীতি ডাক্তার আসে। এসেই বলে, প্লেগ হয়েছে। "গাড়ী বোলাও, হাঁসপাতালমে লে যাও।" শ্রীমতী ভাবে, 'অ্যামেচার হিষ্টিরিয়া' করে সে ভালো করে নি। ধড়মড় করে সে উঠে পড়ে।

শ্রীমতী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন। কলকাতায় সম্প্রতি যে কমিশনার নির্বাচনের হিড়িক চল্‌ছে, তাতে সে এবং জটিলাকুটিলা দাঁড়িয়েছে। কুটিলা তো বেলা দুটোর সময় পাঁউরুটি আর হাঁসের ডিম খেয়ে টাউন হলে মিটিং করতে যায়—ভোট সংগ্রহের জন্যে। বড়াই এদের উৎসাহ দেয়। সেও আধুনিকা।

শ্রীমতী হঠাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে বিডন বাগানের ছোটো চৌবাচ্চায় ঝাঁপ দিতে যায়। পরণে বিধবার সাজ, অবশ্য নিরামিষটা তার সহ্য হয় না। বিধবা সাজবার কারণ অবশ্য সে নিজেই বলেছে, "নাথকে বল্লাম, নাথ!

বোধহয় আমি শিগ্‌গির বিধবা হব। তুমি একটা উইল করে যাও। নাথ যখন বল্লেন, নট্ নাউ, এ ফিউ ডেজ্ আফ্‌টার, তখন থেকে, সেইদিন থেকে, এই বিধবার বেশ ধরেছি।" আত্মহত্যার কারণ অবশ্য অন্য। ব্যাট্‌বল্ খেল্‌তে খেল্‌তে ধিনিকৃষ্ণ নাকি তাকে অপমান করেছে।

সংবাদ পেয়ে ধিনিকৃষ্ণ হাঁফাতে হাঁফাতে আসে। ঝাঁপ দিতে বারণ করলে শ্রীমতী ফোঁস করে ওঠে,—"ও স্টুপিড, সেদিনকার চাবকানি মনে আছে? এখন উইল্ করবি কিনা বল্?" শ্রীমতী চৌবাচ্চায় ঝাঁপ দেয়। কৃষ্ণও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেয়। বড়াই একই সঙ্গে প্রেমের ও অভিনয়ের তারিফ করে।

কিন্তু শ্রীমতীকে ধিনিকৃষ্ণ এতো প্রেম দিয়েও ধরে রাখতে পারে না। সে পালায়। মনের দুঃখে ধিনিকৃষ্ণ ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। তার পাৎলুন ছিঁড়ে গেছে; কার্টর্বাসন হারবারের বুটে প্রচুর ধুলো পড়েছে। রাখালদের কাছে সে আফ্‌শোষ করে,—"এই মুখে আমি গ্রেট্ ইষ্টারণ্ খেয়েছি, এই মুখে রামমোহন চাটুজ্জে খেয়েছি, এই মুখে আমি বটকৃষ্ণ পালের ডিস্‌পেন্‌সারি খেয়েছি, এই মুখে বৃন্দের মায়ের শ্রাদ্ধের চ্যাচড়া খেয়েছি, আর এইমুখে, তোমার মুখের দুটো গালাগাল খেতে পাত্তুম না?" ধিনিকৃষ্ণকে একজন বুদ্ধি দেয়, ফেরবার সময় চিৎপুর আড়তে একবার শ্রীমতীর খোঁজ করা যেতে পারে। ধিনিকৃষ্ণ ডুক্‌রিয়ে কেঁদে উঠে বলে,—"ওরে তার প্রেম, মেমের মত রে! সে মনে করলে আমাকে ডাইভোর্স কর্ত্তে পারে। সে মনে কোরলে ভালবাস্‌তেও পারে। বলে—ভাল আহার দিতে পার, তোমার হব, নইলে স্থ বিট্ করবো। সুখে রাখ মিষ্টি কথা কইব, নইলে গালাগালির চোটে ধাপার মাঠে পাঠাব। পয়সা দাও, তবে প্রেম দেখাব।"

এদিকে শ্রীমতী মান করে শুয়ে আছে। সখীরা এসে পরামর্শ দেয় ব্যারিষ্টার এন্‌গেজ করে ডাইভোর্স করাই উচিত। বিরহী শ্রীমতী চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেয়।

ওদিকে খবর পেয়ে বিদেশীর বেশে ধিনিকৃষ্ণ পুঁটিরামের মেসে এসে উপস্থিত হয়। পুঁটিবামনী জাতে স্যাকরা হলেও কলকাতায় বামনী সেজে মেস্ খুলেছে। তার কাছ থেকেই ধিনিকৃষ্ণ আগেই শুনেছিলো যে, বিদেশীর বেশ ছাড়া শ্রীমতী তাকে 'এলাউ' করবে না। শ্রীমতী ধিনিকৃষ্ণকে দেখে আঙুল মট্‌কায়। ঘুসি পাকাচ্ছে ভেবে ধিনিকৃষ্ণ চম্‌কে সরে যায়। শেষে অবশ্য মিট্‌মাট হয়।

কৃষ্ণলীলা চল্‌ছে, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে এসব দেখে বলেন, ব্যাপার কি! এরা জবাব দেয়,—"এটা কৃষ্ণলীলার একটু নূতন ধরনের ইম্‌প্রুভ্‌ড্‌ এডিশান্‌।" যুগল মূর্তিটি সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করলে বড়াই বলে,—"উনি উনবিংশ শতাব্দীর আদত অবতার। নাম মিষ্টার নচ্ছার, বর্ত্তমান ধিনিকৃষ্ণ সারাৎসার আর বামে, মাইন রিফাইন্‌ এন্‌কোর নাইনটি নাইন, মিষ্টার নচ্ছারবাবুর নিজের পরিবার।" তখন ভদ্রলোকটি বলেন,—"হুঁ হুঁ আজকাল অনেক অকাল কুষ্মাণ্ড ষণ্ড, জালছেঁড়া লক্ষীছাড়া ছোঁড়ার দল, গৃহলক্ষ্মীকে গৃহের বার করে সভ্যতার খাতা খুলেছেন। ব্যাটারা ত্যাগ স্বীকার করেছে।···তোমাদের আর বল্‌বার নাই। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ভগবান, তুমিই যা কর।"

(ঙ) বিবিধ ॥—

বড়দিনের বখ্‌শিশ্‌ (কলি তো—১৮৯৪ খৃঃ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নব্য সংস্কৃতির বিবিধ দিক আক্রমণ করে প্রহসনটি "পঞ্চরং"-এর পরিচয়ে রচিত হয়েছে।

কাহিনী।—পরীস্থানের পরীজানের হুকুম—পৃথিবীর কতকগুলো বেল্লিককে তাঁর চাই। তাঁর হুকুম তামিল করবার জন্যে বেল্লিক খুঁজতে খুঁজতে নজর ও গুল্‌জার কলকাতায় এসে পৌছিয়েছে। তারা ঘুরতে ঘুরতে যখন হয়রান, তখন পুঁটিরাম মিত্রের সঙ্গে তার দেখা। ঘড়ি সারানো, টাকা ধার, গিল্টীর গয়না বাঁধা, জুয়া খেলা, হ্যাণ্ডনোট কাটা ইত্যাদি করে তার দিন চলে। পুঁটে তাদের বলে, এখানে প্রচুর বেল্লিক আছে। দরকার হলে কলকাতাটা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। "মা বাপ্‌কে খেতে দেয় না, মাগের বুট্‌ খায়, এ উল্লুক যদি দরকার হয়, ফি ঘরে ঘরে পাবে, যে বাড়ীতে সেঁধোও। বেশ ইংরাজী কোট্‌ পেণ্টুলেন পরা, এদিকেও বিবিখানা ধাঁজের সাজগোজ, যদি চাও তো ঐ নম্বরে (৩৩ নম্বর) সেঁধোও। অবশ্য সব বাড়ীতেই এ ধরনের কিছু কিছু পাওয়া যাবে।" ৩৩ নম্বরে আর যেতে হলো না, তাঁরা নিজেরাই আসেন—বিলিতী আচার-ব্যবহার প্রিয় যুবক মিঃ হাজরা এবং তার বিবি। বিবি সাহেবকে বলেন,—"ডিয়ার, কুক মটন ছুঁতে চায় না, তোমার বুড়ী মাকে বলো, দুটো কাবাব আমাদের তৈয়ারী করে দেয়, আমি শিখিয়ে দেব; আর বাপ্‌কে বলো, সে-ই আমাদের টেবিলে দে যায়। দিনের বেলা এটা সেটা করে

রাত্তিরে যে কুঁড়েমো করবেন, তাহলে একসন্ধ্যে খান্ আমার আপত্তি নেই।" স্বামীকে "মাংকি" সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর ইভ্‌নিং ড্রেসের কি হলো? স্বামী বলেন, পরশুদিন দেবেন। অধৈর্য হয়ে বিবি সাহেবকে পদাঘাত করেন। মন্ত্রবলে নজর সাহেববিবি দুজনকে পরীস্থানে চালান করে দেয়।

আরও চারজন বেল্লিক আসে। গয়ারাম তাঁর দুটো ছোটো ছেলেমেয়ে এবং তাদের প্রাইভেট টিউটর গদাই দাসকে নিয়ে মর্ণিংওয়ার্কে বেরিয়েছেন। গয়ারামের গায়ে অলষ্টার, মাষ্টারের গায়ে চিড়িয়াবুটী শালের বালাপোষ, ছেলেটি নিকার বোকার স্যুট পরা—নাম ভুলু বাবা, মেয়েটি পিনাফোর পরা—নাম মিসিবাবা। গয়ারামের প্রশ্নের উত্তরে মাষ্টার বলে, ছেলেমেয়ে সাবান ইউজ করে, টুথব্রাশ দিয়ে টিথ্ ক্লিন্ করে, সকালবেলা উঠে তিনবার গড্ নেই বলে। গয়ারাম গদাইকে জিজ্ঞেস করে এ বছরে ক্রস্‌মাসে ছাত্র-ছাত্রীকে সে কী শিখিয়েছে? গদাই ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করে উত্তর দেওয়ায়। গদাই—"কি করে ঘোড়ায় চড়বে?" ছেলে ও মেয়ে—"টগাবগ! টগাবগ!" গদাই—"কি করে বল্‌ড্যান্স কর্ব্বে?"

ছেলে ও মেয়ে—"মেরি মেরি এক্‌স্‌মাস, মেরি ল্যাড্ মেরি ল্যাস্।
মেরি মেরি মেরি চান্স, মেরি মেরি মেরি ড্যান্স,
হুইস্কি, সেরি ফ্লোয়িং মেরি, ওন্‌লি সরি নেটিভ অ্যাস।"

গদাই—"কি করে পথ চল্‌বে?" ছেলে—"ড্যাম ড্যাম নেটিভ কালা।" মেয়ে,—"থাবি হুইপ্ সরে পালা।"—ছেলেমেয়ে দুটিকে যথারীতি পরীস্থানে চালান করে দেওয়া হয়।

পুঁটে নজরকে কুচো বেল্লিকদের কথাও বলে। দৃষ্টান্ত—'এই, বেশ্যার জন্যে গলায় দড়ি দেয়, স্ত্রীর চন্দ্রহার চুরি করে নে যেয়ে ক্রস্‌মাস্ করে, পৈতে ফেলে হাডী হয়,...আপনার দেশের লোকের নিন্দে করে, বাঙ্গালীর সব দোষ দেখে, বাঙ্গালীর আগাগোড়া দোষ দেখে, এমন বেল্লিক যদি চাও তো এ সহর উঠিয়ে নিয়ে যাও।...কারুর মা বিধবা কারুর বোন বিধবা, লেক্‌চার দিচ্ছে বাঙ্গালীর বিধবারা সব অসতী। মস্ত টিকিকাটা ভট্‌চাজ মুরগী খাবার বিধেন দিচ্ছে, শালগ্রাম ছেড়ে সাহেবের আরতি কচ্ছে,—এরকম কুচো বেল্লিকদের দরকার আছে কি? টাইটেল নিতে লাখ্ টাকা দেয়, বাড়ীতে এক মুঠি ভিক্ষে পায় না; সম্পাদক, থিয়েটারের ম্যানেজার।" পুঁটের সঙ্গে নজরদের কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় এক ফুলউলী এবং এক নেবুউলী আসে। নজররা একটু

আড়ালে গিয়ে প্রস্তুত হয়, বেল্লিক দেখবার জন্যে! বেল্লিকের চার যখন এসেছে, তখন টোপ্ গেলবার জন্যে দু-একজন বেল্লিক নিশ্চয়ই দেখা দেবে। কথা মিথ্যে হয় না। গয়ারামের বড়ছেলে মিষ্টার ডস্ আসে। ফুলউলীকে দেখে তাকে সে বলে যে, কোর্টশিপ করে তাকে বিয়ে করবে। ফুলউলী বলে, তাদের দুজনকে একসঙ্গে বিয়ে করলে সে রাজী আছে। কিন্তু ডস্ তা চায় না, সুতরাং নেবুউলী এবং ফুলউলী চলে যায়।

ডসের বাবা গয়ারাম ঘোষেদের বিধবা মেয়ের সঙ্গে ডসের বিয়ে স্থির করেছেন। সেখান থেকে কুড়ি হাজার টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে। কিন্তু দশ হাজার টাকা স্ত্রীধন বাবদ লিখে দিতে হবে। যাহোক এতে আধুনিক বলে নামও ছড়াবে, টাকাও কিছু হবে। কিন্তু এতো সবুর ডসের সয় না। "এই কুস্‌মাসে যেমন করে হয় বে করবই। যদি কোর্টশিপ কর্ত্তে পেলেম না, সিভিল ম্যারেজ হলো না, নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীতে তবে পিস্তল খেয়ে মরা ভাল।" গদাই অবশ্য ডসের মন বুঝে ডসদের বাড়ীরই মেথরানীকে রাজী করিয়েছিলো ডসের জন্যে। কিন্তু মেথরানী "ক্যাডাভ্যারাস," ফুলউলীই ভালো। শেষে গদাই বাধ্য হয়ে ফুলউলীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়াবে কথা দেয়।

এদিকে গয়ারাম ডসের ব্যাপার দেখে রেগে যান—ডস্‌কে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন! কুড়ি হাজার টাকা যে এতে ফস্‌কে যায়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে গয়ারাম ভাবেন, প্রতিবেশী বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো রামচাঁদকে ছেলে সাজিয়ে বিয়ে দিইয়ে টাকা হাত করা যেতে পারে। কিন্তু এতে দুশ্চিন্তাও কম নয়। প্রথমতঃ, তারা বুড়োকে মেয়ে দেবে কেন? দ্বিতীয়তঃ, রামচাঁদের তো কিছুই নেই। গদাই তখন গয়ারামকে বুদ্ধি দেয়, রামচাঁদের চুল সম্পূর্ণ ছেঁটে কলপ দিলে ছোক্‌রা দেখাবে। অবশ্য একটু ফিকিরও করতে হবে—শুধু তাতেই হবে না। থিয়েটারের একটা ছোকরাকে বর সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আসল সময় সে পালাবে এবং সেই গোলমালের ভেতর রামচাঁদের সঙ্গেই বিয়ে হবে। গদাই বলে এবার কুস্‌মাসে তিন জোড়া বর কনে বেরুবে। গদাই নিজে এবং নেবুউলী, মিঃ ডস ও ফুলউলী, রামচাঁদ ও ঘোষেদের বিধবা মেয়ে। গয়ারাম আশ্বস্ত হয়ে বলে,—"তবু আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো। ছেলেটা একটা নাম রাখ্‌বে, ইণ্টার ম্যারেজ হবে কিনা!"

পুঁটিরাম এসব শুনে শ্যামধনের কাছে গিয়ে গয়ারামের অসদুদ্দেশ্য জানিয়ে দিয়ে আসে। ওকে জব্দ করবার উপায় বলে দেয়। আগে বিয়ের রাতেই

স্ত্রীধন বলে নগদ দশ হাজার টাকা গয়ার কাছ থেকে নিতে হবে। তারপর যেই-না ছেলের বদলে রামচাঁদকে বর বলে খাড়া করবে, অমনি শ্যামধনও যেন মেয়ের বদলে একজন দাসী ধরনের কাউকে উপস্থিত করে। কনে তো আগে বার করতে হবে না। সেই টাকা থেকেই কোনো দাসীকে দুশো পাঁচশো টাকা দিলেই সে কনে সাজতে রাজী হবে। শ্যামধন ভালো লোক ; এসব জোচ্চুরির কাজ করতে সঙ্কোচ করলে পুঁটে উপদেশ দেয়,—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।" তাছাড়া সবার কাছে বললেই হবে যে, সৌখীন পুরুষ গয়ারাম রামচাঁদের বিয়েতে শখ করে রামচাঁদের স্ত্রীর স্ত্রীধন করে দিয়েছেন।

শ্যামধনের বাড়ীতে প্রেমদাস ও প্রেমদাসী—দুই বোষ্টম বোষ্টমী আসে। বোষ্টুমীকে প্রেমদাস নবদ্বীপের মেলায় পাঁচসিকে দিয়ে কিনেছে। টাকার লোভ দেখিয়ে পুঁটে প্রেমদাসকে পুরুৎ এবং প্রেমদাসীকে কনে সাজতে রাজী করায়। করণীয় সব সে শিখিয়ে দেয়। প্রেমদাসীকে সে হিষ্টিরিয়া শেখায়। কিভাবে স্মেলিং সল্ট নাকে ধরলে দাঁত কপাটী ভাঙবে—সঙ্গে সঙ্গে। কি করে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরবে,—তখনই তার একটা ছোটোখাটো ধরনের মহড়া হয়ে যায়।

এবার পুঁটে মিঃ ডস্‌কে গিয়ে বলে, শ্যামধনের মেয়েটি খুব আধুনিক। কোর্টশিপ্ শিখেছে, হিষ্টিরিয়া শিখেছে, গাউন কিনেছে, খাটো চুল করেছে। ডস্ তাই শুনে ক্ষেপে ওঠে। বুড়ো বাপের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে চায়। তাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা ও মেয়ে হাত করছে। অবশ্য যা-ই করুক ফুলউলীর ওপরই ডসের একটু টান আছে।

বিয়ের দিন। গয়ারাম ট্রাইসিকেলে করে বরবেশী থিয়েটারের ছোকরাকে নিয়ে চলে। পেছন পেছন রামচাঁদ চলে। চামর হাতে সঙ্গে সঙ্গে চলে ফুলকপিওয়ালী ও ভেট্‌কীমাছওয়ালী। ফুলউলী ও নেবুউলীকে যথাসময়ে পাওয়া যায় না। থিয়েটারের ছোক্‌রাকে গয়ারাম পালাবার ফিকির শিখিয়ে দেয়। ফুলকপিওয়ালী দিয়ে ডস্‌কে সন্তুষ্ট করানো যাবে। আর, ভেট্‌কীমাছ-ওয়ালী গদাইয়ের রইলো। আসল কথা, তিন জোড়া বরকনে হয়ে যাবে।

বিয়ের বাসরে প্রেমদাসীকে দেখে ডস্ ভাবে যা "ক্যাডাভ্যারাস" চেহারা—ওটা রামচাঁদের ওপর দিয়েই যাক। কনে প্রেমদাসী এসে রামচাঁদকে বলে,—"প্রাণনাথ মালা পড়।" প্রেমদাসীকে দেখে রামচাঁদ আঁৎকে ওঠে। বলে,—"আরে এ কে!" কনে বলে ওঠে,—"প্রাণনাথ, আমায় চিন্তে পাচ্চ না? তবে

আমি মূর্চ্ছা যাই।" এসব দেখে ডস্ বলে,—"এমন হিষ্টিরিয়া রোগী আমায় না দিয়ে রামচাঁদকে দিয়েছে। বাপের হাতে সে একটা ফাঁকা পিস্তল দেয়, তারপর নিজেও একটা ফাঁকা পিস্তল নিয়ে বলে, ডুয়েল লড়বে। গয়ারাম বলে, আর পিস্তলে কাজ নেই, টাকার শোকে সে এখন অস্থির! ডস্ অবশ্য বলে, রামচাঁদের স্ত্রীকে সে চায় না, তার ফুলউলীই আছে। এমন সময় ফুলকপি-ওয়ালী এসে বলে ফুলউলীর বদলে সে-ই আছে। গদাই তখন প্রকাশ করে, নিরুপায় হয়ে সে ফুলউলীর বদলে ফুলকপিওয়ালী এবং নিজের জন্যে নেবুউলীর বদলে ভেট্‌কীমাছওয়ালী এনেছে।

নজর ও গুল্‌জার এতোক্ষণ ধরে বেল্লিকদের কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছিলো। গয়ারাম ও তার ছেলে ডস্‌কে তারা পরীস্থানে চালান করে দেয়।

পরীস্থানে পরীজান বেল্লিকদের বড়দিনের ইনাম দেবেন। মিঃ হাজরা, মিসেস হাজরা, ভুলুবাবা, মিসিবাবা, গয়ারাম, ডস্ ইত্যাদি এসে সভায় হাজির হয়। পরীজানের কাছ থেকে এরা সকলে এক একটি করে গাধার টুপি উপহার পায়। পুঁটে তার নিজের হয়ে ওকালতি করায়, তারও ইনাম মেলে। থিয়েটারের ম্যানেজার সভায় ছিলেন। তিনিই বা বাদ যাবেন কেন? তাঁকেও একটা গাধার টুপি উপহার দেওয়া হয়।

নব্য সভ্যতার বিচিত্র গতিবিধি, অনাচার এবং ভণ্ডামিকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রহসন লিখিত হয়েছে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কতকগুলো দুষ্প্রাপ্য প্রহসনের পরিচয় দেওয়া হলো।—

টেক্ টেক্, না টেক্ না টেক্ একবার তো সি (১৮৭২ খৃঃ)—অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়॥ অল্প ইংরিজী জেনে যারা ইংরিজী কথা বলে হাস্যাস্পদ হয়, তাদের এই প্রহসনের মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তথা-কথিত চীনেবাজারী ইংরেজী কথাকেই মূলতঃ এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

সরস্বতীপূজা প্রহসন (১৮৭৫ খৃঃ)—বিরাজমোহন চৌধুরী॥ বাঙ্গালী যুবক ইংরিজী শিখে নিজেকে কেমনভাবে সাহেব মনে করে এবং স্বজাতিদের কিভাবে ঘৃণা করে, এই প্রহসনটিতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

বঙ্গরত্ন (১৮৮১ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত[২৮] যে সব বাঙালী যুবকরা বিলেত

২৮। মুঙ্গের নাট্য সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত

থেকে ফিরে এসে সাহেবদের অনুকরণ করতো তাদের বিভিন্ন অনাচার এবং স্বজাতিবিদ্বেষকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি লেখা হয়েছে।

কলির ছেলে প্রহসন (১৮৮৫ খৃঃ)—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়॥ কলির ছেলে অর্থ কু-শিক্ষিত বাঙালী ছেলে। এরা সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হয়ে সাহেবের দোষগুলোই নকল করে। এদের বাবা মাকে এরা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করে না। এদের নিজস্ব কোনো ধর্মমত নেই এবং অপরের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে এরা উপহাস করে।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি (ঢাকা—১৮৭৯ খৃঃ)—হরিহর নন্দী॥ যারা কুরুচিপূর্ণ আনন্দে মত্ত থাকে, একদিন তাদের শাস্তি পেতে হবেই। তিন চারজন বাবু ধরনের যুবক নিজেদের সভ্যতার বড়াই করতো। তারা ইংরিজী ছাড়া কথা বল্‌তো না, এবং তাদের চাল-চলনও সম্পূর্ণ বিলিতী। তারা মদ্যপান করতো এবং রাস্তায় নির্লজ্জের মতো মাতলামি করে বেড়াতো। শেষে একদিন তাদের পুলিশে ধরে।

হাল আমলের সভ্যতা (১৮৮৫ খৃঃ)—পূর্ণচন্দ্র সরকার॥ কতকগুলো নব্য বাঙালী ব্রাহ্ম ও সাহেবীচালের বাবুকে এই প্রহসনে কটাক্ষ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন তার বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হয়। অপর একজন যদিও বিবাহিত, তবুও অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে চেষ্টা করে। মেয়েটিকে আবার তার অভিভাবকের হেফাজত থেকে তার আপন সভ্য মামা চুরি করে নিয়ে আসে। প্রহসনকারের বক্তব্য এই যে, নব্য বাঙালীর সভ্যতা অর্থ ইংরেজদের হাবভাব নকল করা এবং ব্রাহ্ম নামটির আড়ালে থেকে অত্যন্ত গর্হিত পাপকাজ সম্পন্ন করা।

আই ডোণ্ট কেয়ার (১৮৭০ খৃঃ)—বঙ্কবিহারী মিত্র॥[২৯] প্রহসনটি তথাকথিত সভ্যসমাজের কয়েকজনকে বিদ্রূপ করে লেখা হয়েছে। এরা সভ্যতার নামে অখাদ্য ভোজন এবং মদ্যপান করে সমাজে নিজেদের জাহির করবার চেষ্টা করে।

ভারত দর্পণ (১৮৭২ খৃঃ)—প্রিয়লাল দত্ত ও ললিতমোহন শীল॥ বাঙালী যুবকদের দুর্নীতি ও অনাচারকে তুলে ধরা হয়েছে, যদিও নামকরণে অনেকটা ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করে।

২৯। বহরমপুর ধনসিন্ধু প্রেস থেকে মুদ্রিত।

কলির কুলাঙ্গার (১৮৮০ খৃঃ)—হরিহর নন্দী ॥ একটি নব্য যুবককে কেন্দ্র করে প্রহসনটি রচিত। সে সব সময়েই নিজেকে জঘন্য আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে রাখ্‌তো। এমন কি একদিন তার মা মারা যাচ্ছে, তখনও সে ইয়ারদের নিয়ে স্ফূর্তি করে। কুলগুরু কিছু উপদেশ তাকে দিতে গিয়ে যাচ্ছেতাইভাবে অপমানিত হন।

কলির অবতার (১৮৮৭ খৃঃ)—মহেন্দ্রনাথ নাথ ॥ একটি সাহেবী ভাবাপন্ন যুবক নিজেকে ব্রাহ্ম বলে পরিচয় দিতো। সে তার বিধবা বোনটিকে আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এতে তার বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধে। তার বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। এতে যুবকটি রাগ করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পৈতৃকবাড়ী ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তারই এক বন্ধু অর্থাৎ সমাজ-ভ্রাতার সঙ্গে প্রেম করে তার স্ত্রী পালিয়ে যায়। উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে তখন সে নিজের বাবার কাছে ফিরে এসে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চায়।

বিধবা সঙ্কট (১৮৯০ খৃঃ)—অঘোর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রহসনটিতে সাহেবীয়ানা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। রামচন্দ্রের হঠাৎ খেয়াল হয়, সে ইংরিজী রীতিতে তার বাবার শ্রাদ্ধ করবে। শেষে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দানের বদলে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের দান করে। সে প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ছিলো। কিন্তু সে গোপনে গণিকালয়ে যাতায়াত করতো। শেষে এক ব্রাহ্ম প্রচারকের অনুরোধে তার বিধবা শ্যালিকাকে তার সঙ্গে সে বিয়ে দেবার চেষ্টা করে। বিধবা সম্মত হয় না এবং বাপেরবাড়ী পালিয়ে যায়। রামচন্দ্র বিধবার বাপেরবাড়ীর ঝিকে ঘুষ দেয়। রাত্রে তাকে টেনে আনবার চেষ্টায় সে ঝির হাতে অজ্ঞান করবার ওষুধও দেয়। ঝি সেই ওষুধ অন্য একজন বিধবাকে দেয়—তাকে জেনানা মিশনের এক মহিলা একই রাত্রে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। ঝি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয় এবং বাড়ীতে পুলিশ লুকিয়ে রাখে। রামচন্দ্র এবং জেনানা মহিলা—দুজনেই ফাঁদে পড়ে এবং গুরুতর শাস্তিভোগ করে। ঘুষখাকী ঝি গুরুর কাছে হিন্দুধর্মের জ্ঞান লাভ করে এবং তীর্থের পথে পা বাড়ায়।

ভারতে কোর্টশিপ (১৮৮৩ খৃঃ)—বিপিনবিহারী ঘোষাল ॥ কতকগুলো বাঙালীবাবু এদেশের বিয়েতে বিলিতি কোর্টশিপ্ প্রথা চালু করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁদের মত, কোর্টশিপ্ প্রথা না থাকাতেই এদেশে এতো দাম্পত্য অমিল এবং যৌন ব্যভিচার। প্রহসনের নায়িকা তার বিবাহিত

জীবনে সুখী নয়। তাকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী স্বামী নির্বাচন করতে দেওয়া হয় নি বলেই নাকি তার আজ এই দুর্ভাগ্য। নায়ক স্বয়ং "Courtship society"র সভাপতি। সে ভাবতো, নৈতিক উন্নতি অনাচার জন্যেই কোর্টশিপ্ প্রয়োজন, অথচ সে-ই আবার গোপনে অবৈধ স্ত্রী সংসর্গ চালাতে দ্বিধাবোধ করতো না।

প্রহসনটিতে দুইদিকেই সমান দোষ দেখানো হয়েছে। তাই কোন্পক্ষকে বিদ্রূপ করা গ্রন্থকারের লক্ষ্য—তা ঠিক বোঝা যায় না ; তবে মনে হয় Courtship সমর্থকদের বিদ্রূপ করবার উদ্দেশ্যই এখানে প্রধান।

পাশ করা বাবু (১৮৮০ খৃঃ)—কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অধিকাংশ বাঙ্গালীযুবকের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে দেয়, প্রহসনকার এই মত পোষণ করেন। এক বৃদ্ধ ধর্ম পরায়ণ হিন্দু তাঁর পুত্রকে বিশ্ববিদ্যালযে ঢুকিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিলো, পুত্রটি, বিদ্যা, দয়া, পিতৃভক্তি, চারিত্রিক শুচিতা ইত্যাদির অধিকারী হবে। কিন্তু পুত্র গোপনে মদ্যপান, লাম্পট্য ইত্যাদি কুকর্ম করে বেড়াতো। একদিন সে মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে এসে তার পিতা এবং স্ত্রীকে হত্যা করে।

আক্কেল সেলামী (১৮৮২ খৃঃ)—রাজেন্দ্রনাথ রায়॥ একজন গ্রাম্য বাবু নিজেকে খুব ন্যায়নিষ্ঠ এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলে জাহির করতো। কিন্তু তার কন্যা বয়স্থা হয়ে উঠেছে। সে তার প্রতিবেশী এক অর্থলোভী ধনীর পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। লোকটির যে চাহিদা, বাবুর পক্ষে তা মেটানো সম্ভবপর নয়। বাবু খুব বিপদগ্রস্ত, এমন সময় তার এক প্রতিবেশী ভদ্রলোক তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর পুত্রের সঙ্গে তিনি বিয়ে দিতে চাইলেন। অবশ্য তিনি ধনী ছিলেন না। বাবু বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন। বিয়ের আগেকার সব অনুষ্ঠান গুলো শেষ হয়, শুধু বিয়ে হবার অপেক্ষা, এমন সময় বাবু বেঁকে দাঁড়ালেন। সেই প্রতিবেশী ধনী লোকটি নাকি তার মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হয়েছে। বিশেষ করে বাড়ীর মেয়েরা বাবুকে এজন্যে নাকি খুব চাপ দিয়েছিলো। তাদের মত, ধনীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেই মেয়ে খুব সুখে থাকবে। বাবুর এই অকৃতজ্ঞতায় গাঁয়ের লোকরা অত্যন্ত চটে গেলো। তারা সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করে এই বিয়ে ভেঙে দিলো এবং সকলের সামনে অপমানজনকভাবে বাবুকে নির্যাতন করলো। (সম্ভবতঃ এটি ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রহসন।)

একই বিষয়বস্তুকে নিয়ে লেখা আরও অনেক প্রহসনের শুধুমাত্র সাংবাদই পাওয়া যায়, অন্য কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। **ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব** (প্রকাশকাল অনিশ্চিত)—লেখক অজ্ঞাত;—ইত্যাদি কয়েকটি প্রহসন দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা চলে। বলাবাহুল্য অনেক প্রহসনই তাদের নামটুকু নিয়েও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

৩। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা।—

স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা অনেকটা একার্থক বাচক হিসেবে দেখা দিলেও, দুটোর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার বিরোধ দেখা যায়; তার প্রথমটি পারিবারিক এবং দ্বিতীয়টি সামাজিক। কিন্তু পারিবারিক বিরোধই পরে সামাজিক বিরোধ রূপে আত্মপ্রকাশ করে বলে উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যশিক্ষা রক্ষণশীল রীতিনীতির বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। তাই স্ত্রীশিক্ষাই স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ হিসেবে দেখা দেয়। দুটি কারণে এই দুটিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন এসেছিলো, তা মূলতঃ একটা আন্দোলন রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

শিক্ষার সাধারণ অর্থ বিদ্যাভ্যাস। বিভিন্ন বিদ্যার পুস্তকার্জিত জ্ঞানকেই শিক্ষা বলা হয়। কারণ শিক্ষিত ও বিদ্বান কখনো নিরক্ষর বিদ্যাভ্যাসকারীকে অন্তর্ভুক্ত করে না। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার মাত্রা থেকেই আমরা সাধারণতঃ শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিচার করে থাকি। পরে পাশ্চাত্য-বিদ্যার বিদ্যালয় মাধ্যমে পুস্তকের সহায়তায় শিক্ষাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা বলতেও আমরা অনুরূপ ধারণাই পোষণ করি। তবে বিদ্যালয়ের মাধ্যম ছাড়াও এই বিদ্যাভ্যাস 'শিক্ষা' বলেই গণ্য হয়েছে।

শিক্ষার এই আধুনিক অর্থের কথা ছেড়ে দিলে, আমাদের সমাজের স্ত্রীরা যে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ছিলেন, তা বলা চলে না। জ্ঞানার্জনের প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সমাজে একত্র অবস্থান করে পার্থিব জীবন যাপন করতে গেলে এই প্রবৃত্তিকে রোধ করা সম্ভবপর হয় না। এই ধরনের জ্ঞানার্জনের কথা বলতে গিয়ে "স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা" নামে একটি পুস্তিকায়[১] বলা হয়েছে, —"বালিকা নিজ মাতার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মশিক্ষা

১। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা (আর্যমিশন ইন্‌স্টিটিউট)—কলিকাতা—১৮৯৩ সাল, পৃঃ ১৮।

করিবে। শরীর পালন, শিশুপালন, পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, ভাই ভগিনীর প্রতি স্নেহ, এবং দয়া, সরলতা, স্থিরতা, মিষ্টভাষিতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অকপটতা, সন্তুষ্টতা, পরদুঃখে কাতরতা, মিতব্যয়িতা, অতিথিসেবা, দেবসেবা এই সকল কার্য্য বালিকারা মাতার নিকট প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অভ্যাস করিতেন।" উক্ত পুস্তকের ভূমিকায়[২] প্রকাশক বলেছেন,—"সেই অলীক কল্পিত সুখের জন্য আজকাল অনেককেই স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা দিবার জন্য ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হায়, পূর্ব্বে ভারত রমণীরা যেরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি ও মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায়?" রক্ষণশীল অনেক প্রাবন্ধিক এও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের দেশেব স্ত্রীলোকরা অধীন নয়। তবে স্বাধীনতার আধুনিক অর্থ এবং ধারণাকে মন থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে হবে।

নব্য নাগরিক-সংস্কৃতি-নির্ভর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রীতিনীতি যখন ব্যক্তি-চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছে, তখন প্রত্যক্ষভাবে আচ্ছন্ন পুরুষ-সমাজ যৌগিক ক্ষেত্রে বা পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কাছেও সমর্থনলাভের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেছে এবং তদনুযায়ী তাদের আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া নব্য সংস্কৃতি-নির্ভর পুরুষ-সমাজের অচরিতার্থ বাসনা স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষ-সমাজকে নিয়োজিত করেছে। অবশ্য এই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ আধুনিক অর্থেই প্রযুক্ত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ পুস্তকার্জিত শিক্ষা স্ত্রীসমাজে কতকগুলো অন্তরায়ের জন্যে প্রতিষ্ঠা পায় নি। "বামাবোধিনী পত্রিকায়"[৩] "স্ত্রীশিক্ষার অনুন্নতির কারণ স্বরূপ চারটি কারণ দেখানো হয়েছে,—"(ক) দেশীয় লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে ভ্রম, (খ) বাল্যবিবাহ, (গ) স্ত্রীশিক্ষকের অভাব, (ঘ) আন্তরিক যত্নের শিথিলতা"। বলাবাহুল্য কারণপ্রদ্রষ্টার বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম নয়। তবে এ থেকে আমাদের সমাজের স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটি ভ্রমাত্মক ধারণা এবং তার নিরসনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক"[৪] গ্রন্থে।

২। কলিকাতা ৩১শে বৈশাখ—১৩০০।

৩। 'বামাবোধিনী'—ভাদ্র—১২৭৪—পৃঃ ৫৭৪।

৪। "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক। অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত"—১২২৮।

"প্র ॥ স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধাবাড়া ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ ॥ না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখাপড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখাপড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র ॥ ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে, লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় একি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ ॥ না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই যে, মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড় ২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখাপড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।"

স্ত্রীসমাজ রক্ষণশীল সমাজের একটি শক্তিশালী যন্ত্র। এই সমাজের মধ্যে নব্য সংস্কৃতির প্রভাব রক্ষণশীল সমাজের অবাঞ্ছিত ছিলো। তাই স্ত্রীসমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার নামে রক্ষণশীল সমাজ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীসমাজের ওপর পুরুষ-সমাজ সাংস্কৃতিক একচ্ছত্রতার স্বাভাবিক অধিকারকে শিথিল করতে অনাগ্রহী। শিক্ষিত স্ত্রার যৌগিক পরিবেশে স্বামীর শিক্ষায় আধিক্য থাকায়, যৌগিক ক্ষেত্রে অধিকার শিথিলতার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পাশ্চাত্যবিদ্যার সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রে রক্ষণশীল বিদ্যার পরাজয় ক্রমেই আক্রোশে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য একথা সত্যি যে, স্ত্রীশিক্ষায় প্রাথমিক পর্বে রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কিছু অনাচার প্রবেশ করেছে, কিন্তু এইসব অনাচারের চিত্র অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল সমাজের দৃষ্টিকোণে নিয়ন্ত্রিত এবং দ্বৈতীয়িক অনুশাসন বিরোধী আক্রমণ পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ মাত্র।

শিক্ষায় স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে সমপদ্ধতি অনুসরণেই রক্ষণশীল সমাজের প্রধান আপত্তি। এমন কি অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েও যৌগিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে উদার হতে পারে নি। "ললনা সুহৃদ" নামে একটি গ্রন্থে[৫] সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী[৬] "স্ত্রীশিক্ষা" অধ্যায়ে বলেছেন,—"...এখনও বঙ্গের শত সহস্র ভদ্র পরিবারের নেতাগণকে স্ত্রীশিক্ষার নামে শিহরিয়া উঠিতে দেখা যায়; এখনও সংবাদ ও সাময়িক পত্রে মধ্যে ২ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি দেখিতে পাওয়া যায়।...বর্ত্তমান সময়ে অতি কুপ্রণালিতে স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে। ইহার কুফলও ফলিতেছে। এইসব দেখিয়া অনেক লোকের এরূপ ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, স্ত্রীশিক্ষা জিনিসটাই খারাপ।"

স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক গঠন এবং গতিবিধির ভিন্নতার জন্যে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা যে একই পদ্ধতিতে হওয়া উচিত নয়, একথা বলা হয়েছে অনেকের পক্ষ থেকে। কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা" পুস্তকে[৭] লিখেছেন,—"স্ত্রী ও পুরুষ যখন ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সমান অধিকার কিরূপে পাইতে পারেন। পুরুষ একপ্রকার গুণে, রমণীরা অন্যপ্রকার গুণে বিখ্যাত হইবেন, ইহা অখণ্ডনীয় ঐশিক নিয়ম।" পূর্বে উল্লিখিত "ললনা সুহৃদে"ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন,—"জগদীশ্বরই নরনারীকে দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা, দীক্ষা, বা কার্য্যপ্রণালী যে এক প্রকার হয়. ইহা স্রষ্টার ইচ্ছা নহে। বাহ্য প্রকৃতিও ইহাই বলে।...এই প্রকার যে দিকেই দৃষ্টি করা যায়, স্ত্রীপুরুষের পক্ষে এক প্রকার বন্দোবস্ত কোন বিষয়েই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা। আমাদের মতে ললনাগণের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক।...বালিকা বিদ্যালয়ের বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে গৃহেই বেশ শিক্ষা হইতে পারে; পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষা দিলে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা অনেক ভাল হয়।"

৫। ললনা সুহৃদ—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—কলিকাতা—১২৯৪।

৬। এঁর লেখা "স্ত্রীশিক্ষার দোষ কি?"—১২৯১ সালের ১লা ভাদ্র "সারস্বত" পত্রিকায় প্রকাশিত এবং "নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা" ১২৯৪ সালের ৬ই শ্রাবণ "দৈনিক" পত্রিকায় প্রকাশিত।

৭। স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা—কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঢাকা—১৩০৪ সাল। পৃঃ ১৪।

স্ত্রীশিক্ষা যে স্ত্রীলোকের প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী, একথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। নীলকণ্ঠ মজুমদার "বেদব্যাস" পত্রিকায়[৮] লিখেছেন,—"প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা ইহার দ্বারা পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায় এবং তাহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়। এই সব উক্তিগুলো যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা বলা চলে না। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার বিষয়েই এগুলো প্রযোজ্য হলেও হতে পারে। বুদ্ধি-বৃত্তিতে নারী অপেক্ষাকৃত হীন বলে, উচ্চ শিক্ষার অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত রাখ্‌বার প্রস্তাবও অনেকে করেছেন। সমসাময়িককালের বিখ্যাত গ্রন্থ Dr. Carpenter's Physiology-তে বলা হয়েছে,—"Fore there can be no doubt that the intellectual powers of women are inferior to those of men."[৯]

অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং পাশ্চাত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে দ্বৈতীয়িক অনুশাসনগত আক্রমণের উদ্দেশ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার কুফল চিত্রিত করা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়ে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান মিশনারীদের ভূমিকাই ছিলো প্রধান। "বামাবোধিনী" পত্রিকায়[১০] বলা হয়েছে,—"এখন যাহা কিছু স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা কেবল খৃষ্টান এবং নব্য সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মদিগের দ্বারা হইতেছে। খৃষ্টানদিগের প্রচুর অর্থ থাকাতে তাঁহারা কল্পনা সকল কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইতেছেন, ব্রাহ্মরা অর্থের অনটন প্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বাঙ্গালীদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার এখন যাহা কিছু উন্নতি হইতেছে, তাহা তাঁহাদিগের চেষ্টায় দেখা যাইতেছে।" অনেকে বাল্যবিবাহ প্রথার সমর্থনপুষ্টির জন্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার কুফল চিত্রিত করেছেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিকোণে ও উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হলেও স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অনাচারের সমাজচিত্রগত মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

৮। বেদব্যাস—বৈশাখ, ১২৯৬ সাল।

৯। Physiology—Dr. Carpenter. P.—1043.

১০। বামাবোধিনী—শ্রাবণ—১২৭৪ সাল; পৃঃ ৫৫৫।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সমাজে প্রচলিত আচার পালন ক্রমে শিথিল করে তুলেছে ; তেমনি স্ত্রীশিক্ষাও পারিবারিক এবং সামাজিক আচার পালনে স্ত্রীসমাজকে ক্রমেই দায়িত্বহীন করে তুলেছে। কুসংস্কার থেকে মুক্তিতে সামাজিক কল্যাণ বিদ্যমান্, কিন্তু সুসংস্কারকেও অস্বীকার প্রাথমিক দৃষ্টিকোণের জন্ম দেয়। হরচন্দ্র ঘোষ The 'Oriental Miscellany' পত্রিকায়[১১] Female Emancipation প্রবন্ধে লিখেছেন,—"Female emancipation in its proper and correct sense means nothing more or less than to emancipate women from errors and prejudices, from ignorance and superstition which are so many stumbling blocks in the way of their advancement in society. To walk with our wives and daughters in the evening on the Maidan, under the beautiful graves of the Eden Gardens, arm in arm, and exposed to the gaze of the public, or to give them restrained licence to ramble by themselves does hardly. Come within the true meaning of emancipation and is wholly inconsistent with propriety considering the present deplorable state of Indian Society." প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে হরচন্দ্র ঘোষ স্ত্রী-স্বাধীনতাজনিত অনাচারের চিত্রও দিয়েছেন। সমাজে এইসব দৃষ্টান্ত দুর্লভ ছিলো না বলেই তিনি সহজভাবে এগুলোকে উপস্থাপন করতে পেরেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলো। স্ত্রীশিক্ষা যৌগিকক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সূচনা করে, এই ধারণায় অনেকে স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের স্ত্রৈণতাকে ব্যঙ্গ করে রক্ষণশীল সংস্কৃতিতে আহ্বান জানিয়ে যৌগিকক্ষেত্রে পুরুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত "সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত"[১২] গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে।—

"সময় যত বয়ে যায়, (ভাই) কতই শুনিতে পাই,
কাল সাগরের ঢেউয়ে সদা হাবুডুবু খাই।

১১। The Oriental Miscellany—December 1880.

১২। বৈষ্ণবচরণ বসাক সঙ্কলিত, ১২৯৯ সাল।

নাই আর কুলবতীর লাজ, সদাই বিবিয়ানা সাজ,
রান্নাবাড়া ছেড়ে দিয়ে, ছুঁচে দড়ি কাজ।
(আবার) গাউন কোসে দেশ বিদেশে, গেয়ে বেড়ায় যাচ্ছেতাই॥
নাই আর সে পুরুষের বল, তারা গৃহিণীর অঞ্চল
ঘরে বাইরে রোজকারে সব রমণী মণ্ডল,
(আবার) পুরুষ ভেড়ুয়ার রকম সকম দেখে শুনে মরে যাই॥"

বিবিয়ানাকেও অনেক জনপ্রিয় গানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এ ধরনের একটি গানে[১৩] আছে,—

"হদ্দামজা কলিকালে কল্লে কলকেতায়।
মাগীতে চড়লো গাড়ী ফেটীং জুড়ি,
হাতে ছড়ি হ্যাট মাথায়।
ষষ্ঠী মাকাল আর মানে না,
সেঁজুতির ঘর আর আঁকে না,
আরসিতে মুখ আর দেখে না
এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়।
এখন গাউন পরে, ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গা স্নান ত দেছে ছেড়ে,
গোসল খানায় খানসামাতে
টাউয়েল দিয়ে গা মোছায়।"

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যাপক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রহসনে তার প্রসঙ্গ এসে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষতঃ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকের শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত অধিকার প্রদানে বিভিন্ন প্রহসনের মাধ্যমে সমাজে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ সমর্থন-পুষ্টির চেষ্টা করেছে। সাময়িক ঘটনামূলক আন্দোলনও অবশ্য অনেক প্রহসন রচনার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষার ক্রমবিস্তৃতিতে রক্ষণশীল সমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো। ক্ষেত্রমোহন ঘটকের "কামিনী" নাটকে (১৮৬৯ খৃঃ) ক্রমবিস্তৃতির প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহন বলেছে,—"দিন দিন ফ্যাসেন কেমন বদলে যাচ্চে দেখ্‌ছেন?

১৩। ঐ—পৃ: ৪৫৭-৫৮।

আগেকার হাউড়ো মাগিগুলো পাশা, শাঁখা বাঁকমল পরে কর্ত্তাদের ভোলাতো, এখন সে সকল প্রায় দেখা যায় না, উল্কীর সৌন্দর্য্য লোকের মন থেকে প্রস্থান করেচে, মিসি দাঁতে দেওয়াটা দেখতে দেখ্‌তে উঠে গ্যাল।" গোপালবাবু বল্লেন,—"যে এপিডেমিক, আর মদের দৌরাত্ম্য হয়েচে। দিনে দিনে যেমন আমাদের আচার আহার বেশ বিহার বদলাচ্চে, তার সঙ্গে মাগীদের ফ্যাসন বদলে আস্‌চে।" রক্ষণশীল পূর্ববঙ্গেও স্ত্রীশিক্ষার মারাত্মক বিস্তৃতির কথা রক্ষণশীল পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত নাটকে সারদা ঝুম্নোকে যখন বলে,—"তোমাদের চেয়ে পূর্ব্বদেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক অংশে সভ্য।"—তখন ঝুম্নো জবাব দেয়,—"পূর্ব্বদেশের কারা, বাঙ্গালনীরে? ছাই। পোড়া কপাল আর কি! শুনেচি কারা নাকি সাহেবের সঙ্গে বসে খানা খেয়েচে, আবার নাকি মিসিউলীদের মত ঘাগরা পরা হয়েছিল, গলায় দড়ি!" আক্রমণ পদ্ধতি স্বরূপ প্রহসনকারদের অনেকে রক্ষণশীল পূর্ববঙ্গীয়ার রীতিনীতির নব্যতা প্রকাশ করে তার ভয়াবহতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অমৃতলাল বসুর "তাজ্জব ব্যাপার" প্রহসনে (১৮৯০ খৃঃ) অনঙ্গমোহিনী বলেছে,—"উন্নতিকল্পে কল্‌কত্তা পিছায়ে পরছে সৈত্য, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের গৈরব এখনও বোর্ত্তমান, আপনারা যগ্যাপি আমার ড্যাকা-বজেট্‌ মধ্যা মধ্যা পাট্‌ কইরে আমাকে বাগ্য কইরে থাহেন, তা অইলে অবশ্য বদ্দর মায়ে মানুষ মাত্র স্বীকার করবোন যে, স্ত্রীলোকের জন্যই গ্যাহ বিসর্জ্জন কইরে আমি ক'ত ল্যাখ্‌ছি।" এধরনের অন্য একটি চরিত্র রাখালদাস ভট্টাচার্যের "স্বাধীন জেনানা" (১৮৮৬ খৃঃ) প্রহসনের 'চপলা'। তার কপালে উল্কী। সেটা সাবান দিয়ে ঘষে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলেছে,—"সাবুন দিয়ে রগ্‌রায়ে রগ্‌রায়ে চাল উডাইছি তবু ওডা সারাইবার পারলাম না।"

উনবিংশ শতাব্দীর হুজুগের তাড়নায় এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শে নব্যবাবুদের তাগিদেই স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রী-স্বাধীনতার এই ব্যাপকতা! জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের "সুধা না গরল" প্রহসনে (১৮৭০ খৃঃ) অবিনাশ হেসে বলেছে,—"ওহে বাবু, এটা 19th Century. সকলের চক্‌কান্‌ ফুটেছে; এখনও যারা Female education অনুচিত বলে, তাদের ন্যায় নির্ব্বোধ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে।" স্বামীর তাগিদে অনেক স্ত্রী বাধ্য হয়ে শিক্ষা ও স্বাধীনতার সুবিধা গ্রহণ করেছে। কেদারনাথ ঘোষের "পাপের প্রতিফল" প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ) সুলোচনা স্বর্ণলতাকে জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি নাকি বিবি রেখে পড়চো!"

স্বর্ণলতা তখন মুচ্‌কে হেসে জবাব দেয়,—"কি করি ভাই, যার খাই সে ছাড়ে না, আগে পড়তাম না বলে কত বোকতো।" স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে নব্যবাবুর অপ্রকৃতিস্থতার চিত্রও অনেক প্রহসনকার দিয়েছেন। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "মেয়ে মনষ্টার মিটিং" প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ) সৌদামিনীর হাত ধরে আড় খেম্‌টায় উন্নতবাবু গান গেয়েছেন,—

"এমন দিন আর কবে হবে, ঘোমটা টানা ঘুচে যাবে।
বায়ু সেবন, অশ্বারোহণ, যথা ইচ্ছে তথা গমন
বন্ধুর সঙ্গে রঙ্গে ভ্রমণ কবে ঘট্‌বে!
প্রিয়জনের হ্যাণ্ড ধরে, হাসিমুখে সেক্‌হ্যাণ্ড করে,
শাড়ি ছেড়ে গাউন পরে, সরল প্রাণে কথা কবে।"

নব্যবাবুর আকাঙ্ক্ষার একটি বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে—অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "গাধা ও তুমি" প্রহসনে (১৮৮৯ খৃঃ)। স্বাধীনা রমণীর অনুসন্ধানে বেশ্যা কন্যার কথা উঠ্‌লে বরদা বলে, আজকাল ধিঙ্গী ইস্কুল কলেজে পড়া মেয়ে আছে। Courtship করে বিয়ে করা চলে। এতে সারদা আপত্তি করে। সে বলে,—"তাঁহারা নাকে দড়ি দিয়া চালাইতে চেষ্টা করিবেন। চোক রাঙ্গানি বা ধমকানিতে ভয় করিবেন না। আমাদের এখন বাহিরে স্বাধীনতা ভিতরে সুলতানের হারেমবাসিনী কুলবতীর মতন স্ত্রী চাই।" —সুতরাং বেশ্যাই প্রশস্ত। একদিকে হুজুগ অন্যদিকে যৌগ্মিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠায় রক্ষণশীল মনোভাব পূর্বোক্ত মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

অধিকাংশ প্রহসনকারই স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গে স্বামীর স্ত্রৈণতাকে বিদ্রূপ করেছেন। একদিকে পুরুষের ভীরুতা, অন্যদিকে নারীর শক্তিচর্চা। কেদার-নাথ মণ্ডলের "বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাসা" প্রহসনে (১৮৯৪ খৃঃ) বাল্য বিবাহের সমর্থনে, এবং বাল্যবিবাহে দুর্বল সন্তানের জন্ম,—প্রগতিশীলের এই যুক্তির বিদ্রূপে নারীদের ব্যায়াম চর্চার চিত্র আছে।—

"আমরা কুস্তি করবো ভাই, দেখ্‌বে লো সবাই।
ডন বৈটক, মুগুর ভাঁজা, খেলা লয়ে ডম্বেলে ॥···
মোদের পেরুলে কুড়ি লোকে কয় বুড়ি
সেই সময়ে হবে বিয়ে, বিলাতি চেলে ॥
মোগল কি পাঠান, জুলু কি খৃষ্টান
জুয়ান দেখে দেবে বিয়ে বাগ্দী কি জেলে ॥"

অন্যদিকে পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করে নিজেদের নপুংসকতা প্রমাণ করছে। অমৃতলাল বসুর "তাজ্জব ব্যাপার" প্রহসনে (১৮৯০ খৃঃ) নারীবেশী পুরুষের গীত আছে।

"ঘাট হয়েছে বাপ।
সবাই মোদের কর মাপ ॥
মাগীদের স্বাধীন করে, এখন যেন ম্যাড়া লড়ে,
আমাদের ঘাড়ে চড়ে দিচ্ছে উল্টো চাপ।"

স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্থ বাইরের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পরাজয়কে ডেকে আনা—এই মত প্রচারের চেষ্টা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "কলির হাট" প্রহসনে (১৮৯২ খৃঃ) স্বাধীনা ছাত্রীদের একটি গীতে স্ত্রীদের পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে :—

"একজামিন দিয়ে এলেম সকলে।
আজ গ্র্যাণ্ড গ্যাদারিং টাউন হলে।
দেখে শুনে হদ্দ মেনে, যেন মিন্‌সেগুলো কান মলে ॥
হব ওকালতীতে পাশ, গলায় আচ্ছা দিব ফাঁস
দেখ্‌বো তাদের মুন্সিআনা, কেমন চলে বার মাস,
এবার ডাক্তারি করবো যখন, (ওসে) পড়বে এসে পায় তলে ॥
ঘরের কোণেতে বসে, সদা মরি আপশোষে
পুরুষের বশ হয়ে পোড়া ব্যবস্থার দোষে ;
এবার বারমহলে বাহার দেব, অবলা আর কে বলে !"

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা যে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় ও ক্ষতি আনে, এই মতবাদের সংগঠনসূচক প্রচুর চিত্র প্রহসনকাররা উপস্থাপিত করেছেন। অনেকের মতেই স্ত্রীসমাজে ব্যভিচারের প্রধান কারণ স্ত্রীশিক্ষা। ব্যভিচার পৃথিবীর সব সমাজে সব যুগে সব অবস্থাতেই অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। কারণ ব্যভিচার আদিমপ্রবৃত্তি সম্পৃক্ত বিষয়। একমাত্র স্ত্রীশিক্ষাই ব্যভিচারের কারণ এই মতটি যে রক্ষণশীল সমাজের উপস্থাপিত, এটা বোঝা যায়। প্রকৃত শিক্ষায় যদি স্ত্রীসমাজ শিক্ষিত হয়, তাহলে বরং ব্যভিচার ইত্যাদি সামাজিক অশান্তিসূচক অনুষ্ঠানের প্রতি সমাজের ঘৃণাই পরিস্ফুট হবে। কিন্তু নব্যশিক্ষার সঙ্গে উল্লিখিত শিক্ষার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ব্যক্তির মঙ্গলে অনেকক্ষেত্রে

সামাজিক সংবিধান নিয়োজিত থাকে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এই সংবিধানকে মূল্যহীন করে তোলে। তাই স্ত্রীশিক্ষা আমাদের সমাজের সতীত্ব সংস্কারকে শিথিল করে তুলেছে। অন্যায় সংবিধানের বিরুদ্ধে, ক্ষোভ সংস্কার-ভঙ্গের দিকে স্ত্রীসমাজকে চালিত করেছে। অন্যদিক পাশ্চাত্য অনুকরণে বিভিন্ন পুরুষ সাহচর্য স্ত্রীসমাজকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে তুলেছে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা ব্যভিচারানুষ্ঠানের মূলের কারণ হিসেবে অনেকক্ষেত্রেই বর্তমান থাকতে পারে, কিন্তু একেই প্রধানতম কারণ বলে প্রহসনকাররা দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুশাসনবিরোধী উপাদানগুলো প্রচার করে রক্ষণশীল সমাজকে পুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের "ইহারই নাম চক্ষুদান" (১৮৭৫ খৃঃ) প্রহসনে তাই লম্পটের মুখে স্ত্রীশিক্ষার প্রশস্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে। লম্পট হেমচন্দ্র বলেছে,—"সখে, আজকাল Female Education হয়ে বড় মজা হয়েছে যত সব Yonng Bengalএর। Girlsরা বিদ্যাসুন্দর, মালতীমাধব ও বিজয়বসন্ত পড়ে কেউ বা কুলটা হন। যদি কাহার স্বামী একটু কাল হন, তবে আর স্বামীর সহিত কথা কন না, এখন আমার মতন সুপুরুষ ও সুরসিকদের মজা।" কানাইলাল সেনের "কলির দশদশা" প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ) স্ত্রীশিক্ষার ফলবিশেষের ইঙ্গিত দিয়ে নন্দকিশোর বলেছে,— "বিশেষ স্ত্রীজাতি অবলা, এদের যে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার কত ফল ও উপকার তা এখন বেশ বুঝতে পাল্লেম। অধিকাংশ কেবল প্রেমপত্র লিখ্‌তে, আর অবশেষে সুবিজ্ঞ অভিনয় সংক্রান্ত মহাত্মাদেরও কতক কতক ব্যবহারে আজকাল লাগ্‌চে।" অনেক প্রহসনেই শিক্ষিতা ও স্বাধীনা স্ত্রীলোকদের মুখের ভাষায় বৈবাহিক দুর্নীতির প্রতি আকর্ষণ ব্যক্ত করা হয়েছে। অমৃত-লাল বসুর "বাবু" নাটকে (১৮৯৪ খৃঃ)—কন্দর্পের বাড়ীর সামনে স্বাধীনা মহিলাদের একটি গানে আছে,—

"...আমরা সবাই বিদ্যাবতী
আসলে পরে দোস্‌রা পতি
টান্‌লে প্রাণ তার পানে সই,
কেন চল্‌ব না লো চল্‌ব না।
হাতের পতি হাতে ধরে
বলে আমি পটোল তুল্লে পরে,

আন্‌তে ঘরে নূতন বরে
সতি ভুল্‌বে না ত ভুল্‌বে না।"

পুরুষের গানেও বিদ্রূপাত্মকভাবে এই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। সিদ্ধেশ্বর ঘোষের "লণ্ডভণ্ড" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) রমাকান্তের গানে আছে,—

"আমার কোথায় ছিলে কালাচাঁদ ?
আমি চশমা নাকে বসে আছি
পেতে প্রেমের ফাঁদ।
রিপোর্ট পড়লুম মরেছিলে
তাই আছি খাড়ু খুলে
ধুয়ে সিঁদুর গরম জলে
আমি ঘুচিয়ে দিছি প্রেমের সাধ।"

রক্ষণশীল মতে শিক্ষিতা বা স্বাধীনা স্ত্রীলোক বেশ্যারই নামান্তর। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কষ্টিপাথর" প্রহসনে (১৮৯৭ খৃঃ) পেয়ারা বেশ্যা নিজের সঙ্গে শিক্ষিতা রুক্মিনীর তুলনা করে তাকে বলে,—"আর তুমি কি ? ব্যবসা, বাণিজ্য, চালচলন, সবই আমাদের নিয়েছ, কেবল একটা মুখোস পরে আছ, ভদ্দর আমার।"

সংসারে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিপর্যয়ের বীজ বহন করে,—অনেক প্রহসনকার চিত্রের মধ্যে এই মতবাদ সংগঠনের সূচনা করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা পুরুষ-সমাজের মতো স্ত্রীসমাজেও জীবন যাপনের ব্যয়ভার বৃদ্ধি করেছে। বিদেশী শিল্পের বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্প-পুঁজিবাদী শাসক সম্প্রদায়ের চক্রান্তের কবলে স্ত্রীসমাজও পতিত হয়েছিলো। অবশ্য যদিও পুরুষ সমাজের মাধ্যমেই স্ত্রীসমাজের এই জীবনমানবৃদ্ধির তাগিদ এসেছে। যৌগিক বা পারিবারিক ক্ষেত্রে শিক্ষিতা স্ত্রীর অস্তিত্ব অপ্রত্যাশিত-ভাবে ব্যয়বৃদ্ধির সূচনা করে। দুর্গাদাস দে-র "ল-বাবু" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) স্বাধীনা কুমারীরা গানে ব্যক্ত করেছে,—

"·· থার্টি রুপিজ স্যালারিতে মাগ
পোষান চলে না গো চলে না,
কানমলা খায় কেরাণীতে হেসে
বাঁচি না লো বাঁচি না।"

সাংসারিক জ্ঞানে ডিগ্রীর অপ্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করে অনেক প্রহসনকার সাংসারিক জ্ঞানের সঙ্গে ডিগ্রীর বিকৃত সম্পর্ক দেখিয়ে প্রকারান্তরে স্ত্রীশিক্ষাকে সাংসারিক জীবনে সমস্যা বিবর্ধক বলে স্বীকার করেছেন। গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ তাঁর "পাঁচ কনে" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) এই ধরনের একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। Female Education Section-এর ডেলিগেট বলেছে,—"Entrance না পাশ কল্লে কেউ কুটনো কুটতে পারে না ; L. A. না পাশ কল্লে কেউ রাঁধতে পাবে না। M. A. পাশ কল্লে হাওয়া খেতে যাও আর না যাও, কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে। বিলেত যাওয়া compulsory." শিক্ষিতদের আশা আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত, তাই এদের বিবাহ সমস্যাও সাংসারিক জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। দুর্গাদাস দে-র "ছবি" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) একালের স্ত্রীলোকদের গানে আছে,—

"উইদাউট্ বি. এ., করবো না বিয়ে
নেবো না কেরানী পতি, চাই লো ডিপুটি পতি,
নহে ব্যারিষ্টার পতি, নিদেন পতি এডিটার ॥"

এছাড়া যৌগ্মিক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা জনিত সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের চিত্রও প্রহসনকারদের অনেকে উপস্থাপিত করেছেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা এনে দিয়েছে, তাই এই আত্মমর্যাদাকে বিশিষ্ট অবকাশে অহংকারে রূপান্তরিত করে প্রহসনকাররা তা উপস্থিত করেছেন। যৌগ্মিক বা পারিবারিক ক্ষেত্রে এই "অহংকার"বোধের মাত্রা বৃদ্ধি করে অনেকক্ষেত্রে উন্নাসিকতাজনিত ঘটনার সৃষ্টি করা হয়েছে। গুরুজনকে অভক্তি শিক্ষিতা স্ত্রীর একটি প্রধান লক্ষণ বলে প্রহসনকারদের অনেকে মন্তব্য করেছেন। স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধার চিত্র অনেক প্রহসনেই আছে। পাশ্চাত্য স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে যে সমপর্যায়ত্ব দৃষ্ট হয়, তার অনুকরণ রক্ষণশীল দৃষ্টিতে বিপরীত প্রতিষ্ঠারই বীজ স্বরূপ। রাখালদাস ভট্টাচার্যের "সুরুচির ধ্বজা" প্রহসনে (১৮৮৬ খৃঃ)—সুরুচি তার স্বামী কালাচাঁদকে নাম ধরে ডাকে। কালাচাঁদ মন্তব্য করে,—"তুমি আর কালাচাঁদ কালাচাঁদ করো না। যেন বড়দিদি ডাকচেন।" সুরুচি এতে জবাব দেয়,—"ইংরাজীর তার ত জান্‌লে না, এসব উচ্চ Progressএর তত্ত্ব কি বুঝবে।" রক্ষণশীল দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য অনুকরণজাত এই রীতি যৌগ্মিক-

ক্ষেত্রে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিলো। কিন্তু এই অশ্রদ্ধার বীজকে বিভিন্ন অবকাশে প্রহসনকারেরা প্রচুর মাত্রাবৃদ্ধির সাহায্যে সম্ভাবিত করেছেন। ক্ষেত্রমোহন ঘটকের "কামিনী" নাটকের (১৮৬৯ খৃঃ) রুক্মিণী তার স্বামীকে চাকর বলে পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করে না।—"যদি মোক্ষদা বলে ঐ কি তোর ভাতার? আমি কি বল্‌বো? (চিন্তা) আমি বল্‌বো দূর ও তার চাকর। যেমন একজন রেইলওয়ের বাবু জন্মদাতা পিতাকে অনুপযুক্ত অবস্থায় দেখে সম্মান রক্ষার জন্য বাড়ীর গুরুমশায় বলেছিলো।" নব্য সংস্কৃতি-নির্ভর পুরুষ সমাজের ক্ষেত্রে অনেক রক্ষণশীল প্রহসনকার পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাটির অনুরূপ প্রচুর ঘটনা দিয়েছেন। স্বামীকে পদাঘাতের চিত্রও প্রহসনে দুর্লভ নয়। অবশ্য স্ত্রীকে প্রমত্ত অবস্থায় উপস্থিত করানো হয়েছে। সিদ্ধেশ্বর ঘোষের 'লণ্ডভণ্ড' (১৮৯৬ খৃঃ) প্রহসনে স্ত্রী জেস্‌মিন্ মদ্যপান করে এসে বলে,—

"রে মূঢ়
নিজ প্রাণে যদি তোর না থাকে মমতা
পূর্ণ কর শোণিত পিয়াসা মম।"

—এবং রাঘবরামকে পদাঘাত করে। ভূমি শয্যায় শুয়ে রাঘব মন্তব্য করে,—"বাপ্‌রে বাপ্‌! উঃ কি আস্তাবুলে টক্কোর।" তারপর উঠে বলে,—"ছোট বৌ, এ লাথি সেট্ করবার জন্যে, ছেলেব্যালায় তোমাকে তোমার বাপ্ মা কি আস্তাবল বোর্ডিংয়ে দিয়েছিল? নইলে এমন দোরস্ত চাট্ ত বাবা মানুষের সঙ্গে রিহার্সেলে হয় না।"

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ পুষ্ট করবার জন্যে পুরুষের সাংস্কৃতিক অপ্রতিষ্ঠার চিত্র প্রদর্শন করে সতর্ক করা হয়েছে। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের "বোধনে বিসর্জন" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) সরস্বতীর দীর্ঘ উক্তি,—"এ সওয়ায় আর একটা বিশেষ মতলব আছে; বৈকুণ্ঠে একটা লেডি স্কুল এষ্টাব্লিসের ট্রাই করতে হবে, তাতে যদিও আমার হাজব্যাণ্ডের অপিনিয়ন নেওয়া হয় নাই, কিন্তু তিনি তাতে প্রতিবাদ করতে পারবেন না,......তা আমি যখন তীব্র বক্তৃতা দ্বারা প্রুভ করব, তখন তাঁকে নিশ্চয়ই ওয়াইজ্‌ড্ হতে হবে। মেয়েরা অশিক্ষিতা থাক্‌বে, পুরুষের অধীন হয়ে পিঁজরের পাখীর মত অন্দরে বাস করবে, তা আমি দেখ্‌তে পারব না। যতদিন মেয়েরা এজুকেটেড্ হয়ে পুরুষদের স্ত্রীভক্তি শিক্ষা দিতে না জান্‌বে,...ততদিন আমার —চিন্তার বিরাম নাই, মনের স্থিরতা নাই।"

পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশীয় সমাজে ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাবিলাসিতাও বৃদ্ধি করেছে। বাস্তবজীবনের সঙ্গে এর সম্পর্কহীনতার কথা অনেকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। স্ত্রীশিক্ষাও তাই স্ত্রীসমাজকে বাস্তব জগতের কর্তব্যকে বিস্মৃত করে কল্পনাবিলাসী করে তুলেছে—বিভিন্ন চিত্রে এই মত সংগঠনের সূচনা দেখি। দুর্গাদাস দে-র "ছবি" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) এধরনের কল্পনা বিলাসিনীর ইঙ্গিত করে বুড়কর্তা কানাই বলাইকে বলেছে,—"বলি ও সম্বন্ধী মেগের ভাই, তোর ঠান্‌দিদি কি কলকেতার হালি মেয়ে, যে কেবল ফেসিয়ান্ করে বসে থাকে। আর ঠাকুর দেবতার পূজো ছেড়ে, মুখে ছাই মেখে, চক্ষু কপালে তুলে, চুল এলো করে, কাপড়ের পাড় মাথায় দিয়ে কেদারার সং সেজে বসে থাক্‌বে। আর আমার আশে পাশে ঘুর ঘুর করে প্রিয়ে প্রিয়ে করে বেড়াবে।" স্ত্রীর কবিতা রচনার হাস্যকর বাতিকের মূলেও স্ত্রীশিক্ষা কার্যকরী। এটিও একই কল্পনা-বিলাসিতার প্রকারভেদ। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কষ্টিপাথর" প্রহসন (১৮৯৭ খৃঃ) থেকে একটি চিত্র উপস্থাপিত করা যেতে পারে।—রমানাথবাবুর অন্তঃপুরে তাঁর পত্নী নলিনী কবিতা রচনায় ব্যস্ত। কবিতা শোনাবার জন্যে সে হরের মাকে ডাকে। অথচ তখন বেলা এগারোটা। ঝি বলে,—"বেলা এগারোটা হয়ে গেল। ওঠ না, পায়খানায় যাও, কাপড়চোপড় কাচ, কাজ চোকাও না বাবু। ঝি চাকরদের ছোট-লোকের দেহ বলে কি একটু আরাম বিরামের সাধ নেই। ছিঃ গেরস্ত বউ, এত্ত কেরাণী হলে চলে কি?" নলিনী এসব ভ্রূক্ষেপ না করে অসময়ের বসন্ত নিয়ে বসন্ত-বর্ণনা দেয়। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতে বধূর প্রিয়তমের জন্যে প্রতীক্ষার বর্ণনা। নলিনী নিজেই বলে,—"আহা আহা ভারি সুন্দর উত্‌রে গেছে। এর পরে যে আর চার লাইন লিখ্‌ব, তাতে যদি "নিকুঞ্জ", "পাপিয়া", "মুখানি" আর "নিঝুম" এই কথাকটা লাগাতে পারি, তাহলে আর আমায় পায় কে?" ইতিমধ্যে তার পিসি এসে সংসারের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে গেলে নলিনী কবিতা শোনাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। এতে বিরক্ত হয়ে পিসি চলে যায়। যাবার আগে বলে,—"গেরস্তর মেয়ে দিনরাত্তির অমন কাগজে কলমে থাকলে, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।"

পাশ্চাত্য শিক্ষা যেমন পুরুষ-সমাজের মধ্যে সাহেবীখানা এনেছে, তেমনি স্ত্রীসমাজেও এনেছে বিবিয়ানা। বলাবাহুল্য পুরুষ-সমাজে সাহেবী রুচি প্রতিষ্ঠা পাবার পর, সেই রুচির তাগিদেই যৌগিক বা পারিবারিক ক্ষেত্রে

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্ত্রীসমাজ বিবিয়ানার চাল শিক্ষা করেছে। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের "বোধনে বিসর্জন" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) সরস্বতী ও কলাবৌয়ের গানে এই বিবিয়ানার গতিবিধি প্রকাশ পেয়েছে।—

"কাম কাম কে যাবে কলকাতা সহর
চল মাই ডিয়ার।
করবে ওয়াক্ গড়ের মাঠে
লাগ্‌বে গায়ে পিওর এয়ার॥
চড়বে বগী চেরেট ফেটীং
টাউন হলে করবে মিটিং।
চেয়ার নিয়ে করবে সিটিং
জুট্‌বে কত প্রাণের ইয়ার॥"

কিংবা, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কষ্টিপাথর" প্রহসনে (১৮৯৭ খৃঃ) পুত্রবধূ শশিকলা শাশুড়ী সুশীলাকে বলেছে,—"হলেই বা তুমি আমার শ্বশুরের স্ত্রী!—দ্বিতীয় পক্ষের ত বটে! আর বয়স ত প্রায় এক—তোয় আমি Dear mother in law বলে ডাক্‌বো।" এরা সকলেই তথাকথিত শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রতিনিধি।

রক্ষণশীল প্রহসনকার উপলব্ধি করেছেন যে, নব্য সংস্কৃতির আদর্শ হচ্ছে পাশ্চাত্য সমাজ। তাই পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে নব্য সংস্কৃতি-নির্ভর দেশীয় সমাজের ভেদসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রহসনকারদের অনেকে বিশেষ ধরনের আক্রমণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের "গুই হ্যান্ডু" প্রহসনে (১৮৯৪ খৃঃ) লাটসাহেবের বাড়ীর বল্‌ড্যান্স অনুষ্ঠানের একটি চিত্র আছে। এই সভায় একজন "দিশি ম্যাম্" ছিলেন। প্রকৃত সাহেব বিবিরা নিজেদের "ম্যাচ" মিলিয়ে ড্যান্স সুরু করে দিলো, কিন্তু এঁকে কেউ ডাক্‌লো না। এক সহৃদয় সাহেবের মুখে এই দুর্গতির কারণ বিবৃত হয়েছে। "সি ইজ্ এ প্রেটি ইয়ং লেডি, কিন্তু আপসোসের বিষয় এইসব ইয়োরোপিয়ন্ নেটিভ্‌কে ঘৃণা করে বলে ওর সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করছে না।" সাহেবটি "দিশি ম্যাম্" মিসেস্ উলুইচণ্ডীকে বলেছেন,—"তুমি নেটিভ হেটারদের সঙ্গে মিশ না, তোমার হাজব্যাণ্ডকে বলে ফের পর্দ্দানসিন হও গে, তাহলে আর এমন ফল্‌স্ পজিসনে পড়তে হবে না, আপনার স্ফিয়ারে মুভ্ করলে মান ইজ্জদ বজায় থাক্‌বে।

ফরেন্ ইমিটেসনে কোন মজা নাই। লোকের কাছে কেবলই হাস্যাস্পদ হতে হয়। সেদিন রেলগাড়ীতে তোমাদের একজন Pseudo Patriot Female Emancipater's wife কে দুজন Raffian এর হাত থেকে রক্ষা করে তার কান দুটি মলে দিয়ে তাকেও এই উপদেশ দিয়েছিলুম্।" একই প্রহসনকারের লেখা "আচাভূয়ার বোম্বাচাক" প্রহসনে (১৮৮০ খৃঃ) শেষোক্ত ঘটনা অবকাশ অনুযায়ী উপস্থাপিত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এই বিবিয়ানা এবং পাশ্চাত্য রীতি নীতির ওপর মোহের মূলে আছে তথাকথিত বাঙালী সাহেবদের উস্কানি। অমৃতলাল বসুর "বিবাহ বিভ্রাট" প্রহসনে (১৮৮৪ খৃঃ) মিষ্টার সিং জনৈকা শিক্ষিতাকে বলেছে,—native স্ত্রীলোক বিলেতে গেলে সাহেবরা যত্ন তো যত্ন—লুফে নেয়। সে বলে,—"You will be a curiosity there! ওঃ! আপনি বাড়ীতে খাবার শোবার time পাবেন না। Tea there, Dinner here, Picnic abroad. Yachting, Skating, Riding. Driving, Sight geeing, আজ Crystal palace, কাল Vaux Hall, holiday every day and presents! Rings, Broaches, Dresses—a—la--Paris…।" এই প্রলোভন ছাড়াও স্বামীর তাগিদের কথাও আগে ব্যক্ত করা হয়েছে।[১৪] অনেক প্রহসনেই স্ত্রীসমাজের অধঃপতনের মূলে পুরুষ-সমাজ ও তার অধঃপতনকেই দায়ী করা হয়েছে। রাধামাধব হালদারের "এই কলিকাল" প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ) বলা হয়েছে,—"নারী জন্মের দুর্ভাগ্য—স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে কুসংস্কার। স্ত্রীশিক্ষাতেও অধঃপতন কারণ শিক্ষিত স্বামীর অধঃপতন।"

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ প্রহসনেই, যেখানে স্ত্রীশিক্ষার কিংবা স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে রক্ষণশীল দৃষ্টিই প্রকাশ পেয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রাথমিক অনুশাসনবিরোধী উপাদানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অবশ্য দ্বৈতীয়িক অনুশাসন বিরোধী উপাদানের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এবং সমর্থনপুষ্ট করবার জন্যে আক্রমণ পদ্ধতি হিসেবেও প্রাথমিক অনুশাসনবিরোধী উপাদানকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে জটিলতাকে অতিবর্তন করা সমাজচিত্র গ্রাহকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। স্ত্রীসমাজের যৌনসমস্যা বৃদ্ধির মূলে যে

১৪। পাপের প্রতিফল—কেদারনাথ ঘোষ—১৮৭৫ খৃঃ। সুলোচনা স্বর্ণলতা উক্তি-প্রত্যুক্তি।

রক্ষণশীল বিধি নিষেধ বর্তমান, তার বিরুদ্ধে স্বাধীন দৃষ্টিকোণ রক্ষণশীল গোষ্ঠীতেও প্রগতি এনেছে। সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন পাওয়া যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের "নব নাটকে" (১৮৬৬ খৃঃ) উপহসিত বিধর্ম-বাগীশ মন্তব্য করেছে,—"গ্রাম মধ্যে যে একটা অধর্ম্মের অঙ্কুর স্ত্রী বিদ্যালয় হচ্ছিল, তাহল্যে এতদিন যে একার্ণব হয়ে উঠ্‌তো, ভাগ্যে বাবু সে বিষয়ে লেগেছিলেন তাতেই তো হতে পেলে না।·· গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষাও ওটা অধর্ম্ম।" নব্য সংস্কৃতির পক্ষ থেকে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করে প্রত্যক্ষ আক্রমণ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তবে পরোক্ষে একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আক্রমণ অস্বীকার করা যায় না।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের সমাজে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এতো তীব্র করে তুলেছে, তার কারণ—আমাদের সামাজিক প্রতিবেশের বিশিষ্টতা। রক্ষণশীল পরিবারকেন্দ্রিক সমাজে তাই বিভিন্ন প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। অবশ্য পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রেই সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সাংস্কৃতিক বিরোধের চিত্র চিরন্তন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি সংস্কৃতি যৌগিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে বিরোধে তীব্রতা এনে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ সংগঠন করেছে।

পাস করা মাগ (কলিকাতা—১৮৮৮ খৃঃ)—রাধাবিনোদ হালদার॥ এই "সামাজিক প্রহসন" পরিচয় প্রদায়ক গ্রন্থটির মলাটে কবিতা আকারে মন্তব্য আছে,—

"স্ত্রী স্বাধীনতার এই ফল।
পতি হয় পায়ের তল॥"

প্রহসনের শেষাংশে নায়িকা কিরণশশীর আক্ষেপের মধ্যে দিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিরোধী দৃষ্টিকোণ সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা দেখা যায়। কিরণ বলেছে,—"আমি হতভাগিনী, পতি যে এমন গুরু, পতি যে এমন ধন, সেই পতিকে কত যাতনা দিয়েছি,—আজ আমি—তেমন ধর্ম্ম তেমন হিন্দু ধর্ম্ম—তেমন পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে অপবিত্র অনাচারী ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম সার করেছি।"

কাহিনী।—হরিবাবুর দুই মেয়ে—কিরণশশী ও চাতকিনী। একদিন বৈঠকখানায় কিরণ তার বোন চাতকিনীকে বলে যে, "নেটিভগণ" মেয়ে মানুষের "অনার" বোঝে না। ভাতার বোলে যে একটা পদার্থ বা জানোয়ার আছে, তা তার 'আইডিয়া'তে আসে না। নেটিভ পুরুষের অধীন হয়ে

পরাধীনা বাঙালীর মতো থাকতে তার ইচ্ছে নেই। সে বেথুন স্কুলে হাই প্রাইজ পেয়েছে। যেদিন চাতকিনীর বিয়ে হয়, সেদিন তার স্বামী কিরণশশীর মুখে "ইংলিস্ স্পীচ্ শুনে থাওার ষ্টক্ হয়েছিল।" আর তার "ড্রেস দেখে কেয়ারী মনে করে, জগৎকে নথিং জ্ঞান করে ছিল।" বিয়ের আচার-ব্যবহার দেখে সে অবশ্য নাকি দুঃখ করেছিলো। তবে "ব্রাইড্‌গ্রুমকে শিক্ষিত নেটিভের ন্যায় সভ্য দেখে, সে দুঃখ ডিশ্চার্য করেছে।" চাতকিনী বলে, কিরণের স্বামী যদি কিরণকে নিতে আসে, তবে কি সে শ্বশুরবাড়ী যাবে না? শ্বশুর-বাড়ীর ঘর সে করবে না? কিরণশশী এর জবাবে বলে,—"হাজব্যাণ্ড যদি ইন্‌ভাইট করে পাঠায় তাহলে না হয় এক ঘণ্টার মতন বেড়িয়ে আসি।...গরুর মত শ্বশুরবাড়ী যেয়ে গোয়ালে বাউণ্ড হয়ে থাক্তে পারবো না।" সে আরও বলে, হাজব্যাণ্ড যদি এখানে আসে তবে এক আধ ঘণ্টা কথা কইতে পারে। সে মূর্খ অসভ্য—তবু তার কথার দু'একটা উত্তরও দিতে পারে। কথাবার্তা চল্‌ছে—এমন সময় দেখা যায় দূর থেকে চাতকিনীর স্বামী আস্‌ছে। স্বামীকে দেখে চাতকিনী অন্তঃপুরে পালিয়ে যায়।

চাতকিনীর স্বামী কৃষ্ণবাবু বৈঠকখানায় ঢুকে কিরণশশীকে দেখে বলে যে, তার চিঠি পেয়েই সে দেখা করতে এসেছে। কিরণ বলে,—"আমার হাজব্যাণ্ড মূর্খ অসভ্য—আপনার ওয়াইফও তেমনি। আপনার ওয়াইফ আপনার মত উপযুক্ত এজুকেটেড্ ম্যানের উপযুক্ত নয়। যদি পিতামাতারা স্ত্রীপুরুষের মনের মিল হওয়ার পর বিয়ে দিতেন, তাহলে ওয়াইফ্ হাজব্যাণ্ডে এমন কুরুচিপূর্ণ সম্পর্ক হতো না। আমার হাজব্যাণ্ড আমার মনের মতো না হওয়াতে বড় দুঃখিত আছি।" একথায় কৃষ্ণবাবু বলে, তার মতো হাইমাইণ্ডের সঙ্গে এমন মূর্খের পিওর লাভ হতে পারে না। কিরণ বলে,—"আমার মতে আপনার ওয়াইফের সঙ্গে, আমার হাজব্যাণ্ডের ম্যারেজ হওয়া উচিত ছিল। আর আপনার সহিত আমার অন্তরের ঐক্য আছে। সুতরাং আপনিই আমার হাজব্যাণ্ডের উপযুক্ত।" এমন সময় ভেতর থেকে চাকর কৃষ্ণবাবুকে ডাকতে আসে। কিরণ বলে,—তার ওয়াইফ্‌কে সে সভ্যতা শেখাবার জন্যে অনেক অনেক 'ট্রাই' করেছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। কৃষ্ণ ভেতরে যাবার আগে কিরণ তাকে বলে, সন্ধ্যার পর যেন কৃষ্ণ আসে, তার সঙ্গে নির্জনে অনেক কথা আছে। কৃষ্ণবাবু কিরণশশীর কথাবার্তা ও চাল-চলন দেখে মনে মনে ভাবে—কালকেই

সে তার স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যাবে। কেননা এই সংসর্গে থাকলে স্ত্রীর আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে।

হরিবাবুর অন্য জামাই শশীবাবু তার বৈঠকখানায় বসে বন্ধুকে বলে,—চিরকাল সে পশ্চিমে চাকরি করে। স্ত্রীকে সে সেখানে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করেছিলো। কিন্তু স্ত্রী যাবে না। বিয়ের পর একবার মাত্র সে তার স্ত্রীকে দেখেছে। তবে তার খুব গর্ব এই যে, সে পাশ করা স্ত্রী পেয়েছে। হারাণ শশীবাবুর ভাগ্যের প্রশংসা করে। সে বলে, হয়তো লজ্জার জন্যেই সে এখানে আসতে চাইছে না। —এমন সময় একজন আদালতের চিঠি নিয়ে আসে শশীবাবুর নামে। শশী চিঠি খুলে দেখে যে তার স্ত্রী আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের চিঠি দিয়েছে। চিঠি পড়ে শশী আশ্চর্য হয়ে যায়। "বাঙালীর মেয়ে এরকম ব্যবহার করে কখনও শুনি নাই।" যাহোক সে স্থির করে আগে সে শ্বশুরবাড়ী যাবে।

কিরণশশীর ঘরে কিরণশশী আর কৃষ্ণবাবু। কৃষ্ণবাবু কিরণকে গান গাইতে বলে। কিরণ গায়,—

"ও প্রাণ ডিয়ার। ভ্রাতা সব কাম হিয়ার।
লেক্‌চার দিব গার্ডেনে, হাত ধরে পুরুষ সনে,
বেড়াইব নির্জ্জনে, দিবানিশি হৃদয় চিয়ার।
হাজব্যাণ্ডে করে ডিস্‌মিস্ হয়েছি প্রাণ নিউ মিস্,
দিব আমি সুইট কিস্, ফ্রি-লভ্, নেভার ফিয়ার।"

গান গাওয়া শেষ করে কিরণ বলে, সে জানোয়ার হাজব্যাণ্ড চায় না। ঐজন্যেই সে ডাইভোর্সের অ্যাপ্লাই করেছে। একবার নাকি তার স্বামী এখানে এসে তাকে সাবধানে থাকতে বলেছিলো। কিন্তু কিরণ "প্রিজন্‌মেণ্ট" স্বীকার করে না। সে বলে,—সে স্বাধীন রমণী, "ইংলিস্ ক্যারেকটার" তার "মাইণ্ডে" রয়েছে। কৃষ্ণকে বিয়ে করাই অবশ্য তার উচিত ছিলো। কিন্তু কৃষ্ণ "ম্যারেড" —তার "ওয়াইফ" আছে। এইজন্যে সে সভার "একজন আন্‌ম্যারেড বিউটিফুল ইয়ং লাভার"-কে বিয়ে করবে। কৃষ্ণকে সে তাদের "স্ত্রীপ্রধান বিধায়িনী সভার" মেম্বর হবার জন্যে অনুরোধ করে। সেখানে নাকি অনেক আমোদ প্রমোদ আছে। "আইস ওয়াটার, লেমনড, গ্যালিশার্ট, ফিমেল্ ড্যান্সিং এণ্ড সিংইং সবই সেখানে আছে এবং ইচ্ছা হলে ফ্রি-লাভও পাবেন।" এমন সময় শশী

এখানে এলে কিরণ বলে যে, সে তার সঙ্গে "ডাইভোর্স" করেছে। শশী যদি বাড়ী থেকে এক্ষুনি বিদায় না হয়, তাহলে সে তার বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের জন্যে চার্জ আনবে। শশী বলে,—"তুমি যেরূপ পতি নিন্দা করলে, তোমার ও দেহ শেয়াল কুকুরেও ছোঁবে না।" এতে কিরণ রেগে উঠে শশীকে ঘুসি মারে। তারপর বেয়ারাকে ডেকে তাকে থানায় নিয়ে যেতে বলে। শশী আক্ষেপ করে,—"আমি শিক্ষিত স্ত্রী পেয়ে সুখী হব মনে করেছিলাম, তার ফল পেলাম। হে হিন্দু ভ্রাতাগণ! যদি মর্য্যাদা চাও, জাতি চাও, তবে যেন কেউ—পাস করা মাগ না চায়—সকলে আমার দুরবস্থা দেখ—হায়রে পাস করা মাগ।"

কিরণ বলে, কালকেই সে আবার "ম্যারেজ" করবে। তাদের সভায় কেনারাম নামে একজন "অতি বিউটিফুল ম্যান" আছে। লেখাপড়া একটু অল্প জানে এই বিয়েতে "ফাদার" যদি না রাজী হয় তো সে "উইলিংলি ম্যারেজ" করবে। সে এক্ষুনি কেনারামের বাসায় যাবে।

বিবাহ সভা। পুরোহিত, কৃষ্ণবাবু, হরিবাবু, পরামাণিক, কেনারাম, কিরণশশী এবং অন্যান্য স্ত্রীপুরুষরা উপস্থিত। পুরোহিত কেনারামকে বলে, হাজার টাকা না দিলে একাজে কেউ হাত দেবে না। কেনারাম বলে, বিয়ের শেষে সে পুরুৎ-কে খুসী করে বিদায় দেবে। মেয়েরা উলু দেয়। কিরণ বলে,—"এ কি ব্যাড্ রুল্! এ রকম আচারে আমি 'ম্যারেজ' করতে চাই না।" পরামাণিক কনেকে দেখে বলে—এ কনে নিয়ে কতজনকে কতবার দান করবে! পুরুৎ গোত্র ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলে হরিবাবু বলে, গোত্রে কাজ নেই, সে এম্নিতেই সারুক। সকলের হট্টগোলের মধ্যে কিরণ কেনারামের হাত ধরে বলে, আমাদের যখন মনের মিল হয়েছে, তখন এ নিয়মের দরকার নেই। বিবাহ হয়ে গেলো—জান্তে পেরে পুরুৎ তার পাওনা চাইলে হরিবাবু তাকে এক ছিলিম তামাক খেতে বলে।

এবার হরিশবাবুর সঙ্গে কিরণশশীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। বৈঠকখানায় কিরণ তাকে বলে, সে নেটিভ ফ্যামিলির মধ্যে থেকে নেটিভদের সাহস, চালাকী, আর বুদ্ধি সমস্ত জেনেছে। হিন্দু ডটার হলেও অনেক লেক্চার য়্যাটেণ্ড্ করে ও অনেক ইংলিস সভ্যের সঙ্গে ওয়াকিং ও ইটিং করে বিলাতী সভ্যতা শিখেছে। এখন সে সভ্য লেডি হয়েছে। "আমিও সর্ব্বদা বিলাতী অনুকরণে রত; নিজের যাতে সুখ হয়, সে দিকে মাইণ্ড দেব। নিজ সুখ ত্যাগ করে বোকা, অসভ্য বাঙ্গালীর সমাজে থাক্‌বো না।" হরিশ কিরণশশীর সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড

করে বলে যে, সে সুখী হয়েছে। তার সাধ শিগ্‌গির 'ফুল্‌ফিল্' হবে। কিরণ বলে, সে তার দ্বিতীয় পক্ষের বোকা স্বামীকে আন্‌তে পাঠিয়েছে। এখন এলে তাকে সে ডাইভোর্স করবে। এমন সময় কেনারাম এসে স্ত্রীর সাম্‌নে অপরিচিত পুরুষকে দেখে অবাক্ হয়। কিরণ তার সামনে মাথার কাপড় খুলে গল্প করছে। স্ত্রীর কাছে সে পুরুষটির পরিচয় এবং সম্পর্ক জানতে চায়। কিরণ কেনারামকে বলে যে, সে তাকে ডাইভোর্স করে "নিউ ম্যারেজ" করবে বলে ঠিক করেছে। কারণ কেনারাম ইংরেজী জানে না। গ্রাজুয়েট ভিন্ন তার উপযুক্ত স্বামী কি আর কেউ হতে পারে! কেনারাম বলে, কিরণ নিতান্ত যখন কথা শুন্‌বে না, কিছু আর করবার নেই। তবে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেবার ফল নারায়ণ দেবেন। কেনারাম চলে গেলে কিরণ তার মাকে বলে যে, সে আর একটা বিয়ে করবে ঠিক করেছে। এক পতির দোষ হলে আর একটি পতি গ্রহণ করা যায়—এটা নাকি ইংরেজদের 'ল'-তে আছে। কিরণ হরিশকে বলে, আজ সে একা গার্ডেনে যাবে। হরিশ যেন একাই সেখানে যায়।

সদর বাড়ী। বাউলরা গান গায়—

"অবাক হলাম দেখে শুনে।
হল মাগী মোড়ল, মিন্‌সে গড়োল
এই কলিতে কত জনে;
মাগী যায় কাচারীতে খাজনা দিতে
মিন্‌সে বসে হুঁকা টানে।"

বাউলরা চলে যায়। কিরণশশী আর হরিশ ঘরে ফেরে। কিরণ তার মাকে বলে, পাজী কেনারাম কোর্টে নালিশ করেছিলো। কিন্তু ইংলিশ 'ল' অনুসারে এরা ডিক্রী পেয়েছে। হরিশবাবুকে বিয়ে করে কিরণ নাকি সুখী হয়েছে। আজ থেকে হরিশবাবুকে তার মা জামাই হিসেবে গ্রহণ করুক। একথা শুনে ঝি মন্তব্য করে,—একটি মেয়ের যে এতোগুলো বিয়ে হয়, তা সে জন্মেও শোনে নি। কিরণ ঝিকে সাবধান করে দিয়ে বলে, আজ নেহাৎ তার বিয়ের দিন, তাই তাকে কিছু বল্‌ছে না। পরে এ ধরনের কথা শুন্‌লে তাকে সে ডিস্‌মিস্ করে দেবে। গিন্নি ঝিকে থামিয়ে বলে,—"ওর যা ইচ্ছে তাই বলুক, আর যা ইচ্ছে তাই করুক।"

কিরণশশী তার মাকে বলে, সে একটা "পুরুষের বহুবিবাহ নিবারণী" নামে একটা সভা স্থাপন করবে। "নেটিভ পুরুষরা" বহুবিবাহ করে, কিন্তু "হিন্দুবালারা"

একাধিক বিয়ে করতে পারে না। এই অন্যায় নিয়ম দূর করে "হিন্দুবালারা" যাতে ইচ্ছানুসারে যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে, তার আইন চালু করবে। স্ত্রীর মৃত্যু হলে বা স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করলে পুরুষরা আর বিয়ে করতে পারবে না। "চিরদিনই বৈধব্যজ্বালা সহ্য করিবেন।" তবে গোপনে কোনো কাজ করলে, সে বিষয়ে কোনো আপত্তি অবশ্য নেই। এই সভায় "সভাপত্নী" হবে কিরণশশী।

ঝি গিন্নিমাকে বলে যে সে হরিশকে চেনে। "ও একটা মেথরাণি না খিষ্টানী বিয়ে করেছিল, বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে।" লোকের প্রাইভেট কথা "ডিস্‌ক্লোজ" করছে বলে কিরণ ঝির নামে কেস্ করবার ভয় দেখায়। ঝি বলে, সে "পষ্ট কথার লোক।" তার চার পাঁচটা ছেলে, এখনো এরকম ব্যবহার! আজ একটা বিয়ে, কাল একটা বিগে—একথা কোথাও সে শোনে নি। "ছিঃ ছিঃ দোজবরে বরের তেজবরে মাগ। একটা মেয়ের তিনটি বিয়ে!"

"স্ত্রী প্রধান বিধায়িনী" সভা। প্রমদা, কিরণশশী, হরিশচন্দ্র, কালীচরণ, অন্যান্য মেম্বাররা এবং ভৃত্য উপস্থিত। কিরণ "সভাপত্নী" হয়ে হরিশকে বক্তৃতা দিতে বলে। হরিশ বলে,—এখনো বাঙালী পুরুষরা বহুবিবাহ করছে। কিন্তু হিন্দুবালাদের একাধিক বিবাহ করবার নিয়ম নেই। এখন সেই নিয়ম রোধ করে পুরুষদের দণ্ডের জন্য নতুন নিয়ম প্রচলন করতে হবে। হিন্দুবালারা পতির মৃত্যুর পর কিংবা পতি ত্যাগ করে ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু পুরুষ বিয়ে করতে পারবে না। তবে গোপনে যা খুসী করুক। প্রমদা উঠে বলে,—যাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হয় তারই নিয়ম করা হোক। কেন না, হরিশবাবুর নিয়মে স্ত্রীলোকদের অবিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করতে হবে। ফলে পুরুষের ঘাটতি হবে। আবার একজন সুন্দরী একজন সুন্দর বিবাহিত পুরুষকে হয়তো ভালবেসেছেন, কিন্তু আইন অনুযায়ী তিনি তাহলে তাঁকে বিয়ে করতে পারবেন না। সকলে হাততালি দিয়ে প্রমদার কথা সমর্থন করলো। প্রমদার বক্তব্য এই যে,—স্ত্রীলোকরা ইচ্ছে করলেই স্বামীত্যাগ করে যতোগুলো ইচ্ছে বিযে করতে পারবে আর পুরুষরা স্ত্রীর অনিচ্ছায় স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারবে না, এবং একটির বেশি বিয়ে করতে পারবে না। তাহলে পুরুষ-দমনও হয় এবং পুরুষজাতকে স্ত্রীলোকদের পদতলগত করে রাখাও হয়। চাকর বক্তৃতা শুনছিলো। সে জিজ্ঞাসা করে, একজন মেয়েমানুষের পাঁচসাতজন

"সোয়ামী" হলে কিভাবে ভাগ হবে! প্রমদা তাকে বুঝিয়ে বলে, সময় অনুসারে অথবা পালা করে ভাগ হবে। তারপর বাঙালী সাহেব কালীচরণ বলে,—"প্রমদা যাহা বলিল, টাহা সুটেবল এবং অনরেবল্। আমি এই কথায় ভেরী হ্যাপি হইলাম। ইহাতে ম্যান্ এণ্ড উওমান উভয়েরই মান বজায় থাকবে। ইয়ং ম্যানেরা রমণীগণের পডানত হয়ে আত্মাকে পবিত্র জ্ঞান ও পিটৃ পুরুষের মুখোজ্জ্বল করিয়া সুখী হইবে।" কালীচরণকে হরিশ বিলাতী সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে বলে। কালীচরণ বলে,—বোম্বে নামে একটি জায়গায় একবার তার খুব অর্থাভাব হয়। কোনোদিন খেতে পেতো, কোনোদিন পেতো না। সেখানে অনেক তল্লাস করে শেষে একটি 'সুন্দরী রমণীর' কাছে সে দুইরাত্রি ছিলো। তারপর সে ব্যারিষ্টারী পদ পায়। মেয়েটির হাতের তাবিজ নিয়ে সেই তাবিজ বিক্রী করে সে কলকাতায় ফিরে এসেছে। এতে তার মাত্র সতেরো দিন সময় লেগেছে। সে বিলেতের অনেক বিষয়ই জান্‌তে পেরেছে। কেন না অল্পদিনে অল্প কষ্টে সে ব্যারিষ্টার হয়েছে। কালীচরণ আরও বলে,—"আমি নেটিভদের ওয়েল উইশার। বিলাতের বিফ, ফাউল ইত্যাদি সুখাদ্য। হে দেশবাসী, যদি হেল্‌দি ও সুখী হইটে চাও, তবে বিফ্ ফাউল খাও, কোট্ পেণ্টুলেন পরিটান কর, মাঠায় হ্যাট্ ডাও।" সে বলে—স্ত্রী বোন্‌দের স্বাধীনতা দাও, তাদের দিনে রাত্রে অন্যপুরুষদের সঙ্গে বেড়াতে দাও, আট দশটা "ম্যারেজ" করতে দাও, বিয়ের আগে ইয়ংম্যানের সঙ্গে কোর্টশিপ্ করতে দাও, "এবং সাবটানে ঠাকিবে যেন প্রেগ্‌ন্যাণ্ট্ না হয়;" আর যদি হয় তবে তার যেন তক্ষুনি ডেলিভারী করানো হয়। সন্তানকে দুধ খাওয়ানো নিষেধ। "টাহা হইলে শীঘ্র ইয়ং লেডীর পড্ নষ্ট হইবে।"—কালীচরণের বক্তৃতা শুনে কিরণ ভাবে, আগে জান্‌লে সে কালীবাবুকেই বিয়ে করতো। কারণ কালীবাবু একজন বিলেত ফেরত সভ্য। "যা'হোক এক্ষণে কালীবাবুর সঙ্গেই ম্যারেজ করতে হবে।" বক্তৃতার পর সভা শেস হয়। তারপর চলে আমোদ প্রমোদ।

কিরণশশী কালীচরণকে একপাশে ডেকে এনে পরামর্শ করে তারপর হরিশ-বাবুর কাছে যায়। হরিশের কাছে কিরণ সভার সাব্‌স্ক্রিপ্‌সন চায়। হরিশ ভাবে, সে একশত টাকা সাব্‌স্ক্রিপ্‌সন কেমন করে দেবে। এখন সে কিরণকে বিয়ে করে কিরণের বাপের পয়সায় পেট চালাচ্ছে এবং ওখানেই আস্তানা নিয়েছে। কাল যে কি খাবে, তার সঙ্গতিও নেই। কিরণ হরিশকে বলে,

আজই তাকে একশত টাকা দিতে হবে। নচেৎ সে হাজব্যাণ্ডের উপযুক্ত নয়। কালীচরণ এতে সায় দিলে হরিশ তাকে চুপ করে থাক্‌তে বলে, তাহলে তার মাথা ভেঙে দেবে। এতে কিরণ চেঁচিয়ে বলে ওঠে,—"আমি তোমাকে চাই না, ইউ মান্‌কী—ভাগো হিঁয়াসে।" হরিশ কিরণকে কালীর কাছ থেকে হাত ধরে টান্‌তে গেলে কিরণ বেয়ারা পাহারাওয়ালাকে ডাকতে থাকে। কালীচরণ হরিশকে ঘুসি মারে। এমন সময পাহারাওয়ালা এসে হরিশকে বেঁধে ফেলে। কিরণ হরিশকে 'ব্যাটা" বলায় হরিশ বলে,—"আমার ওয়াইফ্ আমাকে ব্যাটা বল্‌ছিস্!"—এই বলে সে কিরণকে প্রহার করে। পাহারাওয়ালা হরিশকে নিয়ে যায়। কিরণশশী আর কালীচরণ বলে,—"যেমন কাজ তেমন ফল পাও গে।" হরিশের ওপর সহানুভূতি দেখিয়ে প্রমদা তাকে বলে,—যতো টাকা লাগে দিয়ে সে হরিশকে খালাস করে আনবে, তারপর তাকে বিয়ে করবে। তার সঙ্গে সে অন্যায় ব্যবহার করবে না। সে এণ্ট্রান্স পাস করেছে। হরিশ বলে,—আর তার 'পাস করা মাগে' কাজ নেই। কিরণ যখন দোজবরে হাজব্যাণ্ডকে ডাইভোর্স করে, তখন অনেকটাকা খরচ করে হরিশ তাকে বিয়ে করে। ওর হাতে সে সব টাকা কড়ি দিয়েছে। আবার ওর জন্যেই জেলে যেতে হচ্ছে। "পাস করা মাগের খুরে নমস্কার বাবা! আবার পাস করা মাগ!"

কিরণশশীর ভাগ্য বদলিয়েছে। তাই আজ ইডেন গার্ডেনে ছিন্ন গাউন আর ছিন্ন পোষাকে কিরণশশী আক্ষেপ করছে। এই গার্ডেনে একদিন সে কতো আনন্দ করেছে। বাপমায়ের খরচে বিবিয়ানা করেছে। তখন সে ভাবেনি যে শেষে কি হবে! শশীবাবুর কাছে থেকে ঘরসংসার পুত্রকন্যা নিয়ে সে সুখী হতো। কিন্তু তা না করে নিজে পাপে মজে সকলের সঙ্গে আনন্দ করেছে। শশীবাবু তার ধর্মপতি। তাকে সে কতো অপমান করেছে কষ্ট দিয়েছে। এমন কি সে ম্লেচ্ছধর্ম গ্রহণ করেছে।

অবশ্য এর মধ্যে কিরণ, শশীবাবু, হরিশবাবু এবং কেনারামবাবুকে চিঠি দিয়েছে আসবার জন্যে। তাদের সঙ্গে দেখা করে তারপর সে আত্মহত্যা করবে। এমন সময় কেনারাম আসে। কেনারামকে কিরণ প্রণাম করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেনারাম বলে,—"এখন তোর বিদ্বান্ হরিশ কোথা?"—এই বলে সে চলে যায়। তারপর আসে হরিশ। কিরণ তার কাছে সব দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চায়। হরিশ প্রথমে দেখে তাকে চিন্‌তে পারে না। কতো রোগা শীর্ণ চেহারা হয়ে গিয়েছে! কিরণ বলে,—সেই কালীচরণ তার কাছে

দু-বছর ছিলো। তারপর কিরণের অসুখ হলে কালীচরণ সমস্ত গয়না গাঁটি নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। তারপর হাসপাতালে থেকে আরাম হয়ে কিরণ এখন ভিক্ষা করে খায়। হরিশ বলে,—কিরণের কথা হরিশ কি সহজে ভুলবে! কিরণই তো তাকে জেল খাটিয়েছিলো। ভগবান তাকে আরো শাস্তি দেবেন।—এই বলে হরিশ চলে যায়।

তারপর শশী আসে। শশীও কিরণকে ঠিক চিন্‌তে পারে না। শশী বলে, —"তবে তোমাকে কি করে চিন্‌ব, এক তো স্ত্রীলোককে চিন্তে পারা ভার, তাতে আবার তুমি পাশ করা।" কিরণ বলে,—"তুমি আমাকে হত্যা কর, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমাকে বধ কর।" —এই কথা বলে সে শশীর হাতে ছুরি তুলে দেয়। শশী তা গ্রাহ্য না করে তার বাপমায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। তখন কিরণ বলে,—"আমার বিয়ে দেওয়াতে লোকে তাদের জাতে ঠেলে, তাতে তাঁরা কিরণকে পরিত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করেন। তাকে আর বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেন নি। শশী কিরণকে বলে, সে নিজে আবার বিয়ে করেছে, এখন তার চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। কিন্তু কিরণ সুখকে ইচ্ছে করে পায়ে ঠেলেছে—কপালের পাপে। কিরণের যদি বেশি যন্ত্রণাবোধ করে, নিজেই আত্মহত্যা করুক, শশী কেন পাপী হতে যাবে। কিরণ বলে,— "তুমি আমাকে বধ কর, এতে আমি সুখে মরতে পারবো।" শশী তখন মন্তব্য করে,—"তুই আমার আদরের স্ত্রী ছিলি। তুই এখন বেশ্যা হয়েছিস্! তুই এখন ভিখারিণী—ম্লেচ্ছ রমণী!—ওঃ! আমি বড় আশা করেছিলাম; আমার পাস করা মাগ!"

কামিনী (১৮৬৮ খৃঃ)—ক্ষেত্রমোহন ঘটক॥ পাশ্চাত্য শিক্ষা মদ্যপানের শিক্ষা—এই মত পুরুষের ক্ষেত্র প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রহসনকারের মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। স্ত্রীসমাজে মদ্যপান প্রসারের মূলে ছিলো নব্য সংস্কারকদের প্রশ্রয়। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রীসমাজকে এইসব অনাচারে নিয়োজিত করেছে। মদ্যপান সম্পর্কিত বিষয় হলেও শেষোক্ত সাংস্কৃতিক কারণে প্রহসনটিকে এখানেই উপস্থাপিত করা সুবিধাজনক।

কাহিনী।—কাশিমাবাদের বাঙ্গালীটোলার পোষ্টমাস্টার গোপালবাবু তাঁর ক্লার্ক কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে এদেশের স্ত্রীলোকদের অধঃপতন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। স্ত্রীলোকরা শুধু যে সিভিলাইজ্‌ড্ হয়ে অপাঠ্য বটতলার বইয়ের দিকে ঝুঁকেছে, তা নয়, তাদের মধ্যে মদ্যপানও বেড়ে গেছে। কৃষ্ণমোহন

বলে, দোষ তাদের নয়—পুরুষদেরই। "যত দোষ আমাদের। সভ্যবাবুরা আপনার স্ত্রীকে রসিকা করিবার জন্যে এটু লেখাপড়া শিখিয়ে থাকেন, আর তার সঙ্গে লেখাপড়ার অনুপান স্বরূপ একটু মদ খেতে দিয়ে থাকেন। এ সকল করেন কেন যাতে কায়ক্লেশে 'নেই নেই' বলে বিলিতি মেমেদের মত কিছু আদোল আসে।"

সংস্কার-মুক্ত উদয়রাম তাঁর কন্যাকে শিক্ষিত করেছেন এবং মদ্যপানের অভ্যাসও করিয়েছেন। মদ্যপানে গিন্নি আপত্তি করতে গেলে তিনি বলেন,—"আহাঃ, ভাল জিনিস ছেলেপুলেকে না দিয়ে কি খেতে আছে ?" তিনি বলেন, —"এক রত্তি মদ খেলেই যদি লোক বয়ে যেতো, তাহলে এই দেশশুদ্ধ লোকটাই বয়ে যেতো। এখন এই কেবল কতগুলো বাজে লোক জুটেছে, যারা পরের ভাল দেখ্‌তে পারে না, তারাই মদ খাওয়া নিয়ে ফ্যাঁসাৎ করে বেড়ায়। এই যে ইংরাজেরা সপরিবারে মদ খায়, তবে তারা একেবারে বয়ে গেছে ?"

এতোটা সংস্কার-মুক্তি সমাজ সহ্য অবশ্য করে নি। সবাই উদয়কে একঘরে করেছে। মেয়ের বিয়ে হয় না। অবশেষে কেবলরাম নামে এক অশিক্ষিত গ্রাম্য লোককে বুঝিয়ে-সুজিয়ে নামে মাত্র তার পতিত্ব স্বীকার করাতে হয়। কিন্তু কন্যা কামিনী তার বাপের বাড়ীতেই থাকে এবং মদ্যপানও তার যথারীতি বাড়তে থাকে। স্বামী সান্নিধ্যে বঞ্চিতা মদ্যপা কামিনী অতি সহজেই প্রতিবেশী মুন্সেফ মিহির ঘোষালের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করেছে এবং যথারীতি গর্ভবতীও হয়েছে।

কেবলরাম নিজের শিক্ষা সম্বন্ধে সঙ্কোচভাব পোষণ করলেও কুলীন বংশে তার গর্ব আছে। "বাবা এই কুলিনের ঘরের ব্যাটা হয়ে ইতো শিখেছি, এই ঢেক, শ্বশুরের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, কুলীনের ছেলে কে কোথায় লিখাপড়া করে থাকে ?" শ্বশুরের আর কোনো সন্তান নেই, তাই কেবলরাম নিজের থেকেই সম্পর্করক্ষার চেষ্টা করে। "বিষয়টা পাবার আশাতেই আছি, নৈলে তোর বাড়ীতে প্রস্তাব কর্‌্যা দিয়েঁ চলে যেতেম।" অবশ্য এটা তার স্বগতোক্তি।

কেবলরাম এ কয়দিন শ্বশুরবাড়ী এসেছে, কিন্তু কামিনী তার খবর নেয় নি। কেবলরামকে দেখেও সে প্রকাশবাবুর বাড়ীতে মুজরা দেখবার জন্যে যেতে প্রস্তুত হয়। গিন্নি বলেন, স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কামিনী এতে আপত্তি জানায়। উদয়রামও কামিনীকে সমর্থন করেন। "ওটা কি জামাইয়ের মধ্যে জামাই, ওটা তো পশু !" বরং কেবলকে বাড়ী পাহারা দেবার

জন্যে রাখবার ব্যবস্থা করতে চান। উদয় কন্যাকে সান্ত্বনা দেন, "কুচ পরওয়া নেই বেটী, কলকাতায় চিটি লিখে, বিধবাবিবাহের মত এনে, ফের তোর বে দেবো, আমার কামিনী মনোদুঃখ পাবে, কখনই হবে না।"

গিন্নির কিন্তু এতোটা ভালো লাগে না। একসময় কেবলরাম আর কামিনীকে একটা ঘরে একত্র রেখে গিন্নি বাইরে থেকে দরজা এঁটে দেন। কিছুক্ষণ পরে কেবলরামের আর্তনাদ শুনে সবাই ছুটে আসেন। দরজা খোলা হয়। কেবলরামের গাল রক্তাক্ত। কেবল নাকি কামিনীকে আদর করতে গেলে কামিনী তার চুল টেনে গাল কামড়িয়ে দেয়। কামিনী বলে,—"ভাতার হও এসে। হাত ধরে টানো, অসিকতা করো, মুখপোড়া বেশ হয়েচে, বেশ করেচি।" কামিনী তখনই গট্‌গট্‌ করে প্রকাশবাবুর বাড়ী একাই চলে যায়। উদয় অবশ্য তাকে ধরে কয়ে নিয়ে আসেন।

প্রকাশবাবুর অন্তঃপুরের মেয়েদের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মেয়েদের মধ্যে অনাচার ও ব্যভিচার ক্রমেই বাড়চে। বরং পূর্বদেশীয় মেয়েরা অনেকটা সভ্য। মেয়েরা যতোই পুরুষের দোষ দিক, তাদেরই দোষ বেশি।

"হয়ে কুল নারী, উঁকি ঝুঁকি মারি, আধ চক্ষে ঠারি বিলাসে যারা।

পুরুষেরে দোষী, সেই পাপীয়সী, নয়নেতে শোধি, করে গো সারা।"

বিশেষ করে মেয়ে মহলে সকলেই মিহিরবাবু বল্‌তে অজ্ঞান। দাসীর ভাষায়, "গোপনে মিহিরবাবুকে পেলে অনেকেই সক্ করে বিধবা হয়।"

প্রকাশবাবুর শয়নাগারে প্রকাশের স্ত্রী মোক্ষদা ছাড়াও মিহিরের স্ত্রী সারদা এবং কামিনী আসে। যথারীতি মদ্যপান চলে। প্রকাশবাবু সারদার সঙ্গে একটু বেশি ঢলাঢলি করেন। কামিনী মদোন্মত্তা হয়ে নাচতে আরম্ভ করে। প্রকাশবাবু ভাবেন, যে কামিনীকে এ পর্যন্ত কোন ব্যাটা তপস্যা করে পায় নি, আজ তাকে নিজের শোবার ঘরে নৃত্যরতাবস্থায় দেখ্‌তে পাচ্ছেন। মাথায় ঘোমটা নেই অঙ্গভঙ্গী অশ্লীল। প্রকাশবাবু নিজেই লজ্জা পেয়ে যান। বাইরে বাইজীদের নাচগান হচ্ছে। কামিনী বলে,—"আমরা যাবো মুজ্‌রা শুন্তে, আমাদের মুজরা শোনে কে?"

বাইরের আসরের মধ্যে হঠাৎ মাতাল অবস্থায় কামিনী ঢুকে পড়ে। কামিনীকে দেখে ভয় পেয়ে বাইজী এবং তার সারেঙ্গী তবলচী পালিয়ে যায়। আলো উল্টে পড়ে আসর অন্ধকার হয়ে যায়,—একটা হুলুস্থূল পড়ে যায়।

অনেকরাত্রে পাল্কী করে কামিনী এলো। জীবনের ওপর তার ধিক্কার এসেছে। সে আজ সকলের সাম্‌নে নিজেকে অপদস্থ করেছে। তারপর সেই-দিনেই সে আত্মহত্যা করলো। একটা চিঠিতে জানিয়ে গেলো, ছোটোবেলা থেকে পোর্ট ওয়াইন্ খাইয়ে খাইয়ে বাবা তার সর্বনাশ করে গেছেন।

খণ্ড প্রলয় (কলিকাতা—১৮৭৮ খৃঃ)—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ॥ স্ত্রী-সমাজে অল্পবিদ্যা শিক্ষা আংশিক সমাজ বিপর্যয়ের সূত্রপাত করেছে। বিদ্যা-শিক্ষার ব্যাপক চর্চা সমাজকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হবে—প্রহসনকার স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে এই বাদের সংগঠক। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রহসনকারের রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত চরিত্রের মুখের ভাষাতেই গতিবিধির ইঙ্গিত আছে।—

"আমরা বড মজা পেয়েছি।
ইম্যান্‌সিপেশনের জোরে স্বাধীন হয়েছি ॥
গিয়ে সবে এগ্‌জিবিশনে,—
হর্ বেরঙের মালাম। মোরা এনেছি কিনে,
হো হো হো, সেই সনে জেনানা সিষ্টেম উঠিয়ে দিয়েছি ॥
বিকালে ফিটন্ চডে, হাওয়া খাই গড়ের মোডে।
আঁখি ঠেরে অঙ্গ নেড়ে, কত মাথা ঘুরিয়েছি ॥"

কাহিনী :— কলকাতার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি রামশঙ্কর ঘোষ তাঁর মেয়েকে কলেজ পড়িয়ে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। এখন সেই মেয়ে তরুবালা তার ইয়ার বান্ধবীদের নিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে আর অনাচার করে বেড়ায়। ইয়ারদের মধ্যে আছে শৈলবালা, শরৎকুমারী এবং ভাগ্যধরী। কলেজ স্কোয়ারের সামনে এসে তারা গান গায়,—

"আমরা বড মজা পেয়েছি।
ইম্যান্‌সিপেশনের জোরে স্বাধীন হয়েছি।"

এরা দাবী করে,—"জেনানা সিষ্টেম" এরা উঠিয়ে দিয়েছে। রোজ বিকেলে এরা ফিটন চডে গড়ের মাঠে হাওয়া খায়। এরা পুরুষদের "Pet animal" বলে মনে করে। এদের বক্তৃতা হয় লিবার্টি হলে। সব মেয়ের মধ্যে একটা "Unity" আনবার প্রয়োজন "প্রোপোজ" করেছে মাতঙ্গিনী। পুরুষদের মধ্যে বড়ো বেশি "Brotherly feeling"—এদিকে তো স্ত্রীদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র বনিবনা নেই। এটা অসহ্য লাগে তাদের। তাদের দলের ভাগ্যধরী চৌধুরী একজন

"এন্‌লাইটেণ্ড" লেডি, ঢাকা লিটারারী ম্যাগাজিনের এডিটার। যাহোক, এরা সকলে প্রস্তাব করে, এন্‌লাইটেণ্ড ফিমেলদের জন্যে একটা স্বতন্ত্র পার্ক দরকার, এবং একটা সুইমিং বাথেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

মেয়ের গতিবিধি দেখে রামশঙ্কর চিন্তায় পড়েন। আজকাল হলো কি! "মাগীদের বাড়াবাড়ি দেখে পেটের ভেতর যে হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে— বুঝলেন কিনা?" তর্কালঙ্কার বলে,—"আপনারাই সমাজের মাথা খেয়েছেন। উহাদের যেখানে সেখানে বেড়াতে লইয়া গিয়াছেন। যদি আপনাদের সমাজ বন্ধন থাকত তবে 'হল কি' বলে আপসোস করতে হতো না" তর্কালঙ্কারের মেয়ে মাতঙ্গিনীও স্বাধীনা। তর্কালঙ্কারেরও ক্ষোভ কম ছিলো না। রামশঙ্করের এক পারিষদ বলে,—সত্যিই পূর্বে মেয়েরা ভোর বেলায় সাজি নিয়ে ফুল তুলতে যেতো, এখন আর তেমন নেই। তর্কালঙ্কারও বলে চলেন,—আগে মেয়েরা ব্রত পার্বণ করতো, এখন তা উঠে গেছে। "এখন কৃতীরা কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে বামনদের মান রাখে মোণ্ডা চাল দিয়া, আর ইয়াররা মিলে পোলাও কালিয়া খায়।" রামশঙ্কররাও কম যান না—এই বলে ক্ষুব্ধ মনে তিনি চলে যান। যাবার আগে রামশঙ্কর এর একটা ব্যবস্থার জন্যে অনুরোধ জানালে তর্কালঙ্কার মেজাজ হারিয়ে বলে ওঠেন,—"গোল্লায় যাও, এই তোমাদের বন্দোবস্ত!"

লিবার্টি হলে আজেবাজে লোকরা যাতায়াত করে—যদিও দরজায় দুজন দারোয়ান পাহারা থাকে। কে. রায়ও ভেতরে ঢোকেন। কে. রায়ের প্রসঙ্গ টেনে এক দারোয়ান মন্তব্য করে—আজকাল এই সব "বেইমান লোক" খারাপ করেছে। এদের "জাত কা ঠিকানা নেহি, ধরম কো ঠিকানা নেহি, ইমান কো বি ঠিকানা নেহি।" ইংরেজরা এদের পছন্দ করে না, আর হিন্দুরা "ঘরসে নিকাল দে দেতে। এদের ইজ্জত নেই।" দারোয়ানরা মন্তব্য করতে করতে শোনে ভেতরে অভ্যর্থনার ধ্বনি।

হলের মধ্যে হুলুস্থূল কাণ্ড। তরুবালা, মাতঙ্গিনী, শৈলবালা, ভাগ্যধরী, শরৎকুমারী ইত্যাদি নিজের নিজের অভিরুচি মতো মদ্যপান করছে। এমন সময় কে.রায় এসে ভাগ্যধরীকে জিজ্ঞেস করে, তাদের বিয়ের কতদূর হলো! ভাগ্যধরী জবাব দেয়, বি.ব্যানার্জীর সঙ্গে কোর্টশিপ্‌ করতে গিয়ে দেখ্‌লো তাদের প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌ ভিন্ন, তাই বিয়ে হলো না। বিয়ে তাঁর কপালে নেই। মেয়েরা মত্ত অবস্থায় গান গায়! মাতঙ্গিনী বলে,—সে বিলেতে গিয়ে "সিভিল" হবে এবং "মিন্‌সেদের" টেক্কা দেবে। শৈল ডাক্তারী পাস করতে

চায়। শরৎকুমারী হতে চায় ভল্যান্টিয়ার। তরুবালা নাকি হবে বৈজ্ঞানিক। আর ভাগ্যধরী বলে,—"আমি বাই বারে যাইয়া, বস্‌বো এবার বাহার দিয়া।" —এই ভাবে মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষা স্বাধীনতা পুরোদমে চল্‌তে থাকে।

মেয়ে তরুবালার অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে রামশঙ্কর তার স্ত্রী পদ্মাবতীকে বলে যে, পদ্মাবতীর প্রশ্রয়েই মেয়ে এমন হয়েছে! কে এক বিলেত ফেরৎ ছোক্‌রা নীচ থেকে শিস্ দিলেই তরু চলে যায়। পদ্মা বলে,—"সে কি! সে তো ভালো মেয়ে!" যা হোক পদ্মাবতী তার স্বামীকে বলে, মেয়েটার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে। যে করেই হোক। এমন সময় তরু এসে মন্তব্য করে, বুড়োবুড়ীতে এতো চেঁচামেচি কেন! সারাদিন "লেবর"-এর পর বাড়ীতে তার একটু "রেষ্ট"-এর প্রয়োজন। রামনিধি তর্কালঙ্কারও এইসময়ে এসে পড়েন। তিনি বাড়ীতে তাঁর মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে এখানে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন, তাঁর মেয়ে মাতঙ্গিনী আছে কিনা! রামনিধি তর্কালঙ্কার জাত হারাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত। তিনি অনুযোগ করেন, রামশঙ্করের মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই তাঁর মেয়ের ঐ অবস্থা। রামশঙ্করের কিছুই বলবার নেই। পরামর্শ করে একটা কিছু বিহিত করবার জন্যে তর্কালঙ্কারের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

ওদিকে ধর্মতলার মোড়ে তরুবালা তার ইয়ার শরৎ, শৈল, ভাগ্যধরী আর মাতঙ্গিনীকে নিয়ে গান গাইতে গাইতে পথ চলে।—

"আমরা বেরিয়েছি সব হাওয়া খেতে,
চুরুট মুখে ছড়ি হাতে।
বেড়াব, হোটেলে যাব, সুপার খাব,
ফিরব আবার রাতে রাতে॥
মিন্‌সেগুলো অবাক্ হয়ে মুখের পানে দেখ্‌ছে চেয়ে,
আমর্ মর্ পড়লো বুঝি পথে।"

এমন সময় এক বেয়ারা এসে ভাগ্যধরীকে একটা চিঠি দেয়। ভাগ্যধরী বন্ধুদের জানায়, সে চিকাগোতে যাচ্ছে। সঙ্গে মিষ্টার রায়ও যাবেন। ভাগ্যধরী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই সময়ে নিমচাঁদ নামে এক ভদ্রলোক ভাগ্যধরীকে সম্বোধন করে বলে,—"আপনারা হিন্দুমহিলা। শুনেছি আশুতোষ দত্তের ছেলের সঙ্গে আপনার বিবাহ হবে। কেমন করে যাবেন!" জবাব

দেয় তরুবালা। সে বলে,—"আমি জান্‌লাম না, দেখ্‌লাম না, তাকে "পারসন্যালি একজামিন" করলাম না, বিবাহ করলেই হলো! বাবার কোন 'রাইট্' নেই। নিমচাঁদ বলে,—"কন্যার বিবাহ দেবে তাতে আপত্তি কি!" তরুবালা সে-কথায় কান দেয় না। নিমচাঁদকে সে গালাগালি দেয়। নিমচাঁদ মন্তব্য করে,—"যাও মজা টের পাবে,—বিদ্যের ধ্বজা ওড়াও গে।"

গঙ্গায় জাহাজের ওপর চড়ে বসেছে তরুবালা, মাতঙ্গিনী, শৈলবালা ভাগ্যধরী, শরৎকুমারী আর কে.রায়। মেয়েরা গান গায়,—

"আয় আয় আয়, দেখ্‌রে হেথায়
স্বাধীন পবন বইছে এখন।
স্বাধীন লতা, স্বাধীন পাতা,
স্বাধীন প্রাণে দুল্‌ছে কেমন॥"

এদিকে তর্কালঙ্কাররা উপায়ান্তর না দেখে মেয়েকে ঠেকাতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশ কনষ্টেবল সঙ্গে করে সার্জেন্ট গঙ্গার ধারে এলে তর্কালঙ্কার সার্জেন্টকে তার মেয়ে দেখিয়ে দেয়। সার্জেন্ট তর্কালঙ্কারকে বলে, ঐ ব্যক্তিটি ভদ্রলোক এবং মেয়েও সাবালগ। অতএব মেয়েকে আটকানো যেতে পারে না। বরং পুলিশকে হয়রান করবার জন্যে তর্কালঙ্কারেরই সাজা হবে। তর্কালঙ্কার মন্তব্য করেন,—"এ যে উল্টো চাপ, দেশ যে উচ্ছন্নে গেল!" কে. রায় জবাব দেয়,—"আমার নামে নালিশ করে'ছিলেন, কি হলো? আপনার মেয়ে কচি নয় যে ভুলিয়ে এনেছি।" তরুবালাও তার বাবাকে দেখে বলে,—"আমরা বিদেশী শিক্ষায় পাকা হয়ে এলে তারপর পাকা-দেখা দেখিও।" তর্কালঙ্কার এবার মাথায় হাত দিয়ে বসেন। মন্তব্য করেন,—"এ হল কি! যাবার সময়ই 'খণ্ডপ্রলয়' আবার এসে 'মহাপ্রলয়' না করলে বাঁচি।" ওদিকে জাহাজে তারস্বরে মেয়েদের গান চল্‌তে থাকে।—

"কলেজে নলেজ পেয়ে, ভয়েজে যাচ্ছি বেয়ে,
মগজে স্বাধীন লগেজ, কারু মানা মান্‌বে না।
অন্দর সদর করি, আঁধারে আলোক ধরি,
হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে, (বলি) জাত বাছলে চল্‌বে না।

গান চল্‌তে চল্‌তে জাহাজও চল্‌তে থাকে।

মেয়ে মনষ্টার মিটিং প্রহসন (১৮৭৫ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত ॥ (গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস)। স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক উন্নততর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। টাউনহলে গীত, একটি গানে আছে,—

"কলিতে ভাই মাগের এখন বড় মান,
পিতামাতা এসে তাঁরা কেঁদে কেঁদে ফিরে যান।
আবার গিন্নির কুটুম এলে পরে
তিনি চেয়ারে বসে খানা খান।"

বিদ্রূপায়িত চরিত্র উন্নতবাবুর বক্তব্য।—

"হে পামর! হে নারী স্বাধীনতা বিদ্বেষি
হে বাক্ পটুতা বিশিষ্ট, দেশ হিতৈষী॥
আইস সবে মিলিয়ে কর এই পণ।
নারীগণে করিব স্বাধীনতা প্রদান॥"

কাহিনীতে উন্নতবাবুর হাস্যকর পরিণতি প্রহসনকারের এই বক্তব্য সম্পর্কিত মতবাদ এবং দৃষ্টিকোণের পরিচয় দেয়।

কাহিনী।—সোমের বৈঠকখানায় সোম, মীরার, পেট্রিয়ট্, অমৃত ও এডুকেশন—এঁরা সবাই মিলে তাস নিয়ে ডান্স্ ওয়াইজ খেলেন। এর মধ্যে উন্নতবাবু এসে উপস্থিত হন। তিনি এসে অনুযোগ করে বলেন,—"তোমরাই আবার গৌরব কর আমরা বঙ্গভূমির জজ। স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়টা নিয়ে এতো আন্দোলন করছি, কেবল তোমাদের ঔদাস্যেই কিছু করতে পারছি না।" সোম বলেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে যখন গোলমাল চল্‌বে, তখনি একটা সভা করে ও বিষয়টার শেষ ফল দেখ্‌লে হয়। সকলে এতে সম্মতি প্রকাশ করে। সোম বলেন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশের ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করা যাক্। অমৃত বলেন, তাতে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হবে। সবাই শেষে গোল বাধাবে, অনেকে উপস্থিত হবে না। তবে—"আমার বিবেচনায় যাঁহারা 'পবলিক স্পিরিটেড্' বলিয়া পরিগণিত, প্রত্যেক বিভাগের কেবলমাত্র তাহাদিগের দশটিকে নিমন্ত্রণ করিলেই যথেষ্ট হইবে।" অমৃত এদের নামের তালিকা রচনায় মন দেয়। তালিকা শেষ হলে সবাই আশা করে,—"এই সকল মহোদয়দিগের আগমন হইলেই স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়টীর একটা মীমাংসা হবে।"

এঁদের আন্দোলন পল্লী অঞ্চলে পল্লবিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভবানন্দ ঠাকুর তাঁর স্ত্রী সুশীলাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলেন,—"বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী যে বড় ধুম দেখে এলেম। তাদের মেয়েদের নাকি কল্‌কাতার 'মেয়ে মন রাখা' সভায় স্বয়ম্বরা হতে পাঠাবে। গিজেটে খবর এয়েছে, যে-মেয়ে স্বয়ম্বরা হবার জন্যে যাবে, সে এক বাক্‌স গয়না আর মন-মতন বর পাবে। তাই আমি বলি, আমাদের কামিনীকে পাঠিয়ে দিলে কি হয় না? এক বাক্স গয়না পেলে মেয়েদের হয়ে তুইও দুচার খান পরতে পারবি।" ভবানন্দের দুই মেয়ে কামিনী আর যামিনী। কামিনীর বয়স দশ, যামিনীর আট। সুশীলা আপত্তি করে,—"আমার পোড়া কপাল তোমার গয়নার লোভে কি মেয়েকে খিষ্টানের হাতে সঁপে দিব।" চটে গিয়ে ভবানন্দ দুটি মেয়েকে ধরেই টানাটানি করেন। মেয়েরা ভয়ে কেঁদে ওঠে। শেষে কামিনীকে জোর করে নিয়ে গিয়ে তিনি উধাও হন। সুশীলা কান্নাকাটি করে।

চারুর বিধবা দিদি কলকাতায় বিয়ের জন্যে যাবে। চারু গদাধর গুরুর পাঠশালায় পড়ে। সে ছুটি চাইলে, অন্য ছাত্ররা বলে ওঠে,—"গুরুজি, চারুর দিদি ভাতার করতে যাবেন।" গুরুমশায় অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—"ওকিরে তোর বুন যে রাঁড় হয়েছে।" চারু তখন বলে,—"বিধবার বিয়ে হতে পারে বলে গিজেটে আইন ছাপিয়ে দিয়েছে।" গুরুমশায় চারুকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে এবং গালাগালি দিয়ে দূর করে দেন। "রাজ্যিতে যা নাই, শাস্তরে যা নাই, যা করলে জাত যাবে, তাই তোরা করছিস্—দূরহ ব্যাটা তুরুক! আমার পাঠশালায় আর কোনদিন আস্‌বিত মেরে হাড় গুঁড়ো করবো।"

কুলীনকন্যাদের মধ্যেও সাড়া পড়ে যায়। জলের ঘাটে বামা সারদাকে বলে, কলকাতায় "মেয়ে মতন সভায়" অনেকে স্বয়ম্বরা হবার জন্যে যাচ্ছে, সেও তাদের সঙ্গে যাবে। কুমারীদের সঙ্গে বিধবারা কেন যাচ্ছে, সারদা সেটা জিজ্ঞেস করলে বামা বলে,—"ওলো, বুড়ো হলে কি সখও বুড়ো হয়? রক্ত-মাংসের শরীর তাতে আবার ওরা রাঁড় মেয়ে; দুধেভাতে খেয়ে যৌবনটাকে যেন এঁটে সেঁটে রেখেছে।" দাড়িম্ব ইত্যাদি কয়েকজন বিধবা ঘাটে এসেছে। তারাও কলকাতায় যাবে। সারদা তাদের ঠাট্টা করে বলে,—"রাঁড় হয়েছিস্, তাতে আবার দাঁতে মিশি দিস্, সীতে কাটিস্, টিপ্ কাটিস্, তোদের কথা আবার কার কাছে বল্‌বের!" দাড়িম্ব উত্তর দেয়,—"অলো, আমরা, দাঁতে মিশি দি, তাই কি লকবের কথা। তুই যে ভাতার থাকৃতে বাপ্ দাদার নামে

থুথু দিলি, তোর জ্বালায় যে কেউ ঘাটে যেতে পারে না। তুই যে রাস্তার লোকের কাপড় ধরে টেনে ঘরে নিস্, তাই কি কেউ জানে না?" ঝগড়া চরমে বাধবার উপক্রম দেখে বামা ওদের মধ্যে মিট্‌মাট্ করে দেয়।

কলকাতায় টাউনহলে মিটিং হবে। ব্যাণ্ড্ বাজনা বাজে। তোপের আওয়াজ হয়। একে একে "পব্‌লিক স্পিরিটেড" ভদ্রলোকরা আসেন। বিধবারাও যথারীতি একজন করে আসে। 'পব্‌লিক স্পিরিটেড' ভদ্রলোকরা প্রত্যেকে এক একজন বিধবাকে তাদের হাত ধরে নিজেদের ডান পাশের আসনে সযত্নে বসালেন। তারপর কুলীনকন্যারাও এলেন। দ্বিতীয় দলভুক্ত 'পব্‌লিক স্পিরিটেড্' ভদ্রলোকরা তাদেরও আদর করে হাত ধরে নিজেদের ডানপাশের আসনে বসালেন। উন্নতবাবু সস্ত্রীক অর্থাৎ সৌদামিনীর হাত ধরে আসেন। মীরার, সোম, পেট্রিয়ট, অমৃত, এডুকেশন—এঁরাও আসেন। সৌদামিনীর হাত ধরে উন্নতবাবু নাচেন—"এমন দিন আর কবে হবে, ঘোমটা টানা ঘুচে যাবে!"—বলে। পেট্রিয়ট স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে বক্তৃতা করেন। বলেন,—স্ত্রীপুরুষ একত্রে স্বদেশের উন্নতির জন্য চিন্তা না করলে স্বদেশ উন্নতি সুদূর পরাহত। উন্নতবাবুও পঞ্চকন্যার স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত দিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার যৌক্তিকতা নিয়ে বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতা পুরোদমে চল্‌ছে, এমন সময় জেম্‌স্, ফ্রেডেরিক, পীটার ইত্যাদি মিলিটারীর দলের কয়েকজন গোরা হঠাৎ ওদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতার চেষ্টা দেখে তারা সন্তুষ্ট হয়। ফ্রেডেরিক্ বলে,—"Hindu ladies are sure to be the object of curiosity." পীটার বলে,—"Curiosity nicety and charity too." উন্নতবাবু এতে offence নিয়ে প্রতিবাদ করলেন এবং তাদের চলে যেতে বল্‌লেন। জেম্‌স্ তাতে কর্ণপাত না করে উন্নতবাবুর স্ত্রী সৌদামিনীর হাত ধরে ড্যান্স করবার চেষ্টা করে এবং সৌদামিনীকে চুমো খায়। উন্নতবাবু বাধা দিতে গেলে জেম্‌স্ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চার পাঁচ হাত দূরে ছিট্‌কে ফেলে দেয়। জেম্‌স্ তরোয়াল খোলে। তখন স্বয়ম্বরার বরকনেরা রণে ভঙ্গ দেয়। পত্রিকাওয়ালারাও একে একে সরে পড়েন। এমন কি উন্নতবাবুও স্বয়ং নিজের স্ত্রীকে ফেলে রেখে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করলেন।

এসব দেখে সৌদামিনীর ওপর সাহেবদের দয়া হয় তারা সহানুভূতি জানিয়ে বলে,—

"O! Pretty poor lady! we good-bye
Pray you—go, go forward—
Wait upon, and guard your husband,
A treacherous, bloody coward."

আচাভুয়ার বোম্বাচাক (১৮৮০ খৃঃ)—"নাদাপেটা হাঁদারাম" (বিহারী-লাল চট্টোপাধ্যায়) ॥ মলাটে কবিতা আকারে লেখকের মন্তব্য পাওয়া যায়।—

"বেয়াড়া বিদেশী চালে বেআক্কেলে নর।
বেল্লিক আচারে লজ্জা পায় নিরন্তর ॥
শ্রেষ্ঠ নর বুদ্ধি দোষে বানর সন্তান।
লোকে পরিচয় দিয়ে বাড়ায় সম্মান ॥"

প্রহসন শেষে শ্রীহরির মন্তব্য লেখকের বক্তব্যকেই প্রকাশ করে।—

"দূর শালা বাঙ্গাল পোলা! তোরে দেখে লাগে তাক্।
যাচ্ছিল প্রাণ যার জ্বালাতে তারেই আবার ডাক্।
নব্য চালে, সভ্য ছেলে, করেন মুখে জাঁক!
কালের গুণে মন-আগুনে আমি পুড়ে হলেম খাক্।
মুলুক জুড়ে কলির চেলা, বেড়ায় লাকে লাক্।
সাজে কুলাঙ্গনা—বারাঙ্গনা, তাই দেখে অবাক্।
ধর্ম্মের ঢোলে রগড় বাজে তাক্ তাক্ সিন্ তাক্।
ঠেকে দেখে আচাভুয়ার হল বোম্বাচাক্।"

কাহিনী।—পূর্ববঙ্গীয় ভক্তরাম রায়চৌধুরী কাগ্‌মারীর জমিদার। হাটখোলায় তাঁরা গদী। ব্যবসার সূত্রেই কলকাতায় থাকেন। বংশ কৌলীন্য তাঁর নেই। শোনা যায়, পূর্বপুরুষ কুয়োর ঘটি তোলার কাজ করে গেছেন। এইভাবে কিছু পয়সা জমিয়ে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। "বছর দুই চার বাদেই বেলেঘাটায় এক মস্ত খোলার ঘর ভাড়া করে, চার পাঁচটা রূপা বাঁধান হুঁকা, দুই তিনটে কাঁসার গেলাস এক তক্তপোষ, তাতে নতুন এক সতরঞ্চ বিছান,—দুই তিনটা তাকিয়া, নূতন একটা জালা আর একটা অবিদ্যা রেখে দিলেন…।" ভক্তরাম বর্তমানে পাট লবণ ইত্যাদির পাইকারী ব্যবসা করেন। তাছাড়া তেজারতি কারবারও তিনি করে থাকেন।

ভক্তরাম রক্ষণশীল এবং ধর্মধ্বজ। দোষের মধ্যে একটু নারীদোষ তাঁর

আছে। খেমটা নাচের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রবল। খেম্‌টাওয়ালীর ব্যাপারে তাঁর চিত্তবৈক্লব্য ঘটবার বিষয় তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধির মতোই সত্য।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রতিকান্ত নব্য যুবক। সভ্যতার দোষগুলো তার মধ্যে সবকয়টিই পুরোপুরি বিদ্যমান্। ভক্তরামের ভাষায়,—"এ রতিকান্ত্যা ছোরা এহেকবারে মজাইবার লাগ্‌ছে। মাগুরে বিবি সাজাইছে, রাস্তায় ঘাটে সাতে করে নিযে বেড়ায়। দশজনা কুটুম্বি মেলে তা'রে একঘরে করেছে ; সে ছোরাডা কলকেতা পলায় আসেছে।" এখন কলকাতায় তার অবাধ লীলা।

পাইকপাড়ার বাগানবাড়ীর এক মদ্যপান সভায় রতিকান্তবাবু সম্পর্কে মহেশ বলেছে,—"A champion of female emancipation." রতিকান্ত স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের খুব বড় উৎসাহদাতা ; কিন্তু তার জন্যে পুরুষের যেটুকু চরিত্রবল থাকা দরকার, তা তার মধ্যে আদৌ নেই। ইতিমধ্যে রতিকান্ত ট্রেনে এ ব্যাপারে আক্কেল লাভ করেছে বটে, কিন্তু তা সাময়িকভাবে মাত্র। ঘটনাটি এই,—

রতিকান্ত একবার সস্ত্রীক ট্রেনে করে কলকাতায় আস্‌ছিলো। তাদের কামরায় শুধু একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দুজন মাতাল গোরা কামরায় ওঠে। তারা ক্রমে রতিকান্তের স্ত্রীর কাছাকাছি এগিয়ে বসে তাকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলে। ওদিকে রতিকান্ত তার স্ত্রীর আঁচলের পেছনে ভয়ে জড়সড়। মাতাল দুটোর ব্যবহার ক্রমে অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো। ইংরেজ ভদ্রলোক এতোক্ষণ তাদের সবকিছু লক্ষ্য করছিলেন। অবশেষে বাড়াবাড়ি দেখে তিনি ঘুসি মেরে তাদের ট্রেন থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর ভীতত্রস্ত রতিকান্তবাবুকে কানমলা দিয়ে সাহেব বল্‌লেন,—"কাপুরুষ! যদি আপনার স্ত্রীকে রক্ষা কর্ত্তে না পারবি, তবে লেজে বেঁধে বাইরে বেরুস কেন? তোদের যেমন দেশ, আচার ব্যবহারও সেরকম। বানরের ন্যায় আমাদের অনুকরণ কি শোভা পায়?"

কিন্তু এ ঘটনাতেও রতিকান্তের শিক্ষা হয় নি। বন্ধুর সঙ্গে নিজ পত্নীর আলাপ করিয়ে দেবার রীতি সভ্য সমাজে চলিত আছে। চরিত্রবান্ বন্ধু রামবাবুর সঙ্গে স্ত্রী কমলাকে আলাপ করিয়ে দেবার এক অসঙ্গত ইচ্ছা রতিকান্তবাবুর মনে জাগ্‌লো। সেই সঙ্গে স্ত্রীর চরিত্রবল পরীক্ষা করবার অদ্ভুত খেয়ালও তার ঘাড়ে চাপ্‌লো। রামবাবু সৎব্যক্তি। তাঁর এতে মত ছিলো না। তিনি পরিচিত একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বল্‌লেন যে, স্ত্রী

হচ্ছেন ঘৃত কুম্ভ এবং পুরুষ তপ্ত অঙ্গার। অতএব নৈকট্য প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি আক্ষেপ করলেন যে,—"আজকাল বিজাতীয় অনুকরণে আমাদের এমনি বেয়াড়া চাল হয়ে পড়েচে যে, বন্ধুকে যেন মাগটী আগে দেখাতেই হবে।" কিন্তু রতিকান্তবাবুর খেয়াল অটুট রইলো। রামবাবু আবার বল্লেন,—"লেখাপড়া শিখে কি শেষে তোমার এই ব্যুৎপত্তি জন্মাল, বেল্লিক বিধর্ম্মীদের কদাচারের অনুকরণ করে আপন জায়া, ভগ্নী, দুহিতাদিগকে নির্ল্লজ্জের ন্যায় অপর পুরুষের সঙ্গে আহার বিহার কর্ত্তে হবে? সমাজচিত্র কি এতে দিন দিন কলঙ্কিত হচ্ছে না? কেন, আমরা কি আমাদের স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দিই নাই? তারা কি আপন আপন মণ্ডলীতে স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করে না?" বিতর্ক অনেক হলেও রতিকান্ত হার মানলো না। বিশেষ করে স্ত্রী কমলার চরিত্রবল পরীক্ষা করবার ইচ্ছা তার অটল রইলো। রামবাবু অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন। কিন্তু রামবাবু বল্লেন,—"যথেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছেরাও এমন জঘন্য কার্য্যে নিয়োজিত করে এমন বন্ধুকে কলঙ্কহ্রদে বিমজ্জিত কর্ত্তে ইচ্ছা করে না। এ পরীক্ষায় উভয়েরই সর্ব্বনাশ নিশ্চিত।"

কমলার যেমন পতিভক্তি ছিলো, রামবাবুর ছিলো তেমনি বন্ধুপ্রীতি। কিন্তু কয়েকটি ঘটনা এমনভাবে সূত্রায়িত হলো যাতে কমলা ও রামবাবু দুজনেই ভাবলেন, একে অন্যকে ভালবাসেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাকালে তাঁদের মনোভাব তেমন কিছু একটা ছিলো না। ক্রমে এই আসক্তির ধারণা দুজনের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব এনে ফেলে। ধীরে ধীরে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব গুপ্তপ্রেমে পরিণতি লাভ করলো। অবশেষে রতিকান্তবাবু যখন উপস্থিত হলো, তখন তার স্ত্রী রামবাবুর সঙ্গে অভিনয়ের ছল করে গৃহত্যাগ করেছে। অনুশোচনার যন্ত্রণায় সে পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করতে গিয়ে আহত হলো। আক্কেল সেলামী দিয়ে যে জ্ঞানলাভ সে করলো, বঙ্গবাসীকে তা সে বিতরণ করতে ভোলে না।—"বঙ্গবাসিগণ! ভ্রাতৃগণ! সাবধান সাবধান! পাপ ম্লেচ্ছের কুপ্রথার অনুকরণ করে বিশুদ্ধ আর্য্য নিয়মে উপেক্ষা করো না। পুরবাসিনী মহিলাগণকে আমার মত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত স্বাধীনতা দিয়ে এরূপ বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হও না।"

স্বাধীন জেনানা (১৮৮৬ খৃঃ,—রাখালদাস ভট্টাচার্য্য॥ "একটি কথা"তে লেখক বলেছেন,—"কেহ যেন মনে না করেন যে এই প্রহসন দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, যে সকল ভণ্ড পাষণ্ড উন্নতি ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পবিত্র হিন্দু-

সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা সাধন করিতেছে, তাহাদের নিমিত্ত এই মুষ্টিযোগের আবশ্যক। তথাপি যদি কেহ গায়ে পাতিয়া লইয়া বিবাদ বাধাইতে চাহেন তবে গ্রন্থকার বলেন 'সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়'।" প্রহসনের নামকরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত। কিন্তু ভূমিকা নব্য সংস্কারকদের বিরোধিতাকেই ইঙ্গিত করে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রীসমাজকে আক্রমণ না করে স্ত্রীসমাজের এই বিকৃতির জন্যে দায়ী পুরুষসমাজকেই গ্রন্থকার লক্ষ্যস্থল করেছেন।

কাহিনী।—রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নেপাল একটা প্রেস কিনেছে—স্ত্রীর গয়না বেচে এবং বাবার কিছু টাকা নিয়ে। তার আসল উদ্দেশ্য সে নাম কিন্‌তে চায়। দেশহিতৈষী হয়ে নাম কেনা সহজ। এজন্যে দরকার নিজের একটা সংবাদপত্র। নেপালের মতিভ্রমে পিতা পাড়ার এক শিক্ষিত প্রতিবেশী বীরেশ্বর চক্রবর্তীকে বলেন, তিনি যদি তার মন ফেরাতে পারেন। "তুমি ইংরাজী জান কিনা, তাই তোমায় একটু খাতির করে।" বীরেশ্বরও নেপালকে বোঝাতে পারেন না। এদিকে সংবাদপত্র প্রকাশ করে আর্থিক লাভের চাইতে ক্ষতিই বেশি হয়। কিন্তু উদ্যম অটুট থাকে। নেপাল মাঝে মাঝে চোগা চেন ধারণ করে টাউনহলে মিটিংয়ে যায়। এসব পোষাকের ব্যবস্থা ধারকর্জ করেই সম্পন্ন হয়। "আমরা পাব্‌লিক ম্যান—আমরা দেশের বড়লোক, লাটসাহেব রাজা-রাজড়ার কাছে যাওয়া আসা কত্তে হয়, আমাদের এ সব নইলে কি চলে।" নেপালের মেজাজও অস্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌ছে দিনে দিনে। "কাগজ বার করে ইস্তক ব্যাটার যে তেরিয়া মেজাজ হয়েছে, কোন্‌দিন মেরে না বসে।" সে বলে,—"বাজে কথায় কাল কাটাইবার দিন আর আমাদের নাই। দেশের যে দুর্দ্দশা তাতে কোন্ এডুকেটেড সেন্সিবেল্ ম্যান্ আর বাজে বাজে দিন কাটাইতে পারে? এখন কার্য্য চাই। কেবল কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। তবেই দেখিবেন আমরা আবার উন্নত হব। এখন একটা এজিটেশনের বড় দরকার হয়েছে—তা বুঝতে পেরেছেন কি? প্রশটিটিউশনে যে দেশ ছেয়ে ফেল্লে।...মহাশয় আর নিদ্রা যাবেন না। একবার চেয়ে দেখুন; ষ্টেড্ সাহেবের বীরত্ব দেখ্‌লেন ত। হায়! আমাদের দেশে কতদিনে সেরূপ মহাত্মা জন্মাবে!" কথাটা সে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বীরেশ্বরকে বলে। বীরেশ্বর বলেন, আগে নিজের বাবা মা ও ঘর সংসার দেখা দরকার তারপর এজিটেশান। কিন্তু নেপাল বলে,—"আপনি নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায়

কথা বলছেন। তা সে আপনার দোষ নয়। সে আপনাদের কালের শিক্ষার দোষ।…স্যাক্রিফাইসিং স্পিরিট আপনাদের নাই ম্যাট্‌সিনির জীবনী পড়েছেন কি?" এ অবস্থায় বীরেশ্বর আর কি বলবেন!

নেপালের স্ত্রী শিক্ষিতা। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক মোটামোটা ইংরেজী বই পড়ে শেষ করেন। স্বামী-স্ত্রীর equality of right-কে মূল্য দিয়ে চলেন। নেপালের উৎসাহেই অবশ্য তাঁর এতোখানি উন্নতি, তবে কালীপদবাবুর সঙ্গে যখন নেপালের স্ত্রী সান্ধ্য ভ্রমণে বার হয়, তখন নেপালের মন একটু খুঁত্‌খুঁত্‌ করে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তার প্রেম অনন্ত। ফেমিন্‌ ফাণ্ডের গচ্ছিত অর্থ থেকে সে স্ত্রীর জন্যে বিলিতী কাপড় চোপড় করিয়ে দিয়েছে।

পুত্রবধূর গতিবিধি অশোভন বলে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে পিতা রামকুমার পুত্রের কাছে তিরস্কৃত হন। নেপাল বলে,—"I don't care for that. আমি যখন স্বাধীন, আমার হাত পা মস্তিষ্ক এখন স্বাধীন। আমি এখন স্বাধীন চিন্তা কত্তে শিখেছি। আমি কারও বাউন্টির উপর ডিপেণ্ড করি না।" রামকুমার তাকে ত্যাজ্যপুত্র করতে চান, কিন্তু নেপালের মা তাতে দুঃখিত হন এবং কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। এদিকে নেপালের চারিদিকে ঋণ। পাওনাদার সিদ্ধেশ্বর দু-হাজার টাকা চাইতে এসে ব্যর্থ হয় এবং আদালতের ভয় দেখিয়ে চলে যায়। বিপন্ন নেপাল স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর কাছে অর্থ চাইতে গেলে হেমাঙ্গিনী বলেন, কালীপদবাবুর সঙ্গে এখন তাঁর অনেক কাজ আছে। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে দৃক্‌পাত করবার মতো সময় তাঁর নেই। তারপর কালীপদবাবু আসেন। তাঁর সঙ্গে হেমাঙ্গিনী বাগানে বেড়াতে যান। চল্‌তে চল্‌তে তিনি তাঁর সঙ্গে 'পবিত্র প্রণয়ের' প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। হেমাঙ্গিনী বলেন, kissing সাহেবী সমাজে prejudice নয়। কালীপদবাবু বলেন,—"পবিত্র প্রণয়ে kissing তো আমিও দূষণীয় বলি না, আমাদের society তে এটা introduce করবার চেষ্টা করা উচিত।" Utilitarian-ism-এর দোহাই দিয়ে হেমাঙ্গিনী বলেন যে, মানব সমাজে "happiness"-এর amount বৃদ্ধি করবার জন্যে মেল্‌-ফিমেলের অবাধ মিলন দরকার। তারপর হেম কালীপদবাবুকে নিয়ে নির্জন গ্রোভের মধ্যে গিয়ে ঢোকেন,—happi-ness-এর amount বৃদ্ধির জন্যে। নেপাল অলক্ষ্যে সব ঘটনা লক্ষ্য করে।

নেপালের চারিদিকে পাওনাদার। নেপাল পাগলের মতো হেমাঙ্গিনীকে গিয়ে ধরে—যদি কিছু গয়না দিয়ে জেল থেকে তাকে বাঁচান। হেমাঙ্গিনী

বলে ওঠেন,—"Female এর sacred body তে assault কল্লে কি চার্জ্জ আসে জান ?" ইতিমধ্যে কালীপদবাবু এসে হঠাৎ ঘরে ঢোকেন। ক্রুদ্ধ নেপাল তাঁকে অনধিকার প্রবেশের charge আন্‌বে বলে ভয় দেখায়। কালীপদবাবু বলেন,—"আপনার ন্যায় দৈত্যের হস্তে কখনই আমার দুর্ব্বল female friend কে রেখে যেতে পারি না।" নেপাল বাধা দিতে এসে প্রহৃত হয় এবং কালীপদবাবু ও হেমাঙ্গিনী পালিয়ে যান। নিরুপায় নেপাল তখন স্ত্রীশিক্ষার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করে, আক্ষেপ করে,—"উঃ স্ত্রীস্বাধীনতার ফল কি বিষময়! ব্যাপিকা রমণীর শিক্ষাকুহকে পড়ে কি লাঞ্ছনাই ভোগ কল্লেম।"

রুক্মিণী-রঙ্গ (১৮৮৭ খৃঃ)—রাখালদাস ভট্টাচার্য্য॥ গ্রন্থপরিচয়ে লেখক "সাময়িক নাট্যরঙ্গ" বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমসাময়িককালের সদৃশনামা একজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের অনাচারকে কেন্দ্র করে লিখিত হলেও এই ধরনের অনাচার উক্ত ব্যক্তির মধ্যেই পর্যবসিত থাকে নি। দ্বৈতীয়িক ক্ষেত্রে আক্রমণ পদ্ধতি হিসেবে অনাচার চিত্রণ থাকা সত্ত্বেও, পূর্বোক্ত ঘটনাটি প্রচলিত বিভিন্ন অনাচারের অন্যতম প্রকাশিত দৃষ্টান্তমাত্র।

কাহিনী।—কান্তরাম রায়ের কন্যা শিক্ষিতা এবং স্বাধীনা। সে সর্বদা রমণীরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখে। পুরুষগুলো একদিন বুঝবে তারা mule এবং নারী লাগাম। হাঁদারাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিয়ে হলেও স্বামীর ওপর তার টান নেই। সে বাপের বাড়ীতেই থাকে। বন্ধুর কাছে রুক্মিণী তার স্বামীর বর্ণনা দেয়,—"A skeleton emaciated dog. কতকগুলি হাড়ের বোঝা দিদি! কাছে শোও ত টের পাও! তার গায়ে যে হতভাগাটার চাম্‌সে গন্ধ যেন dry fish—a nasty bat!—ওয়াক্—থু—থুঃ।" রুক্মিণী বলে, স্বামী আজকাল তার জন্যে আনাচে—কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করলে গেট্‌কিপার দিয়ে সে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে। একে দয়া করা মানে বেন্থামের abuse of charity.

দিনেশের ওপর রুক্মিণীর খুব টান। বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিনেশকেই বিয়ে করা রুক্মিণীর ইচ্ছে। এ ব্যাপারে অবশ্য দিনেশ ল-ইয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করছে। আবার ওদিকে জেমি এবং ক্রশ নামে অ্যাংলো কাগজ-ওয়ালার সঙ্গেও বন্দোবস্ত করে। "জেমি আর ক্রশ ব্যাটার কলমের ভারি জোর, সব উল্টে দেয়! দিনকে রাত করে, রাতকে দিন করে, যেখানে ছুঁচ না চলে সেখানে বেটে চালায়।"

রুক্মিণীর পিতা কান্তরামও কন্যার উপযুক্ত। কন্যার ব্যভিচারে শুধু যে তার প্রশ্রয় থাকে তা নয়; অনেকক্ষেত্রে সাহায্যও করে থাকে। দিনেশ প্রায় come let us enjoy বলে রুক্মিণীকে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু বাড়ীতেও সেটা হয়ে থাকে। দিনেশ একদিন বাড়ী এলে রুক্মিণীকে কান্ত সে খবর জানায়। তখন রুক্মিণী বলে,—"বাবুকো সেলাম দেও। আর তোম হুঁয়া খাড়া রও। কৈ আদমি কো মাত আনে দেও।" দিনেশকে নিয়ে রুক্মিণী দরজা বন্ধ করে এবং পিতাকে বেয়ারা করে বাইরে পাহারার জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখে।

ইতিমধ্যে রুক্মিণীর স্বামী হাঁদা একটা আপোষের জন্যে তার বন্ধু বিষ্ণুকে নিয়ে আসে। কান্তরামের স্ত্রী যমুনাও স্বাধীনা। সে বায়ু সেবনে বেরিয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং হাঁদা রুক্মিণীর খোঁজ করলে কান্ত বলে,—"সবুর কর, সবুর কর, বাবুকে বেরিয়ে যেতে দাও।" হাঁদা দরজা ভেঙে ফেলতে যায়। বিষ্ণু তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে যায়।

কয়েকদিন পর। দিনেশের ভয়, হাঁদা হয়তো গোলযোগ বাধাবে। রুক্মিণী বলে ওঠে,—"সেটা আবার মানুষ, তার আবার গোলযোগ। বলে, একটু কান্নাকাটি করবে—কিংবা পাড়ায় পাড়ায় দু দশদিন নিন্দা রটাবে। দিনেশ বলে, তাকে ভয় নেই, ভয়—তার পেছনে যারা আছে তাদের। যাক্ আমোদের সময় দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। তারা দুজন আমোদে মত্ত হয়। এমন সময় হাঁদা ও বিষ্ণু আবার আসে। রুক্মিণীকে দেখে হাঁদা বলে, এ ভাবে "ঢলান ঢলিয়ে" সে তার মুখে কালি দিচ্ছে। রুক্মিণী সেকথার জবাব না দিয়ে তাদের admission-এর কৈফিয়ৎ চায়। দিনেশ বলে,—"আপনাদের এখানে আসা অনধিকার প্রবেশ! বিষ্ণুবাবু! আপনি educated and enlightened হয়ে কেন এরূপ illegal কাজ করছেন! আর দেখুন দিকি, woman-এর কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে—।" দিনেশকে থামিয়ে বিষ্ণু বলে, দিনেশের সঙ্গে কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে রুক্মিণীর সঙ্গে। তারপর রুক্মিণীকে বলে, স্বামী যখন তার প্রতীক্ষা করছে, তখন রুক্মিণীর স্বামীর কাছে গিয়ে থাকা উচিত। রুক্মিণী একথা শুনে চটে যায়। "বিবাহ! marriage! কে বল্লে? বিবাহ বড় সহজ কথা বটে! বিবাহ the most sacred tie! এর অর্থ কটা লোক বোঝে? marriage এর defination কি, এর root কোথা, আপনি জানেন!" রুক্মিণীর মতে ভর্তা তিনিই যিনি ভরণ-পোষণ করবার ক্ষমতা রাখেন। হাঁদার দেওয়া কুড়ি ত্রিশ টাকায় এসেন্সের খরচাও

হবে না। "জানেন marriage is a mere contract এবং ইহা সহজেই পরিহার করা যাইতে পারে।" হিন্দু মেয়ের মুখে একথা শুনে বিষ্ণু দুঃখ করে বলে ওঠে,—"ওঃ! ইংরাজী শিক্ষা! পুণ্যময় আর্য্যভূমে তুই কি সর্ব্বনেশে বিষই ঢাল্‌ছিস্!" দিনেশ এদের কথায় কর্ণপাত না করে রুক্মিণীর হাত ধরে নিয়ে চলে যায়। রুক্মিণীর মা যমুনা তখন উপস্থিত ছিলো না।—কান্ত বলে, তিনি খাস্ কামরায় আছেন। কজন সাহেব লোকের সঙ্গে মোলাকাত কচ্ছেন। রুক্মিণীকেও অবশ্য সেখানে দরকার। হাঁদা আদালতের ভয় দেখিয়ে চলে গেলে কান্ত দিনেশকে সাহস দেয়।

হাঁদা নালিশ ঠুকেছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ জেমি আর ক্রুশ্ এসে কান্তকে সাহস দেয়। জেমি বলে,—"কুচ পরোয়া নেই, হামলোক সব করবে। মোকদ্দমা জল্‌দি ফেঁসে যাবে। করাচি মেইলে কাল দুটো চিঠি পাঠিয়েছি তা ডেখে জজের মাথা উল্টে গেছে।" রুক্মিণীকে ক্রুশ্ বলে,—"হামারা সব টোমার সহায় থাক্‌টে টোমার nigger husband মকোদ্দমা করিয়া কি করিটে পারে?" কান্ত সাহেবদের বলে,—রুক্মিণীবিবিকে কামরায় নিয়ে গিয়ে 'পরামর্শ' (?) আঁটতে। তারা দুজন রুক্মিণীকে নিয়ে কামরায় চলে যায়। বাইরে কান্ত তাদের আদেশমতো পাহারা দিতে বসে।

টাউনহলে রমণী-উদ্ধার-সভার একটি বিশেষ মিটিং হয় রুক্মিণীদেবীর মহৎ কীর্তির স্মরণে। গাড়ীতে করে এক সময় রুক্মিণীকে নিয়ে উন্নতিশীল দল সঙ্কীর্তন করতে করতে আসে এবং ঘন ঘন হুর্‌রে চীৎকারে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। তারা গান করে,—

"মিলি সবে চল্ প্রেমের হাটে
হয়ে একমন, মনো মতো ধন;
পাপ স্বামীর মুখে কালি দিয়ে।"

বক্তৃতায় বলা হয়,—"ভারত জেনানার লাঞ্ছনা নিবারণার্থ ইনি কলিযুগে কালী-স্বরূপা হইয়া স্বামীরূপ পাষণ্ড দলনার্থে, পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। রমণী কর্তৃক পাষণ্ড স্বামী দলনকার্য্য ভারতক্ষেত্রে unprecedented নহে। Students of Hindoo mythology অবগত আছেন যে, সত্যযুগে মহাদেব নেশার বশে পাষণ্ডভাব ধারণ করিলে, তাঁর wife কালীমূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে দমন করেন। আমাদের রুক্মিণী দেবী কর্তৃক সেই প্রাচীন উদাহরণের revival হইল মাত্র।" সব রমণীই রুক্মিণীদেবীর আদর্শ অনুসরণ করুক।

এমন সময় পুলিশ এসে 'রুক্মিণী বেওয়া'র খোঁজ করে এবং তাকে আদালতের পরোয়ানা দেখিয়ে গ্রেপ্তার করে। দিনেশকেও পালাতে দেখে নিরাশভাবে রুক্মিণী আর্তনাদ করে উঠলে দিনেশ বলে,—"আমি পালাচ্ছি না। ছায়ার ন্যায় অলক্ষিতভাবে সর্ব্বক্ষণ তোমার পশ্চাৎ থাকলেম, ভাবনা নাই।" রুক্মিণীকে নিয়ে যাবার পর দিনেশ বলে যে, সে বিলেতে আপীল করে এর প্রতিকার করবে। উন্নতিশীল বানোয়ারীলাল বলে,—"শুধু রুক্মিণীর জন্য নয়, সমস্ত ভারতরমণীর জন্যই আপীল করা উচিত। রুক্মিণীদেবী তাঁদের representative মাত্র। এই মোকদ্দমা হতে স্বামীত্যাগের নূতন নজির বার কর্ত্তে হবে।" জেলে যাবার সময় রুক্মিণীকে তার বাবা সান্ত্বনা দেয়,—"ভয় কি মা, মনে কর যেন ছমাস সোয়ামীর ঘরে যাচ্চ; আর যেখানে তুমি যাচ্ছ, সে যায়গা বেশ। সেখানকার জল হাওয়া ভাল। আমি অনেকবার সেখানে কাটিয়ে এসেছি, মন খুলে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, যেন সেখানে গিয়ে আবার এমনি ঘর সংসার পাতিযে নিতে পারবে।" রুক্মিণীর ওপর তার অকুণ্ঠ বিশ্বাস। —"রুক্মিণী আমার বড় ব্রিস্কি ডাটার; জেলার বেটাকে ধাঁ করে ভেড়া বানাবে।" রুক্মিণী খেদ করে,—"হায়! ভারত মহিলার পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার ভান কি বিষম অনর্থের মূল! স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র অবলম্বন, আমার দুরদৃষ্টবশতঃ সেই অবলম্বনকে পরিত্যাগ করে ইহজীবনের সুখের পথে কণ্টক রোপণ কল্লেম। এক্ষণে আমার পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হল। ভদ্রমহিলাগণ! আমার দৃষ্টান্ত দেখে সাবধান হও।"

নভেল নায়িকা বা শিক্ষিত বৌ (কলিকাতা—প্রকাশকাল অজ্ঞাত) —লেখক অজ্ঞাত ॥১৫ স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীসমাজকে কল্পনাবিলাসী এবং সাংসারিক কাজে দায়িত্বহীন করে তোলে। এই মত সংগঠনের অবকাশ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 'নভেল' নামে নব্য সাহিত্য শাখাটির বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত। এক স্থানে হরদেব মন্তব্য করেছেন,—"বাজে অসার নভেলের অসার প্রেম বাঙ্গালায় অর্দ্ধেক নরনারীকে শয়তান করে তুলেছে।" নভেল-নায়িকার অনুকরণ করতে গিয়ে শিক্ষিতা স্ত্রী কিভাবে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করেন, তার বর্ণনা দিয়ে লেখক স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সমর্থনপুষ্ট করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

১৫। প্রকাশক—নবকুমার দত্ত।

কাহিনী।—হরদেব বাসুদেবপুরের একজন যুবক। রেলি ব্রাদার্সের অফিসে তিনি কেরানীগিরি করেন। তাঁর স্ত্রী রুক্মিণীদেবীর নভেলপ্রেম মাত্রাতীত। তিনি বলেন, কেরানী স্বামী প্রেমের কি বোঝেন, নভেলের স্মৃতি নিয়েই তাঁর প্রেমের আনন্দ। ইতিমধ্যে তিনি শিক্ষিতা বান্ধবীদের নিয়ে নভেল প্রেমিকার গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন। তাঁরা সর্বদা উপন্যাসের আলোচনা করেন, কখনো বা স্মৃতি রোমন্থন করেন। নিতম্বিনী একটি নভেল পড়েছেন। সেখানে নায়িকা প্রেমলতা নাকি বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রী। সে তার গৃহভৃত্যের প্রতি আসক্ত হয়ে আত্মবিসর্জন করেছে, এখানেই নাকি প্রেমের জয়। বান্ধবী সারদা একটু রুচিসম্পন্ন, তিনি বলেন, এ সব নভেল শুধু—"হা-হুতাশের দীর্ঘশ্বাস। নাকি-কাঁদুনী আর অস্বাভাবিক দর্শন, অস্বাভাবিক স্পর্শন।" তিনি আরও বলেন,—"আজকালকার বাঙ্গালা ভাষার নভেল লেখকের সংখ্যা করা দায়। কিন্তু লেখক কয়জন—সব অনুবাদক। ইংরেজী নভেলগুলোর শুষ্ক তর্জ্জমা করিয়া লেখক টাইটেল পেজে প্রণীত লিখিয়া দিলেন;......বইগুলো নির্জ্জলা বিদেশী, কিন্তু নামগুলো এদেশী...।" এ সব পড়লে চরিত্র বিকৃত হয়।

রুক্মিণী বলেন,—"প্রেমশূন্য নভেল আর জীবনশূন্য গৃহ একই কথা।" প্রেমের নভেলই শ্রেষ্ঠ নভেল। বিশেষ করে সে সব নভেলই তাঁর ভালো লাগে যেখানে নায়ক-নায়িকা, যুবক-যুবতী, উপ নায়ক-নায়িকা, প্রৌঢ় ও বিধবা, যেখানে সর্বদা জ্যোৎস্না ও কুহুস্বর, যেখানে পীরিতি, প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ ইত্যাদি শব্দ রাশি-রাশি পাওয়া যায়, এবং যেখানে প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে মিলন, আলিঙ্গন, চুম্বন, গ্রহণ, গলাধারণ ইত্যাদি আছে। রুক্মিণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এ ধরনের নভেলের প্রশংসা করেন।

ঝি ডাকতে আসে। বলে কর্তা আফিস থেকে এসে গলা শুকিয়ে বসে আছেন। রুক্মিণী নায়িকার ঢঙে ঝিকে রসহীনা বলে তিরস্কার করেন। অবশেষে বান্ধবীরা চলে গেলে, কর্তা রুক্মিণীকে বলেন,—"অফিস থেকে এসেছি এক গ্লাস জলও পেলুম না।" রুক্মিণী অসুস্থ শাশুড়ীর দোহাই দেন। বলেন, তাঁর দেওয়া উচিত ছিলো। তারপর স্বামীকে বলেন,—চাকরীতে যখন এতো খাটুনি, চাকরী ছেড়ে দিলেই হয়! স্বামী বলেন, তাহলে খাবে কী? স্ত্রী উপদেশ দেন নভেল লিখ্তে, কাটতির ভাবনা নেই। নামকরণ, উদ্দেশ্য, বৈচিত্র্য সব রুক্মিণীই ঠিক করে দেবেন। তিনি বলেন,—"এক একখানা নভেলের মধ্যে চারিটি করিয়া গান আর ছয়খানি করিয়া হাফ্টোন্ ছবি দেবে।

ছবিগুলির স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি সযৌবনা উন্মুক্ত বক্ষা ও অস্ত্রধারিণী হইবে। পুরুষ অমনি তাহাকে স্থির করিবার জন্য জড়াইয়া ধরিবে—কিন্তু স্তন দুইটির উপর দিয়া যেন হাতখানা পড়ে। সেই ছবিগুলা প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনে নমুনা বলিয়া প্রচার করিবে।"

হরদেবের জলখাওয়া আর হয় না। স্ত্রী তাঁকে বলেন, কাব্যরসেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়। বারবার জল চাইলে অবশেষে রুক্মিণী অবশ্য জল দেন, তবে বলেন, তাঁর উচিত নভেলের নায়কদের মতো হাবভাব শেখা।

আর একদিনের ঘটনা। বাড়ীতে হরদেব, কিংবা তার ভাই ভবদেব—কেউই নেই। একঘরে রুক্মিণী নভেল পড়ছেন অন্যঘরে অসুস্থা বিধবা শাশুড়ী জল অভাবে কাতরাচ্ছেন। ঝি জাতে শূদ্র। তার হাতে তিনি জল খাবেন না। বাধ্য হয়ে ঝিকে দিয়ে রুক্মিণীকে ডেকে পাঠালে, রুক্মিণী শাশুড়ীর কুসংস্কারের নিন্দা করেন এবং আবার নভেল পাঠে মনোনিবেশ করেন। ইতিমধ্যে বান্ধবীরা রুক্মিণীর কাছে আসেন। রুক্মিণী নভেল নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। চাঁপা কোন্ এক এম্. এ. পাশের লেখা "গব্যবিশান" বলে একটা বই পড়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটা গান আছে যা বাংলা হিন্দীর জগা খিচুড়ি এবং তৎসঙ্গে প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের ছড়াছড়ি।

ইতিমধ্যে ঝি আবার ডাক্‌তে গেলে বান্ধবীরা সব শুনে জল দিতে চান। রুক্মিণী তখন বলেন, শাশুড়ী আসলে জল চান না, তাঁকেই চান। দুদণ্ড গল্প করতে বসলে তাঁর সহ্য হয় না। বান্ধবীরা একথা শুনে নিরস্ত হয়।

ওদিকে শাশুড়ী বাধ্য হয়ে পাশের বাড়ীর ন-বৌকে ডেকে পাঠান। তিনিই এসে জল দেন। তিনি রুক্মিণীর নিন্দা করেন। বলেন,—"কলিকাল, হলই বা কি—পথের মানুষের অসুখ হলে মানুষে একটু তৃষ্ণার জল না দিয়ে থাক্‌তে পারে না। বেটার বৌ,—পোড়া কপাল কালের।"

ভবদেব গ্রামান্তরে খাজনা আদায় করে দুপুরে ঘর্মাক্ত শরীরে ফেরে। শাশুড়ী তাকে বলেন, আর বাঁচবার সাধ নেই। ন-বৌ ভবদেবকে বলেন, সে যেন আজই শ্বশুরবাড়ীর থেকে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে আসে। সে লক্ষ্মী বৌ, শাশুড়ীর সেবা করবে। ন-বৌ আর ঝির ওপর মায়ের দেখাশোনার ভার দিয়ে ভবদেব তখনই শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয়।

যথারীতি পাল্কীতে করে বৌ নিয়ে ভবদেব ফিরে আসে। তখন হরদেবও এসেছেন। রুক্মিণী এসব দেখে জ্বলে ওঠেন। হরদেব পাল্কীভাড়া দিতে

গেলে তিনি বলেন, আড়ি করে যখন আনা হয়েছে, তখন যার গরজ সে-ই দিক্। হরদেবকে রুক্মিণী কিছুতেই ভাড়া দিতে দেন না। বলেন,—"তুমি যদি দাও, তোমার পায়ের তলে মাথা ভেঙ্গে মরবো।" অসহায় ভবদেব আংটি বেচে পাল্কী ভাড়া দিয়ে রেহাই পায়। তবে সেদিন থেকে ক্রুদ্ধ ভবদেব তার মা আর স্ত্রীকে নিয়ে পৃথগন্ন হলো।

বিপদে পড়লেন হরদেব। আফিসের টাইম—অথচ রান্না হয় না। কৈফিয়ৎ চাইলে রুক্মিণী বলেন, তিনি একদিনকার জন্যে বইটি এনেছেন, তাই বইটি সকালে বসে পড়তে হয়েছে। আজই ফেরৎ দিতে হবে। তিনি তাঁর জীবনের সুখ আনন্দ তাঁর কেরানী স্বামীর জন্যে বিসর্জন দিতে পারেন না।

ক্ষুব্ধ ও ক্ষুধার্ত হরদেব ভাবেন,—"বাজে অসার নভেলের অসার প্রেম বাঙ্গালায় অর্দ্ধেক নরনারীকে শয়তান করে তুলেছে।" তিনি দর্শকদের বলেন,— "সভ্যবৃন্দ! ঘরের পয়সা খরচ করে, বাজে নভেল পড়িয়ে পড়িয়ে এখন ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে মরি। আমাকে দেখে কি দুঃখ হয়? যদি হয়—তবে ঘরের পয়সা খরচ করে অসার প্রেমের অকর্মণ্য ধুয়ো তুলে মানুষকে পশু করে ফেল না।"

তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯০ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু॥ পরিচয়ে "গীতিরঙ্গ" বলে উল্লেখ করা হলেও রচনায় গ্রন্থকারের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রস্তাবনায় "বঙ্গনারী"দের গানে স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং তার মূলে পুরুষের মতিভ্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।—

"ফাটকে আটক রব না।
আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা॥
বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে,
দিয়েছ শেকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি
দখল কর জেনানা॥"

কাহিনী।—কাল উল্টে গেছে। এখন মেয়েরা বাইরে বাইরে, পুরুষরা ঘরে। বাংলাদেশে এসব ব্যাপার দেখেশুনে তাজ্জব বনে গেছে। উড়িয়া মঘাও তার বন্ধু পরশুকে বলে,—"বাপো বাপো, কলকত্তা সহড়কু মনুষ থাড়ে? মাইকি নি মরদ বনিব, কঁধা করিব, জড় তুড়িব, গ্যাস পানি কাম

করিব, আউ মু সব রন্না করিব, গোঁড়-বড়া নাকগুণা পরব, পড়া পড়া, কল্‌কত্তা ছোড়ি পড়া !”

বিবাহ সভার চেহারা পাল্টে গেছে। নাপ্তেনীর নির্দেশে কনে সুপুরী কাটে। ননদ ক্ষীরদা বলে, তার দাদা এটা গালে করেছিলো। নীরদা কনের কাছে ঢেলা ফেলার টাকা চায়। অভ্যাগতারা আসেন। এসে হুঁকো খান। এঁদের পরিচয়ও জানা যায়। শ্রীমুক্তকেশী বক্সী, হুগলী জজকোর্টের সেরেস্তাদার। এদিকে শ্রীমৃণালিনী মিত্র, হাইকোর্টের আপিলেট সাইডে ওকালতী করেন। শ্রীসরসী বালা ভঞ্জ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। এবারেই ফাইনাল দেবার কথা, কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। সরসী মুক্তকেশীর মেয়ে। সরসী মাকে বুঝিয়ে বলে, সে এবারেই পরীক্ষা দেবে। “আমার বিয়েন ভাল, এন্‌ট্রেন্স্ যখন দিই, তখন আমার ভরা দশমাস, শেষ এক্‌জামিনের দিনেই ব্যথা হলো।”

কনে স্বয়ং চাকরী করে। হাবড়া পুলিসের হেড্ কনষ্টেবল। বরের বাড়ীতে সে কনে-যাত্রীদের নিয়ে বিয়ে করতে এসেছে। বর সম্বন্ধে ঘট্‌কী বলে,—“শুভকর্ম্ম হয়ে যাক, তারপর একবার ছেলে দেখবেন, যেমন রূপ, তেমনি গুণ, এই বয়সে গেরস্থালীর হেন কাজটী নেই যে জানে না। আবার শুনেছি নাকি এঁরা একটু পড়তে শিখিয়েছেন।” মৃণালিনীর মেয়ে কামিনী মুক্তকেশীকে জিজ্ঞেস করে,—“আচ্ছা বক্সী ঠাকুরুণ, পুরুষদের লেখাপড়া সম্বন্ধে আপনার কি মত? মুক্তকেশী বলেন,—“আমার মতে একটু আধটু শিখ্‌লে হানি নাই, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তাতে সংসারের ক্ষতি হয়; শুনেছি সেকালেও কোন কোন পুরুষ লেখাপড়া শিখেছিল।” বিভিন্ন রকম আলোচনা চলে, এমন সময় পুরুৎ-ঠাকুরুণ বলে পাঠান,—লগ্ন হয়েছে, বরকে পাত্রীস্থ করতে হবে। ঘট্‌কী বলে ওঠে,—“ওগো বেটাছেলেরা বাড়ীর ভেতরে একবার শাঁকটা বাজাও না গো— !”

এদিকে অন্তঃপুরে দ্বারিক, শ্রীরাম, মাধব সবাই খাট্‌ছে। কথাপ্রসঙ্গে জ্যাঠামশায়ের নিন্দা করছে। একটা মাছ সাঁত্‌লাবার তেল তিনি পলা পলা করে ছবারে দেন। “দাদার মুখে কথাটি নেই, সদাই হাসি মুখ; এক এক সময় জ্যাঠামশায় গঞ্জনা কি কম দেন?” হাতাহাতি করে পান সাজা শেষ করে এদেরকে আবার বাসর জাগ্‌তে হবে। দ্বারিক বলে,—“শুনেছি, কনে বড় রসিক, জিদ্ করে বস্‌বো, গানটান গাইয়ে তবে ছাড়বো। শ্রীরাম বলে,—“আমি

ভাই ছেলে ঘুম পাড়াবার নাম করে একটু ঘুমিয়ে নেব, খানিক রাত্তিরে মেজদা আমায় ডেকো।" মাধবের অবশ্য ঘুম পাবার ভয় নেই। "পোড়া, এমনিতেই যার সারারাত্তির ঘুম হয় না; ও সেই অত রাত্তিরে আসে, তারপর খাবার-টাবার দিতে শুতে আর রাত কতটুকু থাকে?" গোয়ালা অন্তঃপুরে দুধ দিতে এসে রসের গান শুনিয়ে চলে যায়। বাসর জাগাবার অনুরোধ এলে গোয়ালা বলে,—"থাকবার যো কৈ দাদাবাবু, গিন্নী আজ তিনদিন হল উলুবেড়ের হাটে গিয়েছেন একটা গাই কিন্‌তে, আজও খবরটি নেই!"

ছাতনাতলায় ছেলেদের বরণ করবার সময় আসে। পুরুষাচারে জ্যাঠামশায় একটু স্বতন্ত্র থাকেন। বলেন,—"গিন্নী গিয়েছেন, আমার কি শুভকর্ম্মের জিনিস ছোঁবার যো আছে?" ছেলেরা সবাই মিলে বরণের পর পিঁড়ি ধরে। নাপ্তেনী বলে,—"তোমরা পারবে না, বাইরে থেকে চারজন মেয়েকে ডাকবো?" দ্বারিক বলে,—"না এই আমরাই নিচ্ছি, মেয়েদের আর কষ্ট দিয়ে কাজ নাই।" নাপ্তেনী বিড়্‌বিড়্ করে বলে,—"ভালমন্দ লোক থাক তো সরে যাও, গোঁপ পেকে যাবে, মাগের দুয়ো হবে।" তারপর ছেলেদের বলে,—"তোমাদের নিত্‌কিত্ যা আছে করে নাও, পিঁড়িসুদ্ধ বাইরে নিয়ে যেতে হবে।"

শুধু বিবাহসভায় নয়, সবত্রই মেয়েদের রাজত্ব। প্রকাশ্য রাজপথে অফিসযাত্রিনীদের কাছে পয়সায় দশ বারোটা করে "পাতখোলা" বিক্রী হয়। অফিসযাত্রিনীদের অধিকাংশই অন্তঃসত্ত্বা। অফিসের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে তারা আলোচনা করে। ট্রাম এলে তারা ট্রামে চড়ে।

স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্পূর্ণতা কিসে আসবে, এ নিয়ে আলোচনার জন্যে একটা মিটিং ডাকা হয়। ননীবালা বিদ্যালঙ্কার মেয়েদের পক্ষে গোঁফের প্রয়োজনীয়তার কথা বল্‌তে গিয়ে বলেন,—"কে বলে গোঁফে স্ত্রীলোকের শোভার হানি করে! ভগ্নীগণ, মনে কর, যখন আমরা মেডিকেল কলেজে যাই, যখন হাইকোর্টে ওকালতী করতে যাই, হাউসে অফিসে, গুদামে যে যে ভগ্নী যে যে কার্য্যে যান, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে গোঁফের আবশ্যক।" ......"অধম পরাধীন অন্তঃপুরবাসী পুরুষগণেরও গোঁফ আছে, আর আমরা বাহিরে, সভায়, জনতায়, গোঁফ নাই বলিয়া লজ্জা পাই—কি ঘৃণা! কি লজ্জা!" G. B. Lahiri, L. R. C. P. অর্থাৎ গিরিবালা "Ovaria" অপারেশন করে রিমুভ করবার প্রস্তাব করেন। "টাহা হইলে আমাডিগের গোঁফডারি উঠিটে পারে, ও সণ্টান হওয়া বণ্ড হয়,

এ-কথা বিজ্ঞানসম্মত।" বিরাজমোহিনী সেন মন্তব্য করলেন,—G. B. Lahiriর কথা যুক্তিসঙ্গত হলেও "যতদিন পুরুষের গর্ভ হওয়ার কোন সুবন্দোবস্ত না করা যায়, ততদিন আমাদের সন্তান প্রসব বন্ধ করা নিতান্ত স্বার্থপরতা।" ঢাকা বাজেট্-এর সম্পাদিকা অনঙ্গমোহিনী বলেন,—"আমি আপন চইক্ষে ত্থাখ্‌ছি ড্যাকাতে চ্যাংড়াগুলা মোচ্ উঠাইবার লেগে নাপিতের পুইসা দিয়ে খাম্‌কা খাম্‌কা খাউরি করে, আমরা বন্দর মহিলাগণ যইগ্যপি সেই পথ অবলম্বন করি, ত্যা অইলে অইধ্যবসায় কইরে খাউরি করতে খাউরি করতে অবশ্যই মোচ দেখা দিতে পারে। আর পুরুষের সন্তান প্রসব—আমি বজ্রনাদে চিচাইয়ে কইতে পারি যে, পূর্ব্ববঙ্গ এ সম্বন্ধে পথ দেখাইব।" ছেলেদের কাছা আঁটিয়ে রাখবার অনৌচিত্যও তিনি দেখান। সহ সম্পাদিকা রোহিণীমণি তলাপাত্র ছেলেদের হাতে খাড়ু চুড়ি পরাবার কথাও বলেন। শেষে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সবাই বাড়ীতে গিয়ে তাদের পুরুষদের কাছা খুলিয়ে খাড়ু চুড়ি পরাবে। সভ্যারা অবশ্য হাতের কাণের গয়না ছাড়তে চান না। কারণ—খোট্টা পুরুষরা গয়না পড়ে, এটাই তাঁদের যুক্তি। দেশহিতৈষী থাকোমণি মত্ত অবস্থায় সভায় আসেন। অনঙ্গ বলেন,—"ম্যাশা খায়ে সোভায় আসাটা বন্দর উচিত অয় নাই, আমরাও ম্যাশা খাই, কিন্তু কখন, কোথায়? সন্ধ্যার পর, বাসায়, গোপনে।" যাহোক দিনটি বড়দিনের আগের দিন। সভায় স্থির হয়, কাল X'mas-এর দিনে কর্ণেল নিতম্বিনীর পরিচালনায় গ্রাউণ্ড ইলিউমিনেট করে মুনলাইট্ প্যারেড হবে। সভার কাজ সেদিনকার মতো শেষ হয়।

পরদিন গড়ের মাঠে কর্ণেল নিতম্বিনী ও ভলেন্টিয়ারনীরা মার্চ করে, হল্ট্ কের, ন্যাশন্যাল সং গায়। অন্যদিকে স্ত্রীবেশী পুরুষরা আক্ষেপ করে।—

"খেলেম কানমলা নাকমলা, ফিরে কোন্ শালা
স্ত্রীস্বাধীনতার কথা নিয়ে করবে লাফালাফ।
মেয়েদের দণ্ডবৎ, দিলাম এই নাকে খৎ,
যেমনি পাপ করেছিলাম, তেমনি পেলেম তাপ॥"

বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাসা (১৮৯৪ খৃঃ)—কেদারনাথ মণ্ডল॥[১৬] সীমা এবং লজ্জা অতিক্রমকারী স্ত্রীসমাজকে লেখক চিত্রিত করতে গিয়ে

১৬। ১ম সংস্করণে—মহেশচন্দ্র পালকে কৃতজ্ঞতা সহকারে অর্পণ, কিন্তু ২য় সংস্করণে (১৩১৯) প্রণেতাই মহেশচন্দ্র পাল।

বৈকল্পিক নামকরণে দৃষ্টিকোণের Superiority উপলব্ধি ও প্রচার করবার চেষ্টাও করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় "পারিবারিক প্রবন্ধে"[১৭] বলেছেন,—"আমার বিবেচনায় মনুষ্যের প্রকৃতিতে পশুধর্মের অস্তিত্ব অনুভূত হইলেই লজ্জার উদ্রেক হয়।" প্রগতিশীল স্ত্রীসমাজের পশুত্ব রক্ষণশীল রুচিতে আঘাত এনেছে। বিশেষতঃ স্ত্রী-স্বাধীনতায় আমাদের স্ত্রীসমাজ যে রুচি ও শিষ্টতা ধ্বংস করে অসম্মান অর্জন করছে, প্রহসনকার তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য দ্বৈতীয়িক অনুশাসন-বিরোধী আক্রমণ প্রহসনকারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রহসনে একটি গানে নারীদের বুদ্ধিভ্রংশের ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে,—

"আমরা সবাই গড় করি ভাই এদের আক্কেলে
(এখন) বিগড়েছে চাল, রাখবে না, কিছুই সে-কেলে।"

প্রগতিশীল সংস্কারকদের বিরুদ্ধেও প্রহসনকারের বক্তব্য নিহিত আছে। প্রগতিশীল দলের অনেকে বাল্যবিবাহের দোষ দেখাতে গিয়ে বলেন যে বাল্য-বিবাহের ফলে দুর্বল সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই মতটিকে প্রহসনকার বিকৃতভাবে উপস্থিত করে এর বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন।

কাহিনী।—স্ত্রীশিক্ষায় মেয়েদের চোখ, কান ফুটেছে। তারা বুঝতে শিখেছে যে মানসিক চর্চার সঙ্গে দৈহিক স্বাস্থ্য চর্চাও দরকার। অফিসের বড়বাবু গোঁড়া লোক। কিন্তু তাঁর মেয়ে কৃষ্ণভাবিনীও এই দলে! হীরালাল তাঁকে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষার পরিকল্পনা দিতে গিয়ে চাকরী খুইয়েছে, বড় সাহেবকে বলে তিনি তাকে সস্পেণ্ড করিয়েছেন। ইতিমধ্যে একটা পিটিশান আসে। মিস্ গেঙ্গুলি লিখেছেন যে, আজকাল যেমন স্ত্রীশিক্ষা উচ্চসোপানে উঠেছে, সেই সঙ্গে কিছু কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজও দরকার। তাতে বড়বাবুর মেয়ে কৃষ্ণভাবিনীর সই আছে। বড়বাবু রেগে যান। কিন্তু সাহেব হেসে বলেন,— "বাবু it is very landable idea indeed." বড়বাবু অগত্যা বিকৃত মুখে পিটিশান অ্যাপ্রুভ্ড্ করে দেন। বড়বাবু মতিলালকে বলেন, এক একটা মেয়ে পার করতে দশ-বিশ হাজার টাকা লাগে। কিন্তু মেয়েদের জন্যে যদি নব্য সুপুরুষ গ্রাজুয়েট্ টীচার রাখা যায়, তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়। "মতি! আজকাল যেরূপ বাজার পড়েছে, তাতে, কন্যার বাপ-মার এর চেয়ে

১৭। পারিবারিক প্রবন্ধ—লজ্জাশীলতা (৮ম প্রবন্ধ)।

আর কি সহজ পলিসি হতে পারে।" কিন্তু এতো সংস্কার-মুক্ত বড়বাবুও এ সব ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন।

কৃষ্ণভাবিণী স্কুলে ড্যান্স শেখে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্যান্সিং মাষ্টারের প্রেমে সে পড়েছে। ড্যান্সিং মাষ্টার সাহেবদের প্রশংসা এবং নেটিভদের নিন্দা করলেও দুর্বল কৃষ্ণভাবিণী তাতেই সায় দিতে বাধ্য হয়।

কৃষ্ণভাবিণীর ঠান্‌দি এতোকাল কাশীতে ছিলেন। সদ্য এসে নাত্‌নীদের এসব চাল-চলন দেখে বাপ্‌কে তিনি গালাগালি দেন। ড্যান্সিং মাষ্টারের প্রতি দুর্বলতাও তিনি লক্ষ্য করেন। "ঐ মেটে ফিরিঙ্গি ছোঁড়া যতক্ষণ বসে ছিলো, আড়চোখে তার দিকে চাওয়া হচ্ছিল। আর ছোঁড়াও যখন উঠে গেল, আর ঢং করে অমনি ঘুরে পড়া হলো।" বাপের আক্কেলের নিন্দা করে ঠান্‌দি বলেন,—"সোমত্থ মাগীগুলোর বে দিলে, তিন চার ছেলের মা হতো; আইবুড়ো রেখে কেমন করে পেটে ভাত দেয় গা? এই সব দেখেশুনেই ত পাড়ার সবাই ঘোঁট করে একঘরে করবে বল্‌ছে। তারপর যে দিনকাল পড়েছে, কোন্‌দিন মেয়েগুলো কি করে বস্‌বে! তখন বাছার গালে চুণ কালী পড়বে।" ব্যায়াম সমিতির অন্যতমা সভ্যা বিধুমুখী বলে,—"উচ্চ শিক্ষার গুণে আমাদের মনে সে সব কুপ্রবৃত্তি স্থান পায় না।" ঠান্‌দি বলেন, নাচগান না জেনেও বিয়ে কি হয় না? "এই যে ওই মুখুয্যেদের গো—সেই যে আমার ভাসুরের নাম—ধরতে নেই,—তিন চারিটী মেয়ের পুট্‌ পুট্‌ করে বিয়ে হয়ে গেল। কৈ তারা নাচতে গাইতে জানে না বলে ত বিয়ের আটক রৈল না। তাদের বড় মেয়েটি আমাদের কিষ্টির (=কৃষ্ণভাবিণীর) চেয়েও ত ছোট! দুটী ছেলে হয়েছে, আবার পোয়াতী।" সেকালে অল্পবয়সে বিয়ে হতো বলে কেউ দীর্ঘজীবী হতো না? মদন বাকুলি ১০৫ বছর বেঁচেছিলো। ঠান্‌দি ডাক্তারদের নিন্দে করেন। শেষে তার্কিক নাত্‌নীদের তর্কে অধৈর্য হয়ে বলে ওঠেন,—"তোদের ত চোপায় এঁটে উঠ্‌বার যো নেই,...যা যা ছুঁড়িরা তোরা ভারি কল্লা হয়েছিস্‌। তোদের সঙ্গে আমি বক্‌তে পারি নি। তোদের যা খুসি হয়, তা করগে যা।"

মহিলা ব্যায়াম সমিতির সভ্যাদের উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। মিস্‌ গেঙ্গুলী মিস্‌ টপসি টার্ভিকে বোঝায় যে, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কালচারের সঙ্গে Physical cultureও দরকার। কারণ Extensive knowledge-এর জন্যে রেলওয়ে জার্ণি এবং জাহাজ ষ্টীমারে voyage করতে হবে। তাতে

শরীরে সামর্থ্য দরকার হবে। "এখন দরকার আমাদের Climate proof, diet proof হওয়া।" সাহেবদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলে মেয়ের তুলনা করে সে বলে, আমাদের ছেলে মেয়েদের "জেনেরেলি হাতপা গুলো সরু সরু আর পেটগুলো ঢাকাই জালা হয়। আর নাক দিয়ে সিকনি গড়ায়, ছুঁতে ঘৃণা করে।" নেটিভদের মুখে নেটিভের নিন্দা শুনে উৎসাহিত হয়ে মিস্ টপ্সি টার্ভি বলে,—"দেখ্‌টে পাওয়া যায়, নেটিভডের মড্ডে হেল্‌দি যুবা অটি অল্প আছে। কিন্তু অন্য জাটি আপ্‌কোরস্ ইউরোপীয়ানডের সহিট্ অটিক এণ্টার ম্যারেজ হইলে হেল্‌দি গারল্‌স্ উইল্ সিকিওর হেল্‌দি হাজব্যাণ্ডস্ এণ্ড্ বিগেট্ হেল্‌দি চিলড্রেন,—ডু ইউ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড?"

মেয়েদের এইসব কাণ্ডকারখানায় পাড়ার প্রবীণরা অস্বস্তি প্রকাশ করেন। হরিহর পণ্ডিতমশাইকে বলেন,—"স্ত্রীশিক্ষা অতি উত্তম, স্বীকার করি, কিন্তু এখনকারের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের দেখ্‌লে হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায়।" কাউকে এরা গ্রাহ্য করে না, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বিবিয়ানা করে বেড়ায়, একটুও পরিশ্রম করতে চায় না। তাও যদি ঘরে বসে করে তা সহ্য হয়, তা নয়, বাইরে সভাসমিতি করে বেড়ায়। "আর বাবুরাও যারা এখনকার ভারতের ভরসা—তাঁরা কোথায় সুপরামর্শ দিয়ে সুপথ দেখিয়ে এদের নিয়ে যাবেন, তা নয়, তাঁরা একেবারে বাঁধা গরুর দড়িটা কেটে দেন, আর তারা শিং বাঁকিয়ে ল্যাজ উঁচু করে চার পা তুলে ছুটে বেড়ায়।" পণ্ডিতমশায় আর হরিহরবাবু যখন কথাবার্তা বল্‌ছিলেন, এমন সময় একটা হ্যাণ্ডবিল্ একজন দিয়ে যায়। স্ত্রীলোকদের ব্যায়ামচর্চা এবং জাতি নির্বিশেষে বলবান্ স্বামীর নির্বাচনের জন্যে রবিবারে পার্কে 'রাক্ষসী সভার' অধিবেশন হবে।

ইতিমধ্যে মেয়েরা ব্যায়াম চর্চা করে কাহিল হয়ে পড়ে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাদের অনেকে চলাফেরা করে। আট মাসের পোয়াতী, তাই মালতীর স্বামী তাকে মুগুর কেনবার পয়সা দেয় নি বলে মালতী মোচা আর কচু নিয়েই ব্যায়াম করেছে।

রবিবারে পার্কে যথারীতি মিটিং হয়। সমর্থকালে বিবাহ, বলবান্ স্বামী জাতিনির্বিচারে নির্বাচন, স্বাস্থ্য চর্চা ইত্যাদি নিয়ে মিস্ গেঙ্গুলী বক্তৃতা করেন। রাক্ষসীসভার সব সভ্যাই সেখানে উপস্থিত থাকে।

হরিহরবাবু এবং অন্যান্য প্রবীণেরা ষড়যন্ত্র করে কতকগুলো গুণ্ডাকে ঠিক

করে রেখেছিলেন। তারা মেয়েদের জোর করে মিটিং থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের নিজের নিজের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আস্‌বে।

মিটিং শেষ হলো, এবার স্বামী নির্বাচনের পালা। কাবুলী, বাগ্‌দী, চীনে, মগ, হাবসী, ফিরিঙ্গী ইত্যাদি জাতের অনেকে স্বামী হবার আশায় এসে উপস্থিত হয়। ড্যান্সিং মাষ্টারও আসে। "এসো এসো সবে বীর পালোয়ান, ধর ধর দিব মোরা পাণি দান—" বলে মেয়েরা তাদের মালা পরাবার জন্যে প্রস্তুত হয়, এমন সময় হঠাৎ গুণ্ডার দল ঢুকে মেয়েদের টানা হ্যাঁচ্‌ড়া করে নিয়ে যায়। "মুখের গরাস মুখে দিলাম কই" বলে মেয়েরা খেদ করে।

বৌমা (১৮৯৭ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু॥ স্ত্রীশিক্ষা পুরুষের সাংস্কৃতিক পরাজয় সম্ভাবিত করে—এই মতবাদ সংগঠনের সূচনা করে প্রহসনকার একদিকে যেমন শিক্ষার কুফল চিত্রিত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি পুরুষের স্ত্রীসর্বস্বতার চিত্র অঙ্কন করতে বিস্মৃত হন নি। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাগত আক্রমণ ছাড়াও প্রহসনকার ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। কারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন সূচিত হয়!

কাহিনী।—বাবুরাম প্রগতিশীল নব্য যুবক। মার কাছ থেকে সে দুবারে প্রায় ছ'সাতশো টাকা চেয়ে নিয়ে কাগজ বার করেছে দুবার। দুবারেই তাতে লোকসান হয়েছে। আবার টাকা চায় সে। এবারে কাগজে সে নাকি লাভ করবেই। মা তাকে চাকরী করতে বলেন। বাবুরাম বলে—"তুমি আমায় চাকরী করতে বল, ইংরাজের চাকরী, ছি ছি ছি!...তুমি মূর্খ; আমার ফিলিং তুমি কি করে বুঝবে?...জান আমি ভারত সন্তান!" বাবুরামের কম দায়িত্ব নয়। আসামে কুলী মেয়েদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তার প্রতিবিধান দরকার। "হলোই বা কুলী রমণী, রিফর্‌ম্‌ড্‌ ড্রেস ট্রেস পরালে তারাও কেমন রোম্যান্টিক চেহারা ধারণ করে।" তারপর হিন্দুদের কন্যাদায়—বরকর্তাদের ভয়ানক অত্যাচার। (যদিও বাবুরাম নিজে বিয়ে করে শ্বশুরকে এখনো দেনায় ডুবিয়ে রেখেছে)। এ নিয়ে পৃথিবীর দূর দূর দেশের বড়ো বড়ো লোকদের সঙ্গে নাকি সে চিঠির আদান-প্রদান করছে। তাছাড়া,— "ভারতের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, বিধবার ক্লেশ, বম্বে প্লেগ চ্যারিটে ল সোসাইটী—।" মতিলাল বাবুরামের প্রতিবেশী। বাবুরামের মাকে তিনি 'দিদি' বলে ডাকেন। তিনি বলেন,—"কেন, সবাইকেই যে কৃষ্ণদাস পাল, কেশব সেন, মনোমোহন

ঘোষ, সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে হতে হবে, তার ত মানে নাই। যার যেমন শক্তি, সময়, সঙ্গতি, সেই রকম কাজ কল্লেই ভাল হয় না? তোমার মতন অবস্থার দশটি যদি কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে দুর্ভিক্ষ দমন কর্ত্তে ছোটে, তাহলে যে আর দশটি সংসারে দুর্ভিক্ষ বাড়বে। দশজনকে নিয়ে তো পব্লিক্। জনে জনে আপনার আপনার ঘরের মঙ্গল চেষ্টা কর দেখি, তাহলে আপনা আপনি যে সাধারণ মঙ্গল হয়ে যাবে। সরপ্লাসটুকু যে কজনকে পারো বেঁটে দিয়ে সাহায্য করবে।" মতিলাল শুধু অফিস করেন এবং আলু পটলের হিসেব কষেন; র‍্যাডিক্যাল স্পিরিট হারিয়েছেন বলে বাবুরাম অনুযোগ করে। কিন্তু মতিলালের জেরায় সেও বল্‌তে বাধ্য হয়,—"পব্লিক্ ম্যান হবার আমার বরাবর সখ, যদি একটা নামই না রেখে গেলেম, তবে পৃথিবীতে এলেম কেন?" যাহোক বাবুরাম টাকা চাইতে গিয়ে তার মার কাছে বলে,—"নিজের হাতে কাগজ, বিজ্ঞাপনের খুব সুবিধা; অন্য কাগজের সঙ্গেও সস্তায় বন্দোবস্ত হতে পারবে। ঝড়াঝ্ঝড় পেটেন্ট মেডিসিন সব চালিয়ে দিব।" শেষ পর্যন্ত বাবুরামের মা হার মানেন।

বাবুরামের স্ত্রী কিশোরীও প্রগতিশীলা। বেলা দশটায় ঘুম থেকে উঠে তৈরী চা খাওয়া অভ্যাস। শাশুড়ী তার কাছে ঝির সামিল, স্বামী তার কাছে ভেড়া। বাবুরাম স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে হামেশা মাকে গালাগালি করে।

সেদিন ঝির অসুখ। বাবুরামের মা বাসন মাজেন। ১০টায় উঠে কিশোরী তৈরী চা পায় না। চায়ের অভাবে কিশোরীর ফিট্ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। বাবুরাম বলে,—"প্রিয়ে আমার খুব বীরাঙ্গনা, তাই এখনও —এখনও চা না খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য কোন অবলা হলে—।" শেষে স্বামীই কোনোরকমে চা করে তাকে খাওয়ায়। শাশুড়ী একবার কিশোরীকে হেঁসেলে যেতে বলেছিলেন। তাতে কিশোরী উত্তর দেয়,—"আসুন, আমার সঙ্গে আসুন, আলমারী খুলে সমস্ত বই আপনার সামনে ফেলে দিচ্ছি, দেখে বলুন যে তার মধ্যে যত নায়িকা আছে, তারা কি হেঁসেলে গিয়েছিলো।" মতিলাল বিদ্রূপ করে বাবুরামের মাকে বলেন, তিনি যেন দিনরাত পুত্রবধূকে সেবা করেন।" বৌমারও ত আবার ছেলে হবে, তুমি এখন এসব না করলে উনি কার দেখে শিখ্‌বেন! শেষে ত ওঁকেও আবার একদিন ছেলের লাথি ঝাঁটা খেতে হবে!" সন্তানের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে কিশোরী জবাব দেয়,—"আমি যে নায়িকা—হিরোইন্! প্রাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন, ভাল ভাল নায়িকাদের কারও কখন গর্ভ হয় নাই।"

বাবুরাম ও কিশোরীর আদর্শ এবং দীক্ষাগুরু বামাদাস ও তার স্ত্রী হিড়িম্বা দেবী। এরা দুজনেই প্রগতিশীল ব্রাহ্ম; পরস্পরকে তারা ভাই ভগিনী বলে সম্বোধন করে। অবশ্য বিয়ের আগে এরা সম্পর্কে কাকা-ভাইঝি ছিলো। বামাদাস ছিলো হিড়িম্বার বাবার বন্ধু। তাই বিয়ের পরেও মাঝে মাঝে হিড়িম্বা স্বামীকে বামাকাকা বলে ভুলে ডেকে ফেলে। হিড়িম্বা পুরুষোচিত শিক্ষা পেয়ে বড়ো হয়েছে, তাই সাহেব সুবোর সঙ্গেও তার ভাব। ব্যারিষ্টার বিশু নাগ অর্থাৎ মিষ্টার ন্যাগার সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় আছে, বোঝা যায়। অবশ্য স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু ভাষা ও কাব্যের মধ্যে দিয়েই—মনের দিক থেকে নয়। বামাদাস স্ত্রীকে বলে,—"জান তো প্রিয়ে, অধম বামাদাস চিরদিনই অবলা বান্ধব, তার উপর হিড়িম্বা, তুমি আমার গর্ব্ব, আমার সর্ব্বস্ব, আমার পালন কর্ত্রী! যেদিন থেকে তুমি আমায় তোমার প্রেম-শকটে জুড়ে দাম্পত্য চাবুকের জোরে সংসারক্ষেত্রে চালাচ্ছ, সেইদিন থেকে আমি বুঝেছি যে, সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম 'স্ত্রীপূজা'।" বলাবাহুল্য বামাদাস হিড়িম্বার কথায় নিজের ক্ষতি করেও অনেক কাজ করে থাকে।

হিড়িম্বাকে অনুসরণ করে কিশোরী আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা নভেলের ভাষায় কথা বলে—নভেলের নায়িকার মতো ব্যবহার করে। সে নিজেই নিজের নাম রেখেছে উলাঙ্গিনী—উলের মতন অঙ্গ যার! শাশুড়ীর সামনে সে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র প্রেমের প্রশস্তি গাইতে লজ্জাবোধ করে না। বাবুরামের মা অন্নপূর্ণা ভাবেন, ছেলের নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে—সেই সঙ্গে ব্যাটার বৌয়েরও। কিন্তু কিশোরীর সহচরী সকলেই এমনভাবে কথা বলে! তাহলে কি সকলেরই মাথা খারাপ হলো! তিনি হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পান না।

একদিন বাবুরামের বাড়ীতে খিড়কীর বাগানে কিশোরী আর সহচরীরা মিলে তাস খেলবার সঙ্কল্প করে। হিড়িম্বা এসে বলে, 'তাস্' কথাটাই অশ্লীল, এটা খেলা তো দূরের কথা। শেষে স্থির হয় Blindman's Buff খেলা হবে—বাংলায় যাকে বলে কানামাছি। কিন্তু কেউই কানামাছি হতে চায় না। হিড়িম্বা ভাবে, এ সময়ে একটা পুরুষ থাকলে ভালো হতো। শেষে হিড়িম্বা নিজের স্বামী বামাদাসের নাম সুপারিশ করে। মেয়ে মহলে ভদ্রলোককে এনে খেলা করবার ব্যাপারে দু-একজন অস্ফুট আপত্তি জানাতে গেলে হিড়িম্বা বলে,—"আপনাদের কোন ভয় নাই, তিনি পুরুষ বটে, ভদ্রলোকের সভায় বীর বলে পরিচয়ও আছে, কিন্তু অবলাদের সামনে এলে তিনি অতি

কোমল হয়ে পড়েন ; তাঁকে পুরুষ বলে কিছুতেই চেনা যায় না।" হিড়িম্বা স্বামীকে টেনে নিয়ে এসে বামাদাস বলে,—"আমি যেমন প্রেয়সী-ভগিনী হিড়িম্বা-ভৃত্য, তেমনি আপনাদেরও সেবকশ্রী বলিয়া জানিবেন।"

খেলা চল্‌তে থাকে। এক একজন মেয়ে বামাদাসকে আঘাত করে চলে যায়, বামাদাস নাম বল্‌বার চেষ্টা করে। তার চোখ অবশ্য বাঁধা। ইতিমধ্যে কিশোরীর শাশুড়ী অন্নপূর্ণা এসে খবর দেন যে, ওষুধ জালের অভিযোগে বাবুরামকে পুলিশে ধরেছে। "অ্যাঁ প্রাণনাথ বন্দী !"—বলে কিশোরী হিষ্টিরিয়ার অভিনয় করে। সবাই তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যায়। চোখ বাঁধা অবস্থায় বামাদাস বসে থাকে।

হেড কন্‌ষ্টেবল বাড়ীর ভেতরে ঢোকে। মেয়েদের ভুলিয়ে শীলমোহর-টোহর বার করে নেবার উদ্দেশ্যে। বামাদাসকে দেখে হেড কন্‌ষ্টেবলের সন্দেহ হয়, বুঝি এও আসামী—ভয়ে মেয়ে মহলে পালিয়ে এসেছে। কন্‌ষ্টেবল তার মাথায় হাত দিলে তাকে খেলার একটি মেয়ে মনে করে বামাদাস বলে ওঠে,—"এইবার—এইবার ধরেছি। এতো ভগিনী সৈরভ না হয়ে আর যায় না।" চোখ খুলে কনষ্টেবলদের দেখে বামাদাস ভাবে, Blindman's Buff ছেড়ে এবার বুঝি সখীরা Masque rade খেলা ধরেছে। ছদ্মবেশ ভেবে সে কনষ্টেবলের দাড়ি ধরে টানাটানি করে—যাতে ছদ্মবেশ খুলে পড়ে। যন্ত্রণায় কনষ্টেবল চীৎকার করে ওঠে। শেষে পাগল কি আসামী বুঝতে না পেরে তাকে নিয়ে হেড কনষ্টেবল বাবুরামের বাইরের বৈঠকখানায় ইন্‌স্পেক্‌টারের কাছে নিয়ে চলে। সেখানে বাবুরামকেও আনা হয়েছে।

জানা গেলো, "সর্ব্বজ্বর-গজ-সিংহ" নামে লালমোহন সা'র পেটেন্ট ওষুধ বাবুরাম "সর্ব্বজ্বর-হর-গজ-সিংহ" নাম দিয়ে বিক্রী করেছে। আসামে কালাজ্বরের হিড়িকে বাবুরামের জাল ওষুধ প্রচুর বিক্রী হয়েছে। লালমোহন-বাবু ঢাকায় থাকেন। বাবুরাম ভেবেছিলো, তিনি টের পাবেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে এখানে মাধবচন্দ্র নামে তাঁর এক এজেণ্ট ছিলো। সে ওয়ারেণ্ট বার করিয়েছে। মতিলাল বাবুরামকে ছেড়ে দেবার জন্যে ধরাধরি করেন। ইন্‌স্পেক্‌টার বলে, এটা তো আর কগ্‌নিজেবল্‌ কেস্‌ নয় যে ফরিয়াদী ইচ্ছা কল্লেই মিটিয়ে ফেলতে পারেন। মতিলাল কথাপ্রসঙ্গে বাবুরামের অধঃপতনের জন্যে বামাদাস ও হিড়িম্বা যে দায়ী—একথা প্রকাশ করলেন। বাবুরাম বামাদাসের কানামাছি খেলার কথা শুনে বামাদাসের ওপর বিরূপ হয়!

পুরুষের অনুপস্থিতিতে অন্য বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে কানামাছি খেলার কৈফিয়ৎ ইন্‌স্পেকটার বামাদাসের কাছে চাইলে বামাদাস বলে,—"আমি সমস্ত সুন্দরী জাতিকে পবিত্র ভগিনী ভাবে দেখি।" মতিবাবু বলেন,—"এ পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত অনিষ্ট হয়েছে, অধর্ম্ম নিজ মূর্তিতে তার লক্ষ অংশের এক অংশও করতে পারে নি। হিন্দুধর্ম্মের যে এত দুর্দ্দশা, স্বার্থপর ভণ্ডদের উৎপাতই তার সূত্র। আবার যেমনি একটু হিন্দুয়ানীর দিকে ইংরাজী পড়া লোকদের মন ফিরেছে, অমনি তারই ভিতর সুড়সুড় করে ব্যবসাদারের দল ঢুকছে। ঐ বাবুরাম যে পেটেণ্ট ঔষধের ফন্ করেছিলেন, তাও আজকাল অনেক জায়গায় ধর্ম্মের নামে বিক্রয় করা হয়।" ফরিয়াদীর এজেণ্ট মাধব মতিলালের কথা শুনে এবং চরিত্র ব্যবহারে খুব মুগ্ধ হয়। সে বলে,—"আপনার খাতিরে আমি নিজে এই মোকদ্দমা মেটাবার জন্য লালমোহনবাবুর হাতে ধরবো।"

এমন সময় কিশোরী অর্থাৎ উলাঙ্গিনী সখীদের নিয়ে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে বৈঠকখানায় আসে,—"জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ- পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।" বৈঠকখানায় অপ্রত্যাশিতভাবে মেয়েদের দেখে পেত্নী মনে করে হেড্ কনষ্টেবল সভয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে,—"আম—আম—ইদুর আম—অক্ষে কর—অক্ষে কর।" মতিবাবু মেয়েদের লজ্জাহীনতার জন্যে তিরস্কার করলে, বাবুরামের পিস্‌তুতো বোন কায়া জবাব দেয়,—"যখন একজন প্রাণনাথ বন্দী, তখন আমাদের লজ্জা কি?" মামাতো ভাই প্রাণনাথ হলো কি করে, তার জবাবে কায়া বলে,—"যে রকমেই হোক্, ওঁতে তো প্রাণনাথত্ব আছে।" কারণ বাবুরাম সখীর প্রাণনাথ।

মতিবাবু ইন্‌স্পেক্টরকে বলেন, এ হচ্ছে বামাদাস আর হিড়িম্বার শিক্ষার ফল। ইন্‌স্পেক্টার নিজেই লজ্জা পেয়ে কনষ্টেবলদের নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়—মতিবাবুর ওপর সব কিছু বিশ্বাস রেখে। মতিলাল কিশোরীকে তিরস্কার করতে গিয়ে বিপরীত ফল পান। কিশোরী বলে, সেও বাবুরামের সঙ্গে জেলে যাবে। মতিলাল বাবুরামকে তিরস্কার করে বলেন,—"স্ত্রীর কি শিক্ষাই দিয়েছ।......এটি শেখাতে পারনি যে রমণীজন্ম শুধু প্রেয়সী হবার জন্য নয়—তাকে কন্যার কর্ত্তব্য—ভগিনীর কর্ত্তব্য—মাতার কর্ত্তব্য—গৃহস্বামীর মহিষীর কর্ত্তব্য—আর সকল সংসারের প্রতি স্নেহময়ী দেবতার কর্ত্তব্য পালন করতে হয়।......'প্রেয়সী প্রেয়সী'—নির্জ্জঞ্জাল যৌবন বড় মধুর—না? কিন্তু একবার ভাব দেখি যে, এই বৌমার বয়স হবে, এঁর সন্তানাদি হবে, তারপর

সেই ছেলেরা বড় হয়ে তোমাদের দেখে মনে করে যদি যে, মা 'বাবার প্রেয়সী' আর বাবুরাম বাবা 'মার প্রাণনাথ'—তাহলে?" বাবুরাম লজ্জায় "দূর দূর" করে ওঠে। কিশোরী আর সখীরা জিভ কেটে পালিয়ে যায়। বাবুরাম মতিলালকে বলে,—"চল মামা চল, এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও। খুব গালও দিলে, আক্কেলও দিলে বাবা!"

ছবি বা বড়দিনের পঞ্চ রং (কলিকাতা—১৮৯৬ খৃঃ)—দুর্গাদাস দে॥ নামকরণে পাশ্চাত্য সংস্কার প্রচ্ছন্ন। ইংরেজীতে দৃশ্য বল্‌তে সাধারণতঃ অস্বাভাবিক দৃশ্যকেই নির্দেশ করি। প্রহসনকার তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণে যে চিত্র উপস্থিত করেছেন, তার অস্বাভাবিকত্ব (abnormality) নির্দেশ করে তিনি তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণকে সমর্থনপুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন।

কাহিনী।—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নদেরচাঁদ ভেবেছিলেন মেয়েকে পাশ দেওয়াতে পারলে মেয়ের বিয়েতে খরচা কম লাগ্‌বে। এই বিশ্বাসে তাঁর মেয়ে মিস্ বঙ্কিম বিনোদিনী মিত্র্ক "B. A. (Honor)" পাশ করালেন। শেষে অনেক কষ্টে কালাচাঁদের ছেলে রামদাসকে পাত্র পাওয়া গেলো। রামদাস এণ্ট্রান্স পাশ দিয়েছে। কিন্তু তার বাবা কালাচাঁদ অত্যন্ত অর্থলোভী। সে বলে, সে শিক্ষিতা অশিক্ষিতা বোঝে না, ডেপুটীর মেয়ে হোক বা সাধারণ মেয়ে হোক—পাওনা তার চাই-ই। শেষে নদেরচাঁদ তাতেই রাজী হয়েছেন। কিন্তু আক্ষেপ করেন,—"মেয়েটাকে লেখাপড়া শেখালেম, বড় করে রাখলেম, তবু টাকা খরচ।" মেয়ের বিবিয়ানা চালে চলবার ইন্ধন যোগাড় করতেও নদেরচাঁদের কম খরচ হয় নি।

বঙ্কিম বিনোদিনী শুনতে পায় তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। সে নাটক নভেল পড়ে নিজেকে হিরোইন ভাবে, নভেলের হিরো-ই তার পছন্দ। সে আক্ষেপ করে বলে,—"প্রণয়ে যুদ্ধ হলো না, বিদ্রোহ হলো না, বিচ্ছেদ হলো না, বিরহ হলো না, যাতনা হলো না, আমার হিষ্টিরিয়া হলো না, আমার সহজ বিবাহ হবে।" ঠাকুরমা ভেবে অবাক্ হয় এ বিয়ে তার পছন্দ নয় কেন! বর কত পড়েছে, একটা পাশ করেছে, আমাদের সময় যদি শুনতুম বর মুহুরিগিরি কাজ করে, তাহলে যে কত আনন্দ হতো, বল্‌তে পারি না।" ঠাকুরমাকে বঙ্কিম বিনোদিনী জিজ্ঞেস করে, বরের নাম হেমচন্দ্র না জগৎ সিংহ? ঠাকুরমা উত্তর দেয়, সিংহীদের বাড়ীর কেউ নয়, দত্ত বাড়ীর রামদাস। বঙ্কিম বিনোদিনী বলে, —"আমি অনেক নাটক পড়েছি, অনেক নভেল পড়েছি, অনেক নামের

ক্যাটালগ পড়েছি, কিন্তু পতির নাম রামদাস কখন শুনিনি।...'রামদাস-বঙ্কিম বিনোদিনী' বলে যদি কেউ বই লেখে, সে বই ফোটে না কাটে?" এ সব দেখে আতঙ্কিত ঠাকুরমা ভাবে,—"তখনি ত বলেছিলুম মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখান কিছুই নয়। নদেরচাঁদ তা শুনলে না। কেবল বল্‌তো ঠাকুরমা লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে রাখলে বের সময় টাকা লাগবে না। তা এখন কি আর সে কাল আছে; এখন ওজন করে টাকা নেয়, মেয়ের বাপকে পথের ভিখিরি করে। এখন দেখছি নদের এ কুলও গেল, ও কুলও গেল।" যাহোক মেয়ের কথার অতো মূল্য দেন না ঠাকুরমা।

জিম্‌ন্যাষ্টিক গ্রাউণ্ডে জিম্‌ন্যাষ্টিক বেশে প্যাঁজকলি, সুস্‌নীলতা, দাদখানি, পমেটম, কুসুম, বিগ্‌নোলিয়া ইত্যাদি উচ্চশিক্ষিতারা ব্যায়াম করে। সেকেলে ঝি এসব দেখে অবাক হলে সুস্‌নীলতা তাকে বলে,—"ডিয়ার ঝি! তুমি পৃথিবীর খবর জান না তাই ভয় কচ্ছ। ইউরোপ পানে চেয়ে দেখ, আমেরিকা পানে চেয়ে দেখ, মার্কিন পানে চেয়ে দেখ, সেখানকার স্ত্রীলোকের পানে চেয়ে দেখ তারা কি কচ্ছে। যে সুসভ্য দেশে স্ত্রীলোকের প্রাদুর্ভাব, সেই সুসভ্য সমাজের পুরুষেরাও নিরীহ। আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে অভয় পেয়েছি। জিমনাষ্টিক্ বিদ্যা শিক্ষা করেছি।"

বঙ্কিম বিনোদিনী ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে তার বিপদের কথা জানায়। এরা বঙ্কিম বিনোদিনীকে এই বিয়েতে কন্‌সেণ্ট দিতে বারণ করে। বঙ্কিম বিনোদিনী হিরোর জন্যে আক্ষেপ করে,—"আমায় জগৎসিংহ দাও, নয় চন্দ্রশেখরকে দাও, নয় প্রতাপকে দাও; আর যদি জীবিত হিরো দাও, তবে হেমচন্দ্রকে দাও, নয় রবীন্দ্রনাথকে দাও, নয় নবীনচন্দ্রকে দাও, নয় অক্ষয়চন্দ্রকে দাও, নয় চন্দ্রনাথকে দাও। কিন্তু ওঃ, আর একজন আছে, মনে পড়ছে ইন্দ্রনাথ !!!" কিন্তু জীবিত হিরোদের কথা ভেবে আবার আক্ষেপও আসে।—"হেমচন্দ্র! ওহো খিদিরপুরের হেমচন্দ্র! 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' কই আর তো তোমার প্রাণ মাতান—মন ওড়ান কবিতা নাই, এখন তোমার কবিতাই বল, আর প্রেমই বল, আর যাই বল সব হাইকোর্টের প্লিডার্স লাইব্রেরিতে প্রেজেণ্ট করেছ।...তারপর নবীনচন্দ্র, আমাদের চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র, হা সিরাজ মহিষী! হা রঙ্গমতি! কিন্তু এখন নবীন—আর সে নবীন নাই, প্রবীণ হয়েছেন!" বঙ্কিম বিনোদিনী জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে বলে,—"যদি তোমরা আমায় জীবিত পতি দাও—তবে যিনি সেক্সপিয়ারের মত নাটক লিখ্‌তে

পারেন, যিনি গ্ল্যাডষ্টোনের মত বক্তৃতা করতে পারেন, যিনি নেপোলিয়নের মত বীর হতে পারেন,—এদিকে যিনি লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সেলের মেম্বর, ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের নেতা, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য, রথচাইল্ডের মত ধনী, রেলীর মত মার্চেণ্ট, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের মত রসিক, মদনের মত সুপুরুষ হবেন তাঁহাকে একদিন পতিত্বে বরণ করিলেও করিতে পারি!...আমার ভাগ্যে রামদাস!!" রামদাসের কথা ভাবতে ভাবতে সে মূর্ছা যায়। সবাই মিলে তার মূর্ছা ভাঙায়।

ডেপুটীর বাড়ীতে বিবাহ বাসর। ডেপুটী ওপরে চা খাচ্ছিলেন। নীচে অনেক লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। বরকর্তা কালাচাঁদ ডেপুটীকে না দেখে চটে যায়। সে টাকাগুলো নিয়ে যাবার জন্যে—হাতের কাছে অন্য থলে না পেয়ে বাজারের মাছের থলেটা এনেছে। তাড়াতাড়ির জন্যে ধোয়াও হয় নি। আঁশটে গন্ধ এখনো আছে। যাহোক সংবাদ পেযে সে ওপরে গিয়ে ডেপুটীর কাছে প্রথমেই টাকা চায়। টাকা না হলে সে নাকি রামুকে পিঁড়িতে বস্‌তে দেবে না। ডেপুটী তাকে চেক্‌ লিখে দেন। চেক্‌ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সে বলে,—"আহা ওর নাম কি জানেন ডেপুটীবাবু মহাশয় লোক, চা-টা খান্‌ বটে, কিন্তু দেনা পাওনায় খুব সরল। ওর নাম কি যাবা মাত্রেই সমস্ত টাকা একেবারেই রোক্‌ শোধ।" চেক্‌ ট্যাঁকে গোঁজে কালাচাঁদ, কিন্তু মাছের থলে সে ফেলে রেখে যাবে না। এটাই তার লক্ষ্মী। সকলে অপেক্ষা করে। বঙ্কিম বিনোদিনী এখন এন্‌গেজ্‌ড্‌। কাজ শেষ হলে তারপর পিঁড়িতে বস্‌বে। শেষে চিঠি দিয়ে বার্তা জানিয়ে বঙ্কিম বিনোদিনী উপস্থিত হয়। বরের চেহারা কনের বান্ধবীদের কাছে সভ্যজনোচিত বলে মনে হয় না। কপালে চন্দনের ফোঁটায় আরও কিম্ভূত চেহারা নাকি হয়েছে। প্যাজকলি হনি-সোপ দিয়ে চন্দনের দাগ উঠিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে সিভিল করে নিয়ে আসবার জন্যে সে ম্যাজেণ্টাকে বর নিয়ে ড্রেসিংরুমে যেতে বলে। এসব নির্দেশ দিতে গিয়ে প্যাঁজকলির মাথা ধরে। গোলাপজলের ডিকেণ্টার আনবার জন্য অডিকোলনকে অনুরোধ করলে অডিকোলন বলে—জল লেগে তার সেমিজ-জ্যাকেট নষ্ট হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে বর এসে নতুন ড্রেসে ছাঁদনা তলায় বসে। চারজন গ্রাজুয়েট্‌ 'বিনো'-কে নিয়ে আসে। মালা বদল হয়। সকলে বলে ওঠে,—"God bless the happy pair." হ্যাণ্ডসেক্‌ ও শুভদৃষ্টি শেষ হয়। তারপর সাত পাক শেষ হলে বর-কনেকে "হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে" বলতে বলতে

বাসরে নিয়ে চলে। ওদিকে নিমন্ত্রণ সভায় মাতালরা জুটে মাতলামো সুরু করে দেয়।

রামদাস কনে ও তার সঙ্গিনীদের চাল-চলন বুঝে নেয়। বশ্যতা স্বীকার করাই এক্ষেত্রে ভালো, এই মনে করে রামদাস তাদের বলে,—"আপনারা আমাকে যা বল্‌বেন, আমি বিনা ওজরে উইদাউট এনি কন্‌সিডারেসন তা করবো।" রামু বলে,—"হিন্দুর কুসংস্কার দূর করিবার জন্য বিনোকে লইয়া আমি বিলাত যাব। দুষ্ট কুসংস্কারই আমাদের দেশকে নষ্ট করিতেছে, পেণ্টুলেনের পরিবর্ত্তে বস্ত্র পরাইতেছে, মটনের পরিবর্ত্তে মোচার ঘণ্ট খাওয়াইতেছে, আর বিদ্যার্থে বিলাত যাওয়ার পথে বিষম বাধা স্থাপন করিতেছে।" সভ্য হবার জন্যে রামু নাকি চব্বিশ ঘণ্টাই এদের কাছে থাক্‌তে রাজী—যদি এদের হজব্যাণ্ডরা আপত্তি না করে! দাদখানি তখন বলে ওঠে,—"সেরকম হজব্যাণ্ড আমরা লাইক্ করি না, আর সে রকম হজব্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা মিক্স্‌ও করি না। হজব্যাণ্ড অবাধ্য হবে না, হজব্যাণ্ড ফারনিচারের মত থাক্‌বে যেখানে সাজিয়ে রাখবো, সেইখানেই থাক্‌বে।" রামদাস ইচ্ছে করে নভেলী ঢঙে কথাবার্তা বলে। কনে বঙ্কিম বিনোদিনী তখন একটু আশ্বস্ত হয়।—"নভেলী ধরণটা আছে দেখ্‌ছি নভেলী আইডিয়াও কতকটা আছে। তবে একটু পিউরিফাই করে নিতে হবে।" তারপর চলে গান বাজনা। রাত তিনটের পর বর-কনেকে রেখে তারা চলে যায়। রামদাস বঙ্কিম বিনোদিনীর কাছে উচ্ছ্বাস জানাতে গেলে বিনোদিনী আক্ষেপ করে বলে, কলেজে তার আর পড়া হবে না। তবে বিনোদিনী আশা রাখে, রামদাস তার কাছে একটু পড়াশোনা করলেই এফ্. এ-তে ফার্ষ্ট হবে। তারপর বি. এ. পাশ করে দু'জনে মিলে পত্রিকা চালাবে!

রামদাসের বিয়ে দিয়ে রামদাসের বাবা কালাচাঁদ সেই টাকায় কাশীতে চলে যায়। রামদাস চোখে অন্ধকার দেখে। তার হোমিও চিকিৎসার ব্যবসা অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনে তার যেমন ফর্দ দেয়, সেই মতো জিনিষ আন্‌তে গিয়ে তার সবই যায়। পাছে রামদাস স্ত্রীর অলঙ্কার ধরে টানাটানি করে, তাই বিনো বলে,—"তোমার জন্যে আমি নিঃশ্বেস ফেল্‌তে পারি, কাঁদতে পারি, চাঁদের হাসি চুরি করতে পারি, এলোচুলে গালে হাত দিয়ে ভাবতে পারি, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে পারি, এমন কি যদি তুমি বল, হিষ্টিরিয়া করতে পারি। কিন্তু প্রাণনাথ! তুমি নিশ্চয় জেনো, যে, সকল কাজে সাধ আছে—

কিন্তু অলঙ্কার না পরিলে অনেক কাজে সাধ মেটে না।" রামদাস অভয় দেয়। বিনোদিনী রামদাসকে তার অভাবের কথা বলে। চোদ্দো বছর বয়সে জ্যাকেট ষোলো বছর বয়সেও পরতে হচ্ছে। 'ম্যাকেসার' 'ল্যাবেণ্ডার' সব কিছুই ফুরিয়ে গেছে। গালে ঠোঁটে দেবার জন্যে 'ব্লুম্ অব্ রোজ'ও আর নেই। রামদাস তার পয়সার অভাব জানালে—মহারানীর শাস্তি দেবার রীতিতে বিনোদিনী ঝিকে দিয়ে রামদাসের কান মলিয়ে তাকে রান্নাঘরে আটকিয়ে রাখে। রামদাসের কান্নার খবর ঝির মুখে শুনে বিনোদিনী হিরোদের কান্নার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে উল্লসিত হয়।

এদিকে রামদাস দেনায় দেনায় ডুবে গেছে। সে স্ত্রীকে বলে, হয়তো তাকে জেলে যেতে হবে। বিনোদিনী তখন বলে,—"আর আমার ভয় নাই, প্রাণেশ্বর প্রাণ খুলে বল কবে তুমি জেলে যাবে? কবে জগদীশ্বরের কৃপায় সেই শুভদিন উদয় হবে! আমি দুঃখের জীবন বহন করেছি, কখন মন খুলে প্রাণ ভরে কাঁদতে পাইনে। বীরত্ব দেখাতে পারি নে, আমার সেই শুভদিন এসেছে।" স্ত্রীর সঙ্গে এইসব কথাবার্তার সময়েই পেয়াদা এসে রামদাসকে ধরে নিয়ে যায়। এদিকে বঙ্কিম বিনোদিনী তাকে সান্ত্বনা দেয়—"প্রাণনাথ! একটানা প্রণয়, প্রণয় নয়! প্রণয়ে জোয়ার ভাঁটা চাই! প্রণয়ে বিরহ চাই।" স্বামী চলে গেলে বঙ্কিম বিনোদিনী ভাবে,—"আজ এক্সমাস্, সাতপুকুরে ফ্লাওয়ার সো'র সাম্নে বিরহ সমিতি করতে হবে, যাই।"

এদিকে সাতপুকুরের বাগানে ফ্লাওয়ার সো'র সাম্নে সঙ্গিনীদের চোখের ওপর তার বিরহ পর্ব সুরু হয়। "আনন্দ! আনন্দ! উৎসাহ! উৎসাহ! সোৎসাহে বুকে বিরহ প্লে করছে, ও প্রাণে হিষ্টিরিয়ার হরিকেন্ ছুট্‌ছে।" ঝি কিছু বল্‌তে গেলে বিনোদিনী বলে,—"ঝি! আমার ফিলিং আস্‌ছে, তুমি থাম।" প্যাজকলিকে সে বলে,—"প্যাজকলি! ট্রঙ্ক থেকে বিরহের সব জিনিষপত্র বার কর, বোধহয় আর দেরি নেই। ফিলিংএর স্পীরিট্‌টা মধ্যে মধ্যে উড়ু উড়ু হচ্ছে, তবে আমার প্রাণবায়ু বিরহী রামুর কাছে গিয়েছে।" ঝি ভূতের "রোজা" ডাক্‌তে যায়। রোজা এসে বলে,—"বাবা! এ সেকেলে ভূত নয়, এ হালি ভূত। দাও এসেন্স দাও, ফুলের তোড়া দাও, একখানা ছবির বই দাও, একখানা সংবাদ পত্র দাও, যেন বঙ্গ-বাসী দিও না, ও টিকিওয়ালা ভূত নয়।" এমন সময় বিনোদিনী খবর পায় রামদাস 'প্রেসিডেন্ট' জেলে বন্দী। বঙ্কিম বিনোদিনী তখন জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে

গিয়ে বলে,—"আমার বধূকে দাও।" রক্ষীকে সে দ্বার ছেড়ে দিতে বলে, নইলে—প্রাণনাথকে না পেলে—সে কারাগারের দ্বারে প্রাণবিসর্জন করবে। সাহেব তখন সব কিছু বুঝতে পেরে বিনোদিনীকে বলে,—"হিন্দুরা আমাদের সকল বিষয় অনুকরণ করিতে গিয়া জানোয়ার পদে অভিষিক্ত হন, আমরা সেই জানোয়ারকে লইয়া নাচাইয়া থাকি।" হিন্দুরা নিজেদের মান নিজেরাই নষ্ট করছে। বঙ্কিম বিনোদিনীই তার স্বামীর জেলের জন্যে দায়ী। অবশ্য এবারের মতো সাহেব নিজেই ঋণশোধ করে দিয়ে রামদাসকে ছেড়ে দিচ্ছে; কিন্তু বঙ্কিম বিনোদিনী আর কখনো যেন এমন হাস্যকর অনুকরণ না করে। সাহেবরা এসব ঘৃণা করে। "বিবিয়ানা পরিত্যাগ কর, নিজ স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া গুরুজনার প্রতি ভক্তি রাখিয়া স্বচ্ছন্দে—সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর গে। আর এমন কুসংস্কারে লিপ্ত হইও না।"

বিনোদিনীর মনে আক্ষেপ হয়। "আমি কি পাপিনী, আমি আমাদের পবিত্র ধর্ম্মকে অবহেলা করেছি! একজন বিজাতীয়র মুখে হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতে হইল। আর আমি হিন্দু হয়ে বিজাতীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে গিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, ধিক আমাকে! ভগবান! রক্ষা করুন।" ডেপুটী নদের চাঁদ ইতিমধ্যে খবর পেয়ে আসেন। বিনোদিনী তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। রামদাস ছাড়া পেয়ে যায়। বিনোদিনী গিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে। সাহেবকে বিনোদিনী ধর্মপিতা বলে শ্রদ্ধা জানায়। নদেরচাঁদও ভাবে,—"আমি সাহেবীয়ানা করে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করেছি, আমার নিতান্ত ইচ্ছা একবার তীর্থদর্শন করে আসি, এস আমরা তীর্থ দর্শনে যাই।"

পাঁচ পাগলের ঘর (কলিকাতা—১৮৮০ খৃঃ)—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়॥ পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দিলে যে কুফল ফলে, তার চিত্র স্ত্রীশিক্ষার বিকৃতির সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। পারিবারিক শাসনে নিষ্ক্রিয়তা যে সামাজিক শাসনকেও অচল করে দেয়, এই মতবাদ সংগঠক রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ এখানে উপস্থাপিত।

কাহিনী।—রামনাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী পুঁটু ওরফে ডালিম তার বৈমাত্রেয় ভাই শিবু এবং তার বন্ধু নীলুর সঙ্গে নিরুদ্দিষ্টা হয়। সবাই শিবুকে ভালছেলে বলেই জানে। মেয়ে মহলে এই নিয়ে কথা উঠলে কাদু বলে,—"নিজের বোনই পার পায় না তো এ আবার বৈমাত্রেয় বোন! কালে কালে দেশে এক

নতুন মহাভারত সৃষ্টি হবে! শোনা যায় পুঁটু অনেক টাকাকড়ি আর গয়না সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। রমানাথবাবু অত্যন্ত সংস্কার-মুক্ত। তিনি অবশ্য এদের খুঁজতে যাবেন, তবে এ সবে তিনি খুব একটা দোষ দেখেন না। বলেন,—"পাঁচ পাগলের ঘর, পাঁচটা পাঁচরকম হয়। তা বলে কি ঘরের ধন ভাসিয়ে দেব?"

রমানাথবাবু খবর পেলেন পুঁটুকে ফরাসডাঙ্গার রতিবৈষ্ণবীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে। তখন তিনি রতিবৈষ্ণবীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। রতি তাঁকে আদর আপ্যায়ন করে বসায়। পুঁটু ঘুম ভেঙে সাম্‌নেই জ্যাঠামশায়কে দেখ্‌তে পেলো। পুঁটু রতিকে বলে, তার শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, পুঁটুর জন্যে রতি মদ আর চানাচুর নিয়ে আসুক। রতি মদ চানাচুর আন্‌তে যায়। জ্যাঠামশায় পুঁটুকে বাড়ী ফিরতে বলেন। তিনিই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সে কেন বাড়ী ছেড়ে এলো? তার তো কোনো অভাব ছিলো না! পুঁটু জবাব দেয়,—"বিয়ে দিয়েছিলে এক মুখ্যু বাঙ্গালের সঙ্গে! আমি তো মুখ্যু নই আমি লেখাপড়া জানি।"—মুখ্যু বাঙ্গাল স্বামীর সঙ্গে সে থাক্‌তে চায় না। ইতিমধ্যে রতি মদ নিয়ে এলে পুঁটু মদ্যপান করে। জ্যাঠামশায়কেও জোর করে পান করায়। জ্যাঠামশায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পান করেন। ভাবেন, মদের ঝোঁকে দুটো ভালো কথা বলে পুঁটুকে ভুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না।—কিন্তু পুঁটু বাড়ী যেতে চায় না। সে বলে,—"তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো,—আমরা তা পারি না?—কেন? আমরাও মানুষ, হাত পা আছে। ঘরে আটকা থাকবো কেন? আমরা পাঁচ জায়গায় হাওয়া খেয়ে বেড়াবো, আহ্লাদ করবো। দাদা আমাকে এই সব কথা বলেছে। আমায় স্বাধীন করবার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছে।"—এদিকে জ্যাঠামশায়ের নেশার ঘোর লেগেছে। তিনি পুঁটুর সঙ্গে ওখানেই মাতলামি সুরু করে দেন, গান করেন, আমোদ করেন। তিনি যাবার সময় বল্‌লেন, পরদিন আবার আস্‌বেন। শিবু, নীলু, গদাই—এরা তখন ছিলো না। পরে তারা এসে মদ খেয়ে আবার চলে যায়।

এদিকে রমানাথকে থানায় নিয়ে আসা হয়। রমানাথের ভয় হয়, চুরির দায়ে তাকে জেলে যেতে হবে! তিনি ভাবেন, এই রাতেই তিনি যদি ছাড়া পান, তাহলে তিনি পুঁটুর কাছে গিয়ে তাকে ভুলিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এমন সময় নীলু, গদাই আর শিবুকেও দারোগার কাছে এনে

হাজির করা হয়। তারা নাকি মদের নেশায় বলেছে যে ডালিম (পুঁটু) তাদের বোন। সে কতো দারোগাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারে। যাহোক রমানাথ ছাড়া পান। তিনি সেই রাতেই পুঁটুর দরজায় ধাক্কা দেন। কিন্তু পুঁটু দরজা খোলে না। বাড়ী ফিরতে তার ঘোর অমত।

পুঁটু রতিবৈষ্ণবীর বাড়ীতে থেকে ভাবে, বাড়ী ফিরতে তার বয়ে গেছে। জ্যাঠামশায়কে সে দরজা খুলে দেয় নি। দাদা, নীলু, গদাই—এরা রসিকতা জানে। এদের খরচায় এখন চল্‌ছে। পুঁটুর কাছে জহরদ্দী এসেছিলো। মাসে মাসে সে পাঁচশো টাকা দেবে বলেছে।—পুঁটু এসব কথা ভাবছে, এমন সময় বাইরের থেকে তাকে কে যেন ডাকে। পুঁটু দরজা খুল্‌লে শিবু, নীলু, আর গদাইকে বেঁধে নিয়ে রঘুবর আসে। এরা নাকি রেলে কাল রাতে মাতলামি করবার দায়ে ধরা পড়েছে। এরা বলেছে, ডালিম নাকি এদের বোন। এদের কথা সত্যি কিনা, সেটা জানবার জন্যে রঘুবর এখানে এসেছে। পুঁটু রঘুবরকে ছয় টাকা ঘুষ দিতে চাইলো—যাতে সে এদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু রঘুবর জবাব দেয়, চালানী আসামীকে ছাড়া চল্‌বে না—দারোগাবাবু নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সে চেষ্টা করে দেখ্‌বে। পুঁটু—শিবু, নীলু আর গদাইকে বলে, তারা এখন চলে যাক, তাকে আর একজন রেখেছে, তার কাছেই পুঁটু থাক্‌বে। আক্ষেপ করে শিবু বলে,—এই জন্যেই কি তাকে সে বের করে এনেছে! শেষে গালাগালি দিতে দিতে চলে যায় তারা। রঘুবর ফিরে এসে পুঁটুকে বলে, আসামীদের ছাড়া হবে না। তারা নাকি থানায় বলেছে যে, ডালিমকে তারা ঘর থেকে বের করে এনেছে, এবং এখানে এনে রেখেছে। তাছাড়া রঘুবর পুঁটুকে জানিয়ে গেলো যে দারোগা সাহেব পুঁটুর কাছে আস্‌তে চায়। পুঁটু ভাবে, শুনেছে দারোগা লোকটি ভালো, অনেক টাকা, বয়সও কম। জহরদ্দীর থেকেও ভালো হবে। জহরদ্দী পুঁটুকে কলকাতায় নিয়ে যাবে বলেছে। তা, দারোগাকেও না হয় কলকাতায় নিয়ে যেতে বল্‌বে। পুঁটু রতিকে এবার বল্‌বে—সে আর এখানে থাক্‌বে না।

আদালতে শিবু, নীলু আর গদাইয়ের বিচার হলো—সাত বছর করে দ্বীপান্তর। পুঁটুকে জহরদ্দীও নেয় নি, দারোগাও নেয় নি। পুঁটু বাধ্য হয়ে তার সেই বাঙ্গাল মুখ্যু স্বামী যদুনাথের সঙ্গে থাকতে চাইলো। কিন্তু যদুনাথ তাকে লাথি মেরে ফেলে দিলো। শিবু আদালতের সব দর্শককে ডেকে বলে,—"আমি আমার বোনকে ঘরের বের করেছিলাম। ভোগ করতে

পারলাম না। উপযুক্ত শাস্তি পেলাম। পৃথিবীর আর সকলে যেন আমার মতো কার্য্য না করে। যদি করে, আমার মতোই দুর্গতি হবে।"

সব সম্বল হারিয়ে পুঁটু কলকাতায় রাস্তার পাশে ছিন্নবস্ত্রে পড়ে থাকে। একজন লোক পথ চলতে চলতে তাকে "ডালিম" বলে চিনতে পারলো। সে পুঁটুকে গালাগালি দিলো, গায়ে থুতু দিলো, তারপর চলে গেলো। পুঁটু দুঃখ করে আর ভাবে, এই লোকটিই একদিন তাকে পায়ে ধরে সেধেছে! আর একজন লোকও এসে ঠাট্টা করে যায়,—নাগর হারিয়েছে বলে সে কাঁদছে! একজন মাতাল এসে পুঁটুর সঙ্গে মাতলামো করে চলে গেলো। শেষে নিতম্বিনী নামে এক বেশ্যার সঙ্গে তার দেখা হলো। নিতম্বিনী তাকে নিজের ঘরে এনে ঢোকায়। ঐ ঘরে নবীনকালী, বসন্ত ইত্যাদি চারজনে মিলে থাকে। পুঁটু গঙ্গায় ডুবে মরতে চায়। নিতম্বিনী তাকে সান্ত্বনা দেয়। এমন সময় পরেশ নামে একজন এসে পুঁটুকে বলে যে, পুঁটুকে তার সঙ্গে বাড়ী যেতে হবে। পুঁটুর বাপ তার নাকি নেয়াই হয়। সমাজে তাদেরকে একঘরে করেছে। তবুও তারা পুঁটুকে ঘরে নেবে মনস্থ করেছে। পরেশ পুঁটুকে নিয়ে যায়। কার্য সিদ্ধি করে বাপের বাড়ীর নাম করে এক জায়গায় তাকে ফেলে রেখে পরেশ পালিয়ে যায়। সারাদিন পুঁটুর খাবার জোটে নি। খিদেতে সে কাতর হয়ে পড়ে। এমন সময় ছোটোবেলাকার খেলার সাথী কানুর সঙ্গে তার দেখা হলো। কানু তাকে খেতে দিলো। সে বললো, পুঁটু তার কাছেই থাকুক, সে যত্ন করবে। পুঁটু বললো,—"যত্ন আমার এ জগতে জন্মের মত ঘুচে গেচে। জ্যাঠামশায় বলেছিলেন পাঁচ পাগলের ঘর, সেটি সত্যই ঘটলো।"

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে লেখা আরও কতকগুলো প্রহসনের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। নীচে এ ধরনের কতকগুলো প্রহসন উপস্থাপিত করা হলো।—

দেশাচার (১৮৭২ খৃঃ)—অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস সমাজমনে কতোখানি প্রবল, তা প্রহসনটির মধ্যে দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রহসনটিতে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হলেও প্রদর্শনীর সুবিধার জন্যে প্রহসনটিকে এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে।

কলির মেয়ে ও নব্যবাবু (১৮৮৫ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত॥ আধুনিক-কালের একটি বাঙালী তরুণী তার সামাজিক, নৈতিক এবং পারিবারিক সব

কিছু বিধিনিষেধের ওপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতো। সে সব ব্যাপারেই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা এবং সুখের ওপরেই প্রাধান্য দিতো। সে সকলকেই ঘৃণার চোখে দেখতো এবং সর্বদা নিজের সুখের জন্যে নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতো। স্বামীর ওপর দাসীর মতো আনুগত্যকে সে কুসংস্কার বলে মন্তব্য প্রকাশ করতো। বাবুটিও কম নন। তিনি শুধু মদ খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানতেন কিনা সন্দেহ। অন্য সবার কোনো ব্যাপারই তাঁর মনঃপুত হতো না। লেখক স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের চরিত্রকেই অপছন্দের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

ছোট বৌর গুপ্ত প্রেম (১৮৮৬ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত (কপিরাইট্ হোল্ডার—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।)॥ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার কুফলের কথা প্রহসনটিতে বর্ণিত। ছোটো বৌ শিক্ষিত এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু তার এই শিক্ষা শেষে তাকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করে।

বৌবাবু (১৮৮৯ খৃঃ)—সিদ্ধেশ্বর রায়॥ স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা নষ্ট করে দাম্পত্যজীবনকে যে বিষময় করে তোলে, প্রহসনে তা বর্ণিত হয়েছে।

অবলা কি প্রবলা (১৮৮৯ খৃঃ)—বিপিনবিহারী দে॥ স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে স্বামীর স্ত্রীসর্বস্বতা কিভাবে সর্বনাশ ডেকে আনে, প্রহসনটিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

শ্রীযুক্তা বৌ-বিবি—(১৮৯০ খৃঃ)—রাধাবিনোদ হালদার॥ বিবিয়ানা ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় স্ত্রীসমাজ কেমন অস্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করেছে, প্রহসনটিতে তার চিত্র পাওয়া যাবে।

আক্কেল সেলামি বা উদ্ভট মিলন (১৮৯৫ খৃঃ)—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী॥ প্রহসনটি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখা। স্ত্রীশিক্ষা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতা ও অনাচারের জন্ম হয়েছে, লেখক সম্ভবতঃ এই মত পোষণ করেন। একটি হিন্দু মেয়ে কালেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তার বয়স কুড়ি হতে চললো, তবুও সে অবিবাহিতা। কোনো গোঁড়া হিন্দু যখন তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হয় না, তখন তার মা তার সঙ্গে এক ব্রাহ্মের বিয়ের চেষ্টা করলো। কিন্তু এতে তার বাবা আপত্তি তোলেন। তাঁর ভয় হয়—এই বিয়ে হলে তিনি জাতিচ্যুত হবেন। শেষে বালিকাটি এক সাহেবকে পছন্দ করে তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলো। তার বাবা এতে আক্কেল সেলামি লাভ করলেন। কেন

তিনি তাঁর কন্যাকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়েছিলেন। শেষে তাঁর বক্তৃতায় নিজ নিজ কন্যাদের লেখাপড়া শেখাতে বারণ করা হয়েছে সবাইকে।

মাগমুখো ছেলে (১৮৯৫ খৃঃ)—এস্. বি. পাল॥ একজন আধুনিক যুবকের স্ত্রী শিক্ষিতা। স্ত্রীটি পরিবারের সকলের কাছেই অবিনীত ছিলো। এমন কি স্বামীকেও সে ভৃত্যের মতো গণ্য করতো। এই স্ত্রীর প্ররোচনায় তার স্বামী তার বাবাকে অত্যন্ত পীড়ন করতো এবং স্ত্রীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করতো। প্রহসনকারের মত, এই ধরনের স্বভাব আজকালকার অধিকাংশ যুবকের মধ্যেই দেখা যায়।

মেয়ে ছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা (১৮৯৭ খৃঃ)—হরিপদ ভট্টাচার্য (?)॥ একটি শিক্ষিতা স্ত্রী তার দাম্পত্য জীবনে সন্তুষ্ট ছিলো না। তাই সে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলো। সে তার উপপতিকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে নিজের স্বামীকে একদিন হত্যা করে। এতে পরে তার অনুশোচনা হয় এবং সে আত্মহত্যা করে। মরবার আগে সে বলে যায়—সব মা বাবাদের, তাঁরা যেন কখনো তাঁদের মেয়েকে লেখাপড়া না শেখান।

আমার ঝক্‌মারীর মাশুল— (১৮৯৯ খৃঃ)—পঞ্চানন রায়চৌধুরী॥ এক ব্যক্তি একটি অনাথা বালিকাকে পালন করেন এবং তার শিক্ষার ওপর দৃষ্টি দেন। তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েটির বিয়ে দিয়ে তিনি মোটা দাঁও মারিবেন। ১৬ বছর পর্যন্ত তার বিয়ে দেওয়া হলো না। ইতিমধ্যে এক ঘটক আসে। নির্ধারিত জামাই লোকটিকে পাঁচশত টাকা পণ দিতে প্রতিশ্রুত হয়। যথারীতি বিয়ের দিনও স্থির হয়। ঠিক এমন সময় মেয়েটি তার প্রণয়ীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। পালক পিতার ওপর সে বিন্দুমাত্র টানও অনুভব করে না! এতে পিতা এই জ্ঞান লাভ করলেন যে, একদিকে স্ত্রীশিক্ষা এবং অন্যদিকে তাঁর অর্থলোভ এই পরিণামের জন্যে দায়ী। তিনি খেদ করেন—কেন তিনি তাঁর পালিতা মেয়েটিকে জেনানা মিশনের মেয়েদের হাতে শিক্ষার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন! স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের কটাক্ষ অনুভব করা যায়।

এ ছাড়া আরও অনেক দুষ্প্রাপ্য প্রহসন আছে যেগুলোর কেবলমাত্র নামই পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে অন্যান্য সামান্য কিছু আভাস ইঙ্গিত থেকে বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতই মাত্র পাওয়া যায়, পরিচয় পাওয়া যায় না। এগুলোও

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। যেমন,—**পাস করা আতুরে বৌ** (১৮৯২ খৃঃ)—উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ; **মিস্ বিনো বিবি, বি. এ.** (১৮৯৮ খৃঃ)—দুর্গাদাস দে; **দোজবরে ভাতারের তেজবরে মাগ** (১৮৮৭ খৃঃ)—রাধাবিনোদ হালদার—ইত্যাদি কয়েকটি প্রহসনের নাম উল্লেখ করা চলে। অনুসন্ধান করলে আরও হয়তো, এ ধরনের কিছু প্রহসনের নাম পাওয়া সম্ভবপর।

৪। ব্রাহ্মসমাজ-ভণ্ডামি—ও হাস্যকর আচার-আচরণ

ব্রাহ্মসমাজ সর্বজন-শ্রদ্ধেয় একটি সম্প্রদায়-ভিত্তিক সমাজ। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত কিছু ব্যক্তির ভণ্ডামি এবং হাস্যকর আচার-আচরণের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাই। তা অনেকক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে নিযন্ত্রিত! ব্রাহ্মধর্ম নব্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। রামমোহনের সময় থেকে রক্ষণশীলদল ব্রাহ্মসমাজের সংস্কৃতির বিরোধী ছিলো। শিবনাথ শাস্ত্রী এ সম্পর্কে লিখেছেন,—"ব্রহ্মসভা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দুসমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল। তাঁহাদের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক বিষয়ে তাঁহার আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়া পথে ঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্বদা কটূক্তি বর্ষণ হইত।"[১] রামমোহনের সময়ে এর সূত্রপাত এবং কেশব সেনের সময়ে এর বিকাশ। তখনকার চিত্রও পূর্বোক্ত লেখক দিয়েছেন,—"১৮৬৭ সাল হইতে যুবকদলের প্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। অনেকে কল্যকার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং অর্দ্ধাশনে এবং অনশনে দিন কাটাইতে ও পাদুকাবিহীন পদে কলিকাতা সহরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারোৎসাহের ফল স্বরূপ দেশের নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ব্রাহ্ম বিবাহের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।"[২] বলাবাহুল্য নব্য সংস্কৃতির এমন ক্রমাধিপত্যে রক্ষণশীল গোষ্ঠীও

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—নিউ এজ—১ম সং—পৃঃ ৯৮।

২। ঐ পৃঃ ২৪৫।

বিভিন্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। অবশ্য প্রগতিশীল সংস্কৃতির আভ্যন্তরীণ বিরোধিতায় রক্ষণশীলতা পরিধি পরিবর্তন করেছে এবং বিভিন্ন প্রচার দৃষ্টিকোণ সংগঠন ঘটেছে। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল পরিধি থেকে যে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন ঘটেছে, তার মধ্যে পরিধিগত জটিলতা পরিদৃষ্ট হয়। জটিলতা যা-ই থাকুক, রক্ষণশীল সংস্কৃতির পক্ষ থেকে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য খুব কম।

ভণ্ডামির প্রকাশ মানুষের আন্তরিক সংযোগ নষ্ট করে। এই ভণ্ডামি যখন বৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকে, এবং এই পর্যায়ের ঘটনা যখন সংখ্যাবহুল হয়, তখন বৃত্তির ওপর শ্রদ্ধাবোধও নষ্ট হয়। শ্রদ্ধা নষ্ট পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ পক্ষীয় সাংস্কৃতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। বাস্তব ঘটনার অনুকরণে যখন প্রহসনকার এই ভণ্ডামির চিত্র দেন, তখন তা বাস্তব সংঘটনের মূল্য পায় এবং দ্বৈতীয়িক ক্ষেত্রে প্রহসনকারের উদ্দেশ্য সফল হয়। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম-সমাজের ভণ্ডামির চিত্র প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে।

অবশ্য এই ভণ্ডামি সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যে সম্পর্কশূন্য ছিলো, তা নয়। যে কোনো ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ জড়িত থাকে। এই স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে পরিণতিলাভ করতে পারে। কিন্তু সমাজের সহানুভূতি অর্জন ব্যতীত সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ভণ্ডামির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থের ব্যক্তিগত প্রকাশ অনেক প্রহসনকার উপস্থাপন করেছেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির ব্রাহ্মসমাজে অনুপ্রবেশে এইসব ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। একটিমাত্র ব্যক্তির আদর্শ সম্প্রদায়ভুক্ত সকলকে প্রভাবিত করতে পারে না। ভণ্ড ব্রাহ্মের আধিক্যে তাই ব্রাহ্মসমাজে উন্নত বিধিনির্দেশ সত্ত্বেও অধঃপতন ক্রমে সূচিত হয়েছে। এই অধঃপতনের চিত্র প্রহসনে যা পাওয়া যায়, তাকে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জন বললে ভুল বলা হবে। ধর্মীয় সমাজ এবং তার পরিণতির সম্পর্কে অমৃতলাল বসুর "বৌমা" প্রহসনে (১৮৯৭ খৃঃ) আলোচনা আছে। মতিলাল বলেছে,—"চৈতন্যদেবের অমন মধুর ভাব গোঁড়ার জ্বালায় কি মাটীই না হলো। (Papist) পেপিষ্টদের (Inquisition) ইনকুইজিসনের কথা তো পড়েইছেন। আবার দেখুন, যে রামমোহন রায়ের গান অতি নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ হিন্দুরাও ভক্তি ভরে শুনে

আনন্দ করিতেন, কেশব সেন (My God) মাই গড ! কি জগদীশ্বর ! বলে ডেকে উঠ্‌লে বোধ হতো যেন সাম্‌নেই ভগবান্‌ বিরাজমান ! আর সেই ডাক শোন্‌বার জন্য লোকে ব্যাকুল হয়ে ছুট্‌তো, যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লোকে হিন্দুযোগীর সর্ব্বোচ্চ সম্মান 'মহর্ষি' উপাধি প্রদান করেছে, যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখ্‌লে মনে আবার নবদ্বীপের ভাব উদয় হয়, তাঁদের সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যা অবলম্বন করে আজও অনেক পবিত্র হৃদয় সাধ ধর্ম্মপিপাসু যুবক ধীরে ধীরে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সেই ধর্ম্মকেই কতকগুলি মূর্খ ভণ্ড তাদের স্বার্থসিদ্ধি ভোগ-তৃপ্তি ও বিলাস স্ফূর্ত্তির আবরণ করে রেখেছে।"

অপরের দৃষ্টিকোণের inferiority প্রচার দ্বারা সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটানো সহজ হয়। হাস্যকর বলে প্রচারের মূলে থাকে নিজ দৃষ্টিকোণের Superiority প্রচার। তাই অনেক প্রহসনকারই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির আচার-আচরণকে হাস্যকর করে চিত্রিত করেছেন। নব্য সভ্যতা এবং বাবুয়ানার হাস্যকর গতিপ্রকৃতি চিত্রণের মধ্যেও একই উদ্দেশ্য নিহিত। শুধু সাংস্কৃতিক বিরোধিতার ক্ষেত্রে নয়, প্রাথমিক অনুশাসনবিরোধী ক্ষেত্রেও এ ধরনের হাস্যকর গতিপ্রকৃতি চিত্রিত করে নিজ দৃষ্টিকোণে সমর্থনলাভের চেষ্টা করেছে। সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজের হাস্যকর আচার-আচরণ যা কিছু প্রহসনে চিত্রিত হয়েছে, তার মূলে অনেকখানিই নিহিত আছে আক্রমণ পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া বাস্তবক্ষেত্রেও যে গতি-প্রকৃতি ব্রাহ্মসমাজে পরিলক্ষিত হয়েছে, তাতে সাধারণ দৃষ্টিকোণেও হাস্যকর উপাদান সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে নি। এর একটি কারণ মাত্রাতীত আচার সর্বস্বতা। ব্রাহ্মসমাজের আচরণে মাত্রা অতিবর্তনের প্রবণতা আসবার কারণ অবশ্য ছিলো।

ভারতীয় সমাজে অবস্থান করে ভারতীয় সমাজের মজ্জাগত হিন্দুসমাজের দুষ্প্রতিরোধ্য প্রভাব অন্য কোনো ধর্মের পক্ষে এড়িয়ে চলা সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ যে সব ধর্ম ভারতীয় সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছে, কালক্রমে সেগুলো হিন্দুধর্ম গ্রাস করে এক একটি শাখা রূপে তাদের স্থান নির্দেশ করেছে। এই দিকটি সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের সচেতনতাই আচারের মাত্রা অতিবর্তনের কারণ। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ যখন ভিন্ন সম্প্রদায় রূপে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তখন হিন্দুধর্ম থেকে এরা নিজেদের পার্থক্য প্রকট করে তোলবার জন্যে নিয়ম-আচারকে বিশিষ্ট রূপ দিয়ে সেগুলো পালন করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। অন্যদিকে আবার তেমনি রয়েছে ধর্মীয় আভিজাত্য অর্জন। এই আভিজাত্য

অর্জন করতে গেলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক কাঠামোকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই হিন্দুদের থেকেও এরা যে "হিন্দুত্বের" দিক দিয়ে অনেক বেশি ধার্মিক, এটা প্রতিপন্ন করবার জন্যে এরা হিন্দুধর্মের কতকগুলো আত্মগত অনুষ্ঠানকে বাহ্য আচারে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। প্রতীকবাদ এতে তুচ্ছ হওয়ায় এদের উপাসনা পদ্ধতি আরও গভীরতর করে উপস্থাপনা ও প্রচার করা হলো। প্রাচীন আর্যধর্মের উচ্চস্তরের উক্তিগুলোকে স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা হলো। হিন্দুত্বের পথেই এরা হিন্দুধর্মের চাইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব পতিপন্ন করবার জন্যে আচারকে উদ্ভট করে তুলেছিলো।

শুধু আচার-আচরণে নয়, চেহারাতেও তারা তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। এই সময়ে নব্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন যুবকদের মধ্যে দাড়ি রাখবার রীতি ব্যাপক হয়ে ওঠে। নব্য সংস্কৃতিপুষ্ট ব্রাহ্মধর্মেও অনেকে বেদজ্ঞ মুনিঋষিদের মতো দাড়ি রেখে নিজের সাত্বিকতা প্রচারে প্রতিযোগিতার পথে নেমেছেন। অনেকে আবার কেশব সেনের অনুকরণে বেশবাসে সজ্জিত হয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করতে অনেকে চশমা এবং দাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। নব্য যুবকদের এই বিশেষ বেশবাসের ওপর কটাক্ষ করে একটি জনপ্রিয় গান "বিশ্বসঙ্গীত" গ্রন্থে[৩] সঙ্কলিত হয়েছে।—

"চাপ দাড়ি রাখা চোখে চস্‌মা ঢাকা.
ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক নম্বরে অধিক
যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে।
যাদের আঁতুড়ে গন্ধ গায়ে পাওয়া যায়
চস্‌মা নাকের ডগে এ বড় বেজার,
সে সং সাজা দেখে কার না হাসি পায়?
...দেশ জুড়ে উঠেছে দাড়ি রাখা ঢেউ,
বাড়ী বাড়ী দাড়ি বাকি নাইকো কেউ।"

শুধু ব্রাহ্মদলে নয়, নব্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন অনেক যুবকই চশ্‌মা ও দাড়ি রাখ্‌তো। চশ্‌মাটা এই সময়ে আভিজাত্যের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "কেরাণী-চরিত" প্রহসনে (১৮৮৫ খৃঃ) কেরানী শশী চশ্‌মা সম্পর্কে বল্‌তে

৩ বিশ্ব সঙ্গীত—১২৯৯ সাল। পৃঃ ৪৬০—৬১।

গিয়ে বলেছে,—"যাই এখানা আছে, তাই সাহেবটা এক একবার বাবু বলে ডাকে, এতে একটু grave দেখায়।" সভ্য হতে গেলেই চশ্‌মা যেন অপরিহার্য—এই বোধটিকে ব্যঙ্গ করে অমৃতলাল বসুর "বিবাহ বিভ্রাট" প্রহসনে (১৮৮৪ খৃঃ) গোপীনাথের মন্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।—

"ঘটক॥ চস্‌মা!

গোপী॥ ছেলে কি তবে শুধু চোখে কালেজে যাবে?

ঘটক॥ কেন, চক্ষের কোন ব্যাম হয়েছিল নাকি?

গোপী॥ তুমি দেখ্‌ছি কিছুই খবর রাখ না; এল্‌-এর বিদ্যা এখন সূক্ষ্ম হয়েছে, চস্‌মা না হলে স্পষ্ট দেখা যায় না।"

চশ্‌মার সঙ্গে দাড়ি রাখাও যেন সভ্যদের একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "মরকট্‌ বাবু" প্রহসনে (১৮৯৯ খৃঃ) বাবু ও ভৃত্যের কথোকথনে মরকট ভজাকে বলেছে,—"তুই আজও সভ্য হলি নে।" তখন ভজা মন্তব্য করেছে,—"আজ্ঞে সেই লম্বা লম্বা দাড়ী রেখে চোখে চস্‌মা দিয়ে কোলুর বলদের মত!" ব্রাহ্মদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য অন্ততঃ প্রকট ভাব ধারণ করেছিলো। কেশব সেন নিজে চশ্‌মা পরতেন। অমৃতলাল বসু সম্পর্কে একটি ঘটনা সর্বজন পরিচিত। কেশব সেন মাঝে মাঝে চশ্‌মা পরে ঘুমিয়ে পড়তেন। অমৃতলাল একদিন তাঁকে বল্‌লেন, চশ্‌মা চোখে না থাকলে কি তিনি স্বপ্নও দেখ্‌তে পান না! কেশব সেনের অনুকরণেও অনেক ব্রাহ্ম চশ্‌মা গ্রহণ করেছে। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের "বোধনে বিসর্জন" প্রহসনে (১৮৯৬ খৃঃ) কার্তিক মন্তব্য করেছে,—"ব্রাহ্মসমাজে যাবার জন্যে গত বৎসর একখানা চস্‌মা কিনেছিলাম, তারও দাম এ পর্য্যন্ত বাকী!" অমৃতলাল বসুর "বিবাহ বিভ্রাট" প্রহসনে (১৮৮৪ খৃঃ) রামমোহনের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর"—এর লালিকার মধ্যেও চশ্‌মার ইঙ্গিত আছে। গানটিকে বাসর ঘরে বরের মুখে প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মদের দুঃখবাদ বা দুঃখবিলাসকে এতে প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করা হয়েছে।—

"অন্তিমের সেদিনের উপায় কি হবে।
দেহ ছেড়ে আত্মাপাখী যবে উড়ে যাবে॥
ধমনী হইবে স্তব্ধ, কণ্ঠে ঘড়ঘড় শব্দ,
চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চস্‌মা পড়ে রবে॥

গৃহে রোদনের রোল, স্বজনের হরিবোল,
সবে বাক্য কবে, তুমি শুনতে নাহি পাবে ॥”

বিভিন্ন প্রহসনে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে ব্রাহ্মদের গতিবিধির চিত্রণ আছে। এগুলোর মাত্রা অবশ্য বিবেচনাধীন। ভুবনমোহন সরকারের “ডাক্তার বাবু” প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ) বসুজ মশায় ব্রাহ্মদের সম্পর্কে নিন্দাসূচক বর্ণনা দিয়েছেন,—

“এ ইয়ে ধর্ম্মের ছোকরা দলটা হয়ে আরও করে তুলেছে, এদের কেবল চেষ্টা কিসে সব একেকার হয়। ছেলেগুলোকে বইয়ে দিলে, তারা পাঁচজনের দেখাদেখি সমাজে যেতে শেখে, উপাসনা শুনে ক্রমে দলে গিয়ে মেশে, লেখাপড়ায় মন দেয় না, শেষ আচার্য্যের কুহকে পড়ে সব ধর্ম্মের পাণ্ডা হয়ে উঠে।” নীলকণ্ঠ যখন বলে যে, এদের দিয়ে একটা উপকার যে এখন আর কেউ দলে দলে খৃষ্টান হয় না, তখন বসুজ সাংস্কৃতিক বিপদের দিকটি ইঙ্গিত করে বলেছেন,—“আমি ত বলি সে বরং ছিল ভাল, যা দুটো ব্যাপ্টাইজ হতো বটে, কিন্তু তারা সমাজভ্রষ্ট হয়ে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারত না। এরা ত তা নয়, হিঁদুয়ানির প্রকৃত শত্রু হয়ে স্বচ্ছন্দে আমাদের সমাজে রয়েছে; বামুন পইতে ফেলে শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করছে, অথচ সমাজভ্রষ্ট নয়, কেমন মজা দেখুন দেখি, বুকে বসে দাড়ি উপড়াচ্ছে; অথচ হিন্দু নয় বলে পরিচয় দেয়।··· ওরা যে কি তা আজও বুঝতে পারলেম না; দেখতে ত না হিন্দু না মুসলমান, না সাহেব; নাকে চস্‌মা, নেড়েদের মত দাড়ি, ভট্চাজদের মত থান ধুতি—সাহেবদের মতো বেদিতে দাঁড়িয়ে লেক্‌চারও দেয়, আবার খোল করতাল বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নেচেও বেড়ায়। কি বল্‌ব বলুন!” গোপালচন্দ্র রায়ের লেখা “একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব” প্রহসনে (১৮৭৬ খৃঃ) ভাবিনীর মুখে ব্রাহ্মদের সম্পর্কে বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।—“বেম্মা কাকে বলে জানিস্—সে এক রকম ভজা, যেমন কর্ত্তাভজা, খিষ্টান ভজা, তেমনি যারা বেম্মাভজা হয়, তারা দেবতা বামন মানে না, জাত মানে না, ছত্তিক জেতের সঙ্গে বসে ভাত খায়, রাঁড়ের বিয়ে দেয়, আবার ধোপার মেয়ে বামুনে বিয়ে করে, হলো বা ধোপা, নাপ্‌তে, হাড়ি কাওরা, চাঁড়ালের ছেলেদের বামুন কায়েত বদ্যি মেয়ে দেয়।······বেম্মারা মেয়েদের সোমত্ত করে রাখে লেখাপড়া শিকোয়, আবার বিবিয়ানা পোসাক পরিয়ে তাদের সঙ্গে করে দেয়ান দরবারে বেড়াতে নিয়ে যায়। তারা (মেয়েরা) সাহেব সুবোর ভয় করে না।” ব্রাহ্মদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা

স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি আন্দোলনের সমর্থন ও সক্রিয়তা দেখা যায়। তাই ব্রাহ্মদের মধ্যে যৌন দুর্নীতির অনেক চিত্র রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঘোৎসবের পর থেকে উপাসনা মন্দিরে স্ত্রীসমাজের পদক্ষেপ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর বিদ্রূপ আকর্ষণ করেছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিজ্ঞান বাবু" প্রহসনে (১৮৮৮ খৃঃ) ব্রাহ্ম রামকান্তবাবুর প্রতি একটি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য আছে। রামকান্ত বলেছে,—"আমাদের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র।" শীতল বলে, —"বটে বটে, ওঁ বিষ্ণু, ঐ রূপান্তর কি কেবল দাড়িতে আর মসিদের ভেতর ভাইভগ্নী নিয়ে চোক বোজাতে।" কানাইলাল সেনের "কলির দশদশা" প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ) হরিহরের মুখেও ব্রাহ্ম পুরুষদের প্রধান আকর্ষণের কথা বলা হয়েছে,—"ঐ যে সমাজ মন্দিরে যে কান্‌খুড়কী বেটীদের সঙ্গে একত্রে বোসে চক্ষু বুজোবি, ঐটেই প্রধান মৎলব।"

বাস্তবিক এই চোকবোঁজা উপাসনা সাধারণ দৃষ্টিকোণে অস্বাভাবিক লেগেছে। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের কথোপকথন আছে। তাতে ব্রাহ্মদের বলা হয়েছে "চোকবুজনোর দল।"

"১ম ॥ আজকাল কেমন চল্‌ছে মশায়?

২য় ॥ আর মাতামুণ্ডু চল্‌বে কি? কলকাতায় কেশব এক চোক্ বুজনোর দল করেচে, আর এখনকার ছোট ছোট ছোঁড়াগুল সেই দলে ঢুকেচে, তার ভেতর আমার অনেক যজমান আছে, সে বেটারা আর বাপমার শ্রাদ্ধশান্তি কিছুই করে না, কাজে কাজেই বাজার বড় মন্দ।"

অমৃতলাল বসুর "গ্রাম্য বিভ্রাট" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) নেশাখোর মানিকের মুখেও প্রহসনকারের বিদ্রূপ স্পষ্ট। নেশাখোর মানিক বলেছে,—"বেহ্মসমাজের দিন সকালবেলা খোঁয়ারী ভেঙ্গে রাখ্‌বো, বৈকালে বরং মটর ভোর আফিং দিও, তাহলে আপনা আপনি চক্ষু বুজে আস্‌বে, বেশ ভাবের জমাট হবে।"

স্ত্রীপুরুষ একত্র উপাসনায় যাতে মনে কুভাব না জাগে, এজন্যে ভগ্নী সম্বোধনের প্রয়োজন ঘটে। অন্তরে কুভাব পোষণ অথচ বাইরে ভগ্নী সম্বোধনে যে যৌন বিকৃতির চিহ্ন সম্ভাবিত, অনেক প্রহসনকার তা ইঙ্গিত করেছেন। এই কষ্টপ্রয়োজ্য সম্বোধনের অবাস্তবতা দেখাতে গিয়ে অনেক প্রহসনকার

স্ত্রীকে ভগ্নী সম্বোধনের চিত্রও তুলে ধরেছেন, কারণ অনেকেই সস্ত্রীক উপাসনা মন্দিরে যেতেন। অমৃতলাল বসুর "রাজাবাহাদুর" প্রহসনে (১৮৯২ খৃঃ) এরকম একটি ব্যঙ্গ চিত্র আছে।—

"কালাচাঁদ ॥ ভগিনি, সহধর্ম্মিনী, হৃদয় রঞ্জিনি, কালিন্দী কল্লোলিনী।

কালিন্দী ॥ ভ্রাতঃ প্রেম দাও, প্রেম দাও।

কালাচাঁদ ॥ ভগিনি, আঁচল পাত আঁচল পাত।"

স্ত্রীকে ভগ্নী বলে সম্বোধন করা দেখে গাণিক্যধন বিস্ময় প্রকাশ করে বলে,—"আপন বুহিনিরে বিয়া কর্‌ছেন ?" কালাচাঁদ তখন জবাব দেয়,—"আজ্ঞা এই—না না—ঐ ভগ্নী বলি—আমাদের ঐ দস্তর আছে ; স্ত্রী, জানানা স্ত্রী নয়, স্বাধীন মেয়ে মানুষ।" "প্রেম" শব্দটি যেন ব্রাহ্মদের অষ্টপ্রহরের বুলি ছিলো। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "কাজের খতম" প্রহসনে (১৮৯৯ খৃঃ) গণেশের চাকরকে এই ধরনের প্রেম-বাতিক করে চিত্রিত করা হয়েছে। ফটিক ব্রাহ্ম না হলেও তার মুখের বুলির মধ্যে একই কটাক্ষ আছে। আধ্‌পাগলা ফটিক সব ব্যাপারে সব কথাতেই প্রেম-প্রেম করে এবং প্রেমের মহিমা কীর্তন করে। বিশেষ করে মা ঠাক্‌রুণকে দেখ্‌লে উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়। "মনিব ঠাক্‌রুণ ! মনিব ঠাকরুণ ! প্রেম—প্রেম—প্রেম—প্রেম অতি সুন্দর পদার্থ ! প্রেমেই চন্দ্র, সূর্য্যগ্রহণ লাগে। বটবৃক্ষে আটা সঞ্চার হয়। বড় বড় পুকুরে পাঁক বিকাশ পায়।" ব্রাহ্মধর্মের পবিত্র প্রেমের মধ্যে যেমন যৌন দিকটির চিত্রণ আছে, তেমনি আছে স্বার্থগত ভণ্ডামি। অমৃতলাল বসুর "বাবু" নাটকে (১৮৯৪) ব্রাহ্ম সজনী বলেছে,—"দেখুন ; প্রেমের বলে আমাদের হৃদয় এখন উদার হয়েছে, আত্মায় কিছুমাত্র মলা নাই, তাইতে করে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, হিন্দুমাত্রেই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অত্যাচারী, রমণীপীড়নকারী—তারা সকলেই নরকে যাবে।" শুধু প্রেম নয়, "সুরুচি"ও ছিলো ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ বুলি। সুরুচি কুরুচির বৈশিষ্ট্য-বিচার নিয়ে অনেকে হাস্যকর উক্তি উপস্থাপন করেছেন। অমৃতলাল বসুর "বৌমা" প্রহসনে (১৮৯৭ খৃঃ) হিড়িম্বা তাস খেলা সম্পর্কে বলেছে,—"তাসটা বড় কুরুচি ; তবে দেখ্‌ছি, মিসেস পেজ পল্টনের সাহেবদের সঙ্গে বাজী রেখে তাস খেলেন, সেটা অবশ্য সুরুচিসঙ্গত।" শুধু ব্রাহ্মরা নন, নব্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত অন্য অনেকের মধ্যেও এই তথাকথিত রুচিবোধ উগ্র ছিলো। তবে ব্রাহ্মদের সুরুচির প্রসঙ্গে প্রহসনকাররা মাত্রা বৃদ্ধি করেছেন, কারণ রুচির বিষয়ে ব্রাহ্মরা একটি আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। রাখালদাস

ভট্টাচার্যের ''সুরুচির ধ্বজা'' প্রহসনে (১৮৮৮ খৃঃ) সুরুচি যখন বক্তৃতার পর আলোচনায় প্রেমপ্রসঙ্গে Othello থেকে নিধুবাবু এবং ভারতচন্দ্রের নাম আনলেন, তখন নিতম্ব তর্ক করে বলে যে, অশ্লীল কথা উচ্চারিত হয়েছে। সে বলে,—"ভারতচন্দ্র রায় কি অশ্লীল নয়? আমি অনেক শিক্ষিত লোকের কাছে শুনেছি ভারতচন্দ্র রায় কথাটী বড় অশ্লীল।'' ব্রাহ্মধর্ম ও অশ্লীলতা-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদলের ক্ষোভ কোথায়, সেটি জানা যায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের "উঃ মোহন্তের এই কাজ'' প্রহসনে (১৮৭৩ খৃঃ)। দীর্ঘ হলেও একটি কথোপকথন উদ্ধৃত করা চলে।—

"ভুবন ॥ আরে আর শুন্‌ছ, কেশববাবু না:কি আইন কর্চ্চেন, খারাপ কথা কইলে ম্যাদ হবে।

যাদু ॥ হ্যাঁ, যাতে অশ্লীল ভাষা নিবারণ হয়, তারই জন্যে চেষ্টা হচ্চে। তা কেবল কেশববাবু কেন আরও অনেক বড় ২ লোকও তাতে আছেন। সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী-সভাও ত তাতে আছে।

ভুবন ॥ এই আশ্চে রোববার বিদ্যাসুন্দর পোড়াবে। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে।

বিপিন ॥ বিদ্যাসুন্দর একখানা অশ্লীল বই তার আর সন্দেহ কি!

যদু ॥ বাবুরা আবার সক্ করে ঐ বই পরিবারদের পড়িতে দেন।

ভুবন ॥ ..বাঙ্গলা হলেই যত দোষ! ইংরাজী কত বয়ে বিদ্যাসুন্দরের চেয়ে যে শত গুণে অশ্লীল আছে, তা কিন্তু এণ্ট্রেন্স কোর্সে থাকে, ছেলেরা তা শতবার অম্লানবদনে বাপমা গুরুজনের সামনে পড়ে, তার বেলা দোষ হয় না—সেজে ইংরাজী বই!

যদু ॥ আরও ত অনেক বই আছে. সে সব ত বন্ধ করা উচিত; আর এই গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, মুটে, মজুর, প্রভৃতির ইয়ারকি যার জন্যে রাস্তায় চলা যায় না, তাও ত বন্ধ করা উচিত।"

এছাড়া ব্রাহ্মসমাজের "অনুতাপ"কে তার অবাস্তবতার জন্যেই বিদ্রূপ করা হয়েছে। যে-কাজ করে পরে অনুতাপ করতে হয়, সে-কাজ করবার আগে সংযমরক্ষার চেয়েও, অনুতাপকে বেশি মূল্য দেওয়ার জন্যেই সমাজের বিদ্রূপ এই দিকটিকে লক্ষ্য করে বর্ষিত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের—মধ্যে বিনয়ভাবেরও মাত্রাতিরেক পরিলক্ষিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,—"নবভক্তির আবির্ভাবে ব্রাহ্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য্য বিনয়ের আবির্ভাব হয়। তাহার ফল

স্বরূপ তাঁহাদিগের অনেকে পরস্পরের এবং বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের পদে, ধরিয়া পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন। তাহা ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র।"[৪] পাছে মিথ্যা বলা হয়ে যায়, এজন্যে "বোধহয়" বলা ব্রাহ্মদের মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন,—"আমার আবার কেশববাবুর চরণে একান্ত ভক্তি ছিল, আর সকল কথায় "বোধহয়" বলা অভ্যাস করে ফেলেছিলাম, তাই দলের অনেকেই আমাকে ঠাট্টা করে "বোধজ্ঞানী" বলত।"[৫]

ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের শপথের ভাষাতেই ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন আচারের বীজ পাওয়া যায়। সুতরাং শপথবাণী উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

"১। ওঁ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তরি মুক্তিকারণে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বব্যাপিনি পূর্ণানন্দমঙ্গলে নিরবয়ব একমাত্রাদ্বিতীয়ে পরব্রহ্মণি প্রীত্যা তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনেন চ তদুপাস্যামি।

২। সর্ব্বস্রষ্টৃ পরব্রহ্মেতি সৃষ্টং কিঞ্চিন্নারাধয়িষ্যামি।

৩। অরুগ্নোহ বিপন্নশ্চেৎ প্রতিদিনং যদা চিত্তৈকাগ্রতা তদা শ্রদ্ধয়া প্রীত্যা চ পরব্রহ্মণি মনঃ সমাধাস্যামি।

৪। সদনুষ্ঠানায় চ যতিষেৎ।

৫। দুষ্কৃতিভ্যোনিবৃত্ত্যৈ যত্নবান্ ভবিষ্যামি।

৬। যদি মোহাৎ কুকর্ম্ম কিঞ্চিৎ কৃতস্যাৎ তদৈকান্ত তস্তস্মান্মুক্তিমন্বিচ্ছন্ ন প্রমদিষ্যামি।

৭। বর্ষে বর্ষে মদীয়ে চ তাবৎ সাংসারিক শুভকর্ম্মণি ব্রাহ্মসমাজায় দাস্যামি।

হে পরমাত্মন্ মাং প্রতি এতৎ পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন সামর্থ্যমর্পয়। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

অতি সুন্দর এই শপথ থেকে যে উদ্ভট আচার-আচরণের সূত্রপাত হয়েছিলো, তার কয়েকটি নমুনা দিলেই সুস্পষ্ট হবে। অবশ্য এগুলোর মাত্রাবিচারের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ফকিরদাস বাবাজীর লেখা "অবতার" প্রহসন (১৮৮১ খৃঃ) থেকে একটা সাধারণ কথাবার্তার নমুনা দেওয়া হলো।

৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ) ২য় সং—পৃঃ ২৪৬।

৫। মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪ সাল।

"বিক্রম ॥ গুরুদেব !...পিতার প্রেম কি সুদৃঢ় ! তাঁর আশীর্ব্বাদে কন্যাকার উৎসব বিঘ্নবিবর্জ্জিত হবেই হবে। বক্তৃতার বিজ্ঞাপন কাগজে কাগজে দেওয়া হয়েছে।

মাধব ॥ ভ্রাতঃ !

বিক্রম ॥ দাসকে ভ্রাতৃসম্বোধন করবেন না। আমি দাসানুদাস।

মাধব ॥ আহা ! তোমারই প্রকৃত বিনয়। বিনয়কারীরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

বিক্রম ॥ প্রভো ! তোমারি মহিমা ! তোমারি অনির্ব্বচনীয় প্রেম !

মাধব ॥ প্রভু পিতার পিতা, মাতার মাতা। তাঁহার প্রেম যে অনির্ব্বচনীয় তাহা প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ।"

এরপর বিক্রম যখন ভক্তিমূলক গান গেয়ে ওঠে, তখন গুরুদেব শিষ্যের কাছে হার মানলেন। শিশিরকুমার ঘোষের "নয়শো রূপেয়া" প্রহসনে (১৮৭৭ খৃঃ) একটি হিন্দু বিবাহ সভায় ব্রাহ্ম নবীনের বক্তব্যের মধ্যেও এই বিকৃতিকে মাত্রাতিরেকের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রঞ্জনকে সে বলে,—"এ ত আপনি বিবাহ করতে যাচ্ছেন না, উপপত্নী রাখ্‌তে যাচ্ছেন। ইহাতে তাঁর (জগদীশ্বরের) নামটা করা ভাল হয় না। এ বিবাহই নয়। বিবাহ এমন পবিত্র বিষয়, ইহাতে পৌত্তলিকতা ! ব্রাহ্মণে মন্ত্র পড়াইবে। মন্ত্র কি পড়িবে তা তুমিও বুঝবে না, পাত্রীও বুঝবে না। আবার একটী মোড়া আনা হোয়েছে। দেখুন দেখি, আপনি লেখাপড়া শিখেছেন, সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাসও আছে, আপনারা যদি এরূপ কার্য্য করেন, তবে আর কোথায় যাব ? বলিতে কি, আপনি যদি এ প্রণালীতে বিবাহ করেন, আপনাকে পরব্রহ্মের শত্রুর ন্যায় কার্য্য করা হইবে।...উপায় এখনও আছে। বে কোরো না, যতদূর কোরেছ তার জন্যে অনুতাপ কর, আর প্রার্থনা কর।" রঞ্জনের প্রেমের কথায় নবীন বলে,—"যে পাপী তার আবার প্রেম কি ? সে ক্রন্দন করুক। সে ক্রন্দন রাখিয়া কি প্রেম করিতে যাইবে ?......বৃথা আক্ষেপ পরিত্যাগ কর। আজ আমাদের একজন ভ্রাতা ও একজন ভগিনী সংসার সাগরে ঝম্পপ্রদান করিতেছেন। হে ভ্রাতঃ ! আমি ঘোর পাপী, আমার ন্যায় পাপী এ সংসারে আর নাই। আমার উপায় কি হইবে ? আহা ! আজ বিবাহের দিন ! কিন্তু সেদিনের উপায় কি ভাবছ ? সেই দিন ! সেই ভয়ঙ্কর দিন ! সেই শেষের দিন ! (উচ্চৈঃস্বরে গীত)—মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর—অন্যে

বাক্যে কবে···। ইহাদের আত্মা গেল আর থাকে না। ইহাদের আত্মার জন্যে একটু প্রার্থনা করি। (প্রার্থনা করিতে চক্ষু বুঁজিয়া দণ্ডায়মান।)" সাতুলাল এসব আচরণে বিদ্রূপ করলে নবীন বলে,—"আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। হে সভাস্থ ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার প্রতি অত্যাচার কর। খুব অত্যাচার কর। অত্যাচার আসুক, বৃষ্টির ন্যায় আসুক। তোমরা আমাকে প্রহার কর, আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিব।"

ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে যতোটা বাহ্য আড়ম্বর ছিলো, ততোখানি আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ছিলো না। পরে ক্রমাগতই সেটা লোপ পেতে বসেছিলো। নব্যভারত পত্রিকায়[৬] "ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ সমীপে বিনীত নিবেদন" প্রবন্ধে কানাইলাল পাইন নামে জনৈক লেখক বলেছেন,—"ভাইভগিনীগণ! তোমরা কি জান না, আমাদিগের কি ভয়ানক নিন্দা উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে শান্তি নাই। ব্রাহ্মগণ যেরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানে রত, তাহার উপযোগী আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে তাহাদিগের নিষ্ঠা নাই! লব্ধ জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাদিগের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা নাই! তাহাদিগের সাহায্যে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হয় না। একি অসহনীয় কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্ত যদি তোমরা বদ্ধপরিকর না হও, তবে কিসের জন্য জীবন ধারণ?" লেখক ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলো দোষের ইঙ্গিত করেছেন,—যেমন,—"বিচ্ছিন্নতা, একদেশদর্শিতা, সাধারণ মঙ্গলজনক বিবিধ কার্য্যে যত্নশিথিলতা, অপ্রসারিত প্রেম ও ব্রহ্মসন্তানগণের নিত্য ভোগ্যলব্ধ ধন বিতরণে অনুদারতা।"[৭]

ব্রাহ্মরা অনেকাংশেই বাক্‌সর্বস্ব হয়ে পড়েছিলো। তাদের অনেকেরই সংস্কার প্রচেষ্টা ভণ্ডামির নামান্তর ছিলো। কানাইলাল সেনের "কলির দশদশা" প্রহসনে (১৮৭৫ খৃঃ) দিগম্বর ব্রাহ্ম নবীনমাধবকে বলেছে,—"আরে রাখ্, তোর স-সংস্কাক্ড়ি! ভেড়ার মুখ নয় যে আতপ তণ্ডুলে গু-গুড় গুড় কোরবে, ও রকম বাঁ-বাঁধা বোল আমিও অনেক জানি! গো-গোটা কতক আচাভূয়া আচাভূয়া ব-বক্তৃতা কোরে আর পাষাণ দ্রবীভূত কোত্তে হবে না, আগে নিজের চরকায় তেল দেগা, তা-তারপর আমাকে উপাসনা শোনাস্। বেটারা একেবারে অধঃপাতে গেছিস্, তো-তোদের আর ভদ্রস্থ দেখিনে!"

৬। নব্যভারত—চৈত্র—১২৯৫ সাল, পৃঃ ৬৪০।

৭। ঐ—পৃঃ ৬৪৩।

দিগম্বরের কথা শুনে নবীনকিশোর স্বগত মন্তব্য করে,—"যে যাই বলুক, আমাদের ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্চে গাদা পিটে ঘোড়া করা।"

ভারত সংস্কারক সভার মাধ্যমে ব্রাহ্মদের পক্ষ থেকে সুলভ সাহিত্য, নৈশ বিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষা বিস্তার, সুরাপান নিবারণ ইত্যাদির জন্যে আন্দোলনের সূচনা হয়। বলাবাহুল্য প্রচেষ্টা দেশহিতকর, কিন্তু আন্দোলনের পরিচালকদের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব শুধু আক্রমণ পদ্ধতিগতভাবে চিত্রিত হয় নি, বাস্তব সত্যও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। মদ্যপানের সঙ্গে নব্য সংস্কৃতির একটা দুশ্ছেদ্য সম্পর্ক এসে গিয়েছিলো। নব্য সংস্কৃতিরই অন্যতম বাহক ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠলেও, গোপনে মদ্যপান ইত্যাদির ভণ্ডামি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিলো। রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে আক্রমণ পদ্ধতি অনুযায়ী মদ্যপান অনুষ্ঠানের সঙ্গে লাম্পট্যের দিকটি সংযোগ করা হয়েছে। প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী উপাদান সমূহের মধ্যে যৌন দিকটি মানুষকে অত্যন্ত সহজে আকৃষ্ট করে। দাক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) জানকী মন্তব্য করেছে,—"ব্রাহ্মদের কাণ্ড দেখেছ, এঁরাই আবার বলেন আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই। এঁদের শরীরে সকল রকম পাপই প্রবেশ করেছে। এঁদের দ্বারা এমন কাজ নেই, যে তা হয় না। এই যে বক্রেশ্বর বাবুটী ইনি মাতাল, দাঁতাল, ভণ্ড, বেশ্যাভক্ত, নবগুণে ভূষিত। উনি কেন প্রায় ওঁদের দলবলই ঐরূপ।"

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত আক্রমণে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত বেশি সমর্থনপুষ্ট হওয়ায় যৌন, আর্থিক, সাংস্কৃতিক সব দিক থেকেই স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো। স্ত্রীশিক্ষার আনুষঙ্গিক-ভাবে পদ্ধতি অনুযায়ী এসে পড়েছে বার্ধক্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, ব্যভিচার ইত্যাদি দিকগুলো। এইসব চিত্র তাই যতোটা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে, ততোটা বাস্তব নয়—বলাবাহুল্য। স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ধরনের চিত্র প্রদর্শনীর উপযোগী করে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আক্রমণ আতঙ্কেকপন্থা গ্রহণ করেছে বলে লোকপূজ্য কেশবচন্দ্র সেনও রক্ষণশীল সংস্কৃতি-সম্পন্ন দলের আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন। নব্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন দলের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অত্যন্ত প্রতাপশালী স্ফুরিত ব্যক্তিত্ব ছিলো কেশবচন্দ্র সেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে

অনেক কিছুই করেন—যা সমসাময়িককালে তীব্র আলোচনার লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (?) তিনি নিজেদের বন্ধুবান্ধব গোষ্ঠীভূত যাঁরা ছিলেন, তাঁদের পত্নীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে "ব্রাহ্মিকাসমাজ" স্থাপন করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মিকাদের প্রকাশ্য উপাসনা মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকগুলো ব্রাহ্মপরিবারকে আদর্শ জীবন যাপনের জন্যে "ভারতাশ্রম" নামে একটি আশ্রমে সংস্থাপন করলেন। এগুলোর প্রত্যেকটিই কেশব সেনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দলকে উত্তেজিত করেছে। বলা-বাহুল্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইনের সাহায্যে যে সিভিল বিবাহপ্রথা সিদ্ধ হয়, তাতে প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পন্ন দলের পরাজয়ের গ্লানির সঙ্গে ক্রোধও মিশ্রিত হয়েছে।

কেশব সেনের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা নষ্ট হওয়ার কিংবা তাঁকে ব্যঙ্গ করে বিভিন্ন প্রহসন রচিত হওয়ার মূলে একে একে কতকগুলো ঘটনা ঘটে যায়, সেগুলো শুধুমাত্র রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণের বিচারেই ধর্তব্য তা নয়। এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা চলে।[৮] "১৮৭২ সালে উন্নতিশীল ব্রাহ্ম-দলে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। এ আন্দোলন কালে থামিল বটে, কিন্তু ত্বরায় আর এক প্রতিবাদের রোল উঠিল। আশ্রমের অধ্যক্ষের সহিত আশ্রমবাসী কোনও ব্রাহ্মের বিবাদ উপস্থিত হইয়া, সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি বাইরের পত্রে বাহির হইয়া, তাহা হইতে হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উঠিল। কেশবচন্দ্র স্বয়ং বাদী হইয়া ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন।" তারপর উপাসকমণ্ডলীর কাজে উপাসকদের অধিকার নিয়ে নানা রকম আলোচনা হলো। এতে কেশব সেনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজও অনেকটা বিষয়গন্ধী হয়ে পড়ায় সাধারণের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে।

বিখ্যাত কুচবিহার বিবাহ অনুষ্ঠানে কেশব সেনের ওপর বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নষ্ট হয়। অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে কেশব সেন রাজরাজড়ার সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়ে প্রকারান্তরে সুবিধাবাদীর পরিচয় দিয়েছেন। এই বিবাহে তিনি অতোটা অশ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতেন না, যদি তিনি নিজেই তাঁরই উপস্থাপিত ব্রাহ্মবিধি নিয়ম লঙ্ঘন না করতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে সেপ্টেম্বর টাউনহলের বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের

৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ)—২য় সং—পৃঃ ২৪৭

যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে বাল্যবিবাহ ও অকালবিবাহের নিন্দা করেছেন।[৯] কন্যার বিবাহের উপযুক্ত কাল তিনি ষোড়শ বলে নির্ধারিত করেও তাঁর ত্রয়োদশ বৎসরের কন্যাকে কুচবিহারের রাজকুমারের কাছে সমর্পণ করেছেন! এ সম্পর্কে বিরোধী পক্ষীয় একটি পুস্তিকা থেকে অভিযোগ এবং আন্দোলনের যুক্তিগুলো উদ্ধার করা যেতে পারে। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় "কুচবিহারের রাজকুমারের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ বিষয়ক প্রতিবাদ" পুস্তিকায় লিখেছেন,—"যে কেশববাবু ব্রাহ্ম বিবাহ চিঠি মঞ্জুর করিবার সময়ে এদেশীয় স্ত্রীলোকের বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণার্থ দেশীয় বিদেশীয় সুবিজ্ঞ শরীরতত্ত্ববিদ্গণের মত গ্রহণ করিয়া অন্যূন ১৬ বৎসরের বয়সই স্ত্রীলোকের বিবাহের উপযুক্ত সময় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন,—এক্ষণ সেই কেশববাবু কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্কা স্বকীয় কন্যাকে পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক বালকের সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতেছেন, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সত্য সত্যই যদি এ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে কেশববাবু লোকতঃ ধর্ম্মঃ দোষী হইবেন এবং যে ব্রাহ্মসমাজ একসময়ে তাঁহার দ্বারা গৌরবান্বিত হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজকে তিনিই কলঙ্কিত করিবেন।... ১০।১৫ বৎসর যাবৎ বিবাহ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কেশববাবু এবং অন্যান্য প্রচারকগণ মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় এবং বক্তৃতাদিতে যে সমুদয় মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এ বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে কি তাহার বিরূদ্ধাচরণ হইবে না?" এ সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন,—"বাঙ্গালিগণ বক্তৃতায় পটু, কিন্তু কার্য্যকালে কাপুরুষ বলিয়া যে নিন্দিত হইয়া থাকেন, কেশববাবুর ন্যায় একজন ভুবনবিখ্যাত লোকের কার্য্যদ্বারা কি তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় না?" লেখক কেশবচন্দ্রের পূর্বের মন্তব্যসমূহ উদ্ধার করে তারই সাহায্যে কেশবচন্দ্রকে আঘাত করেছেন।—"উক্ত আইনটি বিধিবদ্ধ হইলে কেশববাবু ব্রাহ্মমন্দিরে উপদেশের মধ্যে বলিয়াছিলেন,—এই রাজাজ্ঞা কেবল কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের মত নহে, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের বিধি দেখিতেছি।—১২ ই চৈত্র, ১৭৯৩ শক। যে কেশববাবু আইনটাকে তখন ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করিয়াছিলেন, এখন তিনিই সেই আইন ভঙ্গ বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছেন।" অবশ্য অন্যান্য আপত্তিও ছিলো। পাত্র আগে ব্রাহ্ম ছিলেন না। যদি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দক্ষিণ দেশে বিয়ে

৯। ইণ্ডিয়ান্ মিরার—১৮৭৪ খৃঃ ২১ শে মার্চ রবিবার (পৃঃ ৬)

হতো, তাহলে হিন্দুমতেই হতো। কয়েকমাস আগেও পাত্র হিন্দু ছিলেন। বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হবার পর কয়েকদিন হলো তাঁকে ব্রাহ্ম করে নেওয়া হয়েছে।[১০] শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ অনেকের মিলিত পত্রে কেশব সেনকে বলা হয়েছে,—"কেবলমাত্র উপাসনা পূর্ব্বক বিবাহ দিলে বৈধ হয় কিনা এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমাদের সমাজের অনেক এবং বিশেষরূপে ঘোরতর আন্দোলন ও পরিশ্রম করিয়া একটী রাজবিধি প্রণয়ন করাইয়া লন। তদবধি অনেক স্ত্রী ও পুরুষ এবং অনেক পরিবার এই রাজবিধি অনুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছেন। উক্ত রাজবিধির কোন কোন অংশের প্রতি অনেকের আপত্তি আছে, এরূপ স্থলে কোথায় আপনি উক্ত রাজবিধিতে যাহাতে লোকের রুচি জমে তাহার চেষ্টা করিবেন না আমাদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি যে উদ্দেশ্যেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন না কেন, আপনার দৃষ্টান্তে অনেক ব্রাহ্ম পাত্রের পদসম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া উক্ত রাজবিধি অতিক্রম করিবে।"[১১]

বস্তুতঃ কুচবিহার বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনায় ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই কেশবচন্দ্রের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব আনলেন। এই সময়ে বিরোধীদল কেশবচন্দ্রকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদ এবং প্রধান আচার্যের পদ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। প্রতিক্রিয়ায় কেশবচন্দ্র আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে যা কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে দিব্যভাবের যথেষ্ট অভাব ছিলো। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,[১২]—"ইহার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র তাঁহার নিজের বিভাগীয় সমাজের 'নববিধান' নাম দিয়া, তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; মহম্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়া তাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইলেন।" বলাবাহুল্য কেশবচন্দ্রের এইসব কার্যক্রম বিরোধী পক্ষের কটাক্ষেরই কারণ হয়েছিলো।

ভারতীয় সমাজে যে ধর্মই প্রবর্তিত হোক না কেন, কালক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে পরাজয় বরণ করেছে, বিশেষতঃ যেখানে ধর্মীয় ব্যক্তিরা

১০। ধর্মতত্ত্ব—১৬ই কার্তিক—১৭৯৫ শক।

১১। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত।

১২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (নিউ এজ) ২য় সং—পৃঃ ২৪৮

ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে অবতার বিরোধীতত্ত্বের বাহক ব্রাহ্মদল ক্রমে কেশবচন্দ্রকে 'অবতার' বলে বিশ্বাস করেছে। অবতার বাদের বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার[১৩] মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। "তাঁহারা মনে করেন মহৎ লোক স্বতন্ত্র এক শ্রেণী লোক। তাঁহাদের স্বভাব আর সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব প্রকৃতিগত ভিন্ন। মহৎ লোক সামান্যতঃ জন্মগ্রহণ করেন না, আবশ্যক মত ঈশ্বর ইহাদিগকে প্রেরণ করেন। এই মত একটি ভয়ানক মত।" কিন্তু অবতারবাদকেই ব্রাহ্মদের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছিলো। এর একটা সাংস্কৃতিক কারণ ছিলো। আমাদের সমাজে অধ্যাত্ম বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার জন্যে অবতারবাদ প্রতিষ্ঠা একটা সহজ পথ ছিলো। তাই ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক দিকটিকে মূল্য দেবার জন্যে স্বতঃবিরোধী মত প্রচারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না।

যৌন ও আর্থিক প্রলোভনকে জয় করলেও সাংস্কৃতিক প্রলোভনকে অনেক উন্নত চরিত্র ব্যক্তিও জয় করতে অসমর্থ হন। কেশবচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে যে দিব্যভাব ছিলো, এটা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু অধিকাংশ ভক্তের আচরণে তিনি নিজেকে দৈবাদেশের গ্রাহক অবতার বলে বিশ্বাস করেছেন এবং অবতার হিসেবে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার লালসা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং আচার-আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তের কাছে এই আচার-আচরণ আরও মোহের সৃষ্টি করলেও বিরোধী পক্ষকে আরও বেশি বিতৃষ্ণ করে তুলেছিলো।

বিভিন্ন প্রহসনে ব্রাহ্মসমাজের মতো ব্যক্তিগতভাবে কেশব সেনের বিবিধ আচার-আচরণ নিয়ে প্রচুর মন্তব্য ও ঘটনা চিত্রিত আছে। এসব নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা রুচিবিরুদ্ধ। সমাজচিত্রের খাতিরে গ্রন্থকার একটি বিশেস ধর্ম সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়-গুরুর প্রসঙ্গ এবং বিরোধী দৃষ্টিকোণ বিচারের প্রয়াস পেয়েছেন। বলাবাহুল্য এ সম্পর্কে গ্রন্থকারের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। উপস্থাপিত কাহিনীগুলোও যে সুরুচিসম্পন্ন, তা বলা চলে না। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ইতিহাস জানতে গেলে এর প্রয়োজন। দৃষ্টিকোণের উপলব্ধি ব্যতীত সমাজচিত্র অর্থহীন।

উনবিংশ শতব্দীর নব্য সংস্কৃতির বাহকদের আধ্যাত্মিক সংঘর্ষের সমাজচিত্র ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত প্রহসনে প্রকাশ পেয়েছে। রক্ষণশীল পক্ষ থেকে নব্য

১৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—পৌষ— সম্বৎ ১৯১৪

সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সংঘর্ষ অনেকক্ষেত্রেই একাকার হয়ে গেছে। তাই নব্য সংস্কৃতিবিরোধী অন্যান্য প্রহসনেও ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত প্রসঙ্গ আছে. যা যথাস্থানে ইতিমধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে।

নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫ খৃঃ)—কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র (মনোমোহন বসু)॥ নামকরণ সম্পর্কে "মধ্যস্থ" পত্রিকায়[১৪] লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা চলে! "তাঁহারা (উন্নতিশীল ভায়ারা) না মর্ত্ত্যের না স্বর্গের, না হিঁদু না মুসলমান, না ফিরিঙ্গি, না সাহেব, না বাঙ্গালী, না সে প্রকারের কিছুই! তবে তাহারা কি লোক? পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পরবর্ত্তী বিবরণেও প্রতিপন্ন করিব যে, তাঁহারা নাগলোকেরই লোক; তাঁহারা অহর্নিশি বিদ্বেষ বিষে মাতৃভূমি ও পিতৃবংশকে জরজর করিবার নিমিত্ত শাপভ্রংশে নাগ অংশে হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কলিযুগে তাঁহারা বড় জাগ্রত! বিশেষতঃ ছেলেপুলের জন্য বড় ভয়। তাঁহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের খোলসে আবৃত হইয়া তর্করূপ ফণা ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে বেড়ান—সেই ফণার উপর বাহ্যযুক্তি নামা পদ্মচক্র শোভা ধরে! অবোধ শিশুরা চিনিতে না পারিয়া খেলার বস্তুবোধে যেমন ধরিতে কি কোল দিতে যায় অমনি হায় নির্ঘাত দংশন।" মধ্যস্থ পত্রিকাতেই ১২৮১ সালের ভাদ্রমাসে প্রহসনকার তাঁর প্রহসন রচনার উদ্দেশ্য ও কৈফিয়ৎ প্রকাশ করেছেন। "আমরা জানি ব্যঙ্গের মধ্যে নীচ পরিহাস ও নীচ রসিকতাও আছে—আমরা জানি মিথ্যাপবাদ বা গ্লানির উপকরণেও ব্যঙ্গ কাব্য রচিত হইতে পারে। সেরূপ জঘন্য লিপি দ্বারা অবশ্যই অপকার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু নাগাশ্রমের অভিনয় কি সেই ধাতুর লিপি? তাহাতে কোন্ কথাটা মিথ্যা? তাহার পরিহাররূপী আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলে তাহাতে এই কয় প্রকার অভিযোগ দৃষ্ট হইবে।" তারপর তিনটি অভিযোগের বর্ণনা আছে। প্রথমতঃ উন্নতিশীল দল স্বাধীনতা প্রয়াসী ও অযথা স্বাধীনতা বিলাসী। রাজকীয় স্বাধীনতা সাধ্যাতীত হওয়ায় পারিবারিক বা দাম্পত্যক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার প্রকাশ করে এঁরা স্বাধীনতার সাধ মেটান। দ্বিতীয়তঃ কৈশব সম্প্রদায়ের অতিভক্তি ও অবতার-ধারণা অস্বাভাবিকতায় পর্যায়ে পৌছিয়েছে। তৃতীয়তঃ কেশব সেনের কার্যবিধি

১৪। মধ্যস্থ—আষাঢ়—১২৮১।

ইত্যাদি। "কেশববাবু তাঁহার সম্প্রদায় ও সমাজ মধ্যে একাধিপতি হর্ত্তাকর্ত্তা—তিনি যাহা করেন তাহা প্রায় খণ্ডিত হইবার নয়। তাঁহাদের অনেক নিয়ম ও অনুষ্ঠানও যেন কেমন কেমন—যেন পরিণত বুদ্ধি সম্ভূত নহে—যেন এদেশের লোকের চক্ষে ও পক্ষে সম্পূর্ণ খাপ-ছাড়া—যেন দেশকালপাত্র বিবেচনায় অস্বাভাবিক।"

প্রহসনে নকুলের গানে আছে,—

"(আরে) ধর্ম্মের খোলস অঙ্গে পরা, বেম্মো চক্রের ফণা ধরা;
রিষের বিষে মর্ম্ম ভরা; দেশের দ্বেষে দম্ভ পোরা;
ভ্রান্তি ছোবল, শান্তি-চোরা; কর্ম্মে কেবল শর্ম্ম হরা;
কুহক দিয়ে মুলুক মারা, গোঁসার ফোঁসে গর্জ্জন করা।"

প্রহসনকার বিভিন্ন স্থানে বাউলগীতিতেও বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন :—

"ঠাহর করে দেখ্, দেখি, তোর মনে মনে আছে কি?
ও তুই, এক বলিস্, আর কাজে করিস্
মনেরে ঠারিস্ আঁখি॥"

অন্যত্র,—

"তারে কে ভাই পারে চিন্তে?
ও যার হাজার খানা, ধর্ম্মের ফণা, বক্তৃতাতে,
মরি মরি, বক্তৃতাতে ফোঁস ফোঁসান্তে!
ওরে! সে ফণার বাক্ যোজনার বিষের পানার
তার পেয়েছে যে,
শোনে না মায়ের কান্না, মানে না বাপের ধান্না,
আমরণ করে কেবল হিঁদুকে ঘেন্না!"

ব্রাহ্মসমাজের বিজাতীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে,—

"দিশী ভাব নয় গো আসল বিলিতি বিভা!
তাতে বাহ্য যুক্তির ব্রাইট্ রকম লাইট পাইবা।"

কাহিনী।—রসাতলে বাসুকীর রাজপুরী। সেখানকার মন্ত্রণাগৃহে রাজভ্রাতা অনন্ত, রাজমন্ত্রী বা সম্পাদক তক্ষক, এবং পূর্ববঙ্গজ পরম ভক্ত রামমাণিক্য বা পুঁয়ে বোড়া উপস্থিত। এরা সভার আলোচ্য ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বংশবৃদ্ধির পালা, প্রধান নাগ-নাগিনীর নামকরণ ও

উপাধিবিতরণ, বিষবুদ্ধির বিবরণ, একটা স্থায়ী নিয়ম ইত্যাদি করবার ব্যাপার নিয়ে এঁরা আগ্রহী। তক্ষক বলে,—"আমরা বেশ টের পেয়েছি, প্রভু সেই পরম প্রভুর সাক্ষাৎ অবতার! কেবল কোনো গুহ্য কারণেই নরলোক সাধারণে সেটা বল্‌তে না দিয়ে মহাপুরুষ নামেই এখন প্রকাশ পাচ্ছেন—ও একই কথা—যে চেনে সে চেনে। তারপর, বিভুর বিশেষ আদেশ তো অহোরাত্রি প্রভুর অন্তস্তলে তাড়িৎ বার্ত্তাবহের ন্যায় যাতায়াত কচ্চে। আমরা নিকটে থাকি বলে আমরাও যার তার একটু আধ্‌টু বেগ পেয়ে থাকি।" নাগরাজ বাসুকী এম্. এ. বলেন,—এই সংস্কারটা যদি সবার মনে বদ্ধমূল করা যায়, তাহলে বিষবুদ্ধির কাজ হবে। বিষবুদ্ধির মানে বুঝিয়ে বলেন বাসুকী। ভগবান্ প্রথমে ক্রুদ্ধ মূর্তিতে অবতার হয়ে এলেন, কিছুদিন পৃথিবী ঠাণ্ডা রইলেও আবার যা-কে-তাই। তারপর তিনি বুদ্ধি করে শান্ত বুদ্ধ মূর্তিতে এলেন। কিন্তু তাতেও সাময়িকভাবে পৃথিবী ঠাণ্ডা রইলো, কিন্তু আবার পূর্ববৎ। কলি পৃথিবীকে কাঁদতে দেখে বলেন, পুরাতনের প্রতি ভক্তিই পৃথিবীর রোগ—এতেই এতো দুর্দশা। এতোকাল অবতাররা নতুনকে দমন করে পুরাতনকে জীইয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। উল্টো কিছু না করলে হবে না। কলি বলেন,—"ব্রহ্মা ট্রহ্মা হরি ফরির কর্ম্ম নয়—যদি নাগরাজ স্বয়ং সদলেবলে এসে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তবেই তোমার নাড়ীতে 'পুরাতনের ভক্তি'রূপ যে পুরাতন বিষ আছে, তাতে ফোঁটা-কত নির্ভেজাল নূতনের ভক্তিনামা বাসুকী-দলের বিষ পড়লেই ঐ পুরাতন বিষের উচ্ছেদ হবেই হবে।" বাসুকী আরও বলেন,—"নিরাকার পরমাত্মা সাকার হয়ে কিম্বা সাকার প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারাই সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন"—তাই বাসুকী সাকার। অনন্ত বলে—এটা তো "পাপিষ্ঠ হিন্দুদের" মত। "প্রকাশ্য স্থলে তো আপনার মুখে একদিনও এমন প্রিন্সিপল্ শুনি নি।" বাসুকী চতুর্দিকে একবার সন্দেহের চোখে চেয়ে তারপর মৃদুস্বরে বলেন,—"আরে ভাই, যদি প্রকাশ্য স্থলেই মনের কথা সব বল্‌বো, তবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কথার সৃষ্টি হয়েছে কেন? পাপময় হিন্দুর শাস্ত্রে যা বলে, তার সবই কি মিছে?......তবে কি জান,......কলির অনুরোধে আমরা উল্‌টাতে পাল্‌টাতেই অবতীর্ণ হয়েছি।"

এদিকে ওপাশের ঘরে ভ্রাতা-ভগ্নীরা জড়ো হয়েছেন—সভা করবেন বলে। সভাপতি এখনো আসেন নি। সভাপতি স্বয়ং অবতার। নকুলের ভাষায়,—"উনি এখন গেলে কি আদবকায়দা থাকে—যাকে বলে কদর!" নকুল

অনেকটা স্পষ্ট বক্তা। ব্রাহ্মদের রাগিয়ে বেড়ানো তার স্বভাব। পুঁয়ে বোড়াকে রাগায়, "শান্তিরসে ডুবুডুবু—বঙ্গদেশের বেম্মোবাবু।" তার মতে—"চেঁচালে চিক্রুলে আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়ালেই যদি ধার্ম্মিক হতো, তবে তো জগতে পাপী থাক্তো না—চীৎকারের মত এমন সহজ কাজ কে না করতে পারতো।" সভাপতির অনুপস্থিতকালেই নকুল সভার মধ্যে ঢুকে সবাইকে উদ্দেশ করে বলে,—একজন বিধবা আছেন, সভাস্থ ভ্রাতাদের মধ্যে কে এমন উদার যুবক আছেন যে তাঁকে বিয়ে করতে পারেন! সবাই নিরুত্তর। শেষে নকুল তাদের সঙ্কীর্ণতার ওপর কটাক্ষ করলে পুঁয়ে বোড়া আর থাকতে পারে না; উঠে বলে ওঠে—সে-ই বিয়ে করবে। এমন কি শপথও করে সে। নকুল বলে, বিধবাটি মেথরানী। সঙ্গে সঙ্গে পুঁয়ে বোড়া "হ্যাক্ থুঃ"—বলে সরে যায়। নকুল তখন বলে,—"তারা কি তোমাদের সেই ব্রহ্মপিতার সন্তান নয়? বড়লোক দেখে—পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে দেখে 'ব্রাতাবগ্নী' বলবে, ছোট জাতকে বলবে না—তাদের নামে হ্যাক্ থুঃ! এই কি তোমাদের ধর্ম্মপুস্তকের মত?"

এমন সময় অবতার বাসুকী অর্থাৎ সভাপতি সভায় প্রবেশ করেন। "সকলের করতালি—অনেকের প্রণাম—অনেকের গড়াগড়ি—অনেকের পদধূলি লেহন—অনেকের প্রভুর পাদুকা চুম্বন ইত্যাদি।" নামকরণ প্রসঙ্গে বাসুকী বলেন,—"জঘন্য পৌত্তলিক নাম" "পুরাতন ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন করে" নতুন নাগ-নাম গ্রহণ—এটা ঈশ্বরেচ্ছাতেই হয়েছে—তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছায় নয়। অবতারতত্ত্ব ও বিষবৃদ্ধির বিবরণ সম্পাদক তক্ষক সভায় পাঠ করে।—"কলিযুগে রামমোহন ঋষি কশ্যপ অবতার। তিনিই আদি সমাজনামা খগকুল, আর ভারত সমাজ নাম এই আমাদের মহানাগকুল, এ উভয়েরই মূল। কলিযুগে খগেন্দ্রের অবতার দেবেন্দ্র, নাগ অবতার বাসুকী, খগেন্দ্র বংশ আমাদের ঘোর বৈরী। খগবংশের পরমাত্মীয় হিন্দুবংশের ছেলেমেয়েদের দংশন করে আমরা তার শোধ তুলছি।" তক্ষক বলে,—"কোলব্রুক, জোন্স, উইলকিন্স, উইলসন্ প্রভৃতি দেবতারা হিন্দু শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন দ্বারা অমৃত ও নানা রত্ন আহরণ করিয়া যান। লরেন্সরূপী মহাদেব শেষ আসিয়া····বাসুকীর দ্বারা আরও সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক জঘন্য হিন্দুসমাজ ধ্বংসকারী স্বাধীন উদ্যমের উৎসাহরূপ গরল উৎপাদন করেন। বিষ খেয়ে লরেন্স ঢলে পড়লে 'শাসন শক্তি' নামে তাঁর এক কন্যা মনসার স্থলাভিষিক্ত হয়ে 'প্রকাশ্য Neutrality রাখা কর্ত্তব্য' ইতি মন্ত্রে তাঁহার শরীর হইতে উৎসাহ বিষ কতকটা নামাইয়া দেন।" তা বাসুকী

গ্রহণ করেন। "সেই হইতে আমাদের বিষবৃদ্ধির অদ্বিতীয় উপায় হইয়াছে—সেই হইতে আমাদের মহাপ্রভুকে মহাদেব এত ভালবাসেন যে, কলির কৈলাস ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া গিয়া মহা সম্মানিত ও জগৎ প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।…সেই হইতে এই মহানীতি শিখিয়াছি যে, কলির শ্বেতকায় শিবমূর্ত্তি সংঘের মনোরঞ্জন ব্যতীত জগতে উন্নত হইবার যো নাই।"

অকস্মাৎ সভা ভঙ্গ হয়। কারণ সত্যিকারের একটা সাপ সভাগৃহে ঢুকে পড়েছিলো। সাপ দেখে সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলো।

যথারীতি পরে আবার একটি মিটিং হয়। বাসুকী বলেন,—"নাগসমাজে বাগবাজারের পক্ষীদলের নিয়ম চালাতে হবে। অর্থাৎ পুংস্বাধীনতা আর স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে যে যেমন আগ্রহ, উৎসাহ, অনুরাগ, যত্ন আর কৃতকার্য্যতা দেখাতে পার্ব্বে, তার তেম্নি উপাধি দেওয়া যাবে।" তিনি আরও বলেন,—"স্বাধীনতা আর কুসংস্কারহীনতা গুণের বিচারকালে বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ এবং পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ কোর্টসিপ্‌জনিত বিবাহ; অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ; খুড়তুতো জ্যাঠ্‌তুতো পিস্‌তুতো মাস্‌তুতো মামাতো ভাই ভগ্নীর বিবাহ ইত্যাদির প্রচলন আর অনুষ্ঠানকে উচ্চধরণের গুণ বলেই আগে ধর্ত্তব্য করা যায়।" সবাই বাসুকীর কথা শুনে "চমৎকার নিয়ম! অতি চমৎকার নিয়ম" বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

নতুন নিয়মে সভ্য হতে এলেন বরনাথ বসু এবং সিধুমুখী বসুনী। বরনাথবাবু আদিসমাজভুক্ত ভ্রাতা-বৌদির সঙ্গ ছেড়ে সস্ত্রীক চলে এসেছেন। নাগসমাজ থেকে এঁদের গোধা গোধানি নাম রাখা হলো। বরনাথবাবুর নাকি একটি স্কুল আছে। সেই স্কুলের ছাত্রদের তিনি বিষপান করাবেন।

নাগসমাজের সভ্যদের মনে মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে সন্দেহ যে হয় না, তা নয়। ঢোড়া বলে,—"তাঁর (বাসুকীর) উপদেশ যদি এমন পাকা হর্ত্তুকি, তবে আপনার প্রিয়পতি এই স্বর্ণগোধা ভায়া (বরনাথবাবু) কি জন্যে ওঁর স্কুলের ছাত্রদের কাছ থেকে এত টাকা স্কুলিং আদায় করেন? আপনাদের তো অন্নপানের ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, সুতরাং সংসারের চা'ল্ ডা'ল্ ঘি মাছ তরকারি তো কিন্‌তে হয় না, অথচ আপনার সঙ্গে বেশী অলঙ্কারও তো দেখ্‌তে পাই নে, তবে এত টাকা মাস মাস যে সংসার খরচ বলে নিয়ে থাকেন, সে সব টাকা কি হয়।" ঢোঁড়া আক্ষেপ করে,—"ধর্ম্মোপদেষ্টা জগৎসংস্কারকের সভায় সুযোগ সুবিধাই একমাত্র ইষ্টদেবী।

ধর্ম্মনীতি নামে যে একটা শাস্ত্র আছে, সে বড়লোকের জন্য নয়, সে কেবল দুঃখী প্রাণীদের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে।"

ঢোঁড়া অনুযোগ করে, তার বিষ অর্থাৎ প্রেস্ কেড়ে নেওয়া হযেছে। প্রেস্‌ঘর তালাবন্ধ। সশস্ত্র প্রহরী ঘেরাও করে আছে। ব্রাহ্মসমাজের বিষ ঝাড়বার জন্যে সে পত্রিকা করেছিলো। প্রাণপাত করে সে বিষ ঝেড়েছে। কিন্তু মুস্কিলে পড়লো সে। পাওনাদাররা ছেঁকে ধরলো। মহাপ্রভুদের কাছে নিরুপায় ঢোঁড়া সাহায্যের জন্যে ছুটে যায়, কিন্তু এক পয়সাও মেলে না। ঢোঁড়া ঢোঁড়ানীকে বলে, তারা দুজনে এই "ভয়ানক যোগিনীচক্র" ছেড়ে পালাবে। "এখানে দেখছি, কতক কপট ধূর্ত্ত, কতক অসার নির্ব্বোধ—এখানে থাকলে মান যাবে—মান তো গেছেই—শেষে মার খাওয়ার বাকী, তাও হবে —ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও দূষিত হবে—লজ্জা সরম ভদ্রতা তো অর্দ্ধেক গেছে, যা বাকী আছে তাও থাকবে না।" নীচের ব্যারাকের একটা কাণ্ড তার মনকে আরও বিষিয়ে দেয়। মেটে গিরগিটির গর্ত্তে বেত আছড়া প্রবেশ করেছিলো। তাদের দেখে ভণ্ড বেত আছড়া মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে বল্‌লো,—"তাই তো ব্রাদার, আমি কেন এখানে!" ঢোঁড়া-ঢোঁড়ানী সমাজ ত্যাগ করে।

ঢোঁড়ার বিস কেড়ে নেবার ব্যাপারে বোড়ার মত,—"এ যুগের চাঁদসদাগর 'পেট্রিয়ট্'। সে লরেন্সকে (=হর) ভক্তি করে। কিন্তু তার কন্যা শাসন-তন্ত্রকে (=মনসা) ভক্তি করে না। পেট্রিয়ট নাগবংশের শত্রু। ঢোঁড়া হয়তো শাসনশক্তির নির্দেশ মতো কাজ কর্ত্তে পারে নি। মহারাজের উদ্দেশ্য ছিল পেট্রিয়টকে জব্দ করা।" বোড়ানী নিজেকে ধার্মিকা ও রাজানুগতা বলে মানে: "সেদিন তিনি (মহারাজ) স্পষ্ট বোঝালেন, পাপ হিঁদুদের একান্নবর্ত্তী-প্রথা আর হাত তোলার কুপ্রথাতেই লোক সব কুঁড়ে হয়।" বোড়ানীর শাশুড়ীকে হাত তোলা করে রাখে নি সে। তার শাশুড়ী এখন স্বাবলম্বী। "সিম্‌লে সোঁদের বাড়ী রান্নাবান্না করে খাচ্ছেন দাচ্ছেন।" বোড়ানী অনেক যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেখিযে বলে যে, পরিবারের আয়বৃদ্ধি হওয়া বর্ত্তমান সমাজে মঙ্গলজনক।

এদিকে শ্রীনিকেতনে দয়াল প্রভুর সওয়াল হচ্ছে! স্ত্রীরা কেন গেলো না, তার জবাবে বোড়ানী বলে,—আজ নাকি কারবার বখরাবখরির সওয়াল—তাই কেবল পুরুষরাই গেছেন। নকুল বলে,—সওয়াল হচ্ছে ইন্‌স্‌পিরেশন্। লাউডুগী সওয়াল ব্যাখ্যা করে,—"সে যে হাড়ী বাগ্‌দী দুলে মাগীদের হয়—

তাতে মুখ দিয়ে গ্যাজলা ওটে, রক্তও ছোটে ; চক্ ঠিক জবাফুল হয়।” নকুল বলে,—“ওটা নয়, তবে কিছু কিছু হয়। ইনিও বক্তার হন······আশে পাশে মাথা চালেন, ঘন ঘন দোল খান ; মুখে আগুন ওটে আর বক্তৃতা হলাহল অনর্গল ছোটে! নাকে যে একখানি কলিকবজ তক্তক্ করে, কেবল তারির গুণেই ঝাঁকুনির ভাব অনেক দমনে থাকে, কেন না চক্ষুলজ্জাকে সে একবারে বেরিয়ে যেতে দেয় না।” সওয়ালে বিশেষ আদেশ আর বিশেষ বিধান হয়। মহারাজ সম্পর্কে নকুল বলে,—“আসল গাছপাকা ভক্তেরা অবতার বলেই চিনেছে ; জাগানে ভক্তেরা মহাপুরুষ বলে, কিন্তু দেশের আর সকলে মায়াপুরুষ বলেই জেনেছে।” মহাপ্রভুর চেলারাও আজকাল কথায় কথায় সওয়াল করে। বোড়ানী বলে,—“সেদিন আমি তোলাপাড়া কচ্ছিলেম, আজ মুগের ডাল্ কি অড়র ডাল রাঁধি ? প্রাণকান্ত বোড়া তা শুন্তে পেয়ে থপ্ করে ধ্যানে বসে গেলেন ; খানিক পরেই লাফিয়ে উঠে বল্লেন,—“পেয়েছি পেয়েছি, সন্দেহ পোড়াবার আগুন পেয়েছি—প্রিয়ে ! বিশেষ আদেশ হলো, আজ তুমি মুসুর ডাল আর পুঁই চিংড়ি রাঁধো।” খরচ কমাবার উদ্দেশ্যে বোড়ার অদ্ভুত সওয়াল! আর একটি সওয়ালের দৃষ্টান্ত নকুল দেয়। পুঁয়ে বোড়া ময়ালকে বলেছিলো,—“সওয়াল করে বলুন দেখি আমি কাঠের কারবার করি কি মুদীর দোকান খুলি। ময়াল ধ্যান করে বলে,—কোনটিই কোরো না—তোমার পুঁজির টাকাগুলি এনে আশ্রমের তবিলে জমা দাও।”

গোধা তার নিজের স্কুলটি আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। আশ্রমের অধ্যক্ষ নিজের স্বার্থে গোধার কাছ থেকে সেটি কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে ফেলে। তারপর পাওনা আরো কিছু চায়। গোধানী মন্তব্য করে,—“স্কুল তো নয়, তালুক—তা কেড়ে নিলে, আবার পাওনা—যার ধন তার ধন নয়, নেতো খায় দই—এই কি ধর্ম্ম ?” গোধা সমাজকে নিন্দা করে বলে,—“এরা আবার দেশ সংস্কারক!—যত বাপে খেদানে মায় তাড়ানে কপট ভণ্ড নষ্ট লোকের কুহকে পড়ে আমরা জন কত বোকা গোঁড়া ছোঁড়া কেবল ধনে মানে কুলে শীলে মজে গেলেম।” গোধানী আক্ষেপ করে,—“হিঁদুর আলো আঁধারে ঘর বরং লক্ষ গুণে ভাল—এ আলেয়ার আলো যে এককালে কুপথে নিয়ে গে ঘাড় মুচ্ড়ে দেয়!”

অবতার (কলিকাতা—১৮৮১ খৃঃ)—ফকিরদাস বাবাজী (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ) ॥ “The ‘Avatar’ or Behold the Prince of India.

cometh Riding upon an Ass," মলাটে Satire সম্পর্কে Dryden-এর উদ্ধৃতি আছে,—

> "Satire has always shone among the rest
> And is the boldest may if not the best,
> To tell men freely of their foulest faults.
> To laugh at their vain, deeds and vainer thoughts."

গর্দভারূঢ় মাধবের অনুসরণকারী বাউলদের বিদ্রূপাত্মক গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

> "…তোমার কান্দানী আর কেরামতে
> রাজা উজীর ঘুরিয়ে ফেলে।
> ঐ যে আমীর ওমরা পড়ছে ঘুরে
> মেয়ের জোর সার কলিকালে॥…
> নেটিভ ক্রাইষ্ট তুমিই এখন
> সেভিয়ার হয়েছ হালে।
> থাকো জলে না ছোঁও পানি
> বুজরুকি কত জানালে।
> দাদা, নিজে হয়ে মস্ত মাজি,
> সমাজ দহে নাম ডুবালে॥…
> ঈশ্বর হওয়া মুখের কথা
> হাতী মারা মশার ছলে।
> দাদা, রাং কি কভু হয় গো সোনা,
> থুথুতে কি ছাতু গলে!!"

বলাবাহুল্য কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণই এতে প্রকাশ পেয়েছে।

কাহিনী।—অবতার মাধব গুপ্ত নিজের কামরায় বসে ভাবে, ত্যাগ স্বীকারেই আসল নাম। তার ইচ্ছে, বুদ্ধ, খৃষ্ট বা মহম্মদের মতো জগৎপূজ্য হয়। "তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর তীব্র উপহাস ও কঠোর বাক্যবাণ যদি সহ্য করে থাকতে পারি, বিংশ কি একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ বলে বিখ্যাত হবো।" লোকে তার পেছনে ফেউয়ের মতো লাগে। ইচ্ছা

করে তাদের মুখ থেঁতো করে দেয়। কিন্তু চট্‌লে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে, তাই মাধব তাদের বিদ্রূপে কান দেয় না।

নিজেকে সম্বোধন করে সে বলে,—"মাধব! তোমার স্বাভাবিক কতকগুলি ক্ষমতা আছে—বক্তৃতা শক্তি, গম্ভীর ভাব, fascinating speech, imposing appearence, এতেও যদি তুমি অবতার না হতে পার তোমাকে ধিক্।...... তোমারও baptism তোমারও temptation চাই, ক্রমে তুমি ঐশ্বরিক গুণ সম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন হবে।"

গিন্নীকে কিন্তু মাধব ভয় পায়। বলে, মায়ার প্রভাব। "গিন্নীর মুখ ভার দেখলে 'দয়াময়' বক্তৃতা, ধর্ম্ম, উচ্চাশা—সব ঘুরে যায়।" গিন্নীও যথারীতি আসেন। মুখ ভার। মাধব বলে,—"আচ্ছা ভাই, তুমি যে আমার উপর এমন রাগ করো, তোমার জন্য না কচ্চি কি? রাজা রাজড়ার সঙ্গে আলাপ পরিচয় কুটুম্বিতা করা হয়েছে, এতো লোকের উপহাস সহ্য করেছি, আর অপমানের কথাই নাই।" মাধব বার বার স্ত্রীর মুখচুম্বন করে মান ভাঙাতে চেষ্টা করে। গিন্নী বলেন, সে নাকি অবতার হয়েছে,—হতে পারে অবশ্য এক অবতার—ঢেঁকী অবতার! মোহিনীর কাছে বসে মাধব প্রেমের গান শোনে।

বিক্রম মজুমদার নামে মাধবের এক শিষ্য আসে। সে এসে বলে,—"গুরুদেব!... পিতার প্রেম কি সুদৃঢ়! তাঁর আশীর্বাদে কল্যকার উৎসব বিঘ্নবিবর্জ্জিত হবেই হবে।" বক্তৃতার বিজ্ঞাপন কাগজে কাগজে দেওয়া হয়েছে। মাধব তাকে ডাকে—"ভ্রাতঃ।" বিক্রম বলে,—"দাসকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করবেন না, আমি দাসানুদাস।" মাধব বলে,—"আহা! তোমারই প্রকৃত বিনয়। বিনয়কারীরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে।" বিক্রম বলে,—"প্রভো! তোমারি মহিমা! তোমারি অনির্ব্বচনীয় প্রেম!" মাধব তখন ঈশ্বর প্রশস্তি গায়; বলে,—"প্রভু পিতার পিতা, মাতার মাতা! তাঁহার প্রেম যে অনির্ব্বচনীয়, তাহা প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ।" ভক্তি প্রকাশে গুরু শিষ্য কেউই হারবার নন। শেষে শিষ্য একটা ভক্তিমূলক গান গেয়ে ওঠেন। গুরু তখন বাধ্য হয়ে হার মানেন। এঁদের কথাবার্তায় কাজের কথা যতটুকু, অকাজের কথা তার দশগুণ!

নৈবেদ্যের পাকা কলাটির মতো সমাজে মাধবের আসন। তার বক্তৃতা যা কিছু সব নিজেকে নিয়েই। মাধব বলে,—"জগৎ জান্‌তে চায়, সে অবতার কিনা! অনাবশ্যক বোধে মাধব এতোদিন তার উত্তর দেয় নি। কিন্তু আজ

বুঝতে পারছে, তার মৌনতা জগতের ভ্রান্ত সংস্কার গড়ে তুলছে।” সে বলে,—“আমি সামান্য মনুষ্য—মনুষ্য বটে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যবর্গ অপেক্ষা আমি উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত।…… আমার ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়াছেন, যীশুখৃষ্ট আমাকে দর্শন দিয়াছেন, পল ও যোহন আমাকে দেখা দিয়াছেন, বলিয়াছেন, অনুতাপ কর কেন না ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইযাছে। …আমি জগৎকে জানাই আমি অবতার নহি, কারণ আমি পাপী। কৃষ্ণ প্রভৃতিও অবতার ছিলেন না, কারণ তাঁহারা পাপী! মিথ্যা কথা নরহত্যা, পরদার চুরি প্রভৃতি যত প্রকার পাপ আছে আমি সকলই করিয়াছি; সুতরাং আমি অবতার নামের অনুপযুক্ত। … আমি পাপী হইয়াও ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত, তিনি আমার দ্বারা জগতে নিজ সত্য প্রচার করিবেন। তিনি আমার হস্তে স্বর্গের চাবি দিয়াছেন।”

বক্তৃতা করে গুরুর গলা শুকিয়ে ওঠে। শিষ্যের কাছে মাধব জল চায়। বলে,—“ভ্রাতঃ তুমি আমার জল-সংস্কার কর। কারণ আমি তোমারই নিকট হইতে জলদীক্ষা গ্রহণ করিব।” বিক্রম বলে,—“অহো ভাগ্যং! আমাদের কি সৌভাগ্য!” তারপর জল দেওয়া হলে লাবণ্যময় নামে আর এক শিষ্য বলে ওঠে,—“অদ্য প্রভুর নামে প্রভুর অনুগৃহীত গুরুদেবের তদীয় ভৃত্যদ্বারা জলদীক্ষা হইল ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।” বিক্রমও বলে চলে,—“ওঁ শান্তিঃ নমোদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥”…ইত্যাদি।

অবতারকে সকলে ভক্তি করে। টুক্‌টাক্ মিষ্টিও কিছু পাঠায় তার ভোগের জন্যে। মাধবের চাকরটারও ভোগে লাগে। কারণ আড়ালে সেও দুযেকটা রসগোল্লা গালে পুরতে অভ্যস্ত। একদিন মাধব তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে। চাকর ভয়ে কাঁপে। মাধব তাকে বলে,—“অনুতাপ কর!” চাকর মনে মনে ভাবে,—“অন্য মনিব হলে সেরে দিতো, ভাগ্যিস্ অনুতাপ আছে!” মাধব তাকে বুঝিয়ে বলে,—যার কাছে অবতার মাধবও কীটানুকীট, তার কাছে চাকরটি অপরাধ করেছে। চাকর সরলভাবে বলে,—“সে তো গিন্নী!” মাধব মনে মনে চাকরের বুদ্ধির তারিফ করে ঈশ্বরের তত্ত্ব বোঝায়। রসগোল্লা এঁটো, মাধব তা খেতে পারে না, চাকরকে দিয়ে দেয়। চাকর ভাবে,—“এমন না হলে আর মনিব। অনুতাপ কর আর রসগোল্লা খাও।” চাকর চলে গেলে কর্কশ গলায় মাধব একটা আদিরসাত্মক গান গাইবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। হঠাৎ সমাজের কথা মনে হতে উঠে পড়ে।

সমাজগৃহ। মাধব বেদীতে বসে আছে। আর সবাই চোক বুঁজে নীচে

বসে আছে। শিষ্য লাবণ্যময় হঠাৎ প্রস্তাব করে,—"গুরুদেব! যীশুখ্রীষ্ট যেরূপ গর্দ্দভ আরোহণে জেরুশালেম পর্যটন করেছেন, আপনার তাহা হইল না কেন? জন্মকাণ্ড, জলদীক্ষা কাণ্ড ও পরীক্ষা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, প্রভো! গর্দ্দভ কাণ্ড কবে হবে?" মাধব বলে,—"ঈশ্বর তোমার মুখ দিয়ে আমাকে শিক্ষা দিলেন।" মাধব তাকে গড়পারে গিয়ে গাধা খুঁজে আনতে বলে। "স্ত্রীগর্দ্দভ নহে, নিতান্ত শিশুগর্দ্দভ নহে, নিতান্ত বৃদ্ধও নহে, যুবা একটি গাধা। আমার ন্যায় একটি গাধা, তোমার ন্যায় একটি গাধা, যাও বৎস!" একদল বাউলকে নিয়ে আসবার জন্যেও সে বলে দেয়। তারা পেছন থেকে বিদ্রূপাত্মক গান গাইবে। নইলে যীশুখ্রীষ্টের মতো হবে কি করে? "ঈশ্বরের নিমিত্ত বিদ্রূপ ভাজন না হোলে সকলি বৃথা।"

নগরে মহা হৈ চৈ। গাধার পিঠে শিষ্য পরিবৃত অবতার!! পেছন পেছন বাউলরা বিদ্রূপাত্মক গান গায়,—

"ঈশ্বর হওয়া মুখের কথা,
হাতী মারা মশার হুলে।
দাদা, রাং কি কভু হয় গো সোনা
থুথুতে কি ছাতু গলে!"

যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন (কলিকাতা—১৮৭৮ খৃঃ)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ (কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়?)॥ ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আক্রমণাত্মক দৃষ্টিকোণ রক্ষণশীল পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের নব্য উন্মাদনায় অনেকে সমাজে ব্যভিচারের পরিবেশ সৃষ্টির সহায়তা করে প্রকারান্তরে সামাজিক ক্ষতিই এনেছিলো। তবে দ্বৈতীয়িক অনুশাসনবিরোধী দৃষ্টিকোণ এই চিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

কাহিনী।—মুরারিবাবু একজন ব্রাহ্ম। স্ত্রী-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তিনি তার নিজের স্ত্রী বসন্তকুমারীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। পরপুরুষের সঙ্গে যে-সব ব্যবহার দৃষ্টিকটু, তাও সভ্যতার খাতিরে বসন্তকুমারী স্বামীর নির্দেশে করে থাকেন। বসন্তের ভয় হয়। এতে তাঁর সতীত্ব নাশ হবার সম্ভাবনা। স্বামীকে জব্দ করবার জন্যে তিনি স্বামীর সামনে

সমাজভ্রাতা মথুরবাবুর সঙ্গে মিথ্যা প্রেমাভিনয় করেন। কিন্তু তাতেও স্বামীর হুঁস্ হয় না।

বাড়ীতে মুরারি ও বসন্ত একা থাকেন। তবুও সমাজভ্রাতা মথুরবাবু মুরারিবাবুর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে যাতায়াত করবার অনুমতি পান। একদিন মুরারিবাবু সমাজে বেরোবার আগে মথুরবাবু এলেন। বাড়ীতে একা স্ত্রী। এ অবস্থায় মুরারিবাবুর সমাজে যাওয়া চল্‌তে পারে না। তাই মুরারিবাবু স্ত্রীকে বল্‌লেন, আজ তিনি আর সমাজে যাবেন না। স্ত্রী ইতিপূর্বে স্বামীকে সমাজ থেকে দেরী করে ফেরবার জন্যে অনুযোগ করেছিলেন। স্বামী কি তাতে রাগ করে যাচ্ছেন না। স্ত্রী বল্‌লেন, তিনি যেন সমাজে যান, মথুরবাবুকেও নিয়ে যান। স্ত্রীর এই অস্ত্র ব্যর্থ হলো না। মুরারিবাবু তখন বল্‌লেন, তিনি যাবেন, তবে মথুরবাবু থাকবেন। স্ত্রীও এই চাইছিলেন। মুরারিবাবু বল্‌লেন,—"ভদ্দরলোক এসেছে!! তার ওপোর আমি বার বার বোলেছ—আমি ঘরে না থাকি, আমার মাগ তোমায় Receive কোরবে।" বসন্ত কপটভাবে বলেন,—"নাথ, তুমি কি জান না যে, তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ দেখ্‌তে পাইনে, তোমার অনুরোধে আমি অনেক কোরেছি—আরও বলতো মথুরকে মাতায় করে রাখব, কিন্তু আর তোমার কথা শুন্‌বো না।" বসন্ত রাগ করেছেন ভেবে মুরারি মথুরকে রেখে স্ত্রীকে বুঝিয়ে চলে যান। বসন্ত এবার সুযোগ পেলেন; কিন্তু তাঁর মনের ধারণা, মুরারি স্ত্রীকে এ ভাবে রেখে নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন না। অকারণে ছুতো করে আসবেনই। স্ত্রীর ধারণাই সত্যি হলো। মুরারিবাবু একটা ওজুহাত দেখিয়ে ফিরে এলেন। স্বামী আস্‌বেন জেনেই বসন্ত ও মথুরবাবু কাছাকাছি বসেছিলেন। দুজনকে এ অবস্থায় বসা দেখে তিনি ভাবলেন,—"প্রাণটা কু গাচ্যে, গতিক ভাল নয়, সমাজের বাপের মুখে হাগি, আজ যাব না।" মুরারিকে দেখে স্ত্রী বল্‌লেন,—আশা করি তাঁর বন্ধুর খাতির তিনি ভালো করেই করছেন। মুরারিবাবু চলে গেলেন। মথুরবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। বসন্ত তাঁকে অভয় দিয়ে বল্‌লেন যে, তাঁর স্বামী যা ই মনে করুন না কেন, মুখ ফুটে কিছু বল্‌বেন না। স্বামী আবার ছুতো করে এলেন। স্বামী কিছু বল্‌তে পারবেন না জেনে বসন্ত বলেন,—"দেখুন মথুরবাবু, ব্রহ্মধর্ম্ম ভাল, কি হিন্দুধর্ম্ম ভাল, আমি একবার দেখাই, আপনার কোলে একবার শুই।" তারপর স্বামীকে বল্‌লেন,—"হ্যাগা ব্রহ্মধর্ম্মে চুমোয় দোষ আছে?" মুরারিবাবু নির্বাক্। মনে মনে ভাবেন,—"এখন ঠেকাঠেকি?

আগে জান্‌লে ব্রহ্মধর্মের চোদ্দপুরুষের মুখে হাগ্‌তুম, কোন্ শালা জানে এমন হিড়িক, সামনে কোলে শোবে, আবার জিজ্ঞাসা কচ্চে চুমো খাবে কিনা ? আমি যদি কথা কই, তবে বদরসিক হলেম।"

বসন্তকুমারী আরও একটু অগ্রসর হলেন। মথুরবাবুকে বল্‌লেন,—"মথুরবাবু আমার মাথা ধরেছে, তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।" পর-পুরুষের কোলে শোবার অনৌচিত্য নিয়ে মুরারিবাবু ক্ষীণস্বর তুল্‌তে গেলে বসন্তকুমারী স্বামীকে ধিক্কার দিয়ে বলেন, কই, তিনি তো নিজের থেকে কোল পাত্‌তে পারলেন না! স্বামী তখন মথুরবাবুকে নিয়ে স্ত্রীর ওপর কটাক্ষ করলে স্বামীর ওপর কপট কোপ করে বসন্ত মথুরবাবুকে চলে যেতে বল্‌লেন। এতে সমাজভ্রাতার অপমান হয়, এই ভেবে মুরারিবাবু মথুরবাবুকে থাক্‌তে বল্‌লেন। মুরারিবাবু ভাবলেন, স্ত্রীর মনে ধারণা হয়েছে, স্বামী তাকে অবিশ্বাসিনী মনে করেছেন। তখন মুরারিবাবু স্ত্রীর ধারণা পাল্টাবার জন্যে নিজের থেকেই বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে বসন্তকুমারী তার চাকর গদাকে দশ টাকা বক্‌শিস্ দিলেন এবং এইসঙ্গে কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে দিলেন। মুরারিবাবু আবার একটা ছলে ফিরে এলেন, কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে চলে গেলেন। বসন্তকুমারী মথুরবাবুকে বল্‌লেন,—"আজ একটা স্পেস্তনেস্ত হোগ্ না।" মথুরবাবু লোকনিন্দা ও বন্ধুত্ববিনাশের ভয়ে আপত্তি করলেন। কিন্তু বসন্ত তাতে কান না দিয়ে স্বামীকে জব্দ করবার চেষ্টা করেন।

স্বামী আবার যখন যথারীতি এলেন, তখন বসন্ত চীৎকার করে মূর্ছার ভানে পড়ে যান—"বাবারে মারে গেলুমরে" বলে। বক্‌শিস্ পাওয়া চাকর গদা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মুরারিবাবুকে না চেনবার ভান করে বেদম মার দিলো। মুরারিবাবু তাকে তিনমাসের মাইনে দেননি, সেই ক্ষোভ তার মনে ছিলো, অন্যদিকে গিন্নিমার কাছ থেকে দশ টাকা বক্‌শিস্ না চাইতেই পেয়েছে। চাকর বসন্তের বারণেও মার থামায় না। মুরারিবাবু বলেন,—"আর ধরাধরি কাজ নেই বাবা আমি নাকে খৎ দিয়ে চলে যাচ্চি।" মথুরবাবু বল্‌লেন, আলোর দোষেই এমন অপ্রিয় ব্যাপার ঘট্‌লো। তিনি নিজেও ভয় পেয়েছেন। বসন্ত বলেন,—"আমার গা এখনো কাঁপছে!"

চাকরকে মথুরবাবু অস্পষ্ট আলোটা নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। মুরারিবাবু মথুরবাবুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালেন, এখন তো মথুরবাবুই কর্তা। মথুরবাবু

মৌখিক আপত্তি জানালেন। এদিকে চাকর আলো দিয়ে যেতে চায়। আজ আবার চাঁদের আলোও নেই। তাই মুরারিবাবু গদাকে বলেন,—"ও গদা তোর পায়ে পড়ি, আলো লিস্ নি, লেঙ্গি মাস্তে হয় ত মার। আচ্ছা, আলো থাক্, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।" মুরারিবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন। তবু আলো নিয়ে গদা চলে যায়। গদা বললো, এবার মুরারিবাবু এলে সে ঝাঁটা পিট্‌বে। ইতিমধ্যে আরও দুটাকা বকশিস্ সে পেয়েছে!

অন্ধকার ঘরে একা মথুর ও বসন্ত। ঘরের মধ্যে বসন্তকুমারী ও মথুরবাবু চুমো খাবার ভান করে চক্ চক্ শব্দ করেন। বাইরে থেকে মুরারিবাবু চেঁচান, —"ওরে বাবারে! ওরে যে চক্ চক্ শব্দ হচ্চে, ওরে চুমোর ডাকে যে প্রাণ বাঁচে নারে।" ঘরে আবার ঢুকে মুরারিবাবু গদাকে বলেন,—"ওরে আলোটা জ্বাল না, চক্ষুকর্ণের বিবাদ মেটাই।" গদা আবার মুরারিবাবুকে ঝাঁটাপেটা করে। বলে,—"শালার আক্কেলকে মারি ঝেঁটা, দাঁত ছিরকুট পোড়লো, আলো নেবালে, আমার দশ টাকা বক্‌শিস্ দিলে, তবুও বলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ মেটাই, —তবে রে শালা।"—এই বলে গদা মারের পর মার চালিয়ে যায়। গদা বলে,—"আলো নিবিয়ে আক্কেল দিতে পা ল্ল না, ঝেঁটার চোটে আক্কেল হোলো, সব মিছে।" মুরারিবাবু বলেন,—"ঝেঁটায় ছেড়েছে বিষ ওরে বাপধন।" ছন্দ মিলিয়ে মথুরবাবুও বলে ওঠেন,—"যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন।"

সুরুচির ধ্বজা (১৮৮৬ খৃঃ)—রাখালদাস ভট্টাচার্য॥ প্রহসনকার কাহিনীশেষে গিরিধারীর মুখে একটি ছড়া উপস্থাপন করেছেন।—

"হাসে কাকুর কাইয়েছিল, কাশ্‌তে বিচি বারাইল,
দেহেচ নি হোনার চাদ কুলটার মজা।
গর্ভস্রাব চল গরে, দনে প্রাণে সারলি মোরে
বেলা উবাইলি বাপ্ সুরুচির ধ্বজা॥"

নব্য সংস্কৃতি-নির্ভর রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্মের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রহসনকার রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন।

কাহিনী।—বাঙ্গাল গিরিধারীর পুত্র লালচাঁদ নব্য যুবক হয়েছে শহরে এসে। গিরিধারী তার বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন সে স্ত্রী তার পছন্দ নয়। বন্ধু চারুচন্দ্রকে সে বলে,—"My wife is the great obstacle in the way of my progress. সারাদিন কেবল লোকজনের রসুই নিয়ে পড়ে

থাকে আর বুড়োর পায়ে হাত বুলয়। Gentlemanএর Societyতে move কর্ত্তে আদৌ জানে না।" বন্ধু চারুচন্দ্র সেটা সমর্থন করে বলে,—"Accomplished wife ভিন্ন এই পার্থিব জীবনই বৃথা। মানুষের progress-এর অর্দ্ধভাগ wifeএ help করেন। বিশেষতঃ সভ্যসমাজে আজকালকার দিনে wife নিয়েই পসার।" দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে চারু বলে,—"আমার একটী সেকেলে বন্ধু কেবল এক accomplished wifeএর জোরে বড় বড় associationএর member হচ্চেন, Secretary হচ্চেন; প্রধান প্রধান Social movementএ leading part নিচ্চেন। Progressiveদের মধ্যে তাঁর ভারি পসার।" চারুর কথায় লালচাঁদ আরও দুঃখ করে—নিজের স্ত্রীর কথা ভেবে। তার স্ত্রী যদি সামাজিক ও প্রগতিশীল হতো, তাহলে এতোদিনে লালচাঁদ নিশ্চয়ই C. I. E. সমেত রাজা উপাধি পেতো। চারু ব্রাহ্ম। সে স্ত্রীকে divorce করবার জন্যে লালচাঁদকে পরামর্শ দিলো। দোটানার মধ্যে দিয়ে লালচাঁদ সেই সঙ্কল্প গ্রহণ করলো। বিশেষ করে চারু যখন বলে,—"Religion and theology are two different things altogether." তাদের সমাজে 'a mere girl of twenty five' এসেছে। বিলিতী journals-এ তার লেখা ছাপা হয়। তার সঙ্গে লালচাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে।

সমাজের আচার্য যখন এই ব্যাপার জানলেন, তখন তিনি তা সাগ্রহে অনুমোদন করলেন। তিনি বললেন,—"আপনার নাবালক অবস্থায়—জ্ঞান ও বিবেকের অভাবকালে যখন আপনার পিতা কর্ত্তৃক আপনার প্রথম বিবাহ সংঘটিত হয়েছে, তখন এ দ্বিতীয় পরিণয় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং ঈশ্বরানুমোদিত।" উকীল প্যারী যখন বলেন,—পরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হলে তাঁর নামে মিথ্যা কলঙ্ক আনতে হবে, তখন আচার্য 'বিবেক' এবং 'কর্ত্তব্যবুদ্ধি'তে প্রণোদিত হয়ে উকীল কাজ করেছেন বলে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। আসলে ধনী লালচাঁদের কাছ থেকে সমাজে কিছু টাকা আয় হবে, এই উদ্দেশ্যেই আচার্য এই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকটিকে সমাজে ভিড়িয়েছেন। 'সমাজের' কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ব্যয়ের জন্যে ইতিমধ্যে তিনি লালচাঁদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছেন।

লালচাঁদ বাড়ীতে এসে নিজের স্ত্রী সুশীলাকে অন্য কোথাও যাবার জন্যে তাগাদা দেয়। স্ত্রী কান্নাকাটি করে। তাকে মেরে না ফেললে সে স্বামীর সঙ্গ ছাড়বে না। মা উপদেশ দিতে এসে অপদস্থ হন। গিরিধারী এসে বকুনি

দিলে লাল উত্তর দেয়,—"আমি ওকে বিয়ে করি নি—তুমি আমার অজ্ঞাতে ওর সঙ্গে আমার বে দিয়েছিলে। শাস্ত্রমতে তুমি ওর ভর্ত্তা, ইচ্ছা হয়, তুমি ওকে রেখে দিতে পার।" দুকানে আঙুল দিয়ে গিরিধারী পালিয়ে যান।

'A mere girl of twenty five' সুরুচি বিবাহিতা। সেও তার স্বামীকে ত্যাগ করে লালচাঁদকে বিয়ে করবে। চারুর কাছে লালচাঁদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে সুরুচি জানতে পারে যে, লালচাঁদের প্রচুর টাকা—শুধু লেখাপড়ার অভাব। সুরুচি তাতে বলে,—"Oh, that I will myself make up." কারিগরের হাত ভেড়া পিটিয়ে ঘোড়া করে! এদিকে সুরুচির স্বামী কালাচাঁদ গ্রাম্য, বঙ্গজ এবং মূর্খ। অর্থের জন্যই সুরুচি এতোদিন তাকে স্বামীপদে বরণ করেছিলো, অর্থদোহন এখন তার শেষ হয়েছে। সুতরাং কালাচাঁদকে আর স্বামী করে রেখে লাভ নেই। একদিন সুরুচি ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরে যেতে বলে। কালাচাঁদ সুরুচির জন্যে জাতি, কুল, বাবা, মা—সবকিছু ত্যাগ করেছিলো, সুরুচি যখন তাকে ত্যাগ করলো, তখন সে 'দুকুল হারালাম' বলে অনুশোচনা করে এবং বিদায় নেয়।

এদিকে লালচাঁদ একদিন তার বাড়ীতে সমাজের ভ্রাতা-ভগ্নীদের নেমন্তন্ন করলো। গিরিধারী শুনলেন, তাঁর বাড়ীতে "বিলাতি খ্যামটা নাচ" হবে, তাই শুনে বারণ করতে গিয়ে তিনি অপদস্থ হন। লালচাঁদ তাঁকে পাত্তা দেয় না। বন্ধুরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে লালচাঁদ বলে,—"ও আমার father এর brother অনেকদিন থেকেই আছে, তাই তাড়াতে পাচ্ছি নে।" এরপর নাচগান সুরু হয়।—

"ভাই ভগ্নী মিলিয়া মাতি প্রেম সুধা পানে
হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে, হিপ্ হিপ্ হুররে;"

নাচগান শেষ হলে লালচাঁদ সুরুচিকে ব্যক্তিগতভাবে বললো যে, এ বিয়েতে তার বাবার মত নেই। সুরুচি তাকে পরামর্শ দিলো, সে যেন বাড়ীর থেকে মূল্যবান্ জিনিসপত্র নিয়ে তার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেয়। গিরিধারী তার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে তাকে তিরস্কার করলেন। লালচাদ শূন্যহাতে সুরুচির বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। লালচাঁদের চাইতে লালচাঁদের টাকাই সুরুচির দরকার। অর্থহীন লালচাঁদকে সুরুচি নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করে। বলে,—"আপনার agreementএর terms fulfill কৈ?" ক্রুদ্ধ লালচাঁদ সুরুচির

তথা গোটা সমাজের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আচার্যের কাছে গিয়ে তার দেওয়া টাকাগুলো ফেরৎ চায়। দেঁতো হাসি দেখিয়ে আচার্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, সে টাকা ফেরৎ পাবার কোনো উপায় নেই। কারণ অবলারঞ্জন ফাণ্ডে সব জমা হয়ে গেছে। সুরুচি দয়া প্রকাশ করে বলে, কানা গৌরমণির সঙ্গে বরং লালচাঁদের বিয়ের ব্যাপার বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। গৌরমণির অবশ্য ১৫/১৬ বার বিয়ে হয়ে গেছে। জাতে সে 'কাহার'। তার ওপর আবার এক চোখ কানা। আচার্য বলেন,—"কাহার তাঁর মা বাপ ছিলেন বটে, পরে তিনি চাষা-ধোপা হন; ক্রমে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য অনেক উচ্চজাতির সহিত মিলে এখন তিনি শুধ্‌রে গেছেন।"

লালচাঁদ আর এক মুহূর্তও থাকে না। ছুটতে ছুটতে সে তার গেঁয়ো বাঙ্গাল বাবার কাছে গিয়ে নিজের বুদ্ধিহীনতা স্বীকার করে। গিরিধারী তখন ছেলেকে বলেন,—"কেমন হালার পুত! সিধা হইচ? প্রেম পয়জার নি খাইচ?"

হাতে হাতে ফল (চুঁচুড়া—১৮৮২ খৃঃ)—বঙ্গবিলাস সমজ্‌দার (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার সরকার)॥ টাইটেল পেজে আছে,—"যেদিকে ফিরাই আঁখি, কৃষ্ণময় সকলি দেখি।" প্রহসনটিকে লেখকবর্গ 'হসনহাসন' নামে অভিহিত করেছেন। "সমালোচকদিগের মুখবন্ধ" নামে মুখবন্ধে তাঁরা লিখেছেন,—"যে কেহ এই হসনহাসন ক্রয় করিবেন, তাঁহারই ইহা পড়িবার অধিকার হইবে। অপরের পড়িবারই অধিকার নাই, তা সমালোচনা ত দূরে আস্তাং।...যাঁহারা এই গ্রন্থে আপনাদের মুখচ্ছবি সুস্পষ্টভাবে হৌক, অস্পষ্টভাবে হৌক, দেখিতে পাইবে, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ না করিয়াই এই হসনহাসন কষ্টীকৃত হইয়াছে।"

কাহিনী।—'সংশোধক' কার্যালয়ে গোবর্ধন, নবদ্বীপ ও কেশবচন্দ্র একটা টেবিলের চারপাশে বসে সমাজের অবনতি নিয়ে আলোচনা চালায়। কেবল মন্তব্য করে যে, পাপে লিপ্ত হওয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, "সুতরাং নাটকাদির অভিনয়াদি দ্বারা দেশের সুনীতি সম্মার্জ্জিত হয়, ইহা কোন্ মহাজনের অভীপ্সিত নহে? অতএব জাগো ভ্রাতৃগণ! জাগো, বন্ধুগণ নাটকে মনোনিবেশ কর, আত্মার সংস্কার কর, কিন্তু স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে থাকিও না; সসর্পেচ গৃহে বাস—স্ত্রীলোক সেই সাপিনী।" গোবরও বক্তৃতা দেয় স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে। বক্তৃতার ভঙ্গী ব্রাহ্মদের মতো। গোবর বলে,—"ভ্রাতাগণ, আমি

শুনেছি, যে স্ত্রীলোকগুলি অভিনয় করে, তারা কুলটা, তারা বেশ্যা, তারা বারাঙ্গনা তাতে বরং সহ্য করিতে পারি, তারা আবার নির্লজ্জ বেহায়া, পর-পুরুষকে পুরুষ জ্ঞান করে না।"...এইভাবে প্রকারান্তরে নিন্দা স্তুতিতে রূপান্তরিত হয়। কেবল থিয়েটারে যায়। সে বলে,—"আমি ঈশ্বর প্রসাদাৎ নিজমূর্ত্তিতে অর্থাৎ আত্মপক্ষে কখন যাই নি, তবে তাদের নিরুৎসাহ করবার অভিপ্রায়ে 'সংশোধকের' সম্পাদক স্বরূপে পাঁচ সাতবার গিয়ে থাকলেও গিয়ে থাকতে পারি।" যাহোক, গোবর বলে,—"স্ত্রীলোকের দমন করতেই হবে। নাট্যশালা সংশোধন, নাট্যশালার দোষক্ষালন, করতেই হবে। এখন, এস ভ্রাতাগণ, কি উচিত, কিং কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা বিতর্ক এবং বিচার করা যাক।" নব বলে, —"আমি প্রস্তাব করি,...যে সকল নাটকে স্ত্রীচরিত্র আছে, তাহা পুড়াইয়া ফেলা হক, আর সন্ধ্যার পর যাতে কোনও লোক কোনও কারণে দরজা খুলতে না পারে, তার চেষ্টা করা হক। দরজা খোলাখুলি না হলেই যাতায়াত বন্ধ, সুতরাং চরিত্র অক্ষুন্ন।" একথার বাস্তবতা নিয়ে কেবল তখন সন্দেহ করলে গোবর বলে,—"সম্ভবপর কথা স্বতন্ত্র, সে কথা পৃথক, সে কথার সঙ্গে একথার সম্পর্ক নাই, সম্বন্ধ নাই।" সে বলে,—"দুশ্চরিত্রাদের সংখ্যা বাড়লেও উপকার হচ্ছে। আপন আপন বাড়ীতে আবদ্ধ থেকে এরা যে প্রকার কষ্ট পায় এবং দুঃখ ভোগ করে এবং দুই চারিজন পাপিষ্ঠ ভ্রাতার পদস্খলন করায়; ফলত নাট্যশালায় তাবৎকাল, ততক্ষণ অবধি—সুখে থাকে এবং পাপিষ্ঠ ভ্রাতাদের চিত্তস্খলন করায়। এখন চিত্ত বড, না পদ বড? মন বড, না দেহ বড? আত্মা বড়, না শরীর বড়? শারীরিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা আছে, শারীরিক যন্ত্রণা হতে মুক্তি আছে। কিন্তু হায়! আত্মার—!" যাহোক নব প্রথম প্রস্তাব উঠিয়ে নেয এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব দেয়। "আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে নাটকে স্ত্রীলোক থাকুক; এবং আমাদের মধ্যে যে যে ভ্রাতা ঈশ্বর প্রসাদাৎ পরিণয়ের ফলভোগ কচ্ছেন, তাঁহারা স্ব-স্ব পরিবার বাহির করুন, তাঁরা অভিনয়ে যোগদান করুন। আমি অবিবাহিত, কাজে কাজেই নিজের স্ত্রী বাহির করতে অক্ষম, কিন্তু ভ্রাতাদের সম্মতি হলে আমি অপরের নারী বহির্গতকরণ বিষয়ে আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যে সাহায্য হতে পারে, তা অবারিত দ্বারে করতে প্রস্তুত আছি।" সকলে এ প্রস্তাব সমর্থন করে। তবে কেবল এটার প্রয়োগ বেশ কঠিন বলে মন্তব্য করে। গোবর বলে,—"কেন? আমাদের পরিবারস্থ ভগিনীরা কি বহির্গত হবেন না? তাহলে শিক্ষায় ধিক,

ভগিনাদের ধিক, সংশোধন সভার সভ্যদের ধিক।" নবও সমর্থন করে। গোবর বলে,—"বাহির কর্ত্তেই হবে, অন্তঃপুর রূপ কারাগারে রাখাটা যেমন অধর্ম্ম, তেমনি পাপ।" কেবল বলে,—"স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়াটাই আমার মতে দূষ্য।" গোবর আরও চরমে যায়। কেবল বলে, পুরুষকে দিয়ে স্ত্রী অভিনয় চলে। সকলে একথা সমর্থন করে। কেবল তখন বলে,—"বিশেষ, আজকালকার অভিনয়ে অশ্লীলতার বড় বৃদ্ধি;—অশ্লীল ভাবভঙ্গী, অশ্লীল ভাষা—।" গোবর তার সঙ্গে যোগ করে,—"অশ্লীল কথোপকথন, অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ।" নব মন্তব্য করে,—"সেটা অভিনয়কারি-কারিণী ভ্রাতা ভগিনীদের দোষ? আমার বোধ হয়, নাটকগুলোর দোষে অমন হয়।" তখন নতুন নাটক লেখবার প্রস্তাব হয় এবং কেবল চন্দ্রের ওপর এই ভার পড়ে। কেবলের প্রশ্নে গোবর জবাব দেয়,—"পদ্য লিখ্‌তে হবে, ছন্দ থাকা চাই, নিয়মিত মাত্রায় রচনা হওয়া আবশ্যক, নইলে জোর পৌছবে না।" কেবল জিজ্ঞাসা করে,—"মিতাক্ষর না অমিতাক্ষর? নব তখন হেসে বলে,—"পৌত্তলিক টিকির সঙ্গে পৈতামহিক পঞ্চত্ব পেয়েছে।'' কেবল বলে,- ভ্রাতাদের অনুমতি হলে মাঝে মাঝে গদ্যও থাক্‌বে। এইসব প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির পর বৈঠক শেষ হয়।

ওদিকে শোবার ঘরে দামিনী আর শশিমুখী বসে গল্প করছে। দামিনী বালিশের তলা থেকে 'বিদ্যাসুন্দর' বার করে মন্তব্য করে,—"যাই বল ভাই, ভারতের লেখার মত আর কারুরই লেখা মিষ্ট লাগে না।" শশী বলে,—"রসের কথা না হলে কি কথা?" দামিনীও বলে,—"মুখস্থ হল, তবু পূরণ হল না।'' দামিনীদের সঙ্গে নবদ্বীপের গুপ্ত প্রণয় আছে। নবদ্বীপবাবু সম্পর্কে এবার তারা আলোচনায় নামে। দামিনী বলে,—"সদাই হাসিখুশি, তবু কেমন রসিক। যখন আবার তাঁদের দলে থাকেন তখন কেমন শান্ত, কত গম্ভীর। সত্য ভাই, বড় চমৎকার মানুষ। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন, নইলে মানুষ?'' শশী বলে,—"আচ্ছা ভাই, নবদ্বীপ বাবু এমন লোক, এমন লেখাপড়া জানেন, দেখ্‌তে এমন সুপুরুষ, তবে উনি বে করেন না কেন ভাই?'' দামিনী জবাব দেয়,—"তিনি বলেন কি—আমি একদিন 'গোলকধামে' যাবার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—তিনি বলেন যে, যেমন দেবলোক, গন্ধর্ব্ব লোক, এই সব ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে কিনা, তেমনি স্ত্রীলোক একটা লোক। নর-লোকের সঙ্গে এদের চিরন্তনের সম্বন্ধ হওয়াটা উচিত নয়। ভগবানের যদি সেরকম ইচ্ছা হত, তাহলে তেমনিতর একটা বন্দোবস্ত করতেন।" ফুলকুমারীর

সঙ্গে অবশ্য নবদ্বীপের সম্বন্ধ করা যেতে পারে। তবে ফুলকুমারীর বয়স মাত্র তেরো। অবশ্য দামিনী ঠিকে হিসেবে থাকতে রাজী আছে। 'দামিনীদমন চক্রবর্তী' ও 'শশিশেখর মুস্তোফী' দুজনেই নবদ্বীপের ওপর পরস্পরের আসক্তি বোঝাতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার করে। দামিনী নাকি নবদ্বীপকে পাশে বসিয়ে···ইত্যাদি। আহ্লাদ তরঙ্গিণী এমন সময় হাসতে হাসতে এসে এসব শুনে বলে,—"ভাতারগুল মলো ধম্ম ধম্ম করে, আর দেশের খবর লিখে, এদিকে ঘরের খবর লেখে কে তার ঠিক নাই!" আহ্লাদ খবর দেয়,—"নব-ধম্মেরা যে সকের দল করেছে, বলে বেঙ্গমা বেঙ্গমিতে দেশের বড় অভীষ্ট করেছে। তাই এখন ঘরের বেঙ্গমি দিয়ে সকের দল করে দেশের ছিরিবিদ্ধি করবেন।" এই কথা বলে আহ্লাদ তরঙ্গিণী বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে হাসতে হাসতে কাপড় খোলার উপক্রম করে। পরে উঠে বলে, কেবলরাম নাটক লিখ্‌ছে গোবর গান বসাচ্ছে। শশীরা নাকি সেজেগুজে অভিনয় করবে। এদিকে শশী খবর দেয়—ফুলকুমারীর যে বিয়ে। তবে বাবা রাজী নন। আহ্লাদ বলে, তাতে ভাবনার কারণ নেই। "তা তাঁর কাছে এখন না ভাঙ্গলেই হল; হলে কি আর তিনি জামাইকে বাবা বলবেন না? তোমাদের অমত করে, কি বুড় বয়েসে ঢলাঢলি করবেন?" নবদ্বীপ কায়েত—শশী একথা বল্‌লে আহ্লাদের তখন ভাবনা ঢোকে। সে বলে,—"তা এক কম্ম করনা কেন। যাত্রার পালা ত তোমারই কেবলনিধি লিখ্‌ছেন, তা নবদ্বীপবাবুকে সুন্দর সাজায়ে আর ফুলকুমারীকে বিদ্যা করে, একটা বিয়ের পালা কেন রচে না? তারপর সেই ঘটক ফোজদারকে আনিয়ে বলিস্ যে, এ বিয়ে আর ভাঙ্গবে না"

কেবল যখন পরে অন্তঃপুরে আসে, তখন শশী তাকে বলে,—"তা যদি ভ্রাতৃগণের বিবেচনায় এরূপ মীমাংসা হয়ে থাকে, যে ভগিনীগণের সঙ্গে প্রকাশ্যত অভিনয় করা বিধাতার অভিপ্রেত নহে, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমি আর কোন কথা ব'লতে চাহি না; কিন্তু সহধর্ম্মিণীকুল যে ভ্রাতৃকুলের সহচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া অভিনয়াদির উপকরণ সংগ্রহে তাঁহাদের সাহায্য করবেন, ইহা নিশ্চয়ই বিধাতার অভিপ্রেত সুতরাং আমরা সকল ভগিনী মিলিয়া হরিদগৃহে আপনাদের আনুকূল্য করিব।" কেবল তখন শশিমুখীর মস্তক স্পর্শ করে বলে, —"আহা! বুদ্ধিমতী ভগিনীকে সহধর্ম্মিণীরূপে লাভ করা সকল সভ্যের অদৃষ্টে ঘটে না।" শশী বলে,—ফুলকুমারীকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। কেবল আপত্তি জানায়। সে বলে যে,—"অস্বামিকা কুমারীর পক্ষে রঙ্গশালা গমন" "বিধাতার

অভিপ্রেত” নয়। তখন শশী বলে,—“বিধাতার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত দম্পতী মধ্যে পরস্পর বিশ্রব্ধ আলাপ, এরূপে সন্দর্শন না করিলে, ভগিনী, দাম্পত্য ব্যবহারে নিতান্ত অপটু থাকবেন এবং ভাবি ভ্রাতার ঐহিক সুখোৎপাদন পক্ষে, ব্যাঘাত-কারিণী হইবেন, তাহাও ত বিধাতার অভিপ্রেত নহে।” শেষে কেবলরামকে সে নতুন নাটক লেখবার এক প্রস্তাব জানায়। “কোন শিক্ষিতা কুমারীর নিজ মনোমত ভ্রাতৃলাভ নটমঞ্চে অভিনীত হইলে সমাজ শিক্ষালাভ করিবে, ভ্রাতৃভগিনীগণের মনোরঞ্জন হইবে, আপনার যশোবিস্তার হইবে, ভগিনীবৃন্দের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং বিধাতার মহিমা অধিকতর উজ্জ্বলীকৃত হইবে।” কেবল বলে,—“অতএব আইস আমরা এক্ষণে, সেই মঙ্গলময়ের গুণ এবং করুণা ধ্যান করি যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিতেছেন।” একটুখানি ধ্যান করে কেবলরাম চলে যায়। এই সময় ফুলকুমারী এসে শশীকে বলে,—“দিদি, আজ যে দিন থাকিতেই তোমাদের ধ্যান আরম্ভ হয়েছিল?” শশী জবাব দেয়,—“যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।” ফুলকুমারী একটু বাইরে আপত্তি করে—নবদ্বীপের সঙ্গে নিজের বিয়েতে। শশী তখন গোলকধাম থেকে তার নাম কেটে দেবার ভয় দেখায়। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ আসে। ফুলকুমারী আড়ালে যায়। নবদ্বীপ শশীমুখীর মুখচুম্বন করতে উদ্যত হলে শশীর ভ্রূকুটিতে অবশেষে সে নিরস্ত হয়। দামিনীর প্রসঙ্গে নবদ্বীপ বলে,—“ভগিনীর একান্ত অনুরোধ দেখিয়া, আমি প্রিয় ভগিনীকে, প্রভুর সেবা আরাধনায় সহচরীরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি।” শশী বলে,—“প্রভুর অঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য শান্তিরক্ষকগণের সহায়তা আবশ্যক; যদি ঐহিক অর্থের ক্ষণিক প্রলোভন দেখাইয়া সেই রক্ষকগণকে আনয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাও আপনার কর্ত্তব্য, কেন না তাহাই বিধাতার প্রিয় কার্য্য সাধন।” নবদ্বীপ এতে তার অক্ষমতা জানালে শশী বলে,—“প্রভু! আপনি আত্মবিস্মৃত হইতেছেন।—দক্ষিণের দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা জড়জীবের জড় উদর পূরণ করণাপেক্ষা, আদেশ-প্রাপ্তগণের আত্মোন্নতির সাহায্যার্থ ব্যবহৃত হইলে, পরম মঙ্গলময়ের প্রীতিসাধন হইবে।” তারপর চুপে চুপে এদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাষায় কথা হয়।

তারপর একদিন আসে রঙ্গাঙ্গনের দৃশ্য। দৈবকী বলে, বারাঙ্গনাদের রঙ্গাঙ্গন থেকে উৎখাত করবার জন্যে এই প্রচেষ্টা। নাটকের নাম ধর্ম্ম-উদ্বাহ। রচয়িতা—কেবলচন্দ্র। তারপরে দৈবকীর সাজে গোবর্ধন বলে,—

"এই যে দেখিছ মোরে রমণীর বেশে
মোহন মোহিনীরূপে ; ভুলিও না ইথে ;
সত্যই পুরুষ আমি ; ধর্ম্ম সাক্ষী মানি।...
...হৃদয় মণ্ডপে
শোভিছে যে ঘট-যুগ্ম, পঙ্কজ কোরক,
গজকুম্ভ, গিরিশৃঙ্গ, দাড়িম্ব অথবা
কদম্ব, রসিত যাহে রসিকের চিত,
জানিবে এ কাষ্ঠপ্রাণ নারিকেল মালা
বুকে বাঁধা আছে মাত্র—কুভাব-নাশন ;
সেই নারিকেল, হায় শৈশবে যে মুচি ;
পৌগণ্ডে দোমালা নেয়াপাতির আবাস ;
ক্রমেতে আচ্ছন্ন দেহ শুষ্ক ছোবড়ায়,
উখাড়ি বিক্রমে যাহা কর্ত্তরীর কোপে
নারিকেল, দুইখণ্ড করি অতঃপর
নিষ্কালিয়া অম্বু তার, শাঁস ভক্ষনিয়া,
মালা দুইখানি লভি, বান্ধিয়া,—পৌরুষ
উরস শোভিছে মম।"

ঘটোৎকচ বেশে কেবল আসে। তার কাছে দৈবকী অনুযোগ করে—মেয়ে বড় হচ্ছে, বিয়ে দেওয়া হলো না। ঘটোৎকচ বলে,—"তাই কি এ পাকা আম্র দাঁড়কাকে দিব?" এমন সময় আশালতা মঞ্চে ঢুকে নিজেই নিজের প্রেমের কথা বলে।—

"শিখিয়াছি লেখাপড়া তোমার কৃপায়
দয়াময়, পড়িয়াছি প্রণয়ের কথা
বহুতর গ্রন্থে ; তাহে বয়স হয়েছে।
এখন গর্জ্জিয়া গিরি, বক্ষ বিদারিয়া
ভৈরব দ্রাবকরাশি উদ্গারিবে এবে
বিচিত্র ত নহে।"

সে তার প্রেমাস্পদের নাম করে।—

"নসিরাম নাম তার, পেয়েছি সন্ধান ;

সুন্দর বনেতে বাস, তার করে মোরে
সমর্পিয়া পিতা, তুমি রাখ কুল-মান।"

দৈবকী ঘটোৎকচকে সম্বোধন করে কিছু বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। পরে প্রম্পটারের কৃপায় খেই খুঁজে পায়।—

"কিন্তু বালিকার
পার্থিব পিতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত আমি.
পিতৃপরি য় দিতে, আশা ক্ষিতিতলে
কবে ত আমারই নাম। তবে না জানিয়া,
না দেখিয়া চক্ষে কভু কেমনে আশারে
ফেলিব অতল জলে, জনমের তরে!"

শেষে ঘটোৎকচ অর্থাৎ কেবল অনুমতি দেয়। আশালতা একটা প্রেমের গান গেয়ে চলে যায়। ঘটোৎকচ ধ্যান করে তারপর বলে,—

"চিন্তা নাই, প্রিয়তমে: জানিনু ধেয়ানে,
দয়াময়, দয়াময় আজি এ অধীনে।
অপূর্ব্ব স্বপন আমি দেখিলাম প্রিয়ে—
শিয়রে আসিয়া যেন দেব তেজোময়,
অধিষ্ঠান করি হৃদে কহিলা কোমলে
—সম্প্রদান কর কন্যা নসীরাম করে।"

ইতিমধ্যে আশালতা নসীরাম অর্থাৎ নবদ্বীপকে ধরে আনে। ঘটোৎকচ কন্যাসম্প্রদান করতে যাবেন, এমন সময় কনষ্টেবল নিয়ে পুলিশ সার্জেণ্ট আসে। ঘটোৎকচ অবাক্ হয়ে বলে.—"পুলিশ ত আমার নাটকে নাই, তবে এরা কেন?" সার্জেণ্ট বলে,—"তোমরা জুয়াচুরি করিয়া মর্দ্দালোকে মাদি সাজে; সেইজন্য তোমাদিগকে আমি গ্রেপ্তার করিবে।" পেনাল কোড বার করে ৪৫ আইনের ৪১৯ ধারার অপরাধ পাঠ করে সার্জেণ্ট। "এক ব্যক্তি সাজনের দ্বারা বঞ্চনা করা কহে, যদি সে ব্যক্তি অপর ব্যক্তি ভান করিয়া বঞ্চনা করে, কিম্বা জানিতরূপে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির নিমিত্ত খাড়া করিয়া কিম্বা প্রকাশ করিয়া যে, সে অথবা অন্য ব্যক্তি যাহা সে অথবা তদ্রূপ অন্য ব্যক্তি যথার্থ হয়, তাহা হইতে অন্য ব্যক্তি হয়।"

নসী বলে, এটা বিয়ের উৎসব। হরিহর মুস্তৌফির মেয়ে ফুলকুমারীর সঙ্গে

তার বিয়ে। তারই রংতামাসা। ফুলকুমারীর ডাক আসে। শশী ফুলকুমারী সেজে আসে। তারপর শশী সার্জেন্টের সঙ্গে ফৌজদারবাবুর বাড়ী চলে। গোবর্ধনরাও সঙ্গে চলে।

ওদিকে ফৌজদার সাক্ষী গোপাল আপিসঘরে দরজা বন্ধ করে রামকল্প উপাধ্যায়ের সঙ্গে মদ্যপান করছে। সাক্ষী নিয়মিত নাকি "কলুবাড়ী গোইং" করে। মাতলামি চল্‌তে থাকে—সেই সঙ্গে যাত্রার অভিনয়ও। বাইরের থেকে কড়া নাড়ার শব্দ এলে সাক্ষী পকেট থেকে আদ্রক ও কাঁটালপাতা দ্রুত চর্ব্বন করে দরজা খোলে। তখন নবদ্বীপ, কেবল, গোবর্ধন, শশী, তরঙ্গিণী প্রহরী—এরা সবাই ঢোকে। তারপর নবদ্বীপ কাগজে সই করে সাক্ষী দিইয়ে শশিমুখীকে বিয়ে করে। নোটিশ আগেই দেওয়া ছিলো। দুইজনে শপথ করে। সাক্ষীরাও শপথ করে। নবদ্বীপ ও শশীমুখীকে ফৌজদার আলাদা-ভাবে চলে যেতে বল্‌লে কেবল আর গোবর্ধন আপত্তি তোলে। তখন সার্জেন্ট এসে তাদের পথ আটকায়।

আহ্লাদ তরঙ্গিণী তখন মন্তব্য করে,—

> "রঙ্গাঙ্গনে বঙ্গাঙ্গনা আসিতে না দিল।
> পুরুষ সাজিয়া নারী, রঙ্গ দেখাইল ॥
> নূতন উদ্বাহতত্ত্ব, দেখালে কেবল।
> ঐ দেখ লাভ হল, হাতে হাতে কল ॥"

বাবু (১৮৯৪ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু ॥ নব্য সংস্কৃতির বাহকদের সামষ্টিক পরিচয়ের ইঙ্গিত নামকরণ থেকে বোঝা যায়। ভণ্ড সমাজহিতৈষী এবং ধর্মনেতাকে চিত্রিত করা হলেও, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কটাক্ষই এখানে প্রধান-ভাবে উপলব্ধি করা যায় বলে প্রহসনটিকে এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

কাহিনী।—ফটিকচাঁদ চক্রবর্তীর ভগ্নীপতি ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল দেশহিতৈষী এবং পত্রিকার সম্পাদক। ফটিকচাঁদদের গ্রামের মোড়ল ভজহরি এসে ষষ্ঠীকৃষ্ণকে ধরে—যদি তাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষ দমনের ব্যাপারে সে কিছু করতে পারে। বড়ো বড়ো সাহেবদের সঙ্গে নাকি ষষ্ঠীকৃষ্ণের মেলামেশা আছে। ষষ্ঠী উত্তর দেয়,—"তোমাদের গাঁয়ে আমার খবরের কাগজ কেউ Subscribe করে না, আমি সেখানকার জন্য for nothing লিখ্‌তে পারিনে।" শেষে সে বলে,—"নিদেন তোমাদের গ্রাম থেকে আমার কাগজ দশখানি করে নিতে

হবে, তার দাম চব্বিশ, বাঁধিয়ে তোমরাই নিও। আচ্ছা, তোমাদের গ্রাম গরীব বল্‌ছ, উদ্ধার ভাণ্ডারে চাঁদা বেশী না হয় পঞ্চাশ—না, তোমরা বুঝি আবার গোঁড়া হিন্দু, শুদ্ধি দাও না—তবে একান্নই দিও; তাহলে এডিটোরিয়েলে হবে না, লোকালে একটা প্যারা লিখে দেব এখন।" ষষ্ঠীকৃষ্ণের কাগজ ইংরিজী। গ্রামের লোক বুঝবে না!—ভজহরি সেকথা যখন বলে, তখন সে বলে,—"এঁ্যা, ইংরেজী জানে না। তবে সে গ্রাম থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি, সে গ্রামের জন্য আমি কিছু করতে পারি নে।" দুর্ভিক্ষ সমর্থন করে সে বলে,—"লোক সংখ্যা বড্ড বেড়েছে, ম্যাল্‌থসের মতে দুর্ভিক্ষ বা মড়ক হয়ে কিছু কমা উচিত; তা লেখাপড়া জানা সভ্যলোকের চেয়ে ও রকম মূর্খ চাষা লোকদের মরা কর্ত্তব্য।" ষষ্ঠী শেষে বলে, খরচা দিলে সে যেতে পারবে। তার ফাষ্ট´ক্লাসের যাওয়া আসার খরচ, কেল্‌নারের হোটেল চার্জ; যে লেকচারটি সে দেবে, সেটি লিখে নেবার জন্য রিপোর্টারের খরচা (আহার+সেকেণ্ড ক্লাস যাওয়া আ.সা); তাছাড়া বিভিন্ন ব্রাঞ্চ—পৃথিবীর বড়ো বড়ো টাউনে যা আছে···তাতে যাওয়ার সংবাদ টেলিগ্রাম করবার খরচা; তারপর পাল্কী ভাড়া - ষ্টেশন থেকে গ্রাম; গ্রামে ডেকরেটিং খরচা; তাছাড়া সখের কনসার্ট খরচা এত্তো সব খরচা বহন করতে ভজহরি পারবে কি? বলাবাহুল্য ভজহরি এতে অসামর্থ্য জানায়। ভজহরি বলে, গ্রামের লোকেরা খুবই গরীব। জমিদার সীতানাথসিঙ্গী খাজনা আদায়ে চাপ দেন না, এতেই যথেষ্ট উপকার করছেন। সীতানাথের নাম শুনে ষষ্ঠী খাপ্পা হয়ে ওঠে। গ্রামের সবাইকে সে খাজনা বন্ধ করে দেবার জন্যে বলে। "জমিদারের ভিতর অত বড় পাজী অত্যাচারী আর নাই; আমার কাগজ খানা নিচ্ছিল, তা বন্ধ করে দিয়েছে; উদ্ধার ভাণ্ডারের চাঁদার জন্য লোক পাঠালেম, তা পঞ্চাশটি টাকা বই দিলে না, তা সে ত যে লোক গয়েছিল, তার খাওয়া দাওয়া ট্রেন ভাড়া কমিশনেতে খেয়ে গেল।" ভজহরিরা যদি খাজনা বন্ধ করে তাহলে ষষ্ঠী মেদিনীপুরের বন্যার ফাণ্ড থেকে কিছু দিতে পারবে। ষষ্ঠী একটা ব্যাপার কল্পনা করে উল্লসিত হয়। "বেশ হয়েছে, একটা প্লি পাওয়া গিয়েছে, লেখা যাবে যে, জমিদারের পীড়নে প্রজারা মারা যাচ্ছে।" ভজহরি বলে,—"আজ্ঞে, জমিদারের তো কোনো অত্যাচার নাই!" ষষ্ঠী তখন বলে,—"তৈয়ারি করে নেব, অত্যাচার তৈয়ারি করে নেব, সেজন্য তোমাকে কোন ভাবতে হবে না।" ষষ্ঠী চলে গেলে ফটিক ভাবে,—"শালারা দেশহিতৈষী হয়ে আছে একরকম মন্দ

নয়; খালি চাঁদা তুল্‌ছে আর লম্বা লম্বা চাল্‌ছে, আমি যে হেসে ফেলি, নইলে চাকরি-বাকৃরি নেই, একটা দেশহিতৈষী-ফেশহিতৈষী হলে হত।"

দেশহিতৈষী হিসেবে ষষ্ঠীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী সজনীকান্ত চাকি। সে ব্রাহ্মসমাজের নেতা। সেও অদ্ভুত জীব। বিজ্ঞান-পাগল অশনির একটা হাস্যকর উক্তি শুনে হেসে ফেলে জিভ কেটে বলে,—"এঁ্যা, কল্লুম কি—কল্লুম কি!" অশনির হাত ধরে সে বলে,—"আমি আপনার হাতে ধরে মানা কচ্ছি, এ কথাটি কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।" অশনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—"কি কথা? কই আপনি ত কিছু করেন নি।" সজনী তখন বলে,—"মহাপাতক করেছি, আমরা দুজনেই অশ্লীল হাসি হেসে ফেলেছি।...হাসিটা বড় অশ্লীল কার্য্য, এ পৃথিবী কাঁদবার যায়গা, সর্ব্বদাই কাঁদা কর্ত্তব্য।" দামোদর-ভ্রাতা তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করেছে। তাকে চিন্তামগ্ন দেখে সজনী বলে,—"ভ্রাতঃ তার জন্য চিন্তা কচ্ছো কেন? তুমি তোমার পৌত্তলিক ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে—এ মহৎ কার্য্যে ..আমি স্বয়ং সাক্ষী দেবো, তারপর না হয় দুদিন বেশী করে অনুতাপ করবো...। দামোদরের ভাই দামোদরের স্ত্রীকে সমাজে আস্‌তে দেয় নি! "যে ভাই হয়ে আমার নিজের স্ত্রীকে আমার ভগিনী হতে দিলে না, তার আর মুখদর্শন করতে আছে?" সজনী বলে,—"পর উপকারই হচ্ছে পরম ধর্ম্ম, পরের জন্য ধনমনপ্রাণ সব দেবে; তা বলে আপনার লোকের জন্য কিছু করা যেতে পারে না, আত্মীয়ের উপকার করা কিছু ধর্ম্ম নয়।"

গুরুচরণের মা মারা গেছেন। তাঁকে কোম্পানীর রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে ঘুর হয়, তাই সমাজের জমির ওপর দিয়ে যদি এরা যেতে দেয়, সেজন্যে সে তিনকড়ির সঙ্গে সজনীবাবুর কাছে আসে। প্রথমে সে সেক্রেটারীর কাছে গিয়েছিলো। তিনি চোখ বুঁজে ছিলেন। আধঘণ্টা পর চোখ খুলে তারপর সজনীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সজনী বলে,—"আজ হচ্ছে রবিবার, অফিস বন্ধ, আজ ত এর কিছুই হতে পারে না—কাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে এসে আমায় একবার মনে করে দিয়ে যেও; শুক্রবার দিন সব-কমিটির একটা মিটিং বসবার কথা আছে; সেই সময় তোমার দরখাস্ত আমি প্রেজেণ্ট করবো; তাতে যদি মেজারিটির মত হয়, তাহলে একটা জেনারেল মিটিং কল করা যাবে; বেশী দেরী নয়, দিন পনের বাদে সেটা বস্‌তে পারবে, তাতে যা রেজোলিউসন পাশ হয়, তুম জান্‌তে পারবে।" কিন্তু ততোদিনে মড়া যে একেবারে পচে

যাবে! গুরুচরণ বার বার অনুরোধ করলে সজনী বলে,—"আমি এই বলেম 'না' আর কি 'হাঁ' বল্‌তে পারি, সে যে মিথ্যা কথা কওয়া হবে।"

পরাণে কলুর ছেলে বাঞ্ছারাম এলে তিনকড়ি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করে। বাঞ্ছারাম বলে,—"আমি একজন 'ভ্রাতা' বোধ হয়।...ভ্রাতার আবার নাম কি? তবে ভ্রাতায় ভ্রাতায় গোল না বাঁধে, তাই লোকেরা একটা বলে ডাকে।... তাকে যদি নাম বলেন, তবে নাম বোধ হয়, ভাই-বাঞ্ছারাম!" তিনকড়ি তার জাত জিজ্ঞেস করলে সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে বলে ওঠে,—"ও হো, আজ আমায় 'জাত্তি' কথা শুন্‌তে হ'ল।" তিনকড়ি হেসে ফেল্‌লে বাঞ্ছারাম বলে, —"আপনি হাসতে চান, হাসাতে চান! কি পরিতাপ! কি কুরুচি! আপনি বুঝি হিন্দু?...আর হাস্‌বেন না, ক্রন্দন করুন, উচ্চরবে ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় নাই! দেখুন, ক্রন্দন আদেশ কিনা—ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু ক্রন্দন করে,—ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন করুন, আহা! কতদিনে এ পৃথিবী ক্রন্দনপূর্ণ আনন্দধাম হবে!" বাঞ্ছারাম তার বাবাকে সাকার বলে ত্যাগ করেছে। বীরভূমে দুর্ভিক্ষ দমন করতে গিয়ে এক বিধবা "ভগ্নী"-কে বিয়ে করেছে। "ভগ্নীর নাম ক্ষমাসুন্দরী পালুধি; তার বড় কন্যাটির বিবাহ হয়েছে, সন্তানাদিও হয়েছে, ছোট মেয়েটি সঙ্গেই আছে. আর ভগিনী যে রাতে আমার সহিত পবিত্র পলায়ন করে আসেন, পুত্রটি তার পরদিনই ডাকঘরের চাকরীটিতে জবাব দিয়ে কোথায় বিবাগী হয়ে গমন করেছে, এক্ষণে ভগ্নী আমার ভার্য্যা।" বাঞ্ছারাম বলে, তার ভগিনী ভার্যা ঋষি তুল্য। তিনকড়ি জিজ্ঞেস করে, তার দাড়ি আছে কিনা? বাঞ্ছা অবাক হলে তিনকড়ি বলে,—"কেন হয় না? নাতিপুতি কোলে করে বামুনের মেয়ের কলুর সঙ্গে বে হয়, আর তোমাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ দাড়ী, তাই মেয়েদের হয় না, এই বুঝি ধর্ম্ম মহিমা!" বাঞ্ছারাম ধর্ম্মের মহিমাকে অস্বীকার করতে চায় না। "শীঘ্রই কোন মহাত্মা আবির্ভাব হয়ে প্রার্থনা, অনুতাপ ও বক্তৃতা দ্বারা দুঃখিনী ভগিনীদের এই অভাব মোচন করতে পারবে।" ইতিমধ্যে বাঞ্ছারামের স্ত্রী ক্ষমা এসে "পবিত্র কোন্দল" সুরু করে দেয়। বাঞ্ছা নাকি তাকে আশা দিয়ে নিরাশ করেছে। সেওড়া কুটিরে "একপাল ধীঙ্গি দস্যি মাগী"দের মধ্যে সে স্বামী নিয়ে বাস করতে চায় না—বিশেষ করে দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী! বাঞ্ছারাম বলে,—"শান্তি, শান্তি, তারা সব পবিত্রা ভগিনী!" ক্ষমাসুন্দরী বলে,—"ঢের অমন ভগিনী দেখেছি, ভগ্নী ত আর সম্পর্ক নয়, ও ত আমাদের খেতাব।" ক্ষমার পৌত্তলিক কথায় বাঞ্ছা শোক

করে। তাই দেখে ক্ষমা মন্তব্য করে,—"আবার কি শোক উথলে উঠ্‌লো! ছিচ কাঁদুনি খোকা,—বুড়ো মিন্সে কথায় কথায় কান্না, দুটো ভক্তির কথা হল, কি একটু কীর্ত্তন হল, দু ফোঁটা চোখের জল ফেল্লি, তা না—ও কিরে বাপু! ভাত খাবে গা—ভেউ ভেউ ভেউ কোথা যাচ্ছ গা—ভেউ ভেউ ভেউ, কেমন আছ গা—ভেউ ভেউ ভেউ। গা জ্বলে যায়, সংসার যেন শ্মশান করে তুলেছে।" ক্ষমা তার গয়নাগাঁটি ফিরিয়ে নিতে চাইলে বাঞ্ছা বলে, বিক্রী করে ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে সে তার সদ্ব্যবহার করেছে। ক্ষমা তখন তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে—সে বাঞ্ছাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে চলে গালাগালি।

এইসব "বেম্মজ্ঞানী" জীবদের পাল্লায় পড়ে ছোকরা বাঙ্গাল কন্দর্পও "বেম্মজ্ঞানী" হয়ে উঠতে চায়। সে ছয়মাস হলো কলকাতায় এসেছে। বৃদ্ধা আজিমাকে সে পাকড়াও করে বলে, "আজিমা, আমার মাথার কিরা, তুমি সম্মত অও এট্টা বিধবার বিয়ে গর অইতে না দিতি পাল্লি আয়ি আর সোমাজে মু দেখাইতে পারছি না। যাাতদিন আমাদের দ্যাশের তাবৎ বিধবাগণ বিবাহ না করে, ত্যাতদিন বারত উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই; তুমি যদি একদিন যাইয়া সজনীকান্ত ব্রাতার ল্যাক্‌চোর শুন, তা অইলে এট্টা ত এট্টা—তুমি সেইক্ষণেই সোভায় খারাইয়া দশটা বিবাহ করবা।" বুড়ী তবু আপত্তি করলে কন্দর্প বলে,—"আজি, তুমি লিখাপড়া শিখ নাই, ইংরাজী পর নাই, সোভায় যাও নাই, কারপেট বুনতি জান না, হারমণি বাজাইতি পার না, এই কারণ বুজাতি পাছ না যে তোমার কি দুক্ষ!!" আজিমার কাছে ব্যর্থ হয়ে কন্দর্প সমাজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। সে টুপী, চশমা, চাপকান পরে, তারপর একটা নকল দাড়ি এঁটে চলে যায়। "আপন হইতে দারী গজাইল না, দারী লাগাইছি, দারী না থাক্‌লে সৈভ্য অইব ক্যাম্‌নে?"

চারদিকে সংস্কারকদের ভিড়। যেমন "বেম্মজ্ঞানী" সজনী আর বাঞ্ছারাম, তেমনি সম্পাদক ষষ্ঠীচরণ। তাদের পেছন পেছন রয়েছে ভক্ত হনুমানের দল। এরা সকলেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। স্ত্রীকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে না বেড়ালে তাদের ভারত উদ্ধারই হবে না। ষষ্ঠী তার স্ত্রী নীরদাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খাওয়াতে টেনে নিয়ে যায়।

সেদিন অন্যসব সংস্কারকরাও স্ত্রী নিয়ে ইডেনগার্ডেনে হাওয়া খেতে এসেছিলো। ষষ্ঠীকৃষ্ণ হঠাৎ দেখে দু-একজন গোরা তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। নীরদা ভয় পেলে ষষ্ঠীকৃষ্ণ বলে,—"কি! গায়ে হাত দেবে—আমার

সামনে ! তখনি আমি তলোয়ারের চোটে--না হয় স্পীচের চোটে একেবারে তাকে ভূমিসাৎ করবো।" সেলার নামে চিহ্নিত এক গোরা 'লেডি'দের কাছে এগোয়। ষষ্ঠী বলে—"Now—sir—dont interfere—with এঁ এঁ এঁ—our ladie—।" সেলার তখন ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে এলে স্ত্রীপুরুষ সবাই উর্ধ্ব-শ্বাসে পালায়। নীরদা পালাতে পারে না। সেলার তাকে আটকায়। ওদিকে পুরুষরা বলে,—"দৌড় দৌড় ! ভারত উদ্ধার ! ভারত উদ্ধার !" নীরদা বলে,—"ও সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি হিঁদুর মেয়ে, ভদ্রলোকের মেয়ে, আমি এখানে আসৃতে চাইনে, আমার স্বোয়ামী আমাকে জোর করে এনেছিল ; ও সাহেব, আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর কখনও আসৃব না।" অন্তরাল থেকে বাঞ্ছারাম বলে,—"অনুতাপ করুন, অনুতাপ করুন, বিবাদে প্রয়োজন নাই, 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম'—সাহেবের গায়ে কখনও হাত তোলা যেতে পারে না, পশু ক্লেশ নিবারিণী সভার লোক ধরে নিয়ে যাবে।" ষষ্ঠীকৃষ্ণ কাতরভাবে সাহেবকে অনুনয় করে,—"Please leave my wife." সেলার বলে ওঠে,—"Your wife ! You brute, had she been your wife, you wouldn't have stood there making faces." ষষ্ঠী নিরুপায় হয়ে বলে,—"এ অত্যাচার আমি কখনই সহ্য করবো না,...আমি য়্যাজিটেসন করবো, টাউনহলে মনষ্টার মিটিং কন্‌ভিন্ করবো, সমস্ত কাগজে করেসপণ্ডেন্স লিখ্‌ব, শেষ পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত যাব,—দেখি আমার স্ত্রী আদায় হয় কিনা।" সজনীও সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেণ্টে ডেলিগেট পাঠাবার জন্যে কমিটি ফর্ম করতে বলে। বাঞ্ছারাম বিজ্ঞাপন ছাপাতে বলে এবং চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোবে বলে তৈরী হয়।

এমন সময় তিনকড়ি আর অশনি আসে। তিনকড়ি ওদের তিরস্কার করে এবং বীরদর্পে গোরার সম্মুখীন হয়। গোরা তখন ছদ্মবেশ খুলে ফেলে। গোরা নয়, ফটিক,—নীরদারই সহোদর, ষষ্ঠীর শালা। সে বলে, সে ষষ্ঠীর শালা—সে-সম্পর্কে সে অন্য সমাজ সংস্কারকদেরও শালা, তাই একটু আক্কেল দিলো।

ব্রাহ্মসমাজের আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে আরও কতকগুলো প্রহসনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রহসনগুলো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এবং এগুলোর বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি।—

প্রণয় প্রকাশ নাটক (১৮৭৫ খৃঃ)—গঙ্গাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥ প্রগতিশীল

ব্রাহ্মদের ভণ্ডামি, কুকীর্তি এবং নানারকম উদ্ভট আচারকে ব্যঙ্গ করে প্রহসনটি রচিত।

কপালে ছিল বিয়ে—কাঁদলে হবে কি? (১৮৭৮ খৃঃ)—'বিষ্ণু শর্ম্মা' (?)॥ প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজার বিবাহের ঘটনাকে বিদ্রূপ করে প্রহসনটি রচিত। কেশবচন্দ্র সেনকে সহানুভূতিহীন বিষয়ী ভণ্ড হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর সহকারীদের বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে যান। সবকিছু ঘটনাই অত্যন্ত বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। অবশ্য দলীয় ব্যক্তিদের প্রকৃত নামগুলো একটু গোপন রাখা হয়েছে।

নামের সঙ্গে অতি ক্ষীণ পরিচয় বহন করে কতকগুলো প্রহসনের নাম বিভিন্ন নথিপত্রে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। যেমন,—**নবলীলা** (১৮৮৮ খৃঃ)—প্যারীমোহন চৌধুরী; ইত্যাদি কয়েকটি প্রহসন এই গোত্রে পড়ে। ব্যাপক অনুসন্ধানে তালিকাবৃদ্ধি ঘটা অসম্ভব নয়।

৫। পারিবারিক ক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক বিরোধ।—

আমাদের দেশের সমাজ পরিবার কেন্দ্রিক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে[১] লিখেছেন,—"প্রত্যেক পরিবার এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একটি বৃহত্তর রাজ্যের অন্তর্ভূত। সেই বৃহত্তর রাজ্যের নাম সমাজ। অতএব সমাজের শাসন মানিয়া তাহার অঙ্গীভূত পরিবারগুলিকে চলিতে হয়।" আমাদের দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবার ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের সংস্কার লেখকের মনে বিদ্যমান—বলাবাহুল্য।

আমাদের দেশের পরিবার সংস্কৃতি বল্‌তে সাধারণতঃ যৌথ পরিবারের সংস্কৃতিকেই বুঝে থাকি। বাংলাদেশে একদিকে দায়ভাগের বিচারে ধন-সম্পত্তিতে পিতারই নিব্যূঢ় স্বত্ব থাকায় এবং কৃষি নির্ভর অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা থাকায় যৌথ পরিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় এর গুণের কথা বল্‌তে গিয়ে বলেছেন,[২] "ফলতঃ বশ্যতা, ত্যাগশীলতা, সমদর্শিতা প্রভৃতি অনেকানেক মূলধর্মের শিক্ষা একানুবর্ত্তিতার

১। পারিবারিক প্রবন্ধ—সপ্তচত্বারিংশ প্রবন্ধ—বুধোদয় সং—পৃঃ ২৩৯।

২। পারিবারিক প্রবন্ধ—ঊনচত্বারিংশ প্রবন্ধ—২০১ পৃঃ।

ফল, এবং ঐ সকল ফল জন্মে বলিয়াই আমাদিগের দেশে উহার একটা প্রশংসা হইয়া আসিতেছে।" লেখকের উক্তির মধ্যে এই সঙ্গে পারিবারিক ভাঙনের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট ; প্রশংসার প্রসঙ্গে উত্থাপনই এই ইঙ্গিত বহন করে। বস্তুতঃ রক্ষণশীল সমাজ তার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে যৌথ পরিবার প্রথাকে পোষণ করে চলে। একই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে জনৈক লেখক "আর্য্যদর্শন" পত্রিকায়[৩] "পারিবারিক একতা" প্রবন্ধে লিখেছেন,—"প্রথমে গৃহের একতা প্রয়োজনীয়। নতুবা আমরা সমাজের একতার জন্যে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা কখনই সফল হইবে না।" লেখক এখানে যৌগ্ম ক্ষেত্রের একতার কথা বলেন নি, যৌথ পরিবারের একতার প্রসঙ্গই তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

পারিবারিক একতার প্রসঙ্গ এসেছে পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণে। এই বিরোধকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি—(ক) প্রত্যক্ষ এবং (খ) পরোক্ষ। রক্ষণশীল-সমাজের আজ্ঞাবহ অণু, পরিবারের মধ্যে যখন বিশেষ ব্যক্তিত্বে প্রগতিশীলতার স্পর্শ আসে তখন পরিবার-সংস্কৃতির সঙ্গে তার যে ঐকিক বিরোধ ঘটে তাকে প্রত্যক্ষ বিরোধের দৃষ্টান্ত বলা চলে। পিতাপুত্রের বিরোধ, মাতা কন্যার বিরোধ, স্বামী স্ত্রীর বিরোধ ইত্যাদি এই গোত্রে পড়ে।

আমাদের সমাজে পরোক্ষ বিরোধের একটা প্রধান দৃষ্টান্ত স্ত্রী-গত বিরোধ। আমাদের দেশের রক্ষণশীল সমাজ পিতৃতান্ত্রিক নিয়মকে একদিকে যেমন পোষণ করেছে, অন্যদিক থেকে তেমন স্ত্রীপক্ষীয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক থেকেছে। বিশেষতঃ যৌগ্মিক ক্ষেত্রে পুরুষ পক্ষীয় সতর্কতাকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পারিবারিক সমস্যাজনিত দৃষ্টিকোণগুলি এইসব দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্য স্ত্রীপক্ষীয় সাংস্কৃতিক অধিকারকে স্বীকার করে প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণের সাক্ষাৎকারও বিরল নয়। স্ত্রৈণ পুত্রের মাতা পিতার প্রতি দুর্ব্যবহার, স্বামীর প্রশ্রয়ে ননদ কিংবা শাশুড়ীর সঙ্গে স্ত্রীর বিরোধ, এমন কি ঘরজামাই থাকা কিংবা শ্বশুর গৃহকে আপন ভাবা —এগুলোর মূলেও স্ত্রীবাধ্য মনোভাবেরই প্রকাশ—এই মত প্রচারের চেষ্টা আছে। স্ত্রৈণতা স্বক্ষেত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করে ভ্রাতৃবিরোধ এনে দেয়। আনুষঙ্গিকভাবে জায়ে জায়ে বিরোধও সমাজে দেখা যায়। স্ত্রীর প্রশ্রয়ে এবং স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতায় সন্তানের প্রগতিশীলতা কিংবা অহেতুক পারিবারিক

৩। আর্য্যদর্শন—জ্যৈষ্ঠ—১২৮৮ সাল ; পৃঃ ৭৭।

প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে স্বামীর ক্ষমতাশূন্যতাও প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ সংগঠন করেছে।

প্রত্যক্ষ॥—(ক) পিতা পুত্র বিরোধ—আমাদের সমাজে পারিবারিক শাসনকে সুদৃঢ় করবার জন্যে পিতার মহিমা প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষতঃ মাতার চেয়েও পিতার গৌরব তুলে ধরবার মধ্যে এই উদ্দেশ্য আরও সুস্পষ্ট। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ[৪] ইত্যাদি গ্রন্থে পিতার মহিমা প্রচার করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতেও পারিবারিক শাসনের এই উদ্দেশ্য রক্ষণশীল লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে[৫] লিখেছেন,—"পুরুষের সম্মান তাঁহার নিজের সাক্ষাৎ সম্মান না হইলে হয় না, স্ত্রীলোকের সম্মান স্বামীর সম্মানেই হইতে পারে। সেই জন্যই মাতৃভক্তি পিতৃভক্তির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।" এই পারিবারিক শাসন ব্যবস্থার বলবত্তায় উনবিংশ শতাব্দীতে পিতার সঙ্গেই পুত্রের প্রত্যক্ষ বিরোধ স্পষ্ট।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে নব্য সংস্কৃতির পত্তন হয়, পারিবারিক ক্ষেত্রে যুবকদের মাধ্যমেই তার সম্প্রবেশ ঘটে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল আচার বার'বার পালনের ফলে এবং পারিবারিক তথা সামাজিক দায়িত্ববোধের আধিক্যে নব্য সংস্কৃতির পোষকতা খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। এই রক্ষণশীলতা অল্পবয়সেই আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের গ্রাস করেছে। এর কারণ, এদের গণ্ডী সীমাবদ্ধ এবং সামাজিক বা পারিবারিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে এদের পদে পদে সচেতন থাকতে হয়। পরবর্তীকালে যখন নব্য সংস্কৃতির বাহক স্বামীর ক্রম ঘনিষ্ঠতায় পারিবারিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব-সঙ্কীর্ণতা এসেছে, তখন অবশ্য অল্পবয়স্কা স্ত্রীসমাজেও নব্য সংস্কৃতির সমর্থন এসেছে, এবং যৌগিক ক্ষেত্রে এক একটি অনু গঠন করেছে। কুমারী স্ত্রীসমাজের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব আসবার সম্ভাবনা থাকলেও বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে যেমন আচার পালনের আধিক্য থাকে, তেমন অবিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে তা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষাও এই প্রভাবকে গভীরতর করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও পিতার সঙ্গে বা শ্বশুরের সঙ্গে কন্যা বা পুত্রবধূর প্রত্যক্ষ বিরোধ ততো ব্যাপক নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীসমাজের কর্তৃত্ব

৪। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—৩।৪০।৮৪।

৫ পারিবারিক প্রবন্ধ—বুধোদয় সং—উনবিংশ প্রবন্ধ—পৃ. ৯১।

প্রত্যক্ষভাবে পরিবার কর্তা গ্রহণ করেন না। গৃহিণীর মাধ্যমেই এই শাসনব্যবস্থা নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং কন্যা বা পুত্রবধূর বিরোধ প্রধানতঃ মা অথবা শাশুড়ীর সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে ঘটতে দেখা যায়।

পিতার সঙ্গে পুত্রের বিরোধ যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক—তিনটিক্ষেত্রেই স্বার্থ সংঘাতে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। প্রাচ্য শাস্ত্রমতে যৌগ্মিকক্ষেত্রে যৌন স্বার্থ যৌথ পরিবার তথা সমাজের খাতিরে অনেকটা শিথিল করতে হয়। প্রগতিশীলতা রক্ষণশীল সমাজ স্বার্থের বিরুদ্ধে যৌন স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা এনেছে। ফলে স্ত্রীনির্বাচন, দাম্পত্যজীবনের আচার ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবারের ক্ষেত্রে পদে পদে বিরোধ ধূমায়িত হয়েছে এবং অবশেষে একটি পরিণাম গ্রহণ করেছে। আর্থনীতিক ব্যবস্থা ভূমিনিভরতা থেকে আমলা তান্ত্রিকতার মধ্যে বিবর্তিত হওয়ায় আর্থিক স্বার্থ-সংঘাতও পিতা পুত্রের বিরোধ এনেছে। নব্য সংস্কৃতিতে আয়ব্যয়ের ব্যবস্থায় ক্ষেত্রসঙ্কোচ এবং জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি—এই দুটি কারণ প্রকারান্তরে সাংস্কৃতিক সমস্যাকেও এনেছে। ধর্মীয় বিরোধও অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে নতুন প্রগতিশীল মত সংগঠনের ফলে। নাস্তিকতা, নব্য ধর্মীয় তত্ত্বে বিশ্বাস কিংবা অন্য ধর্মে আসক্তি—ইত্যাদি থেকেও পিতাপুত্রের বিরোধ পারিবারিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

অনেকক্ষেত্রে নব্য সংস্কৃতি পরিবারের প্রধানতম ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে। সেক্ষেত্রে রক্ষণশীল সংস্কৃতির বহন ঘটে থাকে স্ত্রীসমাজের মধ্যে। এখানে স্ত্রীসমাজের সঙ্গে পারিবারিক বিরোধ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। পুত্রবধূ বা কন্যার প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে এই রক্ষণশীল শক্তিই সর্বদা উগ্র থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন স্বার্থ কিংবা আর্থিক স্বার্থ (অলঙ্কারাদির সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিষয়ও জড়িত) যেখানে লঙ্ঘিত, সেখানে পুত্রবধূ বা কন্যার পক্ষ থেকে প্রগতিশীল সংস্কৃতির পোষণ ঘটে থাকে।

স্বামীস্ত্রীর যৌগ্মিক ক্ষেত্রে যে বিরোধ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে পারিবারিক বিরোধের অঙ্গীভূত বলে ধরে নিতে পারি। স্বামী-বাহিত ভিন্ন সংস্কৃতি প্ররোচিত বিভিন্ন আচার স্ত্রীর রক্ষণশীল মনে আঘাত আনে। এতেই বিরোধের সূত্রপাত হয়। যৌগ্মিক ক্ষেত্রের প্রাধান্য সম্পর্কে স্ত্রীর সচেতনতা যখন এসে পড়ে, তখন আপোষ ঘটে। অন্যক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রীরও বিচ্ছেদ ঘটে।

আমাদের সমাজে পরোক্ষ বিরোধের স্বরূপ বুঝতে গেলে স্ত্রীসমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা এবং তার গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

আমাদের সমাজে স্ত্রীসমাজের সাংস্কৃতিক জীবনেও পুরুষের প্রভুত্ব সার্বভৌম। স্ত্রীবাধ্যতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্মৃতিপুরাণে পুরুষকে সতর্ক হতে নির্দেশ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এ ধরনের কয়েকটি শ্লোক আছে—যেগুলো উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন। যথা,—

"পুংসশ্চ স্ত্রীজিতস্যৈব জীবতং নিষ্ফলং ধ্রুবং
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ॥"৬

কিংবা, "কিং তজ্‌জ্ঞানেন তপসা জপ হোম প্রপূজনৈঃ।
কিং বিদ্যয়া বা যশসা স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতং॥"৭

অথবা, "নিন্দন্তি পিতরো দেবা বান্ধবা স্ত্রীজিতং জনং।
স্ত্রীজিতং মনসা বাচা পিতাভ্রাতা চ নিন্দতি॥"৮

এ কথা সত্যি যে, আদিম রিপুর বিরুদ্ধে মতবাদ সংগঠনের জন্যেও অনেক সময় স্ত্রীসর্বস্বতার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীসমাজের বিরুদ্ধে অন্যান্য সুপরিচিত মন্তব্যগুলো থেকেই এই সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া সম্ভবপর। এই সার্বভৌমত্ব স্ত্রীসমাজের জীবনকে আমাদের দেশে মূল্যহীন করে তুলেছে। এ সম্পর্কে স্ত্রীসমাজে যখন বোধ এসেছে, তখন দুঃখবাদ এসে প্রবেশ করেছে। অনেক প্রহসনকার পুরুষের স্বার্থপ্রণোদিত শাস্ত্র সৃষ্টিকে কটাক্ষ করেছেন। শ্রীনাথ চৌধুরীর "আমি তো উন্মাদিনী" প্রহসনে (১৮৭৪ খৃঃ) বিদেশিনী ও চপলার কথোপকথন স্মরণ করা চলে।—

"বিদেশিনী॥ শাস্ত্রের নিয়মে তিনটি বয়সেই স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন।

চপলা॥ আ—রেখে দাও শাস্তর, পুরুষগুলো নিতান্ত শঠ, মনের মতন শাস্তর তোয়ের করেছে, থাক্‌তো আমাদের হাতে কলম, তবে দেখতে পেতিস্, মনের মত শাস্তর তোযের করতেম, পুরুষগুলো যাতে আমাদের অধীন থাকে, তাই করতেম।"

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে মেয়েদের প্রতি সমাজের বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে একটি সুপরিচিত প্রবচন—"পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে তার গুণ গাই!" কুমারী জীবন থেকেই এই দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধৃত করা চলে,—

৬। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—২/৬/৬২।
৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—৪/১৬/৯২।
৮। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—২/১৬/৮৯।

১। "মেয়ে মেগে মেয়ে, তুষ করলে খেয়ে।
হরিভক্তি উড়ে গেল মেঘের পানে চেয়ে॥"

২। "মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ॥"

৩। "মেয়েমানুষের বাড়, কলাগাছের বাড॥" ইত্যাদি।[৯]

সমাজের ধারণা, পিতৃগৃহকে দোহন করেই যেন দুহিতারা 'দুহিতা' নাম সার্থক করে। প্রফুল্লনলিনী দাসীর লেখা "ষষ্ঠীবাঁটা প্রহসনে" (১৮৮৭ খৃঃ) রাধামোহন মন্তব্য করেছেন,—"মেয়ে—তার আবার মনোমত আর অমনোমত ; যাতে তাতে ঘর থেকে বার কোত্তে পাল্লেই হোলো। এ গুলো জন্মো কেবল চিরকালটা বাপমাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে বৈ ত নয়। ওদের দ্বারা বাপ্ মায়ের কি উপকার হতে পারে ? রাতদিন কেবল দ্যাও রে দ্যাও রে ! ওদের সঙ্গে কেবল খাওয়ার আর নেওয়ার সম্পর্ক। বেটীরে শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় বাপের বাড়ীর ঝাঁটাগাছটা নিয়ে যেতে পাল্লেও ছাড়ে না।......মেয়ের বিয়ে দেওয়া—কুটুম্ব বরটী ভালো হলেই হোলো—যাতে লোকের কাছে মুখ উজ্জ্বল হয়।" এর থেকে কুমারীর বিবাহক্ষেত্রে কুমারীর যৌন স্বার্থ এবং পরিবারের পুরুষগত সাংস্কৃতিক স্বার্থের বলবত্তার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রামনারায়ণ তর্করত্নের "নব নাটক" প্রহসনেও (১৮৬৬ খৃঃ) অমলা, কমলা, বিমলা, নির্মলা, চন্দ্রকলা ইত্যাদির কথোপকথনের মধ্যে কুমারী জীবনের দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে।—

"কমলা॥ কতো গোহত্যে ব্রহ্মহত্যে করো্য নারীজন্ম পেয়েছি। আমাদের মত চিরদুঃখিনী কে আছে ? চিরকাল মা বাপের গলগ্রহ হয়্যে রয়েছি, আমাদের উপর তো মা বাপের অনাদর হবেই, তোরা তো পাঁচদিন বাদে শ্বশুর ঘর করতে এসেছিস্। তোরাই মা বাপের কাছে কতো আদর পেয়েছিলি ? ছেলের উপর মা বাপ যত স্নেহ মমত্ব করেন, মেয়ের উপর কি তাদের ততটুকু হয় ? তেমন হলে অমন হেনস্তায় রাখতো কেন ? তা মা বাপ যে এমন সামগ্রী যারপরনাই, তাঁরা যদি অগ্রাহ্য কল্যেন, তবে অন্যে কিনা করবে বলো ?...বলেন যে সো করো্য মেয়েটাকে ঘর থেকে বার করতে পাল্যে বাঁচি।

বিমলা॥ হাঁ তা মুখেও বলেন আর সেই ব্যবহারও করো্য থাকেন।"

৯। বাংলা প্রবাদ—ডঃ সুশীলকুমার দে।

কুমারী জীবনের পর বিবাহিত জীবন। এই জীবনের দুঃখও এদের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।—

"কমলা ॥ প্রথম ঘর কত্যে যাওয়া বড় কঠিন, দেখ, যাদের সঙ্গে জন্মাবধি ঘর করা হয় নি, যাদের চক্ষেও একবার দেখ নি, সেই সকল আ-কামানে কেয়ুটে বোড়ার সঙ্গে সংসার করা বিষম সমিস্যে। যাদের কি ভাব, কি চরিত্র, কিছুই টের পাও নি, একেবারে গিয়ে তাদের মোন যোগান ভাই সামান্যি কঠিন কম্ম? সকলে কি তা পেরে ওঠে? তাতে ভাই একোজন একোরকম, নতুন বৌ এলে সে তো বনের পাখি ধরো্য নিয়ে আসা হলো, তা তার প্রতি স্নেহ মমত্ব করা চুলোয় যাক্, ঐ কি খেলে, ঐ কি কল্যে, কোথায় দাঁড়ালো, কার সঙ্গে কথা কৈলে, এই সকল কথা নিয়েই সংসারের ভিতর ধূম পড়ে যায়।

বিমলা ॥ হাঁ দিদি, সত্যি কথা, আমাদের বিধু বলে, তার অদেষ্টে ঐ রকম ঘটেছিল, আহা পেট ভরো্য খেতেও দিত না, বিধুর যে শাশুড়ী ছিল মাগী যেন রায়বাঘিনী, ননদটিও কাল নাগিনীর মত বড় ফেলা যান না, সব কথাগুলি শাশুড়ীর কানে অমনি তুলে দিত, রাত্তিরে স্বামীর কাছে শুয়ে কি কথাটী বলেছে, আড়ি পেতে শুনে তাও আবার সাতখানি করো্য লাগাতো।"

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় পুত্রবধূদের অবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, তা উল্লেখযোগ্য।[১০]—"বঙ্গদেশে একজাতি মনুষ্য আছে, তাহাদিগকে কোণের বউ বলে।...কোণের বউ প্রতি পদেই অপরাধী, প্রতি কার্য্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, শয়নে, রন্ধনে, বাক্যকথনে, অঙ্গ চালনে, সকলেতেই কোণের বউ দোষী। কোণের বউ ক্ষুধা হইলে বলিতে পাইবে না: খাইতে পাইবে না—উদর পুরিয়া খাইতে পাইবে না; কোন ইচ্ছা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—তিরস্কার করিলে কাঁদিতে পাইবে না; পীড়া হইলে বলিতে পাইবে না—হাসিয়া কথাটী কহিতে পাইবে না—যাতনা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখিয়াও গাত্র-বস্ত্র খুলিতে পাইবে না—ত্বরিত চলিতে পাইবে না—স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে পাইবে না! ইহাই বঙ্গসমাজের নিয়ম।"

১০। "সোমপ্রকাশ" পত্রিকা—১৫ই বৈশাখ—১২৮৭।

১২৯৫ সালে সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত "কোণের বউ" নামে একটা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। বৈকল্পিক নামকরণ,—"বঙ্গ সমাজের একখানি সুন্দর চিত্র।" পুস্তিকাকার পুত্রবধূ সমাজের দুরবস্থার চিত্রই এঁকেছেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে বাংলাদেশের বধূশাসনের একটি নমুনা দিই। "বামাবোধিনী পত্রিকায়" (পৌষ, ১২৯২ সাল) একটি সংবাদ আছে।—"কলিকাতার কোন ভদ্রগৃহের ১২ বৎসরের একটী পুত্রবধূ একটি সন্দেশ চুরি করিয়া খাইয়াছিল বলিয়া জটিলা শাশুড়ী খুন্তি পোড়াইয়া তাহার গাত্রের নানাস্থান দাগাইয়া দেন।"

সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে নারীজীবনের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা গৃহিণী জীবনে। ক্ষমতামত্ততা এই সময়ে এদের জীবনে বিকৃতি আনে। তবে পুরুষ পক্ষীয় সাংস্কৃতিক চাপে অনেক সময় গৃহিণীজীবনও অভিশপ্ত হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর ক্রম বিবর্তনেও অনেকক্ষেত্রে এই দুর্ভাগ্যের অবকাশ ঘটেছে। গৃহিণী জীবনের ধারা অনেকক্ষেত্রে বিধবা জীবনেও অব্যাহত থাকে। যে ক্ষেত্রে থাকে না, সেখানে নারীজীবনের যন্ত্রণা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

দুর্ভাগ্যময় নারীজীবনের বিবর্তনের চিত্র দেবার প্রাসঙ্গিকতা—এর মধ্যে দিয়ে নারীজীবনের ওপর পুরুষ পক্ষীয় সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব কতোখানি সক্রিয় এবং কুফল সৃষ্টিকারী—সেটা পর্যবেক্ষণ করা।

পরোক্ষ বিরোধ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনের মূলে নব্য সংস্কৃতি বাহকের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে বিবেচনা বোধ। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রগতিশীল পক্ষ থেকে যখন স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়, তখন তাদের সাংস্কৃতিক পরাজয়ের চিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে যৌগিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। রক্ষণশীলের মতে প্রগতিশীলের সামাজিক দায়িত্বহীনতার মূলে এই স্ত্রীসবস্বতা। এই দায়িত্বহীনতাকে প্রকট করবার জন্যেই রক্ষণশীল প্রহসনকাররা স্ত্রীসমাজের রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক আচরণকে পুরুষ সমাজের ওপর আরোপ করেছেন। সুতরাং বাংলা প্রহসনের মধ্যে এই সমস্ত সমাজচিত্রের মূলে মাত্রা নির্ধারণ এবং দৃষ্টিকোণ বিচারের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

পিতামাতার প্রতি স্ত্রৈণ পুত্রের দুর্ব্যবহার যৌথ পরিবার শাসনের সময়েও বিরল-দৃষ্টান্ত ছিলো না। কারণ স্বক্ষেত্রের মধ্যে আকর্ষণ সাধারণ প্রবৃত্তি থেকেই আসে। সামাজিক দায়িত্ববোধ এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির শিথিলতা মাত্র। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আর্থনীতিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তনে আমাদের দেশে

পারিবারিক ক্ষেত্রে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। স্ত্রীসমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলোর মধ্যে এই সমাজচিত্র ধরা পড়ে। ডঃ সুশীলকুমার দে সংগৃহীত "বাংলা প্রবাদ" গ্রন্থে এ ধরনের কয়েকটি প্রবাদ আছে।—

১। "মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি।
বৌকে পরাই ঢাকাই শাড়ি॥"

২। "মায়ের পেটে ভাত নেই,
বউয়ের গলায় চন্দ্রহার॥"

৩। "গিন্নীর হাতে রাঙা পলা।
বৌয়ের হাতে সোনার বালা॥"

৪। "বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাড়ি
মাগের কানে সোনা॥"

৫। "বেটা বিয়লাম বউকে দিলাম,
ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম,
আপনি হলাম বাঁদী
পা ছড়িয়ে কাঁদি॥"

৬। "কলির কথা কই গো দিদি,
কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি,
বউয়ের পাতে দই॥"

নব্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠনের জন্যে পদ্ধতি হিসেবে এইসব চিত্রের প্রয়োজন আছে। "টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি" প্রহসনে (১৮৮৯ খৃঃ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকাংশেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মায়ের চাইতেও স্ত্রীকে নিকটতর ভাববার প্রসঙ্গ তুলে মহেন্দ্রের স্ত্রী মহেন্দ্রকে অনুযোগ করে বলেছে, স্ত্রী দুশো পাঁচশো হতে পারে, কিন্তু মা গেলে আর হবে না। এতে নব্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন মহেন্দ্র জবাব দেয়,—"এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। বাবাও যদি দুশো পাঁচশো বিয়ে করে যায় তাহলে?···আমি জানতাম তুমি একটু লেখাপড়া শিখেচ, কিন্তু এখন দেখ্‌চি সেটা আমার ভ্রম, তুমি খালি দাশুরায়ের পাঁচালি পড়েচ।" কিন্তু সংবাদপত্রে নব্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন পত্রিকার

মধ্যেই নব্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই পক্ষদোষকে কটাক্ষ করা হয়েছে। "ভারত সংস্কারক" পত্রিকা[১১] স্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—"পূর্ব্বতন ভ্রাতা ভগিনীদিগের পরস্পরে যে অকৃত্রিম প্রেম লক্ষিত হইত, তাঁহারা সুখে দুঃখে যেরূপ সমভোগী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এইক্ষণে প্রায় তাহার চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভ্রাতা ভগিনীর ত কথাই নাই, যাঁহাদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁহারাই গলগ্রহরূপে পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার গর্ভে তাঁহারা সঞ্জাত, সেই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননীই 'পিতৃ পরিবার' বলিয়া কুপোষ্যবোধে অগ্রাহ্য হইয়া থাকেন।" দৃষ্টিকোণের নিয়ন্ত্রণ যতোই থাকুক, সমাজচিত্র নির্ধারণে এই মন্তব্যটি মূল্যবান সন্দেহ নেই।

ননদ, জা কিংবা শাশুড়ীর সঙ্গে বউয়ের বিরোধ পারিবারিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। এই বিরোধের প্রসঙ্গে যে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে, তার মূলে পরোক্ষ সাংস্কৃতিক সংঘাত সুস্পষ্ট। রক্ষণশীল দৃষ্টিতে "কোণের বউ"-এর প্রতিবাদ যতোই সামান্য হোক না কেন, তাই "চোপা" নামে অভিহিত। এই "চোপার" মূলে যদি কিছু বাস্তব সত্য থাকে, তাহলে সেটুকুর কারণ তাদের জীবনের যৌন আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অশান্তি। এ ছাড়া কুশিক্ষা গ্রহণের অবকাশ, প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণও উল্লেখ করা যেতে পারে।[১২]

জায়ের চেয়েও ননদের সঙ্গে বিরোধের অবকাশ যথেষ্ট ছিলো। পারিবারিক সংস্কৃতিতে ননদের তুলনায় বৌয়ের অত্যন্ত অপ্রতিষ্ঠাতেই এই বিরোধের বীজ নিহিত। বধূর কামনা বাসনা রক্ষণশীল সংস্কৃতিতে মূল্য হীন। প্রবাদ থেকেই একটা স্পষ্টগোচর হয়।

১। "বউয়ের চলন ফেরন কেমন
তুর্কী ঘোড়া যেমন॥"

২। "বউ নয় তো হীরে,
কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি, আজ দিয়েছে ছিঁড়ে॥"

১১। ভারতসংস্কারক—১৯শে বৈশাখ—১২৮১; পৃঃ ৩১।

১২। "স্ত্রীসমাজ ও কলহ" প্রবন্ধ (যুগান্তর সাময়িকী—২০শে জুলাই, ১৯৬২)—এলিজাবেথ গোস্বামী।

৩। "মাগের ইচ্ছা ভাতারটি ॥"

৪। "শুন ভাই কলির অবতার
কোণের বউড়ী বলে—ভাতার ভাতার ॥"

রক্ষণশীল শাসনই বউকে 'স্বক্ষেত্রস্থ' রাখতে সক্ষম! তাই প্রবাদে বলা হয়,—"লোহা জব্দ কামারবাড়ী, বৌ জব্দ শ্বশুরবাড়ী।" এমন কয়েকটি বাংলা প্রবাদ আছে, যেগুলোর মধ্যে ননদের সঙ্গে বৌয়ের পার্থক্যবোধকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন,—"পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়। খেঁদা নাকী বউ এসে বাটায় পান খায় ॥" এই পার্থক্যই ননদের প্রতি বৌয়ের সহানুভূতি হীনতা এনেছে, যদিও বিরোধের কোনো প্রত্যক্ষ কারণ নেই।

কলিকালের সূত্রপাতের বাস্তব ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু পুত্রবধূর স্বাতন্ত্র্যবোধকে কলিকালের ধর্মই বলা হয়েছে। তাই "কলির বৌ হাড়জ্বালানী," "কলির বৌ ঘর ভাঙানী" ইত্যাদি শব্দবন্ধ আমাদের সমাজে অত্যন্ত বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। পুত্রবধূর কামনা বাসনাকে রক্ষণশীল পক্ষ থেকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে কিছুটা কামনা বাসনার কিংবা মনোভাবের পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রবাদেও এর দৃষ্টান্ত আছে।—

১। "জা-জাউলী আপনা উলী
ননদ মাগী পর।
শ্বাশুড়ী মাগী গেলে পরে
হব স্বতন্তর ॥"

২। "শ্বাশুড়ী মলো সকালে
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে ত
কাঁদব আমি বিকেলে ॥"

৩। "একলা ঘরের গিন্নি হব,
চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব ॥"

পুত্রবধূর সাংস্কৃতিক অভিযানের মূলে পুরুষের প্রশ্রয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতাশূন্যতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এই অভিযানকে ব্যাহত করতে স্বামীর সাংস্কৃতিক বলবত্তাকে সক্রিয় করবার জন্য অনেকে বধূর সাংস্কৃতিক অভিযানের মধ্যে যৌন স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি জড়িত করেছেন। যৌন অশান্তির ক্ষেত্রে এধরনের ব্যভিচারের অবকাশ থাকলেও এইসব সমাজচিত্রকে বিবেচনার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

নব্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন গোষ্ঠীর স্ত্রীসর্বস্বতা কিংবা শ্বশুর গৃহকে নিকটতর বোধ করা—এরই মাত্রাতিরেক সৃষ্টি করে প্রহসনকারদের অনেকে "ঘর জামাই"য়ের দুরবস্থার চিত্র দিয়েছেন। সুতরাং পদ্ধতি বিচারে ঘর জামাইয়ের সমস্যা পারিবারিক ক্ষেত্রের সাংস্কৃতিক বিরোধের ক্ষেত্রে উপস্থাপনা করা যেতে পারে। তবে এই প্রথা যে সম্পূর্ণ নব্য সংস্কৃতি-নির্ভর তা নয়। আমাদের সমাজে "ঘরজামাই" সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব-সম্পন্ন প্রবাদের চলন আছে—"দূর জামাইয়ের কাঁধে ছাতি। ঘর জামাইয়ের মুখে লাথি।" আমরা জানি যে স্ত্রীসমাজের কাছে পুরুষের সাংস্কৃতিক পরাজয়ের বীজ উভয় গোষ্ঠীর (রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল) পক্ষ থেকে বিরোধী পক্ষের রীতিনীতির মধ্যে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলেছে। কারণ এর মধ্য দিয়েও দৃষ্টিকোণের সমর্থন লাভ সহজতর। অবশ্য এর মধ্যে দিয়ে "ঘর জামাই" প্রথা এবং তার গতিবিধি সম্পর্কে পরিচয় থেকে গেছে। "Mookherjees Magazine" পত্রিকায়[১৩] "The Domesticated son in law" প্রবন্ধে প্রবন্ধকার রক্ষণশীল সংস্কৃতির অন্তর্গত কৌলীন্য প্রথাকে দায়ী করেছেন। একে আর্য প্রথা বিরোধী বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন।[১৪] তিনি পারিবারিক সমস্যার দিকটি অত্যন্ত অল্প মন্তব্যের মধ্যে দিয়েই শেষ করেছেন।—"If the domestication of son-in-law had been a genaral practice, then the surrender of sons must have been equally frequent. No man can obtain a son-in-law to be an inmate of his family, unless another man has given up his own son for that purpose. Every instance of the **import** of a ঘরজামাই must be concomitant with the **export** of a son. The exports from one set of families must numerically correspond to the inports in another set of households."[১৫] "The exports from one set of families" সম্পর্কে সমস্যা যতোটা তীব্র, স্বপরিবারে অধিষ্ঠিত শ্বশুর গৃহগত মনসম্পন্ন ব্যক্তিও পারিবারিক ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, তার তীব্রতাও কম নয়। উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা-ক্ষীণতা প্রহসনকাররা উদ্ঘাটন করেছেন। পাত্রের "export"-এর

১৩। Mookherjees Magazine (New series) Vol.—2, 1873.

১৪। Ibid—P—652.

১৫। Ibid—P—654.

এর মতোই কর্তব্যের "export"ও কতকগুলো অবস্থা এবং তদনুযায়ী সর্তকে বিবেচনা করে চলে। কিন্তু এই অবস্থা ও সর্ত লঙ্ঘন ঘটায় যে সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, তা যথারীতি প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছে বটে; কিন্তু সাংস্কৃতিক সংঘাত এই দৃষ্টিকোণকে দ্বৈতীয়িক অনুশাসনের সঙ্গে জড়িত করে জটিল করে ফেলেছে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃবিরোধের সমস্যা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এর মূলে পরবর্তী আর্থনীতিক বিবর্তন অত্যন্ত সক্রিয়। কিন্তু রক্ষণশীল পক্ষ থেকে যে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে; তাতে পরোক্ষ বিরোধকে সঞ্জীবিত করে এর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে এখানেও স্ত্রীগত সমস্যার দিকটিই লক্ষ্য-পথে পড়ে। যৌথ পরিবারক্ষেত্রে এই দোষারোপের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল দলের অভিযান প্রকাশ পেয়েছে। এটাও অবশ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেই উপস্থাপিত। হরিনাথ চক্রবর্তীর লেখা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "শয্যাগুরু" প্রহসনটির উদ্দেশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে। তবে রক্ষণশীল পক্ষের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করলেও অন্যায় করা হয়। "আর্য্যদর্শন" পত্রিকায়[১৬] "পারিবারিক একতা" প্রবন্ধে প্রবন্ধকার লিখেছেন,—"ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদের কারণ অনেক স্থলে ভ্রাতৃগণ নহেন, তাহাদের প্রণয়িনীগণ এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করেন। তাহারা অশিক্ষিত, কিন্তু কর্তৃত্ব ভার হস্তে করিতে তাহাদের লালসা। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অগ্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। ক্রমে তাহাদের স্বামীতে সে বিবাদ সংক্রামিত হয়, এবং ভ্রাতৃগণ তাহা মস্তকে লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করেন।"

পারিবারিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত বিরোধে প্রধানভাবে রক্ষণশীল পক্ষ থেকেই প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কারণ রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে পারিবারিক ক্ষেত্র বিস্তীর্ণতর। রক্ষণশীল পক্ষ থেকে স্বক্ষেত্রে আক্রমণও বিরল নয়। বৃদ্ধের স্ত্রীবাধ্যতাই সন্তানের মাধ্যমে পরিবারক্ষেত্রে প্রগতিশীল সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার কারণ; —এই মত প্রচারের মধ্যে স্বক্ষেত্রে আক্রমণ রক্ষণশীল স্বার্থ রক্ষারই প্রচেষ্টা। সুতরাং একথা বলা চলে যে, পারিবারিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিরোধ সম্পর্কিত প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনে সর্বথা রক্ষণশীল মতবাদই প্রাধান্য লাভ করেছে।

১৬। আর্য্যদর্শন—জ্যৈষ্ঠ—১২৮৮ সাল; পৃঃ ৭৮।

(ক) স্ত্রীসর্বস্বতা ও ক্ষেত্রসঙ্কীর্ণতা ॥—

মাগ-সর্বস্ব (১৮৭০ খৃঃ)—হরিমোহন কর্মকার ॥ ভূমিকায় প্রহসনকার লিখেছেন,—"প্রহসনাভিনয়ে যে সামাজিক দোষের কথঞ্চিৎ সংশোধন হয়, ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব, কিন্তু বঙ্গদেশে প্রহসনের সংখ্যা অতি অল্প প্রযুক্তই যে সামাজিক দোষের বৃদ্ধি হইতেছে এমত নহে। তবে প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ দোষেরও সংশোধন হয়, তাহাই পরম লাভ।"

কাহিনী।—রমাকান্ত দত্ত স্ত্রৈণ। তাঁর "অবৈতনিক মোসাহেব" রামেশ্বর তর্করত্ন বলেন,—"খুড়ো, তোমারও দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে, আমারও দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে, সুতরাং স্ত্রীর একটু বশীভূত না হলে চল্‌বে কেন?" রমাকান্ত বলেন,—"এই পাড়ার কতগুলো আহাম্মোকদের কথা সর্ব্বদাই শুন্‌তে পাই যে, তারা রাঁড় নিয়েই আমোদ প্রমোদ করে থাকেন, কিন্তু মেগের সঙ্গে ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। ...আরে ব্যাটারা, তোরা রাঁড়ের বাড়ীতে লোচ্চাম করতে যাস, সমস্ত রাত কাটিয়ে আসিস, বাড়ীতে তোদের মাগ্‌কে ঠাণ্ডা করে কে? তাঁরাও তো লোচ্চা খুঁজে বেড়ায়।" রমাকান্তের মতে স্ত্রৈণ হওয়া বরং ভালো। অবশ্য রমাকান্ত জানেন না যে, সীমা অতিক্রম করলে একই পর্যায়ে পড়তে হয়।

রমাকান্ত বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছেন। "অমন বয়েসে বিয়ে করে একপ্রকার কাশীতে মন্দির দিয়েছেন।" ভাই, ভাইপো, ভাদ্রবধূ সকলেই বিতাড়িত। বুড়ো মা বাজার করেন, বিধবা বোন রেঁধে দেয়। তাঁরা নিরুপায়, তাই চব্বিশ ঘণ্টা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা রাজলক্ষ্মীর অপমান সহ্য করতে হয়। রাজলক্ষ্মীর ধারণা, "ভাল খাব, ভাল পরব, যখন যা চাব তখন তাই পাব বলেই অমন বুড়ো মিন্সের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল।" তাই দাপট দেখাবার ন্যায্য অধিকার তার আছে!

একদিন রমাকান্তের মা পুত্রবধূকে নিন্দাসূচক কথা বলেন। এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে রাজলক্ষ্মী। স্বামী এলে বারুদে যেন আগুন লাগে। রাগ কে থামায়! স্বামী তার জন্যে জরীর শাড়ী এনেছিলেন, রাজলক্ষ্মী সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাপের বাড়ী যাবে বলে সে ভয় দেখায়। "এখন পাল্‌কী এনে দেবে কিনা? হয় তুই সর্ব্বনাশিকে বাড়ী থেকে বিদেয় কর, নয় আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।" রমাকান্ত তাকে আশ্বাস দেন,—"কাল সকালে দেখ্‌বে যে সব ফাঁক হয়ে গেছে। তুমি একলা ঘরে রাজরাজেশ্বরী

হয়ে বসবে, আর আমি চিৎপাত হয়ে তোমার পায়ের তলায় পড়ে থাকবো।” রমাকান্তের বোন কামিনী একটু স্পষ্টবাদী। সে রাজলক্ষ্মীকে তিরস্কার করলে রমাকান্ত বলেন,—“ও কামিনি! শোন, ঝগড়া করলে চল্‌বে না; বৌয়ের মন যুগিয়ে থাক্‌তে পারিস তো থাক্‌, তা নইলে তোরা দুটো বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।” কামিনী দাদার মুখে একথা শুনে মাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওরা চলে গেলে রমাকান্ত সোহাগ করে রাজলক্ষ্মীকে বলেন.—“প্রিয়ে, আর কি, এখন তুমি রাধা আমি শ্যাম! এখন দিবারাত্র মনের সুখে নির্জ্জন নিকুঞ্জে সুখে রাসলীলা করবো। তোমার জটিলে কুটিলের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছি।” যে কাণ্ডটা ইতিমধ্যে হয়ে গেলো, সেটা দাসী পেঁচোর মার কাছে একটু দৃষ্টিকটু লাগে। সে বলে,—“হ্যাঁ গা বাবু, মা বোন্‌ পর, আর বৌ কি এতই আপনার হলো?” রমাকান্ত উত্তর দেয়.—“নয় কেমন করে? মাগই তো আপনার, আর মা—বাপের পরিবার বৈ তো নয়।”

রাজলক্ষ্মীর ভাইয়ের বিয়ে। রাজলক্ষ্মী রমাকান্তের কাছে আব্দার জানায়,—“আমাকে প্রস্তুত হীরের গয়না দিতে হবে। এ যদি না দাও, তাহলে আমি রক্তগঙ্গা হব।” রমাকান্ত বড়ো বিপদে পড়েন। গিন্নীর জন্যেই অফিসের ক্যাশে তাঁর বারো হাজার টাকা দেনা। এজন্যে আবার আরও পাঁচ হাজার টাকা দেনা করতে হবে। যা হোক রমাকান্ত স্ত্রীকে বলেন, কালই পান্নাজহুরীর দোকান থেকে তিনি হীরের গয়না এনে দেবেন।

গিন্নীকে তিনি সন্তুষ্ট অবশ্য করলেন, কিন্তু আক্ষেপ করে বলেন,—“বুড়ো বয়েসে বিয়ে কোরে কি কুকর্ম্মই করেছি! ধনমানপ্রাণ সকলি গেল আর কি।” এমন সময় অফিসের অমৃতলাল সেন আসেন। তিনি বলেন, ক্যাশিয়ার হিসেবে রমাকান্ত পদের মর্যাদা রাখতে পারেন নি। সতের হাজার টাকার ঘাট্‌তি। অফিসে গিয়ে এক্ষুনি অ্যাকাউণ্ট বুঝিয়ে দিতে হবে। তার ওপর আবার চার পাঁচ দিন অফিস কামাই! এর কৈফিয়ৎও দিতে হবে। পাহারাওয়ালা ডাকবার জন্যে অমৃতবাবু প্রস্তুত হন। হতভম্ব রমাকান্তবাবু বলেন,—“অ্যাঁ, বাবা, পাহারাওয়ালা ডাকবে: তোমাকে আমি ছেলের মতন ভালবাসি, তা এইটে কি উচিত?” অমৃতবাবু তখন বলেন,—“মহাশয়! ওতো মাগ-ভাতারের কথা হলো।”

পাহারাওয়ালা রমাকান্তবাবুকে মারতে মারতে নিয়ে যায়। রমাকান্ত তাকে কাকুতি মিনতি করে,—“দোহাই বাবা পাহারাওয়ালা, আমাকে মার

কেন ? বাবা তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এমন কর্ম্ম আর কখন করবো না।" কাষ্ঠহাসি হেসে পাহারাওয়ালা বলে,—"হাঁ হাঁ বাবা, এসা কাম আর নেই করবে ! আবি চলো ; হুঁই যাকে ছোড় দেগা !"

এই এক রকম (কলিকাতা—১৮৭২ খৃঃ)—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রহসনকার অন্যতম চরিত্র কানাইবাবুকে দিয়ে একটি সুদীর্ঘ পদ্য পাঠ করিয়ে তার মধ্যে দিয়ে নামকরণের উদ্দেশ্য তথা গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন ধরনের দুষ্কৃতি বর্ণনার শেষে তিনি লিখেছেন,—

"দেখিতেছি স্ত্রীবাধ্যের জন্য কতজন।
করিতেছে জননীরে সদা অযতন ॥
মাতাকে বঞ্চনা করে অশন বসনে।
সতত নিরত হয় রমণী তোষণে ॥
জন্মাইলি ওরে পাপি যাঁহার উদরে।
এত বড় হোলি যাঁর কোলে খেলা কোরে ॥
কি বলিব কারে আর তাঁরে নাহি মানে।
মানের বদলে স্ত্রীর বাঁদী কোরে আনে ॥
এতে কিরে ধর্ম্ম থাকে ওরে নরাধম।
দেখাইলি লোকে ভাল 'এ এক রকম' ॥"

কাহিনী।—রমাকান্ত একজন বাবু মানুষ। তার স্ত্রীর সঙ্গে মা-র ঝগ্ড়া চল্ছে। রমাকান্ত বিপদে পড়েছে। সে কোন্দিকে যাবে ! "মার দিকে যদি হই, তাহলে তো স্ত্রীর আশা ছেড়ে দিতে হয় ; সে এমন ঘরের মেয়ে নয়। স্ত্রীর দিকে যদি হই, তা হোলে লোকালয়ে এককালে মুখ দেখান বড় ভার হয়ে উঠ্বে ; কারণ এদিকে আমি যে আবার একজন ব্রাহ্ম বোলে পরিচিত !" এমন সময় রমাকান্তর বন্ধু হরিহর আসেন। রমাকান্ত তাঁকে তার সমস্যার কথা বল্লে হরিহর বলেন,—"আজকাল আমাদের নব্য দলভুক্ত ভায়াদের অনেকেই স্ত্রীর বশ দেখ্তে পাচ্চি ; সুতরাং আমারও সেই মতে মত। ব্যবহারোপি বলবান্ ভবেৎ। মায়ের পক্ষে হওয়া উচিত হয় না।"

কিছুক্ষণ পর কানাইবাবু আসেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের হলেও ভণ্ড নন ! রমাকান্তর মতে,—"এমন যে লোক আছে তাহা খুব সৌভাগ্যের বিষয়। আমি মনে করিতাম আমাদের মতই চারপো ভণ্ডামির লোক।" কানাইবাবু

এলে রমাকান্ত বলে, বাড়ীতে তার অসুখ বিসুখ যাচ্ছে, এই জন্যেই সে সমাজে যেতে পারে নি। কিছুদিন থেকে রমাকান্ত নিয়মিত সমাজে অনুপস্থিত থাকছে।

রমাকান্তর স্ত্রী সুখদা খুব বিলাসী। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। সে স্বামীর সিদ্ধান্ত জানতে পেরে আহ্লাদ করে সখী রাজকুমারীকে বলে,—"আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোয়েচে, মাগি বেটিকে আলাদা কোরে দিয়েছি ;—আর তার গলাবাজীর যো রাখিনে।…এখন দাসীর সঙ্গে সমান বল্লেই হয়।" রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করে—যদি কর্তা শাশুড়ীর দিকে হতো তাহলে সুখদা কি করতো ? সুখদা জবাব দেয়,—"এম্নিই আর কি ? [রাগত ভাবে] তাহলে পোড়ার মুখো ভাতারের মুখে না ঝাঁটা মেরে দুচক্ষু যেখানে যেতো সেখানে চোলে যেতেম। তোমার কথায় রাগ করিনি। ভাতার যদি কথার না বশ হবে তবে আর বেঁচে সুখ কি ? অমন ভাতার থাক্‌লেই কি ? আর না থাক্‌লেই কি ?" রাজকুমারী—"তা বই কি ?"—মন্তব্য করে চলে যায় এবং পথে কামিনীকে রমাকান্তবাবুর স্ত্রৈণতার কথা বলে। "মাগকে স্বর্গে তুলে মাকে বাঁদীর মতন রেখে আপনি আপনার নরকের পথ পরিষ্কার কোরেছেন !" কামিনী অসহায়া রমাকান্তের মার কথা ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং তাঁকে দেখ্‌তে চলে।

রমাকান্তর মা যামিনী নীচের ঘরে একা থাকেন আর কাঁদেন। কামিনী এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি ছেলের দুর্মতির কথা বলেন আর কাঁদেন। "যে ছেলেকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেচি, অসহ্য প্রসববেদন সহ্য করেছি, শরীরের শোণিত রূপ স্তন্য দিয়ে পুষ্টিসাধন কোরেছি ; যার হাসি দেখ্‌লে আমার হর্ষের পরিসীমা থাকতো না,…মানুষ করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছি সেই পুত্র আমাকে এই দুঃখ দিতেছে। আমার বাঁচতে আর ইচ্ছা নেই।" রমাকান্তর স্ত্রী সুখদা ছুটে এসে বলে,—"হ্যালা কামিনী ! ও মাগী তোরে কি বোল্‌ছিল ?" কামিনী বলে,—"দুটো দুঃখের কথা বলিতেছিল। তোমার স্বামীর যে কত গুণ তাহা আর বলিতে হবে না। এদিকে লোকের নিকট বলে যে ব্রহ্মজ্ঞানী, এ কোন ব্রহ্মজ্ঞান যে গর্ভধারিণীকে কষ্ট দেয়। এর ফল একদিন ভোগ করতে হবে। এই যে বুড়ো মাগীকে এত কষ্ট দিস্, আর ওঁর চোখ দিয়ে টশ্ টশ্ কোরে জল পোড়চে, মনে কোরেছ এর কি আর ফল ফল্‌বে না ?…পরে দেখো এর ফল ফল্‌বেই। আমরা তো ওঁর তাহার কোন দোষ দেখি না। তোমাদের নিন্দার ভয় নেই তাই লোকালয়ে মুখ দেখাচ্ছ। লোকালয়ে তোমাদের দুর্নামের কি পরিসীমা আছে।" সুখদা

এতে চটে যায়। বলে,—"তোমাকে তো সালিশ করতে ডাকা হয় নি। তুমি বাড়ী বয়ে ঝগ্‌ড়া করতে এসেছ কেন?" ইতিমধ্যে বাড়ীতে রমাকান্ত আসবার খবর পেয়ে সুখদা চলে যায়।

রমাকান্ত ঝোঁকের মাথায় স্ত্রীর পক্ষ নিয়েছে বটে, কিন্তু এতে যে তার সুনাম হয়নি, এটা সে জেনেছে। বিশেষ করে সমাজের ন্যায়নিষ্ঠ নিষ্কলুষ চরিত্রের লোক কানাইবাবু জানলে রমাকান্তর খুব লজ্জা হবে। হরিহরবাবু বলেন, কানাইবাবু সম্ভবতঃ রমাকান্তর ব্যাপার টের পেয়েছেন। ইতিমধ্যে ভৃত্য মধু এসে বলে যে কানাইবাবু আস্‌চেন। রমাকান্ত আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। হরিহরবাবু বলেন, কানাইবাবু এলেই কিছু উপদেশ দেন। কানাইবাবু এলে এরা তাঁর শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করলে কানাইবাবু বলেন, তাঁর মনটা বড়ো অসুস্থ। "আজকালের নব্য ভায়াদের ব্যবহার দেখে মনের ভিতর যে কি কোচ্চে, তা আর বোলে জানাতে পার্চ্চি নে; তাঁদের অত্যাচার এম্নি প্রবল হোয়েচে, যে সর্ব্বসহিষ্ণু বসুমাতা পর্য্যন্ত টল্‌মল্‌ কোচ্চেন্‌। মনে করেচি তাদের বাড়ীতে গিয়ে উপদেশ দেব। এখনকার উপদেশ ভস্মে ঘি ঢালা,—তবে চেষ্টার কসুর করবো না। কিঞ্চিৎ যদি মন ফেরাতে পারি, তাহলেও মঙ্গল বল্‌তে হবে! এ কি অল্প অত্যাচার?" এই বলে কানাইবাবু একখানা কাগজ বের করে একটা পদ্য পড়ে শোনান। নব্যদের ভণ্ডামি এবং অত্যাচার অনাচারের বর্ণনা কবিতাটির মধ্যে রয়েছে।—

"কি কাল এ পড়িয়াছে বলিহারি যাই।
কুত্রাপি এ রূপ ভাই! আর দেখি নাই॥
বিবিধ বেশেতে নর ফেরে সর্ব্বদায়।
বুঝিতে তাদের ভাব দেখি বড় দায়॥"

কবিতাটির নাম "এই এক রকম!" রমাকান্ত বলে,—"বলিতে আপনি আর কিছু বাকি রাখেন নি। কতক লোকে এখন যে রকম করে বেড়াচ্চে, সে সকলই ঠিক বলেছে।" কানাইবাবু বলেন,—"এ লেখা লেখকের পণ্ডশ্রম হয়েছে। এই লেখা কান পেতে শুন্‌বে না, শুন্‌লেও পরিত্যাগ করবে না। যাহারা দোষ নিবারণ করতে বলে, তাহারাই এই সকল কাজ করে। তাহারা ভিতরে ভিতরে সকল কুকার্য্যই করে থাকেন, কিন্তু মনে করেন বাইরের কেহই জান্‌তে পারছে না। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই, ইহা আমাকে এবং তোমাকে

ও রমাকান্তবাবুকে, ও আর হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই বলিতেছি, যাহাতে তোমাদের হিন্দু নাম বজায় থাকে, দেশাচার সংশোধিত হয়, আর স্ত্রীবাধ্য ব্যক্তিরা জননীকে কষ্ট না দিয়া থাকে সে সকল বিষয়েরই যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।" রমাকান্ত এবং হরিহর দুজনেই একথায় সায় দেয়। কানাইবাবু তখন বলেন,—"তবে চলো, আমরা 'এই এক রকম' নিয়ে জনসমাজে ভ্রমণ করে বেড়াই। যাহাতে আমাদের আপন আপন দোষ সংশোধিত হয় সে বিষয়ে আগে যত্নশীল হই।"

ভ্যালা রে মোর বাপ! (কলিকাতা—১৮৭৬ খৃঃ)—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়॥ মলাট পৃষ্ঠায় কবিতাকারে মন্তব্য আছে,—

"বনিতার বশে দেয় জননীকে দুখ।
তার চেয়ে কিবা আর আছে হত মুখ॥"

প্রথম উদ্যমে নটীকে নট বলেছে,—"প্রিয়ে! এ বিষয়ে যে অনেকেই জননীকে অসীম কষ্ট প্রদান করেন, সেটী ত সহজ ব্যাপার নয়, আর এ দোষটী এখন কেমন প্রবল হয়ে উঠেছে তা ত দেখ্‌তে পাচ্চ। স্ত্রীবাধ্য বশতঃ লোকে যে সকল লোকালয়ের ঘৃণিত কদর্য্য কার্য্য করেন, আমরা তাহাই গীতাভিনয়চ্ছলে প্রকাশ করবো।" অবশ্য স্পষ্ট বক্তব্যে প্রহসনকারের সঙ্কোচও প্রকাশ পেয়েছে। নটী বলেছে,—

"তুমি দেশ সংশোধনে, কোরেছ বাসনা মনে,
ছলগ্রাহী জনগণে, ভ্রমে ছল অন্বেষণে।
বিশেষতঃ কালদোষে, অনেকে রত এ দোষে,
নিন্দিলে নিন্দিবে রোষে, নিন্দুকেতে অকারণে॥"

অবশ্য বক্তব্যকালে প্রহসনকার এই সঙ্কোচ থেকে দূরেই অবস্থান করেছেন।

কাহিনী।—কলির কাপ অত্যন্ত স্ত্রীপরায়ণ। স্ত্রী বিজয়কালী কলির কাপকে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করায়। স্ত্রীভক্ত কলির কাপ মার অযত্ন করে। স্ত্রীর জন্যে ঘন ঘন গয়না শাড়ি ইত্যাদি আসে, কিন্তু মার জন্যে ছেঁড়া নেকড়াও জোটে না। একদিন বিজয়কালীকে কলির কাপের মা রাধামণি কাপড়ের কথা জানায়, কারণ সে জানে বিজয়কালীই আসল মালিক। রাধামণি বলে,—"বৌমা! বাবাকে কাপড় কিনে দিতে বল মা! হাড়ী বাগ্‌দীর মতন লোকের কাছে এ কাপড়ে বেরুতে লজ্জা করে মা।" বিজয়কালী

বলে,—"কেমন করে বল্‌বো ? সেদিন তোমাকে এক যোড়া কাপড় কিনে দিলে, এখন বচর ফিরে নি। ঘরে আর ত তাঁত বসান নাই, যে বোল্‌লেই অমনি কাপড় দেবে।" শাশুড়ীকে "ঢ্যশ্‌নো" বলে গালি দেয়। রাধামণি বলে, এর মধ্যেই তো বিজয়কালীর ৫/৬ জোড়া কাপড এনে দিয়েছে। যথাসম্ভব বিনীতভাবেই রাধামণি কথাটা বলে। বিজয়কালী চটে যায়। বলে,—"মর মাগি! আমাতে আর তোতে সমান!" প্রতিবেশিনী সিতুর মাকে শুনিয়ে বিজয়কালী বলে,—"ঠান্‌দিদি! আবাগী আমার হিংসাতেই মলেন। শাশুড়ী ত নয় যেন আমার সতীন।" সিতুর মার সাম্‌নেই শাশুড়ীকে খাওয়ার কথা তুলে খোঁটা দেয়। সিতুর মা মনে মনে এতে চটে গেলেও মুখে কিছু বলে না।

বিজয়কালী স্বামীর ওপর নিজের প্রতিপত্তির কথা সিতুর মাকে জানায়। একরাত্তে নাকি সে তার স্বামীকে মোদো-চাকর সাজিয়ে তাকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে খেয়েছে। গর্ব করে বিজয়কালী বলে, এখন তার স্বামী আড্ডা দেওয়া বন্ধ করেছে। "দিনকতক কতকগুলো কুসঙ্গী যুটে খারাপ কোরে তোলবার উজ্জুগ কোরেছিল। আমার কাছে কি সে পাট হবার যো আছে? দুদিন চোক রাঙ্গাতেই কোথায় বা জটলা, কোথায় বা গাওনা বাজ্‌না, কোথায় বা পান-তামাকের শ্রাদ্ধ, এককালে বৈঠকখানায় বসাই বন্দ কোরে দিলেম।" সিতুর মা বলে, লোকে একটা কথা বলে—"মেগের কাছে ভাতার ভাড়া।" তার ছেলে সিতুর কাছে একটা ভাড়ার পোষাক আছে, তাই দিয়ে সে খেলা করে। সেইটা যদি বিজয়কালী তার স্বামী কলির কাপকে পরাতে পারে, তবে বোঝা যাবে সে সত্যিই কেমন মাগ! বিজয়কালী মোদো-চাকরকে দিয়ে সিতুর মার বাড়ী থেকে ভ্যাডার পোষাক আনিয়ে রাখে। আজই সে কলির কাপকে তা পরাবে।

কলির কাপ বিজয়কালীর জন্যে সন্দেশ কিনে এনেছিলো। নিজে স্ত্রীর কাছে সেগুলো না দিয়ে চাকরকে দিয়ে পাঠায়। মোদো এসব বাডাবাড়িতে অসন্তুষ্ট। সে নির্বিকারভাবে সন্দেশ খেতে খেতে বিজয়কালীর কাছে এসে পৌঁছোয় এবং সন্দেশ দেয়। এঁটো বলে বিজয়কালী মোদোকে ধমক দিয়ে ওগুলো একপাশে সরিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে কলির কাপ এসে বলে,—"আজ ময়রা ব্যাটা না বোলে সন্দেশ রেখে গেছলো, একটু কাম্‌ড়ে আর গলাতে উল্লো না।" তাই নাকি সে বিজয়কালীর জন্যে এনেছে। তাকে না দিয়ে সে কি করে খায়! বিজয়কালী মোদোর এঁটো করে দেবার কথা বলে।

মোদোকে তখন কলির কাপ গালাগালি করে। মোদো নাপিতের ছেলে। বুদ্ধি যথেষ্ট। প্রতিশোধ নেবার জন্য বলে,—“মশায়! অনর্থক রাগ কচ্চেন, আপনি গোলাপ বিবিকে যে এক ওড়া সন্দেশ দিলেন, তাঁকে সন্দেশ দিতে, তিনি আমাকে চাট্টে সন্দেশ দিয়েছিলেন, তারই একটা খেয়েচি।” কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আসলে কলির কাপ যে স্ত্রী ছেড়ে বেশ্যাভক্ত, এ কথাটা বিজয়কালীর মনে যাতে বদ্ধমূল হয়, সে জন্যেই সে একথা বলে। বিজয়কালী রাগের ভান দেখিয়ে বলে, সে বাপের বাড়ী যাবে, কলির কাপ তার গোলাপকে নিয়ে থাকুক। কলির কাপ বিজয়কালীর মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটা তার নামে লেখাপড়া করে দেয়। এবার থেকে বিজয়কালীর কাছেই সব টাকা থাকবে—তার কাছ থেকেই হাত খরচ নেবে। রাধামণি বিজয়কালীর কাছে ব্যর্থ হয়ে সুবিচার পাবার আশায় কলির কাপের কাছে কাপড়ের কথা বলে,—“ন্যাকড়া গুচিয়ে আর লোকের সাক্ষাতে বেরুতে পারি নে।” বৌমা তাকে “হাড়ির তেরস্কার” করেছে—সে কথাও সে বলে। বিজয়কালী শুনে ছুটে এসে গালাগালি দেয়, বলে,—“তোমার তরে লোকালয়ে আমাদের মানসম্ভ্রম সকলি গ্যাচে।” রাধামণি যে বিজয়কালীকে ঈর্ষা করে, সে কথাও বিজয়কালী স্বামীকে জানায়। কলির কাপ মোদোকে না পেয়ে মাকে দিয়ে তামাক সাজায়। বিজয়কালী রাধামণিকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে স্বামীকে বলে। রাধামণি পুত্রের মুখে চাইলে কলির কাপ বলে ওঠে, এ বাড়ীতে এখন তার আর স্বত্ব নেই। মোদো রাধামণিকে শ্রদ্ধা করতো। সে তাকে নিয়ে তার মেয়ে অর্থাৎ কলির কাপের ভগ্নী নবীনকালীর বাড়ীতে রেখে আসে।

মোদো নবীনকালীর বাড়ীতে গিয়ে সব কথা খুলে বলে, এমন কি আজ কলির কাপকে তার স্ত্রী যে ভ্যাড়া সাজাবে, সেই খবরটাও দিয়ে আসে। সে জানতো, কেন না সে-ই সিতুর মার বাড়ী থেকে পোষাকটা নিয়ে এসেছে। নবীনের স্বামী বরেন্দ্র, স্ত্রী শাশুড়ী ইত্যাদি সকলকে নিয়ে মজা দেখবার জন্যে কলির কাপের বাড়ীতে গিয়ে আড়ালে অপেক্ষা করে। সিতুর মাও তৎপর হয়। সিতুর মাকে কলির কাপ খুব বিশ্বাস করে। বেশ্যালয়ে বেশ্যাদের সাজসজ্জা দেখে বাড়ীতে এসে সে নাকি স্ত্রীকে তেমন করে সাজায়—একথা সে অসঙ্কোচে বলে। এমন কি ফিরোজাবাঈকে বেয়ারা যেভাবে তামাক সেজে খাওয়ায়, সেটা দেখে এসে সে যে বেয়ারা সেজে বিজয়কালীকে

তামাক খাইয়েছে, এ কথাও সে বিশ্বাস করে বলে ফেলে। সিতুর মাকে স্ত্রীভক্তির প্রমাণ দেখাবার জন্যে কলির কাপ নিজে তক্ষুণি বেয়ারা সেজে তামাক সেজে বিজয়কালীকে আবার খাওয়ালো। বাঈজীর পোষাক পরে বিজয়কালী স্বামীর সঙ্গে বেয়ারার মতোই ব্যবহার করে। উৎসাহিত হয়ে কলির কাপ মোদোকে দিয়ে পাতকুয়ো থেকে জল আনিয়ে তাতে বিজয়কালীর পা ডুবিয়ে সেই জল পান করে বলে,—"আমি যদি মেগের চন্নামেত্ত না খাব তবে আর কে খাবে ?" এ দৃশ্যও আড়াল থেকে বরেন্দ্ররা দেখে বেশ মজা পায়।

এবার কলির কাপকে বিজয়কালী ভ্যাড়ার পোষাক পরায়। কলির কাপকে ভ্যাড়া বলেই অনেকটা মনে হয়। এমন সময় বরেন্দ্র তার দলবল নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢোকে। বিজয়কালীকে বাঈজীর সাজে দেখে তাকে ঠাট্টা করে। ভ্যাড়াটাকে দেখে বরেন্দ্র তাকে নিয়ে নাডাচাড়া করে, কিন্তু ভ্যাড়া নড়ে না। মোদো বরেন্দ্রকে বলে, কান মোল্‌লে ভ্যাড়া ঢুঁ মারে। একজনকে এই সময়ে তাল দিতে হয়। বরেন্দ্র তাল দেয়। অসন্তুষ্ট মোদো মনের ঝাল মিটিয়ে মনিবের কান মলে দেয়। বাধ্য হয়ে কলির কাপ সব সহ্য করে। নবীনকালী এসে ভ্যাড়ার পোষাক টান মেরে খুলে দেয়। কলির কাপকে এভাবে দেখে সবাই মিলে তাকে ধিক্কার দেয়, গলায় দড়ি দিতে বলে। রাধামণি বলে,— "তুমি কলির ছেলে তোমার দোষ কি ? কালের মতনই কর্ম্ম কোরেছ।…… ভ্যালারে মোর বাপ্ !"

একই বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা আরও কয়েকটি প্রহসনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। নীচে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো।—

ছেলের কি এই গুণ, স্ত্রীর জন্য মাকে খুন (১৮৭৬ খৃঃ)—কাশীনাথ বর্মা॥ একটি যুবক এক সময় স্ত্রীর বিশ্বস্ততায় সন্দিগ্ধ হয়। সে তার মাকে গালাগালি দিয়ে বলে, তিনি নাকি স্ত্রীকে দেখে রাখ্‌তে পারেন না। অন্য পুরুষ মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও তিনি বন্ধ করতে পারেন না। রাগে এবং ঘৃণায় মা এই অভিযোগ তীব্রভাবে অস্বীকার করেন। বলেন, স্ত্রীর প্রতি তার বিশ্বাসহীনতার কোনো কারণ নেই। এতে যুবকটি অত্যন্ত চটে যায়। সে মাকে এমনভাবে মারে যে মা তক্ষুণি মারা যায়। আপাতদৃষ্টিতে প্রহসনটি অন্য গোত্রীয় বলে বোধ হলেও এর মধ্যে দিয়ে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট।

পিরীতের বাঁদর নাচ (১৮৮৬ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত (ননীগোপাল

মুখোপাধ্যায় ?) ॥ একজন স্ত্রৈণ ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর কথায় তার অসুস্থ মাকে অবহেলা করতো, খোঁজখবর নিতো না। কিন্তু অন্যদিকে স্ত্রীর মন যোগাবার জন্যে তার চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। একদিন সে তার স্ত্রী ও বন্ধুদের আমোদ দেবার জন্যে বানরের সাজে সজ্জিত হয়ে নাচতে আরম্ভ করে।

অবলা কি প্রবলা ? (১৮৮৯ খৃঃ)—বিপিনবিহারী দে ॥ একটি স্ত্রীসর্বস্ব ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্ররোচনায় মাতাপিতাকে কষ্ট দিতো। শেষে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এবং বিশেষ করে পুত্রের কৃতঘ্নতা দর্শনে হতাশ হযে তাঁরা আত্মহত্যা করেন। পরিণামে স্ত্রীই তাঁদের হত্যার জন্যে অভিযুক্ত হয়।

কলির বৌ (১৮৯৫ খৃঃ)—আজিজ আমেদ ॥ বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনের কাহিনী। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্ররোচনায় বাবা-মাকে খুব যন্ত্রণা দিতো। অবশেষে একদিন সে তাঁদের বাড়ী থেকে তাড়িয়েই দেয়। কিন্তু একদিন দেখা যায়, সেই স্ত্রীই তার উপপতির সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। এতে তার স্বামী দুঃখে হতাশায় সন্ন্যাস নেয়। কুলত্যাগী স্ত্রীটি শেষে পথের অনাথা কুষ্ঠরোগী হিসেবে স্বামীর সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ! মুসলমান হলেও প্রহসনকার গোঁড়া এবং রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষ নিযে লিখেছেন।

(খ) সমস্যার বীজ—পুত্রবধূ ॥—

হাড়জ্বালানী প্রহসন (কলিকাতা—১৮৬৪ খৃঃ)—গোলাম হোসেন ॥ “হুগলী জেলার বন্দীপুর নিবাসী শ্রীসেখ জমিরদ্দীর আদেশ অনুসারে।” প্রহসনটির আরম্ভে প্রহসনকার তাঁর উদ্দেশ্য জানিয়েছেন একটি গানে (রাগিনী নূতন বউ। তাল ভিন্ন হাঁড়ি)। গানটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

“বউ অভাগী ভালখাকি
ভিন্ন খাবার একখানি।
আপ্নি হয়ে বড় গিন্নি
শাশুড়ী বুড়ীর হাড় জ্বালানী ॥
বিয়ের পূর্ব্বে কলির ছুঁড়ি
শিক্ষা করে ভিন্ন হাঁড়ি।
বিয়ে হলে, পতি গেলে,
সিতা করে কান ভাঙ্গানি।

শাশুড়ী সেবা না করিব,
ভিন্ন হাঁড়ি করে খাব,
মায়ের বাড়ী গিয়া রব,
সদা ভাবে বউ পাপিনী ॥”

পরিণাম প্রদর্শন করে প্রহসনকার উপদেশ দিয়েছেন,—

“কলিকালে এমন পুত্রেতে কিবা কায।
মাকে বাহির করে দেয় নাহি তাতে লাজ ॥
তাই বলি মাগ নিয়ে থাকে যেই জন।
মাতা পিতা বলি তার না করে সেবন ॥
একান্ত হইবে তার নরকেতে বাস।
তাই বলি মা বাপে না কর উপহাস ॥”

প্রহসনকার পুত্র এবং পুত্রবধূ উভয়কেই সমস্যার জন্যে দায়ী করেছেন।—

“সমাপ্ত হইল এই র-সর কাহিনী।
তাই বলি কলির বউ বড় হাড় জ্বালানী ॥”

কাহিনী—হাড়জ্বালানী কলির বউ কাজ করে না, চুপ করে বসে থাকে। অথচ বাসি কাজ অনেক জমা হয়ে আছে। শাশুড়ী সেটা মৃদুভাবে জানালে কর্কশভাবে বউ জবাব দেয়, শাশুড়ীর গিন্নীপনা তার কাছে অসহ্য। ক্ষুব্ধ শাশুড়ী বলেন, তাঁর আয়ু বেশিদিন নেই ; বউয়ের সংসার বউই বুঝে নিক। শাশুড়ীর মরণের কথায় বউ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মরণ কামনা মুখে প্রকাশ করে। শাশুড়ীকে বলে,—“আমি স্পষ্ট বলি শুন, আমি বাবু তোমাকে আর ভাতে রাখতে পারবো না, তুমি আপনার দেখে শুনে খাও গে।” পুত্রবধূর কথায় শাশুড়ী মর্মাহত হন। বলেন,—বুড়ো বয়সে তিনি কোথায় এখন ভিক্ষে মেগে খেতে যাবেন! বউ জবাব দেয়,—“ভিক্ষা মেগে খাবে কি কাটনা কেটে খাবে তা আমি কি জানি, কিন্তু আমার কাছে হবে না।” শাশুড়ী স্থির করেন, বিদেশে ছেলে আছে, তার কাছে চিঠি দেবেন। সে সেখানে চাকরি করে। শাশুড়ীর সঙ্কল্প পুত্রবধূর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে সে বলে,—“তুমি একখানি পত্র পাঠাবে, আমি পাঁচখান পাঠাব।”

সত্যিই শেষে শাশুড়ী ছেলেকে একটা চিঠি লেখেন,—“অন্নত্যাগী করেছেন বৌটি আমার। তুমি ঘরে এলে পরে হইবে বিচার ॥”

তারপর দেখা যায় শাশুড়ী বিতাড়িতা। এই সময়ে বাপের বাড়ী থেকে বৌয়ের আসল মা এলেন। মেয়ের কাছে বেয়ানের খোঁজ নিতে গিয়ে জান্‌তে পারলেন যে শাশুড়ীকে মেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি কন্যার কাজকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সমর্থন করলেন। বেয়ানের দোষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,—"তা বটে মা যথার্থ বটে, সমস্ত দিন বসে থাকে আর খেতে কেমন বাপ্‌রে বাপ বেড়াল ডিঙ্গতে পারে না!" কথা প্রসঙ্গে ছেলের কাছে বেয়ানের চিঠি লেখবার কথাও প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মাও জামাইকে চিঠি লিখ্‌তে বসেন কাগজ কলম নিয়ে।—

"আমার মেয়ের সঙ্গে ঝক্‌ড়া করিয়ে।
রয়েছে তোমার মাতা অন্য বাড়ী গিয়ে॥
ত্বরায় আসিয়ে বাড়ী করিবে বিহিত।
শাসন করিবে তাকে যে হয় উচিত॥"

ওদিকে দুটো চিঠিই একই সঙ্গে ছেলের হাতে এসে পৌঁছোয়। পত্রবাহক রাখালের কাছ থেকে সে জান্‌তে পারে, চিঠি দুটোর একটি তার শাশুড়ীর এবং অন্যটি তার নিজের মায়ের লেখা। রাখালকে সে বলে,—"শাশুড়ী কোনখানা লিখেছে সেইখানা দে"—এই বলে সে শাশুড়ীর চিঠিটাই শুধুমাত্র পড়ে। মার চিঠিটা সে না পড়েই ফেলে দেয়।

গিন্নীর জন্যে সে কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে দেশে ফেরে। তারপর গিন্নীর মান ভঞ্জনের পালা। ছেলে যতোই কাতর হয়, বৌ ততোই বাপের বাড়ী যাবার ভয় দেখায়। শেষে শাশুড়ীর নিন্দা সুরু হয়। ছেলেকে বৌ বলে, শাশুড়ী এসে কান্নাকাটি করলে ছেলের মন যেন আবার গলে না যায়! ছেলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

ইতিমধ্যে গৃহহীনা বুড়ীকে প্রতিবাসিনীরা জানায় যে তাঁর ছেলে ঘরে ফিরেছে। তিনি ধীরে ধীরে মনে মনে আশীর্বাদ করতে করতে নিজের বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। শাশুড়ীকে দেখেই বউ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। সে তখন তার স্বামীকে ডেকে বুড়ীকে দেখিয়ে দেয়। ছেলে তার মাকে হাত ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেয়। মর্মাহতা বৃদ্ধা পুত্রের শৈশবকালের কথাগুলো চিন্তা করতে করতে চোখের জল ফেলেন। ভাবেন, ছেলের জন্যে যখন প্রাণান্ত শ্রম করেছেন, তখন তার বউ কোথায় ছিলো!

প্রতিবাসীরা সবাই ছেলেকে গালাগালি দেয়। ছেলে তখন বৌয়ের দোহাই দেয়। উপদেশ নিরর্থক ভেবে প্রতিবাসীরা ফিরে যায়। প্রতিবাসিনীরা বুড়ীকে বলে, তারাই তাঁকে দেখবে। অন্তত দু বেলার ভাত তারাই জুটিয়ে দেবে। প্রতিবাসিনীরা বউকে গিয়ে বোঝায়, শাশুড়ীর ভিক্ষাবৃত্তি বধূর পক্ষে সম্মানজনক নয়। বউ বলে,—"দূর হগ্‌গে আমার হাতে কর্ম্ম আছে কে দেখতে যায়।" স্বামীকে সে দরজা বন্ধ করে দিতে আদেশ দেয়।

কালের বৌ (কলিকাতা—১৮৮০ খৃঃ)—হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ বধূর প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের আত্যন্তিকতা এখানে প্রহসনকার ব্যক্তিগত দোষারোপের সঙ্গেই চিত্রিত করেছেন। যৌগ্মিকক্ষেত্রে বিরোধ উপস্থাপন করে প্রহসনকার প্রকারান্তরে পারিবারিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল স্বার্থের দিকই চিন্তা করেছেন। পুরুষের সাংস্কৃতিক পরাজয়ের চিত্র সাংস্কৃতিক সংঘাতে সতর্কতারই ইঙ্গিতমাত্র।

কাহিনী।—পুলিনবাবুর স্ত্রী মাতঙ্গিনী কালের বৌ। একদিন সে আলুথালু বেশে এসে পুলি বাবুকে মারতে যায়। পুলিন বলে, মাতঙ্গিনীর তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে বাড়ীর ভেতর করুক। কিন্তু মাতঙ্গিনী বাইরে এসে কেন তাকে অপদস্থ করে! মাতঙ্গিনীর ভয়ে রোজ সভার মাঝে পালিয়ে এসেও রক্ষা নাই। এ সব কথা বাইরে প্রকাশ পেলে লোকে যে পুলিনের মুখে চূণকালি দেবে। পুলিনের কথার জবাবে মাতঙ্গিনী বলে, তার লজ্জা সরমের ভয় নেই। পুলিন বলে, সমস্তদিন পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে দু-একঘণ্টা আমোদ-প্রমোদ না করলে মানুষ কি করে বাঁচবে? তার তো বাড়ী ফিরতে কোনোদিনই রাত দশটার বেশি হয় না। আর, তার আসবার সময় হলেও মাতঙ্গিনী ইচ্ছে করে শুয়ে থাকে ঘুমের ভান করে। এ সব অত্যাচারে শরীর বা মন কিছুই ভালো থাকে না। মাতঙ্গিনী পুলিনকে "পোড়ার মুখো" ইত্যাদি বলে গাল দিয়ে বলে, সে এবার থেকে আর পুলিনের জন্যে খাবার রাখতে পারবে না। এতে তার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাচ্ছে। পুলিন জবাবে বলে, এটা তার নিজের দোষ। কতোদিন মাতঙ্গিনী শুধু শুধু পৌষ মাসের ঠাণ্ডায় পুলিনকে জলে স্নান করিয়ে তারপরে ঘরে তুলেছে অহেতুক খেয়ালে। পুলিনকে কষ্ট দিতে পারলেই কি তার সুখ হয়! এই কি তার পাতিব্রত্য! মাতঙ্গিনী পুলিনের বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করতে দেয় নি। এ সব কথায় চটে গিয়ে মাতঙ্গিনী আবার পুলিনকে মারতে যায়। মাতঙ্গিনী পুলিনকে বলে, সে তার শালি-শালাজ নয় যে তার সঙ্গে তামাসা করবে।

রাত ত্নপুরে কষ্ট দিয়েও তো সে পুলিনকে সোজা করতে পারলো না।—এই বলে মাতঙ্গিনী চলে যায়। পুলিন মন্তব্য করে,—"আমাদের ঘরে বাইরে সুখ নাই। বাইরে রাজকর্ম্মচারিগণের দাসত্ব, বাড়িতে স্ত্রীর দাস হয়ে কালযাপন করিতে হচ্চে।" মাইনে পেয়েই স্ত্রীকে বস্ত্র অলঙ্কার দিয়েও সে রেহাই পায় না। তা ছাড়া তার আঁচড়ানি কামড়ানির জ্বালা তো আছেই। তার আজ ভাগ্য ভালো যে মাতঙ্গিনী তাকে আজ সভার মধ্যে মারে নি।

এমন সময় পুলিনের এক বন্ধু আসে। বন্ধুর কাছে পুলিন সব ত্নঃখের কথা খুলে বলে। পুলিন বলে, কলকাতার গঙ্গার ত্নই ধারের মেয়েগুলো বড়ো খারাপ হয় বলে সে রাঢ় দেশে বিয়ে করেছে, কিন্তু তার এমনই অদৃষ্ট যে কয়েকদিন পরেই গিন্নী উগ্রচণ্ডী মূর্তি ধারণ করেছে। বন্ধু তাকে বলে, সে তার স্ত্রীকে কিছু বলে না বলেই স্ত্রী মাথায় চড়ে বসেছে। ত্নই বন্ধুতে সুখ ত্নঃখের কথা হচ্ছে, এমন সময় মাতঙ্গিনী এসে পুলিনের বন্ধুকে তার পরোপকারের জন্যে গালাগালি দেয়।

কামিনীর মা বাড়ীর ঝি। মাতঙ্গিনী তাকে প্রায়ই যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়ে থাকে। ঝি প্রতিবাদ করতে গেলে মাতঙ্গিনী ঝিকেই উল্টে দোষ দেয়—সে নাকি মুখনাড়া দিচ্ছে—সকালবেলা গালাগালি খাবার জন্যে। কামিনীর মা মনে মনে মন্তব্য করে,—"ধন্নি মেয়ে তাই এমন পুরুষকে বশ করে রেখেচ।" এতেও মাতঙ্গিনীর সন্দেহ। বিড়বিড় করে সে কি বল্‌ছে, সেটা জানবার জন্যে মাতঙ্গিনী চাপ দেয়। এমন সময় পুলিন এসে মাতঙ্গিনীকে বলে, সে কেন বুড়ী ঝিয়ের সঙ্গে লেগেছে? কামিনীর মার যদি কোথাও স্থান থাকতো, তবে কবে মাতঙ্গিনীর জ্বালায় চলে যেতো। মাতঙ্গিনী এতে পুলিনের ওপর রেগে যায়। হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে চেঁচামেচি করতে করতে মাতঙ্গিনী চারদিকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে চলে যায়। কামিনীর মা ভয়ে চলে যায়।

পুলিনের বন্ধু পুলিনকে বলে, আগে সে এই সব ঘটনা শুনে বিশ্বাস করতো না। পুলিন বলে, আজ সে যা দেখ্‌লো, এতো কিছুই নয়। বাড়ীর ভেতর মাতঙ্গিনী পুলিনের যে অবস্থা করেছে, সে আরও শোচনীয়। কতো পাপ করে এই "বঙ্গভূমি"তে জন্ম হয়েছে। আমাদের 'বঙ্গমাতা' 'লণ্ডনেশ্বরীর দাসী' হয়েছে। মহতের আশ্রয় নেওয়া ভালো। কিন্তু ত্নঃখের বিষয় আমরা সব দাসীপুত্র। 'ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্ররা' বলেন যে তাঁরা নাকি আমাদের "দাসীপুত্রের" মতো ব্যবহার করেন না। কিন্তু এটা মিথ্যে। কেন না যাঁরা রীতিমতো

পরীক্ষা দিয়ে সিভিল সার্ভিসে ঢুকেছেন, তাঁরা উঁচু পদ পান না। এঁরা মনে করেন, উঁচু পদ দিলে ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্রদের দাসীপুত্রের অধীনে থাক্‌তে হবে। ওদিকের অবস্থা তো এমন, আবার এদিকে আমরা শতমুখীর ত্রাসে স্বাধীন হতে পারি নে। বন্ধু মন্তব্য করে, স্বদেশে রাজা পুজো পায়, আর শতমুখী পুজো পায় সর্বত্র। কেন না পুলিন বিদ্বান, অনেক টাকাও রোজগার করে সে, তবুও সে শতমুখীর দাসত্ব স্বীকার করেছে। স্ত্রীলোক হচ্ছে মোমের মতন। তাকে ছোটো বেলা থেকে যেভাবে গড়া যাবে, সেভাবে গড়ে উঠবে। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রানী শৈব্যা নিজেকে বিক্রী করে নিজের স্বামীকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একালের শৈব্যা স্বামীকে পীড়ন করতে কিংবা স্বামীর ওপর কর্তৃত্ব করতে পারলেই নিজেকে ধন্য মনে করে। এরা ভাবে না যে স্বামী ইচ্ছে করলেই স্ত্রীকে "গোয়াল কুড়ানী" করতে পারে আবার ইচ্ছে করলে রাজরানীও করতে পারে।

বন্ধুদের সুখ দুঃখের কথা শেষ হয় না। মাতঙ্গিনী শতমুখী হাতে করে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে আসে। সে গালাগালি দিয়ে বলে,—"আমি মনে করেছিলুম যে সভার মধ্যে আর খেংরা হাতে কর্বো না কিন্তু তোরা আমাকে খেংরা না ধরিয়ে ছাড়লি নি। আজ দুজনারি বিষ ঝাড়বো। তোরা যে বিড় বিড় করে যে খে'রার প্রসঙ্গ কচ্চিস তার ফল আজ এখনি দেখাব।" এই বলে সে দুজনকেই ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে। তাড়া খেয়ে দুজনেই পালায়।

একই বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা আরও কয়েকটি প্রহসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রহসনগুলো উপস্থাপন করা হলো।

কলির বৌ হাড় জ্বালানি (১৮৭৫ খৃঃ)—হরিহর নন্দী॥ আজকাল পুত্রবধূদের স্বভাব এবং মেজাজ যে পারিবারিক অশান্তি এবং ভাঙনের সূত্রপাত করে—এই মত প্রহসনটির মধ্যে দিয়ে প্রচার করা হয়েছে।

ননদ ভাইবো'র ঝগড়া (১৮৮০ খৃঃ)—হরিহর নন্দী॥ বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা বৃদ্ধের প্রশ্রয়ে অত্যন্ত মুখরা। সে তার বিধবা ননদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। প্রতিবাদ করতে গেলে সে ঝগড়া ও গালাগালি করে। প্রহসন শেষে লেখক অবশ্য বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা গ্রহণের দোষকেই ইঙ্গিত করেছেন।

মায়ের আদুরে মেয়ে (১৮৮৩ খৃঃ)—অঘোরচন্দ্র ঘোষ॥ হিন্দুসমাজের পুত্রবধূরা তাদের ননদের কাছ থেকে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার পেয়ে থাকে।

ননদের মা অর্থাৎ শাশুড়ীর প্রশ্রয়েই তারা এমন যন্ত্রণা পায়। ননদ এবং শাশুড়ী দুজনেই বধূর উপর আক্রোশ এবং হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। (এটি প্রথম খণ্ড। এতে শেষ পরিণতি দেখানো হয় নি। তবে এর মধ্যে দিয়ে স্ত্রীসমাজের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।)

বৌ-বাবু (১৮৮৩ খৃঃ)—গোসাইদাস গুপ্ত॥ এক বাঙালী ভদ্রলোক একবার দূরে বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি তাঁর সংসারের ভার এবং তাঁর বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষার ভার তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীর হাতে দিয়ে যান। স্বামীর অনুপস্থিতিতে ভদ্রলোকের স্ত্রী নিজের ও শ্বশুর শাশুড়ীর খরচ কমাবার জন্যে, খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে এঁদের দিয়ে যথেচ্ছভাবে খাটিয়ে নিতো। বুড়ো বয়সে বেশি পরিশ্রমে তাঁদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। এখানেও প্রহসনকার অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গ্রহণের যে দোষ—তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরাই সাধারণতঃ সংসারে দুর্দশা আনে।

কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি (১৮৮৪ খৃঃ)—হরিহর নন্দী॥ বাবা মারা যাবার পর দুই ভাই একই সঙ্গে ছিলো। ক্রমে দুজনেই বিবাহিত হলো। বড়ো ভাইয়ের স্বার্থপর স্ত্রী বড়ো ভাইকে এমনভাবে বশীভূত করলো যে, স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কিছুদিনের মধ্যেই বড়ো ভাই, ছোটো ভাই আর তার স্ত্রীকে তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলো।

(গ) শ্বশুর ও শ্বশুরগৃহ-সর্বস্বতা ।—

জামাই বারিক (১৮৭২ খৃঃ) দীনবন্ধু মিত্র॥ প্রহসনকার নামকরণের মধ্যে দিয়ে পুরুষের সাংস্কৃতিক পরাজয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্বশুরগৃহে বাস শ্বশুর-সর্বস্বতারই মাত্রাতিরেক মাত্র। অবশ্য প্রহসনকার ললাটমন্তব্যে যে কবিতা দিয়েছেন, তাতে এই ইঙ্গিত বহন করা হয় নি। সেখানে বলা হয়েছে —

"Of all the blessings in earth
the best is a good wife,
A bad one is the bitterest
curse of human life."

উৎসর্গপত্রে লেখক রাসবিহারী বসুর কাছে প্রহসনের পরিচয় প্রসঙ্গে "অপূর্ব

স্থানের ইতিবৃত্ত” বলে মন্তব্য করেছেন। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনে অনেকে ঘরজামাই প্রথার ইঙ্গিত করে থাকেন। বলাবাহুল্য, এই ইঙ্গিত এতে অত্যন্ত স্পষ্ট।

কাহিনী।—কেশবপুরের জমিদার বিজয়বল্লভ অত্যন্ত অবস্থাপন্ন। তাঁর বাড়ীর মেয়েদের তিনি বিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু পরের ঘরে পাঠাতে চান না। তাই তিনি জামাইগুলোকে ঘরজামাই করে রেখে দিয়েছেন। শুধু তাঁর নিজের জামাই-ই নয়, জামাই সম্পর্কিত অন্যান্য লোকেরাও এখানে আশ্রয় পেয়েছে। এমন কি জামাইয়ের জামাইও বাদ যায় নি। এতোগুলো লোককে বাড়ীতে জায়গা দেওয়া যায় না। তাই তিনি একটা জামাইবারিক বা জামাইযের ব্যারাক তৈরী করে দিয়েছেন। সেখানে জামাইরা থাকে, খায় দায়। কোনো কাজকর্ম নেই, তাই ইয়ারকি ঠাট্টা এবং নেশাআস্‌টা চল্‌তে থাকে। মদ গাঁজা আফিম চরস সবই জামাইদের অভ্যাস আছে। জামাইদের আবার অন্তঃপুরে ঢোকবার পাস্‌-সিস্‌টেম্‌ চালু আছে। বাড়ীর ঝি পাচী—যে জামাইবারিকের খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনা করে, তার হাত দিয়ে জামাইদের কাছে পাশ পাঠানো হয়। পাশ পেলেই জামাই অন্তঃপুরে ঢোকবার অধিকার পাবে এবং স্ত্রীসহবাস করতে পারবে। সকলে সবদিন পাশ পায় না। কোনো জামাই পাঁচদিনে একদিন, কোনো জামাই সপ্তাহে একদিন, কোনো জামাই মাসে একদিন, এমন কি কোনো কোনো জামাই বছরে একদিনই মাত্র পাশ পেয়ে থাকে। তবু জামাইরা ব্যারাক ছাড়ে না। কারণ বাড়ীতে তাদের সঙ্গতি নেই : বিশেষ করে নেশার খরচ যোগাবার অর্থ আয় করতে তারা অক্ষম। অনেক সময় তারা বিনা পাশে লুকিয়ে বাড়ী ঢোকবার চেষ্টা করে। ধরা পড়ে গেলে দারোয়ানকে দিয়ে তাদের গলাধাক্কা দিয়ে দেওয়া হয়। গেটে দারোয়ান পাশ পরীক্ষা করে, তারপর জামাইদের ঢুক্‌তে দেয়। এই পাশ পেলেই যে সহবাস ঘট্‌তো, এমন কোনো কথা ছিলো না। অনেক সময় পাশ পেয়েও স্ত্রীর অনিচ্ছার প্রাবল্যে খিল দেওয়া ঘরের দরজার বাইরে বসে জামাইকে রাত কাটাতে হয়। আবার অনেক সময় স্ত্রীর খুব ইচ্ছে থাকলেও বিজয়বল্লভবাবু জামাই আসতে দিতেন না।

বিজয়বাবুর মেজোমেয়ে আত্মহত্যা করলো একদিন। তার অবশ্য কারণও ছিলো। মেজোমেয়ের বর ছিলো মাতাল। সেটা অবশ্য জামাইবারিকে

সঙ্গদোষে হয়েছিলো। কিন্তু মেজোমেয়ে তার স্বামীকে খুব ভালোবাসতো। স্বামীও তাকে খুব ভালোবাসতো। একদিন জামাই মত্ত অবস্থায় বাড়ীতে ঢুকতে গেলে দারোয়ানকে দিয়ে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মেয়ে এতে খুব আঘাত পায়। সে তার বাবাকে বলে,—"বাবা, আমায় একখানি ছোট বাড়ী করে দেন, আমি ওকে নিয়ে সেখানে থাকি, চাকরে তারে অপমান করে, আমার প্রাণে সহ্য হয় না।" তাতে বিজয়বাবু জবাব দিলেন,—"বিধবা মেয়ে হয়ে যেমন বাপের বাড়ী থাকে, তুমি তেমনি থাক, ভাব, সে মরে গিয়েচে।" একদিন রাতে গলায় ক্ষুর দিয়ে মেজোমেয়ে আত্মহত্যা করলো। চাপরাস হারিয়ে জামাই দেশে দেশে ভেসে বেড়ায়। "ঘরজামায়ে আর থানার চাপরাসী সমান, চাপরাস যদ্দিন, মান তদ্দিন, চাপরাস হারিয়ে গেল, মান ফুরাল।"

ছোটোমেয়ে কামিনী অবশ্য মেজোমেয়ের মতো নয়। ভবী ময়রানী তাকে জিজ্ঞেস করে,—"তোর ভাতারকে যদি তাড়িয়ে দেয়?" কামিনী উত্তর দেয়, —"ওলা বিবির পূজ দিই।" কামিনী তার স্বামীকে ভালোবাসে না, যদিও স্বামী অভয় তাকে খুব ভালোবাসে। কামিনী বলে,—"ঘরজামায়ের মান আর অপমান; ঘরজামায়ের গা, না গণ্ডারের গা, মারলে দাগ চড়ে না, তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেঁধে না, বরং ভোঁতা হয়ে যায়।।"

একদিন অভয় পাশ পেয়ে অন্তঃপুরে আসে। তারপর যথাসময়ে স্ত্রীর ঘরে শুতে যায়। তখন শীতকাল। দুজনেই লেপের তলায় ছিলো। অভয়কে কামিনী বল্‌লো, সে আঁধার ঘরে শুতে পারে না, প্রদীপটা নিভে যাচ্ছে, অভয় উঠে গিয়ে প্রদীপে তেল দিয়ে আসুক। অভয় বলে, কামিনীই উঠে দিয়ে আসুক। কামিনী তখন রেগে গিয়ে বলে,—"আমার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দেবো।" অভয়ও রেগে যায়। কামিনীর কথায় জানা যায়,—"গদীতে ধপাধপ করে নাতি মাল্লে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল; আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম। মাজের দরজায় চাবি, বাইরে যাবার পথ নাই; নরম হয়ে কত ডাক্‌লে, আমি শুনেও শুন্‌লাম না।" ঝি হাবার মা বলেছে. সে রাতে জামাই শেষে বৃদ্ধা ঝি হাবার মার বিছানাতেই শোয়। পরদিন ভোরেই অভয় দেশে চলে যায়। কামিনী অভয়ের অভিমানকে মূল্য দেয় না। সে ভিখারী ঘরজামাই—খাবার সঙ্গতি নেই, রাগ করেই যাক্ বা তাড়িয়ে দেওয়াই হোক—তাকে বার বার এখানেই আসতে হবে।

অভয়ের প্রতিবেশী পদ্মলোচন। বিজয়বল্লভ অভয়কে খুব একটা খারাপ চোখে দেখ্‌তেন না। তিনি অভয়ের চলে যাবার কথা শুনে দুঃখিত হয়ে পদ্মলোচনকে বলেন, তিনি যাতে অভয়কে ফিরে আসবার জন্যে অনুরোধ করেন। অভয়ের অভিমান কমতে চায় না। কিন্তু স্ত্রীর ওপর তার খুব দুর্বলতা তাই আবার অভয় জামাইবাবিকে ফিরে যায়।

পাশ পেয়ে অভয় আবার যায়। অভয় কামিনীর কাছে যাবার আগে কামিনী বলে ওঠে,—“টেবিলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায় ঢেলে দাও; আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তারপর আমার কাছে এস।” অভয়ের গায়ে নাকি গন্ধ। অভয় এতে আপত্তি জানায়। কামিনী তখন বলে যে, বাবিকের অন্যান্য জামাইরাও এসব মেখে তারপর স্ত্রীর কাছে যায়। অভয় নিয়মিত স্নান করে, অন্যান্য জামাইয়ের মতো সে নয়। তাই সে বলে, অন্য জামাইদের সঙ্গে তার যথেষ্ট তফাৎ। তাছাড়া এসব কথায় সে অপমান বোধ করে। তারপর “কামিনী, তুমি এমন নির্দ্দয় কেন?”—বলে অভয় কামিনীর কাছে সরে আসে। তখন নাক টিপে কামিনী বলে ওঠে,—“ওঁরে মাঁ গন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম!” অভয় তখন মজা করবার জন্যে চিৎ হয়ে পড়ে খুব জোরে চীৎকার করে ওঠে,—“বাবা রে, মা রে, মলেম রে, মেরে ফেল্লে রে!” কামিনী অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কারণ বাড়ীর ভেতরের লোকরাও চীৎকার শুনে ছুটে আসে। তাদের কাছে অভয় কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলে যে, কামিনীকে সে নাকিস্বরে কথা বল্‌তে দেখে তাকে পেত্নী ভেবে ভয় পেয়েছিলো। ওরা চলে গেলে ক্রুদ্ধ কামিনী অভয়কে বলে,—“আজ তোমারি একদিন কি আমার একদিন, খাটে উঠ্‌বে আর ন-দিদির মত করব, নাতি মেরে নাবিয়ে দেব।” অভয় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে,—“বটে—এতদূর!” কামিনী বলে,—“চোক রাঙ্গাচ্চ? মারবে নাকি?” অভয় জবাব দেয়,—“গোঁয়ার হলে মাত্তেম।” দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলে,—“কামিনি, আমি তোমার স্বামী; কামিনি আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটি কথা বলে যাই; তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়লো।” অভয় উঠে চলে যায়। কামিনী ছুটে তার কাছে গিয়ে বলে,—“আমার মাথা খাও, রাগ করো না, খাটে এস।” অভয় বলে,—“এ শরীরে আর নয়!” সেদিনই অভয় চলে যায়। কামিনী আক্ষেপ করে।

অভয়ের ভালবাসার স্বরূপ সে বুঝতে পারে। অভয়কে কিভাবে সে পায়ে ঠেলেছে সেকথা ভেবে সে কাঁদে।

অভয় বৃন্দাবনে যায়। সঙ্গে অবশ্য পদ্মলোচনকেও নিয়েছে। পদ্মলোচনেরও দাম্পত্যজীবন সুখের নয়। তাঁর দুই স্ত্রীর টানা হেঁচড়ায় তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। স্বামীর ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে তারা সর্বদা কলহ করে, এবং দুজনের স্বামী-প্রেমের প্রতিযোগিতায় মাঝখান থেকে স্বামারও খাওয়া জোটে না। তাছাড়া সতীনকে স্বামী একটু বেশি টানছেন, এই দোষ দিয়ে দুই সতীনেই স্বামীকে যথেচ্ছভাবে যখন তখন প্রহার করে। মনের দুঃখে বৃন্দাবনে যাবার ইচ্ছা তাঁর হয়েছিলো। অভয়কে বৃন্দাবনে যেতে দেখে তিনিও তার সঙ্গ নিলেন।

এদিকে অনুতপ্ত কামিনী খবর পায়, অভিমান করে অভয় বৃন্দাবনে পালিয়ে গেছে। সে ভবী ময়রানীর সঙ্গে বৃন্দাবনের পথে ছদ্মবেশে পা বাড়ায়। অবশ্য ভবীর স্বামী পুরুষ হিসেবে সহযাত্রী ছিলো। গৃহত্যাগে দুর্নাম রটতে পারে ভেবে দেশে সে মৃত্যুর খবর রটিয়ে দেয়। বৃন্দাবনে গিয়ে তারা অবশেষে অভয়ের হদিশ পায়। তাদের বাসার কাছাকাছি এক জায়গায় তারা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে রইলো। দেশ থেকে অভয় কামিনীর মৃত্যুসংবাদ কিছুদিন আগেই পেয়েছিলো। পদ্মলোচনের কথায় শেষে অভয় একজন বৈষ্ণবীকে ডেকে নেবে স্থির করে। এ সংবাদ পেয়ে কামিনী অভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অভয় অগোচরে কামিনীকেই বৈষ্ণবী করে নেয়। কামিনী নিজনে অভয়কে পেয়ে হঠাৎ অভয়ের পা দুটো বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়। অভয় চমকে ওঠে। সে দেখে, বৈষ্ণবী কাঁদছে। বৈষ্ণবীর মুখের দিকে তাকিয়ে অভয়ের চোখে জল আসে। এ যে কামিনী! সেও তো তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। অভয় তার মুখচুম্বন করে। ইতিমধ্যে ভবীও আত্মপ্রকাশ করে। খবর পেয়ে বিজয়বল্লভ বাবুও বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হন। সকলে দেশে ফিরে চলে। পদ্মলোচনও দেশে ফেরেন অগত্যা। তাছাড়া তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন, স্বামীর নিরুদ্দেশে সতীন দুজন খুব কান্নাকাটি করেছে। দুজনে দুজনের চোখের জল মুছিয়েছে। রান্না করে দুজন দুজনকে খাইয়েছে। এখন তাদের মধ্যে খুব ভাব। স্বামীর মূল্য তারা এতোদিনে বুঝতে পেরেছে!

জামাই বরণ প্রহসন—(১৮৯৪ খৃঃ) লেখক অজ্ঞাত॥ (রচনা শেষে A. D. নামাঙ্কন আছে। "রাজকীয় রঙ্গমঞ্চে" অভিনীত এই কথাটি শেষ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে লেখা আছে।) ললাটে একটি ইংরেজী উদ্ধৃতি আছে,—

"If we shadows have offended
Think but this, and all is mended,
That you have but slumbered here
While these Visions did appear."

(A Midsummer nights Dream)

দৃষ্টিকোণ বিচারে এই প্রহসন রচনাও পূর্বোক্ত শ্বশুরগৃহ-সবস্বতার বিরুদ্ধে লেখকের বক্তব্য মাত্রাবৃদ্ধিকে আশ্রয় করেছে। অর্থনির্ভর সংস্কৃতিতে পরাজয়ের চিত্র দৃষ্টিকোণকে অনেকটা জটিল করে তুলেছে।

কাহিনী।—সজনীকুমার ঘোষ রাজা অঞ্জনারঞ্জন রায়চৌধুরী নামে এক জমিদারের বড়ো জামাই। রাজার জামাই হয়ে সজনী ধরাকে সরা দেখে। পরিবারের মধ্যে ভাঙন এনে নিজের ভাগ বুঝে নিতে চায়। রাজার জামাই হয়ে টুকিটাকি যা পায়, পাছে সেগুলো সাধারণ সম্পত্তি হয়ে যায়, এই তার ভয়। সজনী সবার কাছে তার শ্বশুরের ঐশ্বর্যের কথা রটিয়ে বেড়ায়। শ্বশুর তাকে মাসোহারা দেয় তাতেই সজনীর দিন চলে। সে চাকরী বাকরী করে না। খুড়ো সীতানাথ সজনীকে ধরে, রাজ-সংসারে সজনী যদি তার একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। সজনী বলে, চেষ্টা করে দেখ্‌বে সে। সীতানাথ বলে,—"আমরা বরাবরই বড়লোক ঘেঁষা, কত আমীর ওম্‌রাওর সঙ্গে বেড়িয়েচি, যেমন তেমন লোকের সঙ্গে কি আমরা বসা-দাঁড়াও করি! তবে কি জান বাবা! আমি তো—'মরদ বটি চিঁড়ে কুটি যখন যেমন তখন তেমন'!"

সজনীর বাড়ীতে শ্বশুরবাড়ীর ঝি খুদির মা আসে। সজনী তাকে আত্মীয় গুরুজনের চেয়েও বেশি খাতির করে বসায়। নিজের খুড়োকে দিয়ে তার জন্যে সন্দেশ আনায়। সজনী তাকে জিজ্ঞেস করে,—"আমার এ্যালাউএন্সের টাকাটা এনেছ কি?" কথাটা বলে ফেলেই সজনী লজ্জিত হয়। ঝি বুঝি মনে করবে, টাকার জন্যেই শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক। সামলিয়ে নিয়ে সজনী শ্বশুরবাড়ীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করে। খুদির মা সজনীর হাতে পাঁচশত টাকা আর একটা চিঠি দেয়। শ্বশুরবাড়ীতে উৎসব। জামাই যেন যাবার আগে ফর্দ অনুযায়ী জিনিসপত্র কিনে নিয়ে সেখানে যায়। তাছাড়া এমাসের মাসোহারা আটাশ টাকা দশ আনা দেয়। এ মাসে এ বাড়ী তিনবার তত্ত্ব এসেছে—ইত্যাদি নানান কারণ দেখিয়ে প্রাপ্য টাকা থেকে কিছু কেটে নেওয়া হয়েছে। এমন সময় সজনীর বিধবা বোন দোক্তার জন্যে সামান্য

পয়সা চাইতে এসে ধমক খায়। সজনী বলে,—"আমি ট্যাঁকশাল, না! আমার অত বাজে পয়সা নেই, ঝগড়া কোরতে এসেছিস্ নাকি? বেরো, আমার ঘর থেকে।" পুঁটু মন্তব্য করে,—"বাপ্‌রে! বাবুর রাগ ছাখ! তবু বলি বিধবা বোন্‌কে দুটি খেতে দিতে হতো।" স্ত্রী ঘনঘটা শিক্ষিতা। সে সজনীকে কবিতায় একটা চিঠি দিয়েছে। কবিতায় তার উত্তর দিতে গিয়ে সজনী গলদ্‌ঘর্ম হয়।

খুড়ো সীতানাথকে সঙ্গে নিয়েই সজনী বাজারে বেরোয়। সজনী বাংলা হাতের লেখা পড়তে পারে না, কারণ তার পেটে অতো বিদ্যে নেই। সে তাই বলে,—"ইংরিজিতে আমার পাশ হয় নি, বাঙ্গলাটা আমার বড় বালাই।" সীতানাথ দশ বছর সরকারদের কাছারীতে শিক্ষানবিশী করেছে। তাই সীতানাথকে নিয়ে যাওয়াই সুবিধে।

বড়োলোকের বাড়ী একা যেতে নেই। তাই সে খুড়ো সীতানাথকে চাকর সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ী রওনা হয়। যাবার আগে সজনীর পড়ার ঘর থেকে লালকালি এনে সে জুতোয় লাগায়। ব্লম্ অফ্ রোজটা ফুরিয়ে গেছে।

সীতানাথকে চাকর সাজিয়ে, সঙ্গে করে একটা বাছুর নিয়ে সজনী শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়। শ্বশুর তাকে 'মাজুর' আন্‌তে বলেছিলেন। এরা মাজুরকে 'বাছুর' ভেবেছে। শ্বশুর আম কিন্‌তে পাঠিয়েছিলেন। আম কোথায় জিজ্ঞেস করলে সজনী বলে, দেওয়ানজী চারা করবার জন্যে নিয়ে গেছেন। চারা? হ্যাঁ চারা। কুড়ি টাকা শ-র আম এনেছিলো। বাছুর আর আম একগাড়ীতে ছিলো। এখানে শুধু আঁটি পৌছিয়েছে। "আজ্ঞে বাছুরটা বড ভালমানুষের মতন, ও যে খাবে, এটা মনে হয় নি।" অন্যান্য জিনিষ? ও হো! সব দোকানে ভুল করে ফেলে এসেছে। তাছাড়া অকারণ সে তিনটে গাড়ী ভাড়া করে এসেছে। রাজা অঞ্জনারঞ্জন সেয়ানা জামাইয়ের ছেলেমানুসের মতো ভুল করতে দেখে হেসে বলেন,—যাক্‌গে। তিনি জামাইকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন।

যেমন অঞ্জন তেমনি কুমার—দুইজনেই সমান লম্পট এবং মদ্যপ। কুমারের স্ত্রী শিক্ষিতা, সাহেবী স্কুলে পড়েছে, তবু স্বামী সুখে বঞ্চিতা। স্বামীর "বড়মান্‌সী কোরতেই সময় কেটে যায়, তা গরিব মাগের সঙ্গে বসবেন কখন! রেতে তখন ওঠবার ক্ষমতা থাক্‌বে না, বৈঠকখানাতেই প্রভাত। বড় সদয় তো

বাড়ীর ভেতর এসে বিছানাতে ওঠা ঘটে না, মেজেতেই অঙ্গ পাত।" বৈঠকখানাতে নাচওয়ালীকে নিয়ে কুমারের নাচগান খাওয়া দাওয়া লেগেই আছে।

কুমারের বাবা বুড়ো হলেও তাঁর যথেষ্ট রস। সঙ্গে তার সবদা মোসাহেবী করে তার শ্যালক শ্যামাপদ। সদু গোয়ালিনী অঞ্জনের বাড়ী দুধ দেয়। তার ওপর অঞ্জনের কুনজর পড়েছে। দুধের হিসেবে গোলমাল আছে, দেওয়ানজীকে দিয়ে মিটমাট করাতে হবে—এই অছিলায় তাকে বৈঠকখানায় ডাকা হয়। কারণ এমনি হিসেব মেয়েমহলেই চলে।

অঞ্জন শ্যামাপদর কাছে বল্‌ছিলো, তার বিধবা যুবতী রূপবতী বোনটি অসহায়া, তার ওপর সম্পত্তির বোঝা নিয়ে আছে। অঞ্জন তার অভিভাবক হলে মেয়েটির মঙ্গল হবে। শ্যামা ভাবে,—"তার মাথাটা খাবার ইচ্ছে দেখ্‌ছি। ওর কাছে এনে দেওয়া ডাইনির হাতে পো সমর্পণ।" এদের কথাবার্তা চল্‌ছিলো, এমন সময় সদু এসে বৈঠকখানায় ঢোকে। সে জিজ্ঞেস করে,—হিসেবের কি গোলমাল হয়েছে! অঞ্জন বলে,—"না না গোল কিছু নয়, তবে ধোরতে গেলে গোলও বটে, কি বল হে শ্যামাপদ!" সদুকে তিনি কথায় কথায় ইচ্ছে করে আট্‌কান। শেষে বলেন,—"গোল বিশেষ কিছু নয়, কি জান? কুমারের অন্নপ্রাসনের সময় তুমি তখন হও নি—তোমার বাপ ক্ষীরগুলো দিয়েছিলো বড় পান্‌সে।" সদু হেসে ফেলে। অঞ্জন ভাবেন,—কেল্লা ফতে। তিনি তাকে খাবার জন্যে ল্যাংড়া আম দিলেন। এইসময় বৈঠকখানায় শ্বশুরকে প্রণাম করতে গিয়ে সজনী যখন শাশুড়ী ভেবে ভুল করে সদুকে প্রণাম করে, তখন অঞ্জন বলেন,—"হাঃ হাঃ তা পারে, তাতে দোষ হয় না, সদুও তো সেই যুগ্যি বটে!" অঞ্জন আড়ালে গেলে শ্যামাপদ সদুকে বলে, কর্তাবাবু তার জন্যে পাগল। সে রাতে নির্দিষ্ট সময়ে যেন বাগানে অপেক্ষা করে। এ কথায় সদু খুব চটে যায়। সে বলে, গিন্নীমার কাছে গিয়ে সে সব বলে দেবে। "গরীব লোক বোলে বুঝি যা ইচ্ছা তাই বোল্‌বে!" সদুকে শ্যাম অনেক করে বোঝায়, তার নিজের অনেক দেনা, সদুকে রাজী করাতে পারলে কর্তাবাবু শ্যামাপদর ধার সব শুধে দেবেন। শেষে শ্যামাপদ বলে, ধর্ম্ম নষ্ট সে করুক বা না করুক, মৌখিকভাবে তো রাজী হোক্‌, তাহলেই ধারগুলো শোধ হয়। সদু হাঁ না করে চলে যায়। অঞ্জন এলে শ্যামাপদ বলে, সদু রাজী হয়েছে, অঞ্জন তার ধার শোধের টাকা দিক। অঞ্জন বলে, যখন কাজ মিটবে, তখন টাকা পাবে। শ্যামাপদ বিপদে পড়ে।

অঞ্জনের চাকর মধুর ঘর অঞ্জনের বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে। মধুর অনুপস্থিতিতে শ্যামাপদ অঞ্জনকে মধুর ঘরে রেখে যায়। সামনে দিয়ে সতু যখন যাবে, তখন তার পেছন পেছন অঞ্জনকে যেতে হবে। পুরুষ হয়ে পেছন পেছন যাওয়া দৃষ্টিকটু। তাই অঞ্জনকে মেয়ে সাজিয়ে আনা হয়। অঞ্জন মেয়ে সেজে মধুর ঘরে বসে থাকে। একটু পরে শ্যামাপদ এসে বলে, সতু বল্‌ছে —সে যদি ধর্মই নষ্ট করবে তাহলে বিনে পয়সায় কেন! সে পঞ্চাশ টাকা চায়। অঞ্জন এবার বাধ্য হয়ে শ্যামাপদকে পঞ্চাশ টাকা দেয়। শ্যামাপদ নিজের কাজ হাসিল করে। পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে। সে অঞ্জনকে ঐ অবস্থায় রেখে বাড়ী চলে যায়। মনে মনে ভাবে, কর্তা ভাবছে, সতু আসবে, কিন্তু খুদির মার সঙ্গে সতু অনেক আগেই নিজের বাড়ীতে পৌঁছে গেছে। হয়তো একঘুমও হয়ে গেছে।

ওদিকে অঞ্জনের বাড়ীতে উৎসব, নাচগান মদ্যপান ইত্যাদি চল্‌ছে। কুমারের ছোটোবেলা থেকেই মদে হাতে খড়ি। দেওয়ানজীকে সে বলেছিলো, —"সেদিন আর নেই হে, যেদিন ব্রটিন্ কোরে পিক্‌দানী থেকে মদ ছেকে খেতে হবে।" ভবিষ্যতে সে-ই মনিব হবে বলে দেওয়ানজীকে ভয় দেখায় এবং যা ইচ্ছে টাকা নিয়ে খরচ করে। সজনী এই দলে ভড়ে পড়ে। সজনীর স্ত্রী ঘনঘটা অনেকক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করে শেষে রাগ করে ছাদে গিয়ে শুয়ে থাকে। সজনী ঘরে কাউকে না দেখে একাই শুয়ে পড়লো। নরম স্প্রীংয়ের গদী। তক্ষুণি তার ঘুম এসে যায়। হঠাৎ কয়েকটা ঘুঁসিতে তার সুখনিদ্রা কেটে যায়। কুমার সাহেব মাতাল হয়ে এসে তাকে মারছে। সজনী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। সজনীর অবস্থা কাহিল। পেটে তার দানাপানি কিছুই পড়ে নি। খাবারের বদলে তিনবারই সে জামাই ঠকানো খাবার মুখে দিয়ে অপ্রস্তুত হয়েছে। জল খাইয়ে পেট ভরিয়েছে।

সীতানাথ জামাইয়ের আপন খুড়ো হয়েও তার অসন্তোষ, বেয়াই বলে কেউ তারে চিনলো না। বিশেষ করে তার ভাইপো তাকে বার বার 'সীতু' 'সীতু' বলে ডেকেছে। সবাই তাকে চাকরই ঠাউরিয়েছে। খাবার তার কিছুই জুটতো না। বড়োলোকের বাড়ীতে কে কার খোঁজ রাখে? শেষে বাড়ীর চাকর মধুকে তোসামোদ করে সে এক সরা মাংস পেয়েছে, তাই খেয়েছে। খাওয়া তো হলো, কিন্তু শোয়া? নিজের ঘর চিন্‌তে না পেরে ঘুরতে ঘুরতে সে বাইরে চলে আসে।

অঞ্জন মধুর ঘরে একা একা মধুর প্রতীক্ষায় বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা লোককে আসতে দেখে তিনি তক্তপোষের তলায় লুকোলেন। সীতানাথ এসে প্রাণখুলে রাজবাড়ীর নিন্দে করে। তক্তপোষের উপরে বসে সীতানাথ হঠাৎ অনুভব করে, তলায় কে যেন একজন আছে। সীতানাথ মেয়ের সাজে অঞ্জনকে দেখে ভাবে, মধু বোধহয় রাত্তিরের জন্যে বন্দোবস্ত করে মেয়েমানুষ আনিয়ে রেখেছে। কিন্তু সীতানাথ বুঝতে পারলো, লোকটি আসলে পুরুষ। তখন সীতানাথ ভাবে, লোকটির মতলব খারাপ। তখন সে লোকটিকে জেরা করে। লোকটি নিজের পরিচয় গোপন রেখে, নিজের আসবার কারণ সবই খুলে বলে দেয়। এমন সময় ধুঁকতে ধুঁকতে সজনী আসে। অনাহারের ওপর যথেষ্ট মার পড়েছে তার। সজনী আসবার আগে অঞ্জন আবার তক্তপোষের তলায় লুকোয়। খুড়ো ভাইপোতে অনেক সুখদুঃখের কথা হয়। সজনীর পেটটা কেমন কল্‌কল্‌ করছে, সে বাইরে যাবার রাস্তা জানতে চাইলে সীতানাথ সজনীকে নিয়ে বাইরে চলে যায়। কিন্তু শিকল আট্‌কে রেখে যেতে ভোলে না। এদিকে পাহারাওয়ালা এক মাতালকে ধাওয়া করে ফিরছিলো। সজনীর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে তাকে মাতাল মনে করে সে থানায় নিয়ে চলে।

অঞ্জনের গিন্নী ওদিকে জামাইয়ের খোঁজে এসে দেখেন যে ঘর খালি। মেয়ে ছাদে শুয়ে। তিনি ভাবলেন, জামাই বুঝি অভিমান করে চলে গেছে। "জামাই ঘরে এলো বাপু খেয়ে দরজা বন্ধ কোরে শুলি, তা নয়, ছাদে বসে তারা গুণ্‌ছিলেন।" মেয়ের দোষ দিতে গিয়ে তিনি দেখেন কর্তার বিছানাও খালি! সব খুঁজে হতাশ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মধুর ঘরে এলেন। গিন্নীকে দেখে অঞ্জন ভাবেন, সত্য বুঝি এসেছে। তক্তপোষের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে মেয়ের সাজে কর্তা বলে ওঠেন, 'এই যে আমি।' কর্তা বলে চিন্‌তে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গিন্নী আঁচল দিয়ে তাঁর গলা বেঁধে ফেলে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে আসেন। গিন্নীর পায়ে ধরে কর্তা বলেন, তিনি কিছু জানেন না। গিন্নী বলে ওঠেন,—"কচি খোকা—কুলোয় শুয়ে দুধ খান্!"

কুমার সাহেব সীতানাথকেও রাতে যথেষ্ট মেরেছে। সকালে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে থাকে। বাড়ীর মেয়েরা তার কাছে আসে। গিন্নী অঞ্জনকে মেয়ের সাজে ধরে নিয়ে আসে। এই অবস্থায় অঞ্জনকে দেখে সকলে হাসাহাসি

করে। কুমার নিজেও বিদ্রূপ করে। অঞ্জন তাকে 'কুপুত্তুর' বলে গালাগালি দিতে গিয়ে নিজেই গিন্নীর কাছে ধমক খেলেন। "তোমার আর মুখ নেড়ে কথা কইতে হবে না।" শ্যামাপদ ফাঁকি দিয়ে অঞ্জনের কাছে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে। শ্যামাপদ কাছে থাকা সত্ত্বেও অঞ্জন তাকে সাহস করে কিছু বল্‌তে পারেন না—গিন্নীর ভয়ে। সীতানাথ আসে। এবার সে এলো বেয়াই-এর মর্যাদা নিয়ে।

সজনীকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। তার চেহারা দেখে জামাই বলে চেনা যায় না। এবার জামাইবরণের উদ্‌যোগ হয়। ছেলেরা সব বাইরে চলে যায়। ঘনঘটাকে সজনীর পাশে রেখে বাড়ীর মেয়েরা সবাই মিলে জামাই সজনীকুমারকে বরণ করে।

কি মজার শ্বশুরবাড়ী, যার যার আছে পয়সা কড়ি (১৮৮৬ খৃঃ)—চুনীলাল শীল॥ শ্বশুর আশা করেন, জামাই নজর হাতে শ্বশুরবাড়ী আসুক। এক জামাই শূন্যহাতে আসে, কারণ নজর দেবার ক্ষমতা তার ছিলো না। এতে শ্বশুর চটে গিয়ে তার সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করেন। যুবকটির অসতী স্ত্রী তখন বাপেরবাড়ী ছিলো। তারই প্ররোচনায় যুবকের শ্যালকরা সকলে মিলে যুবকটিকে মারধোর করে বিদেয় করে দেয়।

(ঘ) ক্ষেত্র সঙ্কট-গত সমস্যা ॥ —

ভাগের মা গঙ্গা পায় না (কলিকাতা—১৮৯০ খৃঃ)—অতুলকৃষ্ণ মিত্র॥ পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রচলিত প্রবাদকে নামকরণ হিসেবে ব্যবহার করবার মধ্যে লেখক সমস্যার বিশেষ দিকটিকেই ইঙ্গিত করেছেন। স্বক্ষেত্র এবং পারিবারিক ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধকে নব্য অর্থনীতি ও সংস্কৃতি যেভাবে পরিবর্তিত করেছে, তাকে উপজীব্য করে প্রহসনকার রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন।

কাহিনী।—চার ভাই—লখিন্দর, অজারাম, ভয়ানকচন্দ্র এবং যণ্ডামার্ক। প্রথম তিন ভাই মায়ের খোঁজ খবর নেয় না। বিধবা ভগ্নী 'তারা' এবং তাদের মা ব্রহ্মময়ীর দেখাশোনা একমাত্র যণ্ডামার্কই করে। তাদের জ্ঞাতিখুড়ো রংলালও মধ্যে মধ্যে এসে খবর নেন।

একদিন রংলাল, লখিন্দর, অজারাম এবং ভয়ানকচন্দ্রকে কিছু উপদেশ দিতে চেষ্টা করেন এবং বলেন, পুত্র হিসেবে মাকে তাদের দেখাশোনা করা উচিত।

তখন তারা সকলেই এক একটা ওজর দেখায়। লখিন্দর হ্যাণ্ডনোটের দালালী করে, অনেক নাবালকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দু-পয়সা রোজগার করে। পরে জোচ্চুরিতে ধরা পড়ে তিন বছরের জন্যে জেলে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে সে এখন ভূষিমালের ব্যবসা করে। সে বলে,—তার দুটো সংসার। একটি বৌয়ের এবং আর একটি তার রক্ষিতার। ক্রমে ক্রমে রক্ষিতার ছেলেপুলে হয়ে সংসার অনেক বেড়ে গেছে। একেতেই তাদের খরচ, তার ওপর রক্ষিতার আত্মীয়স্বজনদের আসারও বিরাম নেই। তাদের খরচাও লখিন্দরকে টান্‌তে হয়। "এমনি ভোঁদড়ের মা কুড়ুনিই সব টাকা নিয়ে নেয়। মাকে দেবার পয়সা কোথায় পাবো ?" অজারামের সমস্যাও অনুরূপ। সে মোক্তারি পাস করে যাহোক করে চালাচ্ছিলো। পরে বিধবা শালীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ঘটে, তার ঔরসে এখন শালীর গর্ভে দশটি সন্তান। আসল বৌয়ের মাত্র দুইটি সন্তান। সুতরাং শালীর সন্তানদেরই দাপট। তাই তাদেরই দেখ্‌তে হয়। তাতেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়।

তৃতীয় ভাই ভয়ানকচন্দ্র ব্রাহ্ম। তার অবশ্য রক্ষিতা নেই, তবে তার স্ত্রী মিসেস্ মন্দামণি সবার ওপর দিয়ে চলে। তাছাড়া সে নিজেও অনেকটা স্বার্থপর। কিন্তু যেসব কথা উল্লেখ না করে সে ধর্মীয় বক্তৃতার ভঙ্গীতে প্রমাণ করে যে পৃথিবীতে মা হচ্ছে পরম শত্রু। দাড়ি নেড়ে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করে সে বলে যে, মা তাকে দশমাস পেটে ধরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়েছেন। তারপর এই দুঃখময় পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং শত্রুতারই কাজ করেছেন। "সুতরাং পরম শত্রু মাতাকে উপোষ রাখাই সাব্যস্ত হইল।" খুড়ো রংলাল তিন ভাইকেই তিরস্কার করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রক্ষিতার ছেলেরা এসে পড়ায় তাদের দল ভারী হয়ে পড়লো। দুর্বিনীত রক্ষিতা-পুত্রদের কটূকথা শুন্‌বার চাইতে প্রস্থান করা খুড়ো উচিত বিবেচনা করলেন।

এদিকে অজারামের শালী তথা রক্ষিতা বাতাসী এবং লখিন্দরের রক্ষিতা কুড়ুনী কুকুর-কুকুরীর বিয়ে দেয়; প্রায় দুশো টাকা খরচ করে। সমস্ত পৃথিবীতে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়বে এই লোভ দেখিয়ে ভয়ানকচন্দ্র তাদের ব্রাহ্মমতে বিয়ে দেয়। রেজিষ্ট্রী করে Civil marraige সূত্রে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কুকুরগুলোকে পোষাক পরানো অবস্থায় বিয়ে দেওয়া হয়। কারণ তাদের নগ্নতার অশ্লীলতা ব্রাহ্ম ভয়ানকচন্দ্র সহ্য করতে পারে না ব্যাপার বেশিদূর গড়ায় দেখে ষণ্ডামার্ক, রংলাল এবং তাদের মা ব্রহ্মময়ী—সবাই মিলে

যুক্তি আঁটেন এবং সেই অনুযায়ী অগ্রসর হন। ষণ্ডামার্ক গিয়ে লখিন্দরকে বলে, মা মরমর। মার সিন্দুকে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আছে। আসলে কৃপণ, তাই তিনি এসব এতোদিন ছেলেদেরও জান্‌তে দেন নি। বংলালকে শতকরা দশ টাকা সুদে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছেন। এখন তাঁকে চৈতন্য কবিরাজ দেখ্‌ছেন তিনি আজ কালই মরবেন। অতএব মার সিন্দুক দখলের জন্যেই সে হন্তদন্ত হয়ে এসেছে। অবশেষে সে লখিন্দরকে বলে, মার তিনশত পঞ্চাশ টাকা দেনা আছে। সেটুকু তাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। লখিন্দর কুড়ুনির উৎসাহে ও আশ্বাসে সানন্দে রাজী হয়। লখিন্দর বলে, সম্পত্তির টাকা সে আর ষণ্ডামার্ক—দুজনে ভাগ করে নেবে। তবে অন্য কেউ যেন এ ব্যাপার না জানে। লখিন্দর চলে গেলে অজারাম ও ভয়ানক—সকলের সঙ্গেই ষণ্ডামার্ক একই রকম সর্তের কথা বলে। সকলেরই ধারণা অন্য দুভাই এই সর্ত সম্বন্ধে কিছু জানে না। বলাবাহুল্য অন্য দু ভাইও এই সর্তে তক্ষুণি রাজী হয়ে যায়।

ব্রহ্মময়ী শয্যাগতা। ষণ্ডামার্ক, রংলাল এবং ভগ্নী তারা কাছে উপস্থিত। চৈতন্য কবিরাজ চিকিৎসায় ব্যাপৃত। এমন সময় খুব সতর্কভাবে ভয়ানকচন্দ্র আসে। ভয়ানককে ষণ্ডামার্ক বলে, ঐ টাকা দিয়ে যে মায়ের দেনা শোধ করে দেবে, তাকেই মা সব সম্পত্তি দিয়ে যাবেন। ভয়ানক তিনশত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে চলে যায়। এইভাবে লখিন্দর ও অজারামও আসে। তারাও একে একে তিনশত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে চলে যায়। কেউ কারো টাকা দেওয়ার কথা জান্‌তে পারে না। কবিরাজ এইবার বল্‌লো, আর দেরী নেই, গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করো। তারা তখন কাঁদবার ভান করে। তারার কান্না শুনে তিনভাই ছুটতে ছুটতে আসে। সকলেই সকলের মতলব বুঝতে পারলো, তবুও বেপরোয়া হয়ে সবাই সিন্দুক ঘিরে দাঁড়ালো। খুড়ো রংলাল তাদের নিরস্ত করে লাইন করে দাঁড়াতে বল্‌লেন। তারা লাইন করে দাড়ালে তিনি সিন্দুক খুলে এক একটা জুতোর মালা বার করে তাদের তিন ভাইয়ের গলায় পরিয়ে দেন। সিন্দুক থেকে তারা তিনটে মুড়োঝাঁটার মালাও বার করে এবং মন্দামণি, বাতাসী আর কুড়ুনীকে পরিয়ে দেয়। সেও এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিলো। ভাইরা টাকা হারিয়ে অর্থশোকে অস্থির। তার ওপর আবার এই অপমান! এতে তাদের মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। তারা মাথা গরম করে। তখন শান্ত কণ্ঠে খুড়ো জানান যে—বাইরে দশজন জোয়ান বাগ্দীকে

লাঠি হাতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বাধ্য হয়ে ভাইরা নরম হয়। মা ব্রহ্মময়ী তখন অর্থলোভী সন্তানদের ধিক্কার দিলেন।

শয্যাগুরু (কলিকাতা—১৮৯৬ খৃঃ)—হরিনাথ চক্রবর্তী (বালীগ্রাম)॥ এক্ষেত্রে সর্বস্বতাকে সমর্থন করা না হলেও রক্ষণশীল পক্ষীয়ের বিশেষ অপবাদ ক্ষালনের প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। ভূমিকায়[১৭] লেখক বলেছেন,—"বঙ্গীয় গৃহস্থ সংসারে আজকাল মহাবিপ্লব উপস্থিত। নিত্য নিত্য তাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধ হইতেছে। এই ঐক্য বিরহিত অভাগ্য দেশে আরও অনৈক্যের নিত্য আমন্ত্রণ পূর্ব্বের ন্যায় মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতির সহিত একত্র বাসে প্রায় অনেকেই নারাজ। ইহার কেবল ইচ্ছামাত্রেই নিবদ্ধ নহে, কার্য্যেও হইতেছে। কেবল কার্য্যও নহে, ঐ সূত্রে পরিবার মধ্যে পরস্পর ভয়ঙ্কর মনান্তরও সংঘটিত হইতেছে। বড়ই আক্ষেপের কথা।"

"অনেকে আমাদের কুলবধূগুলিকেই এই গৃহে বিদ্রোহের হেতুস্থলে গ্রহণ করেন। আংশিক সত্য হইলেও এই সিদ্ধান্তকে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার আগমনে, পাশ্চাত্য রুচি প্রভাবে ভদ্র পরিবারে অনেক সুশিক্ষিত যুবা ঐ পদ্ধতি ভালবাসিতেছেন।"

কাহিনী।—বাড়ুজ্যেবাড়ীর উমাপতি, সতীপতি, শচীপতি আর সীতাপতি—চার ভায়ে বেশ মিলে মিশে এক সংসারে থাকে। দেখে গাঁয়ের সকলের চোখ জুড়িয়ে যায়। ভাইদের মধ্যে যেমন ভাব, জাদের মধ্যেও তেমনি ভাব। আবার বিধবা বোন সৌদামিনী যে আছে, তার তো অযত্ন হয়-ই না, বরং এরা সবাই তাকে মাথার মণি করে রেখেছে। কিন্তু পাড়াকুঁদুলী বিন্ধ্যাদিদি, বট্‌ঠাকুরুণ, ন-খুড়ী, ঘোষেরবৌ—এরা সবাই রটিয়ে বেড়ায়, ভাইদের জন্যেই সংসার টিঁকে আছে, জায়েদের জন্যে নয়। "আহা! এমন সোনার সংসার কোথাও নেই! ভাইগুলি যেন রাম লক্ষ্মণ! তবে মাগীগুলো একটাও মানুষের মতো নয়।" গিন্নীর এখন কর্তৃত্ব নেই। সৌদামিনীর কষ্ট নাকি চোখে দেখা যায় না। বাঁড়ুজ্যেবাড়ীর বৌদের বন্ধু নৃত্যকালী উপস্থিত ছিলো, সে এতে প্রতিবাদ করতে গেলে এরা তাকে গালাগালি দেয়। ন-খুড়ী বলে, "তোর ভাতার ত সাহেবের পোষাক পরে; অপিসের কর্ত্তাগিরি করে, (নৃত্যকালীর মুখের কাছে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে) তুই যে তার মাগ্‌লো

১৭। বালীগ্রাম, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ খৃঃ।

কল্লা! আবাগীর ঝি! সংখাশুড়ীর বৌ।·····দেখ ত বট্‌ঠাক্‌রুণ! ছুঁড়ীর মাথায় হাল্‌বাঁট্‌ ফেশান্‌, পরনের শাড়ীর ভেতর শামজী···! ঝ্যাঁটাখাগী!" বিদ্যাদিদি বলে,—"বলি, আবার নেকাপড়া শেখা হয়েছে, বলি, আমরা না হয় মুক্ষু! বলি, ওলো চুলোমুখী! জুতোমোজা পায়ে পরিস্‌ কি করে লো! ওকি মেয়েমানুষ! ও ত বিবি, বলি—মেম!" নিজের ওপর গালাগালি পড়ছে দেখে নৃত্যকালী সরে পড়ে। নৃত্যের বাড়ীতে অবশ্য জায়ে জায়ে ঝগড়া আর চুলোচুলি লেগেই আছে। এক রান্নাঘরে তিন তিনটি বন্দোবস্ত। এটা অবশ্য জায়েদের দোষেই হয়েছে, কিন্তু বাঁড়ুজ্যেবাড়ীর জায়েদের নামে কোনো কথা বল্‌লে সহ্য হয় না।

পাড়াকুঁদুলী বিদ্যাদিদিদের দলের কেউ কেউ, দুপুরে সবাই যখন ঘুমোয় তখন বাঁড়ুজ্যেবাড়ী এক একজন জায়ের কাছে এসে মন ভাঙাতে চেষ্টা করে। বিদ্যাদিদি ছোটোবৌ সরলার ঘরে এসেছিলো। ঘরের ভালো আলমারীটা ইঁদুরের উৎপাতে মেজোবৌয়ের ঘরে চালান করে দেওয়াতে সরলা বোকামির পরিচয়ই নাকি দিয়েছে। ভালো জামাকাপড়গুলোও নাকি বড়োদিদির ঘরে রাখা উচিত হয় না। জায়েদের ভাবের কথা বল্‌তে গিয়ে বিদ্যাদিদি বলে, "খুবই আহ্লাদের কথা! তবে কি জানিস্‌ ছোট বৌ! কিছুই বেশীদিন থাকে না! শেষে যে যার তাই! তাই যারা বুদ্ধিমান মেয়ে হয়, প্রথম থেকেই আপনার আপনার সাম্‌লে রাখে।" বিদ্যাদিদির এ ধরনের কথাবার্তায় সরলা বিদ্যাদিদির ওপর চটে যায়। কিন্তু গুরুজন—কিছু বলা যায় না। সরলার সেজদা বাড়ী এলে সব জায়েরা মিলে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের আয়োজন করছে। বাড়ীতে আনন্দ লেগে আছে। সেজোবৌ নির্মলা তখন বাট্‌না বাটছিলো। ঘোষেরবৌ তার কাছে এসে বসে বলে,—"তা জায়ের ভাই এসেছে বোলে তোমার এত নড়াব্যাস্তা করবার কি দরকার, তোমাদের ভাই ভাবন দেখে বাঁচি না। আমরাও ত জায়ে জায়ে ঘর করেছি, আজই না হয় আলাদা।" ঘোষেরবৌয়ের ওপরে নির্মলাও অত্যন্ত চটে গিয়েছিলো। বন্ধুদের কাছে সে গল্প করে,—"শুনে ভাই আমার বড় রাগ হলো, আবার হাসিও পেলো, তাই রক্ষে। নইলে হয়ত অমনি সেই নোড়ার বাড়ী মেরেই মাগীর নতশুদ্ধ নাকটা ভেঙে দিতেম।" গিন্নীর কাছে এসেও এরা সব বলে, কি করে যে তিন চারটি বৌ নিয়ে ঘর করছে। এ কেউ পারে না। নেহাৎ ছেলেরা নাকি দেবতা তাই, নইলে এ সংসার কবে ভেসে যেতো।

চারদিকে সংসারে ভাঙনের দৃষ্টান্ত, এর মধ্যে এরা যে মিলে মিশে আছে, এতে বৌদের কৃতিত্বের কথা কেউই স্বীকার করবে না। সৌদামিনী এসে একটা ঘটনা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে। ধবলার মার জ্যাঠ্‌তুতো ভাই দুজন নাকি মিলে মিশে ছিলো। কিন্তু বৌ-দুটো পাজীর একশেষ! এসেই তারা ঘর ভাঙ্‌লো। বিধবা বোনটির জন্যে দুটো ঠেঁটি, একটা পাথর, একটা টুক্‌নি আর একটা কাটির মাদুর আলাদা করে রেখে জিনিসপত্র সব চুলচেরা ভাগ হয়ে গেলো। ব্যবস্থা হলো। যেদিন বোনটি এদের দুজনের যে-বাড়ী রাঁধবে, সেই বাড়ীই তাকে যেতে দেবে। একদিন সকলে মিলে বৌভাতের নিমন্ত্রণে গেলো। দুজনের কারো বাড়ী রান্না হলো না, অতএব কেউ তাকে খাবার চাল ডাল দিলো না। তারা সাজগোজ করে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে গেলো। আর ওদিকে বিধবা বোনটি বিকেল পর্যন্ত আশায় আশায় থেকে শেষে খিদের জ্বালায় সে বড়োবৌয়ের ভাঁড়ার থেকে চাল ডাল নিয়ে রান্না করে খেলো। এসেই বড়োবৌ চটে আগুন। বাধ্য হয়ে বিধবা ননদ তখন বোঝায়, একাদশীর দিন বড়োবৌয়ের সে রেঁধে দেয়, কিন্তু কিছু তো খায় না। "দোয়াদশীর দিন যে ডবল খাস্ লো"—বলে বড়োবৌ বাড়ী মাথায় করে। বড়োবৌ বড়ো-কর্তাকে ভয় দেখায়, বোন্‌কে এক্ষুনি বাড়ী থেকে বিদেয় না করলে রক্তগঙ্গা হবে। দাদার আদেশে দ্বিরুক্তি না করে বোন নীরবে ভিটে ছেড়ে পথে বেরোয়। —ঘটনাটা বলে সৌদামিনী কৌতুক করে বলে, কোন্‌দিন এরাও হয়তো একে এমন করবে। জায়েরা তখন সৌদামিনীকে চুমো খেয়ে আদর করে বলে,—"দূর্ ছুঁড়ী! আমাদের তুই যে ভাতারের চেয়েও বেশী পীরিতের লোক!

একদিন মেজোবৌ কমলার মেজাজ চড়ে যায়। কে নাকি বলেছে, এরা কর্তাদের বিগ্‌ড়োবার চেষ্টা করে কিন্তু কর্তাদের জন্যেই পেরে ওঠে না। "ভাল কোল্লেম আমরা, আর যশের ভাগী হলেন কর্ত্তারা।" আমি আজ সতেরো বৎসর এই ভিটেতে এসেছি, এই সতেরো বৎসর কেবলই এইরূপ। গিন্নীরও বিশ্বাস, আমরা নিশ্চয়ই ঘর ভাঙ্গা মেয়ে, কেবল ওঁর গুণবান্ ছেলেদের গুণেই আমরা কিছু কোর্ত্তে পারি না। বাবুদেরও বিশ্বাস, তাঁরাই দেবতা, আমরা সব পেত্নী, কেবল তাঁদের ভয়েই চুপ করে আছি।" সবাই মিলে তারা একটা মজা করবে ভাবে। তারা প্রমাণ করিয়ে দেবে যে তারাই শয্যাগুরু, তাদের ইচ্ছেতে ঘর যেমন ভাঙে, আবার তাদের ইচ্ছেতেই ভায়ে ভায়ে মিলে

মিশে থাকে। বাড়ুজ্যেবাড়ীর এই যে মিল, এটাও তাদের ইচ্ছেতেই আছে। নইলে পুরুষরা তো ভ্যাড়া মাত্র। বৌরা সবাই স্বামীর কাছে পরস্পরের নামে লাগিয়ে দেখবে স্বামীরা পৃথক হয় কীনা। স্বামীরা যখন সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে, তখন বৌরা তাদের অভিনয় ফাঁস করে দিয়ে আবার মিলে মিশে থাক্‌বে। নৃত্য বলে, "শেষ যেন তামাসা কোর্ত্তে গিয়ে সত্যি হয়ে না পড়ে!" বৌরা হেসে তার অমূলক ভয় উড়িয়ে দেয়। সেজোবৌ নির্মলা ভাবে, তার স্বামী শচীপতি একদিন কথা দিয়েছিলেন, যদি কোনোদিন তাঁকে সে আহাম্মক বানাতে পারে তবে তিনি তাকে 'সুযি্য হারে' পাথর বসানো বাবদ কুড়ি হাজার টাকা দেবার জন্যে দাদাকে বল্‌বেন। উমাপতির কাছেই যা কিছু বলার বলতে হয়, কারণ তিনিই বড়ো।

অভিনয় সুরু হয়ে যায়। পরদিন সকালে গিন্নী উঠে দেখেন, বৌরা কেউ ওপর থেকে নামে নি। কাপড় চোপড় কাচা সব কাজ পড়ে আছে। বড়োবৌকে ডাক্‌লে বড়োবৌ বলে, তার বড়ো মাথা ধরেছে। মেজোবৌকে ডাক দিতে গিয়ে তিনি দেখেন, সেজোবৌয়ের সঙ্গে সে ঝগড়া করছে। "তা তোর কেন্‌লা এত তেজ? ঠাক্‌রুণকে বলে দিবি ভয় দেখাচ্ছিস্? ঠাক্‌রুণ ফাঁসী দেবেন আর কি!" মেজোবৌ কমলা কাঁদতে কাঁদতে শাশুড়ীর কাছে এসে বলে,—"বলি রোজ রোজ যে তোমার সেজোবৌ—তোমার সো-বৌ আমাকে এমন কোরে গঞ্জনা দেয়—কেন গা? আমার কি মা বাপ নেই!" মেজোবৌ কমলা চলে গেলে সেজোবৌ-নির্মলা এসে শাশুড়ীকে বলে,—"মা! আমায় এখুনি বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর এ বাড়ীতে একদণ্ড থাকতে চাই না,—মেজদি কিনা অকারণ আমাকে যাচ্ছেতাই বল্লেন!" সে কান্না জুড়ে দেয়। নির্মলা নাকি মেজদিকে বলেছিলো, তার মেয়ে তার চিরুণী কোথায় ফেলেছে, তাই বলে নির্মলা চিরুণী নিয়ে কদ্দিন চল্‌বে। তাতে কমলা নাকি তাকে "একল্‌ষেঁড়ে" "ছোট লোক-কুঁদুলি" এইসব গাল দিয়েছে।

গিন্নী অবাক্ হন। তিনি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন! চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়ায়। তিনি ছোটোবৌ সরলাকে ডেকে এসব ব্যাপার জিজ্ঞেস করলে, ঔদাস্য আর বিরক্তি মিশিয়ে ছোটোবৌ বলে, সে ওপরে বই পড়ছিলো, এসব সে জানে না। ছোটোবৌ অভিনয়ে পটু নয়। অনেক কষ্টে সে হাসি চেপে রেখে কোনোরকমে একথা বলে চলে যায়।

রাত্রে শয্যায় বড়োবৌ প্রমীলা রাগ করে শুয়ে থাকে। উমাপতি জিজ্ঞেস

করে, কি হয়েছে। প্রমীলা বলে, এ সংসারে সুখ নেই—রোজই গণ্ডগোল। "সেদিন বের কোনে ঘরে তুলেছি যে সেজোবৌ, এখন তার মুখের কাছে দাঁড়ায় কে? মেজোবৌয়ের যত বয়েস হচ্ছে, তত যেন তেজ বাড়ছে।" মেজোবৌ আর সেজোবৌয়ে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। দুজনেই না খেয়ে ঘরে শুয়েছে। স্বামীকে প্রমীলা বলে, ভাইদের দেখেও কি সে কিছু বুঝতে পারছে না? আজকাল ভাইরা কেমন আলাদা ভাব দেখায়। সেজ ঠাকুরপো অর্থাৎ শচীপতি নাকি মোকদ্দমা জিতে মক্কেলের কাছে থোক নগদ কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছিলেন। সে টাকা উমাপতির হাতে না দিয়ে তিনি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছেন। অবশ্য সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন। উমাপতি তখন ভাবে, সেইজন্যেই বুঝি এর মধ্যে একদিন শচীপতি এসে কি যেন বল্‌বে বল্‌বে বলে আর বলে নি।

এদিকে কমলাও প্রমীলার মতো রাগ করে শুয়ে থাকে। সতীপতি এসে একটু উদ্বিগ্ন হয়। কমলা বলে এভাবে চব্বিশ ঘণ্টা ঝগড়াঝাঁটির চেয়ে পৃথক হওয়া ভালো। এতে সতীপতি একটু চটে যায়, বলে শুধু স্ত্রী বলেই তাকে ক্ষমা করলো। কমলা বলে আজ সে অনাহারে আছে। ভেবেছিলো স্বামীর কাছে দুঃখের কথা বলে কষ্ট লাঘব করবে, কিন্তু স্বামীও স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না। ইতিমধ্যে সেজোভাই শচীপতি এসে সতীপতির দরজা ধাক্কা দেয়। এসে বলে, ঘরে নির্মলার জন্যে ঘুমোতে পারছে না, বৈঠকখানায় শোবে, সতীপতির কাছে চাবি আছে, চাবিটা দিক। শচীপতি চলে গেলে কমলা সতীপতিকে শচীপতির কথাগুলোর বিকৃত অর্থ করে বোঝায়। বলে, আসলে শচীপতি কমলাকেই গালাগালি দিয়ে গেলো। সতীপতি নাকি নেহাৎ সরল তাই বুঝতে পারে না। বাধ্য হয়ে সতীপতি বলে, যাহোক এ ব্যাপারে কাল একটা হেস্তনেস্ত হবে। ওষুধ ধরেছে দেখে খুসী মনে কমলা স্বামীর পা কোলে টেনে নিয়ে পদসেবা আরম্ভ করে দেয়।

পরদিন উমাপতির কাছে সতীপতি এসে পৃথক হবার কথা বলে। দিনরাত এমন "কিচিমিচি-ঝিকিঝিকি"র চেয়ে যে যার দূরে থাকাই ভালো। উমাপতি উত্তর দেয়,—"কিচিমিচি-ঝিকিঝিকি স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ, তারা সতীসাধ্বী পরম গুণবতী হোলেও পরস্পরের হিংসাদ্বেষ কোত্তে কুণ্ঠিত হয় না।" সতীপতি বলে,—বাড়ীর মধ্যে যে কাণ্ড চল্‌ছে, উমাপতি অগ্রাহ্য করলেও সতীপতি তা পারে না। ইতিমধ্যে শচীপতি আর সীতাপতি আসে।

নিজেদের স্ত্রীর কথা উঠিয়ে সতীপতির সঙ্গে শচীপতির কথা কাটাকাটি—শেষে ঝগড়া হয়। সতীপতির মতো শচীপতিও বলে,—পৃথক হয়ে যাওয়াই ভালো। সীতাপতি বলে, এ ব্যাপারে তারও অমত নেই। উমাপতির মনের মধ্যে ব্যথা গুমরে ওঠে। এতোদিনে সংসারে বুঝি ভাঙন ধরলো।

পৃথক হবার ব্যবস্থাই তারা শেষে করে। কিন্তু আগের থেকেই আলাদা আলাদা ভাব আরম্ভ হয়ে যায়। আগে গ্রামের কতো দুঃখীকে এরা বস্তা বস্তা চাল পাঠিয়ে সাহায্য করেছে। এখন বাড়ীতে ভিখারী এসেও ফিরে যায়। বৌরা যার যার ছেলেমেয়েদের জলখাবার নিজের ঘরে বসিয়ে খাওয়ায়। কিন্তু বৌদের যাই হোক মেয়েমানুষের মন! অভিনয় করতে গিয়ে কান্না পেয়ে যায়। তাদের স্বামীরা সর্বদা চোখের জলে ভাসছেন, ভাইদের কাছে এমন আঘাত (!) তাঁরা কোনোদিনই আশা করেন নি। তাছাড়া পরম দেবতা স্বামীর কাছে দিনের পর দিন মিথ্যা কথা, প্রতারণা করছে—নরকেও স্থান হবে না! গুরুজনদের নামে অপবাদেরও কোনো মার্জনা নেই।

রবিবার সকালে পাড়ার কর্তাব্যক্তিদের সামনে সমস্ত ভাগ বাটোয়ারা হবে। উমাপতি ভাবে, ভালভাবে এ সব চুকে যাওয়াই ভালো, নইলে আদালত হলে বাঁড়ুয্যেবাড়ীর মর্যাদা নষ্ট হবে। কমলা ভাবে,—"এদের একবার ভাল কোরে শিক্ষা দিতে হবে। চোকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, পুরুষ সহস্র লক্ষ্মীমন্ত হউক না কেন, গৃহিণী গুণবতী না হোলে গৃহস্থের সুখ হয় না।"

রবিবারের দিন সকালে লম্বোদর, খুড়ো, ন্যায়বাগীশ ইত্যাদি পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিরা এসে জড়ো হয়। এরা এক এক জনের হয়ে টানচে। বট্‌ঠাকরুণ, ন-খুড়ী, বিন্দি-দিদি—এরাও সবাই আসে। এরাও এক এক বৌয়ের হয়ে টানচে। বট্‌ঠাকরুণ মন্তব্য করে,—"সোনার সংসার ২, এই নাও তোমাদের সোনার সংসার!" ন-খুড়ী মন্তব্য করে,—"সত্যি বট্‌ঠাকরুণ, মাগীদের যেমন তেজ, তেমনি হয়েছে। আমরা যখন জায়ে জায়ে ভেন্ন হই, মাগীরে বড় নাক সিঁট্‌কে ছিল! বলে—গোবর পোড়ে, ঘুঁটে হাসে।" বেশী তেজ ভালো নয়। ইতিমধ্যে বট্‌ঠাকরুণরা এক এক বৌয়ের দিক টেনে কথা বলতে গিয়ে শেষে নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া চুলোচুলি আরম্ভ করে দেয়। নৃত্যকালী এসে বট্‌ঠাকরুণদের চুলোচুলি থামায়। এদিকে লম্বোদরদের মধ্যেও ঝগড়া বাড়তে বাড়তে ক্রমে হাতাহাতি সুরু হয়ে যায়। খুড়ো ন্যায়বাগীশের টিকি ধরে ভূতলে গড়াগড়ি যায়। সতীপতি তাদের তিরস্কার করে থামিয়ে দেন।

"কর্ত্তাপক্ষগণ, গৃহিণীগণ! আপনারা সব ক্ষান্ত হোন্!"—এই বলে প্রমীলা বক্তৃতার ভঙ্গীতে সব অভিনয়ের কথা একে একে ফাঁস করে দেয়। সোনার সংসারটা শুধু তাদেরই গুণে টিঁকে আছে, এটা প্রমাণ করবার জন্যে সবাই মিলে যুক্তি করে এই অভিনয় করেছে। বৌদের পক্ষ থেকে প্রতারণার জন্য ক্ষমা চায়। এমন মর্মান্তিক তামাসা দেখে স্বামীরা হতবাক হয়ে যায়। বৌরা তখন স্বামীদের নির্বোধ বলে দোষারোপ করে। শচীপতি সানন্দে উমাপতিকে বলে সেজোবৌকে সূর্য্যিহার গড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। শচীপতিকে তার স্ত্রী আহাম্মক বলে প্রমাণ করিয়েছে। লম্বোদর মন্তব্য করে, —"বেটীরে আমাদের গ্রামশুদ্ধ লোককে বিষ্ঠের অধম করে দিলে।" কমলার মন্তব্য আজ সত্যি হলো!—"পুরুষগুলো ত আমাদের অজ্ঞান সংস্কারবিহীন শিষ্যি বিশেষ। আমরা রমণী—পুরুষের শয্যাগুরু!"

(ঙ) স্ত্রীসর্বস্বতা ও অন্যান্য সমস্যা ॥—

পিণ্ডদান (কলিকাতা—১৮৮২ খৃঃ)—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়॥ যৌগিক ক্ষেত্রে স্বামীর ব্যক্তিত্বের নাশ সম্পর্কে সতর্কীকরণের মূলে পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে লেখকের সচেতনতা যা-ই থাকুক না কেন, নিছক স্ত্রীসবস্বতার বিরুদ্ধে যৌগিক ক্ষেত্রেই লেখকের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে।

কাহিনী।—নিত্যানন্দ গোস্বামী একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। সে অত্যন্ত স্ত্রৈণ। স্ত্রী কোনো সত্যি ঘটনাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিলে সেটা সে অবিশ্বাস করতে দ্বিধাবোধ করে। আবার স্ত্রীর কাছে যদি সে কোনো অবিশ্বাস্য কথা শুনে সংশয় প্রকাশ করে, তখন তার স্ত্রী কপট অভিমান করে। সুতরাং বিশ্বাস করা ছাড়া নিত্যানন্দের আর কোনো উপায় থাকে না। সকলে তাকে স্ত্রৈণ বলে বিদ্রূপ করে এজন্য সে দুঃখিত, কিন্তু স্ত্রীর মৌখিক প্রেমোচ্ছ্বাসে আবার সব দুঃখ সে ভুলে যায়। স্ত্রী বলে,—"তা না হলে আমার বাপের একটা ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে এখানে এই সামান্য কাঁচের চুড়ি সোনার চুড়ি বলে পরে আছি এই বিলাতী সাড়ি আমার এখন বারাণসী সাড়ি অপেক্ষাও আদরণীয়।" নিত্যানন্দ আহ্লাদে গদগদ হয়।

এমন স্ত্রীসর্বস্ব নিত্যানন্দকেও কাজের জন্যে একবার বাধ্য হয়ে বাইরে বিদেশে যেতে হলো। স্ত্রী বিনোদিনী তার সঙ্গে যেতে চাইলো। লোক-

লজ্জায় পড়ে নিত্যানন্দ তাকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করলো স্ত্রীকে বল্‌লো, তার বন্ধু বিনয় মাঝে মাঝে এসে দেখা শোনা করবে, কোনো ভাবনা নেই।

নিত্যানন্দ চলে গেলো। বাড়ীতে রইলো শুধু নিত্যের পিসীমা আর স্ত্রী বিনোদিনী। যাবার আগে বিনয়কে নিত্য বলে গেছিল,—"অধিক কি বল্‌বো আজ অবধি তুমিই ও বাড়ীর একমাত্র কর্তা।" বিনয় উপলব্ধি করে, কর্তা সে অনেকদিনেরই। কারণ বিনোদিনীর সঙ্গে তার অনেকদিন থেকেই অবৈধ প্রেম জন্মেছিলো। বিনয় মনে মনে বলে,—"তোমার প্রবাস আমার সেই সহবাসের নিমিত্ত। যাই এবার গোঁসাইকুল উদ্ধারের চেষ্টা দেখি গে।"

নিত্যানন্দের অনুপস্থিতিতে দুজনের অত্যন্ত সুবিধে হলো। কয়েকদিন ধরে প্রেমালাপ চলে। বিনয় থিয়েটারের অভিনেতা। বিনোদিনীকে সে বলে, তাকেও নাকি অভিনেত্রী করে থিয়েটারে নামাবে। ঘরের মধ্যেই নব রুক্মিণী হরণের পালার রিহার্সাল হয়—সাহেব সেজে বিনয় কৃষ্ণের অভিনয় করে, আর মেমের পোসাক পরে বিনোদিনী হয় রুক্মিণী। ঐ ঘরেতেই 'রুক্মিণী হরণ' পালার সঙ্গে বস্ত্রহরণ পালাও সাঙ্গ হয়।

কয়েকদিন পর নিত্যানন্দ বিদেশ থেকে ফিরে এলো। তখন ঘরের মধ্যে বিনয় আর বিনোদিনী প্রেমালাপে ব্যস্ত ছিলো। নিত্যানন্দের সাড়া পেয়ে বিনোদিনী বিনয়কে পাশের চোর-কুঠ্‌রিতে লুকিয়ে রাখ্‌লো। অন্ধকার ঘর। নিত্যানন্দ ঘরে ঢোকে। স্ত্রীর চাঁদমুখ দেখবার জন্যে সে বিনোদিনীকে প্রদীপ জাল্‌তে বলে; ঠিক এমন সময় চোর কুঠ্‌রির দিক থেকে ভৌতিক স্বরে কে যেন জল চাইলো। বিনোদিনী তখন স্বামীকে বলে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রতিদিনই এমন ভূতের উপদ্রব চল্‌ছে। নিত্যানন্দ বিনোদিনীর সাহসের প্রশংসা করলো এবং অভয় দিলো। কিন্তু তার নিজের বুকের মধ্যে কাঁপুনি সুরু হলো। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে সে ভূত অর্থাৎ লুকিয়ে থাকা বিনয়কে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে। ভৌতিক স্বরে বিনয় বলে যে, সে নিত্যানন্দের পিতা হরানন্দ গোস্বামী। শুনে নিত্যানন্দ বিস্ময় বোধ করলো। সাবিত্রী-চতুর্দশী ব্রতে পুরুতগিরি করে সে একটি ডাব এনে ঘরে রেখেছিলো। সেটি সে হাত বাড়িয়ে ভূতকে পান করতে দিলো। ভূত তা পান করে তার মধ্যে প্রস্রাব করে নিত্যকে তা প্রসাদ বলে পান করতে বল্‌লো। নিত্য মুখ বিকৃত করে তা পান করলো, কিন্তু অন্য রকম কোনো সন্দেহ তার মনের মধ্যে ঢুকলো

না। সে একটু ক্ষুণ্ণ হলো এই ভেবে যে তার পিতা এখনো প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

পিণ্ডদান করবার উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ গয়ায় যাবার জন্যে আবার প্রস্তুত হলো। স্বামী বিচ্ছেদের ভয়ে স্ত্রী আবার কাঁদবার ভান দেখায়। নিত্য তখন তার বিদেশ থেকে পাওয়া একশত টাকা তার স্ত্রীর হাতে দিয়ে সামান্য কিছু পাথেয় নিয়ে গয়ায় রওনা হলো। বিনোদিনীও এদিকে যথারীতি স্বামীর দেওয়া একশত টাকা পাথেয় করে বিনয়কে নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলো। ঘরে ফিরে এসে নিত্যানন্দ সবকিছু জানতে পেরে নিজের অদৃষ্ট আর আক্কেলকে ধিক্কার দেয়, আর অনুশোচনা করে। "কি ছার একপুরুষের পিণ্ড দিতে গিয়ে সর্ব্বস্ব-ধন চৌদ্দপুরুষকে হারালেম। এই নিমিত্ত বোধ হয় আজকাল লোকেরা পিণ্ডদান দূরে থাক্, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করেন না, আর যেন কখন কেহ নাও করেন, তাহলে আমার মতন সর্ব্বনাশ হবে।"

খোকাবাবু (১৮৯০ খৃঃ) রাজকৃষ্ণ রায়॥ স্ত্রীসর্বস্বতা পারিবারিক শাসনকে শিথিল করে। ফলে সন্তান পালন কিংবা সন্তান শাসনে বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ক্ষতির বীজ আহিত করা হয়। এই প্রহসনটিতেও স্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কাহিনী।—দয়াল একজন সচ্ছল গৃহস্থ। তার সঙ্গে সর্বদা ফেলারাম আর মনসারাম নামে দুজন মোসাহেব ঘুরে বেড়ায়। দয়াল তাঁর নিজের স্ত্রীকে যমের মতো ভয় করেন। তাঁর একটা ছেলে আছে—খোকাবাবু বলেই সবাই তাকে ডাকে। দয়ালের স্ত্রী তাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে বেপরোয়া আর খামখেয়ালী করে তুলেছে। সে যা ইচ্ছে করে, সেটা কার্যকরী করবার জন্যে মোসাহেবদের—এমন কি স্বয়ং দয়ালেরও চেষ্টার অন্ত নেই। অনেকটা গিন্নীর ভয়েই এসব হয়, খোকাবাবু যদি হুকুম তামিল হয় নি বলে তার মার কাছে অনুযোগ করে, তাহলে দয়াল চোখে অন্ধকার দেখবে। দয়াল যখন খোকাবাবুর আদেশকে এতো গুরুত্ব দেয়, তখন মোসাহেবরা তো দেবেই। খোকাবাবুর অনুরোধেই একদিন দয়ালকে মোসাহেবদের দিয়ে কাছা খোলাতে হয়। এমন কি খোকাবাবুর অনুরোধে একদিন মোসাহেব মনসাকে মনিব দয়াল নিজের কাঁধে নিতে বাধ্য হয়।

বাইরে সাহেবরা তাঁবু ফেলেছে। সেখানে তারা শোয়। তখন শীতকাল। খোকাবাবু আব্দার করে, সে তাঁবুতে ঘুমোবে। দয়াল খোকা-

বাবুর এ ধরনের একটা উদ্ভট ইচ্ছে শুনে হতভম্ব হয়ে যান। এমন সময় গিন্নী দয়ালকে তাগাদা দেন, কেন দয়াল খোকাবাবুর ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। গিন্নী বিবিয়ানা পছন্দ করে এবং খোকাবাবুর মতোই চঞ্চল প্রকৃতির। তিনি বলেন, তিনিও তাঁবুতে ঘুমোবেন।

তক্ষুণি তেওয়ারীকে দিয়ে তাঁবুর জন্যে বুল্ সাহেবকে চিঠি পাঠানো হয়। তাঁবুর জন্যে প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচা হবে, দয়াল একটু চিন্তিত হলেও গিন্নীর ধমকে দয়াল বিনা আপত্তিতে পঞ্চাশ টাকা বার করে। ব্যাপার দেখে মালী ভাবে,—"বড়মানুষের খেয়ালি ভাই। আমরা একমাস খাটি পাঁচটাকা মাইনে পাই, আর তাঁবুর বেলা একদমে পঞ্চাশ টাকা। সাহেব না হোলে বাঙ্গালী ঠকে কই? বাঙ্গালী যেমন বুনো ওল, সাহেব তেমনি বাঘা তেঁতুল।"

খোকাবাবু বাগান বাড়ীতে এসেই এক একটা আব্দার ধরে এবং ফলে চাকর মালী মোসাহেব—সকলেই নাকাল হয়। মোসাহেব মনসা বলে,—"পেটের জ্বালায় কত জ্বালাই সইতে হয়। আমার এমন ছেলে হলে কানে তালপটকা গুঁজে আগুন দিয়ে মেরে ফেলতুম।"

তাঁবুতে গিয়ে হঠাৎ গাছের ওপর শব্দ শুনে খোকাবাবু জানতে পারলো যে এটা হনুমানের শব্দ। খোকাবাবু হনুমান দেখতে চায়। কিন্তু হনুমান ততোক্ষণে পালিয়ে গেছে। খোকাবাবু গো ধরে—হনুমান সে দেখবেই। আসল হনুমানকে তো নিয়ে আসা যাবে না। তাই গিন্নীর আদেশে দয়ালকেই হনুমান সাজতে হয়। মালী হনুমানের মুখোস, তুলো ও কোৎরা গুড় সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। পটকার নলও এনে লাগানো হয় দয়ালের পেছনে।

গিন্নী লেজ ধরে দয়ালকে নাচাতে নাচাতে বললো,—"নাচ্‌রে আমার হনুমান, খেতে দেবো মর্তমান।" দয়াল লাফায়। নাচ্‌তে নাচ্‌তে দয়াল বলে,—"রাম! রাম! কপালে এতোও ছিল, ভালো আদুরে ছেলে খোকাবাবু, ভালো নেই-আঁকড়া মাগ! আমার মত যারা মেগের বশ, তাদের ভাগ্যে এম্‌নি দশ।"

বেলুনে বাঙ্গালী বিবি (কলিকাতা—মেছুয়াবাজার—১৮৯০ খৃঃ)—রাজকৃষ্ণ রায়।[১৮] এই প্রহসনেও প্রহসনকার একই দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন।

১৮। খোকাবাবু প্রহসনের পরিশিষ্ট/বেলুনে বাঙালী বিবি/প্রহসন।

অবশ্য সমসাময়িককালের একটি ঘটনার স্মৃতিও এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে। প্রহসনটির প্রথমে বাউলের গানে আছে,—

"বেলুনবাজ সাহেব ভায়া, বেলুনে তুল্‌বে কায়া,
উড়বে খুব লাগিয়ে হাওয়া, লুট্‌বে টাকা পাই ॥"

বলাবাহুল্য এখানে পার্সিভাল স্পেন্‌সার সাহেবের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। National Magazine পত্রিকায়[১৯] প্রকাশিত "Ballooning in Calcutta —past and present" প্রবন্ধে প্রবন্ধকার লিখেছেন,—The tenth attempt at balloonig in Calcutta was the one made by Mr. Percival Spencer from the Ballygunge Race Course but which unfortunately ended in failure. His next attempt was more successful for he ascended in a balloon from the Calcutta Race Course and rose to a great height whence he was blown away by a strong current of wind to the Sunderbans where he alighted at a place named Hastalibad teeming with tigers and muggers. The third from the stables of Tramway Co. at Cossipur on the চৈত্র সংক্রান্তি।...Mr. Spencer's fourth attempt will be ever memorable for, on this occasion a native of India—a Bengale gentleman named Babu Ramchandra Chatterji for the first time in the annals of India, ascended with Mr. Spencer in a balloon from the grounds of the Calcutta Gas Works in Narikeldanga."

কাহিনী।—খোকাবাবু দয়ালের আদুরে ছেলে। স্ত্রৈণ দয়াল স্ত্রীর ভয়ে খোকাবাবুকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন। খোকাবাবু যা গোঁ ধরে, যেন তেন প্রকারেণ তা করা চাই-ই। নইলে প্রলয় ঘটবে। খোকাবাবুর ইচ্ছাপূরণের জন্যে দয়ালের দুই মোসাহেব ফেলারাম ও মনসারাম নাস্তানাবুদ।

কলকাতায় বেলুন নিয়ে খুব হৈ চৈ চল্‌ছে। স্পেন্‌সার সাহেব নিজে বেলুন নিয়ে আকাশে উঠ্‌বেন। সকলের মুখে মুখে এক কথা। এমন কি বাউলরা বেলুন নিয়ে গানই বেঁধে ফেলে।

১৯। National Magazine—July 1890.

একদল বাউল বেলুনের গান করতে করতে চলছিলো, জিজ্ঞাসা করে খোকাবাবু শোনে ওরা হচ্ছে বাউল। কিন্তু খোকাবাবু নিজের বুদ্ধিতে চলে। সে বলে,—না ওরা বাউল নয়, ওরাই বেলুন। ফেলারাম মনে মনে বলে,—"ওঃ, ছেলে যেন বুদ্ধির জাহাজ এইবার দেখ্‌চি, লাটসাহেব না একে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটীর ফাইললজিকাল্ ফেলো বানিয়ে দেন!" খোকাবাবু বুঝতে পারে ফেলারাম তার কথায় কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। সে রেগে গিয়ে বলে,—"আমার কথা ঠিক নয়? বল্ নৈলে নদ্দমায় ঠেলে ফেলে দেবো!" ফেলারাম বিনীতভাবে বলে,—কলকাতায় তো নর্দমা আজকাল নেই। খোকাবাবু হারবার পাত্র নয়। তার বাবার কাছে সে আব্দার ধরে এখুনি একটা নর্দমা খুঁড়ে দেবার জন্যে। দয়াল বলেন, নর্দমা ধাঙড়ে খোঁড়ে। খোকা বলে, তবে ফেলারাম খুঁড়ুক। দয়ালরা বলে মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বররা খুঁড়তে দেবে না। খোকাবাবু বাবাকে ধরে—তার সঙ্গে জুড়ী গাড়ী চড়ে মেম্বারদের বাড়ী যাবে। খোকাকে ভোলাবার জন্যে দয়াল বলেন, তার চেয়ে জুড়ী চড়ে টিভলি গার্ডেনে চলুক। "সেখানে আজ বেলা ৫ টার সময় পার্সিভাল স্পেন্সার সাহেব বেলুনে চোড়ে, আকাশে উড়ে প্যারাসুট ধরে লাফিয়ে পড়বে।" এবার খোকা গোঁ ধরলো সে বেলুনে চড়বে। দয়ালবাবু বিপদে পড়েন। এর চাইতে নিজে হাতে নর্দমা খুঁড়ে দেওয়া ভালো ছিলো। ফেলারাম দয়াল সম্বন্ধে চুপি চুপি মন্তব্য করে,—"ঢের ঢের পুরুষ দেখেছি বাবা, কিন্তু এমন মেগের বশ পুরুষ কখনো দেখি নি—দেখ্‌ব না। গিন্নী যদি আঁচল নাড়ে, কর্তা অম্নি উল্টে পড়ে। যে পুরুষের মেগো রোগ, তার ভাগ্যে নরক ভোগ!"

কিন্তু এদিকে খোকা কান্নাকাটি জুড়ে দেয়; অধৈর্য প্রকাশ করে। বেলুন কেনা চাই-ই। যতো টাকা লাগে লাগুক। মেজাজ যখন তার চরমে ওঠে, তখন তার মুখ থেকে অদ্ভুত রকমের হিন্দী বাৎ প্রকাশ পায়। সে আসল বেলুন না পাক্, ঘুড়িওয়ালার কাগজের বেলুন নেবে—তাও যদি না জোটে, তবে ছবির বেলুন সে চায়। খোকাবাবুর তর সয় না। হাতের ছড়ি দিয়ে সে ফেলারাম ও মনসারামকে মারতে থাকে। তারা পালায়। থাকে একা দয়াল। খোকাবাবুর রাগটুকু সব দয়ালের ওপর গিয়ে পড়ে। সুতরাং দয়ালকেও ছড়ির ঘা খেতে হয়। খোকাবাবুকে কিছু বলার সাহস দয়ালের নেই। তিনি বলেন,—"তোমার মাকে বলো, তিনি যদি তোমায় বেলুন চড়তে বলেন, তাহলে স্পেন্সার সাহেবের কাছ থেকে বেলুন কিনে নিয়ে আস্‌বো।"

এদিকে দয়ালের অন্দরের ছাদে দয়াল-গিন্নী দূরবীণ নিয়ে বেলুন দর্শনে ব্যস্ত। খোকাবাবু কাঁদতে কাঁদতে মাকে গিয়ে বলে, হয় বেলুন চড়বে, নয়তো মাথা কুটে মরবে। "আহা ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস" বলে গিন্নী তাকে আদর করে। কিন্তু অধৈয খোকা মাথা কুটবার ভান করে এবং চীৎকার করে গলা ফাটায়। গিন্নী দয়ালকে ভর্ৎসনা করে বলেন,—"কাঁচা ছেলে মাথা খুঁড়ে কেঁদে মারা গেলো, তুমি মন্দারাম হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চো! শীগ্‌গির ছেলেকে কোলে তোলো, নৈলে দূরবীণ ছুঁড়ে তোমারো মাথা কানা কোরে দেবো।" দয়াল আজ্ঞা পালন করেন।

তারপর গিন্নী বলেন, খোকার বেলুনে না ওঠাই ভালো। কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন,—"বাঙালী পুরুষ বেলুনে উড়লে বাঙ্গালীরে তাকে উৎসাহ দেয় না, বরং নিরুৎসাহ করবার জন্যে ঠাট্টা বট্‌কিরে করে। তার সাক্ষী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বেচারী প্রাণের মায়া ভুলে, আত্মীয় জনের মায়া ভুলে, বাঙালা জাতকে উঁচুতে তোলবার জন্যে বেলুনে চোড়ে উঁচুতে উঠ্‌লো, কিন্তু কটা বাঙালী বাহবা দিলে, দুদশটাকা দিয়ে সাহায্য কোল্লে? আর ওদিকে স্পেন্সার সাহেব এক পলকে বাঙালীর কাছা বাঁধা লুকনো টাকাও টেনেটুনে লুটে নিয়ে চল্লো। বাহারে বাঙালী! সাহেবের ফাঁকির বাঙালী!" এবার খোকা মাকেই বেলুনে উঠ্‌তে বলে। মা তো আর পুরুষ নয়, মেয়ে। সুতরাং মায়ের চড়তে আপত্তি কী? গিন্নী বলেন,—"যা বলেছিস্ খোকা, তা ঠিক্। এখনকার কালে সবি বিপরীত। পুরুষ মেয়ে, মেয়ে পুরুষ। তাতে আবার তোর বাবার কাছে একটু একটু ইংরিজি পড়েচি। ইংরেজের দেশে বিবিতেও বেলুনে চোড়ে ওড়ে⋯তবে কি দোষ কল্লে ইংরিজি পড়া বাঙালী বিবি?"

গিন্নী তখন একটা গ্যাসভরা বেলুন বাগানে এনে ঠিক করে রাখ্‌তে হুকুম করেন দয়ালকে। দয়ালকে অবাক হয়ে থাকবার অবকাশ দেন না। মনসারাম ভাবে,—"বড়মানুষের মাগ, সুঁদর বনের বাঘ। ওরা কি না পারে? দু দশ হাজার পুরুষকে একহাটে কিনে আবার সেই হাটেই বেচতে পারে!"

বেলুন প্রস্তুত হয়। গাউন পরে নিশান হাতে বিবি এসে বেলুনে চড়েন। গিন্নী যদি উড়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হন, এই ভয়ে দয়াল দড়ি ধরে থাকেন—যদিও গিন্নীর এতে অনেক আপত্তি ছিলো। বেলুন উড়তে আরম্ভ করে। গিন্নী উড়তে উড়তে 'হুর্‌রে' আওয়াজ করেন। ওদিকে দড়ি টানাটানি করতে করতে দয়ালরা কাহিল হয়ে পড়েন।

(১৮৯০ খৃঃ)—রাজকৃষ্ণ রায়॥ পূর্বোক্ত প্রহসনটিকে খোকাবাবুর পরিশিষ্ট বলে উল্লেখ করা হলেও এই প্রহসনে তেমন কোনো উল্লেখ নেই। অথচ "খোকাবাবু" কিংবা "বেলুনে বাঙালী বিবি" প্রহসনের মতো 'জুজু' প্রহসনটিও একই দৃষ্টিকোণে রচিত। বস্তুতঃ তিনটি প্রহসনকে একটি প্রহসনের ক্রম পর্যায় বলে গণ্য করতে পারি।

কাহিনী।—দয়ালবাবু কলকাতার একজন স্ত্রৈণ ধনী। মনসারাম আর ফেলারাম নামে দুই মোসাহেব সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাঁর একটি আব্দারে খোকা আছে। গিন্নীর প্রশ্রয়ে সে অত্যন্ত বেয়ারা হয়ে উঠেছে। তবু গিন্নীর ভয়ে দয়াল তাকে কিছু বল্‌তে পারেন না। খোকাকে লেখাপড়া শেখানো দরকার ভেবে একবার তিনি মনসারামকে দিয়ে এডুকেশন গেজেটে বিজ্ঞাপন দিলেন। "একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার মহোদয়ের একটি বালক পুত্রকে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন। মাসিক বেতন পাঁচ কাঠা। তাছাড়া, এই গ্রীষ্মকালে বাগানবাড়ীতে যতদিন উক্ত জমীদার মহাশয়ের অবস্থিতি হইবে, ততদিন কর্ম্মপ্রার্থীকে রন্ধন ও ঠাকুর পূজা করিতে হইবে। সুতরাং বলাবাহুল্য যে, কর্ম্মপ্রার্থীকে স্বয়ং আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে হইবে।" মনসারাম শর্মার নামেই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনটা পড়বার সময় মনসারাম ও দয়ালবাবু দুজনেই চমকে ওঠেন—"মাসিক বেতন পাঁচ কাঠা!"—এ আবার কি! পরে বুঝলেন এটা ছাপার ভুল। কিন্তু ছাপার এই ভুলের জন্যে অনেকে এসে উপস্থিত হবে। কম্পোজিটারের দোষ দেয় মনসা। ফেলারাম কম্পোজিটারদেরই "Printers Devil" বলে অভিহিত করে। "এই দেখুন না, ও বৎসর যখন বর্ধমানের ছোট মহারাণী প্রাণত্যাগ কোল্লেন, তখন 'প্রভাতী' নামক সংবাদ পত্রে একটা অদ্ভুত রকমের খবর ছাপা—হয়েছিলো।—'আমরা বর্ধমানের ছোট মহারাণীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলাম।' পরিতপ্ত-এর জায়গায় পরিতৃপ্ত!" মনসা বলে, ছাপাখানার কম্পোজিটাররা যখন ভূত, তখন ওরা তো পরিতৃপ্ত হবেই, কারণ কেউ মলে ওদের দলভারী হয়।

মনসারাম বলে,—"এখনি কাঠ পিঁপড়ের সারের মত শিক্ষক পণ্ডিতের ঝাঁক এসে পোড়বে। দরওয়ানদের খুব হুঁসিয়ার থাক্‌তে আজ্ঞা করুন!" কাঠ পিঁপড়েই বটে। হাতে—বেতে—আর ব্যাতে (অর্থাৎ মুখে) তাদের যে বিষ, তা মনসার এখনো মনে পড়ে। মনসার কথাই সত্যিই হয়। একে একে

দশজন পণ্ডিত এসে উপস্থিত হয়। তাদের আসতে দেখে মনসা অনুমানেই বুঝতে পারে যে এরা "ছেলে পড়ানো পণ্ডিত।" মনসা বলে,—"পত্রে চিনন্তি উঠন্তি মূলো, ঝড়ে জানন্তি ছুটন্তি তুলো।" দয়াল মনসারামের বুদ্ধির তারিফ করলে মনসা বলে,—"আজ্ঞে তা না হইলে আপনার ন্যায় 'মৃৎ-শুদ্ধির' (=মুচ্ছুদ্দি। নিকট টেঁকতে পারি!"

দ্বিতীয় পণ্ডিতকে ডেকে মনসারাম বলে,—"সন্ধ্যায় দুঘণ্টা দয়ালবাবুর ছেলেকে পড়াতে হবে। রাত্রে বাগানের এক কোণে কালিয়া কোপ্তা, কাবাব রাঁধতে হবে।" কিসের কাবাব—পণ্ডিত তা জিজ্ঞেস করলে মনসারাম "সীতা-পতি বিহঙ্গের" মাংসের নাম করে। সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়ে যায়। তৃতীয় পণ্ডিত বলে,—"ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাব কোইর‍্যা বিদ্যাশিক্ষা কোইর‍্যা প্যাটের জ্বালায় কি শেষ্যা জাতিদর্ম্ম, কুলদর্ম্ম নাশ কোরমু?" সেও চলে যায়। চতুর্থ পণ্ডিত মনসারামকে বলে,—"ভাল মহাশয় রামপাখী রন্ধন কোরে ঠাকুর পূজাটা কোরবো কিরূপে?" মনসারাম বলে,—"সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ঘণ্টা নেড়ে শাঁখ বাজিয়ে পূজো করে তেমন করে পূজো করতে হবে।" চতুর্থ পণ্ডিত উস্‌খুস্ করে। মনসা বলে,—"ওগো ঠাকুর, আমিও তো তাই বল্‌চি, এখন হাজার হাজার হিন্দুর বাড়ীতে এইরূপ রন্ধন প্রচলন—সঙ্কলন। তবে আর রামপাখী রেঁধে শ্যামঠাকুরের ভোগ দিতে দোষ কি?" মনসার কথা শুনে চতুর্থ পণ্ডিত কানে আঙুল দিয়ে "রাম রাম" করে চলে যায়। তখন মনসারাম বাকী সবাইকে বলে,—"আপনারা এখন রাম রাম বলে শুকুবেন, না রামপাখীর রসে রসাবেন?" সবাই তখন বলে ওঠে,—"কাজ নি আমাদের রসানিতে। রামপাখী—কিনা মুরগী, ছি ছি, তারই কালুয়া রাঁধবো!" "রাম রাম" করতে করতে সকলেই উঠে যায়। বাকী থাকে একজন। সেই প্রথম পণ্ডিত। মনসা দয়ালবাবুকে বলে,—"হুজুর তামাসা দেখ্‌লেন? রাম আর রামপাখী একই জিনিস। 'রাম' নামে ভূত পালায়, রামপাখীর নামেও ভূত ভাগে।" তারপর মনসারাম প্রথম পণ্ডিতকে বলে—সে ত্র্যহস্পর্শে রাজী আছে কিনা। "ত্র্যহস্পর্শ" মানে সে বুঝিয়ে বলে,—"অধ্যাপনার্চ্চনরন্ধনম্। ছেলে পড়ানো, হোমের ঘি পোড়ানো আর হাতা পোড়ানো, এই ত্র্যহস্পর্শ।" পণ্ডিত খুব রাজী। সে ভাবে ভালোই হলো, মুরগীর মাংসের মতো পুষ্টিকর খাদ্য পেটে পড়বে। "আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় রেঁধে রেঁধে এ অভ্যাসটায় আমি পরিপক্ক। তা ব্রাহ্মণ সন্তান কি পূজা কোত্তে ডরায়? ওঁ নমো অমুক

দেবায় বোলে ফুল চন্দন, শাঁক ঘন্টা ভোগ নৈবিদ্যি নাড়াচাড়া কোল্লেই বস্।" সে মনসারামকে বলে,—"হিন্দু ব্রাহ্মণে যখন ভোজন কোত্তে পারেন, তখন হিন্দু ব্রাহ্মণে কেন রামপাখী রাঁধতে পারবে না? 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্য বিধীয়তে।' ফাউল তো ফাউল, আউল পর্য্যন্ত রন্ধন কোরে দেবো।" পণ্ডিত নিজের নাম বলে,—সর্বভক্ষ মুখোপাধ্যায়। মনসা নামকরণের সার্থকতা উপলব্ধি করে বলে "পাধ্যায়" কথাটা বাদ দিলেই ভালো হয়। যাহোক সর্বভক্ষ মুখোপাধ্যায়ই দয়ালবাবুর ছেলে খোকাবাবর মাষ্টার হিসেবে বহাল হলো।

খোকা এ সংবাদ জানতে পারলো। সে হঠাৎ "মলুম মলুম—গেলুম গেলুম—পুড়ে মলুম" বলে বিকট চীৎকার করে ওঠে। গিন্নী আতঙ্কে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে। জল নিয়ে ঝি ছুটে আসে। দয়ালবাবুও ছুটে আসেন। কিন্তু আগুন কোথায়, কাপড় পোড়া তো দূরে থাক, একটু গন্ধও নেই। অনেক জিজ্ঞাসার পর খোকাবাবু বলে,—"পুড়িনি, বাবা, কিন্তু পুড়নির ঝাঁঝ লেগেচে।" গিন্নীকে বুঝিয়ে বলে,—"বাবা যে কোত্থেকে একটা ছেলে পোড়ানো এনেচে।" ঝি ভাবে—"ন্যাখাপড়া শিখ্যো হবেক বোল্যা সারা বাপুলকে গপিয়ে দিলেক গা। পোড়ামুখা ছ্যানা বোড্ডো ছেঁচড়া। মোর ইমন ছ্যালা হোল্যা গলাটা টিপ্যা হাই রুণ্ডনারাল নদীর জলায় গেড়্যা রাখ্‌তিন।" খোকাবাবুকে ঝি হাড়ে হাড়ে চেনে। গিন্নী কিন্তু তখনো খোকার জন্যে ব্যস্ত।—"আহা—বাবা আমার ঘেমে তিরঘুণ্ডী হয়ে গেচে।" ওকে জল খাওয়ানো দরকার। ঝি ছুটো পাখা এনে এক হাতে খোকাবাবুকে আর এক হাতে দয়ালবাবুকে হাওয়া করে। গিন্নী দয়ালকে হাওয়া করবার কারণ খুঁজে পায় না। তার নিজেরই হাওয়া খাওয়া উচিত। গিন্নী যখন একথা দয়ালকে বলে, তখন ঝি ভাবে,— "মোর ভাতার যদ্দিপি বেঁচ্যা থাকতো, আর ই মাগী যদ্দিপি মোর সতীন হোতো, তবে মোর ভাতারের ঠেঙ্গার গুঁতোয় আর মোর টনার গুঁতোয় নাক্কেদম কোর‍্যা ছেড়্যা দিতিন।" গিন্নী খোকাবাবুকে জল খাওয়াতে গেলে খোকাবাবু বলে,—"আগে বল্ ছেলে পোড়ানোর কাছে আমাকে পোড়াবি নি, তবে জল খাবো।" দয়াল তখন খোকাবাবুকে বোঝায়—লেখাপড়া না শিখ্‌লে মুখ্যু হয়ে থাকতে হবে। খোকাবাবু বলে,—"বড়মানুষের ছেলে কোন্ কালে লেখাপড়া শেখে? বড়মানুষ বাবা যা কোরে হোক কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমায় কি জন্যে? বড়মানুষের ছেলে রঙ্গরসে ওড়াবে বোলে।" 'দুধের ছেলের' মুখে 'পাহাড়ে বোল' দেখে দয়াল গিন্নীকে দোষ দেয়। খোকাবাবু

আরও আপত্তি তোলে। তার বই বইতে কষ্ট হবে, বই ধরবে কে ? গিন্নী বলে, তাইতো, বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ইত্যাদি চামড়ায় বাঁধা ভারী কেতাবের ভার সইবে কেন ! শেষে স্থির হয়, পণ্ডিতই বইবে। তখন খোকাবাবু আর এক আপত্তি তোলে,—বসে বসে পড়তে তার কষ্ট হয়। গিন্নী তাকে বলে, সে যেন টেবিলের ওপরে শুয়ে শুয়েই পড়ে। অনেকক্ষণ পড়লে মুখ ব্যথা হবে—আবার খোকাবাবুর আপত্তি ! তখন গিন্নী বলে, পণ্ডিতই তার পড়া নিজে পড়ে দেবে। তখনো খোকাবাবুর সমস্যার শেষ নেই !—পণ্ডিত যদি বেত মারে ? গিন্নী তখন সমস্যার সমাধান করে দেয়—দয়ালবাবুই খোকাবাবুর হয়ে বেত খাবেন। দয়ালবাবু খোকাকে বোঝান,—লেখাপড়া শিখে "বড় বড় সরকারী বেসরকারী সাহেবকে বড় বড় দরখাস্ত লিখবি ; তাহলেই ক্রমে ক্রমে 'রায়বাহাদুর'—'রাজাবাহাদুর', সি. আই. ই.—সি. এস্. আই, কে. সি. এস্. আই,—কে. সি. আই. ই.—এই রকম এবং আরও কতরকম খেতাব পাবি।" খোকাবাবু খেতাব পেলে তার বাবা মাও বাদ যাবে না। দয়াল আর তার গিন্নীও তখন বড়ো বড়ো খেতাব পাবে ! গিন্নী বলে,— "আমার খোকা রাজাবাহাদুর হলে এ রাজবাড়ীর মশা, মাছি, টিক্‌টিকি, মাকড়শাটি পর্যন্তও ফস্কাবে না—টস্কাবে না।" রাজাবাহাদুর হবার লোভে শেষে খোকাবাবু পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মন ঘুরে যায়। পণ্ডিতকে তাড়াবার জন্যে সে ফন্দি আঁটে।

পণ্ডিত এদিকে পড়ার ঘরের চেহারা দেখেই ছাত্রকে চিনে নিয়েছে। সে ভাবে, এ ছেলেকে আর পড়াতে হবে না। এমন ছেলেই সে এতোদিন ধরে খুঁজছিলো। ঝি পান দিতে আসে। তার সঙ্গে মাষ্টার খোসগল্প করে। এমন সময় হঠাৎ "হাঁউমাঁউ" শব্দ শুনে ওরা চম্‌কে ওঠে। তারা দেখে একটা বিকট মূর্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। খোকাবাবু "জুজু" সেজে মাষ্টারকে ভয় দেখাতে এসেছে। ঝি এবং মাষ্টার—দুজনেই ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে মাষ্টার ঝিকে বলে,—"ও ঝি ! ঝি ! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় জড়িয়ে ধর।" শেষে ঝিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মাষ্টার পালায়। ঝি মাটিতে পড়ে যায়। খোকা ঝিকে তখন ভয় দেখায়। ঝি তার কাছে কান্নাকাটি করে প্রাণে বাঁচবার জন্যে। চীৎকার শুনে মনসারাম ছুটে আসে। "জুজু" দেখে সেও পালায়। দয়াল আর গিন্নী ছুটে এসে ভয় পেয়ে পড়ে যান। তারপর গিন্নী হঠাৎ আতঙ্কে বলে ওঠে, তার খোকাকে যদি জুজু ধরে।

ছেলেমেয়েদের ওপর জুজুর নজর নাকি বেশি! কিন্তু পণ্ডিত কোথায়? তার খোঁজ পড়ে। দয়ালবাবু বলেন, বোধহয় পণ্ডিত জুজুর পেটে গেছে। ফেলারাম এসে মন্তব্য করে,—"এ যেন রুসের ইনফ্লুয়েঞ্জা!" ইতিমধ্যে জুজু চলে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর খোকাবাবু আসে কাঁদতে কাঁদতে। সে বলে, তাকে নাকি জুজু ধরতে এসেছিলো। জুজুর কথা শোনামাত্রই সবাই তাড়াতাড়ি ছুটে পালায়। গিন্নীও বাদ যায় না। খোকাবাবু তার কোলে উঠ্‌তে চাইলে গিন্নী তখন নিজের ছেলের মায়াও করে না। সবাই চলে যায়। তখন খোকা মনে মনে বলে,—"হুঁ হুঁ কেমন জুজু! পণ্ডিত তো একদম পগার পার। বাগান শুদ্ধ তোলপাড—আমি আবার লেখাপড়া শিখ্‌বো—কলা!"

পারিবারিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত যৌগিক বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রহসন লেখা হয়েছে। আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক রক্ষণশীল সমাজের আনুকূল্যেই এগুলো প্রকাশ পেয়েছে প্রধানভাবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, এই ধরনের একই বিষয়ের কতকগুলো প্রহসনের পরিচয় এখানে উপস্থাপন করা হলো।

ষষ্ঠীবাঁটা বিষম ল্যাঠা (১৮৭১ খৃঃ)—মুন্সী নামদার (ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়)॥ জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরগৃহে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে যে আনন্দানুষ্ঠান ঘটে, তার মধ্যেকার কতকগুলো স্ত্রীঘটিত জঘন্য প্রথার কুফল দেখানোই প্রহসনটির উদ্দেশ্য। অবশ্য স্ত্রীপুরুষের সাংস্কৃতিক সংঘাতের দিকটিকে সম্পূর্ণ গৌণ বলা চলে না।

পূজাতে সাজা মজা (১৮৮৩ খৃঃ)—রামনারায়ণ হাজরা॥ যাদের স্ত্রী সাধ্বী এবং স্বামীকে ভালোবাসে, তারাই দুর্গাপূজোতে আসল আনন্দ পেয়ে থাকে। কিন্তু যাদের অল্প পয়সা এবং যাদের স্ত্রী শুধু বিলাসিতা এবং গয়নাগাটি ভালোবাসে, তারা এই পূজোতে শুধু যন্ত্রণাই পায়। তাদের কাছে পূজোর আমোদ আমোদ নয়, দুঃখ! স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত।

মাগ ভাতারের খেলা (১৮৮৭)—কানাইলাল ধর॥ একটি পুরুষ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে কিভাবে দৃষ্টিকটু দাম্পত্য আনন্দে রত হয় এবং স্ত্রীও কিভাবে এই 'খেলায়' যোগ দেয়, প্রহসনটিতে তার বর্ণনা আছে। এই খেলায় দুই পক্ষের হারজিতের ব্যাপার থাকলেও শেষে পুরুষেরই জিত হয়।

সাজার কাজে হাজার গোল বা গৃহদর্পণ (১৮৮৭ খৃঃ)—কালীকুমার মুখোপাধ্যায়॥ দুষ্প্রাপ্য এই প্রহসনটি সম্পর্কে একই প্রহসনকারের অন্য একটি প্রহসনের[২০] মধ্যে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে,—"এই প্রহসনখানিতে বঙ্গের দুইটি চিত্র চিত্রিত হইয়াছে. একটি অহিফেনসেবী আলস্য পরতন্ত্র প্রাচীনের; অপরটি ইংরাজী বাঙ্গালা শিল্পাদি শিক্ষাগর্ব্বিতা ধনাঢ্যকুলসম্ভবা মহিলা; এতদ্ব্যতীত লোক আলস্যবশীভূত স্ত্রৈণ ও মাদকাসুরক্ত হইলে যে কি প্রকার ক্লেশে পতিত হয়, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। দু একটী রাজনৈতিক আন্দোলনও আছে।" আবার সমসাময়িককালে Calcutta Gazette-এ[২১] মন্তব্য করা হয়েছে,—"Directed against the evils of the joint family system." পারিবারিক এবং যৌগিক বিষয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রহসনটিকে এখানে শেষে উপস্থাপন করা হলো।

যৌগিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সূচিত সাংস্কৃতিক সংঘাতকে কেন্দ্র করে লেখা আরও অনেক প্রহসনের নাম পাওয়া যায়। যেমন—**তিন জুতো** (১৮৮৪ খৃঃ)—নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, **মা মাগীর গলায় দড়ি, বৌয়ের হাতে সোনার চুড়ি** (১৮৮৮ খৃঃ)—হারাণশশী দে; **শাশুড়ী বৌয়ের ঝগড়া** (?)—হরিহর নন্দী; **হুড়কো বৌয়ের বিষম জ্বালা** (১৮৬৩ খৃঃ) —রামকৃষ্ণ সেন, **কলির বৌ হাড় জ্বালানি** (১৮৬৮ খৃঃ)—মুন্সী নামদার (ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়), **কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি** (১৮৬৯ খৃঃ)—মুন্সী নামদার; **ননদ ভাজের ঝগড়া** (১৮৬৯ খৃঃ)—মুন্সী নামদার;—ইত্যাদি। ব্যাপক অনুসন্ধানে তালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর।

৬। 'থিয়েটার' ও সমাজসংস্কৃতি।—

থিয়েটারের[১] বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ সংগঠনের প্রধান কারণ সংস্কৃতিগত বিরোধ। নব্য নাগরিক সংস্কৃতি থেকেই থিয়েটারের জন্ম। থিয়েটারের বাহ্য ঐশ্বর্য্য এবং বস্তুরস সঞ্চারের অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় পদ্ধতি আমাদের দেশীয় আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠানকে ক্রমেই স্থানচ্যুত করে নিজের প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। এতে

২০। বাপ্‌রে কলি—কালীকুমার মুখোপাধ্যায়; চতুর্থ কভারের বিজ্ঞাপন

২১। Bengal Library Catalogue.

১। বাংলাভাষায় প্রচলিত অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত।

রক্ষণশীল দলের গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং থিয়েটারের বিরুদ্ধে যে প্রাথমিক অনুশাসনগত দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে, তার সঙ্গে দ্বৈতীয়িক অনুশাসনগত দৃষ্টিকোণ জড়িত। অবশ্য এটা অস্বীকার করা যায় না যে প্রাথমিক অনুশাসনগত দৃষ্টিকোণও অনেক সময় আক্রমণ পদ্ধতির প্রকারবিশেষ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। নব্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকায়[২] বলেছেন,—"গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা নগরে অনেকস্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্মল রস পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড় প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে,—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশের কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষীদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।"

পূর্বের আমোদ-প্রমোদে ধর্মীয় সংস্পর্শ যতোই থাকুক, মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বিকৃত প্রকাশ তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো। এ সম্পর্কে যে সমাজের সচেতনতা ছিলো না তা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, শুকুল ধামালী গ্রামের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলেও অশ্রাব্য আসল ধামালীর অশ্লীলতা অত্যন্ত অসহনীয় বলে তা গ্রামের বাইরে অনুষ্ঠিত হতো। আসল ধামালীর কথা ছেড়ে দিলেও অন্যান্য সাধারণ আমোদ-প্রমোদ খুব সুরুচি-সম্পন্ন ছিলো না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন,[৩]—"খেঁউড় ও কবি যে কি পর্যান্ত জঘন্য ছিলো, তাহা সভ্যতার নিয়ম রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর। যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয় মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই।

নব্য সংস্কৃতিজাত "থিয়েটারের" দর্শক সমাজের রুচি যে এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিলো, সেটা সাধারণ অনুভবে বোঝা যায়। রক্ষণশীল সমাজ অবশ্য এদিক থেকেও থিয়েটার-সংস্কৃতিকে নামিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন বারাঙ্গনার কথা টেনে। বারাঙ্গনা অভিনীত থিয়েটারে গমন এবং বারাঙ্গনা-

২। বিবিধার্থ সংগ্রহ—মাঘ, ১৭৮০ শক; পৃঃ ২৩৫।

৩। বিবিধার্থ সংগ্রহ—ঐ—পৃঃ ২৩৪।

গৃহে গমন তারা একার্থবাচক বলেই প্রচার করেছেন। নব্য থিয়েটারের দর্শকদের রুচিগত দিক থেকে এভাবে আক্রমণ করা ছাড়া রক্ষণশীল পক্ষের অন্য কোনো দিক ছিলো না।

অবশ্য এঁরা তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন নট-সমাজকে। নট-সমাজ আমাদের দেশে চিরকালই ঘৃণ্য ছিলো। এদের বৃত্তি ছিলো সাধারণের মনোরঞ্জন করা। এই মনোরঞ্জনের জন্যে এদের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কার্যও সম্পন্ন করতে হতো বলে, সমাজে বিশেষ মর্যাদা এদের ছিলো না। আনুষঙ্গিক কার্যকে অতিক্রম করে বিশুদ্ধ অভিনয়ে জীবিকা অর্জন লাভজনক ছিলো না। এ নিয়ম অতীত বর্তমান নির্বিশেষে একইভাবে চলে থাকে। কারণ সমাজের ইতিহাসের মধ্যে প্রবৃত্তির ইতিহাসে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আমাদের দেশীয় পুরোনো-সংস্কৃতি-সম্পন্ন নট-সমাজের মধ্যে এই ঘৃণিত উপাদানগুলো অবস্থান করলেও এই নট-সমাজ সমাজের উচ্চবর্ণের পরিধি বহির্ভূত ছিলো। তবে সৌখীন নটবৃত্তি কিংবা অভিনয় অনুষ্ঠান উচ্চবর্ণের পরিধিভুক্ত সমাজে ঘটেছে। কিন্তু তা ব্যাপক নয়। প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ সাধারণতঃ উচ্চবর্ণ থেকেই উপস্থাপিত। তাই প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পন্ন নট-সমাজের বিরুদ্ধে প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হওয়ার অবকাশ পায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর নব্য সংস্কৃতিজাত যে নট-সমাজের পত্তন হয়, তার মধ্যে ঘৃণিত উপাদান যথেষ্ট ছিলো। প্রথমতঃ নটবৃত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু ঘৃণিত উপাদান প্রাপ্তি, এবং তার ওপর নব্য সংস্কৃতির বিষের সংযোগ নট-সমাজকে কলুষিত করেছে। তাই ভদ্রসন্তানদের এই বৃত্তি গ্রহণের মধ্যে রক্ষণশীল দলের যথেষ্ট আপত্তি ছিলো। বাঈজীর বাহ্য মর্যাদা বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া হলেও যেমন কেউ নিজের পরিবারের কোনো স্ত্রীলোকের বাঈজীবৃত্তি গ্রহণের কথা কল্পনাতে আনতে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়, তেমনি একই মনোভাব রক্ষণশীল দলের দৃষ্টিকোণে প্রকাশ পেয়েছে।

নব্য সংস্কৃতি স্কুল কলেজে নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানে সমসাময়িক যুবকদের প্ররোচিত করেছিলো। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ কলকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসে হিন্দুকলেজের যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়, তাতে ছাত্ররা শেক্সপীয়র থেকে অবৃত্তি করেছিল; কিন্তু একেও ঠিক অভিনয় বলা চলে না। তারপর বটতলার ডেভিড্ হেয়ার একাডেমির (প্রতিষ্ঠা—৭ই আগষ্ট ১৮৫১) ছাত্ররা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শেক্স্পীয়রের "মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস" নাটকের অভিনয়

করে। ১৮৫৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীতে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় (তখনো অভিনয় হয় নি) বলা হয়েছে,—"এই নাটক বিষয়ে ছাত্রগণ পারদর্শিতা প্রকাশ করিলে তাহারদিগের সম্মানের সীমা থাকিবেক না, বিদ্যালয়ের গৌরব যদিও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাচ তাহার সুখ্যাতি সৌরভে বঙ্গদেশ আমোদিত হইবেক।" অবশ্য এই গৌরব বা সম্মান সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যা ইংরেজী অভিনয়ের ক্ষেত্রেই গণ্ডীবদ্ধ। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্ররাও ইংরেজী নাটক অভিনয় করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর বুধবারের "বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকায় মন্তব্য আছে,—[৪] "অভিনেতারা সকলেই কিশোর যুবক।...কেবল হিন্দুযুবকদের লইয়া সংগঠিত অভিনেতৃবর্গের দ্বারা একটি ইংরাজী নাটকের অভিনয় এই প্রথম .....এই যুবকেরা যেভাবে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহাতে এদেশীয় জনগণের মানসিক উৎকর্ষাভিলাষী দর্শকমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।"

অভিনয় বৃত্তির ওপর ছাত্রদের আকর্ষণে গোড়াপত্তন এতেই হয়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও বালক বা কিশোরের প্রয়োজন ছিলো। রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের অভিনয় প্রথা প্রবর্তনের আগে আমাদের রঙ্গালয়ে অজাত-শ্মশ্রু বালকদের দিয়ে নারীর ভূমিকা অভিনয় করানো হতো। তাছাড়া বাস্তব সমাজে যেমন অল্প বয়স্ক বালকের ভূমিকা আছে, তেমনি নাটকেও তা থাকা অস্বাভাবিক ছিলো না। সে সব ভূমিকাতেও বালকের প্রয়োজন অপরিহার্য ছিলো। বিশেষতঃ ব্যবসার ক্ষেত্রে বালকদের অজ্ঞানতার সুযোগ গ্রহণে পরিচালক বর্গ যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে এবং ২৫শে জুন বহরমপুরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়ের পর একজন দর্শক "সাধারণী" পত্রিকার সম্পাদককে উদ্দেশ করে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। দর্শকটি লিখেছেন,—"লোকে 'থিয়েটার' একটি ব্যবসা বিবেচনা করাতে কলিকাতায় নানা দলের সৃষ্টি হইল এবং এই অবধি পাপের স্রোত বৃদ্ধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অজাত-শ্মশ্রু বিদ্যালয়ের বালকগণ পিতামাতা ও আত্মীয়গণের তাড়না তুচ্ছবোধ করিয়া বিদ্যালয় যমালয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করতঃ থিয়েটারের দলে মিশিল এবং "এয়ারকি" জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া অকুতোভয়ে মদ্যপানে ও নানা কুক্রিয়ায় রত হইল। প্রথমে কলিকাতা সহরেই

৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অনূদিত উদ্ধৃতি।

ইহার অবতারণা হয়, পরে এই সকল দল মপস্বলে যাত্রার দলের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য গমন করাতে পাপের স্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।"

উল্লিখিত অভিনয় অনুষ্ঠানে বহরমপুরের বালক সমাজে তার প্রতিক্রিয়ার কথা বল্‌তে গিয়ে পূর্বোক্ত পত্রপ্রেরক বলেছেন,—"এই দল আসিবামাত্র অলস ও অকর্ম্মন্য বালকগণের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া উঠিল, তাহারা নটগণকে কলির দেবতাবোধে নানামত উপাসনা আরম্ভ করিল, কেহ বা বাজার সরকারের ভার, কেহ বা বিজ্ঞাপন বিতরণের ভার এবং কেহ বা 'গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়লের' ন্যায় সর্ব্বকর্ম্মে পরিদর্শকের ভার লইয়া রাত্রিদিন তাহাদের বাসায় গমনাগমন করিয়া অসৎকর্ম্মে বিলক্ষণ পরিপক্ক লাভ করিয়াছেন। পিতামাতা গুরুজন কি করিবেন, তাঁহারা বিশেষ শাসন করিলেই বালকেরা নটগণের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়া অমূল্য জীবন কলুষিত করিবে। নটগণ সকলকে বলিতেছেন যে তাহারা বঙ্গমাতার দুর্দ্দশা অবনীত করিতে নিতান্ত বদ্ধ পরিকর, ইহাতে তাঁহারা সকল বাধাকে তুচ্ছ করে। স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বালকগণের আহ্লাদের সীমা নাই, তাহারা গোঁপ কামাইয়া 'পাছাপেড়ে' কাপড় ও 'জলতরঙ্গ' মল পরিয়া দেশে উপকারে প্রবৃত্ত—আর পায় কে? উৎসাহ দাতা ভুবনবাবু কল্পতরু, তিনি অজস্র অর্থবৃষ্টি করিতেছেন, সুতরাং নটগণের আহার বাহারের কোন কষ্ট না থাকায় ক্রমেই দলের পুষ্টি হইতেছে এবং নটগণ (Recruit) 'রিক্রুট' সৈন্য সংগ্রহের ন্যায় নানা কুহক মন্ত্রে বালক সংগ্রহ করিতেছেন, এদিগে সমাজের উন্নতি এই পর্য্যন্ত।"

সমসাময়িককালে থিয়েটারে বেশ্যা সংগ্রহের রীতি ব্যাপক হয়ে উঠলে থিয়েটারের সংস্পর্শ বালকদের কাছে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলো এবং রক্ষণশীল দলের পক্ষ থেকে আতঙ্কিত মনোভাব প্রকাশ করা স্বাভাবিক ছিলো। সুলভ সমাচারে[৫] "থিএটর ও কুচরিত্র নারী" নামে নিবন্ধে বলা হয়েছে,—"কলিকাতায় থিএটর লইয়া এক বিষম হইয়া উঠিয়াছে। যত বয়াটে ছেলে স্কুল হইতে পলাইয়া গিয়া থিএটরের আকড়ায় মিশে, ভাল ছেলেদেরও কুমতি দেয়। কেউ নাপ্‌তিনী সাজিতেছে, কেউ বউ হইতেছে, কেউ কনসার্টে যোগ দিয়া ফ্লুট ফুঁকিতেছেন, এরূপ অবস্থায় বালকেরা যে শীঘ্র অধঃপাতে যায়, তাহা

৫। সুলভ সমাচার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

বলাবাহুল্য। বিপদ যদি এখানে শেষ হইত, তাহা হইলেও ভাল। ইহা অপেক্ষা আরও বিপদ ঘটিয়াছে। থিয়েটারের লোকেরা সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য এবং উপার্জন লোভে বাজার হইতে স্ত্রীলোক ধরিয়া আনিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। এতদ্দ্বারা কি অল্প বয়স্ক কি অধিক বয়স্ক সকলের পক্ষেই কতদূর অনিষ্টের ভয় তাহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক। একে ত আমাদের দেশে সচ্চরিত্রের দিকে পুরুষদিগের তত দৃষ্টি নাই, তার উপরে এরূপ ব্যবহারে কয়জন লোক আপনার মনকে ভাল রাখিতে পারে? পাঠকদিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন, তাঁহারা যেন যে সমস্ত থিএটরে স্ত্রী অভিনেতা আছে, সেখানে না গমন করেন, গেলে পরে ভাল মন লইয়া ফিরিয়া আসা তাহাদিগের পক্ষে কঠিন হইবে।”

বিভিন্ন প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের সমাজে সমর্থন লাভের জন্যে সকলেই অভিনয়ের সাহায্য নিতেন। সুতরাং আপাত-দৃষ্টিতে নট-সমাজবিরোধী বিভিন্ন মতের প্রচার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দুষ্কর ছিলো বলে মনে হ'তে পারে। কিন্তু বিভিন্ন অভিনয়ের মাধ্যমে এমন কি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে এইসব মত প্রচার থেকে প্রমাণিত হয় যে, নট-সমাজও এইসব প্রচারে খুব নিরুৎসাহ বোধ করে নি। গভীর পর্যবেক্ষণেই উপলব্ধি করা যাবে যে এগুলোর মধ্যে অনেক-গুলোই বিভিন্ন নাট্য সংস্থা বা নাট্যসমাজের পারস্পরিক বিবাদ জনিত রচনা।

থিয়েটারে বেশ্যা সংগ্রহ যেমন একদিকে নট-সমাজকে আরও কলুষিত করেছে, তেমনি সমাজেও তীব্র আন্দোলন এনেছে। বেঙ্গল থিয়েটারে জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী, শ্যামা—এই চারজন বেশ্যাকে নিয়ে যে অভিনয় (১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) সুরু হয়, তাতে অন্যান্য অভিনয় সমাজের গাত্রদাহ হয়। গেরাসিম লেবেডেফ থেকে আরম্ভ করে নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারেও স্ত্রীলোকের ভূমিকা আছে। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পুরুষের দ্বারা অভিনয় হয়ে এসেছে পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ও ১৭ই জুন ন্যাশন্যাল লাইসিয়ামে এই রীতি আবার অনুসৃত হয়। কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারের স্থায়ীভাবে স্ত্রীভূমিকা স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয় হয় পেশাদারী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবশেষে অনেকেই এই পথ গ্রহণ করলেন। “নববিভাকর সাধারণী”-তে[৬] বলা হয়েছে,—

৬। নববিভাকর সাধারণী—২২শে জুলাই, ১৮৮৯ খৃঃ।

"কলিকাতার রঙ্গমঞ্চগুলি লোকের মনে এমন একটি মন্দ ধারণা করিয়া দিয়াছেন যে নাট্য সমাজে বেশ্যা না থাকিলে মন উঠে না। বেশ্যার রঙ্গভঙ্গ বেশ্যার পালট নাট্যোমোদীগণের বড়ই ভাল লাগে। নির্ম্মল আমোদে মন সরে না—কিন্তু কীর্ত্তিটি নাট্যসমাজ হইতেই ঘটিযাছে, রাজকৃষ্ণবাবু অনেক ব্যয় করিয়া নির্ম্মল আমাদের জন্য বীণা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরাও ভাবিয়াছিলাম— বীণা সুগীতি বাজাইবে, কিন্তু নাট্যামোদীগণের কর্ণে এবং চক্ষে পুরুষের চীৎকার পুরুষের নৃত্য ভাল লাগিবে কেন? ক্রমে ক্রমে ব্যয় কুলাইতে না পারিয়া বীণার তার ছিঁড়িয়া গেল। অনেক বিবেচনার পর রামকৃষ্ণবাবু বুঝিলেন, বিদ্যাধরীর করে একালে বীণা বাজান লোকের ভাল লাগিবে না। তাই এবার অবিদ্যার হস্তে বীণা দিয়াছেন।" 'সুলভ সমাচার' ও 'কুশদহ'— ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাইয়ে প্রকাশিত মন্তব্যে অনুরূপ আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে। প্রহসনেও অনেক জায়গায় এ সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য থেকে গেছে। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "ক জের খতম্" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) মতিলাল বলেছে,—"তোমাদের পাঁচজনের ভণ্ডামিতে ভুলে, আস্‌মানে দুর্গো নির্ম্মাণ করবো আশা করে ৺রাজকৃষ্ণ রায় মোচমণ্ডার একদল নিয়ে থিয়েটার করেছিলেন। বাবা সে কাঁচাপাকা মুখ নেই। তাদের কোমর ঘুরান ভাল লাগবে কেন বাবা! দুদিনেই পাত্তাড়ি গুটুতে হল!"

রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনার অভিনয়ের প্রবর্তনে কেবল রক্ষণশীল নাট্যসমাজে নয়, রক্ষণশীল সাধারণ সমাজেও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন চলেছে। অভিনয় শিল্পের দিক বিচার করলে স্ত্রীভূমিকা স্ত্রীর দ্বারা অভিনয় করাবার প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সমাজের প্রয়োজনে অভিনয় শিল্পের উন্নতিও অনস্বীকার্য। "নব্যভারত" পত্রিকায়[৭] সিদ্ধেশ্বর রায় বলেছেন,— "বাস্তবিকই রঙ্গভূমির শিক্ষা জীবন্ত। জীবন্ত এই জন্য যে, অভিনয়ই প্রকৃত চিত্রের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব স্বরূপ এবং জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী হইতে যে শিক্ষালাভ করা যায়, অভিনয় ক্রিয়া হইতেও প্রায় সেই শিক্ষাই লাভ করা যাইতে পারে।" কিন্তু অভিনয় শিল্পের উন্নতি উপায় উদ্ভাবনে নতুন কতকগুলো সামাজিক সমস্যাকে আহবান করা হয়েছে—একথা অনেক রক্ষণশীল লেখক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অভিনয়ের শিল্প সম্পর্কেও চিন্তা যে

৭। নব্যভারত—আশ্বিন, ১২৯৪ পৃঃ ২৯২। 'অভিনয়ে চরিত্র শিক্ষা'।

সমাজ মনে ছিলো না, তা নয়। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য Education Gazette এ মন্তব্য করেছিলেন,[৮] "The more such theatres are started acting will be improved and dramas composed in competition. The present theatres have no female artistes on the staff. This will be soon considered as a defect and means will be sought to remedy this detect. Some of the prostitutes are trying to receive education. If a few of such educated woman are secured happy consequences will outweigh any mischief done."

স্ত্রীভূমিকায় বারাঙ্গনার অভিনয় অনেকে সমর্থন করেছেন। এমন কি রক্ষণশীল "আর্য্যদর্শন" পত্রিকাতেও "রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা" প্রবন্ধে[৯] সমর্থনে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। (ক) পৌরাণিক যুগে বারাঙ্গনা স্বরূপ অপ্সরাদের দ্বারা অভিনয় অনুষ্ঠান সম্পাদন সম্ভব হলে বর্তমানে অসম্ভাব্যতার কোনো হেতু নেই। (খ) স্ত্রীভূমিকায় স্ত্রীলোকের অভিনয়ে স্বভাবের অনুকৃতি ঘটায় অভিনয়ে উৎকর্ষ ঘটে। (গ) মনোরঞ্জন বেশ্যাদের একটি অভ্যস্ত বৃত্তি। সুতরাং দর্শকের মনোরঞ্জনে বেশ্যার অভিনয় অধিকতর সফলতা আনতে সক্ষম, যা কুলবধূর দ্বারা আনা সম্ভবপর নয়। (ঘ) অভিনয় করলে বেশ্যাদের মনের উন্নতি এবং উন্নত জীবনযাত্রা সম্ভবপর।

বেশ্যা সংযুক্ত "বঙ্গরঙ্গভূমিতে" লর্ড লীটনের উপস্থিতি সম্পর্কে 'মীরার'—সম্পাদক যা মন্তব্য করেছেন, 'আর্যাদর্শন' তাতে আপত্তি তুলেছেন। অনেকেই আর্ট এবং সমাজ—উভয়ের মধ্যে পড়ে এ ধরনের মন্তব্যকেই উচিত বিবেচনা করেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মতো ব্যক্তি যাঁদের কাছে কেবল নীতি পাঠই আশা করে থাকি, তাঁদের অনেকেও এই ধরনের মন্তব্য করতে ইতস্ততঃ বোধ করেন নি। অনেকদিন পরে রঙ্গালয় পত্রিকায়[১০] বেশ্যাদের অভিনয় সমর্থন করে একজন 'হেড মাষ্টার' তাঁর প্রেরিত পত্রে লিখেছেন,—"রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের অংশ সামান্যা রমণী কর্তৃক অভিনীত হয়, ইহা অনেকের আপত্তির কারণ বটে, কিন্তু আমি তাহা মনে করিনা। আর সামান্য স্ত্রীলোক ব্যতীত

৮। Indian stage—Vol. II, H.N. Dasgupta. P-228.

৯। 'আর্য্যদর্শন'—ভাদ্র, ১২৮৪ সাল।

১০। রঙ্গালয়, ৯ই চৈত্র, ১৩০৭।

কুলের কুলবধূ দ্বারা যে নটীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা মনে করাটাও আমি অপমানজনক জ্ঞান করি।" কেবল কুলবধূর অভিনয়ে অক্ষমতা নয়, পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাও অন্যতম। এসম্পর্কে সিদ্ধেশ্বর রায় বলেছেন,[১১] —"ভদ্রমহিলার পক্ষে রঙ্গভূমি এখন ব্যাঘ্র ভল্লুক সঙ্কুল ভয়ানক স্থান। সুতরাং তাঁহাদিগকে অভিনয় করিতে বলাতে বা সে চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়াতে পাপ আছে।" প্রহসনেও এ সম্পর্কে মন্তব্য আছে। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "কাজের খতম্" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) মতিলাল বলেছে,—"তোমরা ত আর ঘরের মাগ বের করে দেবে না।...বাঙ্গালীর কুলস্ত্রীরা অসূর্য্যম্পশ্যা, একেবারে দশহাজার লোকের সামনে বের করে দেবে, সেটা কি ঠিক কাজ হবে! ওদের দেশে মেয়েদের গড়ন আলাদা, চরিত্রবল আছে এবং ছেলেরাও মেয়েদের ইজ্জত রাখ্‌তে জানে।"

কিন্তু রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কবিতায়, প্রবন্ধে এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার রচনায় নাট্যসংস্কার বেশ্যা সংগ্রহ এবং বেশ্যাসম্পাদিত অভিনয় ঘৃণার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। "ভবরোগের টোট্‌কা" নামে একটি পুস্তিকায়[১২] অষ্টম গীতে বলা হয়েছে,—

"তোমাদের পায়ে ধরি, বিনয় করি
যেও না সে থিয়েটারে।
যেখানে সাধ্বী সতী পতিব্রতার
অভিনয় বেশ্যা করে।"

উদ্ধৃত কবিতায় বিশেষ ধরনের আক্রমণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করে ভাবপ্রবণতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। "ভারতসংস্কারক" ও "মধ্যস্থ" পত্রিকার রক্ষণশীল দু-একটি সুপরিচিত মন্তব্য অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন। "ভারতসংস্কারক" বলেছেন,—"এ পর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্ত্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্রসন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।" 'মধ্যস্থ' পত্রিকার মন্তব্য আরও বিদ্রূপাত্মক।—"বিলাতে রঙ্গ ভূমিতে স্ত্রীর প্রকৃতি স্ত্রীর দ্বারাই প্রদর্শিত হয়।

১১। নব্য ভারত—আশ্বিন, ১২৯৪ ; পৃঃ ২৯৪।

১২। কলিকাতা—অগ্রহায়ণ, ১২৯৩ সাল।

বঙ্গদেশে দাড়ি গোঁপধারী (হাজার কামাক) জ্যেঠা ছেলেরা মেয়ে সাজিয়া কর্কশ স্বরে সুমধুর বামা স্বরের কার্য্য করিতেছে। ইহা কি তাঁহাদের ন্যায় সমাজ, সমাজসংস্কারক সম্প্রদায়ের সহ্য হয়? ইহার প্রতিবিধান আশু কর্ত্তব্য হইল। প্রতিবিধান আর কি, সত্যকার স্ত্রী লইয়া অভিনয়। রব উঠিল, 'অভিনয় স্বভাবের প্রতিরূপ, পুরুষ দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রকৃতি প্রদর্শন স্বভাবের প্রতিরূপ না হইয়া স্বভাবের হত্যা করা হয়।' অতএব 'আন্ স্ত্রী!' ...কিন্তু বোধ হয়, বঙ্গীয় কুলবতী কুল চিরকাল কঠিন নিয়মে অবরোধিতা থাকাতে নিতান্ত লাজুক ও মুখচোরা হওয়া সম্ভব বিবেচনায় নব সংস্কারকগণ তাঁহাদিগকে অবহেলা করিয়াছেন। অর্থাৎ অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া অকুলবতী জগৎ স্বামিনী বীর রমণী-তনয়াগণকে লইয়াই স্বভাবানুযায়ী উচ্চ অঙ্গের অভিনয় ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। এতদিনে বারাঙ্গনাগণ প্রকাশ্য-রূপে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রসমাজে সমাধিকার প্রাপ্ত হইল।...

অতঃপর ভাক্ত উন্নতি ভক্তগণের মনে মনে আরও কি অভিসন্ধি আছে, আমরা তাহাই দেখিবার আশায় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত কি দেখিতে পাইব! কিন্তু এত অতিসভ্যতার তেজ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা দায়।"

এইসব রক্ষণশীল গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা আর্টের চাইতেও সমাজকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। তাঁরা আর্টের উৎকর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন যে ছিলেন না, তা বলা চলে না। "নব্য ভারত" পত্রিকায় [১৩] সিদ্ধেশ্বর রায় লিখেছেন, —"...আমরা প্রথমেই রঙ্গালয় হইতে গণিকাগণকে স্থানান্তরিত করিতে দেখিলেই সুখী হই।...স্ত্রীচরিত্র পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বারা ভাল অভিনীত হয়, তাহা স্বীকার করি। স্ত্রীচরিত্রের স্বভাব, চালচলন ও ভাবভঙ্গি স্ত্রীলোকের দ্বারা যেমন সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইবে, পুরুষের দ্বারা তেমন হইবে না, তাহাও জানি। কিন্তু গণিকাগণের অভিনয়ে রঙ্গভূমির যেটুকু সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়, তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ক্ষতি হয়।"

রঙ্গালয়ে গণিকার আমদানীতে আর্টের দিক থেকে যা-ই ঘটুক, সাধারণ সমাজের সঙ্গে বেশ্যাসমাজের স্বার্থসংঘাত এবং সামাজিক উন্নতি সম্পর্কিত কতকগুলো চিরন্তন সমস্যাকেই আরও জটিল করে তুলেছে। গোলাপ বেশ্যার

১৩। নব্য ভারত—আশ্বিন, ১২৯৪ সাল

সঙ্গে[১৪] গোষ্ঠবিহারী দত্তের তিনের আইনে যে বিবাহ সম্পাদিত হয়, তাতে সমাজের অনেকেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। যদিও এইসব বেশ্যাদের অধিকাংশই সমসাময়িককালের বিখ্যাত এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের রক্ষিতা ছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্য বিবাহ সমাজের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

নব্য সংস্কৃতি যেমন থিয়েটারের কলুষতার পোষক ছিলো, তেমনি থিয়েটারও নব্য সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করেছে। থিয়েটারের মাধ্যমে বেশ্যাদের উন্নতজীবন যাপনের যে সম্ভাবনা ছিলো, সমসাময়িককালের তথাকথিত বাবুদের কুনজরে তা নষ্ট হয়েছে। নব্য বাবুদের অর্থবলের কাছে সমস্ত প্রকার রুচি ও নীতি ধুয়ে মুছে গেছে। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের "আচাভূয়ার বোম্বাচাক" প্রহসনে (১৮৮০ খৃঃ) স্বরূপ বলেছে,—"বেচারারা (থিয়েটারওয়ালারা) কত কষ্টে ঐ বেটীদের মায়ের লাথিঝাঁটা খেয়ে, খোসামোদ করে টাকা দিয়ে তবে এক একটি এক্ট্রেস সংগ্রহ করে। যাই একটু তয়িরি হয়, অম্নি চিলের মত ছোঁ মেরে বাবুরা তুলে নিয়ে যান। থিয়েটারওয়ালাদের ব্যবসাকেও ধিক, আর তোমাদের প্রকৃতিকেও ধিক্।" অন্যদিকে থিয়েটার সমাজের কুরুচিও দর্শকদের ওপর ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করে তাদের স্বগোত্রীয় করে তুলেছিলো। রচিত নাটকের সঙ্গে অভিনেতব্য নাট্যরূপে যথেষ্ট পার্থক্য থেকে যায়। নট-সমাজের রুচিবিকারের প্রভাব তাতে বর্তমান থাকে। অভিনয়ের মাধ্যমে এই বিকৃত রুচি সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠালাভের উপক্রম করেছে। "বঙ্গীয় নাট্যশালা" পুস্তকে[১৫] ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেছেন, —"আমাদের দেশের দর্শকের রুচি বলিয়া একটা পদার্থ নাই, নাট্যশালা হইতে যে রুচি গড়িয়া দেওয়া হয়, দর্শক সমাজ তাহারই অনুসরণ করেন।" এমন অবস্থায় নাট্যসমাজের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক।

তাই শালীনতা হারিয়ে একজন রক্ষণশীল লেখক তাঁর "বঙ্গীয় নাট্যসমাজ" গ্রন্থে[১৬] বলেছেন,—" নাট্যশালার ঘৃণাস্পদ অনুষ্ঠাতৃগণ! এতদিনে শিক্ষিত সমাজ তোমাদের ভণ্ডামি বুঝিয়াছেন, এজন্য তোমাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে

১৪। "শরৎসরোজিনী" নাটকের সুকুমারীর ভূমিকাভিনয়ে খ্যাতিতে 'সুকুমারী' নামে পরিচিতা।

১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ১০৪, ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

১৬। কলিকাতা, ১২৯০ সাল; মুদ্রাকর—পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

চাহেন। অতঃপর তোমরা রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ কর—রঙ্গালয় পুড়িয়া ছাই হউক। নাট্যশালা যে জগতের ঘৃণার বস্তু, তাহা আমরা বলি না, সময়ে সময়ে অভিনয় জনিত আমোদ যে বিশেষ উপকারী তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু বর্ত্তমানে নাট্যশালাগুলির অধম স্বভাব সম্পন্ন লোকদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির নীচতা দেখিয়া দেখিয়া আজ আমরা বিষম ক্ষুব্ধ হৃদয়ে উহাদের বিলোপ কামনা করিতেছি। অশিক্ষিত পশুপ্রকৃতি মনুষ্য যে নাট্যালয়ের অভিনেতা, এবং নরকের কীটতুল্য ঘৃণিত বেশ্যা যাহার অভিনেত্রী তাহা হইতে বিন্দুমাত্র উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এইজন্য আমরা দেশের সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত মহাত্মাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলির ধ্বংস করিবার সাধ্যমত চেষ্টা পাউন।"

শুধু নাট্যশালার মাধ্যমে নয়, তার অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌখীন নাট্যসংস্থা বাড়ী বাড়ী থিয়েটার করে সমাজের ধমনীতে ধমনীতে এই রুচি বিকারের বিষ সঞ্চারিত করেছে। এ সম্পর্কে "নব প্রবন্ধ" পত্রিকায়[১৭] মন্তব্যে বলা হয়েছে,—"এদেশে প্রায় পাচ বৎসর কাল নাটকাভিনয় ও গীতাভিনয়ের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। একপ আমোদ যে পূর্ব্বকালীন জঘন্য হাপ আকড়াই ও পাঁচালীর অপেক্ষা মঙ্গলজনক তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতকগুলি অভিনয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও কতগুলি বালক মিলিয়া ইহাকে জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার অতি কদর্য্য পুতুল নাচওয়ালাদের ন্যায় লোকের বাটীতে ২ ইষ্টেজ ফিট করিয়া মুচিমোণ্ডা ও মদ মারিয়া বিশুদ্ধ নাট্যামোদকে কলঙ্ক দোষে দূষিত করিতেছে।" জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের "সুধা না গরল" প্রহসনে (১৮৭০ খৃঃ) নটের উক্তি লক্ষণীয়।— "এখন নাটকাভিনয় করা বযাটে ছেলের কায হয়ে দাঁড়িয়েছে; সুরাপান করে না, এমন অভিনেতা প্রায়ই পাওয়া যায় না।"

বিভিন্ন প্রহসনে নটসমাজের যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্নীতি প্রকাশ পেয়েছে প্রাথমিক এবং দ্বৈতীয়িক অনুশাসনগতভাবে অভিনেতাদের লাম্পট্য তথা রঙ্গালয়ে বেশ্যা গ্রহণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। মদ্যপান ও লাম্পট্য ছাড়াও ব্যবসায়গত বিভিন্ন দুর্নীতিও অপ্রকাশ থাকে না। প্রহসনকারদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁরা তাদের

১৭। নব প্রবন্ধ—আষাঢ়, ১২৭৪ সাল

স্বাধীন দৃষ্টিকোণের বশে এবং কিছুটা সাংস্কৃতিক স্বার্থে এই দুর্নীতির চিত্র জ্বলন্ত-ভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাছাড়া অভিনেতব্য নাট্যরূপের অসারতা, পদ্ধতি-হীনতা, শিল্প-চেতনাবিরহিত ব্যবসায়ী মনোভাব ইত্যাদি বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে।

সমাজের ওপরে নটসমাজের প্রতিক্রিয়াও অনেক প্রহসনকার চিত্রিত করেছেন। নটসমাজের মদ্যপান ও লাম্পট্য একদিকে যেমন সাধারণ সমাজভুক্ত ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রকে যেমন শিথিল করে তুলেছে, তেমনি তাদের আকর্ষণীয় অবাস্তব চলন-বলন সমাজের অনেকের মধ্যে বিকার উপস্থিত করেছে—যাকে বলা যেতে পারে "নাট্যবিকার।"[১৮] একদিকে অবাস্তব নাট্য রচনা, অন্যদিকে অবাস্তব অভিনয় উভয়কে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, নটসমাজের অভিনয়গত ভাবভঙ্গীর ব্যাপক অনুকরণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে নটসমাজকে সশ্রদ্ধ অনুকরণ সমাজে অমঙ্গলের সূচনা করেছে। অবশ্য সব কিছুর মূলে নব্য সংস্কৃতির অবাস্তবতা ও অসারতা প্রদর্শন করবার প্রচেষ্টাই নিহিত।

থিয়েটার ও সমাজ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সমর্থনে ও বিরুদ্ধে প্রচুর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রহসনও প্রকাশ পেয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত। তবে বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণের সাহায্যে অপবাদ ক্ষালনের চেষ্টাও আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনে উপস্থাপিত সমাজচিত্রে অভিনেতৃ-সমাজ সম্পর্কিত চিত্র প্রাপ্যাতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজচিত্র ও দৃষ্টিকোণের সামগ্রিক মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে এই প্রাধান্যটুকু বিবেচনার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। সাংস্কৃতিক বিরোধের কারণ যা-ই থাকুক না কেন, দৃষ্টিকোণ সমর্থনের মাধ্যম ছিলো রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চের তাগিদে প্রচুর প্রহসন রচিত হয়েছে। এই সমস্ত রচয়িতার অনেকেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তথা নটসমাজের অন্তর্ভুক্ত অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই প্রহসনে অভিব্যক্ত সমাজচিত্রের মধ্যে থিয়েটার ও সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ এতো প্রাধান্য পেয়েছে।

কিছু কিছু বুঝি (১৮৬৭ খৃঃ)—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়॥ প্রহসনকারের প্রদত্ত "মুখবন্ধ" গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে এবং এই সঙ্গে মাত্রা নির্ধারণেও

১৮। উক্ত নামে একটি প্রহসন প্রকাশিত হয়।

সহায়তা করে। তিনি বলেছেন,—"কয়লাঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ের অধ্যক্ষবৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার সংশোধন বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায় সুরাসেবন, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা, অপব্যয়, ও অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি কএকটা প্রস্তাবে এই 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম। বর্তমানে যদিচ অনেকেই নাটকপ্রিয় হইয়াছেন, তথাপি এমত ভরসা করিনে, যে আমার এই সামান্য রচনা পাঠক-গণের প্রাণ প্রণয়িণী হইবে? বিশেষতঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের, দীনবন্ধু মিত্রের ও 'বুঝলে কিনা' গ্রন্থকর্ত্তার প্রহসনখানি রচনা যে কি চমৎকার হইয়াছে, তাহা বলাপেক্ষা আমি এই 'কিছু কিছু বুঝি'-তে যে স্থলে স্থলে তাহাদিগের নিকট ঋণী হইয়াছি, ইহাই স্বীকার করা ভাল! তবে যে কএকটি প্রস্তাবে পুস্তকখানি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দেশাচার সংশোধন বিষয়ক এইমাত্র বলিতে পারি। সুরা সেবনটী দেশের অল্প দোষাকর নহে; পান-দোষ বিস্তর অনিষ্ট হোচ্চে 'তদ্বিষয়ে যেমত উৎসাহ' অপব্যয়ে কোন প্রকার উপকার দর্শায় না 'তাহাতে অর্থব্যয় করা' নাটক অভিনয়ে অল্প-বয়স্ক চালকেরা অধ্যয়নে বঞ্চিত 'তাহার প্রমাণ' ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতায় লোকালয়ে হাস্যাস্পদ হওয়া 'তাহার ফল দর্শান' গুণগ্রাহী দেশহিতৈষী পাঠক মহাশয় মহোদয়েরা এই কএকটী প্রস্তাবের শব্দগ্রাহী ও রচনাপ্রিয় না হইয়া মর্ম্মগ্রহণ করতঃ দেশাচার সংশোধনে দৃষ্টিপাত করিলেই চরিতার্থ হইব।" প্রহসনকার নটসমাজকে বিশেষ কোনো সমাজ হিসেবে মূল্য দেন নি। তাই তিনি প্রহসনের আরম্ভে যৌন অনাচার ও দুর্নীতি প্রচারক গীত উপস্থিত করেছেন।—

"দেখে শুনে তবু জনগণে	ভাবে না ভাবনা মনে।
সুরাপান ব্যভিচারে,	পরদার পাপাচারে
সদা ফেলে লোকাচারে,	কালী মাখিয়ে বদনে॥"

নটের বক্তব্যে দেশাচার সংশোধনের উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হয়েছে।—"পুরাণ উক্তি নাটক ও গ্রন্থ এখন বিস্তর আছে। তাতে কোন মতে দেশাচার সংশোধিত হোলো না। এক্ষণে দেশের উপকার বিষয়ক নাটক কি প্রহসন করাই কর্ত্তব্য।"

কাহিনী।—বিনোদকুমারের মা রাধামণি—ছেলের দুবছর যখন বয়স, তখন তাকে কোলে নিয়ে অসহায় অবস্থা বিধবা হন। অনেক কষ্ট করে

বিনোদকে বড়ো করে তুলে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। কিন্তু বিনোদের চরিত্র খারাপ হয়ে পড়েছে। আগে বিনোদ দেরী করে আস্‌তো। বল্‌তো, লেক্‌চার শুনে আস্‌তে দেরী হয়। ক্রমে ক্রমে রাত নটা দশটাও হ্‌তো। একদিন বিনোদের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোতে লাগ্‌লো। রাধামণি বিনোদকে সুপথে ফেরাবার কোনো উপায় খুঁজে পান না। খদ্যোতেশ্বরবাবুর দলে পড়ে বিনোদ থিয়েটারের দলে মিশেছে। রাধামণি প্রথমে আপত্তি করেন নি এই ভেবে যে, বড়োলোকের সঙ্গে মিশ্‌লে বিনোদের হয়তো ভালো কিছু হতে পারে কিন্তু এখন তার ফল উল্টো হলো। রাধামণির প্রতিবেশী বরদা বলেন,—"থিয়েটারে আর যেতে দেওয়া হবে না. আমি দেখেছি, ও ছাই ভস্মে যে কত ছেলে বয়ে গ্যালো তা আর বোল্‌তে পারিনে। ও মাথামুণ্ডুতে আর তো কোন উপায় দেখ্‌তে পাইনে, কেবল বাঙ্গালা ভাষাকে আর ছেলেদের উচ্ছন্ন দেওয়া এই মাত্র।"

খদ্যোতেশ্বরবাবু সহকর্মীদের সহায়তায় থিয়েটারের জন্যে ছেলে ধরে ধরে বেড়ায়। বিনোদও এই ধরনের এক শিকার। বিশেষ করে এখন বিনোদই হিরোইনের পার্ট করে। বিদ্যুতেশ্বর হচ্ছে খদ্যোতেশ্বরবাবুর গুরুপুত্র এবং সব রকম কর্মাকর্মের সহায়ক। থিয়েটারের স্থায়ী বিদূষকের ভাষায়,—"এমন হিপোক্রিটেড্‌ আর দুটী নাই। এদিকে ত্রিকণ্ঠি, তার উপরে পদ্মবীচির মালা, হীরেবলী গায়ে, সর্ব্বাঙ্গে ছাবা কাটা, ওদিকে সুরা-অন্ত প্রাণ।" সে বলে,— "ছেলে ধোস্তে আর ত বাকী নাই; এ কিনা স্কুলে, এ কি না পাঠশালা, এ কি না লোকের বাড়ী বাড়ী, ম্যানেজার গবচন্দ্রবাবু আবার অন্য অন্য থিয়েটারের কত ছেলেকে ভাংচি দিয়ে আন্‌চেন। এ বিষয়ে বাজারে মহাশয়ের এক রকম ছেলেধরা নাম উঠে গ্যাচে, কত ছেলের যে মাথা খেলেন, তা আর বলতে পারি নে।" বিনোদকে খদ্যোৎ যে অ্যাকেট্রা 'তৈরী' করেছেন, এ ব্যাপারেও খদ্যোত সচেতন। "গত্তের শ্রাদ্ধে দিতে তো বাকী রাখি নে। মদও খেতে শিখেচে, আর ফাউল কেরি প্রভৃতি কোন অখাদ্যও খেতে বাকি নাই। এর মধ্যে মেয়েমানুষের নামে নেচে ওঠে দেখেচি।"

বিনোদকে তার মা আর বরদা মাসী আট্‌কিয়ে রেখেছে। যা কিছু লেখাপড়া সে ঘরে বসে করুক। বিনোদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকে। এর মধ্যে খদ্যোতেশ্বর বড়ালের কাছ থেকে ইংরাজীতে একটা চিঠি আসে। চিঠির শেষাংশে লেখা থাকে,—"More over a feast will take place

at ours and for which every necessary preparations have be made. Fowl curry and other meats and wine such as champagne and Rose liquor have been brought. . .K. B. ।"
বিনোদ আর স্থির হয়ে থাকতে পারে না। পেছনের দরজা ডিঙিয়ে পালিয়ে সে খদ্যোতেশ্বরবাবুর আখড়ায় গিয়ে পৌঁছোয়।

খদ্যোতেশ্বরবাবুর বাড়ীতেই ঐ দিনেই থিয়েটার। খদ্যোতেশ্বরবাবু দুশ্চিন্তায় পড়েছিলো, বিনোদ এলে সে অনেকটা আশ্বস্ত হয়। চন্নবিলাস, শিশুপাল ইত্যাদি আমন্ত্রিত ভদ্রলোকরাও এসে পৌঁছোলেন। চন্নবিলাস উইলসনের হোটেল ফেরতা। তিনি তাঁর 'অবিদ্যা' চন্নবিলাসীকে পুরুষবেশে সাজিয়ে আনলেন। তাকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণ ঠাট্টা-ইয়ারকি চলে। একদিকে থিয়েটারের প্রস্তুতি চলে, অন্যদিকে প্রাইভেট রুমে মদ মাংসের প্রস্তুতি চলে। অবশেষে দেখা যায়, অভিনেতাদের আগ্রহ প্রাইভেট রুমেই সীমাবদ্ধ। বিনোদ মত্ত অবস্থায় থিয়েটার করে। পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। থিয়েটারের নামে মাতলামির অভিনয় হয়।

খদ্যোতেশ্বরবাবুর থিয়েটার করা ছাড়া অন্য গুণও আছে। বৈষ্ণবীকে হাত করে সে ঘরের বৌঝিদের বার করে থাকে। এই বৈষ্ণবীটি বাইরে খুব ভক্ত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার অসাধ্য কোনো কুকাজ নেই। খদ্যোতের চাকর গদার মুখে মুর্গী-মদের নাম শুনে কানে হাত দিয়ে সে বলে,—"গৌর গৌর! গৌরচাঁদ, তুমি কলির মালিক থাক্তে এ সব আবার কি ঠাকুর! .... মুখে আগুন তোমার! গলিত কুষ্টি ধোরবে। মুখে পোকা পোড়বে।" আড়ালে বৈষ্ণবীকে ডেকে খদ্যোৎ বলে "রামতারকের কোচে রাঁড়ী বোনটার কিছুই কোত্তে পাল্লে না, লাভে হতে কতগুলো টাকা গ্যালো। গোবিন্দ কোলের মেয়েটাও হস্তগত হোলো না! মেদো কলুর মাগটারে কিছু কোত্তে পাল্লে না।" বৈষ্ণবী বলে, "বাবু! এ কি মুখের কথা যে বল্লেই হবে? এই মেদো-কলুর মাগকে কত লোভ দেখিয়ে কত ফোঁস ফাঁস দিয়ে, তবে আজ হস্তগত কোরেছি।" বৈষ্ণবী আবার যেন কাঁচিয়ে না বসে—একথা খদ্যোত বল্লে, তার জবাবে বৈষ্ণবী বলে,—"না বাবু। দশজনের ভদ্রলোকের মেয়ের কাছে যাই, তাদের লেখাপড়া শেখাই, এখন ও কাজ কোল্লে কোন্‌দিন কে দেখ্‌লে যে ভাত ভিক্ষাটি যাবে!" বৈষ্ণবীটি আগে মুসলমান বেশ্যা ছিলো। তারপর জীবনে সে অনেক বামুন কায়েতকে মদের প্রসাদ খাইয়ে এখন ভেক

নিয়েছে। বৈষ্ণবীর পরম পরিতোষে মুর্গী খাওয়া দেখে ফেলে চাকর গদা বলে,—"আমর! বেটী হরিনামের মালা গলায় দিয়ে দিব্বি মদমুরগী মাচ্চে!"

আশা দেখিয়ে বৈষ্ণবী খদ্যোতের কাছ থেকে দশটাকা আগাম নেয়। কলুবৌকে ভ্রষ্টা করবার ইচ্ছে বৈষ্ণবীর ছিলো না বরং খদ্যোতের ওপরে সে বড়ো একটা সন্তুষ্ট ছিলো না। বৈষ্ণবী কামিনী বেশ্যাকে মেদো কলুর বাড়ীতে এনে তাকেই কলুবৌ পদ্ম সাজিয়ে রেখে দেয়। তারপর মেদো কলু আর তার বৌকে আড়ালে লুকিয়ে রাখে। এদিককার সব ব্যবস্থা করে বৈষ্ণবী খদ্যোত বাবুকে গিয়ে বলে যে, কলুবৌ খদ্যোতের বৈঠকখানায় যেতে পারবে না। মেদো কলু দুয়েকদিনের জন্যে বাইরে থাক্‌বে, তার ঘরেই খদ্যোত যেতে পারবে। যথাসময়ে খদ্যোত মেদো কলুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়। কামিনী বেশ্যাকেই সে কলুবৌ ভেবে তার সঙ্গেই প্রেমালাপ করে। ইতিমধ্যে বৈষ্ণবী সরে পড়ে। প্রেমের দোহাই দিয়ে কামিনী খদ্যোতকে বাঁদর সাজায়। মাথায় খড়ের বিঁড়ে দিয়ে গলায় দড়ি পরিয়ে খদ্যোতকে নাচাতে আরম্ভ করে। খদ্যোত বাঁদর-নাচ নাচে। এমন সময় মেদো কলু এসে ঘরে ঢোকে। মেদোর কাছে কামিনী স্ত্রীর অভিনয় করে বলে বাঁদরটা সে নতুন কিনেছে। মেদো তাকে যথেষ্টভাবে নাচায় এবং পীড়ন দেয়। না নাচলে তাকে চাবুক মারা হয়। খদ্যোত বুঝতে পারে, মেদো কলু তাকে চিন্‌তে পেরেছে। অনুনয় করে সে মেদো কলুকে বলে,—"মাধব বাবু! আমার ঢের হয়েচে, আমি নাকে কানে খত দিচ্ছি ছেড়ে দাও।" ইতিমধ্যে রামতারকও আসেন। তাঁর বোনকেও বার করবার চেষ্টা করেছিলো খদ্যোত। এবার খদ্যোত সম্পূর্ণভাবে অপদস্থ হয়।

নাটকাভিনয় !!! (কলিকাতা—১৮৮০ খৃঃ)—দেবকণ্ঠ বাগচী॥ গঞ্জিকা-সেবী কিংবা গুলিখোর যেমন অর্থহীন প্রলাপ বকে এবং ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করে, তেমনি নাট্যাভিনয়ও সম্প্রতি অর্থহীন প্রলাপ ও ভাবভঙ্গীতে পর্যবসিত হয়েছে। গঞ্জিকা ও গুলির নেশাখোরকে দিয়ে অভিনয় করানোর চিত্রটি উপস্থাপন করবার মূলে লেখকের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যই প্রধান। তবে নটসমাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক নেশা ও তার পরিণতি প্রদর্শন করাও লেখকের যে উদ্দেশ্য এটা অস্বীকার করা যায় না।

কাহিনী।—দীনবন্ধু ঘোষ, মনোমোহন দে (মন্মোহন) ও বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের ছাত্র এবং ভারতের উন্নতির জন্যে ব্যগ্র। দীনবন্ধু বলে, কতকগুলো শিক্ষিত ভদ্র ঘরের ছেলে গাঁজা-গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে।

ভারত এখন ঐ সব গুণের জন্যেই উচ্ছন্নে যাচ্ছে। মনোমোহন বলে, রামকাকার চেহারা আগে কেমন সুশ্রী ছিলো। রামকাকা ইংরিজীও জানে একটু। একটা বইও লিখেছে, তবু কেন গুলি খায়। এখন সে-চেহারা আর কিছুই নেই। চোখ দুটো বসে গেছে। গুলিখোরদের চেহারা দেখ্‌লেই গুলিখোর বলে ধরা যায়। মনোমোহন বলে, তাদের রামকাকার মতো মধুখুড়োর গুলি খেয়ে বেড়ায়। খুড়োর পেটের পিলে দেখলে চমকে যেতে হয়। গুলিখোরদের কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতে এরা ভাবে, কি করে গুলিখোরদের—বিশেষ করে গুলিখোরদের এই দলটাকে জব্দ করা যায়! এই দলে আছে—রামচন্দ্র, কালাচাঁদ, মধুসূদন, হারাধন, রামফল, ফলহরি। শেষে মনোমোহন একটা পথ বাৎলায়। সে বলে, ওরা একদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলো। সেখান থেকে এসে ওরাও ঠিক করেছে, একটা অমন থিয়েটার তারা করবে। এখানেই এদের জব্দ করতে হবে। স্থির হয়, আগামী শনিবার এরা রামকাকার আড্ডার সবাইকে জব্দ করবে।

গুলির আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। গুলি খেয়ে সকলে নানারকম প্রলাপ বক্‌ছে। এমন সময় মাতাল সেজে দীনবন্ধু, মনোমোহন আর বিনোদবিহারী গুলিখোরদের আড্ডায় এসে ঢোকে। মাতাল দেখে ওরা সবাই ঘাবড়ে গিয়ে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনোমোহন তখন তাদের সবাইকে আট্‌কিয়ে রেখে বলে, তাদেরকে থিয়েটার করতে হবে। গুলিখোররা অগত্যা এদের কথায় রাজী হয়। বিনোদবিহারী কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্রকে বলে যে তার সে বিয়ের যোগাড় করেছে। রামচন্দ্র খুশি হয়ে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে,—মেয়েটি সুশ্রী তো? বিয়েতে চেন, ছাপর খাট, মশারী আর এক জোড়া জুতো ঐ সঙ্গে সে পাবে তো? নইলে আড্ডায় যেতে তার কষ্ট হয়। সকলের অনুরোধে পড়ে দীনবন্ধু দুটো রামপ্রসাদী গান গায়। যাবার আগে দীনবন্ধু শনিবারের কথা আবার মনে করিয়ে দেয়। ঐদিনেই থিয়েটার হবে।

শনিবার। বাড়ীর মধ্যে নাট্যশালা। সেখানে মেঘনাদবধ নাটক অভিনয় হচ্ছে। রামচন্দ্র রাবণ সেজে বসে বলে,—এখন শালারা মেয়ে নিয়ে এলো না কেন? হারাধন এই সময় দূত সেজে প্রবেশ করলো। প্রম্পটার রামচন্দ্রকে বল্‌তে বলে,—"কোন্‌ বীর রণে পতিত হয়েছে!" রামচন্দ্র সে-কথা না বলে বলে,—"কিরে আমার প্রাণেশ্বরীর এত বিলম্ব কেন? বিয়েটা যে হলেই হয়।" নাটক আর শেষ পর্যন্ত গড়ায় না। রামচন্দ্র গুলিখোরের মতো

আবোল তাবোল যা ইচ্ছে তাই বল্‌তে সুরু করে দেয়। ফলহরি চিত্রাঙ্গদা, রামফল ইন্দ্রজিৎ, কালাচাঁদ রাম এবং মধুসূদন লক্ষ্মণ সেজে প্রবেশ করে। কিন্তু সকলেই গুলিখোর। তাই ষ্টেজে ঢুকে এরা সবাই অর্থহীন প্রলাপ বকে চলে। প্রম্পটারের কোনো কথাই তারা কানে নেয় না। এমন সময় মাইকেল মধুসূদন সেজে দীনবন্ধু এবং স্বর্গদূত সেজে বিনোদ আর মনোমোহন ষ্টেজে প্রবেশ করে। দীনবন্ধু বলে, "নিন্দুক বধে পাপ হয় না। এদের ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ কর।" পুস্তক লিখে তাঁর নাকি পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক ক্ষয় হয়েছে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে যতোসব অকালপক্ক যুবকেরা যত্রতত্র থিয়েটার করছে। তাদের ফাঁসির একটা আইন পাশ করলে ভালো হয়। এই সব যুবকদের এ সময়ে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। অন্যত্র জন্মের মতো পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এমন গুলিখোর মদখোর গাঁজাখোর দুষ্ট স্বভাব পুত্র যেন কারো না জন্মায়।—এই রকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখেশুনে গুলিখোররা ষ্টেজের ওপরেই মূর্ছা যায়। মাইকেলরূপী দীনবন্ধু এদের সবাইকে বেঁধে ফেলবার জন্যে স্বর্গদূতদের আদেশ করে। ত্রাতস্থ হয়ে গুলিখোররা সবাই তখন মিনতি করে বলে,—"আমাদের আর মেরো না, আমরা আর গুলি খাবো না।" কিন্তু বিনোদ ও মনোমোহন তাদের কথা না শুনে তাদের পেটাতে আরম্ভ করে। গুলিখোররা পরিত্রাহি চীৎকার করে। দীনবন্ধু বলে,—"আমি সহজে ছাড়ব না। সকলকে নিয়ে চল, আর যিনি এরূপ করিবেন. তাহারও এরূপ দশা হবে।" এই সময়ে নেপথ্য থেকে গান হয়,—

"কেন ভারতবাসী সবে

তোমরা এখনো মোহেতে ঘুমায়ে শয়নে।"

তিল তর্পণ (১৮৮১ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু॥ প্রহসনকার সমসাময়িক-কালের নাট্যকার ও অভিনেতৃসমাজকে লক্ষ্য করে এই উদ্দেশ্যমূলক প্রহসনটি রচনা করেছেন। কারণ "উৎসর্গ পত্রে" লেখক বলেছেন,—"বঙ্গীয়, নট, নটী, নাট্যব্যবসায়িকর করস্থলপদ্মে এই কয়েক পৃষ্ঠা অনেক আশায় উপহার প্রদত্ত হইল। -গ্রন্থকারস্য।"

কাহিনী।—ম্যানেজার, অপেরা মাষ্টার, অভিনেতা—সবারই সমস্যা, শনিবার কি প্লে হবে! কেউ বলে কমলাকান্তের দপ্তর ড্রামাটাইজড্ করা হোক, কেউ অপেরা করবার প্রস্তাব দেয়। এদিকে লাভ কিছুই হয় না। অত্যন্ত রদ্দি একট্রেস্ যারা—তারাও টাকা না পেলে আস্‌তে চায় না। এমন

সময় এক নাট্যকার এসে ম্যানেজারের খোঁজ করেন। পেলারাম ম্যানেজারকে দেখিয়ে বলে, প্ল্যাকার্ডে এঁর নাম ম্যানেজার হিসাবে ছাপা হয়ে থাকে, যদিও সকলেই এখানে ম্যানেজার। থিয়েটার ম্যানেজার খুব ঘন ঘন বদল হয়। এঁকে আবার পদ্মাপার থেকে আনা হয়েছে। কলকাতার লোককে বিশ্বাস নেই। নাট্যকার বলেন, তিনি একটা ড্রামা লিখেছেন,—"এতে worldএর আহার ঔষধ দুই হবে।" নাট্যকার নকলের দিকে যান না, original thoughts নিয়ে কাজ করেন। "এ খানি হচ্ছে Farcical-Tragi-Comedy de pantomimic Operetta." এর প্লট নেই। "Plot নিয়ে সকলেই লেখে, কিন্তু এর ভাব বড় গভীর; এতে Wit আছে, Humour আছে, Blank verse আছে, নাচ, গান গালাগাল, ভারত, যবন, মূর্চ্ছা, কালিওডান, ভূত নাবান, চিতোর, সাহেব মারা, সব আছে—অশ্লীল নাই।"... "Audienceকে খুসী করতে হবে, নাচের জায়গা পাই না—মল্লিকদের মেজোবউকে খিড়কির ঘাটে নাচিয়ে দিলুম।" নাটকটির নাম তিলতর্পণ। লোকে ভাববে দীনবন্ধুকে গালাগাল। বিশেষ করে মরা মানুষকে গালাগাল! গালাগাল শুনতে Audience ভালবাসেন। তাছাড়া লেখকের ব্যঞ্জনা হচ্ছে,—চারটি তিল দিয়ে চৌদ্দপুরুষকে সন্তুষ্ট করা যায়, তেমনি একটি নাটক দিয়ে সবরকম দর্শককে সন্তুষ্ট করা যাবে। এসব গালাগালির নাটকে এই থিয়েটারওয়ালাদের এম্‌নিতেই যথেষ্ট খ্যাতি আছে। থিয়েটারের দেবেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—কেটে-কুটে ড্রামাখানা দেখা যাবে। গ্রন্থকার এতে একটু ক্ষুণ্ণ হলে দেবেনবাবু বলেন,—"মহাশয়, আপনি ত আপনি, আমি তোমারগে মাইকেলকে কেটিচি, বঙ্কিমকে কেটিচি, তোমার গে দীনবন্ধুকে কেটিচি, আমরাও নিজে বই লিখে থাকি।" বইটির আকার অশ্রুমতীর ডবল। থিয়েটারওয়ালারা আশা করলেন, বইটি 'অ্যাট্রাক্‌টিভ্‌' হবে।

থিয়েটার আরম্ভ হয়। বাপ্পারাওকে চিতোর-রাজ অন্তঃপুরে মহিষী বারণ করছে—যাতে নবাব আলিবর্দীর বিরুদ্ধে বাপ্পারাও যুদ্ধে না যান। বাপ্পা মহিষীকে বুঝিয়ে বলেন, যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ অনিবার্য। "ইহার গোপন কারণ তোমায় বলে দিচ্চি—দুরাত্মা যুদ্ধ উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কেবল সেকেলে পাথুরে কয়লার বন্দুক আছে। কিন্তু আমি কলিকাতা হইতে মার্টিনী হেনরী রাইফেল বন্দুক আন্‌তে পাঠিয়েছি।" তাছাড়া মহিষীর ভয় পাওয়া উচিত নয়, কারণ,—

"রাণাকুল রাণী তুমি, বীরপ্রসবিনী,
জনক শ্বশুর তব, বাপ্পারাও স্বামী,
তুমি কি ডরাও প্রিয়ে বিধর্ম্মী নবাবে,
বাঙ্গালী কুলের গ্লানি,—"

তখন রানী সবোদনে বলে,—"হৃদয় সর্ব্বস্ব! যদিও একান্তই রণে যাবে, ত উইল করে যাও।" ভাবী স্বামী বিচ্ছেদে মহিষী দীর্ঘ বিলাপ করতে করতে মূর্ছা যায়। বাপ্পা তখন নেপথ্যে প্রহরীদের ডাক দেন। কেউ আসেন না। তখন প্রম্পটারকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,--"বই হাতে করে দেখ্‌চ কি? শীগ্‌গির একটা পাগ্‌ড়ি জড়িয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এস না, ষ্টেজ মাটী হয় হয় যে, আমি ততক্ষণ প্যাণ্টোমাইম করি।" রানীর মূর্ছা ভাঙলে রাজা বিলাপরতা রানীকে নিয়ে কক্ষান্তরে যান। বাপ্পার মেয়ে রাজকন্যা হেমাঙ্গিনী সখের বিরহিনী। "কার জন্যে হলো সখি তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু বিরহ আমার হয়েছে নিশ্চয়!—দিনে খিদে হয় না, রেতে ঘুম হয় না, এই দেখ আমার বুক গুর্ গুর্ করছে, কপাল ঘাম্‌ছে, হাই উঠ্‌ছে, চোখ জড়িয়ে জড়িয়ে আস্‌ছে, নিঃশ্বাস ঘন ঘন বইছে, গা ঢলে ঢলে পড়ছে, আর বিরহে বাকি কি আছে বল দেখি?" সখীর সঙ্গে হেমাঙ্গিনী সুখদুঃখের কথা বল্‌ছে, দূর থেকে বাগানের অজমালী অর্থাৎ অজাগর মাইতিকে আস্‌তে দেখে হেমাঙ্গিনী বলে ওঠে,—"কি অপরূপ রূপ মাধুরি! আহা কি ভুরু, কি উরু, কি নয়ন, কি চলন, যেন কোন দেবতা দীনবেশে আজ কানন পরিভ্রমণ কচ্চেন। আহা এমন মনোহর মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই।" অজুকে হেমাঙ্গিনী বলে,—"আপনাকে দেখে অবধি আমার প্রাণ যা হয়েছে, তা আমিই জানি, আর দুষ্ট মদনই জানে, অভাগিনী কি আপনার পদসেবা যোগ্যা?" অজু অবাক্ হয়ে বলে,— "ঠাক্‌রোন, আমি গরিব চাকরের চাকর, আমাকে অমন আজ্ঞা করবেন না।" শেষে হেমাঙ্গিনীর সখী নলিনী অজুকে বুঝিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কারণ ইতিমধ্যে হেমাঙ্গিনী অজুকে বলেছে,—"জীবনকান্ত! আপনার সহবাসে আমার ভিক্ষামুষ্টিও অমৃত।" অজু চলে গেলে হেমাঙ্গিনী বলে,—"সখি, তুমি কি আমার শত্রু, প্রাণনাথকে বিদায় করে দিলে!"

এদিকে অজু কাজ করা ভুলে গিয়ে হেমাঙ্গিনীর ধ্যান করে, নিজের মনের প্রেম নিজেই আস্বাদন করে। দীর্ঘ পয়ার ছন্দে হেমাঙ্গিনীর রূপবর্ণনা করে মামুলি রীতিতে। মালীর সর্দার অজুকে ডাকলে অজু নায়কের ঢঙে খেদ

করে। সর্দার তখন টান্‌তে টান্‌তে অজুকে বাগান কোপাতে নিয়ে যায়।

আবার সিন ওঠে। বাপ্পা সৈন্যদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দীর্ঘ দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দেন। "বাঙ্গালীর ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বোধহয় দুর্দ্দান্ত সেরাজউদ্দৌলার নৃশংসতার কথা অবগত আছে, পলাশীর যুদ্ধে যাহার নিধন হইয়াছে।...আজি সেই মৃত সিরাজের ঠাকুরদা আলিবর্দ্দি খাঁ তোমাদের এত সাধের চিতোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। চিতোর ধ্বংস হইলে তোমাদের কি উপায় হইবে, তার তোমরা কি রক্ষা করিবে, কিসের জন্য যুদ্ধ করিবে, তোমাদের স্ত্রী-কন্যাগণ আর কোথায় গিয়া চিতায় ঝম্প প্রদান করিবে? আর —আর,—এত সকাল সকাল চিতোর গেলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ কবিগণ কি লয়ে নাটক লিখিবে!" রঙ্গলাল হেমচন্দ্র ও মধুসূদনকে খিচুড়ি করে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, তারপর ইংরেজী প্রথায় প্যারেড্‌ করিয়ে তাদের বাপ্পা নিয়ে চলেন —Quick March বলে।

মোসাহেবদের নিয়ে আলিবর্দির অবসর-বিনোদন চল্‌ছে। এমন সময় আলিবর্দির দূত আসে। সে বাপ্পারাওয়ের কাছে গিয়েছিলো। বাপ্পা নাকি বলেছে,--

"বাখরগঞ্জ কুমিল্লা, চাটগা খালকুলা
আউর মুরশিদাবাদ।
এ পাঁচো সহর, শিরমে লে কর
চৌপা দেগা চিতোর মে.'
তবেই সন্ধি, নচেৎ রণং দেহি, রণং দেহি,
দেহি, দেহি, দেহি মে।"

আলিবর্দি তখন সরোষে বলে,—

"নাই পেয়ে হয়েছে মস্ত,
করবো এর হেস্ত নেস্ত,
চৌরস্ত বদ্‌মাস বেটা দোরস্ত হইবে,
চবিস্থির হাঁড়িতে হিন্দুর গোস্ত পড়িবে॥"

ইতিমধ্যে একজন সৈনিক অজুকে আর হেমাঙ্গিনীকে ধরে নিয়ে আসে। অজু খেদ করে,—"ঐ আবাগী ছুঁড়িই এই গেরো ঘটালে; আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে সলিয়ে কলিয়ে বের করে আন্‌লে।" হেমাঙ্গিনী বলে,—"আহা! ভয়ে

ও প্রণয়ে প্রাণনাথ আমার জ্ঞানহারা হয়েছেন।" অজ্ কাঁদতে থাকে। আলিবর্দি বলে,—"হারামজাদ্ বাউরা, ফের যদি কাঁদবি তো একেবারে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব।" হেমাঙ্গিনী বলে,—"না নবাব, তা কখনই হবে না, যতক্ষণ আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ আপনি কি, আপনার সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী, আপনার মক্কা, মদিনা, মস্কাউ একত্র মিলিত হলেও প্রাণেশ্বরের একগাছি কেশও স্পর্শ করতে পারবেন না।" হেমাঙ্গিনী দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়। এসব দেখে আলিবর্দি তাকে পাগল ঠাওরান। কথার ঝোঁকে ভুলে হেমাঙ্গিনী দুর্গেশনন্দিনীর পার্ট মুখস্থ বলে। প্রম্পটার স্মরণ করিয়ে দেয়, এটা দুর্গেশনন্দিনী হয়ে যাচ্ছে। হেমাঙ্গিনী তখন সেটা তাড়াতাড়ি শুধরিয়ে নিয়ে আলিবর্দিকে বলে,—"পাছে আমায় ভীরু মনে করেন, তাই বলি, বিখ্যাত চিতোর-রাজ্য স্থাপক শৈলরাজ, ওরফে বাপ্পারাও আমার পিতা, মালিকুলতিলক অজাগর কেষ্ট আমার—আমার প্রণয়ী ও ভাবী হৃদয়রাজ।" রাজকন্যা হয়ে কেন সে নীচ লোকের প্রতি আসক্ত হলো, আলিবর্দির এই প্রশ্নের উত্তরে হেমাঙ্গিনী বলে, —"নবাব সাহেব বুঝি কখন প্রণয় করেন নি? অশ্বিনী একবার আস্তাবলোন্মুখী হলে কার সাধ্য যে, তার গতি রোধ করে?" আলিবর্দি তখন ভাবেন, এরা গুপ্তচর নয়, মন্দ অভিসন্ধিও নেই। নেহাৎ মস্তিস্কবিকৃতির জন্যে রাজবাড়ী ত্যাগ করেছে। বাপ্পার কাছে যদি এদের ফেরত পাঠানো যায়, তাহলে হয়তো বাপ্পা তাঁদের সন্ধি প্রস্তাবে রাজী হবেন।

মঞ্চে অভিনয় হচ্ছে, সাজঘরেও আর এক দৃশ্যের অভিনয়। দর্শকদের হাততালিতে গ্রন্থকার উৎসাহিত হয়ে সমালোচকের কাছে প্রশংসার কাঙাল হয়ে তাকান। সমালোচক ঐতিহাসিক অসংলগ্নতার কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থকার তখন উত্তরে বলেন, বিভ্রম উৎপাদন হচ্ছে দৃশ্যকাব্যের জীবন। সুতরাং অসম্ভবকে সম্ভব করবার মধ্যেই নাটকীয়ত্ব। তাছাড়া ব্যুৎপত্তি বিচারে নাটক হচ্ছে ন+আটক অর্থাৎ কিছুই আটক নেই। এদিকে ম্যানেজার উচ্ছ্বসিত হয়ে সমালোচক ও গ্রন্থকারকে মদ খাওয়ায়। অন্য সকলেও খায়। সমালোচক শেষে স্বীকার করেন,—"আমিই এর অনেক স্থান বুঝতে পারি নে, তাই থেকে আমি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে, এই নাটকখানি অতি গুরুতর ব্যাপার, কেননা, যেমন মাষ্টার পেণ্টারের পেণ্টিং হঠাৎ দেখ্‌লে কেবল কালি ন্যাপা বোধ হয়, কিন্তু ভেতরে হয়ত কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই আছে, তেমনি যে লেখা সহজে বুঝতে পারা যায় না, তারও ভিতরে অবশ্য কোন গুরুতর ভাব

আছে, আর কবিতাগুলি কি মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষর একেবারে quite original আমি যেন জনসনের স্কুল অভ স্ক্যাণ্ডালে একটা সিন পড়েছিলেম, সেটার সঙ্গে আপনার লভ সিনটা অনেকটা মেলে।" এবার সিন উঠবে, মদ খাওয়া সেরে সবাই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়।

সিন ওঠে। বাপ্পারাও কন্যার শোকে উন্মাদ। "ওরে আমার হেমা কোথায় গেলিরে বাপ!"—বলে কাঁদতে কাঁদতে রানী বেশে এক পুরুষ আসে। বাপ্পার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। রেগে বলে,—"বটে চালাকি! আমায় ষ্টেজে দাঁড় করিয়ে মাটী করবার ফিকির, আমি বুঝতে পারি না বটে? তা এই রইল তোর পাগড়ি, এই রইল তোর চোগা, সবে পাগলামিটে জমাট করে এনেছি, আর এই? তুই কে রে শালা?" প্রম্পটারকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বাপ্পা বলে,—"হেঁ রে ও বইওলা বাবু, একবার ডাক্ দেখি ম্যানেজারকে।" প্রম্পটার ষ্টেজে ঢুকে বলে, কারণ সে পরে বল্‌বে, এখন অভিনয় হোক,—অডিএন্সের সাম্‌নে এমন করা অনুচিত। বাপ্পা বলেন,—"রেখে দাও তোমার অডিএন্স, গুপো রাণী বার করতে অডিএন্সের সামনে লজ্জা হয় না!" মহিষী বলে,—"দেখুন মহাশয়, আমি amateur, আমি আপনাদের pay নিই না।" বাপ্পা বলে,—"তোকে মাইনে দেয় কে রে Rascal? অমনি থিয়েটার দেখ্‌তে পাস এই ঢের, সৈন্য টৈন্য সাজতে দিই তোদের বাবার ভাগ্‌গি। ম্যানেজারের যেমন আক্কেল, বলেন থাক থাক ওরা Serviceable hand; এই দেখ না আজ রাণীর পার্ট দেওয়া গেছে, কাল বেটা আর এক দলে গিয়ে আমাদের পরিচয় দিয়ে মেঘনাদ, পশুপতি, মোহনলাল—এই সব সেজে বস্‌বে এখন, d-d presumption! নয় কোন্ দিন manuscript চুরি করে লম্বা দিবে, mean vagabonds!"

বাপ্পাকে উত্তপ্ত দেখে প্রম্পটার তাকে বুঝিয়ে আবার নামায়। বাপ্পার পাগলামির অভিনয় এবং রানীর শোক। এমন সময় দাড়িওয়ালা নারদ এসে কৃষ্ণের ভজন গান গায়। বাপ্পা নারদকে হেমাঙ্গিনী ভেবে শির চুম্বন করে। নারদ বুঝতে পারে না, পাগ্‌লামি কি ঠাট্টা। সে বলে,—"লাগ, হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা লাগ, পাগল হয় ত সেরে যাগ!" বাপ্পার পাগলামি ঘুচে যায়। "একি! মহর্ষি নারদ যে। কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, ওরে তামাক দে রে।" নারদ বলে, তামাক সে ছেড়ে দিয়েছে। ত্রিলোকে সে ঝগড়া বাধিয়ে বেড়ায় বলে দেবতারা তার হুঁকো বন্ধ করে দিয়েছে, সেই থেকে নারদ

তামাক ছেড়ে দিয়েছে। নারদ হেমাঙ্গিনীর সংবাদ দেয়। মহিষী মূর্ছা যায়, দুজন প্রম্পটার এসে রানীকে নিয়ে চলে যায়। নারদ বলে, মালী আসলে শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র। তাছাড়া নবাবও কন্যাকে ফিরিয়ে দিতে আসছে। ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে এসে Drop Scene ফেলে দিতে বলে। কন্যা আর আসবে না। "কমিটীর বাবুরা একট্রেশ্ নিয়ে বাগানে চলেন, আবার নেতা দর্জি আগাম ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে এখন পোষাকের বাক্স লয়ে পালাল।" ইতিমধ্যে সমালোচকের সঙ্গে গ্রন্থকারের সাংঘাতিক তর্ক বেধে গেছে। সমালোচক বলেন,—অনেকদিন পর নায়ক নায়িকার দেখা হলে কেউই কথা কইবে না। গ্রন্থকারের মত তার উল্টো। ওদিকে অর্ধসজ্জিত এক্টররা এসে অসন্তোষ প্রকাশ করে। সবাই ষ্টেজ ছেড়ে শেষে ভেতরে গিয়ে গোলমাল আরম্ভ করে। ষ্টেজে একা গ্রন্থকার ক্রোধ প্রকাশ করে। "তবে কি আপনারা আর একটিং করবেন না? হায়! হায়! আমার ভাল সলিলকি-টা বলা হল না, জানোয়ার দেখালে না কালী ওড়ালে না সাহেব মারলে না।" যাহোক গ্রন্থকার সঙ্কল্প করেন পরীস্থান না দেখিয়ে তিনি শেষ করতে দেবেন না। তাই তিনি কতকগুলো সজ্জিতা একট্রেস্‌কে ধরে এনে ষ্টেজে ছেড়ে দেন। তারা এসে গান গায়,—

"আমরা সব পরী .....
যখন আছিল ডানা, ভ্রমিতাম দেশ নানা,
উড়িতে না পেরে এখন অপেরা করি।
টমটী, টমটী, টমটী টম।"

নাট্য বিকার (কলিকাতা—১৮৭১ খৃঃ,—বৈকুণ্ঠনাথ বসু॥ বৈকল্পিক ইংরেজী নাম—"The Dramatic Delirium." ললাটে 'Bunyan'-এর উদ্ধৃতি আছে,—

"Some said, 'John print it'
Others said 'Not So.'
Some said 'It might do good'
Others said 'No'."

কামিনী।—হরিশবাবু হুগলীর একজন ধনী ব্যক্তি তিনি ইদানীং বড়ো বিপদে পড়েছেন। মাস তিনেক আগে একদল থিয়েটারওয়ালা এদেশে ফেরি

করতে আসে। কুগ্রহে পড়ে হরিশবাবু তাঁর পুজোবাড়ীর উঠোনে ষ্টেজ বাঁধিয়েছিলেন। তারা চলে গেল, কিন্তু বাড়ীর চাকর বাকরদের বিশেষ করে মেয়েটিকে থিয়েটারের বাতিক ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। এরা দিনরাত থিয়েটারের রিহার্সাল দেয় এবং থিয়েটারী ঢঙে কথাবার্তা বলে। চাকরদের কাজকর্মের পাট উঠে গেছে। ঝিরও অবস্থা তাই। হরিশবাবু সবচেয়ে চিন্তিত মেয়েটিকে নিয়ে। রামমণি বিবাহিতা। তার স্বামী পাঁচকড়ি জীবিত। কিন্তু এই বিশ্রী নামওয়ালা স্বামী সে থিয়েটারী দৃষ্টিতে আপনার ভাবতে পারে না। এমন কি রামমণি নিজের নাম নিয়েও সন্তুষ্ট নয়। সে বলে, নায়িকার এমন নাম হতে পারে না। পিসীমা বলেন,—"তোর নাম রামমণি, তোর মায়ের নাম ছিল গঙ্গামণি, তোর দিদিমার নাম হরমণি, তোর বুড়ো দিদিমার নাম কেষ্টমণি।···গেরস্তোর মেয়ের নাম আবার কি হবে?" কিন্তু তবুও কন্যা অবুঝ।

নিরুপায় হরিশ পাঁচকড়িকে সংবাদ দেন। পাঁচকড়ি একজন মনোবিজ্ঞানী ডাক্তারকে হরিশের কাছে পাঠান। তাঁর নাম রমেন্দ্র। তিনি হরিশের বাড়ীতে এসে অবাক হয়ে যান। তিনি সংবাদ দিতে ভৃত্যদের সহায়তা নিতে গেলে দেখেন ভৃত্যরা সকলে 'দুর্বাসার পারণ' অভিনয়ে ব্যস্ত। তারা সারি সারি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। চাকরদের সর্দার দিগম্বর ভীম সেজেছিলো। সুতরাং সে জেগেছিলো। সে রমেন্দ্রকে বইয়ের ভাষায় পরিচয়াদি জিজ্ঞেস করে। অবশেষে হরিশের সঙ্গে দেখা হওয়ায় রমেন্দ্র আশ্বস্তবোধ করে।

রমেন্দ্র তাঁর পরিচয় দিলে, হরিশ অভ্যর্থনা করেন, এবং দুঃখের কথা সব খুলে বলেন। তিনি বলেন তাঁর মেয়েটি আগে নাটক নভেল পড়তো, তবে থিয়েটার হওয়ার পর থেকে থিয়েটারী ঢঙে কথাবার্তা বলার বাতিক হয়েছে। রমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, বিশেষ কোনও পাটের ওপর মেয়েটির ঝোঁক আছে কিনা। হরিশ বলেন, সব পাটের ওপরেই সে 'বুক্‌নি' দেয়। রমেন্দ্র বলেন মনোম্যানিয়া হলে আরও গুরুতর হতো।

হরিশ রামমণির সঙ্গে রমেন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন। রামমণি রমেন্দ্রের নাম শুনে বলে, বেশ নামটি, তারপর বলে,—"আমার নাম তিলোত্তমা।" সে বলে সে শাপভ্রষ্টা। সে বেঁচে আছে "প্রেমসুধারস পানে"। গান গেয়ে সে বলে ওঠে। ওদিকে চাকর দিগম্বর "মোহিত দুজনে" বলে গানের বাকি

অংশ গেয়ে দেয়। রামমণি বলে, তার বাবার উচিত ছিলো, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী, মণিমালিনী, হিরণ্ময়ী, কিরণশশী, লীলাবতী, শৈলজা, সূর্যমুখী ইত্যাদির একটা নাম রাখা। সে আরও বলে, তার স্বামী পাঁচকড়ি নয়, সেলিম। সেলিম হোক মুসলমান। "অশ্রুমতী" নাটকে তো তা সম্ভব হয়েছে।

হরিশ কন্যাকে বললেন, বিদেশী ভদ্রলোকের সামনে এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু 'বিদেশী' শব্দটা ততোক্ষণে রামমণির মনের মধ্যে তরঙ্গ তুলেছে। রামমণি একটা আদিরসাত্মক থিয়েটারী গান করে 'বিদেশী' নিয়ে। তারপর রমেন্দ্রকে বলে,—"আমার মাথায় দিয়ে হাত, কিরে কর প্রাণনাথ।" হরিশবাবু লজ্জায় পড়েন। রামমণির পিসী বলেন, এ সব জঘন্য গান শিখেছে থিয়েটারের মেয়েগুলোর কাছ থেকে। রামমণি তাদের বাড়ীতে ডেকে এনে এসব শিখেছে। হরিশবাবু পৌরাণিক থিয়েটারে এতো জঘন্য গান নাকি কল্পনা করতে পারেন নি। প্রহ্লাদ চরিত্র, নন্দবিদায়, দুর্বাসার পারণ ইত্যাদি পড়ে তার ভালোই লেগেছিলো। "তা মনে কল্লেম যে প্লে-টা কি রকমে একবার দেখে যাই, ও মশাই দেখলেম কিনা সবগুলোই কেবল পাখোযাজের বোল মুখে সাধছে।" হরিশ রমেন্দ্রকে বলেন তাঁর ভয় হয়, কবে তাঁর কন্যা কুন্দনন্দিনী হয়ে বিষ খায়, কিংবা পদ্মিনী হয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়। রমেন্দ্র রামমণির Case study করবার জন্যে যত্রতত্র যাবার এবং যথেচ্ছ কথা বলবার স্বাধীনতা চায়। বলাবাহুল্য হরিশ তাতে অনুমতি দেন।

এদিকে চাকরদের রিহার্সাল দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই চল্‌ছে। শিগ্‌গির নাকি 'দুর্বাসার পারণ' অভিনয় হবে। প্ল্যাকার্ড টাঙানো হয়েছে! তাতে দ্রৌপদী হবে ভূতেশভাবিনী অর্থাৎ বাড়ীর ঝি ভূতী।

ইতিমধ্যে রামমণির একটা মস্ত ফাঁড়া কাটে। সে ঘরে শুয়ে ছিলো, এমন সময় চাকর দিগম্বর তরোয়াল নিয়ে এসে রামমণিকে কাটতে উদ্যত হয়। রামমণি উঠে বলে,—"অ্যাঁ! একি! কাকা—কাকা!" দিগম্বর বলে,—"বাছা! তুমি এ নরাধম—এ নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না।" শেষে কাকার মনে ধিক্কার জাগে, কিন্তু রামমণি তরোয়াল টেনে নিয়ে নিজের বুকে বসাতে যায়। হরিশ এসে তাড়াতাড়ি কন্যাকে বাঁচায়। এমন সময় ভূতি এসে—"আমার কৃষ্ণা কোথায়" বলে ছুটে এসে বলে, কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন। দিগম্বর মনিব হরিশকে 'দাদা' সম্বোধন করে। দাদা অর্থাৎ মহারাজ নাকি জ্ঞানশূন্য—

এটা তাঁর পক্ষে আশীর্বাদের, নইলে কন্যার শোক তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু সকালে হরিশ খুনে চাকরকে বেঁধে নিয়ে গেলেন।

রামমণির মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে রমেন্দ্র প্রবেশ করলে রামমণি বলে ওঠে,—কেন সে একাকী দুর্গে এসেছে? "চোরেরা শূলে যায় তা কি তুমি জান না?" শেষে সে বলে,—সুরঙ্গ কেটে রমেন্দ্রের প্রবেশ করা উচিত ছিলো। রমেন্দ্র তার প্রতি সহানুভূতি দেখালেন। বিগলিত রামমণি বলে, বাড়ীতে তার ওপর খুব অত্যাচার হয়—সবাই জঘন্য নামে ডাকে। তার ইচ্ছে, নাম পরিবর্তন করে রমেন্দ্রমোহিনী নাম নেবে। নামটি বারবার উচ্চারণ করতে করতে রামমণি গান গায়,—"নাম শুনে প্রাণ শীতল হল কি মধুর নাম!" বাড়াবাড়ি দেখে রমেন্দ্র সরে যায়। এমন সময় ভূতি আসে—নির্দেশ মতো দোয়াত কলম নিয়ে। রাজসিংহের তিলোত্তমার মতো রামমণি অনেক হিজিবিজি নাম লিখে শেষে লেখে "রমেন্দ্র মোহন"। নামটা জোরে উচ্চারণও করে ফেলে। রমেন্দ্র আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ভাবেন, তাঁকে বুঝি ডাকছে। তিনি ভেতরে এলে রামমণি বলে যে, ওটা 'সলিলকি' ছিলো। রমেন্দ্র ফিরে যান। আবার একটা উচু গলার সলিলকিতে রমেন্দ্র আবার এলে এবার তাকে রামমণি না ফিরিয়ে দিয়ে দৃশ্য পরিবর্তনের চুক্তি জানায়। তারপর রমেন্দ্রকে দেখে অধোবদন হয়, যেন 'ভালবাসি' কথাটা বলতে ইচ্ছে করলেও বলতে পারছে না। রামমণি রমেন্দ্রকে তুমি বলবার অধিকার চায়। এমন সময় হরিশের ডাকে রমেন্দ্র হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

আবার এদিকে দিগম্বরের অবস্থাও কম যায় না। ঘরে হাতে পা বাঁধা পড়ে আছে। সে বলে,—"হায়! আমি কারাগারে।" ভূতি ভাতের থালা নিয়ে এসে বলে,—"বাছা, তোর পিতার কি কঠিন প্রাণ, এমন ননীর পুতুলকে বিষ খাইয়ে মারতে যায়। ভূতিকে 'ধাইমা' সম্বোধন করে দিগম্বর বলে, তাকে স্তনদুগ্ধ দিতে সে ভুলেছিলো।" ইতিমধ্যে হরিশ এলে দিগম্বর বলে,—"ঐ দয়াল শ্রীহরি আসছে।" এমন সময় রামমণি ছুটতে ছুটতে এসে বলে ওঠে,—"হৃদয় হার! কণ্ঠরত্ন কে তোমার এমন দশা বল্লে?" হরিশকে ওসমান বল্পনা করে রামমণি বলে,—"এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।" হরিশ কন্যাকে তিরস্কার করে কিছু ফল পান না। রমেন্দ্রও সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেন।

সর্বদা অভিনয় দেখে দেখে হরিশবাবুও প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো হয়েছেন।

মুখ ফস্কে তাঁরও দু-একটা থিয়েটারী কথা বেরিয়ে পড়ে। তিনি রীতিমতো আশঙ্কিত হয়ে পড়েন।

এর মধ্যে একদিন রামমণি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। রমেন্দ্র তাকে দেখে বলে,—বাগানের গোলাপ পদ্মকে লজ্জা দেবার জন্যে সে কেন এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রামমণিকে study করবার জন্যে রমেন্দ্র থিয়েটারী কথা অভ্যাস করছে। রামমণি ভাবে,—"ওঃ এও দেখছি আমার প্রণয়ে পড়েছে—আমার মনের ভাব জানতে পারে নি তো? তাহলে শাস্ত্র অশুদ্ধ হয়ে যাবে" রামমণি বলে, সে জানতে পেরেছে, রমেন্দ্র তাকে ভালবাসে। রামমণির কথা রমেন্দ্র স্বীকার করবার ভান দেখায়। রামমণি বিরক্ত হয়ে বলে, এতো তাড়াতাড়ি স্বীকার করা উচিত নয়। প্রথমে বনে বনে মনোবেদনা জানাতে হবে, তারপর রামমণির সখীকে আভাস দিতে হবে। রামমণি রমেন্দ্রকে বলে,—"দেখ, আমরা কোথাও চলে যাই চল,—"পোড়া মন টেঁকে না এখানে।" সে যাবে সেখানে, যেখানে,—"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে" সেবন করেই প্রাণ ধারণ করবে এবং রমেন্দ্রকে গান্ধর্ব বিবাহ করবে। তবে সাধারণভাবে পালাতে চায় না, একটা নাটকীয় কিছু করে পালাবে। কথা প্রসঙ্গে রামমণি বলে, দিগম্বরকে বলে রমেন্দ্রের মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ে তারপর সেবা শুশ্রূষা করে ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাবার ইচ্ছে তার আছে। আশঙ্কিত হয়ে রমেন্দ্র তা করতে বারণ করেন।

রামমণির জন্মতিথি আসে। বিনা থিয়েটারে কি জন্মতিথি জমে? স্থির হয়, সীতাহরণের পালা হবে। অবশেষে হরণের পালাই ঘটে যায়! রমেন্দ্রকে নিয়ে রামমণি গৃহত্যাগ করে। তবে সুভদ্রাহরণ, সীতাহরণ, রুক্মিণীহরণ—কোনোটির মতোই হলো না বলে অতৃপ্তি আসে রামমণির মনে। তাই সে সীতাহরণের পারফরমেন্সের প্রয়োজন অনুভব করে। রমেন্দ্রকে আড়ালে পাঠিয়ে রামমণি সীতার পাট মুখস্থ বলে। এমন সময় যোগী বেশে পাঁচকড়ি আসে। রমেন্দ্রের কথামতো সে আগেই রাবণের পাট মুখস্থ করেছিলো। 'রাবণ'কে দেখেই রামমণি যথারীতি মূর্ছা যায়। ইতিমধ্যে পাঁচকড়িও ছদ্মবেশ ত্যাগ করে। তাকে দেখে রামমনি খুব অনুতপ্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়। আর কোনোদিন সে থিয়েটারের মোহে পড়বে না সঙ্কল্প করে। বার বার সে স্বামীর কাছে ক্ষমা চায়।

এদিকে ভূতিহরণের পালা। দিগম্বর ভূতিকে বলে,—"আমি তোর নন্দ-

মহারাজ—আর তুই বৃষভানুনন্দিনী—তোকে প্রভাস যজ্ঞ দেখাতে নিয়ে যাব।" দিগম্বর তাকে পরামর্শ দেয়—সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঘাটে পোঁটলা পুঁটলী টাকাকড়ি এবং দিদিমণির জন্মতিথির মিষ্টি—সব কিছু নিয়ে উপস্থিত থাক্‌তে হবে। দূরের পথ। কিছু সম্বল দরকার। দিগম্বরের কথা মতো যথাসময়ে ভূতি রাধা সেজে গঙ্গার ধারে তার নন্দমহারাজের প্রতীক্ষা করে গান গায়। এক কনষ্টেবল এসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, সে বৃসভানুনন্দিনী—প্রভাস যজ্ঞে শ্যামদরশনে যাবে—নন্দ মহারাজের জন্য বসে আছে। পুঁটুলিতে কী আছে—কনষ্টেবল তা জিজ্ঞাসা করে। ভূতি বলে, কৃষ্ণের জন্যে ভেট। পুঁটুলি খুলে মোণ্ডা মিঠাই সোনার গয়না ইত্যাদি দেখে কনষ্টেবল বলে,—"তা বাছা, এখন একটু বিশ্রাম ঘাটে বিশ্রাম করবে চল।" সে তাকে থানায় নিয়ে যায়। পথে যেতে যেতে ভূতি বলে,—"তুমিও বুঝি শ্যামদরশনে যাবে?" কনষ্টেবল জবাব দেয়—"হ্যাঁ।"

ওদিকে হরিশের বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। রামমণিকে নিয়ে রমেন্দ্র পালিয়েছেন! রমেন্দ্রকে সচ্চরিত্র বলে বিশ্বাস করেছিলেন হরিশ! এমন সময় পাঁচকড়ি এসে সব ভুল ভাঙিয়ে দেয়। রমেন্দ্র সম্পর্কে সে সব কথা খুলে বলে। তাঁর লেখা চিঠির তাড়া দেখিয়ে সে বলে, রামমণির মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সব কথাই রমেন্দ্র প্রত্যেক চিঠিতে লিখে লিখে জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যে কনষ্টেবল ভূতিকে ধরে নিয়ে আসে। বলে, এই গয়নাগুলো নিয়ে পালাচ্ছিলো। ভূতি বলে, নন্দমহারাজ দিগম্বরের পরামর্শে সে একাজ করেছে। দিগম্বরকে কনষ্টেবল গ্রেফ্‌তার করে। তাকেই সে নাকি গঙ্গার ধারে পালাতে দেখেছিলো। "নন্দবিদায়" ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়।

হরিশ তারপর রামমণিকে নিয়ে যাবার জন্যে পাঁচকড়িকে অনুরোধ করেন। তাকে আরো বলে দেন, কখনো যেন তাকে নাটক নভেল পড়তে বা থিয়েটার দেখ্‌তে না দেওয়া হয়। পাঁচকড়ি বলে,—"ওতে দোষ নেই; তবে কুরুচিপূর্ণ হলেই সবকিছুতেই দোষ। সুরুচিপূর্ণ নভেল পাঠ করা উচিত; সেই সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা, সমাজশিক্ষা ও নৈতিক বল চাই, নইলে হিতে বিপরীত ঘটে।" মূল অভিনেতা অভিনেত্রী দিগম্বর আর রামমণির অভাবে হরিশবাবুর বাড়ীতে নাট্য বিকারেরও ছেদ ঘটে।

কাজের খতম্‌ (১৮৯৮ খৃঃ)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত॥ থিয়েটার সমাজের

দোষ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে প্রহসনটি লেখা হয়েছে। নব্য সংস্কৃতির একটি দল থিয়েটার বিদ্বেষী। স্কুলের ছাত্রীদের গানে এই মনোভাব ব্যক্ত।—

"(ওলো) দিদি ঘুচলো যাওয়া থিয়েটার।
স্কুলের পড়া, যিশুর ছড়া, এ জীবনে হল সার।
মা মানা করেছে, বাবা কত বলেছে,
গুরু মা দিব্বি দিয়েছে,
বলে, 'যেও না কো থিয়েটার কুরুচি আধার,
সেটা নটী নাচে নাইক তাদের জাত ;'
(তবু) জেনে শুনে বাবু ভেয়ে, ফেরে সাথে সাথ,
(ছি ছি) মুখে বড়াই, এ কিরে ছাই, মনে শুধু ফক্কিদার।"

কিন্তু যাদের পক্ষ থেকে এই মত প্রচার হয়, তাদের ভণ্ডামি এবং কুকর্মেই থিয়েটার-সমাজের এই অপবাদ। এমন কি স্বয়ং দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে বিশেষ সমাজের অপবাদ দেওয়া অশোভন—এই মত প্রচারের চেষ্টা আছে। বলা-বাহুল্য প্রাচীন পন্থীদের সম্পর্কেও একই আক্রমণপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। প্রহসনের অন্যতম চরিত্র মতিলাল থিয়েটার-নিন্দুক বাচস্পতিকে বলেছে,—"দিই দিকি বাবা অষ্ট গণ্ডা পয়সা হাতে, বেশ্যায় হরিণাম করে বলে থিয়েটারে যেতে চাচ্ছ না, সেই বেশ্যারবাড়ী নিয়ে গিয়ে হবিষ্যি করিয়ে আনতে পারি কিনা।" বস্তুতঃ বিভিন্ন গোত্রীয় থিয়েটার-নিন্দুক সমাজকে একটি আক্রমণ পদ্ধতির সহায়তায় কলঙ্কিত করে দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করা হয়েছে।

কাহিনী—সমাজে এক ধরনের লোক আছেন, যাঁরা সবরকম অকর্ম কুকর্মই করে থাকেন, অথচ থিয়েটারের নামে নাক সিঁটকান। থিয়েটারের অভিনেতা মতিলালের কাছে এই সমস্ত স্বার্থপর তথাকথিত প্রতিষ্ঠাবান্ লোকদের ভণ্ডামি অত্যন্ত অসহ্য লাগে। অবশ্য মতিলাল কিছুটা স্পষ্ট বক্তা। কিন্তু এঁরাও হার মানবার নন।

রমাকান্ত গোঁড়া হিন্দু হয়েও স্বার্থের খাতিরে নিজের ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে কৌসুলী করিয়ে এনেছেন। বাচস্পতিকে তিনি কৈফিয়ৎ দেন,—"দেখুন বাচস্পতি মশায়, দান বলুন, দেবভক্তি বলুন, ধর্ম্মে অনুরাগ বলুন, আর আর যে কোন সৎকার্য্যই বলুন, পৃথিবীতে কেউ নিঃস্বার্থ হয়ে করে না। আমার মনে মনে ধারণা ছিল যে, যে আমি হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ

করেছি ; আমার জীবন একরকমে কেটে যাবে। তবে ছেলেটার ত একটা হিল্লে করা চাই···।"

বিলেত ফেরত গণেশগোবিন্দ ডাক্তারের দিন চলে না। কোনোরকমে রমাকান্তের Paid Family Doctor হয়েছে বলে অনাহারে মরে না। অর্থের টানে সে রমাকান্তের সব গোঁড়ামি হজম করে—যদিও নিজে বিলিতী আদব কায়দার একজন মস্তবড়ো ভক্ত। "আপনারা বিলেতের নিন্দে করেছেন, English etiquette গুলোকে condemn করছেন, যদিও আমার এটা খুব unpleasant বোধ হচ্ছে। কিন্তু কি করবো বলুন, compelled হয়ে চুপ করে আছি, কারণ আমি আপনার Paid Family Doctor. Financial question is the question in this world."

একদিন রমাকান্ত, গণেশ ডাক্তার, বাচস্পতি এবং রমাকান্তের গলগ্রহ শ্যালক Editor কুলচন্দ্র গল্পগুজব করছিলেন, এমন সময় মতিলাল আসে। মতিলালকে এরা চেনে, তাই ওকে দেখেই ওরা সকলে থিয়েটারের নিন্দে আরম্ভ করে দেয়। মতিলাল বলে, থিয়েটারে তাদের চেয়েও বড়ো বড়ো লোক যায়। "বড় বড় Independent রাজা, জজ গুরুদাস ব্যানার্জি, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এরা কি বড়লোক নন ?" গণেশ মন্তব্য করে, বেশি টিকিট বিক্রী হলে মতিলালদের মাইনে বাড়বে, তাই মতিলালরা এঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে থিয়েটারে নিয়ে যায়। "Native theatre nasty nasty !" বাচস্পতি বলে,—"রামচন্দ্র ! রামচন্দ্র ! আজকালকার থিয়েটার নরক, নরক ! সেথায় নটী সঙ্কীর্তন করে, ওরূপ স্থানে ভদ্রলোকে যায় !" মতিলাল গণেশ ডাক্তারকে বলে, যার হাড়ি ঠন্ ঠন্, তার সাহেবিপনা শোভা পায় না। বাচস্পতিকে বলে, বাচস্পতির দল যে আটগণ্ডা পয়সার লোভে যখন বেশ্যাবাড়ী পূজো করে, আর হবিষ্যি মারে, তখন দোষ হয় না বুঝি ! মতিলাল বলে, ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে থিয়েটার করতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ রায় ফেল মেরেছেন। অতএব থিয়েটারে মেয়েমানুষই দরকার। ঘরের স্ত্রীকে বার করা উচিত নয়, তাই বাধ্য হয়ে বেশ্যা দিয়েই অভিনয় করাতে হয়। অন্যদেশে চলে, কারণ সেখানে মেয়েদের গড়ন আলাদা, চরিত্রবল আছে, পুরুষেরাও তাদের ইজ্জত রাখতে জানে। লোকে বলে থিয়েটারে গেলে চরিত্র খারাপ হয়, সেটা কি থিয়েটারওয়ালাদের দোষ ? বাবুরাই তো এসে কার Cat's eye, কার Rosy cheek, তাই খুঁজে বেড়ায়। এডিটর কুলচন্দ্র

বলে,—"থিয়েটার আমাদের জিনিষ,, দাঁড়াও অগ্রে দেশের দুঃখ দূর হোক, দরিদ্রতা নিবারণ হোগ,, তারপর আমাদের বিষয় মনোযোগ করা যাবে।" মতি বলে, কাগজে article লিখে দেশের দুঃখ দূর করা যায় না, তাছাড়া তার মতো নিষ্কর্মা গলগ্রহরাই দেশের দুর্দশা বাড়িয়ে তুল্‌ছে। জামাইবাবুর ঘাড় ভেঙে আর পকেট খরচার জন্যে খবরের কাগজ ছাপিয়ে সে দেশের খুব একটা মঙ্গল করছে না। অবশেষে রমাকান্তকে সে আক্রমণ করে। বুড়ো বয়সে তরুণী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে রমাকান্ত যৌবন ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, এদিকে ধর্মের ভণ্ডামি আছে। "দ্বিতীয় পক্ষে বে করা আর ভদ্র-রকমের বেশ্যা রাখা এ দুইই সমান।"

মতিলালের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার। এক বাধ্য হয়ে থিয়েটারে যেতে রাজী হয়। তারপর মতিলাল রমাকান্তের বিলেত ফেরত ছেলে মিঃ ভোসের কাছে যায়। মিঃ ভোসের বিসদৃশ সাহেবিপনায় মতিলাল ক্ষুণ্ণ হয়। মিঃ ভোস মতিলালের সামনেই নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ জুড়ে দেয়। থিয়েটারের প্রসঙ্গ উঠলে মিঃ ভোস বলে,—সে native theatre prefer করে না। মতি তখন বলে, নিজেদের বংশের আচারের সব মর্যাদা ভুলে অন্যের অনুকরণ করা এটা কি খুব একটা preferable! অবশেষে মিঃ ভোসও থিয়েটার দেখ্‌তে রাজী হয়।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে যায়। এডিটার রাস্তায় একটি মেয়ের পেছনে ঘুরতে গিয়ে মতির চোখে ধরা পড়ে যায়। মতিকে সে বলে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সে নিজেই মাঝে মাঝে News Collect করে। সাংবাদিকরা মাঝে মাঝে ভুল সংবাদ দেয়—সেইজন্যে। ইতিমধ্যে একদল বুড়ী বেশ্যা আসে। তারা এককালে দেহ বিক্রী করেছে, কিন্তু এখন ছাদ পিটিয়ে অন্ন সংস্থান করছে। কিন্তু দুর্দশার অন্ত নেই। তারা এসে সাহায্য চাইলে মতি এডিটার মশায়কে দেখিয়ে দেন, কারণ এঁদের দলই তাদের খারাপ করেছে। বাধ্য হয়ে এডিটার তাদের সাহায্য করে।

এদিকে আবার মণি-হ্যাণ্ডবিল্‌ওয়ালী এইসব ভণ্ডদের প্রত্যেকের স্ত্রীর কাছে থিয়েটার দেখবার জন্যে অনুরোধ জানায়। তাঁরা বল্‌লেন, তাঁদের সবারই থিয়েটার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, কিন্তু স্বামীরাই তাতে আপত্তি করেন। বলেন, এতে নাকি তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। যাহোক শেষে তাঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে থিয়েটার দেখবেন, সঙ্কল্প করেন।

ওদিকে রমাকান্তর দলবল সকলেই দলের অপরের অসাক্ষাতে থিয়েটারের মেয়েমানুষ নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। ভাবে, সে একাই বুঝি কুকীর্তি করছে। তাদের স্ত্রীরা থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছিলেন। মতিলালের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে, মতিলাল তাঁদের কাছে ভণ্ডদের কুকীর্তি প্রকাশ করে। যারা থিয়েটারের নামে মুখ বাঁকা করতো তারাই এসব কুকীর্তি করছে! মতিলালের ইঙ্গিতে ভণ্ড থিয়েটার-বিদ্বেষীর স্ত্রীরা অভিনেত্রী সংযুক্ত এক একজন ভণ্ড স্বামীকে টেনে বার করেন। অভিনেত্রীরা ফাঁস করে দেয় কে তাদের কি বলেছে! রমাকান্ত একটি মেয়েমানুষকে নাকি বলেছে, কৃষ্ণের ষোল শো গোপী, তার নয় দুটো হলো। ভোস নাকি একজনকে বলেছে, তার গুণে সে নাকি বশীভূত হয়েছে। গণেশ নাকি আর একজনকে বলেছে, সে তার ঝগ্‌ড়াটে স্ত্রীকে Divorce করে তাকেই বিয়ে করবে। এডিটার একজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, বিলেতে নিয়ে গিয়ে সেখানে সে তাকে বিয়ে করবে। এইভাবে তাদের সবাই নাকি তাদের 'সতীপনা' দেখিয়েছে। স্ত্রীরা গালাগালি সুরু করে দেয়। তারপর প্রহারের উদ্যোগ করে। তখন মতিলাল বলে, ভণ্ডামি যখন প্রকাশই পেয়ে গেছে, তখন এখানেই "কাজের খতম্‌" করা ভালো!

থিয়েটার ও সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা আর বিশেষ কোনো প্রহসন রচনার সংবাদ জানা যায় নি। তবে অনেক প্রহসনই রঙ্গমঞ্চের তাগিদে লেখা; এবং প্রহসনকারদের অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। অভিনেতব্য প্রহসনগুলোর মধ্যে থিয়েটার ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এসে যাওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য এই গৌণ দিকটির মূল্য দিয়ে সেগুলো এখানে উপস্থাপন করা অন্যায়।

৭। রক্ষণশীল-মর্যাদার অসারতা।—

সামাজিক আভিজাত্যের মূলে থাকে ব্যাপক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা। অনেকে আভিজাত্যকে তিনভাগে ভাগ করে থাকেন—(ক) বংশ-গত (খ) অর্থ-গত এবং (গ) বিদ্যা-গত। আবার অনেকে বলেন যেখানে অর্থগত কিংবা বিদ্যাগত গৌরব বংশধারার সঙ্গে জড়িয়ে যায়,সেই অবস্থায় বংশগত আভিজাত্যই প্রকৃত আভিজাত্য। আমাদের সমাজে অর্থের ও বিদ্যার গৌরবকেই বড়ো করে ধরা হয়েছে। বিদ্যা দু প্রকার—(ক) বৈষয়িক এবং (খ) পারমার্থিক। অবশ্য

শেষোক্ত বিদ্যার মর্যাদাই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়। রক্ষণশীল সমাজে শৌণিতিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা অপ্রতিহত হয়ে উঠ্‌লো।

শুধু আভিজাত্য-গত মর্যাদা নয়, আচরণার্জিত মর্যাদাও সমাজে ঘটে থাকে। ধর্ম্ম সম্পর্কে সমাজে ভাবপ্রবণতা-মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব বিরাজ করে। সমাজে সাংস্কারিক গোষ্ঠী এই ধর্মের আচরণ ব্যাখ্যা করে থাকেন। ধর্মের সঙ্গে আচার অনেকটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। এই আচার পালনের মাধ্যমেই মানুষ ধর্মকে বস্তুগতভাবে পায়। সাধারণ মানুষ আচারকেই ধর্ম হিসেবে মূল্য দিয়ে থাকে। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মিক বিকাশ। প্রাথমিক অনুশাসনকে ভিত্তি করেই এর জন্ম। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এর সঙ্গে দ্বৈতীয়িক অনুশাসন যুক্ত হয়ে পড়ে এবং সেটাই পরে বাহ্য আচার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মাচরণের প্রকৃত অর্থ প্রাথমিক অনুশাসন এবং দ্বৈতীয়িক অনুশাসনকে সংযুক্তভাবে মূল্য দিয়ে চলা। ধর্মাচরণ এবং ধর্মের ধ্বজাবহন একার্থবাচক নয়। সামাজিক মর্যাদারক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের ধ্বজা বহন অর্থাৎ বাহ্য আচার পালনই যথেষ্ট। এইসঙ্গে প্রয়োজন ঘটে নীতি প্রচারের। প্রাথমিক অনুশাসন ভিত্তিক নীতি সমাজে যে পক্ষ থেকে বেশি পরিমাণে প্রচার করা হয়, সেই পক্ষের ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ সম্পর্কে প্রথমেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হয়। কারণ মানুষের সাধারণ ধারণা, নীতিজ্ঞানের অভাবই মানুষকে সমাজবিরোধী কর্মে রত করে। সুতরাং প্রচারকের পক্ষের ধর্মাচরণ সম্পর্কে সাধারণের সন্দেহের কোনো প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানকে যাঁরা মূল্য দিয়ে চলেন, তাঁরা ধর্মাচরণের মূলে নীতিজ্ঞানকে স্বীকার করলেও সেই সঙ্গে তার আপেক্ষিকতাকেও স্বীকার করেন। এই ধর্মাচরণের মতো ধর্মীয় ভণ্ডামিও অনুরূপ সমাজসত্য বলে তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন। আগেকার দিনে সমাজের ক্ষমতা ছিলো অপ্রতিহত, তাই ধর্মধ্বজের এই ভণ্ডামি সম্পর্কে চিন্তাও ছিলো অপরাধজনক। মনু বলেছেন,—

"ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসে চয়েত্তৈলং বক্ত্রে শোত্রে চ পার্থিব॥[১]

১। মনুসংহিতা—৮/২৭২।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজের সম্পূর্ণ একীভবন ঘটে নি। তাই প্রাচীন যুগেও ধর্মধ্বজের ভণ্ডামিকে কেন্দ্র করে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্য এই দৃষ্টিকোণ সমাজ থেকেই উপস্থাপিত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক সংঘাত না থাকলে হয়তো তাও সম্ভবপর হতো না।

ব্যক্তিগত এবং বংশগত উভয় দিক থেকেই সাংস্কারিক গোষ্ঠীর মর্যাদার প্রশ্নকে তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে ব্যক্তিগতভাবে যৌন, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ভণ্ডামি ও অনাচারের চিত্র, অন্যদিকে বংশগত মর্যাদার প্রশ্নকে জড়িত করে বৈবাহিক দুর্নীতির চিত্র—উভয়ই উপস্থিত করা হয়েছে। কৌলীন্য মর্যাদা সমাজে ক্রমে যৌন, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে। এই মর্যাদার মূল্যহীনতা সমাজে প্রত্যক্ষ করাবার জন্যে বিরুদ্ধ দৃষ্টিকোণে কুলীনের বংশগত সম্মান নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত করা হয়েছে। যৌনবিকৃতি ও দাম্পত্য অসন্তোষ থেকে যে ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হয়, তা সন্তানের বৈধতা নিয়ে নানারকম বিতর্ক আনে। জন্মগত অবৈধতা মানুষের সবকিছু মর্যাদা নাশ করে,—বিরুদ্ধ দৃষ্টিকোণে এই মতবাদ প্রচারের চেষ্টা আছে।

সাংস্কারিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার শিথিলতা থেকেই ক্রমে দুর্নীতি আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। নানাপ্রকার ধর্মীয় সমাজের ক্রমমিশ্রণ সাংস্কারিক গোষ্ঠীর আধিপত্যের পরিধিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে। বস্তুগত মনোভাবের বৃদ্ধিতে সাংস্কারিক গোষ্ঠীর বৃত্তিগত আয়ের চুক্তিমূল্যও কমে গেছে। তাছাড়া যে ক্ষেত্রে বস্তুগত মনোভাব প্রতিষ্ঠা পায় নি, সেক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্বের ধারণা বিভিন্ন মতবাদের প্রভাবে লোপ পেয়েছে। এছাড়া নব্য অর্থনীতি যখন শিক্ষা সংস্কৃতিকে পরিবর্তিত করেছে, তখন সাংস্কারিক গোষ্ঠীর আয়ের পথ সর্বপ্রকারে সঙ্কীর্ণ হয়েছে। এই সঙ্কীর্ণতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতি ব্যাপক হয়ে উঠেছে। সমাজে অর্থনীতির পরিবর্তন যতো দ্রুত ঘটেছে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির পরিবর্তন ততো দ্রুত ঘটতে পারে নি। তাই স্বক্ষেত্রেই এইসব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুশাসন নির্ভর দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে। অন্যদিকে আবার প্রগতিশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দ্বৈতীয়িক অনুশাসন বিরোধী দৃষ্টিকোণও সংগঠিত হয়েছে এবং তাকে সমর্থনপুষ্ট করবার জন্যে পদ্ধতি হিসেবে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রাথমিক অনুশাসন বিরোধী উপাদানকে গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ রক্ষণশীল মর্যাদার প্রশ্ন তুলে উনবিংশ শতাব্দীতে

যে সব প্রহসন রচিত হয়েছে, সবগুলো এই উভয় প্রকার গোষ্ঠীর উভয় প্রকার মনোভাব থেকেই উৎপত্তি হয়েছে।

ধর্মধ্বজের ভণ্ডামির সামাজিক দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয় যে, এই উপস্থাপিত চিত্রগুলোর কেবল আক্রমণ-পদ্ধতিগত মূল্যই নেই, ঘটনাগত মূল্যও আছে। "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকায় যৌন দুর্নীতি সম্পর্কিত একটি সংবাদ এবং সেই সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২] নবকৃষ্ণেন্দ্র স্বাক্ষরে একটি প্রেরিত পত্রে জনৈকা নারীর সতীত্বনাশের ঘটনা স্মরণ করে মন্তব্য করা হয়েছে,—"কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যেতে ধর্ম্মপরায়ণের বেশ দেখাইয়া অধর্ম্মের একশেষ করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি লিখিবেন?" এখানে মন্তব্য ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও এ ধরনের ভণ্ডামি শুধু উনবিংশ শতাব্দীর নয় চিরকালের সমাজ-সত্য। সমাজে যৌন দুর্নীতির বৃদ্ধির মূলে থাকে দাম্পত্য অসন্তোষ এবং যৌন বিকৃতি। সমাজে মাঝে মাঝে এর বৃদ্ধি ঘটাও অবাস্তব নয়। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মধ্বজ ব্যক্তিদের মধ্যে যৌন দুর্নীতির আধিক্য ঘটেছে বলে যদি কোনো সমাজ-বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে তা অস্বীকার করবার আগে বিবেচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ধর্মধ্বজের ভণ্ডামির সামাজিক প্রকাশের ফলে সমাজে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কাও অনেক প্রতিক্রিয়াসূচক মন্তব্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। রক্ষণশীল পক্ষ থেকেও এ ধরনের বিভিন্ন মন্তব্য দেখা যায়। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের "উঃ মোহন্তের এই কি কাজ" প্রহসনে (৮৭৩ খৃঃ) বামা বলেছে,—"একে ত আজকালকার ছেলেগুলো ঠাকুরদেবতা প্রায় মানেই না, তাতে যদি আবার গোঁসাই মোহন্তের এই রকম কাজ হল, তাহলে ত আর তারা মোটেই মান্‌বে না।"

শুধু যৌন ক্ষেত্রে নয়, আর্থিক ক্ষেত্রেও তাদের অনাচার সমাজের পক্ষে দুর্বিষহ বলে মনে হয়েছে। অর্থের বিনিময়ে আচার-বিরোধী বিধান দিতে এরা যেমন উৎসাহ দেখিয়েছে, তেমনি দুর্বলপক্ষের ওপর সামাজিক চাপ এনে প্রায়শ্চিত্তের বিধির নামে পীডনযন্ত্র স্থাপন করেছে। দৃষ্টিকটু অর্থলোভকে ব্যঙ্গ করে তাই জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের "সুধা না গরল" প্রহসনে (১৮৭০ খৃঃ) ভট্টাচার্যের মুখে একটি উক্তি উপস্থাপিত হয়েছে।—"টাকাতে কিনা হয়? মুদ্রা—আহা হা শ্লোকটা বিস্মৃত হলেম্ যে—মুদ্রা মোক্ষগুণং সুধাঢ্য কলসং—

২। সংবাদ ভাস্কর—১৮ই আষাঢ়, ১২৬১ সাল।

আহা হা ভুলে গেলেম্।—অর্থাৎ মুদ্রার গুণ হচ্ছে—মোক্ষ আর সুধাঢ্য কলসং অর্থাৎ মুদ্রার দ্বারা সুধার কলস পাওয়া যায়।" গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য-নির্বিচারে সবরকম আয়নীতিই এই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকায়[৩] জনৈক গুরুদেবের আর্থিক দুর্নীতির একটি সংবাদ আছে। গুরুদেবটি তারই দীক্ষিতা জনৈক বেশ্যার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি হরণ করেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকম দুর্নীতি এদের আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে। এই সাংস্কারিক গোষ্ঠীই ছিলো সমাজপতি। স্বার্থ-সংঘাত এদের মধ্যে দলাদলি এনেছে। 'সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় এই ধরনের দলাদলি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে,—[৪] "এই দলাদলি সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে, ইহাতে কেবল অনর্থক আত্মবিচ্ছেদ এবং কলহলাভ, সুখের ব্যাপার কিছুই নাই। দলপতি মহাশয়েরা সকলেই মনু এবং প্রধান মনুষ্য, অতএব তাঁহারদিগের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য হওয়াতে সুতরাং দেশের দারুণ দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি কহিব।" পাড়াগাঁয়ে সমাজের চাপ আরও কঠিন বলে সেখানে এই দলাদলি আরও মর্মান্তিক ছিলো। রামনারায়ণ তর্করত্নের "নব নাটকে" (১৮৬৬ খৃঃ) একটি দীর্ঘ পদ্যের শেষে আছে,—

"সংসারের কর্ম্ম আর কেবা দেখে চোকে।
দলি নাই বলো মাগি মরে বোকে বোকে॥
দলের ঘোটেতে বসে নাহি হয় ক্ষুধা।
পর কুচ্ছ শুনিতে শ্রবণে জাগে সুধা॥"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত দিক থেকে সাংস্কারিক গোষ্ঠীর মর্যাদার প্রশ্ন তোলবার ঐতিহাসিক কারণ আছে। তেমনি আবার বংশগত দিক থেকেও প্রশ্ন তোলবার কারণ শুধু মাত্র মর্যাদাহীনতা জনিত আক্রোশ নয়। সমসাময়িককালের সাময়িক পত্রের বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাই। "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকায়[৫] কুলীনজাতি সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে,— "অনেক কুলাভিমানি মহাশয়দিগের ধারণাবতী মতির ন্যূনতা প্রযুক্ত পরিচারকের হস্তে অর্থার্জনস্বরূপ বিবাহের একটি নির্দ্দিষ্ট পত্র আছে, ভৃত্য সেই লিপি দৃষ্টে

৩। সংবাদ ভাস্কর—১লা ফাল্গুন, ১২৬০ সাল।
৪। সংবাদ প্রভাকর—২৩শে পৌষ, ১২৫৭ সাল।
৫। সংবাদ ভাস্কর—২০শে পৌষ, ১২৬০ সাল।

কোন্ স্থানে কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাহা বলিলে তদনুসারে শ্বশুরালয়ে গমন করেন।" এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষে ব্যভিচার তথা অবৈধ সন্তানের জন্মদান—ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঘটা স্বাভাবিক। প্রহসনকারদের অনেকেই তা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষালের "সমাজ সংস্করণ" প্রহসনে (১৮৮৩ খৃঃ) কেনারামের বন্ধু বেণী মন্তব্য করেছে,—"কুলমর্য্যাদা আছে, তাহাতেই তাহাদিগের সন্তান উৎপাদন করিতেছে, কুলীনের স্ত্রী, সন্তান প্রসব করিলেই পুত্র কুলীন হইল।" শ্রীনারায়ণ চট্টরাজের "কলিকৌতুক" প্রহসনে (১৮৪৮ খৃঃ) প্রদত্ত কবিতাতেও বিদ্রূপের সঙ্গে বলা হয়েছে,—

"অধিক সৌভাগ্য এই উল্লাস জনক।
বনাশ্রমে হোতে হয় পুত্রের জনক॥"

একদিকে জন্মগত মর্যাদার চাঞ্চল্যকর অবস্থা অন্যদিকে তেমনি সমাজে মর্যাদার আধিক্য। সাধারণ ব্রাহ্মণের চেয়ে কুলীন ব্রাহ্মণের মর্যাদার পার্থক্য যথেষ্ট ছিলো। "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকায়[৬] "পাক স্পর্শ ও কুলীন বিদায়" শীর্ষক একটি সংবাদে আছে,—"ভূকৈলাসাধিপতি শ্রীযুত রাজা বাহাদুরের পুত্রের বিবাহ কর্ম্ম" উপলক্ষে "এক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া কুলীন দিগকে ৮ আট টাকা হারে সামাজিকের ২ টাকা অপর ব্রাহ্মণগণকে এক এক মুদ্রা বিদায় দিয়াছেন।" শুধু সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়, বিবাহবন্ধনের ক্ষেত্রেও এই মর্যাদার পার্থক্য যথেষ্ট ছিলো। আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা এখানে নিরর্থক। সাংস্কারিক গোষ্ঠীর কৌলীন্য মর্যাদা ঘটিত দৃষ্টিকোণের অনুকরণে অন্যান্য গোষ্ঠীর কৌলীন্যমর্যাদা ঘটিত দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে। সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই যদিও অন্যান্য গোষ্ঠীর কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষণশীল মর্যাদারই অন্তর্ভুক্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণদের তথা ধর্মধ্বজদের এই দুর্নীতি ও অনাচার যেন তাদের সাংস্কৃতিক মর্যাদাকে ব্যঙ্গ করেছে। ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একদা পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে,[৭]—

"জাত কর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ ষট্‌সু ধর্মস্ববস্থিতঃ॥

৬। সংবাদ ভাস্কর—৩২ শে শ্রাবণ, ১২৬১ সাল।

৭। পদ্মপুরাণ—স্বর্গ খণ্ড—২৫ অধ্যায়, নারদ-কথিত।

শৌচাচার পরোনিত্যং বিঘসাশী গুরু-প্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানং মথাদ্রোহশ্চানৃশংস্য কৃপা ক্ষমা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

সুতরাং কেবল শৌণিতিক অধিকারে মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা অর্থহীন। একদা অবশ্য ব্রাহ্মণপক্ষ থেকেই প্রচার করা হয়েছে যে,—

"অনাচারী দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো ন তু শূদ্রোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অভক্ষ্য ভক্ষযেদ্‌গাভী শূকর কুশমূলকং॥"

কিন্তু সমাজে ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই মতবাদ একটি অবাস্তব স্বার্থপ্রণোদিত মতবাদ রূপেই প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণদের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনেব জন্ম হয়েছে। ডঃ সুশীলকুমার দে সঙ্কলিত প্রবাদ বিষয়ক গ্রন্থটি থেকে এ ধরনের কিছু প্রবচন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত প্রবচনগুলো অত্যন্ত সুপরিচিত। যথা,—(ক) বামুন, গণক, কাউয়া, তিন পরের খাউয়া॥ (খ) লাখ টাকায় বামুন ভিখারী, (গ) কালির অক্ষর নেই কো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে॥ (ঘ) ভট্‌চায্যের খুঁটের খুঁট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে লুট॥ (ঙ) জপের সঙ্গে খোঁজ নেই, কপাল জোড়া ফোঁটা। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচাযের পূজার বড ঘটা॥ (চ) কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ॥ (ছ) বামুন, গরু, ছাগল, তিনই দড়ির পাগল॥ (জ) মরা বামুন গাঙে ভাসে, চিঁড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে॥ (ঝ) দেখাও পৈতে, মারো ভাত। (ঞ) বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণে পেলেই যান॥

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, অন্য সম্প্রদায়ের আচারসর্বস্ব সাংস্কারিক গোষ্ঠীকেও বিদ্রূপ করা হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মোল্লা, মুন্সী, হাজী ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রবচন আছে। যথা,—(ক) মোল্লার দাড়ি ওষুধে লাগে। (খ) যত হাজী, তত পাজী॥ (গ) কলিকালের মুন্সী মোল্লা, নামে হবে দড। না মানবে কোরান কিতাব, হুজ্জৎ করবে বড॥—ইত্যাদি।

বিশেষতঃ আচারসর্বস্ব বৈষ্ণবদের ফোঁটা তিলকের ঘটা বেশি। তাই এদেরকে অত্যন্ত বেশি বিদ্রূপ করা হয়েছে। যেমন,—(ক) বোষ্টম হবার বড সাধ। তৃণাদপি শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ॥ (খ) সাধ যায় বোষ্টম হতে, পোঁদ ফাটে মোচ্ছোব দিতে॥ (গ) জাত খোয়ালেই বোষ্টম। (ঘ) সাধে

কি বৈরাগী নাচে। ভাতের থালা হাতের কাছে॥ (ঙ) যুবতীর কোল, শিঙ্গি মাছের ঝোল, মুখে হরিবোল॥ (চ) বেদ বিধি ছাড়া—যা' বৈরেগী পাড়া॥ (ছ) আগে বেশ্যে পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুটনী। সবকর্ম পরিত্যাজ্য এখন বোষ্টমী॥ (জ) ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে। (ঝ) কাজে এড়া, ভোজনে দেড়া, সে থাক্ গিয়ে বোষ্টম পাড়া॥ (ঞ) মাছ খাই না, মাংস খাই না ধর্মে দিয়েছি মন। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী যাচ্ছি বৃন্দাবন॥—চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব-আদর্শের অধোগতিতে এ ধরনের অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রবাদ-বচনের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য যতোই থাকুক, অকারণে তা সমর্থনপুষ্টি লাভ করে না।

প্রবাদ-প্রবচনগুলো সমাজের স্বাভাবিক ভূমি থেকে জন্মলাভ করেছে। ধর্মধ্বজের মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্নপ্রকার যে দৃষ্টিকোণ-সংগঠিত হয়েছে, তার ভিত্তি কোথায় সেটা দেখাবার জন্যে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ধৃতি দিতে হলো। ভণ্ড ধর্মধ্বজ সম্পর্কে বিভিন্ন কবিতাও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় হয়েছে। রামদাস সেন তার "কবিতালহরী" পুস্তকে "ভণ্ডতপস্বী" নামে একটি কবিতার অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে,—

"কোঁচাটী জড়ান মোল্লা সম কাছা নাই।
দেখিতে ধার্মিক বট কপট গোঁসাই॥
ছাপাতে সকল অঙ্গ চমৎকার শোভে।
সতত ধাবিত মন পরনারী লোভে॥"—ইত্যাদি।

অনাচারেও ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রের দোহাইকে অনেক প্রহসনেই নির্মমভাবে আঘাত করা হয়েছে। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বুঝলে কিনা" প্রহসনে (১৮৬৬ খৃঃ) বিদ্যালঙ্কারের গতি-প্রকৃতিকে স্মরণ করা যেতে পারে। মুরগীর মাংসের নামে সে বলে,—"আহা পরিপাটি, পরিপাটি। হ্যা দেখ বাবা, ও দ্রব্যটা বড় মুখপ্রিয়, আর ওটা ভক্ষণ করাও যে অশাস্ত্রীয় তাও নয়। স্পষ্ট বিধিই রয়েছে,—'ভক্ষয়েৎ তাম্রচূড়কং।' তাম্রবর্ণ ইব চূড়া বিদ্যতে যস্য, স তাম্রচূড়কং কিনা, গ্রাম্য কুক্কুটং অর্থাৎ কুঁকড়ো, ইতি ভাষা—তা অনায়াসেই খাবে। তবে কিনা ইদানীন্তন ওটা বহু প্রচলিত নয়, এতাবন্মাত্র।" মদ্যলোভে সে বলেছে,—"তা দিয়েছ যথকিঞ্চিৎ পান কল্যেও হানি নাই। মনু সুস্পষ্টই লিখে গেছেন—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং—ইত্যাদি। এ সকল উপাদেয় দ্রব্যেতে যার প্রবৃত্তি নাই, সে বেটা তো ভূত।" বিধর্মী প্রদত্ত জলেও তার অরুচি

নেই। "মোসলমানের জলটাও বড় প্রসিদ্ধ নয়, তবে কিনা "আপো নারায়ণং স্বয়ং"। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের "বোধনে বিসর্জ্জন" প্রহসনেও (১৮৯৬ খৃঃ) পুরোহিতের উক্তি অনুরূপ। অখাদ্য ভোজন করতে গিয়ে সে বলে,—"কিছু দোষ নেই বাবা। ব্রহ্মার বাহনের ডিম্ব, শিবের বাহনের পুত্র, কার্ত্তিকের বাহনের মিত্র, ..তারপর গঙ্গা'র কচ্ছপ, সমুদ্রের কাঁকড়া, ঠাকুর ঘরের টিক্‌টিকি সবই শুদ্ধ।" একটি ভিখারিনীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলে পুরোহিত শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে দাবী প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে,—"ব্রহ্মস্ব—গুরু পত্নী—মাতৃবৎ—আদৌ মাতা গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী গাভী ধাত্রী।" ধর্ম ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সংস্কারিক গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টাকে অনেক সময় প্রহসনকারেরা অন্যের মুখ দিয়ে নিন্দাও করিয়েছেন অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "মরকটবাবু" প্রহসনে (১৮৯৯ খৃঃ) প্রেম একজন ভট্টাচার্যকে বলেছে,—"আপনার ছেলে মাকড় মাল্লে ধোকড় হয়, আর পরের ছেলের ব্যালা ষোল কাহন কড়ি উচ্ছুগ্গুর ব্যবস্থা দিতে স্মৃতি কোথায় থাকে?"

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রজ্ঞান অনুস্বার-বিসর্গের মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছিলো। স্থানে অস্থানে অনুস্বার-বিসর্গময় ভাষা ছড়িয়ে এরা নিজেদের দীনতাকেই ঢাকবার চেষ্টা করেছে। দুর্গাদাস দে-র "ল-বাবু" প্রহসনে (১৮৯৮ খৃঃ) দধিচূড়ার চিত্রটি উপস্থাপন করা যেতে পারে। পণ্ডিত দধিচূড়া কাব্যকদলী কামার্ত হয়ে এক তাঁতিনীকে একান্তে ডেকে বলে—"সাধুং! সাধুং!—সেবা-দাসীং হবিষ্যামিং?" তাঁতিনী জবাব দেয়,—"দাদা ঠাকুর! বিধবা যে আমিং।" দধিচূড়া বলে,—"ওই ভদ্রদারিকে! সাধুং সাধুং আবাভ্যাম্, বিদ্যাসাগরভ্যাং ছাত্রভ্যাং, নাস্তি কন্টং ন দোষং।" তারপর তাকে গান শোনায়,—

"তাঁতিনীং তুমি মম শ্রীরাধাং আমিং তব শ্রীহরিং
তোমার তরেং শিয়াবাড়ী করবং কলা চুরীং॥"

এদের ধারণা সংস্কৃতজ্ঞান হলেই শাস্ত্রজ্ঞান। তাই এরা এক একটি বিশেষ উপাধি পেয়েও সর্বশাস্ত্রে সবজান্তা ভাব দেখান। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" প্রহসনে (১৮৭৪ খৃঃ) প্রযুক্ত উক্তি প্রত্যুক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

"রাজীব॥ ওহে চাটুয্যে তুমি তর্ক বাচস্পতির নিন্দা করো না, তুমি তাঁকে ভালরূপ জান না, তর্কবাচস্পতি একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ।

বাম॥ ভাল, অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ হোলেনই না, তা তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের ধার ধারেন কি?

রাজীব॥ চাটুয্যে, তুমি অমন কথা মুখে এনো না, যাঁর ব্যাকরণ শাস্ত্রে দখল আছে, তাঁর সকল শাস্ত্রেই অধিকার আছে।"

এর থেকেই পণ্ডিতদের শাস্ত্রজ্ঞানের গতিবিধি উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা এদের অনেকেই হারিয়েছিলেন। তাই কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাপরে কলি" প্রহসনে (১৮৮৮ খৃঃ) পণ্ডিতদের উপাধিকে ভূষির বোঝার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মহেশের অনেক উপাধি। ঝি চাপা মহেশ পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করে যে, উপাধি কি? মহেশ জবাব দেয়,—"একটা প্রকাণ্ড বোঝা।' চপা জিজ্ঞেস করে,—"কিসের বোঝা?' ব্রাহ্মণ জবাব দেয়,—"ভূষির।' বাস্তবিকই এদের উপাধি এদের ব্যঙ্গই করেছে। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" প্রহসনে (১৮৭২ খৃঃ) একজন বিদ্যাবাগীশ উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিতের বিদ্যার নমুনা উপস্থিত করা যেতে পারে। বিদ্যাবাগীশের মুখেই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একজন পণ্ডিতকে সে কেমন করে পাণ্ডিত্যের সাহায্যে জব্দ করেছে, তারই কথা সে বলেছে। "আমি দেকি গ্রামের অপমান হয়। কি করি, এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লুম, প্রস্তটা কি? তিনি বল্লেন ঘটের সমবায়ের আর অসমবায়ের কারণ কি? আমি বল্লুম, এত প্রস্তই হয় নি। ঘট অচেতন পদার্থ। তার কি নারী আছে যে বাইয়ের কম বেশ হবে? এই উত্তর কত্তেই চারিদিক থেকে ধন্য ধন্য রব উঠ্লো। পেট মোটা ভশ্চাজ্জি তো লজ্জায় অধোবদন।"

সুতরাং এইসব ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা বাইরে মোটামুটি অশ্রদ্ধা না পেলেও প্রকৃত শ্রদ্ধা অনেকদিন আগের থেকে ক্রমে ক্রমে হারিয়েছেন। প্রসন্নকুমার পালের "বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক" নাটকে (১৮৬০ খৃঃ) শ্রীদামপত্নী জটিলে আচায্যিমশাইকে সিধে দিতে গিয়ে মন্তব্য করে—অবশ্য তাঁর আড়ালে,—"আচাজ্জি মশাই আবার কোৎ থেকে এলো—ভালো য্যাক হোয়েছে—আচাজ্জি বামুনদের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, কেবল ভুগিয়ে ভুগিয়ে ব্যাড়ায়…।" বস্তুতঃ সামাজিক চাপের জন্যেই এদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠ্তে পারে নি। কারণ সমাজ বল্তে যা কিছু সবই এঁরা। ঈশানচন্দ্র মুস্তাফীর "জলযোগ" প্রহসনে (১৮৮২ খৃঃ) একজন ব্রাহ্মণের দম্ভোক্তির কথা বলা হয়েছে,—"সমাজ কি, আমরাই সমাজ, যা ইচ্ছা করি, করতে পারি সমাজ কেবল উপলক্ষ মাত্র।"

কিন্তু পরবর্তীকালে নব্য সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাবে যখন নতুন সাংস্কারিক মর্যাদার পত্তন হলো, তখন এই সমস্ত ধর্মধ্বজের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ আরও সমর্থনপুষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "কেরানীচরিত" প্রহসনে (১৮৮৫ খৃঃ) জ্ঞান মন্তব্য করেছে,—"মহাশয়, আপনাদের বিজ্ঞতার সঙ্গে আর আমাদের জ্যাঠামিতে একটা ভয়ানক reaction উপস্থিত হয়েছে! আপনি দিনকতক civilization এর history পড়ুন তাহলে সব জান্‌তে পারবেন।" নব্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রগতিশীলের পক্ষ থেকে প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে ভণ্ডামিকে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। সংস্কৃতি অন্যতম প্রধান নির্ভর-যোগ্য আশ্রয়। প্রগতিশীলের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে অতি সহজেই রক্ষণশীল সংস্কৃতির প্রতি সাধারণের বিশ্বাস হ্রাস পাবে। আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক বিরোধেও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি" নাটকে (১৮৬৮ খৃঃ) নন্দ বলেছে,—"বিলেত ফেরতের দ্বারা আমাদের সমাজের তত অনিষ্ট হয় নাই, যত অনিষ্ট আপনার ন্যায়দিগের দ্বারা হচ্ছে। প্রকাশ্য শত্রু ভাল, কিন্তু কপট বন্ধু কিছু নয়।" বিভিন্ন প্রহসনে প্রদত্ত পদ্যের মধ্যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষ করে বাউলদের গানে তা অত্যন্ত প্রকট। পূর্বোক্ত প্রহসনের একটি বাউলগীতিতে আছে,—

"ঘোর কলিকাল, হায়রে হায়রে সব মেকী।
পাকাপাকি জিবের গোড়ায়,
মনের গোড়ায় সব ফাঁকী॥
যত সং ভণ্ড মিলে ধর্ম ভুলে
করবে কেবল ঠকঠকি।
কুঁড জালি, নামাবলী দিনের বেলা সার,
রেতের বেলায় বেতের ছড়ি, ফুলবাবুর বাহার।
আবার দেখি সাহেব সেজে
পেটে পোরে রাম পাকি॥"

উনবিংশ শতাব্দীতে পুরোনো সাংস্কারিক গোষ্ঠীর মর্যাদা ক্রমেই কমে এসেছিলো। একদিকে যেমন স্বাধীন দৃষ্টিকোণ প্রাথমিক অনুশাসনবিরোধী ক্রিয়া কলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়েছে, তেমনি রক্ষণশীল পক্ষ থেকেও আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক বিরোধে দৃষ্টিকোণ সংহত হয়ে তার সঙ্গে মিলিত

হয়েছে। বলাবাহুল্য প্রগতিশীল পক্ষ থেকে দৃষ্টিকোণ সংগঠন স্বাভাবিক। সুতরাং সাংস্কারিক গোষ্ঠীর মর্যাদাকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রহসনের জন্ম হয়, তার মধ্যে সমাজচিত্র নির্ধারণে পদ্ধতিগত চাপ মোটেই অপ্রধান নয়। কিন্তু পদ্ধতিগত চাপ যতোই থাকুক, সাংস্কারিক গোষ্ঠীর মর্যাদা বিরোধী ক্রিয়া-উপাদান সমাজে অবাস্তব ছিলো না।

(ক) রক্ষণশীল সমাজধ্বজ ও ধর্মধ্বজেব ভণ্ডামি ও অনাচার ॥—

ভণ্ড দলপতি দণ্ড (১৮৮৮ খৃঃ)—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ নামকরণে প্রহসনকারেব উদ্দেশ্য স্পষ্ট। প্রহসনের শেষাংশে একটি বাউলের গানে লেখক তাঁর মূল্য বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। গানটি ইতিমধ্যে প্রারম্ভিক বক্তব্যে উপস্থাপিত কবা হয়েছে।

কাহিনী।—গ্রামেব দ.পতি হরিহরবাবু ধর্মধ্বজ ব্যক্তি। গোবর্ধনের বর্ণনায়,—"হরিহব আজও সন্ধ্যে আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করে না, দেবতা-ব্রাহ্মণে অচলাভক্তি।" কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি ব্যভিচারী এবং পরের অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী। নন্দরাম মুখুজ্যে তাঁর প্রতিবেশী। সমাজপতি হরিহর তাঁকে একঘরে করবেন স্থির কবলেন। নন্দরামবাবুব অপরাধ—তার বিলেত ফেরৎ কোন্ এক বন্ধুকে তিনি তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন। মালা জপ করতে করতে হরিহর বলেন,—"বলেন কি মশায়! এতে কি আব হিঁদুয়ানী থাকবে? এ ঘোর কলি দেখ্‌চি। বিলেত ফেরৎ যদি সমাজে চলে যায়, তবে কি কেউ জাত ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে?" হরিহরেব সঙ্গে থাকে মোসাহেব কেনারাম। সে অর্থলোভী। তার স্বগতোক্তি,—"আমি তোমারও অনুগত নই, আর তোমার বাবারও অনুগত নই। তবে আমি যার অনুগত, সে তোমার সিন্দুকে দিনকতকের জন্য বাসা নিয়েচে, এইমাত্র তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পর্ক।" কোচওয়ান্ রহিমবক্সও বাবুর অনুচব। বাবু তার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলেন, কিন্তু সে আসলে বাঙাল হিন্দু। আজকালকার হালচাল বুঝে রহিমবক্স সেজে পেটের দায়ে চাকরি করছে। বাবুর দুর্বলতা বুঝে অর্থ আদায় করা তার পেশা। "ব্যাটা ব্যাটা কন্ ক্যান্? এহনি মেম্ সাব্‌কে কয়ে দিমু—আর ট্যারটা পাবা।" এটা অবশ্য তার স্বগতোক্তি। হরিহরের আর একজন সহচর ধনদাস ভট্টাচার্য। জাতে সে ব্রাহ্মণ।

আপাততঃ সে হরিহরের দলে থাকলেও আসলে কারো দলে নয়। তার উদ্দেশ্য, পাড়ায় দলাদলি বাধিয়ে দুই পক্ষ থেকেই অর্থদোহন করা। স্ত্রী দিগম্বরীকে একবার সে বলেছে,—"একটা দলাদলি বাধলেই আমার উভয় পক্ষ থেকেই বিলক্ষণ লাভ হবে। দেখ, এম্নি করেই দুই হাতে টাকা কুড়াব।" অবশ্য হরিহরের ব্যক্তিগত কুকর্মে উৎসাহ দিয়েও কিছু কিছু অর্থোপার্জন সে করে থাকে।

নন্দরামের সমাজচ্যুতির ব্যাপারে হরিহরের দলের সকলেই একমত। ইতিমধ্যে ধনদাস নন্দের কাছে গিয়ে তাকে পরামর্শ দিলো যে, তিনি বরং নিমন্ত্রণ খাওয়াবার কথাটি চেপে যান এবং পঁচিশ টাকা অর্থব্যয় করুন তাহলে সমাজ ঘটিত সমস্যা থেকে তিনি উদ্ধার পেতে পারবেন। নন্দরাম কিন্তু মিথ্যে কথা বল্‌তে রাজী হলেন না। আশাহত ক্রুদ্ধ ধনদাস মন্তব্য করলেন,—"ওঃ বটে বটেঃ। তোমরা যে একেলে ছোক্‌রা কিনা?"

সমাজপতি ধর্মধ্বজ হরিহরের একটি ফিরিঙ্গী রক্ষিতা ছিলো। তার নাম 'লুসি'। মেমের ওপর খুব লোভ অথচ ইংরাজী ভাষার জ্ঞান হরিহরের খুব কম। বিদ্যা নেই পেটে, অথচ ফিরিঙ্গী লুসির সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলা তাঁর চাই-ই। কেনারামের কাজ তাঁর দুর্বলতাটাকে কৈফিয়ৎ দিয়ে সাম্‌লে রাখা। একদিনকার ছবি বেশ হাস্যকর। লুসিকে সম্ভাষণ করে হরিহর তাকে বল্‌লেন,—"I am coming soon soon, but catched a pain I the bosom, and I-I-I I "। ব্যাপার দেখে লুসি কলকণ্ঠে হেসে গড়াগড়ি যায়। তখন কেনারামই বাবুকে রক্ষা করে। সে বল্‌লো,—"আরে হুজুরের বুঝি আবার সেই বেদনাটা হলো ছাই, ইংরাজী ভাষাটা বেজায় গরম ভাষা কিনা, ওটা কেমন হুজুরের পেটের ভিতর হুটপাট্ করে বেড়ায়। তা হুজুর, আপনি ম্লেচ্ছ যবনের ভাষায় কেন কথা কইতে যান্? আমাদের মাতৃভাষায় কথা কন না। মেমসাহেব ত আমাদের মাতৃভাষা জানেন।"

লুকিয়ে লুকিয়ে হরিহর লুসির সঙ্গে ব্যভিচার করে দিন কাটান। বাইরে তাঁর মালাজপ আর হরিপ্রেম একই সঙ্গে চল্‌তে থাকে।

পাশেরবাড়ীর কোনো এক গণিকার কার্তিক পূজো করা দেখে ফিরিঙ্গী লুসিরও ইচ্ছে হলো সে কার্তিক পূজো করবে। হরিহরকে সে তার সাধ জানালো। হরিহর রাজী হলেন—নির্দিষ্ট দিনে সব কিছু ব্যবস্থা করবার জন্যে। ইতিমধ্যে প্রতিবেশীদের অনেকেই হরিহরের এই গোপনীয় ব্যাপার-

গুলো জেনে গেছে। নন্দরামের ইচ্ছে হলো—অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে হরিহরবাবুর কাছে দলবল নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে চরম অপ্রস্তুত করবেন এবং ভণ্ডামির মুখোস খুলে দেবেন।

লুসিবিবির বাড়ীতে কার্তিক পূজোর উদযোগ হচ্ছে। কেনারাম পূজারী। পূজোর যোগাড়যন্ত্র করছে রহিমবক্স। মেধা দ্রব্যের অভাব সর্বত্রই। কেনারাম তাতে বিচলিত না হয়ে বিধি দিচ্ছে। চন্দনের বদলে অডিকোলন ইত্যাদি। রহিমবক্সের উৎসাহও কম যায় না। সেও বলে—'মুইও না হয় এহানে একটু নেমাজ ছাড়ি দিমু।'' সে নামাজ ছেড়ে দেয়। ধনদাস পূজো আরম্ভ করে। তার ধ্যানমন্ত্রের নমুনা এই,—'ওঁ কার্তিকেয় মহাভাগে ময়ূরারূঢ় সুন্দরং দেবং লম্বোদর সহোদর ধনুষ্টঙ্কারধারি গৌরবর্ণায় চৌগোঁপ্যায় বাবরী কেশধারায় কার্তিকো স্বাহা।'' পুরুৎ দক্ষিণা হিসেবে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি পেলেন। পূজো সাঙ্গ হলো—লুসির নাচ গান আর মদ্যপানের মধ্যে দিয়ে। ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে এক বাউল এসে আধুনিক অনাচার সম্পর্কে আক্ষেপ জানিয়ে প্রস্থান করলো। তারপর যথাসময়ে নন্দরাম তার প্রতিবেশীদের নিয়ে আসরে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয়ে ভণ্ড দলপতি ধর্মধ্বজ হরিহরের যথোপযুক্ত দণ্ড দিলেন।

কলিকৌতুক (শ্রীরামপুর—১৮৮০ খৃঃ)—শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি ॥ টাইটেলে আছে,—''কলিকৌতুক নাটক অর্থাৎ নাট্যচ্ছলে কলির আরম্ভাবধি বর্তমানকাল পর্য্যন্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।'' বিভিন্ন পুরাণে কলিযুগের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হয়েছে—

"ব্যভিচার রতা ন্যায্যো দুর্ম্মুখো গুরুদূষিতা।
দুর্ব্বাক্য বদনাঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে,—

"সর্ব্বেজনা স্ত্রীবশাশ্চ পুংশ্চলাশ্চ গৃহে গৃহে।
তর্জ্জনৈর্ভর্ৎসনৈঃ শশ্বৎ স্বামিনং তাড়য়ন্তীচ।
গৃহেশ্বরীচ গৃহিণী গৃহীভৃত্যাধি কোঽধমঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমঃ পুংসো যোষিতা মাজ্ঞয়া বিনা॥''

কল্কি-পুরাণেও ইতস্ততঃ শ্লোকে কলিযুগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন,—

"দ্বযোঃ স্বীকার স্তুদ্বাহে শাঠ্যে মৈত্রী বদান্যতা।
বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোর্থে ধর্ম্ম সাধনং ॥"

কিংবা,—

"স্ত্রিযো বেশ্যালাপস্তথাঃ স্বপুংসাংত্যক্ত মানসাঃ ॥ ॥
স্ত্রিযো বৈধব্যাহীনশ্চ স্বচ্ছন্দাচরণ প্রিয়া ॥"—ইত্যাদি।

কলিকৌতুক প্রসঙ্গে কলিযুগ বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক এতো শ্লোক উদ্ধারের হেতু এই যে, কলিকৌতুক অনেকটা এইসব শ্লোকেরই ভাষ্য। নামকরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "কলি" শব্দটি সংযুক্ত বিভিন্ন প্রহসনের নামকরণের কথাও এখানে স্মরণ করা চলে। তবে অবকাশ ক্ষেত্রে এখানেই কলির ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হলো।

প্রহসনকার অবশ্য ধর্মধ্বজের ভণ্ডামি ও অনাচারকে প্রধানভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। ঋষি পরীক্ষিৎকে কলিযুগ সম্বন্ধে বলেছেন,—

"না করিবে বিধিমতো কর্ম্ম আচরণ।
শূদ্র সেবী হবে কলিযুগে দ্বিজগণ ॥
তপস্বির বেশ উপজীবী শূদ্র হবে।
নিজে অধার্ম্মিক হযে অন্যে ধর্ম্ম কবে ॥"

কৌলীন্যের মর্যাদাকেও মিথ্যাপবাযণের কথিত পদ্যে বিদ্রূপ করা হযেছে। নেড়ানেড়ী সম্পর্কে পয়ারটি সামাজিক ইঙ্গিত বহন করে।—

"যত বেটা যণ্ডামার্ক চৈতন্যের নেড়া।
ধর্ম্মাধর্ম্ম হীন যেন কাবেলের বেঁড়া ॥
জপতপ নাহি সদা নেড়ী সঙ্গে থাকে।
গাঁজাগুলি সিদ্ধি সুরা খায পাকে পাকে ॥
তুমি রাধা আমি কৃষ্ণ ভাবে পরস্পর।
নেড়ী সঙ্গে রাসলীলা সেবে নিরন্তর ॥
অন্নের বিচার নাই যার তার খায।
অঙ্গের দুর্গন্ধে মাছি পিছে পিছে ধায ॥
বিদ্যার ধুকুড়ী সবে বুদ্ধির চুপুরী।
মূর্খের পলটনে গিযা করে জারিজুরী ॥
ক অক্ষর মহামাংস সবার জঠরে।
অথচ সিদ্ধান্ত করি ফিরে ঘরে ঘরে ॥

আলুকে বলেন রম্ভা, বেল্‌কে বলেন কচু।
তা সবার সম কেবা মোনা কাটা চচু॥"

কাহিনী।—গৌড়দেশে ওপর কলিরাজের গোড়া থেকেই আকর্ষণ। পরীক্ষিৎ তাকে একবার শাস্তি দিয়েছিলেন। তারপর আর সে অনেকদিন মাথা তুল্‌তে পারে নি। অবশেষে সে আশুতোষকে তপস্যা করে। আশুতোষ দেখা দিয়ে বলেন, বিষ্ণু স্বয়ং কলির সহায়তায় বুদ্ধ অবতার ধারণ করবেন। "কোঙ্ক বেঙ্গ" দেশের অর্হৎ নামে এক রাজাও তার অনুকূল হবেন—তবে কিছু দেরীতে। বুদ্ধের সঙ্গে কলির পরামর্শ হয়। বুদ্ধ কথা দিলেন তপস্বীদের বেদবিরোধী করে তুল্‌বেন। অবতার হয়ে তিনি কাজও সুরু করে দিলেন। কামও ইতিমধ্যে এসে কলির সহযোগিতা করে। কেশেল পণ্ডিতেরা সকলে লম্পট হয়ে পড়ে। "সিদ্ধান্ত ভট্টাচায্যি" গাড়ু হাতে তেয়ারীদের বাগানে গিয়ে নির্জনে একটি মেয়েকে ফুল তুল্‌তে দেখে তাকে ধর্ষণ করেন। মেয়েদের মধ্যেও ব্যভিচার বেড়ে যায়। শ্যামা বলে,—"এখনকার মাগীরা বোঝা বোঝা পেলেও ক্ষান্ত হয় না।" পাঁজাদের কেবলার মা দ্রৌপদী হয়ে বসে আছে। বিধবা রঙ্গিনী শেষে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয়েছে।

কাশীকে নষ্ট করে কলি বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হয়। আদিশূরের বেশ ধরে তার মহিষীতে সে উপগত হয়ে বল্লালের জন্ম দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় কৌলীন্যের কুফল। শিব মুখুজ্যে তার ষোড়শী মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কপটলোচন আর মিথ্যাপরায়ণ নামে দুই কুলাচার্যের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শেষে স্থির হয় আধাআধি বখ্‌রা। তারা শিব মুখুজ্যেকে পুষ্করিণী গ্রামে নিয়ে চলে। ৮/৯ বছর বয়সের এক "অকৃতদার নৈকষ্য পাত্র" পাওয়া গেছে। পাত্র একেবারে বিয়ে সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ছেলেটির নাম চণ্ডী। সে মাকে জিজ্ঞেস করে,—"হে মা বে তবে কি তা বল্‌ মা?" মা উত্তর দেয়—, "অরে বাছা বৌমা আসার নাম বে।" ছেলে আবার জিজ্ঞেস করে,—"তা সে এসে কি কোরবে মা?" মা উত্তর দেয়,—"সে এসে বাড়ীর কায কম্ম কোরবে, হেদে তোর কাছে শোবে, এই সকল কোরবে আর কি।" চণ্ডী জিজ্ঞেস করে,—"আমার কাছে শোবে কেন মা?" মা বলে,—"অরে তোর কাছে শুলে আর ছেলেপিলে হবে, তাতেই শোবে।" চণ্ডীর প্রশ্ন শেষ হয় না। সে বলে,—"হা মা তবে আমার কাছে শুলে তোর কেন ছেলে হয় না মা?" প্রসঙ্গ বেগতিক দেখে মা পালায়।

এদিকে শিব মুখুজ্যে ঘটকদের সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হন। ছেলের বাবা অনুপস্থিত ছিলেন। মা ছেলেকে দেখিয়ে দেয়। ছেলে উপস্থিত হলে কপট লোচন তাকে তার বাপের নাম বলতে বলে। কিন্তু চণ্ডী বল্‌তে পারে না। মিথ্যাপরায়ণ তখন তাকে বলে—"ভাল তো ভাই তোমার কথাখানা, ও কুলীনের ছেলে, ও কি কখন আপনার বাপকে দেখেছে, যে তোমার কাছে বোল্‌বে।" কপটলোচন লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করলে চণ্ডী উত্তর দেয় যে, সে পাতে দাগা বুলোয়। মিথ্যাপরায়ণ বলে—'আঃ তুমি তো ভাই বড় জ্বালাতে লাগ্‌লে কুলীনের ছেলে আবার কে কোথা লেখাপড়া করে?" যাহোক একান্ন টাকা পণ নিয়ে ঠিক হয়। ঘটকরা 'তৈল সন্দেশ' অর্থাৎ তেল আর পাটালিগুড় নিয়ে বাড়ী ফেরে।

নির্দিষ্ট দিনে বিয়ের পর বাসর ঘর। যুবতী মহিলারা এসে শ্বশুরের সঙ্গে অশ্লীল রসিকতা শুরু করে। বরের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারা অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়ে দিয়ে প্রসঙ্গ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও অশ্রাব্য করে তোলে। বর বোকার মতো থাকে। মেয়েরা চলে গেলে আটবছরের চণ্ডী তার ষোড়শী বধূকে একা দেখে বলে ওঠে—তুই বুঝি আমার কাছে শুতে এসেছিস? আয় তবে শো।" যুবতী মধুর চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে বলে, "কেন তোমার কাছে শুলে আমার কি হবে?" চণ্ডী উত্তর দেয়,—'উঃ আমি যেন তা জানি নে কেন, মা বলেছে আমার কাছে শুলে তোর ছেলে হবে। মধু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে,—ছেলে হয় কেমন করে তা কি তুমি জান?' চণ্ডী গর্জ্জে চলে বলে,—'না, আমি আবার তা যেন জানি নে।' কেন? ছেলে হবে নাচতে নাচতে। মধুর শরীরে আনন্দের শিহরণ জাগে। সে বরের গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে মধু তার একটা পা বরের গায়ের ওপর তুলে দেয়। বর নির্বিবাদ। মধু তখন বরকে জড়িয়ে ধরে শোয়। বিরক্ত হয়ে চণ্ডী বলে,—"দেখ দেখি, আমি ঠাকরুণকে বলে দেব, উনি আমাকে এঁটে মুটে ধরেছেন।" বাসর ঘর থেকেই বর চেঁচিয়ে ওঠে "ওগো ঠাকরুণ! দৌড় গো, তোমার মেয়ে আমাকে মারলে গো মারলে!" দুঃখের হাসি হেসে মধু সরে গিয়ে শোয়। নিজের ভাগ্যকে সে ধিক্কার দেয়।

কৌলীন্য কলির শাসনকে দৃঢ় করে তোলে। ইতিমধ্যে মায়া, অধর্ম, মোহের সহায়তায় কলি 'মোজেস' আর 'মোহম্মদের' সৃষ্টি করে। তাঁরা এসে 'অধর্ম' প্রচার করে কলির শাসনকে শক্ত করে তুল্‌বেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ বিষ্ণু

কলিকে দমন করবার জন্যে চৈতন্য অবতার হলেন। কলি কিছুদিন রইলো। কিন্তু চৈতন্য মারা যাবার পরই কলির তেজ আবার বেড়ে গেলো। সে তখন নেড়া নেড়ীর মধ্যে ব্যভিচার ঢুকিয়ে দিলো। সখীচরণের কাহিনী দিয়েই সেটা বোঝা যায়। এক নেড়ী কি করে তার সঙ্গিনী হলো, সেটা সে বলে চলে,—

"একবার ওনাতে আমাতে উত্তর দেশে যেতে যেতে একদিন শিষ্য বাড়িতে পৌছিতে না পেরে পথের মাজে এক মুদিখানায় থাকলাম, রাত্রিতে উনিও যে ঘরে শুলেন আমিও সেই ঘরে শুলাম। মা গোসাই আমাকে বোল্লেন, বাছা সখীচরণ! আমার চরণ দুটো বড় দরজ কোচ্চে, তুই না কি একটু তেলটেল দেতে পারিস? আমি বোল্লাম পারব না কেন মা গোঁসাই! আচ্ছা দি চ্ছ, এই বোলে আমি তেলের বাশা থেকে তেল বের কোরে ওনার চরণতলে বোসে তেল দিতে লাগ্‌লাম। উনি বোল্লেন একটু ভাল করে টিপে টেপে ওপর তাকাৎ দিয়ে দে, আমি সেন চরণতলে বোসেই হাটু তাকাৎ টিপতে থাপ্‌তে লাগ্‌লাম, উনি বোল্লেন ও ভাল হোচ্চে না, একটু গোরে এসে ভাল কোরে দে, আমি আর একটু সোরে গে হাটুর একটু ওপর তাকাৎ যেন তেল দিতে আরম্ভ কোরলাম, উনি বোল্লেন, আ—মর ছোঁড়া! ওতে হোলো না, তুই আর একটু সরে আ, না, আমি তোর দাবনার ওপর পা দিই, তুই ভাল কোরে দাবনার ওপর তাকাৎ টিপে টেপে দে, কি কোরবো আমার আমি তাই কোরতে লাগলাম, তখন উনি বোল্লেন, সখীচরণ তুই বৃন্দাবন দেখিছস্? তাতেই আমি বোল্লেম কোই না। মা গোসাই বোল্লেন, একটু ওপর পানে হাত দে দেখ না, ঐখানেই গুপ্ত বৃন্দাবন আছে, বাবাজি। আমি তখন এতো তো বড় জানিনে শুনিনে আমাকে যা বোল্লেন আমি তাই কোরলাম, উনি বোল্লেন দেখলি, আমি বল্লাম দেখ্‌লাম মা গোসাই দেখ্‌লাম, তাতেই আবার উনি বোল্লেন দেখ্‌লি তো পরিক্রিমা কর, আমি বোল্লাম, মা গোসাই পরিক্রিমা কেমন কোরে করে তাতো আমি জানি না, উনি বোল্লেন রোস্ তবে আমি দেখাই, এই বোলে উঠে, বলেন, সনাতন কোই, তা নৈলে কি বৃন্দাবন পরিক্রিমা হয়? আমি বলি, তা তো জানি না, উনি বল্লেন থাক আমি জানাচ্ছি এই বোলে আমার সনাতনের সঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রিমা কোরতে লাগ্‌লেন, বাবাজি! সেই হোতেই উনি আমার সঙ্গে আছেন।"

নেড়া-নেড়ীদের মধ্যে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়। নেড়ারা জপতপ ছেড়ে নেড়ীর সঙ্গেই সব সময় কাটায়। পাকে পাকে গাঁজা গুলি সিদ্ধি ইত্যাদি খেয়ে

নেশা করে। অন্নগ্রহণে বাছবিচার নেই। ক-অক্ষর গোমাংস অথচ নিদ্ধান্ত দিয়ে বেড়ায়। মোটকথা চৈতন্যও কলিকে একেবারে কাবু করতে পারেন নি।

এবারে কলি ক্লাইভের সহায়তায় বাংলাদেশে নিজের নাম দিয়ে একটা রাজধানী গড়ে তুল্‌লো। তার নাম দিলো কলি-কাতা। কলির চর ইংরেজরা এসে কলির রাজ্যকে প্রায় নিষ্কণ্টক করে তোলে। যুবকরা ইংরিজী শিখে অনাচার করে, বাবা মাকে মানে না, ধর্মও মানে না। যত্ন বলে একটা ছেলে তার বাবাকে সামনে দেখে বলে—"গো ফ্রম হিয়ার নাষ্টি ব্রুট্‌ ওল্‌ড ডেবিল!" বন্ধু এলে তাকে যত্ন বলে,—ননসেন্স ফাদার তাকে হিঁদুর আচার মান্‌তে বলে। "আমি অমন অসভ্য ফাদারকে ডোণ্ট কেয়ার করি, ও আবার আমার কিসের ফাদার, ওরই ফাদার সে আমারও ফাদার সেই, আমরা সকলেই নেচার হইতে জন্মিয়াছি, নেচারই আমাদের মান্য! ও ডেবিল, কোথায় কে?"

সাহেবী ছোক্‌রাদের দাপট ক্রমেই বেড়ে চলে। এদিকে কলিকে দমন করবার জন্যে রামমোহন আর বিদ্যাসাগর ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।

—প্রহসনটিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গকে উপস্থিত করা হয়েছে। তবে এখানে উপস্থাপনের একটি অবকাশ থাকায় প্রহসনটিকে এখানেই উপস্থাপন করা হলো। আপাত দৃষ্টিতে প্রহসনে অভিব্যক্ত কাল-সীমা দীর্ঘ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় প্রসঙ্গ উপস্থাপনের তাগিদ এবং সামাজিক দৃষ্টান্তের সক্রিয়তা বা প্রভাব এখানে অস্বীকার করা যায় না। সমাজচিত্রগত মূল্য এই দিক থেকেই গ্রহণ করা উচিত।

বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০ খৃঃ)—মধুসূদন দত্ত॥ প্রহসন শেষে লেখক একটি ছড়া উপস্থাপন করেছেন,—

"বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম-ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম,
"বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া"॥

ছড়াটির মধ্যে দিয়ে প্রহসনকার তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

কাহিনী।—ধর্মধ্বজ বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদ কৃপণ ধনী জমিদার। খাজনার সামান্য পয়সার জন্য তিনি রায়তদের ওপর অত্যাচার করেন, কিন্তু ব্যভিচারের জন্যে টাকা খরচ করতে তিনি পেছ-পা হন না। ব্যভিচারের ব্যাপারে সহায়ক তাঁর অনুচর গদাধর আর পুঁটি নামে এক মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ। পুঁটি বলে,—"এত যে বুড়ো, তবু আজও যেন রস উথলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বছর ওর কর্ম কচ্চি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি, তার কিছু ঠিকানা নেই। বাবু এদিকে পরম বৈষ্ণব, মালা ঠক ঠকিয়ে বেড়ান—ফি সোমবার হবিষ্যি করেন, আ মরি, কি নিষ্ঠে গো।" গদাধরের কথায় প্রকাশ পায়, কোন্ ভট্টাচার্যের সুন্দরী মেয়েকেও তিনি নষ্ট করেছেন। এখন সে 'বাজারে' হয়ে কসবায় আছে।

হানিফ গাজী তাঁর একজন মুসলমান রায়ত। আজন্মায় তার ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে। তাই সে বছরের পুরো খাজনা শোধ করতে পারছে না। সামান্য কিছু শোধ করে বাকীটুকু জন্যে সে ভক্তপ্রসাদের কাছে মাফ চায়। ভক্তবাবু তাতে রাজী হন না। হানিফ তখন গদাধরকে ধরে। গদাধর কানে কানে ভক্তপ্রসাদকে জানালো যে হানিফের ঘরে উনিশ বছর বয়সের এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী আছে। তার এখনো ছেলেপেলে হয় নি। চেষ্টা করলে তাকে পাওয়া যেতে পারে। শুনে ভক্তপ্রসাদ হানিফের খাজনা মাফ করে দেয়। হানিফ উল্লসিত হয়ে বাড়ী ফিরে যায়, সে ভেতরের কিছুই বুঝতে পারলো না।

ভক্তপ্রসাদ পঞ্চানন বাচস্পতির ব্রহ্মত্রভূমি নিজের বাগানের মধ্যে ফেলে বাজেয়াপ্ত করেছেন। সেই পঞ্চাননের মা মারা গেছে দিন চারেক হলো। উপায়ান্তর না দেখে বাচস্পতি ভক্তপ্রসাদের কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। ভক্তপ্রসাদ বাচস্পতিকে শুষ্ক বিনয়ে শূন্য হাতে বিদায় দিলেন। তাঁর নাকি এখন টানাটানি। ওদিকে আবার পীতাম্বর তেলীর স্ত্রী ভগী যখন তার যুবতী মেয়ে পঞ্চীকে নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের অকারণ ডেকে এনে লোলুপ দৃষ্টিতে পাঁচীর দিকে চেয়ে দেখেন। মেয়েটির স্বামী বিদেশে থাকে। পীতাম্বরও কদিন থেকে কেশবপুরের হাটে। এরা চলে গেলে ভক্তপ্রসাদ গদাধরকে বলে, একে হাত করা চাই। এর পেছনেও অর্থ ঢালবার ব্যাপারে তিনি তাঁর টানাটানির সময়ের কথা একেবারেই ভুলে যান। "ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন,—আমি আর এক

মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্তে পারবো না ?" গদাধর এসব দেখে মন্তব্য করে,—"বুড়ো হলে লোভাক্তি হয়, কোন ভালমন্দ জিনিস সাম্‌নে দিয়ে গেলে আর রক্ষা থাকে না।"

ভক্তপ্রসাদের নিদেশে পুঁটি হানিফের বাড়ী গিয়ে তার স্ত্রী ফতেমার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তার উদ্দেশ্য জানায় এবং ভক্তপ্রসাদের দেওয়া পঁচিশ টাকা থেকে চার টাকা কেটে রেখে একুশ টাকা দেয়। মোট পঞ্চাশ টাকা নাকি সে তাকে দেবে। হানিফের সঙ্গে ফতেমার এ ব্যাপার নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছিলো। হানিফের নিদেশেই ফতেমা টাকা নেয়। টাকা দিচ্ছে, না নেওয়াটাই বোকামি, তবে একটা শিক্ষা হানিফ দেবেই। পুঁটি ফতেমাকে বলে—"তুই সাঁজের বেলা ঐ আমবাগানে যাস, তারপরে আমি এসে তোকে নে যাবো। ফতেমা রাজী হয়। হানিফ ফতেমাকে শিখিয়ে দেয় ভক্তপ্রসাদ যেন তার গায়ে হাত দিতে না পারে।

কি করে ভক্তপ্রসাদকে শিক্ষা দেবে, এ ব্যাপারে হানিফ বাচস্পতির পরামর্শ নেয়। বাচস্পতিও ভক্তপ্রসাদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। ভক্তপ্রসাদ মাতৃদায়ে তাঁকে মাত্র পাঁচ টাকা সাহায্য করেছে অনেক বলা কওয়ার পর। কিন্তু কর্তাতিতে টাকা চালাবার ব্যাপারে তিনি মনে মনে ভক্তপ্রসাদের ওপর মনে মনে চটে গিয়েছিলেন। হানিফ আর বাচস্পতি দুজনে মিলে ভক্তপ্রসাদকে জব্দ করবার জন্যে ফন্দি আঁটেন।

এদিকে পুঁটি আবার এসে ফতেমাকে খবর দেয়, আমবাগানে যেতে হবে না। "দেখ, ঐ যে পুকুরের ধারে ভাঙা শিব মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে তা তুই রাত চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস তারপরে আমি এসে যা কত্তে হয়, করে কম্মে দেবো।" ফতেমা মনে মনে ভাবে,— "দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাসা হয়।"

ভক্তপ্রসাদের যেন সময় কাটতে চায় না। যথাসময়ে সেজেগুজে তিনি তৈরী হন। শান্তিপুরী ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদর, জরির জুতো, মাথায় আবার তাজ। এই তাজটা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়েমাগীরে এই সকল ভালবাসে, আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্ছে যে, টিকিটা ঢাকা পড়েছে।" গায়ে তিনি একটু আতরও মাখ্‌লেন। নেড়েরা আবালবৃদ্ধ বণিতা আতরের খোসবো বড় পছন্দ করে।' তারপর ভক্তপ্রসাদ ভাঙা মন্দিরের দিকে চুপি চুপি এগোলেন।

এদিকে হানিফ গাজী আর পঞ্চানন বাচস্পতি ভাঙা মন্দিরের কাছাকাছি একটা অশ্বত্থ গাছের আড়ালে অপেক্ষা করছেন। স্থির হয় বাচস্পতি ইস বা বললেই হানিফ ছুটে গিয়ে ভক্তপ্রসাদকে শিক্ষা দেবে। হানিফের আর ভয় নেই। অন্য জায়গায় সে ঘরের ব্যবস্থা করেছে।

যথাসময়ে ফতেমা আর পুঁটি আসে। ফতেমা ভয়ে ... দেয়। তার স্বামী জানতে পারলে তাকে মেরে ফেলবে। পুটি তাকে অভয় দেয়। ইতিমধ্যে ভক্তপ্রসাদ ও গদাধর এসে পড়ে। ফতেমাকে দেখে ভক্তপ্রসাদ ভাবেন,—"এ যে আস্তাকুড়ে সোনার চাঙড়" গদাধরকে তিনি কিছুদূরে পাহারা দেবার জন্যে গিয়ে দাঁড়াতে বলেন। পরে ফতেমার আঁচল ধরে বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রেম জানায়। শিব মন্দিরের মধ্যে ব্যাভিচার করবার আগে একটু দ্বিধা আসে। কিন্তু তারপরই ভক্তরাম ভাবে,— এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করাই বা কোন ছার!'

এমন সময় হঠাৎ একটা গম্ভীর আওয়াজ আসে—'বটে রে পাপ নরাধম দূর হ!' সকলে তাই শুনে ভয়ে কাঁপতে থাকে। পুটি ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। ভক্ত ভগবানের নাম করেন ঘন ঘন। ভক্ত ভাবেন শিব বুঝি রুষ্ট হয়েছেন। এমন সময় চোখে মুখে কাপড় ঢেকে হানিফ আচমকা ছুটে এসে প্রথমে গদাধরকে চপেটাঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর বুড়ো ভক্তপ্রসাদের পিঠের উপর বসে ঘুসি মারে যতো পারে। বুড়ো পরিত্রাহি চীৎকার ছাড়ে। পুটিকেও হানিফ লাথি মেরে ফেলে দেয়। তারপর সে যেভাবে ছুটে এসেছিলো, সেইভাবেই পালিয়ে যায়। ভক্তপ্রসাদ, পুঁটি এবং গদাধর যন্ত্রণায় কাতরায়।

ইতিমধ্যে— কিছুই যেন জানেন না—এইভাবে বাচস্পতি এসে মন্দিরে ঢোকেন। এই পথ দিয়ে তিনি নাকি যাচ্ছিলেন। গোঙানির শব্দ শুনে এসেছেন। হানিফ গাজীর স্ত্রীকে নিয়ে এ অবস্থায় ভক্তপ্রসাদ এতোরাত্রে কি করে এলেন বাচস্পতি তার কারণ জিজ্ঞেস করলে, ভক্তপ্রসাদ বলেন,—"ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমী ফিরে দেব, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি কোরো, যেন আজকের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।"

হানিফও ইতিমধ্যে আসে। ফতেমার তল্লাস করতে করতে নাকি সে এখানে

এসেছে। সে ভক্তপ্রসাদকে ফতেমার সঙ্গে থাকতে দেখে 'কুটুম' বলে সম্বোধন করে। ভক্তপ্রসাদ প্রমাদ গোণেন। শেষে দুশো টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেহাই পেলেন। ভক্তপ্রসাদ উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে মন্তব্য করেন,—"আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্মতি যেন আমার কখন না ঘটে।"

অশুভ পরিহারক (ঢাকা—১৮৬২ খৃঃ)—গৌরমোহন বসাক॥ বিজ্ঞাপনে[৮] লেখক বলেছেন,—" 'অশুভস্য কালহরণং' নামে একখানি পুস্তক প্রচারিত হওয়াতে যেন কাহার অন্তঃকরণে ঐরূপ ভ্রান্তি সংস্থাপিত হইতে না পাবে, এতদভিলাষেই আমরা তাহার উত্তর স্বরূপ এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। ইহার দ্বারা কুসংস্কার তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিব্যূহের কথঞ্চিৎ ভ্রমপ্রমাদ তিরোহিত হইলেই সফলশ্রম বোধ করিব।" বিধবাবিবাহ সম্পর্কে সাংস্কৃতিক মতবিরোধ বিভিন্ন প্রহসনের জন্ম দিয়েছে। প্রহসনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও ছিলো। অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা "কৌতুক প্রবাহ"[৯] গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহে ধর্মধ্বজের বিরুদ্ধে যুক্তির অসারতা প্রমাণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী ধর্মধ্বজের লাম্পট্যের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

কাহিনী।—উপেন্দ্র, মহেন্দ্র আর মহিম রাজপথে যেতে যেতে আলোচনা করে। ভণ্ড ধর্মধ্বজদের কটাক্ষ করে মহেন্দ্র বলে,—"ওদের যেদিকে চাও, সেদিকেই দোষ। যেমন কম্বলের রোঁয়া বেছে ওর করা ভার তেম্নি ওদের দোষ। ওরা মেনে যা করে তাই শোভা পায়। দেখ না, কেহ কেহ কপাল ভরে ফোঁটা করে সদাই ভবম্ ভবম্ বল্চে, অথচ মদিরা স্রোতে গড়াগড়ি দিয়ে কত শত কুলরমণীর সতীত্ব-রত্ন নষ্ট করচ্যে। কেহ কেহ ডায়মণ্ড কাটা তিলক দিয়ে মালা ঠক ঠক করে লোকতঃ ধাম্মিক জানাচ্যে, আবার গোপনে গোপনে কত শত বিধবাদিগের গর্ভসঞ্চার করচ্যে। ভাই ওদের ধর্মের মর্ম্ম বুঝা ভার।" মহেন্দ্রকে সমর্থন করে মহিমও ছড়া আবৃত্তি করে বলে,—

৮। ঢাকা—১৪ই জ্যৈষ্ঠ—১৭৮৪ শক।

৯। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

"কিবা ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম কিছুই না জানি।
মুখে বলে রাম রাম অন্তরে রমণী।
লোকে বলে সাধু সাধু সাধুতা ত ভারি।
পাইলে পরের ধন ছলে লয় হরি।"

এদের কথাবার্তায় একটা ঘটনা প্রকাশ পায়। শ্যামচাঁদের মেয়ে দশ বছর বয়সে বিধবা হয়। মেয়ে যুবতী হয়ে উঠলে শ্যামচাঁদ তার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু "দেশের কতকগুলো ষণ্ডা" একত্র হয়ে তাতে বাধা দেয়। সম্প্রতি তার গর্ভপাত করাতে গিয়ে হাঙ্গাম হয়। পাড়ায় চৌকিদার বরকন্দাজের ভিড় হয়ে যায়। ক্রমে জানা যায়, ও পাড়ার 'পরম ভক্ত' নিতাই দাস বাবাজীর দ্বারাই কর্ম্মটি সংঘটিত হয়েছে। জানতে পেরে বাবাজীকে জমাদার উত্তম-মধ্যম দেয়। তখন পাড়ার শাক্ত ভক্তেরা বৈষ্ণবের অপমান বিবেচনায় বাধা দেয়, শেষে বাধ্য হয়ে জমাদারকে কিছু দিয়ে টিয়ে মুখবন্ধ করে দিয়েচে। "শুনতে পেলেম, ও বেটাও নাকি তা পেয়েই কর্ম্মটা মিথ্যা বলে হুজুরে রিপোর্ট করেচে।" ওদিকে শ্যামচাঁদও পঞ্চায়েতকে কিছু ধরে দিয়ে সমাজভুক্ত হয়েছে। আর বাবাজী ঠাকুরও আখড়ায় থেকে পূর্ব্বের মতো প্রসাদ বিলোচ্ছেন। বৈরাগি কিনা, জানত—

"মচির পত্র শুচি হয় যদি কপি ধরে।
বেশ্যারাও পূজ্যা হয় শেষ অবতারে॥"

মহিলাদের সামনেই আরো একটি ব্যাপার ঘটে যায়। চৌকিদার একজন মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। চেহারা দেখে তাকে ভদ্রবংশের বলে মনে হয়। অথচ সে নাকি একজন মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। মহিম চৌকিদারদের বলে,—"একে ছেড়ে দাও এ যে ভদ্রলোকের কন্যা দেখ্‌চি, জানতে পেলে ওর বাপ মার দফা একবারে নিকেশ করবে।" বিশাখাও মহেন্দ্রের পায়ে ধরে। মহেন্দ্র তাকে প্রথমে "কুলখাকী" ইত্যাদি বলে ধমক দেয়। শেষে চৌকিদারকে সে বলে, অলঙ্কার নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিক। চৌকিদার তাকে ছেড়ে দেয়। বিশাখা দুঃখ করে বলে, অল্প বয়সে বিধবা হয়েই সে এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। "এ সকল পোড়া দেশের লোক ও বিধাতার বিড়ম্বনা।" সে আস্তে আস্তে চলে যায়। বিশাখা চলে গেলে উপেন বলে,—"বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের যেরূপ বিধি দর্শায়েছেন তদ্রূপ হলে কি ওর এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হোত, না ওই লোক লজ্জা পরিত্যাগ করে

এরূপ বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হোত।" মহেন্দ্র বলে,—"আর সে কথা কি বল্‌বো, স্থপারিষ্টিসাস ফেনাটিকদের কি চক্ষু আছে যে এ সকল বিষয় দেখ্‌বে না শাস্ত্রই ভাল করে পড়বে।" আক্ষেপ করে উপেন বলে,—"তাইত ভাই কতক ত ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা হয়ে যাচ্চে, প্রকৃষ্ট বিধবা বিবাহ।" কথা শুনে মহেন্দ্র মন্তব্য করে,—"কি বিধবা বিবাহ' এ কথায় সায় দিবে কেন? তাহলে যে অনেকের রাসলীলা সম্বরণ হয়।" কথা বল্‌তে বল্‌তে তারা তিন বন্ধু চলে যায়।

উপেন, মহেন্দ্র আর মহিম ভুবনের বৈঠকখানায় এসে আবার একদিন মেলে। সেদিন আবার তাদের সঙ্গে চূড়ামণি ছিলো। চূড়ামণি খুব রসিক। এদের আলোচনায় বসান দিতে তার জুড়ি নেই।

উপেনের মুখে ভুবন বিশাখার কথা শুনে মন্তব্য করে,—"এ ত এতদ্দেশীয় বিধবাগণের নিত্যক্রিয়া, প্রায় অহরহঃই এরূপ শুনা গিয়া থাকে।" বিধবাদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা চল্‌ছে, এমন সময় "অর্জুনের নেজের মত চৈতন্যের নিশান উড়ায়ে" ধর্মানন্দ বিদ্যাভূষণ আসেন। তিনি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে বই লিখেছেন। বিধবাবিবাহের কথা শুনে তিনি বল্‌লেন,—"যাহা কোনকালে শুনি নাই কলিতে তাহাও শুনিলাম, এ সকলই কালের মহিমা বলিতে হইবে।" বিদ্যাভূষণ কলিযুগের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক বিখ্যাত শ্লোকগুলো আওড়িয়ে যান। বিদ্যাভূষণ কোনোকালে শোনেন নি, কলিতে শুনলেন। উপেন্দ্র তাঁকে ঠাট্টা করে বলে—"আপনি কি চার যুগেরই অমর।" বিদ্যাভূষণ এতে রাগ করলে ভুবন চাণক্য-শ্লোক থেকে আর মহেন্দ্র গীতা থেকে শ্লোক তুলে বলে যাঁরা পণ্ডিত, তারা রাগ করেন না। চূড়ামণির ফোড়ন কাটে,—

"গদগদ পণ্ডিত বোড়া
পরের বাড়ী খাইতে পেটি ভরা।
চলিতে চলেন যেন টাঙ্গন ঘোড়া,
কড়ী টর্কা না পাইলে নিষ্টুর মরা॥"

বিদ্যাভূষণ বলেন বিদ্যাসাগর বলেছেন কলিকালের জন্যই পরাশর সংহিতা—এটা ঠিক নয়। পরাশরের প্রথম অধ্যায়ের কুড়ি নম্বর শ্লোক তুলে তার যুক্তি ভারী করবার চেষ্টা করেন। মহিম মন্তব্য করে,—পরাশর যখন দুরকম কথা বলেছেন, তখন একটা সাধারণ এবং অন্যটি বিশেষ বিধি। মনুতেও এমন আছে (যা পত্যায়া পরিত্যক্তা ইত্যাদি)। বিদ্যাভূষণ পরাশরের প্রথম অধ্যায়ের সাতাশ

নম্বর শ্লোক তুলে বলেন, শ্লোকটিতে যখন দানের ব্যাপারে চা'র যুগের লোককে চা'র রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তখন পরাশরও চার যুগের। পরাশরকে চার যুগের বলে বিদ্যাভূষণ নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েই গেলেন। উপেন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে তার মানে বিধবা ... চার যুগেই স্বীকার করতে হবে।

বিদ্যাভূষণ তেবেও হারতে চান না। বলেন—"তোমাদের সঙ্গে কি বিচার করবো, তোমাদের বিদ্যাসাগর হলে হত।" চূড়ামণি মন্তব্য করে—"বাপ রে বাপ! ইনি দেখছি সাগর হতে সাগর হতে চান।" বিদ্যাসাগরের কথা তুলে বিদ্যাভূষণ বলেন যে অর্জুনকে ঐরাবত তার বিধবা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলো এটা সত্যি কথা। কিন্তু "ন দেবচরিতং চরেৎ।" যা দেবতার শোভা পায় মানুষের শোভা পায় না। শাস্ত্রের শ্লোক তুলে মহম বলে, অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষই বলে গেছেন। মহাভারতের বিরাট পর্বেও উত্তর গোগৃহে যাবে বলেছেন,—মানুষের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ যেমন দেবতার মধ্যে ইন্দ্র। চূড়ামণি মন্তব্য করে,—

"যেমনি, সান্নপাতে বিষের বড়ি।
শঙ্গ করতে মিসমরি।
তেমনি তর্কে নারায়ণ রাব।
চা হল জবকরি।"

বিদ্যাভূষণ প্রতি কথাতেই হারছেন তব বলেন,—"তোমরা কি কুসিদ্ধান্তই করছ। প্রমাণগুলো দেখছি তোমাদের নিকট প্রমাণ বোধ হচ্চে না।" চূড়ামণি মন্তব্য করে,—

'নাম ত তাহার বিদ্যাভূষণ।
অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন॥"

উপেন বলে,—'আপনি ত ভারি ঠেঁটা। লোকে বলে—পারি না পারি কথায় হারবো না।" বিদ্যাভূষণ মনে মনে ভাবেন,—"আজ দেখছি দফা শেষ হওয়ার গতিক হয়ে উঠল। আমার বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধ মতটা যদি এদের নিকট প্রকাশ না করে হাবা গোছের পুরান মানষের অথবা বিদ্যাশূন্য বর্ব্বরদের নিকট প্রকাশ করতেম। তাহলে মানটা থাকতো, মতটা থাকতো এবং লোকও বলত আমি বড় পণ্ডিত। যা হউক, পুস্তকটা করে ফেলেছি এক্ষণ না পারি গিলতে না পারি ওগলাতে। ওদের নিকট ঠেঁটামি করেই কোন

মতে মানটা রেখে যাই।" সাযংসন্ধ্যার নাম করে বিদ্যাভূষণ পালিয়ে হাঁপ ছাড়লেন।

মহিম বলে,—"দেখ্‌লে তো ভাই, মৌখিক বিচার করে কেমন ঠেঁটামি করলে?" মহেন্দ্র বলে,—"ওযে একটা বুক ফুল্‌ ব্লকেড, বিদ্যা আছে ত বুদ্ধি নাই, ক একটা বচন টচন শিখে একেবারে বাঙ্গি খেতেই পড়েছে।" উপেন বলে,—"ওর কথা ছেড়ে দাও, দেখ কএক মাস হল 'ঢাকা প্রকাশ' নামে একখানি পত্রিকায় প্রায় দুশত জন বিধবা বিবাহ দিতে সপ্রতিজ্ঞ হযে স্বাক্ষর করেছিল, তারাই বা কি করলে?" মহেন্দ্র বলে,—"ভাই, ওদের কথা বলো না ওরা যে মুখে মুখেই দেশের হিত নিয়ে কানছে।" কোন একটা সভা হলে বলে থাকে,—"হে বন্ধোরা! তোমরা একবার তোমাদের হতভাগা দেশের পানে চাও—ওদাই বা কি চাচ্চো?" মহিম হেসে বলে,—"বিড়ালের গন্ধে মূষিকমাত্রই গর্ত্তে পালায়।" ভুবন দুঃখ করে বলে,—"ভাই, আর একটি বিষম দেখ্‌তে পাই, বড়ো গোছের লোকেরা একেই ত তিল দেখে তাল বলে তাতে আবার ইযাঙ্গ বেঙ্গালদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দেখে যে কত ঠাট্টা করবে তার অন্ত নাই।" "কত যে ভাক্তদলের বাবু ভাযারা হরিব বাড়ির ন্যায ওদের সেখানে গড়াগড়ি যাচ্চো। কেহ বা মনস্কামনা সিদ্ধ করে আসে, কেহ বা ভীমের গদাঘাতের ন্যায ঘোরতর পদাঘাত খেযে হরিবোল্‌ বল্‌তে বলতে ঘরে ফিরে যায।"

আক্ষেপ করতে করতে ভুবন বলে,—"হায ভারতভূমি! তোমার সন্তানেরা পরম পবিত্রজ্ঞান করিযা দিনযামিনী যাপন করিতেছে। তাহারা বিধবাবিবাহকে ঘৃণা না করিবেই বা কেন, যাহাদের নিকট চৌর্য্য, লম্পটতা, মাদকতা ইত্যাদি দোষই দোষ বলিযা পরিগণিত না হয তাহাদের নিকট কি শাস্ত্র যুক্তিসম্মত বিষয বলিযা বিবেচিত হইবে? হা বঙ্গভূমি তুমি ধর্ম্মকে আশ্রয করিযা শীঘ্রই তোমার অশুভ সমূহ পরিহার কর।"

এই কলিকাল (কলিকাতা—১৮৭৫ খৃঃ)—রাধামাধব হালদার॥ মলাটে একটি সুপরিচিত সংস্কৃত উদ্ধৃতি আছে,—"কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাম্‌।" বিজ্ঞাপনেও লেখক বলেছেন যে,—"ব্যঙ্গকাব্য এ পর্য্যন্ত কেহ প্রণযন করেন নাই, আমি প্রগলভতা পরবশ হইযা এই অসম-সাহসিক কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করিলাম।" কিন্তু প্রহসনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার বিষযবস্তুগত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর্মধ্বজের ভণ্ডামির সম্পর্কে

মন্তব্য একজন মাতাল বৈষ্ণবের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণবটি দর্শককে উদ্দেশ্য করে বলেছে,—"সত্তি কথা বল্‌তে কি, আজকাল একাজ ছাড়া প্রায় কেউ নাই, তবে কি জানেন, কেও বা লুকিয়ে—গোপনে, কেও বা সরপট প্রকাশ্যে, অনেকে বাইরে ভারি হিন্দু, বড় ধার্ম্মিক, দিনের বেলায় ঋষির মত ব্যবহার, আর রাত্রে—হা হা আর এক ধারা।"

কাহিনী।—কালাচাঁদবাবুর বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গোস্বামী ঠাকুর কলকাতার রাজপথ ধরে চল্‌ছিলেন। ঘন ঘন ভগবানের নানাবকম নাম তিনি উচ্চারণ করেন। বলেন,—"গোপাল, গোপাল জয় শ্যামসুন্দর মদন মোহন প্রভু! এই মায়াময় সংসার থেকে শীঘ্র পরিত্রাণ কর, ঘোর কলিকাল উপস্থিত, ধরা পাপে পরিপূর্ণা। হায়, হায়! সহস্রের মধ্যে একজনকেও ধার্ম্মিক দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, সকলেই পাপে রত,—অভক্ষ্য ভক্ষণ,—অপেয় পান, অগম্য গমন হায় হায়! মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা চাতুরী, পরদ্রব্যাপহরণ এই সমুদয় পাপাচার ছাড়া কেহই নাই। হরি হরিবোল শ্যামসুন্দর! তোমারি ইচ্ছা! যাহোক আর এ পাপস্থানে বাস করাব আবশ্যক নাই, সত্বরেই পুণ্যধাম শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করে রাধাশ্যামের সেবায় শরীর নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হয়েছে।"

পথে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে গোস্বামীর দেখা। বৈষ্ণবটি মত্ত অবস্থায় ফিরছিলো। গোস্বামী তাকে বলে,—"কি সর্ব্বনাশ! তুচ্ছ সুরা কি তোমাদের ন্যায় বিষ্ণুভক্তিপরায়ণকেও পরাজিত করেছে?" বৈষ্ণব বলে,—"কুকার্য্য অপেক্ষা মদ খেয়ে ঘরে পড়ে থাকা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।" গোস্বামী ঠাকুর চলে গেল। বৈষ্ণব মন্তব্য করে,—"বাবা! বড় বড় কুড়যালি যে দেখ্‌তে পাও, সেগুলি সব বড় বড় বদমায়েসী থলি, গোস্বামী সর্ব্বদা মালা ঠক ঠকান্, অর্থাৎ বোকা ঠকান্।" সেবাদাসীর সন্ধানে বৈষ্ণব ধীরে ধীরে পা চালায়।

বারাণসীবাবুর বৈঠকখানায় বারাণসীবাবু ও বৈষ্ণববাবু মদ্যপান করে। বারাণসী বলে,—"These are days of montony and sameness, Calcutta has grown uncommonly dull, nothing new.—Same faces, same entertainments, যদি মদ না থাকত তাহলে বোধকরি দিন কাটান ভার হতো।" মদের গন্ধ পেয়ে গোস্বামী ঠাকুর আসেন। ঘরে কিসের দুর্গন্ধ—জিজ্ঞেস করেন। মনে মনে তিনি বলেন,—"গন্ধে প্রাণটা সক্ সক্ করে উঠেছে।" গোঁসাইয়ের এমন পরিচয় বারাণসীরা জান্‌তো না।

তাই মদের এমন আড্ডায় বেরসিক ভেবে গোস্বামী ঠাকুরের প্রতি বিরক্ত হয়। তবে তাদের সন্দেহ হয়—মদের লোভে হয় তো ইনি এসেছেন। "আজকাল ধর্ম্মধ্বজীরাই বেশী কুকর্ম্মাসক্ত।" গোস্বামী ঠাকুরকে তারা বলে, তারা আরক পান করছে—শরীরের উপকারের জন্য। গোস্বামী তখন বল্লেন,—"দেখ শাস্ত্রে শরীর রক্ষার্থে সুরা পর্য্যন্ত পানে বিধি দিয়াছেন। তুমি ঔষধ খাবে তা আমার সাক্ষাতে খেতে বাধা কি?" গোস্বামীর কথার ধরনে এরা বুঝতে পারে যে তাঁর সুরার অভ্যাস আছে। বৈষ্ণববাবু বলে,—"তুমি বল্‌ছিলে তোমার শরীরটা কেমন কেমন—এই নাও এক গ্লাস।" গোস্বামী মৌখিক আপত্তি জানায়, অথচ মদ দেখে লোভও হচ্ছে। "আলোচাল দেখ্‌লে যেমন ভেড়ার মুক চলকায়, আমারও মদ দেখে তেমনি মুখে নাল নিঃসরণ হচ্ছে। যা হোক এরা আমাকে বড় ধার্ম্মিক জ্ঞান করে, কিন্তু যদি একাজ করতেই হয়, তবে বাবুদের সঙ্গে মেলাই যুক্তিযুক্ত, বিনা ব্যয়ে উত্তমরূপ সুরাপান হতে পারে।" গোস্বামী তব মৌখিক আপত্তি করেন—কেননা কালাচাঁদের বাড়ী দুই টাকা বিদায় পাওয়ার সম্ভাবনা। বারাণসী চারটাকা হাতে দিয়ে গোস্বামীর লোভ মেটায়। "মদ্‌-টদ্ না তো?"—বলে মদ খান। "মদ খাইয়েছি"—বলে এরা উল্লসিত হয়ে উঠে। গোস্বামী আরকে ওঠার ভান করেন, কিন্তু মনে মনে বলেন,—"এই উদরে যে কত মদ আছে তার পরিমাণ করা যায় না।" গোস্বামী অবশেষে প্রকাশ করেন অনেক দিন ধরেই তাঁর মদের অভ্যাস আছে। "বাপ হে! যখন চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছি, এখন আর কোন কথা গোপন করবার আবশ্যক কি।" বৈষ্ণববাবু বলে ওঠে,—'Oh! What a great hypocrite! Not only he has shared our wine, but he has cheated us out of our good money Rupees four." এখানে মদ্যপান শেষ হলে গোস্বামীকে নিয়ে ওরা সাহেবের হোটেলে যায়। গোস্বামীর এতে আপত্তি নেই। "আর বাপু—সুরাপান যখন করেছি—তখন আর আপত্তি!" বৈষ্ণববাবু বলে,—"I say, he is in the habit of taking English food also he has now left the garb of hypocrisy and you see before you, a true picture of our goswamy class."

মদ্যপ বৈষ্ণববাবুর স্ত্রী মধুমতী ভাবে,— স্বামী মনে করেন—তিনি যে বেশ্যালয়ে সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে আসেন, সেটি দোষের কাজ নয়, সেটী ব্যভিচার

নয়, এর কারণ তিনি পুরুষ। আর আমরা কোন কিছু কল্লেই অমনি জাত গেল, কুলকলঙ্কিনী বলে লোকের কাছে পরিচিত হলেম। এর কারণ—আমরা মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষেরা কি আর মানুষ নয়, তাদের শরীরে কি মনুষ্য বৃত্তি কিছুই নাই।" মধুমতীর মনে প্রতিক্রিয়া জাগে। মদনবাবুর সঙ্গে তার ঝির মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গভীররাতে ইসারা ইঙ্গিত দিয়ে মণিবাবুকে সে ঘরে আনায়। ঝি ঘটক 'লব' 'বিদ'। চাইলে মধুমতী বলে,—"এ বে-র ঘটকালি একদিনে যে ফুরোবার নয়।" স্বামীর লাম্পট্যের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর ব্যভিচারও চল্‌তে থাকে।

ওদিকে হল্ অব্ অল্ নেসনস এর একটি ঘর reserve রাখা ছিলো। বৈষ্ণববাবু, বারাণসীবাবু ও গোস্বামী ঠাকুর আসেন। পিগ এণ্ড পর্কস সস কাফ টঙ্গ এণ্ড ইত্যাদি অর্ডার দেন। গোস্বামীর পছন্দ মতো Old tom ইত্যাদি মদ আনা হয়। ইতিমধ্যে মৌলভী আব্দুল করিম খাঁ এলে গোস্বামীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। শুমেকম্পি-করপোরেশনের চেয়ারম্যান এবং বাক্যবাগীশ দুদশাগ্রস্ত সাহেব ড্যানিয়েলও আসে। গোস্বামীর পরিচয় পেয়ে ড্যানিয়েল্ বলে,—"তোমাদের টেমাদের প্রিষ্ট ক্লাশের লোকেরা বড় হিপোক্রিট্।" বৈষ্ণববাবু মন্তব্য করে,—"Not a whitless than your priest" হাস্যরসের মধ্যে রেখে সবাই আহারে মন দেয়। মৌলভী শূয়োরের মাংস খায়। গোস্বামী মন্তব্য করেন,—"শূকর—ইহা থেকে—সুস্বাদু অর্থাৎ অতি সুস্বাদু। দেখুন যখন নারায়ণ স্বয়ং বরাহমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তখন তাতে অপবিত্রতার সম্ভাবনা কেমন করে থাকতে পারে।" মৌলভী বলেন,—"তোলা বুরা খানা সব জাতোমে হ্যায়, ফকৎ রূপেয়াকা খেল হ্যায়, খোদানে জিনকো দৌলত দিয়া হ্যায়, উও আপনা আচ্ছা আচ্ছা খানা চীজ খাতা, ভালা পহিনতা, আউর সক মিটালেতা। লেকেন যিসকা রুপেয়া হ্যায় নাই, ও সব কুচ যো মিল্‌তা ঐ খাতা।" বাছুরের মাংস খেয়ে গোস্বামী বলেন,—"রাধেকৃষ্ণ, শ্যামসুন্দর মদনমোহন! সকলি তোমার ইচ্ছা। বাপু! আহারে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, যার যা ইচ্ছা সে তাই খেতে পারে, আমার বিবেচনায় আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই।" মৌলভী বলে—"আপরুচি খানা, পররুচি পহেন না। দেখিয়ে হামরা কোরাণমে শূয়ারকো হারাম লিখ্‌তা হ্যায়, উস্‌কো ছোনা নেহি, খানা নেহি, নামভি লেনে মানা হ্যায় লেকিন হাম লোকমে কৈ কৈ খাতা হ্যায়।" গোস্বামী ঠাকুর বাছুরের জিভ খেতে খেতে বলেন,—"দেখ

যদি গরুর অন্তরস্থ রস ব্যবহার হতে পারে, তবে আর শরীরটা বা কি দোষ কল্লে? আর দেখ গব্য আমাদের দেশী কৃষ্ণের ভক্ষ্য, আব গরু বিলাতী কৃষ্ণের ভক্ষ্য, অতএব কৃষ্ণের প্রসাদ সেবায কিছুমাত্র পাপ নাই। জাতের কথায গোস্বামী বলেন,—"বাপু, জাত এটী সামাজিক কথা, আমার বিবেচনায সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ জন্যই এই সকল জাতিভেদ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয, আর মনুতেও স্পষ্ট লেখা আছে "—ইত্যাদি। তাছাড়া শাস্ত্রের নিষেধ। "উটী কেবল শাসন বাবা, আব আমাদের কিঞ্চিৎ প্রাপ্য।" সাহেবকে দিযে একটা ইংরেজ মহিলা আনানো হয। গোস্বামী ঠাকুর বলেন,—"বাপু! বিলাতী সকলি ভাল, বিশেষ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" ড্যানিযেল এবং মেম—দুজনেই এতো মদ টানতে আরম্ভ করে, যে, বাবুরাও আশঙ্কিত হযে ওঠে। তবে পুলকিত হন এই ভেবে যে, মেমকে বাগানে নিযে যেতে পারবে। খাওয়া শেষ হলে, মৌলবী, সাহেব, গোস্বামী ঠাকুর ইত্যাদি সবাই মিলে নস্য, গড়গড়া, চুরোট ইত্যাদি নিযে টান দেন। সর্বজাতির ভেদাভেদ দূর হযে য —ই দুষ্কর্মের নরকে।

চক্ষুঃস্থির প্রহসন (কলিকাতা—১৮৮২ খৃঃ)—কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী॥ মলাটে এক ট) আছে,—

'গোলাম অধম যত আর্য্যজাতিগণ,
না পারি সহিতে আর পর পদাঘাৎ,
ভণ্ডামী দেখি । র ৎ সহিব যন্ত্রণা,
দেখে শুনে তাই আজি হলো চক্ষুঃস্থির।।"

ধর্মধ্বজের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হলেও স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা তথা স্ত্রৈণতা সম্পর্কে যৌগিক সংস্কৃতিগত দৃষ্টিকোণও বিমিশ্রভাবে অবস্থান করেছে। উন্মত্ত যতীনের একটি উক্তিতে,—

'কুলেতে কলঙ্ক সদা অপমান,
যদি বশ কেহ হয রমণীর।
ভণ্ড চাটুকার কথায ভুল না,
দেখে শুনে আজ হলো চক্ষুঃস্থির।"

কাহিনী।—হরগোবিন্দ পাড়াগাঁয়ের এক জমিদার। ফেঁটাকাটা ভণ্ড কৃষ্ণদাস বৈরাগী তার মোসাহেবীপনা করে অন্নসংস্থান করে। শুধু তাই নয়,

হরগোবিন্দের স্ত্রী 'বৈষ্ণবী'র সঙ্গে কৃষ্ণদাস প্রণয়াসক্ত। বৈষ্ণবীর সঙ্গে পরামর্শ করে কৃষ্ণদাস একদিন হরগোবিন্দকে বিষ খাইয়ে তার সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু বিষ মেশাবার পর হঠাৎ যখন ধরা পড়বার সম্ভাবনা, তখন কৃষ্ণদাস হরগোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র যতীনের নামে দোষ দিয়ে হরগোবিন্দকে সাবধান করে দেয়। বলে, যতীনকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, নইলে আবার কোনদিন হয়তো হরগোবিন্দের প্রাণনাশ করবে। বলাবাহুল্য, যতীনকে হরগোবিন্দ বিতাড়িত করে। এতে কৃষ্ণদাসের দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হলো। হরগোবিন্দের একমাত্র উত্তরাধিকারী যতীনকে বিতাড়িত করলে স্ত্রী ও সম্পত্তি দুই-ই ভোগ করতে সে পারবে। কারণ হরগোবিন্দকে সুযোগ মতো একদিন শেষ করতে কষ্ট পেতে হবে না।

হরগোবিন্দ এদিকে কৃষ্ণদাসের আরও ভক্ত হয়ে গেলো। বলে,—"ভাগ্যে তুমি বলে দিলে, নতুবা তো অপঘাৎ মৃত্যু হতো। যে যার ধার আর এ জন্ম সুধতে পার্কো না।" বিনয়ে গলে গিয়ে ভক্ত চূড়ামণি কৃষ্ণদাস বৈরাগী উত্তর দেয়,—'আজ্ঞে যার খাই তার জীবন রক্ষা কর্কো না? না করলে যে নিমক হারাম হতে হয়।"

যতীনের বন্ধু মহেন্দ্র মাতাল, কিন্তু স্পষ্ট বক্তা। পাছে সত্য প্রকাশ হয়, এই ভয়ে কৃষ্ণদাস হরগোবিন্দকে বারণ করে দেয়—ওকে যেন বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া না হয়। মহেন্দ্রও এদিকে আসছিলো, সেটা শুনে ফেলে সে কৃষ্ণদাসকে গালাগালি করে বলে,—'বাবুও যেমন হতভম্বা তুইও তেম্‌নি খল মন্ত্রী যুটেছিস্।" মহেন্দ্র যতীনের প্রশংসা করে এবং হরগোবিন্দের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দেয়। যাবার সময় সে হরগোবিন্দকে সাবধান করে দেয়,—"কিন্তু এ বেশ জেনো ভণ্ডকে বিশ্বাস করে নিজের সর্ব্বনাশের পথ নিজেই পরিষ্কার কচ্চো।"

সবাই চলে গেলে হরগোবিন্দ এ নিয়ে চিন্তা করে। হঠাৎ মনে তার খট্‌কা লাগে। স্ত্রীর সম্বন্ধে তার সন্দেহ ঘনীভূত হয়।—"যতীনের জন্য সকলেই দুঃখ করে, কেবল বাবাজীর উপর বেশী টান, তারই বা কারণ কি?" ভৃত্যও বলে যে, যতীনের কোনো দোষ নেই, বাবাজীই দোষী। হরগোবিন্দের মনে সংশয় তীব্র হয়ে ওঠে।

যতীন বিতাড়িত হওয়ার পর দেখা যায় সে উন্মাদ হয়ে গেছে। তার উন্মত্ততা ভানমাত্র। সে হরগোবিন্দকে এসে ছড়া কেটে সত্যিকথা প্রকাশ করে,

দেয়। বলে যে,—রাতের বেলা তাকে হত্যা করবার চেষ্টা চলছে। আরও বলে যে,—

'শোবার ঘরে লুকিয়ে থেকো।
শঠের ছলা, প্রেমের কলা,
গুপ্ত শলার মজা দেখো॥"

নেহাৎ কৌতূহলী হয়ে হরগোবিন্দ সতর্ক থাকে। রাতে বৈষ্ণবী খাবারে বিষ মেশাতে গিয়ে হরগোবিন্দের সন্দেহে পড়ে। হরগোবিন্দ আহার গ্রহণ না করে বৈষ্ণবীর কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। বৈষ্ণবী এদিকে খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাগানে কৃষ্ণদাস বৈরাগীর সঙ্গে মিলিত হয়। কৃষ্ণদাস বলে,— "বৈষ্ণবী গউর গউর বল, আজ রাধাশ্যাম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। কিন্তু বুড়োটাকে সেটা খাওয়াতে পারলে বাড়ীতেই নিকুঞ্জবন দেখাতাম।" আহ্লাদে গদগদ হয়ে সে বৈষ্ণবীকে বলে,—'আহা! বৈষ্ণবি! তোমাকে প্রেমের ঝাল করে কাঁধে করে নে ফিরব। বৈষ্ণবি আমি শ্যাম তুমি রাধা।"

"এই হাতে কোন্ কথা বলাই দাদা!"—হরগোবিন্দের কণ্ঠস্বর। আচম্বিতে বাবাজীর কাঁধে একটা মস্ত লাঠির আঘাত পড়ে। বাবাজী যন্ত্রণায় কাতরায়। এদিকে নবীন ও মহেন্দ্র এসে মনের সাধ মিটিয়ে বাবাজীকে উত্তম মধ্যম দেয়। বৈষ্ণবী পালাতে গেলে হরগোবিন্দ তাকে ধরেও প্রহার করে।

বাপ্‌রে কলি (১৮৮৬ খৃঃ)—কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়॥ বন্ধু হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রন্থ উৎসর্গ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন,—

" কত হীন হইয়াছে সমাজ মণ্ডলী,
সে সব ঘটনাপূর্ণ এই সে অঞ্জলি।
সমাজের দুরদশা হের একবার,
তুলিতে সমাজ কাঁটা করহ যতন
কুক্রিয়া রত সদা সমাজে সকলি,
কি আর বলব ভাই! এযে 'বাপ্‌রে কলি'!"

কাহিনী।—সত্যচরণ একজন গৃহস্থ ভদ্রলোক। তাঁর ভাই অম্বিকাচরণ দাদার কাছেই থাকে। দুজনেই বিবাহিত, তবে অম্বিকাচরণ শিক্ষা শেষ করেও চাকরীর চেষ্টা করে না। সে বলে,—শ্বশুর বলেছেন, সে হাকিম হবে।

সত্যচরণের স্ত্রী জ্ঞানদাকে অশিক্ষিতা বলে নিন্দে করে। তিনি নাকি কথা বল্‌বার কায়দা কানুন জানেন না। অশিক্ষায় মানুষ শুধু অসামাজিকই হয় না, তাতে স্বভাবও মানুষের খারাপ হয়। জ্ঞানদা দৃষ্টান্তসহ সাধ্য মতো প্রতিবাদ করে বলেন, লেখাপড়া শিখেও স্বভাব খারাপ, এমন নমুনার অভাব নেই। নাগের হাটে সত্যচরণের কিছু প্রজা আছে। তাদের কাছে চল্লিশ টাকা মতো খাজনা পাওনা আছে। জ্ঞানদা সেটা আদায় করবার কথা বল্‌লে অম্বিকা এই অসম্মানজনক কাজ করতে আপত্তি জানায়। সত্যচরণ ও জ্ঞানদা ভাবেন, সত্যিই অম্বিকাকে কলেজে পাঠিয়ে তারা ভুলই করেছেন।

সত্যচরণের বিধবা বোন লক্ষ্মী সত্যচরণের কাছেই থাকে। তার ব্রত পার্বনের দিকে সত্যচরণ ও জ্ঞানদার দৃষ্টি ছিলো। একটি ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে একদা গুরু মহেশ বিদ্যাচঞ্চু আসেন। মেয়েদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ একটু বেশি। বাড়ীতে পুরুষ নেই সংবাদ পেয়েই তিনি আসেন। সত্যচরণ তখন নাগের হাটে। অম্বিকা পোষাক দেখাবার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে অনেক রাতে বাড়ী ফেরে—এ সংবাদও তিনি দাসী চাপার কাছ থেকে জেনেছিলেন। লক্ষ্মী বাধ্য হয়ে শূদ্রা চাপাকে দিয়ে মিষ্টান্ন আনাবার প্রস্তাবে মিষ্টান্ন লোলুপ গুরুদেবের বিধান পায়। তিনি বলেন,—"তাও শাস্ত্রেই আছে, ব্রাহ্মণ অভাবে শূদ্রা বিধবা।" গুরুদেবের লোলুপতা ক্রমেই বাড়ে। শূদ্রা বিধবা চাপা তার নজরে পড়ে। বিধবাবিবাহের কথা তুলে বালবিধবা চাপার কাছ থেকে তিনি নিজনে বিয়ের ইচ্ছা জান্‌তে চান। চাঁপা বলে,—"না ঠাকুর, গতর সুখে থাক, ভাত কাপড়ের দুঃখ পাব না।" কিন্তু গুরুদেব তাঁর আশা ছাড়েন না। রাতে তার শোবার ঘরে চাপা তামাক দিতে গেলে গুরুদেব নাকি চাপার রূপ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তারপর বলেন তিনি নাকি তার পাখী, তাকে সে শিকল দিয়ে রাখুক। তার হাতও নাকি ধরেছেন। বাধ্য হয়ে চাপা গুরুদেবকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে যে, ব্রত পার্বন চুকলে সে তাঁর স্ত্রী হবে।—লক্ষ্মীকে চাপা সব কথা প্রকাশ করে বল্‌লে লক্ষ্মী ভাবে, কলিযুগে মানুষ চেনা দায়।

এদিকে আর একটি কাণ্ড ঘটে। সত্যচরণ অনুপস্থিত। অম্বিকার স্ত্রী শ্বশুরালয়ে। জ্ঞানদা একা শয়নকক্ষে রাতে ছিলেন, এমন সময় জিনিস খোঁজবার ছলে অম্বিকা বৌদির ঘরে আসে। তারপর হঠাৎ জ্ঞানদাকে বলে ওঠে,—"বউ। আমি তোমার ভাবভঙ্গিতে বেশ বুঝেছি যে তুমি আমার প্রতি

আসক্ত।" শুনে দুঃখে গ্লানিতে লজ্জায় জ্ঞানদা মাটিতে মিশে যেতে চাইলেন। শেষে অম্বিকাকে তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়। এতে অম্বিকা ক্রুদ্ধ হয়। ওখান থেকে সে বেরিয়ে যায়। তারপর আলমবেডের মাঠে প্রত্যাগত সত্যচরণকে লোক লাগিয়ে খুন করতে চেষ্টা করে। দৈবাৎ সত্যচরণ রক্ষা পেলেন এবং অপর একজন তার বদলে আহত হলো। সত্যচরণ নিহত হয়েছেন, এই বিশ্বাসে, অম্বিকা বাড়ী ফিরে এসে বৌদিকে বলে, দাদার মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে সে দাহ করে এসেছে। এবার জ্ঞানদা তার কাছে আত্মসমর্পণ করুন, কারণ এখন থেকে তার অন্নই খেতে হবে। জ্ঞানদা বলেন, জগতে দয়ার অভাব নেই; তিনি ভিক্ষা করবেন, কিংবা বিষ বা দড়ি তো আছেই।

সত্যচরণ রক্ষা পেয়ে পুলিসে খবর দিয়েছিলেন। পুলিস সূত্র ধরে এসে অম্বিকাকেই গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। জ্ঞানদা অম্বিকার এতোটা প্রায়শ্চিত্ত আশা করেন নি। সত্যচরণ ফিরে এলে জ্ঞানদা অম্বিকার উদ্ধারের চেষ্টার কথা বল্‌লে সত্যচরণ বলেন,—"পিশাচের জন্ম যে দুঃখ করে সে পাপী।"

গুরুদেব তখনো আছেন। তাঁর মনে তখন চাঁপাকে নিয়ে দিবাস্বপ্নের ঢেউ। "গোবর্দ্ধন শিষ্যের বাগান বাড়ীটা নিয়ে সেইখানেই চাঁপার অবস্থিতি করে দিব—গৃহিণী নামগন্ধও পাবে না।· গরীব লোকের গুরু হওয়া—যদিও পয়সা কম—এই লাভটা আছে । বড় বড় নৈবিদ্যি দেখ্‌লে যেমন হৃদয়ে উল্লাস হয়, চাঁপার মুখখানা দেখ্‌লেও তেমনি আহ্লাদ হয়।"

চাঁপা এসে গুরুদেবকে বলে, আজই সে যেতে চায়। গুরুদেব বলেন, শুভস্য শীঘ্রম্ [illegible] কিন্তু হাটতে পারবে না—কতদূরের পথ। গুরুদেব বলেন,—কাঁধে করে তিনি নিয়ে যাবেন। চাঁপার হাতে একটা শিকল দেখে গুরুদেব অবাক্ হন। চাঁপা বলে, সে তার পাখীকে শিকল দিয়ে বাঁধতে চায়। চাঁপা শিকলটা গুরুদেবের গলায় পরাতে যায়। একটু ইতস্ততঃ করে গুরুদেব তা গলায় পরেন। তারপর পেট কাম্‌ড়াচ্ছে বলে "দাদাঠাকুর গো" —"দিদি ঠাক্‌রুণ গো" বলে চাঁপা চীৎকার করে। সত্যচরণ ছুটে আসেন। চাপা তাঁকে বলে, ঠাকুর তাকে হরণ করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। "এখানে আসা পর্য্যন্ত আমাকে ফোসলাচ্চে। এই রকম লোককে বাড়ী আস্‌তে বল? বৌ ঝির কাছে বস্‌তে বল, এর আচার দেখাবার জন্যে, কতদূর এর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে—দেখাবার জন্যে এর গলায় শেকল দিয়েছি।" সত্যচরণ গুরুকে ভৎর্সনা করে বলেন,—"মন্ত্রদাতা! প্রস্থান করুন—অল্পবিদ্যার গুণ দর্শেচে

—কেবল আদিরসযুক্ত ছোট ছোট সংস্কৃত গ্রন্থই পড়েছেন।" কলিযুগকে সত্যচরণ ধিক্কার দেন।

মুই হঁ্যাদু (কলিকাতা—১৮৯৪ খৃঃ)—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়॥ নিজের হিন্দুয়ানী জাহিরের মধ্যেই ভণ্ডামির গতিবিধি সম্পর্কে সমাজের জ্ঞানলাভ করা উচিত। যারা দেহমনে সৎ তাদের হিন্দুত্ব প্রচারের প্রয়োজন হয় না। প্রহসনের অন্যতম চরিত্র—এক পাণ্ডা বলেছে,—"আমি দেখ্‌ছি কলিকালে সকলেই প্রায় 'মুই হ্যাদুর' দলে, আমি বাবা শাদা লোক, এই বুঝি, লুকিয়ে অগম্যাগমন অপেক্ষা স্পষ্ট বেশ্যালয়ে যাওয়া ভাল।" ধর্মধ্বজের ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই লেখকের প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত।

কাহিনী।—কুকাজ অনেকেই করে, কিন্তু লুকিয়ে কুকাজ করে যারা "মুই হঁ্যাদু" অর্থাৎ "আমি হিন্দু" বলে সমাজে নিজেদের প্রচার করে, সমাজে তাদের প্রতিপত্তি থাক্‌লেও তারা ঘৃণ্য। এই ভণ্ডদের দলে সদার ও সবলুট নামে দুই সন্ন্যাসীও আছে। এরা মদ্যপ ও লম্পট। এদের মত,—

"যবহি য্যাসে আওয়ে মন্‌মে ত্যাইসেই কর ভোগ,
ছোড দেও সব ধরত কি বাত ঝুটা যাগ যোগ।
আপনা নারী পরেয়া নারী, যেস্কি মিলে সঙ্,
নেহি ছোড় দেও ক্যা খুসি হ্যায় কামদেও কি রঙ্।"

যারা প্রকাশ্য দুষ্কর্ম করে, তাদের কথা প্রসঙ্গে বলে,—"এ গোয়াটাদের চেয়ে আমরা বেশ আছি, সব মজা লুকিয়ে মারচি, অথচ হিঁদুয়ানিও বেশ বজায় রেখেছি।"

এম্‌নি মুই হ্যাদুর দলে আছেন লম্বোদর সার্বভৌম ও খগপতি তর্কচঞ্চু। নিমতলার এক পাণ্ডার ভাষায়,—"এই টিকিওয়ালা ব্যাটারা না পারে এমন কাজই নেই, আমি জানি এদের একটা ধেড়ে মুখ বড় ধাম্মিক ছিল, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কড়ে রাঁড়ীর সর্ব্বনাশ কল্লেন।" সম্প্রতি এরা দুজন মুস্কিলে পড়েছেন। দয়েহাটার বিত্তশালী যুবক চৈদবাবু তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে একটা "ঘোঁটমঙ্গল" করেছে। কপালীর বাড়ী দান নিয়েছিলেন বলে এঁদের সে একঘরে করেছে। "হাঁ স্বীকার করি, আমরা ক্রমে ক্রিয়াবিহীন হয়ে বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছি; কিন্তু মূর্খ! তা বলে তোরা আমাদের ওপর আধিপত্য করবি! তম্বুরার লাউ যতই বড় হক না, ডাণ্ডার

নীচেয় ঝুল্‌বেই ঝুল্‌বে।" বাড়ীতে এঁরা দান নিয়েছেন বলে এই নিপীড়ন, অথচ কপালী নইলে তো বাবুদের চলে না। তারা তো তাদের বাড়ী চুপি চুপি ফলারও সারে। "বাবুরা ক-ভেয়ে সহরের বড় মানুষের পোষাকি মোসাহেবের দলভুক্ত, টেবিলের বেড়াল, কিন্তু মুখে খুব লাক পঁচাশি। তোরা বড় বড় হোমরা চোমরা যে ক ঘর কায়েত আছিস্, মাছট্ করে যদি আমাদের মাসে মাসে আঁচলা ভরা রুধির দিস, তাহলে পরের কাছে পেটের দায়ে কি দাঁত কিচুলি কত্তে যাই?" লম্বোদর বলেন,—"বাপু হে। এ গঙ্গাতীর, তোমাদের কাছে মিথ্যে কথা বল্‌বো কেন? পোড়া পেটের দায়ে আমরা গোপনে ছত্রিশ জাত যজিয়ে বেড়াই।" অবশেষে চৈদবাবুর এবং আক্রোশ আপাততঃ স্থগিত রেখে মণিবাঙ্গিদের বাড়ী পা বাড়ান। "প্রায় পাঁচ সাতশ ব্রাহ্মণের উপাদেয় আহার হবে, আর দক্ষিণাও আঁচলা ভরা।"

চেদবাবুকে একদিন এই একঘরে ব্রাহ্মণগুলো বায়দাগ পেলে আবার নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে নেয়। চেদবাবুর বাগানবাড়ীর মেথর জম্মনের স্ত্রী রেবী মেথরানী। সে স্বামীকে বলে,—"কিশিস দেখে বাবুজী আজ, কনে আনে কিয়া করনাজ, দারু পিলাগকর কোন্ ভ্রাজ পানি লুঠারে।" কথা শুনে চেদবাবুর বেয়ারা মিহিরকে ক্রুদ্ধ জম্মদ বলে, "এ (বাবু) তো হামারা কুটুম বন্ গয়া, পকড়িতে পকড়কে উসকো হামারা জাতমে লে লেঙ্গে।" বাবু এলে জম্মদ বাবুকে এই কথা বলে বাবু ঘাবড়ে যান। মেথরকে দশো টাকা দিয়ে সে সন্তুষ্ট করতে যান। মেথর তা পেয়ে প্রস্থান করে চলে যায়। অন্তরাল থেকে লম্বোদর ও খগপতি এসব লক্ষ্য করছিলেন। আত্মপ্রকাশ করে তারা চেদবাবুকে শাসান—বলে দেবেন বলে। "ব্রাহ্মণকে আর অপমান করো না। আমরা সাপের জাত, ঘাঁটিও না, খুঁটিও না।" বাবু বলে,—'এই কান মুচড়ে নাকে খত দিচ্ছি, আর আপনাদের নিয়ে ঘোঁটমঙ্গল করবো না, আমার কন্যার বিবাহের দরুন আপনাদের জন্য সর্বোচ্চ বিদায় মজুত করে রাখব, কাল প্রাতে এসে নিয়ে যাবেন, এখন আপনাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে আজকের এ দুষ্কর্ম যেন প্রকাশ না হয়। ব্রাহ্মণদের হাতে সে দশ টাকা গুঁজে দিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে বলে। মুখে মুখেই বিধান হয়ে যায়। লম্বোদর সার্বভৌম—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" ইত্যাদি ভূরি ভূরি স্মৃতিপুরাণের প্রমাণ দেয়। খগপতি তর্কচঞ্চু বলে,—"নদীনাঞ্চ স্ত্রীনাঞ্চ দোষ পরিবর্জ্জয়েৎ সদাঃ অর্থাৎ নদীতে ও স্ত্রীলোকেতে কোন দোষ নাই। শাঁকের মুখ, উনানের

মুখে. মেয়ে মানুষের মুখ সর্বদাই শুচি।" লৌকিক শাস্ত্রও আওড়ান,—"যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।"

চেদের বন্ধু গোলোক বসু। পাড়াগেঁয়ে নব্যবাবু সে। শহরে এসে চেদের দলে মিশে এখন সে আধুনিক হয়েছে। চেদের ইয়ার শম্ভুসিংহ, ভূতি ঘোষ, নাড়ুগোপাল গোলকের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। গোলোকও নব্যবাবুর মতো নিজের পিতার কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। বন্ধুদের কাছে পিতা ঠাকুরের পরিচয় দেয় এই ভাবে,—"ও স্বর্গী। কর্তার আমলের একজন পুরোনো সরকার, আমাকে ছেলেব্যালা থেকে মানুষ করেছিল বলে আমার ওপর প্রিভিলেজ নেয়।" একদিন গোলোক বসু এবং ইয়ারদের সঙ্গে গল্প করতে করতে চেঁদের মনে "মুই হ্যানু"—ভাব জেগে ওঠে। সে বলে—"দেখ আমরা হিন্দু ক্রিসমাস আমাদের দেশের ফেসটিভ্যাল নয়। কিন্তু রাজভক্তি দেখাবার জন্যে এটি আমাদের এখন পরবের সামিল হয়ে পড়েছে। এতে বিলাতী রকম আমোদ না করে দিশী বিলাতী রকমে কল্লে হয় না? হিন্দুরা সকল কাজেতেই দেবতার পূজা, আর ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, এবার ক্রিসমাসে আমরা জগোৎসব করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাব।" গোলোক প্রস্তাব করে জীবন্ত প্রতিমা পূজা করবার। "বাজারে গিন্নিদের" নিয়ে একাজ কল্লে "চলাচলি" হবে। চেনাশোনা উন্নতমনাদের নিয়ে প্রতিমা সাজানোই ভালো। পুরুষ দেবতার অভাব অবশ্য হয় না।

নাড়ুগোপালের বারপাড়া ভিলায় পুজোর প্রস্তুতি হয়। "সারি সারি ঘটে কারণ বারি, নৈবেদ্যের বদলে স্তূপে স্তূপে কেক বিস্কট সাজান।" দশজন বামুনে হিন্দুস্থানী মতে পোলাও, কাটলেট, মামলেট তৈরী করছে। নিমন্ত্রিত ভট্টাচার্যরা বলে,—"গন্ধে প্রাণ ভরে দিয়েছে, নোলায় জল সক সক কচ্ছে, একবার ভোগটা সরলে হয়, ঝাঁ করে পাত পেতে বসে যাই।" কাছে একটা উড়েনী মজা দেখছিলো, উড়ে তাকে দেখে বলে ওঠে,—

"তু একা কাঁই ফিরস্তি রসৌবতী।
ধাইকিডি মা তাড মারিব জাতি।"

এদিকে লম্বোদর সার্বভৌম আধুনিক স্ত্রীলোকের আচার ব্যবহার গতিবিধি বর্ণনা করে আধুনিক ধরনের চণ্ডীপাঠ করেন। লম্বোদর যখন জীবন্ত নব্যা ভগবতীর কপালে সিঁদুর পরতে যাবেন তখন কার্তিক তাকে বলে ওঠে, উনি বিধবা। লম্বোদর বলেন,—"পুরুষ কুল নির্ম্মুল না হলে উনি বিধবা হতে পারেন না।" বিলেত ফেরৎ কায়স্থ এস্. রায়. ভক্তির আবেগে পুরুৎ ঠাকুরকে প্রণামী দিলেন।

পুরুৎ ঠাকুর পূজো করতে করতেই তাঁকে ছুঁয়ে আশীর্বাদ করেন। পূজোর সময় কায়স্থকে ছুঁয়ে দেওয়ায় কার্তিক মন্তব্য করে,—"আপনারাই লোভে পড়ে হিন্দুয়ানী বিসর্জন দিলেন।" লম্বোদর উত্তর দেন,—"হিন্দুয়ানী কি আর আছে? তুমি উনি মুই—সকলেই মুই হ্যাভব দলে, তা না হলে এ নূতন বিধান বের করে কি এই নব দুর্গার পূজো করতে আসি?" ইতিমধ্যে অসুর হঠাৎ মেজাজের চাপে দুর্গাকে আক্রমণ করে। তখন দুর্গা ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। গতিক দেখে অন্যান্য দেবতা ও ভক্ত—সকলেই ভঙ্গ দেয়।

নব রাহু বা যুগমাহাত্ম্য (কলিকাতা—১৮৯৭ খৃঃ)—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। কলিযুগের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক বিভিন্ন অবকাশ সৃষ্টি করে তদনুযায়ী অনাচার ও ভণ্ডামির চিত্র দেওয়া হয়েছে। প্রদর্শনীতে অন্যতম অংশ বোধে প্রহসনটি এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

কাহিনী।—ভগবানের আদেশে কলি রাজ্যের শাসনভার নিয়েছেন। একা পেরে উঠছেন না। তাই তার শাসনে সহায়তা করছে মদিরা, অনাচার ইত্যাদি। তারা তার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে হালচাল বদলে যায়। সুনীতি ঘরোয়া স্ত্রীলোক। সুরুচি কিন্তু ভাবে, দেশাচার সে মানবে না। ঘরকন্না রান্না বান্না তার ভালো লাগে না। তার ইচ্ছে গাউন পরে সে মেমদের মতো বেড়াবে। স্বামীর ওপরেও তার অশ্রদ্ধা এসে গেছে। শূন্য থেকে পাশ্চাত্য সভ্য বেশে অনাচার নেমে সুরুচিকে সান্ত্বনা দেয়। সে বলে যে, সে পশ্চিম থেকে এসেছে রুচি পরিবর্তন করবার জন্যে। এই বলে সে সুরুচিকে নিয়ে উধাও হয়। জাত খোয়াবার ভয়ে সুনীতি দৌড়িয়ে পালায়।

সপরিবারে শিব বেড়াতে এসেছেন স্বর্গ থেকে। কিন্তু কলির প্রভাবে তাঁর পরিবারেও মতিগতির পরিবর্তন ঘটে যায়। মহাদেবের গায়ে বাঘের চামড়ার ফতুয়া, মাথায় পাঞ্জাবী পাগড়ী। ভগবতী পরেছেন বেনারসী গাউন, ব্রাহ্মিকা ক্যাপ বনেট ইত্যাদি। সঙ্গে তল্পী নিয়ে নন্দী এসেছে। ভগবতীর দুঃখ, সবাই কলের গাড়ীতে চড়ে কলকাতায় গেলো, আর গোঁড়া শিব তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহাদেব নিজের ছেলেদের নিন্দা করে বলেন,—"কার্তিকে বেটা তো ক্ষুদ্র নবাব খোষ পোষাকে বাহাল—ভবিষ্যতে কেবল ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ায়, ঘরে ভাত নেই, তায় তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সরিফান্ মেজাজে

কালাপেড়ে কাপড়ের লম্বা কোঁচা উড়িয়ে ফটিক-চাঁদ সেজে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়। আর ঐ হাতীমাথা গণ্শা দিনরাত সিদ্ধি খেয়েই ভোর, কয়েফে কায়দা কানুন নেই, বুজরুকিতে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে "সিদ্ধিদাতা" ঘোষ নাম জাহির করছেন।" পুত্রনিন্দা শুনে পুত্রদের হয়ে ভগবতী স্বামীকে বিদ্রূপ বলেন, ছেলেরা শিবের মতো খায় না।

কৃষকের সুখশান্তি গিয়েছে। অনাহারে তারা শীর্ণকায়। পরণের কাপড ছিঁড়ে গেছে। তবু তাদের খাজনার মকুব নেই। তারা মন্তব্য করে, ওরা সব শক্তের ভক্ত, নরমের যম। সকলে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার জন্যে পা চালিয়েছে, এমন সময় ফৌজদার এসে কৃষকদের ধরে ফেলে। বলে,—"হাম দেখতে হেঁ তোমলোক বদমাস ডাকু, কোম্পিকো দৌলত লুণ্ঠনে কো ফিকির করতে হে।" তাদের সে মারতে মারতে নিয়ে চলে।

কোথা থেকে Bubonic fever এসে জুটেছে। বম্বে থেকে নাকি এই রোগের আমদানী। এই রোগের হুজুগে সকলে ডাক্তারকে নিয়ে টানাটানি করে। এইসব ভাবতে ভাবতে হালসহরের রাস্তা দিয়ে কয়েকটা গ্রাম্য মেয়ে পথ চলে। এমন সময় এক ইংরেজ ডাক্তার এসে তাদের পথ আটকায়। বলে,—"এ! তোমলোককো বদনপর তাপ উঠ্তে? মুড কুড্তে? দেমে দরদ মালুম হোতে? হ্যালো! তোমরা ছাতিমামে বড়া ভারি প্ল্যাণ্ড উঠা দেখ্তে, Bubonic fever! Bubonic fever! ঠাড়ি রহো! এ Compounder! পাকড়ো পাকড়ো! হাম operate করকে উসকে লহু টেষ্ট করেঙ্গে। সাহেব মেয়েদের ধরতে গেলে এক যুবক এসে বাধা দিয়ে বলে,—"If you stir an inch again, I will knock down your head and examine your deranged brain where in germinates the mania of Bubonic fever." সাহেব তখন বার বার কনষ্টেবলকে হাঁক দেয়। যুবক তাকে বিদ্রূপ করতে করতে চলে যায়।

সর্বত্রই কলির দাপট। ত্রিবেণীর গঙ্গায় এক ফোঁটাকাটা ব্রাহ্মণ স্নান করতে আসে। ঘাটে এসে মেয়েমানুষ দেখে সে বিদ্যাসুন্দরের গান জুড়ে দেয়। তাই দেখে একজন মেয়ে বলে ওঠে,—"আ মরণ! গানের ছিরি দেখ! বুড়ো হয়েছেন, টিকিতে বৃষকাঠ বাঁধা, কাছা ধরে যমরা টানাটানি কচ্ছে, তবুও সখের প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্ছে। যোগে নাইতে এসে বুড়ো মিনসের গঙ্গা স্তব গেল, ঠাকুরদের নাম গেল, বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা গাইছেন! এরা আমাদের দেশের

অধ্যাপক ভট্‌চায্যি।" আর একজন মেয়ে মন্তব্য করে,—"ও বোন্ ঐ বামুন-গুলোই তো সকল কুকর্মের মূল। ধনের লালচে কড়ি—পিশেচেরা কোন কুকাজে পেছপাও হয় না।" আর একজন মন্তব্য করে,—"আর শুনিছিস্? কলকেতার একজন অধ্যাপক ভটচায্যি সাহেবদের পেয়ারের লোক হবে বলে কুকুরের মতন তাদের পাতের এঁটো খানা খায়।"

এইভাবে অনাচারের সহায়তায় কলি চারদিকে অনাচারে ছেয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে মহামারীকে দিয়েও তিনি শাসন চালাতে লাগলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু কলকাতার অবস্থা দেখে শীক্ষেত্রে যেতে চান—সেখানে অন্ততঃ ভাতের অভাব হবে না। বিষ্ণু মন্তব্য করেন,—গো হত্যা, ভ্রূণ হত্যা, অখাদ্য ভোজন, ব্রাহ্মণের যজনযাজনহীনতা, ধর্মদ্বেষী ও দ্বিজদ্বেষী যজমানদের তোষামোদ দেখ্‌তে আর প্রবৃত্তি হচ্চে না।'

বেড়াতে বেড়াতে [illegible] দেবতারা ঘুরে বেড়ান। এইসব অদ্ভুত চেহারার মানুষগুলো দেখে চিৎপুর থানায় খবর দেয়। কোতোয়াল কনষ্টেবলকে দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করতে যান। হঠাৎ পিশাচেরা এসে কোতোয়ালদের তাড়িয়ে দেয়। দেবতারা কলির রাজত্বে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করে শেষে স্বর্গে ফেরবার জন্যে নিজের বাহনে চড়ে বসেন।

বুঝলে কিনা? (১৮৬৩ খৃঃ)—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়॥ রক্ষণশীল সমাজপতির ভণ্ডামি ও অনাচারের সঙ্গে সহায়ক মোসাহেবদের ব্যক্তিস্বরূপ উদঘাটন ও সমাজের মধ্যে তা প্রচারের ইচ্ছা প্রহসনকারের প্রবণতায় প্রকাশ পেয়েছে। ভণ্ডের দুর্দশা প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে পরিণতির প্রতি সমাজের স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা জাগিয়ে নিজ দৃষ্টিকোণকে সমর্থন পুষ্ট করবার চেষ্টা দেখা যায়।

কাহিনী।— অটলকৃষ্ণ বসু গ্রামের দলপতি। সে নিজে মদ্যপ, লম্পট, কুক্রিয়াসক্ত, কিন্তু বাইরে তার ভণ্ডামি পুরো মাত্রায় আছে। মোসাহেব পুরোহিত বিদ্যালঙ্কার যেমন তার লাম্পট্যের সহচর, তেমনি কাউকে একঘরে করা, কিংবা একঘরে করবার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা, সেখানেও বিদ্যালঙ্কার তার মস্তোবড়ো সহায়ক। নিঃসহায়া বিধবা হাবুলের মার দশ হাজার টাকা নিয়ে অটল ফেরৎ দেবার নাম করে না। কেউ ভয়ে হাবুলের মার হয়েও কিছু বল্‌তে পারে না। হাবুলের মাও নালিশ করতে পারে না। "হাকিমের ঘরে কি অমনি নালিশ হয়? তার আবার খরচ পাতি চাই,

দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক চাই, সাক্ষী সনদ্‌ চাই, তা আমার কে আছে মা, যে আমাকে খরচ পাতি দেবে, দেখ্‌বে শুন্‌বে, আমার হয়ে সাক্ষী দেবে? তাতে ওয়ে দস্যি, কার এমন মাথার ওপর মাথা যে আমার হয়ে দুকথা বলে?" প্রতিবেশী দর্পনারায়ণের ভাই ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর মেয়েকে স্কুলে দিয়েছেন বলে, অটল তাকে একঘরে করেছে। মেয়ের বিয়ে দেওয়া তার ভার হয়ে উঠেছে।

দর্পনারায়ণের স্ত্রীর ওপর অটলের আক্রোশ ছিলো। কিন্তু কিছু করতে যাওয়া তার পক্ষে অসাধ্য ছিলো। বিদ্যালঙ্কার এটা জানতো। একদিন বিদ্যালঙ্কার যখন গঙ্গাস্নান করছিলো, দর্পনারায়ণের স্ত্রী সৌদামিনীও সেখানে ছিলো। সে স্নান করে উঠে যাবার সময় তার পেছন পেছন এসে বিদ্যালঙ্কার এক সময়ে তাকে নির্জন পেয়ে অটলের কুপ্রস্তাব তাকে জানায়। এতে সৌদামিনী ক্রুদ্ধ হয়ে গম্ভীর ভাবে চলে যায়। অটল শুনে বলে, টাকার লোভ দেখালে ভালো হতো, যাহোক ওকে আর দরকার নেই, তবে জব্দ করতে হবে। কিছু দিন পরে দর্পনারায়ণের বাপের শ্রাদ্ধ, তার আগে রটাতে হবে যে দর্পের স্ত্রী বাড়ী থেকে বেরিয়ে হাড়কাটা গলির গুঁপো [illegible] বাড়ী ক'দিন ছিলো। তাতে শ্রাদ্ধ পণ্ড হবে। বিদ্যালঙ্কার প্রাপ্তিযোগ নষ্ট হয় [illegible]। অটল বলে, প্রাপ্তিযোগ সে-ই মিটিয়ে দেবে।

অটলকে দর্পনারায়ণ দাদার হয়ে লড়তে গিয়ে অপদস্থ হয়। অটল বলে,—"স্ত্রীলোকের ইস্কুলে যাওয়াও যা, আর মেছো বাজারের বারিকে যাওয়াও তা।" দর্পকেও অটল ভয় দেখালো যে, সে দাদার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছে—তাকেও একঘরে করা উচিত। দর্প মনে মনে খুব চটে যায়। তার ওপর স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে অটলকে মেরে ফেলবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে। ভয় হয় অটলের দলে প্রচুর লোকজন।

অটলের কোচম্যান্‌ পিরু আর অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনে বাবুর্চির কাজ করে। আস্তাবলের মধ্যে নিষিদ্ধ মাংস. খিচুড়ি, মদ ইত্যাদি পানাহার চলে। বাবুর অনাচারে সে অসন্তুষ্ট। বিশেষ করে কথায় কথায় বাবু হুকুম করেন, অথচ পয়সা দেন না। দারোয়ানের কাছে প্রচুর ধার। দারোয়ান আর ধার দিতে চায় না।

অটল নিজের স্বার্থে খৃষ্টান নীলাম্বরকে জাতে ওঠায়। তাকে তার বাবার শ্রাদ্ধে খুব ঘটা করতে বলে, তাদের সন্তুষ্ট রাখ্‌তে বলে। গরীব নীলাম্বর শেষে বাড়ী বাঁধা রেখে পাঁচশো টাকা নেয়। উকিলের কেরানী মদনগোপালের

সহায়তায় লেখাপড়া হয়ে যায়। একবছরের মধ্যে হাজার টাকা দিতে হবে, নইলে বাড়ী পাওয়া যাবে না। আবার এমনভাবে লেখাপড়া হলো যে টাকা ফেরৎ দিলেও বাড়ী ফেরৎ দেওয়া না দেওয়া অটলের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। নীলাম্বর এবং তার মামা অদ্বৈত এতে অসন্তুষ্ট হলেও বাধ্য হয়ে দলপতির মতে মত দেয়।

'সুখী'-মেথরানী হচ্ছে বুদ্ধু-মেথরের স্ত্রী। পূজো প্রায় চারমাস হয়ে গেছে, কাপড় পাওনা আছে—সেটা নেবার জন্যে সে অটলের কাছে আসে। অটল তাকে ধর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে বলে, সন্ধ্যাবেলা সে যেন আস্তাবলের কাছে আসে, সেখানে তাকে কাপড় দেবে। সুখী ভীত হয়, তবে কাপড়ের লোভে ওখানে যেতে রাজী হয়। দর্পনারায়ণ আড়ালে থেকে এসব শোনে। সে সুখীকে ডেকে অটলের উদ্দেশ্যটা খুলে বলে। তারপর তাকে হাত করে সে বলে, আস্তাবলে যেন সন্ধ্যায় সে দেখা করে। দর্প কাছে থাকবে কোনো ভয় নেই। তাকে জব্দ করতে হবে। তবে দর্প যে ভাবে যা কিছু বলতে বা করতে বলে, তাই করতে হবে। সুখী সানন্দে রাজী হয়।

আজ আস্তাবলে মদ মাংসের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সঙ্গে মেয়েমানুষ! অটলের আনন্দ আর ধরে না। ইয়ার ছাড়া ফূর্তি জমে না। তাই বিদ্যালঙ্কারকে সঙ্গে থাকবার জন্যে অটল নিমন্ত্রণ করে। দর্প আগের থেকেই আস্তাবলের খাটিয়ার তলায় আত্মগোপন করে রইলো। যথাসময়ে অটল ও বিদ্যালঙ্কার আসে। সুখীও এসে পড়ে। অটল সুখীকে খাওয়ায়, তোষামোদ করে। নিজেও তার প্রসাদ খায়, বিদ্যালঙ্কারকেও মেথরানীর প্রসাদ খাওয়ায়। মুরগীর মাংসের নামে বিদ্যালঙ্কারের জিভে জল আসে। সে বলে,—"আহা পরিপাটি, পরিপাটি। হ্যা দেখ বাবা ও দ্রব্যটা বড় মুখপ্রিয়, আর ওটা ভক্ষণ করাও যে অশাস্ত্রীয় তা নয়। স্পষ্ট বিধিই রয়েছে—'ভক্ষয়েৎ তাম্রচূড়কং'।" মদের ব্যাপার নিয়ে সে বলে,—"মনু সুস্পষ্টই লিখে গেছেন, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং-ইত্যাদি। এসকল উপাদেয় দ্রব্যেতে যার প্রবৃত্তি নাই, সে বেটা তো ভূত।" শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়ে বিদ্যালঙ্কার পরম আগ্রহে মদ মাংস সেবন করে। সুখীর সম্পর্কে তার যুক্তি—"স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি ।" মদে কম পড়ায় মদ আনতে অটল বাইরে যায়। এমন সময় খাটিয়ার তলা থেকে দর্পনারায়ণ আত্মপ্রকাশ করে মদমাংস এবং মেথরানীর প্রসাদ নিয়ে বিদ্যালঙ্কারকে লজ্জা দেয়। দর্পের স্ত্রী সম্পর্কে কুৎসা রটাবার সঙ্কল্পও সে শুনেছে, এটাও জানিয়ে দেয়। বিদ্যালঙ্কার

উস্‌খুস্‌ করলে বিদ্যালঙ্কারের কাপড় চেপে ধরে এসব কথা বলে লজ্জা দেয়। থাক্‌তে না পেরে বিদ্যালঙ্কার কাপড়চোপড় ছেড়ে রেখে ন্যাংটা হয়ে পালায়। দর্প আলো নিভিয়ে বিদ্যালঙ্কারের কাপড় পরে নকল বিদ্যালঙ্কার সাজে এবং মুখ ঢেকে থাকে। অটল এসে তাকে এ অবস্থায় দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে, নকল বিদ্যালঙ্কার দর্পনারায়ণ বলে,—কয়েকজন বাইরের লোক উঁকি দিয়ে দেখে গেছে। যাতে তাকে চিন্‌তে না পারে, সেইজন্যেই আলো নিভিয়ে সে ঘোমটা দিয়ে আছে। অটলকেও নিরাপত্তার জন্যে সে মুখ ঢাকতে বলে। অটল কম্বল দিয়ে সমস্ত গা ঢেকে থাকে। দর্প তার গলায় দড়ি বাঁধে এবং ভালুকওয়ালা সেজে ঘোরে, তার নির্দেশে অটলও ভালুক নাচ নাচে। হঠাৎ দর্প নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বলে, অটলের সব কথা সে জানে। অটল ভয়ে কেঁচো হয়ে যায়। সবার সামনে অটলের স্বরূপ প্রকাশ করে দর্প বলে,—"ইনিই আমাদের দলপতি, বুঝলে কিনা।"

রক্ষণশীল সমাজধ্বজ ও ধর্মধ্বজের ভণ্ডামি ও অনাচারেকে কেন্দ্র করে রচিত আরও কয়েকটি প্রহসনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। এ ধরনের কয়েকটি প্রহসনও উপস্থাপন করা যেতে পারে।—

ধূর্ত্ত প্রহসন (১৮৭৩ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত। নামকরণ পরিচিত হলেও প্রহসনটি অনুবাদ নয়, মৌলিক। ধর্মপ্রচারকদের ধর্তোমি ও ভণ্ডামির কথাই এর মধ্যে প্রচার করা হয়েছে।

কি মজার কর্ত্তা (১৮৭৫ খৃঃ)—শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী॥ কর্তাভজা সম্প্রদায়-ভুক্ত এক ব্যক্তির কুকাণ্ডকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করে প্রহসনটি লেখা হয়েছে। এই লোকটি কৃষ্ণনাম জপ করতো এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করতো এবং সেই সুযোগে মেয়েদের বিপথে টেনে নিয়ে যেতো। এইভাবে একবার হাতে নাতে ধরা পড়ে উত্তম মধ্যম প্রহার পেলো।

মজার কিশোরী-ভজন (১৮৭৮ খৃঃ)—শশিভূষণ কর॥ পূর্ববঙ্গীয় এক পর্যটক বৈষ্ণব গ্রামে গ্রামে কিশোরী ভজনের মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াতো। কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলো। সে এক-একবার এক-একটি গুপ্ত সভা ডাক্‌তো। যারা গুরুর গুহ্য আদেশ পালন করতে প্রস্তুত এমন সব স্ত্রীপুরুষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সেখানে প্রবেশাধিকার পেতো। এইসব অনুষ্ঠানে সভ্যরা খাওয়া-দাওয়া এবং গান-বাজনা ইত্যাদি যথেচ্ছভাবে করতো, এবং তাদের যে কোনো রকম কাজই যথেচ্ছভাবে করবার অধিকার ছিলো।

বেল্লিক বামুন—(১৮৮৯ খৃঃ)—গোবৰ্দ্ধন বিশ্বাস॥ এক পুরুৎ ঠাকুর বাইরে খুব নিষ্ঠা দেখান, কিন্তু আসলে তিনি অত্যন্ত লম্পট স্বভাবের ছিলেন। একটি সুন্দরী মুসলমান মেয়েকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে কি করে ব্যর্থ হলেন, প্রহসনটিতে তা বর্ণিত হয়েছে।

একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত অবও কতকগুলো প্রহসন রচনার সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন—**মাতাল সন্ন্যাসী** (১৮৮৭ খৃঃ)—ওয়াহেদ বকস, **বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী** (প্রকাশ কাল অজ্ঞাত)—লেখক অজ্ঞাত, **বিধবা বঙ্গবালা** (১৮৭৫ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত, **নক্সা** (১৮৯৮ খৃঃ)—গোবিন্দচন্দ্র দে—ইত্যাদি। মদ্যপান, লাম্পট্য ও বেশ্যাসক্তি সম্পর্কিত প্রদর্শনীতে ইতিমধ্যে একই ধরনের বক্তব্য সমন্বিত প্রহসনের কিছু সন্ধান মিলবে—যদিও সেখানে সাংস্কৃতিক দিকটি প্রধান। ধর্মবিষয়ক প্রদর্শনীতেও ধর্মধ্বজ বা সমাজধ্বজের ভণ্ডামি অবশ্য আছে, কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ নেই বলে তাকে পৃথক প্রদর্শনারই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অনুসন্ধান করলে বিভিন্ন প্রহসনে বিশিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গ প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যাবে। এর সামাজিক কারণ তো ছিলোই। বিশেষ করে আদর্শ অনুকরণের প্রসঙ্গ আসবার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক জনপ্রিয় প্রহসনটি ধর্মধ্বজের ভণ্ডামিকে কেন্দ্র করে লেখা।

(খ) কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা॥—

কুলীন কুল সর্বস্ব (১৮৫৪ খৃঃ)—রামনারায়ণ তর্করত্ন॥ বৈবাহিক দুর্নীতি বিষয়ক দৃষ্টিকোণ এবং বংশমর্যাদার প্রশ্ন অর্থাৎ যৌন এবং সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই দৃষ্টিকোণ বিশেষ করে কৌলীন্য সম্পর্কিত প্রহসনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন দিকটি মুখ্য করে তুলে ধরা হয়েছে—যদিও সাংস্কৃতিক মূল্য দিয়েই তার মূল্যায়ন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দিকটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই প্রহসনটির গোত্র ভেদে এখানে উপস্থাপন করা সুবিধাজনক।

কাহিনী।—কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার কন্যা—জাহ্নবী, শাম্ভবী কামিনী, কিশোরী। কুলপালকের কথায় জানা যায়, জাহ্নবীর বয়স ৩২/৩৩ উত্তীর্ণ হয়নি। শাম্ভবীর বয়স ২৬/২৭, কামিনীর ১৪/১৫ তে পড়েছে,

শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে। এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের অন্যথা কহিলে উত্তম মধ্যম লইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এই সময়ে কুলপালকের সঙ্গে অনৃতাচার্যের দেখা হয়। কুলপালক বলেন,—"আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি, কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন, কবে কুল রক্ষা করিবেন।" তাঁর কথা শুনে অনৃতাচার্য বলে,—"তুমি মহাকুল প্রসূত, তোমার দর্শনে সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল।" অবশ্য সে নিজের ঘটকালির জন্যেই বিশেষ উদ্বিগ্ন। সে তাই বলে, কন্যাদের দুরদৃষ্ট দোষই বিঘ্নজনক হয়েছে। কুলপালকের নির্দেশে সে অনেক জায়গা ঘুরেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। অবশ্য একটি পাত্রের সন্ধান সে পেয়েছে। পাত্রটির বর্ণনা দিতে গিয়ে সে বলে, পাত্রটি বিষ্ণু ঠাকুরের বংশোৎপন্ন, পরম পবিত্র পাত্র। ফলের মুখটী, বর্তমান কুলীনদের সাধারণতঃ যা গুণ আছে, তার চারগুণ গুণ তার মধ্যে আছে। কিন্তু বরের বয়স বর্তমানে বাট। যদি বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে পরের দিন রাত্রেও তা হতে পারবে। যাহোক বিয়ের দিন ঠিক করবার জন্যে অনৃতাচার্য গ্রহাচার্যের কাছে যায়। পঞ্জিকা দেখে গ্রহাচার্য ২৯শে বৈশাখ দিন স্থির করে। ঐ দিনটি খুব শুভ। কিন্তু অতো বেশি সবুর করা তার স্বভাবে নয়। বিশেষতঃ এর মধ্যে বরের দোষগুলো প্রকাশ পেয়ে গেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে, ঘটকালিও যাবে। অনৃতাচার্যের ইচ্ছে কালই বিয়ে ঘটানো। কিন্তু গ্রহাচার্য বলে 'কল্য দিন নাই।" মূর্খ অনৃতাচার্য বলে, কাল দিন হবে না কেন, কাল কি সূর্যোদয় নয়? গ্রহাচার্য জবাব দেয়—বিয়ের দিন হবে না। অনৃতাচার্য বলে—বিয়ে কখনো দিনে হয় না, রাতে হয়। গ্রহাচার্য জবাবে বলে, কাল বিয়ের নক্ষত্র নেই। সুতরা কাল রাত্রিতে বিয়ে হওয়া অসম্ভব। অনৃতাচার্য বলে,—"এ বেটা রাইত কানা নাকি? এ কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি। কল্য তুই আমার নিকট আসিস, তোকে আকাশে কত নক্ষত্র দেখাইয়া দিব, খুঁজিয়া দেখিস্, একটাও কি বিবাহের হইবে না?" গ্রহাচার্যের মতে পরের দিন সপ্ত-শলাক। ঐ নক্ষত্রে বিয়ে হলে স্ত্রী বিধবা হয়। অনৃতাচার্যের মতে কুলীন মেয়েরা সব সময়েই বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করে, অতএব বৈধব্যের কোনো কথাই ওঠে না। শেষে অনৃতাচার্য পরের দিনকেই উপযুক্ত দিন স্থির করে ফিরে যায়। এতোদিন পরে মেয়েদের বিয়ে হবে শুনে তাদের মা ব্রাহ্মণী খুশিতে মেয়েদের ডেকে বলেন,—"এত কালে প্রজাপতি হলো অনুকূল। ফুটিল তোদের বিয়ের

বিবাহের ফুল।" বিয়ের কথা শুনে মেয়েদের কেউ বিষণ্ন হয়, কেউ অবাক হয়, কেউবা আনমনা হয়ে পড়ে। জাহ্নবী বলে,—"এই বয়সে যমের সঙ্গে বিবাহ হইলেই ভাল হয়। বৃদ্ধবয়সে আর এই বিড়ম্বনা কেন?" শাম্ভবী অবিশ্বাসী মনে বলে,—"আমরা কুলীন কন্যা, আমাদের আবার বিবাহ কি?" কামিনী যৌবনবতী। সে মনে মনে ভাবে,— "এ বর যেমনই হউক, বিবাহ হইলেই হয়, না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস কি?" মা তাদের বিয়ের কথা বলে এভাবে অনেকদিন ভুলিয়েছেন। কিশোরী তখন পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে বাইরে খেলতে গিয়েছিলো। দিদির ডাক শুনে খেলা ছেড়ে এসে বিয়ের খবর শুনলো। কিন্তু বিয়ে কাকে বলে তা সে জানে না। মা অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে দিলে সে খুশি হলো। মা তারপরে পাড়ার সবাইকে খবর দিতে বেরোলেন। মেয়েরা সকলে এসে কুলপালকের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কেউ কেউ নিজেদের দাম্পত্য দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। সকলে একত্র হওয়ার পর তারা সবাই মিলে জলসইতে গেলো।

এদিকে কুলপালকের বাড়ীতে পুরো হিত একটি ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণও এসে উপস্থিত হন। বিদেশী কুলীন ব্রাহ্মণ অধর্ম্মক চর মতে শ্বশুরবাড়ীতে থাকাই কুলীন ব্রাহ্মণদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। যে যতোদিন শ্বশুরবাড়ী থাকতে পাবে তার আদর ততোধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বছরে মাত্র তিন শো পঁয়ষট্টি দিনই সুযোগ পাওয়া যায়, তার বেশি নয়। অধর্মক চর বিবাহের সংখ্যা সাড়ে আঠারো গণ্ডা। আবার তার দাদা মশায়ের চার কুড়ি পনের পনেরোটা বিয়ে। যদিও তার দাঁত একটাও নেই, তবুও নাকি বিয়ে করবার সুযোগ পেলে ছাড়েন না। এদের কথা শুনে তর্কবাগীশ বলেন,—"কি ভয়ানক ব্যাপার। বল্লালসেন গৌড়রাজ্যে ধর্ম্মনির্ম্মূলনার্থ ধূমকেতু স্বরূপ উদিত হইয়াছিল, যথার্থই বটে" ধর্মশীল বলেন, আগে কুলীন শব্দে নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতো, এখন তা তার নেই। তার মতে, কুকার্যে যে লীন সে-ই কুলীন। বিবাহ বাণিজ্য যাদের কাজ, তারা শুধু বিয়ে করেই কর্তব্য শেষ করে, স্ত্রীর ভরণ পোষণ বা সুখ সুবিধের দিকে দৃকপাত করে না। বিয়ের পর কোথাও দুবার কোথাও বা মোট তিনবার পদার্পণ করেন। তাতে স্ত্রীদের পাতিব্রত্য বা সতীত্ব কিসে রক্ষা পাবে? বিয়ের পর মেয়েদের চিরদিনই বাপের বাড়ীতে থাকতে হয়। সুতরাং সেখানে পদস্খলন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আজ কুলীন সমাজ তাই ব্যভিচারের মতো উৎকট দোষে আচ্ছন্ন

কুলীন সমাজে পিতা পুত্রকে চিন্‌তে পারে না। পুত্রও কোনোদিন পিতার মুখ দর্শন করে নি। পিতা যখন নিজের নাম প্রকাশ করে, তখন পুত্র উত্তম বলে,—"তবে আমি প্রণাম হই।" বিবাহবণিক মুখোপাধ্যায়কে উত্তম নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু বিবাহবণিক স্মরণে আন্‌তে পারে না—কোথায় কাকে বিয়ে করেছে সে? কার সন্তান খাতা দেখে তার শ্বশুরালয়ের সন্ধান নিতে হয়।

তারপর ফলারের পালা। উদরপরায়ণ যখন শিশুকে জিজ্ঞাসা করে—আগে কি খাবি?—তখন শিশু বলে 'দই খাবো'। সাংঘাতিক একটা অন্যায় কথা বলেছে, এইভাবে উদরপরায়ণ তাকে একটা চড় দেয় কষে। এমন সন্তান থাকার চাইতে না থাকা ভালো। বাপের দুঃখ—আগে দই খেলে কি আর কিছু খেতে পারে। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে ভোজন বিদ্যা কিছুই জানে না।

এদিকে সত্যিই বিবাহ হবে শুনে সখেদে জাহ্নবী মন্তব্য করে,—

> "নির্ব্বাণ হইলে দীপ দবে তৈল দান।
> পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান॥
> যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহ বিধান।
> মিথ্যা নয় লোকে কয় এ তিন সমান॥"

জাহ্নবীর যৌবন চলে গেছে। এখন বিয়ে হওয়া না হওয়া সমান। শাম্ভবী বলে,—দেখা যাক না, কি হয়। ইতিমধ্যে কৌতূহলী যুবতী কামিনী একফাঁকে গিয়ে বর দেখে আসে। ফিরে এসে সে দিদিকে বলে,—

> "দেখিলাম বাসায় বসিয়া আছে বর।
> প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর॥
> রূপের কি কব কথা অতি অপরূপ।
> ভুবনে তাহার কেহ নহে অনুরূপ॥"

একমাত্র বড়দিদির সঙ্গে মানাতে পারে। ঠাট্টা করে বলে,—"যেমন দেবা তেমনি দেবী—মিলেছে ভাল।" মুখে যে যাই বলুক এরা জানে, প্রতিবাদে কোনো ফল হবে না। অদৃষ্টের লিখন। মানতেই হবে।

> 'শুনিতে পারি না আর মরে যাই চল।
> এ বিয়ে হইলে মাত্র একাদশী ফল॥"

বিবাহ সভায় বৃদ্ধ বর বসে আছে। শুধু বৃদ্ধ নয়, আকাট মূর্খ, বধির এবং কানা। সারা গায়ে তার দাদ। মুখে বসন্ত-বাহার। ঘটক অমৃতাচায

তার পরিচয় দেয়—নিকষ কুলীন—বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান—ফুলের মুখুটি !! কুলীনপ্রবর কুলপালক তার কুলরক্ষার জন্যে এই মুখুটি কুলীনের হাতে চার কন্যাকে সমর্পণ করেন।

যৌন বিভাগীয় প্রদর্শনীতে কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রহসন উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে সেগুলোর পুনরুপস্থাপন নিরর্থক।

রক্ষণশীল মর্যাদাকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক এবং দ্বৈতীয়িক—উভয় প্রকার অনুশাসনগত দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ দ্বৈতীয়িক অনুশাসনগত অনেকটা জটিল এবং উপস্থাপক পরিধিও পরিবর্তনশীল। বলাবাহুল্য সমাজচিত্র প্রদর্শনী পরিধি বিশ্লেষণের অবকাশ অল্প।

৮। বিবিধ।—

সমাজের চিন্তা ভাবনা যেমন বিচিত্র, তেমনি তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য অবস্থান করে। প্রদর্শনার সুবিধার জন্যে সমাজচিত্রকে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কতকগুলো ভাগে ফেলা যায় বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত বাহ্য হয়ে পড়ে। কারণ সমাজচিত্র এতো জটিল চিন্তা ভাবনাজাত, যে এগুলোকে ঐভাবে ভাগ করলে বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপকে অনেকাংশেই অস্বীকার করা হয়। বিস্তৃত অবকাশ যেখানে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সেখানে এ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এ ধরনের বিভাগেরও ব্যর্থতা বিবিধ পর্যায় নামে একটি বিশেষ পর্যায়কে স্বীকার করতে সমাজচিত্র উপস্থাপককে প্রবৃত্ত করে।

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক ॥ –

(কক) গ্রন্থকার।—

দৃষ্টিকোণের সমর্থন পুষ্টির জন্যে একদিকে যেমন বিষয়বস্তুগত চিন্তাধারার মূল্য আছে, তেমনি লেখকের ব্যক্তিত্বের উন্নতাবস্থা সম্পর্কে সমাজে প্রচারেরও আবশ্যক হয়। তাই প্রহসন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক বিভিন্ন গ্রন্থকে অসার বলে নিজ দৃষ্টিকোণকে উন্নত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য প্রচার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে সম্পন্ন হয়েছে। অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকেও একই গোত্রে রেখে প্রচারের জন্য যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে পদ্ধতি-বিশেষেরই অনুসরণ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যোগেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আমি তোমারই" প্রহসনের (১৮৭৯ খৃঃ) ভূমিকায় ('সান্তনয় নিবেদন') লেখক বলেছেন,—"পাঠক মণ্ডলি ! লোকে যেমন না পড়িয়া পণ্ডিত হয়, আমিও সেইরূপ লিখিতে না জানিয়া লেখক হইয়াছি, কিন্তু কি করি, আজকালের গ্রন্থকার মহোদয়েরা যেরূপ আমাকেও কাজে কাজেই সেইরূপ হইতে হইয়াছে।" অন্য দৃষ্টান্ত, বিপিনবিহারী বসুর লেখা "বুঝলে ?" প্রহসনের (প্রকাশকাল অনিশ্চিত ভূমিকাতেও লেখকের বক্তব্য,—"বেকারের সময় বিস্তর। সেই সময়ের স্বকিম্বা ক বাবসার এই প্রহসন রচনারূপ অনর্থের মূল, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যেরও দুর্ভাগ্য। যদি ভবিতব্য মানিতে হয়, তাহা হইলে লেখক উপলক্ষ মাত্র।" সমবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির আধিক্য প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে কণ্টকস্বরূপ হয়। তাই অনেকেই তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পুস্তিকায় অবকাশ পেলেই অসার গ্রন্থকারদের আক্রমণ করেছেন। ফকির দাস বাবাজী অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের লেখা 'বঙ্গীয় সমালোচক" কাব্যে লেখক মন্তব্য করেছেন ১—

"সকলেই গ্রন্থকার গ্রন্থে গ্রন্থে অন্ধকার
আজকাল কত কবি গড়াগড়ি যায়।"

কবিতা লেখা সাহিত্যিক খ্যাতিলাভের সহজতম পদ্ধতি এই লোভে অনেকেই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়। প্রবাদ আছে পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি যৌবনে কবি হন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্যযুবকদের কবিতা রচনা বিরুদ্ধ সংস্কৃতি-সম্পন্ন গোষ্ঠীর দৃষ্টি বিস্মিত করেছে। তাই "গোপন বিহার" নামে একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে,—

"কি জ্বালা কলির খেলা হোল কলিকালে
বৈ রচনা করে পাঁচ বোছুরে ছেলে ॥
তিনযুগ তিনকবি নাহি ছিল আর
কলিযুগে কলিকাতায় কবির বাজার ॥"

নভেল রচয়িতার সংখ্যাও কম নয়। "নভেল নায়িকা" নামে একটি প্রহসনে সারদা মন্তব্য করেছে,—"আজকালকার বাঙ্গালাভাষার নভেল লেখকের সংখ্যা করা দায়। কিন্তু লেখক কয়জন, সবাই অনুবাদক। ইংরেজী নভেলগুলোর শুদ্ধ তর্জ্জমা করিয়া লেখক,—টাইটেল পেজে প্রণীত লিখিয়া দিলেন।"

১। বঙ্গীয় সমালোচক (১২৮৭ সাল) পৃঃ ৪

তাছাড়া প্রবন্ধ-পুস্তকও কম রচনা হয়নি। গত শতাব্দীর অধিকাংশ প্রবন্ধ-পুস্তকের নামকরণ এবং রচনার মেজাজ দেখলে মনে হয় গ্রন্থকার নিজে গুরুর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই অধিকাংশ প্রবন্ধ পুস্তকের মধ্যেই উপদেশের বাহুল্য লক্ষ্য করি। সমালোচনা সমসাময়িককালে সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা বড়ো স্থান জুড়ে ছিলো। "আর্য্যদর্শন" পত্রিকায়[২] বলা হয়েছে,—"আজিকালি সমালোচনার ভারি ধুম ধাম পড়িয়া গিয়াছে। প্রতি সম্বাদপত্রের প্রতিবারে বিস্তর গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি সাময়িকপত্রের প্রতি বারেই বিস্তৃত এবং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। রঙ্গ ভূমিতে সমালোচনা নাটকে প্রহসনে সমালোচনা, বক্তৃতায় সমালোচনা এবং বালক বৃন্দের ক্রীড়াস্থলস্বরূপ সমাজগৃহেও সমালোচনার বলে তিষ্ঠিতে পারা যায় না।" সাহিত্য ক্ষেত্রেই যখন এই অবস্থা তখন অন্যান্য ক্ষেত্রে সমালোচনার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এই সময় প্রচুর পরিমাণে সমালোচনামূলক গ্রন্থ কিংবা বিভিন্ন গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে সমালোচনা অত্যন্ত বেশি ছিলো। গ্রন্থকারদের বিরুদ্ধে প্রাহসনিক দৃষ্টির মূলে এই সংঘাত সক্রিয়।

অন্যদিকে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলোও একই পর্যায়ের। সেখানে রচনা ছিলো অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। কয়েকজন খ্যাতনামা গ্রন্থকারের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরচনায় ব্যবসায়গত উন্নতিতে অনেকেই এই পথে নেমেছিলেন। বস্তুতঃ আমাদের সমাজে শিশুপাঠ্য বা বালকপাঠ্য গ্রন্থের কোন আদর্শ ছিলো না। তাই কবিচন্দ্রের লেখা "শিশু বোধকে" 'কলঙ্ক ভঞ্জন' নামে একটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে,—

> "রাধা বলে কলঙ্ক লাগিয়া ডরাইনু
> একুল ওকূল আমি দুকুল হারানু"

কিংবা,—

> "কেহ বলে ও মাগীকে ভালো জ্ঞান ছিল।
> কেহ বলে দূর কর বড় ঢলাইল॥"

এ তো হলো রুচির ভিত্তি রচনা। তাছাড়া পাণ্ডিত্য-প্রচারের প্রবণতা বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে লক্ষ্য করা যাবে। ভ্রমাত্মক জ্ঞান-বিতরণ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ-রচয়িতাদের একটি অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু এ ধরনের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের প্রাচুর্যও দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি করেছে।

২। আর্য্যদর্শন—শ্রাবণ, ১২৮৪ সাল; পৃঃ ১৬৩।

স্বষ্টির প্রতিভা সকলের থাকে না। তাই গ্রন্থরচনার নামে অনুকরণের প্রাচুর্য খ্যাতির নামে অখ্যাতিই এনেছে। অনুকৃতি অনুকরণীয় গ্রন্থের অবমাননাই করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থকারকে কেন্দ্র করে প্রহসন রচনা অস্বাভাবিক ছিলো না।

গ্রন্থকার প্রহসন (কলিকাতা—১৮৭৫ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রহসনের শেষে প্রহসনকার গ্রন্থরচনার সাধের পরিণতি প্রদর্শন করে বলেছেন,—

"অভিলাষ ছিল বড় হতে গ্রন্থকার।
এখন কানের টানে দেখি অন্ধকার॥
নাটকের শেষ অঙ্ক সমাপিত হলো।
মিটেছে আমার সাধ হরি হরি বলো॥"

কাহিনী —কালাচাঁদ একজন গ্রন্থকার। "মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি" —নামে একটি প্রহসনের পাণ্ডুলিপি দেখে রমাশঙ্কর উপহাস করে বলে,— আজকাল যে সকলেই গ্রন্থকার হয়ে উঠ্‌লো। সবই হচ্ছে তর্জমা আর নকল। কালাচাঁদের বইও তাই।

কালাচাঁদ নিজে গ্রন্থকার। অন্যান্য গ্রন্থকারের সঙ্গে তার নানান আলাপ আলোচনা চলে। নসীরাম স্কুলপাঠ্য একটা বই লিখ্‌তে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু সে জানে, ইন্‌স্পেকটার যদি মনোনীত করে, তবেই স্কুলপাঠ্য হবে—নচেৎ হবে না। কালাচাঁদের সঙ্গে তার এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সাহেবরা নাকি অনুবাদ করে নিচ্ছে। এদিকে কালাচাঁদের বিশেষ সুবিধে নেই। তবে কালাচাঁদের আশা—বই বিক্রী করেই সে টাকা রোজগার করবে—বড়োলোক হবে। চাকরীর রোজগারের চেয়ে এই রোজগার অনেক সহজ এবং ভালো।—কালাচাঁদ মনে মনে এই কথা ভাবে।

ইতিমধ্যে কালাচাঁদের একটা বই ছাপা হয়েছে। "স্বদেশ দর্শন" Review তে লিখেছে,—"কালাচাঁদবাবু কেন যে এ গ্রন্থখানি লিখিলেন তাহা আমরাও বুঝিতে পারিলাম না, এরূপ জঘন্য গ্রন্থ ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বাহির হওয়া কতদূর অন্যায় তাহা আমরা বলিতে পারি না। অনেকগুলি পুস্তক হইতে চুরি করিয়া বিষয় সংগ্রহ করা হইয়াছে।" এদের মতে, গ্রন্থের সমালোচনা করা অনর্থক সময় নষ্ট এবং পাঠককে বিরক্ত করাও বটে। কালাচাঁদকে ব্যক্তিগতভাবে বলে দেওয়াই নাকি তাঁদের মতে ভালো ছিলো।

এদিকে বই বিক্রী হয়েছে মাত্র দুই-একটি। ভারত নাট্যশালার অধ্যক্ষ লিখেছেন,—"মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি অভিনয়ের অনুপযোগী এবং অভিনয়ে নাট্যশালা কলঙ্কিত করিতে পারে।" এ সব ব্যাপারে কালাচাদকে তার বন্ধুবান্ধবরা অপমান করে। কালাচাদের কিন্তু বিশ্বাস সমালোচকরা বইয়ের সবকিছু পড়ে না। দু'এক পাতা পড়ে, আর লোকের মুখে শুনেই সমালোচনা করে। এদিকে ছাপাখানায় দেনা। পাওনা মেটাবার জন্যে স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রী করবার কথা সে চিন্তা করে এবং স্ত্রীকে সেকথা জানায়।

স্কুলপাঠ্য বইয়ের গ্রন্থকার হবারও অনেক ঝামেলা। আসল কথা, ডেপুটি ইন্‌স্পেকটর যে বই লেখেন, তাই পাঠ্য হয়। স্বয়ং ডেপুটি ইনস্পেকটরই রামশঙ্করকে একথা বলেন। ইন্‌স্পেকটর সাহেবের বিবেচনা এই যে ডেপুটি ইন্‌স্পেকটরবাবু স্কুলপাঠ্যের জন্যে যা ই লিখবেন তাই উপযুক্ত—আর সবই অনুপযুক্ত। কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে জানা যায়—গেজেটে নাকি প্রকাশ, পুলিশ নতুন একটা শাখা খুলেছে। সেখানে "নকলনবিস আর লিটারেরী থিফ্‌দের সাজা হবে।" ডেপুটি ইনস্পেকটর পদ্মলোচন এই অভিযোগে একজনের ক্ষতি করেছিলেন। এক পণ্ডিত একটি কেতাব ছাপিয়েছিলেন। সেটা পদ্মলোচনবাবুর বইয়ের মতো, কিন্তু নকল কিংবা চুরি ছিলো না। অথচ পদ্মলোচন পণ্ডিতকে ডাকিয়ে এনে ধমকালেন। চাকরী যাবার ভয়—পুলিশে দেবার ভয়—অনেক কিছুই দেখালেন। শেষে পণ্ডিত অনেক কান্নাকাটি ও পায়ে ধরাতে পদ্মলোচন কিছুটা নরম হলেন। পদ্মলোচন বললেন, পণ্ডিতকে তার লেখা বইটির সব কপি পুড়িয়ে ফেলতে হবে,—অবশ্য ছাপাতে যা খরচ লেগেছিলো পদ্মলোচন সবই দেবেন। পরে পদ্মলোচন আর টাকা দিলেন না। এ ঘটনাটা রামশঙ্করের কাছে বর্ণনা করে নসীরাম মন্তব্য করে,—পদস্থ লোকের এমন নীচ প্রবৃত্তি দেখে অবাক হতে হয়। বইয়ের বাজারে স্বরচিত স্কুলপাঠ্য বইয়ের একচ্ছত্র আধিপত্যের জন্যে এরা প্রতারণার রাস্তা গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। ইতিমধ্যে একটা দুঃসংবাদ জেনে রাখা ভালো যে, ছাপার দেনার জন্যে কালাচাঁদের নামে শমন বেরিয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী পুলিশ কোর্টে গ্রন্থকারদের বিচার চলছে। ঘনশ্যাম তর্কালঙ্কারের প্রথমে বিচার হয়। তর্কালঙ্কার মশায় নাকি তাঁর "ভাষা বিচার" গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, এই গ্রন্থ প্রথম। অপরাধ, পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি অবশ্য জবাব দিয়েছেন,—অন্য গ্রন্থ

থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করেন নি বলেই একথা বলা সম্ভবপর হয়েছে। তর্কালঙ্কারের বক্তব্য শুনে বিচারক বললেন,—"টুমি চুরি করিয়েছে না, টবে কি হাম শালা চুরি করিয়েছে।" তর্কালঙ্কারের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ আছে। দেশের ইতিহাস থেকে নকল করে তিনি একটি ইতিহাস ছাপিয়েছেন। শেষে শাস্তি—"উসকো টিকি পাখখড়কে বিশ দফে ইধার উধার ঘুমাযকে ছোড দেও।" দুই নম্বর আসামী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি একখানি ব্যাকরণ লিখেছেন। অন্যান্য ব্যাকরণে যা আছে, তিনি নাকি তাই লিখেছেন। অতএব অন্যের জীবিকার হন্তারক। শাস্তি—দশটি থাপ্পড়, নাক কান মলা। তিন নম্বর আসামী অনুমান ঘোষ। নকল কাব্য লেখবার অভিযোগে বিচারকের রায—গ্রন্থকারকে বার বার ওঠাবসা করতে হবে। চার নম্বর আসামী মতি গোস্বামী। ভূগোল গ্রন্থের গ্রন্থকার। তাঁরও অপরাধ—অপরের লেখা আত্মসাৎ। শাস্তি—হাত বেঁধে লাঠির বাড়ি এবং "গাধাকা মাফিক চিল্লানে কহ।"

শেষ আসামী কালাচাদ। সে তার বইটি লেখবার জন্যে শাস্তি পেয়েছে। রায দিতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিলেন,—"উসকো শিরমে ডনসক্যাপ লাগাও, এক গালমে কালী, দুসরা গালমে চূণা লাগাও, দোনো কান পাকড়কে ইধার উধার ঘুমাও।" দণ্ডাদেশ শুনে কালাচাদ অনুশোচনা করে। অন্যান্য গ্রন্থকারদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে কালাচাঁদ বলে,—"আমার ন্যায বিদ্যাশূন্য, কল্পনাশক্তি শূন্য—রচনাশক্তি শূন্য ব্যক্তিরা যেন গ্রন্থকার হতে ব্যগ্র না হন।" কালাচাঁদের অবস্থা দেখে যেন সকলের চৈতন্য হয়, তবেই মঙ্গল। সংখ্যা বৃদ্ধি হলেই সর্বনাশ।।

(কখ) বড়বাবু ॥—

গ্রামের ক্রিয়াকলাপে প্রাবীণ্যের ভণ্ডামিকে কেন্দ্র করে লেখা একটি প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়। রক্ষণশীল মর্যাদাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও একটু পৃথক ধরনের বলে এই প্রহসনটিকে বিবিধ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিশেষতঃ সমসাময়িককালে বিভিন্ন কবিতায় বা বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ঠিক এই ধরনের ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোনো মন্তব্য উচ্চারিত হয় নি। অথচ পল্লীগ্রামের ক্ষেত্রে এ ধরনের চরিত্র অত্যন্ত বাস্তব।

বড় বাবু (কলিকাতা —১৮৮২ খৃঃ)—কেশবচন্দ্র ঘোষ। প্রহসনকার তাঁর বন্ধু "বঙ্গভাষানুরাগী শ্রীযুক্তবাবু বসন্তকৃষ্ণ বসু বি.এ."-কে পুস্তক উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছেন,—"সোদর সদৃশ বসন্ত! আমার 'বড়বাবু' পল্লী সমাজের একটী কণ্টক, ইহাতে পল্লী গ্রামবাসী ব্যক্তিমাত্রেই সমধিক জ্বালাতন, অথচ ইহার উন্মূলনে কেহই সচেষ্ট নহেন।" এই বড়বাবুদের প্রতিপত্তি সাংঘাতিক। রাধানাথ মন্তব্য করেছে,—"ইহারাই কলির সাক্ষাৎ অবতার। বিশেষতঃ আমাদের মত পাড়া গেঁয়ে অঞ্চলে এঁরা যেরূপ আপনাদিগের প্রভুত্বের পরিচয় দেন, তাতে আমাদিগের তো "দ্বিতীয় কৃতান্তমিব" বলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়ে থাকে, ইহাদের দৌরাত্ম্যে গ্রামশুদ্ধ—দেশশুদ্ধ লোক সকলেই শশব্যস্ত, এক প্রকার বলতে কি এরাই গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা।" নাটক শেষে দর্শকবৃন্দের প্রতি করযোড়ে শ্যামল বলেছে —

"বন্ধুগণ! অধীনের এ মম মিনতি
বড় বাবু প্রেমে মুগ্ধ রাখিও না মতি।
তাহলে অভাগা মত অকূল পাথারে
হারাবে জীবন মান জীবনের তরে॥"

কাহিনী —গ্রামের নেটিভ ডাক্তার শ্যামলধন রায়ের বৈঠকখানায় বসে কৃষ্ণচন্দ্র দুঃখ করে বলে,—কলকাতায় পূজোর হাঙ্গামের কত ধূমধাম পড়ে গেছে, সর্বত্রই হৈ চৈ এবং ব্যস্তসমস্ত ভাব। কিন্তু এ গ্রামে তার লক্ষণই নেই। "আশ্বিনমাস, কি পৌষমাস, এর কিছুই বিভিন্নতা নেই।" অন্যবার তবু যে দু একটা প্রতিমা হয়, এবারে তাও হয় নি। "কেবল আমাদের গ্রামবাসী মহাত্মারা স্ব স্ব সঞ্চয়েই ব্যস্ত, মাসে মাসে স্ত্রীর ফরমাজ মত গহনা তয়ের হবেই। কিন্তু এদিকে দানধর্মের বিষয়ে অষ্টরম্ভা, অথচ বড় হিন্দু বলে সাধারণ সমক্ষে পরিচয় দেওয়াটা আছে।" এরা সব দোকানগুলোতে বসে আড্ডা জমায়—বলে কে নাস্তিক—কে ব্রাহ্ম—অথচ হিঁদুয়ানীর মধ্যে তারা কি করে থাকেন? "নানাবিধ গহনা দে মাগের পা পূজা করে থাকেন।" ডাক্তারের অন্যান্য বন্ধু রাধানাথ, নরেশচন্দ্র ইত্যাদিও কৃষ্ণের কথা সমর্থন করে। কৃষ্ণ বলে, পূজোয় ভক্তি থাকুক বা না থাকুক বৎসরান্তে সাধারণ মানুষের একটা আমোদ তো বটেই। দুঃস্থরাও এই আমোদে নিজেদের ভুলতে অবকাশ পায়। অবশ্য পূজোতে বিপদও যে নেই, তা নয়। শুধু যে কাপড় কেনবার খরচা

আছে তা নয়, "ওদিকে যেমনি দুর্গা প্রতিমের কাটমায ঘা পড়ে, এদিকে তেমনি চাকুরে নব্যবাবুদেরও পিঠে ফরমাজি গহনার জন্ম ঘা পড়ে থাকে।"

বন্ধুরা পরামর্শ দেয়, শ্যামল নিজে যেন দুর্গাপূজা করে গ্রামের লোকদের একটু আনন্দ দেয়। শ্যামল ডাক্তার হলেও আয় খুব সামান্য। বন্ধুদের কাছে ধারের নজির অনেক আছে। রাধানাথ বলে, তারা সকলে মিলে অবশ্য শ্যামলকে সাহায্য করবে। রাধানাথ আরও বলে, তার কথামতো চললে সত্তর আশি টাকায় মধ্যে পুজো করিয়ে দেবে। তবে "বড়বাবু"-দের পাল্লায় যেন না পড়ে। "যদি বড়বাবু ধরেন, তাহলে আড়াইশো কি বল, আড়াই হাজারেতেও কিছু হবে না। তাঁদের তো উদর পূর্ত্তি করা চাই।" শ্যামলকে রাধানাথ সাবধান করে দেয়,—"যদি বড়বাবুর সৈন্য সামন্ত এসে এর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে আমরা সরব।" শ্যামল প্রতিশ্রুতি দেয়, বন্ধুদেরই কথা মতো কাজ সে করবে। ছ-টাকার প্রতিমার বায়না দেওয়া হয়। পুরোহিতকে ডেকে পাঠানো হয়। পুরোহিত এলে তাকে বুঝিয়ে বলা হয় যে গ্রামে এবার একটাও পূজো নেই বলেই তাদের জিদে শ্যামল পূজো করছে। শ্যামল পুরোহিতের যজমান—সেদিক বিবেচনা করে এবং গ্রামের স্বার্থের দিকে চেয়ে পুরোহিত যদি সস্তার মধ্যে একটা ফর্দ করে দেন, তাহলে ভালো হয়। সন্তুষ্ট-চিত্তে পুরোহিত ফর্দ করে দেন। এমন কি অষ্টমীতে ব্রাহ্মণ ভোজনের জায়গায় বারোজনের ব্রাহ্মণ খাওয়াবার সিদ্ধান্ত হয়।

ইতিমধ্যে শ্যামলের ভাই নির্মল এসে খবর দে, বড়বাবু আসছেন। তখন শ্যামল প্রতিশ্রুতি ভুলে 'অর্দ্ধ-উলঙ্গ' ভাবে দ্রুত বড়বাবুকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে যায়। রাধানাথ বলে,—"পুরোহিত মশাই, দেখলেন, কি মজা! আমাদিগের গ্রামে বড়বাবুর কি চমৎকার প্রাধান্য। মনে মনে রাধানাথ ভাবে,—"হায়! কি কুক্ষণে আমাদের গ্রামে বড়বাবুর সৃষ্টি হয়েছিল, এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে যেমন দেবদেবীর প্রতি ভক্তিভাব মনুষ্য হৃদয় হতে দূরীকৃত হচ্ছে, তেমনি তার বদলে বড়বাবুর প্রতি ভক্তিভাব বিশেষ লক্ষিত হতেছে। ফলতঃ এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখলে এমনি অনুমান হয় যে, ইহারাই কলির সাক্ষাৎ অবতার। ইচ্ছে করলে একজনকে গ্রামে রাখতে পারেন, আবার দূর করেও দিতে পারেন, জাত দেওয়া—জাত নষ্ট করা তো এদের হাতের ভিতর, লোককে একঘরে—লোকের ধোপানাপিত বন্ধ করান এদের তো একথার কথা! দলাদলি অঙ্গের আভরণ, লোকের একটু ছিদ্র পেলে তার যথোচিত শাস্তি

দেওয়া আছে, আর আপনার বেলায় "মাকড় মারলে ধোকড় হয়. বাবু এদিকে বেশ্যার ভাত খাচ্ছেন, সে বিষয়ে কারও মুখে টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। হায়। যখন দেশ কিংবা গ্রাম উচ্ছিন্ন যাবার উপক্রম হয়। তখন সেই স্থানে এই রকম এক বড়বাবু সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়।

এদিকে শ্যামল বড়বাবু ও তাদের পরিষদদের নিয়ে কি ভাবে আদর যত্ন করবেন, ভেবেই পান না। বড়বাবুর সম্মানে একটু ত্রুটি দেখলেই অনুচরবর্গ কুৎসিত ভাষায় শ্যামলকে গালাগাল দেয়। অবশ্য সেগুলি আদৌ ত্রুটি কিনা, কিংবা সম্মান বড়বাবুর কতোটা প্রাপ্য, শ্যামল সেটা ভেবে দেখবার অবকাশ পায় না। অপরাধীর মতো সব হজম করে নেয়।

শ্যামলদের পুজোর আয়োজন দেখে বড়বাবু বলেন,—"যা হাজার হোক শ্যামল ও শ্যামলের বন্ধুবান্ধব সকলে বালক এ সমুদয় সমারোহ ব্যাপার, এ সমুদয় কার্যে বয়সের পক্কতা—বুদ্ধির পক্কতা আবশ্যক করে থাকে, এতো আর লক্ষ্মী পুজো নয়,—বৃহৎ ব্যাপার। কাজেই প্রাচীনত্বের বয়োধিক্যতারই প্রয়োজন।" অনুচরেরা বড়বাবুর কথার শতমুখে শতভাবে ব্যাখ্যা করে। রাধানাথ অমনি বলে ওঠে, —"বয়সের পক্কতা—বুদ্ধির পক্কতা আবশ্যক করে যথার্থ, কেন না, তা না হলে কর্মকর্তার চক্ষে ধুলো দেওয়া ফাকি দেওয়া যাবে কেন?" বড়বাবু রাধানাথকে পাত্তা না দিয়ে শ্যামলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন— হিসেব পত্র হয় নি অথচ পুজোর ব্যবস্থা। ছেলেমানুষী দেখে বড়বাবু বিজ্ঞতার হাসি হাসেন। প্রথম অনুচর বলে—"আমাদের বাবু সেরকম ধাতের লোক নন যে, তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন, যখন ছেলে মানুষ করে একটা করে ফেলেছো, তখন আমাদিগকে ভালরূপেই হউক আর মন্দরূপেই হউক উপস্থিত থাকতে হবে। তোমাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।" অনুচরটি আরও বলে, কাজ খারাপ হলে শ্যামলের নিন্দে তো এসে যাবে না, কিন্তু বড়বাবুর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। "অপর গ্রামের লোকে যখন এ বিষয় লয়ে আন্দোলন করবে, তখন তো তারা জানবে না যে এ সমুদয় কায বড়বাবুর অজ্ঞাতে হয়েছিল, তখন তারা বিদ্রূপ করে অমনি বলবে যে অমুক গ্রামে, বিজ্ঞ বহুদর্শী বড় বড় মহাত্মারা আছেন, এই বুঝি তাঁদের বিজ্ঞতা, এই বুঝি তাঁদের বহুদর্শিতা।"

বড়বাবুদের প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছে দেখে এবং শ্যামলের এ রকম দুর্বল-চিত্ততা ও খোসামুদে ভাব দেখে রাধানাথ বলে, তাদের মতে শ্যামল যদি কার্য

না করেও, তাহলে তার দুঃখ নেই, কারণ এতে তাদের স্বার্থ নেই। কিন্তু ভয় হয়, বড়বাবুর মতে কাজ করে শেষে শ্যামল বিপদগ্রস্ত ও দেনা গ্রস্ত হবে। রাধানাথের "লেকচারে" অনুচররা চটে ওঠে। তখন রাধানাথ অনুচরদের বলে, তারা এবং তাদের বড়বাবু এ্যাদ্দিন ছিলেন কোথা? "এখন কিনা পাত পড়েছে তাই অমনি এসে হাত ধুয়ে গণ্ডুষ।" কাজ হাসিলের উদ্দেশ্যে ছেলেমানুষি বলে মিথ্যে বিজ্ঞতা দেখিয়ে অন্ততঃ তার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। বড়বাবুকে ঠুকে কথা বলাতে অনুচরদের একজনের গাত্রদাহ হয়। সে বলে,—"হচ্ছে আপনার সহিত আমার বচসা, তখন আপনি বড়বাবুর গা ঠেঁস দে কেন বলেন? ..তিনি কি আপনাদের মতন ছেলে-ছোকরার কথা গ্রাহ্য করেন? তিনি শিবতুল্য ব্যক্তি, তাঁর মর্য্যাদা আপনারা কি বুঝবেন?" রাধানাথ বলে চলে,—"গ্রামের যে কোন লোকের বাটীতে যে কোন ক্রিয়া-কলাপই হউক না কেন, আমাদের বড়বাবু সম্প্রদায় তথাকার অবতার হয়ে বসেন, আর অপরের যেখানে আধবেলা নেমন্তন্নের জোগাড় হয়, বড়বাবু আর তোমাদের মত লক্ষ্মীর বরযাত্রদের সাতদিন। সুতরাং সাতদিনের আর ভাতের ভাবনা থাকে না, এ ছাড়া ভাল ভাল জিনিসপত্র দেবতা ব্রাহ্মণের ভোজ্য না হয়েও বড়বাবু এবং তোমাদেরই উপাদেয় হয়ে থাকে।" এ কথা শুনে অনুচর ঝগড়া করতে উঠলে বড়বাবু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বারণ করলেন। বললেন, ছেলেমানুষের সঙ্গে সে কেন ছেলেমানমি করছে? রাধানাথ কিছু বলা নিষ্ফল মনে করে বাক্যব্যয় না করে চলে যায়। শ্যামল ভয়ে ভয়ে বড়বাবুর দিকে চায়। যেন সে নিজেই একটা অপরাধ করে ফেলেছে। যাই হোক রাধানাথ তো শ্যামলেরই বন্ধু। বড়বাবু কিন্তু এসব হেসে উড়িয়ে দিলেন। "রাম বল! আমি কি ও সব ছেলে মানুষের কথায় কান দি? আমি ওতে কিছুমাত্র মনে করিনে—ও সব বয়সের ধর্ম্মে অমন হয়ে থাকে, এখন রক্ত গরম আছে, তাই কল্লে, কিছুদিন পরে আর থাকবে না, তবে তুমি এক কাজ কর, তুমি আর একটু পরে গে রাধানাথকে হাত ধরে নে এসো—ছোকরাটি বড় সৎ—ভাল করে বুঝিও সুঝিও যেন রাগ টাগ না করে। পাঁচজনে মিলেমিশে কায কল্লেই সুখের হয়।"

তারপর পুজোর ব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনায় বসে। স্থিরীকৃত সবকিছুই তারা নস্যাৎ করে দেয়। বারোজন ব্রাহ্মণ খাওয়ানোর কথা শুনে তারা হেসেই বাঁচে না। এটা কি পুতুল খেলা। অবশেষে বড়বাবু শ্যামলের

অবস্থা বিবেচনা করে বলেন,—গাঁয়ের সকল ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করার দরকার নেই। প্রত্যেক বাড়ী থেকে একজন করে করলেই যথেষ্ট। শ্যামল বড়বাবুর মুখের সামনে কোনো কথা বল্‌তে সাহস পায় না—খরচ তার প্রাণের ওপর দিয়ে উঠ্‌ছে জেনেও।

এইভাবে পূজোর খরচের এক একটি দিক বড়বাবুর চেষ্টায় বৃদ্ধি পায়। পরে বড়বাবু বলেন,—"গ্রামের সমস্ত কায়স্থকে প্রতিমে দর্শনের নিমন্ত্রণ করে এসো, কেবল দক্ষিণ পাড়ার সরকারদের ঘর বাদ।" কারণ তাদের বাড়ীর মেয়ে একজন মুসলমানের সঙ্গে ভ্রষ্টা। খবরটা অবশ্য প্রমাণ-সাপেক্ষ হলেও এবং মেয়েটিকে তার স্বামী নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছে এটা জেনেও বড়বাবু এই আদেশ দিলেন। যাহোক, এভাবে বড়বাবু নানা হিতোপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। বড়বাবুর সঙ্গে একটা বড় দেখে মাছও চলে যায়। ইতিমধ্যে পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়েছিলো। শ্যামল বড়বাবুর কাছে কৃতার্থের মতো শেষপর্যন্ত খোসামোদই করে যায়।

রাধানাথের আশঙ্কাই সত্য হলো। অষ্টমীর দিন যখন ব্রাহ্মণ-ভোজন চল্‌ছিলো, তখন দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্যামল সম্মুখে ছিলো না। তখন কে একজন বলে উঠ্‌লেন, উনি সামনে থাকবেন কেন—উনি যে স্বয় দুর্গোৎসব দিচ্ছেন, ওর আলাদা সম্মান আছে। একথাটা বড়বাবুর মনে ধরে যায়। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, এবং শ্যামলের অহংকারে ও দাম্ভিকতায় অপমানিত বোধ করলেন। অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে তিনি ব্রাহ্মণদের জোর করে পাত থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান। ব্রাহ্মণরা একবার আহার্যের দিকে ও আর একবার বড়বাবুর দিকে করুণ নয়নে চেয়ে খাবার শুদ্ধ পাত ফেলে দোটানার মধ্যে দিয়ে উঠে পড়ে।

দুশ্চিন্তায় শ্যামল কাহিল হয়ে পড়ে। খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে। স্ত্রী কমলবাসিনী স্বামীকে মৃদু তিরস্কার করে বলে, রাধানাথবাবুর মতো প্রিয়বন্ধুর কথা অবহেলা করা অনুচিত হয়েছে। বড়বাবুর সম্পর্কে তো পূর্বেই তারা সাবধান করে দিয়েছিলো। স্ত্রী বলে, এরা কেবল ছিদ্রান্বেষণ করে এবং নিজেদের অভিলাষ সিদ্ধ করে। সব ঠিকঠাক, কেষ্টবাবুর বিয়েতে এরা কেমন কন্যাপক্ষে ভাংচি কেটে বিয়ে ভেঙে দেয়।

শ্যামলের যখন এমন অবস্থা, তখন রাধানাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও নরেশ ছুটে আসে। শ্যামল ভাবে, বন্ধুরা তাহলে তার ওপর রাগ করে নি। অভিমান করে ষষ্ঠী, সপ্তমী আর অষ্টমীর দিন তারা তার বাড়ীতে পা দেয় নি। কিন্তু বিপদের

দিনে তারা না এসে আর থাকতে পারে নি। শ্যামল অনুশোচনা করে। বড়বাবুর প্রতিপত্তি অনেক। যাবার সময় তিনি নাকি বলে গেছেন,—"ব্যাটার ভারি অহংকার হয়েছে যে আমরা একটু অসুখ হলেই বাড়ুয্যেকে না ডেকে ওকেই ডেকে থাকি, যাহোক শীঘ্রই সে দর্পচূর্ণ কত্তে হবে।" শ্যামল ভাবে, বন্ধুরা সহায় থাকতে তার কোনো ভয় নেই। অবশেষে প্রতিজ্ঞা করে,—"যতদিন আমার দেহে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত থাকবে, ততোদিন আর বড়বাবুদের নাম করবো না, বড়বাবুদের নাম করা দূরে থাক্, কোন ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রণ করেও ডাকবো না, এতে যদি আমায় একঘরে হতে হয় তাও হবো! —তাও হবো॥"

(খ) পরিবেশ-কেন্দ্রিক —

(খক) ম্যালেরিয়া ॥—

ম্যালেরিয়া, প্লেগ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জাকে প্রসঙ্গ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রহসন রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এমন কি বম্বের "Bubonic fever"কে কেন্দ্র করেও প্রাহসনিক প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু ম্যালেরিয়াকে কেন্দ্র করে একটি প্রহসন রচনার সংবাদ পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বরের নামকরণ আধুনিক হলেও এ ধরনের জ্বর ততো আধুনিক নয়। চরক সংহিতায় মশক দ্বারা ব্যাপ্ত জ্বরের উল্লেখ আছে। Hippocrates-ও বিষম জ্বরের উল্লেখ করেছেন। Louis XIV এর Le Grand Danplin-এর চিকিৎসাতে Cinchona Bark ব্যবহার করা হয়েছিলো। রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন Dr. Laveran. তাঁর নামানুসারেই এই জীবাণুর নাম হয়—"Plasmodium Laverani."। বিশিষ্ট মশক সংক্রান্ত তথ্য অবশ্য Sir Ronald Ross—Mansions-এর নির্দেশ মতো প্রথম আবিষ্কার করেন। ম্যালেরিয়া শব্দটি ইটালি ভাষাজ। এর অর্থ দূষিত বায়ু। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন জীবাণুবৃদ্ধি, অন্যদিকে তেমন জলনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্রমাবনতি ম্যালেরিয়াকে মহামারীর মতোই গুরুত্ব দিয়েছে। "মধ্যস্থ" পত্রিকায়ও ম্যালেরিয়া বিষয়ক একটি কবিতায় বলা হয়েছে,—

"কোথা হতে এলো জ্বর সংক্রামক—
উড়িবেগে ধায় অতি ভয়ানক,

মধ্যস্থ—বৈশাখ, ১২৮১ সাল

অন্তক সদৃশ নর-বিনাশক,
বালবৃদ্ধ যুবা বাছে না।
যারে ধরে তারে সারে একেবারে,
এরে ছেড়ে ওরে—ফেরে দ্বারে দ্বারে,
রবিকর-গতি তার বেগে হারে,
ঔষধ পাঁচন মানে না।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক বিক্ষিপ্ত কবিতা। ম্যালেরিয়ার প্রসঙ্গ গ্রহণ করা হয়েছে। জমির আদ্রভাব কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। Calcutta Journal of Medicine পত্রিকার "Fever of Bengal" প্রবন্ধে একটি উক্তি মন্তব্য বলা হয়েছে—" the soil in the epidemic-stricken villages has of late become extremely moist - at least move decidedly and remarkably so than it was before the appearance of this new and appallingly destructive epidemic fever." লর্ড মেয়োর ১৮৬৯ খৃঃ—৭২ খৃঃ) আমলে ব্যাপক রেলপথ স্থাপনে আমাদের স্বাভাবিক জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন ' In many places along the banks of the Hooghly, the commissioners were informed that the drainage of the country had been seriously obstructed by railway embankments, and as the direction of the natural drainge of the villages, situated along the river banks, is inland, they (the commissioners) had no difficulty in believing that it was impeded by the railway embankments on both sides of the river."[৫] দিগম্বর মিত্র রেলওয়ে বাঁধ ছাড়াও অন্যান্য বাঁধের কথা বলেছেন,—"From roads and partly from embankments thrown up accross khals for purposes of fisheries "[৬] তাছাড়া জঙ্গল, খানা ডোবা এবং অপরিস্কৃত পুকুরের কথাও অনেকেই উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িককালে Epidemic Committee[৭] গঠন করা হয়েছে। তদনুযায়ী গভর্নমেন্টও

৪। January, 1869 (Vol II No. I.—P 2)

৫। C. J. M.—Jan. 1869 F. B.

৬। C. J. M, -Jan 1869, F. B.

সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলো বলা যায় না। কিন্তু অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে এই সক্রিয়তা কতকগুলো আড়ম্বরের মধ্যেই সীমিত ছিলো। বণ্টন বিভাগীয় দুর্নীতি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সুদূর পল্লীঅঞ্চলের সমস্যাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই করেছে। বলাবাহুল্য চিকিৎসকের দুর্নীতিও যথেষ্ট পীড়াদায়ক ছিলো।

হাসিও আসে কান্নাও পায় (১৮৭৭ খৃঃ)—ভুক্তভোগী॥ বৈকল্পিক নাম—A farce on Malaria। বলাটে একটি কবিতায় লেখক বলেছেন,—

জাগো, গো ভাই ভারতবাসি কর প্রতিকার।
জননী জন্মভূমি হয় ছারখার॥"

গ্রন্থোৎসর্গেও লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট।—তিনি উৎসর্গ করেছেন,—"To the Unfortunate Brethen of Malarious Districts, and their Zeminder সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও জমিদার শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রহসনটির নামকরণ সম্পর্কেও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্রহসন শেষে "দ্বিতীয় ভদ্রলোকের' উক্তিতে।—"গবর্ণমেণ্টের ঔদাস্য দৃষ্টে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি। এখন দেশের এসব অবস্থা পর্যালোচনা করে,—

"হাসি আসি ওষ্ঠে দেশে নৃত্য করে কত।
কান্না আসে চক্ষে শ্রাবণের ধারা মত॥"

কাহিনী।— গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগ ছেয়ে গেছে। ঘরে ঘরে রোগী—একটি নয়, অনেক। হলধর চক্রবর্তীও এমন একজন গ্রামের ভদ্রলোক। তার মেজোছেলে কেনারামের ম্যালেরিয়া। কেনারামের স্ত্রী কামিনী সেবায় নিযুক্ত। জ্বরে কেনারাম কাতরাচ্ছে, ছটফট করছে। এসব দেখে কামিনী ঘাবড়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে,—"কে আছ কোথায় দেখে যাও—আমার বোধহয় সর্ব্বনাশ হল।" কামিনী আক্ষেপ করে বলে,—"কি দেশ হলো, ঘরে ঘরেই এই রকম। কেউ কারে দেখে এমন লোকটি নাই।" কামিনীর আর্ত্তস্বর শুনে হলধর লেপ মুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসে। চাকর হরে-কে ডাকতে গিয়ে তার পেটে ব্যথা ধরে। হরেকে দিয়েই ডাক্তার ডাকতে হবে। হরে অবশ্য আসে—কম্বল মুড়ি দিয়ে এবং নিজের মাথা টিপ্‌তে টিপ্‌তে। হলধর তাকে বলেন—'তোরও যে দশা আমাদেরও তাই, তা কি করবি ধন, একবার আস্তে আস্তে শেখর ডাক্তারবাবুকে ডেকে নে আস্‌তে হবে। বাপ্—যা ধন যা।" এই সময় কেনারাম বড়ো বেশি কাতরাতে আরম্ভ করে। তখন

হলধর বাধ্য হয়ে গিন্নীকে ডাকতে পাঠান। গিন্নী তখন রান্নাঘরে। কিন্তু ছেলে বলরাম এসে খবর দেয়, মা রাঁধতে রাঁধতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে কি রকম করছেন। ইতিমধ্যে হরে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসে। কিন্তু ডাক্তার বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে চায় না। হরে বলে,—'আরে মহাশয়, ডাক্তার টাকা-টাকা না হাতে পেলে আসতে চায় না। তিনি বল্লেন আগে টাকা নেসায়, তবে বাড়ীর ভেতর যাব।" বলরাম হরেকে এক টাকা দেয়। ডাক্তারকে এই টাকা দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসতে বলে।

ডাক্তার এসে কেনার নাড়ী দেখে। বলে,—"এ প্যাটটা এত ফোল্‌চে ক্যান্?" বলরাম বলে —তার দেওয়া ওষুধেরই ৬ ডোজের ৫ ডোজ খাওয়ানো হয়েছে। ৩ ডোজ খাওয়াবার পরেই রোগ বৃদ্ধি, তাই ডাকতে হয়েছে তাকে। ডাক্তার দেখে অবস্থা খারাপ। সে বলে —"যে রোগ ভেবেছিলাম, তা নয়, — আমার জ্ঞান হয় এটা বেলাদ fever' পেটে বাতাস। ডাক্তার দাস্ত সাফের পরামর্শ দিলে বলরাম আপত্তি করে। বলে, এতে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। ডাক্তার তাতে সায় দেয় তবে একটা prescription লিখে দিয়ে যায়।—

For Kenaram Babu—

Ry	Spt. Chloroform	dr	৩
Ligr.	ammon	m.	30
	Tinc musk	dr	1
Decoc	Cinchona	oz.	6
aqua pura		dr	5½

Make 12 dozes one dose during every 2 hours

বলরাম বুঝতে পারে, এ ডাক্তারের ওষুধ খেলে অবস্থা কাহিল। কিন্তু সে নিরুপায়। আবার যেখানে ধারে চলে সেখানে সব ওষুধ পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেলেও টাট্‌কা হবে না। অথচ হাতে সর্বসাকুল্যে একটাকা মাত্র। হলধর চোখে অন্ধকার দেখেন। বলরাম অনেক কষ্টে নেটিভ ডাক্তারকে বাদ দিয়ে আসল ডাক্তার আনাবার ব্যবস্থা করে। নেটিভ ডাক্তার শেখরের prescription গুলো পড়ে আদত ডাক্তার "Oh Heavens!" বলে চীৎকার করে ওঠেন। যে চিকিৎসা প্রণালী—এতে রোগী যে বেঁচে আছে এটাই আশ্চর্য। ওষুধ আনানো হলো—যা খাওয়ানো হয়েছিলো। দেখা গেলো

Tincture Iodine! সাহেব বলে ওঠেন,—"By Jove this murder, cold blooded and deliberate murder!" একটি ওষুধের বোতলে পানা পাস হলো। ডাক্তার অবাক হলেন—prescription এর aqua pura-র পরিচয় জেনে। পানাপুকুরের জলে mixture! ডাক্তার নিজের গাড়ী দিয়ে Scott Thomson-এর দোকান থেকে ওষুধ আনাবার ব্যবস্থা করেন। কিছু বরফ কিনে রাখতে উপদেশ দেন। গ্রামে ভালো ডাক্তার ও ওষুধ যাতে আসে, সেজন্যে গভর্ণমেন্টের কাছে যেন আবেদন পত্র দেওয়া হয়—সে কথাও বলে দিলেন।

ম্যালেরিয়া ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ-ইনস্পেক্টার ও কয়েকজন ভদ্রলোক নিয়ে রোগীর তদারক করতে বেরোন। পথের ধারে একটা লোককে মরে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হন। একজন বলেন,—"এমন হয়েছে যে ঘরে ঘরে ৪/৫ জন করে লেপমুড়ি দিয়ে কোঁ কোঁ করছে [illegible] করছে। তার উপর সম্প্রতি ২/৪ টা ঘরে কলেরাও আরম্ভ হয়েছে।" আর একজন বলেন,—"অত্যো মরা যাচ্ছে যারা ছোটলোক—গরীব—কোন ক্ষমতা নাই—তারা আর কি করবে? দিন কতক ঘষ্টে ঘষ্টে শাকভাত গিলছে, তারপর মচ্ছে।" প্রথম ভদ্রলোক বলেন,—"শুধু ছোট লোক কেন? ভদ্রলোক যারা—যাদের ক্ষমতা আছে, তারাও তো উপযুক্ত ডাক্তার আর ওষুধ পায় না। আনতে হলে সেই কলিকাতা থেকে—তাও টাকার যায়গায় দশ টাকা। না—না মশায় লোকে এক আধবার পারে—কিন্তু যখন রোজ রোজ ব্যায়রাম,—আর পরিবার শুদ্ধ, তখন আর কি করবে? দিন কতক ভুগে ভুগে পটল তোলে।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নানান রকমের রোগী আসে। একটা রোগীর পেটে শুলের দাগ। শুলের দাগ কি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাহেবকে একজন ভদ্রলোক বলেন,—"সাহেব—পাড়াগাঁয়ে অনেক কবিরাজ—হাতুড়ে জানেন, তাঁরা শুলের উপর—যেমন ডাক্তারেরা blister দেন, তেমনি দাগ দেন—অর্থাৎ কোন পদার্থের দ্বারা পেটের উপর পোড়া করে—তাকে পলেতা বলে—আর টোটকা [illegible] খাইয়ে [illegible] আরাম করে।" কোনো কোনো রোগী ৪ ৫ বছর ধরে ভুগে ভুগে ঘটিবাটি বিক্রী করে এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। এ সব শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট চটে যান। তিনি বলেন,—"টোমাদের ডেশের অবস্থার জন্য টোমরা নিজে ডায়ী। টোমাডের জায়গায় জঙ্গল করিবে, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করিবে, আবার পুষ্করিণীর ডারে বসিয়া বসিয়া হাগিবে আর আমরা এ সকল পরিষ্কার করিব? এ জ্বরের মূল কারণ আমি ডেখিটে পাইটেছি বেশ

খারাফ্ জল ও অতিশয় জঙ্গল। এই দুটি কারণ দূর করিতে যদি তোমরা নিজে যত্নবান না হও, তাহলে এ ভরসা করা বৃথা, যে আমরা সাগর পার হইয়া আসিয়া ঐ সকল কায করিব। আমরা রাজ্যশাসন করিতে আছি। চোর ধরিয়া হাতে তুলিয়া দাও, তাকে সাজা দিতে পারি। টাকা তুলিয়া দাও, আমরা খরচ করিতে পারিব, লোক দাও আমরা তাহাদের খাটাইতে পারিব। তোমাদের জন্য আমরা কিছু কুইনের ভাণ্ডার খালি করিতে পারি না। চাকার দিতেছি, টাকা পাইতেছ, দেশের উপকার তোমরা তোমরা নিজে নিজে কর। বাঙ্গালী জাত বড় বজ্জাত আছে, ফাঁক দিয়া কাজ করিয়া লইতে চায়। কেবল কপড় পাড়িলে গবর্ণমেন্টের পায়ে পড়ে—ওরা ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহ করিবেন, ছেলিয়া হইলে ছেলিয়াদিগের বিবাহের আটক বা করিবার জন্য একটি নূতন আইন চাই—আচ্ছা তাও বাপ্ দিতেছি— কখ ওরে বাপ্, তাবা দিতে নাই—তার বেলা তোমরা নিজের পথটি দেখ

সাহেবদের মতিগতি এবং গবর্ণমেন্টের উদাস ভাব দেখে সাধারণে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। হাসিও আসে কান্নাও পায়।"

(খখ) পূজা-পার্বণ ও অনাচার॥—

আন্তরিক শ্রদ্ধার বিশেষ প্রথাগত প্রকাশই পূজো অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু চারিত্রিক বিকৃতি এবং ধর্মীয় পরায়ণতা এই অনুষ্ঠানকে কলুষিত করে তোলে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও আর্থনীতিক পরিবর্তন ঊনবিংশ শতাব্দীতে এককালে ঘটা সম্ভবপর হয়নি। তাই পূজো অনুষ্ঠান-গুলোর স্বীকৃতি থাকলেও সেগুলোর চেহারা যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। এই সব অনুষ্ঠানের স্বীকৃতির অন্যতম কারণ প্রমোদোপাদান। চেতক আনন্দের সঙ্গে সংস্কারের সর্বদা যোগ থাকে। তাই পূজো অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আনন্দভোগের সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু এই আনন্দভোগের মধ্যে গুণগত, মাত্রাগত, পরিধিগত ইত্যাদি বিচারের দিক আছে—যে দিকটি লক্ষ্য করে প্রাথমিক অনুশাসনগত দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হওয়া সম্ভবপর।

অবশ্য দৈহিক তৌষিক অনুশাসনগত দৃষ্টিকোণ সংগঠিত, এটা অস্বীকার করা যায় না। যেমন বারোয়ারী পুজাঘটিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে আর্থিক দিককে কেন্দ্র করে দৃষ্টিকোণ সূচিত হলেও নব্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ নিষ্ক্রিয়

থাকে না। বিশেষতঃ গ্রাম্য পরিবেশে পূজোকে কেন্দ্র করেই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার প্রকাশ। পরিবারগত সামাজিক অনুষ্ঠানে এতো ব্যাপকতা থাকে না। বিশেষ করে পল্লীঅঞ্চলের দুর্গাপূজোতে ব্যাপকতা আছে বলেই প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের বলবত্তা লক্ষ্য করা যায়।

"বারোয়ারী" বা "বারো ইয়ারী" পূজা সম্পর্কে একটি ইতিহাসও নাকি আছে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। শান্তিপুরের কাছাকাছি গুপ্তিপাড়ায় বারোজন ব্রাহ্মণ বন্ধু মিলে এই পূজার সূচনা করেন। তখনকার দিনেই সাত হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিলো। বলাবাহুল্য এই পূজায় যথেষ্ট জাঁকজমক হয়েছিলো। বহুদিন পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সমাচার-দর্পণে লেখা হয়েছিলো,— "যখন প্রথম বারোয়ারীর পূজা প্রথা হইল, তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্জ কি বাজার ছিল না যে, বারো-ইয়ারীর ঢোলের গোল ঢাকের জাঁক গোঁসাইরের হাঁক না হইয়াছিল।"৭

বার ইয়ারী পূজা প্রহসন (কলিকাতা—১৮৭৮ খৃঃ)—জনৈক গুপ্ত (শ্যামাচরণ ঘোষাল)॥ বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন,—"সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে বারইয়ারী পূজা যেরূপ কুৎসিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন। কিছুদিন অতীত হইল কোন একটী পল্লিগ্রামের বার ইয়ারী পূজা দর্শন করিয়া আমার মনে এরূপ ঘৃণার উদ্রেক হয় যে আমি আপনাকে অল্পবুদ্ধি জানিয়াও সমাজ সংশোধনার্থ এই পুস্তিকাখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিছুদিনের মধ্যে রচনাও সমাপ্ত হইল। কিন্তু, পাছে লোকের নিকট ঘৃণাস্পদ হই, এই ভয়ে জনসমাজে ইহা প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় নাই। এক্ষণে কতিপয় বন্ধুবান্ধবের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট ইহা যে কিরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইবে তা বলা যায় না।"

"আমি এই ক্ষুদ্রকায় 'বারইয়ারী পূজা' প্রহসনখানি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া রচনা করি নাই। যদ্যপি ভ্রমবশতঃ ইহাতে কাহারও মনাকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমি যেন তাহার নিকট বিরক্তিভাজন না হই। আমি গ্রন্থকর্ত্তার পদাকাঙ্ক্ষী হইয়া কিংবা অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধিতে ইহা প্রকাশ

৭। যুগান্তর, ২৫শে অক্টোবর ১৯৭৩ খৃঃ। 'প্রথম বারোয়ারী' প্রবন্ধ—কল্হণ (দীপক কুমার সেন)।

করিতেছি না, সমাজের কতকগুলি কুরীতি সংশোধন করাই আমার এই পুস্তকখানির একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি ইহা দ্বারা বারইয়ারী আমোদবৃক্ষের একেবারে মূলচ্ছেদ কিংবা একান্ত পক্ষে তাহার দুই চারিটী কুৎসিত শাখাচ্ছেদও হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে চরিতার্থ ও আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।" "বারোপকারিক" শব্দটির মৌখিক বিবর্তিত রূপ বারোয়ারী। প্রহসনকার শব্দটিকে বিকৃত করে বার-ইয়ারী অর্থাৎ দ্বাদশ-"ইয়ার"-বিষয়ক বলে ইঙ্গিত করে তাঁর উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। সাধারণতঃ স্ফূর্তির সহযোগী বন্ধুদেরই ইয়ার বলা হয়

কাহিনী।—রামপুর গ্রামে হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুজোর হেডপাণ্ডা। এবার আবার পুজো হবে, তাই সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আলোচনায় বসে। গেলো বছর দুষ্কপোষ্য মোষ আনা হয়েছিলো এক কোপেই বলি হলো, বলি দিয়ে ঠিক সুখ হল না। একজন বলে,—"মোষটার এতে এত লঙ্কাবাঁটা দিলাম, কিছুতেই বোধ করলে না।' নিতাই প্রস্তাব করে মোষের বদলে পাঁঠা আনা হোক। কেটেও সুখ, খেয়েও সুখ,—নইলে মোষের মাংস শুধু মুচিদেরই সুখ। বিনয় জমিদারের ছেলে। সে বলে, মোষ আনা হলে সে বেশি চাঁদা দেবে। তখন বাধ্য হয়ে এবার মোষেরই ব্যবস্থা করে। শুভদিন দেখে প্রতিমার বাঁশ কাটতে হবে। ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠানো হয়। ভট্টাচার্য তখন শৌচকার্যে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁকে জোর করে ধরে আনা হয়। গাড়ু হাতে তিনি তাদের সভায় এসে দিন ঠিক করে দিয়ে যান।

নির্দিষ্ট দিনে হেডপাণ্ডা হেমচন্দ্র দলবল নিয়ে কুড়োল হাতে বাঁশ কাটতে চলে। প্রতিমার নাম করে গরিব গরিব লোকদের বাঁশ ঝাড় থেকে অনেক গুলো করে বাঁশ কাটে। আসলে বাঁশ বেচে কিছু পয়সা পাবার জন্যে। হলা কিছুদিন আগে মারা গেছে। তার বিধবা মেয়ে উঠোনে বসে ধান সেদ্ধ করছিলো। কুড়োল দিয়ে বাবুদের বাঁশ কাটা দেখে সে পা জড়িয়ে ধরে। নবগোপাল তাকে লাথি দিয়ে ফেলে দেয়। নাক দিয়ে মেয়েটির রক্ত ঝরে পড়ে। সেই বীরত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পাণ্ডা বলে,—"তা আমরা কি, সে নেকামোতে ভিজি, দুচার লাথিতে বেটিকে পগারের নীচে ফেলে দিলুম।" মাধবের বর্ণনায় জানা যায়, গ্রামের প্রত্যেকটা পাড়ায় যতো ঝাড় আছে, সব কয়টাতেই তাদের কুড়োলের কোপ্ পড়েছে। মেথর পাড়ায়ও এরা বাঁশ কাট্‌তে গেছিলো। সেখানে গিয়ে তারা শোনে যে রাম মেথরের আজকাল

কিছু টাকা হয়েছে। অমনি কুড়োল হাতে করেই পাণ্ডারা গিয়ে রামার দরজায় গিয়ে ডাকে,—"রামবাবু বাড়ী আছেন?" রামা এলে সবাই তাকে কোলে তুলে নিয়ে নাচতে সুরু করে। শেষে তার কাছ থেকে পাণ্ডারা পাঁচ টাকা নিয়ে ক্ষান্ত হয়। রামা মেথরও খুব আহ্লাদ করে টাকা দেয় তাদের।

ভোলা কৈবর্তদের বাড়ীর ঝাড়ে কুড়োলের শব্দ হলে ভোলা গিয়ে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে,—"গরীব মানুষ পেটে খেতেই পাই না। দু একখানা বাঁশ বেচে, কাটনা কেটে, বাবুদের বাড়ী জল তুলে সংসারটা কষ্টে শ্রেষ্টে এক রকমে চালাই।" কিন্তু বাবুরা অবুঝ। শেষে ভোলা বলে,—"আজ না হয় একটা কেটে নিন।" ভোলা কথাটা যে ভাবেই বলুক না কেন, পাণ্ডারা বলে—ভোলা কি ভিক্ষে দিচ্ছে! রেগে গিয়ে তারা ভোলাকে গালাগালি দেয়, বার বার লাথি মেরে ফেলে দেয়। এমন সময় ভোলার ছেলে তারণ বাড়ী ফিরে এসব দেখে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খায়। শেষে দুজনকে বেঁধে রেখে পাণ্ডারা ঝাড় নির্মূল করে চলে যায়। ভোলা অক্ষেপ করে আর অভিশাপ দেয়।

এই বারইয়ারী পূজোয় পূজোর নাম করে গরিবদের ওপর অত্যাচার, মদ্যপান্ আর নিষ্ঠুর বলিদান চলে। গ্রামের অনেকেই এইভাবে দলে পড়ে মদ্যপান অভ্যাস করে এখন পাকা মদ্যপ। তাদের স্ত্রীরা সর্বদা কান্নাকাটি করেন। চাঁদায় পাওয়া যতোকিছু টাকা—তার অধিকাংশই যায় যাত্রাওয়ালাদের পাদপদ্মে। দীননাথবাবু এই অপব্যয়ের কথা এক পাণ্ডাকে বল্‌লে সে বলে, আমোদ করবার জন্যেই বাঁচা। দীননাথবাবু ওদের বোঝাতে পারেন না যে, সেইসব গরিবরা তাদের মতো আমোদের প্রতিশ্রুতি বা আস্বাদ পায় নি; তাই তারা এজন্যে এক পয়সাও অপব্যয়ে নষ্ট করতে চায় না। শেষে অপমানিত হওয়ার ভয়ে দীননাথবাবু আর কিছু বল্‌লেন না।

পাণ্ডারা অতিথি অভ্যাগতের সম্মান দিতে জানে না। গ্রামের একজনের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে বাড়ীতে বরকর্তা, বর ও বরযাত্রী এসে পৌছিয়েছেন। বিয়ের লগ্ন উপস্থিত। কন্যা সম্প্রদান হবে। এমন সময় দলবেঁধে বারইয়ারী পূজোর পাণ্ডারা আসে। হেমচন্দ্র বলে,—"বারইয়ারির কথা চুলোয় গেল, উনি তাড়াতাড়ি কন্যা সম্প্রদান করতে চল্‌লেন, কেন, বিয়ে কি পালাচ্ছে নাকি!" নব বলে,—"আমাদের পূজো হলো রাত পোয়ালে কাল, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল!" বরকর্তাকে তারা পঞ্চাশ টাকা চাঁদার জন্যে ফেল্‌তে বলে। নেহাৎ ভদ্রতার বশে বরকর্তা তাদের পাঁচ টাকা দিতে চাইলেন। তখন পাণ্ডারা

তাকে অপমান করে। মারামারি বাঁধবার উপক্রম ঘটে। হেড়পাণ্ডা হেমচন্দ্র কন্যাকর্তাকে একঘরে করবার ভয় দেখায়। কন্যাদায়ে কাতর কন্যাকর্তা বিয়ে ভেঙে যাবার ভয়ে দশ টাকা দিয়ে হাফ ছাড়েন। একজন বরযাত্রী মন্তব্য করেন।—"উঃ! কি ভয়ানক কদর্য্য গ্রাম। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভিতর এখনও যে এইরূপ বারইয়ারীর অত্যাচার, এ অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।"

আমোদিনী "হেড়পাণ্ডার মাগ" অর্থাৎ হেমচন্দ্রের স্ত্রী। যাত্রা ইত্যাদিতে সুযোগ সুবিধে তারই সবচেয়ে বেশি। সামনে আসন সংগ্রহের জন্যে মেয়ে মহলের সকলেই তাকে খাতির তোষামোদ করে। কিন্তু তারও দুঃখ কম নয়। বারইয়ারী পূজোর সময় যখন কিছু অনটন ঘটে, তখন হেমচন্দ্র তার গয়না খুলে নিয়ে যায়। কারণ আমোদের সময় সকলে আছে, কিন্তু টাকা দেবার বেলায় কেউ থাকে না। আমোদিনী বলে,—"এমন এক এক খানা করে খুলে রাঁড় হওয়া অপেক্ষা যদি একেবারে রাঁড় হতুম সেও আমার পক্ষে ভাল ছিল।" যাত্রা ইত্যাদির মেয়ে আসরে স্বয়ং হেড়পাণ্ডার স্ত্রী যদি খালি গয়নায় বসে থাকে, তাহলে তার সম্মানের মূল্য কী?

বিনয়ের বাবা অর্থাৎ জমিদার রাজবল্লভ হঠাৎ পূজোর আগের দিন খারাপ স্বপ্ন দেখে বিনয়কে বলিদানের কাছে যেতে বারণ করেন। তিনি বলেন, তিনি স্বপ্ন যদিও বিশ্বাস করেন না,—তবে মন যে তার মানতে চাইছে না। কিন্তু বলির মোষ এসেছে শুনে বিনয় ছুটে বেরিয়ে যায়,—বুড়োর কুসংস্কারের মুণ্ডপাত করতে করতে। স্বপ্ন সত্যি হলো। বলিদানের সময় অঘটন ঘটলো। পাণ্ডারা সকলে অতিরিক্ত মদ্যপান করে বলি দেবার জায়গায় উপস্থিত হলো। সবাই বেহুঁস। মোষ যখন হাড়ি কাঠে ফেলা হলো, তখন বিনয় মত্ত অবস্থায় মোষের পিঠে উঠে বসলো। তারপর মোষের যৌনদেশে লঙ্কাবাটা দেবার জন্যেই হোক কিংবা—"দড়ি নোল পড়েছিল"—যে কারণেই হোক মোষ নড়ে উঠলো। বিনয় তখন মোষের গলা জড়িয়ে ধরলো। ঠিক এমন সময় কর্মকারের খাঁড়া মোষের গলা কেটে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের গলাও অনেকখানি কেটে ফেললো। কিছুক্ষণ পরে বিনয় মারা গেলো। এদিকে বিনয়ের মা পাগল হয়ে যান। জমিদার রাজবল্লভও শোকে অধীর হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পাণ্ডাদের সবাইকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যায়। পাণ্ডারা কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়।

বারান্নী বিভ্রাট (১৮৮৮ খৃঃ)—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়॥ চলিত কথায়

বারারী বা বারোয়ারী বল্‌তে বোঝায় গ্রামের সাধারণ লোক। পুজো ইত্যাদি অনুষ্ঠানের বিশেষণ হয়ে অচ্ছেদ্যভাবে প্রকাশ পাওয়ায় অনেকে একে সাধারণ লোক ঘটিত এই অর্থে ধরে থাকে। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে 'উপকারী' এবং 'উপকারিক' শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য যাই থাকুক তদ্ভব বারোযারীর অর্থ নির্দিষ্ট। এই বারোয়ারী সম্প্রদায গ্রামের সাধারণ আমোদ প্রমোদের ভার নিতো। গ্রামে কোনো বিয়ে হলো বরের কাছ থেকে চাদা নেওয়া এদের নিয়ম ছিলো। এই বার্ষিক আয়,—যা পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দাঁড়াতো—সব কিছুই সাধারণের আমোদ প্রমোদের জন্যে খরচ করা হতো। আজকাল কার দিনে থিয়েটার একটা মস্তোবড়ো আমোদ। কিন্তু পেশাদারী থিয়েটার-ওযালা ভাড়া করবার মতো সামর্থ গ্রামের লোকদের ছিলো না। তাই তারা বাধ্য হয়ে সখের থিয়েটার পার্টি করতে বাধ্য হয। এদের অনুষ্ঠানগুলো অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিলো, অথচ এদের অনর্থক প্রচুর ব্যয হতো যাতে একটা পেশাদারী দল ভাড়া করা হয়তো খুব কঠিন হতো না।[৮]

একদা এই ধরনের একটি দল গ্রামে হুজুগ তোলে—এবার তারা গ্রামে একটা থিয়েটার করবে। গ্রামের চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায। পাণ্ডারা সকলে বুড়ীদের কাছ থেকে ফাণ্ডের জন্যে জোর করে টাকা আদায করে। অবশেষে একদিন যথারীতি থিয়েটার আরম্ভ হয। থিয়েটার যখন বেশ জমে উঠেছে, এই সময়ে কলকাতা থেকে একদল মাতাল আসে। তারাও এই সখের দলের সংগঠক। তারা এসেই ষ্টেজের ওপর উঠে মাতলামি সুরু করে দেয। মহা গোলমালের সূত্রপাত হয। দর্শকরা তাদের গালাগালি দিতে দিতে উঠে যায। গোলমাল যখন চল্‌ছে, এর মধ্যে হঠাৎ ষ্টেজে আগুন ধরে যায। শেষে পাণ্ডাদের গ্রেফ্‌তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয।

কলির হাট (১৮৯২ খৃঃ)—অতুলকৃষ্ণ মিত্র। চরিত্র ও সংস্কৃতি বিকৃতিতে পুজো অনুষ্ঠানের চিত্র প্রহসনকার উপস্থাপিত করেছেন। "সুলভ সমাচার" পত্রিকায[৯] "দুর্গোৎসব" প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন,—"এখন সবই উল্‌টো হয়ে গেছে, বাহিরের ধুমধাম যৎপরোনাস্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু সৎকর্মের নাম গন্ধ নাই। কেবল নাচ তামাসা আলোর ধুমধামেই সকল টাকা খরচ হইয়া যায়।

৮। Calcutta Gazette (১৮৮৮ খৃঃ) প্রদত্ত মন্তব্য অনুসরণে। প্রহসনটি দুর্লভ।

৯। সুলভ সমাচার—১লা কার্তিক, ১৭৭৮ শক।

এখনকার লোকের শ্রদ্ধা ভক্তির কথা দূরে থাকুক, বাবুদের আচার ব্যবহার দেখিলে, তাহাদিগের আর হিন্দু বলিয়া বোধ হয় না।...দালানের একপাশে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা কাচা কাপড় পরিয়া শুদ্ধাচারে কত ভয়ে ভয়ে ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত করেন, অপর পাশে পীর বকস্ বাঁড়ুয্যে মহাশয় নিমন্ত্রিত বাবুদের ও সাহেবদের ভোজের নিমিত্ত কত রামপাখী শ্যামপাখী দুইটা দশটা ছোট ছোট জ্যোন্ত ভগবতীকে ছড়া ছড়া করিয়া উননের উপর চাপাইয়া দেন। রাত্রি ৮টা ৯টা হইতে বাবুদের বাড়ীতে হিন্দুয়ানি গড়াইতে আরম্ভ হয়, এদিকে সাহেব কুটুম্ব দিগের সমাগম, ওদিকে স্বরেশ্বরী পূজার মহা সমারোহ।... পূর্ব্বে চণ্ডীর গান প্রভৃতি কত রকম ভক্তি বিষয়ক গান করা হইত এখন প্রতিমার সম্মুখে বেশ্যাদিগকে নাচান হয়।" প্রবন্ধকার বাবুদের প্রযোজিত দুর্গাপূজো অনুষ্ঠানের যে চিত্র দিয়েছেন, তা বাস্তব সন্দেহ নেই। এই সমস্যা যে দৃষ্টিকোণ সংগঠিত করেছে, প্রহসনটিতে তারই একটি বিশেষ প্রকৃতি অনুসৃত রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। মাত্রাবৃদ্ধি যতোই ঘটুক, মূল সংগতচিত্রটি আবিষ্কার করা কঠিন হয়ে ওঠে না।

কাহিনী।—চারদিকে দুর্গাপূজোর প্রস্তুতি চলছে। সেই সঙ্গে অনঙ্গ-বেশ্যার বাড়ীতে চলে পূজোর বাবু-শোষণ। এবার গবেশবাবু অনঙ্গমঞ্জরীকে দুশো টাকা দামের পূজোর সাড়ী দিয়েছে। অনঙ্গ তাতেও অসন্তুষ্ট। নসীরামকে অনঙ্গ প্রতারণা করে। মায়ের পূজো, মন্দির মেরামত ইত্যাদির নাম করে নসীরাম কিছু অর্থসংগ্রহ করে অনঙ্গের কাছে জমা রেখেছিলো, দেশে যাবার আগে চাইতে গিয়ে কিন্তু তা সে পেলো না। অনঙ্গ বলে, তার অনেক টাকা পাওনা আছে। এটাকা তারই প্রাপ্য। অনঙ্গের নাপ্তেনী রসময়ীও বাবুদের কাছে পার্ব্বনি নেবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ দুর্গাপূজোর হিড়িকে অনঙ্গের বাড়ীতে বাবু-শোষণ চলে তীব্রভাবে।

কার্তিক স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন অনঙ্গের বাড়ীতে, সঙ্গে ময়ূর। ছাতা ধরে আসে এক উড়ে বেয়ারা। প্রত্যেক বছরে বেশ্যাপল্লীতেই তাঁর আদর। তাই এখানে তিনি এসেছেন। আর সবাই অবশ্য কালীঘাটে উঠেছেন। তিনি বললেন, এবার তাদের সপরিবারে বিলেত যাবার কথা ছিলো, কিন্তু মার বারণে হয়ে উঠলো না। মা "একে ইণ্ডিয়ান্, তায় মেয়েমানুষ।" গবেশ তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে। কেননা তারও বাড়ীতে কার্তিককে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য মহাশয় এসে উপস্থিত হন। গবেশ-গিন্নী তাঁকে এখানে

পাঠিয়েছেন। বাড়ীতে পূজো হবে—পূজোর আয়োজন কি কি হবে, তাই জানতে এসেছেন। বেশ্যাবাড়ী আসতে গিয়ে লোকভয়ে ভট্টাচার্য উত্তরীয় মুখে ঢাকা দিয়ে আসতে গিয়ে দরজায় আঘাত খেলেন। কিন্তু এদের জেরায় ভট্টাচার্য স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, এসব জায়গায় যৌবনে তাঁর যাতায়াত ছিলো। "মিথ্যা বলবো কেমন কোরে? যৌবনের কথা কিছু বোলবেন না, অন্ধ—অন্ধ। সে সময়ে লোকের দৃষ্টি থাকে না।" ন্যায়রত্নের সঙ্গে একবার তিনি এখানে এসেছিলেন, এবং "অন্যমনে" "ব্রহ্মতেজ" অতিরিক্ত নিয়ে জব্দ হয়েছিলেন। এখনও অবশ্য আসেন মাঝে মাঝে—তবে আশীর্বাদ করতে।

ভট্টাচার্যকে গবেশ পূজোর প্রয়োজন সম্পর্কে বলে, এবার বিশেষ কিছুই হবে না। ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। দুএকজন বন্ধু খাবে আর বৈঠকখানায় বাঈনাচ হবে। কলা-গিন্নীর ব্যবস্থা প্রসঙ্গে গবেশ বলে,—"কি জানেন, মাথার উপর একটা আইন হয়ে রয়েছে, তখন একটু বাঁচিয়ে চোল্লে ভাল হয় না? বয়েস যাই হোক, মাথায় ছোট খাটো দেখলে একটু গোল বাধলেও বাধতে পারে। তার চেয়ে একেবারে মোচাধবা কলাগিন্নীর কথা বোলে দিয়েছি।" গবেশ কার্তিককে অনুরোধ করে, তার মা-রা যেন একটু স্বাভাবিক চেহারায় আসেন। "পাঁচজন সাহেব সুবো দেখতে আসে।" কার্তিক অবশ্য অভয় দেন,—"হাতের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না, পাঁচ ছয় টাকা চালের মোন হওয়াতে জগন্নাথ খুড়োর মতন আমাদের সকলেরই হাত পেটে ঢুকেছে।" শিবের বাড়ীর ট্যাক্স বাকী পড়ায় তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন—পাছে বলদ শীল করে এই ভয়ে। কার্তিক গবেশকে বলেন, ক্রীনের আড়ালে যেন একটু মদের ব্যবস্থা করে রাখা হয়। ভট্টাচার্য এটা দোষের ধরলেন না। তিনি বললেন,—"তা হবে, তার আর কি! আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মতে বন্য কুক্কুট ভোজন তো চলিত আছে—আর ঔষধার্থে সুরাপান,—এতে কার আপত্তি হতে পারে?" কথা প্রসঙ্গে বিলেত যাওয়ার কথা উঠলে তিনি মন্তব্য করেন,—"বাবা, তোমরা ধনকুবের। তোমরা মনে কোরলে সব করতে পারো। আর কেন? বিলেত কি একটা দেশ নয়? শাস্ত্রে বলে,—'দেশাটন' পণ্ডিতমিত্রতা চ বারাঙ্গনা রাজসভা প্রবেশ—এগুলো দেখাশুনা তো চাই।" পুজোর যা কিছু করণীয় সবই ভট্টাচার্য গবেশের কাছ থেকে শুনে নিয়ে চলে গেলেন। গবেশ অনঙ্গমঞ্জরীকে অষ্টমীতে বাঈনাচে তাদের বাড়ী নেমন্তন্ন করে। বাড়ীতে অবশ্য গাড়ী পাঠিয়ে দেবে।

পূজোর হিড়িকে শহরে বিচিত্র কাণ্ডকারখানা চলে। জাল, জোচ্চুরি, অনাচার, ব্যভিচার—এগুলো সমান তালে চল্‌তে থাকে। গাঁয়ের লোকরা শহরে এসে ভুল নিশানা পায়, অনেকের পকেট কাটা যায়। সর্বস্বান্ত নসীরামরাও বেশ্যাদের ইঙ্গিত পেয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে,—"বাড়ী গিয়ে চল ধারধোর করে গোটা পাঁচেক টাকা যোগাড় করবো এখন। ঐ ছুঁড়ীটাকে একবার দেখ্‌তে হবে। ভারি হাস্‌ছে, বল্ আমরা পাল্‌টে আস্‌ছি।" ভট্টাচার্য বামুনের ছেলে ক্ষুদিরাম ইয়ারদের সঙ্গে নিয়ে মুরগী খায়। গলায় মাংস আট্‌কে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে বন্ধুরা তাকে মদ খাইয়ে গলার মাংস ছাড়িয়ে দেয়। ওদিকে আবার প্রাণপ্রিয়বাবু পূজোর বাজার করতে বেরোন্। কাপড়চোপড় নয়, রাশি রাশি বই কিনেছেন। বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটো তা বইতে পারছে না। "আজকাল ধার্যা হয়েছে যে শিশুকাল থেকে বেশি বই না পোড়লে এক্‌জামিনের ফল ভাল হয় না।" ছেলের নাম মণ্টোকৃষ্ট দাস, মেয়ের নাম মিস্ মেরি রেডি দাসী। পূজোয় তাদের কাপড়চোপড় কিছুই হয় নি। মেরি তার ভাইকে বলে,—"আমার মা বলেচে, এবার মার বে-র সময় আমার পোষাক হবে, তোমার কিছু হবে না দেখো।" মণ্টোকৃষ্ট ঠাকুর দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে প্রাণপ্রিয়বাবু ভাবেন, -'দেশে কি ঘোর কুসংস্কারের হাওয়া প্রচলিত হচ্ছে! এই শিশুকে এর মধ্যে স্পর্শ করেছে।" মণ্টোকে তিনি বল্‌লেন,—"ঠাকুর কই! ছ্যা—চল বিস্কুট কিনে দিই গে।" পূজোয় কলকাতার রাস্তায় নানারকম ব্যাপার চল্‌তে থাকে।

গবেশের বাড়ীতে পূজো। ভট্টাচার্যমশায় কলা-বৌকে সকালে স্নান করাতে নিয়ে যাবার সময় গণেশও সঙ্গে যেতে চাইলেন। কলা-বৌকে গণেশ নিজেই ঘাড়ে নিয়ে চলেন। ভট্টাচার্য আপত্তি করতে গেলে গণেশ বলে ওঠেন,—"না হে ভট্‌চাজ, বোঝো না। শুনিচি, গঙ্গার পথে অনেক বদমাইসি হয়ে থাকে। বিশেষ তরুণী কামিনী প্রভাতের ঘোরে একা আস্‌তে দেওয়া অসমসাহসিকতা। সঙ্গে এলুমই বা! কত তাবড় তাবড় হয়ে যাচ্চে। আমি তো স্ত্রীকে কাঁধে করেচি।"

গবেশবাবুর চণ্ডীমণ্ডপ। কাম ইত্যাদি ছয়টি রিপুর চিত্রাঙ্কিত চালচিত্র। মানিনীর মতো দুর্গা বসে আছেন। পায়ের কাছে মহিষাসুর—তার হাঁটুর ওপর কুকুর খেলা করছে। একপাশে সরস্বতী বিবি, কার্তিকবাবু, আর চস্‌মা চোখে লক্ষ্মীবাঈ, নীচে ঘুঘু আর মোরগ। অন্য পাশে আছেন গণেশ ঠাকুর -

কলা-গিন্নীর তলায় কলা হাতে করে বসে আছেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়ছিলেন। গবেশবাবু অধৈর্য হয়ে বলেন,—"ভট্চাযি মহাশয়! ওসব রেখে দিন। অনঙ্গ অঞ্জলি দেবে।" সত্যিই শেষে প্রতিমার সাম্‌নে অঞ্জলি এসে পড়ে—মদমেশানো বমি! পুরোহিত প্রথমতঃ ইতস্তঃ করলেও পরে সবদিকে ভেবে চিন্তে তিনি গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। এদিকে সবার মাতলামি পুরোদমে চল্‌তে থাকে।

হঠাৎ খবর আসে, যাত্রাওয়ালারা এসে পৌঁছিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিলো, তারা সব কিছু ফেলে রেখে যাত্রাওয়ালাদের কাছে ছুটে যায়। "তারার পুনর্বিবাহ"—না "সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক" যাত্রার অভিনয় কাদের হাটে দুর্গাপূজোকে সার্থক করে তোলে।

বোধনে বিসর্জ্জন কলিকাতা—১৮৯৫ খৃঃ)—অহিভূষণ ভট্টাচার্য (মানিকতলা)। পূর্বোক্ত প্রহসনের অনুরূপ অনাচারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই প্রহসনটিতেও। তবে সাংস্কৃতিক বিচারে কিছুটা পার্থক্য আছে।

কাহিনী।—মদনবাবু অর্থপিশাচ বাঙ্গাল জমিদার। সম্ভবতঃ তিনি নিরক্ষরও। দেওয়ান অর্থাৎ প্রধান কর্মচারীর কাছ থেকে প্রজাদের দরখাস্তের বিষয় জেনে নিচ্ছিলেন। কোন্ মৌজায় ভীষণ জলকষ্ট। তারা চায় একটা সরকারী জলাশয়। তারা নাকি বলেছে এর জন্যে তারা বাড়তি কর দিতেও প্রস্তুত। জমিদার বলেন,—"তুমি প্রজাগর ডাহাইয়া কইয়ে দাও, এবার অইতে প্রত্যেক টাহার আষ্ট আনা হিসাবে করবৃদ্ধি স্বীকার কইরে কবুলতি রেজেষ্টরী করে দেয়, তারপর আগামীতে ঐ সকল গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করা যাইবে।" জানা যায় গত বছর পরতাল জরিপের সময় এক নিঃসহায় ব্রাহ্মণ বিধবার ব্রহ্মোত্তর জমি তিনি মালভুক্ত করে নিয়েছেন। কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ মালভুক্ত জমি ফাঁকি দিয়ে ব্রহ্মোত্তর করে রেখেছিলো।

জমিদার এদিকে আবার পালপার্বণ ইত্যাদিও যথা নিয়মে করে নিজের ধর্মকর্মের পরিচয় দেন। তবে সেটা নামেই ধর্মকর্ম। আসলে তাতে অধর্মের কাজই বেশি হয়। আনুষঙ্গিক আমোদের জন্যেও প্রজাদের কর বৃদ্ধি করে খরচ যোগানো হয়। দুর্গাপূজা আসন্ন। প্রজারা একটা দরখাস্তে জানিয়েছে যে তাদের আমোদের দিকে এবারে পূজোয় যেন একটু লক্ষ্য রাখা হয়। সেজন্যে তারা বরং কর একটু বেশি দিতেও রাজী আছে। মদনবাবু দেওয়ানকে

বলেন,—প্রজারা দেয় দিক—তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু পূজোর সাবেকী খরচা যেন বাড়ানো না হয়।

দেওয়ান গতবছরের পূজোর খরচ দেখায়। দেখা যায় তাতে,—পূজোর খরচ সর্বসমেত পাঁচ সিকা, আনুষঙ্গিক খেমটাওয়ালীর তিনরাত্রির দক্ষিণা দুইশো পঞ্চাশ টাকা, পুরস্কার ও খোরাকী—একশো টাকা, বন্ধুবান্ধবদের আমোদ প্রমোদের জন্যে আতর গোলাপ পানীয় ইত্যাদিতে—পাঁচশো টাকা। খরচ বাঁচাবার জন্যে দেওয়ান খেমটানাচ বাদ দিতে গেলে মদনবাবু বলেন,—"না, তা অইতে পারে না, ওটা আমার সখ করে রাহা, উহাগর করচ্‌টা ঠিক রাহা চাই। বরং পূজার খরচ অইতে কিছু কিছু কমাইতে পার।" থিয়েটারের প্রস্তাবে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলেন,—"অস, সে বালই কইচ। তাগর সাথে মাইয়ে মানুষ দেহা যায়। মাইয়ে মানুষের নিরত্যগীত আমার বড়ই মত্তর লাগে।" শেষে বাবু দেওয়ানকে বলেন, থিয়েটার পেলে ভালোই, নতুবা ভালো দেখে যাত্রার দল ও দুজন খেমটাওয়ালীকে সে যেন বায়না করে রাখে।

[ওদিকে কৈলাসে শিবের পরিবারে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। মর্ত্যে যাবার জন্যে সবাই তৈরী। কিন্তু শিব "ইন্‌ফ্লুইয়েঞ্জায়" কাবু হয়ে পড়েছেন। "কেলামেল" খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করছে। দুর্গা আসেন বিবির পোষাকে। তিনি শিবকে বলেন, কলকাতায় তার ট্রিটমেণ্ট করানো চলতে পারে। তবে তিনি নেশাখোর। হোমিওপ্যাথি চল্‌বে না। শিব যদি নেহাৎ না খায়, তাহলে তিনি ডি. গুপ্ত মিক্‌শ্চার কিংবা "বিজয়াবটিকা" এনে দেবেন। দুর্গার মাথায় গালকের টুপি ইত্যাদি দেখে শিব অবাক হলে দুর্গা যুগ-পরিবর্তন ও যুগরুচির দোহাই দেন। বলেন, শিব বাইরে থাকেন, এ সব কি করে জানবেন! দুর্গা পরামর্শ দেন—শিব যেন মদনবাবুর বাড়ী যান। কুপথ্য খাওয়ার চেয়ে উপবাসে শরীর বাঁচবে।

সরস্বতী আসে। দুর্গার মতোই আধুনিক বিবির পোষাক। দুর্গা কলকাতায় যাবেন, সেও কলকাতায়ই যাবে। অবশ্য যাবার কারণ আছে। মফঃস্বলে 'নিরেট বাংলা' কথা শুনতে তার ভালো লাগে না। তাছাড়া সে একজোড়া গাউন করাবে। "বাঙ্গালীর দোকানের জিনিষ Young Bengal-রা লাইক্‌ করে না। কাজেই চৌরঙ্গির ইয়রোপিয়ান টেলার্সদের কাছে ফরমাস মত মাপ দিয়ে তৈয়ার করে নিতে হবে।" তাছাড়া হার্মোনিয়াম, পিয়ানো ইত্যাদি কিনতে হবে। বীণাটাও থরো রিপেয়ার করতে হবে। অর্থাৎ কলকাতা ছাড়া

তার চল্‌তে পারে না। আর একটা প্ল্যানের কথাও সে বলে। বৈকুণ্ঠে স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে সে আন্দোলন করছে। একটা 'লেডি স্কুল'' স্থাপনের চেষ্টা করছে। ওখানকার কাগজে সে এ নিয়ে লেখালেখি করেছে। কলকাতাতেও এজিটেশান চালাবে এবং সেখানকার কাগজগুলোতে কিছু প্রবন্ধ দেবে।

কার্তিক এতোক্ষণ ব্রুশ দিয়ে চুলপাট করে তারপর জুতোয় ক্রিম লাগাচ্ছিলো। তারপর চা খাওয়া শেষ করে শিবের সঙ্গে দেখা করতে এসে এমন জোরে হ্যাণ্ডসেক্ করে যে শিব উল্টে পড়েন। দাঁত ভেঙে মুখে রক্তারক্তি কাণ্ড। অবশেষে সামলিয়ে ওঠেন। শিবকে কার্তিক বুঝিয়ে বলে—এটা সভ্যতার অঙ্গ। কার্তিকও বলে,—"আমায় কলকাতা যেতেই হবে, সোনাগাছি, রূপোগাছি, মেছোবাজার, হরিবর্দ্ধনের গলি আরও দু এক স্থানে না গেলেই নয়।" কার্তিক কিছু জিনিষও কিনবে—তার ফিরিস্তি দেয়। যথা টাউএল, সিল্কের রুমাল, প্রসাধন দ্রব্য, চুরোট্, বিলাতী কোম্পানীর পাম্প শু, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি। সে বলে,—"ব্রাহ্মসভায় যাবার জন্য গত বৎসর একখানা চস্‌মা কিনেছিলাম, তার দাম এ পর্য্যন্ত বাকী।"

গণেশের ইচ্ছে—সে কোথাও যাবে না। কেননা কলকাতায় গেলে চিড়িয়াখানায় তাকে ধরে রাখ্‌বে। মদনবাবুর বাড়ী গেলে তার ইঁদুরটাই না খেয়ে মারা যাবে। অবশ্য আর একটা কারণ আছে! তার স্ত্রী কলা-বৌ অন্তঃসত্ত্বা। 'থাঁড়বাল' কেবল যখন গজাচ্ছে, তখন শিবের ষাঁড় তা মুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে, তাই তার খুব যন্ত্রণা। কিন্তু তারপরেও, খাম আঁটতে আঠার দরকার পড়ায়, কার্তিক এসে কলা-বৌয়ের বুকের খোল ফাটিয়ে তার থেকে আঠা বার করে নিয়েছে। কলা-বৌয়েরও কোথাও যাবার উপায় নেই। তবে কলা-বৌ সরস্বতীর ট্রেনিংয়ে থেকে বিলিতী আদবকায়দা অনেকটা শিখে নিয়েছে। সে এসে শ্বশুরদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে, এবং সাম্‌নেই একটা বিলিতী ড্যান্স দেয় সরস্বতীর সঙ্গে অবশেষে সে বলে, কলকাতা হলে সে বরং যেতে পারে।

ষাঁড়কে নিয়েও মুস্কিল। তার পায়ে ঘা হয়েছে। তবে নন্দীর টোট্‌কার গুণে ঘা সেরেছে। নন্দী কোথা থেকে জেনে এসেছে যে, সাতজন মেয়ে বেচা বামুনের নাম অশ্বত্থ পাতায় লিখে ষাঁড়ের গলায় ঝুলিয়ে দিলেই ঘা সারবে। নন্দী ঘটকের কাছ থেকে সাতজনের নাম জেনেছে। সে বলে,—"বল্‌তে কি বাবা, নামগুলো লিখে যেই ষাঁড়ের গলায় বেন্ধে দিয়েছি, অম্‌নি পোকাগুলো

বিল্ বিল্ করে বেরিয়ে পালাতে পায় না। হাঁ বাবা, ওরা কি এতোই মহাপাপী।"

অসুর চায় একটু মদ আর মাংস। মদের সূত্রেই কার্তিকের সে খুড়ো। সে মদনের বাড়ী যেতে সম্পূর্ণ নারাজ। কারণ সেখানে তার সুবিধে হবে না। এক সাপই যেতে রাজী হয়। বলে, ছমাস উপোস করে সে দিব্যি থাকতে পারে। মদনের বাড়ীতে তার অসুবিধে হবে না।

শেষে স্থির হয়, দুর্গা যাবেন কলকাতায় গোকুল দার বাড়ী। সেখানে বিলিতী গয়না পরতে পারবেন। কার্তিক ও সরস্বতী দুইজনই যাবে সোনাগাছি। সেখানে তারা এনগেজ্‌ড। গণেশ আর কলা-বৌ যাবে নাটুদায়। অসুর কা-গাঁয়ে, সেখানে যথেষ্ট মদ পাবে শুধু সাপই যাবে মদনবাবুর বাড়ী।—ব্যাপার দেখে শিব হতভম্ব হয়ে পড়েন।]

এদিকে মদনবাবুর বাড়ী পুজোর যোগাড় চলে। দেওয়ান ফর্দ অনুযায়ীই পাঁচ সিকের মধ্যে জিনিস আনিয়েছে। মদনের মতে, গুরুবরণ বা পুরোহিত বস্ত্র ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয়, তাই এগুলো তার কথায় বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি দুঃখ করেন নর্তকীদের জন্যে দুটো বেনারসী পুজোর খরচা বাঁচিয়ে তার থেকে কিনে আনলে ভালো হতো।

মদনবাবু সংবাদ পেলেন—গুরুপুত্র বাড়ীতে পদার্পণ করেছেন। বাবু মন্তব্য করেন,—"লোকে বয় যে বাগাড়ে মরুই পড়লে ছুকুনীর মাতায় টনক নড়ে, এডা ঠিক কথা।" গুরুপুত্রের থাকবার জন্যে তিনি বাড়ীর একটা অনাবাস্য স্থান নির্দেশ করেন। দেওয়ানকে বলেন, তোষাখানার পাশের খালি ঘরে নর্তকীরা থাকবে।

পূজা আরম্ভ হবে। ইতিমধ্যে তিনি দারোয়ানকে দিয়ে মদ আনতে পাঠিয়েছিলেন। খোকা মদ কেড়ে খেয়ে নেয়। সে বাবাকে শাসিয়ে যায় যে বন্ধুদের জন্যেও নিজের জন্যে সে হুইস্কি নেবেই। বাপকা বেটা! এ সব নেশায় পুরোহিত তর্কালঙ্কার দোষ ধরেন না। স্মৃতির বিধান উল্লেখ করেন, "প্রাণান্তে পাতক নাস্তি।' মদনবাবু সান্ত্বনা পান। সুতরাং মদ আসে। মদনবাবু ব্রাহ্মণের সম্মানার্থে পুরোহিতকে একটু খেতে বলেন। পুরোহিত মৃদু আপত্তি জানিয়ে সবটুকু গলাধঃকরণ করেন। ডিম নাকি নিরামিষ। ডিম সিদ্ধ খেয়ে শুদ্ধ হয়ে পূজো করলে আর দোষ রইবে না। তিনি বলেন,—"প্রবৃত্তিরেষাং ভূতানাং"। যার যাতে প্রবৃত্তি তাতে দোষ নেই।

পুরোহিত এবং মদনবাবু উভয়েরই তখন মত্ত অবস্থা। ইতিমধ্যে এক হিন্দুস্থানী ভিখারিণীকে দরজায় আবিষ্কার করে তর্কালঙ্কার তাকে মদ খাওয়ালেন এবং নিজেও তার প্রসাদ খেলেন। তাকে আলিঙ্গন করে তিনি বলে ওঠেন—"এই আমার হবিষ্যান্ন।" মদন প্রসাদ চাইলে তর্কালঙ্কার তাঁকে ব্রহ্মস্বহরণের অপরাধ বুঝিয়ে সতর্ক করেন। খেমটাওয়ালীরা এসে পৌছোয়। উল্লসিত মদনবাবু বলেন—'এই আমার বোধন।" তিনি খেমটা নাচের ব্যবস্থা করতে বলেন। ইতিমধ্যে খোকা এসে দেওয়ানকে আদেশ দেয়,—খেমটাওয়ালীদের তার নিজের বৈঠকখানায় নিয়ে যেতে। পিতাপুত্রের দুরকম আদেশে দেওয়ান বিপদে পড়ে তবে পিতার আদেশই শেষে সে পালন করে। খোকার আদেশের কথা দেওয়ান মদনবাবুকে জানালে মদনবাবু বলেন — লয়ে আসছি আমি, টাকা দিব আমি কৌকাবাবু লইবার চায কিসের লাগিয়ে। খেমটাওয়ালীদের মদনবাবু মদ খাওয়ালেন। নিজে তারপর তার প্রসাদ খান। তর্কালঙ্কারকেও খাওয়ালেন। মদের পর নিষিদ্ধ মাংসের চাটও তর্কালঙ্কার নির্বিকারে ভোজন করেন। বলেন,—'কিছু দোষ নেই বাবা। ব্রহ্মার বাহনের ডিম, শিবের বাহনের পুত্র কার্তিকের বাহনের মিত্র অর্থাৎ মোরগ, এটাতেও দোষ হতে পারে না। কারণ 'ভক্ষয়েৎ তাম্রচূড়ক, তাম্রবর্ণ চূড়া হইলে বিদ্যুতে নয় এও শাস্ত্রেরই কথা বাবা, তারপর গঙ্গার কচ্ছপ, সমুদ্রের কাঁকড়া ও কচুবনের টিকটিকি সবই শুদ্ধ।'

ওদিকে খেমটা নাচ সুরু হল। উচ্চৈঃস্বরে ভগবান বলে—'হরে জগন্নাথ মহাপ্রভু! এবার রঙ্গরস দেখে আসিবেটি গোপাল জাতির গলা ধরব গলা।" নাচ দেখে মদনের নেশা বেড়ে যায়। তিনি আর পুরুৎঠাকুর দুজনেই নাচতে আরম্ভ করে দিলেন।

এমন সময় বদ্ধ মাতাল অবস্থায় হঠাৎ খোকা আসরে ঢোকে। খেমটাওয়ালাদের সে জড়িয়ে ধরলো এবং সেখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। মদনবাবু এসে বাধা দিলেন। বাপবেটায় মিলে খেমটাওয়ালী দুজনকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে দেন আসরের মধ্যেই। কেউই ছাড়বার পাত্র নন। শেষে খোকা মদনবাবুর মাথায় পুজোর ঘটটা তুলে আঘাত করে। ঘট উল্টে বিসর্জন সমাধা হলো, সেই সঙ্গে বলিদানও। তর্কালঙ্কার তখন ভিখারিণী মেয়েমানুষটাকে আগলিয়ে আছেন। সেদিকে খোকার নজর পড়তেই ভয়ার্ত কণ্ঠে পুরোহিত বলে ওঠেন,—"ব্রহ্মস্ব—গুরুপত্নী—মাতৃবৎ—আদৌ মাতা

গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী গাভী ধাত্রী। মাথায় গাঁট্টা খেয়ে তর্কালঙ্কার ভূতলশয্যা গ্রহণ করেন।

ওদিকে অচেতন অবস্থায় বমন করতে করতে মদনবাবু বলেন,— রূপং দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে। দণ্ডায়মান স্নাগত আওড়িয়ে চলে,— 'গুঁতং দেহি, জুতং দেহি আর মুখে কুকুরের মুতং দেহি।' চাকরকে সে বলে,—"যাবে ভগা, লাশ নিয়ে গোয়ালখানায় ফেলগে আর চল্লাম ... এরাই আবার সমাজের মাথা, দেশের মাথা হা ভগবান।"

এবারকার অল্পমজা, ত্রিদিন দুর্গাপূজা ১৮০৮ খৃঃ—নগেন্দ্রনাথ সেন॥ প্রহসনটি দুষ্প্রাপ্য হলেও তার সামান্য পরিচয় উদ্ধার সম্ভবপর হয়েছে। প্রকাশকালের আগের বছরে দুর্গাপূজো মাত্র তিনদিন স্থায়ী হয়েছিলো। পুজো। বিশেষ করে পাবার আমোদ প্রমোদকেই বড়ো ভাবে ধরা এবং খুব মনমরা হয়ে পড়া। প্রহসনটিতে দুর্গাপূজোর আমোদ প্রমোদের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। পুজোর সময় কিভাবে নিন্দু স্ত্রীরা কর্ম উপলক্ষে প্রবাসী স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় থাকে তারপর তারা এলে কিভাবে আনন্দের সাড়া জাগে। বাঙালী যুবকরা দলে দলে কুসঙ্গে পড়ে কিভাবে মদ্যপান করে এবং পুজোর নামে অন্যান্য কুরুচিমূলক আনন্দে কিভাবে যোগ দেয়—এর কতক চিত্রই প্রহসনকার এখানে উপস্থাপন করেছেন।

পুজোপার্বণকে কেন্দ্র করে রচিত আরও কয়েকটি প্রহসনের নাম পাওয়া যায়। যেমন, **দুর্গাপূজার মহাধুম** (১৮৮২ খৃঃ)—কৃষ্ণচন্দ্র পাল, **পূজাতে সাজা মজা** (১৮৮৩ খৃঃ)—বনমালী হাজরা ইত্যাদি। এগুলোর পরিচয় জানবার উপায় নেই।

(খগ) সাধারণ গ্রাম্য পরিবেশগত॥—

এঁরা আবার সভ্য কিসে? (ঢাকা—১৮৭৯ খৃঃ)—জয়কুমার রায়॥ মলাট পৃষ্ঠায় প্রহসনকারের কবিতাকারে মন্তব্য উদ্ধৃত আছে,—

"ফুলমধু আহরণ করে অলিগণে,
মক্ষিকা সতত রত ব্রণ অন্বেষণে
তেমনি সুজন করে গুণের আদর।
মূর্খজনে অন্য দোষে খুঁজে নিরন্তর॥"

ভূমিকায় লেখক বলেছেন,—"আজকাল পল্লিগ্রাম সমূহের বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। ঐক্যতা একটী মহোপকারী পদার্থ তাহা প্রায় অধিকাংশ পল্লিগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। কত যে বিষময় ফল উৎপত্তি হয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। যে উদ্দেশ্যে এই নাটক প্রণয়ন করা আবশ্যক বোধ হইল, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি কিনা, পাঠক মহোদয়গণের বিবেচ্য। দেশাচার দোষে পল্লিগ্রামে যে সকল গর্হিত কর্ম্ম ও লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটন হয়, তাহা দেখানই গ্রন্থ লিখার এক প্রধান উদ্দেশ্য।"

কাহিনী।—চন্দ্রপুর গ্রামে জমিদারদের দুই শরিকের মধ্যে দলাদলি সবদা লেগেই আছে। উত্তরপাড়ার দলে আছেন সুন্দরীমোহন, মতিলাল আর বসরাজ। এঁরা তিন ভাই। দক্ষিণপাড়ার দলের জমিদার হচ্ছেন রাজকিশোর এবং কৃষ্ণকিশোর। দক্ষিণপাড়ার দলটি গ্রামকে উচ্ছন্নে যেতে দিতে বসেছে। উত্তরপাড়ার দল এর প্রতিকার করতে গিয়ে বিরাগভাজন হয়েছে। দুই দলের মধ্যে মারপিট লেগেই আছে।

বসরাজবাবু আক্ষেপ করেন, গ্রামের মধ্যে—বিশেষ করে দক্ষিণপাড়ায় সর্বদা দাঙ্গাহাঙ্গামা, কুৎসিত আমোদ প্রমোদ, মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি লেগে থাকায় গ্রামটি নষ্ট হতে বসেছে। ব্রাহ্মণরাও পর্যন্ত অত্যন্ত অশ্লীল-ভাষী, ছেলেগুলোও এসব দেখাদেখি শিখ্‌ছে। বালক ও স্ত্রীলোকরাও বিভিন্ন রকম নেশা করতে আরম্ভ করেছে। গ্রামের স্ত্রীলোকরা অধিকাংশই ব্যভিচারিণী। তারা বেশ্যার মতো বেশবিন্যাস করে পথে ঘাটে পুরুষের অনুকরণে গান গায়। নিজেদের উপপতি নিয়ে পড়শীদের সঙ্গে সগর্বে আলোচনা করে। বসরাজের মতে,—"এদের চেয়ে বরং বারস্ত্রীরা অনেকাংশে ভাল। এদের মা ভগ্নীই উপপতি জুটিয়ে দেয়।"

উত্তরপাড়ার লোকদের দেখ্‌লেই দক্ষিণপাড়ার লোকরা মারে। এ পক্ষের স্বয়ং বসরাজ বিবাদ মেটাতে গিয়ে অপদস্থ হন। ও পক্ষের জমিদাররা যদিও বা একটু কম যান, মন্ত্রীরা সবদাই মেজাজ চড়িয়ে থাকেন। গোপাল বাগকে তারা অপদস্থ করেছে। ললিতকে প্রহার করেছে। উত্তরপাড়ার লোকদের মেরেও তারা ক্ষান্ত নয়, নিজেদের মধ্যেও তারা মারামারি করে চলে। কৃষ্ণমোহনবাবু সপার্ষদ মদ্যপান করছিলেন এবং হল্লা করছিলেন। পুরোহিত রামশরণ চক্রবর্তী এঁদের সঙ্গে ছিলেন। কী একটা কথা কাটাকাটিতে কৃষ্ণমোহনবাবু পুরোহিতকে প্রহার করে ধরাশায়ী করেন।

রামশরণ বলেন, উত্তরপাড়া ধর্ম মানে, তাতে কৃষ্ণমোহন মন্তব্য করেন,—"পুরুষের আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ? স্ত্রীলোকেরাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে মরে।"

স্ত্রীমহলে জগদম্বা সদুপদেশ দিতে গিয়ে অপদস্থ হন। পুকুর ঘাটে বাজে আলোচনা চল্‌ছিলো। পিসী-স্থানীয়া ভুবনেশ্বরী বলেন,—"আমরা যখন পীরিত করে'ছ, একজন নয়, পাচজন সাতজনকে সমানে রেখেছি।" তিনি অপবাদ দেন যে কালযুগের মেয়ে হয়ে এরা এতো বোকার মতো প্রেম করে। তিনি ভ্রষ্টা বালবিধবা বিনোদিনীর দৃষ্টান্ত দেন—সে নাকি চাঁড়ালকেও নাগর রেখেছে।—"দেখ্‌তো তবু সে কেমন বুক টান করে বেড়ায়—যেন কত বড় সাধ্বী সতী, সাবাস মেয়ে।" পুরুষদের যাতায়াতের পথে এ ধরনের আলোচনার জন্যে জগদম্বা তাদের তিরস্কার করলে তারা প্রতিবাদ করে। "আসুক না, পুরুষ লোক কি আমাদের খেয়ে ফেল্‌বে? আমাদের রঙ্গরসের দিন, রঙ্গরস করবো। যতদিন হাসবার হেসে নিই। বুড়ো হলে আমাদের হাস কে দেখ্‌বে, কে শুন্‌বে?"

রসরাজ বোঝেন, বুঝিয়ে দক্ষিণপাড়াকে ভালো করা যাবে না। সুতরাং শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। মতিলালের পরামর্শে এঁরা লাঠিয়াল সংগ্রহ করেন এবং অত্যাচারীদের ওপর মারধোর সুরু করেন, কারণ ইতিমধ্যে ওরা নাকি বলেছে উত্তরপাড়ার ওটা ধার্মিকতা নয় দুর্বলতা।

এবারে ও পাড়ার দল একটু বিচলিত হয়। পেশাদার সাক্ষীদের নিয়ে কৃষ্ণমোহন ফৌজদারীতে নালিশ দায়ের করেন। কিন্তু এতে কৃষ্ণমোহনবাবুরই হার হলো। তখন বাধ্য হয়ে কৃষ্ণমোহনবাবু অনুচরদের আদেশ দেন,—"বেটাদের যাকে যেখানে পারে, ধরে মারপিট্ট করবে।" এতে উত্তরপাড়ার জমিদার সুন্দরীমোহন ও রসরাজও তাঁদের অনুচরদের আদেশ দিলেন,—"যাও—এই একশত লাঠিয়াল সহ বিপক্ষদের প্রত্যেক বাড়ীতে যাও—যাকে পাবে, অমনি ধরে মার-পিট্ট করবে। স্ত্রীপুরুষ ভেদ রাখিও না।"

এতে দক্ষিণপাড়ার বীরত্ব অনেকটা কমে আসে। তারা আবার ফৌজদারী নালিশ আনে উত্তরপাড়ার বিরুদ্ধে। দারোগা ঘুষ খেয়ে রিপোর্ট লিখেছে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়ে তদন্ত করায়। সুন্দরীমোহন, মতিলাল, রসরাজ—এরা আসামী-তালিকাভুক্ত হলেন। তবে লাঠিয়াল নিতাই আর মনিরুদ্দিনই প্রধান আসামী। মোকদ্দমায় জমিদাররা

ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু লাঠিয়াল দুজনের দুবছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড হলো। এঁরা তাদের ছাড়াবার জন্যে আপীল করলেন।

ইতিমধ্যে বিনোদিনীর স্বৈরাচারিতায় গ্রামের সকলে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কয়েকজন গ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষী একে জব্দ করবার সুযোগ সন্ধান করে বেড়ায়। সুযোগও মিলে যায় একদিন। সেদিন বিনোদিনীর ঘরে বিনোদিনী উপপতি কেশবকে নিয়ে ছেদো প্রেমালাপ চালাচ্ছিলো। বিনোদিনীর মা এসে কেশবকে অভাবের কথা জানিয়ে কিছু সাহায্য চায়। বিনোদিনীর মা কেশবের কাছ থেকে অর্থদোহন করে এবং পরিবর্তে বিনোদিনীর সঙ্গে কেশবের ব্যভিচারে সহায়তা করে। কেশব ইতিমধ্যে অনেক সাহায্য করেছে। এবারেও কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি সে বাধ্য হয়ে দেয়। বিনোদিনীর মার সামনেই দুজনের প্রেমালাপ চলে। এমন সময় উত্তরপাড়ার জমিদারদের কয়েকজন অনুচর এসে কেশবকে টেনে বার করে প্রহার দিতে আরম্ভ করে। শেষে তাকে আধমরা করে দূরে ফেলে দেয়। বিনোদিনী মনমরা হয়। তার অনেক লোক থাকলেও কেশবের ওপর তার একটু বেশি টান ছিলো। মেয়েরা বলে,—"মাগী কি বেহায়া, নিজের জাত মেরেছে। এমন মাগীকে ঝাটা মেরে, কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করে দিতে হয়।"

ক্রমে ক্রমে দক্ষিণপাড়ার ভাগ্যবিপর্যয় সুরু হয়। আপীলে কৃষ্ণমোহনের হার হলো। লাঠিয়াল দুজনে খালাস পেলো। বাড়ীতে ঢুকে মারপিট করেছে বলে পুরোহিতরা তাদের সমাজ থেকে তাড়িয়ে একঘরে করেছেন। তাঁদের পুরোহিত রামশরণ চক্রবর্তীও তাদের বিপক্ষে। পাশের গ্রাম কুসুমপুরের ব্রাহ্মণদের কাছে আবেদন করে জাতে উঠতে গিয়ে কৃষ্ণমোহনবাবুরা অত্যন্ত অপদস্থ হয়েছেন। তাঁরা ভাবেন, ভিন্ন গ্রামে গিয়ে অপদস্থ হওয়ার চেয়ে স্বগ্রামে তোষামোদ করা ভালো। অনুচরদের মধ্যেও দুঃখ দুর্দশা ঘনিয়ে আসে। তখন কৃষ্ণমোহনবাবু পরাজয় স্বীকার করেন। উত্তরপাড়ার কাছে দক্ষিণপাড়ার হার হল। গ্রামও দুর্দশার কবল থেকে অনেকটা মুক্ত হলো।

সাধারণ গ্রাম্যপরিবেশকে কেন্দ্র করে আরও অনেক প্রহসন রচিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ প্রহসনেরই পরিচয় বর্তমানে লুপ্ত। কয়েকটি প্রহসনের শুধুমাত্র নামই পাওয়া যায়। যেমন,—**পাড়াগাঁয়ে একি দায়?** (১৮৬২ খৃঃ) রমানাথ ঘোষ, **পাড়াগেঁয়ে একি দায়, ধর্ম্ম রক্ষার কি উপায়** (প্রকাশকাল অনিশ্চিত)—লেখক অজ্ঞাত, ইত্যাদি।

(খঘ) মিউনিসিপ্যালিটি ॥—

সাধারণ নির্বাচন ঘটিত শাসন সংস্থা—বিশেষতঃ যা আঞ্চলিক তথা প্রত্যক্ষ, তাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ এসব ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিরোধ একদিকে যেমন তীব্র অন্যদিকে তেমন প্রত্যক্ষ। মিউনিসিপ্যালিটি সংস্থাটি অনুরূপ ক্ষেত্রে গঠিত হয় বলে মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। পারম্পরিক সাংস্কৃতিক বিরোধের ক্ষেত্র ছাড়াও রক্ষণশীল পক্ষ থেকে নব্য নাগরিক সংস্কৃতি-নির্ভর মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধেও দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। প্রহসনের অভিনয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাগরিক সংস্কৃতির আওতাতেই ঘটেছে। এসব ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বিরোধগত সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ কমিশনার নির্বাচনে দুর্নীতি, কমিশনারের দুর্নীতি ও অত্যাচার, নির্মম ট্যাক্স আদায় অথচ পরিবর্তে কর্তব্যে নিষ্ক্রিয়তা—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে প্রসঙ্গ করে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ সংগঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণ যতোই থাকুক, কিছুটা বাস্তব সত্য থাকা অসম্ভবপর নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমিশনারদের কেন্দ্র করে রচিত কয়েকটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। বৈষ্ণব চরণ বসাকের 'বিশ্বসঙ্গীত' গ্রন্থে (১২৯৯ সাল) স্থানপ্রাপ্ত ভোটপ্রার্থী কমিশনারদের উদ্দেশ্য করে রচিত গানটি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলে কমিশনারদের প্রতি সাধারণ ব্যক্তির মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে।—

"দেশের ভাল হবে বলে মিলায়ে সকলে
আদর করে কল্লেম কমিশনার,
তার রাখ্‌লে খুব ধম্ম, কল্লে উচিৎ কম্ম,
এখন ফিকির আটছ গলায় ছুরি দিবার।
তখন কাচা দিয়ে গলে, 'আমায় ভোট দাও' বলে,
দ্বারস্থ হ'য়েছ দ্বারে দ্বার,
এমন বাঁচি গেছে উলে, সকল গেছ ভুলে,
দেখ্‌লে যেন চিন্‌তে পার না আর।
করে গরীবকে পেষণ, শুষ্ককে শোষণ,
সেই রক্ত উঠা ধনের এই কি ব্যাভার।

ওহে তিলকাঞ্চন হ'লে, অনায়াসে যা চলে,
কর বৃষোৎসর্গ ! পেয়ে পরের ভাঁড়ার।"

তাছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মিউনিসিপ্যালিটির এবং কমিশনারদের সাধারণ গতিবিধিকে প্রসঙ্গ করে প্রচুর সাধারণ মন্তব্য আছে। বলাবাহুল্য ব্যক্তিগত আক্রমণ তো যথেষ্টই আছে।

ভোটমঙ্গল বা দেবাসুরের মিউনিসিপ্যাল বিভ্রাট (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)—মুদগরধারী হাস্যভূষণ (লেখকের প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। অনুরূপ নামে রচিত 'গিরিশচন্দ্র ঘোষের' প্রহসন—"ভোটমঙ্গল বা সজীব পুতুলো নাচ" প্রহসন নয়)॥ ভূমিকাতে অসঙ্গতি প্রকাশ করে অথচ সাদৃশ্য উপস্থাপিত করে ব্যক্তিগত আক্রমণের ভঙ্গিতে প্রহসনটি রচনা করা হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এক্ষেত্রে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে—কাহিনীতে কিছু পরিচিত পৌরাণিক চরিত্র মিশিয়ে।

কাহিনী।—স্বর্গরাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন হবে। দেবতার দল এবং অসুরের দল—দুই দলই বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। নারদ ভাবে এবার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানশিপ অসুররা নেবে—যাহোক, একটা মজা সে করবে। মতলব নিয়ে সে অসুরের কাছে দেবতাদের একটা চিঠি হাতে করে যায়। ইন্দ্র লিখেছে,—তাঁর ইচ্ছা,—"দেবাসুরের বৈরিভাবের পরিবর্তে একতা ও রাজোন্নতি বিষয়ে পরস্পর একটি চিরশান্তি স্থাপন হয়।" ঐ কাজের জন্যে একটা বারইয়ারী পূজো হবে আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ। অসুররা যেন সবান্ধবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। চিঠি দিয়ে নারদ বলে, আনন্দ বাজারে পূজো হবে। দেবপক্ষের পুরোহিত ঐ পূজো করবে। নারদ দুই পক্ষের পুরোহিতের কথাই নাকি বলেছিলেন, কিন্তু দেবপক্ষের পুরোহিত বৃহস্পতি অসুর পক্ষের পুরোহিত শুক্রাচার্য সম্বন্ধে কটূক্তি করে তাঁর যোগ্যতার প্রশ্ন তোলেন। শুক্রাচার্য একথা শুনে বৃহস্পতিকে গালাগালি দেয়। বকাসুর স্থির করে, আগের দিন সকাল-সকাল খেয়ে একসঙ্গে রওনা হবে, তারপর দেখবে "কার ছেলে কত ভাত খায়।" বদরাগী কলিকে হাতে রাখা ভালো মনে করে নারদ কলির কাছে যাবে—একথা শুনে, নারদকে কলিরাজের কাছে তার নাম করে দুশো লেঠেল এবং তাঁর ছেলে হুতুমকে চাইবার কথা বলে।

এদিকে আনন্দ বাজারে বারইয়ারী ব্রহ্ম প্রতিমা পূজো হচ্ছে। পুরোহিত

বৃহস্পতি বলে চলেন,—ইন্দ্র বলে,—"স পরিবারস্য স দেবাস্য শুভ কর্মার্থায শুভ মিউনিসিপ্যালিটির কার্য নিষ্পন্নার্থায় বারোয়ারি পূজা করিষ্যামি।" বাজনা বাজ্‌ছে—পূজো চল্‌ছে। এমন সময় চারজন দারোয়ান এসে পুরোহিতকে উঠিয়ে দেয়। বলে, যুবরাজ হুতুমের মানা আছে আরও বলে,—"শনি মহারাজ, অসুররাজ গজোদরবাব আউর কলিরাজ আকে উনকো সেলাম দেওতা হ্যায়।" অসুরদের পুরোহিত আসবে, সেই পূজো করবে। এমন সময় শশধর বেগে ছুটে এসে সব শুনে বলেন,—হুতুমের আদেশে বন্ধ—গজোদরের ক্ষমতা' চীৎকার করে বলে ওঠেন—"কে আছিস টাকে ধর।" দারোয়ানরা পালায়। বৃহস্পতি আবার পূজোয় বসেন।

ওদিকে ভোট পাওয়ার জন্যে অনেকেই ভোটদাতাদের সাধ্যসাধনা করছে। ঋষিবর নবমঙ্গল তার বন্ধুদের বলেন,—হুতুম আর ইন্দ্র দুজনেই এর কর্তার কাছে এসেছিলো ভোট চাইতে। হুতোমবাবু বাড়ের কত্ত কে ডাকিয়ে একখান বনাত, পাঁচশটে টাকা নগদ, আর আমার হাসচাঁদকে একখানা খেস না দোশালা কি বলে আর এক জোড়া সিমলের জুতো দিয়ে ভোট দেবার জন্যে কাকে কবুল করে নেচেন। বাবু ভাই আমার হাসচাঁদকে বড্ড ভালবাসেন।' নারদ আর স্থানে স্থানে ভোটের ঢেঁড়া পেটায়, এবং জনান্তরে হুতুমের জন্যে প্রচার চালায়। ঢেঁড়া পেটাবার সময় এক বুড়ি এসে নারদকে বলে, তার ট্যাক্সটা যদি কমিয়ে দেয় নারদ বলে হুতুমকে ভোট দিক, আর জোয়ান ছেলেকে তার কাছে পাঠিয়ে দিক, তাহলে আর তাকে কাপড় বেচে খেতে হবে না।

বৃশ্চিকের ইচ্ছে, শনির মত হলেই গজোদরবাবুর জয় হয়। শনি বলে, দেবতারা যতোই অন্যায় করুক, দেবতারা তার পর নয়। এতে শনিপুত্র কর্কট চটে যায়। বলে, –'Revenge - Revenge'! প্রতিহিংসাই এর প্রধান দুষ্টযোগ' শনি রেগে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে চান। ছেলে বলে,—এক ছেলে এজমালীতে পাবেই বা কি? তার চেয়ে শ্বশুরের পক্ষে যাওয়াই ভাল।

সেকেণ্ড ওয়ার্ডের যবনপল্লীতে নেমক হারাম গাজীর কুটীরে রাত দুপুরে শিখিগোপ ভদ্রবল্লভ ইত্যাদি এসে কড়া নাড়ায়। সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় গাজী তিক্তমুখে বাইরে আসে। ঠাকুরপুত্র করিমচাচা ভোটের কথা জানিয়ে গজোদরবাবুকে ভোট দেবার জন্যে অনুরোধ করে। গাজী বলে, সে শশধর-বাবুকেই শুধু দেবে। দ্বিজ ডাংফডং বলে, ভোটটা কালপেঁচাকেই দেওয়া

আজেবাজে লোকের খাওয়া দাওয়া চলে। ভোটমঙ্গল গান হয়। ফকিরদের গান হয়। গান শেষ করে সবাই ঘড়া-বস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে বিদায় হয়। মেয়েরা ভোটমঙ্গল গান করে।

প্রথমেই মন্দির ভাঙবার তোড়জোড় চলে। বৃহস্পতি খবর পেয়ে রমজান প্রভৃতি লেঠেলদের নিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। মজুরদের নিয়ে গজোদর কবিমচাচা মন্দির ভাঙবার জন্যে মন্দিরের সামনে এসে হাজির হয়। হঠাৎ বৃহস্পতির লেঠেলরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধোর করে। গজোদরের দল পাহিত্রাহি চীৎকার ছেড়ে পালায়। কক্ষবাদ্য করতে করতে নাবদ আনন্দ করে।

গ্রাম্য-বিভ্রাট (১৮৯৮ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু। পূর্বোক্ত প্রহসনের অনুরূপ দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হলেও বর্তমান প্রহসনে রক্ষণশীল পক্ষীয় সাংস্কৃতিক আক্রমণের দিকটি অনেকটা মুখ্য। অবশ্য পূর্বোক্ত প্রহসনের তুলনায় ব্যক্তিগত আক্রমণও কিছু কম

কাহিনী।—ম্যাড়াপাড়া গ্রামের বিজয়, উপেন, সত্য, নেপাল—এরা সব হুজুগের মধ্যে সবদা থাকতে ভালোবাসে। গ্রামে একটা লাইব্রেরী তারা করেছে। হরিসভার মিটিংয়ে এরা উদ্যোগী, আবার ব্রহ্মসমাজের মিটিংয়ে এদের মাতব্বরী করতে দেখা যায়। এদের মুখে বড়ো বড়ো বুলি। বিজয় উকিল, সত্যচরণ ডাক্তার। নেপাল জাতে জেলে হলেও হালে বাবু হয়েছে। সকলেই দেশের কাজের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ম্যাড়াপাড়া গ্রামকে তারা কলকাতার মতো করে তুলবে। এদের মধ্যে মানিক বলে একজন মাতাল আছে। সে স্পষ্টবাদী এবং তার মনও ভালো সে মাঝে মাঝে বন্ধুত্বের সূত্রে তাদের কাজে টিপ্পনী কাটে। তবে লাইব্রেরীর অনারারী সেক্রেটারী গোপাল এদের মধ্যে আন্তরিক কর্মী হলেও দলের কথাতেই চলে।

এরা সব লাইব্রেরী ঘরে বসে নানান হুজুগ নিয়ে আলোচনা করছিলো। এমন সময় হাবুলের একটা টেলিগ্রাম আসে। ম্যাড়াপাড়ায় মিউনসিপ্যালিটি হবে। শিগ্‌গিরই ম্যাজিস্ট্রেট আসবে। খবর পেয়ে সকলে Local Self Government, Liutenant Governor, Viceroy এবং Queen Empress-কে Three cheers দেয়।

চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে। পরাণ চৌকিদার ম্যাজিস্ট্রেটের খোরাকের

জন্যে গরুবাছুর আর মুরগী খুঁজে হয়রান্। রমানাথ স্মৃতিরত্ন মনে মনে হাসেন আর বলেন,—"গ্রামে মুন্সিপাল হবে, একেবারে সব আহ্লাদে আটখানা।… এরপর যে আহ্লাদ বিরিয়ে যাবে, তা বুঝছেন না।…টেক্সর জ্বালায় যখন হাড়ের ছাল ছাড়াবে, তখন বুঝতে পারবেন।" স্মৃতিরত্নকে এরা একটা প্রশস্তিবাচক কবিতা লিখে দিতে অনুরোধ করে, কারণ Right Loyal Reception দেখাতে হবে। স্মৃতিরত্ন বলেন,—"ভায়ারা, খাল কেটে গাঙের কুমীর ঘরে আন্‌ছো।" মিউনিসিপ্যালিটির স্বরূপ বুঝিয়ে দেন তিনি। "নিজের জমী, নিজের ইট, নিজের চূণসুরকী, নিজের কাঠ, নিজের টাকা কিন্তু ছটিমাস টেক্স আপীশ আর ঘর,—সাধ্য কি যে একখানি ইটের উপর আর একখানি ইট বসাও, যতক্ষণ পেয়াদা সাহেব না হুকুম দেন।" Sanitation এ কলকাতার দুর্গতির কথা বর্ণনা করে স্মৃতিরত্ন বলেন,—মিউনিসিপ্যালিটিতে ময়লাও বাড়ছে, দুর্গন্ধও বাড়ছে, রোগও বাড়ছে। বরং হিন্দুশাস্ত্রের Sanitation-এর তিনি গুণগান করেন। Sanitation এর কথায় হেরে গিয়ে উপেন তখন Local Self Government-এর কথা তোলে। এর মধ্যে নাকি গভীর Politics আছে, ইলেকশন, পোলিং, ভোটিং ইত্যাদি অনেক ব্যাপার। স্মৃতিরত্ন বলেন, মেদিনীপুরের এক ভোটাভোটিতে তিনি লাঠালাঠি দেখে এসেছেন। নবাবপুরের সিঙ্গীদের ভোট নিয়ে ঝগড়া হয়—তারপর বিষয় ভাগাভাগী—এখন মোকদ্দমায় নিঃস্ব। দক্ষিণপাড়ার মুখুজ্যেদের দুই বাড়ীতে ভোটের ঝগড়ায় পরস্পরের অশৌচ নেওয়া বন্ধ হয়েছে। স্মৃতিরত্ন বলেন,—"আমাদের এ গ্রামের ভিতর ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পর্যন্ত পরস্পরে বেশ মিল্‌জুল্ আছে, সক করে ঝকড়া বিসম্বাদের বীজ এনে কেন গ্রামখানিকে ছারখারে দেবে।" এরা তখন বলে, এরা নাকি নিঃস্বার্থ পরোপকারী, ঝগড়া বাধবার কোনো আশঙ্কাই নেই।

গ্রামে পলিটিকসে হাতে খড়ি নিতে হবে। তাই পোলিটিক্যাল মাষ্টার ই. এফ্. ম্যাকপোল আসে। সেই সঙ্গে আসে পোলিটিক্যাল গুরুমশায় পীতাম্বর। পাঠশালা বসে যায়। ছাত্ররা পড়ে,—"চেরেকে চার, ইলেক্ট হলেই পগার পার। একে শূন্যি দশ, সেয়ানা ছেলে আপন গণ্ডা কস, সেলামে সরকারের পো বশ।" গুরু বলেন,—

"এ পোলিটিকাল বিদ্যে নয়কো বড় সোজা।
কড়ায় গণ্ডায় চলে নাকো দিতে হয় গোঁজা॥"

তারপর গুরুমশায় চাণক্য শ্লোক আবৃত্তি করেন,—

"সাহেবঞ্চ বাঙ্গালিঞ্চ নৈব তুল্য কদাচনঃ।
সাহেব দদাতি থাপ্পড়, বাঙ্গালী হধে খাদতিঃ॥
শ্বেত-চর্ম্ম-বর্ম্ম সাহেবঞ্চ রক্ষতে সর্ব্ব বিপদে।
কৃষ্ণ চর্ম্মাবৃত প্লীহা ফাটন্তি চ পদে পদে।
পর্ব্বতে রাজতে গোরা, পীড়িত পুষ্প সৌরভে।
ড্রেনাঘ্রাণে বর্দ্ধিত অঙ্গ, শ্রীমুন্সিপাল গৌরবে॥"

গুরু উপদেশ দেন,—"বরাবর মনে রেখো, যে কলিযুগে গৌরাঙ্গই দেবতা, কৃষ্ণকান্ত যতই বড় হউন, তিনি উপাসক মাত্র। এ ছোটবড় নাই, সাহেবের মহেশ্বর থেকে মাকাল পর্যন্ত, আর দুর্গা থেকে বনবিবি পর্যন্ত সব বড় ঠাকুর, বর দিতেও পারেন, শাপ দিয়ে ভস্মও করতে পারেন, আবার নীচু ঠাকুরের শাপটাই কিছু বেশী জাগ্রত। পণ্ডিত হও, স্বাধীন হও, হাকিম হও, যা কর, ছোট বড় কোন ঠাকুরটিকে অমান্য কর না, বেশ করে পূজা কর।" তিনি আরো বলেন,—"কি জান, এই পোলিটিকাল বিদ্যার মধ্যে সেরা বিদ্যা হচ্ছে সেলাম, তেল মাখান একরকম বিদ্যা আছে বটে, তা সে যখন কালেজে যাবে, পাঠশালের পক্ষে সেটা একটু শক্ত।" কোথায় কিভাবে সেলাম করতে হবে গুরুমশায় সেটা শিখিয়ে দেন।

এদিকে সুবিধাবাদী হুজুগ-সন্ধানী ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই কথা কাটাকাটি করতে করতে প্রায় মারামারি বাধিয়ে ফেলে। কার কৃতিত্বে মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে—এটার কথা বলতে গিয়ে সকলেই নিজের নিজের কৃতিত্বকেই জাহির করে। বিজয় বলে, তার লেকচারেই হয়েছে। উপেন বলে, সে মেমোরিয়েলে সই করিয়েছে, তাতেই হয়েছে। সাতা বলে, খবরের কাগজে না উঠালে কিছুরই দাম নেই। রিপোর্টারকে ঘুষ দিয়ে সে নাকি কাগজে উঠিয়েছে। এমন সময় নেপাল পাঠক এসে বলে, সেজদার জন্যে হয়েছে। কাগজে agitation-ই নইলে হতো না। নেপাল জাতে কৈবর্ত। বিজয় জাত তুলে কথা বললে ক্ষিপ্ত হয়ে নেপাল বলে ওঠে—"কৈবর্ত্ত তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল জাত, তা জান? আমরা বৈশ্য। বেদে আমাদের অধিকার আছে। ইচ্ছে করলে আমরা পৈতে নিতে পারি।" এরা প্রত্যেকেই বলে, সে নিজেই কমিশনার হবে। নেপাল বলে, তার সেজদা স্কুলের সেক্রেটারী, তাঁকে দিয়ে ছুটী করিয়ে সমস্ত ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেদের নিয়ে ভোট

ক্যানভাস করবে। এদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায় যে, ভোটের ব্যাপারে গ্রামে লেঠেলদের তৈরী রাখা হয়েছে। কলকাতার মেছোবাজার থেকে হাবসীও নাকি আনানো হচ্ছে। গোপাল মন্তব্য করে —"কলকেতার লোক সোডা-ওয়াটার, ছিপি খুললেই টগবগিয়ে ফুটে ওঠে তারপর সেই পুকুর জল, সেই পুখুর জল। এক হয় জান? এই ক'টা দিন বা একটু আদটু আবটি চলে, তা হাতাহাতির সাহস নাই, ঐ যা মুখে বলে, তারপর সেই ইলেকসন্ও চুকে যায় অমনি যে কে সেই, আসা যাওয়া, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ সব চলছে। আমাদের এখানে এই দেখে নিও, এই যা' বেগড়াবিগড়ী হল—এস এ জন্মে আর মুখ দেখাদেখি থাকবে না। হয়ত এই সূত্র ধরেই দু'তিন পুরুষ ধরে মোকদ্দমাই চলবে।"

গোপাল আর সত্য আলোচনা করে। গোপাল বলে,—'পৃথিবীর ভিতর যেথায় যাও, ছোট বড় যে জাত দেখ, সকলেই কিছু না কিছু আমোদ আহ্লাদ কচ্ছে দেখবে, খালি ও কাজটী নাই আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে। চালচলন বেড়ে গেছে লম্বা, কিছুতেই কুলোবার যো নাই, সব ই মুখটী যেন শিঁচিয়ে আছে।" সত্য বলে,—'বাস্তবিক! আমাদের পাড়ার ঐ হাড়ীরা আছে, এই আকালের সময়ও দেখেছি, তারা মেতে মন্দে নাচগান কচ্ছেই,—আর আমাদের ভিতর কি যে একটা অসন্তোষের হাওয়া এসেছে,—বাড়ীতে দুর্গোৎসব হচ্ছে—তাও বেজার।" গোপাল বলে,—'তা' এ গরিব বেচারাদের সন্তোষের গোড়ায়ও আমরা পোকা ধরতে বসেছি' এই গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি স্কুল বসান যাচ্ছে, যে ছেলেটা স্কুলে গেল সে আর জাত ব্যবসা কত্তে চায় না।" সত্য বলে, মিউনিসিপ্যালিটি হলে এদের আরও সর্বনাশ হবে।

বরদা আর তারিণী গ্রামের জমিদার। বাজনার অর পক্ষ অনেক করে ধরায়, তারা কমিশনার হতে রাজী হয়েছেন। স্মৃতিরত্ন এ খবর যুবক মহলে দিলে সত্য বলে, বরদাবাবুর পাঁচটা ইংরাজী কথা বলার ক্ষমতা নেই, কমিশনার হবেন কি? স্মৃতিরত্ন বলেন, গত বছর অনাবৃষ্টির সময় দশ পনেরো হাজার টাকায় বরদাবাবু সবার উপকারের জন্যে পুকুর কাটিয়েছিলেন। তাছাড়া, পাকা রাস্তা, স্কুল, ডিসপেন্সারী, লাইব্রেরী, অতিথশালা—এগুলোতেও তাঁর দান আছে। প্রথম improvement-এর সময় শাঁসাল লোক রাখাই দরকার। সত্য বলে, মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম দিকে improvement-এ টাকা অবশ্য দরকার। তবে বরদাবাবুদের কাছে চাঁদার জন্যে যাওয়া হবে। ড্রেন

আর ওয়াটার ওয়ার্ক্‌স এর ভার তারা নিন, ড্রেনেজ আর ওয়াটাব ওয়ার্ক্‌স-এ তাদের নাম যোগ করে দেওয়া যেতে পারে। স্মৃতিবত্ন তখন বিদ্রূপ করে বলে,—"কৃপা করে টাকা নিতে রাজী আছ, আর মোড়লী করবার বেলায় তোমরা নিজে।" নেপাল পাঁঠা স্মৃতিরত্নকে বলে,—"আপনারা বিদেয় আসটা পাও, তাই একান ওদের খোসামোদ করা অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি ঠাকুর একটু আমার হয়ে চণ্ডীপাঠ কর না হয় একটা ঘড়াটা আসটা দেওয়া যাবে।" ক্ষিপ্ত স্মৃতিরত্ন বলেন,—"ওর ঠাকুরদাদাও যে আমাদের বাড়ীতে মাছের ঝুড়ী মাথায় করে এনেছে — আমি তখন বালক। আজ দুবন্দ জমী হয়ে আর ভাগের খাপকান পর ... তোর এতদূর আস্পদ্ধা বেড়েছে! আমি বড় মানুষের মোসাহেব।"

হাটতলায় গোল সড়ক। পরাণ চৌকিদার ঢুলীকে সঙ্গে করে ঢ্যাড়া পিটিয়ে বেড়ায়।—"এবং সব হুসিয়ার,—হুকুম মহারাণীর—হুকুম মাজিষ্টর সাহেবের সব চলে চল,—চ'লে চল—হাটতলায় ইলিকসন্ হচ্ছে, গাঁয়ের যে যে বাবুকে কামিনীর সাঁড় করবে তাদিগ্‌গের বোঁট দেবে চল।" চাষীরা ভাবে আবার কি হয়েছে বলে বোধহয় ক সনের খাজনা রেহাত হবে। পরাণ তখন বলে,—"গাঁয়ের ইস্কিরি পড়া বাবুরা তোমার খোরাকের যোট কোরেছে ভাবিসনে। মস্কো গোল হচ্ছে বাবরা সব কামিনীর সাঁড় হয়ে জলের কল আনবে, গোপাল উড়ের সুরঙ্গ কেটে নদ্দামা বানাবে,—যত পারিস পেট ভরে খাস! খাজনার রেহাত হবে কি রে হেবলো? এই ইলিকসনটা হয়ে গেলেই পথ হাটের তার খাজনা দিতে হবেক, নাম হবে তার ট্যাকসো, মাঠে যাবি, তার দিবি ট্যাকসো, যাদ বছরে দুবার প্যাট ভাঙ্গে তাহলে ফেরার হবি, হাল গরু বিকিয়ে যাবে।" চাষীরা বলে,—"এ কামিনীর সাঁড় হবার আগেই দেখি আমাগোর বাবগুলো বলদে ষাঁড়ের একেল পেয়েছে।" চাষীরা বিরক্ত হয়ে নিজের নিজের কাজে চলে যায়।

এদিকে কমিশনার পদপ্রার্থী যুবকরা ভোট পাবার জন্যে নানা রকম পথ খোঁজে। বিজয় উকিল তার ভাগ্নে শ্যামাকে ঘোলাকামারের কথা বলে দেবে বলে — যেমন কোরে পারিস, ওকে আনবি হাতে পায়ে ধরবি, বাপান্ত দিব্য দিবি, খুনোখুনি হবি।" বিজয় বলে, তাকে ভোট দিলে সে বাকী খাজনার মোকদ্দমা বিনা খরচায় করিয়ে দেবে। বিজয় মনে মনে প্রার্থনা করে,—"জয় মা কালি! আমি মিছিমিছি ব্রাহ্ম - মিছিমিছি ব্রাহ্ম! আমায় কমিশনার

কর মা। আমি জোড় পাঁঠা বলি দেব, মুড়ী দুটো নেব না। মা কালী, যদি কমিশনর কোরে দিতে পার, আর সমাজে যাব না, না—না,—নিরাকার! নিরাকার! তুমি রাগ কর না,—আমি দুজনকেই মানি।”

এদিকে বিজয়কে দেখিয়ে দুজন জেলেকে নেপাল বলে,—“ওদিকে ঠিক করতে পারবি তো, তাহলে এক পয়সা নিতেম না,—তোদের অমনি কুলীন কোরে দিতেম।” একজন জেলে বলে,—“না লকত্তা, তার আর কাজ নেই, অই ল গণ্ডা টাকা যোগাড় কোরে দেব, তুমি তালুইকে জাতে তুলে দিও, তাহলেই ঢের হবেক। ও বিজোবাবু—উকীল মানুষ, ওনার সাথে লাগতে গেলে আবার একটা হাংনামা বেধে যাবেক।” তখন বাধ্য হয়ে নেপাল তাকে বলে, বিজয়ের দলের লোকদের দেখা পেলেই সে যেন লাঠি মারে। নেপালের আপন বোনাই গদাই পাজা। সে তার প্রজা নিয়ে নদী পেরিয়ে আসছিলো। সে নেপালকে ভোট দেবে না। নেপাল এক জেলেকে তাদের সবাইকে জলে ফেলে দেবার আদেশ দেয়। জেলেটি অমত করে। স্মৃতিরত্নকে মারবার আদেশ দিলেও বামুন মানুষ বলে সে অমত করে। বাধ্য হয়ে মোড়ল ভোলা ধামালকে আটকাবার আদেশ দেয়। নেপাল মনে মনে ভাবে,—“যদি একান্ত হেরে যাই, লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেব, হরিসভার ব্রহ্মসভার সব চাঁদা বন্ধ করে দেব।”

সত্যর আশা ছিলো, হাবুল কমিশনার হবে, কিন্তু হাবুলকে যথাসময়ে তার স্ত্রী ঘরে চাবি বন্ধ করে আটকে রাখলো। বাধ্য হয়ে হাবুলকে নাম উইথড্র করতে হলো। সত্য অকূলে পড়ে। ভাবে, বিজয় বা নেপালও যদি হারে, তাহলে ভালো হয়, নইলে ওদের অহঙ্কারে টেঁকা যাবে না এই সময় স্মৃতিরত্ন এসে খবর দেন, সাধারণের সঙ্গে পঞ্চায়েতে বসতে তাঁর মর্যাদা যায়, তাই তিনি তাঁর প্রজা লবধন মাঝি আর গফুর সর্দারকে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে সবাই তাদেরই ভোট দিচ্ছে। সম্ভবতঃ তারাই জিতবে। কমিশনার হলেই বাবু হতে হবে, এমন কোনো আইন নেই। সত্য বলে, তাহলে বাইরের লোক জানবে যে গাঁয়ে কোনো শিক্ষিত নেই। তখন স্মৃতিরত্ন তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। নেপালকে তিনি জব্দ করতে চান। লবধনদের চেয়ে নেপালের যতো আভিজাত্য, নেপালের চেয়ে তারিণীবাবুর আভিজাত্য আরও বেশি। সত্য সানন্দে স্মৃতিরত্নের পক্ষে চলে আসে।

উপেন নেপালের দিকে হয়েছে। উপেনের স্ত্রী নেপালের স্ত্রীর সই।

লিখে গেছেন। **মিউনিসিপ্যাল দর্পণ** (১৮৯২ খৃঃ)—সুন্দরীমোহন দাস—ইত্যাদি কয়েকটি প্রহসনের নাম করা যেতে পারে। বিবিধ ঘটনাকেন্দ্রিক পর্যায়ে আরও কয়েকটি প্রহসন উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(গ) বহু উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক।—

কতকগুলো প্রহসন আছে এগুলোর মধ্যে বিশেষ কোন একটি উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় নি, যদিও অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এগুলোর গোত্র নির্ণয় সম্ভবপর। এই ধরনের কয়েকটি প্রহসন উপস্থাপিত করা হল —

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য (কলিকাতা—১৮৮৭ খৃঃ)—হরিমোহন পাইন। (৩৯ চুনারিপুকুর লেন) প্রহসনটিতে একাধিক উদ্দেশ্য প্রকাশ পেলেও মূলতঃ রক্ষণশীল মতকে বরণ করা হয়েছে। কিন্তু পরিণতির কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে লেখকের উদ্দেশ্য অত্যন্ত জটিল।

কাহিনী।— জমিদার রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় আধুনিক। কন্যাকে শেলী কীটস, মিল্টন ইত্যাদি পড়িয়ে উচ্চ শিক্ষিত করেছেন। তিনি নিজে মদ খান কন্যাকেও মদ ধরিয়েছেন। বাগানে 'ফর্শিয়ার ornamental plants" লাগিয়েছেন। তবে তিনি তাঁর পিতার তাগিদে তার কন্যাকে নব্য শিক্ষায় অশিক্ষিত এক যুবকের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। রামকান্তের বন্ধু অবিনাশ অনুযোগ করে,—"এমন Educated girlকে একটা uneducated বটের হাতে সমর্পণ করা অতি অবিধেয়। Educated wife must have an educated husband ছিঃ রামকান্তবাবু, তুমি নিজে একজন Senior Scholar হয়ে এমন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করলে।" রামকান্ত বলে,—'এ বিয়েতে তার নিজের বিন্দুমাত্র হাত ছিলো না। ঘটক বলেছিলো পাত্র জাত্যংশে তাদের পরিবের ঘর। কর্তার ইচ্ছেতেই এই বিয়ে হয়। পাত্রকে ঘরজামাই রাখা হয় তারই ইচ্ছেতে "আজকাল দেখছো তো অবলা মেয়েকে শ্বশুর ঘরে গিয়ে কি কষ্ট সহ্য করতে হয়। একে তো বালিকা সংসারের কিছুই জানে না। তাতে শাশুড়ী বাঘিনীর ধমক ধামকটা কতদূর ভয়ানক। বাছার পিলে শুকিয়ে যায়। আবার কোন কোন ঘরে ধমক ধামকও পদে আছে, আনাগের বেটিরা বউ নিয়ে গিয়ে যেন বাছার চোদ্দ পুরুষের মাথাটা একেবারে কিনে নেয়, প্রহার পর্যন্ত দিতে ত্রুটি করে না। হামেশায় তো কাগজে

দেখ্‌তে পাচ্ছো।" তাছাড়া স্বামী যদি লম্পট বা মাতাল হয়, তাহলে তো মেয়ের যন্ত্রণার শেষ নেই।

কমলার কাছে Doctors, Pleaders, Barristers ইত্যাদির ভিড় সর্বদা লেগেই আছে। তাও তারা প্রথমেই তার দেখা পান না। আরদালীর হাতে স্লিপ পাঠিয়ে "সিটিংরুমে" অপেক্ষা করেন। তারপর যথাসময়ে আরদালীকে দিয়ে ডেকে পাঠান। রমেশ ডাক্তার প্রায় সারাক্ষণই কমলার কাছে থাকে। কমলার নানান ব্যাধি। সুতরাং এ বাড়ীর দৌলতে রমেশ ডাক্তারের আয় মন্দ হয় না। কমলা এইসব "Companion" এর সঙ্গে মদ খায়। মদের কথায় আনন্দশংকে রামকান্ত বলেন,—"শেখাবে আবার কে, আমার শ্যাম্‌পেনের কি অভাব আছে, তাই থেকে শুরু করে, এখন বোটির একশা না হলে চলে না।" তার জন্যে গিন্নী চটে বলেন,—"বুড় বয়েসে হচ্ছে বেশ। নিজে মাতাল, মেয়ে মাতাল, এইবার বাড়ির টিকটিকি আরসোলা পর্যন্ত মদ খাবে।" গিন্নী একটু অন্য ধরনের। উনি নেশা তো করেনই না। বরং দেবদ্বিজে তাঁর যথেষ্ট ভক্তি দেখা যায়। ঘর জামাই মতিলাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল আছে।

মতিলাল ভট্টাচার্য গরীব ভট্টাচার্য-বামুনের ছেলে। মোসাহেবী না কেরানীগিরি করবার চেয়ে ঘর-জামাইগিরিকে সে অনেকটা সুখের চাকরী বলে মনে করে। মাসে পঞ্চাশ টাকা হাত খরচ, তাছাড়া প্রত্যেক বছরে জামাই ষষ্ঠীর সময়, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, নতুন আংটি, কাপড়, উড়ুনী, মোজা, জামা ইত্যাদি তো আছেই। পঞ্চাশ টাকার মধ্যে ত্রিশ টাকা সে দেশে মাকে পাঠায়। তাতে সংসারের খরচ এবং ভাইদের ইস্কুলের খরচ চলে। এক বৈষ্ণব গুরুর কাছে মতিলাল দীক্ষা নিয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে আসেন, তার জন্যে দশ টাকা খরচ। বাকী দশ টাকা এবং জামাই ষষ্ঠীর পাওনা সব কিছু Saving Bank-এ জমা থাকে। মতি বলে, এক মাসে একবারই হোক কিংবা ছয়মাসে একবারই হোক কমলার দেখা পাওয়া যায়। "সেই রাতটা ঠাকুর ঠাকুর করে চাকরিটে বজায় রাখ্‌লে আর বাকী দিনের ভয় তো নেই।" কমলাই তার মনিব। অবশ্য কমলা স্বামীর অযত্ন করে না। "কমলি মাতাল হলে যখন কেউ থামাতে পারে না, স্বামীই তাকে থামায়।" মতিলাল কথা প্রসঙ্গে রমেশ ডাক্তারকে বলে, প্রথমে ঘর-জামাই বলে তাকে চাকর-বাকর গ্রাহ্য করতো না। "একদিন মনিবকে application করলেম যে আমি গরিব হই

আর আপনার Servantএর উপযুক্ত না হই, still আপনাকে Mrs. Bhuttacharyu বলে পরিচয় দিতে হবে। আপনি Mrs Chatterjee বলে পরিচয় দিতে পারবেন না। তা আপনার দশ টাকা মাইনের চাকর হয়ে যে পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরের উপর impertinency দেখালে এ অতি দুঃখের বিষয়।" কমলা step নেওয়ায় এখন ওরা সকলেই মতিলালকে ভয় পায়।

রমেশ ডাক্তারই মতিলালের ভাগ্য এভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই তার কাছে মতিলাল কৃতজ্ঞ। কিন্তু তবু রমেশ কমলার কাছে সবদা থাকে বলে তার দুশ্চিন্তা এবং ঈর্ষা—দুই-ই দেখা দেয়। রমেশ মতিলালকে বুঝিয়ে বলে, কোনো-রকম দুরভিসন্ধি নিয়ে সে কমলার কাছে থাকে না। একমাত্র রাইভ্যাল ডক্টর ছাড়া কারো সর্বনাশ করবার ইচ্ছে তার মনের অবচেতনেও জাগে না। তবে কমলাকে বুঝিয়ে সে বলবে, কমলা এমন কাজ যাতে না করে যাতে স্বামী কষ্ট পায়। মতিলাল রমেশকে কিছু বলতে বারণ করে—হয়তো ঘর-জামাইগিরির চাকরী চলে যেতে পারে। অবশেষে রমেশ আশ্বাস দিতে বাধ্য হয়, সে বলবে না।

রামকান্তের বন্ধু অবিনাশ রামকান্তের মেয়েকে দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। রামকান্ত বলে, দেখা পাওয়া সহজ নয়—তবে চেষ্টা করা যাক্। কমলাকে রামকান্ত চাকর দিয়ে সেলাম পাঠিয়ে কমলার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলেন। চাকর "ভোগে" এসে খবর দিলো,—"মহারাজ, তিনি engaged আছেন, বল্লেন half an hour after, ঘরে একজন ডাক্তার আছেন।"

অবিনাশকে নিয়ে রামকান্ত যথাসময়ে কমলার ঘরে ঢুকতেই "গুড্‌মার্ণং" বলে সম্ভাষণ জানিয়ে কমলা তার পিতাকে চুম্বন করে। রামকান্ত অবিনাশকে Uncle বলে পরিচয় দেয়। কমলা বলে, তার Companion এর অভাব নেই। Uncle-কে একটু বাজিয়ে নিতে হবে কেননা Companion হবার যোগ্যতাও থাকা দরকার। Companion নির্বাচন প্রসঙ্গে কমলা বলে,—"এখন Ceremony দেখা উচিত নয়, Cobler এর ছেলে হউন, যদি তিনি educated, well accomplished man হন, আর ভাল position hold করেন, তাকে লয়ে টেবিলে বসে অনায়াসেই খাওয়া যেতে পারে। আর stupid, indecent, illiterate ব্রাহ্মণ হলে কে তাকে chair দেবে?" কমলা ইংরাজী গান রচনা করতে এবং গাইতে পটু। অবিনাশকে সমজদার পেয়ে সে আনন্দিত হয়। কমলার compose করা একটা ইংরাজী গান

অবিনাশ খাম্বাজ ঠুংরীতে গাইলেন। তারপর Exshaw No. I মদ আসে। বাবা, মেয়ে এবং uncle—তিনজনে মিলে মদ খায়। হঠাৎ কমলা বিষম খেয়ে শুয়ে পড়ে ছট ফট করে। এদের ডাকে গিন্নী এসে ডাক্তার ডাকতে পাঠান। ডাক্তার এসে বলেন, এ মরে গেছে। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের ওপর চটে গিয়ে মতিলালকে দিয়ে রামকান্ত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আনেন। সেও এসে একই মত প্রকাশ করে। বলে, এরে আর বাঁচাবার উপায় নেই। মতিলাল গিন্নী ইত্যাদি সকলে কাঁদে। এমন সময়ে মতিলালের গুরু বৈষ্ণব আসে। শিষ্য মতিলালের কাকুতি মিনতিতে কাতর হয়ে গুরুদেব মৃত কমলার কানে হরিনাম জপ করে। কমলা জীবন পেয়ে উঠে বসে। জিজ্ঞাসা করে,—"প্রভু এখন দাসী কি করবে অনুমতি করুন, আমি আপনার পদে জন্মের মতন বিক্রীত হলাম।" বৈষ্ণব উপদেশ দেন,—"তুমি স্ত্রী জাতি, তোমার স্বামীই পরম গতি, তাঁকে ভক্তি করবে।" রামকান্ত বৈষ্ণব সেবায় এক লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ লিখে দেয়। অ্যালোপ্যাথ এবং হোমিওপ্যাথ দুই ডাক্তার ভাবে, তাদের ওষুধে যা হল না, যোগ প্রয়োগ করে এই পরমার্থিক চিকিৎসা চালু করবে। বৈষ্ণবের মন্ত্রবল ডাক্তারের সমস্ত শক্তিকে পরাভূত করেছে।

হরিঘোষের গোয়াল (কলিকাতা—১৮৮৬ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত। বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন, "এই হরিঘোষের গোয়ালে, বঙ্গসমাজ প্রচলিত স্বদেশ হিতৈষিণী-সভা, ইস্কুলের ডেঁপো ছেলে, নব্য হিন্দু থিয়েটার, মেয়েদের বিবাহ, উন্নত স্ত্রীলোক সম্পাদ পত্রিকা প্রভৃতি বাক্যগুলির বিষয় উপহাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর বঙ্গদেশের ভাবী উন্নতির আশা নির্ভর করে সেই সমস্ত বিষয় যেরূপভাবে চালান হচ্ছে, তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এবং যেগুলি দোষান্বিত বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেগুলিকে দর্শাইয়া এই পুস্তক লিখিত হইল।"

কাহিনী।—কলকাতার স্বদেশ হিতৈষিণীর সভা। সভ্য, দর্শক এবং ছাত্ররা উপস্থিত হন। ভুবন উঠে বলে, আজ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ভারতের মঙ্গলের জন্যে কি কি করণীয়, সেটা ঠিক করবার জন্যে অধিবেশন বসেছে। অধিবেশনে সভাপতি হন মিঃ রংগো সাহেব। ভুবন বলে,—"এই সভা অতি দুঃখের সহিত, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনারেবল

দ্বারিকানাথ মিত্র, রায় দীনবন্ধু মিত্র, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল, বাবু তারকদাস প্রামাণিক ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবন নক্ষত্র বঙ্গ আকাশ হইতে খসিয়াছে, এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিল।" সমর্থনে সকলে বল্‌লো, সত্যিই এঁদের বিয়োগে ভারত আধার হয়েছে। কুলচন্দ্রের প্রস্তাব এই যে,—'Penal Code-এ, ব্যভিচার দোষে স্ত্রীলোকের দণ্ড না থাকায় হিন্দুসমাজের অত্যন্ত অপকার হচ্চে, অতএব উক্ত অপরাধে স্ত্রীলোকের দণ্ড বিধান আবশ্যক।" শ্রোতারা প্রস্তাব সমর্থন করে বলে, এই দণ্ড নেই বলেই আজকাল এতো ব্যভিচারের কথা শোনা যায়। নলিনী তার বক্তৃতায় বলে,—"আমাদের ভারত কি এতই 'হানিবল'। আমরা কি এতই নিকৃষ্ট, আমাদের দেশে কি মহাত্মা জন্মায় নাই। আমরা তাদের বংশধর হয়ে—মাথা হেট হয়, খাট হয়! এখন কিনা অন্নের জন্য, বিদ্যার জন্য, শিক্ষা, চাকুরীর জন্যে পাশ্চাত্যজাতির নিকট কুকুরের ন্যায় পদ - 'লেলিহান' করতে হচ্ছে।" শ্রোতারা সবাই হাততালি দেয় এবং তারপর বংওয়ে সাহেব সবাইকে ধন্যবাদ দেন। তিনি তার ভাষণে বলেন, তিনি দেশে ফিরে গিয়ে ভারতের অবস্থা সব বল্‌বেন। কিন্তু মহাসভার মেম্বার হওয়া এখন ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে। ভারত অতি উর্বরা দেশ। এঁরা সবাই ইচ্ছে করলেই বংওয়ে সাহেবকে সাহায্য করতে পারেন সাহেবও ব্যয়ের সার্থকতা দেখাবেন। সাহেবের ভাষণ শেষ হলে ভুবন সবাইকে উদ্দেশ করে বলে,—"সভ্যগণ! আমাদের চোরম্যানকে সাহায্য করা অতি আবশ্যক। অতএব একটি ফাণ্ড স্থাপন করা হউক।" বংওয়ে সাহেব মনে মনে ভাবে,—"নেটিভদের গায়ে হাত বুলিয়ে, দুটা মনঃপুত কথা বলে তো কিছু হস্তগত করা যাক, তারপর দেখা যাবে—যেমন তেমন করে হোমে গিয়ে কিছু পড়লেই হল।"

এরাই সবাই সংস্কারক। এদের দেখাদেখি ছাত্ররাও লঘুগুরু বোধ হারিয়েছে। কলেজ স্কোয়ারের এক খাবারের দোকানে বসে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামায়ণ পাঠ করছিলেন। এমন সময় কয়েকজন ছাত্র দোকানে ঢুকে বৃদ্ধের কাছে তামাক চাইলো। বৃদ্ধ তখন তাদের কাছে তামাকের অপকারিতার কথা বলে উপদেশ দিতে যান। তখন ছাত্ররা অসহিষ্ণু হয়ে বৃদ্ধের টিকি নেড়ে রহস্য করতে লাগলো। ক্ষিপ্ত হয়ে বৃদ্ধ বলে ওঠে,—"একি তামাক খাবার আড্ডা? পোড়াকপাল ছেলেদের—তোমাদের বাপ মা নুন গিলিয়ে মারে নি কেন?"

সংস্কারক নলিনীবাবুর বাড়ীর অবস্থা দেখা যাক্। নলিনী আর তার স্ত্রী বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায় আর বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। নলিনীর বুড়ী মা তারামণি ঘরের কাজ, রান্নাবান্না ইত্যাদি করে থাকে। একদিন কয়লার অভাবে তারামণি রান্না চড়াতে পারে নি। জ্ঞানদা তখন স্বামীর সঙ্গে বাইরে ছিলো। সে ফিরে এসে সব দেখে রেগে যায়। তারামণি কেন নিজে কয়লার দোকান থেকে কয়লা আনে নি! তারামণি এদিকে একাদশীর উপবাস থেকে দ্বাদশীর দিনও উপবাসী আছে। জ্ঞানদার কাছে চেয়েও দুটি পয়সা পায় নি। নলিনী জ্ঞানদাকে বলে যে, রংওয়ে সাহেবকে বিলেতে পাঠাবার জন্যে সে পাঁচশো টাকা চাঁদা দিয়েছে। এমন সময় একজন ভিখারী আসে। জ্ঞানদা তাকে ভিক্ষে দেয়ই না, বরং বলে,—"অত মোটা গতর রয়েছে, কলে কায করগে—যা না।" তারপর সে মন্তব্য করে,—এরা সমাজের আপদ। নলিনী জ্ঞানদাকে বলে যে, সভায় স্থির হয়েছে গভর্ণর জেনারেলের কাছে ডেপুটেশন যাবে। সেও যাবে একা কি করে কাটাবে—এই বলে জ্ঞানদা কাঁদতে সুরু করে দেয়। এমন সময় সংস্কারক সভার আর এক সদস্য বিলেত-ফেরৎ ব্রজেশ আসে। জ্ঞানদা তার সঙ্গে করমর্দন করে অভ্যর্থনা জানায় তাকে। ব্রজেশ চাঁদার একটা লিষ্ট বার করে সই করতে বলে। এই চাঁদা প্রথমতঃ ফসেট সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্যে, দ্বিতীয়তঃ, রুশ-টার্কী যুদ্ধে টার্কীর পক্ষে আহত সৈন্যদের সাহায্যের জন্যে, তৃতীয়তঃ, আর একজন বিখ্যাত সাহেব জেলে গেছেন, তার উদ্ধারের জন্যে। নলিনী তাতে আনন্দের সঙ্গে সই দেয়।

যেমন নব্য সংস্কারকের দল, তেমনি হরিসভার ভক্তদল। হরিসভায় ভক্তরা জমায়েৎ হয়েছে। বৃন্দাবন গোস্বামী হরির গুণকীর্তন করছে। কয়েকটা ছাত্র এসে ঢুকে ভক্তদের নিয়ে হাসাহাসি করে চুপিচুপি।—"এঁর গোঁপ দেখ ঠিক যেন সিঙ্গির মামা।"—"তা নয় যেন পাটের গুদামে পাট শুকাতে দিয়েছে।" তারা ধমক খেয়ে চুপ করে যায়। এমন সময় লাঠির সঙ্গে ঝুলি বেঁধে একটা লোক আসে। সে বলে, বর্ধমান, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলায় বড়ো অন্নকষ্ট হয়েছে, হরিসভার সভ্যরা কিছু সাহায্য করুক। লোকটার উদ্দেশ্য শুনে সভ্যরা একে একে তামাক খাবার নাম করে বেরিয়ে যায়। যুগল শেষে তাকে বলে,—"নেড়ে হাড়িকে খাওয়ালে কি হবে হে? ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব খেলেই তো অর্থের সার্থকতা।"

এই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের স্বরূপ ধরা পড়ে বারাঙ্গনার ঘরে। চমৎকার নামে এক বেশ্যা গান করছিলো। এমন সময় যুগল আর প্রাণহরি আসে এবং যথা নিয়মে মদ্যপান করতে থাকে। প্রাণহরি মন্তব্য করে,— "বাবা ইংরাজ বেঁচে থাকুক, কি সুধাই বোতলে পুরে রেখেছে।" চমৎকারের ঘরে যুগল আর প্রাণহরি ছিলো। হরিদাস বাবাজী ছিলো সৌরভের ঘরে। হঠাৎ সৌরভ হরিদাসবাবাজীকে চেপে ধরে ঝাঁটা হাতে করে চমৎকারের ঘরে এসে দেখা দেয়। সৌরভ বলে, সে হরিদাসকে ঝেটিয়ে বিষ ঝাড়বে। কেননা মেয়েমানুষ পেয়ে দুমাসের টাকা তাকে ঠকিয়েছে। গলায় চাদর দিয়ে সে হরিদাসকে ঘোরাতে থাকে। হরিদাস আর্তনাদ করে বলে,—

"বাবা মরি মরি—
ছাড় সৌরভ পায়ে পড়ি,
করেছি কায ঝকমারি।"

হরিদাসবাবাজীর অবস্থা চরমে। শেষে যুগলই টাকা মিটিয়ে দিয়ে হরিদাসবাবাজীকে সৌরভের হাত থেকে রক্ষা করে।

সংস্কারকের স্ত্রীরাও সংস্কারের নামে হৃদয়হীনা হয়ে উঠেছে। নলিনীবাবুর কথা আগেই বলেছি। তার স্ত্রী একটা বুলবুল পাখী নিয়ে তার প্রশংসা করেছিলো, এমন সময় তার শাশুড়ী অর্থাৎ নলিনীবাবুর মা তারামণি তার কাছে এসে বলে যে, সামনে কর্তার বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন। এজন্যে নলিনী কোনোকিছু তাকে বলে গিয়েছে কিনা। জ্ঞানদা মন্তব্য করে,—মরার পর আদ্যশ্রাদ্ধ যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। বছর বছর শ্রাদ্ধ করে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার কোনো দরকার নেই। এরা শুধু একাদশী আর গঙ্গাস্নান করতেই জানে। দেশের মঙ্গল কিসে হবে, কুসংস্কার কিসে যাবে, এ ভাবনা এরা একবারও ভাবে না।

সংস্কারকরা শুধু বক্তৃতা দিয়ে ক্ষান্ত নয়, রঙ্গভূমিও তারা করেছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলে। যবনিকা উঠলে দেখা গেলো, নট, কৃষ্ণ ও তিনজন গোপিনী দাঁড়িয়ে আছে। নট বল্‌লো, দেশের লোকের কুরুচি পরিবর্তন করে সুরুচি সংস্থাপনের জন্য এই রঙ্গভূমি স্থাপিত হয়েছে। নট অভিনেতা অভিনেত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেয়। "ইনি রসরাজ বাবু হয়েছেন ঝুটোকৃষ্ণ। আর হরিদাসী, নিতম্বিনী ও মালতী—কেউবা সোনাগাছির, কেউবা মেছোবাজারের।

এরাও ঝুটো গোপিনী। বস্ত্রহরণ পালা শেষ হলে নট দর্শকদের উদ্দেশ করে বলে, এতে দর্শকরাও কৃষ্ণের ন্যায় বস্ত্রহরণের উপদেশ পেলেন। একজন দর্শক উঠে বলে ওঠেন, এসব নাটক অভিনয় করে সমাজের মাথা খাওয়া অনুচিত।

অতএব দেখা যাচ্ছে হরিসভার ভক্তরা আর দেশহিতৈষীরা সবাই সমান চলে চলছেন। হরিসভার যুগলের সঙ্গে অবশেষে দেশহিতৈষী কুলচন্দ্রের আত্মীয়তা স্থাপিত হলো, কিন্তু সেখানেও প্রতারণা।

যুগলের বৈঠকখানায় ঘটকী আসে তার মেয়ের সঙ্গে কুলচন্দ্রের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। কুলচন্দ্র পাঁচশো টাকার গয়না আর পাঁচশো টাকা নগদ দেবে। যুগল পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে দিতে রাজী হয় না। বলে,—"আমার ছেলে এবার এণ্টান্সটা পাশ হলে আর দ্বিগুণ দর হবে। এতে কন্যাকর্তা পারেন—আসুন, নইলে না।" ঘটকীর মুখে সব শুনে কুলচন্দ্র তার স্ত্রী সরোজিনীকে বলে,—"আমি কোনক্রমে দু'হাজার টাকা জমিয়ে ছিলাম। এখন বিবাহের খরচ দেখে মনে হচ্ছে, মেয়েকে ছেলেবেলায় মেরে ফেললেই ভাল করতে।" মেয়ে কুমুদ এসব শুনে মনে খুব ব্যথা পায়।

এদিকে যুগল বলে,—"সে টাকা না পেলে বরকে হাজির করবে না। তখন বাধ্য হয়ে কুলচন্দ্র তার ভিটে বিক্রী করে টাকা এনে যুগলের হাতে দিতে যায়। যুগল বার বার করে কুলচন্দ্রকে দিয়ে সেই টাকা গুনিয়ে শেষে সেটা নেয়। টাকা দিয়ে কুলচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। "আমি গিয়ে শয্যায় শুই গে, যেন বুকের মধ্যে গুরগুরিয়ে কম্প হচ্ছে। বুঝি জ্বর এলো।"

যুগল টাকা পেলো বটে, কিন্তু টাকা তার ভোগে লাগলো না। কুলচন্দ্রের প্রতিবেশীরা যুগলের কাছে গ্রামভাটির জন্যে একশো টাকা আদায় করে। দুইজন প্রতিবেশী বারোয়ারীর নাম করে দুই শো টাকা আদায় করে। ইস্কুলের সম্পাদক এসে যুগলের কাছে কিছু সাহায্য চাইলে। যুগল দিতে কুণ্ঠিত হলে ইস্কুলের ছেলেরা যুগলকে কৃপণ বলে ছড়া কাটে। কুটুমবাড়ী মান রাখবার জন্যে একশো টাকা সম্পাদকের হাতে দিতে হলো। কতকগুলো স্ত্রীলোক এসে শোভা তোলানির জন্যে টাকা চাইলে যুগল অনিচ্ছাসত্ত্বেও পঞ্চাশ টাকা দিলো। তারপর কতকগুলো ভট্টাচার্য ও গুরুমশায় এসে দেখা দিলেন। তাঁরা এসে বল্লেন যে তার স্বর্গীয় পিতার আমলে তাঁরা অনেক সাহায্য পেয়েছেন। অতএব যুগলের কাছেও তাঁরা কিছু আশা করেন। ৫০টা টোলের

প্রত্যেকটির জন্যে অন্ততঃ পাঁচ টাকা করে তাঁরা চান। যুগল অগত্যা তাই দিতে বাধ্য হয়।

শেষে কন্যার বিদায়। সবাই কাঁদতে কাঁদতে কুমুদকে নিয়ে পাল্কীতে ওঠায়। অসুস্থ কুলচন্দ্রকে দীপচন্দ্র ধরে ধরে নিয়ে এলো। যুগল মনে করলো, যাক চার হাজার টাকার গয়না তো আছে, এই যথেষ্ট। কিন্তু যুগলের এই আশাতেও ছাই পড়লো। শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে কুমুদ কুলচন্দ্রকে ডেকে বলে, 'তার জন্যে মা বাবা সর্বস্বান্ত হলো, সে কি করে এটা সহ্য করবে। সে তো বড় ঘরে পড়েছে। তার জন্যে কোনো চিন্তা নেই। কুমুদ তার হাতে গায়ের সমস্ত গয়নাগাটি খুলে দিয়ে বলে, এগুলো দিয়ে কুলচন্দ্র জীবন যাত্রা নির্বাহ করুক। অর্থশোকে যুগল পাগল হয়ে যায়।

এদিকে বারোয়ারী তলায় মহাধূমধাম। এখানে খেউড় গান হবে। তারপর যথাসময়ে বামী আর সামী—দুজনে মিলে খেউড় গান সুরু করে দেয়। প্রাচীন আর নবীনের লড়াই হয়। খেউড় গান শেষ হলে একজন দর্শক বলে—"পূর্ব্বে যে হরি ঘোষের গোয়ালের নাম শুনিছি—এই বঙ্গসমাজই সেই গোয়াল। নবদ্বীপে হরি ঘোষ প্রথমে বাথান ও গোয়ালঘর করে গরু মহিষ রাখতেন, আর অতিথি সৎকারও কর্ত্তেন। হরি ঘোষের মৃত্যুর পর যেরূপ বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, এখনকার বঙ্গসমাজও তদ্রূপ। ভাবলাম হিতৈষিণী সভার দ্বারা মঙ্গল হবে। সুশিক্ষিত বঙ্গসন্তান দ্বারা ভারতের উপকার হবে, কিন্তু সেরূপ আর হলো কোথায়।"

অপূর্ব্ব-লীলা (প্রকাশকাল অনিশ্চিত,—লেখক অজ্ঞাত)॥ তিনটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একটি প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে এই প্রহসনটির মধ্যেও একাধিক উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ বিশেষ কাহিনীর মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

কাহিনী।—(ক) রমানাথ বৈঠকখানায় বসে মদের বোতল এবং গেলাস নিয়ে মদ খেতে খেতে মত্ত অবস্থায় যীশুর জয়গান করছিলো। এমন সময় রমাকে আসতে দেখে বৈঠকখানার অন্য মাতালগুলো লুকিয়ে পড়ে। রমানাথের স্ত্রী একজন আধুনিকা মহিলা। স্বামী ছাড়াও আরও অনেক যুবকের সঙ্গে তার মেলামেশা আছে। রমানাথের স্ত্রী এসে ঘরে মদের বোতল আর গেলাস দেখে মদ খেতে সুরু করলে মাতালরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েমানুষের আস্বাদে তাকে ঘিরে ধরে। রমার স্ত্রী বেয়ারা—পুলিস ইত্যাদি

বলে চীৎকার করে উঠলে দুজন সার্জেণ্ট আসে। রমানাথের এক ইযার সার্জেণ্টকে ডেকে মদ খেতে বলে এবং এই মেয়েমানুষটা নিয়ে স্ফূর্তি করতে বলে। রমানাথের স্ত্রী পালাবার চেষ্টা করলে সার্জেণ্টরা তাকে চেপে ধরে বলে, —"Look here, my sweety! Are we not honourable guests?"

(খ) মিষ্টার পাকড়াশি একজন বিলেত-ফেরৎ শিক্ষিত লোক। মিস বিলাসিনী একজন আধুনিকা। বিলাসিনী পাকড়াশিকে জানায় যে, সে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাকেই বিয়ে করবে। এমন সময় মিষ্টার সিং নামে একজন আধুনিক বাবু পাকড়াশিকে পাঁচশত টাকা Subscribe করতে বলে। পাকড়াশি একজন গরীব লোক। মেথর বাড়ীওয়ালা, বোবা সবলেই তার কাছে টাকা পায়।

শোবার ঘরে বসে পাকড়াশির স্ত্রী বিরাজ তার স্বামীর দৈন্যের কথা ভেবে লজ্জা পায়। সে নিজের হার বেয়ারাকে দিয়ে বিক্রী করিয়ে দু'শো টাকা আনতে বলে। পাকড়াশি তাকে এসে বলে,—সে বাপের বাড়ী গিয়ে দু-হাজার টাকা নিয়ে আসুক। নচেৎ সে নিজেই গুলি খেয়ে মরবে। বিরাজ টাকা সংগ্রহের আশায় তখনই বাপের বাড়ী চলে যায়।

বেযারা এসে পাকড়াশিকে হার বিক্রী করা দু'শো পঞ্চাশ টাকা দিলে পাকড়াশি তা থেকে দু'শো টাকা নতুন যে মেমসাহেব এসেছে তাকে দিযে আসতে বলে। এমন সময় মিষ্টার সিং আসে। সিং একজন ডাক্তার। দেশী এল্.এম.এস ও এম্.বি.দের ওপর তার খুব রাগ। তারা খুব কম টাকাতেই চিকিৎসা করে। এমন সময় বেযারা এসে বলে, মেমসাহেব নেই বলে টাকা দেওয়া হয় নি। একথা শুনে সিং ও পাকড়াশি নৃত্য করে ওঠে। এদের রকম দেখে বেযারা মন্তব্য করে,—"মেমসাহেব কত ভাল—তাই গয়না বেচে টাকা দ্যায়—আর সাহেব কিনা তাই দিযে ফেলে—এক ঘণ্টাই টাকাটা ঘরে রাখ্‌—না—এখনই উড়িযে দেবে—আবার যারা পাবে চাইলে চাবুক খাবে। এদের যে কি ধম্ম তাও জানিনে—মোসলমান নয় শূয়র খায়, হেন্দু নয় গরু মুরগী খায়, বেরমো নয় মন্দিরে যায় না—খেরেস্তান নয় গিরিজায যায় না—এরা কি—কেউ কি বল্‌তে পারে?"

(গ) চেয়ারে বসে—শ্যামা, বামা, বাস্‌, মিট্‌টার, ব্যানর্জী, মকরজী ও ডোজ, সিন্‌গাপ্‌টে, ডেটা—ইত্যাদি কথাবার্তা বলে। এরা সকলেই শিক্ষিত—সবাই এটা জানে। বিলাসিনী নামে একজন আধুনিকা মহিলা উঠে—উনবিংশ

শতাব্দীতে বাঙালী মেয়েদের উন্নতির কথা নিয়ে আলোচনা করে। শ্যামা, দয়া, গাপ্‌টু—এরা তাকে সমর্থন করে। এমন সময় দেবনাথবাবু এলে সবাই তাকে সমাদর করে বসায়। দেবনাথবাবু সব ভ্রাতা ভগ্নীদের স্তুতি করে তারপর লণ্ডনে অন্যান্য মেয়েরা কেমন স্বাধীনভাবে আচার ব্যবহার করেছে—সেকথা প্রকাশ করে। এতে বিলাসিনী বলে,—"বড় দুঃখের বিষয় এ পর্যান্ত আমাদের মধ্যে বল-ইনষ্টিটিউশন্ প্রতিষ্ঠা হয় নাই—অদ্য তাহার সূত্রপাত হইল।" তারপর সব আধুনিকা মহিলারা বস্ত্র ত্যাগ করে নগ্ন অবস্থায় নৃত্য করতে করতে গান গাইতে লাগলো—"না জাগিলে সব ভারত ললনা" গানটি।

নাচগান শেষ হয়। তারপর তাদের দেখা যায় রাজ পথে। শ্যামা, বামা, ললিতা, বরদা ইত্যাদি সকলে ভল্যান্‌টিয়ারে হেল্‌মেট্ পরে এবং বন্দুক ঘাড়ে করে মার্চ করে চল্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা গান গাইছে,—

"ভীম নাদে মনঃসাধে
গীতি গাও নাহি ভয়
জয় ভিক্‌টোরিয়া জয়।"—ইত্যাদি।

ইডেন পার্কের কাছ দিয়ে যাবার সময় চারজন সেলর মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ঐ পথ দিয়ে গান করতে করতে যাচ্ছিলো। ঐ পথে অবশ্য নেটিভ ভল্যান্‌টিয়াররাও ছিলো। কিন্তু সেলরদের আগমনে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন চারজন সেলর চারজন আধুনিকাকে চেপে ধরে নাচগান করতে আরম্ভ করে দেয়। আধুনিকারা ভয়ে কেঁদে ফেলে। আধুনিকাদের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে সেলরদের গান চল্‌তে থাকে।

"Now, young couple we're married together,
We are married together,
We're married together,
Must you not obey your father and mother,
And love one another like sister and brother,
Pray young couple, we'ill kiss each other"

এইভাবে অপূর্ব লীলাখেলা চলে।

(ঘ) বিচিত্র বিষয় সম্পর্কিত—

এমন কতকগুলো সাংস্কৃতিক গোত্রীয় প্রহসন পাওয়া যায় যেগুলোর বিষয়-বস্তু, উদ্দেশ্য ইত্যাদির মধ্যে বিচিত্রতা আছে। নীচে কতকগুলো প্রহসনের

নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো। এগুলোর কোনো কপিই এখনো হস্তগত হয় নি।—

বলদ-মহিমা (১৮৭৫ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত॥ বলদের ওপর হিন্দুদের হাস্যকর ভক্তিকে বিদ্রূপের সঙ্গে চিত্রিত করে প্রহসনটি লেখা হয়েছে।

দর্পণ (১৮৭৮ খৃঃ)—লেখক অজ্ঞাত॥ হিন্দুদের মূর্তি পূজো নিয়ে প্রহসনটি লেখা হয়েছে বলে জানতে পারা যায়।

(ঙ) সমসাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক—

গ্রন্থে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে অধিকাংশ প্রহসনই সমসাময়িক ঘটনা এবং চরিত্র বিশেষকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। অনেকগুলোর ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। যেগুলো অনেকটা ব্যাপক আন্দোলন তুলেছে, সেগুলোর ঘটনা উদ্ধার সম্ভবপর। অধিকাংশ ঘটনাই আজ বিস্মৃত। তবে সমসাময়িক ঘটনা-কেন্দ্রিক কিছু কিছু প্রহসন এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে—যেগুলোর ঘটনাপরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রদর্শনীর অন্যান্য ক্ষেত্রে এধরনের সমসাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক কতকগুলো প্রহসন উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে নিম্নোক্ত ঘটনাকেন্দ্রিক প্রহসনগুলো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিবিধ পর্যায় ভুক্ত।

(ঙক) বাজার—হগসাহেব বনাম হীরা শীল —

সন্নিহিত অঞ্চলে বাজারের পত্তন করবার জন্যে ধর্মতলা বাজারের মালিক হীরালাল শীলের সঙ্গে স্যার ষ্টুয়ার্ট হগের সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধ হয়। এই বিরোধ সমসাময়িককালে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে এবং যথারীতি প্রহসনেরও জন্ম দিয়েছে। কিছুটা পটভূমিকার বর্ণনা প্রয়োজন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ধর্মতলা অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিলো। "ফিভার হস্পিট্যাল কমিটি' এই অঞ্চলের মানুষদের ব্যাপক অসুস্থতার বিষয় তদন্ত করে জানতে পারলেন যে, এখানে প্রতিদিনের আহার্য সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণে যে নিকৃষ্ট আহার্য গ্রহণ করে তাতেই এইসব রোগের প্রাদুর্ভাব। তখন এই অঞ্চলে ধর্মতলা বাজার এবং টেরিটি বাজারই বিখ্যাত ছিলো। ফিভার হস্পিটাল কমিটি তখন স্থির করলেন যে এই বাজারগুলো সংস্কার করতে হবে। ধর্মতলার বাজারের মালিক ছিলেন হীরালাল শীল। তিনি এ সব বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকলেও বাজারটি উত্তম স্থানে না থাকবার জন্যে বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপীয়ানরা যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করতেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী জাষ্টিসরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটা নতুন বাজার নির্মাণ করতে হবে উপযুক্ত স্থানে। এজন্যে গ্রাণ্ড ষ্ট্রীট এবং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থান নির্বাচন করা হলো। কিন্তু কতকগুলো অসুবিধায় এই সিদ্ধান্ত বাস্তবরূপ নিলো না।

তারপর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাষ্টিস মিঃ জেমস উইলসন একটা কমিটি গঠন করলেন এবং তার ওপর বেসরকারী বাজারগুলো তদারকের ভার দিলেন। কমিটির বিবরণে বাজারের প্রচুর দোষের কথা উল্লেখ করা হলো। উইলসন তখন স্থির করলেন যে, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের পত্তন করে এইসব বাজার উচ্ছেদ করলেই একমাত্র প্রতিকারের সম্ভাবনা। কিন্তু অক্টোবরের অধিবেশনে উইলসনের প্রস্তাব জাষ্টিসরা নাকচ করে দিলেন। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমিটির মধ্যে বেসরকারী বাজারের বিত্তশালী মালিকদের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো এবং কয়েকজন কমিটির মধ্যেও ছিলেন।

এরপর এলেন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং পুলিশ কমিশনার স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি একটা স্পেশাল কমিটি তৈরী করে আবার বাজার প্রতিষ্ঠার পুরোনো ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। এজন্যে Calcutta Markets Act VIII of 1871 বিধিবদ্ধ হল। ছয় লক্ষ টাকা খরচ করে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়ে বাজার নির্মাণের কাজ চলতে লাগলো। বাজারের একটা আদর্শ নক্সা তৈরীর জন্যে এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। R R Bayne (ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর নক্সাকার) প্রদর্শিত নক্সা অনুযায়ী শেষে বাজার পরিকল্পিত হলো ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশো কুড়ি টাকা নিয়ে এটা সম্পূর্ণ করেন। তখন ২৫ বিঘে জমির ওপর (দুই লক্ষ আঠার হাজার টাকা মূল্যের) বাজারের পত্তন হলেও পরে আরও বেড়ে যায়। তখনকার জমি এবং গৃহাদি নির্মাণের ব্যয় ধরলে দেখা যায় তা মোট ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকায় উঠেছিলো। এর পরেও অবশ্য আরও ব্যয় হয়েছে।

এই সময় ধর্মতলার বাজারের সঙ্গে হগসাহেবের বাজারের দলাদলি বেশ উপভোগ্য। প্রবাদ আছে, হগসাহেব নাকি নিজের বাজারকে জনপ্রিয় এবং প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে খদ্দেরদের গাড়ীভাড়া দিয়ে বাজারে আনতেন এবং বিনামূল্যে অনেক জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলে দিতেন। এমন কি নিত্য নতুন

ভোজণ দিতেন। অনেকে অভিযোগ করেছিলেন, তিনি ব্যাপারীদের ওপর জোরজুলুম করে, এবং রেট কমিয়ে বাজারে বসাবার চেষ্টা করতেন। এই জন্যেই হীরা শীলের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। হীরা শীল সমসাময়িককালের প্রখ্যাত ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। সুতরাং তাদের এই বিরোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিলো।

রক্ষণশীল দল হীরা শীলকেই সমর্থন করেছেন এবং বিভিন্ন প্রহসনে হগসাহেবের দুরবস্থার চিত্র প্রদর্শন করেছেন। তাকে পরিণতিতে নিরুৎসাহী রূপে দেখিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে হীরা শীলেরই পরাজয় ঘটে। কারণ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হগসাহেব সাত লক্ষ টাকা দরে ধর্মতলা মার্কেট কিনে নিয়েছিলেন। অতএব এ সব ঘটনা এখানে অবাস্তব।

বাজারের লড়াই (কলকাতা—১৮৭৪ খৃঃ)—শিশিরকুমার ঘোষ॥ পুরোনো আদর্শ সংস্কৃতির সমর্থনে রক্ষণশীল দলের পক্ষে প্রহসনটির মধ্যে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করা হয়েছে। নব্য সংস্কৃতি নির্ভর মিউনিসপ্যালিটি সংস্থার বিরুদ্ধেও তাই প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ স্বাভাবিকভাবে প্রযুক্ত।

কাহিনী।—নিজের হাতে রাখবেন বলে হারালাল শীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হগসাহেব বেটুপে ারদের অর্থে নতুন বাজারের পত্তন করেছেন। এ বর পত্তনে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং বেচপেনাবদের রেট কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হলো। তাদের আবেদন নিবেদনের দরখাস্ত চেপে রাখেন। নতুন বাজারে দু মাস গোস্ত বেচবে বলে আরজান কশাই সাতশো টাকা নিয়েছে। মানাউল্লা নিয়েছে তিনশো টাকা। সে ধর্মতলা বাজার থেকে তিনজন কশাইকে ভাগিয়ে আনবে। কয়েকজন টাকা নিয়েছে অনেক, কিন্তু আসে না। তবুও সাহেবের খরচ করা চাই। বিশেষ করে সাহেবদের সুবিধার দিকে তিনি একটু দৃষ্টি দেন। যা সাহেবে খায় না, বাজারে সেগুলো আনবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না। যে সব সাহেব হগের বাজারে আসবে, তাদের গাড়ী ভাড়ার বরাদ্দ তিনশো পঞ্চাশ টাকা স্থির হয়। তারা এলে তাদের আপ্যায়নের জন্যে মিষ্টান্ন খরচ চারশো ত্রিশ টাকা ধার্য হয়। বাজারের অবিক্রীত জিনিস খরিদের জন্যে দুইশো টাকা ধরা হয়। অবিক্রীত জিনিসগুলো খরিদ করে কি করা হয়— সাহেব কেরানীকে তা জিজ্ঞেস করলে কেরানী বলে, চাকর বাবুররা তা ভাগ

করে নেয়। তরীতরকারী সাহেবদের ঘোড়ার খাবারে দেওয়া হয়। কম দরে বিক্রী করবার ক্ষতিপূরণ বারোশো টাকা ধরা হয়।

মিউনিসিপ্যাল অফিসে হীরালাল শীল আসেন। তিনি হগসাহেবকে বলেন, ইচ্ছে করলে তার বার লাখ টাকা মূল্যের বাজার সাহেব ছয় লাখে কিনে নিতে পারেন। বাজারটিতে হীরালাল ষাট হাজার টাকা লাভ করে থাকেন। কিন্তু ছয় লাখ টাকা হগ কোথায় পাবেন। অবশ্য রেটপেয়ারদের টাকায় তা সম্ভবপর। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় বাধে—তাছাড়া আইনও তো আছে। অবশ্য আইন তিনি পাল্টাতেও পারেন,—'লেফটেনেণ্ট গবর্ণর আমার একটু কথা শোনেন বটে," কিন্তু তার নাকি ইচ্ছে নেই। শেষে হগসাহেব জটাবাজার এক দরে আধাআধি বখরার প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু [illegible] হীরালাল তাতে রাজী হন না। বিতর্ক [illegible] হতে দুজনাই টাকার গরম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। হগ বললেন,—"আমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, আমি টাকার সাগর।" হীরালাল এবং হগসাহেব—দুজনেই তাদের লম্বা টাকার থলে দেখাতে লাগলেন—কার থলে কতো লম্বা। হগ এতক্ষণ দেখাচ্ছিলেন রেটপেয়ারদের টাকা। একজন রেটপেয়ার এসে সেটা কেড়ে নিলো। হীরালাল তখন সাহেবের পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট্ট থলি টেনে বার করলেন এবং সকলের সামনে ধরলেন।

বাজারের লড়াইয়ে আপোস হয় না। বাজারের মধ্যে জোর জুলুম চলে। পাহারাওয়ালা এসে তরকারীওয়ালাদের নতুন বাজারে নিয়ে যাবার জন্যে পুরোনো বাজারে ঢুকে টানাটানি করে। কোথাও তারা তরকারী লুকিয়ে কাপড়ে ভরে, কোথাও বা দু আনা চার আনা ঘুস নেয়—আবার কোথাও বা তারা কর্তব্যের নামে মেছুনীর শ্লীলতা নষ্ট করে। হীরালালের দারোয়ান এসেও উল্টো টানাটানি লাগায়। ক্রমে খোদ সাহেব এবং হীরালাল এসে নিজেরাই টানাটানি সুরু করে দিলেন। এইভাবে বাজারের মধ্যেই লড়াই সুরু হয়ে যায়।

লড়াইয়ের রসদ টাকা। সুতরাং হগসাহেব খাদকে কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুরের জন্যে জাষ্টিস্‌দের সভায় আবেদন করেন। টাউনহলের মিটিংয়ে হগ, রবার্ট্‌স্‌ ও আর একজন সাহেব, রাজেন্দ্রবাবু, কৃষ্ণদাসবাবু, উমেশবাবু, হীরালালবাবু, ও আর তিনজন জাষ্টিস্‌ উপস্থিত ছিলেন। হগ্‌সাহেব বলেন, আগে তিনি যে টাকা নিয়েছিলেন, তা ফুরিয়ে গেছে। "আমি লোককে

জোর করিয়া হীরালালবাবুর বাজারে না যাইতে দিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি লাইসেন্‌স বন্ধ করিয়া ব্যবসাদারদিগকে জব্দ করিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি শ্লটার হাউস বন্ধ করিয়া কসাই-দিগকে একরূপ জব্দ করিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি কসাই কি বাগ্‌দীগণ পচা সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে ফাটকে দিতে পারি, কিন্তু তাহা করি না···আমি শুদ্ধ নিজে (হাটের পেছনে) খাটিতেছি না, আমার লোকজন সকলেই ব্যস্ত। পোলিসের কন্‌ষ্টেবল্‌, সারজন্‌, ইনস্পেক্টর সকলই আপন আপন কর্ম্মকাজ ফেলিয়া ইহাতে ব্যস্ত।"

জাষ্টিস্‌ জেম্‌স্‌কে হগ বলেন, সাহেবদের সুখ সুবিধার দিকে বেশ নজর দেওয়া হয়েছে। যেসব সাহেব বাজার করতে আসে, তাদের গাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। যারা হাটে আসতে সময় পায় না, তাদের জিনিস বাড়ীতে পাঠিয়ে বিল দেওয়া হবে। বিল যাতে বেশি না হয়, সেজন্যে হগসাহেব নিজেই তা পরীক্ষা করবেন। জেম্‌সকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে তিনি বলেন, ইচ্ছে করলে বিল্‌ নাও পাঠাতে পারেন এবং সেটাই তিনি করবেন। সব শুনে জেম্‌স্‌ বলেন, বেশ, তাহলে কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুরে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। উমেশবাবু জেম্‌সকে তোষামোদ করে প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। জেম্‌স্‌ বলেন বাজারে সপ্তাহে যেন একবার করে সাহেবদের ভোজ দেওয়া হয়। হগ তাতে রাজী হন।

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল এতে অমত করেন। তিনি বল্‌লেন,—"করদাতারা মুখের অন্নে বঞ্চিত হইয়া ট্যাক্স দেয়।···আমরা সাহেবদিগের খেয়ালের নিমিত্ত কত টাকাই নিরর্থক নষ্ট করিলাম। আমাদের কীর্ত্তির শেষ নাই। এক কীর্ত্তি ক্যানিং মার্কেট, এক কীর্ত্তি ট্রামওয়ে, এক কীর্ত্তি ইঞ্জিন দ্বারা রোলার টানা, আর কীর্ত্তিতে প্রয়োজন নাই। যতদিন পৃথিবী রসাতলে না যায়, ততদিন এই কীর্ত্তিতে কলিকাতার জষ্টিসদিগের সভাপতিদের বুদ্ধি, কৌশল, বিদ্যা ও ক্ষমতার পরিচয় দিবে।" হগ যদি খরচ করতে চান—খরচ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর নিজের টাকাই খরচ করুন।

রাজেন্দ্রলালের উক্তিকে হগসাহেব অপমানজনক ও রাজদ্রোহিতামূলক বলে মন্তব্য প্রকাশ করলেন। "তাহলে বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর" বলে হগ-সাহেব কাজ আছে—এই ছুতোয় চলে যাবার উপক্রম করলেন। রবার্টস্‌ অমত প্রকাশ করেন। হগ, তাঁকে 'নিমকহারাম' সম্বোধন করে বল্‌লেন,—বৃথা

তিনি কাট্‌লেট্‌, কোর্মা, কাবাব, শ্যাম্পেন, শেরি—এসব খাইয়েছিলেন। রবার্টস্‌ বলেন, সে টাকা হগের ঘরের টাকা ছিল না, রেট্‌পেয়ারদেরই অর্থ। একে একে কৃষ্ণদাসবাবু ও অন্যান্য জাষ্টিস্‌রাও মমত প্রকাশ করলেন। তখন ক্ষুব্ধ হগসাহেব বলে উঠ্‌লেন,—"থাকলো তোমাদের বাজার। বাজার পুড়ে যাক্‌, চুলোয় যাক, উচ্ছিন্ন যাক।" নিজের কপাল চাপ্‌ড়ান সাহেব। শেষে,—"থাক্‌ল তোমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, থাকল তোমাদের কাগজপত্র"—বলে তিনি কাগজপত্র চেয়ার—সবকিছু ফেলে দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রহসন রচিত হয়েছে। **বড় বাজারের লড়াই**—Great Market War (১৮৭৪ খৃঃ)—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—একটি প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া সমসাময়িক কালের বিভিন্ন প্রহসনে বাজারের লড়াইয়ের প্রসঙ্গ আছে।

(ঙখ) ঘৃতে ভেজাল ॥—

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবম দশকে ঘৃতে ভেজাল সম্পর্কে যে আন্দোলন হয়, তা পর্যবেক্ষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি নে যে, তার আগে ঘৃতে ভেজাল দেওয়া ব্যবসায়ীদের অজ্ঞাত ছিলো কিংবা এধরনের কোনো কার্য অনুষ্ঠিত হয় নি। ভেজাল আইনের অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭২ ধারার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'সুলভ সমাচার" পত্রিকা[১০] মন্তব্য করেছেন,—"মাখন মারা ঘি চাই বলিয়া দারে দ্বারে যে ঘৃত বিক্রয় হয়, অতি কদর্য্য ঘৃতে পচাকলা লেবুর রস এবং হরিদ্রা দিয়া ঐ ঘৃত দাগ করে। কলিকাতায় যদি মধ্যে মধ্যে ঠক ব্যবসায়ীদের এইরূপ দণ্ড হয়, তবে নগরবাসীদিগের শারীরিক মঙ্গল হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কে এই ঠকদিগকে ধরে? পুলিস কর্মচারীদের বেতন পাইলেই আনন্দ, মিউনিসিপ্যালিটির মিটিং হইলেই আনন্দ, এবং নগরবাসীদের পেট ভরিলেই আনন্দ, তবে ধরিবার লোক আর কোথায় মিলিবে?"

কিন্তু এই ভেজাল বিরোধী সক্রিয়তার ব্যাপক প্রকাশ পেয়েছে যখন ঘৃতে চর্বি মেশাবার প্রক্রিয়া অসাধু ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করেছে। ধর্মকার্যে ঘৃত অপরিহার্য বস্তু। এর সঙ্গে অমেধ্য দ্রব্যের মিশ্রণ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বিচলিত

১০। সুলভ সমাচার—১লা জানুয়ারী, ১৮৭১ সাল।

করে তুলেছিলো। অনুসন্ধান পত্রিকায়[১১] এই আন্দোলনের স্মৃতিচারণ প্রকাশ পেয়েছে।—"ঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রিত হয় বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মহানগরীতে এক বিষম কোলাহল উঠিয়াছিল, আর, তাহার প্রতিধ্বনিও অন্য জনপদসমূহে উত্থিত হইয়া ধর্ম্মভীরু হিন্দু ও মুসলমানকে ব্যাকুলিত করিয়াছিল। কলিকাতার বড় বাজারের কয়েকটী প্রাসিদ্ধ ব্যবসায়ী বসামিশ্রিত ঘৃতের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিয়া অতিকষ্টে জাতি পাইয়াছিলেন।" উপরি-উক্ত মন্তব্যটি থেকেই এই আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। কয়েকটি প্রহসনের পরিচয় এ সম্পর্কে পাওয়া গেলেও সেগুলোর কপি দুর্লভ। এই ধরনের দুটি প্রহসনের পরিচয় উদ্ধার করা হলো।—

ঘিয়ের সাতকাণ্ড (১৮৮৬ খৃঃ)—নীলমণি শীল॥ সাম্প্রতিককালের একটি অনুসন্ধানে ঘৃতে অমেধ্য ভেজালের কথা সাধারণের কাছে প্রচারিত হওয়ায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। গোঁড়া হিন্দুরা এই নিয়ে আন্দোলন চালান। এঁদের মত, ব্যবসায়ীরা অন্যান্য খাদ্যে ভেজাল দিক, তাতে আপত্তি নেই কারণ তা মানুষের খায়। কিন্তু ঘৃত—যা হোম করে দেবতাকে দেওয়া হয়, পূজো-আর্চাতে যার প্রয়োজন সব চাইতে বেশি—তার ভেজাল অমাজনীয় অপরাধ!

ঘিয়ের গন্ধে প্রাণ গেল (১৮৮৬ খৃঃ)—এস্. এন্. লাহা॥ এই প্রহসনেরও বিষয়বস্তু পূর্ববৎ। ঘিয়ের ভেজাল সম্পর্কে এই প্রহসনেও রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে।

(ভগ) মাছে রোগ॥—

গত শতাব্দীতে অর্থাৎ ১২৮২ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "সাধারণী" পত্রিকায় বলা হয়েছে,—"পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, হুজুতে বাঙ্গালা, হুজুরে চীন, এখন দেখিতেছি, কেবল হুজ্জুতে বাঙ্গালা নয়, হুজুকেও বাঙ্গালা। এত হুজ্জতও আর কোথাও নাই, এবং এমন হুজুকে দেশও অল্প আছে।" যে বছরে এই মন্তব্যটি করা হয়েছে, সেই বছরেই একই পত্রিকায় (২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২) একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে,—"পদ্মার মৎস্যে এক প্রকার পোকা জন্মিয়াছে। এই মৎস্য ভক্ষণ করাতে লোকের পীড়া জন্মিতেছে।

১১। অনুসন্ধান পত্রিকা—১০ই শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল।

ইলিশ মাছেও কি পোকা হইযাছে?" ঐ সপ্তাহের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "সুলভ সমাচার" পত্রিকায় এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হয়।—"ঢাকা প্রদেশে মাছের মধ্যে অত্যন্ত মহামারি উপস্থিত হইযাছে, এমন কি তথাকার বাজারে মাছ পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে। তথাকার ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সমুদায় মাছের ভিতর এক প্রকার ছোট ছোট পোকা হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহাদের এক প্রকার বসন্ত রোগ হইযাছে, সেই রোগের জন্য ইহাদের গায়ে পোকা জন্মিয়াছে, এ মাছ খাইযা যাহাদের পীড়া হইবে তাহাদের আর নিস্তার নাই। জেলেরা মাছের কল্যাণে স্বস্ত্যয়ন ও পূজা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষতঃ ঐ দেশে মাছ একটি প্রধান খাদ্য, তজ্জন্য লোকের আহার বিষয়ে বিলক্ষণ কষ্ট হইযাছে। নিরামিষ-ভোজী লোকের আর বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না।"

এই ঘটনা এ সময় মৎস্যভোজী বাঙালীদের কারো মনে এনেছে ভীতি, আবার কারো মনে এনেছে সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়। একদল হুজুগপ্রিয় বাঙালী এর ভয়াবহতা সবিস্তারে প্রচার করেছেন, আবার কেউ কেউ এটাকে একটা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বলেও মনে করেছেন। ধর্মধ্বজ সম্প্রদায় একে ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এ নিয়ে কিছু Street literatureও বেরিয়েছিলো, যেমন—দ্বিজবর শর্মার লেখা 'মাছের বসন্ত', জহরলাল শীলের লেখা 'জেলে মেছুনীর খেদ' ও 'মাছের পোকা', চিন্তামণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'মাছ খাব কি পোকা খাব', আশুতোষ দত্তের লেখা 'মেছেনীর দর্পচূর্ণ' ইত্যাদি। সবই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের।

মাছে পোকা (প্রকাশকাল—১৮৭৪ খৃঃ)—বাদলবিহারী চট্টোপাধ্যায়॥ প্রহসনটির কোনো কপি পাওয়া যায় না, তবে পূর্বোক্ত বিষয়টিকে নিয়ে এই একটিই মাত্র প্রহসনের নাম জানা যায়।

(ঙঘ) যুবরাজ বরণ॥—

যুবরাজ (সপ্তম এডওয়ার্ড নামে পরে খ্যাত) প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ তার ভারত ভ্রমণের শেষের দিকে কলকাতায় পদার্পণ করেন। কলকাতার রাজভক্ত ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত জমিদাররা তার অভ্যর্থনার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কলকাতার আলোকসজ্জা সম্পর্কে "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত[১২]

১২। গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পৃঃ ৫৪।

পুস্তিকায় বলা হয়েছে,—"এ বিষয়ে আমরা অধিক আর কি বলিব যুবরাজ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে আমি বাল্যকালে ফেয়ারিটেল নামক পুস্তক পাঠ করিয়া সমুদয় অসম্ভব বোধ করিতাম, কিন্তু অদ্য এই নগর দর্শনে তাহা আমার পক্ষে ততদূর অসঙ্গত বোধ হইতেছে না।" হীরালাল শীল কলুটোলা ষ্ট্রীট দেশীয় প্রথায় আলোক সজ্জিত করেন। অনেক ব্যবসায়ী লালদীঘির চারদিকে প্রচুর ব্যয়ে উজ্জ্বল আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলেন। ২৮শে ডিসেম্বরে বেলগাছিয়া বাগানে তার অভ্যর্থনায় ছিলেন—রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর, প্রিন্স ফেরোকসা, নবাব আমীর আলি, অনারেবল দুর্গাচরণ লাহা, কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রলাল মল্লিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মানিকজি রসটমজি, মহম্মদ আলি, মৌলভী আব্দুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি। তাছাড়া রাজা রমানাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, সত্যব্রত সামশ্রমী ইত্যাদিও ছিলেন।

এর থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, যুবরাজের অভ্যর্থনা রাজরাজড়ার পক্ষ থেকে বাইরের জাঁক-জমকের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে,—"যুবরাজ যে যে স্থানে গমন করিবেন সেই সেই স্থানে দ্রব্যাদি যে মহার্ঘ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। রাজা ও জমীদারগণের কিছু ব্যয়ের আধিক্য হইবেক। যুবরাজ যেরূপ ধুমধাম দেখিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহাতে দেশের অবস্থা ভাল দেখিয়াই যাইবেন। আলোয় এলেন আলোয় গেলেন অন্ধকার কাহাকে বলে তাহার ভাবও তাঁহার মনে একবার উদয় হইল না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে বড় বড় লোকেরা দুঃখের বিষয়, কি কষ্টের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না।

উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে যুবরাজ অভ্যর্থনায় মধ্যবিত্ত জনসাধারণের ক্ষোভের কারণ যথেষ্ট উপলব্ধি করা যায়। রাজনৈতিক কারণ যাই থাকুক, এগুলোর মধ্যে সমাজগত ক্ষোভের কোনো কারণ ঘটেনি। কিন্তু ভবানীপুরের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে তাঁর অন্তঃপুরে সাদরে বরণ করায় বিশেষতঃ অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের এতে প্রয়োজিত করায় সমাজের রক্ষণশীল দলের পক্ষ থেকে বিদ্রূপাত্মক প্রচুর রচনা, সমসাময়িককালের পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা প্রহসন ইত্যাদির আকারে প্রকাশ পায়। পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার ইত্যাদি সংবাদপত্রে তার প্রচুর নিদর্শন আছে। শোনা যায় বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকও এই অভ্যর্থনাকে বাড়াবাড়ি ভেবেছিলেন। রঙ্গমঞ্চেও "গজদানন্দ ও কর্ণাটকুমার" ইত্যাদি অধুনালুপ্ত

প্রহসন অভিনীত হয়েছে। উকিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সতীর্থের এই ধরনের কাজে "বাজিমাৎ" নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি প্রকাশ করেন।—

"বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥
'ফিক্র' দানে, এক তাড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥"

ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—

"সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়।
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুল তলায়।
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥"

বেলগাছিয়ার বাগানে অভ্যর্থনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করে কিস্তিমাৎ করবার 'বুদ্ধি' তাদের নাকি ছিলো না।—যেটা জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বিনা বাধায়ই সম্পন্ন করেছেন সমাজকে অস্বীকার করে।—

"বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন।
বিষ্ণুপুরের মিন্সের দেখ বড়ে টেপার গুণ॥"

সমসাময়িককালে কুৎসামূলক বিভিন্ন আলোচনাকে এখানে টানবার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে—তা বিশুদ্ধভাবে সামাজিক রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ। এর সঙ্গে রাজনৈতিক মনোভাব যুক্ত হওয়ায় এই আন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপক রূপ নিয়ে প্রহসন রচনায় প্ররোচিত করেছে। অনেক চেষ্টা করেও এই বিষয়ে লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রহসনের কোনো কপি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নি। এই বিলুপ্তির মূলে তদানীন্তনকালের বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের দায় অস্বীকার করা যায় না।

(ঙঙ) অন্যান্য॥—

জয় মা কালী কালীঘাটে একি চুরি (১৮৭৫ খৃঃ)—"রাজরত্ন"॥ কালীঘাটের কালীর গহনাচুরির সমসাময়িক একটি ঘটনা নিয়ে প্রহসনটি

বচন। জাগ্রত দেবী এবং ভয়ঙ্করী দেবী কালীর গহনা চুরির মতো দুঃসাহসিক কাজকে বিস্ময়ের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

পল্লীগ্রামস্থ সামাজিক অবস্থা বিষয়ক নাটক (১৮৭৭ খৃঃ)—রাখলদাস হাজরা॥ উত্তরপাড়া অঞ্চলের সমসাময়িককালের একটি বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি রচিত হয়েছে। বাগ্‌দান অনুযায়ী বিবাহের ব্যবস্থা হয়, যথারীতি আমোদ প্রমোদও চলে, কিন্তু অবশেষে কনের বাড়ীতে পুলিশ এসে ধাওয়া করে।

কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বর্গ হইতে সোনার টালি পতনে কলির অবতার (১৮৮১ খৃঃ)—আর.এন সরকার॥ কিছুদিন আগে বাংলা দেশে একটা গুজব উঠেছিলো যে কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বর্গ থেকে একটা সোনার টালি এসে পড়ে। তাতে নাকি লেখা ছিলো যে, শিগ্‌গিরই বিষ্ণু অবতার হবে না শুকদেব শাস্তি দেবার জন্যে জন্মগ্রহণ করবেন।

বড় ঘরের বড় কথা (১৮৮২ খৃঃ)—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়॥ বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকার মন্তব্যে বলা হয়েছে,—Farce containing a personal attack upon a Bengali gentleman, who has been recently made a knight companion of the order of the star of India."

কাশীতে হয় ভূমিকম্প নারীদের একি দম্ভ (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)—মুনশী নামদার (ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়)॥ সমকালীন কোন বিষয় নিয়ে রচিত। বইটি কিংবা বইটি সম্পর্কে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটনাকেন্দ্রিক রচনা প্রচুর আছে। সেগুলির অধিকাংশই পাঁচ-মেশালি পথ পুস্তিকা (Street Literature)। যে কয়েকটি অন্ততঃ প্রহসন নামে চিহ্নিত করা যেতো, সেগুলিও বিলুপ্তির গহ্বরে। প্রসঙ্গতঃ গত শতাব্দীর পথ পুস্তিকার প্রেরণা দিয়েছে, এমন কটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।—(১) আনন্দময়ীতলার পাঁঠা চুরি (১৮৭৫ খৃঃ), (২) আশ্বিনে ঝড় (১৮৬৪, ১৮৬৫ খৃঃ), (৩) কার্তিকে ঝড় (১৮৬৭ খৃঃ), (৪) আশ্বিনে ঝড় (১৮৭৭ খৃঃ), (৫) জগন্নাথের মন্দির পতন (১৮৭৫ খৃঃ), (৬) হুগলী নদীর সেতু (১৮৭৪ খৃঃ), (৭) ডেঙ্গু জ্বর (১৮৭২ খৃঃ), (৮) কালীর অলঙ্কার চুরি ১৮৭৫ খৃঃ), (৯) পুলিশ ঘাটে অগ্নিকাণ্ড (১৮৭৬ খৃঃ), (১০) সোনাগাজীর খুন (১৮৭৫ খৃঃ) ইত্যাদি।

(চ) গোত্র-বহির্ভূত।—

এই পর্যায়ভুক্ত প্রহসনের সমাজচিত্র গ্রহণ অত্যন্ত জটিল। সমাজচিত্রকে ব্যাপক অর্থে ধরলে চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যুগ নির্বিশেষেও যে অস্তিত্ব রক্ষা করে—তাকেও অন্তর্ভুক্ত করা চলে। তাছাড়া পদ্ধতিগত জটিলতা স্থান, কাল অথবা পাত্রগত যে কোনও একটি দিকে চরম অসঙ্গতি প্রকাশ করে বা অস্বীকার করে অন্য দুটি দিকে সাদৃশ্য রক্ষা করে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নিম্নোক্ত প্রহসনগুলোর মূল্য তাই ব্যাপক অর্থে। প্রয়োজনবোধে এগুলোকে পন্থাবিশেষ অনুযায়ী বর্জন করাও চলে। কিন্তু সঙ্কীর্ণতা পরবর্তী গবেষণা-মূলক পদক্ষেপে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, তাই এগুলোকেও উপস্থাপিত করা হলো।

ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম (ঢাকা—১৮৭৭ খৃঃ)—হরিহর নন্দী (বাঙ্গালিটোলা, ঢাকা)। নামকরণ এবং স্বভাবের বৈপরীত্য উপলব্ধির প্রচার সমাজে গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি আবিষ্কার প্রচেষ্টা মাত্র। সমাজ-মনের গতি-প্রকৃতির চিত্রে এর মূল্য সামান্য হলেও অস্বীকার করা চলে না। তবে গৌণভাবে সমাজচিত্রের যা প্রকাশ, তা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। নাটক শেষে নেপথ্যে একটি কবিতায় বলা হয়েছে,—

"দোয়াত নাই, কলম নাই, কলমচাঁদ সরকার।
লেখা জানে না, পড়া জানে না, বিদ্যাধর নাম তার।
জাগা নাই, জমিন নাই, গল্প করে ভারি।
আগে পাছে লণ্ঠন, টাকার নামে ঠনঠন
সদাই দৌড়ান গাড়ী॥
কানে কলম গুঁজে ফিরে, ছেঁড়া কাঁথা গায় ওরে
বাত্তি জ্বালায় লেম্প,
ইংরেজী বকেন সদা, ডেম্ ডেম্ যা ডেম্ ডেম্॥"

কাহিনী।—পিতৃদত্ত নাম অনেক সময়েই মানুষের স্বভাব বা ব্যবহারের ঠিক বিপরীত হয়। এমন একজন লোক হচ্ছেন রসিকবাবু। বাকীতে রসকরাওয়ালার কাছ থেকে মিষ্টি খাবার সময় তাঁর মতো রসিকের জুড়ি মেলে না, কিন্তু দামটি দেবার সময়ে একেবারে বেরসিক।

একদিন রসিকবাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কয়েকজন বন্ধুও উপস্থিত

ছিলেন। এমন সময় রসকরাওয়ালা তার পাওনা আট আনা আদায় করবার জন্যে রসিকবাবুর কাছে আসে। এইবার নিয়ে তার ছ'বার ঘোরা হলো। তাই মেজাজটা একটু গরম ছিলো। রসিকবাবু তাকে আবার ঘোরাতে চাইলে সে বলে,—"আরে বাবু ক্ষেপ কেন, খাবার বেলা মনে ছিল না যে পয়সা দিতে হবে।' রসিকবাবু তখন তাকে গলাধাক্কা দেন। কারণ, বন্ধুদের সামনে ছোটলোক হয়ে রসিকবাবুকে অপমান করেছে। লোকটি গালাগালি দিয়ে গেলে, পাওনা আদায় করে তবে সে ছাড়বে। অবশেষে বন্ধুরা বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেয়।

রসিকের এই বন্ধুরাও কম রসিক নয়। নিমাই দত্তের বাড়ী মাতৃশ্রাদ্ধে ফলারের নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছিলো। পথে নিখরচায় তামাক খাবার লোভে রসিকবাবুর বাড়ীতে বিশ্রামের জন্যে এসেছিলো। রসিকবাবু যখন বললেন, দাগুরাম সরকারের মেয়ের বিয়ে, ঘটক জামাই দেখাতে নিয়ে আসবে, তখন কিছু মিষ্টি প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় তারা দাগুরামের বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। অবশ্য সঙ্গে রসিকবাবুও যান

বন্ধুদের নিয়ে রসিকবাবু যখন দাগুরামের বাড়ী পৌছিয়েছেন, তখন ঘটক বরকে নিয়ে এসে উপস্থিত করেছে। বরের নাম বিদ্যাধর দে। নাম শুনে স্বভাবতঃই মনে ধারণা জন্মে যে ছেলেটি বিদ্বান্। বিদ্যার পরিচয় জানাবার জন্যে কতকগুলো সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। বিদ্যাধর কিছু বলতে পারে না। ঘটক বলে — দেখেন মহাশয়গণ, এসব (প্রশ্নে) সাধারণতঃ লোকে ঘাবড়াইয়ে থাকে, তাতে আবার ছেলেমানুষ আরও ঘাবড়াইয়েছে।" রামকান্তবাবু রসিকের সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি বললেন —"কাথায় হাগিলে কখন গন্ধে ছাড়ে না তবে যারে মেয়েটি দেবে সে কি বোকা দেখে দেবে না কি ? কুমারের ১০ দশকর্মার পাতিলটাও ত লোকে বাজায়ে নেয়। তা জান ?" ঘটক বলে,—"মহাশয়, সময় গতিকে নিতান্ত বিজ্ঞলোক, হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, যে এসব বিপদে পড়েছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম জানেন।" রামকান্ত তখন ঘটককে থামিয়ে বলে ওঠেন,—"মহাশয়, আপনে যেন আর কথা বলেন না, আপন মুখচন্দ্র মেঘমণ্ডলে ঢেকেছে আপনে যেরূপ বলেছিলেন তাতে সকলের মনেই বিশ্বাস হয়েছিল যে ছেলেটি বোধহয় বি.এ.ই হবে তা এখন প্রত্যক্ষই প্রমাণ পাওয়া গেল।" বর ও ঘটককে বুঝিয়ে বলে যে, বাড়ীর লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা দরকার। তাই বিয়ে হবে কি না হবে, তা পরে জানানো

হবে। গোপাল নামে আর একজন বন্ধু রসিকবাবর সঙ্গে দাশুরামের বাড়ী এসেছিলো। সে বললো,—"এ যে দেখি ছাল নেই কুত্তার বাঘা নাম, বিদ্যা একেবারে শূন্য নাম রেখেছেন বিদ্যাধর।" বন্ধুর হাসতে হাসতে বিদায় হয়।

জগা পাগ্‌লা বা জ্যান্তে মরা (১৮২০ খৃঃ)—রাজকৃষ্ণ রায়॥ জ্ঞান ও কর্মের বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধির প্রচারের মধ্যে দেশে পূর্ববৎ গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যায়। এখানেও গৌণভাবে উপস্থাপিত সমাজ চিত্রের মূল্য আছে।

কাহিনী।—জগবন্ধু অর্থাৎ জগা গাঁয়ের সুপরিচিত পাগল। লোকে তাকে জগা পাগলা জানে। হঠাৎ একদিন জগা দিব্য চক্ষুতে দেখতে পায়, মানুষগুলো এক একটা জালা' বিশেষ। অমনি সে ঢিল সংগ্রহ করে, জালাগুলো ফাটাবে বলে। মাটির খালি জালাগুলোর ঠোকানির জ্বালা বরং সয় কিন্তু বিবেবুদ্ধি জ্ঞানশূন্য খালি মানুষ জালাগুলোর জ্বাল সয় না।' তার পাগ্‌লামি দেখে দুঃখে তার মা বলে ওঠেন 'মর মর্'। মাতৃবাক্য পালনীয় বলে জগা মরতে শ্মশানে যায়। সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। জগা তাকে প্রণাম করতেই নরহরি ভট্টাচার্য তাকে 'বেঁচে থাক' বলে আশীর্বাদ করেন। মাতৃবাক্যের মতো ব্রাহ্মণবাক্যও পালনীয়। জগা এখন মরবে না বাঁচবে, ভেবে পায় না। শেষে ভাবে আজ হতে সে জ্যান্ত মরা। কিন্তু একা সে এভাবে থাকবে না, দলভারী হবে সে। একে একে জ্যান্তমরার দলও বাড়তে থাকে।

পাঁচটা কলার লোভ দেখিয়ে নরহরি জগাকে দিয়ে মাটির কলসী বওয়ায়। পাঁচটা কলার কথা কল্পনা করতে করতে অন্যমনস্কতায় জগা কলসীটি হঠাৎ ভেঙে ফেলে। ব্রাহ্মণ তাকে চড় লাগায়। জগা বলে,—"উঃ বাপরে! ছেবাদ্দের চালকলা চটকানো হাতের চড় এত শক্ত। রোসো, তোমারও আত্মছেরাদ্দের বরাদ্দ কচ্চি। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার উত্তমাঙ্গে আঘাত কোল্লে পাপ হবে অধমাঙ্গ টেনে মারি আছাড়।" আঘাতে ব্রাহ্মণের হাত পা অবশ হয়ে যায়। সেও হয় জ্যান্তে মরা।

পাঁচটা পরী বেড়াতে বেরিয়েছিল। জগাকে দেখে হঠাৎ খেয়ালের বশে তাকে কল্পতরু ধরনের একটা মগ দিলো। সে মগের কাছে যা চাইবে, তাই পাবে। সেই সঙ্গে দুটো লাঠিও দিয়ে দেয়। একটা লাঠি ঠুকলে একটা ভূত এসে লাঠির মালিকের হুকুম মতো কাজ করবে। অন্য লাঠিটা ঠুকলে ভূতটি অদৃশ্য হবে। পরীক্ষা করবার জন্যে জগা মগের কাছে মুড়িমুড়কি চায় এবং

পেয়ে পেট ভরে খায়। এবারে লাঠি পরীক্ষার পালা। লাঠি ঠুকে সে ভূতকে বার করে। কিন্তু কাকে মারধোর লাগাবে? শেষে লোক না পেয়ে পরীদেরই মারতে হুকুম দেয়। পরীরা প্রমাদ গোণে, কিন্তু তারা নিরুপায়। অবশেষে জগা ভূতকে নিরস্ত করে। মারধোর খেয়ে পরীরাও জ্যান্তে মরা হয়ে রয়।

তারপর জগা ঘুরতে ঘুরতে জীবন ময়রার দোকানের সামনে হাজির হয়। জীবনের কাছে সে দুটো বাতাসা খেতে চায়। জীবন তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, এটা খয়রাতির জায়গা নয়, দোকান। তখন জগা মগের কথা ফাঁস করে তার সামনেই তার পরীক্ষা দেখায়। জীবন ভাবে মগটি হাত করতে পারলে সে একটা ছেড়ে দশটা দোকান দিতে পারবে। পাগলা মানুষ, মগটা পেতে বোধহয় বিশেষ বেগ পেতে হবে না। এই ভেবে জগাকে সে ভেতরে আদর যত্ন করে বসতে দেয়। গা টিপে দেয় বা বাতাস করে—বলে বড়ো পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, জগা একটু ঘুমোক। ঘুমোলেই সে মগটি সরিয়ে রাখবে। জগা ভাবে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। সে ঘুমের ভান করে পড়ে রয়। জীবন চুপি চুপি মগটা সরিয়ে রাখে। ঘুম থেকে যেন জেগে উঠলো—এই ভান করে জগা জীবনকে বলে, মগ কোথায়? জীবন না জানার ভান করে এবং বোকা সাজে। বার বার জগার তাগাদায় সে জগাকে ধমকায়, ভাবে, ধমকিয়ে পাগলাটাকে সরিয়ে দেবে। শেষে জীবনের বউ এবং চার ছেলে এসে সবাই মিলে জগাকে মারতে শুরু করে দেয়। কোনো উপায় না দেখে জগা লাঠি ঠুকে ভূত বার করে ওদের সবাইকে মারতে বলে। ভূত আদেশ পালন করে। মার খেয়ে খেয়ে অবশেষে জীবন মগ ফেরত দেয়। তারা ছয়জনেই আধমরা হয়ে যায়। কিন্তু ভূত মেরেই চলে।

এদিকে জগার মা কোথা থেকে সংবাদ পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়। সে ভেবেছিলো, জীবনময়রা জগাকে মারধোর করছে। কিন্তু এসে বিপরীত ব্যাপার দেখে ঠেকাতে গিয়ে সেও ভূতের কবলে পড়ে। ভূত তাকেও মারতে আরম্ভ করে। মার খেতে খেতে জগার মা পার্বতীও জ্যান্তে মরা হয়ে রয়।

এতোগুলো জ্যান্তে মরার মাঝখানে বসে জগা ভাবে,—"অন্ততঃ একটা না একটা ঘটনার দাপটে দুনিয়ার মানুষ মাত্রেই জ্যান্তে মরা। আমি দেখেশুনে, ঠেকেঠুকে এতক্ষণে বেশ বুঝলুম, এ দুনিয়া জ্যান্তর জন্যেও নয়, মরার জন্যেও নয়, কেবল জ্যান্তে মরার জন্যে।"

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে (১৮৮৪ খৃঃ)—অমৃতলাল বসু ॥ এই প্রহসনে নাগরিক জীবনের বৃত্তি সম্পর্কিত সমাজচিত্র কিছুটা স্পষ্ট। পদ্ধতিগত জটিলতা এতে অপেক্ষাকৃত কম।

কাহিনী।—খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে ও পুঁটিরাম চাটুজ্যে চক্রবর্তী মশায়ের বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে এঁদের বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকে না। ভবতারিণী নামে এক ঝিই এদের দেখাশোনা করে। খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে ছাপাখানায় কাজ করেন পুঁটিরাম চাটুজ্যে রাধাবাজারে সাহেব মেমদের কাছে কাট কাপড় বেচেন। বাঁড়ুজ্যে সারাদিন ঘুমোন রাত্রে বেরিয়ে যান। চাটুজ্যে সারাদিন বাইরে থাকেন রাত্রে আসেন। ভবির মনে মতলব আসে। সে দেখলো, দুটো বোর্ডারকে যদি একঘরে রাখা যায়, তাহলে একঘর থেকেই দুটো ভাড়া আদায় হয়। বিশেষতঃ বোর্ডার দুজনের কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় না। ভবি দুজনকে এক ঘরেই জায়গা করে দিলো। তারা দুজনেই জানলেন, এটা তাঁদের নিজের নিজের ঘর।

কিছুদিন পর থেকে বোর্ডার দুজনেই লক্ষ্য করলেন যে, তারা যে খাবার নিয়ে তাকে রেখে দেন, সেগুলো কে যেন খেয়ে নেয়। তারা ভাবেন, ভবিই তার চুরি করে। মনে মনে তিনি ভবির ওপরে অসন্তুষ্ট হন। এক বোর্ডারই অন্য বোর্ডারের খাবার খান নিজের খাবার ভেবে। ভাবেন, ভবি বুঝি তাঁর জন্যই তাকের ওপর রেখে গেছে।

একদিন চাটুজ্যে ঘরে গাঁজার ধোঁয়া পেলেন। ভবি বলে, রান্নাঘরের ধোঁয়া উঠে এসেছে। চাটুজ্যে মন্তব্য করেন,—"রান্নাঘরে তো আর গাঁজার ডালনা রাঁধা হয় না।" বিশেষ করে চক্রবর্তীও খান না যখন। ভবি তখন বলে ওপরে ছাপাখানায় একজন কাজ করেন। তিনি থাকেন, তিনিই গাঁজা খান। চাটুজ্যে ভাবেন, ওপরকার ধোঁয়া নীচে আসবে কি করে। সন্দেহ জাগলেও কিছু বলতে পারেন না তিনি। চাটুজ্যে চলে গেলে, তাঁর কাপড়, গামছা, খড়ম-টড়ম সরিয়ে রাখা হয়। বিছানাটা অবশ্য বাড়ীওয়ালার। বাঁড়ুজ্যে চলে গেলেও একই ব্যবস্থা। কেউ কারো কাপড় জামা দেখতে পান না, তাই তারা প্রত্যেকেই ভাবেন, ঘর তাঁর একারই।

একদিন ঘরে বাঁড়ুজ্যে এসে মশারীর মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে চাটুজ্যে এসে পড়েন। তাঁর দোকানের মালিক আজ তাঁকে ছুটি দিয়েছেন। ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন তাকের ওপরে একটা

পাঁউরুটি। পাঁউরুটিটা বাঁড়ুজ্যে এনে রেখেছিলেন, পরে খাবেন বলে। চাটুজ্যে—পাঁউরুটি দেখে ভাবেন, কলা দিয়ে দুধ দিয়ে পাঁউরুটি দিয়ে বেশ ভালো খাওয়া হবে। ভবির বুদ্ধি আছে। রুটিটা হাতে করে তিনি সেঁকতে যান রান্নাঘরে। ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙে মশারী তুলে বাইরে এসে অন্যজন দেখেন পাউরুটি নেই, বদলে এক ছড়া কলা। কলাটি চাটুজ্যে হাতে করে এসেছিলেন। বাঁড়ুজ্যে রাগ করে কলা নদমায় ছুঁড়ে ফেলে দুধ আনতে গেলো। এদিকে দুধ হাতে করে ঘরে ঢুকে চাটুজ্যে কলার শোকে অন্ধ। শেষে চাটুজ্যে পাউরুটি নদমায় ফেলে দেন রাগ করে।

এমন সময় ঘরে দুজনেরই একসঙ্গে উপস্থিতিতে একজন অন্যজনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বাঁড়ুজ্যে ভাবেন কাপড়ওয়ালা তো দোছতরির ঘরে থাকেন—ভবি বলেছিলো, চাটুজ্যে ভাবেন, ছাপাখানার লোকটি তো দোছতরির ঘরে থাকেন—ভবি তাকে একথা বলেছে। বাঁড়ুজ্যে চাটুজ্যে দুজনেই দুজনকে বলেন. এ ঘর তাঁর, ওঁর ঘর দোছতরিতে। শেষে কথা কাটাকাটি থেকে গালাগালি। দুজনেই দুজনকে ভাড়ার রসিদ দেখায়। কিন্তু তাতে গোলমাল থামে না। চাটুজ্যে বলেন,—"দূর বেটা! কমা, সেমিকোলন ক-এর জায়গায় ফ, হয়ের জায়গায় চ।" বাঁড়ুজ্যেও সমানে মন্তব্য করেন—"কমিনস্ মিস ইভব ফাদার্স সপ, হেম্বারচিপ, বনেট, মসলিন্" ইত্যাদি। গোলমাল শুনে ভবতারিণী ছুটে এসে বলে, এটা দুজনেরই ঘর। "ঠাকুর মশাইরা শোন, রাগ করো না। এই যে দেখ, ও ঠাকুরটী দিনের ঘরে থাকেন, আর এ ঠাকুরটী খালি রেতেই ঘরে থাকেন, তাই চক্কোত্তী মশাই বল্লে যে, পূব দিকের বারাণ্ডার ঘরটা যদ্দিন না মেরামত সম্পুন্নি হয়, তদ্দিনকার মত এই এক ঘরেই—" ইত্যাদি।

ঘরের আপাততঃ অধিকার নিয়ে চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ঘুসি পাকাতে গিয়ে নিরস্ত হন। বাঁড়ুজ্যে বলেন,—"আপনার উপর আমার কোন বিশেষ বিদ্বেষ ভাব নাই।" চাটুজ্যেও বলেন,—"আমারও মশায়ের সঙ্গে কোন সাংঘাতিক শত্রুতা নাই।" শেষে তারা সিদ্ধান্তে আসেন যে,—সবই ভবির দোষ। তারপর দুজনে দুজনের পরিচয় নেন। পুঁটিরাম চাটুজ্যে কমলাকান্ত গাঙ্গুলীর মেয়ে দিগম্বরীকে বিয়ে করতে চলেছেন। খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে আবার ঐ দিগম্বরীকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তাতেই শেষ নয়। দুদিন পরে শমন প্রাপ্তি. অন্যপূর্বা বালিকা—জাত যাবে, ড্যামেজের নালিশ।

তারপর গঙ্গায় আত্মহত্যা করেছে—এই রটিযে সে নিরুদ্দিষ্ট হযে আছে। চাটুজ্যে বলেন, বাঁড়ুজ্যের হাতেই তিনি দিগম্বরীকে তুলে দেবেন. তিনি চান না। বাঁড়ুজ্যে বলেন. তিনি তার বাগ্‌দত্তাকে নিতে চান না। আবার হাতাহাতি ও গালাগালি চলে। ভবিকে অস্ত্র সরবরাহ করতে বলেন—যুদ্ধ করবেন। শেষে উভয়ের পরামর্শে উভয়েই নিরস্ত হন। সিদ্ধান্ত করেন—যুদ্ধ অসভ্যের কাজ, ছেলেমানুষি। তখন আবার দুজনেই অপরের সুখের জন্যে বন্ধুপ্রেমে মত্ত হযে দিগম্বরীকে বিযে করতে আপত্তি জানান। শেষে ঘুঁটি চলে। চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে নিজের কড়ি দিযে খেলবেন স্থির করেন। দুজনেই চালাকী করে কড়ি ভরাট করে রাখেন—যাতে ছয পড়ে। একজন সীসে দিযে, একজন মাটী দিযে। সেযানে সেযানে কোলাকুলি, তাই বার বার ছয ফেলে শেষে পরিশ্রান্ত হযে দুজনেই ঘুঁটি খেলা বন্ধ করেন।

এই সমযে ভবি একটা চিঠি আনে। তাতে লেখা আছে, দিগম্বরী ত্রিবেণীতে স্নান করবার জন্যে নৌকোয যাচ্ছিলেন, তখন ঝড় উঠে তার নৌকো ডুবিযে দেয। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে মোহর আঁকা একটা উইল আছে। তাতে দিগম্বরী তাঁর বাগ্‌দত্ত স্বামীকে সব কিছু উইল করে দিযেছেন। বাঁড়ুজ্যে ও চাটুজ্যে তখন দুজনেই দিগম্বরীর ওপর নিজের স্বামীত্বের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। এ চিঠি কালকের। ভবি আজ হাতে দিযেছে। আজকের ডাকেও পিওন আর একটা চিঠি এনে দেয। দিগম্বরীকে জাহাজের লোকেরা উদ্ধার করেছে। তিনি জীবিত আছেন। সম্পত্তির মালিক এখন তিনি নিজে। তিনি নিজেই নাকি এখানে এসে সম্বন্ধ পাকা করে যাবেন। একথা শুনে চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে দুজনেই আবার খুব উদার হযে যান। দিগম্বরীকে তাঁরা কেউই বিযে করতে চান না। ইতিমধ্যে আর একটা চিঠি আসে। "সম্প্রতি ঠাকুরাণীর কুষ্ঠী দেখান হইযাছিল, তাহাতে জানা গেল তিনি আপনা অপেক্ষা বত্রিশ বৎসর তিন মাসের বড়—সুতরাং সম্বন্ধ ভঙ্গ করিযা কল্যরাত্রে অন্য পাত্রের সঙ্গে তাঁহার শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইযা গিযাছে। তিনি এক্ষণে শান্তিপুরের মানিকচন্দ্র মুখোপাধ্যাযের সহধর্ম্মিণী হইযাছেন।" তখন চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে দুজনেই মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। দুজনের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হযে পড়ে। বাঁড়ুজ্যে চাটুজ্যেকে বলেন,—"দেখ, আমার একটী ভাই ষেটেরা পূজোর দিনে আঁতুড়ে মারা পড়ে, তোমার মুখের দিকে আমি যত চাচ্চি, আমার ততই তাকে মনে পড়ছে। ওঃ হো! হো! হো!" চাটুজ্যে

বলে,—"কি আশ্চর্য্য, আমিও তোমায় ঠিক ওই কথা বলতে যাচ্ছিলেম। উঃ ল। ও। ত।" তারপর দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে বলেন—"আমরা দুটি সহোদর।"

পণ্ডিত মূর্খ প্রহসন (কলিকাতা—১৮৮১ খৃঃ)—ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী সরস্বতী ভট্টাচার্য নবদ্বীপ। (প্রকাশক)। স্থান কাল এবং পাত্রের মধ্যে কয়েকটি দিকে পূর্ণ অসঙ্গতি এনে অন্য দিকে অত্যন্ত সাধর্ম্য রক্ষা করে ভাবসাম্য রক্ষার পদ্ধতিতে উদ্দেশ্যমূলক রচনার নিদর্শনরূপে এই প্রহসনটি গণ্য করা যেতে পারে। সুতরাং এই পদ্ধতির নিস্তরণ পর্যবেক্ষণে সমাজচিত্র গঠণ সম্ভবপর।

কাহিনী—বঙ্গদেশ থেকে কতকগুলো ব্রাহ্মণ উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় একবার যান। পথের মধ্যে রাজবাড়ীর পাশে কয়েকজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন। তখন রাত্রি হয়ে গেছে। স্ত্রীলোক সম্ভোগের ইচ্ছা তাদের মনে জাগলো। তখন তাঁরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভয়ে স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা জেগে উঠে তাঁদের প্রহার করে। তার পর দিন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় এদের নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করা হলো বিচারের জন্যে। বিক্রমাদিত্য এঁদের চিনতে পারলেন—বঙ্গদেশের পণ্ডিত বলে। তিনি এদের কথাবার্তায় মূর্খতার প্রকাশ দেখে অবাক হলেন। তিনি বুঝতে পারেন, বঙ্গদেশে এখন কেমন অবস্থা চলছে। ব্যঙ্গ করে তিনি পণ্ডিতদের বললেন—'তোমরা যেরূপ মহাপণ্ডিত, তাতে তোমাদের কাছে দেবতারাও পরাজিত হোয়ে থাকেন।

বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমরা কেন রাত্রিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলে, তোমাদের দেশে কি রাত্রিকালেই রাজদর্শনের নিয়ম?" উত্তরে পণ্ডিতরা বলেন,—"না মহাশয়, আমাদের এই জ্যোতিষ মহাশয় গণনা করিয়া দেখিলেন যে, ঐ সময় সাক্ষাতের মহেন্দ্রযোগ।"

বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতদের পরিচয় চাইলে তাঁরা তাঁদের নিজের পরিচয় দিলেন। বৈদান্তিক বলেন যে,—"আশীর্বাদকের নাম রামগোবিন্দ শর্ম্মা, উপাধি—ন্যায়বাগীশ, ব্যবসা বেদান্ত শাস্ত্র," বেদান্ত শাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। নৈয়ায়িক বলেন,—"আমার নাম গঙ্গাগোবিন্দ শর্ম্মা, উপাধি বেদান্ত সরস্বতী। ন্যায়শাস্ত্রে অতুল্য পরাক্রমশালী।" জ্যোতিষী বলে,—"আমার নাম কৃষ্ণকান্ত

শর্ম্মা, উপাধি বৈয়াকরণচঞ্চু, ব্যবসা জ্যোতিষ শাস্ত্র গণনা করা।" কবি বলেন,—"আমার নাম অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা, উপাধি বিদ্যাসাগর, ব্যবসা মৃত ব্যক্তির জীবন দান।"

বৈদান্তিক বলেন,—"আমাদের বঙ্গদেশে এই উপাধিগুলি অজাগল স্তন স্বরূপ। আমরা গলদেশে পুস্তক বন্ধন করে রেখেছি। আপনাদের দেশের মত নয়। আমাদের সকল বিদ্যা কণ্ঠস্থ থাকে এই জন্য।"

পরদিন নবরত্ন সভায় তাঁদের সাক্ষাতের আদেশ জানিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য সভা করেন।

বিবিধ পর্যায়ের প্রদর্শনী এখানে শেষ করা হলো। অনুবাদ ইত্যাদি ধরনের প্রহসনের মধ্যেও গৌণভাবে সমাজচিত্রের পরিচয় আছে। কিন্তু গৌণভাবে উপস্থাপিত সমাজচিত্রের প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে অকারণ কাল বৃদ্ধির কোন আবশ্যকতা নেই। গ্রন্থ-বিস্তারের ভীতি অবশ্য গ্রন্থকারের পক্ষে একটি কারণ হিসেবে ধরা চলে। পরিশেষে প্রহসনের তালিকায় নামকরণ থেকে সমাজচিত্রের কিছু কিছু উপাদান আবিষ্কার করা চলে। কারণ নামকরণে লেখকের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাভাবনা নিয়োজিত থাকে। বাংলা প্রহসনের কালানুক্রমিক তালিকার ইতিহাসগত মূল্য ছাড়াও সমাজচিত্রগত মূল্যের দিকই গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করা হয়েছে এবং যথারীতি গ্রন্থে তার অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হয়েছে।

উপসংহার

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনে অভিব্যক্ত সমাজচিত্রের প্রদর্শনী শেষ হলো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেকটি প্রহসনই উপস্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি, কারণ এর অনেকগুলোই আজ লুপ্ত। যেগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যেও বর্জিত হয়েছে প্রকাশিত অনুবাদ প্রহসনসমূহ। অনুবাদ প্রহসন সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুবাদের তাগিদের মূলে অন্যতম কারণ সামাজিক চিন্তাভাবনাগত তাগিদ। সমাজচিত্রের সাধারণ উপাদান অঞ্চল-নির্বিশেষে কিংবা কাল-নির্বিশেষে সমতা রক্ষা করে চলে। সুতরাং এই উপাদানের তাগিদ চিরন্তন। কিন্তু এ ছাড়াও সামাজিক বিশেষ বিশেষ অবস্থা, স্থান অথবা কাল নির্বিশেষে কয়েকটি ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এই দুটি দিকই সামাজিক চিন্তাভাবনাগত তাগিদ। সুতরাং এই চিন্তাভাবনারও সমাজচিত্রগত মূল্য আছে, কারণ সমাজচিত্র চিন্তাভাবনা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—উভয়েরই সমাহার।

সাময়িকপত্রে কিছু প্রহসন প্রকাশ পেয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই পুনর্মুদ্রিত হয়ে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রণ সম্ভবপর হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রহসনগুলোকে প্রহসন হিসেবে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথচ এগুলোকে প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করলে অতিব্যাপ্তির ভয় আছে। তবে এরকম দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই।

অপ্রকাশিত প্রহসনগুলোকেও প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে অমর্যাদা দেওয়া সমাজচিত্র উপস্থাপকের পক্ষে একদেশদর্শিতা। বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং বিরলক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে এ ধরনের যে কয়েকটি প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলোর অধিকাংশ কীটদষ্ট অবস্থায় বর্তমান। কিন্তু লিপির বিবর্ণতা বা কীটদষ্টতার চেয়েও একটি বড়ো অসুবিধা এই যে, এগুলো যে উনবিংশ শতাব্দীর রচনা, তা নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই। কেননা, প্রথমতঃ, এগুলোতে লেখকের নাম নেই। দ্বিতীয়তঃ এগুলোর মধ্যে সাময়িক যেটুকু ইঙ্গিত আছে, তা এতো অস্পষ্ট এবং সঙ্কীর্ণ যে সেগুলো দেখে শতাব্দীর গণ্ডীভুক্ত করা দুঃসাধ্য। অবশ্য এই সঙ্কীর্ণতার জন্যেই হয়তো এগুলো মুদ্রণের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি।

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন বলতে একদিক থেকে সঙ্কীর্ণতার

প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তেমান প্রহসনের আঙ্গিক সম্পর্কে বিভিন্ন মতবিরোধ থাকায় প্রসারিত অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী গবেষকদের সুবিধার জন্যেই এই প্রসারণ সম্পাদিত হলেও পূর্বোক্ত সঙ্কীর্ণতার ক্ষেত্রে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

প্রহসনে সমাজচিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিমূলক দু-একটি প্রহসনের উপস্থিতি সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে একটি ত্রুটিমূলক পথ। এর কারণ সাহিত্য এবং সমাজবিজ্ঞান এক নয়। সুতরাং যেসব প্রহসন সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্যে সামাজিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত, সেগুলোর বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞান পন্থায় যতোই ঘটুক না কেন, তা অপূর্ণ। অবশ্য অনেকে সার্বজনীন আবেদনের তত্ত্বকে উপস্থিত করে সামাজিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তার মূল্য নির্দেশ করতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার মূল্যবিবেচনা সেক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে দাড়ায়—যা সমাজবিজ্ঞানে যথেষ্ট মর্যাদা পেয়ে থাকে। তাই প্রহসনের সমাজ-চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে গ্রন্থকার প্রতিনিধিত্বমূলক চয়ন বর্জন এবং বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হন নি। গ্রন্থবিস্তারের একটি অন্যতম কারণ হলেও, একে অতিক্রম করলে মৌলিক ত্রুটি থেকে যায়। উপস্থাপিত প্রহসনের সংখ্যাধিক্যের জন্যে তাই কৈফিয়ৎ-এর প্রয়োজন থাকে না।

সমাজচিত্রের অঞ্চলগত নির্দেশ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে গৌণ নয়। আমাদের সমাজ বলতে যে আঞ্চলিক পরিধিভুক্ত সমাজকে আমরা বুঝে থাকি, সেই আঞ্চলিক পরিধির মধ্যেও আবার চিন্তাভাবনা বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে স্বীকার করা হয়ে থাকে। সমাজের পরিধির মধ্যে এই সমস্ত কেন্দ্রের চিন্তাভাবনা কিংবা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগত সম্পর্ক নির্দেশের মধ্যে দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের অনেক তথ্য মূল্য পেয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক প্রহসনকারের আবাসস্থান বা রচনাস্থান, প্রচার কেন্দ্র অর্থাৎ প্রকাশস্থান ইত্যাদি সম্পর্কেও আধুনিক যুগে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মুদ্রণ, অভিনয় ইত্যাদি সম্পর্কিত অনুকূল চাপে এই সমস্ত নামাঙ্কন চিন্তাভাবনার কেন্দ্রস্থলসমূহ ব্যক্ত করে না। এ সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণও তাই হয়ে ওঠে ত্রুটিপূর্ণ। যতোগুলো প্রহসনের রচনাস্থান কিংবা প্রকাশস্থান সম্পর্কে জানা যায়, সেগুলোকে প্রয়োজনবোধে লিপিবদ্ধ রাখা অবৈজ্ঞানিক নয়। কিন্তু বাইরের কতকগুলি অসুবিধাই এই অবৈজ্ঞানিক মতকেই সম্পূর্ণ অতিক্রম করবার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রহসনের সমাজচিত্রের মধ্যে মাত্রানিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু বিশেষ শতাব্দীর সমাজ চিত্রের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পেতে গেলে প্রহসন পর্যায়ভুক্ত রচনাগুলোকে বর্জন করা চলে না। শতাব্দী বিশেষের চিন্তা-ভাবনা যতো রকম রীতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে তার প্রত্যেকটিরই সমান মূল্য আছে। কারণ রীতিবিশেষের মধ্যে সমাজচিত্রের এমন কতকগুলো উপাদান আবিষ্কার সম্ভবপর--যা অন্যত্র দুর্লভ। সুতরাং মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাহুল্য থাকায় এই রীতিবিশেষকে বর্জন করবার পক্ষে যারা মত পোষণ করেন, তাঁরা প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানকেই অবহেলা করেন। শুধু তাই নয়। সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যেও এই রীতিবিশেষ গ্রহণে কিংবা অতি সাধারণ পাঠক এই প্রকাশ প্রবণতায় আমরা এর একটি পৃথক মূল্য নিশ্চয়ই দিতে পারি। উনবিংশ শতাব্দীর বটতলার পথপুস্তিকার Street Literature। সন্ধান লাভ করেছি, সেগুলোর অধিকাংশই প্রহসন রীতিতে রচিত। এগুলোর মধ্যে অশ্লীলতার যথেষ্ট প্রকাশ আছে। সংস্কারবদ্ধ বর্তমান গবেষকদের কাছে এর প্রয়োজন অনুভূত না হলেও সমাজ বিশেষের যৌন-মনস্তত্ত্বের তৎকালের সম্ভাব্য গবেষণার পথরোধ করা বর্তমান গ্রন্থকারের পক্ষে অসম্ভব জনক।

এইবার প্রহসনের সমাজচিত্র সম্পর্কিত একটি বিতর্কের প্রসঙ্গে আসা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর বহু প্রহসনগুলোর অধিকাংশই ব্যক্তিগত আক্রমণ ও ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার প্রয়াস। সমাজজীবনে সাময়িক বিরোধের ইতিহাসে এই কুৎসা রটনা বা ভিন্ন পদ্ধতি এবং বিবরণ অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রুচিশীল পাঠক এগুলো সম্পর্কে নাসিকাকুঞ্চন করেন। এই কুৎসামূলক প্রহসনগুলোকে এক দিকে যেমন পোষণ করে এসেছে নষ্টরুচি দর্শক, অন্য দিকে তেমন ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন থিয়েটার কর্তৃপক্ষও এর বিরোধী ছিলেন না। "বঙ্গীয় নাট্যশালা" গ্রন্থে ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় (ব্যোমকেশ মুস্তফী) সমসাময়িককালের একটি বিশেষ যুগের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন —" এই সকল বিসদৃশ চিত্রের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের রুচি ক্রমশঃ ব্যক্তিগত গালি ও কুৎসা শুনিবার দিকে চলিতে লাগিল। সে ক্ষুধা মিটাইল,— ক্ল্যাসিক থিয়েটার ও মধ্যযুগের মিনার্ভা থিয়েটার। এই দুই নাট্যশালায় অভিনীত ঐরূপ প্রহসনগুলির আর নাম করিয়া কাজ নাই। উহাদের স্মৃতি যত শীঘ্র লোপ হয়, ততই সাহিত্যের এবং সমাজের মঙ্গল।" নব্য সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কলকাতার রঙ্গালয়ের এরকম গতিবিধি সহজেই বিভিন্ন অঞ্চলের

রঙ্গালয়কে প্রভাবিত করেছে এবং বলাবাহুল্য সমর্থনকারী দর্শকেরও অভাব হয় নি। পূর্বোক্ত লেখক তাই মন্তব্য করেছেন,—"আমাদের দেশে দর্শকের রুচি বলিয়া একটা পদার্থ নাই, নাটাশালা হইতে যে রুচি গড়িয়া দেওয়া হয়, দর্শক সমাজ তাহারই অনুসরণ করেন।"[১] বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এগুলো সামাজিক ব্যাধি এবং এর নিরাময়ও প্রশংসার্হ। কিন্তু ব্যাধির উপস্থিতি বা ইতিহাস ছাড়া যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান অচল, তেমনি ঐসব সামাজিক ব্যাধির পরিচয় এবং ইতিহাস জানাও সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য উভয় বিজ্ঞানকে সমগোত্রীয় করে উপস্থাপিত করলে সমাজবিজ্ঞানকে অনেকটা সঙ্কীর্ণ অর্থে ধরা হয়।

প্রহসনের সমাজচিত্র আপাত দর্শনে সমাজের ভয়াবহ রূপের স্বাক্ষর বলে অনুভূত হবে। সমাজের এই ভয়াবহতা বা বীভৎসতার মধ্যে বাস্তব সত্য যে বিন্দুমাত্র বর্তমান নেই—তা নয়। রুচি এবং সাহিত্যিক সংস্কার সমাজের ভয়াবহরূপের অনেক অংশই সভ্যতার নামে আবৃত রেখেছে। প্রহসন এই রূপকেই অনাবৃত করবার চেষ্টা করেছে। সুতরাং সমাজের এই ভয়াবহ রূপ উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমাদের সর্বদা জেনে রাখা উচিত যে, এইসব চিত্র বর্ধিত মাত্রায় অবস্থান করেছে। মাত্রাতিরেকই এই বীভৎসতার জন্যে অনেকটা দায়ী।

প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণে সমাজের সর্বাঙ্গীণ চিত্র উপস্থাপিত হতে পারে নি। মানসিক কতকগুলো বাধা ছাড়াও বাহ্য কতকগুলো বাধা অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকায় সমাজচিত্রের অনেক অংশই প্রহসনে ধরা পড়ে নি। তাছাড়া প্রচুর প্রহসন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, যেগুলোর মধ্যে উপস্থাপিত সমাজচিত্রে অনেক মূল্যবান্ উপাদান থাকা সম্ভব ছিলো। কিন্তু সেগুলো উদ্ধার করা কোনো মতেই সাধ্য নয়। শতাব্দীর এপারে দাঁড়িয়ে এবং একবিংশ শতাব্দীর কিনারায় এসে বর্তমান গ্রন্থকার যন্ত্রণাক্ত মনে একথা অনুভব করেন।

১। বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

॥ বাংলা প্রহসনের কালানুক্রমিক তালিকা ॥

(১৮৫৪—১৮৯৯)

গত শতাব্দীর প্রচুর প্রহসন আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র সেগুলোর নামই পাওয়া যায়। অনেক প্রহসনের তাও পাওয়া যায় না। ক্যালকাটা গেজেটে প্রদত্ত সরকারী নথি, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর তালিকা, পত্র পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও উল্লেখ, প্রহসনের বা অন্যান্য পুস্তকের চতুর্থ কভারে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন এবং গ্রন্থকারের পরিচয়জ্ঞাপক বিশেষণাবলী ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে এই তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে বিশেষ করে, যে বিজ্ঞাপনে প্রকাশের সম্ভাব্যতার কথাই বলা হয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে পরে প্রকাশিত হবার কোনো প্রমাণ নেই, সেগুলোর নাম বর্জিত হয়েছে। তাছাড়া প্রাপ্ত প্রহসন থেকেও নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞাপন বা নথির সত্যতা সম্পর্কে তালিকা-কারের কোনো দায় নেই।

লক্ষণ বিচার করে কয়েকটি প্রহসন ঊনবিংশ শতাব্দীর বলে নিশ্চিত ধারণা হয়েছে অথচ সেগুলোর টাইটেল পেজ ছিন্ন থাকা এবং অন্যত্র পরিচয় অনুল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তালিকায় অপাঙ্‌ক্তেয় রাখা সম্ভব হয় নি।[১]

১৮৫৪

১। বাবু—কালীপ্রসন্ন সিংহ

২। কুলীনকুলসর্বস্ব—রামনারায়ণ তর্করত্ন (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭)

১৮৫৫

৩। নির্বোধ বোধ[২]— ? (পৃঃ ৬)

১। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত প্রহসন 'হাস্যার্ণব— ? (১৮২২ খৃ) এবং 'কৌতুক সর্বস্ব' —রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (১৮২৮ খৃ পৃঃ ৭৮)—এ দুটিকে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজন নেই। তেমনি প্রয়োজন নেই জোডরেলের রচিত, গোলোকনাথ দাসের অনুদিত ও বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত 'কাল্পনিক সংবাদ ' প্রহসনটিকে অন্তর্ভুক্ত করবার

২। A Farce condemning the songs usually sung at Bengali Akharas, Calcutta—1955 (?)

১৮৫৭

৪। বিধবা পরিণয়োৎসব—বিহারীলাল নন্দী

৫। বিধবা বিষম বিপদ— ?

৬। চপলা চিত্ত চাপল্য—যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

১৮৫৮

৭। চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ৯৫)

৮। কলি কৌতুক—শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি

১৮৫৯

৯। বাসর কৌতুক—শ্যামাচরণ দে (পৃঃ ৪০)

১৮৬০

১০। বিধবা বিরহ—শিমুয়েল পির বক্‌স্

১১। একেই কি বলে সভ্যতা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (পৃঃ ৩৪)

১২। বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (পৃঃ ৩২)

১৩। বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক—প্রসন্নকুমার পাল (পৃঃ ১০৬)

১৮৬১

১৪। দলভঞ্জন—তারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ৩+৮০)

১৫। কুলীন কায়স্থ—অম্বিকাচরণ বসু

১৬। শুভস্য শীঘ্রং—ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল (হরিশ্চন্দ্র মিত্র)

১৮৬২

১৭। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—ভুবনমোহন চক্রবর্তী

১৮। পাড়াগাঁয়ে একি দায় ?—রামনাথ ঘোষ (পৃঃ ৪৭)

১৯। ম্যাও ধরবে কে ?—হরিশ্চন্দ্র মিত্র (পৃঃ ৬০)

২০। গুলি হাড়কালি নাটক—ভুবনেশ্বর লাহিড়ী

২১। অশুভ পরিহারক—গৌরমোহন বসাক (পৃঃ ৫১)

২২। পুনর্বিবাহ—গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৭২)

২৩। শ্যামকিশোরী—হরিশ্চন্দ্র বসাক

২৪। কি মজার গুড ফ্রাইডে— ? (পৃঃ ২৪)

১৮৬৩

২৫। হুড়কো বৌয়ের বিষম জ্বালা—রামকৃষ্ণ সেন

২৬। একেই বলে বাবুগিরি—কালাচাঁদ শর্মা ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়

২৭। কন্যা বিক্রয়— নফরচন্দ্র পাল

২৮। না বিইয়ে কানাইয়ের মা— ?

২৯। পরের ধনে বরের বাপ—ব্রজমাধব শীল

৩০। কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে
—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ১৬)

৩১। ঘর থাকতে বাবুই ভেজে—ব্যোমকেশ বাঙ্গাল
(হরিশ্চন্দ্র মিত্র) (পৃঃ ২৬)

৩২। বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি—রাধামাধব হালদার (পৃঃ ৬৬)

৩৩। অশুভস্য কালহরণং—গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী

৩৪। কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের একি দম্ভ—মুন্সী নামদার

১৮৬৪

৩৫। মুষলং কুল নাশনং—দ্বারকানাথ মিত্র (পৃঃ ৩৬)

৩৬। চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা—বিশ্বম্ভর দত্ত (পৃঃ ৯২)

৩৭। বিধবা বিলাস—যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩৮। ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে—হরিমোহন কর্মকার

১৮৬৫

৩৯। যেমন কর্ম তেমনি ফল—রামনারায়ণ তর্করত্ন (পৃঃ ৫৫)

১৮৬৬

৪০। বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাটক
—রামনারায়ণ তর্করত্ন (পৃঃ ১৫৮)

৪১। সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র

৪২। বিয়ে পাগলা বুড়ো—দীনবন্ধু মিত্র (পৃঃ ৫৪)

৪৩। বুঝলে কিনা ?—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ১৭৩)

১৮৬৭

৪৪। বারুণী বিলাস—নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ০৬)

৪৫। তারপর কি নাটক— ?

৪৬। একেই বলে ঘোর কলি— ?

৪৭। সম্বন্ধ সমাধি— ?

৪৮। কিছু কিছু বুঝি—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
—৩১শে অক্টোবর (পৃঃ ১০৪)

৪৯। এঁরাই আবার বড়লোক—নিমাইচাঁদ শীল
—১২ নভেম্বর (পৃঃ ১০৬)

১৮৬৮

৫০। বিপদই সম্পদের মূল—কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়

৫১। বরের কাশীযাত্রা—বনমালী চট্টোপাধ্যায়

৫২। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

৫৩। কলির বৌ হাড় জ্বালানী—মুন্শী নামদার (৪র্থ সং)
—১০ই মার্চ ৮৬৯ (পৃঃ ১৫)

৫৪। দুই সতীনের ঝগড়া—মুন্শী নামদার (২য় সং)
—১১ই মার্চ ১৮৬৯ (পৃঃ ১৬)

৫৫। কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে—সেখ আজিমদ্দী (২য় স) (পৃঃ ১৬)

১৮৬৯

৫৬। অসুরোদ্বাহ—জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ

৫৭। বাহবা চৌদ্দ আইন— ? (পৃঃ ১২)

৫৮। বেশ্যা বিবরণ— ? (পৃঃ ১২)

৫৯। ননদভাজের ঝগড়া—মুন্শী নামদার (পৃঃ ১৬)

৬০। কামিনী নাটক—ক্ষেত্রমোহন ঘটক—৬ই মার্চ (পৃঃ ১১২)

৬১। চক্ষুদান—রামনারায়ণ তর্করত্ন—২৫শে নভেম্বর (পৃঃ ২৬)

৬২। কলির বৌ ঘরভাঙ্গানি—মুন্শী নামদার (পৃঃ ১৬)

৬৩। উভয় সঙ্কট—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রামনারায়ণ তর্করত্ন)
—১৯শে নভেম্বর (পৃঃ ২৭)

১৮৭০

৬৪। কলিকালের গুড়ুক ফোঁকা নাটক—অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ও
হীরালাল দত্ত (পৃঃ ৩৬)

৬৫। ফাল্‌তো ঝক্‌ড়া—জীবনকৃষ্ণ সেন—৫ই মে

৬৬। উদ্ভট—মতিলাল মজুমদার—২০শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৫০)

৬৭। মাগ সর্ব্বস্ব—হরিমোহন কর্ম্মকার (২য় স.)
—২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮ (পৃঃ ৩৩)

৬৮। সুধা না গরল—জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার—২৮শে জুলাই (পৃঃ ৭০)

৬৯। আই ডোণ্ট কেয়ার—বঙ্কবিহারী মিত্র—২৭শে মে (পৃঃ ৩৬)

১৮৭১

৭০। রতনেই রতন চেনে—অক্ষয়কুমার সাধু

৭১। ষষ্ঠীবাটা বিষম ল্যাঠা—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
—১২ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৪)

৭২। একাদশীর পারণ—বিপিনবিহারী দে (পৃঃ ৩৬)

৭৩। গিরিবালা প্রহসন— ? (পৃঃ ৪৪)

৭৪। জ্ঞানদায়িনী—কেদারনাথ ঘোষ (পৃঃ ৪০)

১৮৭২

৭৫। কিঞ্চিৎ জলযোগ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—২০শে সেপ্টেম্বর

৭৬। অনূঢ়া যুবতী—শ্রীমতী নিতম্বিনী—২৩শে ডিসেম্বর (পৃঃ ৩৪)

৭৭। জামাই বারিক—দীনবন্ধু মিত্র—২০শে মার্চ (পৃঃ ৭৮)

৭৮। সমাজ রহস্য—অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৯। দারোগা মশাই—হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ২+৬০)

৮০। এই এক রকম—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ৩২)

৮১। সপত্নী কলহ—হরিশ্চন্দ্র মিত্র

৮২। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
—১২ই ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৩৪)

৮৩। টেক টেক না টেক না টেক একবার তো সি—অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
—২৬শে ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ১২)

৮৪। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়
—২৫শে নভেম্বর (পৃঃ ৪৮)

৮৫। ভারত দর্পণ—প্রিয়লাল দত্ত ও ললিতমোহন শীল (পৃঃ ৭৬)

৮৬। দেশাচার—অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৪৮)

৮৭। নয়শো রুপেয়া—শিশিরকুমার ঘোষ—৬ই ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৯৭)

৮৮। হতভাগ্য শিক্ষক—হরিশ্চন্দ্র মিত্র

১৮৭৩

৮৯। উঃ মোহন্তের এই কাজ—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—৯ই অক্টোবর

৯০। আর কেহ যেন না করে—নিত্যানন্দ শীল

—১লা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৫৪)

৯১। মোহন্তের এই কি কাজ !!! (১ম)—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (পৃঃ ৭০)

৯২। মোহন্তের এই কি কাজ !!! (২য়)—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস

—২০শে ডিসেম্বর

৯৩। যমালয়ে এলোকেশীর বিচার—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায

—২০শে ডিসেম্বর (পৃঃ ৮)

৯৪। আকাট মূর্খ—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায

৯৫। মহন্তের কি দুর্দ্দশা—তিনকড়ি মুখোপাধ্যায

—২৩শে ডিসেম্বর (পৃঃ ৪৪)

৯৬। মা এযেচেন !!!—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায (পৃঃ ৪০)

৯৭। নাপিতেশ্বর নাটক—নগেন্দ্রনাথ সেন—১৬ই জুন (পৃঃ ৬৯)

৯৮। মোহন্তের এই কি দশা !!—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

৯৯। তারকেশ্বর নাটক—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায

—১০ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৪০)

১০০। মোহন্তের এই কি কাজ !—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

—২৫শে আগষ্ট (পৃঃ ৭০)

১০১। সাধের বিয়ে—ফেলুনারায়ণ শীল—১৯শে অক্টোবর (পৃঃ ৪২)

১০২। বারণাবতের লুকোচুরি— ? —৪ঠা সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৩৮)

১০৩। আজকের বাজার ভাও—দুর্গাদাস ধর—১২ই নভেম্বর (পৃঃ ১৪)

১০৪। তীর্থ মহিমা—নিমাইচাঁদ শীল—৯ই ডিসেম্বর

১০৫। মোহন্তের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—? (পৃঃ ৩২)

১০৬। গত নিকাশ ও হাল বন্দোবস্ত—শ্রীনাথ কুণ্ডু (পৃঃ ১৭)

১৮৭৪

১০৭। মোহন্তের চক্রভ্রমণ—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায

—৫ই ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৫৮)

১০৮। বিবাহ ভঙ্গ—হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায—১লা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৮৮)

১০৯। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—? (নবরঙ্গ নাট্যশালা)
—৮ই জানুয়ারী (পৃঃ ৮৮)

১১০। মোহন্তের যেমন কি তেমন—নারায়ণচন্দ্র—৩রা মে (পৃঃ ১৪)

১১১। মোহন্তের শেষ কান্না—?

১১২। মোহন্তের কি সাজা—চন্দ্রকুমার দাস (পৃঃ ৫৮)

১১৩। মোহন্তের দফা রফা—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১১৪। নবীন মহন্ত—রাজেন্দ্রলাল ঘোষ

১১৫। কেরাণী দর্পন—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

১১৬। তুই না অবলা !!!—কুঞ্জবিহারী বসু

১১৭। একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব—বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য
(গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়)—২০শে জানুয়ারী (পৃঃ ৭৮)

১১৮। মহান্ত পক্ষে ভূতো নন্দী—হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়
—১লা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ২৬)

১১৯। বিধবার দাতে মিশি—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ৮৮)

১২০। হাসিও আসে কান্নাও পায়—ভুক্তভোগী (পৃঃ ২৬)

১২১। মাতালের জননী বিলাপ—রামচন্দ্র দত্ত (পৃঃ ১৫)

১২২। আমি তো উন্মাদিনী—শ্রীনাথ চৌধুরী—১০ই জানুয়ারী (পৃঃ ৬০)

১২৩। মোহন্তের কারাবাস—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
—১লা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৮৮)

১২৪। মাতালের সভা—পণ্ডিত মানব জন্ম নারায়ণ বিদ্যাশূন্য
—৯ই জুন (পৃঃ ৩২)

১২৫। বড় বাজারের লড়াই—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
—৫ই জুন (পৃঃ ১২)

১২৬। এলোকেশী, নবীন, মোহন্ত বাজেন্দ্রলাল দাস
—২রা আগষ্ট (পৃঃ ১২)

১২৭। বাজারের লড়াই—শিশিরকুমার ঘোষ—১লা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৩৪)

১২৮। ভণ্ড তপস্বী—দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ২৮)

১২৯। দেশের গতিক—হরিমোহন ভট্টাচার্য্য (পৃঃ ৭৫)

১৩০। ধূর্ত্ত প্রহসন—? (পৃঃ ৩১)

১৩১। মেয়ে মনষ্টার মিটিং প্রহসন—? (পৃঃ ৩১)

১৮৭৫

১৩২। এই কলিকাল—রাধামাধব হালদার

১৩৩। পাপের প্রতিফল—কেদারনাথ ঘোষ

১৩৪। বলদ-মহিমা নাটক—? (পৃ: ১৫)

১৩৫। সমালোচক—? (পৃ: ৩২)

১৩৬। পাপের উচিত দণ্ড—যদুনাথ দাস (পৃ: ৪ + ১৮)

১৩৭। গ্রন্থকার প্রহসন—? (পৃ: ৪২)

১৩৮। বাঙ্গালীর মুখে ছাই—গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
—১৪ই জুন (পৃ: ৩৫)

১৩৯। ইহারই নাম চক্ষুদান—যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
—১লা আগষ্ট (পৃ: ২২)

১৪০। নব্য উকীল—রমানাথ সান্যাল—২২শে সেপ্টেম্বর (পৃ: ৬৪)

১৪১। নাগাশ্রমের অভিনয—কেঁডেলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র (মনোমোহন বসু)
—২৮শে জানুয়ারী (পৃ: ১২৬)

১৪২। বাসর কৌতুক—বটকৃষ্ণ রায়—১২ই ডিসেম্বর (পৃ: ৪৮)

১৪৩। ডাক্তারবাবু—জনৈক ডাক্তার (ভুবনচন্দ্র সরকার)
—১৫ই জুন (পৃ: ১২৮)

১৪৪। প্রণয় প্রকাশ—গঙ্গাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩রা—এপ্রিল (পৃ: ৪৭)

১৪৫। কলির দশদশা প্রহসন—কানাইলাল সেন—১৫ই মে (পৃ: ৯৫)

১৪৬। তুমি কার প্রহসন—গঙ্গাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৬ই জুলাই (পৃ: ৮১)

১৪৭। জয় মা কালী, কালীঘাটে এ কি চুরি!—'রাজরত্ন'
—২৫শে আগষ্ট (পৃ: ১২)

১৪৮। কি মজার কর্ত্তা—শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী—২০শে জানুয়ারী (পৃ: ১২)

১৪৯। কলির বৌ হাড জ্বালানি—হরিহর নন্দী—১৫ই এপ্রিল (পৃ: ১৪)

১৫০। কি লাঞ্ছনা—শ্রীপতি ভট্টাচার্য (পৃ: ৪৩)

১৫১। মাছে পোকা—বাদলবিহারী চট্টোপাধ্যায় (পৃ: ১২)

১৫২। সরস্বতী পূজা—বিরাজমোহন চৌধুরী—৯ই ফেব্রুয়ারী (পৃ: ৪৫)

১৫৩। বিধবা বঙ্গবালা—?—২৪শে সেপ্টেম্বর (পৃ: ১২৮)

১৫৪। হিত সাধন—যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (?) (বি: ১৮৭৫)

১৫৫। হীরক অঙ্গুরীয়ক—ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী—১৮ই জানুয়ারী (পৃ: ৩২)

১৫৬। বঙ্গমাতা—? (পৃঃ ১২)

১৮৭৬

১৫৭। চোরের উপর বাটপাড়ি—অমৃতলাল বসু—১১ই নভেম্বর (পৃঃ ৩৪)

১৫৮। এর উপায় কি ?—মীর মশাররফ হোসেন

১৫৯। রামের বিয়ে প্রহসন—কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার
—২৩শে আগষ্ট (পৃঃ ১৫)

১৬০। একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব—গিরিগোবর্দ্ধন (গোপালচন্দ্র রায়)
—২৮শে এপ্রিল (পৃঃ ৮২)

১৬১। বাঙ্গালীবাবু—কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায—১০ই মার্চ (পৃঃ ৭৫)

১৬২। ভ্যালারে মোর বাপ—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায
—১৮ই আগষ্ট (পৃঃ ৬৩)

১৬৩। ছেলের কি এই গুণ, স্ত্রীর জন্যে মাকে খুন—কাশীনাথ বর্মা
—১৫ই জুন (পৃঃ ৮)

১৮৭৭

১৬৪। হাযরে পযসা—কিশোরলাল দত্ত—২২শে মাচ (পৃঃ ২৭)

১৬৫। এমন কর্ম্ম আর করব না—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
—৭ই জুলাই (পৃঃ ১১৮)

১৬৬। ঘেঁাটমঙ্গল—রামনিধি কুমার

১৬৭। যেমন দেবা তেমি দেবী—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায
—১ লা আগষ্ট (পৃঃ ১০৩)

১৬৮। ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম—হরিহর নন্দী
—২ই এপ্রিল (পৃঃ ১৯)

১৬৯। কলির কুলটা প্রহসন—বটবিহারী চক্রবর্তী
—১৫ই এপ্রিল (পৃঃ ২৬)

১৭০। পল্লী গ্রামের সামাজিক অবস্থা বিযযক—রাখালদাস হাজরা
—৭ই জুলাই (পৃঃ ৬৫)

১৭১। ঋকুমারীর মাশুল—? (পৃঃ ২৮)

১৭২। কুলীন কুমারী—পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য

১৮৭৮

১৭৩। গুপ্ত বৃন্দাবন—প্রিয়নাথ পালিত (পৃঃ ৯৭)

১৭৪। কপালে ছিল বিয়ে, কাঁদলে হবে কি—বিষ্ণু শর্ম্মা
—৬ই মে (পৃঃ ২৮)

১৭৫। দ্বাদশ গোপাল—'জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামানী' (রাজকৃষ্ণ রায়)
—১১ই জুলাই

১৭৬। খণ্ডপ্রলয—কেশবচন্দ্র ঘোষ (পৃঃ ৩০)

১৭৭। যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ৬ই জুলাই

১৭৮। মজার কিশোরী ভজন—শশিভূষণ কর—৩১শে এপ্রিল (পৃঃ ২২)

১৭৯। বার ইয়ারী পূজা প্রহসন—'জনৈক পাণ্ডা' (শ্যামাচরণ ঘোষাল)
—১০ই মে (পৃঃ ৫৮)

১৮০। হঠাৎ বাবু—হরিহর নন্দী

১৮১। মক্কেল মামা—নটবর দাস—১৮ই আগষ্ট (পৃঃ ১১)

১৮২। মামা ভাগ্নীব নাটক—মহেশচন্দ্র দাস দে— ৭ই আগষ্ট (পৃঃ ১২)

১৮৩। এবাবকাব অল্পমজা, দু তিনদিন দুর্গাপূজা—নগেন্দ্রনাথ সেন
—২৬শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১৬)

১৮৪। সভ্যতা সোপান—প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায
—২৮শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৩৬)

১৮৫। দর্পণ—দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায—২১শে জানুয়ারী (পৃঃ ৩১)

১৮৬। বাসর কৌতুক—নন্দলাল রায—২৩শে জানুযারী (পৃঃ ৮৬)

১৮৭। দু কুল ফর্সা—নিবারণচন্দ্র দে (পৃঃ ২০)

<u>১৮৭৯</u>

১৮৮। পাশ করা ছেলে—দুর্গাচরণ রায—২৮শে জুলাই (পৃঃ ২০)

১৮৯। রোকা কড়ি চোকা মাল—হীরালাল ঘোষ
—৪ঠা অক্টোবর (পৃঃ ১৯)

১৯০। এঁরা আবার সভ্য কিসে ?—জযকুমার রায
—২৪শে জানুযারী (পৃঃ ৭৬)

১৯১। এই কি সেই ?—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায
—১৬ই অক্টোবর (পৃঃ ১৯)

১৯২। আমি তোমারই —যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায
—২৩শে মার্চ (পৃঃ ৩১)

১৯৩। স্বর সম্মেলন—অম্বিকাচরণ গুপ্ত—৩রা মার্চ (পৃঃ ১১)

১৯৪। শনীসন্দর্শন বা সামাজিক দৃশ্য—কামিনীগোপাল চক্রবর্ত্তী
—১০ই আগষ্ট (পৃঃ ১৬)

১৯৫। পদীর বেটা পদ্মলোচন—গোপালচন্দ্র মিত্র—২০শে জুলাই (পৃঃ ২০)

১৯৬। কালের কি কুটিল গতি—রামপদ ভট্টাচার্য—৩রা আগষ্ট (পৃঃ ৮)

১৯৭। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—হরিহর নন্দী—২০শে ডিসেম্বর (পৃঃ ২০)

১৯৮। প্রণয়ের প্রতিফল—মোহিনীমোহন ঘোষাল (২য় সং)
—২রা ডিসেম্বর

১৯৯। ধনুর্ভঙ্গ—কালীপদ মুখোপাধ্যায় (বারাণসী)—(পৃঃ ৬০)

১৮৮০

২০০ রাজা হওয়া বিষম দায়—মহিমচন্দ্র গুপ্ত (পৃঃ ৮৪)

২০১। পাঁচ পাগলের ঘর—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
—৩০শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৬৭)

২০২। আচাভূয়ার বোম্বাচাক—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
—১০ই আগষ্ট (পৃঃ ৮৪)

২০৩। অপূর্ব্ব ভাবক উদ্ধার—নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ

২০৪। কলির সঙ্—শৈলেন্দ্রনাথ হালদার—৬ই অক্টোবর (পৃঃ ৬৩)

২০৫। নাটকাভিনয় !!! প্রহসন—দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী
—১২ই জানুয়ারী (পৃঃ ৩০)

২০৬। ননদ ভাই বো'র ঝগড়া—হরিহর নন্দী—১লা মার্চ (পৃঃ ৮)

২০৭। তুমি যে সর্ব্বনেশে গোবর্দ্ধন—শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়
—৪ঠা এপ্রিল (পৃঃ ৩২)

২০৮। কলির কুলাঙ্গার—হরিহর নন্দী—৪ঠা জুলাই—(পৃঃ ১৬)

২০৯। আশ্চর্য্য কেলেঙ্কার—উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল—১৮ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ২৬)

২১০। পাজীর বেটা ছুঁচো—উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল—২৩শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৮)

২১১। পাশ করা বাবু—কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়—১২ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ২৪)

২১২। ডিক্রি-ডিস্‌মিস—অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
—৪ঠা অক্টোবর (পৃঃ ২৪)

২১৩। অযোগ্য পরিণয়—?—৮ই এপ্রিল (পৃঃ ৭৪)

২১৪। কমলা কাননে কদমের চারাব আঁটি—দীননাথ চন্দ (পৃঃ ৪+৭৭)

২১৫। কালের বৌ—হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৩রা জুন (পৃঃ ২১)

১৮৮১

২১৬। তিলতর্পণ—অমৃতলাল বসু

২১৭। বৌ ঠাকরুণ—?

২১৮। কলির মেয়ে ছোট বৌ ওরফে ঘোর মূর্খ—অম্বিকাচরণ গুপ্ত (পৃঃ ৩৬)

২১৯। শালাবাবুর আক্কেল—হেমচন্দ্র দত্ত

২২০। অবতার—ফকিরদাস বাবাজী (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ)
—১০ই অক্টোবর (পৃঃ ২০)

২২১। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
—২৫শে ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৩৬)

২২২। গুণের শ্বশুর—কালিপদ ভাদুড়ী (২য় সং)—৭ই নভেম্বর (পৃঃ ৩৯)

২২৩। বক্কেশ্বরের বোকামি—কামিনীগোপাল চক্রবর্তী
—২৫শে আগষ্ট (পৃঃ ২২)

২২৪। বঙ্গরত্ন—? (মুঙ্গের নাট্যসমাজ)—৫ই জুন (পৃঃ ২২)

২২৫। পণ্ডিত মূর্খ নাটক—ব্রহ্মব্রত ভট্টাচার্য্য ?—২৫শে আগষ্ট (পৃঃ ৬৬)

২২৬। এই এক প্রহসন—? (পৃঃ ৫৯)

১৮৮২

২২৭। গোলক ধাঁদা—কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী—১৮ই জুলাই (পৃঃ ২৪)

২২৮। হাতে হাতে ফল—বঙ্গবিলাস সমজদার
(ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার) ২৯শে মে (পৃঃ ৬০)

২২৯। কর্ম্মকর্ত্তা—সুরেন্দ্রনাথ বসু

২৩০। জলযোগ—ঈশানচন্দ্র মুস্তফী—১৭ই মে (পৃঃ ৮২)

২৩১। আক্কেল গুড়ুম—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—৮ই অক্টোবর (পৃঃ ২৫)

২৩২। বড়বাবু—কেশবচন্দ্র ঘোষ—২৯শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৪৮)

২৩৩। পিণ্ডদান—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—১লা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ২৩)

২৩৪। যেমন রোগ তেমনি রোঝা—রাজকৃষ্ণ দত্ত
—২রা এপ্রিল (পৃঃ ৫৭)

২৩৫। বড় ঘরের বড় কথা—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
—৯ই এপ্রিল (পৃঃ ৫৭)

২৩৬। চক্ষুঃস্থির প্রহসন—কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—৪ঠা জুন (পৃঃ ৪২)

২৩৭। ত্রিপুরাশৈল নাটক—শরচ্চন্দ্র গুপ্ত—৪ঠা জুন (পৃঃ ৪২)

২৩৮। আক্কেল সেলামী—রাজেন্দ্রনাথ রায়—১লা জুলাই (পৃঃ ৩২)

২৩৯। দুর্গাপূজার মহাধুম—কৃষ্ণচন্দ্র পাল—১৭ই অক্টোবর (পৃঃ ১০)

২৪০। অপূর্ব্ব দল—? (পৃঃ ৫৫)

২৪১। বাবার ছেলের মা—শশাঙ্ক বিহারী গুহ (পৃঃ ১৩)

১৮৮৩

২৪২। বৌ বাবু—গোঁসাইদাস গুপ্ত—১০ই এপ্রিল (পৃঃ ৩৬)

২৪৩। ডিশ্ মিশ্—অমৃতলাল বসু—২০শে ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৩১)

২৪৪। ভাবতে কোর্টশিপ—বিপিনবিহারী ঘোষাল
—২৫শে ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৬৭)

২৪৫। সমাজ সংস্করণ—টি এন্ জি. (ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল)
—২০শে মে (পৃঃ ২৮)

২৪৬। কার মরণে কেবা মরে মলো মাগী কলু—বনোয়ারীলাল গোস্বামী
—৪ঠা এপ্রিল (পৃঃ ২)

২৪৭। সরসীলতার গুপ্ত কথা—বিনোদবিহারী বসু—২৮মে (পৃঃ ৬০)

২৪৮। শাশুড়ী জামাই—শম্ভুনাথ বিশ্বাস—২রা অক্টোবর (পৃঃ ২)

২৪৯। ফচ্কে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা—শম্ভুনাথ বিশ্বাস
—২৯শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১২)

২৫০। প্রণয় বিচ্ছেদ—মনোরঞ্জন বসু—৯ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১২)

২৫১। মায়ের আদুরে মেয়ে—অঘোরচন্দ্র ঘোষ
—১০ই অক্টোবর (পৃঃ ১২)

২৫২। পূজাতে সাজা মজা—রামনারায়ণ হাজরা
—২৪শে নভেম্বর (পৃঃ ১৪)

২৫৩। গোবর্দ্ধন—?— ই ডিসেম্বর (পৃঃ ২৪)

২৫৪। অমৃতে গরল—দিবাকান্ত রায়—৭ই ডিসেম্বর (পৃঃ ৭৪)

২৫৫। কুলীন বিবহ—?—১লা জানুয়ারী (পৃঃ ৬৭)

১৮৮৪

২৫৬। বিবাহ বিভ্রাট—অমৃতলাল বসু—৯ই ডিসেম্বর

২৫৭। হঠাৎ নবাব—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃঃ ১২৬)

১২৪৬

২৫৮। গুঁফো গম্বুজ বা রসরত্ন—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

২৫৯। সাদাই ভাল—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায—১৫ই জানুযারী (পৃঃ ৪৮)

২৬০। মাগ সর্ব্বস্ব—রামকানাই দাস (?) ৩রা এপ্রিল (পৃঃ ৩৬)

২৬১। তিন জুতো—নন্দলাল চট্টোপাধ্যায—২০শে মার্চ (পৃঃ ৫১)

২৬২। তুমি কার ?—গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায—১৫ই মে (পৃঃ ৭৯)

২৬৩। কৌলীন্যে কি স্বর্গ দেবে ?—অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
—১০ই জুলাই (পৃঃ ৭১)

২৬৪। বাল্যবিবাহের অমৃত ফল—সারদাচরণ ঘোষ, এম্-এ,
—১৫ই আগষ্ট (পৃঃ ৮৭)

২৬৫। কলির বৌ ঘর ভাঙ্গা ন—হরিহর নন্দী—৮ই আগষ্ট (পৃঃ ৮)

২৬৬। পস্তাবেন ধনঞ্জয—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায—৭ই জুন (পৃঃ ২৮)

২৬৭। বড বৌ বা ডাক্তার—প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায
—১লা অক্টোবর (পৃঃ ৩৫)

২৬৮। গ্রাব্ খেলা প্রহসন—মদ্দা গাজী—২৩শে অক্টোবর (পৃঃ ২০)

২৬৯। অসৎ বংশের বিপরীত ফল—হরিহর নন্দী
—৫ই জানুযারী (পৃঃ ৭২)

২৭০। চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে—অমৃতলাল বসু

১৮৮৫

২৭১। নাকে খৎ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায (পৃঃ ২১)

২৭২। টাইটেল দর্পণ—প্রিযনাথ পালিত—৮ই এপ্রিল (পৃঃ ৩৬)

২৭৩। সচিত্র হনুমানের বস্ত্র হরণ—বেচুলাল বেণিযা
—১৯শে জুন (পৃঃ ৩৪)

২৭৪। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—রাধাবিনোদ হালদার (পৃঃ ৩৪)

২৭৫। কেরাণী চরিত—প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায—১৪ই ডিসেম্বর (পৃঃ ১৭)

২৭৬। গাঁযের মোড়ল বা গৃহস্থের সর্ব্বনাশ—অমৃতলাল বিশ্বাস
—১৭ই ডিসেম্বর (পৃঃ ৮৯)

২৭৭। হাল আমলের সভ্যতা—পূর্ণচন্দ্র সরকার
—১১ই ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৪৬)

২৭৮। সমাজ কলঙ্ক—আশুতোষ বসু—৮ই মে (পৃঃ ২৬)

২৭৯। তোমার ভালবাসার মুখে আগুন—নলিনীলাল দাসগুপ্ত
—৫ই মে (পৃঃ ২২)

২৮০। যৌবনের ঢেউ—?—১০ই মাচ (পৃঃ ১৮)

২৮১। কলির মেয়ে ও নব্যবাবু—?—১০ই মাচ (পৃঃ ১৮)

২৮২। কলির ছেলে প্রহসন—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায
—২৯শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১০)

১৮৮৬

২৮৩। ঠাকুর পো—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায—২০শে অক্টোবর (পৃঃ ৭৮)

২৮৪। হরিঘোষের গোযাল—?—২৫শে আগষ্ট (পৃঃ ৭৮)

২৮৫। বাপ্‌রে কলি—কালীকুমার মুখোপাধ্যায—২রা মাচ (পৃঃ ২৮)

২৮৬। স্বাধীন জেনানা—রাখালদাস ভট্টাচার্য
— ১লা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৩৬)

২৮৭। সুরুচির ধ্বজা—রাখালদাস ভট্টাচার্য -৩০শে অক্টোবর (পৃঃ ৩৬)

২৮৮। এমন কর্ম্ম আর করবো না—হরিহর নন্দী—১০ই এপ্রিল (পৃঃ ৯)

২৮৯। রসিক নাটক—হরিমোহন পাল—১০ই এপ্রিল (পৃঃ ২৮)

২৯০। ফচ্‌কে ছুঁড়ীর ভালবাসা—?—১২ই আগষ্ট (পৃঃ ১১)

২৯১। কি মজার শ্বশুরবাড়ী, যার যার আছে পয়সা কড়ি
—চুনীলাল শীল—২৮শে জুলাই (পৃঃ ১২)

২৯২। ভালবাসার মুখে ছাই—লালবিহারী সেন—৩রা আগষ্ট (পৃঃ ১১)

২৯৩। রহস্য মুকুর—কালীচরণ চট্টোপাধ্যায—১২ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ২০)

২৯৪। নাত্‌নি জামাই—হরিহর নন্দী (২য় সং)
—৮ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১০)

২৯৫। ছোট বৌযের গুপ্ত প্রেম—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায ?
—১১ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১২)

২৯৬। ঘিয়ের সাত কাণ্ড—নীলমণি শীল—৪ঠা সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১২)

২৯৭। বুড়ো পাগ্‌লার বে—এস্‌.এন্‌. লাহা—৯ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১২)

২৯৮। ঘিয়ের গন্ধে প্রাণ গেল—এস্‌. এন্‌. লাহা
—২১শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১২)

২৯৯। পিরীতের বাঁদর নাচ—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায ?
—৪ঠা সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১২)

৩০০। সংস্কারক প্রহসন—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—২০শে ডিসেম্বর (পৃঃ ২৪)

১৮৮৭

৩০১। অবলা ব্যারাক—রাখালদাস ভট্টাচার্য্য—২রা জুলাই (পৃঃ ৩৪)

৩০২। ষষ্ঠি বাটা প্রহসন—প্রফুল্লনলিনী দাসী (পৃঃ ৪৩)

৩০৩। বেল্লিক বাজার—গিরিশচন্দ্র ঘোষ (পৃঃ ৪৬)

৩০৪। রুক্মিণী রঙ্গ—রাখালদাস ভট্টাচার্য্য—৩০শে জুলাই (পৃঃ ২৪)

৩০৫। বৈষ্ণব মাহাত্ম্য—হরিমোহন পাইন—১০ই জুলাই (পৃঃ ৩৫)

৩০৬। রাঙ্গা বৌয়ের গোদা ভাতার—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ?
—২৬শে জানুয়ারী (পৃঃ ১২)

৩০৭। কলির ছেলের প্রহসন—ত্রিভুবাম দাস—১লা মাচ (পৃঃ ২৮)

৩০৮। ঠেঙ্গাপাথিক ভুঁইফোড় ডাক্তার—কুঞ্জবিহারী দেব
—১১ই ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ১২১)

৩০৯। অসৎ কর্মের বিপরীত ফল (২য়)—হরিহর নন্দী
—১৫ই মাচ (পৃঃ ১৪)

৩১০। সাজাব কাজে হাজার গোল—কালীকুমার মুখোপাধ্যায
—২৭শে এপ্রিল (পৃঃ ২৭)

৩১১। মাতাল সন্ন্যাসী—ওয়াহেদ বক্স—১০ই জুলাই (পৃঃ ৯)

৩১২। আজব জোলা—চন্দ্রকান্ত দত্ত—২২শে আক্টোবর (পৃঃ ১০)

৩১৩। গোপালমণির স্বপ্ন কথা—এস.এন. লাহা
—২১শে অক্টোবর (পৃঃ ১২)

৩১৪। শান্তমণির চূড়ান্ত কথা—মণিলাল মিশ্র
—২৬শে অক্টোবর (পৃঃ ১২)

৩১৫। কলির অবতার—মহেন্দ্রনাথ দাস—২রা ডিসেম্বর (পৃঃ ৪৮)

৩১৬। এক ঘরে দুই রাঁধুনি পুড়ে মলো ফ্যানগালুনি
—রাধাবিনোদ হালদার—১৬ই নভেম্বর (পৃঃ ১২)

৩১৭। মাগ ভাতারের খেলা—কানাইলাল ধর—১১ই নভেম্বর (পৃঃ ১২)

৩১৮। দোজবরে ভাতারের তেজবরে মাগ—রাধাবিনোদ হালদার
—২২শে নভেম্বর (পৃঃ ১০)

৩১৯। যুগীর পৈতে রঙ্গ—শ্রীনাথ লাহা—১২ই নভেম্বর (পৃঃ ১২)

১৮৮৮

৩২০। নব লীলা—প্যারীমোহন চৌধুরী

৩২১। কলির প্রহ্লাদ—রাজকৃষ্ণ রায—২রা সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৭০)

৩২২। ভণ্ড দলপতি দণ্ড—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

—৬ই এপ্রিল (পৃঃ ১৬)

৩২৩। ভণ্ড বীর—রাখালদাস ভট্টাচার্য্য (পৃঃ ৪০)

৩২৪। শিখ্‌ছ কোথা ? ঠেকেছি যথা—হরিহর নন্দী

—২০শে ডিসেম্বর (পৃঃ ৮)

৩২৫। বিজ্ঞানবাবু—সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায—১৫ই এপ্রিল (পৃঃ ৪৮)

৩২৬। দিল্লীকা লাড্ডু—সুধামাধব দাস—১০ই জুলাই (পৃঃ ২৪)

৩২৭। জয জগন্নাথ—রসিকপ্রসাদ মুখোপাধ্যায—২রা জানুয়ারী (পৃঃ ২০)

৩২৮। ষ্টুডেণ্ট্‌স-রহস্য—?—১৬ই ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৬৬)

৩২৯। বারাবী বিভ্রাট—অ'বনাথ মুখোপাধ্যায—১৫ই মে (পৃঃ ৭০)

৩৩০। পাস করা মাগ—রাধাবিনোদ হালদার—১০ই মে (পৃঃ ৬৬)

৩৩১। পাস করা জামাই—রাধাবিনোদ হালদার—২৩শে মে (পৃঃ ১২)

৩৩২। কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বর্গ হইতে সোনার টালী পতনে কলির অবতার—অ. র. এন সরকার—১৫ই জুলাই (পৃঃ ১১)

৩৩৩। ঠক বাছতে গাঁ উজাড়—শৈলেন্দ্রচন্দ্র সরকার—২৫শে আগষ্ট (পৃঃ ৮)

৩৩৪। মা মাগীর গলায় দড়ি, বৌয়ের হাতে সোনার চুড়ি—

হারাণশশী দে—১৮ই জুলাই (পৃঃ ১২)

৩৩৫। বোনের পো—সারদাকান্ত লাহিড়ী—২৯শে জুলাই (পৃঃ ৮২)

৩৩৬। কলিকালের রসিক মেয়ে (১নং)—হারাণশশী দে

—১৬ই ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৩৭। কানাকড়ি—রাজকৃষ্ণ রায—২৮শে অক্টোবর (পৃঃ ২২)

৩৩৮। আর কি বলদ গাছে ধরে—হরিহর নন্দী

—২০শে ডিসেম্বর (পৃঃ ১০)

৩৩৯। শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়া—হরিহর নন্দী—২০শে ডিসেম্বর (পৃঃ ১০)

৩৪০। পিরীতের মুখে ছাই—হারাণশশী দে—১৯শে ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৪১। কলিকালের প্রেমের রঙ্গ, বেশ্যা নিয়ে রঙ্গভঙ্গ—হারাণশশী দে

—১৪ই ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৪২। প্রণয়ের ভালবাসা—হারাণশশী দে—১৭ই ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

১৮৮৯

৩৪৩। ভোট মঙ্গল—? (লীলা থিয়েটার, মজিলপুর)
—২০শে ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৪৮)

৩৪৪। তোমার উচ্ছন্নে যাবার সুরু—মতিলাল শীল
—৭ই নভেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৪৫। কলিকালের রসিক মেয়ে (২নং)—হারাণশশী দে
—৩রা জুন (পৃঃ ১২)

৩৪৬। স্কুল মাষ্টার—জনৈক ঘর সন্ধানে (আশুতোষ সেন)
—২০শে মার্চ (পৃঃ ৩৪)

৩৪৭। চক্ষুঃ স্থির—ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী—১৫ই মে (পৃঃ ৩৬)

৩৪৮। মাগ সব্বস্ব—রামকানাই দাস—১০ই মে (পৃঃ ৩৬)

৩৪৯। কলির হঠাৎ অবতার—মোহনলাল মিশ্র—১১ই জুলাই (পৃঃ ১২)

৩৫০। বাসর কৌতুক—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৫ই জুন (পৃঃ ৩৫)

৩৫১। বাসর যামিনী—লালবিহারী দে—১১ই জুলাই (পৃঃ ২৩)

৩৫২। অবলা কি প্রবলা ?—বিপিনবিহারী দে—১৬ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৮৪)

৩৫৩। কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি—হরিহর নন্দী—১২ই নভেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৫৪। নাতিন জামাই—হরিহর নন্দী—১২ই নভেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৫৫। ননদ ভাইবো'র ঝগড়া—হরিহর নন্দী—১২ই নভেম্বর (পৃঃ ১০)

৩৫৬। ঘোড়ার ডিম—হরিহর নন্দী—১২ই নভেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৫৭। ট্রাএল ব্রাহ্মণী—জগদ্ধাত্রী—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
—১০ই অক্টোবর (পৃঃ ৫৭)

৩৫৮। প্রাণের জ্বালা—গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়
—২১শে অক্টোবর (পৃঃ ১১)

৩৫৯। বেল্লিক বামন—গোবর্দ্ধন বিশ্বাস—১৩ই জুলাই (পৃঃ ১২)

৩৬০। সাংঘাতিক রগড়—বিপিনবিহারী দে—১১ই জানুয়ারী (পৃঃ ১২)

৩৬১। গাধা ও তুমি—অতুলকৃষ্ণ মিত্র—২১শে এপ্রিল (পৃঃ ৪০)

৩৬২। টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি ?—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
—১০ই আগষ্ট (পৃঃ ৫৩)

৩৬৩। বক্কেশ্বর—অতুলকৃষ্ণ মিত্র—২০শে জুলাই (পৃঃ ३০)

৩৬৪। বিচিত্র অন্নপ্রাসন—পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য
—১৩ই জানুয়ারী (পৃঃ ২৮)
৩৬৫। লম্পটের নাকে খৎ—গুরুদাস বৈরাগী—৪ঠা মে (পৃঃ ১৮)
৩৬৬। রসিক কামিনীর হদ্দ মজা, রথ দেখা আর কলা বেচা—
—মোহনলাল মিশ্র—১১ই জুলাই (পৃঃ ১২)
৩৬৭। বৌবাবু—সিদ্ধেশ্বর রায়—১৪ই সেপ্টেম্বর পৃঃ ৪৪)

১৮৯০

৩৬৮। ভাগের মা গঙ্গা পায় না—অতুলকৃষ্ণ মিত্র
—১৫ই জানুয়ারী (পৃঃ ৩৮)
৩৬৯। মানিক জোড়—বিপিনবিহারী বসু—৩০শে আগষ্ট (পৃঃ ১০৮)
৩৭০। মাষ্টরি দিদি!—কুসুমেশ্বকুমার মিত্র—২৫শে আগষ্ট (পৃঃ ১৬)
৩৭১। সকলেই শুখায—রমেশচন্দ্র নিযোগী—১৫ই মে (পৃঃ ১২)
৩৭২। ডাক্তারবাবু—রাজক রায়—২৫শে মার্চ (পৃঃ ১৪)
৩৭৩। খোকাবাবু—রাজকৃষ্ণ রায়—২রা মার্চ (পৃঃ ১২)
৩৭৪। বেলুনে বাঙ্গালী বিবি—রাজকৃষ্ণ রায়—২রা মার্চ (পৃঃ ১৩)
৩৭৫। শ্রীযুক্তা বৌ বিবি—রাধাবিনোদ হালদার
—২১শে জুলাই (পৃঃ ৩৮)
৩৭৬। লোহেন্দ্র গবেন্দ্র—রাজকৃষ্ণ রায়—৪ঠা অক্টোবর (পৃঃ ৬৪)
৩৭৭। টাটকা টোটকা—রাজকৃষ্ণ রায় ৯ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ২০)
৩৭৮। জগা পাগলা—রাজকৃষ্ণ রায়—১৫ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৩২)
৩৭৯। জুজু—রাজকৃষ্ণ রায়—৯ই জুলাই
৩৮০। তাজ্জব ব্যাপার—অমৃতলাল বসু—২রা আগষ্ট পৃঃ ৭০)
৩৮১। বিধবা সঙ্কট—অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫ই নভেম্বর (পৃঃ ৭০)
৩৮২। বৌবাবু—কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ৩৪)
৩৮৩। বুঝলে ?—বিপিনবিহারী বসু

১৮৯১

৩৮৪। আইন বিভ্রাট—হরেন্দ্রলাল মিত্র—৪ঠা মার্চ পৃঃ ২১)
৩৮৫। বানরের গলায হীরার হার—হাজারীলাল দত্ত
—১০ই এপ্রিল (পৃঃ ১২)

৩৮৬। বার বাহার—জানকীনাথ বসু (বৈকণ্ঠনাথ বসু)
—৬ই নভেম্বর (পৃঃ ৪৭

৩৮৭। পৌরাণিক পঞ্চরং—জানকীনাথ বসু (বৈকুণ্ঠনাথ বসু)
—৮ই জুন (পৃঃ ৫৬)

৩৮৮। নাট্যবিকার—জানকীনাথ বসু (বৈকুণ্ঠনাথ বসু)
—৭ই জুন (পৃঃ ৪৮)

৩৮৯। বড়বাবু—নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—৫ই নভেম্বর (পৃঃ ১৫)

৩৯০। পথজারে পাজী—দুর্গাদাস দে—২৩শে ডিসেম্বর (পৃঃ ২৮)

৩৯১। সম্মতি সঙ্কট—অমৃতলাল বসু (মজলিস্-মাঃ, ফাঃ ১২৯৭)

৩৯২। প্রেম সাগর—ওয়াহেদ বক্স—২০শে ডিসেম্বর (পৃঃ ১৮)

১৮৯২

৩৯৩। রাজা বাহাদুর—অমৃতলাল বসু—১০ই জানুয়ারী (পৃঃ ৪৮)

৩৯৪। পাশ করা আদুরে বৌ—উপেন্দ্রনাথ ঘোষ—১লা মার্চ (পৃঃ ২০

৩৯৫। মিউনিসিপ্যাল দর্পণ—সুন্দরীমোহন দাস
—২১শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৫৭)

৩৯৬। কালাপানি—অমৃতলাল বসু—১৮ই ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৯৭। নদের চাঁদ—প্রমথনাথ দাস—২০শে ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৯৮। পূজার রোশনাই—?—১৮ই ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

৩৯৯। এর উপায় কি ?—মীর মোশাররফ হোসেন
—৩০শে জানুয়ারী (পৃঃ ৭০)

৪০০। পশ্চিম প্রহসন—কুঞ্জবিহারী রায় (পৃঃ ১১৬)

৪০১। কলির হাট—অতুলকৃষ্ণ মিত্র (পৃঃ ৩৩)

৪০২। গোড়ায় গলদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ১৩৬)

১৮৯৩

৪০৩। হ য ব র ল—কুঞ্জবিহারী বসু—২০শে ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ১৮)

৪০৪। খণ্ড প্রলয়—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—১৬ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৩০)

৪০৫। জীয়ন্ত মানুষ যমের বাড়ী—অনাথবন্ধু চক্রবর্তী
—১৫ই ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ১১)

৪০৬। বেজায় আওয়াজ—দেবেন্দ্রনাথ বসু (পৃঃ ৪০)

৪০৭। অবাক্ কাণ্ড বা জ্যান্ত বাপের পিণ্ডদান
—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ২৮)

৪০৮। কন্যাদায়—যতীন্দ্রচন্দ্র শর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়)

৪০৯। বুড়ো বাঁদর —অতুলকৃষ্ণ মিত্র

১৮৯৪

৪১০। বাবু—অমৃতলাল বসু—২৭শে জানুয়ারী (পৃঃ ৯১)

৪১১। বড়দিনের বখ্‌শিশ্—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
—২৯শে ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৩৬)

৪১২। জামাই বরণ—এ. ডি. ব—২রা আগষ্ট (পৃঃ ৫৪)

৪১৩। আজব কারখানা বা বিলাতী সং—অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র
—১৪ই মার্চ (পৃঃ ৩১)

৪১৪। কপালের লেখা—যোগীন্দ্রনাথ ভাস্কর—১২ই এপ্রিল (পৃঃ ৪)

৪১৫। সভ্যতার পাণ্ডা - গিরিশচন্দ্র ঘোষ—২৪শে ডিসেম্বর (পৃঃ ৫০)

৪১৬। যমের ভুল—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—২৫শে ডিসেম্বর (পৃঃ ৯৫)

৪১৭। বেহদ্দ বেহায়া—কেদারনাথ মণ্ডল—১০ই জানুয়ারী (পৃঃ ৩৯)

৪১৮। মুই হাঁদু—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—১৩ই জানুয়ারী (পৃঃ ৬৫)

৪১৯। সপ্তমীতে বিসর্জন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৮৯৫

৪২০। নারী চাতুরী—চন্দ্রশেখর শর্ম্মা—২৭শে এপ্রিল (পৃঃ ২০)

৪২১। মাগ মুখো ছেলে—এস্. বি. পাল—১৮ই মার্চ (পৃঃ ১৫)

৪২২। একাকার—অমৃতলাল বসু—২৯শে জানুয়ারী (পৃঃ ৯৫)

৪২৩। কলির বউ—আজিজ আমেদ—১৯শে মে (পৃঃ ১২০)

৪২৪। আক্কেল সেলামী বা উদ্ভট মিলন—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী
—৯ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৩২)

৪২৫। কলির কাপ—যশোদানন্দন চট্টোপাধ্যায়
—১লা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ৫২)

৪২৬। সমাজ বিভ্রাট বা কল্কি অবতার—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
—৯ই সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৩২)

১৮৯৬

৪২৭। রক্তারক্তি—অক্ষয়কুমার দে—২রা জানুয়ারী (পৃঃ ৭০)

৪২৮। রক্তগঙ্গা—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—২৩শে অক্টোবর (পৃঃ ২৮)

৪২৯। লণ্ডভণ্ড—সিদ্ধেশ্বর ঘোষ—৩০ মার্চ (পৃঃ ৫৭)

৪৩০। হিতে বিপরীত—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—৭ই মে (পৃঃ ৩০)

৪৩১। বিলাসী যুবা—অঘোর বসু চৌধুরী—১লা মে (পৃঃ ৬১)

৪৩২। বোধনে বিসর্জন—অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য—১৫ই মে (পৃঃ ৪৮)

৪৩৩। শয্যা গুরু—হরনাথ চক্রবর্তী—৪ই নভেম্বর (পৃঃ ৭৮)

৪৩৪। ছবি—দুর্গাদাস দে—২৮শে ডিসেম্বর (পৃঃ ৭৬)

৪৩৫। গুল্‌ড্‌ ফুল—রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত- ১৫ই ডিসেম্বর (পৃঃ ২৮)

৪৩৬। প্রেমের বামড—শরৎচন্দ্র দাস—১৩ই ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

৪৩৭। এ মেয়ে পুরুষের বাবা—শরৎচন্দ্র দাস—১৩ই ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

৪৩৮ দশ আনা ছ আনা—শরৎচন্দ্র দাস—১০ই নভেম্বর পৃঃ ১২)

৪৩৯। পাঁচ কনে—গিরিশচন্দ্র ঘোষ—৫ই জানুয়ারী

১৮৯৭

৪৪০। বৌমা—অমৃতলাল বসু—১১ই জানুয়ারী (পৃঃ ১০০)

৪৪১। নবরাহা বা যুগমাহাত্ম্য—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
—৭ই জানুয়ারী (পৃঃ ৩৩)

৪৪২। আমি হিন্দু মতে সাহেব হব, হ্যাট্‌ কোট পরে সদাই রব
—শশিভূষণ অধ্যায়—১লা জানুয়ারী (পৃঃ ১২)

৪৪৩। বৈকুণ্ঠের খাতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫ই এপ্রিল (পৃঃ ৫৫)

৪৪৪। কাপ্তেনবাবু—কালীচরণ মিত্র—১০ই জুন (পৃঃ ৮৪)

৪৪৫। মেয়েছেলের লেখাপড়া, আপনা হতে ডুবে মরা
—হরিপদ ভট্টাচার্য্য —২১শে আগষ্ট (পৃঃ ৯)

৪৪৬। সই—কালীচরণ মিত্র—৫ই জুলাই (পৃঃ ৪৪)

৪৪৭ আড়কাটি—হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১লা সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৮৯)

৪৪৮। নক্সা—গোবিন্দচন্দ্র দে—১২ই জানুয়ারী (পৃঃ ৩৪)

৪৪৯। কষ্টি পাথর—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৭৮)

১৮৯৮

৪৫০। মিস বিনো বিবি বি এ—দুর্গাদাস দে—২৫শে জুলাই (পৃঃ ৬৯)

৪৫১। ফটিক চাঁদ—চুণীলাল দেব—২৭শে মার্চ (পৃঃ ৬২)

৪৫২। ডুমুরের ফুল—কুসুমেষুকুমার মিত্র—১০ই জুলাই (পৃঃ ৮৪)

৪৫৩। গ্রাম্য বিভ্রাট—অমৃতলাল বসু—২রা ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ১১৬)

৪৫৪। লবাবু—দুর্গাদাস দে (পৃঃ ৬০)

৪৫৫। প্রেম নাটক—মন্মথলাল মিশ্র—৩১শে ডিসেম্বর (পৃঃ ১২)

১৮৯৯

৪৫৬। Encore '99 !!! Or শ্রীমতী—দুর্গাদাস দে
—৯ই ডিসেম্বর (পৃঃ ৭৪)

৪৫৭। আমার এ ম বি মাস্তুল—পঞ্চানন বাগচৌধুরী—৬ই মার্চ (পৃঃ ৫৬)

৪৫৮। ভূটিয়াম পদ বা দার্জ্জিলিংয়ের নক্সা—ধীরেন্দ্রনাথ পাল
—২৬শে জুন (পৃঃ ৩৬)

৪৫৯। বগড়ের চাঁচি—বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
—৯ই ফেব্রুয়ারী (পৃঃ ১০৪)

৪৬০। মরবট বাবু—

৪৬১। ভিটে কুল ও শাক—চণ্ডীচরণ ঘোষ (পৃঃ ৩৫)

৪৬২। কচ্ছের ...—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৫ই ডিসেম্বর (পৃঃ ৪০)

[উপরের তালিকাভুক্ত প্রহসনগুলোর মধ্যে অনেকগুলিই ছদ্মনাম বা নামবিহীন অবস্থায় মুদ্রিত। ক্যালকাটা গেজেটে প্রদত্ত সরকারী নথি এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রামাণ্য উক্তি থেকে স্থলবিশেষে নাম উল্লেখ করা হয়েছে]

পরিশিষ্ট—খ

॥ অনিশ্চিত খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রহসনসমূহের তালিকা ॥

নিম্নোক্ত তালিকাটি ত্রুটিমুক্ত না-ও হতে পারে। বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচার, ব্যক্তিগত অনুমানের বাস্তবতা বিচার ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। তবু তালিকাটি প্রণয়নের আবশ্যকতা বোধ করা হয়েছে লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় প্রহসনের নামোদ্ধারের তাগিদে।

প্রাপ্ত ॥

৪৬৩। হাড় জ্বালানী—গোলাম হোসেন (পৃঃ ১৫)

৪৬৪। ঝাঁড় ভাঁড় মিথ্যাকথা তিন লয়ে কলকাতা—প্যারীমোহন সেন

৪৬৫। ফোতো নবাবি— ?

৪৬৬। পোঁটাচুন্নির বেটা চন্দনবিলেস (পৃঃ ২০)

৪৬৭। নভেল নায়িকা বা শিক্ষিতা বৌ— ? (পৃঃ ২০)

৪৬৮। পুরু নজর—কালু মিঞা

৪৬৯। রহস্যের অন্তর্জ্জলী— ?

৪৭০। চিনির বলদ— ?

গ্রন্থকার-বিশেষণে নামোল্লেখ॥—

৪৭১। কমলিনীর মধুচাক—বেচুলাল বেণিয়া

—১৮৮৫ খৃঃ জুন-এর আগে প্রকাশিত।

৪৭২। ছোট বউর বোম্বাচাক—বেচুলাল বেণিয়া

—১৮৮৫ খৃঃ জুন-এর আগে প্রকাশিত।

৪৭৩। স্ত্রীবদ্ধি প্রহসন—"পরশুরাম" গ্রন্থকার।

—১৩০৪ সালের আগে প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনে নামোল্লেখ॥—

৪৭৪। ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব— ?

৪৭৫। হবির লুট— ?

৪৭৬। হঠাৎ জ্ঞান— ?

৪৭৭। সাক্ত গেঁয়ের কাছে মামদোবাজী— ?

৪৭৮। যমের মায়ের গঙ্গাস্নান— ?

৪৭৯। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ— ?

৪৮০। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী — ?

৪৮১। বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনায় প্রাণ যায়— ?

৪৮২। প্রেম করা বিষম দায়— ?

৪৮৩। প্রবাসে পতি কি দুর্গতি— ?

৪৮৪। পাড়াগেঁয়ে একি দায়, ধর্ম্ম রক্ষার কি উপায়— ?

৪৮৫। ধান ভানতে শিবের গীত— ?

৪৮৬। ছাই ফেলতে ভাঁযা কুলো— ?

৪৮৭। ঘোর কলি— ?

৪৮৮। ঘোর ইয়ার— ?

৪৮৯। ঘরের কড়ি দিয়ে মদ খায় লোকে বলে মাতাল— ?

৪৯০। কেউ কারু নয়— ?

৪৯১। উরোৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোক গেলরে বাপ্— ?

৪৯২। অবাক কলি পাপে ভরা—নন্দলাল দত্ত

(৪৭৪ নং থেকে ৪৯২ নং প্রহসন— ৪৬৪ নং প্রহসনের বিজ্ঞাপনে)

৪৯৩। দুই সতীনের ঝগড়া—হরিহর নন্দী

(১২৯৩—৪ঠা ভাদ্রের পূর্বে প্রকাশিত। ৩২৪ নং প্রহসনের বিজ্ঞাপনে)

৪৯৪। নববাবুর কাঞ্চনমালা—ভবানীদাস চট্টোপাধ্যায়

৪৯৫। ছাপাখানার চার ইয়ার—? (৪৯৪—৯৫ নং প্রহসন 'দুর্গোৎসব' (?) পুস্তিকার বিজ্ঞাপনে—'প্রহসন')

৪৯৬। রং সোহাগির আজব ঢং—ছিদ্দিক আলি

৪৯৭। রাতে উপুড় দিনে চিৎ ছোট বউর এ কি রীত—কালু মিঞা

৪৯৮। কোঁৎকা—শেখ মনিরুদ্দি

৪৯৯। সোমত্ত মাগীর সখ—ছিদ্দিক আলি

(৪৯৬—৪৯৯ নং প্রহসন ৪৬৮ নং প্রহসনের বিজ্ঞাপনে)

৫০০। রতনের রতন—? (একটি গ্রন্থচ্যুত ৪র্থ কভার থেকে)

৫০১। নব প্রেয়সীর মান রক্ষা—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত। (২০২ নং প্রহসনের বিজ্ঞাপনে)

৫০২। হিতসাধন—যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৮৯ নং প্রহসনের বিজ্ঞাপনে)

পত্র-পত্রিকায় নামোল্লেখ :—

৫০৩। এরা করে কি ?—কালিদাস মিত্র

(মিত্র প্রকাশ ১২৭৮ ২য় পর্ব—১২শ সংখ্যার বিজ্ঞাপনে)

৫০৪। লম্পটের কারাবাস—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ

(কর্ণধার পত্রিকা (?) পৃঃ ২২০ দ্রষ্টব্য)

৫০৫। জন্ম এয়োস্ত্রী—স্বরনাথ ভট্টাচার্য্য (নব্যভারত, ফাল্গুন —১২৯৭ দ্রষ্টব্য।)

॥ শেষ কথা ॥

প্রহসনের যে তালিকাটি দেওয়া হলো, তার মধ্যে অনেকগুলো খাঁটি প্রহসন কিনা, এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেওয়া সম্ভব। আদিরসাত্মক 'কৌতুক' জাতীয় রচনা এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনা দু-একটি ক্ষেত্রে খাঁটি প্রহসন ধর্মের প্রান্তসীমা অতিক্রম করেছে। কতকগুলো পথ-পুস্তিকা (Street-Literature) কথোপকথনরীতির এবং লঘু জাতীয় হওয়ায় সেগুলোও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রদত্ত তালিকার পরিধি বিস্তারের কারণ ভবিষ্যৎকালে প্রহসনের ধর্ম নিয়ে মাত্রাগত দিক থেকে বিভিন্ন মত দেখা দিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত মতের গোঁড়ামিতে এবং তালিকার সঙ্কীর্ণতায় ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে অসুবিধা দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। প্রহসনগুলো অত্যন্ত দ্রুতভাবে লুপ্তির পথে এগোচ্ছে। এগুলো শুধু সাহিত্য পাঠকের কাছেই নয়, গবেষকদের কাছেও অপাঙ্‌ক্তেয়। অথচ সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে এগুলো যতোটা আবশ্যক, সমাজ সম্পৃক্ত মনো-বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষেও ততোটা প্রয়োজনীয়। পুস্তিকাগুলো যথারীতি লোপ পাবে বলাবাহুল্য, এবং পরে কেউ পড়বেন বলেও মনে হয় না। তব তালিকার মাধ্যমে এগুলোর স্মৃতি রক্ষা করবার মতো দায়িত্ব লেখককে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হলো। গ্রন্থটির মধ্যে যতখানি সম্ভব প্রহসনের বর্ণনাত্মক পরিচয় এবং বিষয়বস্তু দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তার কারণও সেই দায়িত্ব-স্বীকার।

অন্যান্য পুস্তকের চেয়ে প্রহসন সংগ্রহের অসুবিধা যথেষ্ট। পাঠাগারে প্রহসন ধরনের পুস্তকগুলো অনেকদিন আগেই আবর্জনাবোধে বর্জন (Weed out) করা হয়েছে। তাই অধিকাংশ পাঠাগারেই প্রহসনের বিশেষ নামগন্ধ নেই। শতাব্দী কেবল সাহিত্যকেই বাঁচিয়ে রেখেছে, সমাজের দলিল হিসেবে মূল্য দিয়ে অসাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখে নি। তবে কয়েকটি পাঠাগার সাহিত্য অসাহিত্য নির্বিচারে পুরোনো বই সংগ্রহে যত্ন নিয়েছেন। এ সবের মধ্যে সব চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম। এই ধরনের কয়েকটি লাইব্রেরী থেকে কিছু কিছু প্রহসনের পরিচয় উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এইসব নগণ্য পুস্তিকা সংগ্রহের জন্যে আগ্রহ পোষণ করেছিলেন এবং মূল্য

জেনেছিলেন নারিকেলডাঙ্গার 'মানদা-নিবাস'। ব্যক্তিগতভাবে শ্রীযুক্ত সনৎ-কুমার গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজনের সংগ্রহ প্রশংসনীয়। কিছু সংখ্যক প্রহসনের নাম পাওয়া গেছে বেঙ্গল লাইব্রেরী অফিস এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর মুদ্রিত পুস্তক তালিকায়। এ ছাড়া গ্রে-ষ্ট্রীট—বীডন ষ্ট্রীট—চিৎপুর অঞ্চল অর্থাৎ পুরোনো থিয়েটার পাড়ার পুরোনো পুস্তক ব্যবসায়ীদের মারফৎ অস্পষ্ট সংবাদ সংগ্রহ করে অনেক ঘরোয়া সংগ্রহের সুবিধা নিতে হয়েছে। উক্ত অঞ্চলের পুরোনো কাগজ ব্যবসায়ীদের সহৃদয়তায় কিছু সংখ্যক প্রহসনের অস্তিত্ব জানা সম্ভবপর হয়েছে। ব্যক্তিগত সঙ্কোচবোধে, গণিকা পল্লীর কয়েকটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ সম্পর্কে সন্ধান পেয়েও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। দালালদের মারফৎ দু'একটি ক্ষেত্রে মাত্র সফল হয়েছি, কারণ প্রহসনরীতি এবং তার প্রকাশ-তারিখ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এদের কিছুমাত্র নেই। তবে এদের সহৃদয়তা স্বীকার্য।

প্রহসনগুলো তাড়াতাড়ি লোপ পেয়ে যাবার অনেক কারণ আছে। রসিকতার বই সমসাময়িক ব্যাপার নিয়ে রচিত হলে, সে সময় তা খুব হাতে হাতে ঘোরে। প্রহসনের বই গুলো অধিকাংশই সমসাময়িক ব্যাপার নিয়ে রসিকতা। জনসমাজে প্রচারের জন্যে এগুলোর দাম ছিলো খুব সস্তা এবং বলাবাহুল্য পাতাও সেরকম নীচু ধরনের ছিলো। তাই, কালের আবেদন শেষ হতে না হতে বইয়ের দেহ-সামর্থ্য শেষ হতো। ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলো থেকে প্রহসনের অস্তিত্ব লোপ পাবার কারণ একমাত্র এটাই। ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রহসন সাধারণতঃ সেখানেই টিকে গেছে, যেসব ক্ষেত্রে প্রহসনকার স্বয়ং কোনো ব্যক্তিকে উপহার দিয়েছেন, কিংবা বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতি যেখানে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এইসব প্রহসনের সংরক্ষণে কিছুদিন যত্ন দেখা গেলেও পরের পুরুষে তা মূল্যহীনভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া একত্র বাঁধিয়ে না রাখলে আলমারিতে তা বেশিদিন থাকে না। ক্ষুদ্র নগণ্য পুস্তিকাগুলো এক-একটি করে বাঁধিয়ে রাখবার পরিশ্রমে বা ব্যয়ে কেউ সাধারণতঃ রাজী হন না। (বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে একত্র বাঁধিয়ে রাখবার নীতি অনুসরণ করেছেন।)

এবার পাঠাগারের-কথা। যে সব বই বেশি আদান-প্রদান হয়, পাঠাগার কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ সেগুলোই বাঁধাতে চেষ্টা করেন, বিশেষতঃ সেগুলো যদি মোটা হয়। পুস্তিকাগুলো পাঠাগার থেকে সাধারণতঃ বাইরে যায় না,

কারণ পৃষ্ঠায়তন পুস্তকের ওপর গ্রাহকদের ঝোঁক বেশি। তাই দীর্ঘদিন অব্যবহারে পড়ে থেকে এগুলো নষ্ট হয়; কেননা পাতাও উচ্চস্তরের নয়। গ্রাহকদের হাতে গেলেও একই অবস্থা। শতচ্ছিন্ন অবস্থায় পাঠাগারের আলমারিতে কিছুদিন অবস্থান করে সেগুলো পাশের ঘরের ছেঁড়া বইয়ের জঞ্জালের মধ্যে স্থানলাভ করে। তারপর পাতাগুলো আর পাঁচটা বইয়ের সঙ্গে নাড়াচাড়ার সময় এলোমেলো হয়ে যায়। পরে পুরোনো কাগজের দোকানকে আশ্রয় করে। পাঠাগারের ছিন্ন পুস্তক-পুস্তিকাগুলোর পাতা মিলিয়ে মিলিয়ে পূর্ণায়তন করবার মহৎ তাগিদ অনেক পাঠাগারেরই নেই। সবচেয়ে দুঃখের কথা, দুষ্প্রাপ্য-স্বল্পপ্রাপ্য সম্পর্কিত কোনো চেতনাই এঁদের মধ্যে অনেকের নেই।

পাঠাগার থেকে ছাঁটাই Weed out) করবার আর একটি কারণ আছে। এগুলো প্রায় সবই 'হুজুগের রচনা'। আন্দোলন স্তিমিত হলেই এগুলো পাঠকের কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে। এ সব ক্ষেত্রে পাঠকের ভরসা ও অনুগ্রহার্থী পাঠাগার-কর্তৃপক্ষের দোষ দেওয়া যায় না।

লুপ্তপ্রায় প্রহসনগুলোর পরিচয় সাহিত্য-অসাহিত্য নির্বিচারে গ্রন্থের মধ্যে তুলে ধরবার হেতু এ ছাড়া আর কিছু নয়। এ গুলোর লোপ সাধনের ভার কাল স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, কিন্তু গবেষক ঐতিহাসিকরা কালের এই নির্দয়তাকে মেনে নিতে বেদনাবোধ করেন।

গবেষণার খাতিরে রুচিবোধ মেনে চলা গ্রন্থকারের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। "এরাই আবার সভ্য কিসে?—প্রহসনের (১৮৯৭ খৃঃ) লেখক জয়কুমার রায় উৎসর্গ পত্রে (১২ই মাঘ, ১৩০৫ সাল) তার অগ্রজ নবকুমার রায়কে লিখেছিলেন,—"উদ্দেশ্য সাধন করিতে বসিয়া বাধ্য হইয়া দুই একটি সুরুচি বিরুদ্ধ বিষয় সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণের নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করিব।" প্রহসনকারের এবং বর্তমান গ্রন্থকর্তার উদ্দেশ্য এক না হলেও কৈফিয়ৎ প্রার্থনার দিক থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

নির্দেশিকা

* ভূমিকা (ডঃ ভট্টাচার্য) এবং পরিশিষ্ট ক ও খ (লেখক) অংশকে আপাতত নির্দেশিকার পরিধি-বহির্ভূত রাখা হলো।—জ

ই

ঈ

উ

এ

প

ফ

ব

ল

শ

ষ

স

হ

॥ পরিমার্জনিকা ॥

৪৬ পৃষ্ঠায় শেষ বাংলা পঙ্‌ক্তিটি আরবী উদ্ধৃতির পরে বসবে। তাছাড়া—

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ মুদ্রণ	শুদ্ধ
৯	১৭	ভারত	ভরত
১২	১৯	সুবৃর্ত্ত	সুবৃত্ত
১৪	২৭	গোলক	গোলোক
২৩	৫	চার ইয়ারের	চার ইয়ারে
২৯	১১	মূলে থাকে। দৈহিক	মূলে থাকে দৈহিক
৪১	৭	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
৬৪	৯	অবিস্তার	অর্থ বিস্তার
৭৯	১৬	৻ ̄॥মক	কৌর্মিক
৮১	৬	দৈর্ঘ মেনে দেওয়া	দৈর্ঘ্য মেনে নেওয়া
৯২	১৫	সলাট লিখন	ললাট লিপি
৯৬	১ম	ভারত	ভরত
১১৩	১৪	চার ইয়ারের	চার ইয়ারে
১৮৫	২৯	বেশ্যাশক্তি	বেশ্যাসক্তি
২৪১	৯	দুষ্প্রবৃত্তিব কেন্দ্র	দুষ্প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে
২৫৭	২০	স্কুল অব ওয়াইভস	স্কুল ফর্ ওয়াইভ্‌স্
২৭২	১০	মোহন্তের কি দুর্দ্দশা (১৮৭৩ খৃঃ)	মহন্তের কি দুর্দ্দশা (১৮৭৩ খৃঃ
২৯৯	১৬	য্যাসা কি ত্যাসা	যেসা কি তেসা
৩২৮	৩	সিদ্দিক আলি	ছিদ্দিক আলি
৩৮৭	২৩	কৌলীন্য কি	কৌলীন্যে কি
৪১২	২৭	শ্রীফল	কুফল
৪১৭	১৭	কাপ্তেন বাবুর	কাপ্তেন বাবু
৪২৪	১	গামছা পড	গামছা পর
৪২৪	৪	সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক	(গব) সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক
৪৩৩	৬	অস্বাভাবিক	অস্বাভাবিকতা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ মুদ্রণ	শুদ্ধ
৪৪৬	১৭	কামারডাঙ্গায	কামারডাঙ্গা ?
৪৭০	১ম ও ২য	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
৪৭৪	১২	দক্ষিণারঞ্জন	দক্ষিণাচরণ
৪৭৪	৯	ঘর থাকতে	ঘর থাক্তে
৫৪৬	২৭	রামকৃষ্ণ	রাজকৃষ্ণ
৫৪৭	২৯	যতীন্দ্রনাথ	যতীন্দ্রচন্দ্র
৫৪৮	২১	মুখোপাধ্যায	বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৪৯	১ম	যতীন্দ্রনাথ	যতীন্দ্রচন্দ্র
৫৬৬	F. N.	K. P. Dutta	K. D. Dutta
৬০২	১৮	চুণীলাল দে	চুণীলাল দেব
৬২১	১৫	বসেন	বসে
৬২৪	১৬	দক্ষিণারঞ্জন	দক্ষিণাচরণ
৬৯১	৭	গগণ	গগন
৭০৩	৯	wires	wives
৭১০	২৫	(অমুদ্রিত)	(লেখক) শরৎচন্দ্র দাস
৭৪২	১৩	জগনাথ	জগন্নাথ
৭৫২	১৪	গোবর্ধন	গোবর্দ্ধন
৭৫৩	২	অন্যতম যুগীদের	অন্যতম। যুগীদের
৭৭২	২১	বকশিস	বখ্‌শিশ্‌
৭৭৭	১ম	বৌ ঠাকরুণ	বউ ঠাকরুণ
৬৪০	২	গত নিকাশ	গত নিকাশ ও হাল বন্দোবস্ত
৭৬৮	২১	কামিনীকুমার	কালীকুমার
১১৪৬	১	বেল্লিক বামুন	বেল্লিক বামন

‘চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী’ প্রহসনটি উল্লেখ কালে অনেক স্থানে ‘শোনে’ মুদ্রিত হয়েছে। সর্বস্থলে নির্দেশিকা-অনুসরণে সংশোধিতব্য।